অখণ্ড সংস্করণ

শিবরাম রচনা সমগ্র

অখণ্ড সংস্করণ

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

সংগ্রহ করার বাতিক কোনো কালেই ছিল না কাকার! কেবল টাকা ছাড়া। কিন্তু টাকা এমন জিনিস যে যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হলে আপনিই অনেক গ্রহ এসে জোটে এবং তখন থেকেই সংগ্রহ শুরু।

একদিন ওদেরই একজন কাকাকে বললে, 'দেখুন, সব বড়-লোকেরই একটা না একটা কিছু সংগ্রহ করার ঝোঁক থাকে। তা না হলে বড়লোক আর বড়লোকে তফাৎ কোথায়? টাকায় তো নেই! ওইখানেই তফাৎ ওখানেই বিশেষ বড়লোকের বৈশিষ্ট্য। আর ধরুন, বৈশিষ্ট্যই যদি না থাকল তবে আর বড়লোক কিসের? আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জেরও কলেক্শনের "হবি" ছিল।'

কাকা বিস্মিত হয়ে গ্রহের দিকে তাকান—'পঞ্চম জর্জও?'

'নিশ্চয়!' কেন, তিনি কি বড়লোক ছিলেন না? কেবল সম্রাটই নন, দারুণ বড়লোকও যে! অনেকগুলো জমিদারকেই একসঙ্গে কিনতে পারতেন।'

'ও! তাই বুঝি জমিদার সংগ্রহ করার বাতিক ছিল তাঁর?' কাকা আরও বিস্ময়ান্বিত।

'উহুঁহু। জমিদার নিয়ে তিনি করবেন কি? রাখবেন কোথায়? ও চীজ্ তো চিড়িয়াখানায় রাখা যায় না। তিনি কেবল স্ট্যাম্পো কলেক্ট করতেন—'

'ইস্ট্যাম্পো? ওই যা পোস্টাপিসে পাওয়া যায়? না, দলিলের?'

'দলিলের নয়! নানা দেশের নানা রাজ্যের ডাকটিকিট, একশো বছর আগের, তারো আগের—তারো পরের—এমনি নানান কালের, নানান আকারের, রঙ-বেরঙের যত ডাকটিকিট।'

'বাঃ বেশত !' কাকা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন—'আমারও তা করতে ক্ষতি কি ?'

'কিছু না। তবে একটা পুরনো টিকিটের দাম আছে বেশ। দু পাঁচ টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ দশ বিশ হাজার দুলাখ চারলাখ পর্যন্ত !'

'অ্যাঁ, এমন ?' কাকা কিছু ভড়কে যান ; তা হোক, তবুও করতেই হবে আমার। টাকার ক্ষতি কি আবার একটা ক্ষতি নাকি ?'

'নিশ্চয় নয় ! আর তা না হলে বড়লোক কিসের ?' এই বলে গ্রহটি উপসংহার করে। এবং, আমার কাকাকেও প্রায় সংহার করে আনে।

কাকা স্ট্যাম্প সংগ্রহ করছেন - এ খবর রটতে বাকী থাকে না। পঞ্চাশ-খানা য়্যালবাম যখন প্রায় ভরিয়ে এনেছেন তখন একদিন সকালে উঠে দেখেন বাড়ির সামনে পাঁচশো ছেলে দাঁড়িয়ে। কি ব্যাপার ? জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় ওরা সবাই এসেছে কাকার কাছে কেউ স্ট্যাম্প বিক্রি করতে, কেউ বা কিনতে। সবারই হাতে স্ট্যাম্পের য়্যালবাম।

কাকা তখন গ্রহকে ডাকিয়ে পাঠান, 'একি কাণ্ড ? এরাও সব ইস্টাম্পো সংগ্রহ করছে যে ? করছে বলে করছে, অনেকদিন ধরে করছে—আমার ঢের আগের থেকেই— একি কাণ্ড ?'

'কি হয়েছে তাতে ?' গ্রহটি ভয়ে ভয়ে বলে, কাকার ভাবভঙ্গী তাকে ভীত করে তুলেছে তখন, 'কেন ওদের কি ও কাজ করতে নেই ?'

'সবাই যা করছে, পাড়ার পাঁচকে ছোঁড়াটা পর্যন্ত'— কাকা এবার একেবারে ফেটে পড়েন, 'তুমি আমাকে লাগিয়েছ সেই কাজে ? ছ্যা ! কেন, এরাও কি সব বড়লোক নাকি ?'

'বড় বালকও তো নয়।' আমি কাকাকে উস্‌কে দিই তার ওপর— 'নেহাৎ কাচ্ছাবাচ্ছা যতো।'

কাকা আবার আফসোস করতে থাকেন, ইস্টাম্পে আমার দশ-দশ হাজার টাকা তুমি জলে দিলে হ্যাঁ ! ছ্যা !'

গ্রহ আর কি জবাব দেবে ? সে তখন বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। পাথরের প্রতিমূর্তি'র মতই তার মুখে কোনো ভাবান্তর নেই আর। তিতি-বিরক্ত হয়ে কাকা নিজের যত য়্যালবাম খুলে ছিঁড়ে চ্যাঙড়াদের ভেতর স্টাম্পের লুট লাগিয়ে দ্যান সেই দণ্ডেই।

কিন্তু স্ট্যাম্প ছাড়লেও বাতিক তাঁকে ছাড়ল না ! বাতিক জিনিসটা প্রায় বাতের মতই, একবার ধরলে ছাড়ানো দায় ! তিনি বললেন, 'ইস্ট্যাম্পো নয়—এমন জিনিস সংগ্রহ করতে হবে যা কেউ করে না, করতে পারেও না। সেই রকম কিছু থাকে তো তোমরা আমায় বাতলাও !'

তখন নবগ্রহ মিলে মাথা ঘামাতে শুরু করল। তাদের প্রেরণায়, তাদেরই,

আরো নব্বই জন উপগ্রহের মাথা ঘামতে লাগল। নতুন 'হবি' বের করতে হবে এবার রীতিমতন বুদ্ধি খাটিয়ে।

নানা রকমের প্রস্তাব হয়! খেচরের ভেতর থেকে প্রজাপতি, পাখির পালক, জলচরের ভেতর থেকে রঙিন মাছ, কচ্ছপের খোলা ইত্যাদি; ভূচরের ভেতর থেকে পুরানো আসবাবপত্র, সেকেলে ঢাল তলোয়ার, চীনে বাসন, গরুর গলার ঘণ্টা, রঙ-বেরঙের নুড়ি, যত রাজ্যের খেলনা—

কাকা সমস্তই বাতিল করে দ্যান। সবাই পারে সংগ্রহ করতে এসব। কেউ না কেউ করেছেই।

তখন পকেটচরদের উল্লেখ হয়। নানাদেশের একালের সেকালের মোহর, টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানি ইত্যাদি। ফাউণ্টেন পেন, দেশলায়ের বাক্সকেও পকেটচরদের মধ্যে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু কাকাকে রাজি করানো যায় না। কেউ না কেউ করেছেই এসব; এতদিন ধরে ফেলে রাখেনি নিশ্চয়।

কেউ কেউ মরীয়া হয়ে বলে—'কেরোসিনের ক্যানেস্তারা?' 'নস্যির ডিবে?' 'জগঝম্প?' 'কিম্বা গাঁজার কলকে?' অর্থাৎ চরাচরের কিছুই তখন বাকি থাকে না। কাকা তথাপি ঘাড় নাড়েন।

নানা রকমের খাবার-দাবার? চপ, কাটলেট, সন্দেশ, শনপাপড়ি, বিস্কুট, টফি, চকোলেট, লেবেনচুস? মানে, খাদ্য অখাদ্য যত রকমের আর যত রঙের হতে পারে—আমিই বাতলাই তখন। তবুও কাকার উৎসাহ হয় না।

অবশেষে চটেমটে একজনের মুখ থেকে বেফাঁস বেরিয়ে যায়—'তবে আর কি করবেন? শ্বেতহস্তীই সংগ্রহ করুন।'

কিন্তু পরিহাস বলে একে গ্রহণ করতে পারেন না কাকা। তিনি বারম্বার ঘাড় নাড়তে থাকেন—'শ্বেতহস্তী! শ্বেতহস্তী! সোনার পাথর বাটির মতো ও কথাটাও আমার কানে এসেছে বটে। ব্রহ্মদেশে না শ্যামরাজ্যে কোথায় যেন ওর পুজোও হয়ে থাকে শুনেছি। হ্যাঁ, যদি সংগ্রহ করতে হয় তবে ওই জিনিস! বড়লোকের আস্তাবল দূরে থাক, বিলেতের চিড়িয়াখানাতেও এক আধটা আছে কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, ওই শ্বেতহস্তীই চাই আমার!'

কাকা সর্বশেষ ঘোষণা করেন, তাঁকে শ্বেতহস্তীই দিতে হবে এনে, শ্যামরাজ্য কি রামরাজ্য থেকেই হোক, হাতিপোতা কি হস্তিনা থেকেই হোক, করাচী কিম্বা রাঁচি থেকেই হোক, উনি সেসব কিছু জানেন না কিন্তু শ্বেতহস্তী ওঁর চাই। চাই ই। যেখান থেকে হোক, যে করেই হোক যোগাড় করে দিতেই হবে, তা যত টাকা লাগে লাগুক। এক আধখানা হলে হবে না, অন্তত ডজন খানেক চাই তাঁর, না হলে কলেকশন আবার কাকে বলে?

এই ঘোষণাপূর্বক তৎক্ষণাৎ তিনি ইঞ্জিনীয়ার কণ্ট্রাকটার ডাকিয়ে আসন্ন শ্বেতহস্তীদের জন্য বড় করে আস্তাবল বানাবার হুকুম দিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য ! দু সপ্তাহের ভেতর জনৈক শ্বেতহস্তীও এসে হাজির ! নবগ্রহের একজন উপগ্রহ কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনে যেন।

কাকা তো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন—'বটে বটে ? এই শ্বেতহস্তী ! এই সেই, বাঃ ! দিব্যি ফরসা রঙ তো ! বাঃ বাঃ !'

অনেকক্ষণ তাঁর মুখ থেকে বাহবা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। হাতিটাও সাদা শুঁড় নেড়ে তাঁর কথায় সমর্থন জানায় !

আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'জানিস, বার্মায়-- না না, শ্যামরাজ্যে এরকম একটা হাতি পেলে রাজারা মাথায় করে রাখে। রাজার চেয়ে বেশি খাতির এই হাতির ; রীতিমতো পুজো হয়—হুঁহুঁ ! শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে রাজা নিজে পুজো করেন। যার নাম রাজপুজো। তা জানিস ?'

এমন সময় হাতিটা একটা ডাক ছাড়ে। যেন কাকার গবেষণায় তার সায় দিতে চায়।

হাতির ডাক ? কিরকম সে ডাক ? ঘোড়ার চিঁ-হিঁ-হিঁ, কি গোরুর হাম্বার মতো নয়, ঘোড়ার ডাকের বিশ ডবল, গরুর অন্তত পঞ্চাশগুণ একটা হাতির আওয়াজ। বেড়ালের কি শেয়ালের ধ্বনি নয় যে একমুখে তা ব্যক্ত করা যাবে। সহজে প্রকাশ করা যায় না সে-ডাক।

হাতির ডাক ভাষায় বর্ণনা করা দুষ্কর।

ডাক শুনেই আমরা দু চার-দশ হাত ছিটকে পড়ি। কাকাও পাঁচগজ পিছিয়ে আসেন।

'বাবা ! যেন মেঘ ডাকল কড়াক্কড়্।' কাকা বলেন, সিংহের ডাক কখনো শুনিনি, তবে বাঘ কোথায় লাগে। হ্যাঁ, এমন না হলে একখানা ডাক।'

'এটাকে হাতির সিংহনাদ হয়ত বলা যায় ? না কাকা ?' আমি বলি।

উপগ্রহটি, যিনি হাতির সমভিব্যাহারে এসেছিলেন, এতক্ষণে একটি কথা বলার সুযোগ পান—'প্রায়ই ডাকবে এরকম। শুনতে পাবেন যখন তখন।'

'প্রায়ই ডাকবে ? রাত্রেও ? তাহলে তো ঘুমনোর দফা—' কাকা যেন একটু দুর্ভাবিতই হন।

'উঁহু রাতে ডাকে না। হাতিও ঘুমোয় কিনা। রাত্রে কেবল ওর শুঁড় ডাকে।'

'তা ডাকে ডাকুক। কিন্তু এর কিরকম রঙ বলত।' আবার আমার প্রতি কাকার দৃক্পাত—'ফর্সা ধবধব করছে। আর সব হাতি কি আর হাতি ? এর কাছে তারা সব জানোয়ার। আসল বিলাতী সাহেবের কাছে যেমন সাঁওতাল। এই ফর্সা রঙটি বজায় রাখতে হলে সাবান মাখিয়ে একে চান করাতে হবে দু বেলা—ভাল বিলিতি সাবান, হুঁ হুঁ পয়সার জন্য পরোয়া

করলে চলবে না। নইলে আমার এমন সোনার হাতি কালো হয়ে যেতে কতক্ষণ?'

'এমন কাজটিও করবেন না।' উপগ্রহটি সবিনয়ে প্রতিবাদ করে।—'ঐটিই বারণ। স্নানটান একেবারে বন্ধ এর। শ্বেত হস্তীর গায়ে জল ছোঁয়ানই নিষেধ, তাহলেই গলগণ্ড হয়ে মারা পড়বে!'

'ঐ গলায় আবার গলগণ্ড?' আমি শুধাই। 'তাহলে তো ভারী গণ্ডগোল!'

'হ্যাঁ, বলো কি?' কাকা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, 'তাহলে, তাহলে?'

'সাধারণ হাতির মতো নয়তো যে রাত দিন পুকুরের জলে পড়ে থাকবে। শ্যামরাজ্যে রীতিমত মন্দিরে সোনার সিংহাসনের ওপরে বসানো থাকে। সেখানে হরদম ধূপধুনো পুজো আরতি চলে। কেবল চন্নামৃত তৈরির সময়েই যা এক আধ ফোঁটা জল ওর পায়ে ঠেকানো হয়। এখানে তো সেরকমটি হবে না।'

কাকা তার কথা শেষ করতে দ্যান না—'এখানে হবে কি করে? রাতারাতি মন্দিরই বা বানাচ্ছে কে, সোনার সিংহাসনই বা পাচ্ছি কোথায়? তবে পুজোরী যোগাড় করা হয়তো কঠিন হবে না, পুরুৎ বামুনের তো আর অভাব নেই পাড়ায়, কিন্তু হাতি পুজোর মন্তর কি তারা জানে?'

কাকার প্রশ্নটা আমার প্রতিই হয়। আমি জবাব দিই—'হাতির চন্নামেত্য আমি কিন্তু খেতে পারবো না কাকা!'

গোড়াতেই বলে কয়ে রাখা ভালো। সেফটি ফার্স্ট! বলেই দিয়েছে কথায়।

'পারবি না? কেন খেতে পারবি না? এ কি তোর গুজরাটি হাতি? কালো আর ভূত? এ হোলো গিয়ে ঐরাবতের বংশধর, স্বর্গের দেবতাদের একজন। খেতেই হবে তোকে—তা না হলে পরীক্ষায় তুই পাশ করতেই পারবিনে।'

পরীক্ষার পাশের ব্যাপারে মেড-ইজির কাজ করবে ভেবে আমি একটু নরম হই। কম্প্রমাইজের প্রস্তাব পাড়তে যাচ্ছি, এমন সময়ে উপগ্রহটি বলে ওঠে—'না না, পুজো করবার আবশ্যক নেই। হস্তী পুজোর ব্যবস্থা তো নেই এদেশে। নিত্যকর্ম পদ্ধতিতেও তার বিধি খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুজো করার দরকার নেই এমনি আস্তাবলে ওকে বেঁধে রাখলেই হবে। গায়ে জলের ছোঁয়াচটিও না লাগে, সহিস কেবল এই দিকে কড়া নজর রাখে যেন।'

'সহিস? হাতির আবার সহিস কি? মাহুতের কথা বলছ বুঝি?' কাকা জিজ্ঞেস করেন।

'সহিস মানে, যে ওর সেবা করবে, সইবে ওকে। সহিস কাঁধে বসলেই মাহুত হয়ে যায়। কিন্তু ওর কাঁধে বসা যাবে না তো। ভয়ানক অপরাধ

তাতে।' উপগ্রহটি ব্যাখ্যা করে দ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাতির উদ্দেশেই হাত তুলে নমস্কার জানায় কিম্বা মাথা চুলকায় কে জানে !

'ওর স্নানের ব্যবস্থা তো হোলো, স্নানটান নাস্তি। আচ্ছা, এবার ওর আহারের ব্যবস্থাটা শুনি'— কাকা উৎগ্রীব হন, 'সাধারণ হাতি তো নয় যে সাধারণ খাবার খাবে ?'— তারপর কি যেন একটু ভাবেন— 'ধার টার তো ? না তাও বন্ধ ?'

তাঁর অদ্ভুত প্রশ্নে আমরা সবাই অবাক হই। বলে ফেলি, 'খাবে না কি বলছেন ? না খেলে অত বড় দেহ টেঁকে কখনো তাহলে ? হাতির খোরাক বলে থাকে কথায়।'

'আমি ভাবছিলাম, চানটানের পাট যখন নেই তখন খাওয়া টাওয়ার হাঙ্গামা আছে কিনা কে জানে।' কাকা ব্যক্ত করেন. 'তা কি খায় ও বলতো ?'

উপগ্রহটি বলে, 'সব কিছুই খায়, সে বিষয়ে ওর রুচি খুব উদার। মানুষ পেলে মানুষ খাবে, মহাভারত পেলে মহাভারত। মানে, মানুষ আর মহাভারতের মাঝামাঝি ভুভারতে যা কিছু আছে সবই খেতে পারে।'

আমি টিপ্পনী কাটি, 'তা হলে হজম শক্তিও বেশ ওর।'

'ভালো. খুবই ভালো।' কাকা সন্তোষ প্রকাশ করেন, 'যদি মানুষ পায়, কতগুলো খাবে ? টাট্‌কা মানুষ অবশ্যি।'

'যতগুলো ওর কাছাকাছি আসবে। টাটকা-বাসি নিয়ে বড় বিশেষ মাথা ঘামাবে না। বলেছি তো খুব উদার রুচি।'

'তুই ওর কাছে যাসনে যেন, খবরদার !' কাকা আমাকে সাবধান করেন, 'তবে তোকে ও মানুষের মধ্যেই ধরবে কিনা কে জানে !'

হঁ্যা, তা ধরবে কেন ? আমি মনে মনে রাগি তা যদি ও না ধরতে পারে, তাহলে ওকেই বা কে মানুষের মধ্যে ধরতে যাচ্ছে ? ওর রুচি যেমনই হোক, ওর বুদ্ধিশুদ্ধির প্রশংসা তো আমি করতে পারব না। কাকার মধ্যেই বরং ওকে গণ্য করব আজ থেকে।

তবে একেবারেই নিশ্চিন্ত হতে চান কাকা. 'খাদ্য হিসাবে কি ধরনের মানুষের ওপর ওর বেশি ঝোঁক ?'

একবার কটাক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে নেন আমার জন্যেই ওঁর যত ভাবনা যেন।

'চেনা লোকেরই পক্ষপাতী, চেনাদেরই পছন্দ করবে বেশি। তবে অচেনার ওপরেও বিশেষ আক্রোশ নেই। পেলে তাদেরো ধরে খাবে।'

'ভালো ভালো। আর কতগুলো মহাভারত ? প্রত্যেক ক্ষেপে ?'

'পুরো একটা সংস্করণই সাবড়ে দেবে।'

'বলছ কি ? অষ্টাদশ পর্ব ইয়া ইয়া মোটা এক হাজার কপি—?'

'অনায়াসে !' উপগ্রহটি জোরের সঙ্গে বলে, 'অনায়াসে !'

'-- সচিত্র মহাভারত ?' কাকা বাক্যটাকে শেষ করে আনেন।

'ছবিটবির মর্ম বোঝে না!' আমি যোগ করি।

'সেই রকম বলেই বোধ হচ্ছে।' কাকা মন্তব্য করেন. আরে, সবাই কি আর চিত্রকলার সমঝদার হতে পারে ?'

উপগ্রহের প্রতি প্রশ্ন হয়, 'সে কথা থাক ! মানুষ আর মহাভারত ছাড়া আর কি খাবে ? খুঁটিনাটি সব জেনে রাখা ভালো।'

ইঁট পাটকেল পেলে মহাভারত ছোঁবেও না ; শালদোশালা পেলে ইঁট পাটকেলের দিকে তাকাবে না, শালদোশালা ছেড়ে বেতালকেই বেশি পছন্দ করবে, কিন্তু রসগোল্লা যদি পায় তো বেতালকেও ছেড়ে দেবে, রসগোল্লা ফেলে কলাগাছ খেতে চাইবে, মানে, এক আলিগড়ের মাখন ছাড়া সব কিছুই খাবে।'

'কেন, মাখন নয় কেন ? মাখন তো সুখাদ্য।

'মাখনকে যুতমতো ঠিক পাকড়াতে পাড়বে না কিনা। শুঁড়েই লেপটে থাকবে, ওকে কায়দায় আনা কঠিন হবে ওর পক্ষে।'

'ও !' কাকা এইবার বুঝতে পারেন।

'হ্যাঁ, যা বলেছেন। মাখন বাগানো সহজ নয় বটে।' আমি বলি, 'এক পাউরুটি ছাড়া আর কেউ তা বাগাতে পারে না।'

'যাক খাদ্য তো হোলো, এখন পানীয় ?' কাকা জিজ্ঞাসু হন।

'তরল পদার্থ যা কিছু আছে। দুধ, জল, ঘোলের সরবৎ, ক্যাস্টর অয়েল, মেথিলেটেড স্পিরিট— কত আর বলব ? কার্বলিক এ্যাসিডেও বিচ্ছু হবে না ওর, তারও দু-দশ বোতল দু-এক চুমুকে নিঃশেষ করতে পারে। কেবল এক চা খায় না।'

'ওটা গুড হ্যাবিট। ভালো ছেলের লক্ষণ।' কাকা ঈষৎ খুশি হন. সিগারেট টানতেও শেখেনি নিশ্চয়। সবই তো জানা হোলো, কিন্তু কি পরিমাণ খায় তা তো কই বললে না হে।'

'যত যুগিয়ে উঠতে পারবেন। এক আধ মণ, এক আধ নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবে।'

'তাতে আর কি হয়েছে। কেবল এক মানুষটাই পেয়ে উঠব না বাপু, ইংরেজ রাজত্ব কিনা। হাতিকে কিম্বা আমাকেই—কাকে ধরে ফাঁসিতে লটকে দ্যায় কে জানে! তবে আজই বাজারে যত মহাভারত আছে সব বইয়ের দোকানে অর্ডার দিচ্ছি। ময়রাদের বলে দিচ্ছি রসগোল্লার ভিয়েন বসিয়ে দিতে। আমার কলা বাগানটাও ওরই নামে উইল করে দিলাম। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করুক। আর ইঁট পাটকেল ? ইঁট পাটকেলের অভাব কি ? আস্তাবল বানিয়ে যা বেঁচেছে আস্তাবলের পাশেই পাহাড় হয়ে আছে। যত ওর পেটে ধরে ইচ্ছামত বেছে খাক, কোনো আপত্তি নেই আমার।'

অতঃপর মহাসমারোহে হস্তীপ্রভুকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা সবাই শোভাযাত্রা করে পেছনে যাই। শেকল দিয়ে ওর চার পা বেঁধে আটকানো হয় শক্ত খুঁটির সঙ্গে। শুঁড়টাকেও বাঁধা হবে কিনা আমি জিজ্ঞাসা করি। 'শুঁড় ছাড়া থাকবে জানতে পারা যায়। শুঁড় দিয়েই ওরা খায় কিনা, কেবল তরল ও স্থূল খাদ্যই নয়, হাওয়া খেতে হলেও ওই শুঁড়ের দরকার।

হাতির দাম শুনে তো আমার চক্ষু স্থির! পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম নয়; যে লোকটা বেচেছে সে থাকে দুশো ক্রোশ দূরে তার এক আত্মীয় শ্যামরাজ্যের জঙ্গল বিভাগে কাজ করে সেখান থেকে ধরে ধরে চালান পাঠায়। উপগ্রহটি অনেক কষ্টে বহুৎ জপিয়ে আরো কেনার লোভ দেখিয়ে এটি তার কাছ থেকে এত কমে আদায় করতে পেরেছেন। নইলে পুরো লাখ টাকাই এর দাম লাগতো! এই হস্তীরত্নের আসলে যথার্থ দামই হয় না, অমূল্য পদার্থ বলতে গেলে।

হাতিকে এতদূরে হাঁটিয়ে আনতে, তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসতেও ভদ্রলোকের কম কষ্ট হয়নি। কিন্তু কাকার হুকুম,—কেবল সেই জন্যই—নইলে কে আর প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এহেন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক শ্বেতহস্তীর সঙ্গে -

'তা ত বটেই' কাকা অম্লান বদনে তখুনি তাকে একটা পঞ্চাশ হাজারের চেক কেটে দ্যান।

'আরো আছে এমন, আরো আনা যায়'—উপগ্রহটি জানান, 'এ রকম শ্বেতহস্তী যত চান, দশ বিশ পঞ্চাশ—ওই এক দর কিন্তু।'

'আরো আছে এমন?' কাকা এক মুহূর্ত একটু ভাবেন, 'বেশ, তুমি আনাবার ব্যবস্থা কর। তাতে আর কি হয়েছে, পঁচিশ লাখ টাকার শ্বেতহস্তীই কিনব না হয় - হয়েছে কি।'

'বড় মানুষের বড় খেয়াল!' সেই পুরাতন গ্রহটি এতক্ষণে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে, 'তা না হলে আর বড়লোক কিসের!'

দু দিন যায়, পাঁচদিন যায়। হাতিটাও বেশ সুখেই আছে। আমরা দু বেলা দর্শন করি। কাকা ও আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কাকিমা বিশেষ ভক্তিভরে। কাকিমা অনেক কিছু মানতও করেছেন, হাতির কাছে ঘটা করে পুজো এবং জোড়া বেড়াল দেবেন বলেছেন। কাকিমার এখনো ছেলেপুলে হয়নি কিনা।

কলাগাছ খেতেই ওর উৎসাহ বেশি যেন। ইঁট পাটকেল পড়েই রয়েছে, স্পর্শও করেনি। দু একটা বেড়ালও এদিক ওদিক দিয়ে গেছে, হাতিকে তারা ভালো করেই লক্ষ করেছে, ও কিন্তু তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি! গাদা গাদা মহাভারত কোণে পুঁজি করা—তার থেকে একখানা নিয়ে ওকে আমি দিতে গেছলাম একদিন। পাওয়ামাত্র উদরস্থ করবে আশা করেছি আমি।

কিন্তু মুখে পোরা দূরে থাক, বইখানা শুঁড়তলগত করেই না এমন সজোরে আমার দিকে ছুঁড়েছিল যে আর একটু হলেই আমার দফা রফা হোতো।
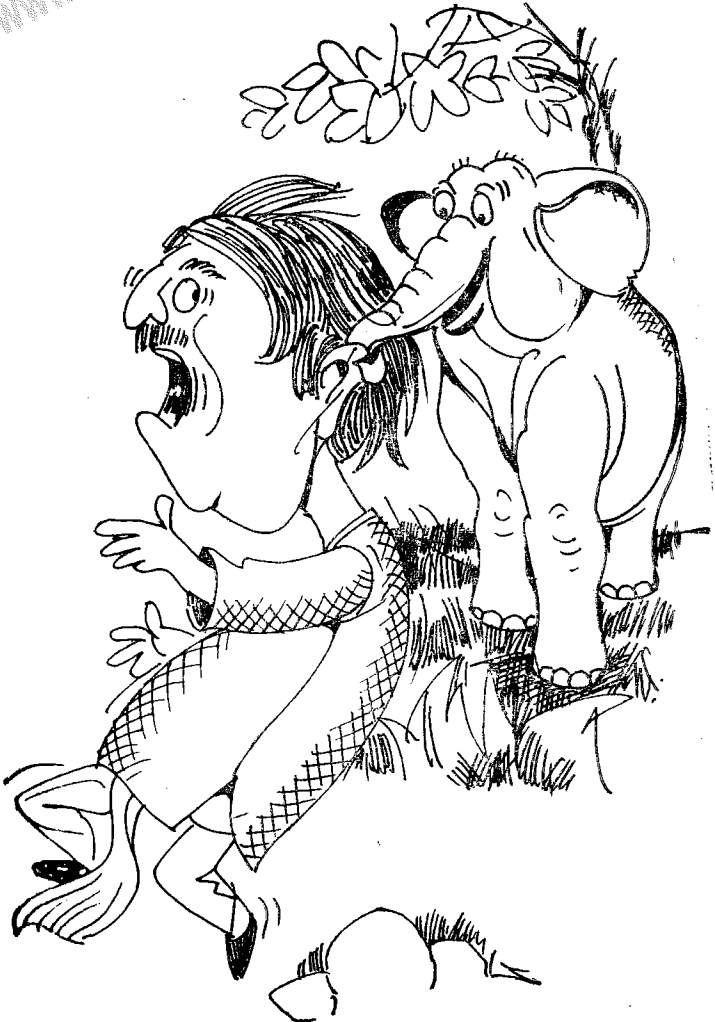
কাকা বললেন, 'বুঝতে পারলি না বোকা? তোকে পড়তে বলছে! ধর্মপুস্তক কিনা! মুখ্যু হয়ে রইলি, ধর্মশিক্ষা তো হোলো না তোর!'

ধর্মশিক্ষা মাথায় থাক। কাকার পুণ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গেছি সেই রক্ষে! না, এর পর থেকে এই ধর্মাত্মা হাতির কাছ থেকে সন্তর্পণে সুদূরে থাকতে হবে; সাত হাত দূর থেকে বাতচিৎ।

এইভাবে হপ্তাতিনেক কাটার পর হঠাৎ একদিন বৃষ্টি নামল। মুড়ি পাঁপরভাজা দিয়ে অকাল বর্ষণটা উপভোগ করছি আমরা। এমন সময়ে মাহুত ওরফে সহিস এসে খবর দিল, বাদলার সঙ্গে সঙ্গে হাতিটার ভয়ানক ছটফটানি আর হাঁকডাক শুরু হয়েছে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটলাম আমরা সবাই।

কি ব্যাপার? সত্যিই ভারী ছটফট করছে তো হাতিটা। মনে হয় যেন লাফাতে চাইছে চার পায়ে।

কাকা মাথা ঘামালেন খানিকক্ষণ। 'বুঝতে পারা গেছে। মেঘ ডাকছে কিনা। মেঘ ডাকলে ময়ূর নাচে। হাতিও নাচতে চাইবে আর আশ্চর্য কি? ময়ূর আর হাতি—বোধহয় একজাতীয়? কার্তিক ঠাকুরের পাছার তলায় ময়ূর আর গণেশ ঠাকুরের মাথায় ওই হাতি, আত্মীয়তা থাকাই স্বাভাবিক। যাই হোক, ওর তিন পায়ের শেকল খুলে দাও, কেবল এক পায়ের থাক, নাচুক একটুখানি!'

তিন পায়ের শেকল খুলে দিতেই ও যা শুরু করল, হাতির ভাষায় তাকে নাচই বলা যায় হয়তো। কিন্তু সেই নাচের উপক্রমেই, আরেক পায়ের শেকল ভাঙতে দেরি হয় না। মুক্তি পাবামাত্র হাতিটা উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়ে, সহিস বাধা দেবার সামান্য প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু এক শুঁড়ের ঝাপটায় তাকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে চলে যায়।

তারপর দারুণ আর্তনাদ করতে করতে মুক্তকচ্ছ শুঁড় তুলে ছুটতে থাকে সদর রাস্তায়। আমরাও দস্তুরমত ব্যবধান রেখে, পেছনে পেছনে ছুটি। কিন্তু হাতির সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে পারব কেন? আমাদের মানুষদের দুটি করে পা মাত্র সম্বল। হাতির তুলনায় তাও খুব সরু সরু। দেখতে দেখতে হাতিকে আর দেখা যায় না। কেবল তার ডাক শোনা যায়। অতি দূর দূরান্ত থেকে।

তিনঘণ্টা পরে খবর আসে, মাইল পাঁচেক দূরে এক পুকুরে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আত্মহত্যা করবে না তো হাতিটা? শ্বেতহস্তীর কাণ্ড, কিছুই বোঝা যায় না। কাকিমা কাঁদতে শুরু করেন, পুজো আচ্চা করা হয়নি ঠিকমতন, হস্তীদেব তাই হয়ত এমন ক্ষেপে গেছেন, এখন কি সর্বনাশ হয় কে জানে! বংশলোপই হবে গিয়ে হয়তো।

বংশ বলতে তো সর্বসাকুল্যে আমি, যদিও পরস্মৈপদী। কাকিমার কান্নায় আমারই ভয় করতে থাকে।

কাকা এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে ছোটেন শ্বেতহস্তীকে প্রসন্ন করতে। আমরা সকলেই চলি কাকার সঙ্গে। কিন্তু হাতির যেরকম নাচ আমি দেখেছি তাতে সহজে ওকে হাতানো যাবে বলে আমার ভরসা হয় না।

পথের ধারে মাঝে মাঝে ভাঙা আটচালা চোখে পড়ে, সেগুলো ঝড়ে উড়েছে কি হাতিতে উড়িয়েছে বোঝা যায় না সঠিক। আশে পাশে জন প্রাণীও নেই যে জিজ্ঞাসা করে জানা যাবে। যতদূর সম্ভব হস্তীবরেরই কীর্তি সব! শ্বেত শুণ্ডের আবির্ভাব দেখেই বাসিন্দারা মল্লুক ছেড়ে সটকেছে এই রকমই সন্দেহ হয় আমাদের।

কিছুদূর গিয়ে হস্তীলীলার আরো ইতিহাস জানা যায়। একদল গঙ্গাযাত্রী একটি আধমড়াকে নিয়ে যাচ্ছিল গঙ্গাযাত্রায়, এমন সময়ে মহাপ্রভু এসে পড়েন। অমন ঘটা করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে রাস্তা জুড়ে যাওয়াটা ওঁর মনঃপূত হয় না উনি ওদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। শোনা গেল, এক একজনকে অনেক দূরে অবধি তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। কেবল বাদ দিয়েছেন, কেন জানা যায়নি, সেই গঙ্গাযাত্রীকে। সেই বেচারা অনেকক্ষণ অবহেলায় পড়ে থেকে, অগত্যা উঠে বসে দেহরক্ষার কাজটা এ যাত্রা স্থগিত রেখে একলা হেঁটে বাড়ি ফিরে গেছে।

অবশেষে সেই পুকুরের ধারে এসে পড়া গেল। কাকা বহু সাধ্য-সাধনায় অনেক স্তব স্তুতি করেন। হাতিটা শুঁড় খাড়া করে শোনে সব, কিন্তু নড়ে চড়ে না। রসগোল্লার হাঁড়ি ওকে দেখানো হয়, ঘাড় বাঁকিয়ে দ্যাখে, কিন্তু বিশেষ উৎসাহ দ্যাখায় না।

পুকুরটা তেমন বড় নয়। কাকা একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ান— কাছাকাছি গিয়ে কথা কইলে ফল হয় যদি। কিছু ফল হয়, কেন না হাতিটা কাকা বরাবর তার শুঁড় বাড়িয়ে দ্যায়।

আমি বলি 'পালিয়ে এসো কাকা। ধরে ফেলবে।'

'দূর। আমি কি ভয় খাবার ছেলে? তোর মতন অত ভীতু নই আমি।' কাকার সাহস দেখা যায়, 'কেন, ভয় কিসের? আমাকে কিছু বলবে না। আমি ওর মনিব— মনিব – উঁ-হুঁ-হুঁ শ্রীবিষ্ণু! সেবক—'

বলতে বলতে কাকা জিভ কাটলেন। কান মললেন নিজের! 'উঁহু, মনিব হব কেন, অপরাধ নিয়ো না প্রভু শ্বেতহস্তী! আমি তোমার ভক্ত— শ্রীচরণের দাসানুদাস। কি বলতে চাও বলো, আমি কান বাড়িয়ে দিচ্ছি। তোমার ভক্তকে তুমি কিছু বলবে না, আমি জানি। হাতির মতো কৃতজ্ঞ জীব দুনিয়ায় দুটি নেই, আর তুমি তো সামান্য হাতি নও, তুমি হচ্ছ একজন হস্তী-সম্রাট।

কাকা কান বাড়িয়ে দ্যান, হাতি শুঁড় বাড়িয়ে দ্যায়—আমরা রুদ্ধশ্বাসে উভয়ের উৎকর্ণ আলাপের অপেক্ষা করি।

হাতিটা কাকার সর্বাঙ্গে তার শুঁড় বোলায়, কিন্তু সত্যিই কিছু বলে না। কাকার সাহস আরো বেড়ে যায়, কাকা আরো এগিয়ে যান। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন, 'দেখছিস, কেমন আদর করছে আমায়, দেখছিস?'

কিন্তু হাতিটা অকস্মাৎ শুঁড় দিয়ে কাকার কান পাকড়ে ধরে। কানে হস্তক্ষেপ করায় কাকা বিচলিত হন 'কেন বাবা হাতি! কি অপরাধ করেছি বাবা তোমার শ্রীচরণে যে এমন করে তুমি আমার কান মলছ?'

কিন্তু হস্তীরাজ কর্ণপাত করেন না। কাকার অবস্থা ক্রমশই করুণ হয়ে আসে: তিনি আমার উদ্দেশ্যে (চেষ্টা করেও আমার দিকে তখন তিনি তাকাতে পারেন না।) বলেন— বাবা শিবু কান গেল, বোধ হয় প্রাণও গেল। তোর কাকিমাকে বলিস—বলিস যে সজ্ঞানে আমার হস্তীপ্রাপ্তি ঘটে গেছে!'

আমরা ক্ষিপ্র হয়ে উঠি, কাকাকে গিয়ে ধরি। জলের মধ্যে একা হাতি, স্থলের মধ্যে আমরা সবাই। হাতির চেষ্টা থাকে কাকার কান পাকড়ে জলে নামাতে - আর হাতির চেষ্টা যাতে ব্যর্থ হয় সেই দিকেই আমাদের প্রচেষ্টা। মিলনান্ত কানাকানি শেষে বিয়োগান্ত টানাটানিতে পরিণত হয়, কান নিয়ে এবং প্রাণ নিয়ে টানাটানিতে!

কিছুক্ষণ এই টাগ অফ-ওয়ার চলে। অবশেষে হাতি পরাজয় স্বীকার করে তবে কাকার কান শিকার করে তারপরে। আর হাতির হাতে কান সমর্পণ করে কাকা এ যাত্রা প্রাণরক্ষা করেন।

কাকার কানটি হাতি মুখের মধ্যে পুরে দেয়। কিন্তু খেতে বোধহয় তার তত ভালো লাগে না। সেইজন্যই সে এবার রসগোল্লার হাঁড়ির দিকে শুঁড় বাড়ায়।

যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে কাকা বলতে থাকেন—'দিসনে খবরদার, দিসনে ওকে রসগোল্লা। হাতি না আমার চোদ্দ পুরুষ! পাজী ড্যাম শুয়ার রাসকেল, গাধা, ইস্টুপিট! উঃ, কিছু রাখেনি কানটার গো, সমস্তটাই উপড়ে নিয়েছে। উল্লুক, বেয়াদব, আহাম্মোক!'

কাকার কথা হাতিটা যেন বুঝতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে আসে। ও হরি, একি দৃশ্য! গলার নীচের থেকে যে অব্দি জলে ডোবানো ছিল, হাতির সেই সর্বাঙ্গ একেবারে কুচ কুচে কালো—যেমন হাতিদের হয়ে থাকে। কেবল গলার উপর থেকে সাদা - য়্যাঁ, এ আবার কী বাবা?

তাকিয়ে দেখি, পুকুরের কালো জল হাতির রঙে সাদা হয়ে গেছে। শ্বেত-হস্তীর আবার একি লীলা?

কর্ণহারা হয়ে সে-শোকও কাকা কোনো মতে এ পর্যন্ত সামলে ছিলেন, কিন্তু হাতির এই চেহারা আর তার সহ্য হয় না। অত সাধের তাঁর সাদা হাতি—!

মূর্চ্ছিত কাকাকে ধরাধরি করে আমরা বাড়ি নিয়ে যাই। হাতির দিকে

কেউ ফিরেও তাকাই না। একটা বিশ্রী কালো ভূতের মত চেহারা কদাকার কুৎসিৎ বুড়ো হাতি। উনি যে কোনো কালে সোনার সিংহাসনে বসে পুজাপুজো লাভ করেছেন একথা ঘূণাক্ষরেও কখনো মনে করা কঠিন।

পরদিন একজন লোক জরুরি খবর নিয়ে আসে— অনুসন্ধানী উপগ্রহের প্রেরিত অগ্রদূত। উপগ্রহটি আরো পঞ্চাশটি শ্বেতহস্তী সংগ্রহ করে কাল সকালেই এসে পৌচচ্ছেন এই খবর। কাকার আদেশে প্রাণ তুচ্ছ করে, বহু কষ্ট স্বীকার করে দুশো ক্রোশ দূর থেকে চারপেয়ে হাতিদের সঙ্গে দুপায়ে হেঁটে তিনি—ইত্যাদি ইত্যাদি!

কিন্তু কে তুলবে এই খবর কাকার কানে?

মানে, কাকার অপর কানে?

পাশের বাড়ী বেরিবেরি হওয়ার পর থেকেই মন খারাপ যাচ্ছিল। পাশের বাড়ীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক যে ছিল, তা নয়, সম্পর্ক হবার আশঙ্কাও ছিল না, কিন্তু বেরিবেরির সঙ্গে সম্পর্ক হতে কতক্ষণ? যে বেপরোয়া ব্যারাম কোনদেশ থেকে এসে এতদূর পর্যন্ত এগুতে পেরেছে, তার পক্ষে আর একটু কষ্ট স্বীকার করা এমন কি কঠিন!

ক'দিন থেকে শরীটাও খারাপ বোধ করতে লাগলাম। মনের মধ্যে স্বগতোক্তি শুরু হয়ে গেল—"ভাল করছ না হে, অশ্বিনী! সময় থাকতে ডাক্তার-টাক্তার দেখাও।"

মনের পরামর্শ মানতে হোলো। ডাক্তারের কাছেই গেলাম। বিখ্যাত গজেন ডাক্তারের কাছে। আমাদের পাড়ায় ডাক্তার এবং টাক্তার বলতে একমাত্র তাঁকেই বোঝায়।

তিনি নানারকমে পরীক্ষা করলেন, পাল্‌সের বীট্ গুণলেন, ব্লাড্‌প্রেসার নিলেন, স্টেথিস্‌কোপ বসালেন, অবশেষে নিছক আঙ্গুলের সাহায্যে বুকের নানাস্থান বাজাতে শুরু করে দিলেন। বাজনা শেষ হলে বললেন, "আর কিছু না, আপনার হার্ট ডায়ালেট করেছে।"

"বলেন কি গজেনবাবু?"—আমার পিলে পর্যন্ত চম্‌কে যায়।

তিনি দারুণ গম্ভীর হয়ে গেলেন -"কখনো বেরিবেরি হয়েছিল কি ?"

"হুঁ। হয়েছিল। পাশের বাড়ীতে।" ভয়ে ভয়ে বলতে হোলো। ডাক্তারের কাছে ব্যারাম লুকিয়ে লাভ নেই!

"ঠিকই ধরেছি। বেরিবেরির আফটার-এফেক্ট-ই এই।"

"তা হলে কি হবে ?" আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লাম: "তা হলে কি আমি আর বাঁচবো না ?"

"একটু শক্ত বটে। সঙ্গীন কেস। এরকম অবস্থায় যে-কোন মুহূর্তে হার্টফেল করা সম্ভব।"

"অ্যাঁ! বলেন, কি গজেনবাবু! না, আপনার কোনো কথা শুনব না! আমাকে বাঁচাতেই হবে আপনাকে।"—করুণকণ্ঠে বলি, "তা যে করেই পারেন আমি না বেঁচে থাকলে আমাকে দেখবে কে ? আমাকে দেখবার আর কেউ থাকবে না যে! কেউ আমার নেই।"

পাঁচটাকা ভিজিট দিয়ে ফেললাম। "আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখা যাক"—গজেন ডাক্তার বললেন, "একটা ভিজিটালিসের মিক্‌শ্চার দিচ্ছি আপনাকে। নিয়মিত খাবেন, সারলে ওতেই সারবে।"

আমি আর পাঁচটাকা ওঁর হাতে গুঁজে দিলাম—"তবে তাই কয়েক বোতল বানিয়ে দিন আমায়, আমি হরদম খাবো।"

"না, হরদম নয়। দিনে তিনবার। আর, কোথাও চেঞ্জে যান। চলে যান—পশ্চিম টশ্চিম। গেলে ভালো হয়। সেখানে গিয়ে আর কিছু নয়, একদম কম্‌প্লিট রেস্ট।"

প্রাণের জন্য মরীয়া হতে বেশী দেরী লাগে না মানুষের। বললাম, "আচ্ছা, তাই যাচ্ছি না হয়। ডাল্‌টন্‌গঞ্জে আমার বাড়ী, সেখানেই যাবো।"

"কম্‌প্লিট রেস্ট, বুঝেছেন তো ? হাঁটা-চলা, কি ঘোরাফেরা, কি দৌড়ঝাঁপ, কি কোনো পরিশ্রমের কাজ—একদম না! করেছেন কি মরেছেন—যাকে বলে হার্টফেল—দেখতে শুনতে দেবে না—সঙ্গে সঙ্গে খতম্! বুঝেছেন তো অশ্বিনীবাবু ?"

অশ্বিনীবাবু হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, ডাক্তার দেখাবার আগে বুঝেছেন এবং পরে বুঝেছেন—যেদিনই পাশের বাড়ীতে বেরিবেরির সূত্রপাত হয়েছে, সেদিনই তিনি জেনেছেন তাঁর জীবন সংশয়। তবু গজেনবাবুকে আশ্বস্ত করি, "নিশ্চয়! পরিশ্রম না করার জন্যই যা পরিশ্রম, তাই করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন থেকে অলস হবার জন্যই আমার নিরলস চেষ্টা থাকবে।" এই বলে আমি, ওরফে অশ্বিনীবাবু, বিদায় নিলাম।

মামারা থাকেন ডাল্‌টন্‌গঞ্জে। সেখানে তাঁদের ক্ষেত-খামার। মোটা মাইনের সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে জমিটমি কিনে চাষবাস নিয়ে পড়েছেন। বেকার-সমস্যা সমাধানের মতলব ছোটবেলা থেকেই মামাদের মনে ছিল, কিন্তু

চাকরির জন্য তা করতে পারছিলেন না। চাকরি করলে আর মানুষ বেকার থাকে কি ক'রে? সমস্যাই নেই তো সমাধান করবেন কিসের? অনেকদিন মনোকষ্টে থেকে অবশেষে তাঁরা চাকরিই ছাড়লেন।

তারপরেই এই চাষবাস। কলকাতার বাজারে তাঁদের তরকারি চালান আসে। সরকারী-গর্বে অনেককে গর্বিত দেখেছি, কিন্তু তরকারির গর্ব কেবল আমার মামাদের! একচেটে ব্যবসা, অনেকদিন থেকেই শোনা ছিল, দেখার বাসনাও ছিল; এবার এই রোগের অপূর্ব সুযোগে ডালটনগঞ্জে গেলাম, মামার বাড়ীও যাওয়া হোলো, চেঞ্জেও যাওয়া হোলো এবং চাই কি, তাঁদের তরকারির সাম্রাজ্য চোখেও দেখতে পারি, চেখেও দেখতে পারি হয়তো বা।

মামারা আমাকে দেখে খুশী হয়ে ওঠেন। "বেশ বেশ, এসেছো যখন, তখন থাকো কিছুদিন।" বড়মামা বলেন।

"থাকবই তো!" পায়ের ধুলো নিতে নিতে বলি—"চেঞ্জের জন্যই তো এলাম!"

মেজমামা বলেন, "এসেছ, ভালই করেছ, এতদিনে পটলের একটা ব্যবস্থা হোলো।"

ছোটমামা সায় দেন, "হ্যাঁ, একটা দুর্ভাবনাই ছিল, যাক, তা ভালোই হয়েছে।"

তিন মামাই যুগপৎ ঘাড় নাড়তে থাকেন।

বুঝলাম, মামাতো ভাইদের কারো গুরুভার আমার বহন করতে হবে। হয়তো তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে হতে পারে। তা বেশ তো, ছেলে-পড়ানো এমন কিছু শক্ত কাজ নয় যে, হার্টফেল হয়ে যাবে! গুরুতর পরিশ্রম কিছু না করলেই হোলো; টিউশানির যেগুলো শ্রমসাধ্য অংশ—পড়া নেওয়া, ভুল করলে শোধরাবার চেষ্টা করা, কিছুতেই ভুল না শোধরালে শেষে পাখাপেটা করা এবং মাস ফুরোলে প্রাণপণে বেতন বাগানো, এখন থেকেই এগুলো বাদ দিতে সতর্ক থাকলাম। হ্যাঁ, সাবধানই থাকবো, রীতিমতই, যাতে কান মোলবার কষ্টস্বীকারটুকুও না করতে হয়, বরঞ্চ প্রশ্রয়ই দেব পটলকে—যদি পড়াশুনায় ফাঁকি দিতে থাকে, কিংবা কাঠফাটা রোদ চেগে উঠলেই ওর যদি ডাণ্ডাগুলিখেলার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, ভেগে পড়তে চায়, আমার উৎসাহই থাকবে ওর তরফে। ভ্রাতৃপ্রীতি আমার যতই থাক্, প্রাণের চেয়ে পটল কিছু আমার আপনার নয়, তা মামাতো পটলই কি, আর মাসতুতো পটলই কি!

মামাতো ভাইদের সঙ্গে মোলাকাত হতে দেরী হোলো না। তিনটে ডানপিটে বাচ্চা—মাথা পিছু একটি করে—গুণে দেখলাম।—এর মধ্যে কোনটি পটল, বাজিয়ে দেখতে হয়। আলাপ শুরু করা গেল—"তোমার নাম কি খোকা?"

"রাম ঠনাঠন্।"

"আঁ! সে আবার কি?" পরিচয়ের সূত্রপাতেই পিলে চমকে যায় আমার দ্বিতীয় জনের অযাচিত জবাব আসে—"হামার নাম ভট্রিদাস হো!"

আমার তো দম আট্কাবার যোগাড়!—বাঙ্গালীর ছেলের এ সব আবার কি নাম! এমন বিদঘুটে—এরকম বদনাম কেন বাঙ্গালীর?

বড়মামা পরিষ্কার করে দেন—"যে দেশে থাকতে হবে, সেই দেশের দস্তুর মানতে হবে না? তা নইলে বড় হয়ে এরা এখানকার দশজনের সাথে মিলে মিশে খাবে কিসে, মানিয়ে চলবেই বা কি করে?"

মেজমামা বলেন—"এ সব বাবা, ডালটনী নাম। যে দেশের যা দস্তুর!"

ছোটমামা বলেন—"এখানকার সবাই বাঙালীকে বড় ভয় করে। আমরা ব্যবসা করতে এসেছি, যুদ্ধ করতে আসিনি তো! তাই এদের পক্ষে ভয়ংকর বাঙ্গালী নাম সব বাদ দিয়ে এদেশী সাদা সিদে নাম রাখা।"

তৃতীয়টিকে প্রশ্ন করতে আমার ভয় করে—"তুমিই তবে পটল?"

ছেলেটির দিক্ থেকে একটা ঝট্কা আসে—"অহঃ! হামার নাম গিধোড় বা!"

হার্টফেলের একটা বিষম ধাক্কা ভয়ানকভাবে কেটে যায়। পকেট থেকে বের করে চট করে এক দাগ ভিজিটালিস্ খেয়ে নিই—"পটল তবে কার নাম?"

তিনজনেই ঘাড় নাড়ে—"জান্হি না তো!"

"তুম্হারা নাম কেয়া জী?" জিগেস করে ওদের একজন!

"আমার নাম? আমার নাম?" আমতা আম্তা করে বলি, "আমার নাম শিব্রাম ঠনাঠন্!"

যস্মিন দেশে যদাচারঃ ; ডাল্টন্গঞ্জের ডালভাঙ্গা কায়দায় আমার নামটার একটা হিন্দি সংস্করণ বার করতে হয়।

ভট্রিদাস এগিয়ে এসে আমার হাতের শিশিটি হস্তগত করে—"সিরপ্ হ্যায় কেয়া?"

তিনটি বোতল ওদের তিনজনের হাতে দিই—মেজমামা একটি লেবেলের উপর দৃক্পাত করে বলেন, "সিরপ্ নেহি। ভিজ্টলিস্ হ্যায়। খাও মৎ—তাক্ক উপর রাখ দেও।"

ভট্রিদাস রাম ঠনাঠন্কে বুঝিয়ে দেয়—"সমঝা কুছ্? ইস্সে হি ভিজ্লন্ঠন্ বন্তি। এহি দবাই সে।"

বড়মামা বলেন, "শিবু, সেই কাল বিকেলে গাড়িতে উঠেছো, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়? কিছু খেয়ে টেয়ে নাও আগে।"

ব্যাপক ওঝার ডাক পড়ল। ছোটমামা আমার বিস্মিত দৃষ্টির জবাব দেন —"তোমার দাদামশায়ের সঙ্গে মামীরা সব তীর্থে গেছেন কিনা, তাই দিনকত-র জন্য এই মহারাজকে কাজ চালানোর মতন রাখা হয়েছে।"

তেইশটা চাপাটি আর কুছ্ তরকারি নিয়ে মহারাজের আবির্ভাব হয়। তিনটি চাপাটি বা চপেটাঘাত সহ্য করতেই প্রাণ যায় যায়, তারপর কিছুতেই আর টানতে পারি না। মামারা হাসতে থাকেন। অগত্যা লজ্জায় পড়ে আর আড়াইটা কোনো রকমে গলাধঃকরণ করি। টেনে টুনে পাঠাই গলার তলায়, ঠেলে ঠুলে।

মামা ভয়ানক হাসেন—"তোমার যে দেখি পাখির খোরাক হে!"

আমি বলি, "খেতে পারতাম। কিন্তু পরিশ্রম করা আমার ডাক্তারের নিষেধ কিনা।"

আঁচিয়ে এসে লক্ষ করি, আমার ভুক্তাবশেষ সেই সাড়ে সতেরটা চাপাটি ফ্রম রাম ঠনাঠন্ টু গিধোর চক্ষের পলকে নিঃশেষ করে এনেছে। এই দৃশ্য দেখাও কম শ্রমসাধ্য নয়, তৎক্ষণাৎ আর এক দাগ ভিজিটালিস্ খেতে হয়।

বড়মামা বলেন, "চলো একটু বেরিয়ে আসা যাক। নতুন দেশে এসেছ জায়গাটা দেখবে না?" বলে আমাকে টেনে নিয়ে চলতে থাকেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরুতে হয়। ডাক্তারের মতে বিশ্রাম দরকার—একেবারে কম্‌প্লিট রেসট্। কিন্তু মামার রেস্‌ট্ কাকে বলে, জানেন না, আলস্য ওঁদের দু-চক্ষের বিষ—নিজেরা অলস তো থাকবেনই না, অন্য-কাউকে থাকতেও দেবেন না।

সারা ডালটনগঞ্জটা ঘুরলাম, অনেক দ্রষ্টব্য জায়গা দেখা গেল, যা দেখবার কোনো প্রয়োজনই আমার ছিল না কোনদিন। পুরো সাড়ে তিন ঘন্টায় পাক্কা এগারো মাইল ঘোরা হোল। প্রতি-পদক্ষেপেই মনে হয়, এই বুঝি হার্টফেল করল। কিন্তু কোন রকমে আত্মসংবরণ করে ফেলি। কি করে যে করি, আমি নিজেই বুঝতে পারি না।

বাড়ি ফিরে এবার বিয়াল্লিশ্টা চাপাটির সম্মুখীন হতে হয়। পাখির খোরাক বলে আমাকেই সব থেকে কম দেওয়া হয়েছে। পরে খাব জানিয়ে এক ফাঁকে ওগুলো ছাদে ফেলে দিয়ে আসি, একটু পরে গিয়ে দেখি, তার চিহ্নমাত্রও নেই। পাখির খোরাক তাহলে সত্যিই!

খাবার পর শোবার আয়োজন করছি, বড়মামা বলেন, "আমাদের ক্ষেতখামার দেখবে চলো।"

ছোটমামা বলেন, "দিবানিদ্রা খারাপ। ভারী খারাপ! ওতে শরীর ভেঙে পড়ে।"

আমি বলি, "আজ আর না, কাল দেখব।"

"তবে চল, দেহাতে গিয়ে আখের রস খাওয়া যাক, আখের ক্ষেত দেখেছ খনও?"

আখের রসের লালসা ছিল, জিজ্ঞাসা করলুম, "খুব বেশি দূরে নয় তো?"

"আরে, দূর কীসের? কাছেই তো—দু-কদম মোটে।"

ক'দমে। কদম হয় জানি নে, পাক্কা চোদ্দ মাইল হাঁটা হোলো, চোখে কদম ফুল দেখছি। তবু শুনি—"এই কাছেই। এসে পড়লাম বলে।"

প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছি, মামার পাল্লায় পড়লে প্রাণ প্রায়ই থাকে না। রামায়ণ মহাভারতে তার প্রমাণ আছে।

আরো দু-মাইল পরে দেহাত। আখের রস খেয়ে দেহ কাত করলাম। আমার অবস্থা দেখে মামাদের করুণা হোলো বোধ হয়, দেহাতি রাস্তা ধরে একা যাচ্ছিল একটা, সেটাকে ভাড়া করে ফেললেন।

একায় কখনও চড়িনি; কিন্তু চাপবার পর মনে হোলো, এর চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ছিল ভালো। একার এমনি দাপট যে, প্রতি মুহূর্তেই আমি আকাশে উদ্ধৃত হতে লাগলাম। এ যাত্রায় এতক্ষণ টিকে থাকলেও এ-ধাক্কায় এবার গেলাম নির্ঘাত, সজ্ঞানে একা-প্রাপ্তির আর দেরি নেই—টের পেলাম বেশ।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল—একায় যতক্ষণ এসেছি, তার দুই-তৃতীয়াংশ সময় আকাশে-আকাশেই ছিলাম, একথা বলতে পারি; কিন্তু সেই আকাশের আঘাতেই সারা গায়ে দারুণ ব্যথা! হাড়পাঁজরা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে বোধ হতে লাগল। তেত্রিশটা চাপাটির মধ্যে সওয়া তিনখানা আত্মসাৎ করে শুয়ে পড়লাম। কোথায় রামলীলা হচ্ছিল, মামারা দেখতে গেলেন। আমায় সঙ্গে যেতে সাধলেন, বার বার অভয় দিলেন যে, এক কদমের বেশি হবে না, আমি কিন্তু ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলাম। ডালটনী ভাষায় এক কদম মানে যে একুশ মাইল, তা আমি ভাল রকমই বুঝেছি।

আলাদা বিছানা ছিল না, একটিমাত্র বড় বিছানা পাতা, তাতেই ছেলেদের সঙ্গে শুতে হোলো। খানিকক্ষণেই বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ, সৌরজগতেই বাস করছি বটে—আমার আশেপাশে তিনটি ছেলে যেন তিনটি গ্রহ! তাদের স্থান-পরিবর্তনের কামাই নেই। এই যেখানে একজনের মাথা দেখি, একটু পরেই দেখি, সেখানে তার পা; খানিক বাদে মাথা বা পা'র কোনটাই দেখতে পাই না। তার পরেই অকস্মাৎ তার কোনো একটার সঙ্গে আমার দারুণ সংঘর্ষ লাগে। চটকা ভেঙে যায়, আহত স্থানের শুশ্রূষা করতে থাকি; কিন্তু ওদের কারুর নিদ্রার বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় ঘটে না। ঘুমের ঘোরে যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ওরা—আমিও যদি ওদের সঙ্গে ঘুরতে পারতাম, তা হলে বোধ হয় তাল বজায় থাকত, ঠোকাঠুকি বাধার সম্ভাবনাও কমতো কিছুটা। কিন্তু মুশকিল এই ঘুরতে গেলে আমার ঘুমনো হয় না, আর ঘুমিয়ে পড়লে ঘোরার কথা একদম ভুলে যাই।

ছেলেগুলোর দেখছি পা দিয়েও বক্সিং করার বেশ অভ্যেস আছে এবং সব সময়ে 'নট্-টু-হিট্ বিলো-দি-বেল্ট'-এর নিয়ম মেনে চলে বলেও মনে হয় না। নাক এবং দাঁত খুব সতর্কভাবে রক্ষা করছি—ওদের ধাক্কায় কখন যে দেহচ্যুত হয়, কেবলি এই ভয়। ঘুমনোর দফা তো রফা!

ভাবছি, আর 'চৌকিদারি'তে কাজ নেই, মাটিতে নেমে সটান 'জমিদার' হয়ে পড়ি। প্রাণ হাতে নিয়ে এমন করে ঘুমনো যায় না। পোষায় না আমার। এদিকে দুটো তো বাজে। নিচে নেমে শোবার উদ্যোগে আছি, এমন সময়ে নেপথ্যে মামাদের শোরগোল শোনা গেল—রামলীলা দেখে আড়াইটা বাজিয়ে ফিরছেন এখন। অগত্যা মাটি থেকে পুনরায় প্রমোশন নিতে হোলো বিছানায়।

মামারা আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন, অর্থাৎ তাঁদের ধারণা যে, জাগালেন। তারপর ঝাড়া দু ঘণ্টা রামলীলার গল্প চলল। হনুমানের লম্পঝম্প তিন মামাকেই ভারী খুশি করেছে—সে সমস্তই আমাকে শুনতে হোলো। ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল, কেবল হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক মামা প্রশ্ন করে বসলেন—"হনুমানের বাবা কে জানো তো শিব্রাম ?"

ঘুমের ঝোঁকে ইতিহাসটা ঠিক মনে আসছিল না। হনুমান প্লুরাল হলে মামাদের নাম করে দিতাম, সিঙ্গুলার অবস্থায় কার নাম করি ? সঙ্কোচের সহিত বললাম "জাম্বুবান নয়তো ?"

বড়মামা বললেন, "পাগল !"

মেজমামা বললেন, "যা আমরা নিঃশ্বাস টানছি, তাই।"

"ওঃ ! এতক্ষণে বুঝেছি !"—হঠাৎ আমার বুদ্ধি খুলে যায়, বলে ফেলি চট করে, "ও ! যতো সব রোগের জীবাণু !"

বড়মামা আবার বলেন, "পাগলা !"

"উহুঁহুঁ !"—মেজমামাও আমায় দমিয়ে দেন, বলেন, "না ও সব নয়। জীবাণুটিবাণু না।"

"জীবাণুটিবাণুও না ? তা হলে কি তবে ? আমার তো ধারণা ছিল ওই সব প্রাণীরাই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে যাতায়াত করে।"—আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলি।

ছোটমামা বলেন, "পবনদেব।"

সাক্ষাৎ পবনদেবকে নিঃশ্বাসে টানছি এই কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়েছি, কিংবা হয়তো ঘুমইনি। বড়মামা আমাকে টেনে তুললেন—"ওঠো, ওঠো ; চারটে বেজে গেছে, ভোর হয়ে এল। মুখ হাত ধুয়ে নাও, চলো বেরিয়ে পড়ি। আমরা সকলেই প্রাতঃভ্রমণ করি রোজ। তুমিও বেড়াবে আমাদের সঙ্গে।"

মেজমামা বললেন, "বিশেষ করে চেঞ্জে এসেছো যখন ! হাওয়া বদলাতেই এসেছো তো ?"

ছোটমামাও সায় দেন—"ডালটনগঞ্জের হাওয়াই হোলো আসল ! হাওয়া খেতে এসে হাওয়াই যদি না খেলে, তবে আর খেলে কি ?"

চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে মামাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। সাড়ে

গাড়ি থামার পর বড়মামা দু'ধারে যতদূর যায়, বাহু বিস্তার করলেন —"এই সব—সবই আমাদের জমি।"

যতদূর চোখ যায়, জমি! কেবল জমিই চোখে পড়ে। মেজমামা বলেন, "এবার যা আলু ফলেছিল, তা যদি দেখতে! পটলও খুব হবে এবার।"

ছোটমামা ঘাড় নাড়েন—"আমরা সব নিজেরাই করি তো! জন-মজুরের সাহায্য নিই না। স্বাবলম্বনের মত আর কী আছে? গতবারে আমরা তিন ভায়ে তুলে কুলিয়ে উঠতে পারলাম না, প্রায় আড়াই লক্ষ পটল এঁচোড়েই পেকে গেল। বিলকুল বরবাদ। পাকা পটল তো চালান যায় না, কে কিনবে?"

বড়মামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন—"তবুও তো প্রত্যেকে দশলাখ করে তুলেছিলাম।"

মেজমামা আশ্বাস দেন—"যাক, এবার আর নষ্ট যাবার ভয় নেই, ভাগনেটা এসে পড়েছে, বাড়তির ভাগটা ওই তুলতে পারবে।"

ছোটমামা বলেন, "কিন্তু এবার পটল ফলেছেও দেড়া।

"তা ও পারবে। জোয়ান ছেলে—উঠে-পড়ে লাগলে ও আমাদের ডবল তুলতে পারে। পারবে না?" বড়মামা আমার পিঠ চাপড়ান।

পৃষ্ঠপোষকতার ধাক্কা সামলে ক্ষীণস্বরে বলি, "পটলের সিজন্‌টা কবে?"

"আর কি, দিন সাতেক পরেই পটল তোলার পালা শুরু হবে" ছোটমামার কাছে ভরসা পাই।

চোদ্দ মাইল হেঁটে টলতে টলতে বাড়ি ফিরি। ফিরেই ডিজিটালিসের অন্বেষণে গিয়ে দেখি, তিন বোতলই ফাঁক। গিধোড়কে জিজ্ঞাসা করি—"ক্যা হুয়া।"

গিধোড় জবাব দেয়—"উ দোনো খা ডালা।"

ভটরি দাস প্রতিবাদ করে—"নেহি জি, উ ভি খায়া! আপ্‌কো ডিজ্‌টালিস উভি খাইস্‌।"

কেবল খাইস্‌ নয়, আমাকেও খেয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি, এই দারুণ পরিশ্রমের পর এখন কি করে হার্টফেলের হাত থেকে বাঁচি? আত্মরক্ষা করি আপনার?

গজেন ডাক্তারকে চিঠি লিখতে বসলাম—কাল এসে অবধি আদ্যোপান্ত সব ইতিহাস সবিশেষ দিয়ে অবশেষে জানাই—

"ডিজিটালিস নেই, ভালই হয়েছে, আমার আর বাঁচবার সাধও নেই। বাঁচতে গেলে আমায় পটল তুলতে হবে। এক-আধটা নয়, সাড়ে তিনলাখ পটল—তার বেশিও হতে পারে। তুলতে হবে আমাকে। পত্রপাঠ এমন একটা ওষুধ চট করে পাঠাবেন, যাতে এই পটল-তোলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হার্টফেল করে। এ পর্যন্ত যা দারুণ খাটুনি

গেছে, তাতেও যখন এই ডায়ালেটেড হার্ট আমার ফেল করেনি, তখন ওর ভরসা আমি ছেড়েই দিয়েছি। ওর ওপর নির্ভর করে বসে থাকা যায় না। সাড়ে তিনলাখ পটল তোলা আমার সাধ্য নয়, তার চেয়ে আমি একবার একটিমাত্র পটল তুলতে চাই—পটলের সিজন্ আসার ঢের আগেই। যখন মরবারও আশা নেই, বাঁচবারও ভরসা নাস্তি—তখন এ জীবন রেখে লাভ? ইতি মরণাপন্ন (কিংবা জীবনাপন্ন) বিনীত—ইত্যাদি।"

এক সপ্তাহ গেল, দু'সপ্তাহ কেটে গেল, তবু ডাক্তারের কোনো জবাব নেই, ওষুধ পাঠাবার নাম নেই। কাল সকাল থেকে পটল-পর্ব শুরু হবে ভেবে এখন থেকেই আমার হৃৎকম্প আরম্ভ হয়েছে। এঁচে রেখেছি মামারা রাত্রে রামলীলা দেখতে গেলেই সেই সুযোগে কলকাতার গাড়িতে সটকান দেব।

কলকাতায় ফিরেই গজেন ডাক্তারের কাছে ছুটি। গিয়ে দেখি কম্পাউণ্ডার দু'জন গালে হাত দিয়ে বসে আছে, রোগীপত্তর কিচ্ছু নেই! জিজ্ঞাসা করলাম—"গজেনবাবু আসেননি আজ? কোথায় তিনি?"

দু'-তিনবার প্রশ্নের পর অঙ্গুলিনির্দেশে জবাব পাই।

"ও! এই বাড়ির তেতলায় গেছেন! রোগী দেখতে বুঝি?"

উত্তর আসে—"না, রোগী দেখতে নয়, আরো উপরে।"

"আরো উপরে? আরো উপরে কি রকম? বাড়ির ছাদে নাকি?"—আমি অবাক হয়ে যাই। "ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন বুঝি?"

"আজ্ঞে না, তারও উপরে।"

"ছাদেরও উপরে? তবে কি এরোপ্লেনের সাহায্যে তিনি আকাশেই উড়ছেন এখন?" ডাক্তার মানুষের এ আবার কি ব্যারাম! বিস্ময়ের আতিশয্যে প্রায় ব্যাকুল হয়ে উঠি; এমন সময়ে ছোট কম্পাউণ্ডারটি গুরু-গম্ভীরভাবে, অথচ সংক্ষেপে জানান—"তিনি মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন! সে কি রকম!!!"—দশদিনের মধ্যে তৃতীয়বার আমার পিলে চমকায়। হার্টফেল ফেল হয়।

বুড়ো কম্পাউণ্ডারটি বলেন—"কি আর বলবো মশায়! এক চিঠি—এক সর্বনেশে চিঠি—ডালটনগঞ্জ থেকে—অশ্বিনীর না ভরণীর—কার এলো যেন—তাই পড়তে পড়তে ডাক্তারবাবুর চোখ উল্টে গেল। বার তিনেক শুধু বললেন, 'কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ!!"...তার পরে আর কিছুই বললেন না। তাঁর হার্টফেল হোলো।"

নিজের পাড়ায় যতটা অপরিচিত থাকা যায়! এইজন্যেই গজেন ডাক্তারের কাছে আমি অশ্বিনীরূপ ধারণ করেছিলাম। আজ সেই ছদ্মনামের মুখোস আর খুললাম না, নিজের কোনো পরিচয় না দিয়েই বাড়ি ফিরলাম। একবার ভাবলাম, বলি যে, সেই সঙ্কট মুহূর্তে ডাক্তারবাবুকে এক ডোজ ডিজিটালিস দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখন আর বলে কি লাভ!

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি

আর কিছু না, একটু মোটা হতে শুরু করেছিলাম, অমনি মামা আমার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন—'সর্বনাশ! তোর খুড়তুতো দাদামশায়ই—কী সর্বনাশ!'

কথাটা শেষ করবার দরকার হয় না। আমার মাতুলের খুড়ো আর জ্যেঠা স্থূল কায়তায় সর্বনাশের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। নামের উল্লেখেই আমি বুঝতে পেরে যাই।

খুড়তুতো দাদামশায়ের বুকে এত চর্বি জমে ছিল যে হঠাৎ হার্টফেল হয়েই তাঁকে মারা যেতে হল, ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন হয়নি। জ্যেঠতুতো দাদামশাইয়ের বেলা ডাক্তার এসেছিলেন কিন্তু ইনজেকশন করতে গিয়ে মাংসের স্তর ভেদ করে শিরা খুঁজে না পেয়ে, গোটা তিনেক ছুঁচ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গচ্ছিত রেখে, রাগে-ক্ষোভে-হতাশায় ভিজিট না নিয়েই রেগে প্রস্থান করেছিলেন। রেগে এবং বেগে।

যে বংশের দাদামশায়দের এরূপ মর্মভেদী ইতিহাস, সে বংশের নাতিদের মোটা হওয়ার মতো ভয়াবহ আর কী হতে পারে? কাজেই আমার নাতিবৃহৎ হওয়ার লক্ষণ দেখে বড়মামা বিচলিত হয়ে পড়েন।

প্রতিবাদের সুরে বলি 'কি করব! আমি কি ইচ্ছে করে হচ্ছি?'

'উঁহু, আর কোনো অসুখে ভয় খাই না। কিন্তু মোটা হওয়া—বাপস!

অমন মারাত্মক ব্যাধি আর নেই। সব ব্যায়রামে পার আছে, চিকিচ্ছে চলে ; কিন্তু ও রোগের চিকিচ্ছেই নেই। ডাক্তার কবরেজ হার মেনে যায়। হুঁ!'

অগত্যা আমাকে চেঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, রোগা হবার জন্য। লোকে মোটা হবার জন্যেই চেঞ্জে যায়, আমার বেলায় উল্টো উৎপত্তি। গোহাটিতে বড় মামার জানা একজন ভালো ডাক্তার থাকেন ; তাঁর কাছেই যেতে হয়। তিনিই আমায় রোগা-রোগ্য—রোগা করে আরোগ্য করার ভার নেন—।

প্রথমেই তাঁর প্রশ্ন হয়—'ব্যায়াম-ট্যায়াম কর ?

'আজ্ঞে দু বেলা হাঁটি। দু মাইল, দেড় মাইল, এমনকি আধ মাইল পর্যন্ত —যেদিন যতটা পারি। রাস্তায় বেরুলেই হাঁটতে হয় !'

'হ্যাঁঃ! হাঁটা আবার একটা ব্যায়াম নাকি! ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আছে ?'

'না তো !' সসংকোচে কই।

'ঘোড়ায় চড়াই হল গিয়ে ব্যায়াম। পুরুষ মানুষের ব্যায়াম। ব্যায়ামের মত ব্যায়াম। একটা ঘোড়া কিনে ফেলে চড়তে শেখো—দুদিনে শুকিয়ে তোমার হাড়গোড় বেরিয়ে পড়বে।'

ডাক্তারের কথা শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়। গোরু থেকে ঘোড়ার পার্থক্য সহজেই আমি বুঝতে পারতাম, যদিও রচনা লিখতে বসে আমার 'এসে'তে ঘোড়া-গরু এক হয়ে এসে মিলে যেত, সেই একতার থেকে ওদের আলাদা করা ইস্কুলের পণ্ডিতের পক্ষে কষ্টকর ছিল। চতুষ্পদের দিক থেকে উভয়ে প্রায় এক জাতীয় হলেও বিপদের দিক থেকে বিবেচনা করলে ঘোড়ার স্থানই কিছু উঁচু হবে বলতে হয়।

যাই হোক, ডাক্তার ভদ্রলোক গোহাটির লোক হলেও গৌ গাবৌ গাবঃ না করে, গোড়াতেই গোরুকে বাতিল করে ঘোড়াকেই তিনি প্রথম আসন দিতে চাইলেন—অবশ্য আমার নিচেই। আমিও, ঘোড়ার উপরেই চড়ব, এই স্থির সংকল্প করে ফেললাম। বাস্তবিক, ঘোড়ায় চড়া সে কী দৃশ্য! সার্কাসে তো দেখেইছি, রাস্তাতেও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যায় বই কি!

আম্বালায় থাকতে ছোটবেলায় দেখেছি পাঞ্জাবীদের ঘোড়ায় চড়া। এখনও মনে পড়ে, সেই পাগড়ী উড়ছে, পারপেণ্ডিকুলার থেকে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে সওয়ারের কেমন সহজ আর 'খাতির নাদারৎ' ভাব আর তার দাড়িও উড়ছে সেই সঙ্গে! যেন দুনিয়ার কোনো কিছুর কেয়ারমাত্র নেই! তাবৎ পথচারীকে শশব্যস্ত করে শহরের বুকের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাওয়া। পরমুহূর্তে তুমি দেখবে কেবল ধুলোর ঝড়, তাছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না।

হ্যাঁ, ঘোড়ায় আমায় চড়তে হবেই! ঠিক তেমনি করেই। তা না হলে বেঁচে থেকে লাভ নেই, মোটা হয়ে তো নেই-ই।

আশ্চর্য যোগাযোগ। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের পর বিকেলের দিকে

বেড়াতে বেরিয়েছি, দেখি সদর রাস্তায় নীলাম ডেকে ঘোড়া বিক্রি হচ্ছে। বেশ নাদুস নুদুস কালোকোলো একটি ঘোড়া—পছন্দ করে সহচর করবার মতই।

'বাইশ টাকা! বাইশ টাকায় যাচ্ছে—এক, দুই—'

'তেইশ' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি হাঁকলাম।

'চব্বিশ টাকা।' ভিড়ের ভেতর থেকে একজন যেন আমার কথারই জবাব দিল।

'চব্বিশ টাকা।' নীলামওয়ালা ডাকতে থাকে, 'ঘোড়া, জিন, লাগাম মায় চাবুক—সব সমেত মাত্র চব্বিশে যায়। গেল গেল—এক দুই—'

বলে ফেলি একবারে 'সাতাশ'।

'আটাশ!' ভিড়ের ভেতর থেকে আবার কোন হতভাগার বাগড়া।

আমার পাশে একজন লোক আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়—'আমি ঘোড়া চিনি', সে বলে, 'অদ্ভুত ঘোড়া মশাই! এত সস্তায় যাচ্ছে, আশ্চর্য! ওর জিনের দামই তো আটাশ টাকা!'

'বলেন কি!' আমার চোখ বড় হয়ে ওঠে, 'তা হলে আরো উঠতে পারি—কী বলেন?'

'নিশ্চয়! ভাবছেন বুঝি দিশী ঘোড়া? মোটেই তা নয়, আসল ভুটানী টাট্টু—যাকে বলে!'

ভুটানী বলতে কি বোঝায় তার কোন পরিচয়ই আমার জানা ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গিতে এটা বেশ বুঝতে পারলাম যে এ হেন একটা জানোয়ারের মালিক না হতে পারলে ভুভারতে জীবনধারণই বৃথা!

অকুতোভয়ে ডাক ছাড়ি—'তেত্রিশ।'

'চৌৎ—' আমার পাশের এক ব্যক্তি ডাকার উদ্যম করে। উৎসাহের সূত্রপাতেই ওকে আমি দমিয়ে দিই—'সাঁইত্রিশ!' তারপর আমি হন্যে হয়ে উঠি—পর পর ডেকে যাই—'উনচল্লিশ, তেতাল্লিশ, সাতচল্লিশ, উনপঞ্চাশ।'

পর পর এতগুলো ডাক আমি একাই ডেকে যাই! উনপঞ্চাশে গিয়ে ক্ষান্ত হই।

'উনপঞ্চাশ—উনপঞ্চাশ! এমন খাসা ঘোড়া মাত্র উনপঞ্চাশে যায়! গেল-গেল—চলে গেল! এক-দুই'—

তারপর আর কেউ ডাকে না! আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিরস্ত হয়ে পড়েছে তখন। 'এক, দুই, তিন!'

নগদ উনপঞ্চাশ টাকা গুনে ঘোড়া দখল করে পুলকিত চিত্তে বাড়ি ফিরি। সেই পার্শ্ববর্তী অশ্ব-সমঝদার ভদ্রলোক আমার এক উপকার করেন। একটা ভাড়াটে আস্তাবলে ঘোড়া রাখবার ব্যবস্থা করে দেন। তারাই ঘোড়ার খোরপোশের, সেবা-শুশ্রূষার যাবতীয় ভার নেবে। সময়ে-অসময়ে এক চড়া ছাড়া কোনো হাঙ্গামাই আমাকে পোহাতে হবে না! অবশ্য এই অশ্ব সেবার জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হবে ওদের।

ভদ্রলোককে সন্দেশের দোকানে নেমন্তন্ন করে ফেলি তক্ষুনি।

পরের দিন প্রাতঃকালে আমার অশ্বারোহনের পালা। ভাড়াটে সহিসরা ঘোড়াটাকে নিয়ে আসে। জনকতক ধরেছে ওর মুখের দিকে, আর জনকতক ওর লেজের দিকটায়। মুখের দিকের যারা, তারা লাগাম, ঘোড়ার কান, ঘাড়ের চুল অনেক কিছুর সুযোগ পেয়েছে কিন্তু লেজের দিকে লেজটাই কেবল সম্বল। ও ছাড়া আর ধর্তব্য কিছু ছিল না। আমি বিস্মিতই হই কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করি না, পাছে আমায় আনাড়ি ভাবে। ঘোড়া আনার এই নিয়ম হবে হয়তো, কে জানে!

সেই ডাক্তার ভদ্রলোক বাড়ির সামনে দিয়ে সেই সময় যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে থামেন। 'এই যে! একটা ঘোড়া বাগিয়েছ দেখছি! বেশ বেশ! কিনলে বুঝি? কতয়? ঊনপঞ্চাশে? বেশ সস্তাই তো! খাসা—বাঃ!'

ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে নিজের প্রেসক্রিপশনকেই বড় করেন—'হ্যাঁ, হাঁটা ছাড়ো। হাঁ-টা ছাড়ো। হাঁটা ব্যায়াম নাকি আবার! মানুষে হাঁটে? ঘোড়ায় চড়তে শেখো। অমন ব্যায়াম আর হয় না। দুদিনে চেহারা ফিরে যাবে। এত কাহিল হয়ে পড়বে যে তোমার মামারাই তোমাকে চিনতে পারবেন না। হুম্।'

তাঁর 'রুগী' দেখার তাগাদা, অপেক্ষা করার অবসর নেই! ঘাড় নেড়ে আমাকে উৎসাহ দিয়েই তিনি চলে যান! দর্শকদের মধ্যে তাঁকে গণনা না করেই আমার অভিনব ব্যায়ামপর্ব শুরু হয়।

সহিসরা বেশ কষে তাকে ধরে থাকে, আমি আস্তে আস্তে তার পিঠের উপর উঠে বসি; বেশ যুত্ করেই বসি; শ্রীযুত হয়ে।

কিন্তু যেমনি না তাদের ছেড়ে দেওয়া, ঘোড়াটা চারটে পা একসঙ্গে জড়ো করে, পিঠটা দুমড়ে ব্যাখারির মতন বেঁকিয়ে আনে। এবং করে কি, হঠাৎ পিঠটা একটু নামিয়েই না, ওপরের দিকে এক দারুণ ঝাড়া দেয়—ধনুকে টঙ্কার দেওয়ার মতই! আর তার সেই এক ঝাড়াতেই আমি একেবারে স্বর্গে—ঘোড়ার পিঠ ছাড়িয়ে প্রায় চার পাঁচ হাত উঁচুতে আকাশের বায়ুস্তরে বিরাজমান!

শূন্যমার্গে চলাচল আমার ন্যায় স্থূল জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই বাধ্য হয়েই আমাকে নামতে হয়, ঐ ঘোড়ার পিঠেই আবার। সেই মুহূর্তেই আবার যথাস্থানে আমি প্রেরিত হই, কিন্তু পুনরায় আমার অধঃপতন! এবার জিনের মাথায়। আবার আকস্মিক উন্নতি। এবার নেমে আসি ঘোড়ার ঘাড়ের উপর। আবার আমাকে উপরে ছুঁড়ে দেয়; এবার যেখানে নামি সেখানে ঘোড়ার চিহ্নমাত্র নেই। অশ্ববর আমার আড়াই হাত পেছনে দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখন, আমাকে লুফে নেবার জন্যই কিনা কে জানে!

ঘোড়ার মতলব মনে মনে টের পেতেই, তার ধরবার আগেই আমি শূন্যে

পড়ি। জানোয়ারটা ততক্ষণে আমাকে ফেলে, উন্মুক্ত গৌহাটির পথ ধরে টেলিগ্রামের মতো দ্রুত ছুটে চলেছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসি আমি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি, ঘোড়ায় চড়ার বিলাসিতা পোষাল না আমার। একটা হাত কপালে রাখি, আর একটা তলপেটে! মানুষের হাতের সংখ্যা যে প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় এ কথা এর আগে এমন করে আমার ধারণাই হয়নি কখনও। কারণ তখনও আরো কয়েকটা হাতের বিলক্ষণ অভাব বোধ করি। ঘাড়ে পিঠে, কোমরে, পাঁজরায় এবং শরীরের আরো নানা স্থানে হাত বুলোবার দরকার ছিল আমার।

কেবল যে বেহাতই হয়েছি তাই নয়, বিপদ আরো ;—উঠতে গিয়েই সেটা টের পাই। দাঁড়াবার এবং দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে দু'টো পা-ও মোটেই যথেষ্ট নয়, বুঝি তখন। সহিসরা ধরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেয়, কিন্তু যেমনি না ছাড়ে অমনি আমি সটান্! তখন সবাই মিলে, সহানুভূতিপরবশ হয়ে ধরাধরি করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারেও আমার নিজের হাত পা নিজের কোন-ই কাজে লাগে না, এক ওদের হ্যাণ্ডেল হওয়া ছাড়া… নিজের চ্যাংদোলায় নিজে চেপে আসি।

তারপর প্রায় এক মাস শয্যাশায়ী। সবাই বলে ডাক্তার দেখাতে কিন্তু ডাক্তার ডাকার সাহস হয় না আমার। মামার বন্ধু—তিনিই তো? এই অবস্থাতেই আবার ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা দিয়ে বসবে কিনা কে জানে! অশ্ব-চিকিৎসা ছাড়া আর কিছু তো জানা নেইকো তাঁর। সেই পলাতক ভুটানী টাট্টুকে যদি খুঁজে না-ও আর পাওয়া যায়, একটা নেপালী গাঁট্টার যোগাড় করে আনতে কতক্ষণ? ডাক্তার? নাঃ! মাতৃপুরুষানুক্রমে ও আমাদের ধাতে সয় না।

বিছানা ছেড়ে যেদিন প্রথম বেরুতে পারলাম সেদিন হোটেলের বড় আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চমকে গেলাম। অ্যাঁ! এতটা কাহিল হয়ে পড়েছি নাকি? নিজেকে দেখে চেনাই যায় না যে! মুখের দিকে তাকাতেই ইচ্ছা করে না—বিকৃতবদনে বাইরে বেরিয়ে আসি।

রাস্তায় পা দিতেই আস্তাবলের বড় সহিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'হুজুর, আপনার কাছে আমাদের কিছু পাওনা আছে।'

'পাওনা?' আবার আমাকে চমকাতে হয়—'কিসের পাওনা?'

'আজ্ঞে, সেই ঘোড়ার দরুন।'

'কেন, তার দাম তো চুকিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, চাবুকের দরুন ক-আনা পাবে বটে তোমরা। তা চাবুক তো আমার কাজেই লাগেনি, ব্যবহারই করতে হয়নি আমায়! ও ক-আনাও কি দিতেই হবে নেহাৎ?'

'আজ্ঞে কেবল ক-আনা নয় তো হুজুর! বাহাত্তর টাকা সাড়ে বারো আনা মোট পাওনা যে! এই দেখুন বিল!

'বাহাত্তর টাকা সাড়ে বারো আনা ?' আমার চোখ কপালে ওঠে। 'কেন, আমার অপরাধ ?'

'আজ্ঞে আপনার ঘোড়ায় খেয়েছে এই এক মাসে সাড়ে বাইশ টাকার ছোলা সোয়া পাঁচ টাকার ঘাস—'

আমি বাধা দিয়ে বলি—'কেন, সে তো পালিয়ে গেছে গো !'

'আপনার ঘোড়া ? মোটেই না। খাবার সময়েই ফিরে এসেছিল আর তার পর থেকে আস্তাবলে ঠিক রয়েছে।' সে-ই ছোট সহিসকে হুকুম দেয়—'নিয়ে আয়তো ভুটানী টাট্টু হুজুরের সামনে।'

বলতে বলতে সহিসটা ঘোড়াকে এনে হাজির করে। ঘোড়াটা যে ভাল খেয়েছে দেয়েছে তার আর ভুল নেই, বেশ একটু মোটাসোটাই হয়েছে বলে আমার বোধ হল।

'আমরা তো তবু ওকে কম খেতে দিয়েছি, দিতে পারলে ওর ডবল, আট ডবল খেতে পারত। কিন্তু সাহস করে খাওয়াতে পারিনি, হুজুর বেঁচে উঠবেন কিনা ঠিক ছিল না তো। এর আগের --' সহিসটা হঠাৎ থেমে যায়, আর কিছু বলতে চায় না।

পরবর্তী বাক্যটি প্রকাশ করার জন্য আমি পীড়াপীড়ি লাগাই। ছোট সহিসটা বলে ফেলে—'ওতে চেপে এর আগে আর কেউ বাঁচেনি হুজুর।'

বড় সহিসটা বলে—'এই তো ঘাস আর ছোলাতেই গেল সওয়া পাঁচ আর সাড়ে বাইশ। একুনে সাতাশ টাকা বারো আনা। ভুট্টা খেয়েছে মোট দশ টাকার। ভুটানী টাট্টু কিনা, ভুট্টা ছাড়া ওদের চলে না। এই গেল সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা দেখুন না বিল।'

'এর ওপর আবার বজ্‌রা - ' ছোট সহিসটি বলতে যায়।

'থাম তুই।' বলে বড় সহিসটি তাকে বাধা দেওয়ায় আমাকে আর বজ্রাঘাতটা সইতে হয় না।

'বিল এনেছ, আমার খাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাও।' মনে মনে বলি ! 'খাল বিল এক হয়ে যাক আমার।'

এবার ছোট সহিসটা শুরু করে—'তারপর ঘোড়ার বাড়ি ভাড়া বাবদে গেল দশ টাকা—'

'ঘোড়ার জন্যে আবার একটা বাড়ি ?' আমি অবাক হয়ে যাই।

'আজ্ঞে একটা গোটা বাড়ি নিয়ে একটা ঘোড়া করবেই বা কি ? ওদের তো খাবার ঘর কি শোবার ঘর, বৈঠকখানা কি পায়খানা আলাদা আলাদা লাগে না। এক জায়গাতেই ওদের সব কাজ—কিন্তু হুজুর, ঐ জায়গাটার ভাড়াই হচ্ছে মাসে দশ টাকা।'

আমার কথা বেরোয় না। সহিসটা সুর মোলায়েম করে বলে, 'তারপর

হুজুরের ঘোড়ার খিদ্‌মৎ খেটেছি, আমাদের মজুরি আছে। আমরাই দশ পনের টাকা কি না আশা করি হুজুরের কাছে ?'

হুজুরের অবস্থা তখন মজুরের চেয়েও কাহিল। তবু মনে মনে হিসাব করে অঙ্ক খাড়া করি—'তা হলেও সব মিলিয়ে বাষট্টি টাকা বারো আনা হয়। আর দশ টাকা দু'পয়সা কিসের জন্যে ?'

ছোট সহিসটা চটপট বলে—'আজ্ঞে ও দু'পয়সা আমাকে দিবেন। খৈনির জন্যে।'

'ঘোড়ায় খৈনি খায় ? আশ্চর্য তো !'

'আজ্ঞে ঘোড়ায় খায়নি। আমিই খাবার জন্য ডলছিলাম, ওটার মুখের কাছেই। কিন্তু যেমনি না ফট্‌ফটিয়েছি অম্‌নি হারামীটা হেঁচে দিয়েছে—বিলকুল খৈনিটাই বরবাদ।'

তখনই পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে ওকে দিয়ে দিই। যতটা পাতলা হওয়া যায়। দেনা আর শত্রু কখনও বাড়াতে নেই।

বড় সহিস বলে—'আর বাকি দশ টাকার হিসাব চান ? জানোয়ার এমন পাজী আর বলব কি হুজুর ! একদিন বাড়ির মালিকের পকেটের মধ্যে নাক ডুবিয়ে একখানা দশ টাকার নোট বেমালুম মেরে দিয়েছে। একদম হজম।'

'অ্যাঁ, বল কি ?' আমি বিচলিত হই—'একেবারে খেয়ে ফেলল নোটখানা ? কড়্‌কড়ে দশ দশটা টাকা ?'

'এক্কেবারে। আমরা আশা করলাম পরে বেরুবে, কিন্তু না, পরে অনেক আস্ত ছোলা পেলাম, সেগুলো ঘুগনিওয়ালাদের দিয়েছি, কিন্তু নোট বিলকুল গায়েব। এ টাকাটাও ঘোড়ার খোরাকীর মধ্যে ধরে নেবেন হুজুর।'

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। দশ-দশটা টাকা ঘোড়ার নস্যি হয়ে গেল ভাবতেই আমার মাথা ঘুরতে থাকে।

সহিসটা আশ্বাস দেয়—'চাবুকের দামটা তো ধরা হয়নি হুজুর, যদি মর্জি করেন তা হ'লে ওটার কয় আনা জুড়ে পুরো তেয়াত্তর টাকাই দিয়ে দিবেন। আর আমাদের দু'জনকে ওই দুটো টাকা', বিনয়ের বাড়াবাড়িতে জড়ীভূত হয়ে বলে সে—'আপনাদের মতো আমীর লোকের কাছেই তো আমাদের বক্‌সিসের আশা-প্রত্যাশা হুজুর !'

প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে সহিস বিদায় করি। মামার দেওয়া যা উপসংহার থাকে তার থেকে হোটেলের দেনা চুকিয়ে, হয়তো মালগাড়িতে বামাল হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। যাই হোক, ঘোড়াকে আর আস্তাবলে ফিরিয়ে নিতে দিই না। সামনেই একটা খুঁটোয় বেঁধে রাখতে বলি, রাস্তাই আমার ঘোড়ার আস্তানা এখন থেকে। সেই উপকারী ভদ্রলোককে ডেকে দিতে বলি সহিসদের, যিনি কেবল ঘোড়া চিনিয়েই নিরস্ত হননি, আস্তাবলও দেখিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোককেই ঘোড়াটা উপহার দিয়ে তাঁর উপকারের ঋণ পরিশোধ করব।

অভিলাষ প্রকাশ করতেই বড় সহিসসা বলে—'ওঁকে কি দেবেন হুজুর! ওঁর ভগ্নিপতিরই তো ঘোড়া।'

আমার দম ফেলতে দেরি হয়। সেই নীলামওয়ালা ওর ভগ্নীপতি? সে ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই ছোটটা যোগ দেয়—'আর ওনারই তো আস্তাবল হুজুর!'

আমি আর কিছু বলি না, কেবল এই সংকল্প স্থির করি, যদি আমি গৌহাটিতে থাকতে থাকতেই সেই উপকারী ভদ্রলোকটি মারা যান, তাহলে আমার যাবতীয় কাজকর্ম—গল্পের বই পড়া, বায়স্কোপ দেখা, চপকাটলেট খাওয়া এবং আর যা কিছু সব স্থগিত রেখে ওঁর শবযাত্রায় যোগ দেব। সব আমোদ-প্রমোদ ফেলে প্রথমে ঐ কাজ। সেদিনকার অ্যামিউজমেণ্ট ঐ।

সহিসরা চলে যায়। আমি ঘোড়ার দিকে তাকাই আর মাথা ঘামাই—কি গতি করব ওর? কিংবা ও-ই আমার কি গতি করে? এমন সময়ে ডাক্তারের আবির্ভাব হয় সেই পথে। আমাকে দেখে এক গাল হাসি নিয়ে তিনি এগিয়ে আসেন—'এই যে! বেশ জীর্ণশীর্ণ হয়ে এসেছ দেখছি! একমাসেই দেখলে তো? তখনই বলেছিলাম! ঘোড়ায় চড়ার মতন ব্যায়াম আর হয় না। পায়ে হেঁটে কি এত হালকা হতে পারতে? আরও মুটিয়ে যেতে বরং! যাক্, খুশি হলাম তোমার চেহারা দেখে! বাড়ি ফিরে মামাকে বোলো, মোটা রকম ভিজিট পাঠিয়ে দিতে আমায়।'

'মামা কেন, আমিই দিয়ে যাচ্ছি!' সবিনয়ে আমি বলি, 'এই ঘোড়াটাই আপনার ভিজিট।'

'খুশি হলাম, আরো খুশি হলাম।' ডাক্তারবাবু সত্যিই পুলকিত হয়ে ওঠেন, 'তা হোলে এবার থেকে আমার রুগী দেখার সুবিধেই হ'ল।'

ডাক্তারবাবু লাফিয়ে চাপেন ঘোড়ার পিঠে, ওঠার কায়দা দেখেই বুঝতে পারি এককালে ওই বদঅভ্যাস দস্তুরমতই ছিল ওঁর। পর মুহূর্তেই তাঁকে আর দেখতে পাইনা। বিকালে হোটেলের সামনে আস্তে আস্তে পায়চারি করছি, তখন দেখি, মুহ্যমানের মতো তিনি ফিরছেন, হেঁটেই আসছেন সটান।

'আপনার ঘোড়া কি হল?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি। আমার দিকে বিরক্তি-পূর্ণ দৃক্‌পাত করেন তিনি।—'এই হেঁটেই ফিরলাম। কতটুকুই বা পথ! চার মাইল তো মোটে। ঘোড়ায় চড়া ভালো ব্যায়াম বটে, কিন্তু বেশি ব্যায়াম কি ভালো? অতিরিক্ত ব্যায়ামে অপকারই করে, মাঝে মাঝে হাঁটতেও হয় ভাই!' বলে তিনি আর দাঁড়ান না।

খানিক বাদে ডাক্তারবাবুর চাকর এসে বলে—'গিন্নীমা আপনার ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন।'

'কিন্তু ঘোড়া কই? ঘোড়াকে তোমার সঙ্গে দেখছি না তো!'

ঘোড়া যে কোথায় তা চাকর জানে না, ডাক্তারবাবুও জানেন না, তবে তাঁর

কাছ থেকে যা জানা গেছে তাই জেনেই/ কর্তার অজ্ঞাতসারেই গিন্নী এই মোটা ভিজিট প্রত্যাপর্ণ করতে দ্বিধা করছেন না। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গিন্নীপক্ষ যা জেনেছেন আমি তা কর্মবাচ্যের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করি। যা পঙ্কোদ্ধার হয় সংক্ষেপে তা এই—অশ্বপৃষ্ঠে যত সহজে ডাক্তারবাবু উঠতে পেরেছিলেন নামাটা ঠিক ততখানি সহজসাধ্য হয়নি, এবং যথাস্থানে তো নয়ই। দু'চার মাইলের কথাই নয়, পাক্কা পনের মাইল গিয়ে ঘোড়াটা তাঁকে নামিয়ে দিয়েছে বললেও ভুল বলা হয়, ধরাশায়ী করে পালিয়েছে। কোথায় গেছে বলা কঠিন, এতক্ষণে একশ মাইল, দেড়শ মাইল, কি এক হাজার মাইল চলে যাওয়াও অসম্ভব না। কর্তা বলেন একশ, গিন্নীর মতে দেড়শ, এক হাজার হচ্ছে চাকরের ধারণায়।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি, ততক্ষণাৎ গাড়ি ধরে বাড়ি ফেরার জন্যে। খাবার সময় তো প্রায় হয়ে এল, যে-এক হাজার মাইল সে এক নিঃশ্বাসে গেছে, খিদের ঝোঁকে তা পেরিয়ে আসতেই বা তার কতক্ষণ? ঘাড় থেকে ঘোড়া না নামিয়ে গৌহাটিতে বাস করা বিপজ্জনক।

আমার পাশের বাড়ির রাজীবরা খাসা লোক! ও, ওর দাদা, বাবা, ওরা সব্বাই। কিন্তু লোক ভালো হলে কি হবে, মনের ভাব ওরা ঠিক মতন প্রকাশ করতে পারে না। সেটা আমাদের ভাষার গোলমালে, কি ওদের মাথার গোলমালে, তা এখনো আমি ঠাওর করে উঠতে পারিনি। কিন্তু যখনই না আমি তাদের কিছু জিগগেস করছি, তার জবাব যা পেয়েছি তা থেকে দেখেছি মাথামুণ্ড কোনো মানেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেন, এই আজই তো! বেরুবার মুখেই রাজীবের দাদার সাথে দেখা। জিগগেস করলুম—"কেমন আছো হে?"

"এই কেটে যাচ্ছে একরকম!"

কেটে যাচ্ছে? শুনলে পিলে চমকায়! কিন্তু তখন ভারী তাড়া, ফুরসত নেই দাঁড়াবার। নইলে কী কাটছে, কেন কাটছে, কোথায় কাটছে, কিভাবে কাটছে, কবের থেকে কাটছে—এসবের খবর নেবার চেষ্টা করতুম।

বাজারের পথে রাজীবের বাবাকে পাই—"এই যে! কেমন আছেন মুখুয্যে মশাই?

"আজ্ঞে যেমন রেখেছেন!"

এও কি একটা জবাব হোলো নাকি? এ থেকে ভদ্রলোকের দেহমনের বর্তমান অবস্থার কতখানি আমি টের পাবে? কে রেখেছেন, আর কেনই বা রেখেছেন—তারই বা কি কোন হদিশ পাওয়া যায়? তোমরাই বলো।

ঝি সঙ্গে নিয়ে বাজারে চলেছেন, তখন আর তাঁকে জেরা করে জানা গেল না ; অগত্যা ঝিকেই প্রশ্ন করি—"তুমি কেমন গো বুড়ী ?"

"এই আপনাদের ছিচরণের আশীর্বাদে।" আপ্যায়িত হয়ে বুড়ী যেন গলে পড়ে।

ছিচরণকে আমি চিনি না, তার আশীর্বাদের এত বহর কেন, বাতিকই বা কিসের, তাও আমার জানা নেই, কিন্তু সঠিক উত্তর না পাওয়ার জন্যে—ও আর ছিচরণ—দুজনের ওপরেই নিদারুণ চটে গেলাম।

এক বন্ধুর সঙ্গে মোলাকাত হঠাৎ। অনেকদিন পরে দেখা, কুশল প্রশ্ন করি—"মহেন্দ্র যে ! ভালো আছো তো ?"

"এই একরকম।"

এও কি একটা কথার মত কথা হল ? ভাল থাকার আবার একরকম, দুরকম, নানারকম আছে নাকি ? বন্ধু বলে কিছু আর বলি না, মনে মনে ভারী বিরক্তি বোধ করি।

বিকেলে যখন আমি বাসামুখো, সেই সময় রাজীবও—খাসা ছেলে রাজীব ! সেও দেখছি ফিরছে ইস্কুল থেকে ! "এই যে রাজীবচন্দর ! চলছে কি রকম ?"

"চমৎকার !"

না, এবার ক্ষেপেই যেতে হলো। যখনই ওকে কোনো কথা—তা ওর স্বাস্থ্য, কি খেলাধুলা, কি পড়াশোনা যা কিছুর সম্পর্কেই জিগগেস করেছি, তখনই ওর ওই এক জবাব—'চমৎকার !' এ ছাড়া যেন আর অন্য কথা ওর ভাঁড়ারে নেই—আলাদা কোনো বুলি ও জানে না।

বাড়ি ফিরে ভারী খারাপ লাগে। এ কী ? সবারই কি মাথা খারাপ নাকি ? আবাল বৃদ্ধ বনিতা—সক্কলের ? এবং একসঙ্গেই ? আশ্চর্য !

দুনিয়া-সুদ্ধ সবারই ঘিলুর গোলমাল, না, আমাদের ভাষার ভেতরেই গলদ—তাই নিয়ে মাথা ঘামাই। এরকম হেঁয়ালীপনার খেয়ালী জবাবে কবিরাই খালি খুশি হতে পারেন, আমার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মন কিন্তু ভীষণ বিচলিত হয়। মাথা ঘামাতে হয় আমায়।

আচ্ছা, আমাদের ভাষাকে অঙ্কের নিয়মে বেঁধে দিলে কেমন হয় ? বিশেষ করে বিশেষণ আর ক্রিয়াপদের ? অঙ্কের নির্দেশের মধ্যে তো ভুল হবার কিছু নেই। 'ফিগারস ডু নট লাই'—অঙ্কেরা মিথ্যাবাদী হয় না,—মিথ্যে কথা বলতে জানে না—এই বলে একটা বয়েত আছে না ইংরাজীতে সংখ্যার মধ্যে বাঁধা পড়লে শংকার কিছু থাকে না ; আর, ভাসা-ভাসা ভাবটা কেটে যায় ভাষার। অঙ্কের নিরিখটাই সব চেয়ে ঠিক বলে মনে হয়।

১০০-কেই পুরো সংখ্যা ধরা যাক তাহলে। আমাদের দেহের, মনের, বিদ্যার, বুদ্ধির, রূপের, গুণের—এক কথায় সবকিছুর সম্পূর্ণতাজ্ঞাপক সংখ্যা

হলো গিয়ে ১০০ ; এবং ওই সংখ্যার অনুপাতের দ্বারাই অবস্থাভেদের তারতম্য বুঝতে হবে আমাদের। এর পর আর বোধগম্য হবার বাধা কি রইল?

উদাহরণ ঃ নিয়মকানুন মেনে এর পর রাজীবের বাবাকে গিয়ে যদি আমি জিগগেস করি ...'কেমন আছেন মশাই ? ভাল তো ?' এবং সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থার সংখ্যা যদি হয় ১০০—তাহলে ভেবেচিন্তে, অনেক হিসেব করে তাঁকে উত্তর দিতে হবে ঃ "এই ভাল আছি এখন! পরশু পেটের অসুখে ১০ দাঁড়িয়েছিল, কাল দাঁতের ব্যথায় ৫-এ ছিলাম, আজ যখন দাঁত তোলাই তখন তো কাত, প্রায় নাই বললেই হয়। এই যাই আর কি! তারপর অনেকক্ষণ ZERO বার পর সামলে উঠলাম, সেই থেকেই ১-টু দুর্বল বোধ করছি নিজেকে — এখন এই ৫৩!"

অর্থাৎ যেদিন—যখন—যেমন তাঁর শরীর-গতিক!

আমার বিস্ময়-প্রকাশে বরং আরো একটু তিনি যোগ করতে পারেন ঃ "হ্যাঁ, বাহান্নই ছিলাম মশাই! কিন্তু আপনার সহানুভূতি প্রকাশের পর এখন একটু ভাল বোধ করছি আরো। তা, ওই যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন!"

সব সময়েই মানুষ কিছু একরকম থাকে না—সুতরাং সব সময়েই উত্তর একরকম হবে কেন? এমনি সব ব্যাপারেই। ভাব-প্রকাশের দিকে ভাষায় যে অসুবিধা আছে সংখ্যার যোগে তা দূর হবেই—যেমন করে কুয়াশা দূরে হয়ে যায় সূর্যোদয়ের ধাক্কায়। সাহিত্য আর অংকের যোগাযোগে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি তো হবেই নির্ঘাৎ—অংকের সম্বন্ধেও আমাদের আতংক কমে যাবে ঢের। সেইটাই উপরন্তু। অর্থাৎ লাভের উপরি। ফাউয়ের ওপর থাউকো।

নাঃ, এ বিষয়ে রাজীবের বাবার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়ার দরকার এখুনিই—এই দণ্ডেই। এবং রাজীবের সঙ্গেও।

তখুনি বেরিয়ে পড়ি ৬২ বেগে।

ওদের বাড়ি বরাবর গেছি, দেখি, শ্রীমান রাজীবলোচন সদর রাস্তায় দাঁড়িয়েই ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন! ৯৮ মনোযোগে। "খুব যে ঘুড়ি ওড়াচ্ছ দেখছি?"

"চমৎকার!" আমার প্রশ্নের জবাবে ভদ্রলোকের সেই এক কথা!

"কিন্তু বাড়ির ছাদে ওড়ালেই ভাল ছিল নাকি? তোমাদের বাড়ির ছাদে তে বারান্দা নেই। ঘুড়ির উত্থান আর তোমার পতন দুটোই একসঙ্গে হতে পারত! তাহলে খুব সুবিধের হত না?"

"চমৎকার!"

"তোমার বাবা কি করছেন এখন?"

"চমৎ —"

বলতে বলতেই সে পিছু হটতে শুরু করে,ঘুড়ির তাল সামলাবার তালেই।

চোখকে আকাশে রেখে, পুরোপুরি ১০০-ই, ওর মনও ঘুড়ির সঙ্গে একই সূত্রে লটকানো, ওর স্থূল রাজীব-অংশই কেবল পিছু হটে আসে পৃথিবীতে—আসে চকিতের মধ্যে আর ৯২ বেগে—এত তাড়াতাড়ি যে আমি ভ্রূক্ষেপ করবার অবকাশ পাই না।

১ মুহূর্তে সে আমার ১০০ কাছাকাছি এসে পড়ে। ১০০ মানে, ঘনিষ্ঠতার চরম যাকে বলা যায়। আমি ককিয়ে উঠি সেই ধাক্কায়।

"কানা নাকি মশাই?" আমার দিকে না তাকিয়েই ওর জিজ্ঞাসা।

"তুমি ৮৭ নাবালক! কি আর বলব তোমায়—"

"দেখতে পান না চোখে?" আকাশে চোখ রেখেই ওর চোখা প্রশ্নটা।

"উহুঁ। বরং ৭৫ চক্ষুষ্মান। ১০০-ই ছিলাম, কিন্তু তোমার লাটাইয়ের চোট লেগে চশমার একটা পাল্লা ভেঙে গিয়ে বাঁ চোখে এখন অর্ধেক দেখছি।" বলে আমার আরো অনুযোগ: "একটা পাল্লা, মানে চশমাটার ৫০ পাল্লাই বলা যায়। তোমার পাল্লায় পড়ে এই দশা হল আমার।"

"য়্যাঁ?" এবার সে ফিরে তাকায় তিরানব্বই বিস্মিত হয়ে—"কি বললেন?"

"আমার ধারণা ছিল তুমি ৪২ বুদ্ধিমান, কিন্তু দেখছি তা নয়! বয়সে ১৩ হলে কি হবে, এই তেরতেই তিন তেরং উনচল্লিশ পেকে গেছ তুমি।"

৭২ হতভম্ব হয়ে যায় সে। "কি সব আবোল-তাবোল বকছেন মশাই পাগলের মতো?"

"এখন দেখছি তুমি ঊনব্বই ইঁচর-পাকা।"

"আর আপনি পাঁচশো উজবুক!" জোর গলাতেই সে জাহির করে।

আমি ৯৭ অগ্নিশর্মা হই, ৫ আঙুলে ওর পঞ্চাশ কান পাকড়ে ধরি—"বললেই হলো ৫০০? সাংখ্যদর্শন বোঝা অত সোজা না! ১০০-র ওপরে সংখ্যাই নেই!"

বলে ওর ৪৩ কান পাকড়ে ৭৫ জোরে ৮৫ আরামে মলতে শুরু করে দিই। ভাবতে থাকি মোট কান-সংখ্যার বাকি ৫০কে রেহাই দেব, না, এই সঙ্গেই বাগিয়ে ধরব? কিংবা আমার মুক্ত ৫০ হাতে ওর ২২ গালে ৮২ জোরালো এক চড় কষিয়ে দেব এক্ষুনি?

ইত্যাকার বিবেচনা করছি এমন সময়ে ও তীব্র চিৎকার শুরু করে দেয়। ওর বাবা ছুটে আসেন টেলিগ্রামের মত। ওর দাদাও আসে পাশের বাড়ির তাসের আড্ডা ফেলে। পাড়াপড়শীরাও। সকালের দেখা হওয়া সেই বন্ধুটিও এই মাহেন্দ্রক্ষণে এসে জোটেন কোত্থেকে।

২৬ কান্নার আওয়াজে ৬৩ গলার অস্পষ্টতা মিলিয়ে তারস্বরে আওড়াতে থাকে রাজীব—"আমি ঘুড়ি ওড়াচ্ছি, কোথাও কিছু নেই, কোনো বলা কওয়া

না, এই লোকটা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ধরে ধরে মারছে কেবল আমায়! আর অঙ্ক কষে কষে কী সব গালাগাল দিচ্ছে—"

শুনেই সবাই আস্তিন গুটোতে শুরু করে।

আমার বন্ধু মহেন্দ্র এসে মাঝখানে পড়েন—"আহা হা! করছেন কি! করছেন কি? দেখছেন না ভদ্রলোকের হিস্টিরিয়া হয়েছে!"

"য়্যাঁ? হিস্টিরিয়া?"

"দেখছেন না, চোখ লাল আর গা কাঁপছে ওর! এই সবই তো হিস্টিরিয়ার লক্ষ্মণ!"

চোখ লাল আমার ৯৪ রাগে, কাঁপছিও সেই কারণেই! হিস্টিরিয়া না কচু! তবু ওদের ৭২ বোকামি আমাকে ৯২ অবাক করে দেয়।

আমার বন্ধু অকস্মাৎ ডাক্তার হয়ে ওঠেন—"জল, কেবল জলই হচ্ছে এ রোগের ওষুধ। মাথায় রক্ত উঠলেই মৃত্যু! রক্ষে নেই তাহলে আর!"

হিস্টিরিয়ার নামে ওদের বীররস অচিরে অপত্য স্নেহে পরিণত হয়, যে যার বাড়িতে ছুটে যায়, এক এক বালতি জল নিয়ে বেরিয়ে আসে ছুটতে ছুটতে।

আমার মাথায় ঢালতে আরম্ভ করে—সবাই মিলে!

বাধা দেবার আগেই বালতি খালি হয়েছে। কাপড় জামা ভিজে আমার একশা—মানে ০০ই! একি আপদ বলো দেখি। ভারী বিচ্ছিরি!

আমি পালাবার চেষ্টা করি। কয়েকজন মিলে চেপে ধরে আমায়। আরো—আরো—আরো বালতি খালি হতে থাকে! হাঙ্গামা আর বলে কাকে!

একে পৌষের ৯৫ শীত, তার ওপরে ৫২ কনকনে ঠাণ্ডা জল, তার ওপরে আবার, এই দুর্যোগেই, সাঁইসাঁই করে বইতে শুরু করেছে উত্তুরে হাওয়া—৫৭ শীতল। কাঁহাতক আর সওয়া যায়? ১ ঝটকায় হাত পা ছাড়িয়ে নিই, বলি, "তোমাদের এই ৪৯ পাগলামি বরদাস্ত করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

এই বলে ১ দৌড়ে যেই না আমি ৬৫ দিতে যাচ্ছি, ওরা ৭৭ ক্ষিপ্রতায় আমাকে পাকড়ে ফেলে, ফলে আমারই চাদর দিয়ে বাঁধে আমাকে ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে। ৮৮ কষ্ট বোধ হতে থাকে আমার। কষ্টের চূড়ান্ত যাকে বলে!

এমনি সময়ে এক হোসপাইপওয়ালা রাস্তায় জল দিতে আসে। রাজীব তার হাত থেকে পাইপ হাতিয়ে আমাকেই লক্ষ্য করে! তার যাবতীয় রাগ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্ণমর্দনের বেদনা ভুলে আমার পীড়নের সাধু প্রতিশোধ নিতে চায়। শিশু ভোলানাথ এক নম্বর।

"এই—এই—এই! ওকি হচ্ছে?" চেঁচিয়ে উঠেছি আমি।

৬০ এর বাছা, শুনবে কেন সে? উন্মুখর জলের তোড় ছেড়ে দেয় সে আমার মুখের ওপর, ৫৬ পুলকে। অর্থাৎ পুলকের সেই ডিগ্রীতে, যেখানে সে নিজে ছাপিয়ে উঠেছে এবং ছাপাতে চাইছে অপরকেও।

"এতক্ষণে ঠিক হয়েছে!" বন্ধুবর উৎসাহে ৬৯ হয়ে ওঠেন—"এইবার ঠাণ্ডা হবে।"

জলের গোঁত্তা এসে ধাক্কা মারে নাকে চোখে মুখে মাথায় গায়—কোথায় না!

কতক্ষণ আর এই বরফি জলের টাল সামলানো সম্ভব ১ জনের পক্ষে? ক্রমশই আমি কাহিল মেরে আসি। একেবারে ঠাণ্ডা হতে, অর্থাৎ (৫ পঞ্চত্ব পেতে বেশি দেরি নেই বুঝতে আর বিলম্ব হয় না আমার।

এর পরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্তই। জলযোগের পর অ্যাম্বুলেন্সযোগে আমাকে পাঠিয়ে দেয় হাসপাতালে। সেখানেই এখন আমি।

হিস্টিরিয়ার কবল থেকে বেঁচেছি! এখন ভুগছি খালি নিউমোনিয়ায়। অমন ৫৫ জল-চিকিৎসার পরিণাম তো একটা আছেই!

অঙ্ক আর সাহিত্যের যোগাযোগে যে আবিষ্কারটা আমি করেছিলাম সেটা আর চালু করা গেল না এ-বাজারে। আঙ্কিক সাহিত্যিকের ৯৯ দশায় অর্থাৎ অন্তিম অবস্থায় তার সাহিত্য-অঙ্কের যবনিকা পতন হল।

সাহিত্য প্লাস অঙ্ক, তার সঙ্গে যদি সামান্য একটা ছেলেকে যোগ দেওয়া যায় তার ফল দাঁড়ায় প্রাণবিয়োগ। অর্থাৎ একেবারে শূন্য। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ১-ই কি আর ১০০-ই কি, সব ব্যাপারেই ছেলেদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া নিরাপদ। চাইল্ড ইজ দি ফাদার অফ ম্যান, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন; এই কথাগুলোর মানে আমি বুঝতে পারলাম এতদিনে। আমার হাড়ে হাড়ে। এর যথার্থ দামও এতদিনে আত্মসাৎ করতে পারলাম। অর্থাৎ, ছেলেরা হচ্ছে মানুষের বাবা! আর, বাবার সঙ্গে লাগতে গেলে কাবার হতে কতক্ষণ?

আবিষ্কারকের ক্রমপরিণতি খুব সুবিধের হল না, সেজন্যে দুঃখ নেই। কোন দেশে কোন কালেই হয় না, ইতিহাস পড়ে জানা আছে। যাই হোক, এই সুযোগে সেই ভদ্রলোক, সেই মহেন্দ্রবাবু, মাহেন্দ্রক্ষণে যিনি অযাচিত এসে বন্ধুকৃত্য করেছিলেন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে রাখি। হিস্টিরিয়ার টাল সামলেছি, নিউমোনিয়ার ধাক্কা সামলাব কিনা কে জানে! আগে থেকে দিয়ে রাখাই ভাল।

৬৭ জলকষ্টের কথা আর মনে নেই, এখন ৭৬ মন্বন্তর আমার সম্মুখে। সাবু বার্লিই খালি পথ্য আমার এখন।

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। গত শতাব্দীর শেষের দিকে, তখনো তোমরা আসোনি পৃথিবীতে। আমিও আসব কিনা তখনো আন্দাজ করে উঠতে পারছিলাম না। সেই সময়ে বারাসতে এই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিল। অবশ্য তারপর আমিও এসেছি, তোমরাও এসেছ। আমি আসার কিছুদিন পরেই দিদিমার কাছে গল্পটি শুনি। তোমাদের দিদিমারা নিশ্চয়ই বারাসতের নন, কাজেই তোমাদের শোনাবার ভার আমাকে নিতে হল।

সেই সময় একদা সুপ্রভাতে বারাসতে রামলক্ষ্মণ ওঝার বাড়ি যমজ ছেলে জন্মালো। যজম কিন্তু আলাদা নয়—পেটের কাছটায় মাংসের যোজক দিয়ে আশ্চর্য রকমে জোড়া। সেই অদ্ভুত লক্ষণ রামলক্ষ্মণ পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার বরাত জোর বলতে হবে। লোকে একেবারে একটা ছেলেই পায় না, আমি পেলাম দু-দুটো—একসঙ্গে এবং একাধারে।"

ডাক্তার এসে বলেছিল, "কেটে আলাদা করার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু তাতে বাঁচবে কিনা বলা যায় না।"

রামলক্ষ্মণ বললেন—"উঁহুঁ-হুঁ! যেমন আছে তাই ভাল। ভগবান দিয়েছেন, কপালের জোরে ওরা বেঁচে থাকবে।"

ছেলেদের নাম দিলেন তিনি রামভরত ও শ্যামভরত।

পৌরাণিক যুগে জড়ভরত ছিল, তার বহুকাল পরে কলিযুগে এই বিস্ময়কর আবির্ভাব—জোড়াভরত।

জোড়াভরত প্রতিদিনই জোরালো হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমশ হামাগুড়ি দিতেও শুরু করল। চার হাতের চার পায়ের সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! কে একজন যেন মুখ বেঁকিয়েছিল—"ছেলে না তো, চতুষ্পদ!" রামলক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করেছেন—"চতুর্ভুজও বলতে পার। সাক্ষাৎ ভগবান! সকালে উঠেই মুখ দেখি, মন্দ কি!" তারপর পুনশ্চ জোড় দিয়েছেন—হ্যাঁ, নেহাত মন্দ কি?"

ক্রমশ তারা বড় হল। ভায়ে-ভায়ে এমন মিল কদাচ দেখা যায়। পরস্পরের প্রতি প্রাণের টান তাদের এত প্রবল ছিল যে কেউ কাউকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারে না। তাদের এই অন্তরঙ্গতা যে-কেউ লক্ষ করেছে সে-ই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, এদের ঘনিষ্টতা বরাবর থাকবে, এদের ভালবাসা চিরদিনের। সকলেই বলেছে যে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই একটা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু যে রকম ভাবগতিক দেখা যাচ্ছে তাতে এদের দু-ভাইয়ের মধ্যে কখনো ছাড়াছাড়ি হবে, দুঃস্বপ্নেও এমন আশঙ্কা করা যায় না। এদের আত্মীয়তা কোনদিন যাবার নয়, নাঃ। বাঙলা দেশে আদর্শ ভ্রাতৃত্বের জন্যে মেডেল দেবার ব্যবস্থা সে-সময়ে থাকলে সে মেডেল যে ওদেরই কুক্ষিগত হত একথা অকুতোভয়ে বলা যায়।

দুভায়ে একসঙ্গেই খেলা করত, একসঙ্গে বেড়াত একসঙ্গে খেত, আঁচাত এবং ঘুমোত অন্য সব লোকের সঙ্গ তারা একেবারেই পছন্দ করত না। সব সময়েই তারা কাছাকাছি থাকত, একজনকে ছেড়ে আরেকজন খুব বেশি দূরে যেত না রামলক্ষ্মণের গিন্নি তাদের এই সুগুণের কথা জানতেন, এই কারণে যদি বা কখনো কেউ হারিয়ে যেত, স্বভাবতই তিনি অন্যজনের খোঁজ করতেন। তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল যে একজনকে যদি খুঁজে পান তাহলে আরেকজনকে অতি সন্নিকটেই পাবেন। এবং দেখা গেছে তাঁর ভুল হত না।

আরও বড় হলে রামলক্ষ্মণ ওদের গরু দুইবার ভার দিলেন। রামলক্ষ্মণের খাটাল ছিল। সেই খাটালে গরুরা বসবাস করত, তাদের দুধ বেচে ওঝা মহাশয়ের জীবিকা নির্বাহ হত। রামভরত গরু দুইত, শ্যামভরত তার পাশে দাঁড়িয়ে বাছুর সামলাতো—কিন্তু সবদিন সুবিধে হয়ে উঠত না। এক-একদিন দুরন্ত বাছুরটা অকারণ পুলকে লাফাতে শুরু করত। শ্যামভরতকেও তার সঙ্গে লাফাতে হত, তখন রামভরতের না লাফিয়ে পরিত্রাণ ছিল না। রামভরতের হাতে দুধের বালতিও লাফাতে ছাড়ত না এবং দুধের অধঃপতন দেখে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রামলক্ষ্মণ স্বয়ং লাফাতেন।

এত লাফালাফি সহ্য করতে না পেরে রামলক্ষ্মণের গিন্নি একদিন বলেই ফেললেন, "দুধের বাছা, ওরা কি দুধ দুইতে পারে?"

রামলক্ষ্মণ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, "নাঃ, কিছু হবে না ওদের দিয়ে। ইস্কুলেই দেব, হ্যাঁ।"

ইস্কুলের নাম দু-ভায়ের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

একদিন তো বাছুরটা শ্যামভরতকে টেনে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। রামভরতকে তখন দুধ দোয়া স্থগিত রেখে, অগত্যা বাছুর এবং ভায়ের সঙ্গে দৌড়তে হল।

রামলক্ষ্মণ সেদিন স্পষ্টই বলে দিলেন, "না তোরা আর মানুষ হবি না। যা, তবে ইস্কুলেই যা তাহলে।"

ইস্কুলে গিয়ে দু-ভায়ের অবস্থা আরো সঙ্গীন হল। একসঙ্গে ইস্কুলে যায়, ইস্কুল থেকে আসে। কিন্তু সেকথা বলছি না। মুশকিল হল এই, এক ভাই লেট করলে আরেক ভায়ের লেট হয়ে যায়। সেই অপরাধের সাজা দিতে এক ভাইকে কনফাইন করলে আরেক ভাই তাকে ফেলে বাড়ি চলে আসতে পারে না, তাকেও আটকে থাকতে হয়। বিনা দোষেই। একজন যদি পড়া না পারে এবং তাকে মাস্টারমশাই বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেন, তখন অন্য ভাইকে নিখুঁত ভাবে পড়া দেওয়া সত্ত্বেও, সেইসঙ্গে বেঞ্চে দাঁড়াতে হয়। সবচেয়ে হাঙ্গামা বাধল সেইদিন যেদিন দুজনের কেউই পড়া পারল না আর মাস্টার বললেন একজনকে বেঞ্চে দাঁড়াতে, আরেকজনকে মেঝেতে নিলডাউন হতে। মাষ্টারের হুকুম পালন করতে দুজনেই প্রাণপণ চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। 'ধুত্তোর' বলে সেইদিন তারা ইস্কুল ছাড়ল—ও মুখোই হল না আর।

বাড়িতে বাবাকে এসে বলল, "মানুষ হবার তো আশা ছিলই না, তুমিই বলে দিয়েছ! অমানুষ হবার চেষ্টা করলাম, তাও পারা গেল না।"

শ্যামভরত ভায়ের কথায় সায় দিয়েছে, "অমানুষিক কাণ্ড আমাদের দ্বারা হবার নয়। নিলডাউন আর বেঞ্চে দাঁড়ানো। দুটো একসঙ্গে আবার।"

তারপর থেকে রামলক্ষ্মণ ছেলেদের আশা একেবারেই ছেড়েছেন।

ওরা যখন যুবক হয়ে উঠল তখন ওদের মধ্যে এক-একটু গরমিলের সূত্রপাত দেখা গেল। রামভরত ভোরের দিকটায় ঘুমোতেই ভালবাসে। তার মতে সকালবেলার ঘুমটাই হচ্ছে সবচেয়ে উপাদেয়। কিন্তু শ্যামভরতের সেই সময়ে প্রাতর্ভ্রমণ না করলেই নয়। ভোরের হাওয়ায় নাকি গায়ের জোর বাড়ে। বাধ্য হয়ে আধা-ঘুমন্ত রামভরতকে ভায়ের সঙ্গে বেরুতে হয়।

মাইল-পাঁচেক হেঁটে হাওয়া খেয়ে শ্যামভরত ফেরে, ক্লান্ত রামভরত তখন শুতে পারলে বাঁচে। ঘুমোতে ঘুমোতে ভায়ের সঙ্গে বেরিয়েছে সেই কখন, আর দৌড়তে-দৌড়তে ফিরল এই এখন - এরকম অবস্থায় কার না পা জড়িয়ে আসে, কে না গড়াতে চায়? কিন্তু শ্যামভরত তখন-তখনই আদা-ছোলা চিবিয়ে ডনবৈঠক করতে লাগবে—কাজেই রামভরতের আর গড়ানো হয় না, তাকেও ভাইয়ের সঙ্গে ওঠবোস করতে হয়।

ব্যায়াম সেরেই শ্যামভরত স্নান সারবে। রামভরত বিছানার দিকে করুণ

দৃষ্টিপাত করে তেল মাখতে বসে—কী করবে ? স্নান সেরেই শ্যামভরতের রুটির থালার সামনে বসা চাই—সমস্ত রুটিন বাঁধা। ব্যায়াম করেছে, ভোরে হেঁটেছে, তার চোঁ চোঁ খিদে। বেচারা রামভরতের রাত্রে ঘুম হয়নি, ভোরেও তাকে জাগতে হয়েছে, দারুণ হাঁটাহাঁটি। তারপর ফিরে এসেই এক মুহূর্ত পায়নি—গরহজম হয়ে এখন তাঁর চোঁয়া ঢেকুর উঠছে।

সে বলেছে, "এখন খিদে নেই, পরে খাবো।"

ভাই ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, "পরে আবার খাবি কখন ? পরে আমার আবার কখন সময় হবে ? আমার কি আর অন্য কাজ নেই ?"

সে জবাব দিয়েছে, "আমার খিদে নেই এখন।"

শ্যামভরত চটে গেছে, "খিদে নেই, কেবল খিদে নেই ! কেন যে খিদে হয় না আমি তো বুঝি না। কেন, তুমিও তো ব্যায়াম করেছ বাপু ! তবে ? খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি, আর তোমার খিদে নেই—এ কেমন কথা ?"

কাজেই রামভরতকে গরহজমের ওপরেই আবার গলাধঃকরণ করতে হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে, প্রথম সুযোগেই রামভরত ভাইকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। "এবার একটু শুলে হয় না ?"

"শোয়া আর শোয়া ! দিনরাত কেবল শোয়া ! কী বিছানাই চিনেছ বাবা !" শ্যামভরত গম্ভীরভাবেই ছিপ হাতে নেয়।

"এই দুপুর রোদে দারুণ গরমে তুমি মাছ ধরতে যাবে ?" রামভরত ভীত হয়ে ওঠে।

"যাবই তো।" শ্যামভরত বলে, "কেবল শুয়ে শুয়ে হাড় ঝরঝরে হবার জোগাড় হল। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি পড়ে পড়ে ঘুমোও, আমি মাছ ধরতে চললুম।"

শ্যামভরতের গায়ে জোর বেশি, টানও প্রবল। কাজেই কিছু পরেই দেখা যায়, শ্যামভরত মাছ ধরছে আর রামভরতকে তার কাছে চুপটি করে বসে থাকতে হয়েছে।

বেলা গড়িয়ে আসছে, এক ভাই মাছ ধরে, আরেক ভাই পাশে বসে ঢুলতে থাকে।

এইভাবে দু-ভাই ক্রমশ আরো বড় হয়ে ওঠে।

একদা বাপ রামলক্ষ্মণ বললেন, "বড় হয়েছিস, এবার একটা কাজকর্মের চেষ্টা দ্যাখ। বসে বসে খাওয়া কি ভাল ?

বসে বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে কিম্বা দৌড়তে দৌড়তে কী ভাবে খাওয়াটা সবচেয়ে ভাল সে সম্বন্ধে জোড়াভরত কোনদিন ভাবেনি, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাপের কথা মেনে নিয়েই চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

গাঁট্টা-গোট্টা চেহারা দেখে একজন ভদ্রলোক শ্যামভরতকে দারোয়ানির কাজে

বহাল করলেন। কিন্তু রামভরতকে কাজ দিতে তিনি নারাজ। শ্যামভরত দিনরাত পাহারা দেয়, রামভরতও ভায়ের সঙ্গে গেটে বসে থাকে।

ভদ্রলোক শ্যামভরতের খোরাকি দেন। রামভরতকে কেন দেবেন? রামভরত তো তাঁর কোনো কাজ করে না। সে যে গায়ে পড়ে, উপরন্তু তাঁর বাড়ি পাহারা দিয়ে দারোয়ানির কাজে বিনে-পয়সায় অমনি পোক্ত হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে যে তিনি কিছু চার্জ করেন না এই যথেষ্ট।

তিন দিন না খেয়ে থেকে রামভরত মরিয়া হয়ে উঠল, বললে, "আমি তাহলে গাড়োয়ানিই করব।"

এই না বলে গরুর গাড়ির একজন গাড়োয়ানের সঙ্গে, কেবল খাওয়া-পরার চুক্তিতে অ্যাপ্রেনটিস নিযুক্ত হয়ে গেল।

এরপর রামভরত গাড়োয়ানি করতে যায়। শ্যামভরতকেও ভায়ের সঙ্গে যেতে হয়। উন্মুক্ত সদর দ্বার বিনা রক্ষণাবেক্ষণে পড়ে থাকে। কোনদিন বা শ্যামভরত দরজা কামড়ে পড়ে থাকে সেদিন আর রামভরতের গাড়োয়ানিতে যাওয়া হয় না।

অবশেষে একদিন এক কাণ্ড হয়ে গেল। ক্ষুধাতুর রামভরত থাকতে না পেরে বাগানের এক কাঁদি মর্তমান কলা চুরি করে খেয়ে বসল। শ্যামভরত ভাইকে বারণ করেছিল কিন্তু ফল হয়নি। তখন থেকে শ্যামভরতের মনে বিবেকের দংশন শুরু হয়ে গেছে।

কর্তা তাকে পাহারা দেবার কাজে বহাল করেছেন। চুরি চামারি যাতে না হয়, তাই দেখাই তো তার কর্তব্য। কিন্তু এ চুরি যে কেবল তার চোখের সামনেই হয়েছে তা নয়, সে এতে বাধা দেয়নি, দিতে পারেনি; এমন কি একরম প্রশ্রয়ই দিয়েছে বলতে গেলে। তার কি এতে কর্তব্যের ত্রুটি হয়নি? এ কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? কে বড়? ভাই, না মর্তমান কলা?

অবশেষে আর থাকতে না পেরে, শ্যামভরত চুরির কথাটা কর্তার কাছে বলেছে। কর্তা হুকুম দিয়েছেন, "চোরকো পাকড় লেয়াও।"

চোর পাকড়ানো অবস্থাতেই ছিল, সুতরাং তাকে ধরতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। কর্তা তৎক্ষণাৎ রামভরতকে শ্যামভরতের সাহায্যে থানায় ধরে নিয়ে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছেন।

সাতদিন ধরে বারাসতের আদালতে এই চুরির বিচার চলেছিল। রামভরত আসামী, শ্যামভরত সাক্ষী। রামভরত আসামীর কাঠগড়ায়, তার হাতে হাতকড়া—শ্যামভরত ভায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। আবার শ্যামভরত যখন জবানবন্দী দেয় তখন রামভরতকে ভায়ের সঙ্গে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসতে হয়।

অবশেষে রামভরতের একমাস জেলের হুকুম দিলেন হাকিম। রামভরতকে জেলে নিয়ে গেল, কিন্তু শ্যামভরতকেও সেই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। অথচ

শ্যামভরতের জেল হয়নি। মহা মুশকিল ব্যাপার। নির্দোষের অকারণ সাজা হতে পারে না। অগত্যা রামভরতকে জেল থেকে খালাস দিতে হল।

খালাস পাওয়া মাত্র রামভরত বলা নেই কওয়া নেই, ভাইকে ঠ্যাঙাতে শুরু করে দেয়। তাদের জীবনে প্রথম ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব। শ্যাম রামকে ঘুসি মেরে ফেলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে নিজেও গিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে, তারপর দুজনে জড়াজড়ি হুটোপাটি, তুমুল কাণ্ড।

রাস্তার লোকেরা মাঝে পড়ে বাধা দেয়। দুজনকে আলাদা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু আলাদা করতে পারে না। অল্পক্ষণেই বুঝতে পারে, দুজনকে তফাত করা তাদের ক্ষমতার অসাধ্য। কাজেই তাদের ছেড়ে দেয় পরস্পরের হাতে। তারাও মনের সুখে মারামারি করে। অবশেষে দুজনেই জখম হয়। তখন দুজনকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়—একই স্ট্রেচারে।

হাসপাতাল থেকে ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে ছেড়ে দেবার পর দুজনে বেরিয়ে আসে। পাশাপাশি চলে, কিন্তু কেউ একটি কথা বলে না। রামভরত গুরুগম্ভীর, শ্যামভরত ভারি বিষণ্ণ। রামভরত আস্তে আস্তে হাঁটে, মাঝে-মাঝে কপালের ঘাম মোছে। শ্যামভরত থেকে-থেকে ঘাড় চুলকোয়। সেই ফাঁকে আড়চোখে ভায়ের মুখের ভাব লক্ষ করার চেষ্টা করে।

দু-ভাই চুপ-চাপ হেঁটে চলে।

অবশেষে রামভরত আফিমের দোকানের সামনে এসে পেঁছয়। একটা টাকা ফেলে দেয় দোকানে। এক ভরি আফিম কেনে, কিনেই মুখে পুরে দেয় তৎক্ষণাৎ।

শ্যামভরত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, রামভরত কিন্তু উদাসীন। শ্যামভরত মাথা চাপড়ায়, রামভরত এক ঘটি জল খায়। শ্যামভরত চায় ভাইকে নিয়ে তখুনি আবার হাসপাতালের দিকে ছুটতে। রামভরত কিন্তু দেওয়াল ঠেস দিয়ে একটা খাটিয়ায় বসে পড়ে। শ্যামভরত তখন কেঁদে ফেলে, বলে, "একী করলি ভাইয়া।"

রামভরত ভারী গলায় জবাব দেয়, "কলা খেলে আফিম খেতে হয়।"

"আচ্ছা এবার তুই যত খুশি কলা খাস, আমি আর বলব না।" শ্যামভরত লুটিয়ে পড়তে চায় মাটিতে।

রামভরত গম্ভীর হয়ে ওঠে, "আফিম খেলে আর কলা খেতে হয় না।"

এই কথা বলে সে খাটিয়ার ওপর সটান হয়। দেখতে দেখতে রামভরত মারা যায়।

আর শ্যামভরত?

শ্যামভরতকে যেতে হয় সহমরণে।

একবার হাতি পোষার বাতিক হয়েছিল আমার কাকার। সেই হাতির সঙ্গেই একদিন তাঁর হাতাহাতি বেধে গেল। সে কথাও শুনেছিস। হাতির শুঁড় এবং কাকার কান খুব বেশি দূরে ছিল না—সুতরাং তার আসন্ন ফল কি দাঁড়াবে তা আমি এবং হাতি দুজনেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। কাকাও পারেননি তা নয়, কিন্তু দুর্ঘটনা আর বলে কাকে! সেই কর্ণবধ-পর্বের পর থেকে এই পালার শুরু!

কান গেলে মানুষের যত দুঃখ হয় অনেক সময় প্রাণ গেলেও ততটা হয় না বোধ হয়। কান হারিয়ে কাকা ভারি মুশড়ে পড়েছিলেন দিনকতক।

কর্ণের বিপদ পদে পদে, এই কথাটাই কাকাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। মহাভারত পড়েও জানা যায়, তা ছাড়া, পাঠশালায় পড়বার সময় ছেলেরাও হাড়ে হাড়ে টের পায়। হাড়ে হাড়ে না বলে কানে কানে বললেই সঠিক হবে, কেন না কানের মধ্যে বোধহয় হাড় নেই, থাকলে ওটা আদৌ অত সুখকর 'মলতব্য' ব্যাপার হত না।

কাকাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু কাকা বোঝেন কিনা তিনিই জানেন। তত্ত্বকথা বোঝা সহজ কথা নয়। আর তাছাড়া আমি তাঁকে বোঝাই মনে মনে, মুখ ফুটে কিছু বলবার আমার সাহস হয় না। কাকা যা বদরাগী, ক্ষেপে যেতে কতক্ষণ!

কাকাকে দেখলে আজকাল আমার ভয় হয়। কর্ণচ্যুত কাকা পদচ্যুত

চেয়ারের চেয়েও ভয়াবহ। তার উপরে নির্ভর করা যায় না—করেছ কি কুপোকাৎ! আর আজকাল যে রকম কটমট করে তিনি তাকান আমার দিকে। মুখের পানে বড় একটা না, আমার কানের দিকে কেবল। ঐ দিকেই তাঁর যত চোখ, যত ঝোঁক আর যত রোখ। আমি বেশ বুঝতে পারি আমার কর্ণসম্পদে তিনি বেশ ঈর্ষান্বিত। হাতির হাত থেকে বাঁচিয়েছি, এখন কাকার কবল থেকে কি করে কান সামলাই তাই হয়েছে আমার সমস্যা। কাকা একবার ক্ষেপে গেলে আমাকে তার নিজের দশায় আনতে কতক্ষণ?

তাই আমিও যতটা সম্ভব দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করি। নিতান্তই কাকার কাছাকাছি থাকতে হলে মর্মাহত হয়ে থাকি। এবং মনে মনেই তাঁকে সান্ত্বনা দিই।

অবশেষে একদিন সকালে কাকা অকস্মাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। 'শিবু—শিবু—' ডাক পড়ে আমার।

কাকার কাছে দৌড়োই কান হাতে করে। এত যখন হাঁকডাক, কি সর্বনাশ হবে কে জানে? প্রাণে মরতে ভয় খাই না, মারা গেলে আবার জন্মাবো, কিন্তু কানে মারা যাবার আমার বড্ড ভয়।

'কোথায় ছিলিস এতক্ষণ? হয়েছে, সব ঠিক হয়েছে। আর কোন ভাবনা নেই!' উৎসাহের আতিশয্যে উথলে ওঠেন কাকা। আমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকি।

'বুঝেছিস কিছু?' কাকার প্রশ্ন হয়।

'উঁহু—' আমি দুকান নাড়ি। ঘাড় নাড়লেই কানরা নড়ে যায়, কেন যে তা জানি না, তবে বরাবর দেখে আসছি আমি।

'রামপুরহাট যাব। টিকিট কিনে আনগে। একটা ফুল, একটা হাফ। তুই যাবি আমার সঙ্গে।'

'রামপুরহাট? হঠাৎ?' আমি বলে ফেলি।

'হঠাৎ আবার কি? সেইখানেই তো যেতে হবে।' আমার সবিস্ময় প্রশ্নে কাকা যেন হতভম্ব হয়ে যান।—'বামাক্ষেপার জীবনী পড়িসনি? আর পড়বিই বা কি করে? বুড়ো হাতি হতে চললি কিন্তু ধর্মশিক্ষা হলো না তোর। যত বলি সাধু মহাত্মা যোগী-ঋষিদের জীবনীটিবনী পড়—তা না, কেবল ডাণ্ডা-গুলি, লাট্টু আর লাটাই। যদি তা পড়তিস তাহলে আর একথা জিজ্ঞেস করতিস না।'

আমি আর জিজ্ঞাসা করি না। মৌনতা দ্বারা কেবল সম্মতি নয়, পাণ্ডিত্যের লক্ষণও প্রকাশ পায়, এই শিক্ষাটা আমার হয়ে যায়। না বলে কয়ে যদি সমঝদার হওয়া যায় তাহলে আর কথা বলে কোন্ মুখনা? কাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমাকে সবিশেষ জ্ঞান দিতে উদ্যত হন।—'রামপুরহাটের কাছেই এক ঘোর মহাশ্মশান আছে, জানিস? এই দশ-বিশ মাইলের মধ্যেই

সেই শ্মশানে বসে কেউ যদি একটানা তিন লক্ষ বার কোনো দেবতার নাম জপ করতে পারে তাহলেই সিদ্ধি ! নির্ঘাৎ ! স্বয়ং বশিষ্ঠমুনি এই বর দিয়ে গেছেন। আমার ঠাকুর্দার কাছে শোনা। সেইখানেই আমি যাব।'

'সেখানে কেন কাকা ?' আমি একটু বিস্মিতই হই। সিদ্ধির জন্য অতকষ্ট করে অতদূরে যাবার কি দরকার ? রামপুরহাট না গিয়ে, রামশরণ দুবেকে বললে এখনি তো এক লোটা বানিয়ে দেয় ? কোনও হাঙ্গামা নেই ! হ্যাঁ, সবতাতেই কাকার যেন বাড়াবাড়ি।

আমার সিদ্ধি মেডইজির ভূমিকা পড়ার মুখেই কাকা উসকে ওঠেন—'উঁহুঁ হুঁ, সে সিদ্ধি নয়। ও তো খেতে হয়, খেলে আবার মাথা ঘোরে। এ সিদ্ধি পেতে হয়। বামাক্ষেপা, বারদির ব্রহ্মচারী, আরো যেন কারা সব ঐ শ্মশানে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ! জানিস না ? আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা এইরকম জপ করে যাব, যেমনি না তিন লক্ষ বার পুরবে অমনি মা দুর্গা হাসতে হাসতে দশ হাত নেড়ে এসে হাজির হবেন। বাবা গণেশও শুঁড় নাড়তে নাড়তে আসতে পারেন। তাঁরা এসে বলবেন—'বৎস বর নাও—'

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠি।

'তখন আমি যা বর চাইব, বুঝেছিস কিনা, সঙ্গে সঙ্গে ফলবে। তাকেই বলে সিদ্ধিলাভ। আমি যদি চাই, আমার আরো দুটো হাত গজাক, তক্ষুনি গজাতে পারে। হুম ! তৎক্ষণাৎ !'

শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়। চতুর্ভুজ কাকার চেহারা কল্পনা করার আমি প্রয়াস পাই।

'কিন্তু কাকাবাবু ! চার হাত হলে তুমি পাশ ফিরে শোবে কি করে ?'

'কিন্তু আমি তো আর হাত চাইব না। হাত তো আমার আছেই। দুটো হাতই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এই নিয়েই পেরে উঠি না। পায়েরও আমার আর দরকার নেই। দুটো পা-ই আমার মোর দ্যান এনাফ। আমি কেবল চাইব আর একটা কান। কান না হলে আমাকে মানায় না, আয়নার দিকে তাকানোই যায় না। তাই বুঝিছিস কিনা অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম—রামপুরহাট ! মন্ত্র বলে চারটে হাত কি চারটে পা যদি আমার গজাতে পারে তাহলে একটা মাত্র কান গজানো আর এমন কি ?'

কাকা তাঁর কথায় পুনশ্চ যোগ করেন আবার--'ইচ্ছে করলেই যদি আমি চতুষ্পদ হতে পারি তাহলে এমন বিকর্ণ হয়ে থাকব কেন ? কিসের তরে ?'

আমারও—দারুণ বিশ্বাস হয়ে যায়। মন্ত্রবলে কতো কি হয় শুনেছি, কান হওয়া আর কি কঠিন ? কানেই যখন মন্ত্র দেয়, তখন মন্ত্রেও কান দিতে পারে। আশ্চর্য কিছু নয়। তিন লাখ বার কেবল দুর্গা কি কালী কি জগদ্ধাত্রী এর যে কোন একটা নাম—উহুঁ, জগদ্ধাত্রী বাদ—চার অক্ষরের মন্ত্র তার মধ্যে আবার

দস্তুরমত দ্বিতীয় ভাগ! জগদ্ধাত্রীর তিন লক্ষ মানে কালীর ছলক্ষের ধাক্কা। শক্তির আরাধনাতেই নাহক শক্তির বরবাদ নেহাত সময়ের অপচয়! পয়সা না লাগুক, কিন্তু দেবতার নামের বাজে খরচ করতেও আমি নারাজ।

'কাকা, আমিও তাহলে বর চেয়ে নেব যাতে না পড়ে শুনে ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারি।' আমি একটু ভেবে নিই, 'কেবল পাশ করাই বা কেন, স্কলারশিপটা নিতেই বা ক্ষতি কি? যে বরে পাশ হয়, স্কলারশিপও তাতে হতে পারে, কি বল কাকা? মা দুর্গার পক্ষে কি খুব শক্ত হবে এমন?'

'আর ম্যাট্রিকই বা কেন? না পড়ে একেবারে এম্-এ?' এম্-টা আমি আরো বড়ো করি।

'বারে! আমি মরব জপ করে আর তুমি পাশ করবে না পড়ে? বাঃ-রে!' —কাকা খাপ্পা হয়ে ওঠেন।

'তা হলে আমার গিয়ে আর কি হবে!' আমি ক্ষুন্ন হই। 'তোমার সঙ্গে নাই গেলাম তবে, আমার তো আর কানের তেমন অভাব নেই।'

'পাগল! তা কি করে হয়? তোকে যেতেই হবে সঙ্গে। সিদ্ধিলাভ করা কি অতই সোজা নাকি? জপ করতে বসলেই তুলে দেয় যে,—

'কে? পুলিসে?'

'উহুঁ। পুলিস সেখানে কোথা? শুনেছিস মহাশ্মশান! বারো কোশের ভেতরে কোনো জনমানব নেই।'

'ও বুঝেছি! শেয়াল! বেশ তোমার বন্দুকটা নিয়ে যাব না হয়—কাছে এলেই দুম—দুড়ুম।'

'শেয়াল নয় রে পাগলা, শেয়াল নয়। ডাকিনী যোগিনী, ভূত পেরেত, তাল-বেতাল—এরা সব এসে তুলে দেয়। সিদ্ধিলাভ করতে দেয় না।'

ভূত-প্রেত শুনেই আমি হয়ে গেছি! তাল-বেতালের তাল আমাকেই সামলাতে হবে ভাবতেই আমার হৃৎকম্প শুরু হয়। 'কাকা—কাকা—!' কম্পিত কণ্ঠ থেকে আমার কেবল কা কা ধ্বনি বেরোয়, তার বেশি বেরোয় না।

'আরে, ভয় কিসের তোর। আমি তো কাছেই থাকব। গতিক সুবিধের নয় দেখলে দুর্গা পালটে রাম-নাম করতে লেগে যাব না হয়। রাম-নামে ভূত পালায়। তবে রাম হচ্ছে খোট্টাদের দেবতা—তা হোক গে, রামও বর দিতে পারে। সীত উদ্ধার করেছিলেন আর একটা কান উদ্ধার করতে পারবেন না? তবে কিনা দুর্গা—দুর্গাই হল গিয়ে মোক্ষম! রামকেও দুর্গার কাছে বর নিতে হয়েছিল।'

তথাপি আমি ইতস্তত করতে থাকি।

'আচ্ছা, এক কাজ করা যাক! তুই নাহয় রাম রাম জপিস—তাহলে তো আর ভয় নেই তোর? রামকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাশের ফিকিরও করে নিতে

পারিস! আমার কোন আপত্তি নেই। ভোলানো খুব শক্ত হবে না হয়ত। রামটা ভ্যাবা গঙ্গারাম। তা না হলে বাঁদরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে···এত মানুষ থাকতে?' এতখানি বলে কাকাকে দম নিতে হয়—'তা ছাড়া তোর দাঁতব্যথা, পেট-কামড়ানো, সর্দিকাশি, লঙ্কা খেলে হেঁচকি ওঠা—স্কুলের টাস্‌ক না হলে ডায়েরিয়া হওয়া—যতরাজ্যির ব্যারাম তো তোর লেগেই আছে, এসবও তোর সেরে যাবে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমায়।'

পাশের কথায় আমার উৎসাহ সঞ্চার হয়। নতুন প্রস্তাবে কাকার সঙ্গে রফা করে ফেলতে দেরি হয় না একটুও। সেই দিনই আমরা রওনা দিই। সন্ধ্যার মুখে রামপুরহাটে পেঁছানো; কাকার বন্ধু এক ডাক্তারের বাড়িতে আমাদের আবির্ভাব।

ডাক্তার ভদ্রলোক সে সময়ে একটা ঘোড়ার দর করছিলেন। একজন গেঁয়ো লোক ঘোড়া বেচতে এসেছিল, দিব্যি খাসা ঘোড়াটি—আকারপ্রকারে তেজী বলেই সন্দেহ হয়; প্রাথমিক কুশলপ্রশ্ন আদানপ্রদানের পরেই কাকা জিজ্ঞাসা করেন, 'ঘোড়া কেন হে হারাধন?'

'আর বল কেন বন্ধু!' হারাধন ডাক্তার দুঃখ প্রকাশ করেন, 'দূরে দূরে যতো গ্রাম থেকে ডাক আসে, সেখানে তো মোটর চলে না, গরুর গাড়ির রাস্তাও নেই অনেক জায়গায়, সে স্থলে ঘোড়াই একমাত্র বাহন;' অদূরস্থিত সাইকেলের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে—'ওতে চেপে আর পোষায় না ভাই! তাই দেখে শুনে একটা ঘোড়াই কিনছি এবার।'

'বেশ করেছ, বেশ করেছ।' কাকার সর্বান্তকরণ সমর্থন—'আমাদের স্বদেশী ঘোড়া থাকতে বিদেশী সাইকেল কেন হে! ঠিকই বুঝেছো এতদিনে। তা, তোমার ঘোড়াটিকে তো বেশ শান্তশিষ্ট বলেই বোধ হচ্ছে।' কাছে গিয়ে কাকা ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে সার্টিফিকেট দেন।

'তোমার তো ছোটবেলায় ঘোড়ায় চড়ার বাতিক ছিল হে! ঘোড়া দেখলেই চেপে বসতে,' ডাক্তার বলেন, 'কি রকম জানোয়ার কিনলাম, চড়ে একবার পরীক্ষা করে দেখবে না? আমার তো ঘোড়ায় চড়া প্র্যাক্‌টিস করতেই কিছুদিন যাবে এখন!'

তৎক্ষণাৎ অশ্ব-পরীক্ষায় সম্মত হন কাকা; হাতি-ঘোড়ার ব্যাপারে বেশি বেগ পেতে হয় না রাজি করাতে কাকাকে। চতুষ্পদের দিকে কাকার স্বভাবতই যেন টান। সে তুলনায় আমার দিকেই একটু কম বরং, পদগৌরব করার মত কিছু আমার ছিল না বলেই বোধ হয়।

'ঘোড়ায় চাপবার বয়েস কি আছে আর?' কাকা সন্দিগ্ধ স্বরেই বলেন, 'দেখি তবু চেষ্টা করে।' তারপর ডাক্তারবাবু, আমি এবং অশ্ববিক্রেতা—সর্বোপরি স্বয়ং অশ্বের ব্যক্তিগত সহযোগিতায় কষ্টেসৃষ্টে কোনোরকমে তো চেপে বসেন শেষটা।

কাকার দেহখানি তো কম নয়, ভারাক্রান্ত হয়ে ঘোড়াটা কেমন যেন ভড়কে যায়। নড়বার নামটিও করে না। কাকা যতই 'হেট হেট' করেন ততই সে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে থাকে।

অশ্ব বিক্রয়ের আশা ক্রমশই সুদূরপরাহত হচ্ছে দেখে অশ্ববিক্রেতা বিচলিত হয়ে ওঠে; এবং তার হাতের ছিপটিও। কিন্তু যেই না ঘোড়ার পিঠে ছপাৎ করে এক ঘা বসিয়ে দেওয়া, অমনি ঘোড়াটা ঘুরপাক খেতে শুরু করে দেয়। এ আবার কি কাণ্ড! কাকা তো মরীয়া হয়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরেন।

এদিকে ঘোড়ার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে ডাক্তারবাবুর শখের বাগানের দফা-রফা, নানাপ্রকার গোলাপ গাছের চারা লাগিয়েছিলেন, ঘোড়া কেনবার কাছা-কাছিই লাগিয়েছিলেন–ঘোড়ার পায়ে তাদের অপঘাতের আশঙ্কা তো করেননি কোনদিন! অতঃপর অশ্ববর মুহুর্মুহু এগোতে আর পেছোতে থাকে, যে পথে এগোয় সে পথে প্রায়ই পেছোয় না এবং বিদ্যুদ্বেগে অগ্রপশ্চাৎ গতির ধাক্কায় আর এক ধারের শাকসব্জির দফা সারে—অশ্বক্ষুরে মুড়িয়ে যায় সব। এ-সমস্তই কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার! আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরপর দুটি মহাদেশ এইভাবে বিধ্বস্ত করে অশ্বরত্ন নিদারুণ এক লাফ মারেন—সেই এক লাফেই কাকা-পৃষ্ঠে, বাগানের বেড়া টপকে সামনের একটা নালা ডিঙিয়ে, তাকে অন্তর্হিত হতে দেখা যায়। আমিও দেরি করি না; তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের সাইকেলটায় চেপে পশ্চাদ্ধাবন করি। ঘোড়ার এবং কাকার।

ধাবমান অশ্বকে সশরীরে খুব সামান্যই দেখা যায়, অল্পক্ষণ পরেই তিনি কেবল শ্রুতিগোচর হতে থাকেন। দূর থেকে কেবল খটাখট কানে আসে; কিছুক্ষণ পরে পদধ্বনিও না—শুধুই চিঁহি চিঁহি। চিঁহিরই অনুসরণ করি।

অনেকক্ষণ অনেক ঘোরাঘুরির পর এক ধু-ধু প্রান্তরে এসে পড়ি। সন্ধ্যা কখন পেরিয়ে গেছে। আধখানা চাঁদের ম্রিয়মাণ আলোয় কোনরকমে সাইকেল চালিয়ে যাই। কিন্তু সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও চিহ্নমাত্র নেই—না ঘোড়ার না সওয়ারের।

ইতস্তত সাইকেল চালাতে থাকি, কী করব আর? ফাঁকা মাঠ আর পরের সাইকেল পেলে কে ছাড়ে? কাকাহারা হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে কাকীর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব? মুখ দেখাব কি করে? সে ভাবনাও যে নেই তা নয়।

'কে-রে? শিবু নাকিরে? শিবুই তো!'

চমকে গিয়ে সাইকেল থামাই। দেখি কাকা এক উঁচু ঢিবির পাশে পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন।

'আঃ; এসেছিস তুই? বাঁচলুম।'

'তোমার ঘোড়া কোথায় কাকা?'

'আমায় ফেলে পালিয়েছে। কোথায় পালিয়েছে জানি না।' কাকার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ে—'আঃ হতভাগার পিঠ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচেছি। কিন্তু

এ কোথায় এনে ফেলেছেরে ? এও কি রামপুরহাট ?'

'উহুঁ, মনে তো হয় না। রামপুরহাট কত মাইল দূরে ত বলতে পারব না, তবে বেশ কয়েকঘণ্টা দূরে।'

'তাহলে এ কোন জায়গা ? তুই কি বলছিস তবে লক্ষ্মণপুরহাট ?'

'লক্ষ্মণপুর হতে পারে, ভরতপুর হতে পারে, হনুমানপুর হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু হাটের চিহ্নমাত্র নেই কাকা। চারধারেই তো ধুধু মাঠ ! সাইকেল করে চারদিকে ঘুরলাম, জনমানবের পাত্তাই নেই কোথাও।'

'তবে···তবে এই কি সেই মহাশ্মশান ?' কাকা নিজেই নিজের জবাব দেন, 'দুর্লক্ষণ দেখে তাই তো মনে হয়। দমকা হাওয়ায় মড়াপোড়ানোর গন্ধও পেয়েছি খানিক আগে। আর, দু-একটা শেয়ালকেও যেতে দেখলাম যেন। তাহলে—তাহলে কি হবে ? কাকার কণ্ঠে অসহায়তার স্বর।

কাকার বিচলিত হওয়ার কারণ আমি বুঝি না।—'কেন ? এখানে আসবার জন্যেই তো আমাদের আসা ? তাই নয় কি ? তাহলে সিদ্ধিলাভের ব্যাপারটা শুরু করে দিলেই তো হয়।'

'আজই ? আজ রাত্রেই ? আজ যে সিদ্ধিলাভের জন্য মোটেই আমি প্রস্তুত নইরে। আজ কি করে হয় ?'

'যখন হয়ে পড়েছ তখন আর কি করা ?' আমি কাকার পাশে বসে পড়ি। —'তেমন ঝোপ-ঝাড় নেই, বেশ ফাঁকাই আছে কাকা ! ভূতপ্রেত এলে টের পাওয়া যাবে তক্ষুনি।'

'সমস্ত দিন ট্রেনে—খাওয়াদাওয়া হয়নি। খিদেয় নাড়ী চিঁ চিঁ করছে, এই কি সিদ্ধিলাভের সময় ? তোর কি কোন আক্কেল নেই রে শিবু ? এ রকম বিপদ হবে জানলে কে আসতে চাইত—এই আমি নিজের কান মলছি, যদি আজ উদ্ধার পাই—' !

তাঁর একমাত্র কানকে কাকা একমাত্রা মলে দেন। কিন্তু উদ্ধারের কোন ভরসাই মেলে না। ততক্ষণে চাঁদ ডুবে গিয়ে অন্ধকার ঘোরালো হয়ে আসে। দুহাত দূরেও দৃষ্টি অচল হয়। আমি কাকার কাছ ঘেঁষে বসি, আমার গা ছমছম করতে থাকে।

অবশেষে কাকা বলেন—'তাই করা যাক অগত্যা। তোর কথাই শুনি। আজ রাত্রে এখান থেকে বেরুবার যখন উপায় নেই; তখন কি আর করা ? কাল সকালে একেবারে সিদ্ধি পকেটে করে হারাধনের বাড়ি ফিরলেই হবে। এই নে আমার কোট, এই নে পিরাণ —' কাকা একে একে আমার হাতে তুলে দিতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করি—'তুমি কি খালি গা হচ্ছ কাকা।'

'বাঃ, হব না ? সাধু সন্ন্যাসীরা কি কাপড়জামা পরে চাদর গায়ে দিয়ে তপস্যা করে নাকি ? তাহলে কি হয়রে মুখ্যু ? এই নে চাদর—এই নে আমার গেঞ্জি—এই নে আমার—'

আমি সচকিত হয়ে উঠি। অতঃপর পরবর্তী বস্তুটি কী তা বুঝতে আমার বিলম্ব হয় না।—'উহুঁ, কাপড়টা থাক কাকা। কাপড় পরাতে তত ক্ষতি হবে না—'

'তুই তো জানিস।' কাকা রাগান্বিত হন; 'হ্যাঁ কাপড়টা থাক। তাহলেই আমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে! তবে এত কাণ্ড করে দরজি ডাকিয়ে গেরুয়া রঙের কৌপীনই বা তৈরি করলাম কেন, আর অমন কষ্ট করে সেটা এঁটে পরতেই বা গেলাম কেন তবে?'

কাপড়ও আমার হাতে চলে আসে। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে কৌপীনসম্বল কাকা কর্ণলাভের প্রত্যাশায় ঘোর তপস্যা লাগিয়ে দেন।

আমি আর কী করব? কাকার কাপড়টাকে মাটিতে বিছিয়ে পাতি, কোটকে করি বালিশ, গেঞ্জিটাকে পাশ বালিশ। তারপর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে সটান হই। আমি দেখেছি, জেগে থাকলেই আমার যত ভয়, ঘুমিয়ে পড়লে আর আমার কোনো ভয় করে না!

অনেকক্ষণ অমনি কাটে। ঘুমেরও কোন সাড়া নেই, কাকারও না। সহসা একটা আওয়াজ – চটাস।

আমি চমকে উঠি! কাঁপা গলায় ডাকি—'কাকা!'

কাকার কোন সাড়া নেই। আরো বেশি করে আমি চাদর মুড়ি দিই।

আবার খানিক বাদে 'চটাস'। এবার আওয়াজটা আরো যেন জোরালো।

আবার আমার আর্তনাদ—'কাকা!'

অন্ধকার ভেদ করে উত্তর আসে—'উহুঁহুঁ!'

কাকার চাপা হুঙ্কারে আমি নিরস্ত হই। আর উচ্চবাচ্য করি না। কাকার যোগভঙ্গ করে কি নিজের কানের বিঘ্ন ঘটাবে? অন্ধকারের মধ্যেই ওঁর হাত বাড়াতে কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ কেটে যায়, আমার একটু তন্দ্রার মতো আসে। কিন্তু অকস্মাৎ ফের চটকা ভাঙে; চমকে উঠে বসি, শুনতে থাকি—চটাচট চচ্চড় চটাচট—চট। অন্ধকার চৌচির করে কেবল ঐ শব্দ, আর কিছু না, এবং বেশ জোর জোর।

তবে কি—তবে কি...? ভয়ে আমার হাত পা গুটিয়ে আসে। তাহলে কি তাল-বেতালেই আমার কাকাকে ধরে পিটাতে শুরু করে দিয়েছে নাকি? কিংবা ভূতপ্রেতরাই কাকাকে বেওয়ারিশ পেয়ে মজা করে হাতের সুখ করে নিচ্ছে? যাই হোক, কোনটাই ভাল কথা নয়।

আমি মরীয়া হয়ে ডাকতে শুরু করি—'কাকা কাকা কাকা—!'

'বসতে দিচ্ছে নারে—'

আওয়াজ পেয়ে আশ্বাস পাই। তবু যা হোক, আমার কাকাই বটেন।

'ও—ও—ও কি—কি—কিসের শব্দ?'

আমার গলা কাঁপে।

'আর বলিস না।' করুণ কণ্ঠের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে দারুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস। 'একদম, বসতে দিচ্ছে না।'

'কিসে বসতে দিচ্ছে না?' ভূতে?'

'উহুঁ!'

'ডাকিনী-যোগিনী?'

'উহুঁহুঁ।'

'তবে কি তাল-বেতাল?'

'নাঃ। মশায়। মশার ভারি উৎপাত রে!'

'ওঃ, তাই বল।'। মশার কথা শুনে ভরসা পাই। তাহলে অন্য মারাত্মক কিছু নয়! 'তোমার চাদর মুড়ি দিয়েছিলাম বলে বুঝতে পারিনি এতক্ষণ! তাইতো! কী রকম মশার ডাক শুনছো কাকা,—পন্‌-পন্‌পিন্—কী ডাকরে বাবা! এরাই তোমার সেই ডাকিনী নয়তো?'

'কে জানে!' কাকার বিরক্তির তীক্ষ্নতায় অন্ধকার বিদীর্ণ হয়, কিন্তু ডাকিনী না হলেও যোগিনী যে, তা আমি বিলক্ষণ টের পাই, আমার গায়ের সঙ্গে যোগ হওয়া মাত্রই।

আবার চটাপট শব্দ হয়। মনের সুখে গালে মুখে হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে চড়াতে থাকেন কাকা।

চপেটাঘাত ছাড়া মশকবধের আর কী উপায় আছে? অতঃপর কেবল এই চড়-চাপড়ই চলতে থাকে! এবং বেশ সশব্দেই। তপস্যা ওঁর মাথায় উঠে যায়।

কিন্তু মশার সঙ্গে মারামারিতে পারবেন কেন কাকা? প্রাণী হিসেবে ওরা খেচর, কাকা নিতান্তই স্থলচর। ওদের হল আকাশ পথে লড়াই আর কাকার ভূমিষ্ঠ হয়ে। তাছাড়া কাকার একাধারে দুপক্ষকে আক্রমণ—মশাকে এবং কাকাকে। কাজেই, কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেই—কাবু হয়ে পড়েন কাকাবাবু। রণে ক্ষান্ত হয়ে তাঁকে পরাজয়-স্বীকার করতে হয়। এই ঘোরতর সংগ্রামে, মশাদের মধ্যে নিহতদের তালিকা আমি দিতে পারব না—তবে আহতদের মধ্যে একজনের নাম আমি বলতে পারি—খোদ আমার খুড়োমশাই।

তাঁর বৈরাগ্য এসে যায় তপস্যায়। এমন অবস্থায় কার বা না আসে? তিনি বলেন—'দে আমার কাপড়জামা। গায়ের চাদরটাও দে। সিদ্ধিলাভ মাথায় থাক। কানে আমার কাজ নেই আর, ঘুমিয়ে বাঁচি।'

বিছানা, বালিশ, পাশ বালিশ, মশারি সবই ফিরিয়ে দিতে হয়। অবিলম্বেই লম্বা হন কাকা! মাটিতে শুয়ে পরনের কাপড়কেই লেপে পরিণত করি, কি আর করব? তারই তলায় গা ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয় আমায়। লেপের প্রলেপে—যতটুকু বাঁচোয়া!

অমন ভয়ঙ্কর রাতও প্রভাত হয়। আবার সূর্যের মুখ দেখি আমরা। ইতস্তত তাকাতেই চোখে পড়ে—সেই ঘোড়া! একটু দূরে উবু হয়ে বসে আছে।

অদ্ভুত দৃশ্য! ঘোড়াকে এভাবে বসে থাকতে জীবনে কখনো দেখিনি। সারা-রাত তপস্যা করছিল নাতো?

কাকা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন—'যাক বাঁচিয়েছো। এতখানি পথ আর হেঁটে ফিরতে হবে না। বর না হোক, অশ্ববর তো পাওয়া গেল আপাতত!'

কিন্তু পরমুহূর্তেই ওঁর উৎসাহ নিবে আসে। গত সন্ধ্যার দুর্ঘটনা স্মরণ করে উনি দমে যান। আমি কাকাকে অভয় দিই—'সমস্ত রাত মশার কামড় খেয়ে শায়েস্তা হয়ে এসেছে ব্যাটা। দাঁড়াবার ওর খ্যামতা নেই, বসে পড়েছে দেখছ না!'

'তাই বটে!' কাকা ঈষৎ চাঙ্গা হন, 'তাহলে ঠুকঠুক করে বেশ নিয়ে যেতে পারবে। কি বলিস তুই!'

'নিশ্চয়। আর আমার তো সাইকেলই আছে'—আমি জানাই।

কাছে গিয়ে ওকে উঠতে বলি—ব্যাটার কোনো গ্রাহ্যই নেই। কাকা কান মলে দেন। নিজের নয়; ঘোড়ার; তবুও সে নট-নড়ন-চড়ন। গালে ওর আমি থাবড়া মারি, তথাপি নিরুৎক্ষেপ! অগত্যা আমি আর কাকা দুজনে মিলে ল্যাজ ধরে ওকে টেনে তুলতে যাই। আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টায় অবশেষে ও খাড়া হয়।

'সারারাত চুপচাপ ছিল ঘোড়াটা! এত কাছেই ছিল অথচ! এর কারণ কিরে শিবু?' কাকা জিজ্ঞাসা করেন, 'এতো ভাল লক্ষণ নয়।'

'জপ করছিলো বোধ হয়।' আমি ব্যক্ত করি, 'সমাধি হয়ে গেছে দেখছ না।'

'তাই হবে। স্থানমাহাত্ম্য যাবে কোথায়?' কাকার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে,—'এ তো সিদ্ধিলাভেরই জায়গা, তবে হ্যাঁ—যদি না তুলে দেয়--'

সিদ্ধিলাভের কথায় কাকার কানের দিকে তাকাই। কানটা যথাস্থানেই নেই। কাকার সিদ্ধিলাভ আর হল না এ-যাত্রা! আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে!

কাকা ঘোড়ার পিঠে চাপেন। ঘোড়ার চলবার উদ্যোগই নেই, সেই পুরনো বদঅভ্যাস। আমাদের ছিপটি মারার সাহস হয় না। কালকের অত ঘোরা-ঘুরির পর—আবার? অনেক করে ওকে বোঝাই। বাপু বাছা বলে ঘাড়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিই ওর।

ও কেবল জবাব দেয়, চিঁহিঁহিঁ।

এই ভাবে বহুক্ষণ আমাদের কথোপকথনের পর ও রাজী হয়। হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু এ আবার কি বদখেয়াল? পেছন দিকে হাঁটতে থাকে! হ্যাঁ, সটান পেছনেই।

গতিক দেখে কাকা তো প্রায় কেঁদে ফেলেন।—'কান তো গেছেই, এবার কি ঘোড়ার পাল্লায় পড়ে প্রাণটাও বেঘোরে যাবে নাকিরে শিবু?'

আমিও ভাবিত হই কিন্তু ঘাবড়াতে দিই না কাকাকে। বলি—'ভয় খেয়ো না কাকা। বুঝতে পেরেছি কী হয়েছে। আর কিছু না, ঘোড়াটা সিদ্ধিলাভ

করেছে। 'একে স্থানমাহাত্ম্য, তার ওপরে কাল সারা রাত ধরে ঘোরতর তপস্যা —যাবে কোথায় ? তার ফলেই তোমার ঘোড়ার এই কাণ্ড।'

'সিদ্ধিলাভ করেছে কি করে বুঝলি ?' কাকার কণ্ঠ করুণতর হয়।

'এ আর বুঝছ না কাকা ? যারা সিদ্ধিলাভ করে তারা কি আমাদের মতো হবে ? তাহলে সিদ্ধপুরুষে আর আমাদের মতো কাঁচাপুরুষে তফাত কি ? আমরা সামনে দিয়ে হাঁটি, সিদ্ধপুরুষ হাঁটবেন পেছনের দিকে। সিদ্ধিলাভ করলে পেছনে হাঁটতেই হবে। সিদ্ধপুরুষদের চালচলনই আলাদা। সিদ্ধ-ঘোড়ারও।'

আমার ব্যাখ্যা শুনে কাকার চোখ বড় হয়। তিনি তখন জাঁকিয়ে বসেন বাহনের পিঠে—'যাক বাঁচা গেছে; সিদ্ধিলাভের ফাঁড়াটা ঘোড়ার ওপর দিয়েই গেছে। আমার হলে কি রক্ষা ছিল ? এই বপু নিয়ে এতো বয়সে পেছনে হাঁটতে হলেই তো গেছলাম ! অমন সিদ্ধি আমার পোষাত না বাপু !'

আমি আন্দাজী রামপুরহাটের দিক নির্ণয় করে নিয়ে সেই মুখো ঘোড়াটার পেছন ফেরাই। কাকাও ঘুরে বসেন। বলেন—দে, লেজটা তুলে দে আমার হাতে। ওর ল্যাজকেই লাগাম করব আজ। সিদ্ধপুরুষের আবার ল্যাজ কেন ?'

ল্যাজ হস্তগত করে অনুরোধ করেন কাকা—'এবার হাঁটো প্রভু !' অনেকটা গানের সুরের মতো করে। ভজন গানের মতন।

আশ্চর্য, বলা মাত্রই ঘোড়াটা চলতে শুরু করে। বেশ ধীর চতুষ্পদক্ষেপে। রাগ-হিংসা-ক্ষোভ-দুঃখ-চালাকি-চতুরতা, কোন কিছুর বালাই নেই ওর ব্যবহারে। শুধু সিদ্ধ নয়, এ সমস্তই সুসিদ্ধ হওয়ার লক্ষণ।

ঘোড়া চলতে থাকে। পেছন ফিরিয়ে সামনের দিকে, কিংবা মুখ ফিরিয়ে পেছনের দিকে। যেটাই বলো।

আমিও সাইকেল চালিয়ে যাই। ওর পেছন-পেছন কিংবা মুখোমুখি।

মন্টুর মাস্টার

বি. এ. পাস করে বসে আছে মিহির, কি করবে কিছুই স্থির নেই। এমন সময়ে দৈনিক আনন্দবাজারে একটা বিজ্ঞাপন দেখল কর্মখালির। কোনো বনেদী গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের জন্য একজন বি. এ. পাস গৃহশিক্ষক চাই—আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবেক, তাছাড়া বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা।

বিজ্ঞাপনটা পড়েই লাফিয়ে উঠল মিহির, এই রকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল সে···খাওয়া-থাকাটা অমনিই হবে, তাছাড়া ত্রিশ টাকা মাস-মাস—কিছু কিছু বাড়িতেও পাঠাতে পারবে, এম. এ.-টাও পড়া হবে সেই সঙ্গে, সিনেমা ফুটবল-ম্যাচ দেখার মতো পকেট-খরচারও অভাব হবে না।

একবার তার মনে হল এই বিজ্ঞাপনটা এর আগেও যেন দেখেছে সে—ওই আনন্দবাজারেই। হ্যাঁ, প্রায়ই সে দেখেছে। গত বছরও দেখেছিল, তখনই তার ইচ্ছা হয়েছিল একটা আবেদন করে দেয়, কিন্তু তখনো সে বি. এ. পাস করেনি। খুব সম্ভব ছেলেটি একটি গবাকান্ত—তাই বেতন ভারী দেখে কেউ এগোলেও ছেলে আবার তার চেয়ে ভারী দেখে পিছিয়ে পড়ে।

সে কিন্তু পেছোবে না, প্রাণপণে পড়াবে ছেলেটাকে—পড়াতে গিয়ে যদি পাগল হয়ে যেতে হয় তবুও। ত্রিশ টাকা কম টাকা নয়—তার জন্য গাধা পিটিয়ে মানুষ করা আর বেশি কথা কি, মানুষ পিটিয়েও গাধা বানানো যায়। ভদ্রলোক অতগুলো টাকা কি মাগনা দিচ্ছেন নাকি?

বিকেলেই মিহির সেই ঠিকানায় গেল। বি. এ.-র সার্টিফিকেটটা সঙ্গেই নিয়ে গেছল কিন্তু ভদ্রলোক তা দেখতেও চাইলেন না, কেবল মিহিরকে পর্যবেক্ষণ

করলেন আপাদমস্তক। মিহিরই যেন মিহিরের সার্টিফিকেট, মিহির খুশিই হল এতে।

অবশেষে ভদ্রলোক বললেন, তোমার জামাটা একবার খোলো তো বাপু?

মিহির ইতস্তত করে। জামা খুলতে হবে কেন? বুঝতে পারে না সে!

—আপত্তি আছে তোমার?

—না, না। মিহির জামাটা খুলে ফেলে। ত্রিশ টাকার জন্য জামা খোলা কেন, যদি জামাই হতে হয় তাতেও রাজি।

—তুমি এক্সারসাইজ কর?

—এক আধটু!

—বেশ বেশ। ভদ্রলোককে একটু চিন্তান্বিত দেখা যায়। মিহির ভাবে, এক্সারসাইজ করার অপরাধে চাকরিটা খোয়াল না তো? নাই বলতো কথাটা, কিন্তু কি করেই বা সে জানবে যে ভদ্রলোক এক্সারসাইজের উপর এমন চটা। কিন্তু এও তো ভারি আশ্চর্য, সে গ্রাজুয়েট কি না, কোন্ বছরে পাস করেছে এসবের কিছুই তিনি জিজ্ঞেস করছেন না।

—আর একটা কথা খালি জিজ্ঞাসা করব তোমায়।

মিহির পকেটের মধ্যে সার্টিফিকেটটা বাগিয়ে ধরে—এইবার বোধ হয় সেই প্রশ্নটা আসবে! আর সে উত্তর দিয়ে চমৎকৃত করে দেবে যে বি. এ.-তে সে ফার্স্ট ক্লাস উইথ ডিস্টিংশন পেয়েছে।

ভদ্রলোক মিহিরকে আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, তোমার শরীরটা নেহাত মন্দ নয়। ওজন কত তোমার!

ওজন? আকাশ থেকে পড়ে মিহির—অবশেষে কি না এই প্রশ্ন—তা প্রায় দু মনের কাছাকাছি!

—বেশ বেশ। কিছুদিন টিকতে পারবে তুমি, আশা হয়। কি বলিস মণ্টু, তোর এ মাস্টার মশাই কিছুদিন টিকে যাবে, কি মনে হয় তোর?

মিহিরের ছাত্র কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে সায় দিল—হ্যাঁ বাবা, এ মাস্টার মশায়ের গায়ে অনেক রক্ত আছে।

ভদ্রলোক অবশেষে তাঁর রায় প্রকাশ করলেন—কিছুদিন টেকা আশার কথা, বেশ কিছুদিন টেকাটাই হল আশঙ্কার। যাক, সবই শ্রীভগবানের হাত—

মণ্টু বাধা দিল—ভগবানের হাত নয় বাবা, শ্রী ছার—

—চুপ! কথার উপর কথা ক'স কেন? কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হল না তোর। হ্যাঁ, দেখ বাপু, পড়াশুনার সঙ্গে এটিকেটও একে শেখাতে হবে। পিতামাতা গুরুজনদের কথার উপর কথা বলা, অতিরিক্ত হাসা—এই সব মহৎ দোষ সারাতে হবে এর। বেশ, আজ থেকেই ভর্তি হলে তুমি। ত্রিশ টাকাই বেতন হল, মাসের পয়লা তারিখেই মাইনে পাবে, কিন্তু একটা শর্ত আছে। পুরো এক মাস না পড়ালে, এমন কি একদিন কম হলেও একটা টাকাও পাবে না তুমি। পাঁচ

দিন দশ দিন পড়িয়ে অনেক প্রাইভেট টিউটার ছেড়ে চলে গেছে, সে রকম হলে আমি বেতন দিতে পারি না, সে-কথা আমি আগেই বলে রাখছি—

মণ্টু বলল, একজন কেবল বাবা উনত্রিশ দিন পর্যন্ত ছিলেন—আরেকটা দিন যদি কোনো রকমে থাকতে পারতেন, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না।

—থাম। তা তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এসোগে। আজ সন্ধ্যা থেকেই ওকে পড়াবে। মণ্টু, যা, মাস্টার মশায়ের ঘরটা দেখিয়ে দে, আর ছোটু রামকে বলে দে বেতন-নিবারকে মাস্টার মশায়ের বিছানা পেড়ে দিতে।

আগাগোড়াই অদ্ভুত ঠেকছিল মিহিরের, কিন্তু ত্রিশ টাকা—এক সঙ্গে ত্রিশ টাকা মাসের পয়লা তারিখে পাওয়াটাও কম বিস্ময়ের নয়। চিরকাল মাস গেলে টাকা দিয়েই সে এসেছে—কলেজের টাকা, মেসের টাকা, খবরের কাগজওয়ালার টাকা ; এই প্রথম সে মাস গেলে নিজে টাকা পাবে। এই অনির্বচনীয় বিস্ময়ের প্রত্যাশায় ছোটখাট বিস্ময়গুলো সে গা থেকে ঝেড়ে ফেলল।

সন্ধ্যার আগেই সে জিনিসপত্র নিয়ে ফিরল। বেশ ঘরখানি দিয়েছে তাকে—ভারি পছন্দ হল তার। এমন সাজানো-গোছানো ঘরে এর আগে থাকেনি কখনো। একধারে একটা ড্রেসিং টেবিল—পুরনো হোক, বেশ পরিষ্কার। একটা ছোট বুককেসও আছে—তার বইগুলি সাজিয়ে রাখল তাতে। আর একধারে পড়াশুনার টেবিল, তার দু ধারে দুটো চেয়ার—বুঝল, এই ঘরেই পড়াতে হবে মণ্টুকে। সব চেয়ে সে চমৎকৃত হল নিজের বিছানাটা দেখে।

ঘরের একপাশে একখানা খাট, তাতেই তার শোবার বিছানা। চমৎকার গদি-দেওয়া, তার উপরে তোশক, তার উপরে ধবধব করছে সদ্য পাটভাঙা বোম্বাই চাদর। ভারি ভদ্রলোক এরা,—না, কেবল ভদ্র বললে এদের অপমান করা হয়. যথার্থই এরা মহৎ লোক।

সত্যিই খাটে শোবার কল্পনা তার ছিল না। জীবনে কখনো সে গদিমোড়া খাটে শোয়নি। আনন্দের আতিশয্যে সে তখনই একবার গড়িয়ে নিল বিছানায়। আঃ, কী নরম ! আজ খুব আরামে ঘুমানো যাবে—খেয়েদেয়ে সে তো এসেছেই, আজ আর কোনো কাজ নয়, এমন কি মণ্টুকে পড়ানোও না, আজ খালি ঘুম। তোফা একটা ঘুম বেলা আটটা পর্যন্ত।

মণ্টু এল বই-পত্র নিয়ে। মিহির প্রস্তাব করল, এসো, খাটে বসেই পড়াই।

—না সার, আমি ও-খাটে বসব না !

মিহির বিস্মিত হল, কেন ? এমন খাট !

—আপনি মাস্টার মশাই গুরুজন, আপনার বিছানায় কি পা ঠেকাতে আছে আমার ? বাবা বারণ করেছেন।

—ওঃ তাই ? তা হলে চল, চেয়ারেই বসিগে। ক্ষুণ্ণমনে সে চেয়ারে গিয়ে বসল—কিন্তু যাই বল, বেশ বিছানাটি তোমাদের। ভারী নরম। বেশ আরাম হবে ঘুমিয়ে।...দেখি তোমার বই। ...Beans !...বীন্‌স মানে জানো ?

মণ্টু ঘাড় নাড়ে। তার মানে সে জানে না।

—Beans মানে বরবটি। বরবটি এক রকম সব্জি—তরকারি হয়, আমরা খাই। Beans দিয়ে একটা সেনটেন্স কর দেখি। পারবে ?

মণ্টু ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ। তারপর অনেক ভেবে বলে—I had been there.

মিহির অত্যন্ত অবাক হয়—এ আবার কি! উঃ, এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো কেন সব মাস্টার পালিয়ে যায়। গবাকান্ত বলে গবাকান্ত। মরীয়া হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে তার মানে কি হল ?

মণ্টুও কম বিস্মিত হয় না—তার মানে তো খুব সোজা সার! আপনি বুঝতে পারছেন না ? সেখানে আমার বরবটি ছিল। আই হ্যাড বিন দেয়ার—আমার ছিল বরবটি সেখানে...সেইটাই ঘুরিয়ে ভাল বাংলায় হবে সেখানে আমার—

—থাম থাম, আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না তোমাকে। আই হ্যাড বিন দেয়ার মানে—আমি সেখানে ছিলাম।

মণ্টু আকাশ থেকে পড়ে—তবে যে আপনি বললেন বীন মানে বরবটি ? তাহলে আমি সেখানে বরবটি ছিলাম—বলুন।

মিহির সন্দেহ প্রকাশ করে—খুব সম্ভব তাই ছিলে তুমি। Bean আর Been কি এক জিনিস হল ? বানানের তফাত দেখছ না ? এ Been হল be ধাতুর form—

বাধা দিয়ে মণ্টু বলে, হ্যাঁ বুঝেছি সার, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ কিনা এ-Been হল মৌমাছির চেহারা। বি মানে মৌমাছি আর ফর্ম মানে চেহারা! আমি জানি।

বিস্ময়ে হতবাক্ মিহির শুধু বলে, জানো তুমি ?

—হ্যাঁ, আজ সকালেই জেনেছি। আপনি চলে যাবার পর বাবা বললেন, তোর নতুন মাস্টার মশায়ের বেশ ফর্ম। তখনই জেনে নিলাম।

মিহির কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে বললে, আমার চেহারা মৌমাছির মতো ? জানতাম না তো। কিন্তু সে-কথা যাক, যে Beans মানে বরবটি, তা দিয়ে সেনটেন্স হবে এই রকম—Peasants grow beans অর্থাৎ চাষীরা বরবটি উৎপন্ন করে, বরবটির চাষ করে। বরবটি ফলায়। বুঝলে এবার ?

মণ্টু ঘাড় নেড়ে জানায়, বুঝেছে।

—অতটা ঘাড় নেড়ো না, ভেঙে যেতে পারে। তোমার তো আর মৌমাছির চেহারা নয় আমার মতন। বেশ, বুঝেছ যদি, এই রকম আর একটা সেনটেন্স বানাও দেখি বীন্স দিয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে মণ্টুর মুখ নড়ে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বার হয় না। মিহির হতাশ হয়ে বলে, পারলে না ? এই ধর যেমন, Our cook cooks beans,

আমাদের ঠাকুর বরবটি রাঁধে। এখানে তুমি কুক কথাটার দু রকম ব্যবহার পাচ্ছ, একটা নাউন আরেকটা ভার্ব। আচ্ছা, আর একটা সেনটেন্স কর দেখি।

এতক্ষণে বীনস ব্যাপারটা বেশ বোধগম্য হয়ে এসেছে মণ্টুর। সে এবার চটপট জবাব দেয়—We are all human beans.

—অ্যাঁ? বল কি? আমরা সবাই মানুষ-বরবটি? বরবটি-মানুষ?

—কেন? বাবাকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে হিউম্যান বীনস।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মিহির। অর্থাৎ বসে তো সে ছিলই, মাথায় হাতটা দেয় কেবল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস এই ছেলেকেই পড়াতে হবে তাকে? ওঃ, এইজন্যই মাস্টররা টিকতে পারে না? কি করে টিকবে? পড়াতে আসা—কুস্তি করতে তো আসা নয়। রোজই যদি এ রকম ধস্তাধস্তি করে দুবেলা ওকে পড়াতে হয়, তাহলেই তো সে গেছে। তাহলে তাকেও পালাতে হবে টুইশানির মায়া ছেড়ে, ত্রিশ টাকার মায়া কাটিয়ে, নরম গদির আরাম ফেলে—

নাঃ, সে কিছুতেই পালাচ্ছে না। একজন ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত টিকেছিল, আর একদিন টিকতে পারলেই ত্রিশ টাকা পেত, কিন্তু একটা দিনের জন্য এক টাকাও পেল না। বোধ হয় তার কেবল পাগল হতেই বাকি ছিল—পাগল হয়ে যাবার ভয়ে পালিয়েছে। আর একটা দিন পড়াতে হলেই পাগল হয়ে যেত। কিংবা পাগল হয়েই সে পালিয়ে গেছে হয়তো, নইলে ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা কোনো সুস্থ মানুষ ছেড়ে যায় কখনো? কী সর্বনাশ! ভাবতেও তার হৃৎকম্প হয়।

সে কিন্তু চাকরিও ছাড়বে না, পাগলও হবে না, তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মণ্টু যা বলে বলুক—না পড়ে না পড়ুক—বোঝে বুঝুক, না বোঝে না বুঝুক—মণ্টুকে সে বই খুলে পড়িয়ে যাবে—এই মাত্র; ওকে নিয়ে মোটেই সে মাথা ঘামাবে না। আর মাথাই যদি না ঘামায় পাগল হবে কি করে? নির্বিকার-ভাবে সে পড়াবে—কোনো ভয় নেই তার।

তার গবেষণায় বাধা পড়ে, মণ্টু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে—বেতন-নিবারক বিছানা—এর ইংরেজী কি হবে সার?

—বেতন-নিবারক বিছানা আবার কি?

—সে একটা জিনিস। বলুন না ওর ইংরেজীটা জেনে রাখা দরকার।

—ও রকম কোনো জিনিস হতেই পারে না।

—হতে পারে না কি হয়ে রয়েছে। আপনি জানেন না তাহলে ওর ইংরেজী। সেই কথা বলুন।

ওর ইংরেজী হবে পে-সেভিং বেড (Pay-saving bed)।

মণ্টু সন্দেহ প্রকাশ করে—শেভিং মানে তো কামানো। ছোটুরাম

আমাদের চাকর, সে বেতন কামায়, বেতন-নিবারকে শোয় না তো সে। তাকে অনেক বার অনেক করে বলা হয়েছে কিন্তু কিছুতেই সে শোয় না। 'সেইজন্যই তো এ-চাকরটা টিকে গেল আমাদের। বাবা ভারি দুঃখ করেন তাই।

কী সব হেঁয়ালি বকছে ছেলেটা? মাথা খারাপ না কি এর? অ্যাঁ? যাক, ও সব ভাববে না সে। সে প্রতিজ্ঞাই করেছে—মোটেই মাথা ঘামাবে না এদের ব্যাপারে। একবার ঘামাতে আরম্ভ করলে তখন আর থামাতে পারবে না—নির্ঘাৎ পাগল হতে হবে। আজ আর পড়ানো নয়, অনেক পড়ানো গেল, কেবল মাথা কেন, সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে তার ধাক্কায়। আজ এই পর্যন্তই থাক। মন্টুকে সে বিদায় দিল। —যাও আঙ্কেের মতন তোমার ছুটি।

এইবার একটা তোফা নিদ্রা - নরম গদির বিছানায়। দু-দুবার বৌবাজার আর বাগবাজার করেছে আজ, অনেক হাঁটাচলা হয়েছে—ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। আজ রাত্রে সে খাবে না বলেই দিয়েছে—এক বন্ধুর বাড়িতেই খাওয়াটা সেরেছে বিকেলে। ব্যস, সুইচ অফ করে এখন শুলেই হয়।

নরম বিছানায় সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে আরামে মিহিরের চোখ বুজে এল—আঃ! নিদ্রার রাজ্যে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে সে, এমন সময়ে তার মনে হল সর্বাঙ্গে কে যেন এক হাজার ছুঁচ বিঁধিয়ে দিল এক সঙ্গে। আর্তনাদ করে মিহির লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। বাতি জেবলে দেখে, সর্বনাশ—সমস্ত বিছানায় কাতারে কাতারে ছারপোকা··ছারপোকা আর ছারপোকা! হাজারে হাজারে, লাখ-লাখ—গুনে শেষ করা যায় না। শুধুই ছারপোকা।

এতক্ষণে বেতন-নিবারক বিছানার মানে সে বুঝল, বুঝতে পারল কেন মাস্টাররা টেকে না। ও বাবাঃ! কেবল ছাত্রই নয়, ছারপোকাও আছে তার সাথে। ঘরে-বাইরে যুদ্ধ করে একটা লোক পারবে কেন? তবু যে ভদ্রলোক ঊনত্রিশ দিন যুঝেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না—ছেড়ে পালাতে হল যাঁকে তিনি একজন শহীদ পর্যায়ের সন্দেহ নেই। ত্রিশ টাকা মাইনের মাস্টার রেখে বেতন না দিয়েই ছেলে পড়ানো - নাঃ, ভদ্রলোক কেবল উদার আর মহৎ নন, বেশ রসিক লোকও বটেন তিনি! মায়া দয়া নেই একটুও, একেবারে অমায়িক।

ভীতি-বিহ্বল চোখে সে ছারপোকা-বাহিনীর দিকে তাকিয়ে রইল। গুনে শেষ করা যায় না—ওকি মেরে শেষ করা যাবে? আর সারা রাত ধরে যদি ছারপোকাই মারবে তো ঘুমোবে কখন? নাঃ, চেয়ারে বসেই আজ কাটাতে হল গোটা রাতটা!

আলো দেখা মাত্র ছারপোকাদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছল—দু-তিন মিনিটের মধ্যে তারা কোথায় আবার মিলিয়ে গেল। মিহির ভাবল—বাপ্‌স, এরা রীতিমতো শিক্ষিত দেখছি! যেমন কুচকাওয়াজ করে এসেছিল তেমনি কুচ-কাওয়াজ করে চলে গেল—আধুনিক যুদ্ধের কায়দা-কানুন সব এদের জানা

দেখা যাচ্ছে। কোথায় গেল ব্যাটারা?

সদ্য পাট-ভাঙা ধবধবে চাদরের এক কোণ তুলে দেখে তোশকের গদির খাঁজে খাঁজে থুক থুক করছে ছারপোকা—অন্যধারেও তাই। আর বেশি সে দেখল না, কি জানি এখন থেকেই যদি তার মাথা খারাপ হতে থাকে। চেয়ারে গিয়ে বসল, কিন্তু ভয়ে আলো নিবোল না—কি জানি যদি ব্যাটারা সেখানে এসেও তাকে আক্রমণ করে। বলা যায় নি কিছু…

পরদিন মণ্টুর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ ঘুম হয়েছিল রাত্রে?

—খাসা! অমন বিছানায় ঘুম হবে না, বলেন কি আপনি?

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে বললেন, বেশ বেশ, ঘুম হলেই ভাল। জীবনের বিলাসই হল গিয়ে ঘুম।

—আর ব্যাসন হল বেগুনি? না বাবা?

—তা তোমার ঘুমটা বোধ হয় বেশ জমাট? ঘুমিয়ে আয়েস পাও খুব?

—আজ্ঞে, সে-কথা আর বলবেন না। একবার আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাশের বাড়ি চলে গেছলাম কিন্তু মোটেই তা টের পাইনি।

—বল কি?

—আমাদের বাড়ি বর্ধমানে। শুনেছেন বোধ হয় সেখানে বেজায় মশা—মশারি না খাটিয়ে শোবার যো নেই। একদিন পাশের বাড়িতে খুব দরকারে ডেকেছিল আমাকে, কিন্তু ভুলে গেছলাম কথাটা। যখন শুতে যাচ্ছি তখন মনে পড়ল, কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে, অত রাত্রে কে যায়, আর দরজা-টরজা বন্ধ করে তারা শুয়ে পড়েছে ততক্ষণ। আমি করলাম কি, সেরাত্রে আর মশারি খাটালাম না! পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল মশাই, বলব কি, দেখি পাশের বাড়িতেই শুয়ে রয়েছি!

দারুণ বিস্মিত হলেন ভদ্রলোক—কি রকম?

—মশায় টেনে নিয়ে গেছে মশাই! সেইজন্যেই তো মশারি খাটাইনি। রাত-বিরেতে অনায়াসে পাশের বাড়ি যাবার ওইটেই সহজ উপায় কি না!

ভদ্রলোক বেজায় মুশড়ে পড়লেন যেন—মশাতেই যখন কিছু করতে পারেনি তখন কিসে আর কী করবে তোমার! তুমি দেখছি টিকেই গেলে এখানে।

মিহির বলল, আমার কিন্তু একটা নিবেদন আছে। কয়েকটা টাকা আমাকে দিতে হবে আগাম। ছারপোকার অর্ডার দেব।

—ছারপোকার অর্ডার! কেন? সে আবার কি হবে?

—ও, আপনি জানেন না বুঝি? ছারপোকার মতো এমন মস্তিষ্কের উপকারী মেমারি বাড়ানোর মহৌষধি আর নাই। বিলেতে ছারপোকার চাষ হয় এইজন্যে। গাধা ছেলে সব দেশেই আছে তো, তাদের কাজে লাগে।

একটু থেমে সে আবার বললে, আমার এক বন্ধু তো এই ব্যবসাতেই লেগে পড়েছে—রেলগাড়ির ফাঁকফোকর থেকে সব ছারপোকা সে টেনে বার করে নেয়।

সাগ্রহে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, কি রকম; কি রকম ? বিলেতে ছারপোকার চাষ হয় ? দাম দিয়ে কেনে লোকে ? আমদানি রপ্তানি হয় তুমি জানো ? আমি বেচতে পারি, হাজার হাজার; লাখ লাখ—যতো চাও।

—বেচুন না। আমিই কিনে নেব। আমার নিজের কাজে লাগবে। ছারপোকার রক্ত ব্রেনের ভারি উপকারী—একটা ছারপোকা ধরে নিয়ে এমনি করে মাথায় টিপে মারতে হয়, এই রকম হাজার হাজার লাখ ছারপোকার রক্তে এক ছটাক ব্রেন হয় ; সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন;—বি. এ. পাশের সময়ে আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। সারা বছর ফাঁকি দিয়েছি, ফেল না হয়ে আর যাই না। এমন সময়ে এক বিলেতি কাগজে ছারপোকার উপকারিতা পড়া গেল, অমনি সমস্ত বাসা খুঁজে যার বিছানায় যা ছারপোকা ছিল, সব সদ্ব্যবহার করলাম। পরীক্ষা দেবার তখন মাত্র তিন দিন বাকি। তারপর ফল যা পেলাম নিজের চোখেই দেখুন, আমার কাছেই আছে বি. এ. পাস করলাম উইথ ডিস্টিংশন—ফার্স্ট ক্লাস উইথ···

কাল থেকেই সে ব্যগ্র হয়ে ছিল,—এখন সুযোগ পেতেই সার্টিফিকেটখানা মণ্টুর বাবার মুখের সামনে মেলে ধরল। ভদ্রলোকের চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠল বিস্ময়ে—সত্যিই! একটা কথাও মিথ্যে নয়, Passed with Disitinction—লেখাই রয়েছে। বটে, এমন জিনিস ছারপোকা! কে জানতো গো!

পয়সা খরচ করে ছারপোকা কিনতে হবে না, তোমার বিছানাতেই রয়েছে—হাজার, হাজার লাখ লাখ, যত চাও। তোমার ভয়ানক ঘুম বলে জানতে পারনি।

এতক্ষণ কেন বলেননি আমায় ? অনেকখানি ব্রেন করে ফেলতাম। এ বেলা আমার নেমন্তন্ন আছে ভবানীপুরে; এখনই বেরোতে হবে নইলে এক্ষুনিই. যাক; —দুপুরে ফিরেই ওগুলোর সদ্ব্যবহার করব। তারপরে পড়াতে বসব মণ্টুকে।

মিহির চলে গেলে পিতাপুত্রে চাওয়াচাওয়ি হয়। অবশেষে মণ্টুর বাবা বললে, ছারপোকার সঙ্গে যে ব্রেনের সম্বন্ধ আছে, অনেক দিনই একথা মনে হয়েছে আমার। ছারপোকার ব্রেনটা একবার ভাব দিকি—অবাক হয়ে যাবি তুই। খুচ করে এসে কামড়েছে, তক্ষুনি উঠে দেশলাই জ্বাল, আর পাবি না তাকে, কোথায় যে পালিয়েছে, তার পাত্তা নেই। মানুষ যে দেশলাই আবিষ্কার করেছে, এ পর্যন্ত ওদের জানা। এটা কি কম ব্রেন ? আর এ ব্রেন তো ওদের ওই রক্তেই, কেন না মাথা তো নেই ওদের, গায়েই ওদের সব ব্রেন। ঠিক বলেছে মিহির।

তুই কী বলিস মণ্টু ?

—হ্যাঁ বাবা।

—তারপর ছারপোকার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধও কম নয়। ছারপোকা বিস্তারের সাথে সাথে শিক্ষার বিস্তার বাড়ে। ট্রামে বাসে সিনেমায় যেমন ছারপোকা বেড়েছে, তেমনি হু হু করে খবরের কাগজের কাটতিও বেড়ে গেছে। এই সেদিন বায়স্কোপে আমাদের সামনেই সাড়ে চার আনার সীটে একটা কুলী বসেছিল, তোর মনে পড়ে না মণ্টু ?

—হ্যাঁ—বাবা।

—সে তো লেখাপড়া কিছুই জানে না। দু মিনিট না বসতেই দু পয়সা খরচা করে একখানা আনন্দবাজার কিনে আনল সে। এতে শিক্ষার বিস্তার হলো না কি ? মণ্টু কি বলিস তুই ?

—হ্যাঁ বাবা।

চল তবে এক কাজ করিগে। তোর মাস্টার মশাই ফেরার আগে আমরাই ছারপোকাগুলোর সদ্ব্যবহার করে ফেলি। ব্রেন তো তোরও দরকার, আর আমারও—মেমারিটাও দিন দিন কেমন যেন কমে আসছে। সেদিন শ্যামবাবুকে মনে হল গোবর্ধনবাবু আর গোবর্ধনবাবুকে মনে হল হারাধনকান্ত ! এ তো ভাল কথা নয়রে মণ্টু। কি বলিস তুই ?

—হ্যাঁ বাবা।

সন্ধের পরে ফিরল মিহির। কাল সারা রাত ঘুম নেই, তার পর আজ সমস্ত দিন বন্ধুদের আড্ডায় তাস পিটে এতই ক্লান্ত হয়েছে যে ঘুমোতে পারলে বাঁচে। আজ সে আলো জ্বালিয়েই শোবে—আলো দেখে যদি না আসে ব্যাটারা। এখন 'নমো নমো' করে মণ্টুকে খানিকক্ষণ পড়ালেই ছুটি।

মণ্টু বই নিয়ে আসতেই গোটা ঘরটায় একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

—নতুন ধরনের এসেন্স-টেসেন্স মেখেছ না কি কিছু ? ভারি গন্ধ আসছে তোমার গা থেকে। মিহির জিজ্ঞাসা করল।

—গা নয় সার্, মাথার থেকে।

—কিসের গন্ধ ? বেজায় খোশবাই দিচ্ছে।

—ছারপোকার ! আপনি চলে যাবার পর বাবা আর আমি দুজনে মিলেই বেতন-নিবারকের'র যতো ছারপোকা ছিল সব শেষ করেছি ! ছোট্টুরামকেও বলা হয়েছিল কিন্তু সে-ব্যাটা মোটেই ব্রেন চায় না। বলে যে বিরেন সে কেয়া কাম ? আর একটাও ছাড়পোকা নেই আপনার বিছানায় ! হি-হি-হি !

—হ্যাঁ ? সিংহনাদ ক'রে মিহির চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে পড়ে সটান চিৎপটাং। মণ্টু তো হতভম্ব। দারুণ সেই চিৎকার শুনে মণ্টুর

বাবা ছুটে আসেন—কী হয়েছে রে, মণ্টু? কী হল?

—ছারপোকা নেই শুনে মাস্টারমশাই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

—তা তুই বলতে গেলি কেন? বারণ করলাম না তোকে? অতগুলি ছারপোকার রেনের শোক—

—আমি কী করে জানব যে উনি অমন করবেন। আমি কিছু বলিনি। উনি কী করে গন্ধ পেলেন উনিই জানেন। মুখে জল ছিটোলে জ্ঞান হয় শুনেছি, ছিটবো, বাবা?

অজ্ঞান অবস্থাতেই মিহিরের গলা থেকে বের হয়—উঁহু!

মণ্টুর বাবা বললেন—কাজ নেই। জ্ঞান হলে যদি কামড়ে দেয় রে? ঐ দ্যাখ বিড়বিড় করছে—

মিহির তার শোক সামলে উঠল পরদিন সাড়ে আটটায়। ষাঁড়ের মতন সারারাত এক নাগাড়ে নাক ডাকাবার পর।

শিরোনাম দেখেই বুঝতে পারছ, এটা ভীষণ অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। যথার্থই তাই, সত্যিই ভারি রোমাঞ্চকর ঘটনা—নিতান্তই একবার আমি এক ভয়ঙ্কর নরখাদকের পাল্লায় পড়েছিলাম।

আফ্রিকার জঙ্গলে কি কোনো অজ্ঞাত উপদ্বীপের উপকূলে নয়—এই বাংলাদেশের বুকেই, একদিন ট্রেনে যেতে যেতে। সেই অভাবনীয় সাক্ষাতের কথা স্মরণ করলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়।

বছর আটেক আগের কথা, সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছি—মামার বাড়ি যাচ্ছি বেড়াতে। রাণাঘাট পর্যন্ত যাব, তাই ফূর্তি করে যাবার মতলবে বাবার কাছে যা টাকা পেলাম তাই দিয়ে একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে ফেললাম। বহুকাল থেকেই লোভ ছিল ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে চাপবার, এতদিনে তার সুযোগ পাওয়া গেল। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—কথাটা প্রায় ভুলে গেছলাম। ভুলে

ভালই করেছিলাম বোধ করি, নইলে এই অদ্ভুত কাহিনী শোনার সুযোগ পেতে না তোমরা!

সমস্ত কামরাটায় একা আমি, ভাবলাম আর কেউ আসবে না তাহলে। বেশ আরামে যাওয়া যাবে একলা এই পথটুকু। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পূর্ব-মুহূর্তেই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে উঠলেন। একমাথা পাকা চুলই তাঁর বার্ধক্যের একমাত্র প্রমাণ, তা না হলে শরীরের বাঁধুনি, চলা-ফেরার উদ্যম, বেশ-বাসের ফিট্‌ফাট্‌ কায়দা থেকে ঠিক তাঁর বয়স কত অনুমান করা কঠিন।

গাড়িতে আমরা দুজন, বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও অল্পক্ষণেই আমাদের আলাপ জমে উঠল। ভদ্রলোক বেশ মিশুক, প্রথম কথা পাড়লেন তিনিই। এ-কথায় সে-কথায় আমরা দমদম এসে পেঁছিলাম। হঠাৎ একটা তারস্বর আমাদের কানে এল—'অজিত, এই অজিত, নেমে পড় চট্‌ করে। গাড়ি ছেড়ে দিল যে!'

সহসা ভদ্রলোকের সারা মুখ চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ত্বরিত দৃষ্টিতে সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা একবার তিনি দেখে নিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'নাঃ, সে-অজিতের কাছ দিয়েও যায় না!'

কিছু বুঝতে না পেরে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম। ভদ্রলোক বললেন—'অজিত নামটা শুনে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল আমার। কিন্তু নাঃ, এ-অজিত সে-অজিতের কড়ে আঙুলের যোগ্যও নয়—এমনি খাসা ছিল সে-অজিত! অমন মিষ্টি মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। শুনবে তুমি তুমি তার কথা?'

আমি ঘাড় নাড়তে তিনি বললেন—'গল্পের মাঝ পথে বাধা দিয়ো না কিন্তু। গল্প বলছি বটে, কিন্তু এর প্রত্যেকটা বর্ণ সত্য। শোনো তবে।—'

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে তিনি শুরু করলেন; বছর পঞ্চাশ কি তার বেশিই হবে, তখন উত্তর-বর্মায় যাওয়া খুব বিপদের ছিল। চারিধারে জঙ্গল আর পাহাড়। জঙ্গল কেটে তখন সবে নতুন রেললাইন খুলেছে সেই অঞ্চলে—অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাঝে মাঝে এমন ধ্বসে যেত যে গাড়ি-চলাচল বন্ধ হয়ে যেত একেবারে। তার ওপরে পাহাড়ে-ঝড়, অরণ্য-দাবানল হলে তো কথাই ছিল না। রেঙ্গুন থেকে সাহায্য এসে পেঁছিতে লাগত অনেকদিন—এর মধ্যে যাত্রীদের যে কি দুরবস্থা হতো তা কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে।

তখনকার উত্তর-বর্মা ছিল এখনকার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা, রীতিমত বরফ পড়ত—সময়ে সময়ে চারিধারে সাদা বরফের স্তূপ জমে যেত। এখন তো মগের মুলুকের প্রকৃতি অনেক নম্র হয়ে এসেছে, তার ব্যবহারও এখন ঢের ভদ্র। সেই সময়কার ব্রহ্মদেশের মেজাজ ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে!

সেই সময় একবার এক ভয়ানক বিপাকে আমি পড়েছিলাম—আমি এবং

আরো আঠারো জন। আমরা উত্তর-বর্মায় যাচ্ছিলাম—আমরা উনিশজনই ছিলাম সমস্ত গাড়ির যাত্রী। উনিশজনই বাঙালী। প্রথম রেললাইন খুলেছিল, কিন্তু দুর্ঘটনার ভয়ে সেখানকার অধিবাসীরা কেউ রেলগাড়ি চাপত না। ভয় ভাঙাবার জন্যে রেল কোম্পানি প্রথম প্রথম বিনা-টিকিটে গাড়ি চাপবার লোভ দেখাতেন। বিনা পয়সার লোভে নয় অ্যাডভেঞ্চারের লোভে রেঙ্গুনের উনিশ-জন বাঙালী আমরা তো বেরিয়ে পড়লাম।

সহযাত্রী মোটে এই কজন—কাজেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হতে দেরি হলো না। কোনখানে যে সেই ভয়াবহ পাহাড়ের ঝড় নামল, আমার ঠিক মনে পড়ে না এখন, তবে রেলপথের প্রায় প্রান্ত-সীমায় এসে পড়েছি। ওঃ সে কী ঝড়—সেই দুর্দান্ত ঝড় ঠেলে একটু একটু করে এগুচ্ছিল আমাদের গাড়ি—অবশেষে একেবারেই থেমে গেল। সামনের রেললাইন ছোট বড় পাথরের টুকরোয় ছেয়ে গেছে—সেই সব চাঙড় না সরিয়ে গাড়ি চালানোই অসম্ভব। অতএব পিছনো ছাড়া উপায় ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরে এক মাইল আমরা পিছোলাম। এত আস্তে গাড়ি চলছিল, চলছিল আর থামছিল যে মানুষ হেঁটে গেলে তার চেয়ে বেশি যায়। কিন্তু পিছিয়েই কি রেহাই আছে? একটু পরেই জানা গেল যে পেছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধ্বস্ নেমেছে। ঘণ্টাখানেক আগে যে রেলপথ কাঁপিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটেছে, এখন কোথাও তার চিহ্নই নেই।

অতএব আবার এগুতে হলো। যেখানে যেখানে পাথরের টুকরো জমেছে, আমরা সব নেমে লাইন পরিষ্কার করব ঠিক হলো। তা ছাড়া আর কি উপায় বলো? কিন্তু সেদিকেও ছিল অদৃষ্টের পরিহাস। কিছুদূর এগিয়েই ঝড়ের প্রবল ঝাপটায় ট্রেন ডিরেলড্ হয়ে গেল। লাইন থেকে পাথর তোলা আরেক কথা। পাঁচ দশজন মিলে অনেক ধরাধরি করলে এক-আধটা পাথরের চাঙড় যে না সরানো যায় তা নয়, কিন্তু সবাই মিলে বহুৎ ধস্তাধস্তি করলেও গাড়িকে লাইনে তোলা দূরে থাক এক ইঞ্চিও নড়ানো যায় না। এমন কি আমরা উনিশজন মিলেও যদি কোমর বেঁধে লাগি, তাহলেও তার একটা কামরাও লাইনে তুলতে পারব কিনা সন্দেহ! তারপরে ঐ লম্বা চওড়া ইঞ্জিন—ওকে তুলতে হলেই তো চক্ষুস্থির! ওটা কত মণ কে জানে। আমরা ইঞ্জিনের দিকে একবার দৃক্‌পাত করে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম।

পেছনের অবস্থা তো দেখেই আসা গেল, সামনেও যদি তাই ঘটে থাকে, তাহলেই তো চক্ষুস্থির! কেন না যেদিক থেকেই হোক, রেলপথ তৈরি করে সাহায্য এসে পোঁছতে ক'দিন লাগবে কে জানে। চারিধারে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল, একশো মাইলের ভেতরে মানুষের বাসভূমি আছে কিনা সন্দেহ! ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গের যা খাবার-দাবার তা তো এক নিঃশ্বাসেই নিঃশেষ হবে—তারপর? যদি আরো দু'-দিন এইভাবে থাকতে হয়? আরো দু-সপ্তাহ?

কিম্বা আরো দু-মাস ? ভাবতেও বুকের রক্ত জমে যায় ।

পরের কথা তো পরে—এখন কি করে রক্ষা পাই ? যে প্রলয়, গাড়ি সমেত উড়িয়ে না নিয়ে যায় তো বাঁচি ! মাঝে মাঝে যা এক-একটা ঝাপটা দিচ্ছিল, উড়িয়ে না নিক, গাড়িকে কাত কিম্বা চিতপাৎ করার পক্ষে তাই যথেষ্ট । নিজের নিজের রুচিমত দুর্গানাম, রামনাম কিম্বা ত্রৈলঙ্গস্বামীর নাম জপতে শুরু করলাম আমরা ।

সে-রাত তো কাটল কোনোরকমে, ঝড়ও থেমে গেল ভোরের দিকটায় । কিন্তু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে খিদেও জোর হয়ে উঠল । বর্মার হাওয়ায় খুব খিদে হয় শুনেছিলাম, প্রথম দিনেই সেটা টের পাওয়া গেল । খিদের বিশেষ অপরাধ ছিল না—যে হাওয়াটা কাল আমাদের ওপর দিয়ে গেছে ।

কিন্তু নাঃ, কারু টিফিন ক্যারিয়ারে কিছু নেই, যার যা ছিল কাল রাত্রেই চেটে-পুটে সাবাড় করেছে । কেবল অ্যালুমিনিয়াম প্লেটগুলো পড়ে রয়েছে, আমাদের উদরের মত শোচনীয় অবস্থা—একদম ফাঁকা । সমস্ত দিন যে কি অস্বস্তিতে কাটল কি বলব ! রাত্রে কষ্টকল্পিত নিদ্রার মধ্যে তবু কিছু শান্তির সন্ধান পাওয়া গেল—বড় বড় ভোজের স্বপ্ন দেখলাম ।

দ্বিতীয় দিন যা অবস্থা দাঁড়াল, তা আর কহতব্য নয় । সমস্ত সময় গল্প-গুজব করে, বাজে বকে, উচ্চাঙ্গের গবেষণার ভান করে, খিদের তাড়নাটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করলাম ! গোঁফে চাড়া দিয়ে খিদের চাড়াটা দমিয়ে দিতে চাইলাম,—তারপরে এল তৃতীয় দিন ।

সেদিন আর কথা বলারই উৎসাহ নেই কারো—রেলগাড়ির চারদিকে ঘুরে, আনাচ-কানাচ লক্ষ্য করে, অসম্ভব আহার্যের অস্তিত্ব পরিকল্পনায় সেদিনটা কাটল । চতুর্থ দিন আমাদের নড়া-চড়ার স্পৃহা পর্যন্ত লোপ পেল—সবাই এক-এক কোণে বসে দারুণভাবে মাথা ঘামাতে লাগলাম ।

তারপর পঞ্চম দিন । নাঃ, এবার প্রকাশ করতেই হবে কথাটা—আর চেপে রাখা চলে না । কাল সকাল থেকেই কথাটা আমাদের মনে উঁকি মারছিল, বিকেল নাগাদ কায়েম হয়ে বসেছিল—এখন প্রত্যেকের জিভের গোড়ায় এসে অপেক্ষা করছে সেই মারাত্মক কথাটা—বোমার মত এই ফাটল বলে । বিবর্ণ, রোগা, বিশ্রী বিশ্বনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বক্তৃতার কায়দায় শুরু করলেন—'সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ'—

কি কথা যে আসছে আমরা সকলেই তা অনুমান করতে পারলাম । উনিশ-জোড়া চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি এক মুহূর্তে যেন বদলে গেল, অপূর্ব সম্ভাবনার প্রত্যাশায় সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে নড়ে-চড়ে বসলাম ।

বিশ্বনাথবাবু বলে চললেন—'ভদ্রমহোদয়গণ, আর বিলম্ব করা চলে না । অহেতুক লজ্জা, সঙ্কোচ বা সৌজন্যের অবকাশ নেই । সময় খুব সংক্ষিপ্ত—আমাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি আজ বাকি সকলের খাদ্য জোগাবেন,

এখনই আমাদের তা স্থির করতে হবে।'

শৈলেশবাবু উঠে বললেন, 'আমি ভোলানাথবাবুকে মনোনীত করলাম।'

ভোলানাথবাবু বললেন, 'কিন্তু আমার পছন্দ অমৃতবাবুকেই।'

অমৃতবাবু উঠলেন—অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে তিনি লজ্জিত কি মর্মাহত বোঝা গেল না, নিজের সুস্পষ্ট দেহকেই আজ সবচেয়ে বড় শত্রু বলে তাঁর বিবেচনা হলো। আমতা আমতা করে তিনি বললেন, 'বিশ্বনাথবাবু আমাদের মধ্যে প্রবীণ এবং শ্রদ্ধেয়; তা ছাড়া তিনি একজন বড় বক্তাও বটেন। আমার মতে প্রাথমিক সম্মানটা তাঁকেই দেওয়া উচিত; অতএব তাঁর সপক্ষে আমি নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করছি।'

কমল দত্ত বললেন, 'যদি কারুর আপত্তি না থাকে তাহলে অমৃতবাবুর অভিলাষ গ্রাহ্য করা হবে।'

সুধাংশুবাবু আপত্তি করাতে অমৃতবাবুর পদত্যাগ অগ্রাহ্য হলো, এই একই কারণে ভোলানাথবাবুর রেজিগনেশনও গৃহীত হলো না।

শঙ্করবাবু বললেন, 'ভোলানাথবাবু এবং অমৃতবাবু—এঁদের মধ্যে কার আবেদন গ্রাহ্য করা হবে, অতঃপর ভোটের দ্বারা তা স্থির করা যাক।'

আমি এই সুযোগ গ্রহণ করলাম; "ভোটাভুটির ব্যাপারে একজন চেয়ারম্যান দরকার, নইলে ভোট গুনবে কে? অতএব আমি নিজেকে চেয়ারম্যান মনোনীত করলাম।"

ওদের মধ্যে আমিই ছিলাম দূরদর্শী, সাহায্য এসে না পৌঁছানো তক্ নিত্য-কার ভোটায়নের জন্যে চেয়ারম্যানকেই কষ্ট করে টিকে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত, এটা আমি সূত্রপাতেই বুঝতে পেরেছিলাম। অমৃতবাবুর দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকাতে; আমি সকলের বিনা অসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়ে গেলাম।

অতঃপর প্রভাসবাবু উঠে বললেন, 'আজকের দুপুরবেলার জন্যে দুজনের কাকে বেছে নেওয়া হবে; সেটা এবার সভাপতি মশাই ব্যালটের দ্বারা স্থির করুন।'

নান্দুবাবু বললেন, 'আমার মতে ভোলানাথবাবু নির্বাচনের গৌরব লাভের অযোগ্য। যদিও তিনি কচি এবং কাঁচা, কিন্তু সেই-সঙ্গে তিনি অত্যন্ত রোগা ও সিড়িঙ্গে। অমৃতবাবুর পরিধিকে অন্তত এই দুঃসময়ে, আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না।"

শৈলেশবাবু বললেন, 'অমৃতবাবুর মধ্যে কি আছে? কেবল মোটা হাড় আর ছিবড়ে। তাছাড়া পাকা মাংস আমার অপছন্দ, অত চর্বিও আমার ধাতে সয় না। সেই তুলনায় ভোলানাথবাবু হচ্ছেন ভালুকের কাছে পাঁঠা। ভালুকের ওজন বেশি হতে পারে—কিন্তু ভোজনের বেলায় পাঁঠাতেই আমাদের রুচি।'

নান্দুবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'অমৃতবাবুর রীতিমত মানহানি হয়েছে,

তাঁকে ভালুক বলা হয়েছে—অমৃতবাবুর ভয়ানক রেগে যাওয়া উচিত আর প্রতিবাদ করা উচিত—'

অমৃতবাবু বললেন, 'শৈলেশবাবু ঠিকই বলেছেন; এত বড় খাঁটি কথা কেউ বলেনি আমার সম্বন্ধে। আমি যথার্থই একটা ভালুক।'

অমৃতবাবুর মত কুটতার্কিক যে এত সহজে পরের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন, আশা করতে পারিনি। বুঝতে পারলাম, তাঁর আত্মগ্লানির মূলে রয়েছে struggle for existence। যাক, ব্যালট নেওয়া হলো। কেবল ভোলানাথবাবুর নিজের ছাড়া আর সকলের ভোট তাঁর সপক্ষে গেল। অমৃতবাবুর বেলাও তাই, একমাত্র অমৃতবাবু স্বয়ং নিজের বিপক্ষে ভোট দিলেন।

অগত্যা দুজনের নাম একসঙ্গে দুবার ব্যালটে দেওয়া হলো—আবার দু-জনেরই সমান সমান ভোট পেলেন। অর্ধেক লোক পরিপুষ্টতার পক্ষপাতী, বাকি অর্ধেকের মত হচ্ছে, 'যৌবনে দাও রাজটীকা'।

এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান সভাপতির ওপর নির্ভর করে। আমার ভোটটা অমৃতবাবুর তরফে দিয়ে অশোভন নির্বাচন-প্রতিযোগিতার অবসান করলাম। বাহুল্য; এতদিনের একাদশীর পর অমৃতে আমার বিশেষ অরুচি ছিল না।

ভোলানাথবাবু পরাজয়ে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ দেখা গেল; তাঁরা নতুন ব্যালট দাবি করে বসলেন। কিন্তু রান্নাবান্না যোগাড়ে জন্য মহা-সমারোহে সভাভঙ্গ হয়ে যাওয়ায়, ভোলানাথবাবুকে বাধ্য হয়ে স্থগিত রাখতে হলো। তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা নোটিশ দিয়ে রাখলেন, পরদিনের নির্বাচনে তাঁরা পুনরায় ভোলানাথবাবুর নাম তুলবেন। কালও যদি যোগ্যতম ব্যক্তির অগ্রাহ্য করা হয়, তাহলে তাঁরা সবাই একযোগে 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করবেন বলে শাসালেন।

কয়েক মুহূর্তেই কি পরিবর্তন। পাঁচদিন নিরাহারের পর চমৎকার ভোজের প্রত্যাশায় প্রত্যেকের জিভই তখন লালায়িত হয়ে উঠেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা যেমন আশ্চর্য রকম বদলে গেলাম—কিছুক্ষণ আগে আমরা ছিলাম আশাহীন; ভাষাহীন; খিদের তাড়নায় উন্মাদ-অর্ধমৃত; আর তখন আমাদের মনে আশা, চোখে দীপ্তি, অন্তরে এই কথাটা তুললে যদি চলে তো তুলবেন না, ভালবাসা—এমন প্রগাঢ় প্রেম, যা মানুষের প্রতি মানুষ কদাচই অনুভব করে! এমন একটা অপূর্ব পুলক, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! অর্ধ-মুমূর্ষুতা থেকে একেবারে নতুন জীবন! আমি শপথ করে বলতে পারি; তেমন অনির্বচনীয় অনুভূতির আস্বাদ জীবনে আমি পাইনি।

অমৃতকে আমি আন্তরিক পছন্দ করেছিলাম। সত্যিই ভাল লেগেছিল ওকে আমার। স্থূল মাংসল বপু, যদিও কিছু অতিরিক্ত রোমশ (শৈলেশবাবু ভালুক বলে বেশি ভুল করেননি), তবু ওঁকে দেখলেই চিত্ত আশ্বস্ত হয়, মন

কেমন খুশি হয়ে ওঠে। ভোলানাথও মন্দ নন অবশ্য ; যদিও একটু রোগা, তবু উঁচুদরের জিনিস তাতে সন্দেহ নেই। তবে পুষ্টিকারিতা এবং উপকারিতার দিক থেকে বিবেচনা করলে অমৃতর দাবি সর্বপ্রথম। অবশ্য ভোলানাথের উৎকৃষ্টতার সপক্ষেও অনেক-কিছু বলবার আছে, তা আমি অস্বীকার করবার চেষ্টা করব না। তবু মধ্যাহ্ন ভোজনের পাতায় পড়বার যোগ্যতা ওঁর ছিল না, বড়-জোর বিকেলের জলখাবার হিসেবে ওঁকে ধরা যেতে পারে।

দীর্ঘ উপবাসের পর প্রথম দিনের আহারটা একটু গুরুতরই হয়ে গেল। অমৃত এতটা গুরুপাক হবে আমরা ভাবিনি—বাইরে থাকতে যিনি আমাদের হৃদয়ে এতটা আবেগ সঞ্চার করেছিলেন, ভিতরে গিয়ে যথেষ্টই বেগ দিলেন। সমস্ত দিন আমরা অমৃতের ঢেঁকুর তুললাম। সকলেরই পেট (এবং সঙ্গে সঙ্গে মন) খারাপ থাকায়, পরদিন লঘু পথ্যের ব্যবস্থাই সঙ্গত স্থির হলো—অতএব কচি ও কাঁচা ভোলানাথবাবুকে জলযোগ করেই সেদিন আমরা নিরস্ত হলাম।

তারপর দিন আমরা অজিতকে নির্বাচিত করলাম। ওরকম সুস্বাদু কিছু আর কখনো আমরা খাইনি জীবনে। সত্যিই ভারী উপাদেয়, তার বউকে পরে চিঠি লিখে আমি সে-কথা জানিয়েছি। এক মুখে তার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না—চিরদিন ওকে আমার মনে থাকবে। দেখতেও যেমন সুশ্রী, তেমনি মার্জিত রুচি, তেমনি চারটে ভাষায় ওর দখল ছিল। বাংলা তো বলতে পারতই, তা ছাড়া ইংরাজি, হিন্দি এবং উড়েতেও অনর্গল তার খই ফুটত। হিন্দি একটু ভুলই বলত, তা বলুকগে, তেমনি এক-আধটুকু ফ্রেঞ্চ আর জার্মানও ওর জানা ছিল, তাতেই ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছল। ক্যারিকেচার করতেও জানত, সুর ভাঁজতেও পারত,—বেশ মজলিসী ওস্তাদ লোক এক কথায়, অমন সরেশ জিনিস আর কখনো ভদ্রলোকের পাতে পড়েনি। খুব বেশি ছিবড়েও ছিল না, খুব চর্বিও নয়, ওর ঝোলটাও ভারি খাসা হয়েছিল। এখনো যেন সে আমার জিভে লেগে রয়েছে।

তার পরদিন বিশ্বনাথবাবুকে আমরা আত্মসাৎ করলাম—বুড়োটা যেমন ভূতের মত কালো তেমনি ফাঁকিবাজ, কিচ্ছু তার গায়ে রাখেনি, যাকে বলে আমড়া-আঁটি আর চামড়া। পাতে বসেই আমি ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম, 'বন্ধুগণ, আপনাদের যা খুশি করতে পারেন, আবার নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমি হাত গুটোলাম।' শৈলেশবাবুও আমার পথে এলেন, বললেন—'আমারো ঐ মত। ততক্ষণ আমিও অপেক্ষা করব।'

অজিতকে সেবা করার পর থেকে আমাদের অন্তর যে আত্মপ্রসাদের ফল্গুধারা অগোচরে বইছিল, তাকে ক্ষুণ্ণ করতে কারোই ইচ্ছে ছিল না! কাজেই আবার ভোট নেওয়া শুরু হলো—এবার সৌভাগ্যক্রমে শৈলেশবাবুই নির্বাচিত হলেন। তাঁর এবং আমাদের উভয়েরই সৌভাগ্য বলতে হবে ; কেন না, কেবল রসিক লোক বলেই তাঁকে জানতাম, সরস লোক বলেও জানলাম তাঁকে। তোমাদের

বিশ্বকবির ভাষায় বলতে গেলে, তাঁর যে-পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেই নতুন পরিচয়ে তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ হলেন।

তারপর? তারপর—একে একে ব্যোমকেশ, নিরঞ্জন, কেদারনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ—গঙ্গাগোবিন্দর নির্বাচনে খুব গোলমাল হয়েছিল, কেন না ও ছিল যেমন রোগা তেমনি বেঁটে—তারপরে নিতাই থোকদার—থোকদারের এক পা ছিল কাঠের—সেটা থোক ক্ষতি, সুস্বাদুতার দিক থেকে সে মন্দ ছিল না; নেহাত—অবশেষে এক ব্যাটা ভ্যাগাবণ্ড, সঙ্গী হিসাবে সে মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না, খাদ্য হিসেবেও তাই। তবে রিলিফ এসে পেঁছবার আগে যে তাকে খতম করতে পারা গেছল এইটাই সুখের বিষয়। নিতান্তই একটা আপদ-চুকানো দায় আর কি!

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি ভদ্রলোকের কাহিনী শুনছিলাম; এতক্ষণে আমার বাক্যস্ফূর্তি হলো—'তাহলে রিলিফ এসেছিল শেষে?'

'হ্যাঁ, কবির ভাষায়, একদা সুপ্রভাতে; সুন্দর সূর্যালোকে; নির্বাচনও সদ্য শেষ হয়েছে, আর রিলিফ ট্রেনও এসে পেঁছেছিল, তা নইলে আজ আমাকে দেখবার সৌভাগ্য হত না তোমার।...এই যে বারাকপুর এসে পড়ল, এখানেই আমি নামব। বারাকপুরেই আমি থাকি গঙ্গার ধারে, যদি কখনো সুবিধে হয়, দু'একদিনের জন্যে বেড়াতে এসো আমার ওখানে। ভারী খুশি হব তাহলে। তোমাকে দেখে আমার কেমন বাৎসল্য-ভাব জাগছে। বেশ ভাল লাগল তোমাকে, এমন কি অজিতকে যতটা ভাল লেগেছিল, প্রায় ততখানিই, একথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। তুমিও খাসা ছেলে,—আচ্ছা আসি তাহলে।'

ভদ্রলোক বিদায় হলেন। এমন বিমূঢ়, বিভ্রান্ত আর বিপর্যস্ত আমি কখনো হইনি। বৃদ্ধ চলে যাবার পর আমার আত্মাপুরুষ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু-মধুর, চালচলন অত্যন্ত ভদ্র—কিন্তু হলে কি হবে, যখনই তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমার হাড়-পাঁজরা পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল! কি রকম যেন ক্ষুধিত দৃষ্টি তাঁর চোখে—বাবাঃ! তারপর তাঁর বিদায়-বাণীতে যখন জানালেন যে তাঁর মারাত্মক স্নেহ-দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এমন কি তাঁর মতে আমি অজিতের চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন নই,—তেমনি খাসা এবং বোধকরি তেমনি উপাদেয়—তখন আমার বুকের কাঁপুনি পর্যন্ত বন্ধ হবার মত হয়েছিল!

তিনি যাবার আগে মাত্র একটি প্রশ্ন তাঁকে করতে পেরেছিলাম—'শেষ পর্যন্ত আপনাকেও ওরা নির্বাচন করেছিল? আপনি তো সভাপতি ছিলেন; তবে কি করে এটা হলো?'

'শেষ পর্যন্ত আমিই বাকি ছিলাম কিনা! আগের দিন ভ্যাগাবণ্ডটার পালা গেছল। আমি একাই সমস্তটা ওকে সাবাড় করেছিলাম। বলব কি, পাহাড়ের হাওয়ায় যেমন আমার খিদে হতো, তেমনি হজম করবার ক্ষমতাও খুব বেড়ে গেছল। হতভাগা লোফারটা শেষপর্যন্ত টিকেই ছিল, তার কারণ অখদ্যে লোক

বলে তাকে খাদ্য করতে সবার আপত্তি ছিল। কিন্তু খাবার জিনিসে অত গোঁড়ামি নেই আমার—উদরের ব্যাপারে আমি খুব উদার। তাছাড়া এতদিনেও নির্বাচিত হবার সুযোগ না পেয়ে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মনোক্ষোভ জেগেছিল ওর; আমার কাছে আত্মমর্যাদা লাভ করে সে যে কৃতার্থ হয়েছে এতে আমার সন্দেহ নেই।

'হ্যাঁ, তুমি কি জানতে চাচ্ছিলে—কি করে আমার পালা হলো? পরদিন আবার নির্বাচনের সময় এল। কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায়, আমি যথারীতি নির্বাচিত হয়ে গেলাম বিনা বাধায়। তারপর কারু আপত্তি না থাকায়, আমি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ সেই সম্মানার্হ পদ পরিত্যাগ করলাম। আপত্তি করবার কেউ ছিলও না তখন। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল ট্রেনটা—দুরূহ কর্তব্যের দায় থেকে রেহাই পেলাম আমি—নিজেকে আর গলাধঃকরণ করতে হলো না আমায়!'

পরোপকারের বিপদ

আমার বন্ধু নিরঞ্জন ছোটবেলা থেকেই বিশ্বহিতৈষী—ইংরেজীতে যাকে বলে ফিলানথ্রপিস্ট্। এক সঙ্গে ইস্কুলে পড়তে ওর ফিলানথ্রপিজ্‌মের অনেক ধাক্কা আমাদের সইতে হয়েছে। নানা সুযোগে ও দুর্যোগে ও আমাদের হিত করবেই, একেবারে বদ্ধপরিকর—আমরাও কিছুতেই দেব না ওকে হিত করতে। অবশেষে অনেক ধস্তাধস্তি করে, অনেক কষ্টে, হয়ত ওর হিতৈষিতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছি।

হয়ত ফুটবল ম্যাচ্ জিতেছি, সামনে এক ঝুড়ি লেমনেড্, দারুণ তেষ্টাও এদিকে—ও কিন্তু কিছুতেই দেবে না জল খেতে, বলেছে; 'এত পরিশ্রমের পর জল খেলে হার্টফেল্ করবে।'

আমরা বলেছি, 'করে করুক, তোমার তাতে কি?'

'আহা, মারা যাবে যে!'

'জল না খেলেও যে মারা যাব, দেখছ না?'

সে গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়েছে—'সেও ভাল।'

তখন ইচ্ছে হয়েছে আরেকবার ম্যাচ্ খেলা শুরু করি—নিরঞ্জনকেই ফুটবল্ বানিয়ে। কিম্বা ওকে ক্রিকেটের বল ভেবে নিয়ে লেমনেডের বোতল-গুলোকে ব্যাটের মত ব্যবহার করা যাক।

পরের উপকার করবার বাতিকে নিজের উপকার করার সময় পেত না ও। নিজের উপকারের দিকটা দেখতেই পেত না বুঝি। এক দারুণ গ্রীষ্মের

শনিবারে হাফ-স্কুলের পর মাঠের ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছি, নিরঞ্জন বলে উঠল—'দেখছ, হিরণ্যাক্ষ, দেখতে পাচ্ছ ?'

কী আবার দেখব ? সামনে ধূধূ করছে মাঠ, একটা রাখাল গরু চরাচ্ছে, দু-একটা কাক-চিল এদিক ওদিকে উড়ছে হয়ত—এ ছাড়া আর কোনো দৃশ্য পৃথিবীতে দেখতে পেলাম না। ভাল করে আকাশটা লক্ষ্য করে নিয়ে বললাম—'হ্যাঁ দেখেছি, এক ফোঁটাও মেঘ নেই কোথ্থাও। শিগ্গির যে বৃষ্টি নাম্‌বে সে ভরসা করি না।'

'ধুত্তোর মেঘ! আমি কি মেঘ দেখতে বলেছি তোমায়? ঐ যে রাখালটা গরু চরাচ্ছে দেখছ না!'

'অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি, কি হয়েছে তাতে? গরুদের কোনো অপকার করছে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই! এই দুপুর রোদে ঘুরলে বেচারাদের মাথা ধরবে না? নয় গরু বলে মাথাই নয় ওদের! মানুষ নয় ওরা? বাড়ি নিয়ে যাক্ বলে আসি রাখালটাকে। সকাল-বিকেলে এক-আধটু হাওয়া খাওয়ালে কি হয় না? সেই হলো গে বেড়ানোর সময়—এই কাটফাটা রোদ্দুরে এখন এ কি ?'

কিন্তু রাখাল বাড়ি ফিরতে রাজি হয় না—গরুদের অপকার করতে সে বদ্ধপরিকর।

নিরঞ্জন হতাশ হয়ে ফিরে হা-হুতাশ করে—'দেখ্‌ছ হিরণ্যাক্ষ, ব্যাটা নিজেও হয়ত মারা যাবে এই গরমে, কিন্তু দুনিয়ার লোকগুলোই এই রকম! পরের অপকারের সুযোগ পেলে আর কিছু চায় না, পরের অপকারের জন্যে নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত!'

যখন শুনলাম সেই নিরঞ্জন বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত যাচ্ছে, তখন আমি রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। যাক্, এতদিনে তাহলে ও নিজেকে পর বিবেচনা করতে পেরেছে, তা না হলে নিজেকে ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত পাঠাচ্ছে কি করে? নিজেকে পর না ভাবতে পারলে নিজের প্রতি এতখানি পরোপকার করা কি নিরঞ্জনের পক্ষে সম্ভব ?

অকস্মাৎ একদিন নিরঞ্জন আমার বাড়ি এসে হাজির। বোধ হয় বিলেত যাবার আগে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিতেই বেরিয়েছিল। অভিমানভরে বললাম—'চুপি-চুপি বিয়েটা সারলে হে, একবার খবরও দিলে না বন্ধুদের? জানি, আমাদের ভালর জন্যই খবর দাওনি, অনেক কিছু ভালমন্দ খেয়ে পাছে কলেরা ধরে, সেই কারণেই কাউকে জানাওনি;—কিন্তু না হয় না-ই খেতাম আমরা, কেবল বিয়েটাই দেখতাম। বউ দেখলে কানা হয়ে যেতাম না ত!'

'কি যে বলো তুমি! বিয়েই হলো না ত বিয়ের নেমন্তন্ন! নিজের উপকার করব তুমি তাই ভেবেছ আমাকে? পাগল! ভাবছি তোত্‌লাদের

জন্যে একটা ইস্কুল খুলব। মূক-বধিরদের বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তোত্‌লাদের নেই। অথচ কি 'পসিবিলিটি'ই না আছে তোত্‌লাদের!'

'কি রকম?'—আমি অবাক হবার চেষ্টা করি।

'জানো? প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস্‌ আসলে কি ছিলেন? একজন তোত্‌লা মাত্র। মুখে মার্বেলের গুলি রাখার প্র্যাক্‌টিস করে করে তোত্‌লামি সরিয়ে ফেললেন। অবশেষে এত বড় বক্তা হলেন যে অমন বক্তা পৃথিবীতে আর কখনো হয়নি। সেটা মার্বেলের গুলির কল্যাণে কিম্বা তোতলা ছিলেন বলেই হলো, তা অবশ্য বল্‌তে পারিনা।'

'বোধহয় ওই দুটোর জন্যই'—আমি যোগ দিলাম।

নিরঞ্জন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল—'আমারো তাই মনে হয়। আমিও স্থির করেছি বাংলাদেশের তোত্‌লাদের সব ডিমস্থিনিস্‌ তৈরি করব। তোত্‌লা তো তারা আছেই, এখন দরকার শুধু মার্বেলের গুলির। তাহলেই ডিমস্থিনিস্‌ হবার আর বাকি কি রইল?'

আমি সভয়ে বললাম—'কিন্তু ডিমস্থিনিসের কি খুব প্রয়োজন আছে এদেশে?'

সে যেন জ্বলে উঠ্‌ল—'নেই আবার! বক্তার অভাবেই দেশের এত দুর্গতি, লোককে কাজে প্রেরণা দিতে বক্তা চাই আগে। শত সহস্র বক্তা চাই, তা না হলে এই ঘুমন্ত দেশ আর জাগে না। কেন, বক্তৃতা ভাল লাগে না তোমার?'

'থামলে ভারি ভাল লেগে যায় হঠাৎ, কিন্তু যখন চলতে থাকে তখন মনে হয় কালারাই পৃথিবীতে সুখী।'

আমার কথায় কান না দিয়ে নিরঞ্জন বলে চল্‌ল—'তাহলেই দ্যাখো, দেশের জন্যে চাই বক্তা, আর বক্তার জন্যে চাই তোত্‌লা। কেননা ডিমস্থিনিসের মতো বক্তা কেবল তোত্‌লাদের পক্ষেই হওয়া সম্ভব, যেহেতু ডিমস্থিনিস্‌ নিজে তোত্‌লা ছিলেন। অতএব ভেবে দ্যাখো, তোত্‌লারাই হলো আমাদের ভাবী আশাভরসা, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।'

যেমন করে ও আমার আস্তিন্‌ চেপে ধরল, তাতে বাধ্য হয়ে জামা বাঁচাতে আমাকে সায় দিতে হলো।

'তোত্‌লাদের একটা ইস্কুল খুলব, সবই ঠিক, বিস্তর তোত্‌লাকে রাজিও করিয়েছি, কেবল একটা পছন্দসই নামের অভাবে ইস্কুলটা খুলতে পারছি না। একটা নামকরণ করে দাও না তুমি। সেইজন্যেই এলাম।'

'কেন, নাম তো পড়েই আছে, 'নিঃস্বভারতী',—চমৎকার! ভারতী,—মানে, বাক্য, যাদের নিঃস্ব—কিনা, থেকেও নেই, তারাই হলো গিয়ে নিঃস্বভারতী।'

'উঁহু, ও নাম দেওয়া চল্‌বে না। কারণ রবি ঠাকুর ভাববেন

'বিশ্বভারতী' থেকেই নামটা চুরি করেছি।'

'তবে একটা ইংরিজি নাম দাও—Sanatorium for faltering Tongues (স্যানাটোরিয়াম্ ফর্ ফল্টারিং টাংস) – বেশ হবে।'

'কিন্তু বড় লম্বা হলো যে।'

'তাতো হলোই। যেদিন দেখবে, তোমার ছাত্ররা তাদের ইস্কুলের পুরো নামটা সটান্ উচ্চারণ করতে পারছে, কোথাও আট্‌কাচ্ছে না, সেদিনই বুঝবে তারা পাশ হয়ে গেছে। তখন তারা সেলাম ঠুকে বিদায় নিতে পারে। নাম-কে নাম; কোশ্চেন্ পেপার্-কে কোশ্চেন্ পেপার্।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এই নামটাই থাক্‌ল।'—বলে নিরঞ্জন আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সবেগে বেরিয়ে পড়ল, সম্ভবত সেই মুহূর্তেই তার ইস্কুল খোলার সুমতলবে।

মহাসমারোহে এবং মহা সোরগোল করে নিরঞ্জনের ইস্কুল চলছে। অনেকদিন এবং অনেকধার থেকেই খবরটা কানে আসছিল। মাঝে মাঝে অদম্য ইচ্ছেও হতো একবার দেখে আসি ওর ইস্কুলটা; কিন্তু সময় পাচ্ছিলাম না মোটেই। অবশেষে গত গুডফ্রাইডের ছুটিটা সামনে পেতেই ভাবলাম—নাঃ, এবার দেখতেই হবে ওর ইস্কুলটা। এ সুযোগ আর হাতছাড়া নয়। নিরঞ্জন ওদিকে দেশের এবং দশের উপকার করে মরছে, আর আমি ওর কাছে গিয়ে ওকে একটু উৎসাহ দেব, এইটুকু সময়ও হবে না আমার! ধিক্ আমাকে!

মার্বেলের গুলির কল্যাণে নিশ্চয়ই অনেকের তোত্‌লামি সেরেছে এতদিন। তাছাড়া আনুষঙ্গিক ভাবে আরো অনেক উপকার—যেমন দাঁত শক্ত, মুখের হাঁ বড়, ক্ষুধাবৃদ্ধি—এসবও হয়েছে। এবং ডিমস্থিনিস হবার পথেও অনেকটা এগিয়েছে ছাত্ররা।—অন্তত: 'ডিম' পর্যন্ত তো এগিয়েছেই, এবং যেরকম কসে তা দিচ্ছে নিরঞ্জন; তাতে 'স্থিনিসের'ও বেশি দেরি নেই—হয়ে এল বলে।

ঠিকানার কাছাকাছি পেঁছিতেই বিপর্যয় রকমের কলরব কানে এসে আঘাত করল; সেই কোলাহল অনুসরণ করে স্যানাটোরিয়াম্ ফর্ ফল্টারিং টাংস খুঁজে বের করা কঠিন হলো না। বিচিত্র স্বরসাধনার দ্বারা ইস্কুলটা প্রতিমুহূর্তেই যেন প্রমাণ করতে উদ্যত যে, ওটা মূক-বধিরদের বিদ্যালয় নয়—কিন্তু আমার মনে হলো, তাই হলেই ভাল ছিল বরং—ওদের কণ্ঠ লাঘব এবং আমাদের কানের আত্মরক্ষার পক্ষে।

আমাকে দেখেই কয়েকটি ছেলে ছুটে এল—'কা-কা-কা-কা-কা-কে চান?'

দ্বিতীয়টি তাকে বাধা দিয়ে বলতে গেল—'মা-মা-মা-মা—' কিন্তু মা-মার বেশি আর কিছুই তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

তখন প্রথম ছাত্রটি দ্বিতীয়ের বাক্যকে সম্পূর্ণ করল—'মাস্টার্ বা-বা-বা-বা—' আমি বললাম 'কাকাকে, মামাকে কি বাবাকে কাউকে আমি চাই না। নিরঞ্জন আছে?'

ছেলেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল। সে কি, নিরঞ্জনকে এরা চেনে না? এদের প্রতিষ্ঠাতা নিরঞ্জন, তাকেই চেনে না! কিম্বা যার যার নাম উচ্চারণ-সীমার বাইরে, তাকে না চেনাই এরা নিরাপদ মনে করেছে?

একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন ঐখান দিয়ে, মনে হলো এই ইস্কুলেরই ক্লার্ক, তাঁকে ডেকে নিরঞ্জনের খবর জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—'ও, মাস্টারবাবু?' এই পর্যন্ত তিনি বললেন, বাকিটা হাতের ইসারা দিয়ে জানালেন যে তিনি ওপরে আছেন। এই ভদ্রলোকও তোত্‌লা নাকি?

আমাকে দেখেই নিরঞ্জন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্‌ল—'এই যে অ-অনেক দিন পরে! খ-খবর ভাল?'

য়্যাঁ? নিরঞ্জনও তোত্‌লা হয়ে গেল নাকি? না, ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে? বললাম—'তা মন্দ কি! কিন্তু তোমার খবর তো ভাল মনে হচ্ছে না? তোত্‌লামি প্র্যাক্‌টিস্‌ করছ কবে থেকে?'

'প্যা-প্যা-পর্যাক্‌—প্র্যাক্‌টিস করব কে-কেন? তো-তো-তোত্‌লামি আবার কে-কেউ প্র্যাক্‌টিস্‌ করে?'

'তবে তোত্‌লামিতে প্রমোশন পেয়েছ বলো!'

'ভাই হি-হি-হিরন্না-ন্না-ন্না-ন্না-ন্না-ন্না'—বল্‌তে বল্‌তে নিরঞ্জনের দম আটকে যাবার যোগাড় হলো। আমি তাড়াতাড়ি বললাম—'হিরণ্যাক্ষ বল্‌তে যদি তোমার কষ্ট হয়, না হয় তুমি আমাকে হিরণ্যকশিপুই বোলো। 'কশিপু'র মধ্যে 'দ্বিতীয় ভাগ' নেই।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন বল্‌লে,—'ভাই হি-হিরণ্যকশিপু, আমার এই স্যানাটো-টো-টো-টো-টো'—

এবার ওর চোখ কপালে উঠল দেখে আমি ভয় খেয়ে গেলাম। ইস্কুলের লম্বা নামটা সংক্ষিপ্ত ও সহজ করার অভিপ্রায়ে বললাম—'হ্যাঁ, বুঝেছি, তোমার এই স্যানাটোজেন, তারপর?'

নিরঞ্জন রীতিমত চটে গেল—'স্যানাটোজেন? আমার ইস্কুল হো-হো-হলো গিয়ে স্যা-স্যানাটোজেন? স্যানাটোজেন তো এ-একটা ও-ও-ওষুধ!'

'আহা ধরেই নাও না কেন! তোমার ইস্কুলও তো একটা ওষুধ বিশেষ! তোত্‌লামি সারানোর একটা ওষুধ নয় কি?'

অতঃপর নিরঞ্জন খুশি হয়ে একটু হাসল। ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'তা, তোমার ছাত্ররা কদ্দুর ডিমস্থিনিস হলো?'

'ডি-ডিম হলো!'

'অর্ধেক যখন হয়েছে, তখন পুরো হতে আর বাকি কি!' আমি ওকে উৎসাহ দিলাম।

নিরঞ্জন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে—'আ-আর হবে না! মা-মা-মার্বেলই

ম্,খে রাখতে পা-পারে না তো কি-কি-কি-করে হবে ?'

'ম্,খে রাখতে পারে না ? কেন ?'

'স-স-সব গি-গিলে ফ্যালে !'

'গিলে ফ্যালে ? তাহলে আর তোত্,লামি সারবে কি করে, সত্যিই ত ! আ, তুমি নিজেরটা সারিয়ে ফেল, ব্,ঝলে ? রোগের গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়া দরকার, দেরি করা ভাল না !'

হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে নিরঞ্জন জবাব দেয়—'আ-আমার যে ডি-ডি-ডি-ডিস্,পেপ্,সিয়া আছে ! হ-হ-হজম্, কোর্,তে পা-পারবো কেন ?'

'ও, ডিস্,পেপ্,সিয়া থাকলে তোত্,লামি সারে না ব্,ঝি ?'

'তা-তা কেন ? আ-আমিও গি-গিলে ফেলি !'—আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ; নিরঞ্জন বল্,ল, 'আ-আমার কি আর পা-পা-পাথর হ-হজম করবার ব-ব-বয়েস আছে ?'

'তাইত ! ভারি ম্,শকিল ত ! তোমার চল্,ছে কি করে ? ছেলেরা বেতন দেয় ত নিয়ম মত ?'

'উ*হ্,—স-সব ফি-ফি-ফি্ যে ! অ-অনেক সা-সাধাসাধি করে আনতে হয়েছে !'

'তবে তোমার চলছে কি করে ?'

'কে-কেন ? মা-মা-মার্বে'ল বেচে ? এক একজন দ-দ-দশটা-বারোটা করে খায় রোজ ! ওগ্,লো ম্-ম্,খে রাখা ভা-ভা-ভা-ভারি শক্ত ।'

'বটে ? বিস্ময়ে অনেকক্ষণ আমি হতবাক্ হয়ে রইলাম; তারপর আমার ম্,খ দিয়ে কেবল বেরোলো—'ব-ব-বল কি !'

যেমনি না নিজের কণ্ঠস্বর কানে যাওয়া, অমনি আমার আত্মাপ্,র্,ষ কেঁপে উঠল ! য়্যাঁ, আমিও তোত্,লা হয়ে গেলাম নাকি ! নাঃ, আর একম্,হ্,র্ত'ও এই মারাত্মক জায়গায় নয় ! তিন লাফে সি*ড়ি টপ্,কে ঊর্ধ্ব'শ্বাসে বেরিয়ে পড়লাম সদর রাস্তায় ।

দেশবিদেশ বেড়াতে তোমরা সকলেই খুব ভালবাস। সব ছেলেই ভালবাসে। কিন্তু আমাদের শ্রীকান্তর ভ্রমণে আনন্দ নেই, তার কাছে ভ্রমণের মানেই হচ্ছে দেড় মণ।

তার মামা ভারি কৃপণ—কোথাও যেতে হলে গোটা বাড়িখানাই সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। কি জানি, বিদেশে কোনো জিনিসের দরকার পড়লে যদি সেটা আবার পয়সা খরচ করে কিনতে হয়! কিন্তু শ্রীকান্তর এদিকে প্রাণ যায়; সেই বিরাট লটবহর তাকেই বইতে হয় কি না! সে-সব মালপত্র গাড়িতে তুলতেও শ্রীকান্ত, গাড়ি থেকে নামতেও শ্রীকান্ত, স্টেশনে যে কুলি নামক একজাতীয় জীবের অস্তিত্ব আছে; একথা শ্রীকান্তকে দেখলে মামা একদম ভুলে যান।

কেবল কুলির কাজ করেই কি নিষ্কৃতি আছে? তাকে সারা রাস্তা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ির দরজায় পাহারা দিয়ে। কেন না মামার ধারণা; ওই ভাবে দরজার মুখে মাথা গলিয়ে খাড়া থাকলে সে কামরার দিকে কেউ আর এগোয় না! এবং যে-কামরার দিকে কেউ এগোয় সেদিকে কেবল একজন নয়, সেই স্টেশনের যত ভোম্বলদাস সবাই সেই কামরাটার দিকেই ঝুঁকে পড়ে—তা তার ভেতর জায়গা থাক বা না থাক। কিছু দূরে খালি কামরা থাকলেও সেদিকে তাদের যেন দৃষ্টি যায় না।

তার মামা আবার পারতপক্ষে মেল-গাড়িতে যান না, প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেলে। যা দু-চার পয়সা বাঁচে। সময়ের আর কি মূল্য আছে বল? দু-ঘণ্টা পরে পেঁছিলে যদি দুটো পয়সা বাঁচে, তারই দাম। প্যাসেঞ্জারে গাড়ির সব স্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়—দু-তিন মিনিট অন্তর স্টেশন—কাজেই একটুখানি বসতে না বসতে আবার গিয়ে দরজায় দাঁড়াতে হয়। রাত্রেও ছাড়ান নেই—কেন না

তখন যাতে কামরাতে স্থান বাহুল্য না কমে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা দরকার। তার মামা আয়েসি লোক, সারা রাত দিন গাড়িতেও বাড়ির মতো আরাম চান—তখন যদি অনাহূত কেউ এসে তাঁর জায়গা জুড়ে বসবার জন্য তাঁর ঘুম ভাঙাতে চায়, তাহলে যে কি দুর্ঘটনাই ঘটে তা শ্রীকান্ত ভেবে পায় না। কাজেই রিজার্ভ কামরার নোটিস বোর্ডের মতো তাকে গাড়ির দরজায় লটকে থাকতে হয়।

এই সব নানা কারণে ভ্রমণে শ্রীকান্তের সুখ নেই, শখও নেই। কিন্তু না চাইলেও অনেক জিনিস আপনি আসে। হাম হোক, কে আর চায়? কিন্তু হামেশাই তা হচ্ছে। ফেল হতে আর কোন্ ছেলের বাসনা, তবু কাউকে না কাউকে ফেল হতেই হয়।

যেমন আজ তাকে যেতে হচ্ছে। ছ্যাকরা গাড়ির ছাদে যা জিনিস ধরে তার চার গুণ চাপানো হয়েছে. গাড়ির মধ্যে শ্রীকান্ত, তার মামা এবং মামী, আর মামাতো বোন টেঁপি। কিন্তু তারই ফাঁকে গাড়ির ফোকরেও মালের কিছু কমতি নেই,—জলের কুঁজো, হ্যারিকেন লণ্ঠন, হ্যাতব্যাগ, ছাতা, পানের ডিবে, খাবারের চাঙ্গারি, টুকরো-টাকরা কত কি! কিন্তু এগুলোর জন্য শ্রীকান্তর ভাবনা নেই, কেন না এসব টেঁপির ভার—পানের ডিবে মামীমা সামলাবেন আর খাবারের চাঙ্গারি মামা। কিন্তু গাড়ির ছাদে বাক্স-তোরঙ্গ, বিছানার লাগেজ আর কাপড়-চোপড়ের বিপুলকায় হোল্ডঅল —ওসব এখন থেকেই যেন শ্রীকান্তের ঘাড়ে চেপে বসেছে।

শিয়ালদহ পৌঁছেই মামা সর্বাগ্রে নামলেন। নেমেই বললেন, ওগো হাতপাখাটা দাও তো! শ্রীকান্ত মোটঘাট সব নামা। ও বাপু কোচম্যান, তুমি একটু ধর, বুঝলে? আমি টিকিটগুলো কেটে আনি।

গাড়ি দাঁড়াতেই জনকতক কুলী এসে জুটেছিল, তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাল নামাতে গেল। মামা টিকিট কাটতে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু কুলীদের এই অযাচিত কর্মস্পৃহা দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। বাধা দিয়ে বললেন, কি, তোমরা মাল নামাবে না কি? আবদার তো কম নয়! কেন, আমাদের কি হাত পা নেই?

একজন কুলী শ্রীকান্তর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, ওই বাচ্চা ছেলে, ওকি সেকবে বাবু?

কেন সেকবে না শুনি? ওদের বয়সে আমরা লোহা হজম করেছি। শ্রীকান্ত, সব চটপট নাবিয়ে ফেল, ও ব্যাটাদের ছুঁতে দিসনে। যাও, যাও, এ কি রুটি সেকা? এখন থেকেই ওকে সব শেকতে হবে। তোমরা সব যাও।

বলে যেভাবে মাছি তাড়ায় সেইভাবে কুলীদের তাড়াবার একটা চেষ্টা

করলেন, কিন্তু তারা নড়ল না দেখে বললেন, দেখ বাপু মালে হাত দিও না, পয়সা পাবে না আগেই বলে দিচ্ছি।

এই কথা বলে টিকিট কিনতে চলে গেলেন। শ্রীকান্তর ইচ্ছা হল একবার বলে যে লোহা হজম করা যদিবা সম্ভব হয়, সেই লোহা বহন করা তত সহজ নয়। কিন্তু বলেই বা কি লাভ, সমালোচনা করলে তো লোহার ওজন কমবে না · এই ভেবে সে আস্তে আস্তে বাক্স-পেঁটরা, বাসনের ছালা, বিছানার লাগেজ, সুটকেস, মার জলের কুঁজোটি পর্যন্ত গাড়ি থেকে নামিয়ে প্ল্যাটফর্মের একাংশে স্তূপাকার করতে লাগল।

টিকিট কিনে মামা ছুটতে ছুটতে ফিরলেন —'বললেন, গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই রে, মোটে আট মিনিট বাকি। শ্রীকান্ত, এই সামান্য ক'টা জিনিস প্ল্যাটফর্মে নিতে তোর কবার লাগবে? বার তিনেক, বোধ হয়? বার তিনেক হলে ফি বারে দু মিনিট—মোট ছ মিনিট, বাড়তি থাকে আরো দু মিনিট, খুব গাড়ি ধরা যাবে। টেঁপি, তুই এখানে দাঁড়িয়ে মালপত্রগুলো আগলা, শেষবারে শ্রীকান্তর সঙ্গে আসবি। আমি আর তোর মা এগোলাম। একটা খালি দেখে কামরা দেখতে হবে তো। শ্রীকান্ত, তুই ট্রাংকটা মাথায় নে, তার উপরে ছোট সুটকেসটা চাপিয়ে দিচ্ছি, পারবি তো? বিছানার লাগেজটা বাঁ বগলে নে, আর ডান হাতে বড় সুটকেসটা। বাঁ হাতে লণ্ঠন দুটো ঝুলিয়ে নিস, তাহলেই হবে। দ্বিতীয় বার বাসন-কোসনের থলেটা আর তোর মামীর তোরঙ্গটা নিবি। দৌড়ে যাবি আর দৌড়ে আসবি—নইলে গাড়ি ফেল হয়ে যাবে, বুঝেছিস? আমি এগোই ততক্ষণ।'

তিনি তো এগোলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখেন শ্রীকান্তর দেখা নেই। তিনি আশা করেছিলেন যে শ্রীকান্ত তাঁর পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে, তাকে দেখতে না পেয়ে তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন। ফিরে এসে দেখেন, শ্রীকান্ত মালপত্রের বোঝা নিয়ে একেবারে যেন চিত্র পুত্তলিকা!

—'কি রে, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে? গাড়ি ফেল করবি না কি?'

—'কি করব আমি এগোতে পাচ্ছি না যে। বড্ড ভারি হয়েছে মামা। টেঁপিকে বললাম তুই পেছন থেকে ঠেলে ঠেলে দে, আমি চলতে থাকি, তা ও—'

—'বারে! বাবা আমায় এখানে জিনিস আগলাতে বলল না? আমি ওকে ঠেলতে ঠেলতে যাই আর এদিকে সব চুরি হয়ে যাক। তোমার আর কি, জিনিস কমে গেলে তোমাকে তো আর বইতে হবে না।'

মামা বললেন, 'তাই তো, ভারি মুশকিল হল দেখছি।'

একটা কুলী এবার সাহসভরে এগিয়ে এসে বলল, 'খোকাবাবু সেকুবে কেনো? সোব ফেলে ভেঙে চুরমার হোবে। আর ইদিকে টিরেনভি ছোড়ে দিবে।'

তাই তো! ভারি মুশকিল!

কুলী করলে তো নগদ লোকসান, এদিকে জিনিস ফেলে ভাগলেও ক্ষতি, দাঁড়ালেও সময় নেই—কিন্তু ভাববার আর সময় কই? কাজেই বাধ্য হয়ে

মামাকে দুটো কুলী করতে হল। আধঘণ্টা আগে বেরুলে এই অপব্যয়টা হত না। শ্রীকান্তই পাঁচ-ছবারে কম কম করে গাড়িতে মালগুলো তুলতে পারত। থাকগে. আর উপায় কি ?

অতঃপর একটা দেখবার মতো দৃশ্য হল। দুটো কুলী আগে আগে, তাদের মাথায় দুটো বড় বড় তোরঙ্গ। একজনের বগলে বিছানার লাগেজ, আরেক জনের বগলে বাসনের থলে। মামী নিয়েছেন জলে কুঁজো আর টেঁপি নিয়েছে পানের বাটা। মামার এক হাতে একটা ছোট হাতব্যাগ. অন্য হাতে তালপাখা – তারই ভারে মামা কাতর ; এতই ঘেমে উঠেছেন যে, ওরই ফাঁকে তালপাখার হাওয়া খেতে হচ্ছে তাঁকে।

সব শেষে চলেছে শ্রীকান্ত — একেবারে কুঁজো হয়ে। বাড়তি ট্রাঙ্কটা তারই ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। শোভাযাত্রাটা দেখবার মতো।

গাড়িতে উঠেই মামা লম্বা করে বিছানা পেতে ফেললেন। এতক্ষণ গুরুতর পরিশ্রম গেছে, সেজন্য যথেষ্ট বিশ্রাম দরকার। চলতি গাড়ির ফাঁকা হাওয়া গায়ে লাগতেই তিনি আরামে চক্ষু-বুজে বললেন, আঃ, এতক্ষণে দেহটা জুড়োল। গোটা গাড়িটা ভর্তি, কিন্তু এ কামরাটা খুব খালি পাওয়া গেছে ; কারু চোখে পড়েনি বোধ হয়।

বিচিত্র লটবহরে ওই ছোট কামরার প্রায় সমস্তটাই ভরে গেছল, তারই একধারে বসে শ্রীকান্ত তার পীড়িত ঘাড়ে শুশ্রূষা করছিল। তার অবস্থাটা বুঝে মামী বললেন 'বড্ড লেগেছে না কি রে ?'

অপ্রতিভ হয়ে শ্রীকান্ত ঘাড়ে হাত বুলানো বন্ধ করল— না, মামীমা।'

মামা বললেন, 'ওয়েট লিফটিং একটা ভালো একসারসাইজ। এতে ওর ঘাড় শক্ত হবে। সেটা দরকার। এর পরে ওর বৌ-এর বোঝা রয়েছে না ?'

বৌ-এর, না, বইয়ের — কিসের বোঝা বললেন মামা, বোঝা গেল না সঠিক।

মামী বললেন, 'তোমার যেমন। যাচ্ছি তো ক'দিনের জন্য. বিয়ের নেমন্তন্নে। এত মালপত্র নিয়ে বেরুনো কেন ? কী কাজে লাগবে এসব ?

মামা বললেন, যাকে রাখ সেই রাখে, কথাটা জান তো ? সব জিনিসই কাজে লাগে, কাজের সময় তখন পাওয়া না গেলেই মুশকিল।

মামী বললেন, 'মদনপুরে গাড়ি তো দাঁড়ায় মোটে এক মিনিট। বোধ হয় এক মিনিটও দাঁড়ায় না। তার মধ্যে কি এই লটবহর নিয়ে নামা যাবে ? দেখো, তখন কী ফ্যাসাদে পড় ! বাক্স-পেঁটরা সব গাড়িতেই থেকে যাবে দেখছি।'

মামা বললেন, 'কি জানো গিন্নী, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। কিচ্ছু ভেব না তুমি।'

মামার কথায় শ্রীকান্তর হৃৎকম্প হল, কেন না মদনপুর স্টেশন যেখানে এক মিনিট মাত্র গাড়ি থামে কিংবা তাও থামে না, সেখানে ভগবানের জায়গায়

নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই সে কল্পনা করতে পারল না। এই বিরাট এবং বিচিত্র লটবহর তাকেই গাড়ি থেকে নামাতে হবে। তাহলেই তো সে গেছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—শ্রীকান্তর সারা শরীর রি রি করে কাঁটা দিয়ে উঠল।

দমদমে গাড়ি দাঁড়াতেই জনকতক কৃষ্ণকায় ফিরিঙ্গী যুবক এসে সেই কামরায় উঠল। মামার এবং মালপত্রের বহর দেখে তারা একেবারে হতভম্ব। অবশেষে তাদের একজন ভাঙা বাংলায় মামাকে বলল, 'টোমরা এ গাড়িতে কেনো বাবু? এটা সাহেবডের জন্যে—দরজায় নোটিস দেখ নাই, 'For Europeans only.' টোমাডের নামিটে হবে।'

সবেমাত্র আয়েস করছেন, নামার কথায় মামার মাথা গরম হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'কেনো নামটে যাব? আমরাও তোমাদের মটই খাঁটি ইউরোপীয়ান আছি। চাহিয়া ডেখ টোমাডের ও আমাডের গায়ের রঙ একপ্রকার।'

—'অল রাইট। ডেখি তোমরা নামিবে কি না?' বলে তারা নেমে গেল এবং পরবর্তী স্টেশনে একজন রেল-কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে এল।

কর্মচারীটিও এসে নামতে অনুরোধ করলেন।

মামা বললেন, 'সমস্ত গাড়ি ভর্তি, কেবল এইটা খালি, কোথাও জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে আমরা এই কামরায় উঠেছি। অন্য কোথাও বা উঁচু ক্লাসে আমাদের জায়গা করে দিন, এখুনি আমরা নেমে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা দেখছি জায়গা' বলে কর্মচারীটি নেমে গেলেন, ফিরিঙ্গীরা গাড়িতেই রইল! শ্রীকান্তর ভয় হল পাছে কর্মচারীটি অন্য কোথাও জায়গা খুঁজে পান তাহলে তো এখুনি তাকে ভগবানের অবতার হয়ে আবার লটবহর বওয়া-বওয়ি করতে হবে।

কিন্তু কর্মচারীটি আর ফিরলেন না, গাড়িও ছেড়ে দিল। কেবল ফিরিঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে গজরাতে লাগল। মামা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু মামী বললেন, 'কাজ নেই বাপু, পরের স্টেশনে চল অন্য কামরায় যাই।'

—'হ্যাঁঃ, কোথাও খালি রয়েছে না কি?'

—'না থাকে, পরের গাড়িতে যাব না হয়।'

—'পাগল!'

—'সবই তো পরের গাড়ি মামীমা, কোনটা আমাদের নিজেদের গাড়ি?' বলল শ্রীকান্ত। আবার ওঠা নামার ঝক্কি বওয়ার দায় এড়াতে বলতে হল তাকে!

—যদি পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। সাহেবদের গাড়ি যে!' মামীমা কন।

—'হ্যাঁ, ধরলেই হল! তুমি চুপ করে থাক, ব্যাটারা বাংলা বোঝে—তুমি ঘাবড়ে গেছ জানলে আরো লাফাবে।'

অগত্যা মামী চুপ করলেন।

খানিক বাদেই ব্যারাকপুর এল। গাড়ি দাঁড়াতেই ফিরিঙ্গীগুলো একজন সাহেব কর্মচারীকে ডেকে আনল। তিনি এসে বললেন, 'বাবু টোমাডের নামিটে হইবে- যাহাদের সাহেবি ড্রেস, এ কেবল টাহাদিগের জন্য!'

মামা বললেন, 'তা একথা আগে বলনি কেন সাহেব? আমাডেরো সাহেব পোশাক আছে। আমাদের সময় দাও, আমরা এখুনি সাহেব বনে যাচ্ছি। ওগো ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও তো—'

অগত্যা সাহেব কর্মচারীটি চলে গেল। মামার সত্যিই কিছু সাহেবি পোশাক ছিল না, একটা চাল মারলেন মাত্র। এদিকে গাড়িও ব্যারাকপুর ছাড়ল।

অতঃপর ফিরিঙ্গীরা আর কোনো উপায় না দেখে এদের তাড়াবার ভার নিজেদের হাতে নিল। পরস্পর পরামর্শ করে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিল মামী দস্তুরমতো ঘাবড়ে গেলেন। মামারও যে একটু ভয় না হল এমন নয়। মামী বললেন, 'হ্যাঁ গা, কামড়ে দেবে না তো?'

মামা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বললেন, 'কি জানি!'

কামড়াবার কথা শুনে টেঁপি একেবারে বাবার বিরাট পরিধির পেছনে এসে আশ্রয় নিল!

মামা বললেন, 'ভালো ফন্দি মাথায় এসেছে। শ্রীকান্ত তুই কুকুর ডাকতে পারিস?'

—'বেড়ালের ডাক খুব ভালো পারি মামা। ডাকব? ম্যা—'

—'না, না, বেড়াল ডাকতে হবে না। মাঝে মাঝে তুই কুকুরের মতো ডাক দিখি!'

শ্রীকান্ত ডাকল—'ঘেউ ঘেউ।'

—'আর একটু জোরে।'

—'ঘেউ ঘেউ ঘেউউ।'

সহসা কুকুরের ডাক শুনে ফিরিঙ্গীরা সব চুপ। শ্রীকান্ত আবার ডাকল—'ঘেউ ঘেউ ঘেউ—'

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'ওরোকম ডাকছে কেনো সে? তার কি হোয়েছে?'

মামা গম্ভীরভাবে বললেন, 'ও কিছু নয় সাহেব। দশ-বারো দিন হল ওকে একটা পাগলা কুকুরে কামড়িয়েছে। Bitten by a mad dog—বুঝলে?'

ফিরিঙ্গীরা যেন লাফিয়ে উঠল।—অ্যাঁ? হাইড্রোফোবিয়া! একথা আগে বলো নাই কেন? ওটো কামড়াইটে পারে?

মামা বললেন, 'না না, কামড়াইবে না। সে ভয় নাই।'

বলতে বলতে নৈহাটি এসে পড়ল। ফিরিঙ্গীরা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ হুড়মুড় করে সেই কামরা থেকে পিটটান দিল।

'যাক, বাঁচা গেল' বলে মামা যেই মাত্র না স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন অমনি

আরেকজন ফিরিঙ্গী যুবক এসে সেই কামরায় উঠল। সে কোনো উচ্চবাচ্য না করে এককোণে গিয়ে বসল, মামাদের দিকে তাকালও না। মামা বললেন, 'দাঁড়াও। তোমাকেও ভাগাচ্ছি পরের স্টেশনে। শ্রীকান্ত, গাড়ি ছাড়লেই—বুঝেছিস?'

যুবকটি ডিটেকটিভ নভেল বের করে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল, হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে চমকে উঠে মামাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি? কি হয়েছে ওর?'

সাহেবের মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে মামা বাংলাতেই জবাব দিলেন—'ও কিছু না, জলাতঙ্ক—যাকে তোমরা হাইড্রোফোবিয়া বল!'

—'ওঃ! তাই না কি? ওতে ওর উপকার হবে।'

বলে ছোকরা আবার বইয়ে মন দিল। তার নিশ্চিন্ত নির্বিকার ভাব দেখে মামার পিত্তি জ্বলে গেল। তবু তিনি বললেন, 'তোমাকে সাবধান করা আমার কর্তব্য। কি জানি, যদি কামড়ে দেয়, বলা তো যায় না। তখন তোমাকেও ঐ রোগে—'

যুবকটি মৃদু হেসে বলল, 'আহা, না না! যে কুকুর ডাকে সে কি আর কামড়ায়?'

অগত্যা মামা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন এবং শ্রীকান্তও ডাক ছেড়ে দিল। তাকে কুকুর বলাতে সে মনে মনে এমনই চটেছিল যে, তার ইচ্ছা করছিল এখুনি গিয়ে ফিরঙ্গীটাকে কামড়ে দেয়।

কাঁচড়াপাড়ায় গাড়ি থামতেই যুবকটি মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখছিল। তার পরিচিত বন্ধুদের দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি শুরু করতেই সেই পুরাতন দল এসে উপস্থিত। তারা তাকে ঐ কামরায় দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নিরাপদে আছ তো? ওখানে যে মারাত্মক হাইড্রোফোবিয়া!'

—'সে আমি সারিয়ে দিয়েছি।'

—'সারিয়ে দিয়েছ কি রকম?'

তখন মামার চাল যুবকটি বন্ধুদের কাছে ফাঁস করে দিল—সে কামরায় ঢুকেই ছেলেটিকে জল খেতে দেখেছিল, জলাতঙ্ক রোগে যা কখনো সম্ভব নয়। তখন শ্রীকান্তর ভারি রাগ হল তার মামার উপর, জলাতঙ্ক রোগে জল খেতে নেই একথা কেন তাকে তিনি আগে বলেননি। তাইতো তাকে এমন অপদস্থ হতে হল! কুকুর না হবার অপমান সইতে হল এমন!

এইবার ফিরিঙ্গীরা আবার সেই কামরায় জাঁকিয়ে বসল এবং স্পষ্ট ভাষায় মামাকে জানাল যে এবার তাঁকে নামতেই হবে এবং এর পরের স্টেশনেই।

অসহায়ভাবে মামী বললেন, 'ওগো, কি হবে তাহলে?'

মামা বললেন, 'কিছু ভেব না গিন্নী ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।'

ভগবানের নাম শুনে শ্রীকান্তর নিজেকে মনে পড়ল এবং ঘাড়ের ব্যথাটা এতক্ষণে কতটা মরেছে জানবার জন্য সে একবার ঘাড়টাকে খেলিয়ে নিল।

পরের স্টেশন আসতেই মামা বললেন, এখানে তো হয় না, পরের জংশনে না হয় বদলানো যাবো। এখানে তো মিনিট খানেক যাত্রী গাড়ি থামে। এত মালপত্তর আমাদের!'

—'না, টা হইবে না, এইখানেই টোমাকে নামটে হইবে।'

তখন তারা সবাই মিলে মামার বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা, সুটকেস-এ হাত লাগাল।

—'ডেখি, টুমি কেমন না নাম।' এই বলে একজন বাসনের থলেটা নামিয়ে দিয়ে বলল—'Here you are আর এই নাও টোমার জলে পিচার!'

কুঁজোর জাত যাওয়ায় মামীমা হায় হায় করতে লাগলেন। ততক্ষণে দুজন মিলে ধরাধরির করে ভারি ট্রাঙ্কটা নামিয়ে ফেলেছে। মামা তখন বাঙ্কের উপরের আরো ভারি হোল্ডঅলটা ওদের দেখিয়ে দিলেন। একজন গিয়ে সেটা নামাল।

মামা বললেন, 'বেঞ্চির তলায় ঐ তোরঙ্গটা—ওই যে।'

একজন সেটা নামিয়ে বলল এই নাও, টোমার টুরঙ্গ।'

মামা সংশোধন করে দিলেন—তুরঙ্গ নয় তোরঙ্গ। সর্বশেষে বুদ্ধিমান যুবকটি ছোট হাতব্যাগটা মামাকে এগিয়ে বলল, 'গুডবাই, মিস্টার!'

মামা এতক্ষণ পুলকিত হয়ে ওদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই বাক্স বললেন, 'ইহাই মদনপুর—এইখানেই আমরা নামতাম। অতএব গুডবাই মিস্টারস এবং থ্যাঙ্কস্!'

শুঁড়ওয়ালা বাবা

বই-টই গুছিয়ে নিয়ে বেরুবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে দাদামশাই ডেকে বললেন—'আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। তোর শুঁড়-ওলা বাবা আসছেন, দুপুরে এসে পৌঁছবেন তার পেয়েচি। আজ আবার মেল ডে, আমার তো আপিস কামাই করা চলবে না। বাড়ি থাকবি তুই।'

ইস্কুলে যেতে হবে না জেনে মণ্টুর ফুর্তি হল, কিন্তু সে বেশ ভাবনায় পড়ে গেল। শুঁড়-ওলা বাবা আবার কি রকম বাবা?

সে ত প্রায় বছর দশেক হতে চলল তার বাবা স্বর্গে গেছেন সে শুনেছে, তার কিছুদিন পরে মা-ও তাঁর অনুসরণ করলেন। তখন থেকে মণ্টু মামার-বাড়িতেই মানুষ। এতদিন সে কোনো প্রকার বাবার সম্বন্ধেই কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য শোনেনি, তবে অকস্মাৎ এই শুঁড়-ওলা বাবার প্রাদুর্ভাব হলো কোত্থেকে আবার?

বই-টই রেখে দিয়ে মণ্টু বৈঠকখানায় গিয়ে বসল এবং মনে মনে বাবার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে লাগল।

বাবা তাহলে দু'রকম? এক শুঁড় আছে, আরেক রকম শুঁড় নেই। তবে সাধারণত বাবাদের শুঁড় থাকে না। যথা নীতু, নীলিম ও ঝনকুর বাবার

নেইকো। যে ক'টি বন্ধুর বাবার সঙ্গে তার চাক্ষুষ ঘটেছে তাঁদের কারুরই শুঁড় নেই।

মণ্টুর মতে বাবাদের শুঁড় না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বাবারা যেমন ছেলেদের গাধা হওয়া পছন্দ করেন না, বাবাদের হাতি হওয়াটাও তেমনি ছেলেদের রুচিতে বাধে! তবে মণ্টুর দুর্ভাগ্য, বেচারার বাবাই নেই। আর সব বন্ধুর কেমন বাবা আছে. তারা বাবার কাছ থেকে কত কি প্রাইজ পায়, তমু তো সেদিন একটা সাইকেল পেয়ে গেছে, কিন্তু বেচারা মণ্টু—।

যাক, সৌভাগ্য বলতে হবে যে এতদিন বাদে তবু মণ্টুর একজন বাবা আসছেন। তবে দুঃখের মধ্যে ঐ যা—শুঁড়! তার জন্যে আর কি করা যায়, নেই-মামার চেয়ে কাণা মামা যেমন ভালো, তেমনি একেবারে বাবা না থাকার চেয়ে শুঁড়-ওলা বাবাই বা মন্দ কি! তারপর কাল আবার মণ্টুর জন্মদিন—হয়ত তিনি কেবল শুঁড় নাড়তে নাড়তেই আসচেন না, কত কি উপহারও ঝাড়তে আসচেন।

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক মণ্টুদের বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নামলেন এবং সোজা ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করলেন—'এইটে ঘনশ্যামবাবুর বাড়ী না?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাঁকে বলগে সত্যপ্রিয়বাবু এসেচেন। আমি সকালে তার করেচি, পেয়ে থাকবেন বোধহয়।'

তবে ইনিই! মণ্টুও প্রায় এই আন্দাজ করেছিল। খুব মোটা বটে, তবে হাতির কাছাকাছি একেবারে নন। তাছাড়া, শুঁড় নেই। শুঁড় না থাকার জন্য মণ্টু যে ক্ষুব্ধ হলো তা নয়, বরং তাকে যেন একটু খুশিই দেখা গেল।

—'দাদামশাই আপিস গেছেন। আপনি বসুন।'

—'তুমিই বুঝি উৎপল? আমি তোমার গুরুজন। প্রণাম করো। মণ্টু ঈষৎ হতভম্ভ হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কাকে?'

—'কেন, আমাকে? আশ্চর্য হবার কি আছে? গুরুজনদের ভক্তি করতে শিখবে, তাঁদের কথা শুনবে। এসব শেখনি?'

মণ্টু হাত তুলে নমস্কার করল।

—'ও কি? ও কি প্রণাম হলো? দেখচি এখানে তোমার শিক্ষাদীক্ষা সুবিধা হয়নি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয়। যাক, ক্রমশঃ সব শিখবে। এখান থেকে গেলেই—'

—'আপনি কি আমাকে নিয়ে যাবেন এখান থেকে? কোথায়?'

—'কেন? দেশে। তোমার বাবার বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যেতেই ত আমি এসেচি।'

—'আপনি আমার বাবা যদি তবে আপনার শুঁড় কই ?'

—'শুঁড় ?'

—'হ্যাঁ। দাদামশাই যে বললেন যে মণ্টু তুই বাড়ি থাকিস, তোর শুঁড়-ওলা বাবা আজ আসবেন। কিন্তু আপনার শুঁড় নেইত! শুঁড় কোথায় ?'

—'হুঁ।'

'হুঁ' বলে ভদ্রলোক ভারী গম্ভীর হয়ে গেলেন, মণ্টুর সঙ্গে তারপর আর কোনো কথাই তাঁর হলো না! ঘাট হয়ে গেছে ভেবে মণ্টু ম্লান মুখে চুপ করে রইল। সে বইয়ে পড়েছিল বটে যে কাণাকে কাণা বলিয়ো না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না ইত্যাদি—পড়েছিল এবং মুখস্থ করেছিল, কিন্তু বইয়ের হুকুম কাজে না মানলে যে অঘটন ঘটবে তা সে ভাবেনি। যার পা নেই তাকে খোঁড়া বললে সে যেমন মনঃক্ষুণ্ণ হয়, এঁকে শুঁড় নেই বলাতে বোধহয় ইনি তেমনি বিচলিত হয়েছেন! অঙ্গহীনতার অনুযোগ না করাই মণ্টুর উচিত ছিল।

ঘনশ্যামবাবু অফিস থেকে ফিরলে অন্যান্য কথাবার্তার পর সত্যপ্রিয়বাবু বললেন—'দেখুন, উৎপলকে আমি নিয়ে যেতে চাই। দাদা-বৌদি নেই, কিন্তু আমি ত আছি। আমিই এখন ওর অভিভাবক।'

—'কেন, এখানে তো ও বেশ আছে। সেই অজ পাড়াগাঁয়ে—

—'তাহলে খুলেই বলি। এখানে ওর যথার্থ শিক্ষা হচ্ছে না।'

—'যথার্থ শিক্ষা বলতে কি বোঝায় ?'

—'অনেক কিছু। তা নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার পক্ষে বাতুলতা। তবে এখানে থেকে যথার্থ অশিক্ষা যে ওর হচ্ছে তাতে ভুল নেই।'

—'যথার্থ অশিক্ষা হচ্ছে ? কি রকম শুনি।'

—'আপনি বলেচেন আমি নাকি ওর শুঁড়-ওলা বাবা। উৎপল তাই বলছিল। এতদ্বারা ওকে মিথ্যাবাদিতা শেখানো হচ্চে। আমি তো ওর বাবা নই, তাছাড়া আমার শুঁড়ও নেই।'

—'এই কথা! তুমি ওর কাকা তো বটে! 'ব'-এ শুঁড় দিলেই 'ক' হয় এও বোঝো না বাপু!'

কিন্তু কিছুতেই সত্যপ্রিয়কে বোঝানো গেল না; পরদিন সকালেই মণ্টুকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। পথে যেতে যেতেই মণ্টুর যথার্থ শিক্ষা শুরু হয়ে গেল।

—'দেখ উৎপল! আজ আমি তোমাকে মাত্র তিনটি উপদেশ দেব। যদি মানুষ হতে চাও তাহলে আমার এই তিনটি উপদেশ তোমার মূলমন্ত্র হবে আর জীবনে সর্বদা মেনে চলবে! প্রথম হচ্ছে, সত্যনিষ্ঠ হবে, সত্যের জন্য যে ত্যাগ, যে কষ্ট, যে লাঞ্ছনাই স্বীকার করতে হোক না কেন, কখনো পিছুবে না। দ্বিতীয় উপদেশ এই, সব সময়ে নিয়মানুবর্তী হবে। নিয়ম না মানলে

শৃঙ্খলা থাকে না, তাতে করে সামাজিক ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটে। আমার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে এই—'

উপদেশগুলো মন্টুর কানে যাচ্ছিল কিনা বলা যায় না. কানে গেলেও তার মানে নিশ্চয় তার মাথায় ঢোকেনি। একটু আগে একটি ছেলে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় অকারণে, বোধহয় অকারণ পুলকেই, মাথায় চাঁটি মেরে গেছল, কাকার নিয়ম-নিষ্ঠা প্রচারের মাঝখানে তার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ সে খুঁজছিল। তৃতীয় উপদেশের সূত্রপাতেই, পথে চলতি ছেলেটি আবার যেমনি তার পাশে এসেছে অমনি সে তাকে ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করে ফেলল।

মণ্টু নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি অনুসারে সম্ভবত নিয়মরক্ষাই করেছিল, কিন্তু সত্যপ্রিয় উলটো বুঝলেন—'দ্যাখো, এইমাত্র তুমি পথে চলার নিয়মভঙ্গ করলে!'

—'ও যে আমাকে চাঁটি মারল আগে!'

—'আমি তা দেখেচি, কিন্তু ওকে ক্ষমা করাই তোমার উচিত ছিল নাকি? আমার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে, কখনো কাউকে আঘাত করবে না। কেউ যদি তোমার বাঁ গালে চড় মারে তাকে ডান গাল ফিরিয়ে দেবে।'

স্টেশনে গিয়ে সত্যপ্রিয় দারুণ ভাবনায় পড়লেন। মণ্টুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার কি টিকিট কিনব? হাফ না ফুল? একটু মুশকিল আছে দেখচি।

—'আমি তো হাফ্-টিকিটে যাই।'

—'বারো বছর পুরে গেলে পুরো ভাড়া দিতে হয়। আজ তোমার ঠিক বারো বছর পূর্ণ হবে। তবে হিসেব করে দেখলে ঠিক বারো বছরে পড়তে এখনো তোমার চার ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তের সেকেণ্ড বাকি। তারপর থেকেই তোমার ফুল টিকিটের বয়স হবে।'

—'তা কেন? আমাদের পাড়ার হাবলা দেখতে বেঁটে, কিন্তু তার বয়স সতের বছর। সে এখনো হাফ-টিকিটে যায়, তাকে কই ধরে না তো।'

—'এতক্ষণ কি বোঝালাম তোমাকে? সর্বদা সত্যনিষ্ঠ হবে—বাক্যে, চিন্তায় এবং আচরণে। কাজেই এখনো যখন তোমার বারো বছর পূর্ণ হয়নি, এখন ফুল টিকিট কেনা যেতে পারে না। কিন্তু গাড়িতে যেতে যেতে পূর্ণ হবে, সেইটাই ভাবনার কথা! আচ্ছা তখনকার কথা তখন দেখা যাবে।'

গাড়িতে উঠে সত্যপ্রিয় একদৃষ্টে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। মণ্টু জানালার ফাঁকে বাইরের পৃথিবীর পরিচয় দিতে লাগল।

কিন্তু যেই না চার ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তের সেকেণ্ড গত হওয়া, অমনি সত্যপ্রিয়বাবু তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে গাড়ির অ্যালার্ম সিগন্যালের শেকল ধরে

ঝুলে পড়লেন। ফল হলো ঠিক মন্ত্রের মত—ঝড়ের বেগে যে-গাড়ি ছুটছিল, গাংপালাদের ছোটাচ্ছিল, দু'ধারের দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যখানে অকস্মাৎ তা থেমে গেল। ট্রেনের গার্ড এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে শেকল টেনেছে ?'

সত্যপ্রিয় বুঝিয়ে বললেন 'দেখুন, এই ছেলেটির বারো বছর এইমাত্র পূর্ণ হলো। এর পর তো একে আর হাফ টিকিটে নিয়ে যেতে পারি না; কোন স্টেশনে থামলেই ভাল হোতো, কিন্তু মাঠের মাঝখানে যে বয়স পূর্ণ হবে তা কি করে জানব বলুন! অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে আমি অক্ষম, তা ছাড়া রেল কোম্পানীকে আমি ঠকাতে চাইনে। ওর হাফ-টিকিট আছে। এখান থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত আরেকটা হাফ-টিকিট আপনি দিন কিম্বা হাফ-টিকিটের ভাড়া নিয়ে রসিদ দিন।'

—'এই জন্য গাড়ি থামিয়েছেন ? আচ্ছা পরের স্টেশনে দেখা যাবে।'

—'তা দেখতে পারেন, কিন্তু ভাড়া এখান থেকে ধরতে হবে, পরের স্টেশন থেকে নিলে চলবে না।'

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই গার্ড সত্যপ্রিয়কে জানালেন যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েচে! তিনি আকাশ থেকে পড়ে বললেন—'কেন, গ্রেপ্তার কিসের জন্য ?'

—'দেখচেন না। অকারণে শেকল টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা! স্পষ্টই লেখা রয়েছে। দরজার মাথায় ওই!'

—'অকারণে তো টানিনি।'

—'সে কথা আদালতে বলবেন।'

সত্যপ্রিয় কিছুতেই গাড়ি থেকে নামবেন না, সত্যের মর্যাদা রাখবার জন্য যা করা দরকার, যা প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ ভদ্রলোকই করবে, তাই তিনি করেচেন। তিনি তো কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করেননি, কারণ—গুরুতর কারণ ছিল বলেই শেকল টেনেছেন। কাজেই তিনি গ্রেপ্তার হতে নারাজ, এটা বেশ ওজস্বিনী ভাষায় সবাইকে জানিয়ে দিলেন।

তিনি নামতে প্রস্তুত নন, অথচ তিনি না নামলে ট্রেনও ছাড়তে পারে না। অনর্থক ডিটেন্ড হতে হবে ভেবে সত্যপ্রিয়র সহযাত্রীরা গার্ডের সাহায্যে অগ্রসর হল। মাঠের মাঝখানে গাড়ি থামানোর জন্য তারা তখন থেকেই বিরক্ত হয়ে আছে। সকলে মিলে তাঁকে ধরে জোর করে নামাতে গেল। টানা টানিতে সত্যপ্রিয়র দামী সিল্কের অমন পাঞ্জাবীটা গেল ছিঁড়ে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেজাজও গেল বিগড়ে, তিনি ধাঁ করে একজন সহযাত্রীর নাকে ঘুসি মেরে বসলেন। তখন সকলে মিলে চাঁদা করে তাঁকে ইতস্ততঃ মারতে শুরু করে দিলে। কদাচ কাহাকেও আঘাত করিয়ো না—জীবনের এই মূলমন্ত্র তিনি ভুলে গেলেন। তবে, বাঁ গালে মার খাবার পর ডান গাল তিনি বাড়িয়ে

দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু সেটা বোধ হয় বাধ্য হয়ে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে, কেননা আক্রমণ থেকে এক গাল বাঁচাতে গিয়ে অন্য গাল বিপন্ন হচ্ছিল। অসুবিধা এই যে দুটো গাল এক সঙ্গে ফেরানো যায় না।

একা সত্যপ্রিয় কি করবেন? খানিকক্ষণ খণ্ডযুদ্ধের পরেই দেখা গেল যে একা তিনি সাত জনকে মারবার চেষ্টা করে কাউকেই বিশেষ মারতে পারেননি, কিন্তু সাত জনের মার তাঁকে হজম করতে হয়েছে। সকলে মিলে তাঁকে চ্যাংদোলা করে স্টেশনের একটা গুদাম ঘরে নিয়ে ফেলে তার বাহির থেকে দরজা লাগিয়ে দিল—সেই যতক্ষণ না থানার থেকে পুলিশ এসে তাঁর হেফাজত নেয়। মণ্টুও কাকার সঙ্গে স্বেচ্ছায় সেই ঘরে আটক রইল!

তারপর ট্রেন ছাড়ল। স্টেশন জুড়ে ব্যস্ত উত্তেজনা, বিরাট সোরগোল, সেই সব গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। ছোট্ট স্টেশনটা সত্যপ্রিয়র মত নির্জীব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। সেই বন্ধ ঘরের মধ্যে সত্যপ্রিয় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন। তাঁকে তখন আর চেনাই যায় না। সমস্ত মুখখানা ফুলে মস্ত হয়েচে, চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে, প্রকাণ্ড মুখে তাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না—হ্যাঁ, এতক্ষণে হাতির মাথার সঙ্গে তুলনা করা চলে। অচিরেই হয়ত শুঁড়ও বেরুতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে বলে মণ্টুর সন্দেহ হতে থাকে।

কাঞ্জিভেরম্ থেকে ঘুরে এসে আমাদের পাড়ার হরগোবিন্দ মজুমদার কেবলই তাল ঠুকতে লাগলেন—'বলং বলং যোগবলম্ ! বলযোগে কিছু হবে না, যদি কিছু হয় তো যোগবলে।'

আমাদের সন্দেহ হলো, ভদ্রলোক বোধহয় শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে গেছলেন এবং সেখান থেকে মাথা খারাপ করে রাঁচী না হয়েই বাড়ি ফিরেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কঞ্জিভেরমটা কোথায় দাদা ?'

'কঞ্জিভেরম্ কোথায় জানিসনে ? কোথাকার ভেড়া ! জিওগ্রাফি অপ্শনাল ছিল না বুঝি ? অ ! কঞ্জিভেরম্ হলো পণ্ডিচেরমের কাছাকাছিই।'

'পণ্ডিচেরম্ ! সে আবার কোথায় ?' বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই।

তিনি ততোধিক অবাক হন—'কেন ? আমাদের অরবিন্দর আস্তানা ! পণ্ডিচেরম্-এর বাংলা করলেই হবে পণ্ডিচারী। আসলে ওটা তেলেগু ভাষা কিনা !' একটু থেমে আবার বলেন, 'তেমনি কঞ্জিভেরমের বাংলা হোলো কঞ্চিভারী, মানে বাঁশের চেয়েও।'

'ওঃ, বোঝা গেছে ! পণ্ডিচারী না গিয়েই তুমি পিণ্ডচারী, মানে কিনা, পণ্ডশ্রম হয়েচে ? তাই বলো এতক্ষণ !'

'তোরা বুঝবিনে। এ সব বুঝতে হলে ভাগবৎ মাথা চাই রে, মানুষের মাথার কর্ম নয়। যোগবল দরকার।' তিনি হতাশভাবে মাথা নাড়েন।

আমি তার চেয়ে বেশি মাথা নাড়ি—'যা বলেছ দাদা ! আমাদেরই মুণ্ডপেরম, অর্থাৎ মুণ্ডুর, কিনা, কপালের গেরো।'

বাড়ির চিলেকোঠায় বসে দাদার যোগাভ্যাসের বহর চলে, পাড়ার চা খানায়

বসে আমরা তার আঁচ পাই ! একদিন খবর যা এল তা যেমন অদ্ভুত তেমনি অভূতপূর্ব। দাদা নাকি যোগবলে মাধ্যাকর্ষণকেও টেক্কা মেরেছেন— আসন-পিঁড়ি অবস্থায় নাকি আড়াই আঙুল মাটি ছাড়িয়ে উঠেছেন।

আমারা সন্দেহ প্রকাশ করি, এ কখনো হতে পারে ? উঁহু ! অসম্ভব !

কিন্তু সংবাদদাতা শপথ করে বলে (তার বিশ্বস্ত সূত্রকে টেনে ছেঁড়া যায় না) যে তার নিজের চোখে দেখা, দাদার তলা থেকে পিঁড়ি টেনে নেওয়া হলো কিন্তু দাদা যেমনকার তেমনি বসে থাকলেন যেখানকার সেখানে— যেন তথৈবচ !

আমি প্রশ্ন করি, 'চোখ বুজে বসে' ছিলেন কি ?'

উত্তর আসে—'আলবৎ ! যোগে যে চোখ বুজতে হয়।'

আমি বলি, 'তবেই হয়েছে ! চোখ বুজে ছিলেন বলেই পিঁড়ি সরাতে দেখতে পান নি, নইলে ধুপ করে' মাটিতে বসে পড়তেন।'

ভরত চাটুজ্যে যোগ দেয়—'নিশ্চয়ই ! হাত পা গুটিয়ে আকাশে বসে থাকা কি কম কষ্ট রে দাদা ! অমনি করে মাটিতে বসে থাকতেই হাতে পায়ে খিল ধরে যায় !'

তার পরদিন খবর এল, আজ আর আড়াই আঙুল নয় প্রায় ইঞ্চি আড়াই। তার পরদিন আধ হাত, তারপর ক্রমশঃ এক হাত, দেড় হাত, পৌনে দুই — অবশেষে যেদিন আড়াই হাতের খবর এল সেদিন আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না, পৃথিবীর নবম আশ্চর্য্য (কেননা, অষ্টম আশ্চর্য্য অনেকগুলো ইতিমধ্যে ঘোষিত হয়ে গেছে) হরগোবিন্দ মজুমদার-দর্শনে উর্দ্ধশ্বাস হলাম।

কিন্তু গিয়েই জানলাম তার একটু আগেই তিনি নেমে পড়েছেন। ভারি হতাশ হলাম। কি করব ? কান থাকলেই শোনা সম্ভব —কিন্তু দেখার আলাদা ভাগ্য থাকা চাই। ভূত, ভগবান, রাঁচীর পাগলা গারদ, বিলেত-জায়গা— এসব অনেক কিছুই আছে বলে' শোনা যায়, কিন্তু কেবল ভাগ্য থাকলেই দর্শন মেলে। আমার চক্ষু ভাগ্য নেই করব কি ?

'উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত', ইত্যাদি আবেদনে আড়াই হাত আত্মোন্নতির জন্য হরগোবিন্দকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করব কিনা এই কথা ভাবছি, এমন সময়ে দাদা আমার ইতস্ততঃ-চিন্তায় অকস্মাৎ বাধা দিলেন—'তোরা আর আমাকে হরগোবিন্দবাবু বলিসনে।'

'তবে কি বলব ?'

'হরগোবিন্দ মজুমদারও না।'

'তবে ?'

তিনি আরম্ভ করেন—'যেমন শ্রীভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র'

আমি যোগ করি— 'শ্রীমদ্ভাগবৎ, শ্রীহনুমান —'

'উঁহু, হনুমান বাদ। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—'

আমি থাকতে পারি না, বলে ফেলি—"শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্রীঅরবিন্দ ”

'হুঁ, এবার ঠিক বলেছিস। তেমনি আজ থেকে আমি, তোরা মনে করে রাখিস, আজ থেকে আমি শ্রীহরগোবিন্দ।'

আমি সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করি, সত্যি তাইত হবে ব্যাঙাচি বড় হয়ে ব্যাঙ্ হলে তার ল্যাজ নোটিশ না দিয়েই খসে যায়. তেমনি যে-মানুষ আড়াই হাত মাটি ছাড়িয়েছে সে তো আর সাধারণ মানুষ নয়, তারও ল্যাজামুড়ো যে বিনা বাক্যব্যয়ে লোপ পাবে সে আর আশ্চর্য কি!

আমি সবিনয়ে বলি 'এতটাই যখন ত্যাগস্বীকার করলেন দাদা, তখন নামের মধ্যে থেকে ওই বদ্‌খৎ গো-কথাটাও ছেঁটে দিন। ওতে ভারি ছন্দপাত হচ্ছে। নইলে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে শ্রীহরবিন্দ বেশ মিলে যায়।'

দাদাকে কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত দেখি—'ব্যাকরণে লুপ্ত অ-কার হয় জানি। কিন্তু গো-কার কি লুপ্ত হবার?' তাঁর বিচলিত দৃষ্টি আমার ওপর বিন্যস্ত হয়।

আমি জোর দিই—'একেবারে লুপ্ত না হোক ওকে গুপ্ত রাখাও যায় তো? চেষ্টা করলে না হয় কি!'

দাদা অমায়িক হাস্য করেন—'পাগল! যোগদৃষ্টি থাকলে দেখতে পেতিস যে গুরু-মাত্রের মধ্যেই গরু প্রচ্ছন্ন রয়েচেন, গরুর জন্যে যেমন শস্য, গুরুর জন্যে তেমনি শিষ্য—আদ্যক্ষরের ইতর-বিশেষ কেবল! আসলে উভয়েরই হলো গিয়ে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। সুতরাং গো-কথাটায় আপত্তি করবার এমন কি আছে?' তারপর দম নেবার জন্য একটু থামেন, 'তা ছাড়া গো-শব্দে নানার্থ! অভিধান খুলে দ্যাখ্।'

আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, উনি বাধা দেন—'এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোকে। তোর যখন ভাগবৎ মাথা নয়, তখন ও-মাথা আর ঘামাসনে। তুই বরং ভরতকে ততক্ষণ ডেকে আন। ওকে আমার দরকার।'

ভরতচন্দ্র আসতেই দাদা সুরু করেন—'বৎস, তোমার লেখা-টেখা আসে নাকি? এই রকম যেন কানে এসেছিল।'

'লিখি বটে এক-আধটু, সে-কিন্তু কিছু হয় না।'

'আরে সাহিত্য না হোক কথা-শিল্প তো হয়? তা হ'লেই হোলো। কথা-শিল্প আর কাঁথা-শিল্প এই দুটোই তো আমাদের জাতীয় সম্পদ, বলতে গেলে—আর কি আছে?' সহসা আত্ম-প্রসাদের ভারে দাদা কাতর হয়ে পড়েন, 'ভরত, তোমাকেই আমার বাহন করব, বুঝলে? তুমিই আমার মহিমা প্রচার করবে জগতে। কিন্তু দেখো শ্রীভ-কথিত যেন সাত খণ্ডের কম না হয়। (আমার দিকে দৃক্‌পাৎ ক'রে) তোদের কেনা চাই কিন্তু।'

আমি দাদাকে উৎসাহ দিই—'কিনব বইকি। আমরা না কিনলে কে কিনবে?'

দাদা কিন্তু খিঁচিয়ে ওঠেন—'কে কিনবে! দুনিয়া শুদ্ধু কিনবে! আর কেউ না কিনুক্ রোমা রোলাঁ কিনবে একখান!' (তারপর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) ওই লোকটাই কেবল চিনল আমাদের,—আর কেউ চিনল না রে!'

এমনি চলছিল,—এমন সময়ে দাদার যোগচর্চার মাঝখানে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটল। দাদা যোগবলে আড়াই হাত ওঠেন, পৌনে তিন হাত ওঠেন, তিন হাত ওঠেন, এমনি ক্রমশঃ চলে,—হঠাৎ একদিন আকস্মিক সিদ্ধিলাভ ক'রে একেবারে সাড়ে সাত হাত ঠেলে উঠেচেন! ফলে চিলকোঠার ছাদে দারুণভাবে মাথা ঠুকে গেছে দাদার! ঘরখানা, দুর্ভাগ্যক্রমে, সাড়ে পাঁচ হাতের বেশি উঁচু ছিল না।

কলিশনের আওয়াজ পেয়ে বাড়িশুদ্ধ লোক ওঘরে গিয়ে দ্যাখে, দাদা কড়িকাঠে লেগে রয়েছেন। মানে, মাথাটা সাঁটা, উনি অবলীলাক্রমে ঝুলছেন চোখ বোজা, গা এলানো; ওটা যোগ-সমাধি কি অজ্ঞান-অবস্থা, ঠিক বোঝা গেল না—দেখলে মনে হয়, যেন কড়িকাঠকে বালিশ ক'রে আকাশের ওপর আরাম করছেন।

ভাগবৎ মাথা বলেই রক্ষা, ছাতু হয়নি! অন্য কেউ হ'লে ঐ ধাক্কায় আপাদমস্তক চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে একাকার হয়ে যেত। যাই হোক দাদাকে তা ব'লে তো কড়িকাঠেই বরাবর রেখে দেওয়া যায় না,—কিন্তু নামানোই বা যায় কি করে?

বাড়িশুদ্ধ সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু কি করবে, ঘরের ছাদ সাধারণতঃ হাতের নাগালের মধ্যে নয়—বেশির ভাগ ছাদ এমনি বে-কায়দায় তৈরি! অবশেষে একজন বুদ্ধি দিল, দাদার পায়ে দড়ির ফাঁস্ লাগিয়ে, কূপ থেকে যেমন জলের বালতি তোলে, তেমনি ক'রে টেনে নামানো যাক। অগত্যা তাই হলো।

আমি যখন দাদার সান্নিধ্যে গেলাম,—যেমন শোনা তেমনি ছোটা, কিন্তু ততক্ষণ দাদার পঙ্কোদ্ধার হয়ে গেছে—তখন দাদার মাথা আর বাড়ির ছাদে নেই, নিতান্তই তুলোর বালিশে। হায় হায়, এমন চমকপ্রদ দৃশ্যটাও আমার চোখছাড়া হোলো, চক্ষুর অগোচরে একেবারেই মাঠে (মানে, কড়িকাঠে) মারা গেল—এমনি দুরদৃষ্ট! হায় হায়!

চারিদিকের সহানুভবদের বাঁচিয়ে, বিছানার একপাশে সন্তর্পণে বসলাম। মাথার জলপটিটা ভিজিয়ে নিয়ে দাদা বললেন—"ভায়া! এইজন্যই মুনি-ঋষিরা বাড়ি ঘর ছেড়ে, বনে-বাদাড়ে যোগসাধনা করতেন! কেননা ফাঁকা জায়গায় তো মাথার মার নেই। যত ইচ্ছে উঠে যাও,—গোলোক, ব্রহ্মলোক,

চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, বন্দরে খুশি চলে যাও, কোনো বাধা নেই—আকাশে একদম ফাঁকা। এই কথাই তো এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলুম ভরতচন্দ্রকে।"

ভরতচন্দ্র বাধিতভাবে ঘাড় নেড়ে নিজের বোধশক্তির পরিচয় দেন।

'আর এ কথাও বলি বাবা ভরতকে, যে কদাপি লেখার চর্চা ছেড়ো না। ওটাও খুব বড় সাধনা। কালি-কলম-মন লেখে তিন জন—এটা কি একটা কম যোগ হলো? আর যখন চাটুজ্যে হয়ে জন্মেছ তখন আশা আছে তোমার।'

আশান্বিত ভরত জিজ্ঞাসান্বিত হয়—'প্রভু, পরিষ্কার ক'রে বলুন! আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—'

প্রভু পরিষ্কার করেন—'চাটুজ্যে হলেই লেখক হতে হবে, যেমন বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে। আর লেখক হলেই নোবেল প্রাইজ।"

'কিন্তু আমার লেখা যে নোবেল প্রাইজওলাদের লেখার দু' হাজার মাইলের মধ্যে দিয়ে যায় না, গুরুদেব! তেমন লিখতে না পারি, তেমন-তেমন লেখা বুঝতে তো পারি।'

'পারো, সত্যি?' গুরুদেব যেন সহসা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠ সংযত ক'রে নেন—'বাংলাদেশে কারই বা যায়? আর বিবেচনা করে দেখলে, তাদের লেখাও তো তোমাদের লেখার দু' হাজার মাইলের মধ্যে আসে না। তবে?'

আমি ভয়ে ভয়ে বলি—'তফাৎটা অতখানিই বটে, কিন্তু আগিয়ে কে, আর পিছিয়ে কে, সেই হোলো গে সমস্যা।'

দাদা অভয় দেন—'বৎস ভরত, ঘাবড়ে যেয়োনা। তুমি, নারাণ ভটচাজ আর মেরী করেলী হ'লে এক গোত্র। পাবে, আলবৎ পাবে, নোবেল প্রাইজ পেতেই হবে তোমাকে। বিলেতে যাবার উদ্যোগ কর তুমি। আমি শুনেছি, এদেশ থেকে এক-আধ ছত্র লিখতে-জানা কেউ বিলেত গেছে কি অমনি তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে নোবেল প্রাইজ গছিয়ে দিয়েছে। প্রায় কালিঘাটে পাঁঠা বলি দেওয়ার মত আর কি!'

ভরতচন্দ্র উৎসাহ পায় কিনা তার মুখ দেখে ঠাহর হয় না। আমি কানে কানে বলি—'আরে নাই বা পেলে নোবেল প্রাইজ! এই সুযোগে বিলেত দেখতে পাবে, অনেক সাহেব-মেম দর্শন হবে, সেইটাই কি কম লাভ? বরং এই ফাঁকে এক কাজ করো, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-টক্তদের মধ্যে বিলেত যাবার নামে চাঁদার খাতা খুলে ফেল, বোকা ঠকিয়ে যা দু' পাঁচ টাকা আসে। তারপর নাই বা গেলে বিলেত! তোমার আঙুল দিয়ে জল গলে না জানি, নইলে এই আইডিয়াটা দেবার জন্য টাকার বখরা চাইতাম।'

ভরতের মুখ একটু উজ্জ্বল হয় এবার।

তার বিলেত যাবার দিনে জাহাজঘাটে সে কী ভীড়! নোবেল-তলার

যাত্রী দেখতে ছেলে বুড়ো সবাই যেন ভেঙে পড়েছে। চিড়িয়াখানায় শ্বেতহস্তী দেখতেও এ রকম ভীড় হয়নি কোনোদিন। স্বয়ং শ্রীহরগোবিন্দ যখন বলেছেন, তখন নোবেল প্রাইজ না হয়ে আর যায় না। যোগবাক্য কি মিথ্যে হবার? লেখার জোরে যদি না-ই হয়—যোগবল ত একটা আছে, কি না হয় তাতে? ভরতচন্দ্র জাহাজে উঠতে গিয়ে পুলকের আতিশয্যে এক কুকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়েন।

কিম্বা হয়ত কুকুরই তাঁর ঘাড়ে পড়েছিল, কেননা কুকুরের হয়ে কুকুরের মালিক মার্জনা চান—'I am sorry, Babu।'

ভরতচন্দ্র জবাব দেন—'But I am glad—very glad।' আমার হাত টিপে ফিস্ ফিস্ করেন—'দেখছিস, সাহেবের কুকুর এসে ঘাড়ে পড়েছে। সাদা চামড়ার লোক কামড়ে না দিয়ে আপ্যায়িত করেছে—এ কি কম কথা রে? নোবেলপ্রাইজ তো মেরেই দিয়েছি। কি বলিস?'

আমি আর কি বলব! হয়ত কিছু বলতে যাই এমন সময় অকুস্থলে শ্রীশ্রীহরগোবিন্দর অভ্যুদয় হয়।

আশীর্বাদের প্রত্যাশায় ভরতচন্দ্র ঘাড় হেঁট করেন। কিন্তু দাদার মুখ থেকে যা বেরোয়, তা ঠিক আশীর্বাণীর মত শোনায় না—

'বৎস, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে। নোবেলপ্রাইজ তোমার জন্যে নয়।'

শরতের আকাশে (কিম্বা ভারতের?) যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত! আমরা স্তম্ভিত, হতভম্ব, মুহ্যমান হয়ে পড়ি। এত আয়োজন, প্রয়োজন—সব পণ্ড তা'হলে?

'বৎস প্রথমে যোগবলে যা বলেছিলাম, তা ঠিক নয়। তাছাড়া সেদিন আমার ভাগবৎ মাথার অবস্থা ভালো ছিল না—ভাগবৎ যোগের সঙ্গে কড়িকাঠ যোগ ঘটেছিল কিনা! আজ সকালে আবার নতুন ক'রে যোগ করলাম, সেই যোগফলই তোমাকে জানাচ্ছি।'

ফুঁ দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিলে ঘরের চেহারা যেমন হয়, ভরতচন্দ্রের মুখখানা ঠিক তেমনি হয়ে গেল (উপমাটা বাজারে-চলতি চতুর্থ শ্রেণীর উপন্যাস থেকে চুরি করা—সেই মুখভাবের হুবহু বর্ণনা দেবার জন্যই, অবশ্য!)

হরগোবিন্দর বাণীবর্ষণ চলতে থাকে; "বৎস, সব যোগের চেয়ে বড় যোগ কি, জানো? রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, মনোযোগ, অর্ধোদয়যোগ সব যোগের সেরা হচ্ছে যোগাযোগ। এই যোগাযোগ ঘটলেই, তার চেয়েও বড়ো, বলতে গেলে শ্রেষ্ঠতম যে যোগের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, তা হচ্চে অর্থযোগ। এবং তা না ঘটলেই বুঝতে পারছ যাকে বলে অনর্থযোগ। রবীন্দ্রনাথের বেলা এই যোগাযোগ ছিল, তাই তাঁর নোবেলপ্রাইজ জুটেছে; তোমার বেলা তা নেই। কি ক'রে আমি এই

যোগফলে এলাম, তোমরাও তা কষে দেখতে পারো। রবীন্দ্রনাথ+পাকা দাড়ি+টাকার থলি=নোবেলপ্রাইজ। কিন্তু তোমার পাকা দাড়িও নেই, টাকাকড়িও নেই —বৎস ভরতচন্দ্র, সে যোগাযোগ তোমার কই?'

ভরতচন্দ্রের করুণ কণ্ঠ শোনা যায়—'কিছু টাকা আমিও যোগাড় করেছি। আর দাড়ির কথা যদি বলেন, না হয় আমি পরচুলার মত একটা পরদাড়ি লাগিয়ে নেব।'

শ্রীহরগোবিন্দ প্রস্তাবটা পর্যালোচনা করেন, কিন্তু পরক্ষণেই দারুণ সংশয়ে তাঁর মুখ-চোখ ছেয়ে যায়—'কিন্তু তারা যদি প্রাইজ দেবার আগে টেনে দ্যাখে, তখন?'

সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা আমার মনেও সাড়া তোলে। সত্যিই তো, তখন? ভরতচন্দ্রও বারবার শিউরে ওঠেন।

'নাঃ, সে কথাই নয়! ভরতচন্দ্র, তুমি মর্মাহত হয়ো না! যেমন half a loaf is better than no loaf, তেমনি half a বেল is better than নোবেল। তোমার জন্য আমি প্রাইজ এনেছে, তা নোবেলের চেয়ে বিশেষ কম যায় না। বিবেচনা ক'রে দেখলে অনেকাংশে ভালোই বরং। বৎস, এই নাও।'

বলে কাগজে-মোড়া একটা প্যাকেট ভরতচন্দ্রের হাতে দিয়ে, মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে ভিড়ের মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হন। আমরা প্যাকেট খুলতে থাকি, মোড়কের পর মোড়ক খুলেই চলি, কিন্তু মোড়া আর ফুরোয় না। অবশেষে আভ্যন্তরীণ বস্তুটি আত্মপ্রকাশ করে।

আর কিছু না, একটা কদ্‌বেল।

বিহার মন্ত্রীর সান্ধ্য বিহার

সেবার পুজোয় সেই বিহারেই যেতে হলো আবার।

ভূমিকম্পের পর থেকে বিহারের নাম করলেই আমার হৃৎকম্প হয়। আর্থকোয়েক আর হার্টফেল নোটিশ না দিয়েই এসে পড়ে, আর নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে কাজ সেরে চলে যায়।

তুমি হয়তো বলবে, ও-দুটোরই দরকার আছে! প্রাচীন বাড়ি-ঘর যেমন শহরের বুকে কদর্যতা, তেমনি সেকেলে শহর-টহর পৃথিবীর পিঠে আবর্জনা—ভূপৃষ্ঠ থেকে ওরা কি সহজে সরতো ভূমিকম্প না থাকলে? এতো আর এক-আধখানা পুরানো ইমারত নয় যে, মেরামত করে টরে বদলে ফেলবে? একে তো সারিয়ে সরানো যায় না, সরিয়ে সারাতে হয়—আর ভেঙ্গে গড়বার জন্য শহরকে-শহর সরিয়ে ফেলা কি চারটিখানি কথা?'

তারপর হার্টফেল—'হ্যাঁ—ওটাও সেকেলে লোকদের জন্যেই', তুমি বলবে। 'নিজের হৃদয়ের কাছে হেলাফেলা না পেলে বুড়ো মানুষরা কি মরতে চাইতো সহজে? আধমরা হয়েও আধাখ্যাঁচ্‌রা জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকতো'—বলবে তুমি।

তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু আমি যে নিজেকে যথেষ্ট সেকেলে মনে করতে পারছিনে, নতুবা বিহারে পা বাড়াতে আর কি আপত্তি ছিল আমার? হৃৎকম্প থেকে হৃৎঝম্প—একটার থেকে আরেকটার—কতখানি বা দূরত্ব?

বাধ্য : সেই বিহারেই যেতে হলো - বেড়াতে।

গেছলাম যেখানে, জায়গাটার নাম আর করব না, আমার পিশেমশাই সেখানে দারোগা আর হাসপাতালে ডাক্তার হচ্ছেন সাক্ষাৎ আমার মেসোমশাই।

দারোগার দোর্দণ্ড প্রতাপে যারা রোগা হয়ে পড়ে, অচিরাৎ ডাক্তারের কবলে তাদের আসতে হয় ; কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে তারা কোথায় যায়, ডাকঘরে খবর নিয়েও তার হদিশ মেলে না। অর্থাৎ তারা একেবারে সুদূরপরাহত হয়ে যায়। রোগী আর রোগ দু'জনকেই যুগপৎ আরোগ্য করার দিকে কেমন যেন একটা গোঁ আছে মেসোমশায়ের।

পই পই করে বলে দিয়েছিলেন মা—'মরে গেলেও ওষুধ খাসনে। হাজার অসুখ করলেও মেসোমশায়ের কাছে যাসনে।'

আর পিসেমশাই ? তাঁর কাছে গেছি কি, অমনি তিনি ছাতুখোর পাহারা-ওয়ালাদের দিয়ে আমাকে পিসে ফেলে আরেক প্রস্থ ছাতু বানিয়ে থানায় পুরে রাখবেন আমায় ; কিন্তু এসে দেখলাম, যতটা ভয় করা গেছল, ততটা না ; তেমন মারাত্মক কিছু না। মেসোমশায়ের তো মা:ার শরীর, রোগযন্ত্রণা রুগীর যদি বা সয়, ও'র আদপেই সহ্য হয় না, রোগের যাতনা লঘু করতে গিয়ে রুগীকেই লাঘব করে ফেলেন তিনি—আর পিসেমশাই ? সারা পৃথিবীটাই তাঁর কাছে মায়া! দুনিয়াটাই জেলখানা তাঁর কাছে। তাই দুনিয়াটাকেই জেলখানায় পুরতে পারলে তিনি বাঁচেন।

তবে আমার অন্তত ভয়ের কিছু ছিল না কোনো পক্ষ থেকেই। আমার প্রতি ভয়ানক অমায়িক ও'রা দু'জনেই। দু'-একদিনেই খুব ভাব জমে গেল আমাদের।

একদা পড়ন্ত বিকেলে হাসপাতালের ডাক্তারখানায় বসে মেসোমশায়ের সঙ্গে খোসু গল্প করছি, এমন সময় এক খোট্টাই-মার্কা রুগী আস্তে আস্তে এসে হাজির হোলো সেখানে। দেখলেই বোঝা যায়, দেহাতী লোক, যন্ত্রণাবিকৃত মুখ। এসেই বিরাট এক সেলাম ঠুকলো মেসোমশাইকে।

মেসোমশাই তাকে আমলই দিলেন না 'তোর মনে থাকবার কথা না তুই আর তখন কতটুকু! তবে তোর মাকে জিজ্ঞেস করিস। অনেকরকম খোস দেখেছি, সারিয়েছিও, কিন্তু সে কি খোস রে বাবা—!"

যে খোস-গল্পের সঙ্গে স্বয়ং আমি জড়িত, তা আমার ভালো লাগবার কথা নয়। আমি তেমন উৎসাহ দেখাই না ; কিন্তু মেসোমশাইকে উৎসাহ উৎসাহ দেখাতে হয় না।

"যেন আমাদের দেলখোস্। কত বৈদ্য-হাকিম হন্দ হয়ে গেল! কিন্তু সারিয়েছিল কে তোর সেই খোস-পাঁচড়া ? শুনি ? এই শর্মাই! সবে তখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি—তখনই! তুই মরিস খোসের জ্বালায়, আর আমরা মরি খোশবুর জ্বালায়—!"

'খোশবু কি মেসোমশাই ?' অনুসন্ধিৎসু হতে হয়, জেনারেল নলেজের পরিধি বাড়াবার প্রয়াস পাই।

'তোর সেই খোস্ পচে গিয়ে কী গন্ধই না বেরিয়েছিল, বাপ্সৃ! আমি যতই বোঝাই তোর মাকে যে আগে আম ডাঁসা থাকে, তারপর পাকে, তারপর পচে, তারপরে শুকোয়, তারপরেই তো হয় আমসি—তখনই হলো গিয়ে আমের আরাম! আমাশা সারাতেও সেই কথা। তোর মা ততই বলেন, 'ছেলেটাকে তুমিই সারলে সনাতন!' আরে বাপ্, বলো যে সারালে, তা না, সারলে। সারলে আর সারালে কি এক হোলো? দুটো কি এক ক্রিয়াপদ? আ-কারের তফাৎ নেই দুজনের?'

'তবে সারলো কিসে?' এবার আর নিজের খোস্গল্পে সাগ্রহে যোগ না দিয়ে পারি না।

'সারলো যেমন করে যাবতীয় ঘা সারে—যেমন করে ডাক্তারী-মতে সারিয়ে থাকি আমরা। খোস পচে হলো শোষ, শোষ থেকে হলো কার্বাঙ্কল—তারপরে সারলো, সহজেই সারলো, শুকিয়ে গিয়ে সেরে গেল শেষে। সারবেই, ও তো জানা কথা, কলেরা হলেই আমাশা সেরে যায়—সারছে না আমাশা—কলেরা করে দাও, তারপর তখন নুনজল দাও ঠেসে। হামেশাই এই করে সারাচ্ছি—আরে, চিকিচ্ছে কি চারটিখানি কথা? হয় এম্পার, নয় ওম্পার! ডাক্তারকে ধরে দুর্গা বলে ঝুলে পড়তে হয়।'

'তা বটে।'

'সারানোর পদ্ধতিই এই। বাতের কি কোনো চিকিচ্ছে আছে? মানে, সোজাসুজি চিকিচ্ছে? উঁহুঃ! কেবল পক্ষাঘাত হলেই বাত সারে। তারপর পক্ষাঘাতের ওষুধ হলোগে ম্যালেরিয়া। জ্বরের যা কাঁপুনি বাপু, সাতখানা কম্বল চাপা দিলেও বাগ মানে না, লাফিয়ে ওঠে রোগী! আর যাঁহাতক লাফানো, তাঁহাতক পক্ষাঘাত-সারা!'

'কিন্তু ম্যালেরিয়া থেকে গেল যে?'

'পাগল! জ্বর সারাতে কতক্ষণ? দুশো গ্রেন কুইনিন ঠেসে দাও, একদিনেই দুশো। তারপর আর দেখতে শুনতে হবে না—'

'কিন্তু ম্যালেরিয়া আবার সময়মত পাওয়া গেলে হয়!' আমি সন্দেহ প্রকাশ করি।

'আরে, ম্যালেরিয়ার আবার অভাব আছে এদেশে? এনোফিলিস্ তো চারধারেই কিল্‌বিল্ করছে। ডাক্তারের চেয়ে তাদের সংখ্যা কি কিছু কম, তুই ভেবেছিস? তবু যদি বেহারের এ-অঞ্চলে নিতান্তই না মেলে, পক্ষাঘাতের রুগীকে আমি চেঞ্জে পাঠিয়ে দিই বর্ধমানে! আমার কাত হয়ে থাকা কতো রুগী যে বাত সারিয়ে ফিরে এসেছে বর্ধমান থেকে! তবে—'

অকস্মাৎ থেমে যান মেসোমশাই। তারপর কতিপয় হ্রস্ব-নিঃশ্বাস ত্যাগ

করে বলেন—'কতক আর ফেরেনি রে! তাদের শেষটা নিউমোনিয়া ধরে গেল কিনা!'

'ও! নিউমোনিয়া হলে বুঝি আর সারে না মেসোমশাই?' আমার কৌতূহল হয়। 'না কি, টাইফয়েড হলে তবেই তা সারবার?'

মেসোমশাই নিরুত্তর।

'গোদ কিংবা গলগণ্ড হলে সারে বুঝি?'

মেসোমশাই মাথা নেড়ে বাধা দেন।

'তবে কি—তবে কি—সর্দিগর্মিই হওয়া চাই?'

'উঁহুঁ। হার্টফেল হলে তবেই সারে নিউমোনিয়া।' বলেই মেসোমশাই গম্ভীর হয়ে যান বেজায়।

'তাহলে তো মারাই গেল? গেল নাকি?' আমার সংশয় ব্যক্ত হয়।

'গেলই তো!' মেসোমশাই কোপান্বিত হন—'যাবেই তো! যত সব আনাড়িকেন্ট বর্ধমানের! কেন যে রুগীদের নিউমোনিয়া হতে দ্যায় ভেবেই পাই না। সারানো না যাক, নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক ছিল তো!'

'ছিলো! প্রতিষেধক থাকতে বেচারা বেতো-রুগীরা মারা গেল অমন বেঘোরে? বলেন কি মেসোমশাই?' আমি প্রায় লাফিয়ে উঠি। 'ছিলো প্রতিষেধক?'

'ছিলোই তো! ম্যালেরিয়া থেকে কালাজ্বর করে দিতে পারতো! কালাজ্বরের তো ভালো চিকিচ্ছেই রয়েছে। ইউরিয়া স্টিবামাইন! আমাদের উপেন ব্রহ্মচারীর বের করা! নেহাৎপক্ষে যক্ষ্মা তো ছিল—যক্ষ্মা হলে আর নিউমোনিয়া হয় না। হাতি যেখান দিয়ে যায়, ইঁদুর কি সে-ধার মাড়ায় রে? ঘোড়া যেখানে ঘাস খায়, বাছুর কি সে জায়গা ঘেঁসে কখনো?'

আমি একটু হতাশ হয়েই পড়ি। 'কিন্তু যক্ষ্মা হলে আর কি হোলো! যক্ষ্মা কি সারে আর?'

'সারে না আবার! তেমন গা ঝেড়ে বসন্ত হয়ে গেল যক্ষ্মা তো যক্ষ্মা, যক্ষ্মার বাবা অবধি সেরে যায়! পকসের জার্মের কাছে লাগে আবার যক্ষ্মার ব্যাসিলি—হুঃ!'

'বসন্ত!' শুনে আরো দমে যাই আমি।—'বসন্ত কি আর ইচ্ছে করলেই হয় সবার?'

'আলবাৎ হয়—হবে না কেন? মেসোমশাই বেশ জেরোলো হয়ে ওঠেন 'টিকে না নিলেও হবে। আর টিকে যদি নিয়েছে, তাহলে তো কথাই নেই।'

সেই পাগড়ি-পরা লোকটি এতক্ষণ অস্ফুট কাতরোক্তি দিয়ে মেসোমশায়ের মনোযোগ আকর্ষণের দুশ্চেষ্টা করছিল, এবার সে অর্ধস্ফুট হয়ে ওঠে—'বাবুজি!'

মেসোমশাই কিন্তু কর্ণপাত করেন না—'এসব তথ্য বুঝতে হলে ডাক্তার

হওয়া লাগে। তাই তো ডাক্তার হতে বলছি তোকে। বলি যে, ডাক্তারি পড় বোক্‌চন্দর্‌!'

মেসোমশায়ের আদুরে ডাকে আমার রোমাঞ্চ হয়।

'আপনার চিকিচ্ছে তো খাসা মেসোমশাই, ওষুধ খর্চা হয় না! রোগ দিয়েই রোগ সারিয়ে দ্যান! যাকে বলে রোগারোগ্য, বাঃ!'

'বিলক্ষণ! ওষুধ দিয়েই তো সারাই—বিনা ওষুধে কি সারে? কিন্তু ওষুধের কাজটা হোলো কি? আরেকটা ব্যামো দেহে ঢুকিয়ে তবেই না একটা সারানো। উকিলদের যেমন! আরেকটা মামলার পথ পরিষ্কার করে, তাহলেই তাদের একন্ন মেটে! আমাদের ডাক্তারদেরও তাই! ওষুধ দিয়ে আনকোরা একটা ব্যারামের আমদানি না করলে কি—'

দেহাতী লোকটির দেহ হঠাৎ যেন কুঁকড়ে যায়। তার আর্তনাদে আমাদের আলোচনা ব্যাহত হয়। 'বাবুজী. হম্‌ মর গিয়া!'

মেসোমশাই চটেই যান—'ক্যা হুয়া, হুয়া ক্যা?'

'বহুৎ শির্‌ দুখাতা, আউর্‌ পিঠমে ভি দরদ্‌—'

'আভি কেয়া? কল ফজিরমে আও! যো বখৎ হসপতাল খুলা রহতা—'

'নেহি বাবুজি, মর্‌ যায়গা, গোড় লাগি। 'হামারা বোখার ভি আ গয়ী—'

কাকুতি মনতিতে মেসোমশাই ঈষৎ টলেন। থার্মোমিটারটা বার করেন; কিন্তু থার্মোমিটারের কাঠিটাকে খাপ থেকে বার করার কথা তিনি বিস্মৃত হন, খাপ-সমেত সমস্তটাই অবহেলাভরে দ্যান বেচারার বগলে ভরে।

তারপর সখাপ সেটাকে বগল থেকে বহিষ্কৃত করে সামনে এনে মনোযোগ সহকারে কি যেন পাঠ করেন। অতঃপর ও'র মন্তব্য হয়—'হুম্‌ বোখর ভি হুয়া জারাসে!'

প্রয়োজন ছিল না, তবু আমিও কিঞ্চিৎ ডাক্তারি বিদ্যা ফলাই—'হুয়া বই কি! জারা লাগতি তো? জারা জারা?'

মেসোমশাই ছাপানো ফর্মে খস খস করে দু'লাইন ঝেড়ে দ্যান। ও প্রেস্‌কৃপসন্‌ আমিও লিখে দিতে পারতুম্‌! ব্যবস্থাপত্রের বাঁধা গৎ আমার জানা। আমার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে ডিসপেনসিং রুমের প্রকাণ্ড কাচের জার এবং তার অভ্যন্তরীণ অদ্বিতীয় মহৌষধ—যার রঙ কখনো লাল, কখনো বেগুনী, কখনো বা ফিকে জর্‌দা। সর্দি-কাশি কি পেটব্যথা, পিত্তশূল কি পিলে-জ্বর, জ্বরবিকার কি গলগণ্ড—যারই রুগী আসুক না কেন, সবারই সে এক দাবাই, সর্বজীবে সমদৃষ্টি মেসোমশায়ের, ভদ্রলোকের এক কথার মত একমাত্র ব্যবস্থা।

পিঠে দরদ্‌ওয়ালার বেলাও অবশ্য তার অন্যথা হয়নি, সেই একমাত্র

ওষুধের একমাত্রা বা একাধিক নিশ্চয়ই তিনি বিরাদ্দ করে দিয়েছেন—অব্যাহতেই। সে-বেচারা চির্‌কুট নিয়ে দাবাইখানার দিকে এগুতেই আমিও মেসোমশায়ের কাছ থেকে কেটে পড়ি। ডাক্তারি-বিদ্যা এক ধাক্কায় অনেকখানি হজম করা সহজ নয় আমার পক্ষে।

হাওয়া টাওয়া খেয়ে ফিরতে একটু রাতই হয়। পিসেমশায়ের নিকটে যাই—রাত্রের আহারটা তার আস্তানাতেই চলে কিনা! ইয়া ইয়া মাছ, মুরগী আর পাঁঠা কোত্থেকে না কোত্থেকে প্রায় প্রত্যহই জুটে যায়—পিসেমশায়ের পয়সা খরচ করে কিনতে হয় না। নৈশ-পর্বটা আমাদের জোরালো হয় স্বভাবতঃই।

থানায় পেঁছেই দেখি, সেখানেও এসে জুটেছে সেই প্যাগড়ি পরা লোকটা। আড়াই মাইল দূরে কোথায় তার আত্মীয়ের বাড়ি কি চুরি গেছে না কোন হাঙ্গামা হয়েছে, তারই তদন্তে নিয়ে যেতে চায় পিসেমশাইকে। পিসেমশাই তাকে খুব বকেছেন, ধম্‌কেছেন দাবড়ি দিয়েছেন হাজতে পোরবার ভয় দেখিয়েছেন—কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা, দারোগা দেখে সহজে রেগো হবার পাত্র না। পিসেমশাই রাত্রে এক পা নড়তে নারাজ, অগত্যা, সেই পাগড়িপরা দশটা টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছে, তখন তিমি কেস্‌টা কেবল ডায়েরীতে টুকে নিতে প্রস্তুত হয়েছেন। এখানে আসা অবধি বরাবর আমি লক্ষ্য করেছি, পিসেমশায়ের বামহাত দক্ষিণের জন্যে ভারি কাতর—বেশ একটু উদ্‌ব্যগ্র বললেই হয় - আর দক্ষিণহাত কি ইতর, কি ভদ্র—সবার প্রতি স্বভাবতঃই কেমন বাম—সবাইকে গলহস্ত দেবার জন্যে সর্বদাই যেন শশব্যস্ত হয়ে আছে।

ডায়েরী লেখা শুরু করেন পিসেমশাই। নামধাম জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর প্রশ্ন হয়—'কেয়া কাম করতে হো?'

'মন্ত্রীকা কাম!'

'কেয়া? মিস্ত্রীকা কাম?' কানটাকে চাগিয়ে নেন পিসেমশাই।

'নেহি নেহি, জি! মিস্ত্রী নেহি মন্ত্রী!'

'সমঝ্‌ গিয়া!' পিসেমশাই লিখে নেন তাঁর ডায়েরীতে। আমাকে বলেন—'আমরা যাদের মিস্তিরি বলি এইসব দেহতী লোকেরা তাদেরই মন্ত্রী বলে বুঝেচিস? লেখাপড়া জানে না তো, আকাট মুখখু, আবার সমস্‌কৃত করে বলা হচ্ছে 'মন্ত্রীকা কাম...'

তারপর প্যাগ্‌ড়ি-পরার দিকে ফেরেঃ 'সমঝ্‌ গিয়া! কেয়া মন্ত্রী। রাজমন্ত্রী, না ছুতোর-মন্ত্রী?''

'রাজমন্ত্রী।' বিরক্ত হয়েই বুঝি জবাব দ্যায় পাগ্‌ড়ি-পরা।

'ওই যো-লোক্‌ দেশ্‌কো ইমারত্‌ বনাতা? বাঁশকো ভারা বাঁধতে মাথাপর ইটকো বোঝা লেকে উপর উঠতা—?' পিসেমশাই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দ্বারা পরিস্কাররূপে প্রাণিধান করতে চান।

'জি হ্যাঁ ! বহুত ভারী বোঝা !' সায় দ্যায় সে।

'উসি বাস্তে তুমারা শির্ দুখাতর ? নেহি জি ?' আমি জিজ্ঞাসা করি। এতক্ষণে ওর দাবাইখানা যাবার কারণ আমি টের পাই।

'পিঠ্‌মে ভি দরদ্ !' সে বলে একটু মুচকি হেসে। 'উসি বাস্তে।'

পিসেমশাই তাঁর জেরা চালিয়ে যান —'উঠ্‌নেকা বখৎ কভি কভি গির্ ভি যাতা উলোক—ঐ রাজমন্ত্রী লোক ? কেয়া নেহি ?'

'ঠিক হ্যায়।' পাগ্‌ড়ি-পড়া ঘাড় নাড়ে।—'কভি কভি।'

বহুৎ ধবস্তাধস্তি, বিস্তর বাদানুবাদের পর ডায়েরী লেখা শেষ হয়! লোকটা চলে গেলে পিসেমশাই নোটখানা খুলে দ্যাখেন, পরীক্ষা করেন আসল কি জাল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন তিনিঃ 'না, আসলই বটে, তবে চোরাই কিনা কে জানে ! কোনো মিনিস্টারের পকেট মেরে আনা নয় তো ?'

'কি করে জানলেন ?' শার্লক্ হোম্‌সের জুড়িদার বলে সন্দেহ হয় আমার পিসেমশাইকে।

'ক্যাবিনেটের একজনের নামের মত নাম লেখা নোটের গায়ে। তবে নাও হতে পারে। এসব তো এধারের বাজার-চল্‌তি চালু নাম, অনেক ব্যাটারই এমন আছে।'

সকালবেলার খাওয়াটা মেসোমশায়ের বাড়িতেই হয় আমার। রাত্রের গুরুভোজনের পর ঘুম থেকে উঠে পিসেমশায়ের সঙ্গে একচোট দাবা খেলে স্নান-টান সেরে যেতে প্রায় বারোটাই বেজে যায়।

আজ গিয়ে দেখি মাসীমা বিচলিত ভারী। মেসোমশাই হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে সেই যে সাত সকালে হাসপাতালে গেছেন, ফেরেননি এখনো। কারণ জিজ্ঞাসা করি।

মাসীমা বলেন—'কাল বিকেলে হাসপাতালে কে একটা উটমুখো এসেছিল না ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তখন ছিলাম তো। কে এক রাজমিস্ত্রী না ছুতোর মিস্ত্রী !'

'সেই সর্বনেশের কাণ্ড দ্যাখো !' টেবিলের ওপর খোলা চিঠিটার দিকে দৃক্‌পাত করেন মাসীমা —খুব বিরক্তিভরেই।

আগাপাশতলা পড়ে দেখি চিঠিটা বিহারের জনৈক মন্ত্রী লিখছেন—নামটা নাই করলাম—লিখেছেন অনেক কথাই। তিনি জানিয়েছেন যে, থার্মোমিটারের খাপের, যে কোনো নামী মেকারের যত দামী জিনিসই হোক না কেন, বগলে গলিয়ে দিলেই কিছু জ্বর-উত্তোলনের ক্ষমতা জন্মে না, বরং তাকে বগলদাবাই করাই এক বিড়ম্বনা। উপরন্তু আরো বিশেষ করে এই কথাও তিনি জানতে চেয়েছেন যে, সেবাই হচ্ছে চিকিৎসকের ধর্ম ; যখন, যে সময়ে, যে অবস্থাতেই

রোগার্ত আসুক না কেন, তাকে সুস্থ না করা পর্যন্ত ডাক্তার তটস্থ থাকবেন, তা সে রুগী ইতরেই হোক্, কি ভদ্রই হোক্ ; গরীবই হোক্, আর বড়লোকই হোক্ ; সরকারী ভারী চাকুরেই হোক কি সে বেসরকারী ভবঘুরেই হোক্—।

তা ছাড়া আরো তিনি বলছেন ঃ আমরা—সরকারী কর্মচারীরা, তা মন্ত্রীই হই, কি ডাক্তারই হই ; দারোগা হই বা পাহারাওয়ালাই হই ; ভুলেও যেন কখনো না মনে ভাবি যে, আমরাই জনসাধারণের মনিব। জনসাধারণেরই নিছক খাই, তাদের সেবার জন্যেই আছি, আমরা তাদের ভৃত্য মাত্র।

ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ সদুপদেশের পর তাঁর সার কথাটি আছে সর্বশেষে। নিজের দুরবস্থা তো তিনি স্বচক্ষেই কাল দেখে গেছেন হাসপাতালের আর সব রুগীরা কিভাবে আছে, তাদের দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করতে আজ স্বয়ং তিনি—সেই তিনিই আসবেন···ছদ্মবেশে নয় অবিশ্যি এবার ভদ্রবেশে প্রকাশ্যরূপে !

ছুটি হাসপাতালে।

গিয়ে দেখি বিপর্যয় ব্যাপার ! বেজায় হৈ চৈ, ভারী শশব্যস্ততা সবদিকে ঃ প্রেস্‌কৃপ্‌শন সব পালটানো হচ্ছে, বদলানো হচ্ছে খাতা-পত্র, রঙ-বেরঙের ভালো ভালো দাবাই পড়ছে রুগীদের শিশিতে। মিনিস্টার আসছেন হাসপাতাল-পরিদর্শনে ! বহুরূপী সেজে নয়—দস্তুরমত সরকারী কেতায় ! অফিসিয়াল্ ভিজিট্ যা তা না !

কাজেই, নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই মেসোমশায়ের। হাসপাতালের কায়েমী রুগীদের অনেক করে জপানো হচ্ছে—চিকিৎসার কিরকম সুব্যবস্থা করা হয় এখানে ওদের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কি সব সুপাচ্য ও সুপথ্য ওদের দেওয়া হয় ; এই যেমন—আঙুর-বেদনা, সাগু-মিছরি, দুধ-বার্লি, মাখন-পাউরুটি, সুপ-সুরুয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনাস্বাদিত তালিকা মুখস্থ করতে করতে হাঁপ ধরে যাচ্ছে—নাভিশ্বাস উঠছে বেচারাদের, মনে মনে তারা গাল পাড়ছে মিনিস্টারকে।

ওদের মধ্যে দু'-একজন আবার হয়তো যুধিষ্ঠির সেজে বসেছে, তারা দাবি করেছে, শুধু শুধু মিথ্যেকথা বলা তাদের ধাতে পোষাবে না, উপরোক্ত খাদ্যাখাদ্যগুলি বস্তুত যে কি চীজ, কেবল কানে শুনে সঠিক ধারণা করা যায় না, এমন কি চোখে দেখাও যথেষ্ট নয়, চেখে দেখার দরকার। ঐ তালিকা মনে রাখবার মতো মুখস্থ করতে হলে সত্যি-সত্যিই ওদের মুখ-স্থ করে দেখতে হবে। তাদের সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা বজায় রাখতে রান্নার তোড়জোড় করতে হয়েছে। নাজেহাল হয়ে পড়েছেন মেশোমশাই।

ডাক্তারখানায় তো এই দৃশ্য ! সেখানে থেকে সটান ছুটি থানায় ঃ সেখানে আবার কি দুর্ঘটনা, কে জানে !

গিয়ে দেখি পিসেমশাই তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। তিনিও পেয়েছেন এক চিঠি।

চিঠির আসল মর্ম—আসল মর্ম তিনিই জানেন কেবল! কাউকে জানতে দিচ্ছেন না তিনি! দাবাবোড়েরা তাঁর পাশেই গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের মতই তাঁর মুখ—বেশ থমথমে। কার সাধ্য, তাঁর কাছ ঘেঁসে! মনে হয়—কে যেন মশাই! পিসে ফেলেছে আমার পিসেমশাইকে—আপাদমস্তক—একেবারে পা থেকে শিরোপা অব্দি।

ওধারে হাসপাতালে ভূমিকম্প দেখে এলাম, এখানে যা দেখছি, তাতে তো হৃৎকম্পের ধাক্কা!

পিসেমশায়ের এক দাবা, আর মেসোমশায়ের একমাত্র দাবাই—এসে অবধি কেবল এই দেখছি এঁদের দুজনের। এই দিয়েই এতদিন এখানকার সবাইকে ওঁরা দাবিয়ে এসেছেন; কিন্তু আজ যেন ওঁরাই দাবিত—নিজের চালে নিজেরাই মাত হয়ে গেছেন কিরকমে! ওঁদের কাত দেখে আমারো ভারী রাগ হয়—কিন্তু কার ওপর যে বুঝতে পারি না সঠিক!

ভূমিকম্পেরই দেশ বটে বিহার! ছোটখাটো ভূমিকম্প যেখানে সেখানে যখন তখন লেগেই রয়েছে ও অঞ্চলে আজকাল!

পাতালে বছর পাঁচেক

তখনই বারণ করেছিলাম গোরাকে সঙ্গে নিতে। ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কোনো বড় কাজে যাওয়া আমি পছন্দ করিনে।

আর ঐ অপয়া বইখানা। প্রেমেন মিত্তিরের 'পাতালে পাঁচ বছর'! যখনই ওটা ওর বগলে দেখেছি, তখনই জানি যে, বেশ গোলে পড়তে হবে।

বেরিয়েছি সমুদ্র যাত্রায়, পাতাল যাত্রায় তো নয়! সুতরাং কী দরকার ছিল ও-বই সঙ্গে নেবার? আর যদি নিতেই হয়, তবে আমার 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' কী দোষ করলো? যতো সব বিদঘুটে কাণ্ড ঐ ছেলেটার! মনে মনে আমি চটেই গেলাম।

শেষে কিন্তু ভড়কাতে হলো- জাহাজে উঠেই যখন বইয়ের কারণ ও ব্যক্ত করলে। আমাকে রেলিং-এর একপাশে ডেকে এনে চোখ বড়ো করে চাপাগলায় বললে, 'মেজ-মামাকে বলবেন না কিন্তু। খুব ভালো হয়, যদি জাহাজটা ডুবে যায়!'

আমি বললাম, 'কি ভালোটা হয়?'

'সটান পাতালে চলে যাওয়া যায় এবং সেখানে'—এই বলেই গোরা উৎসাহের সহিত বইখানার পাতা ওলটাতে শুরু করে—গোড়ার থেকেই।

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, নিতান্তই অকস্মাৎ প্রচণ্ড সাইক্লোন কিংবা বরফের পাহাড়ের ধাক্কা যদি না লাগে, তাহলে সে রকম সুযোগ পাওয়াই যাবে কিনা সন্দেহ। আর সেই দুরাশা পোষণ করেই যদি ঐ

বই এনে থাকে, তবে তো সে খুবই ভুল করেছে, কারণ আজকালকার নিরাপদ সমুদ্র-যাত্রায় পাতালের ভ্রমণ-কাহিনীকে কাজে লাগানো ভারী কঠিন।

আমার কথায় সে দমে গেল। গম্ হয়ে থেকে অবশেষে বললে – 'তাহলে কি কোনই আশা নেই একেবারে ?'

'দেখছি না তো!' নিস্পৃহকণ্ঠে আমি জবাব দিই—'তাছাড়া, তুমি ব্যতীত জাহাজের এতগুলি প্রাণীর মধ্যে কারো ভুলে পাতালে যাবার শখ আছে বলেও আমার মনে হয়ে না।'

'বলেন কি ?' গোরা যেন আকাশ থেকে পড়ল ;—'তা কখনো হয় ? আপনিও কি যেতে চান না পাতালে ?'

আমি প্রবলবেগে ঘাড় নাড়লাম—'পাতাল দূরে থাক, হাসপাতালেও না।' মুখ ফাঁক করলাম আমার। –'কেউ কি মরতে যায় ওসব জায়গায় ?'

'আপনি মিথ্যে বলছেন!' গোরা অবিশ্বাসের হাসি হাসল, 'পাতালে যাবার ইচ্ছা আবার হয় না মানুষের!'

'আমার হয় না। আমাকে জানো না তুমি।' আমি জানালাম, 'আমার পাতালে যাবার ইচ্ছা হয় না, মোটর চাপা পড়বার ইচ্ছা হয় না, রেলে কাটা যাবারও ইচ্ছা করে না। আমি যেন কিরকম!'

'আমি সঙ্গে থাকব, ভয় কি আপনার!' ও আমাকে উৎসাহ দেয়।—'মেজমামাকে দেখে আসি, আপনি ততক্ষণ পড়ুন বইখানা।'

বইটা হাতে নিয়ে ভাবলাম এটাকে এখনই, আমাদের আগেই পাতালে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়! সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি, সিঙ্গা ফুঁকতে তো যাচ্ছিনে, আকাশ-পাতালের বৃত্তান্ত আমার কি কাজে লাগবে? তারপর কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বইটা পড়তে শুরু করি শেষের দিক থেকে। গোড়ার দিক থেকে পড়বো না বলেই শেষের দিকটাই ধরি আগে।

শেষপৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে একশ চৌত্রিশ পাতা পর্যন্ত এগিয়েছি—কিংবা পিছিয়েছি—এমন সময়ে কর্ণবিদারী এক আওয়াজ এলো। সেই মুহূর্তেই আমার হাত থেকে খসে পড়ল বইটা এবং খসে পড়লাম চেয়ার থেকে। অত বড়ো জাহাজটা থর থর করে কাঁপতে লাগল মুহুর্মুহু।

উঠব কিংবা অমনি করে পড়েই থাকব, অর্থাৎ উঠবার আদৌ আবশ্যক হবে কিনা, ইত্যাকার চিন্তা করছি, এমন সময় গোরার মেজমামা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

'এই যে, বেঁচে আছো ? বেঁচেই আছো তাহলে। হার্টফেল করোনি এখনো ?

'উঁহু।' সংক্ষেপে সারি।

'আমার তো পিলে ফাটার উপক্রম।' জানান গোরার মামা।

'ব্যাপার কি? কি হয়েছে? এঞ্জিন বার্ষ্ট করলো নাকি।'

'উ'হ্‌, আরেকখানা জাহাজ। জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকি।'

'কী সর্বনাশ।'

'মনে হচ্ছে কোনো চারা জাহাজ। চোরাই মালের জাহাজ টাহাজ হবে বোধ হয়। ধাক্কা মেরেই ছুটেছে। ঐ দ্যাখো না!'

ঐ অবস্থাতেই ঘাড় উ'চু করে তাকালাম, আরেকখানা জাহাজের মতই দেখতে, সুদূর দিকচক্রবালের দিকে নক্ষত্রবেগে পালাচ্ছে। আমাদের শ্রীমান ততক্ষণে কাঁপুনি থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন স্তম্ভিত হয়ে।

দুধারেই এনতার ফাঁকা, দুশো জাহাজ যাবার মতন চওড়া পথ, তবু যে এরা কি করে মুখোমুখি আসে, মারামারি করে, আমি তো ভেবে পাই না! আমি বিরক্তি প্রকাশ করি।

'উপকূল থেকে আমরা এখন কদ্দূরে?' মেজমামার প্রশ্ন।

'দেড় শো কি দুশো মাইল হবে বোধ হয়!' আমি বলি, 'ছ'সাত ঘণ্টা তো চলছে আমাদের জাহাজখানা!'

বলতে বলতে ঢং ঢং করে অ্যালার্ম বেল বাজতে শুরু করলো এবং শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেব লাফাতে লাফাতে আবির্ভূত হলেন।—'মেজমামা, দেখবে এসো, কী মজা! আপনিও আসুন শিব্রামবাবু! জাহাজের খোলে হুহু করে জল ঢুকছে। কী চমৎকার!' তার হাততালি আর থামে না।

অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি, কাপ্তেন সেখানে দাঁড়িয়ে। খালাসীরা পাম্পের সাহায্যে জলনিকাশ করছে। চারিদিকেই দারুণ ত্রাস আর ত্রস্ততা। যাত্রীরা ভীত-বিবর্ণ-মুখে খালাসীদের কাজ দেখছ। সমস্ত জনপ্রাণীর মধ্যে আমাদের গোরাই কেবল আনন্দে আত্মহারা। পাতালে যাবার পথ পরিষ্কার হচ্ছে কিনা ওর। কাজেই ওর ফুর্তি'

'কেন অনর্থক পাম্প করে মরছে?' আমাকেই প্রশ্ন করে গোরা। 'জাহাজটা ডুবে গেলেই তো ভাল হয়।'

'ভালটা যাতে সহজে না হয়, তারই চেষ্টা করছে, বুঝতে পারছো না?' আমার কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকাশ পায়।—'কলিযুগে কেউ কি কারো ভাল চায়?'

'যা বলেছেন! ভারী অন্যায় কিন্তু।' একমুহূর্তের জন্য থামে সে— ডাঙ্গা এখান থেকে কদ্দূর?'

'তা—দূ'—তিন মাইল হবে বোধ হয়।' আমি ভেবে বলি।

'মোট্রে! তাহলে তো সাঁতরেই চলে যেতে পারবো।' সে যেন একটু হতাশ হয়। কোন দিকে বলুন তো ডাঙ্গাটা?'

'সোজা নিচের দিকে।'

'ওঃ তাই বলুন!' ওর মুখে হাসি ফোটে আবার। আপনি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!'

'নাঃ, ভয় কিসের!' আমি জোর করে হাসি।

'পাতালে যেতে হবে এবং পুরো পাঁচবচ্ছর থাকতে হবে সেখানে। তার আগে চলছে না। কি বলুন? তাই তো?' আমার মতের অপেক্ষা করে গোরা। সমুদ্রটা তলিয়ে দেখতে সে অস্থির।

পাতাল যেরকম জায়গা, সেখানে পুরো পাঁচমিনিটও থাকা যাবে কিনা এই রকম একটা সংশয় আমার বহুদিন থেকেই ছিল, পাতাল-কাহিনীর একশ চৌত্রিশ পাতা পর্যন্ত পড়েও সে সন্দেহ আমার টলেনি, কিন্তু আমার অবিশ্বাস ব্যক্ত করে ওকে আর ক্ষুণ্ণ করতে চাই না।

হঠাৎ সে সচকিত হয়ে ওঠে--'বইটা? সেই বইখানা?'

'ডেকেই পড়ে রয়েছে।' আমি বলি।

'ডেকে ফেলে এসেছেন? কী সর্বনাশ!—কত কাজে লাগবে এখন ঐ বইটা। কেউ যদি নেয়—সরিয়ে ফ্যালে?' বলে গোরা বইয়ের খোঁজে দৌড়োয়।

'কি রকম বুঝছ গতিকটা?' মেজমামা এগিয়ে আসেন।

স্বয়ং জাহাজ তাঁর কথার জবাব দেয়। তার একটা ধার ক্রমশ কাত হতে থাকে, ডেকের সেই ধারটা পাহাড়ের গায়ের মতো ঢালু হয়ে নেমে যায়। সে ধারটা দিয়ে জলাঞ্জলি যাওয়া খুবই সোজা বলে মনে হয়। বসে বসেই সুড়ুৎ করে নেমে গেলেই হল। অ্যালার্ম বেল আরো জোর জোর বাজাতে থাকে। কাপ্তেন লাইফবোটগুলো নামাবার হুকুম দ্যান। জাহাজ পরিত্যাগের জন্য যাত্রীদের প্রস্তুত হতে বলেন।

লাইফবোট নামানোর জন্য তেমন হাঙ্গাম পোহাতে হলো না। জাহাজ তো কাত হয়েই ছিল, সেই ধার দিয়ে দড়ায় বেঁধে ওগুলো ছেড়ে দিতেই সটান জলে গিয়ে দাঁড়াল। আরোহীরাও লাইফবোটের অনুসরণে প্রস্তুত হলেন। সাবধানতা এইজন্য যে একটু পা ফসকালেই একেবারে লাইফ আর লাইফ-বোটের বাইরে—সমুদ্রগর্ভেই সটান!

গোরার মেজমামা এবং আমি—আমাদেরও বিশেষ দেরি ছিল না। যেমন ছিলাম, তেমনি বোটে যাবার জন্যে তৈরি হলাম। এমন দুঃসময়ে লাগেজ, হোল্ড-অল বা সুটকেসের ভাবনা কে ভাবে? সন্দেশের বাক্সের কথাই কি কেউ মনে রাখে? কেই-বা সঙ্গে নিতে চায় সেসব?

কিন্তু গোরা? গোরা? কোথায় গেল সে এই সংকট-মুহূর্তে? আমি গলা ফাটাই এবং মেজমামা আকাশ ফাটান—গোরার কিন্তু কোনো সাড়াই পাওয়া যায় না।

'কে জানে হয়তো কেবিনে বসেই বই পড়ছে!' আমার আশঙ্কা প্রকাশ পায়।

'এই কি পড়বার সময়?' মেজমামা খাপ্পা হয়ে ওঠেন।—'পড়াশুনা করার সময় কি এই?'

'ওর কি সময়-অসময়-জ্ঞান আছে?' আমি বলি, 'যা ওর পড়ার ঝোঁক!'

দু'জনে আমরা কেবিনের দিকে দৌড়োই, নাঃ, কেবিনে তো নেই, তখন এদিকে-ওদিকে, দিগ্‌বিদিকে ছোটাছুটি শুরু করি—কিন্তু কোথায় গোরা! অবশেষে আমাদের জন্য সবুর না করে শেষ বোটখানাও ছেড়ে দেয়।

সবগুলি বোটকেই দিক্‌চক্রান্তে একে একে অন্তর্হিত হতে দেখে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে মেজমামা বসে পড়েন। আমি পড়ি শুয়ে। সেই পরিত্যক্ত জাহাজের প্রান্তসীমায় তখন কেবলি আমরা দু'জন। গোরা অথবা লাইফ-বোট—কার বিরহ আমাদের বেশি কাতর করে বলা তখন শক্ত।

খট্ করে হঠাৎ একটা শব্দ হতেই চমকে উঠি! দেখি শ্রীমান গৌরাঙ্গ হাসতে হাসতে অবতীর্ণ হচ্ছেন। সমুন্নত ডেকের চূড়ায় গিয়ে তিনি উঠেছিলেন।

'কোথায় ছিলিরে এতক্ষণ?' গোরাকে দেখতে পাবামাত্র সেখানে বসেই মেজমামা যেন কামান দাগেন।

'কতক্ষণে বোটগুলো ছাড়ে, দেখছিলাম।' গোরার উত্তর আসে, 'সবগুলো চলে যাবার পর তবে আমি নেবেছি।'

কৃতার্থ করেছো। মনে মনে আমি কই।

মেজমামার দিক থেকে সহানুভূতির আশা কম দেখে ছেলেটা আমার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। কানে কানে বলে, 'পাতালে যাবার এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে মশাই? আপনিই বলুন না।'

আমি চুপ করে থাকি। কী আর বলবো? আশঙ্কা হয় এখন কথা বলতে গেলেই হয়ত তা কান্নার মত শোনাবে! নিশ্চিত-মৃত্যুর সম্মুখে কান্নাকাটি করে লাভ!

'ঘাবড়াবেন না', ওর চাপা-গলার সান্ত্বনা পাই। 'ফিরে এসে আপনিও প্রেমেনবাবুর মতো অমনি একখানা—বইয়ের মত বই—লিখতে পারবেন।'

আমি শুধু বলি—'হ্যাঁ, ফিরে এসে! ফিরে আসতে পারি যদি!' মুখ ফুটে এর বেশি বলতে পারি না, মুখের ফুটো বুজে আসছিল আমার।

ক্রমশ বিকেল হয়ে আসে। অনেকক্ষণ বসে থেকে অবশেষে আমরা উঠি। খাওয়ার এবং শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো! যতক্ষণ অথবা যতদিন এই জাহাজের এমনি ভেসে থাকার মতি-গতি থাকবে, আর এই পাশ দিয়ে যেতে যেতে অন্য কোনো জাহাজ আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে না নেবে, ততক্ষণ বা ততদিন টিকে থাকার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে বই কি!

আফশোস করে আর ফল কি এখন?

জাহাজকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তিনি সেইরূপ কাত হয়েই রইলেন, বেশি আর তলাবার চেষ্টা করলেন না। আমরা তিনজনে এধারে ওধারে এবং কেবিনে পরিভ্রমণ শুরু করলাম।

নাঃ, খাবার দাবার অপর্যাপ্তই রয়েছে। পাঁচ বছর না হোক, পাঁচ হপ্তা

টেকার মতো নিশ্চয়ই! বিস্কুট, রুটি, মাখন, চকোলেট, জ্যাম, ঠাণ্ডা মাংস টিন কে টিন। গোরার পুলক আর ধরে না! তার কলেবর আমাদের একেবারে ক্ষেপিয়ে তুললো প্রায়।

খাওয়া দাওয়া সেরে একটা প্রথম শ্রেণীর কেবিনে শয়নের আয়োজন করা গেল। ডেকের টিকিট কেটে প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া কতখানি সুবিধার, নরম গদির আরামের মধ্যে গদগদ হয়ে গোরা আমাদের তাই বোঝাতে চায়, কিন্তু তার সূত্রপাতেই এক ধমকে মেজমামা থামিয়ে দেন ওকে।

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙলে সবাই আমরা চমৎকৃত হলাম। এ কি! কেবিনের দরজা কেবিন ছাড়িয়ে এত উঁচুতে গেল কি করে। রাতারাতি জাহাজটা কি আরেক ডিগবাজি খেলো না কি! বাইরে বেরিয়ে যে কারণ বের করব, তারও যো নেই। কেন না দরজা গেছে কড়িকাঠের জায়গায়, কিন্তু আমরা দরজার জায়গায় নেই। আমরা যে কোথায় আছি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

গোরা কিন্তু আমাদের কাজের ছেলে। কোত্থেকে একটা দড়ি বাগিয়ে এনে হুক লাগিয়ে ফাঁসের মতো করে দরজার দিকে ছুঁড়ে দিল। কয়েকবার ছুঁড়তেই আটকালো ফাঁসটা। তারপর তাই ধরে সে অবলীলাক্রমে উপরে উঠে গেল। ফাঁসটাকে দরজার সঙ্গে ভাল করে বেঁধে দড়িটা নামিয়ে দিল সে আমাদের উঠবার জন্য।

যে দড়ি-পথ গোরার পক্ষে মিনিটখানেকের পরিশ্রম, তাই বেয়ে উঠতে দুজনেই আমরা নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণে, অনেক উঠে পড়ে, বিস্তর ধস্তাধস্তি করে, এ ওর ঘাড়ে পড়ে, পরম্পরায়, বহুৎ কায়দা-কসরতে ঘর্মাক্ত -কলেবরে অবশেষে আমরা উপরে এলাম। এসে দেখি জাহাজ এবার অন্যধারে কাত হয়েছেন। অন্যদিকে হেলেছেন, তাই আমাদের প্রতি এই অবহেলা। সেইজন্যেই কেবিনের মেজে পরিণত হয়েছে দেয়ালে, আর দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাদ জাহাজের মেজাজে!

জাহাজের এই রকম দোলায় অতঃপর কি করা যায়, তাই হলো আমাদের ভাবনা। 'ব্রেকফাস্ট করা যাক।' গোরা প্রস্তাব করল।

এই রে! মেজমামা বাজের মতন ফাটবেন এইবার! মুখ না ধুতেই প্রাতরাশের সম্মুখে! এ-প্রস্তাবে— নাঃ আর রক্ষা নেই! কিন্তু আমার আশঙ্কা ভুল, মেজমামার দিক থেকে কোনই প্রতিবাদ এলো না। কাল থেকে গোরার প্রত্যেক কথাতেই তিনি চটছিলেন, কিন্তু এককথায় তাঁর সর্বান্তঃকরণ সায় দেখা গেল।

প্রাতরাশ সেরে সব চেয়ে উঁচু এবং ওরই মধ্যে আরামপ্রদ একটা স্থান বেছে নিয়ে সেখানে আমরা তিনটি প্রাণী গিয়ে বসলাম। বসে বসে সারাদিন জাহাজটার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করি! প্রত্যেক ঘণ্টায়ই একটু একটু করে জলের

তলায় তিনি সমাধিস্থ হচ্ছেন। এই ভাবে চললে তাঁর আপাদমস্তক তলানো ক ঘণ্টার বা কদিনের মামলা, মনে মনে হিসাব করি।

'হয়েছে হয়েছে।' মেজমামা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, 'যখন আমরা জাহাজে উঠলাম, মনে নেই তোমার ? জাহাজের খোলে যত রাজ্যের লোহা-লক্কর বোঝাই করছিল মনে নেই ?'

'হ্যাঁ, আছে। তা কি হয়েছে তার ?'

'লক্করগুলো তো ভেগেছে, এখন ওই লোহার ভারেই জাহাজ ডুবছে। খোলের ভেতর থেকে লোহাগুলো তুলে এনে যদি জলে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো জাহাজটাকে ভাসিয়ে রাখা যায়।'

আমি ঘাড় নাড়ি—তা বটে। কিন্তু কে আনবে সেই লোহা ? এবং কি করেই বা আনবে ?'

গোরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'আনবো ? আনবো আমি ?' তার কেবল মাত্র আদেশের অপেক্ষা !

'থাম !' মেজমামা প্রচণ্ড এক ধমক লাগান।

'লক্করদের সবাই কি গেছে ? আপাতত একে জলে ফেলে দিলেও জাহাজটা কিছু হালকা হতে পারে বোধ হয় ? দেব ফেলে ?' আমি বললাম।

'থামো তুমি।' মেজমামা গরম হলেন আরো—'তোমরা দুজনে মিলে আমাকে পাগল করে তুলবে দেখছি।'

'তার চেয়ে এক কাজ করা যাক।' আমি গম্ভীরভাবে বলি, 'জাহাজের কেবিনগুলো ওয়াটার-টাইট বলে শুনেছি। বড়ো দেখে একটার মধ্যে ঢুকে ভাল করে দরজা এঁটে আজকের রাতটা কাটানো যাক—তারপর কালকের কথা। কাল যদি ফের বেঁচে থাকি, তখন -।'

তাই করা গেল। স্টোর-রুম থেকে প্রচুর খাবার এনে সব চেয়ে বড়ো একটা কেবিনের মধ্যে আমরা আশ্রয় নিলাম। গোরা কতকগুলো টর্চ বাতি নিয়ে এসেছিল, তাদের আর আমাদের একসঙ্গে জ্বালাতে শুরু করলো। 'টর্চের সাহায্যে টর্চার করার নামই হচ্ছে জ্বালানো' মেজমামা বললেন, 'এর চেয়ে জ্বালাতন আর কি আছে ? আর ঠিক এই ঘুমোবার সময়টাতেই।' বললেন মেজমামা।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু রাত যেন আর কাটে না। যতক্ষণ সম্ভব এবং যতদূর সাধ্য, প্রাণপণে আমরা ঘুমিয়েছি ; কিন্তু ঘুমানোর তো একটা সীমা আছে ! গোরা সেই সীমানায় এসে পেঁছেই ঘোষণা করে, 'এইবার ব্রেকফাস্ট করা যাক।'

'অ্যাঁ ! এই রাত থাকতেই !' শুয়ে শুয়েই আমি চমকে উঠি।

'কী রাক্ষুসে ছেলে রে বাবা !' মেজমামাও গর্জন করেন, 'তোর কি ভোর হোতেও তর সইছে না রে ?'

'খিদে পেয়েছে যে!' গোরা বলে, 'ভোর না হলে বুঝি খিদে পেতে নেই?'

'খিদে কি আমারও পায়নি?' মেজমামা ফোঁস করেন; 'কিন্তু— কিন্তু তা বলে কি রাত থাকতেই ব্রেকফাস্ট—এ-রকম বে-আক্কেলে কথা কেউ শুনেছে কখনো? কারো বাপের জন্মে? ভদ্রলোকে শুনলে বলবে কি?'

'আহা, ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েছে খাক না! এখানে তো ভদ্রলোক কেউ নেই। কে শুনছে?' বিস্কুটের টিনটা গোরার দিকে আগিয়ে দিই।

'বা-রে, আমি বুঝি বাদ?' মেজমামা আমার দিকে হাত বাড়ান, ছেলে-মানুষ বলে কি ও মাথা কিনেছে নাকি? ছেলেমানুষ না হলে খিদে পেতে নেইকো?'

মেজমামাকেও একটা টিন দিতে হয় এবং নিজেও আমি একটা টিন শেষ করি। তারপর আবার ঘুম। তারপর আবার অনেকক্ষণ কাটে। আবার ঘুম ভাঙে। আবার খাবার পালা। এইভাবে বারবার তিনবার ব্রেকফাস্টের দাবী মিটিয়েও সকালের মুখ দেখা যায় না। বারোটা বিস্কুটের টিন ফুরোয়, কিন্তু বারো ঘণ্টার রাত আর ফুরোয় না, তখন বিচলিত হোতে হয়, সত্যিই!

'গোরা, জ্বালতো টর্চটা একবার। কি ব্যাপার দেখা যাক—'

টর্চের আলো ফেলে কেবিনের পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে যা দেখি, তাতে চোখ কপালে উঠে যায়। জল, কেবল সমুদ্রের কালো জল! তা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

'সর্বনাশ হয়েছে!' মেজমামা কন— খুব সংক্ষেপেই।

'হ্যাঁ। আমরা জলের তলায়—ডুবে গেছি। আমাদের জাহাজ ডুবে গেছে কখন!'

কিন্তু একথা মুখ ফুটে না বললেও চলতো, কেন না এ তথ্য আর অস্পষ্ট ছিল না যে, আমাদের আর আশেপাশের কেবিনগুলো সব ওয়াটার-টাইট বলেই আমরা বেঁচে আছি এখনো পর্যন্ত! পোর্টহোলের কাচের শার্সিটা পুরু, এত পুরু যে, তা ভেঙে জল ঢুকাতে পারবে না; তাই রক্ষা!

'এবার কিন্তু মারা গেলাম আমরা।' কান্নার উপক্রম হয় মেজমামার।

'অনেকটা নিচেই তলিয়েছি মনে হয় এত নিচে যে, সুয্যির রশ্মিও এখানে এসে পৌঁছোয় না। দিন কি রাত, বোঝবার যো নেই।'

'কতক্ষণ আছি, তাই বা কে জানে!' মেজমামার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

'ব্রেকফাস্টের সংখ্যা ধরে হিসেব করলে মনে হয়, এক রাত কেটে গিয়ে গোটা দিনটা কাটিয়ে এখন আমরা আরেক রাতে এসে পৌঁছেছি।'

'তবে! তবে আর কি হবে।' মেজমামার হতাশার স্বর শুনে দুঃখ হলো। তারপরে নিজেই তিনি নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—'তবে আর কি হবে! দাও আমার রুটি-মাখনের বাক্সটা, সাবাড় করা যাক তাহলে!'

মুখ থেকে কথা খসতে-না খসতেই গোরা মাতুল-আজ্ঞা পালন করে। এসব দিকে ওর খুব তৎপরতা।

'এইভাবে কতদিন এখানে কাটাতে হবে, কে জানে! হয়তো বা যাবজ্জীবনই!' পাঁউরুটির পেষণে মুখের কথা অস্পষ্ট হয়ে আসে মেজমামার।—'না খেয়ে তো আর বাঁচা যায় না। অতএব খাওয়াই যাক—কী করা যাবে!'

তারপর থেকে উদরকেই আমরা ঘড়ির কাজে লাগাই। আবার খিদে পেলেই বুঝি, আরো ছ'ঘণ্টা কাটলো। এই করেই দিনরাত্রির হিসেব রাখা হয়। এসব বিষয়ে গোরার পেট সব চেয়ে নিখুঁত—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় চলে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সাড়া দেয়!

এইভাবে কয়েকটা ব্রেকফাস্ট কেটে যাবার পর মনে হলো, কেবিনের অন্ধকার যেন অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। হ্যাঁ, এই যে বেশ আলো আসছে পোর্টহোল দিয়ে।

কী ব্যাপার? ব্যগ্র হয়ে ছোটেন মেজমামা পোর্টহোলের দিকে, 'কই, আকাশ তো দেখা যাচ্ছে না। চারদিকেই জল যে!' তাঁর করুণধ্বনি আমাদের কানে বাজে!

নাঃ, এখনো জলের তলাতেই আছি বটে, তবে কিছুটা উপরে উঠেছি। সূর্যরশ্মি-প্রবেশের আওতার মধ্যে এসেছি! আমার মনে হয়, ইতিমধ্যে উপরের মাস্তুল টাস্তুলগুলো বসে গিয়ে ভার কমে যাওয়ায় খানিকটা হালকা হয়ে নিমজ্জিত জাহাজটা কিছু উপরে উঠতে পেরেছে। যাক, একটু আলো তো পাওয়া গেল, এই লাভ!

'থাক না জল চারদিকে, আমাদের কেবিনের মধ্যে তো নেই! এই বা কি কম বাঁচোয়া!' সান্ত্বনার স্বরে এই বলে মেজমামার কথার আমি জবাব দিই।

প্রত্যুত্তরে মেজমামা শুধু আরেকটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন।

'আমার কিন্তু এমনি জলের তলায় থাকতেই ভাল লাগে। কিরকম মাথার উপরে, তলায়, চারধারেই—অথৈ জল! কেমন মজা! যদ্দূর চাও—খালি সমুদ্দুর—আর সমুদ্দুর!' গোরা এতক্ষণে একটা কথা কয়—'বাড়ির চেয়ে এখানে—এখন ঢের ভাল!'

'হ্যাঁ! বাড়ির চেয়ে ভাল বই কি!' মেজমামা নতুন বিস্কুটের টিন খুলতে খুলতে বলেন, 'জলে ডুবে বসে আছি—জলাঞ্জলি হয়ে গেছে আমাদের—ভাল না?'

'জলে ডুবে কি রকম?' গোরা প্রতিবাদ করে—'ডুবে গেলেও আমরা কতো নিচে আছি শিব্রামবাবু?'

'বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ ফিট, কি আরো বেশিই হবে—কে জানে!' আমি জানাই।

'ডুবন্ত লোকের কাছে ত্রিশ ফিট জলের তলাও যা, আর হাজার ফিটও তাই! সবই সমান! কোনোটাই ভাল নয়।' আবার মেজমামার দীর্ঘনিঃশ্বাস।

'কিন্তু মেজমামা, আমাদের কেবিনের মধ্যে তো এক ফোঁটাও জল ঢুকতে পারছে না! তাহলে ডুবলামই বা কি করে?' আবার গোরার জিজ্ঞাস্য হয়। —জলে যদি না পড়ি—না যদি হাবুডুবু খাই—আমরা মরবো কেন?' বলেই সে আমার দিকে প্রশ্নবাণ ছাড়ে, 'হ্যাঁ, শিব্রামবাবু, বলুন না! জলে ডুবে গেলে কি বাঁচে মানুষ? আমরা যদি ডুবেছি, তাহলে বেঁচে আছি কি করে?'

'আহা, জল ঢুকছে না যেমন, হাওয়াও ঢুকতে পারছে না যে তেমনি।' আমি ওকে বোঝাবার প্রয়াস পাই। 'আর আমার মনে হয়, মানুষে জলে ডুবে যে মারা যায়, সে জলের প্রভাবে নয় হাওয়ার অভাবেই! এই কারণেই গায়ে জলের আঁচড়টিও না লাগিয়ে আমরা শোনপাঁপড়ির মত শুকনো থেকেও সমুদ্রগর্ভে ডুবে মারা যেতে পারি। আজই হোক কিংবা কালই হোক—সঞ্চিত হাওয়ার অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে গেলেই—অক্সিজেন-বঞ্চিত হলেই আমরা…'

গুরুতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাঝখানেই গোরা সশব্দে লাফিয়ে ওঠে—'একি? কে ওখানে? ও কে?'

আমাদের সবার দৃষ্টি পোর্টহোলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওর শার্সির ওধারে বদন ব্যাদান করে এ আবার কোন প্রাণী বাবা? অজানা কোন্ জানোয়ার? সমুদ্রের তলায় এমন বিচ্ছিরি বিটকেল বিদঘুটে চেহারা—ভয় দেখাচ্ছে এসে আমাদের!

'শার্ক!' মেজমামা পর্যবেক্ষণ করে কন। 'এরই নাম শার্ক।'

'হ্যাঁ, বইয়ে পড়েছি বটে। এই সেই শার্ক?' গোরার উৎসাহের সীমা থাকে না। পোর্টহোলের উপর সে ঝুঁকে পড়ে একেবারে।

'উঁহুঁ, অতো না! অতো কাছে নয়, কামড়ে দিতে পারে।' আমি সতর্ক করে দিই, 'এমন কি, না কামড়ে একেবারে গিলে ফেলাও অসম্ভব নয়।'

'বাঃ শার্সি রয়েছে না মাঝখানে?' গোরা মোটেই ভয় খাবার ছেলে নয়।

'তোকে দেখলেই সুখাদ্য মনে করবে!' মেজমামাও সাবধান করতে চান—'তখন শার্সি ফার্সি ভাঙতে ওর কতক্ষণ! মাঝখান থেকে আমরাও মারা পড়বো তোর জন্যেই!'

গোরা কিন্তু ততক্ষণে অতিথির সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান শুরু করেছে।

সেদিন বিকেল থেকেই কেবিনের বাতাস দুর্গন্ধ হয়ে উঠল।—'এইবার কমে আসছে অক্সিজেন,—বিষাক্ত হয়ে উঠছে বাতাস।' আমি বললাম, 'এর পর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হবে আমাদের।'

'তাহলে উপায় ?' মুখখানা সমস্যার মত করে তোলেন মেজমামা। 'তাহলে এক কাজ করা যাক', তিনি নিজেই সমাধান করে দেন, 'যতো টিন আর বিস্কুট আছে, সব খেয়ে শেষ করা যাক এসো। খেয়ে দেয়ে তারপর গলায় দড়ি দিলেই হবে। খাবি খেয়ে অল্পে অল্পে মরার চেয়ে আত্মহত্যা করা ঢের ভাল!'

'ঠিক অতো উপাদেয় না হোলেও আরেকটা উপায় আছে এখনো ?' মেজমামাকে আশ্বস্ত করি, 'আমাদের দু'ধারেই কেবিন, উপরে আর নিচের তলাতেও। আপাতত দেয়ালে এবং মেজেয় ছ্যাঁদা করে ঐ সব ঘরের বিশুদ্ধ বাতাস আমদানি করা যাক। এ ঘরের দূষিত বায়ু সব দূর করে দিই। তারপর শেষে ছাদ ফুটো করলেই হবে। আপাতত এতেই এখন চলে যাবে দিনকতক।'

মেজমামা স্বস্তির সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়েন। গোরা বলে, 'তার চেয়ে আমরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলি না কেন। তাতেও তো কিছু বাতাস বাড়তে পারে! কি বলেন ?'

মেজমামা কট মট করে তাকান ওর দিকে, আমি কোনো উত্তর দিই না।

এর পরের ক'দিনের ইতিহাস সংক্ষেপে এই : ঘরের বাতাস ফুরিয়ে এলেই এক একধারে একটা করে গর্ত বাড়ে। বাতাসের কমতি গর্তের বাড়তির দ্বারা পুষিয়ে যায়। গোটা জাহাজটা আমাদের ভাগ্যক্রমে এয়ার-ওয়াটার-টাইট ছিল বলেই এই বাঁচোয়া!

শার্কটা গোরার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়েছিল নিশ্চয়। সে কেবলি ঘুরে ঘুরে আসে। গোরা তার শার্ক-বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে সময় কাটায়। ইতিমধ্যেই দুজনের ভাব বেশ জমে উঠেছে। সামুদ্রিক সব বিষয়কর্ম ফেলে ঘুলঘুলির কাছেই ঘোরা-ফেরা করছে শার্কটা। আর গোরার তরফেও আগ্রহের অভাব নেই, সুযোগ পেলেই সে সমুদ্রচর বন্ধুর আদর-আপ্যায়নের কসুর করে না। বেশির ভাগ সময়ই ওদের মুখোমুখি দেখা যায়—মাঝে শার্সির ব্যবধান মাত্র। কোন দুর্বোধ্য ভাষায় যে ওরা আলোচনা করে, তা ওরাই জানে কেবল।

মেজমামা একটার পর একটা বিস্কুটের বাক্স উজাড় করে চলেন। আর কারো হস্তক্ষেপ করার যো নেই ওদিকে। মেজমামার প্রসাদ পায় গোরা। আর কখনো-সখনো নিজের প্রসাদের দু'-এক টুকরো আমাকে দ্যায়। আমি হাঁ করেই থাকি, উঠে কি হাত বাড়িয়ে খাবার কষ্ট স্বীকার করার ক্ষমতাও যেন নেই আমার। গোরার ভুলবশত ক্বচিৎ কখনো এক-আধখানা যা গোঁফের তলায় এসে পড়ে, তাতেই আমার জীবিকা-নির্বাহ হয়ে যায়।

শুয়ে শুয়ে প্রেমেনের বইখানা পড়ি। দু'বার পড়ে ফেলেছি এর মধ্যেই—একবার শেষ থেকে গোড়ার দিকে, আরেকবার গোড়া থেকে শেষের দিকে। এবার মাঝখান থেকে দু'দিকে পড়তে শুরু করেছি—যুগপৎ।

ক'দিন এইভাবে কাটে, জানি না! খাওয়া আর শোওয়া ছাড়া তো কোনো কাজ নেই—শুয়ে পড়া, আর শুয়ে শুয়ে পড়া। এমনি করে একদিন যখন বইটার দিগ্বিদিকে পড়ছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ সমুদ্রতল যেন তোলপাড় হয়ে উঠল। আমাদের কেবিন কাঁপতে লাগল, একটা গমগমে আওয়াজ শুনতে পেলাম। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলাম আমরা—কী ব্যাপার? প্রশ্নের পরমুহূর্তেই পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলো আমাদের কেবিনের মধ্যে ঢুকলো। এ কী! এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সবাই আমরা চমকে গেলাম।

'আকাশ, আকাশ!' মেজমামা চিৎকার করে আকাশ ফাটান।

তাইতো! আকাশই তো বটে! ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে দেখি—রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুনীল আকাশ! নীলাভ শূন্যের তলায় দিগন্ত বিস্তার সমুদ্রের কালচে নীল জল! আবার যে এইসব নীলিমার সাক্ষাৎ পাবো, এমন আশংকা করিনি।

ভেসে উঠেছি আমরা। ভাসছি আবার। কিন্তু ভেসে উঠলাম কি করে? মেজমামা হঠাৎ কঠোরভাবে চিন্তা করেন—অনেক ভেবে চিন্তে বলেন, 'হয়েছে, ঠিক হয়েছে। জাহাজের খোলটা গেছে খসে সেই সঙ্গে যত লোহালক্কর ছিল, সব গেছে জলের তলায়। তার জন্যই ওই বিচ্ছিরি আওয়াজটা হলো তখন, তাইতেই, বুঝেছিস গোরা!'

গোরা ততক্ষণে কেবিনের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! তারও আর্তনাদ শোনা যায় সঙ্গে সঙ্গেই—'জাহাজ! মেজমামা, জাহাজ! এদিক দিয়েই যাচ্ছে। দ্যাখোসে—'

এতদিনে ও একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করে। হাফ-প্যাণ্টের পকেট থেকে লাল সিল্কের রুমালটা বার করে নাড়তে শুরু করে দ্যায়। আমিই ওটা ওকে একদা উপহার দিয়েছিলাম! ওর জন্মদিনে।

আমাদের নব জন্মদিনে সেটা এখন কাজে লাগে।

রেঙ্গুন থেকে চাল-বোঝাই হয়ে জাহাজটা কলকাতা ফিরছিল। জাহাজে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, অচেনা মানুষের মুখ দেখে আনন্দ হয়! ক্যালেণ্ডারের তারিখ মিলিয়ে জানা যায়, পুরো পাঁচ-পাঁচটা দিন আমরা জলের তলায় ছিলাম।

'যাহোক পাতাল-বাস হলো মামা।' মেজমামা ঘাড় নাড়লেন—'পাঁচদিন না তো—পাঁচ বচ্ছর।'

'পাতালে তো অ্যাদ্দিন কাটলো, এখন হাসপাতালে কদিন কাটে

কে জানে!' আমি বলি, 'যা বিস্কুট পেটে গেছে এই কদিনে। শুকনো বিস্কুট চিবুতে হয়েছে দিনরাত!'—

গোরা বলে, 'বারে বিস্কুট বুঝি খারাপ। ও তো খুউব ভাল জিনিস। বিস্কুট খেতে পেলে ভাত আবার খায় নাকি মানুষ!'

গোরার মামা গুম হয়ে থাকেন। তাঁর ভোট যে বিস্কুট আর গোরার পক্ষেই সেটা বোঝা যায় বেশ।

আমাদের বকু সশরীরে ঈশ্বরলাভের পর ভারী এক সমস্যায় পড়ে গেল। আর কিছু না—নিজের নামকরণের সমস্যার।

এ জন্মে ঈশ্বরলাভ হলে এইখানেই ফ্যাসাদ! অকস্মাৎ নাম থেকে নামান্তরে যাবার হাঙ্গামা। এজন্মে না পেলে এসব মুশকিল নেই, নাম বদলাতে হয় না; যথাসময়ে কলেবর বদলে ফেললেই চলে যায়। কিন্তু দেহরক্ষা না করে ঈশ্বরলাভ ভারী গোলমেলে ব্যাপার।

বকুর বরাতে এই গোলোযোগ ছিল—সশরীরে স্বর্গীয় হবার সঙ্কট। মরে যাবার পর যারা স্বর্গীয় হয়, বা, স্বভাবতঃই ঈশ্বর পায়—তারা বিনা সাধ্য-সাধনাতেই পেয়ে যায়; এইজন্য তাদের নামের আগে একটা চন্দ্রবিন্দু যোগ করে দিলেই চলে। যেমন ৺চিত্তরঞ্জন, ৺আশু মুখুজ্যে ইত্যাদি। স্বর্গত-র নামের আগে অনুস্বর ও বিসর্গের পরবর্তী চিহ্নটি দিয়ে লেখা দস্তুর—ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তিমে, বিসর্গের শেষে স্বর্গের চূড়ান্ত ব্যঞ্জনার যেটি সংক্ষেপ। সংক্ষিপ্ত স্বর্গীয় সংস্করণ। তবে উচ্চারণের সময়ে তোমরা যা খুশি পড়তে পারো: স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন কিংবা চন্দ্রবিন্দু চিত্তরঞ্জন বা ঈশ্বর চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন আপত্তি করতে আসবেন না।

বকুর বেলা আমাদের সে সুবিধে নেই। চন্দ্রবিন্দুযোগে বকুর নিজেরও

আপত্তি হতে পারে, তার মা বাবার তো বটেই এবং পাড়াপড়শীরাই কি ছেড়ে কথা কইবে? শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে না ডেকে হঠাৎ নাম-ডাকে ঈশ্বর হয়ে যাওয়া—ফাঁকতালে এতটা বাহাদুরি বরদাস্ত করতে তারা রাজী হবে না। সবাই কি হাসিমুখে যুগপৎ, পরের লাভ ও নিজের ক্ষতি স্বীকার করতে পারে? উঁহু।

ঈশ্বর? সে তো মুঠোর মধ্যে?—এরকম সন্দেহ যার মনে ঘুণাক্ষরেও জেগেছে, সে-ই পিতৃদত্ত নাম পালটে নতুন নামে উত্তীর্ণ হয়। ব্যাঙাচি বড় হলেই তার ল্যাজ খসে যায়, ওরফে, ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে গেলেই সে বড় হয়। অতএব পৈতৃক নাম খসে গেলেই বুঝতে হবে যে লোকটা কিছু যদি হাতাতে পেরে থাকে তো সেই কিছু—আর কিছু না, খোদ ঈশ্বর।

এখন, আমাদের বকুও ঈশ্বরকে বাগিয়ে ফেলেছে। তারপরেই এই নতুন নামকরণের নিদারুণ সমস্যা।

আনন্দ যোগ করে একটা উপায় অবশ্যি ছিল; কিন্তু কেউ কি তার কিছু বাকি রেখেছে আর? বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে আড়ম্বরান্দ, বিড়ম্বনানন্দ পর্যন্ত যা কিছু ভালমন্দ এবং ভালমন্দের অতীত আনন্দদায়ক নাম ছিল, সবই বকুর বেদখলে। এই কারণে বকু ভারী নিরানন্দ কদিন থেকে। দেখা যাছে, ঈশ্বর হাতানো যত সোজা, ঐশ্বরিক নাম হাতড়ানো ততটা সহজ নয়।

অনেক নামাবলী টানা-ছেঁড়ার পর একটা আইডিয়া ধাক্কা মারে আমার মাথায়: 'আচ্ছা ব্যাকরণ মতে একটা নাম রাখলে হয় না?'

'ব্যাকরণের নাম—কি রকম নাম—কি রকম শুনি আবার?' বকু একটু আশ্চর্যই হয়। কিন্তু নিমজ্জমান লোকের কুটোটিকেও বাদ দিলে চলে না এবং কুটোটি এগিয়ে দিয়ে পরের উপকার করতে, ঈশ্বর যে পায় নি, সেও কদাচই পরাঙ্মুখ হয়।

সোৎসাহে আমি অগ্রসর হই: 'এই যেমন—এই ধর না কেন, বকু ছিল ঈশ্বর—'

সে বাধা দেয়: 'বারে! আমি আবার ঈশ্বর ছিলাম কবে?'

'ছিলে কি ছিলে না তুমিই জানো! আমার জানা থাকার কথা নয়। ব্যাকরণের ব্যবস্থাটাই বলছি আমি কেবল। বেশ, তাহলে এই ভাবেই ধরো—বকু হলো ঈশ্বর এ—তো হয়? হতে পারে তো?'

'বাঃ! আমি হবো কেন?' সে আপত্তি করে, 'আমি তো কেবল ঈশ্বরকে পেলাম!'

'বেশ, তাই সই। তবে এই রকম হবে—বকু পেল ঈশ্বর ইতি বক্কেশ্বর। কেমন, হলো এবার?'

ততটা মনঃপুত হয় না বকুর। কিন্তু অনেক টানা-হ্যাঁচড়ার পর কষ্টেসৃষ্টে এই একটা বেরিয়েছে, এটাও খোয়ালে, অগত্যা বিনামা হয়েই থাকতে হবে বকুকে, কিংবা নেহাত কোনো বদনামই না বইতে হয় শেষটায়, একথা স্পষ্টা-

স্পষ্টই আমি ওকে জানিয়ে দিই।

'ব্যাকরণের সূত্রটা কি শোনা যাক তো?'

'যাকে বলে একেবারে দীর্ঘসূত্র।' আমি ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাই। 'সন্ধিও বলতে পারো। সমাসও বলা যায়। সমাস হলে হবে দ্বন্দ্ব সমাস—বকুশ্চ ঈশ্বরশ্চ—'

আর বলতে হয় না। নামের মহিমায় বকু বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিগলিত বকু প্রগলভ হয়ে ওঠে, 'বাঃ বেশ নাম! নামের মতো নাম! বক্কেশ্বর! বকু ছিল—নাঃ, ছিল কি? ছিল কেন? এ তো অতীতের কথা নয়—বকু হলো—হ্যাঁ—হওয়া আর পাওয়া একই। হলেই পায়, পেলেই হয়—বকু হলো ঈশ্বর। আবার আবার ব্যাকরণসিদ্ধও বটে? কটা সিদ্ধপুরুষের আছে এমন নাম। বকুশ্চ ঈশ্বরশ্চ—যেন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা! খাসা!'

সেই থেকে দ্বন্দ্ব সমাসে ঈশ্বরের সঙ্গে ওর সন্ধি স্থাপিত হয়েছে এবং মার্বেলের ট্যাবলেট পড়েছে বাড়ির সদরে: স্বামী বক্কেশ্বর পরমহংস।

ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে জড়িত হবার ঢের আগে থেকেই বকু বেচারা আমাদের ঈশ্বরে জর্জরিত। ছোট বেলা থেকেই ওর ঈশ্বর-উপার্জনের দুরভিসন্ধি। সদ্য প্রকাশিত ওর নিজের কথামৃতে রয়েছে: 'বরাবরই আমার ঝোঁক ছিল, এই পরম বর্বরের দিকে। বাড়িই বলো আর জুড়িগাড়িই বলো কিংবা জারিজুরিই বলো এসবই পেতে হবে বর্বর হয়ে। বর্বরতা ব্যতিরেকে এসব লভ্য হবার নয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। বল আর বর্বরতা এক; দ্যাখো ভুতপূর্ব ইংরেজ আর বর্তমান জাপানকে, দ্যাখো অভুতপূর্ব হিটলার মুসোলিনী আর চেঙ্গীজ খাঁকে। এইসব বর্বর শক্তির মূলে আছেন সেই বর্বর শক্তিমান মহাবর্বর। হিটলারের হিট-এর যোগান এই কেন্দ্র থেকেই। মুসোলিনীর মুষল ইনিই। প্রচুর অর্থ বা প্রচুর অনর্থ যাই করতে চাও না কেন, খোদ ভগবানের কাছ থেকেই তার ফন্দি ফিকির জেনে নিতে হবে। এই রহস্য হচ্ছে উত্তম রহস্য-উপনিষদের রহস্যমুত্তমম্। তাঁর কাছ থেকেই জানতে হবে সুকৌশলে। কায়দা করে। সহজে জানান্ দেবার পাত্র তিনি নন—যোগবলেই তাঁকে টের পাবে। যোগঃ কর্মসুকৌশলম। এবং তার ফলেই হবে বলযোগ। অচিরাৎ এবং নির্ঘাৎ।'

এই কথামৃত পড়ার পর থেকেই আমার ধারণা বলবৎ হয়েছে যে, বৈধ বা অবৈধ যে কোনো উপায়ে হোক, ঈশ্বরকে আত্মসাৎ না করে ও ছাড়বে না। আর তার পরেই ওর কেল্লা ফতে—বাড়িই কি আর দাড়িই কি, জুড়িই কি আর ছুঁড়িই কি—সবই ওর হাতের আওতায়। তখন ওকে কে পায়!

হ্যাঁ, যা বলছিলুম···ছোটবেলার থেকেই ওর এই ভাগবৎ দৌর্বল্যের কথা। সেই কালেই একদিন ওর বাড়িতে গিয়ে যে-দুর্ঘটনা দেখেছিলাম তাতেই আমার আন্দাজ হয়েছিল যে ঈশ্বর না পেয়ে ওর নিস্তার নেই। বকু তখন স্কুলের ছাত্র,

সেকেণ্ড ক্লাসে এবং হাফ্ প্যান্টে। যদি পড়ার কথাই ধরো, বইয়ের চেয়ে প্যাণ্টেই ছিল ওর বেশি মনোযোগ—প্যাণ্টই ছিল ওর একমাত্র পাঠ্য। এবং অদ্বিতীয়। প্রায় সময়েই বইয়ের পড়া না, প্যাণ্ট পরা নিয়েই ওকে বিব্রত দেখেছি।

এমনি একদিন গেছি ওদের বাড়ি, ক্লাস পরীক্ষার ফলাফলের বৃত্তান্ত নিয়ে, গিয়ে দেখি বকু এবং বকুর বাবা মুখোমুখি বসে—আর বকু দিচ্ছে বাবাকে ধর্মোপদেশ। কথাগুলো ঠিক ধরতে পারলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম যে বড় বড় বাণী গড় গড় করে বকে যাচ্ছে বকু—বোধহয় মুখস্থ কোনো বই থেকে—আর হাঁ করে শুনছেন ওর বাবা।

আমাকে দেখে বকু সহসা থেমে যায়, 'কিরে কি খবর?'

'পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে—' আমি ইতস্তত করি, 'বল—বলবো কি?'

'বল না কি হয়েছে?'

'ফেল গেছিস তুই! বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, পালি—সব সাবজেক্টেই।' বলে ফেলি আমি।

সামলাতে একটু সময় লাগে বকুর, ওর বাবার হাঁটা কেবল আরো একটু বড়ো হয়। বকু বলে—'যাক, সংস্কৃতে যে পাস করেছি এই ঢের। ওতেও তো ফেল যেতে পারতুম। তবু ভাল।'

'সংস্কৃত তোর ছিল না, তুই পালি নিয়েছিলিস তো!'

আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে বকু যেন কেমন হয়ে গেল হঠাৎ! 'ও—তাই নাকি!' এই বাঙ্নিষ্পত্তি করেই তার চোখ দুটো ঠেলে কপালে উঠল, নাক গেল বেঁকে, মুখ গেল সাদা ফ্যাকাসে মেরে।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে ওকে ধরতে গেলাম। ওর বাবা আমাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন—তারপর আস্তে আস্তে ওর চোখ বুজে এল, ঘাড় হোল সোজা, সারা দেহ কাঠ হয়ে অনেকটা ধ্যানী বুদ্ধের মতো হয়ে গেল বকু।

আমি যেন সার্কাস দেখছি তখন, কিন্তু ঠিক উপভোগ করতে পারছি না, এমন সময়ে ওর বাবা বললেন—'ভয় পেয়ো না, ভয়ের কিছু নেই। ওর সমাধি হয়েছে!'

'সমাধি? সমাধি কি? মরে গেলেই তো সমাধি হয়!' আমি এবার সত্যিই ভয় পাই. 'যাকে বলে কবর দেয়া! তাহলে বকু কি আর বাঁচবে না?' আমার কণ্ঠস্বর কাঁদো কাঁদো।

'না না—মরবে কেন। বেঁচেই আছে, জলজ্যান্ত বেঁচে আছে!'

'ও, বুঝেছি!' আমি মাথা নাড়ি—'জীবন্ত সমাধি! এরকম হয় বটে। অনেক সময়ে সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেলে এরকমটা হয়ে যায় নাকি!'

বকুর বাবা ঘাড় নাড়েন—'উঁহু, সে সমাধিও নয়। তাতে তো লোক মারা যায়, প্রায় সব লোকই মারা যায়—জলে ডুবেই মারা যায়। কিন্তু এ সমাধিতে

মরবার কিছু নেই, থাবি খায় না পর্যন্ত।'

তারপর একটু থেমে তিনি অনুযোগ করেন, 'এরকম ওর মাঝে মাঝে হয়। প্রায়ই হয়।'

'তবে বুঝি কোন শক্ত ব্যায়রাম?' সভয়ে জিজ্ঞেস করি।

'ব্যায়রাম! হ্যাঁ, ব্যায়রামই বটে!' অমায়িক মৃদু মধুর হাস্য ওর বাবার। 'কেবল ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষদেরই হয় এই ব্যায়রাম।'

'আমি এর ওষুধ জানি।' বলি ওর বাবাকে। 'আমার পিস্তুতো ভায়ের এই রকম হতো। ঠিক হুবহু। তারপর পাঁচু ঠাকুরের মাদুলি পরে ভাল হয়ে গেল। আপনি যদি ওকে মাদুলি আনিয়ে দ্যান, ও সেরে যাবে।'

'পাগল। এ পেঁচোয় পাওয়া নয়—যে সারবে। এ হচ্ছে ভগবানে পাওয়া —এ সারে না।' তাঁর কণ্ঠস্বর আশাপ্রদ কি হতাশাব্যঞ্জক ঠিক ধরতে পারি না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, 'আর একবার ভগবানের হাতে পড়লে, মানে ভগবানের হাতে কারু কি পরিত্রাণ আছে? তাঁর কাছ থেকে কি পালিয়ে বাঁচতে পারে কেউ?'

এই অভিযোগের আমি আর কি জবাব দেব? তবু ওঁকে আশ্বাস দিতে চেষ্টা করি, 'যদি বলেন, এখনকার মতো আমি বকুকে ভাল করে দিতে পারি?'

তিনি শুধু সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকান, কিছু বলেন না।

'আপনাদের বাড়ি নস্যি নেয় কেউ? এক টিপ ওর নাকে দিলেই এক্ষুনি—'

'খোকা, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ! সমাধির ব্যাপার বোঝা তোমার সাধ্য নয়। এ যে পরমহংসদেবের মতো! সমাধি সারানো নস্যির কর্ম না—তা পরিমলই দাও কি কড়া মকুথলই দাও।'

'নস্যির কর্ম নয়—তাহলে—তাহলে তো ভারী মুশকিল!' বেচারার দৈহিক বিপর্যয় দেখে দুঃখ হয় আমার। অজ্ঞান মানুষকে জ্ঞান দেবার ইচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার বশে যারা ডুবন্ত অবস্থায় জল খেয়ে বা আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষায় আত্মহারা হয়ে আফিং গিলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তাদের অভিরুচির তোয়াক্কা বা অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই তাদের ঠ্যাং ধরে প্রবল প্রতাপে আমরা ঘুরিয়ে থাকি, দুমদাম দুম্দাড় পিঠে কিলচড় সাঁটিয়ে যাই—তাদের দেহে লাগবে কি মনে ব্যথা পাবে কিছুমাত্রও একথা ভাবিনে, তাদের আবার ধাতস্থ করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনাতেই আমাদের আনন্দ।

'তাহলে তো সত্যিই ভারী মুশকিল!' একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলি কথাটা, 'অবশ্যি আরো একটা উপায় আছে সমাধি সারাবার। যদি বলেন—যদি বলেন আপনি—তবে য়্যাক চড়ে—'

মনে হলো বকু যেন চমকে উঠলো। চড়ের কথায় নড়েচড়ে বসলো যেন। কিন্তু সেদিকে দেখব কি, আমার চড়ের গুণই বা কি দেখাব, তার আগেই ওর বাবার চাড় দেখা গেল। ওর বাবা করেছেন কি, আমার কথা শুনেই না হাতের

কাছে ছিল এক ভাঙা ছাতা, তাই নিয়ে এমন এক তাড়া করলেন আমায়, যে তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে সটান ছাতে উঠে পাশের বাড়িতে টপকে পড়ি—বেচারা বকুকে সমাধির গর্ভে অসহায় ফেলে রেখেই পালিয়ে আসি প্রাণ নিয়ে। বকুর আগে আমাকে নিজেকে বাঁচতে হয়।

পরের দিন ইস্কুলে এসে বকুর কি না বকুনি আমায়।

'আমার সমাধি তুই কি বুঝিস রে হতভাগা? বোকা গাধা কোথাকার। জানিস শ্রীরামকৃষ্ণের, শ্রীচৈতন্যের সমাধি হতো? শ্রীবকুরও তাই হয়। তুই তার জানবি কি মুখ্যু? চড় দিয়ে উনি সমাধি সারাচ্ছেন! আহাম্মোক! সমাধি হলে কানের কাছে রাম নাম কৃষ্ণ নাম করতে হয় তাহলেই জ্ঞান ফিরে আসে। সবাই জানে একথা, আর উনি কিনা—'

বকুর আফশোস আর ফোঁস ফোঁস সমান তালে চলে। বাধা দিয়ে বলতে যাই—'রাম নামের মহিমা আমারও জানা আছে! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কিন্তু মারের চোটেও ভূত পালায় নাকি? তোকে পেঁচো ভূতে পেয়েছিলো তাই আমি—'

সেই মুহূর্তে মাস্টারমশাই আসেন ক্লাসে—বিতণ্ডা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই, বকুর কি বরাত জানি না; সেই পুরাতন দুর্লক্ষণের পুনরাবৃত্তি। মাস্টারমশাই পড়া নিয়ে কী প্রশ্ন করেছেন, বকু পারেনি; অমনি হুকুম হয়ে গেছে বেঞ্চির উপর নীল ডাউনের। আর নীল ডাউন হবার সঙ্গে সঙ্গেই বকুর সমাধি।

ব্যাপার দেখে ভড়কে গিয়ে মাস্টারমশাই তো জল আনতে ছুটে বেরিয়েছেন। ক্লাসসুদ্ধ সবাই গেছে হকচকিয়ে; কী করতে হবে ভেবে পাচ্ছে না কেউ। ভারী বিভ্রাট!

আমি ওর কানের কাছাকাছি গিয়ে রাম না, মার—কোনটা যে লাগাবো ঠিক করতে না পেরে বলেই ফেলি হঠাৎ—'চাঁটাও কসে থ্যাক চড়!'

যেই না এই বলা, অমনি বকু সমাধি আর নীল ডাউন ফেলে রেখে এক সেকেণ্ডে স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চি।

তারপর—তার পরদিনই বকু ইস্কুলে ইস্তফা দিল।

এসব তো বেশ কিছুদিন আগের কথা। ইতিমধ্যে বকু বয়সে বেড়ে এবং বুদ্ধিতে পেকে যে ঈশ্বরকে নিয়ে বাল্যকালে তার নিতান্তই খুচরো কারবার ছিল তাকেই এখন বেশ বড়ো রকমের আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে ফলাও রকমে ফাঁদতে চায়। আর সেই জন্যেই ওকে জাঁকালো রকমের নাম নিতে হচ্ছে, শ্রীমৎ বক্কেশ্বর পরমহংস। যে কোনো ব্যবসাতেই নামটাই হচ্ছে আসল। সেইটাই গুড-উইল কিনা।

বকু থেকে বক্কেশ্বর হবার পর, অনেকদিন আর যাওয়া হয়নি ওর কাছে। ভাবলাম যাই একবার। ঈশ্বরই লাভ করেছে বেচারা; কিন্তু ঈশ্বরকে ভাঙায়ে

আরো কতদূরে কী লাভ—কোনো সুরাহা করতে পারলো দেখে আসা যাক। পুরো টাকাটা পেয়ে কোনোই সুখ নেই—যদি না ষোলো আনায় ও চৌষট্টি পয়সায়—এবং কত আধলায় কে জানে—তার বহুল ও বহুবিস্তৃত হবার সম্ভাবনা থাকে। যে টাকাকে আনায় আনা যায় না, তা নিতান্তই অচল টাকা। তাকে পাওয়াও যা, না পাওয়াও তাই—একেবারেই বদলাভ বলতে গেলে।

বকুই আমাকে বলেছিল একথা। 'যে ঈশ্বর ব্যাঙ্কে বাড়েন না তিনি নিতান্তই বক্কেশ্বর। বক্কেশ্বরের তাঁকে আদৌ—কোন দরকার নেই। অকেজো জিনিসের ঝামেলা কে সইবে বাপু?'

গিয়ে দেখি বেশ ভীড় ওর বৈঠকে। ঘর জুড়ে শতরঞ্জি পাতা, ভক্ত শিষ্য পরিবেষ্টিত বকু মাঝখানে সমাসীন। নির্লিপ্ত; নির্বিকার প্রশান্ত ওর মুখচ্ছবি—কেমন যেন ভিজে-বেড়াল ভাব।

আমিও গিয়ে বসি একপাশে, ও দেখতে পায় না, কিংবা দেখেও দেখে না; কে জানে!

ভক্তদের একজন তখন প্রশ্ন করেছে, 'প্রভু; ব্রহ্ম কি? ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধই বা কি?'

প্রথমে বকুর মৃদু হাস্য—তারপরে বকুর সুমধুর কণ্ঠ। 'ব্রহ্ম! ব্রহ্মকে দেখা স্বয়ং ব্রহ্মারও অসাধ্য। আর ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ বলছ? সে হচ্ছে ডিমের সম্বন্ধ! এই জন্যেই জগৎকে ব্রহ্মাণ্ড বলে থাকে। আমাদের জন্যে ব্রহ্মের কোনোই হাপিত্যেশ নেই; আমরা বাঁচি কি মরি, খাই কি না খাই, খাবি খাই কি খাবার খাই তা নিয়ে ব্রহ্মের মোটেই মাথা ব্যথা করে না। মাথাই নেই তো মাথা-ব্যথা! ব্রহ্ম সে এক চীজ্। এই প্রত্যয় যার হয়েছে তাকেই বলা যায় ব্রহ্মালু। ব্রহ্মের আলু প্রত্যয় আর কি! খুব কম লোকেরই এই প্রত্যয় আসে জীবনে। যাদের হয় তাঁদেরই বলা হয় সিদ্ধ মহাপুরুষ। অর্থাৎ কিনা—'

ভিড়ের ভেতর থেকে আমি ফোড়ন কাটি, 'আলুসেদ্ধর মহাপুরুষ'।

ক্ষণেকের জন্য বকুর খইফোটা বন্ধ হয়, ভক্তরাও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিন্তু ভক্তির স্রোত কতক্ষণই বা রুদ্ধ থাকে! আরেক জনের প্রশ্ন হয়—'দেখুন, আপনি ভগবানকে মাতৃভাবে সাধনা করতে বলেছেন। কিন্তু মার কাছে যা চাই তাই পাই, কিন্তু ভগবানের কাছে চেয়ে পাই না কেন বলুন তো?'

ভারী মুশকিলের কথাই। এই নিদারুণ সমস্যার বকু কি সমাধান করে, জানবার আমারও বাসনা হয়।

বকুর আবার মৃদু হাস্য—তবে এবার হাসির পরিধি সিকি ইঞ্চি সংক্ষিপ্ত।

'আমরা কি ভগবানের কাছে চাই পাগলা? সত্যি সত্যিই কি তাঁকে মা বলে ভাবতে পারি? আমাদের প্রার্থনা তো রাম শ্যাম যদু মধুর কাছেই। তাদের কাছে চেয়ে-চিন্তে আমাদের পাওনা-গণ্ডা না পেলে তখন গিয়ে

ভগবানকেই গাল পাড়ি।'

'কিন্তু রাম শ্যাম যদু মধুর মধ্যেও কি সেই ভগবান—সেই মা নেই কি? তবে তাদের আচরণ ঠিক মাতৃবৎ হয় না কেন মশাই?'

'তার কারণ, সেই মা যখন সীমার মধ্যে আসেন তখন যে মাসীমা হয়ে পড়েন। মার চেয়ে মাসীর দরদ কি বেশি হয় কখনো? মাসীর যদি বা কদাচ দেবার ইচ্ছাই হয় সে নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ, কখনো বা হয়ই না; কখনো যদি বা হলো, দিলেন আবার ঠিক উল্টোটাই। তাই এত হা-হুতাশ।'

বকু তাক্ লাগিয়ে দেয় আমায়। এই সব মুরুব্বির মতো আর মোরব্বার মতো বোলচাল—যেমন মিষ্টি তেমনি গুরুপাক। অ্যাতো তত্ত্ব পেলো কোথায়। তবে কি সত্যিই ভগবান পেয়েছে নাকি? সন্দিগ্ধ হতে হয়। এ যে স্বয়ং পরমহংসদেবের মতোই প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাণ জল করা কথা সব। আমার নাস্তিক হৃদয়েও ভক্তির ছায়াপাত হতে থাকে।

এমন সময়ে জনৈক ভক্ত এক ছড়া পাকা মর্তমান নিয়ে এসে হাজির। দণ্ডবৎ হয়ে বকুর শ্রীচরণে কলার ছড়াটা নিবেদন করে দেন তিনি।

বকু হাত তুলে আশীর্বাদ জানায়—'জয়স্তু।'

তারপর একটা কলা ছাড়িয়ে মুখের কাছে তোলে—নিজের মুখের কাছে। কাকে যেন অনুনয় করে—'মা খাও!'

আমি চারিদিকে তাকাই, বকুর মাকে দেখতে পাই না কোথাও। তিনি হয়তো তখন তেতলায় বসে। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পান দোক্তাই চিবুচ্ছেন হয়ত। সেখান থেকে কি শুনতে পাবেন বকুর ডাক? তাছাড় হাজার অনুনয় বিনয়েও, তিনি কি আসতে চাইবেন এই দঙ্গলে? সাধের দোক্তা ফেলে খেতে চাইবেন এই কলা?

বকুর পুনরায় সকাতর অনুরোধ—'খাও না মা?'

তাহলে বোধহয় দরজার আড়ালেই অপেক্ষা করছেন উনি। এতক্ষণ হয়তো নেপথ্যেই বিরাজ করছিলেন।

আমি মার আগমনের প্রতীক্ষা করি, বকু কিন্তু করে না, কলাটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে, স্বচারুরূপে চিবিয়ে ফ্যালে একদম।

দ্বিতীয় কলাটিও ঐ ভাবে মুখের কাছাকাছি আনে। আবার বকুর বেদনামথিত আহ্বান—'মা। মাগো! খাও না মা! আরেকটা কলা খাও!'

আমি অবাক হই এবার। পাশের একটি ভক্তকে জিজ্ঞেস করি—'মহাপ্রভুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এমন করছেন কেন?'

শুনে তিনি তো চোখ পাকান, আরেকজন ঘুসি পাকায়। অবশেষে পেছনের একটি সদাশয় ভদ্রলোক আমাকে সব বুঝিয়ে দেন; তখন আমি জানতে পারি যে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের চিরদিনের আদা ও কাঁচকলার সম্পর্ক চেষ্টা করে ভুলে গিয়ে; আত্মীয়বোধে তাঁর সঙ্গে বাতচিত করা আধুনিক

ভাগবৎ সাধনারই একটা প্রত্যঙ্গ। তারপর আর বুঝতে দেরী হয় না আমার। অর্থাৎ ভগবানকে মা—মাসী বলে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে—আমাদের ধর্ম মা যেমন—ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু বাগিয়ে নেবার ফন্দি। ভগবানের সঙ্গে এহেন চালাকি আমার ভাল লাগে না। চালাকির দ্বারা—একে চালাকি করা ছাড়া কি বলব? কিন্তু চালাকির দ্বারা কি কোনো বড় কাজ হয়?

তৃতীয় কলার প্রাদুর্ভাবেই আমি প্রতিবাদ করি, 'উঁহু, মা বেচারীকে অত কলা খাওয়ানো কি ঠিক হবে? সর্দি হতে পারে মার। তার চেয়ে বরং এখানকার বাবাজীদের মধ্যে বিতরণ করলে কি হয় না?'

বকুর কদলী সেবন কিন্তু বাধা পায় না। চিবুতেই চিবুতেই সে বলে; 'হ্যাঃ, মার আবার সর্দি হয় নাকি? তিনি হলেন আদ্যাশক্তি। সর্বশক্তিময়ী! সর্দি হলেই হলো। আর যদি হয়ই, মা কি আমার আদা-চা খেতে জানেন না?

সাধ্য-সাধনায় লোকে ঢেঁকি গেলে, কলা তো কি ছার! সমস্ত ছড়াটাই বকুর মাতৃগর্ভে গেল। মা'র বিকল্পে বকুর অন্তরালে দেখতে না দেখতে হাওয়া!

তারপর একে একে 'মা আঁচাও' 'মা মুখ মোছ'—ইত্যাদি হয়ে যাবার পর, একটি পান মাতৃজাতির মুখে দিয়ে বকুর দ্বিতীয় কিস্তি কথামৃত শুরু হয়। মাঝে একবার একটা সমাধির ধাক্কাও সামলাতে হয় বেচারা বকুকে।

অবশেষে অনেক বেলায়, ভক্তদের সবার অন্তর্ধানের পর, থাকি কেবল বকু আর আমি।

'এই যে শিব্রাম যে! অনেকদিন পরে কি মনে করে?' ভারিক্কী চালে বকু বলে।

'এলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যাব বলে! 'মডার্ন টাইমস্' হচ্ছে মেট্রোয় চার্লি চ্যাপলিনের। চল; দেখে আসা যাক আর হেসে আসা যাক খানিক।'

'আমার কত কাজ, কি করে যাই বল!' বকুর মুখ ভার।

'আচ্ছা, মাকে একবার জিজ্ঞেস করেই নাও না বাপু। তিনি তো এখনো দেখেননি ছবিটা। কিংবা যদি দেখেও থাকেন তো দেখেছেন সেই ফিল্ম তোলার সময় হলিউডে। তারপর সটান চলে এসেছে কলকাতায়, এই প্রথম শো।'

'আঃ, কী যা তা বকছ! মার এখন সময় কই?'

'তবে মাকে নাই নিয়ে গেলে, তোমাকে নিয়ে গেলেই হবে। মা'র কি মাসীমার কি যারই হোক, অনুমতিটা নিয়ে নাও চটপট।'

'ভাই শিব্রাম,' বকুর দ্বিতীয় দফার দীর্ঘনিঃশ্বাস : 'ঈশ্বর ছাড়া কি কোনো কাম্য আছে আমার জীবনে? না, আর কোনো চিন্তা? না, কিছু দ্রষ্টব্য?

না। এখন ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য।'

'তা বেশ তো। লক্ষ্য তাই থাক না, কিন্তু সিনেমাটা উপলক্ষ্য হতে বাধা কি? চার্লি চ্যাপলিন—'

'তা হয় না ভাই শিব্রাম' বকু বাধা দিয়ে বলে—'তুমি নিতান্ত মূঢ়মতি! মহৎ গূঢ় রহস্য কি বুঝবে! লক্ষ্য মাত্রই ভেদ করার জিনিস তা তো মানো? কথায় বলে লক্ষ্যভেদ। ঈশ্বর যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তাহলে ঈশ্বরকেও ভেদ করতে হবে বৈ কি। ঈশ্বরকে ফাঁক না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

আমার কিরকম একটা ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর লক্ষ্য হতে পারেন কিন্তু ভেদ্য নন, কিংবা ভেদ্য হতে পারেন কিন্তু লক্ষ্য নন, অথবা ও দুয়ের কিছুই তিনি নন—সমস্ত ভেদাভেদের বিলকুল অতীত তিনি। সেই কথাটাই পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করতে যাচ্ছি কিন্তু পাড়তে না পাড়তেই সে আমাকে বাগড়া দয়ে, 'বাঃ, ভেদ করা যায় না কে বলল? ঈশ্বরকে ভেদ করেই তো আমরা এলাম। এলো এই বিশ্ব চরাচর! নইলে এলাম কোত্থেকে? ঈশ্বরকে ছিন্নভিন্ন ছত্রাকার করেই তো আমরা এসেছি—ধাবমান পলাতক বিধাতার ছত্রভঙ্গ আমরা। যা একবার ভেদ হয়েছে তা আবার ভেদ হবে! বার বার ভেদ হবে। তবে হ্যাঁ, দুর্ভেদ্য বটে।'

এই বলে সে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের উদাহরণ ঠেলে নিয়ে আসে আমার সামনে, আমার কিন্তু ওরফে ধনঞ্জয়ের, অধিকতর মুখরোচক দৃষ্টান্তে প্রহারের দুরভিসন্ধিই জাগতে থাকে মাথায়।

নিজেকে সামলে নিই কোনরকমে—না, এতখানি বরদাস্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার পিত্ত প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, একটা নিষ্কাম রাগ, নিঃস্বার্থভাবে তাকে ধরে অহেতুক পেটাবার সদিচ্ছা আমার পেটের মধ্যে প্রধূমিত হয়। না, বকু যদি এতটা বাড়ে তাহলে বকুকেই আমার জীবনের লক্ষ্য করে বসব কোনদিন! ধরে ঠ্যাঙাব, বা একেবারে ভেদ করেই ফেলব ওকে জরাসন্ধের মত সরাসরি। জরাসন্ধকে কে ফাঁক করেছিল? অর্জুন, না, ধনঞ্জয়—কে? সে যেই করুক, য়্যাডভাইস বা এগজাম্পলের পরোয়া নেই আমার, ওকেও আমি দেখে নেব, হুবহু, তা যাই থাক কপালে, মানে বকুর কপালে! আর বলতে কি, বকুকে আমার ততটা দুর্ভেদ্য বলে মনে হয় না আদপেই।

চটেমটেই চলে আসি—সেদিনকার মতো ওকে মার্জনা করে দিয়ে।

আসবার সময় সে রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'জানতে পাবে, ক্রমশঃই জানতে পাবে। অচিরেই প্রকাশ হবে সব। ভগবান যখন ফাটেন, বোমার মতোই ফাটেন! যেমনি অবাক করা তাঁর কাণ্ড—তেমনি কান ফাটানো তাঁর আওয়াজ! না দেখার, না শোনার মত কি! কতজনকে যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যান তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। ভগবানের মুখে যে পড়েছে তার কি আর রক্ষে আছে ভাই?'

দিনকতক পরে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি সঞ্চয় করে আবার যাই বকুর কাছে। দৃঢ়-সংকল্প হয়েই যাই, এবার বলা নেই কওয়া নেই, সোজা গিয়েই ওকে চটাতে শুরু করে দেব, তা যাই থাক বরাতে—ভক্তবৃন্দই এসে বাধা দিক কি মাসীমাই মাঝখানে পড়ুন। কারুর কথা শুনছিল না!

কিন্তু যাবার মুখে দোরগোড়াতেই প্রথম ধাক্কা। দেখি বকুর সাইনবোর্ড বদলেছে, 'শ্রীমৎ বক্কেশ্বর পরমহংসের' বিনিময়ে স্রেফ 'স্বামী বক্কানন্দ'! আমার মনে আঘাত লাগে, ভাল হোক মন্দ হোক বকু আমার বন্ধুই—বিনা হাফ্-প্যাণ্ট্ এবং হাফপ্যাণ্টের সময় থেকেই। ধনরত্ন কিছুই ওকে দিতে পারিনি, কেবল নাম-মাত্র দান করেছিলাম, তাও অভিমান বশে সে প্রত্যাখ্যান করল।

অভিমানবশে কি ক্রোধভরে, কে জানে। আমি ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে অনুযোগের স্বর তুলতেই ও বলে, 'আর ভাই, বোলো না! পাড়ার চ্যাঙড়াদের জ্বালায় পালটাতে হলো! 'পরমহংসে'র জায়গায় কেবল 'পরমবক' বসিয়ে দিয়ে যায়। চক্ দিয়ে; কালি দিয়ে উডপেন্সিল দিয়ে—যা পায় তাই। কাঁহাতক আর ধোয়া মোছা করি? আর যদি দিনরাত কেবল নিজের নাম নিয়েই পাগল হব, ভগবানকে তাহলে ডাকব কখন? কাল আবার আলকাতরা দিয়ে লিখে গেছে—সে লেখা কি ছাই সহজে ওঠে? ভারী খিটকাল গেছে কাল। তারপরই ভাবলাম ধুত্তোর নাম। নাম নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? রোজ রোজ নাম ধুয়ে খেতে হবে? বদলে ফেললুম নাম! তা বক্কানন্দ! এমন মন্দই বা কি হয়েছে?'

'শ্রীমৎ বক্কেশ্বর পরম্বক? আমি বলি, 'তাই বা এমনকি খারাপ হতো? ছেলেরা তো তোমার ভালই করছিল। বক্কানন্দের চেয়ে ভালই ছিল বরং।'

'বারে! তুমিও আবার বক বক করছ! বক যে একটা গালাগাল!' বকু বলে—দারুণ গালাগাল যে! হংসমধ্যে বকো যথা, পড়নি বইয়ে?'

'ধার্মিক মানুষদের তো বকের সঙ্গেই তুলনা করে। বলে বক—ধার্মিক। বক কি যা তা?' বকের পক্ষে আমি দাঁড়াই—'হাঁসের চেয়েও বক ভাল—এমন কি প্যাঁচার চেয়েও।'

'তোমার কাছে ভাল হতে পারে' বকু এবার চটে, 'আমার কাছে নয়। তোমার ইচ্ছা হয়, বকের মাদুলি বানিয়ে গলায় ঝোলাওগে। আমি কিন্তু বক দেখলেই মুছে ফেলব, মেরেই বসব একেবারে। কেউ যদি একবার আমাকে বক দেখায়। যদি হাতের নাগালে পাই কাউকে।' বকু গজরাতে থাকে।

'তা থাকগে।' আমি ওকে ঠাণ্ডা করি, 'ব্যাকরণ থেকে বের করা ছিল কিনা নামটা, তাই বলছিলাম—!'

'বাঃ, এতেও তো ব্যাকরণ বজায় আছে। বিলক্ষণ! বকু ছিল আনন্দ কিংবা বকু পেল আনন্দ অথবা বকুর হল আনন্দ ইতি বক্কানন্দ! এমন কি মন্দ?'

'কিন্তু এই যে নামের গোড়ায় স্বামী বসিয়েছ! স্বামী কেন আবার?'

'বাঃ তাও জানো না? স্বামী বসাতে হয় যে। বিয়ে না করলেও বসানো যায়।' আমার বোকামিতে বকুর বিস্ময় ধরে না—'তার ওপরে আমি তো বিয়েও করতে যাচ্ছি শিগগির।'

আমি আকাশ থেকে পড়ি—'বল কি? বিয়ে? এই এত বয়সে?'

'অবাক হচ্ছ যে! বিয়ে কি করতে নেই?' বকু বলে, 'দুদিন বাদে বকানন্দও লোপ পাবে আমার। থাকবে কেবল স্বামী। শুধুই স্বামী।'

'হ্যাঁ?'

'তোমাকে লক্ষ্যভেদের কথা বলেছিলাম না? সে লক্ষ্যভেদ হয়ে গেছে আমার অ্যাদ্দিনে।'

'হ্যাঁ? বলো কি? ঈশ্বরকে ফাঁক করেছো তাহলে?'

'একেবারে চৌচির—এই দ্যাখো।' ব্যাঙ্কেরএকাটা পাস বই বের করে আমাকে দেখায়, তাতে বকুর নামে লক্ষ টাকা জমা। পুনরায় আমার পিলে চমকায়।—'এ্যাঁ! এত টাকা বাগালে কোত্থেকে?'

'ভক্তদের কাছে থেকে প্রণামী পাওয়া সব। ধারও আছে কিছু কিছু—তাও বেশ মোটারকমের। তবে ধর্তব্য নয়। ফেরত দেবার কোনো কথা নেই।

'ভক্তদের ফাঁকি দেবে? বেচারাদের?'

'ভক্তিতে মানুষকে কানা করে। গুরুর কাজ হচ্ছে চক্ষুদান করা। এইজন্যে গুরুকে বলেছে জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। সেই গুরুতর কাজটাই করছি আমি কেবল।'

'বারে আমার ভাই বক্কানন্দ!' বলে আমি তারিফ করি—'বাহবা কি বাহবা! গদাম্—গদাম্—গুম্!'

শেষের কথাগুলো বলে আমার দক্ষিণহস্ত···ওর প্রশস্ত পিঠে—বেশির ভাগ অব্যয় শব্দ সব হাতের অপব্যয় থেকেই আসে তো!

আমার তারিফের তাল সামলাতে ওর সময় লাগে। এটা অনুরাগের বহর, না কি, অনেকদিনের রাগের ঝাল···ও ঠিক বুঝতে পারে না। আমিও না।

পুনরাবৃত্তির সূত্রপাতেই ও পিছিয়ে যায়। 'আমি চললুম ব্যাঙ্কে। য়্যাদ্দিন শুধু সমাধিই করেছি। এবার সমাধা করি!'

আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। লক্ষ টাকা ভেদ করা কি চারটি খানি? দুর্ভেদ্য রহস্যের মতোই বকুকে বোধ হতে লাগল আমার।

ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে গেলে সে ব্যাঙ হয়, আরো বড়ো হলে তার ব্যাঙ্ক হয় তারপরে যখন ঠ্যাংটাও খসে যায় তখন থাকে শুধু ব্যা।

তা; ভক্তদের কাছে অপদস্থ হলেও বকুর আর কোনো তোয়াক্কা নেই। সে আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে। নতুন ব্যা—করণে।

ভক্তরা ওর পীঠস্থানে যদি পাদ্যার্ঘ দেয় তাতেই বা কি যায় আসে ওর এখন?

একটি স্বর্ণঘটিত দুর্ঘটনা

বিশ্বেশ্বরবাবু সবেমাত্র সকালের কাগজ খুলে বিশ্বের ব্যাপারে মনযোগ দেবার চেষ্টা পাচ্ছেন, এমন সময়ে বিশ্বেশ্বর-গৃহিণী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। 'ওগো সর্বনাশ হয়েছে—!'

বিশ্বজগত থেকে তার বিনীত দৃষ্টিকে অপসারিত করেন বিশ্বেশ্বরবাবু। চোখ তুলে তাকান গৃহিণীর দিকে।

'ওগো আমার কি সর্বনাশ হলো গো। আমি কি করবো গো—!'

বিশ্বেশ্বরবাবুকে বিচলিত হতে হয়। 'কি—হয়েছে কি?'

'চুরি গেছে। আমার সমস্ত গয়না। একখানাও রাখেনি গো'—

বিশ্বেশ্বরবাবুর বিশ্বাস হয় না প্রথমে। ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেন তিনি। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন—'ও! গয়না চুরি! তাই বলো! আমি ভেবেছি না জানি কি!' বিশ্বেশ্বরবাবু যোগ করেন। তাঁর য়্যানাটমিতে ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

'আমার অত গয়না! একখানাও রাখেনি গো!'

'একখানাও রাখেনি নাকি!' বিশ্বেশ্বরবাবুর বাঁকা ঠোঁটে ঈষৎ হাসির আভাস যেন উঁকি মারে। 'তা হলে ভাবনার কথা তো।'

বিশ্বেশ্বরবাবুর ভাবভঙ্গি গৃহিণীকে অবাক করে, কিন্তু অবাক হয়ে থাকলে শোক প্রকাশের এমন সুযোগ হারাতে হয়। এহেন মাহেন্দ্র যোগ জীবনে কটা আসে? 'ভাবনার কথা কি গো! আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে

করছে। কে আমাদের এমন সর্বনাশ করে গেল গো'—তারস্বর ছাড়তে উদ্যত হন তিনি।

'যাক, যেতে দাও। যা গেছে তার জন্য আর দুঃখ করে কি হবে?'—হাসি-মুখেই বলেন বিশ্বেশ্বরবাবু—'গতস্য শোচনা নাস্তি বুদ্ধিমানের কার্য।'

এহেন বিপর্যয়ের মধ্যেও হাসতে পারছেন বিশ্বেশ্বরবাবু? সর্বস্বান্ত হয়ে দুঃখের ধাক্কায় তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো? না, গিন্নীকে সান্ত্বনা দিতেই তাঁর এই হাসিখুশির ভান? কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না, না পেরে আরো তিনি বিগড়ে যান—'তুমি বলছ কি গো! হায় হায়, আমার কি সর্বনাশ হল গো!' বাজখাই গলা বার করেন গৃহিণী।

'আরে থামো থামো, করছ কি।' এবার বিশ্বেশ্বরবাবু সত্যিই বিচলিত হন—'চেপে যাও, পাড়ার লোক জানতে পারবে যে!'

'বয়েই গেল আমার!'—গিন্নী খাপ্পা হয়ে ওঠেন—'আমার এত টাকার গয়না গেল আর পাড়ার লোক জানতে পাবে না। কোনদিন গা সাজিয়ে পরতে পেলুম না, দেখাতেও পেলুম না হিংসুটেদের। জানুক না মুখপোড়ারা—মুখপুড়িরা।'

'উহুঁহুঁ, তুমি বুঝছ না গিন্নী!'—বিশ্বেশ্বরবাবু মুখখানা প্যাঁচার মতো করে আনেন—'চুরির খবর পেলে পুলিস এসে পড়বে যে!'

'পুলিস?' পুলিসের কথায় গিন্নীর ভয় হয়।

'আর পুলিস এলেই বাড়িঘর সব খানাতল্লাসী হবে! আষাঢ়ের ঘন মেঘে বিশ্বেশ্বরবাবুর হাঁড়ি-পানা মুখে ভারী হয়ে আসে। 'সে এক হাঙ্গামা।'

এবার ভড়কে যান গিন্নী।—'কেন, চুরি গেলেই পুলিসে খবর দেয় এই তো জানি। চোরেই তো পুলিসের কিনারা করে।' পরমুহূর্তেই ভুল শুধরে নেন—'উহু! পুলিসেই তো চুরির কিনারা করে, চোরকেও পাকড়ায়!'

'সে হাতেনাতে ধরতে পারলেই পাকড়ায়'—বিশ্বেশ্বর গোঁফে মোচড় দেন, 'তা না হলে আর পাকড়াতে হয় না।'

'হ্যাঁ হয় না;'—গিন্নী মাথা নাড়েন, 'তুমি বললেই আর কি?'

'তা তেমন পীড়াপীড়ি করলে নিয়ে যায় পাকড়ে। একটাকে নিয়ে গেলেই হলো! এখানে চোরকে হাতে না পেয়ে আমাকেই ধরে কিনা কে জানে!'

'তোমাকে কেন ধরতে যাবে?' গিন্নীর বিস্ময় হয়।

'সব পারে ওরা। হাঁস আর পুলিস, ওদের পারতে কতক্ষণ?' বিশ্বেশ্বর-বাবু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন, 'তবে তফাত এই, হাঁস পাড়ে হাঁসের ডিম। আর ওরা পারে ঘোড়ার ডিম। ঘোড়ার ডিমের আবার মামলেটও হয় না, একেবারে অখাদ্য।' তাঁর মুখ বিকৃত হয়।

'তোমাকে কক্ষনো ধরবে না।'—গিন্নী সজোরে বলেন।

'না ধরবে না আবার। আমাকেই তো ধরবে।' বিশ্বেশ্বরবাবুর দৃঢ়

বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। 'আর ধরলেই আমি স্বীকার করে ফেলব। তা বলে রাখছি কিন্তু। করাবেই ওরা আমাকে স্বীকার। স্বীকার করানোই হলো ওদের কাজ, তাহলেই ওদের চুরির কিনারা হয়ে গেল কিনা।'

'চুরি না করেও তুমি স্বীকার করবে চুরি করেছ?'

'করবই তো! পড়ে পড়ে মার খেতে যাব নাকি? সকলেই স্বীকার করে। করাটাই দস্তুর। আর নাও যদি মারে, হাজত বলে এমন একটা বিশ্রী জায়গায় আটকে রাখে শুনেছি সেখানে ভারী আরশোলা আর নেংটি ইঁদুর। আরশোলা আমার দুচক্ষের বিষ; আর নেংটি ইঁদুর? বাবাঃ, সে বাঘের চেয়েও ভয়ানক! অমন অবস্থায় পড়লে সকলকেই স্বীকার করতে হয়।'

'যদি তেমন তেমন দেখ না হয় স্বীকার করেই ফেল। তাহলেই ছেড়ে দেবে তো?'

'হ্যাঁ; দেবে। একেবারে জেলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে।'

'তবে কাজ নেই তোমার স্বীকার করে।'—গিন্নী এবার শান্ত হন, 'গয়না আমি চাই না।'

'হ্যাঁ, সেই কথাই বল! আমি বেঁচে থাকতে তোমার ভাবনা কি? আবার গয়না গড়িয়ে দেব নাহয়।'

'হ্যাঁ, দিয়েছ! সেবার বালিগঞ্জের জমিটা বিক্রী করেই তো হলো।'

'এবার না হয় টালিগঞ্জের বাড়িটাই বেচে ফেলব।'

এতক্ষণে গিন্নীর মুখে হাসি দেখা দেয়—'জমিটা বেচে পাঁচ হাজার টাকার গয়না হয়েছিল। পুরানো বাড়ির আর কত দাম হবে?'

'যতই কম হোক, বিশ হাজারের কম তো না। আমি ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর চেয়ে গয়না গড়িয়ে রাখতেই বেশি ভালবাসি। তুমি তো জানো! মাটিতে পুঁতে রাখার চেয়েও ভাল।'—একটু দম নেন।—'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। জলে ফেলে দেওয়ার চেয়েও।'

'কিন্তু এত টাকার গয়না! পুলিসে খবর না দাও, নিজে থেকেও একটু খোঁজ করলে হতে না! হয়তো পাওয়া যেত একটু চেষ্টা করলে।'

'হ্যাঁ; ও আবার পাওয়া যায়। যা যায় তা আর ফেরে না। ও আমি অনেকবার দেখেছি। কেবল খোঁজাখুঁজিই সার হবে!' বিশ্বেশ্বরবাবু বুড়ো আঙুল নাড়েন।

'তবু'—গিন্নীর তথাপি খুঁত-খুতুনি যায় না।

'খুঁজব কি, কে যে নিতে পারে তা তো আমি ভেবেই পাচ্ছি না।' বিশ্বেশ্বরবাবু কপাল কোঁচকান, 'কার যে এই কাজ?'

'কার আবার! কার্তিকের! তা বুঝতেও তোমার এত দেরি হচ্ছে? যে চাকর টেরি কাটে, সে চোর না হয়ে যায় না।'

'কার্তিক? এতদিন থেকে আছে, অমন বিশ্বাসী? সে চুরি করবে? তা

কি হয় কখনো ?'

'সে করবে না তো কি আমি করেছি ?' গিন্নী এবার ক্ষেপে যান।

'তুমি ?'—বিশ্বেশ্বরবাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান—'তোমার নিজের জিনিস নিজে চুরি করবে ? আমার বিশ্বাস হয় না।'—

'তাহলে কি তুমি করেছ ?'

'আমি ? অসম্ভব।' বিশ্বেশ্বরবাবু প্রবলভাবে ঘাড় নাড়েন।

'তুমি করোনি, আমিও করিনি, কার্তিকও করেনি—তাহলে কে করতে গেল ? বাড়িতে তো এই তিনটি প্রাণী !' গৃহিণী অন্তরের বিরক্তি প্রকাশ করেই ফেলেন।

'তাই তো ভাবনার বিষয়।' বিশ্বেশ্বরবাবু মাথা ঘামাবার প্রয়াস পান,—এইখানেই গুরুতর রহস্য !' গোয়েন্দার মতো গোলমেলে হয়ে ওঠে তাঁর মুখ।

'তোমার রহস্য নিয়ে তুমি থাকো, আমি চললুম। গয়না গেছে বলে পেট তো মানবে না, চলে যেতে যেতে বলে যান গিন্নী, 'তুমি টালিগঞ্জের বাড়িটার বিহিত কর এদিকে, তাছাড়া আর কি হবে তোমাকে দিয়ে ! গয়নার কি গতি করতে পারি, আমি নিজেই দেখছি।'

'কার্তিককে কিছু বোল না যেন। প্রমাণ নেই, বৃথা সন্দেহ করলে বেচারা আঘাত পাবে মনে।'—কর্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

'কি করতে হয় না হয় সে আমি বুঝব।'

'আর পাড়ায় কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।' বিশ্বেশ্বরবাবু ঈষৎ ব্যস্তই হন,—'চুরি যাওয়া একটা কেলেঙ্কারীই তো ?'

'অত টাকার গয়না, একদিন গা সাজিয়ে পরতেও পেলুম না। তোমার জন্যেই তো। কেবলই বলেছ, গয়না কি পরবার জন্যে। ও-সব বাক্সে তুলে রাখবার জন্যে ! এখন হল তো; সব নিয়ে গেল চোরে ?' গিন্নীর কেবল কাঁদতে বাকী থাকে।

'সে তো তোমার ভালর জন্যেই বলেছি। পাড়ার লোকের চোখ টাটাবে। তোমায় হিংসে করবে—সেটা কি ভাল ?'

'বেশ; তবে এবার ওদের কান টাটাক। আমি গলা ফাটিয়ে ডাক ছেড়ে বলব যে, আমার অ্যাতো টাকার গয়না ছিল। বলবই তো !'

'উহুঁহুঁ। তাহলেই পুলিসে জানবে। চুরির কিনারা হবে, ভারী হাঙ্গামা। ও নিয়ে উচ্চবাচ্যও কোরো না। আমি আজ বিকেলেই বরং টালিগঞ্জে যাচ্ছি।'

গিন্নী চলে গেলে আবার খবরের কাগজ নিয়ে পড়েন বিশ্বেশ্বরবাবু। নিজের গৃহের সমস্যা থেকে একেবারে স্পেনের গৃহ সমস্যায়। বিশ্ব ব্যাপারে ওতঃপ্রোত হয়ে কতক্ষণ কাটে বলা যায় না, হঠাৎ সদর দরজায় প্রবল কড়া নাড়া ওঁকে সচকিত করে। নিচে নেমে যেতেই পাড়ার সবাই ওঁকে ছেঁকে ধরে।

'কোথায় গেল সেই বদমাইশটা ?' তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে সবাই।

'কে গেল কোথায় ?' বিশ্বেশ্বরবাবু বিচলিতই হন।

'সেই গুণধর আপনার চাকর ? কার্তিক ? চুরি করে পালিয়েছে বুঝি ?'

'পালিয়েছে ? কই তা তো জানি না ! কার চুরি করল আবার ?'

'আপনাকেই তো পথে বসিয়ে গেছে আর আপনিই জানেন না ? আশ্চর্য !'

'আমাকে ? পথে বসিয়ে ?' বিশ্বেশ্বরবাবু আরো আশ্চর্য হন, 'আমি তো এতক্ষণ ওপরেই বসেছিলাম।'

'দেখুন বিশ্বেশ্বরবাবু, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে যাবেন না। আপনার ও চাকরটি কম নয়। আমরা তখন থেকেই জানি। যে চাকর টেরি কাটে, সে চোর ছাড়া আর কি হবে ? আমরা সবই জানতে পেরেছি; আপনার গিন্নীর থেকে আমাদের গিন্নী; আমাদের গিন্নীদের থেকে আমরা।'

'হ্যাঁ, কিছুই জানতে বাকি নেই।' জনতার ভেতর থেকে একজন বেশি উৎসাহ দেখায়—'এখন কোথায় গেল সেই হতভাগা ! পিটিয়ে লাশ করব তাকে। সেই জন্যই আমরা এসেছি।'

'দেখুন, সমস্তই যখন জেনেছেন তখন আর লুকোতে চাই না।'—বিশ্বেশ্বরবাবু বলেন,—'কিন্তু একটা কথা। মেরে কি লাভ হবে ? মারলে অন্য অনেক কিছু বেরুতে পারে, কিন্তু গয়না কি বেরুবে ?'

'আলবত বেরুবে।'—তাদের মধ্যে দারুণ মতের ঐক্য দেখা যায়, 'বার করে তবে ছাড়বো। বেরুতেই হবে।'

বিশ্বেশ্বরবাবু দেখেন, এরা সব বাল্যকাল থেকে এখন পর্যন্ত এ যাবৎকাল বাবার কাছে, মাস্টারের কাছে, স্কুলে আর পাঠশালায়, খেলার মাঠে আর সিনেমা দেখতে গিয়ে সার্জেন্টের আর গুণ্ডার হাতে যেসব ঠেঙান, ঠোক্কর আর গুঁতো খেয়ে এসেছে আজ সুদে আসলে নিতান্তই ধরা পড়ে যাওয়া কার্তিককেই তার সমস্ত শোধ দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। বেওয়ারিশ মাথায় চাঁদা করে চাঁটাবার এমন অর্ধোদয়যোগ সহজে এরা হাতছাড়া করবে না। তবু তিনি একবার শেষ চেষ্টা করেন—'একটা কথা ভাবার আছে। শাস্ত্রে বলে ক্ষমা হি পরমো ধর্মঃ। মার্জনা করে দেওয়াই কি ভাল নয় ওকে ?'

'আপনার চুরি গেছে আপনি ক্ষমা করতে পারেন। আপনার চাকর আপনি তো মার্জনা করবেনই। কিন্তু আমরা পাড়ার পাঁচজন তা করতে পারি না।'

'কি মুশকিল, কি মুশকিল ! তাহলে এক কাজ করুন আপনারা। অর্ধেক লোক যান হাওড়ায়, অর্ধেক শেয়ালদায়। এই দুটো পথের একটা পথেই সে উধাও হয়েছে এতক্ষণ।'

পাড়ার লোকেরা হতাশ হয়ে চলে যায়। পলায়মান চোরের পশ্চাদ্ধাবনের উৎসাহ প্রায় কারোরই হয় না। বিশ্বেশ্বরবাবুর আবার কাগজের মধ্যে ফিরে আসেন। এমনই সময়ে টেরি-সমন্বিত কার্তিকের আবির্ভাব।

'কি রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?'—বিশ্বেশ্বরবাবু খবরের কাগজ থেকে

চোখ তোলেন। 'সকাল থেকে তো দেখতে পাইনি।' ওঁর কণ্ঠে সহানুভূতির সুর।

'আত্মীয়র বাড়ি গেছলাম'—আমতা আমতা করে কার্তিক। কিন্তু একটু পরেই ফোঁস করে ওঠে—'গেছলাম এক স্যাকরার দোকানে।'

বিশ্বেশ্বরবাবু যেন ঘাবড়ে যান—'আহা, কোথায় গেছলি আমি জানতে চেয়েছি কি! যাবি বই কি, একটু বেড়াতে টেড়াতে না গেলে হয়। বয়স হয়ে আর পেরে উঠি না তাই, নইলে আমিও এককালে প্রাতর্ভ্রমণ করতাম! রেগুলারলি।'

'গিন্নীমা আমার নামে যা-নয়-তাই বদনাম দিয়েছেন। পাড়ায় কান পাতা যাচ্ছে না—' চাপা রাগে ফেটে পরতে চায় কার্তিক।

বাধা দেন বিশ্বেশ্বরবাবু—'ওর কথা আবার ধরে নাকি! মাথার ঠিক নেই ওর। তুই কিছু মনে করিসনে বাপু।'

'আমি কিনা—আমি কিনা—!' কার্তিক ফুলে ফুলে ওঠে। অকথ্য উচ্চারণ ওর মুখ দিয়ে বেরুতে চায় না।

'আহা, কে বলছে!'—বিশ্বেশ্বরবাবু সান্ত্বনা দেন, 'আমি কি বলেছি সে কথা? বলিনি তো? তা হলেই হল।'

'পাড়ার পাঁচজনে নাকি আমায় পুলিসে দেবে। দিক না—দিয়েই দেখুক না মজাটা।'

'হ্যাঁ, পুলিসে দেবে! দিলেই হল!'—বিশ্বেশ্বরবাবু সাহস দেন—'হ্যাঁ, দিলেই হল পুলিসে। কেন মিছে ভয় খাস বলতো। ওরা পুলিসে দেবার কে? আমি আছি কি জন্যে?'

'ভয় যার খাবার সেই খাবে। আমি কেন ভয় খেতে যাবো? কোনো দোষে দুষী নই আর আমারই যত বদনাম। আসুক না একবার পুলিস। আমি নিজেই না হয় যাচ্ছি থানায়।'

বিশ্বেশ্বরবাবু বেজায় দমে যান এবার—'আরে, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কোথায় পুলিস, কে কাকে দিচ্ছে তার ঠিক নেই, হাওয়ার সঙ্গে লড়াই।' একটু থেমে ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বের করেন—'বদনাম দিয়েছে তার হয়েছে কি? গায়ে কি লেগে রয়েছে? এই নে; বকশিস নে—কিছু খা গিয়ে।'

ঝনাৎ হতেই তৎক্ষণাৎ তুলে নেয় কার্তিক। একটু ঠাণ্ডা হয় এতক্ষণে।

'কিন্তু একটা কথা বলি বাপু। যদি কিছু নিয়েই থাকিস, এখান থেকে সরিয়ে ফেল। একখানাও রাখিস নি যেন এখানে। পাড়ার লোক যদি খবর দেয়, পুলিস যদি এসেই পড়ে, খানাতল্লাসী হতে কতক্ষণ?' সদুপদেশ দিতে যান বিশ্বেশ্বরবাবু!

'কী নিয়েছি, নিয়েছি কি?' কার্তিক ক্ষেপে ওঠে।

'আমি কি বলেছি কিছু নিয়েছিস ? কিছু নিসনি। তবু যদি কিছু নিয়ে থাকিস বলে তোর সন্দেহ হয়।···আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন, কার্তিক ? আমি তোকে গাড়ি ভাড়া এবং আরো কিছু টাকা দিচ্ছি, এখান থেকে পালিয়ে যা না কেন ?'

'কেন পালাবো ? আমি কি চুরি করেছি ? তবে পালাব কেন ?' কার্তিক দপদপ করে জ্বলতে থাকে।

'আহা, আমি কি পালাতে বলেছি ? বলছি, দিনকতক কোথাও বেড়াতে যা না ? এই হাওয়া খেতে, কি চেঞ্জে কোথাও—শিলঙ কি দার্জিলিং, পুরী কিম্বা ওয়ালটেয়ারে ? লোকে কি যায় না ? চুরি না করলে কি যেতে নেই ? দেশেও তো যাসনি অনেকদিন ! আমি বলি কি—'

কিন্তু তাঁর বলাবলির মধ্যে বাধা পড়ে। 'বিশ্বেশ্বরবাবু বাড়ি আছেন ?' বলতে বলতে কতকগুলি ভারী পায়ের শব্দ ক্রমশ উপরে উঠতে থাকে, সটান তাঁর ঘরের মধ্যে এসে থামে। জনকতক পাহারওলা নিয়ে স্বয়ং দারোগাবাবুকে দেখা যায়।

'আপনার নামে গুরুতর অভিযোগ। আপনি নাকি বাড়িতে চোর পুষেছেন ?'

বিশ্বেশ্বরবাবু আকাশ থেকে পড়েন, 'এসব মিথ্যে কথা কে লাগাচ্ছে বলুন তো ? কার খেয়েদেয়ে কাজ নেই ? ঘর-বাড়ি কি চোর পুষবার জন্যে হয়েছে ? কেউ শুনেছে কখনো এমন কথা ?'

'আপনার কি গয়নার বাক্স চুরি যায়নি আজ ?'—দারোগা জিজ্ঞাসা করেন।

বিশ্বেশ্বরবাবু ভারি মুশড়ে যান। চুপ করে থাকেন। কি আর বলবেন তিনি ?

'চুরির খবর থানায় রিপোর্ট করেন-নি কেন তবে ?'—দারোগাবাবু হুমকি দেন।

'গিন্নী বলছিলেন বটে চুরি গেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।' কার্তিকের দিকে ফেরেন এবার—'এই, তুই এখানে কি করছিস ? দাঁড়িয়ে কেন ? বাড়ির ভেতরে যা। কাজ কর্ম নেই ?'

'এই বুঝি আপনার সেই চাকর ? কিরে ব্যাটা, তুই কিছু জানিস চুরির ?'

'জানি বইকি হুজুর, সবই জানি। চুরি গেছে তাও জানি ; কি চুরি গেছে তাও জানি—' কার্তিক বলতে থাকে।

বিশ্বেশ্বরবাবু বাধা দেন—'দারোগাবাবু, অ্যাকে ছেলেমানুষ তার ওপর ওর মাথা খারাপ। চাকর হয়ে টেড়ি কাটে, দেখছেন না ? কি বলতে কি বলে ফেলবে, ওর কথায় কান দেবেন না। বহুদিন থেকে আছে, ভারী বিশ্বাসী, ওর ওপর সন্দেহ হয় না আমার।'

'বহুদিনের বিশ্বস্ততা একদিনেই উপে যায়; লোভ এমনই জিনিস মশাই !'—

দারোগাবাবু বলেন, 'আকচারই দেখছি এরকম।' কার্তিকের প্রতি জেরা চলে—'এ চুরি—কার কাজ বলে তোর মনে হয়?'

'আর কারো কাজ নয় হুজুর, আমারি কাজ।'

'কেন করতে গেলি এ কাজ?'

'ঐতো আপনিই বলে দিয়েছেন হুজুর! লোভের বশে।' কার্তিক প্রকাশ করে, 'তা শিক্ষাও আমার হয়েছে তেমনি। সবই বলব আমি, কিছুই লুকবো না হুজুরের কাছে।'

'যা যাঃ! আর তোকে সব বলতে হবে না!'—বিশ্বেশ্বরবাবু দুজনের মাঝে পড়েন, 'ভারি বক্তা হয়েছেন আমার! অমন করলে খালাস করাই শক্ত হবে তোকে। দারোগাবাবু, ওর কোন কথায় কান দেবেন না আপনি।'

দারোগাবাবু বিশ্বেশ্বরের কথায় কান দেন না—'কোথায় সে সব গয়না?' কার্তিককেই জিজ্ঞাসা করেন।

'কোথায় আবার? আমারই বিছানার তলায়!' বিরক্তির সঙ্গে বিস্তারিত করে কার্তিক।

ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে নাড়াচাড়া শুরু করতেই কার্তিকের লাখটাকার স্বপ্ন বেরিয়ে পড়ে। নেকলেস, ব্রেসলেট, টায়রা, হার, বালা, তাগা, চুড়ি, অনন্ত—সব কিছুরই অন্ত মেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় কার্তিককে। সে কিন্তু বেপরোয়া। এবার বিশ্বেশ্বরবাবু নিজেই ওকালতি শুরু করেন ওর তরফে—'দেখুন দারোগাবাবু! নেহাত ছেলেমানুষ, লোভের বশে একটা অন্যায় করেই ফেলেছে। ছেলেবেলা থেকে আছে, প্রায় ছেলের মতই, আমার কোন রাগ হয় না ওর ওপর। এই ওর প্রথম অপরাধ, প্রথম যৌবনে—এবারটা ওকে রেহাই দিন আপনি। সুযোগ পেলে শুধরে যাবে, সকলেই অমন শুধরে যায়। যে অভিজ্ঞতা আজ ওর লাভ হলো তাই ওর পক্ষে যথেষ্ট। অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ বড় হয় জীবনে। এই থেকে ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, কলকাতার মেয়রও হতে পারে একদিন—হবে না যে তা কে বলবে? আর যদি নিতান্তই রেহাই না দেবেন, তবে দিন ওকে গুরুতর শাস্তি। আমি তাই চাই আপনার কাছে। চুরির চেয়েও গুরুতর। ও কি চোর? ও চোরের অধম। ও একটা গুণ্ডা! দেখছেন না কি রকম টেরি? ওকে আপনাদের গুণ্ডা য়্যাক্টে একসটার্ন করে দিন—ঘাড় ধরে বার করে দিন এ দেশ থেকে। যাবজ্জীবন নির্বাসন। আমি ওকে এক বছরের বেতন আর গাড়িভাড়া আগাম গুণে দিচ্ছি, ও এক্ষুণি কেটে পড়ুক, ছাপরা কি আরা জিলায়—যেখানে খুশি চলে যাক। গয়না তো সব পাওয়া গেছে, কেবল সাধু হবার, নতুন করে জীবন আরম্ভ করবার একটা সুযোগ দিন ওকে আপনি।'

বিশ্বেশ্বরবাবুর বক্তৃতায় দারোগার মন টলে! কেবল বক্তৃতাই নয়, সেইসঙ্গে বক্তার দুই নয়নের দর বিগলিত ধারায় দারোগাবাবু বিমুগ্ধ, ব্যথিত, ব্যতিব্যস্ত

হয়ে ওঠেন। তিনি শিকার ফেলে চিত্তবিকার নিয়ে চলে যান।

পুলিসের কবল থেকে অব্যাহতি পেয়েও একটুও কাহিল হয় না কার্তিক। তার সঙ্গে যেন ভয়ানক অভদ্রতা করা হয়েছে, ভয়ানক রকম ঠকানো হয়েছে তাকে, এহেন ধারণার বশে একটা জিঘাংসার ভাব তার প্রত্যেকটি আচরণ-বিচরণ থেকে প্রকাশ পেতে থাকে।

অবশেষে চিরবিদায়ের আগের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। কর্তা অনেক আদর-আপ্যায়নে, অযথা বাক্য বিস্তারে, অযাচিত বখশিসের প্রাচুর্য দিয়ে ওর যাবজ্জীবন নির্বাসনের দুঃখ ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু ও কি ভোলে? ওর ব্যথা কি ভোলবার? ওই জানে!

'তোমার আদরেই তো সর্বনাশ হয়েছে ওর! মানুষ এমন নেমকহারাম হয়!' গিন্নী নিজের অসন্তোষ চাপতে পারেন না—'যথেষ্ট মাথা খেয়েছ, আর কেন? বরং, দড়ি-কলসি কিনে ডুবে মরতে বলো ওকে!'

নিভে যাবার আগে শেষবারের মতন উসকে ওঠে কার্তিক। 'দড়ির ভাবনা নেই, কর্তার পুজোয় দেওয়া ছেঁড়া সিল্কের জামাটা পাকিয়েই দড়ি বানিয়ে নেব, কিন্তু কলসী আর হলো কোথায়? বড় দেখেই কলসী গড়াতেই চেয়েছিলাম মাঠাকরুণ, কিন্তু গড়তে আর দিলেন কই? হ্যাঁ, বেশ ভাল একটা পেতলের কলসী হত—' বলে একটু থেমে সে উপসংহার করে—'আপনার গয়নাগুলি গালিয়েই!'

একটি বেতার ঘটিত দুর্ঘটনা

অ্যামবুলেন্স চাপা পড়ার মত বরাত বুঝি আর হয় না। মোটর চাপা পড়া গেল অথচ অ্যামবুলেন্স আসার জন্য তর সইতে হলো না—যাতে চাপা পড়লাম তাতেই চেপে হাসপাতালে চলে গেলাম। এর চেয়ে মজা কি আছে?

ভাগ্যের যোগাযোগ বুঝি একেই বলে। অবিশ্যি, ক্বচিৎ এরূপ ঘটে থাকে—সকলের বরাত তো আর সমান হয় না। অবিশ্যি এর চেয়েও—অ্যামবুলেন্স চাপা পড়ার চেয়েও, আরো বড়ো সৌভাগ্য জীবনে আছে। তা হচ্ছে রেডিয়োয় গল্প পড়তে পাওয়া।

দুর্ভাগ্যের মত সৌভাগ্যরাও কখনো একলা আসে না। রেডিয়োর গল্প আর অ্যামবুলেন্স চাপা—এই দুটো পড়াই একযোগে আমার জীবনে এসেছিল। সেই কাহিনীই বলছি।

কোন্ পুণ্যবলে রেডিয়োয় গল্পপাঠের ভাগ্যলাভ হয় আমি জানিনে, পারতপক্ষে তেমন কোনো পুণ্য আমি করিনি। অন্তত আমার সজ্ঞানে তো নয়, তবু হঠাৎ রেডিও অফিসের এক আমন্ত্রণ পেয়ে চমকাতে হলো। আমন্ত্রণ এবং চুক্তিপত্র একসঙ্গে গাঁথা-দক্ষিণা পর্যন্ত বাঁধা—শুধু আমার সই করে স্বীকার করে নেওয়ার অপেক্ষা কেবল। এমন কি রেডিয়োর কর্তারা আমার পঠীতব্য গল্পের নামটা পর্যন্ত ঠিক করে দিয়েছেন। 'সর্বমস্তত্যম!' এই নাম দিয়ে, এই শিরোনামার সঙ্গে খাপ খাইয়ে গল্পটা আমায় লিখতে হবে।

তা, আমার মত একজন লিখিয়ের পক্ষে এ আর এমন শক্ত কি? আগে গল্প লিখে পরে নাম বসাই, এ না হয়, আগেই নাম ফেঁদে তারপরে গল্পটা লিখলাম। ছেলে আগে না ছেলের নাম আগে, ঘোড়া আগে না ঘোড়ার লাগাম আগে, কারো কারো কাছে সেটা সমস্যারূপে দেখা দিলেও একজন লেখকের কাছে সেটা কোনো প্রশ্নই নয়। লাগামটাই যদি আগে পাওয়া গেল, তার সঙ্গে ধরে বেঁধে একটা ঘোড়াকে বাগিয়ে আনতে আর কতক্ষণ?

প্রথমেই মনে হলো, সব আগে সৌভাগ্যের কথাটা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাইকে জানিয়ে ঈর্ষান্বিত করাটা দরকার। বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। বন্ধু বান্ধব, চেনা আধচেনা, চিনি-চিনি সন্দেহজনক যাকেই পথে পেলাম, পাকড়ে দাঁড় করিয়ে এটা-সেটা একথা সেকথার পর এই রোমাঞ্চকর কথাটা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করলাম না। অবশেষে পই পই করে বলে দিলাম—'শুনো কিন্তু! এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার—সাড়ে পাঁচটায়—শুনে বলবে আমায় কেমন হলো।'

'শুনবে বইকি! তুমি গল্প বলবে আমরা শুনবো না, তাও কি হয়? রেডিয়ো কেনা তবে আর কেন? তবে কিনা, রেডিয়োটা কদিন থেকে আমাদের বিকল হয়ে রয়েছে—কে বিগড়ে দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। গিন্নির সন্দেহ অবশ্যি আমাকেই—যাক্, এর মধ্যে ওটা সারিয়ে ফেলব'খন! তুমি গল্প পড়ছ, সেটা শুনতে হবে তো।' একজনের আপ্যায়িত করা জবাব পেলাম।

আরেকজন তো আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারেন না: 'বলো কি? আরে, শেষটায় তুমিও! তোমাকেও ওরা গল্প পড়তে দিলে? দিনকে দিন কি হচ্ছে কোম্পানীর! আর কিছু বোধহয় পাচ্ছে না ওরা—নইলে শেষে তোমাকেও—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অধঃপাতের আর বাকি কি রইলো হে? নাঃ, এইবার দেখবে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো উঠে যাবে, আর বিলম্ব নেই!'

বন্ধুবরের মন্তব্য শুনে বেশ দমে গেলাম, তথাপি আমতা আমতা করে বললাম—'রেডিয়োর আর দোষ কি দাদা? খোদার দান। খোদা যখন দ্যান্ ছাপ্পর ফুঁড়ে দিয়ে থাকেন, জানো তো? এটাও তেমনি আকাশ ফুঁড়ে পাওয়া—হঠাৎ এই আকাশবাণীলাভ।'

'আচ্ছা শুনবখন। তুমি যখন এত করে বলছ। অ্যাস্পিরিন, স্মেলিং সল্ট—এসব হাতের কাছে রেখেই শুনতে হবে। তোমার গল্প পড়লে তো—সত্যি বলছি, কিছু মনে কোরো না—আমার মাথা ধরে যায়—শুনলে কি ফল হবে কে জানে!' মুখ বিকৃত করে বন্ধুটি জানিয়ে গেলেন।

তবু আমি নাছোড়বান্দা। পথেঘাটে যাদের পাওয়া গেল না তাদের বাড়ি ধাওয়া করে সুখবরটা দিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য উক্ত শুক্রবারে সেই মুহূর্তে সকলেই শশব্যস্ত! কারো ছেলের বিয়ে, কারো মেয়ের পাকা দেখা, কার আবার কিসের যেন এনগেজমেণ্ট, কাউকে খুব জরুরি দরকারে কলকাতার বাইরে যেতে

হচ্ছে! এমনি কত কি কাণ্ডে সেই দণ্ডে সবাই বিজড়িত—রেডিয়োয় কর্ণপাত করার কারো ফুরসৎ নেই। কি মুশকিল, দ্যাখো দেখি। আমি গল্প বলব কেউ শুনবে না। আমার জানাশোনারা শুনতে পাবে না—এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছে? আমার গল্প পড়ার দিনটিতেই যে সবার এত গোলমাল আর জরুরি কাজ এসে জুটবে তা কে জানত!

আর তাছাড়া, রেডিয়োর সময়টাতেই তারা কেন যে এত ভেজাল জোটায় আমি তো ভেবে পাই না। পূর্বজন্মের তপস্যার পুণ্যফলে রেডিয়োকে যদি ঘরে আনতে পেরেছিস্—তাই নিয়েই দিনরাত মশগুল থাক—তা না। অন্তত প্রোগ্রামের ঘণ্টায় যে কখনো কক্ষচ্যুত হতে নেই একথাও কি তোদের বলে দিতে হবে? আর সব তালে ঠিক আছিস্ কেবল রেডিয়োর ব্যাপারেই তোরা আনরেডি—সব তোদের উল্টোপাল্টা!

সত্যি, আমার ভারী রাগ হতে লাগল। অবশ্যি, ওদের কেউই আমাকে আশ্বাস দিতে কসুর করল না যে যত ঝামেলাই থাক যেমন করে হোক, আমার গল্পটার সময়ে অন্তত ওরা কান খাড়া রাখবে—যত কাজই থাক না, এটাও তো একটা কাজের মধ্যে। বন্ধুর প্রতি কর্তব্য তো। এমন কি কলকাতার বহির্গামী সেই বান্ধবটিও ভরসা দিয়ে গেলেন যে ট্রেন ফেল করার আগের মিনিট পর্যন্ত কোনো চুল-ছাঁটা সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে যতটা পারা যায় আমার গল্পটা শুনে তবেই তিনি রওনা দেবেন।

সবাইকে ফলাও করে জানিয়ে ফিরে এসে গল্পটা ফলাতে লাগা গেল! 'সর্বমত্যন্তম্—এর সঙ্গে যুতমতো, মজবুতমতো একটা কাহিনীকে জুড়ে দেয়াই এখন কাজ।'

কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল কাজটা মোটেই সহজ নয়। গল্প তো কতই লিখেছি, কিন্তু এ ধরনের গল্প কখনো লিখিনি। ছোট্ট একটুখানি বীজ থেকে বড় বড় মহীরুহ গজিয়ে ওঠে। লোকে বলে থাকে, আমি নিজের চোখে কখনো দেখিনি বটে, তবে লোকের কথায় অবিশ্বাস করতে চাইনে। তবুও, একথা আমি বলব যে গাছের বেলা তা হয়ত সত্যি হলেও, একটুখানি বীজের থেকে একটা গল্পকে টেনে বার করে আনা দারুণ দুঃসাধ্য ব্যাপার!

বলব কি ভাই, যতই প্লট ফাঁদি আর যত গল্পই বাঁধি, আর যত রকম করেই ছকতে যাই, কিছুতেই ওই 'সর্বমত্যন্তম্'-এর সঙ্গে খাপ্ খাওয়ানো যায় না। একটা গল্প লিখতে গিয়ে ভাবতে ভাবতে একুশটা গল্প এসে গেল, মনের মধ্যে গল্পের একশা, আর মনের মত তার প্রত্যেকটাই, কিন্তু নামের মত একটাও না।

ভাবতে ভাবতে সাত রাত্রি ঘুম নেই; এমন কি, দিনেও দু চোখে ঘুম আসে না। চোখের কোলে কালি পড়ে গেল আর মাথার চুল সাদা হতে শুরু করল। অর্ধেক চুল টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেললাম—আর কামড়ে কামড়ে ফাউণ্টেনের

আধখানা পেটে চলে গেল। কত গল্পই এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এল আর গেল কিন্তু কোনটাই ওই নামের সঙ্গে খাটল না।

তখন আমি নিজেই খাটলাম—আমাকেই খাটিয়া নিতে হলো শেষটায়।

শুয়ে শুয়ে আমার খাতার শুভ্র অঙ্কে—আমার অনাগত গল্পে আস্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে কত কি যে আঁকলাম! কাকের সঙ্গে বগ জুড়ে দিয়ে, বাঘের সাথে কুমীরের কোলাকুলি বাধিয়ে, হনুমানের সঙ্গে জাম্বুবানকে জর্জরিত করে, সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার!

সব জড়িয়ে এক ইলাহী কাণ্ড! কি যে ওই সব ছবি, তার কিচ্ছু বুঝবার যো নেই, অথচ বুঝতে গেলে অনেক কিছুই বোঝা যায়। গুহা মানুষেরা একদা যে সব ছবি আঁকতো, এবং মানুষের মনের গুহায়, মনশ্চক্ষুর অগোচরে এখনো যে সব ছবি অনুক্ষণ অঙ্কিত হচ্ছে, সেই সব অন্তরের অন্তরালের ব্যাপার! মানুষ পাগল হয়ে গেলে যে সব ছবি আঁকে অথবা আঁকবার পরেই পাগল হয়ে যায়। সর্বমত্যন্তম্—ড্যাশ—উইদিন্ ইন্ভার্টেড্ কমার শিরোনামার ঠিক নিচে থেকে সুরু করে, গল্পের শেষ পৃষ্ঠায় আমার নাম-স্বাক্ষরের ওপর অবধি কেবল ওইসব ছবি—ওই পাগলকরা ছবি সব! পাতার দুধারে মার্জিনেও তার বাদ নেই—মার্জনা নেই কোনোখানে।

তোমরা হাসছো? তা হাসতে পারো! কিন্তু ছবিগুলো মোটেই হাসবার নয়—দেখলেই টের পেতে। ওই সব ছবির গর্ভে যে নিদারুণ আর্ট নিহিত রইলো, আমার আশা, সমঝদারের সাহায্যে (রাঁচির বাইরেও তাঁরা থাকবেন নিশ্চয়! একদিন তার তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হবে—হবেই—চিরদিন কিছু তা ছলনা করে, নিগূঢ় হয়ে থাকবে না। আমার গল্পের জন্য, এমন কি, আমার কোনো লেখার জন্য কখনো কোনো প্রশংসা না পেলেও, ওই সব ছবির খ্যাতি আমার আছেই—ওদের জন্য একদিন না একদিন বাহবা আমি পাবই। ওরাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে—আজকে না হলে আগামীকালে—মানুষের দুঃস্বপ্নের মধ্যে অন্ততঃ—এ বিশ্বাস আমার অটল।

অবশেষে 'সর্বমত্যন্তম্'-এর পরে ড্যাশের জায়গায় শুধু 'গর্হিতম্' কথাটি বসিয়ে রচনা শেষ করে, আমার গল্পের সেই চিত্ররূপ নিয়ে নির্দিষ্ট দিনক্ষণে রেডিয়ো ষ্টেশনের দিকে দৌড়ালাম।

ভেবে দেখলে সমস্ত ব্যাপারটাই গর্হিত ছাড়া কি? আগাগোড়া ভাল করে ভেবে দেখা যায় যদি, আমার পক্ষে রেডিয়োর গল্প পড়তে পাওয়া, এবং যে দক্ষিণায় গল্প বেচে থাকি, সেই গল্প পড়তে গিয়ে তার তিনগুণ দাক্ষিণ্য-লাভের সুযোগ পাওয়া দস্তুরমত গর্হিত বলেই মনে হতে থাকে! এবং যে গল্প আমি চিত্রাকারে, মিকি মাউসের সৃষ্টি কর্তাকে লজ্জা দিয়ে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে ফেঁদেছি তার দিকে তাকালে—না, না, এর সমস্তটাই অত্যন্তম্—অতিশয় অত্যন্তম—এবং কেবল অত্যন্তম্ নয়, অত্যন্তম্ গর্হিতম্!

তারপর? তারপর সেই গল্প নিয়ে হন্যে হয়ে যাবার মুখে আমার দু নম্বর বরাত এসে দেখা দিল। অ্যাম্বুলেন্স চাপা পড়লাম।

হাসপাতালে গিয়েও, হাত পা ব্যয় না করে, নিজে বাজে খরচ না হয়ে, অটুট অবস্থায় বেরিয়ে আসাটা তিন নম্বর বরাত বলতে হয়। কিন্তু সশরীরে সর্বাঙ্গীণরূপে লোকালয়ে ফিরে এসে ভাগ্যের ব্রাহ্মস্পর্শের কথাটা যে ঘটা করে যাকে তাকে বলবো, বলে একটু আরাম পাবো তার যো কি! যার দেখা পাই, যাকেই বলতে যাই কথাটা, আমার সূত্রপাতের আগেই সে মুক্তকণ্ঠ হয়ে ওঠে:

'চমৎকার! খাসা! কী গল্পই না পড়লে সেদিন! যেমন লেখায় তেমনি পড়ায়—লেখাপড়ার যে তুমি এমন ওস্তাদ্ তার পরিচয় তো ইস্কুলে কোনোদিন দাওনি হে! সব্যসাচি যদি কাউকে বলতে হয় তো সে তোমায়! আমাদের সবাইকে অবাক্ করে দিয়েছ, মাইরি!'

আমিও কম অবাক্ হইনি। প্রতিবাদ করতে যাব, কিন্তু হাঁ করবার আগেই আরেকজন হাঁ হাঁ করে এসে পড়েছে:

'তোমার গল্প অনেক পড়েছি! ঠিক পড়িনি বটে, তবে শুনতে হয়েছে। বাড়ির ছেলেমেয়েরাই গায়ে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছে। শোনাতে তারা ছাড়ে না—তা সে শোনাও পড়ার মতই! কিন্তু যা পড়া সেদিন তুমি পড়লে তার কাছে সে সব কিছু লাগে না। আমার ছেলেমেয়েদের পড়াও না। হ্যাঁ, সে পড়া বটে একখান্! আহা, এখনো এই কানে—এইখানে লেগে রয়েছে হে!'

তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন আরেকজন: 'গল্প শুনে তো হেসে আর বাঁচিনে ভায়া! আশ্চর্য গল্পই পড়লে বটে! বাড়ি সুদ্ধ সবাই—আমার দুধের ছেলেটা পর্যন্ত উৎকর্ণ হয়েছিল, কখন্ তুমি গল্প পড়বে! আর যখন তুমি আরম্ভ করলে সেই শুক্রবার না কোন্‌বারে—বিকেলের দিকেই না?—আমরা তো শুনবামাত্র ধরতে পেরেছি—এমন টক-মিষ্টি—ঝাল্-ঝাল্—নোন্‌তা গলা আর কার হবে? আমার কোলের মেয়েটা পর্যন্ত ধরতে পেরেছে যে আমাদের রামদার গলা!'

রামদা-টা গলা থেকে তুলতে না তুলতেই অপর এক ব্যক্তির কাছে শুনতে হলো: 'বাহাদুর, বাহাদুর! তুমি বাহাদুর! রেডিয়োর গল্প পড়ার চান্স্ পাওয়া সহজ নয়; কোন্ ফিফিরে কি করে জোগাড় করলে তুমিই জানো! তারপরে সেই গল্প মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে রগ্‌রানো—সে কি চাট্টিখানি? আমার তো ভাবতেই পা কাঁপে, মাথা ঘুরতে থাকে! কি করে পারলে বলো তো? আর পারা বলে পারা—অমন নিখুঁত ভাবে পারা—যা একমাত্র কেবল হাঁসেরাই পারে। আবার বলি, তুমি বাহাদুর!!'

তারাই আমায় তাক্ লাগিয়ে দিল। রেডিয়োর স্বর্গে যাবার পথে উপসর্গে আট্‌কে অ্যাম্বুলেন্স চেপে আধুনিক পাতালে যাওয়ার অমন গালভরা খবরটা ফাঁস করার আর ফাঁক পেলাম না।

হাম কিংবা টাইফয়েড, সর্পাঘাত কিংবা মোটর-চাপা, জলে ডোবা কিংবা গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, এগজামিনে ফেল-করা কিংবা কাঁকড়া-বিছে কামড়ানো— জন্মাবার পর এর কোনটা না-কোনটা কারু না-কারু বরাতে কখনো-না-কখনো একবার ঘটেই। অবশ্য যে মোটর চাপা পড়ে তার সর্পাঘাত হওয়া খুব শক্ত ব্যাপার, সেরকম আশংকা প্রায় নেই বললেই হয়, এবং যার সর্পাঘাত হয় তাকে আর গাছ থেকে পড়তে হয় না। যে ব্যক্তি জলে ডুবে যায় মোটর-চাপা পড়ার সুযোগ তার যৎসামান্যই এবং উঁচু দেখে গাছ থেকে ভাল করে পড়তে পারলে তার আর জলে ডোবার ভয় থাকে না। তবে কাঁকড়া-বিছের কামড়ের পরেও এগজামিনে ফেল করা সম্ভব, এবং অনেকক্ষেত্রে হামের ধাক্কা সামলাবার পরেও টাইফয়েড হ'তে দেখা গেছে। হামেশাই দেখা যায়।

কিন্তু বলেছিই, এসব কারু-না-কারু অদৃষ্টে ঘটে কখনো বা কদাচ। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা প্রায় সবারই জীবনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে অনিবার্যরূপে প্রকট হয়, তার ব্যতিক্রম খুব বড় একটা দেখা যায় না। আমি গোঁফ ওঠার কথা বলছিনে— তার চেয়ে শক্ত ব্যারাম— গোঁফ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হবার প্রেরণা মানুষকে পেয়ে বসে।

আমারও তাই হয়েছিল। প্রথম গল্প লেখার সূত্রপাতেই আমার ধারণা হয়ে গেল আমি দোলগোবিন্দ বাবুর মতো লিখতে পেরেছি। দোলগোবিন্দকে আমি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ মনে করতাম— কেননা একই কাগজে দু'জনের নাম একই টাইপে ছাপার অক্ষরে দেখেছিলাম আমি। এমন কি অনেক সময়ে দোলগোবিন্দকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় লেখক আমার বিবেচনা হয়েছে— তাঁর লেখা কেমন জলের মতো বোঝা যায়, অথচ বোঝার মতন মাথায় চাপে

না। কেন যে তিনি নোবেল প্রাইজের জন্য চেষ্টা করেন না, সেই গোঁফ ওঠার প্রাক্কালে অনেকবার আমি আন্দোলন করেছি—অবশ্যি মনে মনে। এখন বুঝতে পারছি পণ্ডিচেরী, কিংবা পাশাপাশি, রাঁচীতে তাঁর পরামর্শ দেবার কেউ ছিল না বলেই। আরও দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের লেখা এখনও চোখে পড়ে থাকে কিন্তু কোনো কাগজ-পত্রেই দোলগোবিন্দ বাবুর দেখা আর পাই না।

যাই হোক, গল্পটা লিখেই বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে, দোলগোবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের রচনার ঠিক পাশেই সেটা প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। নিশ্চিন্তে বসে আছি যে নিশ্চয়ই ছাপা হবে এবং ছাপার অক্ষরে লেখাটা দেখে কেবল আমি কেন, রবীন্দ্রনাথ, এমন কি, স্বয়ং দোলগোবিন্দ পর্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠবেন—ও হরি! পর পর তিন মাস হতাশ হবার পরে একদিন দেখি বুকপোস্টের ছদ্মবেশে লেখাটা আমার কাছেই আবার ফিরে এসেছে। ভারী মর্মাহত হলাম বলাই বাহুল্য! শোচনীয়তা আরও বেশি এইজন্য যে তিন মাসে তিনখানা কাগজ কিনেছিলাম—খতিয়ে দেখলাম সেই দেড়টা টাকাই ব্যাটাদের লাভ!

তারপর, একে একে আর যে-কটা নামজাদা মাসিক ছিল সবাইকে যাচাই করা হল—কিন্তু ফল একই। আট আনার পেট-মোটাদের ছেড়ে ছ-অনার কাগজদের ধরলাম—অবশেষে চার আনা দামের নব্যপন্থীদেরও বাজিয়ে দেখা গেল। নাঃ, সব শেয়ালের একই রা! হ্যাঁ, গল্পটা ভালই, তবে ছাপতে তাঁরা অক্ষম! আরে বাপ, এত অক্ষমতা যে কেন তাতো আমি বুঝতে পারি নে, যখন এত লেখাই অনায়াসে ছাপতে পারছ তোমরা! মাসিক থেকে পাক্ষিক—পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে নামলাম; অগত্যা লেখাটার দারুণ অমর্যাদা ঘটছে জেনেও দৈনিক সংবাদপত্রেই প্রকাশের জন্য পাঠালাম। কিন্তু সেখান থেকেও ফেরত এল। দৈনিকে নাকি অত বড় 'সংবাদ' ধরবার জায়গাই নেই। আশ্চর্য! এত আজেবাজে বিজ্ঞাপন যা কেউ পড়ে না তার জন্য জায়গা আছে, আমার বেলাই যত স্থানাভাব? বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে ছাপলেই তো হয়। কিন্তু অদ্ভুত এঁদের একগুঁয়েমি—সব সংবাদপত্র থেকেই বারম্বার সেই একই দুঃসংবাদ পাওয়া গেল।

তখন বিরক্ত হয়ে, শহর ছেড়ে মফঃস্বলের দিকে লক্ষ্য দিতে হল—অর্থাৎ লেখাটা দিগ্বিদিকে পাঠাতে শুরু করলাম। মেদিনীপুর-মন্থন, চুঁচুড়া-চন্দ্রিকা, বাঁকুড়া হরকরা, ফরিদপুর-সমাচার, গৌহাটি-গবাক্ষ, মালদহের গৌড়বান্ধব কারুকেই বাদ রাখলাম না। কিন্তু শহরে পেট-মোটাদের কাছ থেকে যে দুর্ব্যবহার পাওয়া গেছে, পাড়াগেঁয়ে ছিটে ফোঁটাদের কাছে তার রকম-ফের হল না। আমার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক দারুণ ষড়যন্ত্র আমার সন্দেহ হতে লাগল।

এইভাবে সেই প্রথম ও পরোবর্তী লেখার ওপরে 'ট্রাই এণ্ড ট্রাই এগেন' পলিসির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতেই বাংলা মুলুকের তাবৎ কাগজ আর সাড়ে তিন বছর গড়িয়ে গেল—বাকি রইল কেবল একখানি কাগজ—কৃষি সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক। চাষাড়ে কাগজ বলেই ওর দিকে এতাবৎ আমি মনোযোগ দিইনি, তারা কি আমার এই সাহিত্য রচনার মূল্য বুঝবে? ফেরত তো দেবেই, হয়তো সঙ্গে সঙ্গে বলে পাঠাবে, 'মশাই. আপনার আষাড়ে গল্প আমাদের কাগজে অচল; তার চেয়ে ফুলকপির চাষ সম্বন্ধে যদি আপনার কোনো বক্তব্য থাকে তা লিখে পাঠালে বরং আমরা বেয়ে চেয়ে দেখতে পারি।'

এই ভয়েই এতদিন ওধারে তাকাইনি—কিন্তু এখন আর আমার ভয় কি? (ডুবন্ত লোক কি কুটো ধরতে ভয় করে?) কিন্তু না; ওদের কাছে আর ডাকে পাঠানো নয়, অনেক ডাকখরচা গেছে অ্যাদ্দিন, এবার লেখা সমভিব্যাহারে আমি নিজেই যাব।

'দেখুন, আপনি—আপনিই সম্পাদক, না? আমি—আমি একটা—একটা লেখা এনেছিলাম আমি—?' উক্ত সম্পাদকের সামনে হাজির হয়ে হাঁক পাড়লাম।

গম্ভীর ভদ্রলোক চশমার ফাঁকে কটাক্ষ করলেন—'কই দেখি!'

'একটা গল্প। একেবারে নতুন ধরনের—আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন।' লেখাটা বাড়িয়ে দিলাম 'আনকোরা প্লটে আনকোরা স্টাইলে একেবারে—'

ভদ্রলোক গল্পে মনোযোগ দিয়েছেন দেখে আমি বাক্যযোগ স্থগিত রাখলাম। একটু পড়তেই সম্পাদকের কপাল কুঞ্চিত হল, তারপরে ঠোঁট বেঁকে গেল, নাক সিঁটকাল, দাড়িতে হাত পড়ল,—যতই তিনি এগুতে লাগলেন, ততই তাঁর চোখ-মুখের চেহারা বদলাতে লাগল, অবশেষে পড়া শেষ করে যখন তিনি আমার দিকে তাকালেন তখন মনে হল তিনি যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। হতেই হবে। কিরকম লেখা একখান!

'হ্যাঁ, পড়ে দেখলাম—নিতান্ত মন্দ হয়নি! তবে এটা যে একটা গল্প তা জানা গেল আপনি গল্পের নামের পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে কথাটা লিখে দিয়েছেন বলে—নতুবা বোঝার আর কোনো উপায় ছিল না।'

'তা বটে। আপনারা সম্পাদকরা যদি ছাপেন তবেই নতুন লেখক আমরা উৎসাহ পাই।' বলতে বলতে আমি গলে গেলাম, 'এ গল্পটা আপনার ভাল লেগেছে তাহলে?'

'লেগেছে এক রকম। তা এটা কি—'

'হ্যাঁ, অনায়াসে। আপনার কাগজের জন্যেই তো এনেছি।'

'আমার কাগজের জন্য?' ভদ্রলোক বসেই ছিলেন কিন্তু মনে হল যেন আরো একটু বসে গেলেন, 'তা আপনি কি এর আগে আর কখনও লিখেছেন?'

ঈষৎ গর্বের সঙ্গেই আমি জবাব দিলাম, 'নাঃ, এই আমার প্রথম চেষ্টা।'

'প্রথম চেষ্টা ? বটে ?' ভদ্রলোক ঢোঁক গিললেন, 'আপনার ঘড়িতে ক'টা এখন ?'

ঘড়িটা পকেট থেকে বার করে অপ্রস্তুত হলাম, মনে পড়ল কদিন থেকেই এটা বন্ধ যাচ্ছে, অথচ ঘড়ির দোকানে দেওয়ার অবকাশ ঘটেনি। সত্য কথা বলতে কি, সম্পাদকের কাছে ঘড়ি না হোক অন্ততঃ ঘড়ির চিহ্নমাত্র না নিয়ে যাওয়াটা 'বে-স্টাইলি' হবে ভেবেই আজ পর্যন্ত ওটা সারাতে দিইনি। এখান থেকে বেরিয়েই বরাবর ঘড়ির দোকানে যাব এই মতলব ছিল।

ঘড়িটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'নাঃ বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি। কদিন থেকেই মাঝে মাঝে বন্ধ যাচ্ছে।'

'তাই নাকি ? দেখি তো একবার ?' তিনি হাত বাড়ালেন।

'ঘড়ি মেরামতও জানেন নাকি আপনি ?' আমি সম্ভ্রমভরে উচ্চারণ করলাম।

'জানি বলেই তো মনে হয়। কই দেখি, চালানো যায় কিনা।'

আমি আগ্রহভরে ঘড়িটা ওঁর হাতে দিলাম—যদি নিখরচায় লেখা আর ঘড়ি একসঙ্গে চালিয়ে নেওয়া যায়, মন্দ কি !

ভদ্রলোক পকেট থেকে পেনসিল-কাটা ছুরি বার করলেন ; তার একটা চাড় দিতেই পেছনের ডালার সবটা সটান উঠে এল। আমি চমকে উঠতেই তিনি সান্ত্বনা দিলেন, 'ভয় কি ? জুড়ে দেব আবার।'

সেই ভোঁতা ছুরি এবং সময়ে সময়ে একটা চোঁথা কলমের সাহায্যে তিনি একটার পর একটা ঘড়ির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে ফেলতে লাগলেন। মিনিট এবং সেকেন্ডের কাঁটাও বাদ গেল না। খুঁটিনাটি যত যন্ত্রপাতি টেবিলের উপর স্তূপাকার হলো—তিনি এক একটাকে চশমার কাছে এনে গভীর অভি-নিবেশের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সূক্ষ্ম তারের ঘোরানো ঘোরানো কি একটা জালের মতো—বোধহয় হেয়ার-স্প্রিংই হবে—দু'হাতে ধরে সেটাকে লম্বা করার চেষ্টা করলেন। দেখতে দেখতে সেটা দুখান হয়ে গেল, মৃদু হাস্য করে আমার দিকে তাকালেন ; তার মানে, ভয় কি, আবার জুড়ে দেব।

ভয় ছিল না কিন্তু ভরসাও যেন ক্রমশ কমে আসছিল। যেটা জুয়েলের মধ্যে সবচেয়ে স্থূলকায় সেটাকে এবার তিনি দাঁতের মধ্যে চাপলেন, দাঁত বসে কিনা দেখবার জন্যই হয়ত বা। কিন্তু দন্তস্ফুট করতে না পেরে সেটাকে ছেড়ে ঘড়ির মাথার দিকের দম দেবার গোলাকার চাবিটাকে মুখের মধ্যে পুরলেন তারপর। একটু পরেই কটাস করে উঠল ; ওটার মেরামৎ সমাধা হয়েছে বুঝতে পারলাম।

তারপর সমস্ত টুকরো-টাকরা এক করে ঘড়ির অন্তঃপুরে রেখে তলাকার ডালাটা চেপে বন্ধ করতে গেলেন ; কিন্তু ডালা তাতে বসবে কেন ? সে উঁচু

হয়ে রইল। ওপরের ডালাটা আগেই ভেঙেছিল, এবার সেটাকে হাতে নিয়ে আমাকে বললেন, আঠার পাত্রটা আগিয়ে দিন তো—দেখি এটাকে!'

অত্যন্ত নিরুৎসাহে গাম-পটটা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আঠার সহায়তায় যথেষ্ট সংগ্রাম করলেন কিন্তু তাঁর যৎপরোনাস্তি চেষ্টা সমস্ত ব্যর্থ হলো। আঠায় কখনও ও জিনিস আঁটানো যায়? তখন সবগুলো মুঠোয় করে নিয়ে আমার দিকে প্রসারিত করলেন—'এই নিন আপনার ঘড়ি।'

আমি অবাক হয়ে এতক্ষণ দেখছিলাম, বললাম—'এ কি হল মশাই?'

তিনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন—'কেন, মেরামৎ করে দিয়েছি তো!'

বাবার কাছ থেকে বাগানো দামী ঘড়িটার এই দফারফা দেখে আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল—'এই বুঝি মেরামৎ করা? আপনি ঘড়ির যদি কিছু জানেন না তবে হাত দিতে গেলেন কেন?'

'কেন, কি ক্ষতি হয়েছে?' একথা বলে তিনি অনায়াসে হাসতে পারলেন—'তাছাড়া, আমারও এই প্রথম চেষ্টা।'

আমি অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলাম, তারপর বললাম, 'ওঃ! আমার প্রথম লেখা বলেই এটা আপনার পছন্দ হয়নি? তা-ই বললেই পারতেন—ঘড়ি ভেঙে একথা বলা কেন?' আমার চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো হলো, কিন্তু অবাঞ্ছিত অশ্রু কোনমতে সম্বরণ করে, এমনকি অনেকটা আপ্যায়িতের মতো হেসেই অবশেষে বললাম—'কাল না হয় আর একটা নতুন গল্প লিখে আনব, সেটা আপনার পছন্দ হবে। চেষ্টা করলেই আমি লিখতে পারি।'

'বেশ আসবেন।' এ বিষয়ে সম্পাদকের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল, 'কিন্তু ঐ সঙ্গে আর একটা নতুন ঘড়িও আনবেন মনে করে। আমাদের দুজনেরই শিক্ষা হবে তাতে। আপনারও লেখার হাত পাকবে, আমিও ঘড়ি সম্বন্ধে পরিপক্কতা লাভ করব।'

পরের দিন 'মরীয়া' হয়েই গেলাম এবং 'ঘড়িয়া' না হয়েই। এবার আর গল্প না, তিনটে ছোট ছোট কবিতা—সিম, বেগুন, বরবটির উপরে।

আমাকে দেখেই সম্পাদক অভ্যর্থনা করলেন—'এই যে এসেছেন, বেশ। ঘড়ি আছে তো সঙ্গে?'

আমি দমলাম না—'দেখুন এবারে একেবারে অন্য ধরনের লিখেছি। লেখাগুলো সময়োপযোগী, এমন কি সব সময়ের উপযোগী। এবং যদি অনুমতি করেন তাহলে একথাও বলতে সাহস করি যে আপনাদের কাগজের উপযুক্তও বটে। আপনি যদি অনুগ্রহ—'

আরও খানিকটা মুখস্থ করে আনা ছিল-কিন্তু ভদ্রলোক আমার আবৃত্তিতে বাধা দিলেন—'ধৈর্য, উৎসাহ, তিতিক্ষা এসব আপনার আছে দেখছি। পারবেন আপনি। কিন্তু আমাদের মুশকিল কি জানেন, বড় লেখকেরই বড় লেখা কেবল আমরা ছাপতে পারি। প্রবন্ধের শেষে বা তলার দিকে দেওয়া

চলে এমন ছোট-খাট খুচরা-খাচরা যদি আপনার কিছু থাকে তাহলে বরং— এই ধরুন, চার লাইনের কবিতা কিংবা কৌতুক-কণা—'

আমি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিলাম—'হ্যাঁ, কবিতা। কবিতাই এনেছি এবার। পড়ে দেখুন আপনি, রবীন্দ্রনাথের পরে এমন কবিতা কেউ লিখেছে কিনা সন্দেহ।'

তিনি কবিতা তিন পিস হাতে নিলেন এবং পড়তে শুরু করে দিলেন—

'সিম।

সিমের মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

ধামার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সপ্রশংস অভিব্যক্তি দেখা গেল—'বাঃ, বেড়ে হয়েছে! আপনি বুঝি সিমের ভক্ত? সিম খেয়ে থাকেন খুব? অত্যন্ত ভাল জিনিস, যথেষ্ট ভিটামিন।'

'সিম আমি খাইনে। বরং অখাদ্যই মনে করি। তবে এই কবিতাটা লিখতে হিমসিম খেয়েছি।'

'হ্যাঁ, এগুলো চলবে। খাসা কবিতা লেখেন আপনি; বরবটির সঙ্গে চটপটির মিলটা মন্দ না। তুলনাটাও ভাল—তা, এক কাজ করলে তো হয়!'—অকস্মাৎ তিনি যেন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হলেন। 'দেখুন, ভিটামিনের কাগজ বটে কিন্তু ভিটামিন আমরা খুব কমই খাই। কলা বাদ দিয়ে কলার খোসা কিংবা শাঁস বাদ দিয়ে আলুর খোসার সারাংশ প্রায়ই খাওয়া হয়ে ওঠে না—এইজন্যে মাস কয়েক থেকে বেরিবেরিতে ভুগতে হচ্ছে; তা আপনি যদি—' তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, পারব। খুব পারব। ঝুড়ি ঝুড়ি কলার খোসা আপনাকে যোগাড় করে দেব। কিন্তু শুধু খোসা তো কিনতে পাওয়া না, কলার দামটা আপনিই দেবেন।' তাঁর সমর্থনের অপেক্ষায় একটু থামলাম, 'কলাগুলো আমিই নয় হয় খাব কষ্টে-সৃষ্টে—যদিও অনুপকারী, তবু বেরিবেরি না হওয়া পর্যন্ত খেতে তো কোন বাধা নেই?'

'না, সে কথা নয়। আমি বলছি কি, আমি তিন মাসের ছুটি নিয়ে ঘাটশিলায় হাওয়া বদলাতে যেতাম, আপনি যদি সেই সময়ে আমার কাগজটা চালাতেন।'

'আমি?' এবার আমি আকাশ থেকে পড়লাম যেন।

'তা, লিখতে না জানলেও কাগজ চালানো যায়। লেখক হওয়ার চেয়ে সম্পাদক হওয়া সোজা। আপনার সঙ্গে আমার এই চুক্তি থাকবে: আপনাকে নামজাদা লেখকদের তালিকা দিয়ে যাব, তাঁদের লেখা আপনি চোখ বুজে চালিয়ে দেবেন—কেবল কপি মিলিয়ে প্রুফ দেখে দিলেই হল। সেই সব লেখার

শেষে পাতার তলায় তলায় যা এক-আধটু জায়গা পড়ে থাকবে সেখানে আপনার এই ধরনের ছোট ছোট কবিতা আপনি ছাপতে পারবেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। এই রকম কৃষি-কবিতা—ওলকপি, গোলআলু, শকরকন্দ—যার সম্বন্ধে খুশি লিখতে পারেন।'

বলা বাহুল্য, আমাকে রাজি করতে ভদ্রলোককে মোটেই বেগ পেতে হল না, সহজেই আমি সম্মত হলাম। এ যেন আমার হাতে স্বর্গ পাওয়া—গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! সম্পাদক-শিকার করতে এসে সম্পাদকতা-স্বীকার—তোমাদের মধ্যে খুব কম অজাতশমশ্রু লেখকেরই এরকম সৌভাগ্য হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

সম্পাদনা-কাজের গোড়াতেই এক জোড়া চশমা কিনে ফেললাম ; ফাউণ্টেন পেন তো ছিলই। অতঃপর সমস্ত জিনিসটাই পরিপাটিরকম নিখুঁত হলো। কলম বাগিয়ে 'কৃষিতত্ত্বের' সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করলাম। যদিও সম্পাদকীয় লেখার জন্য ঘুণাক্ষরেও কোন অনুরোধ ছিল না সম্পাদকের, কিন্তু ওটা বাদ দিলে সম্পাদকতা করার কোন মানেই হয় না, আমার মতে। অতএব লিখলাম।

'আমাদের দেশে ভদ্রলোকদের মধ্যে কৃষি-সম্বন্ধে দারুণ অজ্ঞতা দেখা যায়। এমন কি, অনেকের এরকম ধারণা আছে যে এই যে সব তক্তা আমরা দেখি, দরজা, জানালা, কড়ি বরগা, পেনসিল, তক্তপোষে যেসব কাঠ সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় সে সমস্ত ধান গাছের। এটা অতীব শোচনীয়। তাঁরা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ওগুলো ধান গাছের তো নয়ই, বরঞ্চ পাট গাছের বলা যেতে পারে। অবশ্য পাট গাছ ছাড়াও কাঠ জন্মায় ; আম, জাম, কাঁঠাল, কদবেল ইত্যাদি বৃক্ষেরাও তক্তাদান করে থাকে। কিন্তু নৌকার পাটাতনে যে কাঠ ব্যবহৃত হয় তা কেবলমাত্র পাটের।...'

ইত্যাদি—এইভাবে একটানা প্রায় আড়াই পাতা কৃষি তত্ত্ব। কাগজ বেরুতে না বেরুতে আমার সম্পাদকতার ফল প্রত্যক্ষ করা গেল। মোটে পাঁচশ করে আমাদের ছাপা হত, কিন্তু পাঁচশ কাগজ বাজারে পড়তেই পেল না। সকাল থেকে প্রেস চালিয়ে, সাতগুণ ছেপেও অনেক 'হকার'কে শেষে ক্ষুণ্নমনে আর শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিতে হল।

সন্ধ্যার পরে যখন আপিস থেকে বেরুলাম, দেখলাম একদল লোক আর বালক সামনের রাস্তায় জড়ো হয়েছে ; আমাকে দেখেই তারা তৎক্ষণাৎ ফাঁকা হয়ে আমার পথ করে দিল। দু'একজনকে যেন বলতেও শুনলাম—'ইনি, ইনিই!' স্বভাবতঃই খুব খুশি হয়ে গেলাম। না হব কেন?

পরদিনও আপিসের সামনে সেই রকম লোকের ভীড় ; দল পাকিয়ে দু'চারজন করে এখানে ওখানে ছড়িয়ে, রাস্তার এধারে ওধারে, দূরে সুদূরে (কিন্তু অনতিনিকটে), প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়েই ব্যক্তিবর্গ। সবাই বেশ

আগ্রহের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করছে। তাদের কৌতূহলের পাত্র আমি বুঝতে পারলাম বেশ; এবং পেরে আত্মপ্রসাদ হতে লাগল।

আমি কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিচলিত হয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, আমি দ্বিধাবোধ করার আগেই মণ্ডলীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আমার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। একজন বলে উঠল—'ওর চোখের দিকে তাকাও, কি রকম চোখ দেখেছ!' আমিই যে ওদের লক্ষ্য এটা যেন লক্ষ্য করছি না এই রকম ভাব দেখাচ্ছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে বেশ পুলক সঞ্চার হচ্ছিল আমার। ভাবলাম, এ সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া বর্ণনা দিয়ে আজই বড়দা'কে একখানা চিঠি ছেড়ে দেব।

দরজা ঠেলে আপিস-ঘরে ঢুকতেই দেখলাম দু'জন গ্রাম্যগোছের লোক আমার চেয়ার এবং টেবিল ভাগাভাগি করে বসে আছে—বসার কায়দা দেখলে মনে হয় লাঙল ঠেলাই ওদের পেশা। আমাকে দেখেই তারা তটস্থ হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য যেন তাদের লজ্জায় ম্রিয়মাণ বলে আমার বোধ হলো কিন্তু পরমুহূর্তেই তাদের আর দেখতে পেলাম না—ওধারের জানলা টপকে ততক্ষণে তারা সটকেছে। আপিস-ঘরে যাতায়াতের অমন দরজা থাকতেও তা না ব্যবহার করে অপ্রশস্ত জানলাই বা তারা কেন পছন্দ করল, এই অদ্ভুত কাণ্ডের মাথামুণ্ড নির্ণয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সযত্নলালিত ছড়ি হস্তে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তাঁর দাড়ির চাকচিক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। চেয়ারে ছড়ির ঠেসান দিয়ে দাড়িকে হস্তগত করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কি নতুন সম্পাদক?'

আমি জানালাম, তাঁর অনুমান যথার্থ।

'আপনি কি এর আগে কোন কৃষি-কাগজের সম্পাদনা করেছেন?

'আজ্ঞে না', আমি বললাম, 'এই আমার প্রথম চেষ্টা।'

'তাই সম্ভব।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'হাতে-কলমে কৃষি-কাজের কোন অভিজ্ঞতা আছে আপনার?'

'একদম না।' স্বীকার করলাম আমি।

'আমারও তাই মনে হয়েছে।' ভদ্রলোক পকেট থেকে ভাঁজ করা এই সপ্তাহের একখানা 'কৃষি-তত্ত্ব' বার করলেন—'এই সম্পাদকীয় আপনার লেখা নয় কি?'

আমি ঘাড় নাড়লাম—'এটাও আপনি ঠিক ধরেছেন।'

'আবার আন্দাজ ঠিক।' বলে তিনি পড়তে শুরু করলেন:

'মুলো জিনিসটা পাড়বার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কখনই টেনে ছেঁড়া উচিত নয়, ওতে মুলোর ক্ষতি হয়। তার চেয়ে বরং একটা ছেলেকে গাছের ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে ডালপালা নাড়তে দিলে ভাল

হয়। খুব ক'সে নাড়া দরকার। ঝাঁকি পেলেই টপাটপ মুলোবৃষ্টি হবে, তখন কুড়িয়ে নিয়ে ঝাঁকা ভরো।...'

'এর মানে কি আমি জানতে চাই!' ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে যেন উষ্মার আভাস ছিল।

'কেন? এর মানে তো স্পষ্ট।' বৃদ্ধ ব্যক্তির বোধশক্তি-হীনতা দেখে আমি হতবাক হলাম, 'আপনি কি জানেন, কত হাজার হাজার, কত লাখ লাখ মুলো অর্ধপক্ব অবস্থায় টেনে ছিঁড়ে নষ্ট করা হয় আমাদের দেশে? মুলো নষ্ট হলে কার যায় আসে? কেবল যে মুলোরাই তাতে অপকার করা হয় তা নয়, আমাদের—আমাদেরও ক্ষতি তাতে। দেশেরই তাতে সর্বনাশ, তার হিসেব রাখেন? তার চেয়ে যদি মুলোকে গাছেই পাকতে দেওয়া হত এবং তারপরে একটা ছেলেকে গাছের ওপরে—'

'নিকুচি করেছে গাছের! মুলো গাছেই জন্মায় না।'

'কি! গাছে জন্মায় না! অসম্ভব—এ কখনও হতে পারে? মানুষ ছাড়া সবকিছুই গাছে জন্মায়, এমন কি বাঁদর পর্যন্ত।'

ভদ্রলোকের মুখবিকৃতি দেখে বুঝলাম বিরক্তির তিনি চরম সীমায়। রেগে 'কৃষি-তত্ত্ব'খানা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফুঁ দিয়ে, ঘরময় উড়িয়ে দিলেন—তারপরে নিজের ছড়িতে হস্তক্ষেপ করলেন। আমি শঙ্কিত হলাম—লোকটা মারবে নাকি? কিন্তু না, আমাকে ছাড়া টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আলমারি, ঘরের সবকিছু ছড়িপেটা করে, অনেক কিছু ভেঙেচুরে, অনেকটা শান্ত হয়ে, অবশেষে সশব্দে দরজায় ধাক্কা মেরে তিনি সবেগে বেরিয়ে গেলেন। লোকটা কোনো ইস্কুলের মাস্টার নয় তো?

আমি অবাক হলাম, ভদ্রলোক ভারী চটে চলে গেলেন তা তো স্পষ্টই, কিন্তু কেন যে কি সম্বন্ধে তাঁর এত অসন্তোষ তা কিছু বুঝতে পারলাম না।

এই দুর্ঘটনার একটু পরেই আগামী সপ্তাহের সম্পাদকীয় লেখবার জন্য সুবিধে মতো জাঁকিয়ে বসছি এমন সময়ে দরজা ফাঁক করে কে যেন উঁকি মারল। যারা জানলা-পথে পালিয়েছিল সেই 'চষ্য'-রাজাদের একজন নাকি? কিন্তু না, নিরীক্ষণ করে দেখলাম বিশ্রী চেহারার জনৈক বদ্খৎ লোক। লোকটা ঘরে ঢুকেই যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেল, ঠোঁটে আঙুল চেপে, ঘাড় বেঁকিয়ে, কুঁজো হয়ে কি যেন শোনবার চেষ্টা করল। কোথাও শব্দমাত্র ছিল না। তথাপি সে শুনতে লাগল। তবু কোনো শব্দ নেই। তারপরে অতি সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে পা টিপে টিপে আমার কাছাকাছি এগিয়ে এসে সুতীব্র ঔৎসুক্যে আমাদের দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ একেবারে নিষ্পলক, তারপরেই কোটের বোতাম খুলে হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে একখণ্ড 'কৃষি-তত্ত্ব' বার করল।

'এই যে, তুমি! তুমিই লিখেছ তো? পড়—পড় এইখানটা, তাড়াতাড়ি। ভারী কষ্ট হচ্ছে আমার।'

আমি পড়তে শুরু করলাম:

'মুলোর বেলা যেরকম আলুর বেলা সেরকম করা চলবে না। গাছ ঝাঁকি দিয়ে পাড়লে আলুরা চোট খায়, এই কারণেই আলু পচে আর তাতে পোকা ধরে। আলুকে গাছে বাড়তে দিতে হবে—যতদূর খুশি সে বাড়ুক। এরকম সুযোগ দিলে এক-একটা আলুকে তরমুজের মতো বড় হতে দেখা গেছে। অবশ্য বিলাতেই; এদেশে আমরা আলু খেতেই শিখেছি, আলুর যত্ন নিতে শিখিনি। আলু যথেষ্ট বেড়ে উঠলে এক-একটা করে আলাদা আলাদা ফজলি আমের মতন তাকে ঠুসি-পাড়া করতে হবে।

'তবে পেঁয়াজ আমরা আঁকশি দিয়ে পাড়তে পারি, তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। অনেকের ধারণা পেঁয়াজ গাছের ফল, বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। বরং ওকে ফুল বলা যেতে পারে—ওর কোনো গন্ধ নেই, যা আছে কেবল দুর্গন্ধ। ওর খোসা ছাড়ানো মানেই ওর কোরক ছাড়ানো। এনতার কোরক ওর। পেঁয়াজেরই অপর নাম শতদল।

'অতি প্রাচীনকালেও এদেশে ফুলকপি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাকে আহার্যের মধ্যে তখন গণ্য করা হত না। শাস্ত্রে বলেছে অলাবু-ভক্ষণ নিষেধ, সেটা ফুলকপি সম্বন্ধেই। আর্যেরা কপি খেতেন না, ওটা অনার্য হাতিদের খাদ্য ছিল। 'গজভুক্ত কপিত্থ' এই প্রবাদে তার প্রমাণ রয়েছে।

'বাতাবিলেবুর গাছে কমলালেবু ফলানোর সহজ উপায় হচ্ছে এই—'

'ব্যস, ব্যস—এতেই হবে।' আমার উৎসাহী পাঠক উত্তেজিত হয়ে আমার পিঠ চাপড়াবার জন্য হাত বাড়াল। 'আমি জানি আমার মাথা ঠিকই আছে, কেননা তুমি যা পড়লি আমিও ঠিক তাই পড়েছি, ওই কথাগুলোই। অন্তত আজ সকালে, তোমার কাগজ পড়ার আগে পর্যন্ত ওই ধারণাই আমার ছিল। যদিও আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে সব সময়ে নজরে নজরে রাখে তবু এই ধারণা আমার প্রবল ছিল যে মাথা আমার ঠিকই আছে—'

তার সংশয় দূর করার জন্য আমি সায় দিলাম—'নিশ্চয়! নিশ্চয়!! বরং অনেকের চেয়ে বেশি ঠিক একথাই আমি বলব। এইমাত্র একজন বুড়ো লোক —কিন্তু যাক সে কথা।'

লোকটাও সায় দিল—'হ্যাঁ, যাক। তবে আজ সকালে তোমার কাগজ পড়ে সে ধারণা আমার টলেছে। এখন আমি বিশ্বাস করি যে সত্যি সত্যিই আমার মাথা খারাপ। এই বিশ্বাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এক দারুণ চিৎকার ছেড়েছি—নিশ্চয়ই তুমি এখানে বসে তা শুনতে পেয়েছ?'

আমি ঘাড় নাড়লাম, কিন্তু আমার অস্বীকারোক্তিতে সে আমল দিল না—

'নিশ্চয় পেয়েছ। দু মাইল দূর থেকে তা শোনা যাবে। সেই চিৎকার ছেড়েই এই লাঠি নিয়ে আমি বেরিয়েছি, কাউকে খুন না করা পর্যন্ত স্বস্তি হচ্ছে না। তুমি বুঝতেই পারছ আমার মাথার যা অবস্থা তাতে একদিন না একদিন কাউকে না কাউকে খুন আমায় করতেই হবে—তবে আজই তা শুরু করা যাক না কেন ?'

কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না, একটা অজানা আশঙ্কায় বুক দুর দুর করতে লাগল।

'বেরুবার আগে আর একবার তোমার প্যারাগুলো পড়লাম, সত্যিই আমি পাগল কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে। তার পরক্ষণেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তায় যাকে পেয়েছি তাকেই ধরে ঠেঙিয়েছি। অনেকে খোঁড়া হয়েছে, অনেকের মাথা ভেঙেছে ; সবশুদ্ধ কতজন হতাহত বলতে পারব না। তবে একজনকে জানি, সে গাছের উপর উঠে বসে আছে। গোলদীঘির ধারে। আমি ইচ্ছা করলেই তাকে পেড়ে আনতে পারব। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল তোমার সঙ্গে একবার মোলাকাৎ করে যাই—'

হৃৎকম্পের কারণ এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম—কিন্তু বোঝার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্প একেবারেই বন্ধ হবার যোগাড় হল যেন !

'কিন্তু তোমায় আমি সত্যি বলছি, যে লোকটা গাছে চেপে আছে তার কপাল ভাল। এতক্ষণ তবু বেঁচে রয়েছে বেচারা। ওকে খুন করে আসাই উচিত ছিল আমার। যাক্, ফেরার পথে ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। এখন আসি তাহলে—নমস্কার !'

লোকটা চলে গেলে ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়ল। কিন্তু এতগুলো লোক যে আমার লেখার জন্যই খুন-জখম হয়েছে হাত-পা হারিয়েছে এবং একজন গোলদীঘির ধারে এখনও গাছে চেপে বসে আছে—এই সব ভেবে মন ভারী খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু অচিরেই এই সব দুশ্চিন্তা দূরীভূত হলো, কেননা 'কৃষি-তত্ত্বে'র আটপৌরে সম্পাদক অপ্রত্যাশিতরূপে প্রবেশ করলেন।

সম্পাদকের মুখ গম্ভীর, বিষণ্ণ, বিলম্বিত। চেঞ্জে গিয়েই অবিলম্বে ফিরে আসার জন্যই বোধ হয়। আমরা দুজনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পরে একটিমাত্র কথা তিনি বললেন—'তুমি আমার কাগজের সর্বনাশ করেছ।'

আমি বললাম, 'কেন, কাটতি তো অনেক বেড়েছে।'

'হ্যাঁ, কাগজ বহুত কেটেছে, আমি জানি। কিন্তু আমার মাথাও কাটা গেছে সেই সঙ্গে।' তারপরে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কীর্তিকলাপ তাঁর দৃষ্টিগোচর হল, চারিদিকে ভাঙচোরা দেখে তিনি নিজেও যেন ভেঙে পড়লেন—'সত্যি বড় দুঃখের বিষয়, বড়ই দুঃখের বিষয়। 'কৃষি-তত্ত্বে'র সুনামের যে হানি হলো, যে বদনাম হলো তা বোধহয় আর ঘুচবে না। অবিশ্যি কাগজের এত বেশি বিক্রী এর আগে কোনোদিন হয়নি বা এমন নামডাকও

চারধারে ছড়িয়ে পড়েনি—কিন্তু পাগলামির জন্য বিখ্যাত হয়ে কি লাভ? একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ দেখি চারধারে কি রকম ভীড়—কি সোরগোল! তারা সব দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে দেখবার জন্যে। তাদের ধারণা তুমি বদ্ধ পাগল। তাদের দোষ কি? যে তোমার সম্পাদকীয় পড়বে তারই ওই ধারণা বদ্ধমূল হবে। তুমি যে চাষ-বাসের বিন্দুবিসর্গও জানো তা তো মনে হয় না। কপি আর কপিত্থ যে এক জিনিস একথা কে তোমাকে বলল? গোল আলুর সম্বন্ধে তুমি যে গবেষণা করেছ, মুলো চাষের যে আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছ সে সম্বন্ধে তোমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই। তুমি লিখেছ শামুক অতি উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু তাদের ধরা অতি শক্ত। মোটেই তা নয়, শামুক মোটেই সারবান নয়, এবং তাদের দ্রুতগতির কথা এই প্রথম জানা গেল। কচ্ছপেরা সঙ্গীতপ্রিয়, রাগ-রাগিণীর সম্মুখে তারা মৌনী হয়ে থাকে, সেটা তাদের মৌনসম্মতির লক্ষণ, তোমার এ মন্তব্য—একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কচ্ছপদের সুরবোধের কোনই পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনিই ওরা চুপচাপ থাকে, মৌনী হয়ে থাকাই ওদের স্বভাব—সঙ্গীতের কোন ধারই ধারে না তারা। কচ্ছপদের দ্বারা জমি চষানো অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। আপত্তি না করলেও জমি তারা চষবে না—তারা তো বলদ নয়! তুমি যে লিখেছ, ঘোড়ামুগ ঘোড়ার খাদ্য আর কলার বীচি থেকে কলাই হয়, তার ধাক্কা সামলাতে আমার কাগজ উঠে না গেলে বাঁচি! গাছের ডাল আর ছোলার ডালের মধ্যে যে প্রভেদ আছে দেড় পাতা খরচ করে তা বোঝাবার তোমার কোনই দরকার ছিল না। কেবল তুমি ছাড়া আর সবাই জানে। যাক্, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি বিদায় নাও। তোমাকে আর সম্পাদকতা করতে হবে না। আমার আর বায়ু-পরিবর্তনের কাজ নেই—ঘাটশিলায় গিয়েই আমাকে দৌড়ে আসতে হয়েছে—তোমার পাঠানো কাগজের কপি পেয়ে অবধি আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। পরের সপ্তাহে আবার তুমি কি গবেষণা করে বসবে সেই ভয়েই আমার বুক কেঁপেছে। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! যখনই তোমার ঘোষণার কথা ভেবেছি—জাম, জামরুল আর গোলাপ জাম কি করে একই গাছে ফলানো যায়, পরের সংখ্যাতেই তুমি তার উপায় বদলে দেবে, তখন থেকেই নাওয়া-খাওয়া আমার মাথায় উঠেছে—বেরিবেরিতে প্রাণ যায় সেও ভাল—তখনই আমি কলকাতার টিকেট কিনে গাড়িতে চেপেছি।'

এতখানি বক্তৃতার পর ভদ্রলোক এক দারুণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। ওরই কাগজের কাটতি আর খ্যাতি বাড়িয়ে দিলাম, আয়ও বেড়ে গেল কত অথচ উনিই আমাকে গাল-মন্দ করছেন! ভদ্রলোকের নেমকহারামি দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। অতএব, শেষবিদায় নেওয়ার আগে আমিই বা ক্ষান্ত হই কেন? আমার বক্তব্য আমিও বলে যাব। এত খাতির কিসের?

'বেশ, আমার কথাটাও শুনুন তবে। আপনার কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই, আপনি একটি আস্ত বাঁধাকপি। এরকম অনুদার মন্তব্য যা এতক্ষণ আমাকে শুনব বলে কোনদিন আমি কল্পনাও করিনি। কাগজের সম্পাদক হতে হলে কোনো কিছু জানতে হয় তাও আমি এই প্রথম জানলাম। এতদিন তো দেখে আসছি যারা বই লিখতে জানে না তারাই বইয়ের সমালোচনা করে, আর যারা ফুটবল খেলতে পারে না তারাই ফুটবল খেলা দেখতে যায়। আপনি নিতান্তই শালগম, তাই একথা বুঝতে আপনার বেগ পেতে হচ্ছে। যদি নেহাৎ ভূমিকুষ্মাণ্ড না হতেন তাহলে অবশ্য বুঝতেন যে 'কৃষি-তত্ত্বে'র কি উন্নতি আর আপনার কতখানি উপকার আমি করেছি! আমার গায়ে জোর থাকলে আপনার মত গাজরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে যেতাম! কি আর বলব আপনাকে, পালং শাক, পানফল, তালশাঁস, যা খুশি বলা যায়। আপনাকে পাতিলেবু বললে পাতিলেবুর অপমান করা হয়—'

দম নেবার জন্য আমাকে থামতে হল। গায়ের ঝাল মিটিয়ে গালাগালের শোধ তুললাম, কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে নির্বাক। আবার আরম্ভ করলাম আমি—

'হ্যাঁ, একথা সত্যি, সম্পাদক হবার জন্য জন্মাইনি! যারা সৃষ্টি করে আমি তাদেরই একজন, আমি হচ্ছি লেখক। ভুঁইফোড় কাগজের সম্পাদক হয় কারা? আপনার মতো লোক—নিতান্তই যারা টম্যাটো। সাধারণত যারা কবিতা লিখতে পারে না, আট-আনা-সংস্করণের নভেলও যাদের আসে না, পিলে-চমকানো থিয়েটারী নাটক লিখতেও অক্ষম, প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রেও অপারগ তারাই অবশেষে হাত-চুলকানো থেকে আত্মরক্ষার জন্য আপনার মতো কাগজ বের করে বসে। আপনি আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেছেন তাতে আর মুহূর্তও এখানে থাকতে আমার রুচি নেই! এই দণ্ডেই সম্পাদক-গিরিতে আমি ইস্তফা দিচ্ছি। 'চাষাড়ে' কাগজের সম্পাদকের কাছে ভদ্রতা আশা করাই বাতুলতা! ঘড়ির দুর্দশা দেখেই আমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। যাব তো আমি নিশ্চয়, কিন্তু জানবেন, আমার কর্তব্য আমি করে গেছি, যা চুক্তি ছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি আমি। বলেছিলাম আপনার কাগজ সর্বশ্রেণীর পাঠ্য করে তুলব—তা আমি করেছিও। বলেছিলাম আপনার কাগজের কুড়ি হাজার গ্রাহক করে দেব—যদি আর দু-সপ্তাহ সময় পেতাম তাও আমি করতে পারতাম। এখন - এখনই আপনার পাঠক কারা? কোন চাষের কাগজের বরাতে যা কোনদিন জোটেনি সেইসব লোক আপনার কাগজের পাঠক—যত উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, মোক্তার, হাইকোর্টের জজ, কলেজের প্রফেসার, যত সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। একজনও চাষা নেই ওর ভেতর—যত চাষা গ্রাহক ছিল তারা সব চিঠি লিখে কাগজ ছেড়ে দিয়েছে—ঐ দেখুন টেবিলের ওপর চিঠির গাদা! কিন্তু আপনি এমনই চাল-কুমড়ো যে পাঁচ শ' মুখ্যু চাষার জন্যে বিশ হাজার উচ্চশিক্ষিত গ্রাহক হারালেন! এতে আপনারই ক্ষতি হলো, আমার কি আর! আমি চললাম।'

তোমরা আমাকে গল্প-লেখক বলেই জানো। কিন্তু আমি যে একজন ভাল শিকারী, এ খবর নিশ্চয়ই তোমাদের জানা নেই। আমি নিজেই এ কথা জানতাম না, শিকার করার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত!

আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, কোথায় নাকি দশ-বারো বছরের ছেলেরা, দশ-বারো হাত বাঘ শিকার করে ফেলেছে। আজকের ৭ই জুলাইয়ের খবরের কাগজেই তোমরা দেখবে একটা সাত বছরের ছেলে ন' ফিট বাঘ সাবাড় করে দিয়েছে। বাঘটার উপদ্রবে গ্রামসুদ্ধ লোক ভীত, সন্ত্রস্ত। কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। ভাগ্যিস সেখানকার তালুকদারের একটা ছেলে ছিল এবং আরো সৌভাগ্যের কথা যে বয়স ছিল মোটে বছর সাত, তাই গ্রামবাসীদের বাঘের কবল থেকে এত সহজে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হলো।

তোমরা হয়ত বলবে যে, ছেলেটার ওজনের চেয়ে বন্দুকের ওজনই যে ভারী। তা হতে পারে, তবু এ কথা আমি অবিশ্বাস করি না, বিশেষ করে' যখন খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে নিজের চোখে দেখেছি। আমার ভালুক শিকারের খবরটাও কাগজে দেখেছিলাম—তারপর থেকেই তো ঘটনাটায় আমার দারুণ বিশ্বাস হয়ে গেছে। প্রথমে আমি ধারণা করতেই পারিনি যে আমিই ভালুকটাকে মেরেছি, এবং ভালুকটারও মনে যেন সেই সন্দেহ বরাবর ছিল মনে হয়, মরার আগে পর্যন্ত। কিন্তু যখন খবরের কাগজে আমার শিকার কাহিনী নিজে পড়লাম, তখন নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অমূলক ধারণা আমার দূর হলো। ভালুকটার সন্দেহ বোধকরি শেষ অবধি থেকেই গেছল,

কেন না খবরের কাগজটা চোখে দেখার পর্যন্ত তার সুযোগ হয়নি—কিন্তু না হোক, সে নিজেই দূর হয়ে গেছে।)

সেই রোমাঞ্চকর ঘটনাটা এবার তোমাদের বলি : আমার মাসতুতো বড়দা সুন্দরবনের দিকে জমি-টমি নিয়ে চাষ-বাস শুরু করেছেন। সেদিন তাঁর চিঠি পেলাম—'এবার গ্রীষ্মটা এ ধারেই কাটিয়ে যাও না, নতুন জীবনের আস্বাদ পাবে, অভিজ্ঞতাও বেড়ে যাবে অনেক। সঙ্গে করে কিছুই আনতে হবে না, কয়েক জোড়া কাপড় এনো।'

আমি লিখলাম – 'যেতে লিখেছ যাব না-হয়। কিন্তু কাপড় নিয়ে যেতে হবে কেন বুঝতে পারলাম না। আমার সুটকেসে তো দু'খানার বেশি ধরবে না, এবং বাড়তি বোঝা বইতে আমি নারাজ! আর তা ছাড়া এই সেদিনই তো তুমি কলকাতা থেকে বার জোড়া কাপড় নিয়ে গেছ! অত কাপড় সেখানে কি করো? বৌদি নিশ্চয়ই ধুতি পরা ধরেননি। তোমার কাপড়েই আমার চলে যাবে—তুমি তো একলা মানুষ, বাপু!'

দাদা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন—'আর কিছু না, বাঘের জন্যে।'

আমার সবিস্মিত পালটা জবাব গেল—'সে কি! বাঘে ছাগল গরুই চুরি করে শুনেছি, আজকাল কাপড়-চোপড়ও সরাচ্ছে নাকি? কাপড়-চোপড়ের ব্যবহার যখন শিখেছে, তখন তারা রীতিমত সভ্য হয়েছে বলতে হবে!'

দাদা উত্তর দিলেন—'চিঠিতে অত বকতে পারি না। আমার এখানে এসে তোমার কাপড়ের অভাব হবে না, এ কথা নিশ্চয়ই—কিন্তু যে কাপড় তোমাকে আনতে বলেছি, তার দরকার পথেই। চিড়িয়াখানার বাঘই দেখেছ, আসল বাঘ তো কোনদিন দেখনি, আসল বাঘের হুহুঙ্কারও শোননি। চিড়িয়াখানার ওগুলোকে বেড়াল বলতে পার। সুন্দরবন দিয়ে স্টিমারে আসতে দু'পাশের জঙ্গলে বাঘের হুঙ্কার শোনা যায়, শোনামাত্রই কাপড় বদলানোর প্রয়োজন অনুভব করবে। প্রায় সকলেই সেটা করে থাকেন। যত ঘন ঘন ডাকবে, (ডাকাটা অবশ্য তাদের খেয়ালের ওপর নির্ভর করে) তত ঘন ঘনই কাপড়ের প্রয়োজন। তবে তুমি যদি খাকি প্যাণ্ট পরে আস, তাহ'লে দরকার হবে না।'

অতঃপর চব্বিশ জোড়া কাপড় কিনে নিয়ে আমি সুন্দরবন গমন করলাম।

আমার মাসতুতো দাদাও একজন বড় শিকারী। এ তথ্যটা আগে জানতাম না; এবার গিয়ে জানলাম। শুধু হাতেই অনেক দুর্দ্ধর্ষ বাঘকে তিনি পটকে ফেলেছেন। বন্দুক নিয়েও শিকারের অভ্যাস তাঁর আছে, কিন্তু সে রকম সুযোগে তিনি বন্দুককে লাঠির মত ব্যবহার করতেই ভালবাসেন। তাঁর মতে কেঁদো বাঘকে কাঁদাতে হলে বন্দুকের কুঁদোই প্রশস্ত—গুলি করা কোন কাজের কথাই নয়। কিছুদিন আগে এক বাঘের সঙ্গে তাঁর বড় হাতাহাতি হয়ে গেছল, তাঁর নিজের মুখেই আমার শোনা। বাঘটার

অত্যাচার বেজায় বেড়ে গেছল, সমস্ত গ্রামটার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাত ব্যাটা, এমন কি তাদের স্বপ্নের মধ্যে এসে হানা দিত পর্যন্ত !

দাদার নিজের ভাষাতেই বলি :—'তারপর তো ভাই বেরোলাম বন্দুক নিয়ে। কি করি, সমস্ত গ্রামের অনুরোধ। ঠেলা তো যায় না—একাই গেলাম। সঙ্গে লোকজন নিয়ে শিকারে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। একবার অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম, কি বলব ! বাঘ করল তাদের তাড়া, তারা এসে পড়ল আমার ঘাড়ে ; মানুষের তাড়ায় প্রাণে মারা যাই আর কি ! গেলাম। কিছুদূর যেতেই দেখি সামনে বাঘ, বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে জানলাম টোটা আনা হয়নি—আর সে বন্দুকটা এমন ভারী যে, তাকে লাঠির মতও খেলানো যায় না। কী করি, বন্দুক ফেলে দিয়ে শুধু হাতেই বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জোর ধস্তাধস্তি, কখনো বাঘ ওপরে আমি নীচে, কখনো আমি নীচে বাঘ ওপরে—বাঘটাকে প্রায় কাবু করে এনেছি এমন সময়ে—'

আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করছি, বৌদি বাধা দিয়ে বললেন—'এমন সময়ে তোমার দাদা গেলেন তক্তাপোষ থেকে পড়ে। জলের ছাঁট দিয়ে, হাওয়া করে, অনেক কষ্টে ওঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। মাথাটা গেল কেটে, তিন দিন জলপটি দিতে হয়েছিল।'

এর পর দাদা বারো দিন আর বৌদির সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না এবং মাছের মুড়ো সব আমার পাতেই পড়তে লাগল।

দাদা একদিন চুপিচুপি আমায় বললেন—'তোমার বৌদির কীর্ত্তি জানো না তো ! খুকিকে নিয়ে পাশের জঙ্গলে জাম কুড়োতে গিয়ে, পড়েছিলেন এক ভালুকের পাল্লায়। খুকিতো পালিয়ে এল, উনি ভয়ে জবু-থবু হয়ে, একটা উইয়ের ঢিপির উপর বসে পড়ে এমন চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন যে, ভালুকটা ওঁর ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।'

আমি বললাম—'ওঁর ভাষা না বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছল, এমনও তো হতে পারে ?'

দাদা বিরক্তি প্রকাশ করলেন—'হ্যাঃ ! ভারি ত ভাষা ! প্রত্যেক চিঠিতে দুশো করে বানান ভুল !'

বৌদির পক্ষ সমর্থন করতে আমাকে, অন্ততঃ মাছের মুড়োর কৃতজ্ঞতা-সূত্রেও, বলতে হলো,—'ভালুকরা শুনেছি সাইলেণ্ট ওয়ার্কার, বক্তৃতা-টক্তৃতা ওরা বড় পছন্দ করে না। কাজেই বৌদি ভালুক তাড়াবার ব্রহ্মাস্ত্রই প্রয়োগ করেছিলেন, বুঝলে দাদা ?'

দাদা কোন জবাব দিলেন না, আপন মনে গজরাতে লাগলেন। বৌদির তরফে আমার ওকালতি শুনে তিনি মুষড়ে পড়লেন, কি ক্ষেপে গেলেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সেদিন বিকেলেই তাঁর মনোভাব টের পাওয়া

গেল। দাদা আমাকে হুকুম করলেন পাশের জঙ্গল থেকে এক ঝুড়ি জাম কুড়িয়ে আনতে—সেই জঙ্গল, যেখানে বৌদির সঙ্গে ভালুকের প্রথম দর্শন হয়েছিল।

দাদার গরহজম হয়েছিল, তাই জাম খাওয়া দরকার, কিন্তু আমি দাদার ডিপ্লোম্যাসি বুঝতে পারলাম। আমাকে ভালুকের হাতে ছেড়ে দিয়ে, আমাকে সুদ্ধ বিনা আয়াসে হজম করবার মতলব। বুঝলাম বৌদির পক্ষে যাওয়া আমার ভাল হয়নি। আমতা-আমতা করছি দেখে দাদা বললেন—'আমার বন্দুকটা না হয় নিয়ে যা, কিন্তু দেখিস, ভুলে ফেলে আসিস না যেন।'

ওঃ, কি কুটচক্রী আমার মাসতুতো বড়দা! ভালুকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা বরং আমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বন্দুক ছোঁড়া—? একলা থাকলে হয়ত দৌড়ে পালিয়ে আসতে পারব, কিন্তু ঐ ভারী বন্দুকের হ্যাণ্ডি-ক্যাপ নিয়ে দৌড়তে হলে সেই রেসে ভালুকই যে প্রথম হবে, এ বিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ ছিল না, দেখলাম দাদাও তেমনি স্থির-নিশ্চয়।

দাদা জামের ঝুড়ি আর বন্দুকটা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন—'চট করে যা, দেরি করিসনি। তোর ভয় কচ্ছে নাকি?'

অগত্যা আমায় বেরুতে হলো। বেশ দেখতে পেলুম, আমার মাসতুতো বড়দা আড়ালে একটু মুচকি হেসে নিলেন। মাছের-মুড়োর বিরহ তাঁর আর সহ্য হচ্ছিল না। নাঃ, এই বিদেশে বিভুঁয়ে মাসতুতো ভাইয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে ভাল করিনি। খতিয়ে দেখলাম, ওই চব্বিশ জোড়া কাপড়ই বড়দার নেট লাভ।

বেরিয়ে পড়লাম। এক হাতে ঝুড়ি, আরেক হাতে বন্দুক। নিশ্চয়ই আমাকে খুব বীরের মত দেখাচ্ছিল। যদিও একটু বিশ্রী রকমের ভারী, তবু বন্দুকে আমায় বেশ মানায়। ক্রমশ মনে সাহস এলো—আসুক না ব্যাটা ভালুক, তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং বড়দাকেও! মাসতুতো ভাই কেবল চোরে-চোরেই হয় না, শিকারীতে-শিকারীতেও হতে পারে! উনিই একজন বড় শিকারী, আর আমি বুঝি কিছু না?

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলাম। আসুক না ব্যাটা ভালুক এইবার! ঝুড়িটা হাতে নেওয়ায় যতটা মনুষ্যত্বের মর্যাদা লাঘব হয়েছিল, বন্দুকে তার ঢের বেশি পুষিয়ে গেছে। আমাকে দেখাচ্ছে ঠিক বীরের মত। অথচ দুঃখের বিষয়, এই জঙ্গল পথে একজনও দেখবার লোক নেই। এ সময়ে একটা ভালুককে দর্শকের মধ্যে পেলেও আমি পুলকিত হতাম।

বন্দুক কখনো যে ছুঁড়িনি তা নয়। আমার এক বন্ধুর একটা ভাল বন্দুক ছিল, হরিণ-শিকারের উচ্চাভিলাষ বশে তিনি ওটা কিনেছিলেন। বহুদিনের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তিনি গাছ-শিকার করতে পারতেন। তিনি

বলতেন—গাছ-শিকারের অনেক সুবিধে ; প্রথমত গাছেরা হরিণের মত অত দৌড়ায় না, এমন কি মুটে পালাবার বদভ্যাসই নেই ওদের, দ্বিতীয়ত—ইত্যাদি, সে বিস্তর কথা। তা, তিনি সত্যিই গাছ শিকার করতে পারতেন—অন্তত বাতাস একটু জোর না বইলে, উপযুক্ত আবহাওয়ায় এবং গাছটাও হাতের কাছে হলে, তিনি অনায়াসে লক্ষ্য ভেদ করতে পারতেন—প্রায় প্রত্যেক বারই।

আমিও তাঁর সঙ্গে গাছ-শিকার করেছি, তবে যে-কোন গাছ আমি পারতাম না। আকারে-প্রকারে কিছু বড় হলেই আমার পক্ষে সুবিধে হতো, গুঁড়ির দিকটাতেই আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। বৃক্ষ-শিকারে যখন এতদিন হাত পাকিয়েছি, তখন ঋক্ষ-শিকারে যে একেবারে বেহাত হব না, এ ভরসা আমার ছিল।

জঙ্গলে গিয়ে দেখি পাকা পাকা জামে গাছ ভর্তি ! জাম দেখে জাম্ববানের কথা আমি ভুলেই গেলাম। এমন বড় বড় পাকা পাকা খাসা জাম ! জিভ লালায়িত হয়ে উঠল। বন্দুকটা একটা গাছে ঠেসিয়ে, দুহাতে ঝুড়ি ভরতে লাগলাম। কতক্ষণ কেটেছে জানি না, একটা খস খস শব্দে আমার চমক ভাঙল। চেয়ে দেখি—ভালুক !

ভালুকটা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমি যা করছি সেও তাতেই ব্যাপৃত ! একহাত দিয়ে জামের একটা নীচু ডালকে সে বাগিয়ে ধরেছে, অন্য হাতে নির্বিচারে মুখে পুরছে—কাঁচা ডাঁসা সমস্ত। আমি বিস্মিত হলাম বললে বেশি বলা হয় না ! বোধ হয়, আমি ঈষৎ ভীতই হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, ভালুক দর্শনের বাঞ্ছা একটু আগেই করেছি বটে, কিন্তু দেখা না পেলেই যেন আমি বেশি আশ্বস্ত হতাম। ঠিক সেই মারাত্মক মুহূর্তেই আমাদের চারি চক্ষুর মিলন !

আমাকে দেখেই ভালুকটা জাম খাওয়া স্থগিত রাখল এবং বেশ একটু পুলকিত-বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আমি মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। গাছে উঠতে পারলে বাঘের হাত থেকে নিস্তার আছে, কিন্তু ভালুকের হাতে কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। ভালুকরা গাছে উঠতেও ওস্তাদ।

অগত্যা শ্রেষ্ঠ উপায়—পালিয়ে বাঁচা। বন্দুক ফেলে যেতে দাদার নিষেধ ; বন্দুকটা বগল-দাবাই করে চোঁচা দৌড় দেবার মতলব করছি, দেখলাম সেও আস্তে আস্তে আমার দিকে এগুচ্ছে। আমি দৌড়লেই যে সে আমার পিছু নিতে দ্বিধা বোধ করবে না, আমি তা বেশ বুঝতে পারলাম। ভালুক-জাতির ব্যবহার আমার মোটেই ভাল লাগল না।

আমিও দৌড়চ্ছি, ভালুকও দৌড়চ্ছে। বন্দুকের বোঝা নিয়ে ভালুক-দৌড়ে আমি সুবিধে করতে পারব না বুঝতে পারলাম। যদি এখনও

বন্দুকটা না ফেলে দিই, তাহলে নিজেকেই এখানে ফেলে যেতে হবে। অগত্যা অনেক বিবেচনা করে বন্দুককেই বিসর্জন দিলাম।

কিছুদূর দৌড়ে ভালুকের পদশব্দ না পেয়ে ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে আমার বন্দুকটা নিয়ে পড়েছে। ওটাকে নতুন রকমের কোন খাদ্য মনে করেছে কিনা ওই জানে! আমিও স্তব্ধ হয়ে ওর কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছিলাম।

ভালুকটা বেশ বুদ্ধিমান। অল্পক্ষণেই সে বুঝতে পারল ওটা খাদ্য নয়, হাতে নিয়ে দৌড়োবার জিনিস। এবার বন্দুকটা হস্তগত করে সে আমাকে তাড়া করল। বিপদের ওপর বিপদ—এবার আমার বিপক্ষে ভালুক এবং বন্দুক। ভালুকটা কি রকম শিকারী আমার জানা ছিল না। বন্দুকে ওর হাত অন্তত আমার চেয়ে খারাপ নয় বলে'ই আমার আন্দাজ।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। কয়েক লাফ না যেতেই পেছনে বন্দুকের আওয়াজ। আমি চোখ কান বুজে সটান শুয়ে পড়লাম,—যাতে গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়—যুদ্ধের তাই রীতি কিনা! তারপর আবার দুড়ুম! আবার সেই বন্দুক গর্জ্জন! আমি দুরু দুরু বক্ষে শুয়ে শুয়ে দুর্গানাম করতে লাগলাম। ভালুক-শিকার করতে এসে ভালুকের হাতে না 'শিকৃত' হয়ে যাই!

আমি চোখ বুজেও যেন স্পষ্ট দেখছিলাম, ভালুকটা আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার গুলিতে আমি হতাহত—অন্তত একটা কিছু যে হয়েছি, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। গুলির আঘাতে না যাই, ভালুকের আঘাতে এবার গেলাম! মৃত্যুর পূর্বক্ষণে জীবনের সমস্ত ঘটনা বায়স্কোপের ফিলমের মত মনশ্চক্ষের ওপর দিয়ে চলে যায় বলে একটা গুজব শোনা ছিল। সত্যিই তাই—একেবারে হুবহু! ছোটবেলার পাঠশালা পালানো, আম্র-শিকার থেকে শুরু করে আজকের ভালুক শিকার পর্যন্ত—প্রায় চারশো পাতার একটা মোটা সচিত্র জীবন-স্মৃতি আমার মনে মনে ভাবা, লেখা, ছাপানো প্রুফ কারেক্ট করা—এমন কি তার পাঁচ হাজার কপি বিক্রি অবধি শেষ হয়ে গেল।

জীবন-স্মৃতি রচনার পর আত্মীয়-স্বজনের কথা আমার স্মরণে এল। পরিবার আমার খুব সামান্যই—একমাত্র মা এবং একমাত্র ভাই—সুতরাং সে দুশ্চিন্তার সমাধা করাও খুব কঠিন হলো না। এক সেকেন্ড—দু' সেকেন্ড—তিন—চার—পাঁচ সেকেন্ড—এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু ভালুক ব্যাটা এখনো এসে পেঁছিল না তো! কি হলো তার? এতটা দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কি?

ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখি, ওমা, সেও যে সটান চিৎপাত! সাহস পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম—এ ভালুকটা তো ভারি অনুকরণ-প্রিয় দেখছি! কিন্তু নড়ে না-

চড়ে না যে। কাছে গিয়ে দেখলাম, নিজের বন্দুকের গুলিতে নিজেই মারা গেছে বেচারা! বুঝলাম, অত্যন্ত মনক্ষোভেই এই অন্যায়টা সে করেছে! প্রথম দিন বৌদির ব্যবহারে সে লজ্জা পেয়েছিল, আজ আমার কাপুরুষতার পরিচয়ে সে এতটা মর্মাহত হয়েছে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

বন্দুক হাতে সগর্বে বাড়ি ফিরলাম। আমার জাম-হীনতা লক্ষ্য করে দাদার অসন্তোষ প্রকাশের পূর্বেই ঘোষণা করে দিলাম—'বৌদির প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ভালুকটাকে আজ নিপাত করে এসেছি! কেবল দুটো শট—ব্যস খতম।'

দাদা, বৌদি, এমন কি খুকি পর্যন্ত দেখতে ছুটল। আমিও চললাম—এবার আর বন্দুকটাকে সঙ্গে নিলাম না,—পাঁচজনে যাত্রা নিষেধ, পাঁজিতে লেখে। দাদা বহু পরিশ্রমে ও বৌদির সাহায্যে, ভালুকের ল্যাজটাকে দেহচ্যুত করে, এই বৃহৎ শিকারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সযত্নে আহরণ করে নিয়ে এলেন। এই সহযোগিতার ফলে দাদা ও বৌদির মধ্যে আবার ভাব হয়ে গেল। আপনি আত্মদান করে ভালুকটা দাদা ও বৌদির মধ্যে মিলন-গ্রন্থি রচনা করে গেল—তার এই অসাধারণ মহত্ত্বে সে নতুন মহিমা নিয়ে আমার কাছে প্রতিভাত হলো। আমার রচনায় তাকে অমর করে রাখলাম, অন্তত আমার চেয়ে সে বেশিদিন টিকবে আশা করি।

বাড়ি ফিরেই দাদা বললেন—'অমৃতবাজার পত্রিকায় খবরটা পাঠিয়ে দিই কি বলিস?—A big wild bear was heroically killed by my young brother aged—aged—কত রে?'

'আমার age তুমি তা জানোই!'—আমি উত্তর দিলাম।

'উঁহু, কমিয়ে লিখতে হবে কিনা! নইলে বাহাদুরি কিসের! দশ বারো বছর কমিয়ে দিই, কি বলিস?'

কিন্তু দশ-বারো বছর কমিয়েও আমার বয়স যখন দশ-বারো বছরের কাছাকাছি আনা গেল না—(সাতে দাঁড় করানো তো দুঃসাধ্য ব্যাপার!) তখন বাধ্য হয়ে 'Young' এই বিশেষণের ওপর নির্ভর করে আমার বয়সাল্পতাটা লোকের অনুমানের ওপর ছেড়ে দেওয়া গেল।

সেদিন আমার পাতে দু'-দুটো মুড়ো পড়ল, খুকি মাকে বলে রেখেছে তার কাকামণিকে দিতে। আমি আপত্তি করলাম না, ভালুকের আত্মবিসর্জনে যখন করিনি, খুকির মুড়ো-বিসর্জনেই বা করব কেন? সব চেয়ে আশ্চর্য এই, আমার ঝোলের বাটির অস্বাভাবিক উচ্চতা দেখেও দাদা আজ ভ্রূক্ষেপ করলেন না!

আমার বাঘ শিকার

মুখের দ্বারা বাঘ মারা কঠিন নয়। অনেকে বড় বড় কেঁদো বাঘকে কাঁদো কাঁদো মুখে আধমরা করে ঐ দ্বারপথে এনে ফেলেন। কিন্তু মুখের দ্বারা ছাড়াও বাঘ মারা যায়। আমিই মেরেছি।

মহারাজ বললেন, 'বাঘ-শিকারে যাচ্ছি। যাবে আমাদের সঙ্গে?'

'না' বলতে পারলাম না। এতদিন ধরে তাঁর অতিথি হয়ে নানাবিধ চর্ব্যচোষ্য খেয়ে অবশেষে বাঘের খাদ্য হবার সময়ে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলে না। কেমন যেন চক্ষুলজ্জায় বাধে।

হয়তো বাগে পেয়ে বাঘই আমায় শিকার করে বসবে। তবু মহারাজার আমন্ত্রণ কি করে অস্বীকার করি? বুক কেঁপে উঠলেও হাসি হাসি মুখ করে বললাম, 'চলুন যাওয়া যাক। ক্ষতি কি?'

মহারাজার রাজ্য জঙ্গলের জন্যে এবং জঙ্গল বাঘের জন্যে বিখ্যাত। এর পরে তিনি কোথাকার মহারাজ, তা বোধ হয় না বললেও চলে। বলতে অবশ্য কোন বাধা ছিল না, আমার পক্ষে তো নয়ই, কেন না রাজামহারাজার সঙ্গেও আমার দহরম-মহরম আছে—সেটা বেফাঁস হয়ে গেলে আমার বাজারদর হয়ত একটু বাড়তোই। কিন্তু মুশকিল এই, টের পেলে মহারাজ হয়তো আমার বিরুদ্ধে মানহানির দাবি আনতে পারেন—এবং টের পাওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল না। মহারাজ না পড়ুন, মহারাজকুমারেরা যে আমার লেখা পড়েন না, এমন কথা হলফ করে বলা কঠিন। তাছাড়া আমি যে পাড়ায় থাকি, যে গুণ্ডাপাড়ায়, কোন মহারাজার সঙ্গে আমার খাতির আছে ধরা পড়লে তারা সবাই মিলে আমাকে একঘরে করে দেবে। অতএব সব দিক ভেবে স্থান, কাল, পাত্র চেপে যাওয়াই ভাল।

এবার আসল গল্পে আসা যাক।

শিকার যাত্রা তো বেরোল। হাতির উপরে হাওদা চড়ানো, তার উপরে বন্দুক হাতে শিকারীরা চড়াও ডজনখানেক হাতি চার পায়ে মশ মশ করতে করতে বেরিয়ে পড়েছে। সব আগের হাতিতে চলেছেন রাজ্যের সেনাপতি। তারপর পাত্র-মিত্র-মন্ত্রীদের হাতি; মাঝখানে প্রকাণ্ড এক দাঁতালো হাতিতে মশগুল হয়ে স্বয়ং মহারাজা; তার পরের হাতিটাতেই একমাত্র আমি এবং আমার পরেও ডানহাতি, বাঁহাতি আরো গোটা কয়েক হাতি। তাতে অপাত্র অমিত্ররা। হাতিতে হাতিতে যাকে বলে ধুল পরিমাণ! এত ধুলো উড়ছে যে দৃষ্টি অন্ধ, পথঘাট অন্ধকার—তার পরিমাণ করা যায় না।

জঙ্গল ভেঙে চলেছি। বাঁধা রাস্তা পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ,—এখন আর মশ মশ নয়, মড় মড় করে চলেছি। এই 'মর্মর-ধ্বনি কেন জাগিল রে!' ভেবে না পেয়ে হতচকিত শেয়াল, খরগোশ, কাঠবেড়ালির দল এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে, শাখায় শাখায় পাখিদের কিচির-মিচির, আর আমরা কারো পরোয়া না করে চলেছি। হাতিরা কারো খাতির করে না।

চলেছি তো কতক্ষণ ধরে। কিন্তু কোন বাঘের ধড় দূরে থাক, একটা ল্যাজও চোখে পড়ে না। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর কিসের সোরগোল শোনা গেল। কোত্থেকে একদল বুনো জংলী লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। তারা বনের মধ্যে ঢুকে কি করছিল কে জানে! মহারাজা হয়তো বাঘের বিরুদ্ধে তাদের গুপ্তচর লাগিয়ে থাকবেন। তারা বাঘের খবর নিয়ে এসেছে মনে হতেই আমার গায়ে ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু তারা বাঘের বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে 'হাত-তী হাত-তী' বলে চেঁচাতে লাগল।

হাত-তী তো কি? হাতি যে তা তো দেখতেই পাচ্ছ—হাতি কি কখনো দেখনি না কি? ও নিয়ে অমন হৈ চৈ করবার কি আছে? হাতির কানের কাছে ওই চেঁচামেচি আর চোখের সামনে ওরকম লম্ফঝম্ফ আমার ভাল লাগে না। হাতিরা বন্য ব্যবহারে চটে গিয়ে ক্ষেপে যায় যদি? হাতি বলে কি মানুষ নয়? হাতিরও তো মানমর্যাদা আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে!

মহারাজকে কথাটা আমি বললাম। তিনি জানালেন যে, আমাদের হাতির বিষয়ে উল্লেখ করছে না, একপাল বুনো হাতি এদিকেই তাড়া করে আসছে, সেই কথাই ওরা তারস্বরে জানাচ্ছে! এবং কথাটা খুব ভয়ের কথা। তারা এসে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। হাতি এবং হাওদা সমেত সবাইকে আমাদের দলে পিষে মাড়িয়ে একেবারে ময়দা বানিয়ে দেবে।

তৎক্ষণাত হাতিদের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হল। কথায় বলে হস্তিযূথ, কিন্তু তাদের ঘোরানো-ফেরানোর এত বেজুত যে বলা যায় না। যাই হোক কোন রকমে তো হাতির পাল ঘুরল, তারপরে এলো পালাবার পালা।

আমার পাশ দিয়ে হাতি চালিয়ে যাবার সময় মহারাজা বলে গেলেন,

খবরদার। হাতির থেকে একচুল যেন নড় না। যত বড় বিপদই আসুক, হাতির পিঠে লেপটে থাকবে। দরকার হলে দাঁতে কামড়ে, বুঝেছ?'

বুঝতে বিলম্ব হয় না। দূরাগত বুনোদের বজ্রনাদী বৃংহণধ্বনি শোনা যাচ্ছিল—সেই ধ্বনি হন হন করতে করতে এগিয়ে আসছে! আরো—আরো কাছে, আরো আরো কাছিয়ে। ডালে ডালে বাঁদররা কিচমিচিয়ে উঠেছে। আমার সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ঘেমে নেয়ে গেলাম।

এদিকে আমাদের দলের আর আর হাতিরা বেশ এগিয়ে গেছে। আমার হাতিটা কিন্তু চলতে পারে না। পদে পদে তার যেন কিসের বাধা! মহারাজার হাতি এত দূর এগিয়ে গেছে যে, তার লেজ পর্যন্ত দেখা যায় না। আর সব হাতিরাও যেন ছুটতে লেগেছে। কিন্তু আমার হাতিটার হল কি। সে যেন নিজের বিপুল বপুকে টেনে নিয়ে কোন রকমে চলেছে।

আমাদের দলের অগ্রণী হাতিরা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এধারে বুনো হাতির পাল পেল্লায় ডাক ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে—ক্রমশই তার আওয়াজ জোরাল হতে থাকে। আমার মাহুতটাও হয়েছে বাচ্ছা। কিন্তু বাচ্ছা হলেও সে ই তখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হে! তোমার হাতি চলছে না কেন? জোরসে চালাও। দেখছ কি?'

'জোরে আর কি চালাব হুজুর? তিন পায়ে হাতি আর কত জোরে চলবে বলুন?' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বললে।

'তিন পা! তিন পা কেন? হাতিদের তো চার পা হয়ে থাকে বলেই জানি। অবশ্য, এখন পিঠে বসে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চার পা দেখেই উঠেছিলাম বলে যেন মনে হচ্ছে। অবশ্য, ভাল করে ঠিক খেয়াল করিনি।'

'এর একটা পা কাঠের যে। পেছনের পা টা। খানায় পড়ে পা ভেঙে গেছল। রাজাসাহেব হাতিটাকে মারতে রাজি হলেন না, সাহেব ডাক্তার এসে পা কেটে বাদ দিয়ে কাঠের পা জুড়ে দিয়ে গেল। এমন রঙ বার্নিশ যে ধরবার কিছু জো নেই। ইসক্রুপ দিয়ে বাঁধা কি না!'

শুনে মুগ্ধ হলাম। ডাক্তার সাহেব কেবল হাতির পা-ই নয়, আমার গলাও সেইসঙ্গে কেটে রেখে গেছেন। আবার মহারাজেরও এমন মহিমা, কেবল বেছে বেছে খোঁড়া হাতিই নয়, দুগ্ধপোষ্য একটা খুদে মাহুতের হাতে অসহায় আমায় সমর্পণ করে সরে পড়লেন!

'কাঠের হাতি নিয়ে বাচ্চা ছেলে তুমি কি করে চালাবে?' আমি অবাক হয়ে যাই।

'বার্লি আমার নাম' সে সগর্বে জানাল,—'আর আমি হাতি চালাতে জানব না?'

'বার্লি' ? ভারি অদ্ভুত নাম তো !'—আমার বিস্ময় লাগে।

'আমি সাধুর ভাই। সাধু আমেরিকায় গেছে ছবি তুলতে।'

'তোমার বার্লিনে যাওয়া উচিত ছিল।' না বলে আমি পারলাম না : 'গেলে ভাল করতে।'

শোনবামাত্রই নিজের ভুল শোধরাতেই কি না কে জানে, তৎক্ষণাত সে হাতির ঘাড় থেকে নেমে পড়ল। নেমেই বার্লিনের উদ্দেশেই কি না কে বলবে, দে ছুট ! দেখতে দেখতে আর তার দেখা নেই। জঙ্গলের আড়ালে হাওয়া।

আমি আর আমার হাতি, কেবল এই দুটি প্রাণী পেছনে পড়ে রইলাম। আর পেছনে থেকে তেড়ে আসছে পাগলা হাতির পাল ! তেপায়া হাতির পিঠে নিরুপায় এক হস্তিমুর্খ।

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাজ পরার মতো আওয়াজ চার ধার থেকে আমাদের ছেয়ে ফেলল। গাছপালার মড়মড়ানির সঙ্গে চোখ ধাঁধানো ধুলোর ঝড় ! তার ঝাপটায় আমাদের দম আটকে গেল একেবারে।

মহারাজার উপদেশ মতো আমি এক চুল নড়িনি, হাতির পিঠে লেপটে সেঁটে রইলাম ! হাতির পাল যেমন প্রলয়নাচন নাচতে নাচতে এসেছিল, তেমনি হাঁক-ডাক ছাড়তে ছাড়তে নিজের ধান্দায় চলে গেল।

তারা উধাও হলে আমি হাতির পিঠ থেকে নামলাম। নামলাম না বলে খসে পড়লাম বলাই ঠিক। হাতে পায়ে যা খিল ধরেছিল ! নীচে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছি, ও-মা, আমার কয়েক গজ দূরে এ কি দৃশ্য ! লম্বা চওড়া বেঁটে খাটো গোটা পাঁচেক বাঘ একেবারে কাত হয়ে শুয়ে ! কর্তা, গিন্নী, কাচ্চা-বাচ্চা সমেত পুরো একটি ব্যাঘ্র-পরিবার ! হাতির তাড়নায়, হয়তো বা তাদের পদচারণায়, কে জানে, হতচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

কাছাকাছি কোনও জলাশয় থাকলে কাপড় ভিজিয়ে এনে ওদের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে পারলে হয়তো বা জ্ঞান ফেরানো যায়। কিন্তু এই বিভুঁয়ে কোথায় জলের আড্ডা, আমার জানা নেই। তাছাড়া, বাঘের চৈতন্য-সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত কি না, সে বিষয়েও আমার একটু সংশয় ছিল।

আমি করলাম কি, প্রবীণ বনস্পতিদের ঘাড় বেয়ে যেসব ঝুরি নেমেছিল তারই গোটাকতক টেনে ছিঁড়ে এনে বাঘগুলোকে একে একে সব পিছমোড়া করে বাঁধলাম। হাত, পা, মুখ বেঁধে-ছেঁদে সবাইকে পুঁটলি বানিয়ে ফেলা হল—তখনো ব্যাটারা অজ্ঞান।

হাতিটা এতক্ষণ ধরে নিস্পৃহভাবে আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। এবার উৎসাহ পেয়ে এগিয়ে এসে তার লম্বা শুঁড় দিয়ে এক একটাকে তুলে ধরে নিজের পিঠের উপর চালান দিতে লাগল। সবাই উঠে গেলে পর সব শেষে

ওর ল্যাজ ধরে আমিও উঠলাম। তখনো বাঘগুলো অচেতন। সেই অবস্থাতেই হাওদার সঙ্গে শক্ত করে আর এক প্রস্থ ওদের বেঁধে ফেলা হল।

পাঁচ পাঁচটা আস্ত বাঘ—একটাও মরা নয়, সবাই জলজ্যান্ত। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম নিঃশ্বাস পড়েছে বেশ। এতগুলো জ্যান্ত বাঘ একাধারে দেখলে কার না আনন্দ হয়? একদিনের এক চোটে এক সঙ্গে এতগুলো শিকার নিজের ল্যাজে বেঁধে নিয়ে ফেরা—এ কি কম কথা?

গজেন্দ্রগমনে তারপর তো আমরা রাজধানীতে ফিরলাম। বাচ্ছা মাহুত বার্লি ব্যগ্র হয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। এখন অতগুলো বাঘ আর বাঘান্তক আমাকে দেখে বারংবার সে নিজের চোখ মুছতে লাগল। এরকম দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

খবর পেয়ে মহারাজা ছুটে এলেন। বাঘদের হাওদা থেকে নামানো হলো। ততক্ষণে তাদের জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু হাত পা বাঁধা – বন্দী নেহাত! নইলে, পারলে পরে, তারাও বার্লি'র মতো একবার চোখ কচলে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করতো।

এতগুলো বাঘকে আমি একা স্বহস্তে শিকার করেছি, এটা বিশ্বাস করা বাঘদের পক্ষেও যেমন কঠিন, মহারাজার পক্ষেও তেমনি কঠোর। কিন্তু চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দেখলে অবিশ্বাস করবার কিছু ছিল না।

কেবল বার্লি একবার ঘাড় নাড়বার চেষ্টা করেছিল—'এতগুলো বাঘকে আপনি একলা—হাতিয়ার নেই, কুছ নেই—বহৎ তাজ্জব কি বাত...'

'আরে হাতিয়ার নেই, তো কি, হাত তো ছিল!' বাধা দিয়ে বলতে হলো আমায়। 'আর, তোমার হাতির পা-ই তো ছিল হে! তাই কি কম হাতিয়ার? বাঘগুলোকে সামনে পাবামাত্রই, বন্দুক নেই টন্দুক নেই করি কি, হাতির কাঠের পা-খানাই খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে দু হাতে তাই দিয়েই এলোপাথাড়ি বসাতে লাগলাম। ঘা কতক দিতেই সব ঠাণ্ডা! হাতির পদাঘাত—সে কি কম নাকি? অবশ্য তোমাদের হাতিকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। বলবামাত্র পেছনের পা দান করতে সে পেছ পা হয়নি। আমিও আবার কাজ সেরে তেমনি করেই তার ইস্ট্রাপ লাগিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যিস্, তুমি হাতিটার কেঠো পায়ে-র কথা বলেছিলে আমায়...!'

অম্লান বদনে এত কথা বলে হাতির দিকে চোখ তুলে তাকাতে আমার লজ্জা করছিল। হাতিরা ভারি সত্যবাদী হয়ে থাকে। এবং নিরামিষাশী তো বটেই, তাদের মতো সাধুপুরুষ দেখা যায় না প্রায়। ওর পদচ্যুতি ঘটিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি এই মিথ্যা কথায় কেবল বিরক্ত নয়, ও যেন রীতিমতো অপমান বোধ করছিল। এমন বিষ-নজরে তাকাচ্ছিল আমার দিকে যে—কি বলব! বলা বাহুল্য, তারপর আমি আর ওর ত্রিসীমানায় যাইনি।

হাতিরা সহজে ভোলে না।

আমার ব্যাঘ্রপ্রাপ্তি

'একবার আমাকে বাঘে পেয়েছিলো। বাগে পেয়েছিলো একেবারে ....'

আমার আত্মকাহিনী আরম্ভ হয়।

এতক্ষণ আমাদের চার-ইয়ারি আড্ডায় আর সকলের শিকার-কাহিনী চলছিলো। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে যে যার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করছিলেন। আমার পালা এলো অবশেষে।

অবশ্যি সবার আগে শুরু করেছিলেন এক ভালুক-মার। তার গল্পটা সত্যই ভারী রোমাঞ্চকর। ভালুকটা তাঁর বাঁ হাতখানা গালে পুরে চিবোচ্ছিল কিন্তু তিনি তাতে একটুও না বিচলিত হয়ে এক ছুরির ঘায়ে ভালুকটাকে সাবাড় করলেন। ডান হাত দিয়ে—তাকে হাতিয়ে।

আমি আড় চোখে তাঁর বাঁ হাতের দিকে তাকালাম। সেটা যে কখনো কোন ভালুক মন দিয়ে মুখস্থ করেছিল তার কোন চিহ্ন সেখানে নেই।

না থাক, আমার মনের বিস্ময় দমন করে আমি জিজ্ঞেস করি: 'ভালুক কি আপনার কানে কানে কিছু বলেছিলো?'

'না। ভালুক আবার কি বলবে।' তিনি অবাক হন।

'ওরা বলে কিনা, ওই ভালুকরা।' আমি বলি: 'কানাকানি করা ওদের বদভ্যাস। পড়েন নি কথামালায়?'

'মশাই, এ, আপনার কথামালার ভালুক নয়। আপনার ঈশপ কিংবা গাঁজার শপ পান নি।' তাঁর মুখে-চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে।—'আস্ত ভালুক। একেবারে জলজ্যান্ত।'

ভালুক শিকারীর পর শুরু করলেন এক কূর্মবীর। তাঁর কচ্ছপ ধরার

কাহিনী। তাঁরটাও জলজ্যান্ত। জল থেকেই তিনি তুলেছিলেন কচ্ছপটাকে ঃ

কচ্ছপটা জলের তলায় ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। হেদো-গোলদীঘির কোথাও হবে। আর উনি ড্রাইভ খাচ্ছিলেন—যেমন খায় লোকে। খেতে খেতে একবার হলো কি ওঁর মাথাটা গিয়ে কচ্ছপের পিঠে ঠক করে ঠুকে গেল। সেই ঠোক্কর না খেয়ে তিনি রেগেমেগে কচ্ছপটাকে টেনে তুললেন জলের থেকে!

'ইয়া প্রকাণ্ড এক বিশমণী কাছিম। বিশ্বাস করুন।'—তিনি বললেন। 'একটুও গাঁজা নয়, নির্জলা সত্যি। জলের তলা থেকে আমার নিজের হাতে টেনে তোলা।'

'অবিশ্বাস করবার কি আছে?' আমি বলি ঃ 'তবে নির্জলা সত্যি—এমন কথা বলবেন না।'

'কেন, বলবো না কেন?' তিনি ফোঁস করে উঠলেন।—'কেন শুনি?'

'আজ্ঞে, নির্জলা কি করে হয়? জল তো লেগেই ছিলো কচ্ছপটার গায়ে।' আমি সবিনয়ে জানাই।—'গা কিংবা খোল—যাই বলুন, সেই কচ্ছপের।' আমি আরো খোলসা করি।

তারপর আরম্ভ করলেন এক মৎস্য অবতার—তাঁর মাছ ধরার গল্প। মাছ ধরাটা শিকারের পর্যায়ে পড়ে না তা সত্যি, কিন্তু আমাদের আড্ডাটা পাঁচ জনের। আর, তিনিও তার একজন। তিনিই বা কেন বাদ যাবেন? কিন্তু মাছ বলে তাঁর কাহিনী কিছু ছোটখাট নয়। এইসা পেল্লায় পেল্লায় সব মাছ তিনি ধরেছেন, সামান্য ছিপে আর নাম মাত্র পুকুরে—যা নাকি ধর্তব্যের বাইরে। তার কাছে তিমি মাছ কোথায় লাগে!

'তুমি যে-তিমিরে তুমি সে-তিমিরে।' আমি বলি। আপন মনেই বলি—আপনাকেই।

মাছরা যতই তঁর চার খেতে লাগল তাঁর শোনাবার চাড় বাড়তে লাগল ততই। তাঁর কি, তিনি তো মাছ ধরতে লাগলেন, আর ধরে খেতে লাগলেন—আকচার। কেবল তাঁর মাছের কাঁটাগুলো আমাদের গলায় খচখচ করতে লাগলো।

তাঁর Fish-ফিসিনি ফিনিশ হলে, আমরা বাঁচলাম।

কিন্তু হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তেই শুরু হলো এক গন্ডার-বাজের। মারি তো গণ্ডার—কথায় বলে থাকে! তিনি এক গণ্ডার দিয়ে শুধু গণ্ডারটাকেই নয়, আমাদেরকেও মারলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরাও এক গণ্ডা'র কম ছিলাম না।

এক গণ্ডারের টেক্কায়—একটি ফুৎকারে আমাদের আড্ডার চার জনকেই যেন তিনি উড়িয়ে দিলেন। চার জনার পর আমার শিকারের পালা এলো।

নাচার হয়ে আরম্ভ করতে হলো আমায়।

'হ্যাঁ, শিকারের দুর্ঘটনা আমার জীবনেও যে না ঘটেছে তা নয়, আমাকেও একবার বাধ্য হয়ে……'

আমার শিকারোক্তি শুরু করি।

'মাছ, না মাছি?' মৎস্য-কুশলী প্রশ্ন করেন।

আমি অস্বীকার করি—'মাছ? না, মাছ না। মাছিও নয়। মশা, মাছি, ছারপোকা, কেউ কখনো ধরতে পারে? ওরা নিজগুণে ধরা না দিলে?'

'তবে কি? কোন আর্সোলা-টার্সোলাই হবে বোধ হয়?'

'আরশোলা? বাবা, আরশোলার কেই ধার-কাছ ঘ্যাঁষে?' বলতেই আমি ভয়ে কাঁপি।—'না আরশোলার ত্রিসীমানায় আমি নেই, মশাই। তারা ফর্‌ফর্‌ করলেই আমি সফরে বেরিয়ে পড়ি। দিল্লী কি আগ্রা অন্দুরে যাই নে, যেতেও পারি নে, তবে হ্যাঁ, বালিগঞ্জ কি বেহালায় চলে যাই। তাদের বাড়াবাড়ি থামলে, ঠাণ্ডা হ'লে, বাড়ি ফিরি তারপর।'

'তা হ'লে আপনি কি শিকার করেছিলেন, শুনি?' হাসতে থাকে সবাই।

'এমন কিছু না, একটা বাঘ।' আমি জানাই: 'তাও সত্যি বলতে, আমি তাকে বাগাতে যাই নি, চাইও নি। বাঘটাই আমাকে··মানে, বাধ্য হয়েই আমাকে, মানে কিনা, আমার দিকে একটুও ব্যগ্রতা না থাকলেও শুধু কেবল ও-তরফের ব্যাঘ্রতার জন্যেই আমাকে ওর খপ্পরে পড়তে হয়েছিলো। এমন অবস্থায় পড়তে হলো আমায়, যে তখন আর তাকে স্বীকার না করে আমার উপায় নেই…'

আরম্ভ করি আমার বাঘাড়ম্বর।

'…তখন আমি এক খবর-কাগজের আপিসে কাজ করতাম। নিজস্ব সংবাদাতার কাজ। কাজ এমন কিছু শক্ত না। সংবাদের বেশির ভাগই গাঁজায় দম দিয়ে মনশ্চক্ষে দেখে লেখা—এই যেমন, অমুক শহরে মাছবৃষ্টি হয়েছে, অমুক গ্রামে এক ক্ষুরওয়ালা চার-পেয়ে মানুষ জন্মেছে (স্বভাবতঃই নাপিত নয়), কোন গহন পাহাড়ে এক অতিকায় মানুষ দেখা গেল, মনে হয় মহাভারতের আমলের কেউ হবে, হিড়িম্বা-ঘটোৎকচ-বংশীয়। কিংবা একটা পাঁঠার পাঁচটা ঠ্যাং বেরিয়েছে অথবা গোরুর পেটে মানুষের বাচ্চা—মানুষের মধ্যে যে-সব গোরু দেখা যায় তার প্রতিশোধ-স্পৃহাতেই হয়ত বা—দেখা দিয়েছে কোথাও! এই ধরনের যত মুখরোচক খবর। 'আমাদের স্টাফ রিপোর্টারের প্রদত্ত সংবাদ' বাংলা কাগজে যা সব বেরোয় সেই ধারার আর কি! আজগুবি খবরের অবাক জলপান!…'

'আসল কথায় আসুন না!' তাড়া লাগালো ভালুক-মার।

'আসছি তো। সেই সময়ে গোহাটির এক পত্রদাতা বাঘের উৎপাতের কথা লিখেছিলেন সম্পাদককে। তাই না পড়ে তিনি আমায় ডাকলেন, বললেন, 'যাও তো হে, গোহাটি গিয়ে বাঘের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জেনে এসো তো। নতুন কিছু খবর দিতে পারলে এখন কাগজের কাটতি হবে খুব।'

'গেলাম আমি—কাগজ, পেনসিল আর প্রাণ হাতে করে। চাকরি করি, না গিয়ে উপায় কি?

'সেখানে গিয়ে বাঘের কীর্তিকলাপ যা কানে এলো তা অদ্ভুত! বাঘটার জ্বালায় কেউ নাকি গোরু-বাছুর নিয়ে ঘর করতে পারছে না। শহরতলীতেই তার হামলা বেশি, তবে ঝামেলা কোথাও কম নয়। মাঝে মাঝে শহরের এলাকাতেও সে টহল দিতে আসে। হাওয়া খেতেই আসে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু হাওয়া ছাড়া অন্যান্য খাবারেও তার তেমন অরুচি নেই দেখা যায়। একবার এসে এক মনোহারি দোকানের সব কিছু সে ফাঁক করে গেছে। সাবান, পাউডার, স্নো, ক্রীম, লুডো খেলার সরঞ্জাম—কিছু বাকি রাখে নি। এমন কি, তার শখের হারমোনিয়ামটাও নিয়ে গেছে।

'আরেকবার বাঘটা একটা গ্রামোফোনের দোকান ফাঁক করলো। রেডিয়ো-সেট, লাউডস্পীকার, গানের রেকর্ড যা ছিলো, এমন কি পিনগুলি পর্যন্ত সব হজম, সে সবের আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।

'আমি যেদিন পেঁছলাম সেদিন সে এক খাবারের দোকান সাবাড় করেছিল। সন্দেশ-রসগোল্লার ছিটেফোঁটাও রাখে নি, সব কাবার। এমন কি, অবশেষে সন্দেশওয়ালার পর্যন্ত ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তক্ষুনি-তক্ষুনি বাঘটার আশ্চর্য খাদ্যরুচির খবরটা তার-যোগে কলকাতায় কাগজে পাচার করে দিলাম।

'আর, এই খবরটা রটনার পরেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। চিড়িয়াখানার কর্তা লিখলেন আমাকে—আমি বা গোহাটির কেউ যদি অদ্ভুত বাঘটাকে হাতে-নাতে ধরতে পারি—একটুও হতাহত না করে—আর আস্ত বাঘটাকে পাকড়াও করে প্যাক করে—পাঠাতে পারি তা হলে তাঁরা প্রচুর মূল্য আর পুরস্কার দিয়ে নিতে প্রস্তুত আছেন।

'আর হ্যাঁ, পুরস্কারের অঙ্কটা সত্যিই খুব লোভজনক—বাঘটা যতই আতঙ্কজনক হোক না! যদিও হতাহত না করে—এবং না হয়ে—খালি হাতাহাতি করেই বাঘটাকে হাতানো যাবে কি না সেই সমস্যা।

'খবরটা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। গোহাটির বড় বড় বাঘ-শিকারী উঠে পড়ে লাগলেন বাঘটাকে পাকড়াতে।

'এখানে বাঘাবার কায়দাটা একটু বলা যাক। বাঘরা সাধারণত জঙ্গলে থাকে, জানেন নিশ্চয়? কোন কিছু বাগাতে হলেই তারা লোকালয়ে আসে।

শিকারীরা করে কি, আগে গিয়ে জঙ্গলে মাচা বেঁধে রাখে। আর সেই মাচার কাছাকাছি একটা গর্ত খুঁড়ে—সেই গর্তের ওপরে জাল পেতে রাখা হয়। জালের ওপরে জঞ্জাল! আবার শুকনো লতাপাতা, খড়কুটো বিছিয়ে আরো জালিয়াতি করা হয় তার ওপর, যাতে বাঘটা ঐ পথে ভ্রমণ করতে এলে পথ ভ্রমে ঐ ছলনার মধ্যে পা দেয়—ফাঁদের মধ্যে পড়ে, নিজেকে জলাঞ্জলি দিতে একটুও দ্বিধা না করে।

'অবশ্যি, বাঘ নিজগুণে ধরা না পড়লে, নিজের দোষে ঐ প্যাঁচে পা না দিলে অক্ষত তাকে ধরা একটু মুশকিলই বই কি! তখন সেই জঙ্গল ঘেরাও করে দলকে দল দারুণ হৈ চৈ বাধায়। জঙ্গলের চারধার থেকে হট্টগোল করে, তারা বাঘটাকে তাড়া দেয়, তাড়িয়ে তাকে সেই অধঃপতনের মুখে ঠেলে নিয়ে আসে। সেই সময়ে মাচায়-বসা শিকারী বাঘটাকে গুলি করে মারে। নিতান্তই যদি বাঘটা নিজেই গর্তে পড়ে, হাত-পা ভেঙে না মারা পড়ে তা হলেই অবশ্যি।

'তবে বাঘ এক এক সময়ে গোল করে বসে তাও ঠিক। ভুলে গর্তের মধ্যে না পড়ে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ে—শিকারীর ঘাড়ের ওপর। তখন আর গুলি করে মারার সময় থাকে না, বন্দুক দিয়েই মারতে হয়। বন্দুক, গুলি, কিল, চড়, ঘুষি—যা পাওয়া যায় হাতের কাছে তখন। তবে কিনা, কাছিয়ে এসে বাঘ এ সব মারামারির তোয়াক্কাই করে না। বিরক্ত হয়ে বন্দুকধারীকেই মেরে বসে—এক থাবড়াতেই সাবড়ে দেয়। কিন্তু পারতপক্ষে বাঘকে সেরকমের সুযোগ দেওয়া হয় না,—দূরে থাকতেই তার বদ-মতলব গুলিয়ে দেওয়া হয়।

'এই হলো বাঘাবার সাবেক কায়দা। বাঘ মারো বা ধরো যাই করো—তার সেকেলে সার্বজনীন উৎসব হলো এই। গৌহাটির শিকারীরা সবাই এই ভাবেই বাঘটাকে বাগাবার তোড়জোড়ে লাগলেন।

'আমি সেখানে একা। আমার লোকবল, অর্থবল কিছুই নেই। সদলবলে তোড়জোড় করতে হলে টাকার জোর চাই। টাকার তোড়া নেই আমার। তবে হ্যাঁ, আমার মাথার জোড়াও ছিল না। বুদ্ধি-বলে বাঘটাকে বাগানো যায় কিনা আমি ভাবলাম।

'চলে গেলাম এক ওষুধওয়ালার দোকানে—বললাম, 'দিন তো মশাই, আমায় কিছু ঘুমের ওষুধ।'

'কার জন্যে?'

'ধরুন, আমার জন্যেই। যাতে অন্তত: চব্বিশ ঘণ্টা অকাতরে ঘুমোনো যায় এমন ওষুধ চাই আমার।'

বাঘের জন্যে চাই সেটা আর আমি বেফাঁস করতে চাইলাম না। কি জানি, যদি লোক-জানাজানি হয়ে সমস্ত প্ল্যানটাই আমার ভেস্তে যায়!

তারপর গুজব যদি একবার রটে যায় হয়তো সেটা বাঘের কানেও উঠতে পারে, বাঘটা টের পেয়ে হুঁসিয়ার হয়ে যায় যদি ?

'তা ছাড়া, আমাকে কাজ সারতে হবে সবার আগে, সব চেয়ে চটপট, আর সকলের অজান্তে। দেরি করলে পাছে আর কেউ শিকার করে ফেলে বা বাঘটা কোন কারণে কিংবা মনের দুঃখে নিজেই আত্মহত্যা করে বসে তা হলে এমন দাঁওটা ফসকে যবে— সেই ভয়টাও ছিল।

'ওষুধটা হাতে পেয়ে তারপর আমি শুধালাম—'একজন মানুষকে বেমালুম হজম করতে একটা বাঘের কতক্ষণ লাগে বলতে পারেন ?'

'ঘণ্টা খানেক। হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই।'

'আর বিশ জন মানুষ ?'

'বিশ জন ? তা দশ-বিশটা মানুষ হজম করতে অন্তত ঘণ্টাতিনেক লাগা উচিত—অবশ্যি যদি তার পেটে আঁটে তবেই।' জানালেন ডাক্তার বাবু। 'তবে কিনা, এত খেলে হয়তো তার একটু বদ-হজম হতে পারে। চোঁয়া ঢেঁকুর উঠতে পারে এক-আধটা।'

'তাহলে বিশ ইনটু তিন, ইনটু আট—মনে মনে আমি হিসেব করি— হলো চারশ আশি। একটা বাঘের হজম-শক্তি ইজ ইকোয়াল টু চারশ আশিটা মানুষ। তার মানে চারশ আশি জনার হজম-শক্তি। আর হজম-শক্তি ইজ ইকোয়াল টু ঘুমোবার ক্ষমতা।

'মনে মনে অনেক কষাকষি করে, আমি বলি, 'আমাকে এই রকম চারশ আশিটা পুরিয়া দিন তো! এই নিন ওষুধের টাকা। পুরিয়ার বদলে আপনি একটা বড় প্যাকেটেও পুরে দিতে পারেন।'

'ডাক্তারবাবু ওষুধটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি এর সবটা খেতে চান, খান, আমার আপত্তি নেই। তবে আপনাকে বলে দেওয়া উচিত যে এ খেলে যে প্রগাঢ় ঘুম আপনার হবে তা ভাঙাবার ওষুধ আমাদের দাবাই-খানায় নেই। আপনার কোনো উইল-টুইল করবার থাকলে করে খাবার আগেই তা সেরে রাখবেন এই অনুরোধ।'

'ওষুধ নিয়ে চলে গেলাম আমি—মাংসের দোকানে। সেখানে একটা আস্ত পাঁঠা কিনে তার পেটের মধ্যে ঘুমের ওষুধের সবটা দিলাম সেঁধিয়ে,— তার পরে পাঁঠাটিকে নিয়ে জঙ্গল আর শহরতলীর সঙ্গমস্থলে গেলাম। নদীর ধারে জল খাবার জায়গায় রেখে দিয়ে এলাম পাঁঠাটাকে। জল খেতে এসে জলখাবার পেলে বাঘটা কি আবার না খাবে ?

'ভোর না হতেই সঙ্গমস্থলে গেছি—বাঘটার জলযোগের জায়গায়। গিয়ে দেখি অপূর্ব দৃশ্য! ছাগলটার খালি হাড় ক'খানাই পড়ে আছে, আর তার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন আমাদের বাঘা মক্কেল! গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

'উস, কি ঘুম! রাস্তার কোনো পাহারাওয়ালা কি পরীক্ষার্থী কোনো ছাত্রকেও এমন ঘুম ঘুমুতে দেখি নি!

'বাঘটার আমি গায়ে হাত দিলাম, ল্যাজ ধরে টানলাম একবার। একেবারে নিঃসাড়। থাবার নখগুলো, গুণলাম, কোনো সাড়া নেই। তার গোঁফ চুমরে দিলাম, পিঠে হাত বুলোলাম—পেটে খোঁচা মারলাম—তবুও উচ্চবাচ্য নেই কোনো!

'অবশেষে সাহস করে তার গাল টিপলাম। আদর করলাম একটু। কিন্তু তার গালে আমার টিপসই দিতেও বাঘটা নড়লো না একটুও।

'আরো একটু আদর দেখাবো কিনা ভাবছি। আদরের আরো একটু এগুবো মনে করছি, এমন সময়ে বাঘটা একটা হাই তুললো।

'তার পরে চোখ খুললো আস্তে আস্তে।

'হাই তুলতেই আমি একটা হাই জাম্প দিয়েছিলাম—পাঁচ হাত পিছনে। চোখ খুলতেই আমি ভোঁ দৌড়। অনেক দূরে গিয়ে দেখি উঠে আলিস্যি ছাড়ছে—আড়মোড়া ভাঙছে; গা-হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছে একটু। ডন-বৈঠক হয়তো সেটা, ওই রকমের কিছু একটা হ'তে পারে। কী যে—তা শুধু ব্যায়ামবীরেরাই বলতে পারেন।

'তার পর ডন-বৈঠক ভেঁজে বাঘটা চারধারে তাকালো। তখন আমি বহুৎ দূরে গিয়ে পড়েছি, কিন্তু গেলে কি হবে, বাঘটা আমার তাক পেলো ঠিক। আর আমিও তাকিয়ে দেখলাম তার চাউনি! অত দূর থেকেও দেখতে পেলাম। আকাশের বিদ্যুৎঝলক যেমন দেখা যায়। অনেক দূরে থেকেও সেই দৃষ্টি—সে কটাক্ষ ভুলবার নয়।

'বাঘটা গুড়ি গুড়ি এগুতে লাগলো—আমার দিকে। আমারো দৌড় বেড়ে গেল আরো—আরোও।

'গুড়ি গুড়ির থেকে ক্রমে তুড়ি লাফ বাঘটার।

'আর আমি? প্রতি মুহূর্তেই তখন হাতুড়ির ঘা টের পাচ্ছি আমার বুকে।

'বাঘটাও আসছে—আমিও ছুটছি বাঁচবার আশায়। ছুটছি প্রাণপণ··· ···' বলতে বলতে আমি থামলাম—দম নিতেই থামলাম একটু।

'তার পর? তার পর? তার পর?···' আড্ডার চারজনার ব্যগ্রসপ্রশ্ন! বাঘের সম্মুখে পড়ে বিকল অবস্থায় আমি যাই-যাই, কিন্তু তাঁদের মার্জনা নেই। তাঁরা দম দিতে ছাড়ছেন না।

'···ছুটতে ছুটতে আমি এসে পড়েছি এক খাদের সামনে। অতল গভীর খাদ। তার মধ্যে পড়লে আর রক্ষে নেই—সাততলার ছাদ থেকে পড়লে যা হয় তাই—একদম ছাতু! পিছনে বাঘ, সামনে খাদ—কোথায় পালাই? কোনদিকে যাই?

'দারুণ সমস্যা! এ ধারে খাদ, ওধারে বাঘ—ওধারে আমি খাদ্য আর এধারে আমি বরবাদ!

'কি করি? কী করি? কী যে করি?

'ভাবতে ভাবতে বাঘটা আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।' বলে আমি হাঁফ ছাড়লাম। এতখানি ছুটোছুটির পর কাহিল হয়ে পড়েছিলাম।

'তারপর? তারপর কী হলো?'

'কি আবার হবে? যা হবার তাই হলো।' আমি বললামঃ 'এ রকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে।' আমার গপ্পো শেষ হলো সেইখানেই।

'কি করলো বাঘটা?' তবু তাঁরা নাছোড়বান্দা।

'বাঘটা?' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললামঃ 'কী আর করবে? বাঘটা আমায় গিলে ফেললো গপ্ করে'।'

ভালুকের স্বর্গলাভ

গল্প কেমন লিখি জানিনে, কিন্তু শিকারী হিসেবে যে নেহাৎ কম যাই না, এই বইয়ের 'আমার ভালুক শিকার' এই তোমরা তার পরিচয় পেরেছ। আমার মাসতুতো বড়দাদাও যে কত বড় শিকারী, তাও তোমাদের আর অজানা নেই। এবার আমার মামাত ছোট ভাইয়ের একটা শিকার-কাহিনী তোমাদের বলব। পড়লেই বুঝবে, ইনিও নিতান্ত কম যান না। হবে না কেন, আমারই ছোট ভাই তো!

গল্পটা, যতদূর সম্ভব, তার নিজের ভাষাতেই বলবার চেষ্টা করা গেল ঃ

ভালুকদের ওপর আমার বরাবর ঝোঁক, ছোটবেলা থেকেই। দাদার ভালুক শিকারের গল্পটা শুনে অবধি, ভালুকদের ওপর আমার ছোটবেলার টানটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। সর্বদাই মনে হয়, কোন ফাঁকে একটা ভালুক শিকার করি। কিন্তু শিকারের জন্য এয়ার-গান পাওয়া সোজা হতে পারে (আমাদের দেবুরই একটা আছে)—কিন্তু ভালুক যোগাড় করাই শক্ত। অবশ্য রাস্তায় প্রায়ই ভালুকওয়ালাদের দেখা পাওয়া যায়, সেসব নিঃসন্দিগ্ধ নৃত্যপটু ভালুকদের শিকার করাও অনেকটা সহজ, কিন্তু তাতে ভালুকদের আপত্তি না থাকলেও তাদের গার্জেনদের রাজি করানো যাবে কি না সন্দেহ!

কিন্তু চমৎকার সুযোগ মিলে গেল হঠাৎ। আমাদের পাহাড়ে দেশে সার্কাস-

টার্কাস বড় একটা আসে না। সার্কাস দেখতে হলে আমরা কলকাতায় যাই পুজোর দিনে দাদার ওখানে। যাই হোক, এবার একটা সার্কাস এসে পড়েছে আমাদের অঞ্চলে। শুনলাম, অনেকগুলো ভালুকও এনেছে তারা। ভারী আনন্দ হল।

দেবুকে গিয়ে বললাম, 'এই, তোর বন্দুকটা দিবি দিন কতো'র জন্যে ?'

'কি করবি ?'

'ভালুক শিকারের চেষ্টা দেখব।'

'আমার এটা তো এয়ার-গান, এতে কি ভালুক মরে ? কেন অমল, তোর তো সেজকাকারই ভাল বন্দুক রয়েছে !'

'দূর, সেটা বেজায় ভারী। তোলাই দায়, ছোঁড়া তো পরের কথা। তা ছাড়া আমি একটা গল্পে পড়েছি, ভারি বন্দুক ভালুক-শিকারের পক্ষে বড় সুবিধের নয়।'

'ও, তোর সেই দাদার গল্পটা ? কিন্তু আমি যে এটা দিয়ে কাক মারি !'

এটা হল গিয়ে দেবুর স্রেফ গুল। বললে কাক মারি, কিন্তু আসলে ওই দিয়ে ও মাছি তাড়ায় ! এয়ার-গান থাকে ওর পড়ার টেবিলে, সেখানে কাক একটাও নেই, কিন্তু যত রাজ্যের মাছি।

'বেশ, আমি তোকে একটা জিনিস দেব, তাতে মারা না যাক কাক ধরা পড়বে।'—দেবু উৎসুকচোখে তাকায়—'আমার ক্যামেরাটা দেব তোকে ওর বদলে। কাকের ছবি ধরা আর কাক ধরা একই ব্যাপার নয় কি ?'

দেবু সে কথা মেনে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠে। আমার 'জাইস আইকনের' সঙ্গে ওর বন্দুকের বিনিময় করে আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ি সার্কাসের তাঁবুর উদ্দেশ্যে—ভালুক মারার মৎলব নিয়ে আমি, আর ভালুক ধরার উৎসাহ নিয়ে দেবু !

বাজারের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেবু এক গাদা কালো জাম কেনে। আমার দিকে, বোধ করি তার স্মরণশক্তির পরিচয় দেবার জন্যই, গর্বভরে তাকায়—'জানিস, ভালুকেরা জাম খেতে ভাল বাসে ?'

হুঁ, জানি ; কিন্তু যাকে শিকার করতে যাচ্ছি তাকে জাম খাওয়ানো আমি পছন্দ করি না—সাবাড়ের আগে খাবারের ব্যবস্থা একটা নিষ্ঠুর ব্যবহার নয় কি ? আমার মতে ওটা দস্তুরমত অত্যাচার—ভালুকের প্রতি এবং নিজের পকেটের প্রতি ! দেবুকে জবাব দিই, 'ভালুকের সঙ্গে ভাব করা তো মৎলব নেই আমার !'

সার্কাসের তাঁবুর পেছন দিকটায় জানোয়ারের 'মিনেজারী'—হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, ভালুক, জেব্রা—একটা উটও দেখলাম। খোঁটায় বাঁধা হাতি শুঁড় তুলে অপরিচিত লোককেও সেলাম ঠুকছে, জেব্রা এবং উটও কম দর্শক আকর্ষণ করেনি। কতকগুলো ছোঁড়া বাঘের খাঁচার দিকে গিয়ে ভিড়েছে, ওদের আফিং

খাইয়ে রাখা হয় কিনা এই হলো ওদের আলোচ্য বিষয়। দেখা গেল, বাঘেরা মনোযোগ দিয়ে সেই গবেষণা শুনছে এবং মাঝে মাঝে হাই তুলে ওদের কথা সমর্থন করছে।

মোটের উপর সমস্তটা জড়িয়ে বেশ উপভোগ্য ব্যাপার। কিন্তু এ সমস্ত থেকে কঠোরভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভালুকের খাঁচার দিকে আমরা অগ্রসর হলাম। পথে-ঘাটে সর্বদাই যাদের দেখা মেলে স্বভাবতঃই তাদের মর্যাদা কম; বেচারা ভালুকদের বরাতে তাই একটিও 'য়্যাডমায়ারার' জোটেনি।

একটি বড় খাঁচার একধারে দু'টো মোটাসোটা ভালুক—আর তার পাশেই পার্টিশান-করা অন্য ধারে একটা বেঁটে ভালুক। পার্টিশানের মাঝখানের দরজাটা বাইরে থেকে লাগানো। এতক্ষণ অবধি কোনো সমঝদার না পেয়ে মোটা ভালুক দু'টো যেন মুষড়ে পড়েছিল, আমাদের দু'জনকে যেতে দেখে নড়ে-চড়ে বসল। কিন্তু বেঁটে ভালুকটার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই! বুঝলাম নিতন্তে উজবুক বলে'ই ওটাকে আলাদা করে রেখেছে!

দেবু পকেট থেকে একমুঠো জাম বার করল—তাই না দেখে বেঁটে ভালুকটার লম্ফ-ঝম্ফ দেখে কে? কিন্তু আমরা প্রথমে দিলাম মোটা ভালুকদের, তারা দু-একটা চাখ্‌লো মাত্র, তারপর আর ছুঁলোও না। এই ভালুক দু'টোর টেস্ট উঁচুদরের বলতে হবে, কেননা আমরাও রাস্তায় চেখে দেখেছি জামগুলো একেবারে অখাদ্য, এমন বিশ্রী জঘন্য জাম প্রায় দেখা যায় না।

কিন্তু বেঁটে ভালুকটা তা-ই অম্লানবদনে সবগুলো খেলো; খেয়ে আবার হাত বাড়ায়! দেবু দু'পকেট উলটিয়ে জানায় যে 'হোপ্‌লেস্‌' তবু তার আগ্রহের নিবৃত্তি হয় না। বুঝলাম ব্যাটার বুদ্ধিশক্তি একটু কম।

দেবু আমার কাছে আবেদন করে,—'এই অমল, দে না তোর একটা চকোলেট একে।'

আমি অগত্যা বিরক্তিভরে একটা চকোলেট ছুঁড়ে দিই—'ভারি হ্যাংলা তো!'

দেবু মাথা নেড়ে জানায়, 'ছেলেমানুষ কিনা! বড় হ'লে শুধরে যাবে।'

কিন্তু ভালুকটা চকোলেট স্পর্শও করে না, জামের জন্য দেবুর জামার নাগাল পাবার চেষ্টা করে। আমি এয়ার-গানের সাহায্যে চকোলেটটা সন্তর্পণে বাগিয়ে এনে বদন ব্যাদান করতেই দেবু বাধা দেয়, 'খাস্‌ নে, সেপ্‌টিক হবে।'

বাধ্য হয়ে চকোলেটটা মোটা ভালুকদের দান করতে হয়। যথার্থই ওদের টেস্ট উঁচুদরের। ওদের একজন ওটা সযত্নে কুড়িয়ে নেয়, নিয়ে

সুকৌশলে রূপোলী কাগজের মোড়ক খুলে ফেলে চকোলেটটা বার করে, তারপর সমান দু'ভাগ ক'রে দু'জনে মুখে পুরে দেয়। ভালুকদের মধ্যে এরূপ সভ্যতা আর সাধুতো আমি কোনদিন আশা করিনি। একদম অবাক হয়ে যাই। এ রকম ন্যায়পরায়ণ আদর্শ ভালুককে মারাটা সঙ্গত হবে কিনা এয়ার-গান হাতে নিয়ে ভাবতে থাকি।

দেবু চমৎকৃত হয় 'দেখছিস কি রকম শিক্ষিত ভালুক!' তারপরে একটু থেমে যোগ করে—'শিক্ষিত প্রাণীদের শিকার করা কি উচিত?' অবশেষে আমার মতামত না পেয়েই আপন মনে ঘাড় নাড়তে থাকে—'একেই তো আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম,……এই ভালুকটি গেলে এর স্থান কি আর পূর্ণ হবে?'

ওর সহৃদয়তার প্রশ্রয় না দিয়ে গম্ভীরভাবেই জবাব দিই—'না, এখন আর শিকার করব না। সার্কাস দেখবার আগে এদের খতম করা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না!'

আড়াইটার শো-র টিকিট কেটে আমি আর দেবু ঢুকে পড়ি; আমার হাতে দেবুর এয়ার-গান, আর দেবুর হাতে আমার ক্যামেরা। স্থিরসংকল্প হয়েই ঢুকেছি, সার্কাসের পরেই অব্যর্থ শিকার; কেননা অনেক ভেবে দেখলাম, সার্কাস-এর সঙ্গে কারকাসই হচ্ছে একমাত্র মিল এবং খুব ভাল মিল। শিকারী-জগতে ভয়ানক পেছিয়ে রয়েছি, অন্ততঃ আমার পিসতুতো দাদা এবং তাঁর মাসতুতো বড়দা'র চেয়ে ত বটেই,—সেই অপবাদ আজ দূর করতে হবে।

প্রথমেই সেই মোটা ভালুক দু'টোকে এরিনায় এনে হাজির করেছে। বেঁটেটাকে ওদের সঙ্গে না দেখে দেবু একটু ক্ষুণ্ণ হলো,—'সেই বাচ্চাটাকে আনবে না?'

'ওটা আস্ত জানোয়ারই আছে, এখনো মানুষ হয়ে ওঠেনি কিনা!'

দেবু চুপ করে থাকে, বোধ করি ওর প্রাণের ভালুককে অমানুষ বলাতে মনে মনে দুঃখিত হয়। খানিক বাদে ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলে, 'হতভাগার জন্যে জাম এনেছিলাম।'

আমি ওর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাই—'য়্যাঁ? তোরও বুঝি ভালুক-শিকারের মতলব? একরাশ ওই বিদঘুটে জাম খেয়ে কেউ বাঁচে কখনও? পেটে গেছে কি নির্ঘাৎ ধনুষ্টঙ্কার! তুই বুঝি জাম খাইয়ে কাজ সারতে চাস?' দেবু উত্তর দেয় না। আমি আশ্বাস দিই—'তা বেশ ত, এয়ার গানে ঐ জাম পুরে ছুঁড়লে নেহাৎ মন্দ হবে না। জাম খাওয়ানো-কে জাম খাওয়ানো, কাম ফতে-কে কাম ফতে!'

দেবু সান্ত্বনা পায় কিনা ও-ই জানে। দেখি ওর দু' পকেট জামে ভর্তি। ইতিমধ্যে সেই মোটা ভালুক দু'টো বাইসাইকেলে চেপে এমন অদ্ভুত কসরৎ দেখাতে থাকে যা নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না। ভালুকের

ভাষা আলাদা না হলে এবং আলাপের সুবিধা থাকলে, ওদের কাছ থেকে দু'-একটা সাইকেলের প্যাঁচ শিখে নিলে নেহাৎ মন্দ হত না! সেটা সম্ভব কিনা মনে মনে চিন্তা করছি, এমন সময়ে দেবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে—'আমার সেজ মামা কি বলে জানিস অমল?'

দেবুর সেজ মামা কি বলে জানবার আগ্রহ না থাকলেও জিজ্ঞাসা করি।—'বলে, যে সার্কাসে মানুষে ভালুকের খোলস গায়ে দিয়ে সেজে থাকে। সাইকেলের খেলা দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে।'

আমি প্রতিবাদ করি—'পাগল! আমি কখনো কোনো মানুষকে এমন অদ্ভুত সাইকেল চালাতে দেখিনি, এ কেবল ভালুকের পক্ষেই সম্ভব।'

দেবু ঘাড় নাড়ে—'তা বটে।'

আমি জোর দিয়ে বলি—'নিশ্চয়ই তাই! শিক্ষালাভের ফলে কত কি হয় বইতে পড়িসনি? এ তো কিছুই না, আমি যদি ভালুকটাকে তারের ওপর সাইকেল চালাতে দেখি তাহলেও আশ্চর্য হব না। এমন কি এখুনি যদি ওরা স্পষ্ট বাংলায় কথা কইতে শুরু করে দেয় তাহ'লেও না।'

দেবু সায় দেয়—'হুঁ, তা বটে।'

কায়দা-কসরৎ দেখিয়ে ভালুকেরা চলে গেল। একটু পরে, যখন একটা হাতি চার পায়ে একটা পিপের পিঠে দাঁড়াবার দুশ্চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছে—আমি দেবুকে অপেক্ষা করতে বলে, অলক্ষ্যে ওদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম এখন হাতির কসরতের ওপরেই সকলের য'রপরনাই মনোযোগ, ভালুক শিকারের এই হচ্ছে সুযোগ।

সার্কাসের পেছন দিকে, একেবারে তাঁবুর শেষ প্রান্তে ভালুকের আস্তানা। দূর থেকে মনে হলো ভালুক দুটো যেন নিজেদের বাহাদুরির গল্প ফেঁদেছে। বেশ স্পষ্ট দেখলাম ধেড়ে-মোটাটা পিঠ চাপড়ে ছোট ভাইকে সাবাস দিচ্ছে। ওরা কী ভাষায় কথোপকথন করে জানবার কৌতূহল ছিল কিন্তু আমাকে দেখতে পাবামাত্র যেন একদম বোবা মেরে গেল।

আমি বললাম, 'কি হে ভায়ারা! বেশ ত আড্ডা চলছিল, থামলে কেন?'

আমার কথা শুনে এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। তার মানে—'এই ছেলেটা কি বলছে হ্যা?' নিশ্চয়ই আমাদের বুলি ওদের বোধ্যগম্য নয়। উঁহু, স্বদেশী ভালুক না; তবে কি উত্তর মেরুর? যাকে, 'পোলার বেয়ার' বলে, তাই নাকি এরা? পোলার বেয়ার মারতে পারলে বড়দা'র চেয়ে বড় কীর্তি রাখতে পারব ভেবে মনে ভারি ফুর্তি হ'ল! এয়ার-গানটা বাগিয়ে ধরলাম।

প্রথমে বাচ্ছা থেকেই শুরু করা যাক, কিন্তু খাঁচার পাখি শিকার ক'রে আরাম নেই। বেঁটে ভালুকটার খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। বিপদ এবং মুক্তি এক কথায় বিপন্মুক্তির সম্মুখীন হয়ে ও যেন প্রথমটা

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কেননা অনেক ইতস্তত করে তবে সে খাঁচার নীচে পা বাড়ালো।

এমন সময়ে একটা অঘটন ঘটল। অকস্মাৎ দৈববাণী হলো—'পালাও পালাও, মারাত্মক ভালুক।'

চারিদিকে তাকালাম, কেউ কোথাও নেই, সার্কাসের লোকজন সার্কাস নিয়ে ব্যস্ত। তবে এ কার কণ্ঠধ্বনি? নিজের স্বগতোক্তি বলেও সন্দেহ করবার কারণ ছিল না। ভাল করে চেয়ে দেখি, ওমা, সেই মোটা ভালুকদেরই একজন হাত নাড়ছে আর ওই কথা বলছে।

আগেই আঁচ করা ছিল, তাই আর আশ্চর্য হলাম না। বাংলাভাষাও যে এরা আয়ত্ত করেছে, এই ধরনের একটা সন্দেহ আমার গোড়া থেকেই ছিল। শিক্ষিত ভালুকের পক্ষে একটা বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা এমন আর বেশি কথা কি? ইতিমধ্যে সেই বেঁটে ভালুকটা দেখি আমার বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছে।

মোটা ভালুকটা আবার আওয়াজ ছেড়েছে—'ওহে দেখছ না! ভালুক যে!'

ভালুক যে, তা অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। ভালুক আমি খুব চিনি। চিনি এবং নিজেকেও চেনাতে জানি—আমি এবং আমার দাদা দু'জনেই। কিন্তু এই মোটা ভালুকটার আহাম্মুকি দেখ! একটু শিক্ষা পেটে পড়েছে কি আর অহংকারের সীমা নেই অমনি নিজের জাত ভুলতে শুরু করেছেন। কোন কোন বাঙালি যেমন দু'পাতা ইংরেজি পড়েই নিজেকে আর বাঙালি জ্ঞান করে না, একেবারে খাস ইংরেজ ভেবে বসে, ওরও তাই দশা হয়েছে। নিজেও যে উনি একটি 'নাথিং বাট ভাল্লুক', তা ওঁর খেয়াল নেই।

ভারি রাগ হয়ে গেল আমার। চেঁচিয়ে বললাম—'ও তো ভাল্লুক, আর তুমি কি? তুমি যে আস্ত একটা জাম্ববান!'

ওকে একটু লজ্জা দেবার চেষ্টা করলাম, এ রকম না দিলে চলে না। শিক্ষিত লোককেও অনেক সময়ে শিক্ষা দেবার দরকার হয়। আমার অত্যুক্তি শুনে বোধ করি ভালুকটার আত্মগ্লানি হলো, কেননা সে আর উচ্চবাচ্য করল না। বেঁটেটা আর এক পা এগুতেই আমি এয়ার-গান ছুঁড়লাম, ছররাটা ওর পেটে গিয়ে লাগল। ও থমকে দাঁড়িয়ে পেটটা একবার চুলকে নিল, কিন্তু মোটেই দমল না; ধীর পদে অগ্রসর হতে লাগল—বন্দুকের মুখেই।

দুঃসাহসী বটে! বাধ্য হয়ে এবার আমাকেই পশ্চাদপদ হতে হলো। 'আবার, আবার সেই কামান গর্জন।' কিন্তু ও একটু করে গা চুলকোয় আর এগিয়ে আসে। গ্রাহ্যই করে না, যেন অনেক কালের গুলি খাবার অভ্যাস!

বুঝলাম খুব শক্ত শিকারের পাল্লায় পড়া গেছে, আমার বড়দার বরাতে যা জুটেছিল, ইনি মোটেই তেমন সন্তোষজনক হবেন না! হঠাৎ উনি একটা

অদ্ভুত গর্জন করলেন; ওটা বাংলায় কোনো অব্যয় শব্দ কিংবা কোনো অপভাষা কিনা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করছি এবং যখন প্রায় সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি যে ওই গর্জনের ভাষাটা বাংলা নয় বরং গ্রীক হলেও হতে পারে, সেই সময়ে ভালুকটা অশ্বের মত দৌড়ে এসে অকস্মাৎ আমাকে এক দারুণ চপেটাঘাত করল।

স-বন্দুক আমি বিশ হাত দূরে ছিটকে পড়লাম। জানোয়ারদের খাবার জন্য কি শোবার জন্য জানি না বিচালির গাদি স্তূপাকার করা ছিল, তার ওপরে গিয়ে পড়েছিলাম বলেই বাঁচোয়া। এক মুহূর্তের চিন্তাতেই বুঝলাম গতিক সুবিধের নয়। যে পালায় সেই কীর্তি রাখে এবং যে কীর্তি রাখতে পারে কেবল সেই বেঁচে যায়, এমন কথা নাকি শাস্ত্রে বলে। আজ যদি শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করি, তাহ'লে কাল ফিরে এসে শিকার আবার করলেও করতে পারি। অতএব —

চড় টা আমার পালানোর পক্ষে সাহায্যই করল, না হেঁটে, না হুটে এবং না লাফিয়ে বিশ হাত এগিয়ে পড়া কম কথা নয়! উঠেই উদার পৃথিবীর দিকে চোঁচা দৌড় দিলাম। ভালুক বাবাজীবনও অমনি পিছু নিলেন — যেমন ওদের দুঃস্বভাব! অনুকরণ আর অনুসরণ করতে যে ওরা ভারি মজবুত, দাদার গল্প পড়েই তা আমার জানা ছিল।

পাহাড়ের যে দিকটায় আলেয়ার ভয়ে দিনেও লোকে পথ হাঁটে না, প্রাণভয়ে সেইদিকেই ছুটলাম। মাঝখানে একটা জায়গা এমন স্যাঁৎসেতে, সেখান দিয়ে যেতে কি রকম একটা গ্যাসে যেন দম আটকে আসে; জায়গাটা পেরিয়ে উঁচু একটা পাথরের ঢিবিতে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

দৌড়তে দৌড়তে ভালুকটা সেই স্যাঁৎসেতে জায়গাটায় এসে পিছলে পড়ল। মিনিটখানেক পরে উঠতে গিয়ে আবার মুখ থুবড়ে গেল। হঠাৎ কি হলো ভালুকটার? বার বার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই যেন আর দাঁড়াতে পারে না।

আমিও সেই উঁচু ঢিবিটার ওপরে দাঁড়িয়ে—অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ দেখি ভালুকটা উঁচু হয়েছে, উঠেই দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মাথার দিকে নয় লেজের দিকে! অবাক কাণ্ড! মাথা নীচের দিকে, লেজ ওপরের দিকে—এ আবার কি রে! এটা কি এখানেই সার্কাস শুরু করল নাকি!

আরো খানিকক্ষণ কাটল। ভালুকটা আরো একটু উঁচু হ'ল। ভাল করে চোখ রগড়ে দেখি — ও দাদা, এ যে একেবারে মাটি ছেড়ে উঠে পড়েছে! দাঁড়িয়েই আছে বলতে হবে, যদিও তার মাথাই নীচে আর পা ওপরের দিকে। ভালুকটা দু'হাত দিয়ে মাটি আঁকড়াবার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে, কিন্তু তার আকাশে পদাঘাত করাই সার—কেননা পৃথিবী আর তার মধ্যে তখন দু'হাত ফারাক! মাটির নাগাল পাওয়া মুশকিল!

খানিক বাদে ভালুকটা উড়তে শুরু করল। ভালুক উড়ছে এ কখনও কল্পনা করতে পার? কিন্তু আমার স্বচক্ষে দেখা। আমার হাত থেকে এয়ার-গান খসে পড়ল। উড়তে উড়তে ভালুকটা একবার আমার মাথার কাছাকাছি পর্যন্ত এল—আমি বসে পড়ে আত্মরক্ষা করলাম। ও যে রকম হাত বাড়িয়েছিল,—ঠিক ডুবন্ত লোক যেভাবে কুটো ধরতে যায়,—আর একটু হ'লেই আমায় ধরে ফেলেছিল আর কি! ওর চোখে এক অসহায় সপ্রশ্ন দৃষ্টি - ভাবটা যেন, 'হায়, আমার একি হলো!' আমাকে ধরতে ওকে সাহায্য না করায়, ও যে আমার ওপর খুব বিরক্ত আর মর্মাহত হয়েছে, তা ওর মুখভাব দেখলেই বোঝা যায়।

লক্ষ্য করে দেখলাম ওর পেটটা ভয়ানক ফেঁপে উঠেছে—চারটে জয়ঢাক এক করলে যা হয়। ঠিক যেন একটা রক্তমাংসের বেলুন! ভালুকটা ক্রমশঃই ওপরের দিকে যেতে লাগল—লেজ সর্বাগ্রে। দেখতে দেখতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে অবশেষে বিন্দুমাত্রে পরিণত হলো, তারপর চক্ষের পলকে অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অমল ভ্রাতাজীবনের শিকার কাহিনী পাঠে বিজ্ঞানবিদ্ পাঠক হয়ত এই ব্যাখ্যা দেবেন যে, বেচারা ভালুক যে স্যাঁতসেতে জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে, সেখানটায় প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাদুর্ভাব ছিল; সেই গ্যাস উদরস্থ করার ফলেই বাবাজী বেলুনে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস ওই ভালুকটা ছিল অতিরিক্ত পুণ্যাত্মা—কেননা সশরীরে স্বর্গারোহণের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়! এ ভাবে মহাপ্রস্থানের পথে যাবার এ্যাকসিডেণ্ট এ পর্যন্ত চারজনের মোটে হয়েছে, এই ভালুক-নন্দনকে ধরে; যাদের মধ্যে কেবল একজন মাত্র দুর্বিপাক কাটিয়ে কোন গতিকে স্বস্থানে ফিরতে পেরেছেন। প্রথম গেছলেন স্বয়ং যুধিষ্ঠির, দ্বিতীয়—তাঁরই সর্মভিব্যাহারি জনৈক কুকুর শাবক, তৃতীয় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল, আর চতুর্থ—?

চতুর্থ এঁদের কারো চেয়েই কোন অংশে ন্যূন নয়।

কাষ্ঠকাশির চিকিৎসা

বড়দির আদরে খোকাকে একটি কথা বলার কারু জো নেই। বলেছ কি খোকা তো বাড়ি মাথায় করেছেই, বড়দি আবার পাড়া মাথায় করেন! প্রতিবেশীদের প্রতি বেশি রাগ আমার নেই - তাই যতদূর সম্ভব বিবেচনা করে বড়দি আর খোকাকে না ঘাঁটিয়েই আমি চলি।

কালই মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে পছন্দ করে কিনে এনেছি, আজ সকালেই দেখি খোকা সেই দামী পাইনের ছড়িটা হস্তগত করে অম্লানবদনে চর্বণ করছে। খোকার এইভাবে ছড়িটি আত্মসাৎ করবার প্রয়াস আমার একেবারেই ভাল লাগল না, ইচ্ছা হল ওকে বুঝিয়ে দিই ছড়ির আস্বাদ মুখে নয়, পিঠে। কিন্তু ভয়ানকভাবে আত্মসংবরণ করে ফেললাম।

ভয়ে ভয়ে বড়দির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম—'দেখছ, খোকা কি করছে?'

সঙ্গে সঙ্গে বড়দির খান্ডামার্কা জবাব—'কি তোমার পাকা ধানে মই দিচ্ছে? ও তো ছড়ি চিবুচ্চে!'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'তা চিবুক ক্ষতি নেই কিন্তু যত রকমের কাঠ আছে, তার মধ্যে পাইন কাঠ খাদ্য হিসেবে সব চেয়ে কম পুষ্টিকর, তা জানো কি? তাছাড়া এখন চারধারে যে রকম হুপিংকাফ হচ্ছে—'

বড়দি ঝামটা দিয়ে উঠলেন—'যাও যাও, তোমাকে আর বোকা বুঝাতে

হবে না। সেদিন আমি একটা ওষুধের বিজ্ঞাপনে পড়লাম পাইন গাছের হাওয়ায় যক্ষ্মাকাশি পর্যন্ত সারে—যার হাওয়ায় যক্ষ্মা সেরে যায়, তাতেই কি না হুপিংকাশি হবে? পাগল!'

আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, বললাম—'বেশ আমার কথার চেয়ে বিজ্ঞাপনেই যখন তোমার বেশি বিশ্বাস তখন আজই আমি এক ডজন ছড়ির অর্ডার দিচ্ছি, তুমি রোজ একটা করে খোকাকে খাওয়াও। আহার ওষুধ দুই হবে। বলে বিনা-ছড়ি হাতেই বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির থেকে।

জীবনটা বিড়ম্বনা বোধ হতে লাগল। সারা দিন আর বাড়ি ফিরলাম না। ওয়াই. এম সি. এ-তে সকালের লাঞ্চ সারলাম, তারপর সোজা কলেজে গেলাম, সেখান থেকে এক বন্ধুর বাড়ি বিকেলের জলযোগ পর্ব সেরে চলে গেলাম খেলার মাঠে। মোহনবাগান ম্যাচ জেতায় যে স্ফূর্তিটা হল, ক্লাবে গিয়ে ঘণ্টা দুই ব্রিজ খেলায় হেরে গিয়ে সেটা নষ্ট করলাম। সেখান থেকে গেলাম সিনেমায় সাড়ে ন'টার শোয়ে।

রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে সদর দরজা খোলাই পেলাম। হাঁকডাক করতে হল না, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। জ্যাঠামশাই ভারি বদরাগী মানুষ, তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হলে আর রক্ষা নেই। পা টিপে টিপে নিজের ঘরের অভিমুখে যাচ্ছি বড়দি কোথায় ওত পেতে ছিলেন জানি না, অকস্মাৎ এসে আক্রমণ করলেন।

'শিবুরে, খোকা বুঝি আর বাঁচে না!'

বড়দির অতর্কিত আক্রমণ, তার পরেই এই দারুণ দুঃসংবাদ—আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লাম।—'কেন, কেন, কি হয়েছে? ছড়িটা গিলে ফেলেছে না কি?'

বিপদের মুহূর্তে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের কথাই আগে মনে পড়ে। ছড়িটার দুর্ঘটনা আশঙ্কা করলাম।

'না, না, ছড়ির কিছু হয়নি।'

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে বড়দির দিকে দৃষ্টিপাত করলাম 'যাক, ছড়ির কোন অঙ্গহানি হয়নি তো! বাঁচা গেছে।'

'না, ছড়ির কিছু হয়নি, তবে সন্ধ্যে থেকে খোকা ভারি কাশছে—ভয়ানক কাশছে। হুপিংকাফ হয়েছে ওর—নিশ্চয়ই হুপিংকাফ। কি হবে ভাই?'

এতক্ষণে মুরুব্বি চাল দেবার সুযোগ এসেছে আমার। গভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'তখনই তো বলেছিলাম সকালে! তা তুমি গ্রাহ্যই করলে না। তখন পাইনের হাওয়ায় কত কি উপকারিতার কথা আমায় শুনিয়ে দিলে। এখন ঠেলা সামলাও।'

'লক্ষ্মি দাদাটি, তোমাকে একবার ডাক্তার বাড়ি যেতে হবে এখুনি।'

'এত রাত্রে? অসম্ভব. ডাক্তার কি আর জেগে বসে আছে এখনো? তার চেয়ে এক কাজ কর না বড়দি?'

ব্যগ্রভাবে বড়দি প্রশ্ন করলেন, 'কি, কি?'

'পাইনের হাওয়ায় যক্ষ্মা সারে, আর হুপিং সারবে না? ছড়িটা দিয়ে খোকাকে কষে হাওয়া কর না কেন?'

বড়দি রোষ কষায়িত নেত্রে আমার দিকে দৃকপাত করলেন—'না তোমাকে যেতেই হবে ডাক্তারের কাছে। নইলে জ্যাঠামশাইকে জাগিয়ে দেব। এই ডাক ছাড়লাম—ছাড়ি?'

'না না, রক্ষে কর - দোহাই! যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে।'

খোকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। হ্যাঁ, হুপিংকাফ, নিশ্চয়ই তাই, ছড়ি খেলে হুপিংকাফ হবে, জানা কথা। কি কাশিটাই না কাশছে, নিজের নাক-ডাকার আওয়াজে শুনতে পাচ্ছে না তাই, নইলে এই কাশির ধ্বনি কানে গেলে জ্যাঠামশাই নিশ্চয় ক্ষেপে উঠতেন। কিম্বা উঠে ক্ষেপতেন।

গেলাম ডাক্তারের কাছে—ভাগ্যক্রমে দেখাও হল। কাল সকালে তিনি খোকাকে দেখতে আসবেন। এখন এক বোতল পেটেণ্ট হুপিংকাফ-কিওর দিলেন, ব্যবস্থাও বাতলে দিলেন। বড়দিকে বললাম, 'এই ওষুধটা এক এক চামচ তিন ঘণ্টা বাদ বাদ খাওয়াতে হবে।'

'তিন ঘণ্টা বাদ বাদ? ওতে কি হবে? অসুখটা কতখানি বেড়েছে দেখছ না? ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ালে যদি বাঁচে খোকা।

'বেশ, তাই খাওয়াও। আমি এখন ঘুমুতে চললাম।'

ঘণ্টাখানেক চোখ বুজেছি কি না সন্দেহ, বড়দির ধাক্কায় জেগে উঠলাম।

'আঃ, কি ঘুমুচ্ছিস মোষের মতো? এদিকে খোকার যে নাড়ি ছাড়ে।'

ধড়মড়িয়ে উঠলাম—'তাই নাকি?' যতটুকু নাড়ি জ্ঞান তাই ফলিয়েই বুঝলাম নাড়ি বেশ টন টন করছে। বড়দিকে সে কথা জানাতেই তিনি আগুন হয়ে উঠলেন, জ্যাঠামশায়ের ভয়ে চ্যাঁচাতে পারলেন না এই যা রক্ষা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওষুধ খাইয়েছে?'

'হ্যাঁ, দু চামচ।'

'এক ঘণ্টায় দু চামচ? বেশ করেছ!'

'শিবু, খোকার বুকে সেই পুলটিসটা দিলে কেমন হয়? আণ্টি-ফ্লজিস্টিন—যেটা জ্যাঠামশায়ের নিউমোনিয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল—এখনো তো এক কৌটো রয়ে গেছে। দেব সেটা?'

আমি বললাম, 'ডাক্তার তো পুলটিস দিতে বলেনি!'

বড়দি বললেন, 'ডাক্তার তো সব জানে। সেটা দিয়ে কিন্তু জ্যাঠামশায়ের খুব উপকার হয়েছিল, আমি নিজে দেখেছি। তুই স্টোভ জ্বাল, আমি ফ্ল্যানেল যোগাড় করি।'

আমি ইতস্তত করছি দেখে বড়দি অনুচ্চ-চিৎকারের একটা নমুনার দ্বারা জানিয়ে দিলেন, স্টোভ না ধরালেই তিনি অকৃত্রিম আর্তনাদে জ্যাঠামশায়ের নিদ্রাভঙ্গ ঘটাবেন। আমি ভারি সমস্যার মধ্যে পড়লাম—যদি বা খোকা বাঁচতো, বড়দির চিকিৎসার ঠেলায় সকাল পর্যন্ত—মানে ডাক্তার আসা পর্যন্ত—টেকে কিনা সন্দেহ। অথচ বড়দির চিকিৎসায় সহায়তা না করলে আরেক বিপদ। ওদিকে খোকার মৃত্যু, এদিকে আমার অপঘাত—আমি স্টোভ ধরাতেই স্বীকৃত হলাম।

পুলটিসের হাত থেকে খোকার পরিত্রাণের একটা ফন্দি মাথায় এল। স্টোভ ধরাতে গিয়ে বলে উঠলাম - 'এই যা, ধরচে না তো! যা ময়লা জমেছে বার্নারে। পোকারটা দাও তো বড়দি?'

'সর্বনাশ! পোকার—সে যে জ্যাঠামশায়ের ঘরে।'

আমি তা জানতাম। 'তাহলে কি হবে? যাও তুমি নিয়ে এসগে। নইলে তো স্টোভ ধরবে না।'

'বাবা! জ্যাঠামশায়ের ঘরে আমি যাব না, তার চেয়ে আমি চ্যাঁচাব।'

'না না, তোমায় চ্যাঁচাতে হবে না। আমিই যাচ্ছি।'

'ওই সঙ্গে তাক থেকে থার্মোমিটারটাও এনো, জ্বর দেখতে হবে।'

খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ গরম! পোকার আনি আর না আনি, থার্মোমিটারটা দেখা দরকার! নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জ্যাঠামশায়ের কক্ষে ঢুকলাম, দরজা খোলাই ছিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে জীবন্ত একমাত্র নাসিকা—নাসিকার কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়েই যদি থার্মোমিটার বাগিয়ে আনতে পারি, তাহলেই আজ রাত্রের ফাঁড়া কাটল।

কাছাকাছি এক বেড়াল শুয়েছিল, অন্ধকারে তো দেখা যায় না, পড়বি তো পড় তার ঘাড়েই দিয়েছি এক পা! সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা চেঁচিয়ে উঠেছে ম্যাঁও!

শুনেছি বেড়ালের দৃষ্টি অন্ধকারেই ভাল খেলে, ওরই আগে থেকে আমাকে দেখা উচিত ছিল। আমার পথ থেকে অনায়াসেই সরে যেতে পারতো। নিজে দোষ করে নিজেই আবার তার প্রতিবাদ—আমার এমন রাগ হল বেড়ালটার উপর, দিলেম ওকে কষে এক শুট, মহামেডান স্পোর্টিং-এর সামাদের মতন।

আমার শুটটা গিয়ে লাগল একটা চেয়ারে, সেখানেই যে সেটা দাঁড়িয়েছিল জানতাম না। পাজি বেড়ালটা এবার ঠিক নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। শুটের প্রতিক্রিয়া থেকে কোনো রকমে আমি টাল সামলে নিলাম কিন্তু চেয়ারটা চিৎপাত হল।

এই সব গোলমালে নাসিকা গর্জন গেল থেমে, কিন্তু আমার হৃৎকম্প আরম্ভ হল সেইসঙ্গে। ভাবলাম, নাঃ, হামাগুড়ি দিয়ে চার-পেয়ের মতো চলি, তাতে ধাক্কাধুক্কি লাগবার ভয় কম, সাবধানেও চলা যাবে, জ্যাঠামশায়ের নিদ্রা এবং

নাসিকা গর্জনের হানি না ঘটিয়ে নিঃশব্দে থার্মোমিটারটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব। একটু পরেই আবার নাক ডাকতে লাগল—আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে হামাগুড়ি প্র্যাকটিস শুরু করলাম।

প্রথমেই একটা বস্তুর সংঘর্ষে দারুণভাবে মাথা ঠুকে গেল—হাত দিয়ে অনুভব করলাম ওটা চেয়ার। সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে—সুবিধার দিক এবং অসুবিধার দিক ; অন্ধকারে হামাগুড়ি অভিযানে পা সামলানো যায় বটে, কিন্তু মাথা বাঁচানো দায়। যাক, গোল টেবিলটা এতক্ষণে পেয়েছি, এবার হয়েছে, ঘরের মধ্যিখানে পেঁছে গেছি—এখান থেকে সোজা উত্তরে গেলেই সেই তাক যেখানে থার্মোমিটার আছে। না তাকালেও পাবো।

অনেকটা তো গুড়ি দেওয়া হল—কিন্তু তাক কই? ভাল করে তাক্ করতে গিয়ে টেবিলটাকে পুনরাবিষ্কার করলাম—এবার মাথা দিয়ে—এবং রীতিমতন ভড়কে গেলাম! একি, এখনো আমি ঘরের মধ্যিখানেই ঘুরছি? আহত মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবতে লাগলাম—কি করা যায়?

নতুন উদ্যমে আবার যাত্রা শুরু করলাম। এই তো টেবিল—এই একটা চেয়ার, এটা? এটা জ্যাঠামশায়ের পিকদানি—ছিঃ! যাকগে, হাতে সাবান দিলেই হবে—এই তো দেয়াল, এই আরেকখানা চেয়ারঃ এই গেল গিয়ে সোফা—এ কি? ঘরে তো একটা সোফা ছিল বলেই জানতাম, নাঃ, এবার হতভম্ব হতে হল আমাকে। যে ঘরে দিনে দশবার আসছি যাচ্ছি, তাতে এত লুকোনো সম্পত্তি ছিল জানতাম না তো! আরেকটু এগিয়ে দেখতে হল—আরো কি অজ্ঞাত ঐশ্বর্য উদ্ধার হয়! এই যে দেখছি আরেকখানা চেয়ার—ঘরে আজ এত চেয়ারের আমদানি হল কোত্থেকে! এই যে ফের আরেকটা পিকদানি—ছিছিঃ, এ-হাতটাতেও সাবান লাগাতে হল আবার! ছ্যাঃ!

নাঃ, এবার এগুতে সত্যিই ভয় করছিল। ঘরে আজ যে রকম পিকদানির আমদানি তাতে আর বেশি পরিভ্রমণ নিরাপদ নয়। দরজাটা কোন দিকে? এবার বেরুতে পারলে বাঁচি—আর থার্মোমিটারে কাজ নেই বাবা! উঠতে গিয়ে মাথায় লেগে গেল—এ কোনখানে এলাম? টেবিলের তলায় নাকি? টেবিলটা তো ছোট এবং গোল বলেই জানতাম—এ যে, যেখানে যত ঘুরে ফিরেই উঠতে যাই মাথায় লাগে। ঘরের ছাদ নোটিস না দিয়ে হঠাৎ এত নীচে নেমে আসবে বলে তো মনে হয় না। তবে আমার দণ্ডায়মান হবার বাধা এই দীর্ঘ-প্রস্থ বস্তুটি কি? এটাকে নিয়ে ঠেলে উঠব, যাই থাক কপালে।

যেই চেষ্টা করা, অমনি সহসা জ্যাঠামশায়ের নাসিকাধ্বনি স্থগিত হল। ক্ষণপরেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—'চোর চোর! ডাকাত! খুনে! ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! খুন করলো!'

ও বাবা! আমি জ্যাঠামশায়ের তক্তপোশের তলায়—কী সর্বনাশ! ওঁকে শুদ্ধ নিয়ে উঠবার চেষ্টায় ছিলাম! এখন ওঁকে অভয় দেওয়া দরকার। বোঝান দরকার চোর নয়, ডাকাত নয়, ভূমিকম্প নয়—অন্য কিছু, নগণ্য কিছু। মিহি সুরে ডাকলাম—'মিঁয়াও!'

জ্যাঠামশাই যে খুব ভরসা পেয়েছেন এমন বোধ হল না। এবার গলা ফুলিয়ে ডাকতে হল—'ম্যাঁ-া-া-ও!'

বড়দি হ্যারিকেন হাতে ঢুকলেন। জ্যাঠামশাই ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'দেখতো সুশী, আমার তক্তপোশের তলায় কি?'

বড়দি আমাকে পর্যবেক্ষণ করে আশ্বাস দিলেন, 'ও কিছু না, জ্যাঠামশাই, একটা ইঁদুর, আপনি ঘুমান!'

জ্যাঠামশাই সন্দিগ্ধস্বরে বললেন, 'ইঁদুর আমার চৌকি ঠেলে তুলবে? ইঁদুরের এত জোর—একি হতে পারে?'

বড়দি বললেন, 'ধাড়ি ইঁদুর যে।'

ধাড়ি ইঁদুর! একটু আগে বেড়ালের ডাক শুনলাম যেন। বেড়াল-ইঁদুর এক সঙ্গে, ওরা যে খাদ্য-খাদক বলেই আমার জানা ছিল। যাকগে আলোটা নিয়ে যা আমার সামনে থেকে—ঘুম পাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্যাঠামশায়ের নাসিকা-বাদ্য বেজে উঠল। বড়দির আড়াল দিয়ে আমিও বিপদ-সংকুল কক্ষ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলাম।

বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে দেখি ভোর হতে আর বাকি নেই—সুদূর আকাশে মুক্তাভা দেখা দিয়েছে। রাত দুটো থেকে এই ভোর পাঁচটা, ওই ঘরে আমি কেবল ঘুরেছি—পায়ে মিটার বাঁধা ছিল না, নইলে জানা যেত কত মাইল মোট ঘুরলাম? তিন ঘণ্টায় তিরিশ মাইল তো বটেই।

বড়দি করুণ কন্ঠে বললেন, 'তুমি তো থার্মোমিটার আনতে বছর কাটিয়ে দিলে, এদিকে দেখ এসে, খোকা কেমন করছে।'

দেখেই বুঝলাম আর না দেখলেও চলে খোকার শেষ-মুহূর্ত সন্নিকট! যে সময়ে আমি এনডিওরেনস্ হামাগুড়ির রেকর্ড সৃষ্টি করছিলাম, আমার ভাগ্নের অদৃষ্টে সেই সময়ে অন্যবিধ এনডিওরেনস পরীক্ষা চলছিল দেখলাম, বড়দি নিজেই কোনো রকমে স্টোভ ধরিয়ে নিয়েছেন, ইতিমধ্যে দু-দুবার খোকার বুকে পুলটিস দেওয়া হয়ে গেছে। ওষুধের দিকে তাকিয়ে দেখি গোটা বোতলটা ফাঁক! 'ওষুধের কি হল' জিজ্ঞাসা করতেই বড়দি জানালেন, দশ মিনিট অন্তর এক চামচ করে খাওয়ানো হয়েছে, তবু তো কই কোন উপকার দেখা যাচ্ছে না। আমি বললাম, উপকার দেখা যেত যদি খোকার বদলে তুমি খেতে।

হাত টিপে দেখলাম, কিন্তু খোকার নাড়ি পেলাম না। খোকার আর অপরাধ কি, যে এক বোতল হুপিংকাফ-কিওর ওকে উদরস্থ করতে হয়েছে,

তাতে কি আর ওর নাড়ি-ভুঁড়ি হজম হতে বাকি আছে? তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ফোন করলাম—'আমাদের খোকা মারা যাচ্ছে।'

পায়জামা-পরনেই ডাক্তার ছুটে এলেন, পরীক্ষা করে বললেন, 'না, মারা যাচ্ছে না। তাছাড়া এর হুপিং কাফই হয়নি। দেখি—'বলে খোকার গলার কাছে সুড়সুড়ি দিতেই খোকা বেদম কাশতে শুরু করল এবং কাশির ধমকে বেরিয়ে এল সূক্ষ্মাতম কি একটা জিনিস। হাতে নিয়ে ভাল করে দেখে ডাক্তার বললেন, এ তো পাইন কাঠের টুকরো দেখছি! খোকা বোধ হয় পাইন কাঠের কিছু চিবুচ্ছিল—তার ভগ্নাংশ ভেঙে গলায় গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বড়দি বললেন, 'হুপিংকাশি নয়, তাহলে এটা কি কাশি?' বড়দির ক্ষোভের কারণ ছিল, সমস্ত রাত ধরে এক সঙ্গে হুপিংকাফ, নিউমোনিয়া ও সর্দিগর্মির চিকিৎসার পর সেই প্রাণান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে জানলে কার না দুঃখ হয়?

আমি উত্তর দিলাম, এক রকমের কাষ্ঠ-হাসি আছে জানো তো বড়দি? এটা হচ্ছে তারই ভায়রা-ভাই—কাষ্ঠ-কাশি।

মহাত্মা বলে সর্বসাধারণে পরিচিত ও পূজিত হবার ঢের আগে থেকেই গান্ধীজী যে যথার্থ অর্থে মহান আত্মা, তার পরিচয় এই গল্পে তোমরা পাবে। যিনি এই গল্পের জন্য নায়ক, এক গৌণ চরিত্র, তাঁর নিজের মুখ থেকে এ কাহিনীটি শোনা আমার।

গোবিন্দবাবু সেই সময়ে কলকাতার একজন সাধারণ আপিসের কেরানী। তাঁর আসল নাম অবশ্য গোপন রাখলাম। এখন তিনি এমন বড় পদে প্রতিষ্ঠিত যে তার নাম করলে অনেকেই তাঁকে চিনতে পারবেন।

বহুদিন আগেকার কথা। গোখলে সেই সময়ে ভারতবর্ষের নেতা। সেই গোখলের কলকাতাবাসের সময়ে তাঁকে পছন্দসই বাসা খুঁজে দিয়েছিলেন, এই সূত্রে গোখলের সঙ্গে আমাদের গোবিন্দবাবুর ঘনিষ্ঠতা গজায়।

ঘনিষ্ঠতা দিনদিনই দারুণতর হয়ে উঠছিল। কেন না, গোখলের দেশ থেকে যখনই তাঁর আত্মীয়-গোষ্ঠীর কেউ আসেন, গোখলে তাঁকে কলকাতা দেখাবার ভার গোবিন্দবাবুর ওপর দেন। গোবিন্দবাবুকে গোখলের অনুরোধ রাখতে হয়। অত বড় দেশমান্য ব্যক্তির ভাড়াটে বাড়ি যোগাড় করে দেবার সুযোগ লাভ করে তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছিলেন, এখন তাঁর দেশোয়ালিদের কলকাতা দেখিয়ে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন।

তাঁর ফরমাস খাটতে পেলে গোবিন্দবাবু যে আপ্যায়িত হন এটা বোধ করি গোখলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই গোবিন্দবাবুকে বাধিত করবার সামান্য সুযোগও তিনি অবহেলা করতেন না। যখনই পোরবন্দর, কি পুণা, কি জুনাগড় থেকে কোন অতিথি আসত, গোখলে বলতেন, 'গোবেন্দবাবু, ইন্‌কো কলকাত্তা তো কুছ দেখলা দিজিয়ে!'

গোবিন্দবাবু অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ঘাড় নাড়তেন। কিন্তু সেই অদৃষ্ট পূর্ব অপরিচিত অভ্যাগতকে কলকাতার দৃশ্য ও দ্রষ্টব্য দেখিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সেই উৎসাহের কতখানি পরে বজায় থাকত তা বলা কঠিন।

সেই সময়ে গান্ধীজী আফ্রিকা থেকে সবে স্বদেশে ফিরেছেন, তাঁর কীর্তি-কাহিনী সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। যদিও আপামর সাধারণের কাছে তাঁর নাম তখনো পৌঁছেনি, তবু তাঁর অদ্ভুত চরিত্র, জীবনযাত্রা ও কর্ম-প্রণালীর কথা ক্রমশ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভারতবর্ষে ফিরেই গান্ধীজী গুজরাট থেকে কলকাতায় এলেন গোখলের সঙ্গে দেখা করতে।

সেই তাঁর প্রথম কলকাতায় আসা। কাজেই গোখলের স্বভাবতই ইচ্ছা হল গান্ধীজীকে কলকাতাটা দেখানোর। এ কাজের ভার আর কার ওপর তিনি দেবেন? এই কাজের উপযুক্ত আর কে আছে ওই গোবিন্দবাবু ছাড়া? অতএব 'গোবিন্দবাবুকে ডেকে অনুরোধ করতে তাঁর বিলম্ব হল না।

'মোহনদাসকো কলকাত্তা তো দেখলা দিজিয়ে!'—শুনে গোবিন্দবাবু কিন্তু নিজেকে এবার অনুগৃহীত মনে করতে পারলেন না। গান্ধীজীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। যদিও গোবিন্দবাবুর কানে গান্ধীজীর খ্যাতি পৌঁছেছিল, তবু কেবল 'মোহনদাস' থেকে তিনি বুঝতে পারলেন না যে তিনি সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটিরই 'গাইড' হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তা ছাড়া গোখলের কথায় তিনিই সকালে গিয়ে লোকটাকে স্টেশন থেকে এনেছেন —থার্ড ক্লাসের যাত্রী, পরণে মোটা কাপড়—তাও আবার আধময়লা, পায়ে জুতো নেই, মলিন অপরিচ্ছন্ন চেহারা—এ সব দেখে লোকটার ওপর তাঁর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়নি। সেই লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে সারা কলকাতা ঘুরতে হবে ভেবে গোবিন্দবাবুর উৎসাহ উপে যাবার যোগাড়!

কিন্তু কি করবেন? গোখলের অনুরোধ। আগের দিনই তিনি গোখলের দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়কে কলকাতা দর্শন করিয়েছেন। সে লোকটি গুজরাটের কোন এক তালুকের দারোগা। সে তবু কিছু সভ্য-ভব্য ছিল, হাজার হোক দারোগা তো! কিন্তু এ লোকটা—? গান্ধীজীর দিকে দৃষ্টিপাত করে গোবিন্দবাবু বিরক্তি গোপন করতে পারলেন না। বোধহয় কোন সিপাই-টিপাই কি দারোয়ানই হবে বোধ হয়! গোখলের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু—তাঁর প্রদেশের তাবৎ লোকের ওপর গোবিন্দবাবু বেজায় চটে

গেলেন। তাদের কলকাতা আসার প্রবৃত্তিকে তিনি কিছুতেই মার্জনা করতে পারছিলেন না।

যাই হোক, নিতান্ত অপ্রসন্নমনে সিপাইকে লেজে বেঁধে গোবিন্দবাবু নগর-ভ্রমণে বার হলেন। এই ভেবে তিনি নিজেকে সান্তনা দিলেন যে রাস্তার লোকে এও তো ভেবে নিতে পারে যে, এ তাঁর নিজেরই সেপাই। 'গোবিন্দবাবু আজ বডি গার্ড সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন'—তাদের এই সাময়িক ভুল-বোঝার ওপর কথঞ্চিৎ ভরসা করে তিনি কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ পাবার চেষ্টা করলেন।

পরেশনাথ মন্দিরের কারুকার্য, সেখানকার মাছের লাল, নীল ইত্যাদি রং বেরং হবার রহস্য, মনুমেণ্ট কেন অত উঁচু হয়, কলকাতার গঙ্গা কোন কোন প্রদেশ পেরিয়ে এসেছে, হাওড়া-পুল কেন জলের ওপর ভাসে আর ভাসা পুল কেন যে ডুবে যায় না তার বৈজ্ঞানিক কারণ ইত্যাদি কলকাতা শহরের যা কিছু দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য ছিল লোকটাকে তিনি ভাল করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

ওকে ক্রমশই তাঁর ভাল লাগছিল। এমন সমঝদার শ্রোতা তিনি বহুদিন পাননি। এমন কি কালকের সেই দারোগাটিও এমন নয়। দারোগাটি তবু মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করার প্রয়াস পেয়েছে—বলেছে অত বড় মনুমেণ্ট কেবল ইটের বাজে খরচ, মানুষ যদি না থাকল ত অত উঁচু করার ফায়দা কি! বলেছে মাছের ঐ লাল, নীল রং সত্যিকার নয়, রাত্রে লুকিয়ে রং লাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই সিপাইটি সে রকম না; তিনি যা বলেন তাতেই ঘাড় নেড়ে এ সায় দেয়। তবে অসুবিধার কথা এই যে কালকের দারোগাটি তবু কিছু ইংরেজি বুঝত, ইংরজির সাহায্যে তাকে বোঝানো সহজ ছিল. কিন্তু এ সিপাই ত ইংরেজির এক বিসর্গও বোঝে না! অথচ হিন্দিতে সমস্ত বিষয়ে বিশদ করতে গিয়ে গোবিন্দবাবুর এবং হিন্দি ভাষার প্রাণান্ত হচ্ছিল।

গোবিন্দবাবু সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়লেন মিউজিয়মে গিয়ে। চিড়িয়াখানায় তেমন কিছু দুর্ঘটনা হয়নি, কেন না, জন্তু জানোয়ারের অধিকাংশই উভয়ের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল নয়। 'ই হাঁথি, ই ভালু, বান্দর এই বলে তাদের পরিচিত করার পরিশ্রম গোবিন্দবাবুকে করতে হয়নি! কিন্তু মিউজিয়মে গিয়ে বাঁদরের পূর্বপুরুষ থেকে কি করে ক্রমশ মানুষ দাঁড়াল তার বিভিন্ন জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ডারুইনের বিবর্তনবাদ বোঝাতে গোবিন্দবাবুর দাঁত ভাঙবার যোগাড় হল। কিন্তু সিপাইটির ধৈর্য ও জ্ঞান-তৃষ্ণা আশ্চর্য বলতে হবে। গোবিন্দবাবু যা বলেন তাতেই সে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, আর বলে - 'সমঝাতা হ্যায়, সমঝাতা হ্যায়।'

সমস্ত দিন কলকাতা শহর আর হিন্দি 'বাতের' সঙ্গে রেষারেষি করে গোবিন্দবাবু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন! মাঝে মাঝে ছ্যাকরা গাড়ির সাহায্য নিলেও অধিকাংশ পথ তাঁদের হেঁটেই মারতে হয়েছিল। ফিরবার পথে

গোবিন্দবাবু স্থির করলেন আর হাঁটা নয়, এবার সোজা ট্রামে বাড়ি ফিরবেন! সারাদিনের ধস্তাধস্তিতে গোবিন্দবাবু কাবু হয়ে পড়লেও সিপাইটির কিছুমাত্র ক্লান্তি দেখা গেল না।

অশ্ব-বাহন ছেড়ে কলকাতায় তখন প্রথম বিদ্যুৎ-বাহনে ট্রাম চলছে। গোবিন্দবাবু ট্রামে উঠলেন বটে, কিন্তু সিপাইটি যে তাঁর পাশে বসে এটা তাঁর অভিরুচি ছিল না। যদি চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে দৈবাৎ চোখাচোখি হয়ে যায়। কিন্তু সিপাইটির যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে! সে অম্লানবদনে কিনা তাঁর পাশেই বসল। তার আস্পর্ধা দেখে গোবিন্দবাবু মনে মনে বিরক্ত হলেন এবং সংকল্প করলেন আর কখনও গোখলের বাড়ির ছায়া মাড়াবেন না।

তাঁদের মুখোমুখি আসনে একজন ফিরিঙ্গি বসেছিল, তার কি খেয়াল হল, সে হঠাৎ গোবিন্দবাবু এবং সিপাইয়ের মধ্যে যে জায়গাটা ফাঁক ছিল, সেইখানে তার বুটসুদ্ধ পা সটান চাপিয়ে দিল।

গোবিন্দবাবু বেজায় চটে গেলেন। ফিরিঙ্গিটার অভদ্রতার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা থাকলেও ওর হোঁৎকা চেহারার দিকে তাকিয়ে একা কিছু করবার উৎসাহ তাঁর হচ্ছিল না। সিপাইটির দিকে বক্র কটাক্ষ করলেন, কিন্তু তার রোগাপটকটা শরীর দেখে সেদিক থেকেও বড় একটা ভরসা পেলেন না। অগত্যা তিনি নীরবে অপমান হজম করতে লাগলেন।

কিন্তু একটু পরে তিনি যে অভাবিত দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। সিপাইটি করেছে কি, তার ধূলিধূসরিত চরণযুগল সোজা সাহেবের পাশে চাপিয়ে দিয়েছে। বাবাঃ সিপাইটির সাহস তো কম নয়, তিনি মনে মনে তার তারিফ করলেন। সামান্য নেটিভের দুঃসাহস দেখে ফিরিঙ্গিটাও বুঝি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার ফেরঙ্গ স্বভাব চাড়া দিয়ে উঠল। সে রুক্ষ স্বরে হুকুম করলে —'এইও! গোর হঠা লেও!'

সিপাইটি কোন জবাবও দেয় না, পাও সরায় না ; যেন শুনতেই পায়নি সে।

সাহেব সিপাইয়ের পাঁজরায় বুটের ঠোক্কার মেরে বলল—'এই! তুম! শুনতা নেহি?'

প্রত্যুত্তরে সিপাই পা না সরিয়ে মৃদু একটু হাসল কেবল।

এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সাহেব জীবনে কখনো দেখিনি। সাহেবের হুমকিতে ভয় খায় না, অথচ পদাঘাতের প্রতিশোধ নেবারও চেষ্টা করে না, ভয়ও নেই ক্রোধও নয়—অপমান ও লাঞ্ছনায় হাস্যরত এমন অপূর্ব সমন্বয়ের সাক্ষাৎ এর আগে সে পায়নি। বিস্ময়ে এবং পরাজয়ে তার স্পর্ধা স্বভাবতই সংকুচিত হয়ে এল। সে এবার গোবিন্দবাবুকে ইংরেজিতে বলল—'তোমার বন্ধুকে পা তুলে নিতে বল।'

গোবিন্দবাবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। সেই সামান্য সিপাইটা তাঁর বন্ধু! দস্তুরমত রাগ হল তাঁর। তিনি গোবিন্দবাবু, হাকিমের দক্ষিণ হস্ত, আর এই সিপাইটা কিনা তাঁর সমকক্ষ! ফিরিঙ্গির ওপর গোড়া থেকেই তিনি চটেছিলেন, এখন তার এই অমূলক সন্দেহে তিনি অসম্ভব ক্ষেপে গেলেন। দ্বিরুক্তি না করে উঠেই রাগের মাথায় তিনি ফিরিঙ্গিটার নাকের গোড়ায় এক ঘুসি কষিয়ে দিয়েছেন।

সারা ট্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ফিরিঙ্গিও আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়াল। সেই গাড়িতে হিন্দু স্কুলের জনকতক ছাত্র যাচ্ছিল, তারা গোবিন্দবাবুর পক্ষ নিল। ফিরিঙ্গিটিকে হিড়হিড় করে রাস্তায় নামিয়ে তুলো ধুনবার উদ্যোগ করল তারা।

যে সিপাইটি নিজের লাঞ্ছনায় এতক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন ও নির্বিকার ছিল, সাহেবের প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনায় সে এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'Oh my boys' বলে ছেলেদের সম্বোধন করে সে বক্তৃতা শুরু করে দিল। সেই বক্তৃতার মর্ম হচ্ছে সাহেবের কোন দোষ নেই। তাকে মারবার কোন অধিকার নেই আমাদের। কারুকেই মারবার আমাদের অধিকার নেই। মানুষ যেন মানুষকে আঘাত না করে। তোমরা অন্যায় আচরণকারীকে ক্ষমা করতে শেখ, ভালবাসতে শেখ। ভালবাসার দ্বারাই অন্যায়কে জয় করা যায়। অহিংসা পরমো ধর্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিপাইয়ের মুখে ইংরেজির চোস্ত বুলি শুনে গোবিন্দবাবু তো হতভম্ভ। এ যদি এমন চমৎকার ইংরেজি জানে তবে এতক্ষণ তা বলেনি কেন? তাহলে কি তাঁকে সারাদিন এমন হিন্দি কসরৎ করে এমন গলদঘর্ম হতে হয়? আহা, আগে জানলে ডারউইনের বিবর্তনবাদ কত ভাল করেই না একে বোঝান যেত! ছেলেরা নিরস্ত হল কিন্তু গোবিন্দবাবুর উষ্মা যায় না। তিনি বললেন—'ও কেন আমাদের পাশে পা তুলে দিল?'

'ও আরামের জন্য পা তুলেছে, আমিও আরাম পেয়েছি, পা তুলে দিয়েছি। শোধ-বোধ হয়ে গেছে।'

'ও তোমাকে মারল কেন?'

'আমি তো সেজন্য ওকে কিছু বলছি না।'

লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, এই অদ্ভুত লোকটির কথায় ও ব্যবহারে সাহেব চমৎকৃত হয়ে গেছল। সে সিপাইটির করমর্দন করে ও ধন্যবাদ জানিয়ে চলতি একজনের মোটরে চড়ে চলে গেল। সিপাইটি গোবিন্দবাবু ও ছেলেদের হয়ে সাহেবের কছে ক্ষমা নিয়েছে।

ঠেঙাবার এমন দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় গোবিন্দবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি সারা পথ আর বাক্যব্যয় করলেন না, সিপাইয়ের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। ভীতু কোথাকার! যদিও ভাল ইংরেজি বলতে

পারে তবু তার কাপুরুষতাকে তো মার্জনা করা যায় না! তাকে গোখলের আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে তিনি সটান বাড়ি ফিরলেন। সিপাইয়ের সঙ্গে বিদায়সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না।

পরদিন গোখলের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন—'আপনার সিপাই কিন্তু খাসা ইংরেজি বলতে পারে!'

'সিপাই কৌন? আরে মোহনদাস! তুমি সিপাহি বনু গিয়া!' বলে গান্ধীজীকে ডেকে গোখলে একচোট খুব হাসলেন। গান্ধীজীও হাসতে লাগলেন।

এত হাসাহাসির মর্মভেদ করতে না পেরে গোবিন্দবাবু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই যখন রহস্যভেদ হল, সিপাহি'র যথার্থ পরিচয় তার অজ্ঞাত রইল না, তখন তিনি আরো কত বেশি অপ্রস্তুত হয়েছিলেন তা তোমরা অনুমান করতে পারো। বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন মানুষ এতখানি অপ্রস্তুত হয়নি।

মাঝরাতে টুসির দাদুর পেট-ব্যাথাটা খুব-জোর চাগাড় দিয়ে উঠলো। দু'হাতে পেট আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লে তিনি—এই কলিক! এতেই প্রাণ তাঁর লিক করে বুঝি এক্ষুনিই! তাঁর মর্মান্তিক হাঁকডাক শুরু হয়—'টুসি! টুসি!'

টুসি ঘুমোচ্ছিল পাশের বিছানাতেই, জেগে ওঠে সে। 'কি দাদু! ডাকছো আমায়?'

'এক্ষুনি যা একবার বামাপদ ডাক্তারের কাছে। ছুটে যাবি। বলবি যে, মরতে বসেছে দাদমশাই!'

'অ্যাঁ?—' টুসি ধরমড়িয়ে উঠে বসে।

'বলবি যে, সেই কলিকটা—। হঠাৎ ভয়ানক—। উঃ বাবাগো!'

ওঃ! সেই কলিক। অনেকটা আশ্বস্ত হয় টুসি। 'স্টোভে জল ফুটিয়ে বোতলে পুরে দেবো তোমায় দাদু? চেপে ধরবো তোমার পেটে?'

'ধুত্তোর বোতল! বোতলেই যদি কাজ হোতো, তাহলে লোকে আর ডাক্তার ডাকতো না। বোতলের কাছেই ব্যবস্থা নিত সবাই! উঃ! আঃ! ওরে বাবারে! গেলাম রে!'

দাদুর আর্তনাদে বিকল হয়ে পড়ে টুসি। বামাপদবাবুকে কল দিতে যেতেই হয়। কি আর করা? 'কিন্তু এই রাত্তিরে? এত রাত্তিরে আসবেন কি ডাক্তার?' রাতবিরেতে রাস্তায় বেরুতে টুসি একটু ইতস্তত করে।

'বেশি কি রাত হয়েছে শুনি? এই তো সবে দুটো! আর এমন কি দূরে? দেরি করিসনে—যা!' আর্তনাদের ফাঁকে ফাঁকে উৎসাহ-বাণী বিতরণ করেন ওর দাদু।

শার্ট গায়ে, স্লিপার-পায়ে তৈরি হয় টুসি। ছোট্টো মনিব্যাগটা পড়ে যায় পকেট থেকে ; যথাস্থানে তাকে আবার তুলে রাখে। ফাউন্টেনপেনটাও আঁটে বুকে। এত রাত্তিরে কে আর দেখছে তার কলম ? তাহলেও—তবুও—!

'ছুটতে ছুটতে যাবি ! দাঁড়াবিনে কোথাও ! যাবি আর আসবি ! আমি খাবি খাচ্ছি। বুঝেছিস ?'

অতঃপর মর্মন্তুদ যত অব্যয়শব্দ-অপপ্রয়োগের পালা শুরু হয় ওর দাদুর —'মা গো ! বাবা গো ! গেলুম গো ! উঃ ! আঃ ! ইস ! উহুহু !'

ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে পড়ে টুসি। এক পলকও দাঁড়ায় না আর।

প্রথম খানিকটা সে সবেগেই যায়—কিন্তু ক্রমশঃই ওর গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে আসে। খেয়ে-না-খেয়ে সে বেশ একটু মোটাই ; তাড়াহুড়ার পক্ষে খুবই যে উপযোগী নয়, অল্পক্ষণেই সে তা বুঝতে পারে। তবু তার দাদুর যে এখন-তখন, একথা ভাবতেই টুসির মন ভারী হয়ে আসে—ভারী পা-কে তাড়িত করে দেয়। হাঁপাতে-হাঁপাতেই সে ছোটে।

এমন সময় রাস্তার এক প্রাণী অযাচিতভাবে এসে টুসির গতিবৃদ্ধির সহায়তায় লাগে, যদিও সে সাহায্য না করলেও—টুসির নিজের মতে—বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না।

জনবিরল পথ। কোনো লোক নেই কোথাও। একটা মোটরও চলে না রাস্তায়। কেবল ইঁদুররাই এই সুযোগে মহাসমারোহে রাস্তা পারাপার করছে —এধারের ফুটপাথ পেরিয়ে ওদিকের অন্দরে গিয়ে সেঁধুচ্ছে। ওদিক থেকে ছুটে আসছে এদিকে।

যথাসম্ভব তেজে চলেছে টুসি, ইঁদুরের শোভাযাত্রায় পদাঘাত না করে—সবদিক বাঁচিয়ে।

এমন সময় একটা কুকুর—

ইঁদুরদের অন্বেষণেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল সে বোধহয়, কিন্তু বৃহত্তর শিকার পেয়ে ক্ষীণজীবীদের পরিত্যাগ করতে মুহূর্তের জন্যেও সে দ্বিধা করলো না। টুসির পেছনে এসে লাগলো সে।

'ঘেউ-ঘেউ-ঘেউউউ !'

টুসি দৌড়োয়—আরো—আরো জোরে। আরো—আরো—আরো তীরবেগে সে ছুটতে শুরু করে।

কুকুরও সশব্দে দৌড়ায়। টুসির পেছনে-পেছনেই।

হাঁপ ফেলার ফাঁক নেই টুসির। প্রাণপণে সে দৌড়োচ্ছে।—ফিরে তাকাবার ফুরসৎ নেই তার। না ফিরেই সে উদ্ধত আওয়াজ শোনে, উদ্যত নখদন্ত নিজের মনশ্চক্ষেই দেখে নেয়। আরো জোরে সে ছুটতে থাকে।

ছুটতে-ছুটতে তার মনে হয়, দৌড়োচ্ছে সে এমন আর মন্দ কি ! মোটা বলে ইস্কুলের ছেলেরা দৌড়ের-স্পোর্টসে নামাবার জন্যে প্রায়ই ওকে

ওসকায় ; কিন্তু এরকম একটা কুকুরের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে প্রথম পুরস্কারই মেরে দিতে পারে সে একছুটেই—হ্যাঁ !

কিন্তু দরকারের সময় কোথায় তখন কুকুর ? এখন—যখন তেমন তাড়া নেই, কুকুরের তাড়নায় ছুটতে হচ্ছে ওকে।

ছুটবার মুখে টুসির সম্মুখে এসে পড়ে একটা পার্ক—লোহার সরু করগেট শিকের রেলিং দিয়ে ঘেরা। পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে হাঁপ ছাড়ে টুসি। কুকুরটা বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকে। বড় আর একটা উচ্চবাচ্য করে না সে—কি হবে অকারণে 'ঘেউৎকারে' গলা ফাটিয়ে ? নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে শিকার এখন ! শিকের রেলিং ডিঙ্গিয়ে, কি তার কায়দার দরজা খুলে-ভেজিয়ে ভেতরে ঢোকার কৌশল তো ওর জানা নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিতান্তই জিহ্বা-আস্ফালন এবং ল্যাজ-নাড়া ছাড়া আর উপায় কি ?

পার্কের ওধারে একটা গ্যাসের বাতি খারাপ হয়ে দপ্‌দপ্‌ করছিল। প্রায় নিভবার মুখেই আর কি ! বাতির অবস্থা দেখে দাদুর অবস্থা ওর মনে পড়ে। তাঁর জীবন-প্রদীপও এতক্ষণে হয়তো ওই বাতির মতই—ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে টুসি।

পার্কের ওধারের গেটটা পেরিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে খানিকটা গেলেই বামাপদবাবুর বাড়ি।

টুসি পার্কের অন্যধারে যায়। গেটটা আবার কিছুটা দূরেই—অতটা ঘুরে যেতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। সামনেই রেলিং-এর একটা শিক বেশ ফাঁক করা দেখতে পায় সে। ছেলেপিলেদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যেই বিধাতার সহায় নিশ্চয়ই এই ফাঁকের সৃষ্টি ! ফাঁকের নেপথ্য দিয়ে—ফাঁকি দিয়ে গলে যাবার সোজা রাস্তা নেয় সে।

কিন্তু টুসির হিসেবে ভুল ছিল। ঈষৎমাত্র। ছেলের মধ্যে ধরলেও পিলের মধ্যে কিছুতেই গণ্য করা যায় না তাকে, বরং পিপের সঙ্গেই তার উপমা ঠিক মেলে। কাজেই মধ্যপথেই সে আটকে যায়—ঠিক তার দেহের মধ্যপথে। এগুতেও পারে না, পেছিয়ে আসাও অসম্ভব।

বহুক্ষণ রেলিং-এর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে—করগেট-শিকের বাহুপাশ কিন্তু একচুলও শিথিল হয় না। অবশেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয় সে। কি মুশকিলেই সে পড়লো বলো তো! কোথায় বিছানায় আরামে না কোথায় রেলিং-এর 'ব্যাড়া মে'। কান্না পেতে থাকে তার।

কুকুরটাও এতক্ষণে গোটা পার্কটা ঘুরে-ফিরে তাঁর কাছাকাছি এসে পেঁছেছিল। টুসির মুখের ওপরেই সে লাফাতে-ঝাঁপাতে শুরু করে এবার।

অসহায় হয়ে হাত পা ছুঁড়ে টুসি—কী আর করবে ? তাও একখানা

হাতে, আধখানা পা—তার বেশি আর নয়। পালিয়ে বাঁচবার উপায়ও তার নেই। আগেই সে-পথ সে বন্ধ করেছে।

ওকে ছেড়ে ওর কোঁচা ধরে টানতে থাকে কুকুরটা। অ্যাঁ! মুক্তকচ্ছ করে দেবে নাকি! মতলব তো ভাল নয় ওর! দু'হাতে প্রাণপণে কাপড় চেপে ধরে টুসি—গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে। এক কামড়ে কোঁচার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে বিরক্ত হয়ে চলে যায় কুকুরটা। হ্যাঁ, বিরক্ত হয়েই বেশ! হুটোপাটি নেই, দৌড়ঝাঁপ নেই এরকম ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রেলিং-এর গায় লেগে থাকা খেলা ভাল লাগে না ওর। ইঁদুরদের খোঁজেই সে চলে যায় আবার।

কুকুরটা ওকে বর্জন করে গেলে কিছুটা স্বস্তি পায় সে। খানিক বাদে একটা লোক যায় পাশ দিয়ে—টুসি তার দিকে ডাক ছাড়ে।

'ও মশাই! মশাই গো!'

'কে? লোকটা চমকে ওঠে। 'কি? কি হয়েছে তোমার?' টুসির কাছে এসে জিগ্যেস করে সে।

'আমাকে এখান থেকে বের করে দিন না মশাই!' টুসির কণ্ঠস্বর অতিশয় করুণ। 'ভারি মুশকিলে পড়েছি আমি।'

ওর অবস্থা দেখে হাসতে শুরু করে দ্যায় লোকটা 'বাঃ! বেড়ে তো! কার অঞ্চলের নিধি এসে এখানে আটকা পড়েছো চাঁদ! আছে নাকি কিছু ট্যাঁকে?'

টুসির পকেট হাতড়ে মনিব্যাগটা সে হাতিয়ে নেয়। দাদুর দেওয়া ইস্কুলের মাইনে আর বায়স্কোপ-দেখার পয়সা—সবই যে রয়েছে ঐ ব্যাগে। টুসির যথাসর্বস্ব! সবটা বাগিয়ে নিয়ে লোকটা সত্যিই চলে যায় যে—! বাঃ! বেশ মজার তো!

টুসি চেঁচাতে শুরু করে—'পিক্-পকেট! পিক-পকেট! পকেটমার! পুলিশ। ও পুলিশ! চোর, ডাকাত, খুনে পালাচ্ছে—পুলিশ! ও পুলিশ।'

লোকটা ফিরে আসে ফের—'অমন করে চ্যাঁচাচ্ছো কেন যাদু? এই নিশুত-রাতে শুনবে কে? কে জেগে বসে আছে সারারাত তোমার জন্যে হারানিধি? এই যে,বাঃ। ফাউন্টেনপেনও একটা আছে দেখছি! দেখি বাঃ। বেশ পেনটি তো। পার্কার? কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মী ভাইটি।'

অতঃপর কলমটি হস্তগত করে ওর মাথায় আদর করে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে যায় লোকটা। টুসি আর চ্যাঁচায় না এবার।

কতক্ষণ যে এভাবে কাটে, জানে না সে—হঠাৎ ভারী একটা সোরগোল শুনতে পায় টুসি।

'চোর-চোর! পাকড়ো! পাকড়ো। উধর ভাগা—উস তরফ।'

হ্যাঁ, সেই পকেট-কাটা হতভাগাই। ছুটতে-ছুটতে সে এসে টুসির পাশের রেলিং টপকে পার্কের গেট দিয়ে উধাও হয়।

কয়েকমুহূর্ত পরেই এক পাহারাওয়ালা এসে টুসিকেই জাপটে ধরে—

'পাকড় গয়ি ! এই ভাইয়া !' নিজের উচ্চকণ্ঠ ছেড়ে দেয় সে এবার—ফূর্তি ওর দ্যাখে কে !

আরেকজন পাহারাওয়ালা এসে যোগ দেয় তার সঙ্গে—'এই ! বাহার আও। নিকলো জলদি !' টুসিকে এক ঘুসি লাগায় সে কষে—'চোট্টা কাঁহাকা ?'

টুসি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করে।

'আরে ! ই তো রোনে লাগি ! বহুৎ বাচ্চা বা !'

'বাচ্চা হোই চায় সাচ্চা হোই, লেকিন একঠো কো তো থানামে লে-যানা পড়ি।'

অপর পাহারাওয়ালাটা বলে—'এই ! চলো থানাতে ;'

'থানাতেই তো যেতে চাচ্ছি আমি।' টুসি কাঁদতে কাঁদতেই জানায়—'আমায় নিয়ে যাও না থানায় ধরে-বেঁধে—এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও না আমাকে।' ভারী করুণ কণ্ঠ ওর।

যদি চুরির দায়ে পড়েও মুক্তির সম্ভাবনা আসন্ন হয় এই লৌহ-শৃঙ্খলের কবল থেকে—টুসি তাতেও রাজি এখন। বেশ প্রসন্নমনেই রাজি।

দেহের সমস্ত বল দিয়ে দুই পাহারাওয়ালার দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন—কিন্তু দারুণ টানাটানিতেও বিন্দুমাত্রও ধসকানো যায় না টুসিকে। একচুলও এদিক ওদিক করতে পারে না ওর।

দু'জনেই থমকে গিয়ে হাঁপাতে থাকে। টুসিও।

'বড়ি জোরসে সাঁটল্ বা ! ই-তো এইসা নিকলবে না !' একজন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়ে !

অন্যজন কপালের ঘাম মোছে—'লোহা তোড়্না লাগি। মিস্তিরি চাহি ভাইয়া !'

অতঃপর দুজনের মধ্যে কি যেন পরামর্শ হয়। কানাকানি ফুরোলে দু'জনেই ওরা মুখ ব্যাজার করে—'ছোড় দে ভাইয়া ! ই-চোরসে হামলোগোঁকো কাম নাহি !'

এই বলে—'স্থানত্যাগেন দুর্জনাৎ' চাণক্যের এই নীতি-বাক্য মেনে নিয়ে সরে পড়ে তারা তৎক্ষণাত।

চোর তো ছেড়েই গেছে, এখন পুলিশেও ছেড়ে চলে গেল, তাহলে পরিত্রাণের ভরসা আর নেই—এতক্ষণে বুঝতে পারে টুসি। কুকুর, পকেটমার, পাহারাওয়ালা একে-একে সবাই ওকে ছেড়ে গেল !

সকলের পরিত্যক্ত হয়ে একা সে দাঁড়িয়ে থাকে নির্জন পার্কের একধারে রেলিং-এর সঙ্গে একাকার হয়ে একটা আলোর দিকে তাকিয়ে—

বাতিটা দপদপ করছে তখন থেকেই—

তার দাদুও বোধহয়...

ভোর হয়ে আসে। দু' একজন করে লোক এসে দেখা দেয় পার্কে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সব আসেন—খবরের কাগজ তাঁদের হাতে।

টুসি ঐ ত্রটস্থ অবস্থাতেই নিজের ঘাড়ের ওপর মাথা রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন।

একজন ভদ্রলোক ব্যাপারটা দেখতে যান—ইশারায় তিনি ডাকেন অপর সবাইকে।

ফিস ফিস করে আলোচনা শুরু হয় তাঁদের—

'সেই ছেলেটিই না? যার নিরুদ্দেশের খবর বেরিয়েছে আজকের কাগজে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এই যে লিখেছে—ছেলেটি শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, দোহারা বলিলে হয়তো কমিয়েই বলা হয়—বরং বেশ হৃষ্টপুষ্টই বলিতে হইবে। যেমন হৃষ্ট, তেমনই পুষ্ট! অদ্য রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময় ডাক্তার ডাকিবার অজুহাতে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি কেহ উক্ত শ্রীমানকে দেখিতে পান, দয়া করিয়া শ্রীমানের খোঁজ দেন, তাহা হইলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। কোনোরকমে একবার ধরিতে পারিলে নগদ পাঁচশত টাকা পুরস্কার।'

'আরো এই যে, এখানেও আবার!—'টুসি ভাই! যেখানেই থাক, ফিরিয়া আইস। আর তোমাকে ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। তোমার দাদু আর মৃত্যুশয্যায় নেই, এখন জীবন্ত-শয্যায়। সুতরাং আর কোন ভয় নেই তোমার। কতো টাকা চাই তোমার, লিখিও। লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।'

'আবার এই যে—পুনশ্চ! 'প্রিয় টুসি, তুমি ফিরিয়া আসিলে ভারী খুশি হইব। এবার তোমার জন্মদিনে তোমাকে একটা টু সীটার কিনিয়া দিব। যেখানে যে-অবস্থায় থাকো, লিখিয়া জানাইও। মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইব। ইতি তোমার দাদু।'

তাঁদের একজন খবর দিতে ছোটেন টুসির দাদুকে। বাকি সবাই টুসিকে ঘিরে আগলাতে থাকেন। কি জানি, যদি পালিয়ে যায় হঠাৎ! জেগে উঠেই টেনে দৌড় মারে যদি! হাওড়া গিয়ে ট্রেনে দৌড় মেরে হাওয়া হয়ে যায়! ও'রা খুব সন্তর্পণেই ওকে ঘিরে দাঁড়ান, ঘুণাক্ষরেও শব্দ হয় না—নিঃশ্বাস-ফেলার শব্দও না!

একজন মন্তব্য করছিলেন—'ঘুমোবার কায়দাটা দেখুন! শোবার জায়গাটিও বেছে নিয়েছে বেশ—ফাঁকা-মাঠে—খোলা-হাওয়ায়—তোফা-আরামে—মজা করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোঁড়ার ফুর্তি দেখুন একবার?'

অমনি আর সবাই তাঁর মুখে চাপা দিয়েছে—'চুপ! চুপ! করছেন কি? জেগে উঠবে যে! জেগে উঠলে পালাতে কতক্ষণ! আমরা কি তখন ধরতে পারবো দৌড়ে? ওর বাবার বাবাই পারেনি যেকালে...!'

'ধরা শক্ত বলেই ত পুরস্কার দিয়েছে ধরবার জন্যে—'কোনরকমে একবার ধরিতে পারিলে'—দেখছেন না?'

টুসির দাদু এসে পড়েন ট্যাক্সিতে।

নাতিকে দেখে তাঁর আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। বলে—'আমি মরছি কলিকের জ্বালায় আর উনি কিনা এখানে এসে মজা করে—আয়েস করে ঘুমোচ্ছেন!'

এক থাপ্পড় কসিয়ে দেন তিনি টুসির গালে।

'আহাহা! মারবেন না, মারবেন না!' সবাই একবাক্যে হাঁ হাঁ হাঁ করে ওঠেন!

'না, মারব না! মারব না বইকি! মশাই, সেই দেড়টার সময় বেরিয়েছে ডাক্তার ডাকতে, দেড়টা গেল, দুটো গেল, আড়াইটা গেল, তিনটেও যায়-যায়! পাত্তাই নেই বাবুর! কলিক উঠে গেল আমার মাথায়! জানেন মশাই, পঞ্চাশ টাকার ট্যাক্সিভাড়া বরবাদ গেছে কাল একরাত্রে আমার? কলিক পেটে নিয়েই সেই রাত্রেই দৌড় কি দৌড়! এ-থানায়, ও-থানায়, সে-থানায় কোন থানাতেই নেই উনি! এ-হাসপাতাল, ও-হাসপাতাল—কোথাও নেই হতাহত হয়ে! হাত-পা কেটে পড়ে থাকলেও ত বাঁচতুম! কিন্তু তাও নেই। কি বিপদ ভাবুন ত। কি করি! গেলুম তখন খবরের-কাগজের আপিসে। সেই রাত্রেই। রাত আর কোথায় তখন, ভোর চারটে! নাইট-এডিটারের হাতে-পায়ে ধরে মেশিন থামিয়ে স্টপ প্রেস করে একমুঠো টাকা গচ্ছা দিয়ে তবে এই বিজ্ঞাপনটা ছাপিয়ে বের করেছি জানেন?'

একখানা আনন্দবাজার পকেটের ভেতর থেকে টানাটানি করে বের করেন তিনি।

'তবেই এই বিজ্ঞাপন বেরোয় আজকের কাগজে! আর আপনি বলছেন কিনা, মারবেন না!' তিনি আরো বেশি অগ্নিশর্মা হন। 'মারবো না? তবে কি আদর করবো নাকি ওই বাঁদরকে?'

চড়ের চাপটেই চটকা ভেঙে গেছল টুসির—কিন্তু সবই ওর কেমন যেন গোল-মাল ঠেকছিল; মাথায় ঢুকছিল না কিচ্ছুই। কিন্তু এখন চোখের সামনেই স্বয়ং দাদু এবং তাঁর বিরাশী সিক্কার একত্র যোগাযোগ দেখে তার ফলাফল অচিরেই কতদূর মারাত্মক হতে পারে, মালুম করতে বিলম্ব হয় না টুসির।

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যায় টুসি—লৌহ-বেষ্টনীর আলিঙ্গন-পাশ থেকে মুক্ত হবার অন্তিম-প্রয়াসে!

আশ্চয্যি! শিকের বগল থেকে সে গলে আসে আপনার থেকেই—অনায়াসেই! চেষ্টা না করতেই একেবারে সুড়ুৎ করে চলে আসে! এক-রাত্রেই চুপসে আধখানা হয়ে এসেছে বেচারা—কাজেই আলগা হয়ে বেরিয়ে আসতে দেরি হয় না তার!

আর, দাদুর ঘুষি টুসির কাছাকাছি পেঁছবার আগেই সে সরেছে। সরেছে উদ্দামগতিতে।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে টুসি পার্কের অন্য পারে! রেলিং টপকাবার আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে, সন্নিহিত আরেকটা শিকের উন্মুক্ত আহ্বান উপেক্ষা করে, এমন কি আরেকটা ছেলেপিলের যাতায়াতের ফাঁকের প্রলোভন সংবরণ করেই টুসি এবার সদর-গেট দিয়েই বেরিয়ে গেছে সটান।

বেরিয়েই ছুট কি ছুট! ডাইনে না, বাঁয়ে না, সোজা বামাপদবাবুর বাড়ির দিকে।

ওর দাদু এদিকে গজগজ করতে থাকেন—'বাবু এখন বাড়ি গেলেন ত গেলেন। না গেলেন ত ও'রই একদিন কি আমারই একদিন।'

একজন এগিয়ে গিয়ে বলতে সাহস করে—'আপনার নাতি যে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল মশাই!'

উনি গর্জন করেন—'নিরুদ্দেশ হয়ে গেল বলেই ত বেঁচে গেল এ-যাত্রা। নইলে কি আর আস্ত থাকত? দেখেছেন ত সেই চড়খানা? সেই নাতিবৃহৎ চড়? তার পরেও কি কোন নাতির—যতই সে বৃহৎ হোক না! উদ্দেশ পাওয়া যেত এতক্ষণ?'

গুম হয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসেন তিনি।

'ও মশাই, পুরস্কার? পুরস্কার?'

দুচারজন দৌড়োয় ও'র পেছনে-পেছনে। ছাড়বার মুখে ট্যাক্সিটা 'ভর-ভরর—ভরর ভরর—র র র র—' ভরাট গলায় এক আওয়াজ ছাড়ে, আর সেই সাথে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে যায় ওদের মুখে।

দাদুর চিকিৎসা সোজা নয়

টুসির দাদুকে ধরেছে এবার এক অদ্ভুত ব্যারামে। এক-আধদিন নয়, প্রায় মাসখানেক থেকে কিছুতেই ঘুম হচ্ছে না ওঁর। কত ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, বৈদ্য, হোমিওপ্যাথ ও হাতুড়ে—নামজাদা আর বদনামজাদা, নানারকমের চিকিৎসা করে করে হন্দ হয়ে গেল—কিন্তু অসুখ-সারার নামটি নেই আর। এই একমাসে এক ডিসপেনসারি ওষুধই গিলে ফেললেন তিনি, কিন্তু অসুখ একেবারে অটল—যেমনকে তেমন।

ঘুম তাঁর হয় না আর। রাত্রে তো নয়ই, দিনের বেলায়, দুপুর কিংবা বিকেলের দিকে—তাও না! ভোরবেলায়, কি সকালে ঘুম ভাঙবার পর, কিংবা রাত্রে খাবারের ডাক আসবার আগে—যেসব অর্ধোদয়যোগে টুসির এবং সব স্বাভাবিক মানুষেরই স্বভাবতই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, প্রগাঢ়নিদ্রা আপনা থেকেই এসে জমে, তিনি আপাদমস্তক চেষ্টা করে দেখেছেন, কিন্তু না, সে-সব মাহেন্দ্রক্ষণেও ঘুম তাঁর পায় না, এমন কি, টুসির পড়ার টেবিলে বসেও দেখেছেন, টুসির পরামর্শমতই, কিন্তু সব প্রাণপণ প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে তাঁর। অবশেষে তিনি সুদীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছেন—

'যখন হাকিমি দাবাই-ই দাবাতে পারলো না, তখন এ রোগ আর—'

বাক্যটার তিনি আর উপসংহার করেননি, নিজেকে দিয়েই তা করতে হবে হয়তো, এইরকমই তাঁর আশঙ্কা।

'ডাক্তারিতেই বা কি হবে? বলে, পুরো একটা ডিসপেনসারিই সরিয়ে ফেললাম—হ্যাঁ!'

'কোথায় সরালে দাদু? কই আমি জানি না তো!' বিস্মিত হয়ে

জিগগেস করে টুসি—দাদুর এবংবিধ কার্যকলাপের সে তো ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি কখনো।

'কোথায় আবার! আমার এই পেটেই—পেটের মধ্যেই!'

'ও, তাই বলো।' পেটের খবর সে টের পাবে কি করে?

'তবুও সারলো না অসুখ!'

দাদুর খেদোক্তিতে টুসির মন কেমন করে। তাই এবার সে নিজেই দাদুর চিকিৎসার ভার নেবে, এইরকমই সে স্থির করেছে। তখন থেকেই সে দস্তুরমতো মাথা ঘামাতে লেগেছে! স্কুলের টাস্ক, মার্বেল খেলা, ঘুড়ি-ওড়ানো, এমন কি সুযোগ পেলেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া ইত্যাদি সব জরুরি কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল ওর দাদুকে ভাল করার কথাই সে ভাবছে এখন। কতকগুলো উপায় মনেও যে আসেনি তার, তা নয়। কোন সম্রাট অসুস্থ ছেলের বিছানার চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে ছেলেকে আরাম করে এনেছিলেন —সেই ঐতিহাসিক চিকিৎসা-পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? অসুখ সারাবার এইটেই তো সবচেয়ে সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়, তার মনে হতে থাকে। এক্ষুনি—আজ রাত্রেই বা যে-কোনো সময়ে দাদু খানিকক্ষণের জন্যে একটু চোখ বুজোলেই এই চিকিৎসা শুরু করে দিতে পারে—

কিন্তু দাদু যে চোখই বোজেয় না ছাই! এক মিনিটের জন্যেও না।

তখন মরীয়া হয়ে আর কোনো উপায় না দেখে সে সজাগ দাদামশায়ের চারদিকেই প্রদক্ষিণ লাগিয়ে দেয়, কিন্তু দাদুর চোখও ঘুরতে থাকে তার সাথে সাথে।

'এই! এই! ওকি হচ্ছে? ঘুরণি লেগে পড়ে যাবি যে—আমার ঘাড়েই পড়বি ঘুরে। থাম থাম।'

বাধা পেয়ে সে বসে পড়ে লজ্জিত হয়ে—থামের মতই বসে যায়। ঘুরপাকের রহস্য দাদুকে জানাবার তার আর উৎসাহ হয় না। কে জানে, কি ভাববে দাদু?

আচ্ছা, সেই রেলিং চিকিৎসাটা কেমন? হঠাৎ তার মনে পড়ে এখন। এক গভীর রাত্রে দাদুর জন্যে ডাক্তার ডাকতে বেরিয়ে বেরসিক এক কুকুরের পাল্লায় পড়ে হন্তদন্ত হয়ে পার্ক ভেদ করে যাবার মুখে রেলিংয়ের ফাঁকে আটকে গেছল সে—না পারে রেলিংকে বাড়াতে, না পারে নিজেকে ছাড়াতে। কিন্তু সেই অবস্থায় সটান দাঁড়িয়ে—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কি তোফা ঘুমটাই না দিয়েছিলো সে! তেমন ঘুম তার আর কোনদিনই হয়নি। কখন কোন ফাঁকে যে ভোর হয়েছে, টেরই পায়নি টুসি, কিন্তু—

হতাশভাবে সে ঘাড় নাড়ে! নাঃ, এ-চিকিৎসার রাজি করানো যাবে না দাদুকে! দাঁড়াবার জন্যে ততটা নয়, কেন না, বলতে গেলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই আমরা ঘুমুই, যদিও সে হচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে দাঁড়ানো, কিন্তু

টুসি ভেবে দেখে, রেলিং-এর কবলে ঐভাবে আটকে থাকাটা একবারেই পছন্দ করবেন না দাদামশাই। ওর নিজেরই তো পছন্দ হয়নি প্রথমটায়।

তবে? আর কি কোন উপায় নেই? ভয়ানকভাবে ভাবতে থাকে টুসি। ডাক্তারেরা হাল ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু সে তো ছাড়তে পারে না—যেহেতু দাদুর যা-হাল, তাতে হাল ছেড়ে দেওয়া মানে—দাদুকেই ছেড়ে দেওয়া। দাদুকে ছাড়ার কথা মনে হলেই দেদার কান্না পেতে থাকে।

'আচ্ছা দাদু, এক কাজ করলে হয় না—?'

'কি কাজ?'

আমতা আমতা করে কোনরকমে বলে ফেলে টুসি—নতুন একটা বুদ্ধি খেলেছে ওর মাথায়—'সেই যে একরাত্তিরে তোমার কলিকের জন্যে ডাক্তার ডাকতে বেরিয়েছিলাম, রাস্তায় দেখেছিলাম কি, বড়ো রাস্তাতেই দেখেছিলাম, ফুটপাথের ওপর, সারা ফুটপাথ জুড়ে কতো লোক যে শুয়ে আছে, একফুট পথও বাদ রাখেনি। আর তারা শুয়ে আছে দিব্যি আরামে, বালিশের বদলে মাথায় কেবল একখানা করে ইঁট দিয়ে। অক্লেশে ঘুম দিচ্ছে—খাসা ঘুমোচ্ছে তারা—কুকুর-ফুকুর কারু কোনো তোয়াক্কা না করেই—'

'ফুটপাথে গিয়ে আমি শুতে পারবো না বাপু! তা তুমি যাই বলো! তা চাই আমার ঘুম হোক, আর নাই হোক—'

'না-না ফুটপাথে কেন, আমার মনে হয় কি জানো দাদু ফুটপাথ নয়, ঐ ইঁটের সাথেই ঘুমের কোন যোগাযোগ আছে। একটা শক্ত জিনিসে মাথা রাখলে ঘুম না হয়েই পারে না—জানো দাদু, ইস্কুলের ডেস্কওয়ালা বেঞ্চে বসে বইয়ের গাদায় মাথা রেখে ছেলেরা কেমন তোফা ঘুমোয়—মাস্টার ক্লাসে এলেও টের পায় না। তখনো তাদের নাক ডাকতে থাকে, মাস্টারের হাঁক-ডাকেও ঘুম ভাঙে না। জানো?'

দাদু ভুরু কুঁচকে ব্যবস্থা-পত্রটা ভেবে দেখেন।

টুসি উৎসাহ পায়—'বুঝেছ দাদু, ঐ বালিশের জন্যেই ঘুম হচ্ছে না তোমার! যা নরম! যখন আমার মাথার তলায় বালিশ থাকে না, চৌকির তলায় চলে যায়, তখনই আমি দেখছি—আমার ঘুম সব চেয়ে ঘন হয়ে ওঠে—বুঝেছো দাদু!'

'যা তবে, নিয়ায় ইঁট!' ঢালাও হুকুম দিয়ে দেন ওর দাদু। 'রাস্তার থেকেই আনবি তো? ভাল দেখে আনিস কিন্তু। দেখে-শুনে ভাল করে বাজিয়ে—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখে—বুঝলি? হ্যাঃ, রাস্তার ইঁট আবার ভাল হবে! কিন্তু কি আর করা, উপায় তো নেই!'

'মনোহারি দোকানে তো কিনতে পাওয়া যায় না ইঁট।' টুসির অনুযোগ।

'তবে যা, তাই নিয়ে আয়গে—সাবান দিয়ে সাফ করে নিলেই হবে। যা।'

বলতে না বলতেই দৌড়ায় টুসি। একখানা আঠারো ইঞ্চি, একটুকরো

কার্বলিক-সোপ আর তিনখানা চন্দন-সাবান আর পামোলিভ নিয়ে আসে সেই সঙ্গে। প্রথমে কার্বলিকটা দিয়ে ইটের যত জীবাণু-ছাড়ানো, তারপরে পামোলিভ ঘসে ঘসে কার্বলিকের গন্ধ-তাড়ানো! সবশেষে চন্দন মাখিয়ে সুরভিত করা। তার সৌরভ বাড়ানো।

'দেখছো দাদু! সাবান-টাবান মাখিয়ে কিরকম করে ফেলেছি ইটখানাকে!'

দাদু শুঁকে দেখেন একবার—'হুম! বেশ উপাদেয়ই হয়েছে বটে।'

রাজভোগ্য ইট-মাথায় সারারাত কেটে যায় দাদুর—কিন্তু ঘুমোবার ভাগ্য আর হয় না। একপলের জন্যেও চোখের পলক পড়ে না তাঁর।

সকালে উঠেই তাঁর গজগজানি শুনতে হয় টুসিকে—'হ্যাঃ, ইট না ছাই! ইট মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে সবাই! দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে তারা! কি দেখতে কি দেখছেন, তার নেই ঠিক। মাঝখানে থেকে আমার - উঃ! সেই তখন থেকেই মাথাটা টাটিয়ে আছে!' বলে মাথার বদলে ঘাড়েই হাত বুলোতে থাকেন তিনি।

'উঃ কী মাথাটাই না ধরেছে!···ক্যাফিয়াস্পিরিন? ক্যাফিয়াস্পিরিনে কি হবে আমার? ক্যাফিয়াস্পিরিন কে কিনে আনতে বললো তোকে? একি তোর সেই আধকপালে? বলছেন—মাথা ধরেছে? সমস্ত মাথাটাই—এই ঘাড়ের এখান থেকে ও-ঘাড় পর্যন্ত। ক্যাফিয়াস্পিরিনে কি করবে এর? ঘাড় ধরা কি সারে ওতে? অ্যাস্পিরিন-ট্যাস্পিরিনের কম্মো নয় বাপু!'

'ঘাড়ের দুধারই ধরে গেছে তোমার, বলছো কি দাদু'?

'ধরবে না? ইটখানা কি একটুখানি?' দাদু ঘাড় নাড়েন।

'আমূল-মস্তকের সর্বত্রই ধরেছে, কিন্তু যার ধরবার কথা ছিল—নিদ্রাদেবী, যদি-বা তিনি আসতেন, কিন্তু ইটের বহর দেখে ত্রিসীমানার মধ্যেও আর ঘেঁস দ্যাননি তিনি'—ইত্যাকার নিজের মতামত প্রবলভাবে ব্যক্ত করতে থাকেন ওর দাদু!

টুসি? টুসি আর কি করবে? চুপ করে শুনতে থাকে। ইটের অপরাধ অম্লানবদনে নিজের ঘাড় পেতেই নেয় সে।

কয়েকদিন পরে একরাত্রে দাদু অনিদ্রার আতিশয্যে ছটফট করছেন, পাশের বিছানায় শুয়ে ওর নিজের চোখেও ঘুম নেই—ভয়ে-ভয়ে একটা কথা বলে ফেলে টুসি—

'আচ্ছা দাদা তুমি উপক্রমণিকা পড়ে দেখেছো কখনো? সত্যি—সমসকৃত পড়তে বসলেই এমন ঘুম পায়, অ্যাতো ঘুম পায় আমার, যে কী বলবো!'

কথাটা মনে ধরে ওর দাদুর। টুসির দিদিমা বই হাতে নিয়ে দিবানিদ্রা শুরু করতেন, স্মরণ হয় ওঁর। প্রত্যহই প্রথম পাতা থেকে হরিদাসের গুপ্তকথা তাঁর আরম্ভ হতো, কিন্তু কোনোদিনই আড়াই পাতার বেশি এগুতে পারতো

না ; বলতেন—'আঃ কী ঘুমটাই না আছে ঐ বইটাতে!' অবশেষে গুপ্তকথা অজ্ঞাত রেখেই একদা ও'কেই ভবলীলা সাঙ্গ করতে হয়েছে, কোন এক গুপ্ততর জগতে চলে যেতে হয়েছে. ভেবে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে দাদুর চোখ। একদিন বইখানা খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেদিন দুপুরে, কী আশ্চর্য্য, ঘুম তো হলোই না বৌয়ের, উপরন্তু তার বদলে তাঁর সঙ্গে বকাবকি করে অম্বল হয়ে গেল।

'যা, নিয়ায় তো! উপক্রমণিকাকেই দেখবো আজ।'

টুসি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ওর দাদু মাথার কাছে আলো জেবলে উল্টে যাচ্ছেন পাতার পর পাতা—উপক্রমণিকাও শেষ আর রাতও কাবার! বাস্তবিক. কী চমৎকার বই এই উপক্রমণিকা, ঘুম না হোক, দুঃখ নেই কিন্তু কী ভালই লেগেছে যে দাদুর! সন্ধি-বিধি ও ষত্ব-ণত্বের অনুক্রম থেকে শুরু করে-দ্বন্দ্ব ও মধ্যপদলোপী আর যাবতীয় সমাসকে অবহেলায় অতিক্রম করে, নরঃ-নরৌ-নরাঃ এবং লট-লোট-লঙ্-বিধিলিঙের ব্যূহভেদ করে বীরবিক্রমে এগিয়েছেন তিনি, ভূদাদি ধাতু থেকে তদ্ধিতপ্রত্যয় পর্যন্ত পার হয়ে গেছে তাঁর, সহজেই হয়ে গেছে ; ণিজন্ত-প্রকরণ ও পরস্মৈপদীর ব্যাপারটাও বেশ হাড়ে-হাড়েই বুঝেছেন, অবশেষে কর্মবাচ্য ও কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে ঠেকেছেন এ ন। আগাগোড়া সবই তিনি পড়েছেন সাগ্রহে। পড়েছেন আর ভেবেছেন। ভেবেছেন আর অবাক হয়েছেন। কত সত্য, কত তত্ত্ব, কত রহস্য, কী গভীরত্বের পরিচয়ই না নিহিত আছে ওর পাতায় পাতায়? ওর বিধি-বিধানে জীবনের কত জটিল সমস্যার সমাধানই না খুঁজে পেলেন। বাস্তবিক, ওকে ব্যাকরণ না বলে ব্যাকরণদর্শনই বলা চলে, এর জন্যে যদি ষড়দর্শনের তালিকায় আরেকটা সংখ্যা বাড়াতে হয়—বাড়িয়ে সপ্তম দ্রষ্টব্যেরও আমদানি করতে হয়-তবুও। আহা! অবহেলা না করে ছেলেবেলায় এই সদগ্রন্থ মন দিয়ে পড়তেন যদি!—

তাহলে কী যে হতো আজ, তা অবিশ্যি তিনি আন্দাজ করতে পারেন না। সকালে উঠে টুসি, দাদুকে নিদ্রিত না দেখুক, কিন্তু খুশি দেখেছে। পুলকিত না দেখতে পাক, অন্তত তিতবিরক্ত দেখতে হয়নি।

উপক্রমণিকা মুখস্ত করেও যখন বিনিদ্রার ব্যতিক্রম দেখা গেল না, তখন অন্য প্রস্তাব পাড়ে টুসি। খেলাধুলো করলে কেমন হয়? ফুটবল কি টেনিস বা ঐরকমের একটাকিছু? ফুটবল খেলে ফিরলে কেমন গা ঝিম ঝিম করে। আপনার থেকেই চোখের পাতা জড়িয়ে আসে টুসির। সেইজন্যেই তো সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে বসেই সেই যে সে চেতনা হারায়, রাত্রে খাবার সময় অমন ষাঁড়ের ডাকাডাকিতেও সহজে তার সাড়া মেলে না।

'মাঠে গিয়ে তোমার মতো বল পিটতে পারবো না বাপু! ওসব গোঁয়ারদের খ্যালা। যতোসব গুণ্ডারাই খ্যালে! তারপর ল্যাং মেরে ফেলে

দিক আমায়। ফেলে আমার ঠ্যাং ভেঙে দিক আর কি!' দাদু মুখ বেঁকান।

'মাঠে কেন, ছাদে? আমাদের বাড়ির ছাদেই তো।' টুসি তাঁকে আশ্বস্ত করে। আর কেউ না, কেবল তুমি আর আমি।'

'হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে! কিন্তু দ্যাখো বাপু, কেয়ারি করতে পাবে না, ফাউল-টাউল করা চলবে না তা বলে। আর—'দাদু শেষপর্যন্ত খোলসা করেই কন—'আর আমাকেও কিন্তু বল মারতে দিতে হবে—মাঝে-মাঝেই।'

'বাঃ, তুমিই তো মারবে! তোমারই তো দরকার একসারসাইজের।' টুসি বিশদ করে দেয়—'ভয় নেই, আমি একলা-একলা খেলবো না।'

'আমিও গোল দেবো কিন্তু! আমাকেও গোল মারতে দিতে হবে! হ্যাঁ!'

'বেশ তো, তুমিই খালি গোল দিয়ো। আমি একটাও গোল দেবো না তোমায়।' গোড়াতেই অভয় দিয়ে টুসি গোলযোগ থামায়।

তারপরে পাড়ার এক টেনিসক্লাব থেকে বহু ব্যবহৃত ও বহিষ্কৃত একটা ডিউস বল যোগাড় করে হাজির হয় টুসি।

'অ্যাঁ! এত ছোট?'; দাদু অবাক হন—'ফুটবল এত ছোট কেনরে?'

'ফুটবল না তো।' টুসি জানায়, 'ছাদে কি অত বড়ো ফুটবল চলে কখনো? আমার এক শুটে তাহলে তো কোথায় উড়ে যাবে, তার ঠিক নেই। তাই টেনিসের বল নিয়ে এলাম। টেনিসই বা মন্দ কি দাদু?'

'তা মন্দ কি!' তিনিও সায় দেন—'তবে টেনিসই হোক, ক্ষতি কি তাতে?' ফুটবল-সম্পর্কে ব্যাটবল, ব্যাটবল আর টেনিস, টেনিস আর ক্রিকেট, ক্রিকেট আর হকি— তাদের তারতম্য আর বিশেষত্ব কেবল নামমাত্র নয়, ভালোভাবেই দাদুর জানা; ওদের ভেদাভেদের সব খবর—তাবৎ রহস্য—কিছুই তাঁর অবিদিত নেই আর।

তারপর থেকে দুপদাপ, ধুপধাপ—পাড়ার লোক সচকিত হতে থাকে প্রত্যহ। বাড়িওয়ালা এসে বলেন—'ছাদ ভেঙে ফেলবেন দেখছি। কি হয় আপনাদের—ফুটবল খেলা?'

'ফুটবল? না তো।' দাদুর চোখ কপালে ওঠে—'ফুটবল! রামোঃ! ফুটবল আবার খ্যালে মানুষে? ওতো গোঁয়ারদের খ্যালা মশাই! আমরা টেনিস খেলি। আসবেন, আপনিও আসবেন—তিনজনেই খ্যালা যাবে নাহয়।'

বাড়িওয়ালাকে আমন্ত্রণ করে তো বসেন, কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে একটা থেকেই যায় তাঁর। আপনমনেই বলেন তিনি—'আসবেন তো খেলতে, তবে টুসির সঙ্গে পেরে উঠলে হয়! আমি যে আমি—আমাকেই গলদঘর্ম করে দিচ্ছে!'

বাড়িওয়ালা আসেন বিকেলে, ঈষৎ আপ্যায়িত হাসিমুখ নিয়েই – 'হ্যাঁ!

বাড়ির ছাদ আমার বেশ বড়োই, টেনিস খ্যালা যায় বটে। তবে আপনারাই খেলুন, আমি দেখি। এই স্থূলদেহ নিয়ে এ-বয়সে আর ঐসব খ্যালাধুলোর হুলস্থুল আমার পোষায় না মশাই!'

টেনিসের বল পড়ে ছাদে। বলটাকে রাখা হয় সেন্টারে - নাতি আর দাদু দু'জনেই মুখোমুখি হন—নাতিবৃহৎ কুরুক্ষেত্রের সম্মুখে।

'নেট কই মশাই—নেট?' বাড়িওয়ালা একটু বিস্মিতই।

'নেট? নেট আবার কি? নেট কেন? নেটে কি হবে? কিসের নেট?' দাদুও কম বিস্মিত নন।

'কেন, টেনিস নেট?' বাড়িওয়ালা বলেন। 'বলই তো দেখছি কেবল—তাও তো কুল্লে একটাই। র‍্যাকেটই বা কোথায়?'

ততক্ষণে খেলা শুরু হয়ে যায় ওঁদের। খেলতে-খেলতেই বলেন দাদু—বলের সঙ্গেই তাঁর গলা চলে—'ও, ব্যাটের কথা বলছেন? আমাদের তো এ ব্যাটবল-খেলা নয় মশাই! ভুল করছেন আপনি—খ্যালার কোনো খবর তো রাখেন না! আর কি করেই বা রাখবেন—এসব খ্যালাধুলো তো আর ছিল না আমাদের কালে! তাই এসব খ্যালার নাম-ধাম জানার কথাও নয় আপনার। আরে মশাই—আমরা টেনিস খেলছি যে। ওই যাঃ! দেখুন তো—গোল দিয়ে দিলে—বকতে বকতে সামলাই বা কখন—ছাই!'

আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে গোলের মুখে গিয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়ান তিনি। দুড়দাড় করে বল পিটিয়ে আনছে টুসি, কোন ফাঁকে যে গোল দিয়ে বসে—কিসের ফাঁকতালে যে ফের আবার গোলযোগ ঘটায়, ঠিক নেই কিছু। তর্ক মাথায় রেখে এখন সতর্ক হয়ে থাকতে হয় তাঁকে।

বাড়িওয়ালা চটেই যান, তাঁর নিজের বাড়ির ওপর একটা বাড়াবাড়ি তাঁর বরদাস্ত হয় না। বাড়ির মায়ার জন্যে ততটা নয়; যেরকম খেলার দাপট, তাতে এর ইহকাল, পরকাল—সমস্তই ঝরঝরে! এবাড়ির ভবিষ্যতের আশা তিনি ছেড়েই দিয়েছেন—খেলোয়াড়দের স-বলতার জন্যই ছাড়তে হয়েছে; কিন্তু তাহলেও টেনিস-বলের প্রতি ফুটবলের ন্যায় এই দুর্ব্যবহার তাঁর সহ্য হয় না—এইটেই সবচেয়ে তাঁর প্রাণে লাগে। বিশেষরকম ব্যথা দেয়।

ঘুম না হোক, খেলার ফল অবিশ্যি একটা দেখা যায়—সেটাকে হয়তো সুফলই বলা যেতে পারে।

টুসির দাদু আর অভিযোগ করেন না, নিদ্রাহানির জন্যে কোন ক্ষোভের বাণী তাঁর মুখে শোনা যায় না আর।—'নাই হোকগে—ঘুম না হয় নাই হোলো, না হোলো তো বয়েই গ্যালো আমার! ঘুমের দরকারটাই বা কি? ঘুমিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে? দূরদূর—ঘুমোয় আবার মানুষ! যতো গরু, ভ্যাড়া, ছাগল, গাধারাই খালি ঘুমিয়ে সময় বাজে নষ্ট করে।' এবংবিধ সব বাক্যই বরং তাঁর মুখে এখন।

আজকাল সকাল থেকেই শুরু হয় তাঁর উপক্রমণিকা-পাঠ, এরকম নিত্য-ক্রিয়ার মধ্যে ; আর বিকেলে টুসি ইস্কুল থেকে ফিরলে পরে টেনিস-পর্ব—সেটাকে নৃত্য ক্রীড়া বলা যেতে পারে। আর রাত্রে ? সারারাত তাঁর চোখে ঘুম ত নেইই, টুসিরও ঘুমের দফা রফা।

কোন গোলটা তাঁকে নিতান্ত অন্যায় করে দেওয়া হয়েছে, কোনটাকে আর একটু হলেই নির্ঘাৎ বাঁচানো গিয়েছিল, কোন গোলটার পায়ের ফাঁকের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়ার অপরাধ কিছুতেই তিনি মার্জনা করতে পারেন না, এমনি না জানিয়ে সুড়ুৎ করে চলে গেল যে হঠাৎ! কোন অবশ্যম্ভাবী গোলকে তিনি অকস্মাৎ দু'পা জুড়ে দিয়ে গলে যেতে দেননি, সোজাসুজি গোল দেবার কি-কি নতুন কায়দা তিনি আবিষ্কার করেছেন, কোনটাকে তিনি কৃপা করে ছেড়ে দিয়েছেন—বলের প্রতি নয়, টুসির প্রতি কৃপাবশেই, কোন গোলটা তিনি নিজেই, হ্যাঁ, তিনি নিজেই ত—আর একটু হলেই প্রায় দিয়ে ফেলেছিলেন আর কি—বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সেইসব কূটকচালে আলোচনায় টুসিকে যোগ দিতে হয় তাঁর সঙ্গে।

'আচ্ছা ফুটবলেও ত গোল দ্যায় বলে শোনা যায় ? দ্যায় না ? টেনিসেও দ্যায়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ফুটবলের গোলে আর টেনিসবলের গোলে তাহলে প্রভেদ কোথায় ?' দুটোর আকারে আর ওজনে তফাৎ আছে অবশ্যি, তা ঠিক! যদিও দুটোই গোলাকার, তাহলেও ভারি গোলমাল ঠেকে ওর দাদুর। দুটো খেলাতেই যখন গোল দেবার প্রথা এক, কোন প্রকারভেদ নেই, তখন আলাদা নামকরণ কেন ? বলের আকার-ভেদের জন্যেই কি তাহলে ?'

দাদুর জিজ্ঞাসুতার কি জবাব দেবে টুসি ? শুনতে শুনতে নাজেহাল হয়ে পড়ে সে।

প্রহরের পর প্রহর চলে যায়—অফুরন্ত বাক্যালাপ আর ফুরোয় না। হঠাৎ ওর দাদু মোড় ঘোরেন—'তদ্ধিত-প্রত্যয় জানিস ? জানিস কি ? জানিস! আচ্ছা, বল ত তাহলে—লকারার্থ-নির্ণয় কাকে বলে ?'

খেলার ঠেলা তবুও ভাল উপক্রমণিকার উপক্রমেই গলা শুকিয়ে আসে টুসির। ক্ষীণস্বরে সে জানায়—'উঁহু !' এ বিষয়ে তার নিজের প্রতি একটুও প্রত্যয় আছে বলে মনে হয় না।

'বটবৃক্ষ সন্ধিবিচ্ছেদ করত। করতে পারিস ?' খেলার থেকে এখন ব্যাকরণে নেমেছেন ওর দাদু! 'দেখেছিস করে ?'

ভাল করেই দেখে টুসি। বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা—গুঁড়ির থেকে শুরু করে যায় গাছের ডগা অব্দি, পাতার থেকে মাথা পর্যন্ত কোথাও বাদ রাখে না, কিন্তু কোথাও কোন বিচ্ছেদের আভাসমাত্রও তার নজরে পড়ে না।

'পারলিনে ত? বট ছিল বৃক্ষ, হলো গিয়ে বটবৃক্ষ—দেখলি?'

ওর দাদু জোর দিয়েই জানাতে চান যে, এটা হলো গিয়ে স্বরসন্ধি এবং নিশ্চয়ই এর কোন ভুল নেই—কিন্তু মানতে কিছুতেই রাজি হয় না টুসি। অদৃশ্য সন্ধিতে সে ঘোরতর অবিশ্বাসী। ওর মতে—যদি হতেই হয়, তবে নিছক এটা দাদুর একটা অভিসন্ধি কেবল।

সেও পাল্টা প্রশ্ন করে বসে দাদুকে—'আচ্ছা, Buchanan সন্ধিবিচ্ছেদ কর ত তুমি!'

'বুচানন? এ আর এমন শক্তটা কি? বুচা ছিল আনন, হলো গিয়ে বুচানন—যেমন পঞ্চানন আর কি! আবার সমাসও হয়—বুচা আনন যাহার, সেই বুচানন; কিন্তু কি সমাস, কে জানে!' দ্বন্দ্ব না বহুব্রীহি? ওঁর নিজেরই কেমন খটকা লাগে। মধ্যপদলোপী কর্মধারও হতে পারে বা।' সমাস-প্রকরণটায় এখন উনি তেমন পাকা হতে পারেননি, অকাল-পক্ব এখন—টুসির মতই! ভাল করে পোক্ত হতে কমাস লাগে, কে জানে!

হঠাৎ ওঁর প্রাণে সন্দেহ জাগে—'আমাদের পাড়ার সেই ফিরিঙ্গিটা নয়ত রে? বুচানন সাহেব? সাবধান, ওর সঙ্গে যেন কোন সন্ধি বাধাতে যাস না। মারখুনে মানুষ—কাণ্ডজ্ঞানহীন—কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই কো।'

নাতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি সাবধান করে দেন।

'আচ্ছা উপসর্গ কয় প্রকার বল ত দেখি?'

পর-পর তিনবার একটা বেজে গেছে ঘড়িতে—সাড়ে-বারোটার, একটার এবং দেড়টার ঘন্টা—সেও হয়ে গেল কতোক্ষণ! ঘুমে সারাদেহ জড়িয়ে আসছে টুসির—এখন উপসর্গে কেন—সোজা স্বর্গে যেতে বললেও সে রাজি নয়, শক্তিও নেই তার।

'আচ্ছা, আমি বলে যাচ্ছি, তুই গুণে যা। প্র, পরা অপ, সং—'

ঘুমের ঘোরেই শুনতে থাকে টুসি। ক'টা হলো উপসর্গ সবশুদ্ধু? দশটা না না দু'শোটা? ওর নিজেকে নিয়ে? দাদুকে ধরে, না বাদ দিয়ে? আর বুচানন? সেও তো দেখতে অনেকটা সঙের মতোই! সঙ ও তো একটা উপসর্গ? বুচানন তাহলে উপসর্গ। আর বটবৃক্ষ? বটগাছের তদ্ধিত হয়? বুচাননের?—

'—উৎ পরি, প্রতি, অভি, অতি, উপ, আ! কিরে? গুণলি? কটা হলো? আরে মোলো যা, এ যে নাক ডাকাতে লেগেছে!'

দেখতে না দেখতে আরেক উপসর্গ দেখা দিয়েছে টুসির। নাঃ, ভারী ঘুম কাতুরে হয়েছে ছেলেটা! এই কথা বলছে—বলতে—বলতে—এই ঘুম? দিনরাতই ঘুমুচ্ছে! আশ্চর্য্য! ঘুমিয়ে কি সুখ পায় এরা? ঘুমিয়ে হয়টা কি, অ্যাঁ? নাক-ডাকানো নাহক সময়ের অপব্যয়! নাঃ ঘুমিয়েই ফতুর—

— মানুষ আর হলো না ছোঁড়াটা। কড়িকাঠের দিকে অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে থাকে দাদুর।

সকালে টেবিলে বসে মলিনমুখে দৈনিক কাগজের পাতা ওলটায় টুসি। এত বড়ো আনন্দবাজার সামনে, তবু সে নিরানন্দ। দাদুর অসুখ সারাতে গিয়ে নিজের সুখও তার গেছে। হঠাৎ বিজ্ঞাপনের এক জায়গায় তার চোখ গিয়ে আটকায়—'স্বামীজীর অদ্ভুত যোগবল!' পড়ে উৎফুল্ল হয়ে দাদুকে লুকিয়ে সেই ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে ছেড়ে দেয় তক্ষুনি।

পরদিন প্রাতঃকালেই নধর-দর্শন স্বামীজীর প্রাদুর্ভাব হয় তাদের বাড়িতে।

'কি চাই আপনার?'

'জয়োস্তু! আপনার দৌহিত্রের আহ্বানেই আসা। তার পত্রে আনুপূর্বিক সমস্তই প্রণিধান করেছি। অত না লিখলেও হতো—যোগবলেই জানতাম সব।'

'কি? হয়েছে কি?' দাদু একটু ভীতই হন।

'আপনার দুঃসাধ্য ব্যাধি—তবে ও আমি সারিয়ে দেবো। যোগবলে সবই সম্ভব। শুধু যোগবলেই সম্ভব।'

'কিছু তো বুঝতে পারছি না মশাই!' থতমত খান উনি।

'সন্ত্রস্ত হবেন না'। তখন স্বামীজীই সমস্ত বুঝিয়ে দেন সাবলীল ব্যাখ্যায় —এই যে নিদ্রাহীনতা, এ সামান্য ব্যাধি নয়, আশু না সারালে এতেই গতাসু হবার ধাক্কা! যোগের দ্বারাও নিদ্রা আনানো যায়, যাকে বলে যোগনিদ্রা, নিদ্রাযোগের সঙ্গে অবশ্যই তার অগাধ পার্থক্য; যোগবলে মানুষকে এমন কি, চিরনিদ্রায় পর্যন্ত অভিভূত করে দেওয়া যায়, যদিচ বলযোগেও সেটা সম্ভব, কিন্তু দুইয়ের ফারাক বহুৎ। উনি ইচ্ছা করলে টুসির দাদুকে এই মুহূর্তেই নিদ্রালু করে দিতে পারেন।

কিন্তু সন্ত্রস্ত হতেই হলো ওঁকে—'কি আলু?' আলুর পরিণতির ভয়াবহ আশঙ্কায় তাঁর চোখ-মুখ তখন বেগুনের মত নীল হয়ে গেছে।

'নিদ্রালু। এক্ষুণি হঠযোগের সাহায্যে আপনার ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি আমি।' সহজ করে বলেন স্বামীজী।

'কি যোগ বললেন?'

'হঠযোগ।'

'ওতে কিসসু হবে না।' হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন টুসির দাদু। 'ইটযোগ করে দেখা হয়েছে মশাই, কিসসু হয়নি।'

ইটযোগ বলতে স্বামীজী কি প্রণিধান করলেন, স্বামীজীই জানেন, কিন্তু তারপরই তিনি ইটযোগ আর হঠযোগের পার্থক্য, প্রথমোক্তের চেয়ে শেষোক্তের শ্রেষ্ঠতা, যোগের পরম্পরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বোঝাতে অগ্রসর হন। টুসির দাদুর প্রথমে সংশয়, তারপরে সন্দেহ, তারপরে একটা বিজাতীয় রাগ হতে

থাকে। অবশেষে স্বামীজী যখন টাকাকড়ির প্রস্তাবে আসেন, যোগ থেকে একেবারে বিয়োগের ব্যাপারে—হঠযোগের ক্রিয়াকলাপে কি কি এবং কত কত খরচ তখন আত্মসংবরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

'কী? জোচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? বোকা পেয়ে ঠকাতে এসেছ আমায়? বটে?' বোমার মতন ফাটেন তিনি—'নিয়ায় তো টুসি, সেই ইটখানা! ইটযোগ কাকে বলে, একবার বুঝিয়ে দিই লোকটাকে।'

'অপমান-সূচক কথা বলবেন না বলছি!' স্বামীজীও চটে যান।—'তাহলে আমি রাগান্বিত হয়ে এই মুহূর্তেই হয়তো আপনাকে ভস—'

ভস্মীভূত করার আগেই ফস করে তাঁকে থামতে হয় হঠাৎ। সেই মুহূর্তে টুসি হস্তে ইটের প্রবেশ ঘটে।

'আহা ক্রোধ-পরবশ হচ্ছেন কেন! ক্রোধ-পরবশ—' বলতে বলতে কয়েক-পা পিছিয়ে যান স্বামীজী এবং পরমুহূর্তেই সুপরিকল্পিত এক পশ্চাৎ লাফে অদৃশ্য হন, বোধকরি যোগবলেই।

টুসির দাদু শুধু বলেন —'ছ্যাঃ!'

ঐ অব্যয়-শব্দে টুসির কি প্রণিধান হয় কে জানে; সে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে থাকে।

ওর বিষণ্ণ-মুখ দেখে মায়া হয় দাদুর!—'যাক, তাতে আর কি হয়েছে? তুই তো ভালই চেয়েছিলি—যাকগে, ভালই হয়েছে। পরশু আছে শিবরাত্রি। ছোটবেলা থেকে ভেবে আসছি যে, শিবরাত্রি করবো; কিন্তু করা আর হয় না! হয় খেয়ে ফেলি, নয় ঘুমিয়ে পড়ি। এবার তো আর ঘুমোনোর ভয় নেই, কেবল খাওয়াটা বাদ দিতে পারলেই হয়। তাহলেই হলো। পুণ্যটা করে ফেলা যাক এই ফাঁকে। কি বলিস?'

টুসি এতক্ষণে খুশি হয়—'আমিও দাদু করবো তাহলে!'

তখন দু'জনে মিলে প্ল্যান আঁটেন—না-খাওয়ার, না-ঘুমোনোর প্ল্যান। দীর্ঘ এক ফিরিস্তি বেরোয়—কখন কি কি না করতে হবে তার। টুসি কি না-খেয়ে থাকতে পারবে, বিশেষ করে না-ঘুমিয়ে? যা ঘুম পায় ওর। আর যেমন বিটকেল খিদে। দিনরাত খালি খাই-খাই। আর—সারাদিন না হয় টেনিস খেলেই গেল, কিন্তু রাত্রে? রাত্রে টেনিস-খেলা তো সম্ভব নয়, আর রাত্রে তো ঘুম পাবেই টুসির। এবিষয়ে টুসির দাদুর বিশ্বাস সুদৃঢ়; টুসির নিজেরও যে একেবারে সন্দেহ নেই, তা নয়।

টুসি প্রস্তাব করে—সারারাত সিনেমা দেখা যাক না কেন? তাহলে কিছুতেই ওর ঘুম পাবে না, শিবের দিব্যি গেলে সে বলতে পারে। কত ভাল-ভাল বাংলা বই আর বিলিতি সিরীয়াল—হোলনাইট শো রয়েছে সব হাউসেই।

বায়স্কোপে দাদুকে রাজি করাতে বেশি বেগ পায় না সে। আর তখন থেকেই লাফানো শুরু হয়ে যায় তার।

শিবরাত্রির সকাল থেকেই উপবাস শুরু হয় টুসির। প্রথমে রাস্তায় বেরিয়েই এক বন্ধুর আমন্ত্রণে রেস্তোঁরায় বসে অন্যমনস্কতার বশে এককাপ চা একখানা মামলেট ; তারপরে ঘণ্টা-দুয়েক বাদ আর এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে মনের ভুলে ফের চিনেবাদাম আর ডালমুটের সদ্ব্যবহার ; তারপরে আরেকজনার খর্পরে পড়ে আবার শোন পাপড়ি আর চন্দ্রপুলি, সেও অবিশ্যি ভুলক্রমেই ; তারপরে বিকেলে যোগেশদার আহ্বানে অনিচ্ছাসত্ত্বেই একপ্লেট মটনকারি আর খানকয়েক টোস্ট তারপর সন্ধের মুখে ওদের ক্লাসের সেকেণ্ড বয় সমীরের বাড়ি হানা দিয়ে এবং সে না সাধতেই—তাকে সতর্কতার অবকাশ না দিয়েই তার পাত থেকে পাঁচখানা পরোটা আর গোটা-দশেক আলুর দম—এইভাবে সারাদিন দারুণ উপবাস চালিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত টুসি রাত নটার সময় দাদুর সঙ্গে যায় নামজাদা এক সিনেমায়।

টুসিকে নিয়ে আবার মুশকিল হয়েছে ঘনশ্যামবাবুর। রবিবার দিন আফিসের তাড়া নেই, তাই একটু দেরি করে ওঠেন তিনি। সেদিনও সাতটা বাজিয়ে উঠেছেন ; উঠে দেখেন টুসির কোন পাত্তা নেই। যা সন্দেহ করেছিলেন তাই, পকেট হাতড়ে দেখলেন ট্রামের মান্থলিখানাও হাওয়া।

ছুটির দিনে ভোরে উঠেই হাওয়া খেতে বেরিয়েছে টুসি।

ফিরল বারোটা বাজিয়ে—প্রায় একটার কাছাকাছি।

'ছিলি কোথায় এতক্ষণ ? আমার মান্থলি নিয়ে বেরিয়েছিস ? কতদিন বলেছি এটা বে-আইনি ; তাছাড়া মান্থলির মধ্যে আমার···'

'বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে গেছলাম। সাড়ে দশটার শো-এ সিনেমা দেখে ফিরছি···' জানালো টুসি : 'বুঝলে দাদু, ছবিটায় কি মারামারি কাটাকাটি··· উঃ, কি মারামারি যে কী বলব !'

'বুঝেছি। কিন্তু মান্থলির খাপের ভেতর দুশো কত টাকা ছিল না ?'

'দুশো সাত টাকা ছিল যেন। কিন্তু এখন আর তা নেই। আমরা ক'বন্ধু মিলে সিনেমা দেখলাম না ? আর এতক্ষণ অব্দি না কিছু খেয়ে থাকা যায় ? রেস্তোরায় খেতেও হলো। বেশি খাই নি দাদু, একখানা করে মোগলাই পরোটা আর এক প্লেট করে কষা কারি।'

'কেতাথ করেছো ! এখন দাওতো আমার মান্থলি আর দুশো টাকা !'

পকেটে হাত দিয়ে টুসি আঁতকে ওঠে—'ওমা, কোথায় গেল মান্থলিটা !' এ পকেট ও পকেট হাতড়ায়। প্যান্টের পকেট পর্যন্ত।

'নাঃ, হাফ প্যান্টের পকেটেও তো নেই। নিশ্চয় পড়ে গেছে কোথাও।

ট্রামেই পড়েছে নিশ্চয়।'

'দুখানা একশো টাকার নোট ছিল যে রে! আর খুচরো সাত টাকা!'

'সাত টাকা আর নেই, বলেছি তো।'

'দুশো টাকাই রয়েছে যেন!' রাগে উথলাতে থাকেন ঘনশ্যাম,—'পড়ে গেছে না হাতি! বন্ধুদের কেউ হাতিয়ে নিয়েছে নিশ্চয়। যা সব বন্ধু! নয় তো কেউ পকেট মেরেছে নির্ঘাত।'

'আমার বন্ধুরা তেমন নয়'—টুসির প্রতিবাদ—'তারাও আমায় খাওয়ায়, সিনেমা দেখায়, তাই আমিও তাদের দেখালুম। আর আমার পকেট মারবে এমন কেউ জন্মায় নি এই কলকাতায়।'

'তুই নিজেই ত একটা পকেটমার। আমার পকেট সাফ করাই তো তোর কাজ। বদ ছেলেদের পাল্লায় পড়ে দিনকে দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছিস। তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।'

'ত্যাজ্যপুত্র কি করে হবে দাদু? আমি তো তোমার পুত্র নই।'

'ত্যাজ্যনাতি করে দেব তোকে।'

'ত্যাজ্যনাতিও হয় না দাদু! শুনি নি কোনকালে।'

'হয় না, হবে। হলেই দেখতে পাবি। আমার সব বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করব তোকে।'

'বিষয়-আশয় আমার চাইনে দাদু! ও নিয়ে আমি কি করব?' বলে টুসি। সত্যি, দাদুর বিষয়ের কোন আশয় সে করে না, সে বিষয়ে তার উৎসাহই নেই, কেবল দাদুর পকেটই তার লক্ষ্যস্থল। সেই সম্বল বজায় থাকলেই ঢের!

'আমি তোর অনেক অত্যাচার সয়েছি, কিন্তু আর না। আজই আমি খবর-কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তোর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কই নেই···এখুনি আমি চললাম কাগজের আপিসে।'

'খবরের কাগজে যাচ্ছোই যখন দাদু, তখন ঐ সঙ্গে মাদুলিটার জন্যেও একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও না—এই বলে যে যদি কোন সদাশয় ভদ্রলোক আমার মাদুলি টিকিটটি খুঁজিয়া পান তাহা হইলে দয়া করিয়া······।'

'দয়া করিয়া! সে আমি বুঝবো! তোমাকে আর উপদেশ দিয়ে আমার মাথা কিনতে হবে না।'

'কেন, পাওনি তুমি একবার খুঁজে? সেই যেবার হারিয়ে গেছলাম, রাত দুপুরে তোমার কলিকের ওষুধ কিনতে গিয়ে, খবর-কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাও নি আমায় তুমি? বিজ্ঞাপন দিতে না দিতে না দিতেই তো পেয়ে গেছলে আমাকে। বিজ্ঞাপনে কাজ হয় দাদু!'

সে কথা কানে না তুলে ঘনশ্যাম বেরিয়ে পড়েন। খবরকাগজের আফিসে পেঁছে বাল্যবন্ধু বটকেষ্টর সঙ্গে দেখা।

'এই যে ঘনশ্যামভায়া যে! অনেকদিন পরে দেখা। তা এখানে কি করতে শুনি?' শুধান বটকেষ্ট।

'একটা বিজ্ঞাপন দিতে এসেছি ভাই! বোলো না আর। বখা ছেলেদের পাল্লায় পড়ে নাতিটা আমার গোল্লায় গেছে। বিজ্ঞাপন দিয়ে ভাবছি ওকে ত্যজ্যপুত্র করে দেব। ত্যজ্যপুত্র বা ত্যজ্যনাতি যাই বলো!'

'ও বাবা! এ যে দেখছি নাতিবৃহৎ ব্যাপার!' বটকেষ্ট অবাক হলো— 'পুঁচকে একটা নাতিকে নিয়ে একটা বৃহৎ কাণ্ড বাধিয়েছো দেখছি।'

'নইলে ছেলেটা মানুষ হবে না। বাপ-মা-মরা ছেলে—অসৎ সঙ্গে মিশে অধঃপাতে যেতে বসেছে। ঐ বিজ্ঞাপনটা দিলে ভাবছি ও শুধরোবে। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যবস্থা করে দেওঘর কি কনখল, গুরুকুলে কি রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে—কোনো আশ্রমে পাঠিয়ে দেব ওকে— সেখানে থেকে সৎসঙ্গে যদি ছেলেটা মানুষ হয় কোনদিন। আমার কাছে আদরে মানুষ হয়েছে। কিন্তু দেখছি, ঠিকই বলে থাকে সবাই, আদর দিয়ে ছেলের মাথা খাওয়া হয় কেবল। আমি আর টুসির মুখ দেখব না ঠিক করেছি।'

'To see or not to see? কিন্তু ও যাবে আশ্রমে?'

'না গিয়ে উপায় কি? ছাপার অক্ষরে যখন দেখবে ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তারপর আশ্রম থেকে ওকে নিতে এসেছে···ভাল কথা, তুমি এখানে কেন হে?

'একটা কুকুর হারানোর বিজ্ঞাপন দিতে ভাই! অ্যালসেসিয়ান কি কোন নামী জাতের কুকুর নয়, এমনি দেশী কুকুর কিন্তু দেখতে ভাল। আর ভারী প্রভুভক্ত। ভারী মায়া পড়ে গেছে কুকুরটার ওপর আমার। কেউ খুঁজে দিতে পারলে নগদ পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেবার বিজ্ঞাপন।'

'দিয়েছ বিজ্ঞাপন?'

'দশটার সময় এসে দিয়ে গেছি···'

'দিয়েছ তো! তা এখন আবার এই বেলা দুটোর সময় কি? তোমার বিজ্ঞাপন তো ছেপে বেরুবে কাল সকালের কাগজে!'

'তা তো জানি, তবে সেই বিজ্ঞাপনটার খবর নিতে এসেছিলাম।'

'ও, তার প্রুফ দেখতে চাও বুঝি?'

'কিন্তু এসে দেখছি, যে কর্মচারিটির কাছে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলাম সে লোকটা নেই। বিজ্ঞাপন-বিভাগে সকালে দশটায় সাতটা লোক দেখেছিলাম, এখন তাদের একটাও দেখছিনে। কী যেন জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছেন সবাই।'

'বিভাগে তা হলে আছে কে এখন?'

'কেবল বেয়ারা। সে কোন খবর দিতে পারে না। অপেক্ষা করছি

তাই তো !'

'তা হলে তো আমাকেও অপেক্ষা করতে হবে দেখছি।'

কিন্তু কাঁহাতক অপেক্ষা করা যায়? অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা আবার সেই বিজ্ঞাপন-বিভাগে গিয়ে হানা দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন বেয়ারাকে—'কর্তারা সব কি জরুরী কাজে বেরিয়েছেন জানতে পারি কি?'

'কুকুর খুঁজতে বেরিয়েছেন সবাই।'

'কুকুর!'

'হ্যাঁ, আমিও বেরুতাম, কিন্তু আপিস ফাঁকা রেখে যাই কি করে? কুকুরটার জন্য নগদ পাঁচশো টাকার বকশিশ আছে মশাই!'

'কিন্তু কুকুর তো…' বলতে গিয়ে বাধা পান বটকেষ্ট। ঘেউ ঘেউ করতে করতে বিজ্ঞাপন-বিভাগের এক কর্মচারী এসে উপস্থিত। যার হাতে কটকেষ্ট-বাবু বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলেন তিনিই। তার ঘেউৎকারই বাধা দিল।

তিনি নন, তাঁর সঙ্গীটিই ঘেউ ঘেউ করছিল।

'এই নিন মশাই আপনার কুকুর। খুঁজে খুঁজে হয়রান!' বলেন ভদ্রলোক—'এবার পুরস্কারটা বার করুন তো দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিভাগের আরেকজন এসে হাজির আর একটা কুকুর নিয়ে। আবার আনকোরা ঘেউ ঘেউ।

তারপর আরো একজন। তিনিও একটাকে খুঁজে এনেছেন।

সাতজনাই এলেন একে একে—সতেরটা কুকুর সাথে নিয়ে।

বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্তা সাতটা কুকুর লম্বা দড়ায় বেঁধে এনেছেন। যেমন ঢেউ এর পর ঢেউ আসে, তেমনি ঘেউএর পর ঘেউ ঘেউ ঘেউ আসতে লাগল।

দারুণ হৈ চৈ পড়ে গেল সারা আফিসে। সবারই দাবি নগদ পুরস্কারের।

'নিন আপনার কুকুর—বেছে নিন এর ভেতর থেকে। আর দিয়ে দিন পুরস্কারের টাকাটা। আমরা বাঁটোয়ারা করে নেব সবাই।'

'কিন্তু আমি তো কুকুর নিতে আসি নি। আমি সেই বিজ্ঞাপনটার সম্পর্কেই বলতে এসেছিলাম।'

'বলুন তা হলে।'

'বিজ্ঞাপনটা আমি আর দিতে চাই না। ওটা আমি ফেরত চাই। বিজ্ঞাপন দিতে না দিতেই কুকুরটা আমার ফিরে এসেছে—নিজের থেকেই কখন এসে গেছে।'

বিজ্ঞাপনে কাজ হয়, বলছিল টুসি। মনে পড়ে ঘনশ্যামের।

'ফিরে এলে চলবে কেন! এসব কুকুর এখন কে নেবে তাহলে?' বিজ্ঞাপন-

বিভাগের ভদ্রলোকেরা প্রশ্ন তোলেন—'আর আমাদের প্রাপ্য পুরস্কারেই বা কী হবে? কুকুর তো আমরা এনেছি—এখন নেওয়া না নেওয়া আপনার মর্জি'। সব এরা দিশী কুকুর, নেড়ি কুত্তা—যেমনটি আপনি চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু এদের তো আমি চাই না…' বোঝাতে যান বটকেষ্টবাবু—'আমার নিজেরটিকেই চাই।'

দারুণ ঘেউ ঘেউ শুনে এর মধ্যে আফিসের বড়কর্তা বেরিয়ে এসেছেন।

'এখানে এত হট্টগোল কিসের?' এসেই তিনি তম্বি করেন।

'ইনি…এঁর কুকুর সব…নিয়ে যেতে বলছি এঁকে। ইনি নিচ্ছেন না কিছুতেই।'

'নিয়ে যান আপনার কুকুরদের।' হুকুম দেন বড় কর্তা—'দারোয়ান, ইন্ লোককো নিকাল দেও।'

দারোয়ানরা এসে দড়িসমেত কুকুরগুলো বটকেষ্টর কোমরে জড়িয়ে দেয়—'নিয়ে যান আপনার কুকুর মশাই! আপনি আমাদের চাকরি খাবেন দেখছি।'

কুকুরের দলবলসহ বটকেষ্টকে তারা গলির মোড় অবধি পার করে দিয়ে আসে।

তারপর, সদলবলে বটকেষ্ট চলে গেলে আসেন আরেক ভদ্রলোক।

'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ বিভাগে আমি একটা বিজ্ঞাপন দিতে এসেছি।'

'দিন', বিজ্ঞাপন-বিভাগ থেকে তাঁকে বলা হয়—'কিন্তু আমরা কুকুর-হারানো কোনো বিজ্ঞাপন নেব না। কুকুরের বিজ্ঞাপন একদম্ নেওয়া হয় না।'

'না না, কুকুর নয়। হারানোর বিজ্ঞাপনও না। আমি একটা ট্রামের মান্থলি টিকিট খুঁজে পেয়েছি। আজ বেলা সাড়ে বারোটার সময় ট্রামের মধ্যেই পড়েছিল মান্থলিটা।'

'বিশদ বিবরণ দিন।' বিজ্ঞাপন-বিভাগের কর্মচারী কপি লিখে নিতে তৈরি হন।

'মান্থলিটার খাপে G-H G-H মার্কা মারা…'

'জি-এইচ জি-এইচ?' লাফিয়ে ওঠেন ঘনশ্যাম—'ও তো আমার মান্থলি। আমার নাম ঘনশ্যাম ঘাই। তারই আদ্যাক্ষর জি-এইচ জি-এইচ।'

'তাই নাকি? বলুন তো আর কি ছিল সেই মান্থলির ভেতর?'

'একশো টাকার দু-খানা নোট—মোট দুশো টাকা। কিছু খুচরোও থাকতে পারে। নোটেরও নম্বর দিতে পারি তবে তার জন্যে দয়া করে আমার বাড়িতে

পায়ের ধুলো দিতে হবে একবার। আমার নোটবুকে টোকা আছে নম্বর।'

'তার দরকার নেই—এই নিন আপনার মাদুলি আর টাকাটা। বিজ্ঞাপন দেওয়ার খরচাটা আমার বেঁচে গেল মশাই; তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ আপনাকেও। আমিও ঐ মাদুলির জন্যই বিজ্ঞাপন দিতে এসেছিলাম। আমার নাতি বলছিল যে বিজ্ঞাপন দিলে নাকি কাজ হয়। তা, দেখছি ব্যাপারটা সত্যি!'

'ভারী বুদ্ধিমান তো আপনার নাতি!'

'সে কথা বলতে! অমন ছেলে আর হয় না!' তিনি গালভরা হাসি হাসেন—'এমন কি বিজ্ঞাপন না দিয়েও, কেবল দিতে এলেই কাজ হয়, তাও দেখলাম!'

নেহাত অমূলক নয়। বরং বলতে গেলে বলতে হয় মূলোই এই কাহিনীর মূলে।

কথায় বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সমূলে তাকে সংহার করাই উচিত।

আমার সংহারপর্বটা প্রায় তার কাছাকাছিই যায়। সমূলে তাকে আমি শেষ করেছি।

সেদিন রবিবার হলেও সবাই আমরা গেছি ইস্কুলে। আমরা, মানে, আমাদের সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরাই কেবল; আমাদের কেলাসে গিয়ে জমেছি সকলে।

ইস্কুলের বার্ষিক উৎসবের দিনে একটা নাটক অভিনয়ের কথা হচ্ছিল। সেদিন সেই নাটকের মহড়া শুরু হবার কথা।

কী নাটক আমরা জানিনে। আমাদের বাংলার স্যার লিখেছিলেন পালাটা। আর, তার বিভিন্ন ভুমিকায় অভিনয় করবার পালা ছিল আমাদের। সেদিনকে সেইসব পার্ট বিলি হবার কথা।

ক্লাসে আমরা বসতে না বসতেই স্যার এসে দাঁড়ালেন। হাতে খেড়ো-বাঁধা মোটা একটা খাতা। সেইটেই তাঁর স্বরচিত নাটকের কপি বলে মনে হলো আমাদের।

'জনা-কে কেউ জানো তোমরা?' ক্লাসে বসেই তিনি শুধোলেন আমাদের।

কারো মুখে কোন জবাব নেই। কোন্ জনার কথা উনি বলছেন কে জানে! কত জনাকেই ত জানি।

'প্রবীরের মা জনা।' তিনিই জানালেন।

আমরা সবাই একদৃষ্টে প্রবীরের দিকে তাকালাম।

'প্রবীর ত তার মার নাম কোনদিন আমাদের জানায়নি স্যার। আমি বললাম—'জানব কি করে?'

'কেউ কি তার মার নাম কখনো মুখে আনে?' আপত্তি করে প্রবীর: 'আনতে আছে কি? মা গুরুজন না?'

'মহাগুরু।' সায় দিলেন মাস্টারমশায়। কিন্তু আমাদের প্রবীরের মার কথা এখানে হচ্ছে না। পৌরাণিক প্রবীরের কাহিনী নিয়েই আমার নাটকটা। মহাভারতের প্রবীর—যেমন বীর তেমনি যোদ্ধা। তাকে নিয়েই আমাদের এই পালা। আর সেই প্রবীরের মার নামই হচ্ছে জনা।'

'তাই বলুন স্যার!' হাঁফ ছেড়ে আমরা বাঁচলাম।

'আমার নাটিকাটির নাম হচ্ছে জনা, ওরফে প্রবীর পতন।' বললেন বাংলার স্যার। 'মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত বই জনা-কে কেটে ছেঁটে তোমাদের উপযোগী করে বানিয়েছি আমি।'

তারপর তাঁর কথার সারাংশ প্রকাশিত হলো—'প্রবীরই হলো এই বইয়ের হীরো। নাটকের যেন পার্ট। এখন তোমাদের মধ্যে কে এই পার্ট নিতে চাও জানাও আমায়।'

ক্লাসশুদ্ধ সব ছেলেই আমি আমি করে উঠল। 'আমি স্যার···আমি স্যার... আমি স্যার! এবং আমিও।

হীরো হতে চায় না কে? আমার আমিত্বও কারো চাইতে কিছু কম নয়। হারবার পাত্র কারও কাছে।

কিন্তু প্রবীর বলল—'না স্যার, আমাকেই এই পার্ট দেওয়া উচিত আপনার। আমি এর জন্য আগের থেকেই বিধিনির্দিষ্ট।'

'বিধিনির্দিষ্ট?' বাংলার স্যার বিস্মিত।

'নইলে স্যার আমার নাম প্রবীর হতে গেল কেন? এই স্কুলে আমি পড়তে এলাম কেন? এখানে ভর্তি হতে গেলাম কেন? এই কেলাসে প্রোমোশনই বা পেলাম কেন?'

এত কেন-র জবাবে আমার ছোট্ট একটি প্রতিবাদ—'তোর নাম প্রবীর হতে-পারে, কিন্তু তোর মা'র নাম ত আর জনা নয়। বইটার নাম শুনেছিস? জনা ওরফে প্রবীর পতন।'

'মার নাম জনা না হতে পারে কিন্তু জনাই আমাদের দেশ।' জানায় প্রবীর।

'জনাই? যেখানকার মনোহরা বিখ্যাত?' মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করেন—'মনোহরা নামক মেঠাই প্রসিদ্ধ যেখানকার?'

'হ্যাঁ স্যার, সেখানেই আমার জন্ম। সেই জনাই আমার মাতৃভূমি। আর ভূমা আর মাতৃ ম তো এক; তাই নয় কি স্যার?'

'তা বটে।' ঘাড় নাড়েন বাংলার স্যার—'সেকথা ঠিক। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

'তাহলে পার্ট'টা আমার পাওয়া উচিত কিনা আপনি বলুন স্যার?'

'কিন্তু শুনেছ তো, বইটার নাম প্রবীর পতন। প্রবীর খুব বীর হলেও যুদ্ধ করতে করতে মারা পড়বে শেষটায়। শেষ পর্যন্ত মারা পড়তে রাজি আছ তো তুমি?'

'কেন মরব না স্যার? সত্যি সত্যি তো আর মরতে হবে না। তবে যতক্ষণ আমি পারব বীরের মতন লড়াই করে যাবো। সহজে মরব না স্যার—তা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি।'

'তোমাকে পাঁচ মিনিট লড়াই করতে দেওয়া হবে, তার বেশি নয়। তারপর যেই আমি উইংস-এর পাশ থেকে ইশারা করব—এইবার, তক্ষুণি তোমাকে ধপাস করে পড়তে হবে কিন্তু। গায়ে একটু লাগতে পারে; কিন্তু তা গ্রাহ্য করলে চলবে না। এর নাম হচ্ছে পতন ও মৃত্যু। ভেবে দ্যাখো কথাটা··· রাজি আছ?'

এক কথায় সে রাজি। তার নামের টু-থার্ড বীর তো—সেই কথাটাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বললে যে বীরের মৃত্যু তার শিরোধার্য। (আহা, নামমাত্র মরে নাম করতে কে চায় না যেন!)

প্রবীরের পার্ট'টা সে-ই পেলে। আর সব পার্ট'ও বিলি হলো। সবাই পেল এক একটা পার্ট। আমিও পেলাম একটা।

আমারটা কাটা সৈনিকের পার্ট। তাতে কোন বক্তৃতা নেই, লম্ফ ঝম্ফ কিছু না! স্টেজের এক কোণে চুপটি করে মড়ার মতন শুয়ে থাকা কেবল। নাকে মাছি বসলেও নড়া চলবে না, মশা কামড়ালেও নয়! প্রবীর যখন বীরদর্পে তার তরোয়াল ঘুরিয়ে স্টেজময় দাপাদাপি করে লড়াই করবে, আমি তখন লাশের মতোই পড়ে থাকব এক পাশে। একটি কথাও কইতে পাব না। ও যদি আমার পায়ের কাছেও এসে লাফায়; আমায় ডিঙিয়ে যায়, বারংবার আমার এধার থেকে ওধারে টপকাতে থাকে, এমন কি আমার ওপরে দাঁড়িয়েই লড়াই জমায় তবু আমি মোটেই ওকে ল্যাং মারতে পারব না। আমার মুখে যেমন কথাটি নেই, পায়ের বেলাও ও-কথা নয়।

সেরকম কথা থাকলে স্টেজের ওপরে শুয়ে শুয়েই এইসা একটা ল্যাং মারতাম ওকে যে বাছাধনের আর পাঁচ মিনিট ধরে লড়াই চালাতে হত না, সেই একটি ল্যাংয়েই পতন! আর পতনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু!

কিন্তু মাস্টারমশাই বললেন, প্রবীর যাই করুক না, আমার পক্ষে কোন ল্যাং বা ল্যাংগুয়েজ নাস্তি!

বইয়ের সব পার্টে'রই ব্যবস্থা হলো, কিন্তু জনা সাজতে রাজি হলো না ছেলেদের কেউই। পার্ট'টা ডিফিকাল্ট বলে নয়, মেয়ের পার্ট বলেই। বরং

'নেপথ্যে কোলাহল' হতে রাজি হলো কিন্তু জনা হতে একজনাও না।

তখন মাস্টারমশাই নিজেই জনার পার্ট নিলেন।

জোর মহলা চলল তারপর কদিন ধরে। তেড়ে ফুঁড়ে হাত পা নেড়ে যা শুরু করল প্রবীরটা···

'দাও মাগো সন্তানে বিদায়।
চলে যাই লোকালয় ত্যজি।
ক্ষত্রিয়-সন্তান,
অপমান কত সবো আর ?···'

তাকিয়ে দেখবার মতোই ব্যাপার। তার অংগভঙ্গী রকমসকম হাবভাব দেখে, এমন কি, প্রবীর-প্রসবিনী জননী জনা (ওরফে আমাদের বাংলার মাস্টারেরও) তাক লেগে যায়!

আর এমন রাগ ধরে আমার! হাত পা খেলানো অ্যায়সা চমৎকার পার্টটা আমার হলে কী মজারই না হ'ত! অবিশ্যি, শেষ পর্যন্ত 'পতন ও মৃত্যু' অবধারিত হলেও আমার কোন আপত্তি ছিল না। তার বদলে আমাকে হতে হলো কিনা কাটা সৈনিক! চিরকাল ধরে দেখে আসছি আমার কপালটাই এমনি ফাটা!

তাহলেও, নিজের পার্টটা তৈরি করতেও কোন কসুর ছিল না আমার। সুবিধের এইটুকু যে, এর রিহার্সাল স্টেজে না দিলেও চলে, নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই আরামে রপ্ত করা যায় বেশ খানিকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকা—এই বইতো নয়!

বিছানায় শুয়ে শুয়েই মতলব খেলতে থাকে আমার মাথায়। দাঁড়াও বৎস, তোমার ঐ হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দেওয়া বার করছি আমি—ল্যাং মারতে না পারি, কিন্তু তোমার ঐ ল্যাংগুয়েজই মারব তোমায়! ল্যাংএর ল্যাংগুয়েজে নাই মারলাম, ল্যাংগুয়েজের ল্যাং মেরেই কেড়ে ফেলব তোমাকে—দাঁড়াও না!

উৎসবের দিন সকালবেলায় এক কোঁচর মুড়ি আর আস্ত একটা মুলো নিয়ে প্রবীরের পাড়া দিয়ে যাচ্ছি—দেখি যে তখনো সে তার পার্ট নিয়ে দারুণ সোরগোল তুলেছে। সারা বাড়ি ফাটিয়ে পার্ট দিয়ে তার বাড়াবাড়ি!

সামনে দিয়ে আমায় যেতে দেখে সে বলে—'কি খাচ্ছিস রে ?'

'মুড়ি আর মুলো।'

'দিবি আমায় দুটি ?'

'তা খা না, কত খাবি। বাজার থেকে আজ এক ঝুড়ি মুলো নিয়ে এসেছে আমাদের বাড়ি। তুই খা ততক্ষণ, আমি পোস্টাফিস থেকে বাবার জন্যে ডাক-টিকিট কিনে আনি।'

বলে মুলো আর মুড়ি তার জিম্মায় রেখে আমি চলে গেলাম। বেশ খানিকক্ষণ বাদ ফিরে এসে দেখি, মুড়ির স্বাদ আর আমায় পেতে হবে না—

মুড়ির সঙ্গে আস্ত মুলোটিও খতম ! আসলে সে শেষ করেছে সবটা।

যাকগে—থাকগে। কথায় বলে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। সেই বসুন্ধরার সামান্য একটা মুলোর গোটাটাই সে হজম করবে সে আর বেশি কি ! আজকের দিনটির বীর তো ঐ প্রবীরই !

উৎসবের ক্ষণটি এলো অবশেষে। ঠিক দুপুরবেলায় স্কুলের প্রাঙ্গণে খাটানো সামিয়ানার তলায় প্রথম সারিতে বসে হেড্‌ স্যার, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, আর পুলিস সাহেব, এবং আমাদের ছোট্ট শহরের আরো সব বড় বড় লোক।

দৃশ্যপট উঠল স্টেজের।

আলুলায়িতকুন্তলা জনা। (ছদ্মবেশে আমাদের বাংলায় স্যার) স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, আর প্রবীর তাঁর সামনে খাড়া। কাটা সৈনিকের ন্যায় আমি রণক্ষেত্রের এক পাশে ধরাশায়ী।

হাত পা নাড়া দিয়ে শুরু হলো প্রবীরের—

'দা-দাও মা-মা গো স-স-স-সন্তানে বিদায়—হিক—হিক—হিক···দা-দাও মা-মা গো··· হিক ···হিক···'

হেঁচকিরা এসে ওর বক্তৃতার তোড়ে বাধা দিতে লাগল।

'দাদা আর মামা পাচ্ছ কোথায় ?' ফিস ফিস করলেন জনা।—'তোমার ত তোতলামি ছিল না, এ ব্যারাম আবার কবে থেকে ?'

প্রবীর। চ-চ-চ-চ-চ-চ-চ-চ···

জনা। (জনান্তিকে) এই সেরেছে !

প্রবীর। চলে যাই হিক হিক···লো-লো-লো-লো—লোকালয় ত্যজি – হিক হিক—

'কী হচ্ছে কি !' জনা এগিয়ে গেলেন প্রবীরের কাছে—'ওমা, দারুণ মুলোর গন্ধ বেরুচ্ছে যে মুখ দিয়ে। মুলো খেয়েছিলে না কি আজ ?' প্রবীরের কানে প্রশ্ন তাঁর।

'আ-আমি মু-মু-মু-মুলো হিক হিক হিক খা-খাইনি স্যার। ও-ও-ও-ওই আমায় খা-খাইয়ে দিয়েছে—' বলে সে ধরাশায়ী আমায় একটা তরোয়ালের খোঁচা লাগায়।

'খাইয়ে দিয়েছে !' জনা-মশাই তো অবাক।

'হাঁ স্যার। ও ব-বললে যে খা ! তখন কি জা জানি মু-মু-মু-মু-মুলো খেলে এমন হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ-চকি ওঠে ! হিক হিক !'

জনার মুখে কথাটি নেই। আড়চোখে চেয়ে দেখি তিনি রোষ-কষায়িত নেত্রে তাকিয়ে রয়েছেন আমাদের দুজনার দিকেই।

আবার শুরু করে প্রবীর : '—লোকালয় ত্যজি !

'ক্ষ-ক্ষ-ক্ষ-ক্ষ-ক্ষ-ক্ষ—হিক হিক !'

প্রবীরের ক্ষয় আর শেষ হয় না। কিন্তু ওকে ক্ষয়িষ্ণু হতে দেখে মাস্টার-

মশাই আর সহিষ্ণু থাকতে পারলেন না। 'খুব হয়েছে!' বেশ চড়া গলাতেই বলে ফেললেন এবার।

কিন্তু প্রবীরের হেঁচকি উঠতেই লাগল। জনার ধিক্কারে তার হিক্কার বাধা পেল না একটুও।

'জা-জানি সার। ও আমার শত্তুর। চি-চি-চিরদিন জানি! কি-কিন্তু এ-ত বড় শত্তুর তা-তা আমি জা-জা-জানতুম না।'

বলে সে আমাকে আবার এক তরোয়ালের খোঁচা লাগায়।

পড়ে পড়ে মার খেতে হয় আমায়। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কত আর সওয়া যায় বল?

আমি লাফিয়ে উঠি। উঠে দৌড় মারি স্টেজ থেকে। আর প্রবীর এদিকে প্রাণ ভরে হেঁচকাতে থাকে।

হেঁচকি সমেত প্রবীরকে এক হ্যাঁচকায় টেনে নিয়ে জনাও স্টেজ থেকে অদৃশ্য হন।

যবনিকা পড়ে যায়—অট্টহাস্যে সামিয়ানা ফেটে পড়ে। আমি ততক্ষণে তার ত্রিসীমানা থেকে কেটে পড়েছি।

সংস্কৃতের স্যার তাঁর ব্যাকরণের সূত্রে নিপাতনে সিদ্ধ কতবার করে বুঝিয়েছিলেন ক্লাসে, কিন্তু আমাদের মাথায় ঢোকেনি। আজ প্রবীরের নিপাতনে আমার সিদ্ধিলাভ হওয়ায় তার মানে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম আমি। তরোয়ালের খোঁচাগুলোই টের পাইয়েছিল আমায়।

আর এর মূলে ছিল সেই মুলো—মূলতঃ আমি হলেও; মুলোকেই আসলে আসামী করা উচিত।

জাহাজ ধরা সহজ নয়

গঙ্গাযাত্রার থেকে, শুনেছি, খুব কম লোকই বেঁচে ফেরে। পদ্মাযাত্রাও আমার কাছে প্রায় তাই।

যতবার পদ্মাযাত্রায় বেরিয়েছি একটা-না-একটা বিপদ ঘটেছেই। একবার তো আমার খুড়তুতো বোনকে শ্বশুরবাড়ি দিতে গিয়ে··· না, সে দুঃখের কথা কেন আর! ঠিক নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের মত না হলেও, নাকাল হবার কাহিনী তো বটেই।

পদ্মা আমার কাছে বিপদ-দা! আমার জীবনে বিপদের দান নিয়ে এসেছে বার-বার!

সেই বিপজ্জনক পথেই পা বাড়িয়েছি আবার। সাধের কলকাতা ছেড়ে আমার পদ্মাপারী মামার বাড়ি চলেছি এই গরমের ছুটিতে—আমের আশায়।

শেয়ালদা থেকে লালগোলার ঘাট—রেলগাড়ির লম্বা পাড়ি। সেখানে নেমে, পদ্মার ধারে গিয়ে গোদাগাড়ির ইস্টিমার ধরতে হয়। লালগোলার ঘাটে ইস্টিমারে চেপে পরপারে গোদাগাড়ির ঘাটে গিয়ে নামো, তারপর গোদাগাড়িতে আবার চাপো রেলগাড়িতে! তারপরে প্রথম ইস্টিশনই বুঝি আমনুরা। ইস্টিশনের নাম শুনেই সজল জিভে সেই আমের কথাই মনে পড়বে তোমার।

আমের রাজ্যের শুরু সেই আমনুরা থেকেই। তুমি মালদহের আমরাজ্যে এসে পড়লে—রাজ্যের আম যে যোগায় সেই মালদা! সারা বাংলায় যার সাম্রাজ্য!

আমি অবিশ্যি আমনুরাতেই থামব না। আমনুরা ছাড়িয়ে—আরো কী কী সব পার হয়ে—ইংরেজবাজার পেরিয়ে—আরো কয়েক স্টেশন পরে পৌঁছব

গিয়ে সামশিতে। আমের রাজ্য ভেদ করে—আমসত্ত্ব দেশের ওপর দিয়ে—অনেক-অনেক পরে নিজের গায়ের ইস্টিশনের গায়ে ভিড়ব গিয়ে—প্রায় আমসি হয়েই।

সামসি থেকে ফের এক হাঁটার পাল্লা—পাক্কা দশ মাইলের ধাক্কা—সারা পথটা পায়দলে যাও! ঘণ্টা তিন-চার পায়দল যাবার পর তবেই আমাদের—আমার মামাদের গ্রাম—চঞ্চল! আর সেই মামাতো-আমবাগান! ভাবতেই; ট্রেন থেকে নামতেই প্রাণে চাঞ্চল্য জাগল। লালগোলাতেই লালায়িত হয়ে উঠলাম—নিজেকে যেন একটু সজীব বোধ করলাম।

সুটকেশটা হাতে করেই পা চালালাম পাড়ের দিকে। শোনা ছিল, লালগোলার ইস্টিমারদের চালচলন সুবিধের নয়। কখন আসে, কখন যায়; তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। খুশি মতন আসে, খেয়ালমাফিক ছাড়ে। কিছু তার ঠিকঠিকানা নেই, কাজেই সব-আগে ঘাটে গিয়ে তার পাত্তা নেওয়া ভাল।

চলেছিলাম হন-হন করে! মাঝপথে থামাল এক মেঠাইওয়ালা।

'আরে বাবু এতো দৌওড়াচ্ছেন কেন? আইসন, গরম পুরী খাইয়ে যান!'

'হ্যাঁ, বসে-বসে তোমার পুরী খাই; আর এদিকে আমার ইস্টিমার ছেড়ে দিক!'

'জাহাজ ছাড়তে আখুন ঢের দেরি আছে।' জানায় মিঠাইওয়ালা: 'আখুন তো সাঁজ ভি হোয়নি। সাত বাজবে; আট বাজবে, সাওয়া-দশ-ভি বজ যাবে, বহুৎ পাসিনজর আসবে—ডেক-উক সোব ভরতি হোবে, তব তো ছোড়বে জাহাজ!'

ওমা! এমনিধারাই জাহাজ নাকি? জাহাজের গতিবিধি বুঝি ওই রকম? তা হয়ত হতেও পারে। এমনটাই যে হবে তার একটা আন্দাজও ছিল আমার··· মামাদের মুখে শুনে-শুনেই। শুনেছিলাম যে, গোদাগাড়ির ইস্টিমারের গদাই-লস্করি চাল! তবে আর হন্যে হয়ে ছুটে কি হবে? আমিও এদিকে জাহাজী কারবার লাগাই না কেন? জাহাজের অনুকরণে নিজের পেটের খোল ভর্তি করতে লাগি। আমার উদরও তো বলতে গেলে জাহাজের মতই উদার।

'মিষ্টি-টিষ্টি আছে কিছু?'

'আছে না? কি চাহি আপনার? রসগুল্লা, পেঁড়া, বরফি, জিলাবি—সব-কুছ। বহুৎ বঢ়িয়া-বাঢ়িয়া মিঠাই বাবু!'

'তা বেশ তো? দেখলাও কেইসা বঢ়িয়া? খব চীজ্ দেও দো-চারঠো। ইস্টিমার যতক্ষণ না ছাড়ে ততক্ষণ তোমার মিষ্টি মারা যাক।' ইস্টিমারকে সামনে রেখে আমার ইষ্টের সাধনায় লাগি। দহিবড়া থেকে শুরু করে, বরফি সরগোল্লা জিলাবি সাবড়ে, এমন কি; লাড্ডু পর্যন্ত পান করতে বাকি রাখি না কিছুই। পেঁড়াও গোটা-চার পাচার করি।

খাবার মাঝখানে ইস্টিমারের বাঁশি কানে বাজে। চমকে উঠি—অ্যাঁ!

ছাড়লো নাকি ইষ্টিমার? মেঠাইওয়ালা কিন্তু ভরসা দেয়—'ঘাবড়াইয়ে মৎ বাবু! উ তো পহলী আওয়াজ। ওই রোকোম চার-চার দফে ভোঁ-ভোঁ কোরবে তব্ তো ছাড়বে জাহাজ। দশ-দশ মিনিট যাবে, অউর এক-এক ভোঁ ছোড়বে।'

ও, তাই নাকি? শুনে একটু ভরসা পাই। তা—তাতো হতেই পারে। ইষ্টিমার তো ইংরেজি-ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গই? প্রোনাউনে she! আর মেয়েরা কি একবার আসি বলে বিদায় নিতে পারে? নিয়েছে কখনো? বিনিকেই তো দেখছি; আসি ভাই, আসি ভাই; অন্ততঃ বিরাশীবার না বলে কিছুতেই নড়বে না!

আমি তখন আরো গোটাকয়েক মণ্ডা ঠাসি! মন ঠাণ্ডা করে।

তারপর হালকা-মনে হেলতে-দুলতে ইষ্টিমার-ঘাটের দিকে এগোই। ঘাট পেরিয়ে জেঠির ডেকে পা দিয়ে দেখি—ওমা একি! আমার ইষ্টিমার যে মাঝ-পদ্মায়! আমার জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই জেঠির মায়া কাটিয়েছে!

সর্বনাশ! আবার কখন আসবে ইষ্টিমার? খালাসীদের কাছে জানা গেল যে কাল সকালের আগে নয়। শুনে নিজের ওপর যতো না, তার চেয়ে বেশি রাগ হলো মিঠাইওয়ালার ওপর। সে কেন তার মিঠে বুলিতে এমন করে আমায় মজাল? মজা পেয়েছে?

তাকে পাকড়ালাম গিয়ে তক্ষুণি।

আমার গালাগাল সে অম্লানবদনে হজম করলো। তারপরে নিজের গালে হাত দিলো—'ঈস! হাম্‌কো ভি তো খেয়াল ছিলো না বাবু! আজ হাটবার ছিল যে! হাট-কা আদ্‌মি যেতো ফিরোৎ গিলো না? উসি-বাস্তে—জাহাজ জলদি ভোরে গিলো আর ছোড়ে ভি দিলো জলদি।"

কিন্তু এই জলদিতে আমার আগুন নিভলো না।—'তব্—তব্—তুম কাহে এইসা ঝুটমুঠ বাত্‌লায়কে আমাকে তক্‌লিফ দিলে?'

'তক্‌লিফ কেনো হোবে বাবু? একঠো রাত তো? একরাত কো বাত্ তো? আপনি হামার দু-কানে আইস্থন—ওহি হামার দুকান!' মেঠাইওয়ালা অদূরে পথের ধারে তার খোড়োঘরের আটচালার দিকে আঙুল ছোড়ে—'উখানে হামি থাকে। হামি আউর হামার বিটিয়া—লছমি। আজ রাতঠো হামার ঘরে থাকে, কাল সবেরে জাহাজমে চলিয়ে যান—পুরী-কচৌরি খাকে নিদ্ যান খুশীসে—কুনো কস্‌টো হোবে না। হামার পুরী-কচৌরিভি খুব উম্‌দা চীজ আছে বাবু! লালগোলাকে কেতনা আমীর আদ্‌মি—'

'তোমারা পুরীকচুরী খায়কে আধমরা হয়ে আছে। এই তো বলছো? তা আমি 'বুঝতা হ্যায়। কিন্তু বোঝা উচিত ছিলো অনেক আগে। কে জানে, তোমার ঐ সব গেলাবার মতলবেই তুমি আজ আমায় ইষ্টিমার ফেল করাবে!'

গজরাতে-গজরাতে তার পিছু-পিছু যাই। ঘরের সামনে গিয়ে সে হাঁকি

ছাড়ে—'লছ মি ? আরে বিটিয়া, এই বাবুকো-বাস্তে ই-ঘরমে হামরা খাটিয়াঠো·····'

দোকানের পাশের ঘরটিতে খাটিয়া পেতে আমার শোবার ব্যবস্থা সব সেই লছমিই ক'রে দিলো, মেঠাইওয়ালার সেই মুখ-বুজে থাকা বাচ্চা মেয়েটি। আর সে নিজে তুলসীদাসী রামায়ণ পেড়ে তার লালটিমু জ্বালিয়ে রামভজন গান করতে লাগল। নামেই লালটিম, আসলে কালো টিমটিমু।

আর আমি আরেক দফা তার লাড্ডু-পেঁড়ার সঙ্গে রফা ক'রে আমার খাটিয়ায় লম্বা হলাম ; আর তার পরেই শুরু হল আমার দফা রফা ! কী মশা রে বাবা সেখানে ! আর যেমন মশা, তেমনই কি ছারপোকা। পদাতিকবাহিনী আর বিমানবহরে যেন যুগপৎ আমাকে আক্রমণ করল। ওপর থেকে-- নীচের থেকে—এক সঙ্গে কামড়াতে লাগল আমায়। আগাপাশতলার কোথাও আর আস্ত রাখল না।

হাত পা ছুঁড়ে—এলোপাথাড়ি লাগলাম আমি মশা তাড়াতে। কিন্তু কতো আর তাড়াবো ? তাড়াবো কোথায় ? পিন-পিন করে কোত্থেকে যে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে ! আর সেই সঙ্গে লাখে-লাখে ছারপোকাও ! পিন-পিন করে না এলেও, তাদের জাহাজ আলপিন নিয়ে আসার কসুর নেই। আর এদের রাম-ভোজনের সঙ্গে তাল রেখে······সেই সঙ্গে চলেছে মেঠাইওয়ালার রামভোজন।

ভোরের দিকে সারা গায়ে চাদরমুড়ি দিয়ে একটু ঘুমের মতো এসেছিলো বুঝি ! তন্দ্রার ঘোরে আরেক দিনের ছবি দেখছিলাম ! এই পদ্মাতেই আরেক যাত্রার ওই ইষ্টিমারের বুকেই যে-কাণ্ডটা ঘটেছিল, তার ছবি কেমন ক'রে জেগে উঠে আবার যেন আমার স্বপ্নালু চোখের ওপর ভাসছিল !

কী বিপদেই-না পড়েছিলাম সেদিন—সেদিন এমনি—এই পদ্মাতেই। সেই দুর্ঘটনার ঠেলাতেই-না আমার ছোটবেলাকার তোতলামি সেরে গেল একবেলায়। একদিনেই—জন্মের মতন। সেরকম দুর্দৈব যেন কারুর কখনো না হয় !...

সে-ই আরেক ইষ্টিমারযাত্রা। পদ্মার বুকের ওপর দিয়ে চলেছি, পূর্ব-বাংলার মুলুকে—খুড়তুতো দিদির শ্বশুরবাড়িতে—দিদি আর জামাইবাবুর সঙ্গে। এইতো, ক'বছর আগের কথা ?

সেই প্রথম চেপেছি ইষ্টিমারে। চেপে ফুর্তি হয়েছে এমন ! ঘুরে-ঘুরে দেখছি চারদিকে। ইষ্টিমার কেমন করে জল কেটে-কেটে যাচ্ছে ! আঃ, সে কী মজা !

আর, কী জোর হাওয়া রে বাবা ! উঠিয়ে নিয়ে যায় যেন। পদ্মার জল-বায়ুর কী উপকারিতা কে জানে ! গঙ্গার আর সমুদ্রের হাওয়া খেলে যেমন চেঞ্জের কাজ করে—জোর হয় গায়—পদ্মার এই জোরালো-হাওয়ায় তেমনি হয়ে থাকে কিনা জানবার আমার কৌতুহল হয়।

জিজ্ঞাসু হয়ে জামাইবাবুর কাছে যাই। 'ব-বলি ও জা-জা-জা জাম—,

বলতে গিয়ে কথাটা জাম হয়ে যায় গলায়।

'বুঝেছি।…জামাইবাবু।' বললেন জামাইবাবু: 'কী বলতে চাও বলো।'

'ব-ব-বলছিলাম কি যে, এই চে-চে-চে—চে—চে'

'এত চেঁচাচ্ছো কেন, হয়েছে কি?' চেঁচিয়ে ওঠেন উনি নিজেই।

'চে-চে-চেচাব কেন? ব-ব-বলছি যে, চে-চে-চে-চেইন্…!'

ঐ পর্যন্তই রইল। চেইন্-কে আর ওর বেশি টানা গেল না।

'না ইস্টিমারের চেইন থাকে না। ইস্টিমার কি রেলগাড়ি যে চেন থাকবে?'

জবাব দিলেন জামাইবাবু।—'আর, চেনের কথাই-বা কেন? চেন টেনে ইস্টিমার থামাবার কি দরকার পড়ল তোমার হঠাৎ? শুনি?'

'নানু—না, চে-চেইন্ না। চে-চে-চে-চে—' জবাবদিহি দিতে গিয়ে আমার চোখ-মুখ কপালে উঠে যায়। কিন্তু ঐ চে-ৎকারই সার, তার বেশি আর বার করা যায় না। তখন ভাবলাম যে, চেঞ্জ-কথাটা এই পাপ গলা দিয়ে যদি না গলতে চায়, তার বদলে—বায়ু পরিবর্তনকেই না হয় নিয়ে আসি। কিন্তু শোনার ধৈর্য থাকলে তো জামাইবাবুর! 'চে-চে-চেন্না! ব-বলছি কি, যে, বা-বা-বা-বা-বা-বা-বা-বা…' কিন্তু মাঝ পথেই তিনি বাধা দিয়েছেন—'বাবা রে—বাবা! পাগল করে দেবে নাকি?…বলেছি না তোমাকে? কতবার তো বলেছি যে তোমার যা বলবার তা গান করে ব'ল—বেশ ক'রে সুরে ভেঁজে নিয়ে পাও? গানই হচ্ছে তোত্‌লামির একমাত্র দাবাই। যদি সারাতে চাও তোমার এই তোত্‌লামো তো গানের সাহায্য নাও। কেন, সুর খেলিয়ে বলতে কি হয়? আর সুর বার-করা এমন কিছু শক্তও না। স্বরটা নাকের ভেতর দিয়ে বার করলেই সুর হয়। আর কিছু না থাক, নাক তো আছে?'

তা তো আছে। কিন্তু তাই বলে হাতির মতন এমন কিছু লম্বা নাক নয় যে, ইচ্ছে করলেই আমি শুঁড় খেলাতে পারবো? কিন্তু কথাটা আর মুখ খুলে বলার দুশ্চেষ্টা করি নে। মনে মনেই বলে বিমুখ হয়ে দিদির কাছে চলে যাই।

দিদি তখন ডেকের মেয়েলী এলাকায় রেলিঙের ধার ঘেষে পদ্মার শোভা দেখছিলেন। ইস্টিমারের দাঁত কেমন ঢেউ কেটে চলেছে, দেখছিলেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। দেখতে দেখতে—

দেখতে-না-দেখতে তক্ষুণি আবার ছুটে আসতে হয়েছে তার বরের—সেই বর্বরের কাছেই আবার।

'দি—দি—দি—দি—দি—দি…।'

দিদির কথাটা ভাল করে বলতেই তাঁর বাগড়া এল।—'না, কিছু তোমায় দিতে হবে না। কিচ্ছু আমার চাইনে।'

'দি-দিচ্ছেনে তো—ব-লছি কি যে, তো-তো-তো-তোশ্তো—।'

'আবার তোত লাতে লেগেছো? কি বললাম একটু আগে?'

'যা বললাম গান করে বলতে বলিনি? তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন।'

'বলো, গান গেয়ে বলো ! প্রাণ খুলে গাও, গান খুলে বাতলাও। আমি কান খুলে শুনি ! শুনে আমার জন্ম সার্থক করি।'

তখন বাধ্য হ'য়ে আমায় বাল্মিকী হতে হয়। তিনি যেমন ক্রৌঞ্চ-বিরহে কাতর হয়ে তাঁর প্রথম শ্লোক ঝেড়েছিলেন, আমিও তেমনি মুখে-মুখে আমার গান বাঁধি—মনের দুঃখে ঃ

'ইষ্টিমারে চেন থাকে না বলছিলে না মশায়,
কিন্তু থাকলে ভাল হতো এখন এরূপ দশায়।'

'বাঃ বাঃ বেশ ! এই তো ! এই তো খাসা বেরুচ্ছে।' তিনি বাহবা দেন, 'বেশ সুরেলা হয়েই বেরুচ্ছে তো ! তোফা !'

ভগ্নকণ্ঠে আবার আমায় সুর নাড়তে হয় ঃ

'আমার দিদি, তোমার বৌ গো—
বলতে ব্যথা লাগে !
মরি হায় রে—'

'মরি হায় রে ! মরে যাই—মরে যাই ! বড়-বড় ওস্তাদের মতোই গিটকিরি মারতে শিখেছো দেখছি ?' তিনি টিটকিরি মারেন।

কিন্তু ওস্তাদি কাকে বলে জানি না, আমার গানের সুরগুলি নাকের থেকে—gun থেকে গুলির মতই—শেষ পর্যন্ত না দেগে থামা যায় না—

মরি হায় রে !······
তোমার যে বৌ—আমার যে বোন—
বলতে বেদন জাগে।
জলে পড়ে গেছেন তিনি
মাইল তিনেক দূরে—
মরি হায় হায় রে ! । !'

দুঃস্বপ্ন ভাঙতেই খাটিয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছি। কখন সকাল হলো ? ইস, বড্ডো বেলা হয়ে গেছে যে ! ইষ্টিমার ধরতে পারলে হয় এখন !

সুটকেসটা তুলে নিয়েই ছুটলাম। পথে নামতেই সেই সদালাপী মেঠাই-ওয়ালা সামনে এল—'আরে বাবু ! জাহাজ ছোড়তে আবি বহুৎ দেরি ! জাহাজ আখুনো আসেই নাই ! গরমাগরম পুরী ভাজিয়েছে—খাইয়ে যান !'

'তোমার পুরী আমার মাথায় থাক্ !' বলে আমি মাথা নাড়ি ঃ 'তোমার আর কি ? তুমি খাইয়ে যাও, আর আমি খুইয়ে যাই ! কালকেও তুমি ঐ কথাই বলেছিলে। ঐ বলে সারারাত তোমার ছারপোকা আর মশার কামড় খাইয়েছো। কিন্তু আর না !'

সেই সঙ্গে ওর সঙ্গীত-সুধা পানের কথাটা আর পাড়লাম না। পা বাড়ালাম। মনে মনেই বললাম, একবার নিজের পুরীতে গিয়ে যদি পেঁছুতে পারি—আমনুরার গাড়ি ধরতে পারি যদি—তাহলে আসল মেঠাই খাবো আমার মামার

বাড়ি। আমের চেয়ে মিঠে কিছু আর আছে নাকি? ঝুড়িখানেক আম আর এক গামলা ক্ষীর নিয়ে বসে যাও, খোসা ছাড়িয়ে ক্ষীরে ডুবিয়ে খোস মেজাজে খেতে থাকো। এক পয়সা খরচা নেই আমের পেছনে। আরামসে খাও। তারপর বিকেলে ছুরি-হাতে বেরিয়ে পড়ো বাগানে, আমগাছের ডালে উঠে আমোদ করো! হনুমানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাগো। আমের জন্যে কোন ব্যয় নেই। যা-কিছু ব্যয়াম তা শুধু খাওয়ার। হাতের আর মুখের।

ছুটতে ছুটতে ঘাটের কিনারায় পেঁছই। পেঁছেই দেখি—আঃ, ঐযে আমার ইস্টিমার—সামনেই খাড়া! ধড়ে আমার প্রাণ এল এতক্ষণে। এক দৌড়ে জেটির কোলে গিয়ে পড়লাম।

জেটিতে—ইস্টিমারে—চারধারেই তাড়া। ভীষণ হৈ-চৈ। এ-খালাসী ডাকছে ও-খালাসীকে—ভাইয়া হো! ইস্টিমারও ডাকছে—কাকে তা বলা কঠিন। কিন্তু তার দারুণ ভেঁায়ে কানে তালা ধরিয়ে দেয়।

জেটির কিনারে ইস্টিমারের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ওমা, ইস্টিমার যে জেটির বাঁধন কেটেছেন! ইস্টিমারে আর জেটিতে তখন বেশ কিছুটা ফারাক! ইস্টিমারের পাটাতন—ইস্টিমার ভিড়লে যেটি জেটির গায়ে এসে লাগে—সেতুবন্ধের মতই—যার ওপর দিয়ে যাত্রীরা ওঠে নামে—যায় আসে—গটগট ক'রে হাঁটে—কুলীরা যতো মাল তোলে, নামায়—যার সঙ্গে ইস্টিমারের জোঠতুতো সম্পর্ক—সেই সম্পর্ক আর নেই।

সে-সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে আমার আসার আগেই। ইস্টিমারের খালাসীরা তাদের পাটাতন তুলে নিতে যাচ্ছে···

এখন বুকের পাটা চাই। লালগোলায় ইস্টিমার ধরতে বেগ পেতে হবে বেশ—আমায় জানানো হয়েছিল বার-বার। সেই বেগ পেতে হলো এখন। আমি আগু-পিছু করি—বেগ পাবো কি পাবো না? তারপর মারি একলাফ সবেগে। মরিয়া হয়ে পড়ি গিয়ে পাটাতনের ওপর—পদ্মার ভগ্নাংশ পার হয়ে। গিয়ে বসে পড়ি। আমার কাণ্ড দেখে সবাই হৈ-হৈ করে ওঠে!

ইস্টিমারে—জেটির যতো লোক। কিন্তু কে কী বলছে, তা শোনার তখন কি আমার হুঁশ আছে! না কিছু দেখছি—না শুনছি! পায়ের তলায় পাটাতন পেয়েছি এই ঢের। মুহূর্তটাক বসে থাকি, তারপরে টলতে-টলতে উঠি—উঠে দাঁড়াই! সুটকেস আমার হাতে। তারপর আমার নজর পড়ে, নীচের দিকে। পাটাতনের তলায়—ওমা, এ যে থৈ-থৈ জল! দেখে আবার আমি বসে পড়ি। পাটাতনের নীচেই পদ্মার বিস্তার! আমার মাথা ঘুরতে থাকে।

উপুড় হয়ে পড়ি আবার—পাটাতনের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটি···আস্তে আস্তে এগুতে থাকি···সুটকেস টানতে টানতে। দিচ্ছি তো দিচ্ছিই হামাগুড়ি। যেন এর শেষ নেইকো। ইস্টিমারের ডেক মনে হয়, মাইল দেড়েক দূরে। যাই হোক, যত দেরিই হোক, গুঁড়ি মেরে-মেরে পেঁছলাম গিয়ে। উঠলাম ডেকে।

তখন দেহের সাথে সাথে সারা মনও যেন আমাকে ডেকে উঠল—পেয়েছি! পেয়ে গেছি!!

ডুকরে উঠল মনের থেকে ধন্যবাদ—বিধাতার উদ্দেশ্যে—ইষ্টিমারের উদ্দেশে—আমার নিজের উদ্দেশে—মুখর হয়ে ডেকের উপর নিজেকে রেখে হাঁপাতে থাকলাম।

নাঃ, আর না—আর কক্‌খনো না। কদাপি আর এমন বিপজ্জনক কাজে হাত দেবো না—হাত পা কোনটাই নয়। শপথ করি নিজের মনে। মা দুর্গার দয়ায় বড্ডো বেঁচে গেছি এ-যাত্রা।

হুঁশ্ হতে দেখলাম, এক-জোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে।

নীল পোশাকে এক খালাসী।

'ঈস্! ইষ্টিমার-ধরা কি চাট্টিখানি?' হাঁপ ছেড়ে আমি বলিঃ 'কিন্তু ধরতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত। কি বল খালাসী সায়েব?'

খালাসীটা হাসল—'কি দরকার ছিল বাবু এত মেহনতের? জাহাজ তো আমরা ভেড়াচ্ছিলাম জেটিতেই। খানিক পরে এমনি আসতেন—হেঁটেই আসতেন সোজা। সবুর করলেই পারতেন একটু।'

অ্যাঁ? তাই নাকি? তখন আমার খেয়াল হলো। হ্যাঁ, তাও তো হতে পারে। পাটাতন তুলছিল না, নামাচ্ছিলই খালাসীরা। নামিয়ে জেটির গায়ে লাগানো হচ্ছিল—বুঝতে পারলাম তখন।

তাকিয়ে দেখলামও তাই। গোদাগাড়ির ইষ্টিমার সোরগোল করে লালগোলার জেটির কোলে এসে ভিড়েছে। জ্যেঠতুতো সম্পর্কের আত্মীয়তা সুনিবিড় হয়েছে এতক্ষণে।

ওপারের যাত্রীদের নিয়ে ইষ্টিমারটা এসে পেঁছিল সেই-মাত্তর!

আর কিছু না, বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলেছি খালি : 'চা খাও আর না খাও, আমাকে তো চাখাও।'

অমনি দোকানের ও-কোণ থেকে কে যেন তার কান খাড়া করল, ছোট্ট একটি ছেলে, আমি লক্ষ্য করলাম।

'দূর! এই অবেলায় এখন চা খায়? শুধু একগ্লাস জল—আর কিছু না!' বন্ধুর জবাব এল : 'আর—আর না হয় ওই সঙ্গে একখানা বিস্কুট। ভাগাভাগি করেই অবিশ্যি।'

'ভারী যে নিরাসক্তি! না বাপু, আধখানা বিস্কুটে আমার লোভ নেই, আর নীরেও আমার আসক্তি নেই তুমি জানো। আমার চা-ই চাই!'

কান-খাড়া-করা ছেলেটি এবার বলে উঠল : 'অ্যাঁ, কি বললেন?'

'তোমাকে তো কিছু বলিনি ভাই!' আমি বললাম : 'আমি বকচি এই—এই পাশের—আমার পাশের—কি বলব একে? এই পার্শ্ববর্তীকে।'

'আপনি শিব্রাম চকরবরতির মতো কথা বললেন না?'

'অ্যাঁ? কার মতো কথা বল্লাম?' আমার বেশ চমক লাগে।

'শিব্রাম চকরবরতির মতো।'

এবার আমি হকচাকিয়েই গেছি! বা রে! আমি আবার কার মতো কথা বলতে যাব? আমি কি—বলতে কি—আমি নিজেই কি উক্ত অভদ্রলোক—সেই শিব্রাম চকরবরতি নই?

'ওই রকম মিলিয়ে-মিলিয়ে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ল্যাজামুড়ো এক করে কথা বলা ভারী খারাপ। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। বুঝলেন মশাই?'

'তুমি কি—ঐ কি নাম বললে—সেই ভদ্রলোককে কখনো দেখেচ?'

'না দেখিনি, দেখবার আমার বাসনাও নেই। ঐ ভদ্রলোক আমাকে যা বিপদে ফেলেছিলেন একবার।'

'অ্যাঁ, বলো কি? তোমাকে তিনি বিপদে ফেলেছিলেন?' আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওকে পর্যবেক্ষণ করি: 'কই, আমার তো তা মনে পড়চে না!'

'উনি কি আর ফেলেছিলেন? ওঁর মতো কথা বলতে গিয়ে আমি নিজেই ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম!' ছেলেটি বলল: 'হাড় কখানা আস্ত নিয়ে যে নিজের আস্তানায় ফিরতে পেরেছি এই ঢের!'

'ও, বুঝেচি! সেই তারা, সেই সব বিচ্ছিরি লোক, শিব্রাম চকরবরতির লেখা যারা একদম পছন্দ করে না, তারাই বুঝি? তারা তোমার কথা শুনে, তোমাকেই শিব্রাম চকরবরতি ভেবে, সবাই মিলে, ধরে বেঁধে বেশ এক চোট বেধড়ক—'

'উঁহুহু!' ছেলেটি বাধা দেয়: 'তারা কেন মারবে? তারা কারা? তারা কোথেকে এল? না, তারা নয়। সেই জন্যেই তো বারণ করচি, শিব্রাম চকরবরতির মতো কথা কক্ষণো বলবেন না। ওই ধরনের কথা বলার বদভ্যাস ছাড়ুন, জন্মের মতো ছেড়ে দিন—তা নাহলে আপনাকেও হয়তো কোনদিন আমার মতো বিপদে পড়তে হবে।'

বন্ধুর উদ্দেশ্যে বললাম—'তাহলে চা থাক! খোকার গল্পটাই শোনা যাক! বলো তো ভাই, কাণ্ডটা। ওই বিষয়ে বলতে কি, সব চেয়ে বেশি আমারই আগে সাবধান হওয়া দরকার।'

এবং আমার বন্ধু—যিনি এতক্ষণ চায়ের বিপক্ষে ছিলেন—চাউর করলেন:

'না, চা আসুক! এবং তুমিও এসো এই টেবিলে। ওহে, তিন কাপ চা, আর—আর তিন ডজন বিস্কুট! চা খাই আর না খাই, তোমাদের তো—কি বলে গিয়ে—চা পান করাতে দোষ নেই?'

'খুব সামলে নিয়েছেন।' ছেলেটি আমাদের টেবিলে এসে বসল: 'বলতে পারতেন যে ঐটেই দস্তুর!—সঙ্গে বলতে পারতেন আরো। কিন্তু খুব বাঁচিয়ে নিয়েছেন। শিব্রাম চকরবরতি এখানে থাকলে, ঐ দোষের জন্যে দস্যুকেও নিয়াসতেন বিনা দোষেই। ঐটেই ওঁর মস্ত দোষ। টেনে হিঁচড়ে কেমন করে যে তিনি এনে ফেলেন।'

'কি করে যে এত পারেন ভদ্রলোক, আমি আশ্চর্য হই।' আশ্চর্য হয়ে আমি বলি।

'যেমন করে মুর্গিতে ডিম পাড়ে, তেমনি আর কি!' বন্ধুবরের অনুযোগ: 'এমন কি শক্ত?'

'শক্ত ? কিছু না।' ছেলেটি বলে : 'আমরা সবাই পারি। আমাদের ক্লাসের পেত্যেক ছেলে। আমাদের বাড়িতে দাদারা, দিদিরা, এমন কি বৌদি পর্যন্ত। ওতো এনতার পারা যায়, ঐ উনি যা বললেন—একেবারে মুর্গির মতোন। আস্ত ঘোড়ার ডিম। পেড়ে দিলেই হলো—পারতে কি ! তবে লেখকের মধ্যে ঐ একজনই শুধু পারেন—কিন্তু পাঠকের হাজার হাজার। পাঠকের মধ্যে এক আমিই যা ঠেকে শিখেচি, আমি আর পারব না।' ছেলেটি নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করে।

এরপর, আসল গল্পটা যতদূর সম্ভব ছেলেটির নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করা যাক :

'গরমের ছুটিটা কোথায় কাটানো যায় ! ভাবলুম; অনেক দিন তো যাইনি, কাকার ওখানেই যাই—' ছেলেটি শুরু করল বলতে : 'আসানসোলে গিয়ে সোলে শান দিয়ে আসি। কলকাতার বাইরে ফাঁকাও হবে; আর আরাম করে থাকাও হবে। একেবারে আমের আশা যে ছিল না তাও না, তবে—না মশাই, আমার আমাশা ছিল না। তবে, কাকার বাগানে ঢুকে আম জাম যে বাগানো যাবে সে আশা খুবই ছিল।'

ছেলেটি অম্লানবদনে অকাতরে বলে যাচ্ছিল, আর আমার চোখ ক্রমশই বড়ো থেকে আরো বড়ো হতে হতে, ছানাবড়া কি, লেডিকেনি পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেল। অবশেষে আমি আর থাকতে পারলাম না—

'থামো, থামো ! তুমি বলচ কি ? তুমি কি বলচ, তুমি শিব্রাম চকরবরতি নও ? তুমি নিজেই নও ? ঠিক বলচ ? ঠিক জানো ? আমার গুরুতর সন্দেহ হচ্ছে, তুমিই শিব্রাম চকরবরতি ?'

'আমি ? না; আমি না।' ছেলেটি ম্লান একটুখানি হাসল।

'বলো, নির্ভয়ে বলো, কোন ভয় নেই। লোকটার ওপর রাগ আছে, কিন্তু আমরা তোমাকে ধরে ঠ্যাঙাব না।' আমার বন্ধুটি অভয় দিয়ে বলেন : 'না, এমন সামনে পেয়ে বাগে পেলেও না।'

'কী যে বলেন ! শিব্রাম চকবরবরতি লোকটি কি এতই ছোট হবে ?' এই বলে ছেলেটি আত্মরক্ষার খাতিরেই কিনা বলা যায় না, অদূরবর্তী আয়নায় প্রতিফলিত নিজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল : 'চেয়ে দেখুন তো ! আর শিব্রাম চকরবরতির নাকি গোঁফ-দাড়ি একদম থাকবে না ?'

'সে একটা কথা বটে !' আমি ঘাড় নাড়ি : 'শিব্রাম চকরবরতি লোকটা এত ছোট না হওয়াই উচিত। এতদিনে তো সাবালক হবার কথা। তবে কিনা, ছোট লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তা ছাড়া, তা ছাড়া'—আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি : 'তুমি ঠিক ছদ্মবেশে আসো নি তো ? মানে কিনা,—ভদ্র ভাষায় বলতে হলে—আপনি ছদ্মবেশে আসেন নি তো শিব্রাম বাবু ?'

ছেলেটি মুখ ভার করে ভাবতে লাগল, বোধহয় তারা ধরা পড়ে-যাওয়া

ছদ্মবেশের কথাই সে ভাবতে লাগল। আমিও ভাবতে থাকি, ঐ শিব্রাম হত-ভাগাটাকে অনন্‌করণীয় বলেই আমার ধারণা ছিল। একটু অহঙ্কারও না ছিল তা নয়! অননন্‌করণীয় মানে, অনন্‌করণের অযোগ্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ওর সম্বন্ধে আমার, অনেকের মতো আমারও একটা ভুল ধারণাই এতদিন থেকে গেছে! অত্যন্ত সহজেই যে-কেউ ওকে— মানে, ঐ শিব্রামটাকে—টেক্কার পর টেক্কা মেরে বেটক্কর যেতে পারে। তবে আর কষ্ট করে ওর লেখাপড়া কেন? ছোঃ! অন্ততঃ আমি তো আর পড়ছিনে; ওর আজে-বাজে যতো বই, আজ থেকে সব তালাক দিলাম, তালাবন্ধ থাকল বাক্সে!

'আপনি বলছেন আমিই সেই?' ছেলেটি আরো একটু ম্লান হাসল। ছদ্ম-বেশে এসেছি বলে আপনাদের মনে হচ্ছে? বেশ, তাহলে আমার নাককান টেনে টেনে দেখন্‌! দেখতে পারেন টানাটানি করে। মন্‌খোস হলে তো খন্‌লে আসবে?'

ছেলেটি তার মন্‌খ বাড়িয়ে দিল। আমার হাত সুড় সুড় করলেও আত্ম-সম্বরণ করে বললাম: 'আচ্ছা, পরে পরীক্ষা করে দেখবখন! এখন তোমার গল্প তো শেষ কর!'

আরম্ভ করল ছেলেটি:

'গেছি তো কাকার বাড়ি। নিরাপদে পে'ছেচি। কাকা তখন বেদানা খাচ্ছিলেন; কোন জবরজারি হয়নি, এমনই সুস্থ শরীরে বেদনা দিয়ে ব্রেক-ফাস'ট করছেন, দেখেই বন্‌ঝতে পারলাম।

আমি যেতেই বলেন, 'এইযে, এইযে! মন্টু যে! খবর কি? আছিস কেমন?'

'খবর ভাল। সামার ভেকেশন আমার কিনা! ভাবলন্‌ম, আসানসোলে এসে সোলে একটু—'

কাকাবাবন্‌ বাধা দিয়ে বলেন: 'বেশ বেশ! এসেছিস; বেশ করেছিস। যখন পারবি তখনই আসবি। কাকা-কাকীর বাড়ি সবাই আসে। আসে না কে?'

'ডাকাডাকি না করেই তো আসে।' ঐ সঙ্গে এইটুকুও যদি যোগ করতেন কাকাবাবন্‌, ভারী খন্‌শি হতাম। কিন্তন্‌ কাকাবাবন্‌ ওর বেশি আর এগন্‌লেন না, অধিক বলা বাহন্‌ল্য মাত্র ভেবে চেপে গেলেন একেবারে। বোধহয় শিব্রাম চকরবরতির বই ওঁর তেমন পড়াটড়া ছিল না।

পায়ের ধন্‌লো নিতে না নিতেই তিনি গলে পড়লেন: 'এই নে! বেদানা খা।'

বেদানার অনন্‌রোধে বেশ দমে গেলাম। ও-জিনিষ অসুখবিসুখে খেতেই যা বিচ্ছিরি, তার ওপর সুস্থ শরীরে খেতে হলেই তো গেছি। বেদানাটা হাতে নিয়ে বললাম: 'কাকাবাবন্‌! বেদানা দিলেন বটে, কিন্তন্‌ বলতে কি, একটু

বেদনাও দিলেন।'

কাকা আমার কথাটায় কানই দিলেন না।

'নে নে, খেয়ে ফ্যাল! খেলে গায়ে জোর হয়। ভাল শরীরে খেলেই আরো জোর বাড়ে। নে, ছাড়িয়ে খা! কাকা বেদানা দিলে খেতে হয়।'

মনে মনে আমি বলি, 'কাকস্য পরিবেদনা!' এবং প্রাণপণে বেদনা দূর করি, এক একটাকে পাকড়ে, গলা ধরে দূর করে দিই—একেবারে গালের ভেতরে। তারপর আমার গলার তলায়।

'তুমি গলাধঃকরণ করো। বুঝতে পেরেচি।' আমি বলি।

'ঠিক বলেচেন! চমৎকার বলেচেন, কিন্তু'—ছেলেটি উসকে উঠেই তক্ষুনি আবার নিবু নিবু হয়ে আসে, কেমন যেন মুষড়ে পড়ে। 'তার পরে শুনুন!'

এমন সময়ে কাকীমা এসে পড়লেন। এসেই কাকার কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।

'কী, সকাল বেলায় ছেলেটাকে ধরে ধরে বেদানা খাওয়াচ্ছ? ওসব ওদের কখনো ভাল লাগে? রোচে কখনো? মন্টু, আয় চপ খাওয়াব তোকে, ভাল এঁচোড়ের চপ, আমার নিজের তৈরি, রান্নাঘরে আয়।'

পিতৃব্যস্নেহ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে উঠলাম। কাকীমা ছোট্ট একটু পিঁড়ি দিলেন বসতে: 'বোস।'

'না, এই ভুঁয়েই বসি।' আমি বললাম: 'পিঁড়ি দিয়ে কেন আর পীড়িত করছেন কাকীমা?'

'অ্যাঁ, কি বললি?' কাকীমা কান খাড়া করলেন।

'পিঁড়ি তো নয়, পীড়নের যন্ত্র।' আমার পুনরুক্তি হলো: 'যন্ত্রণাও বলতে পারেন।' আরো ভাল করে বললাম আবার: 'না, কাকীমা, আমি প্রপীড়িত হতে চাইনে।'

কাকীমা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

'এসব আবার কেমন কথা?' কাকীমা হাঁ করে রইলেন: 'যন্ত্র আবার যন্ত্রণা—কীসব যা তা বকচিস আবোল তাবোল?' কাকীমার দুই চোখ বিস্ময়ে চোখা হয়ে উঠল।

'চপ দিন, তাহলে চুপ করব।' বললাম আমি।

কাকীমা একটু ইতস্ততঃ করে চপের প্লেটটা এগিয়ে দিলেন।

কামড়াতে গিয়ে দেখি দাঁত বসে না। চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র বাইরে এ আবার কি জিনিস রে বাবা?

'কাকীমা, এ কি বানিয়েছেন? এ কি চপ? এর চাপ তো আমি সইতে পারছি না।' আমি জানাই: 'এঁচোড়গুলো আগে কিমা করে নেন নি কেন কাকীমা? এ যে চোরেরও অখাদ্য হয়েছে। এই চপের আঘাত না করে

আমাকে চপেটাঘাত করলেও পারতেন। আমি হাসিমুখে খেতাম।'

কাকীমার চোখ কপালে উঠে যায়, বহুক্ষণ তাঁর মুখে কথা সরে না। তারপর তাঁর সমস্ত মুখ কেমন একটা আশঙ্কার আবছায়ায় ভরে ওঠে। তিনি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করেন: 'ঢোকবার আগে তুই এ-বাড়ির ছাঁচতলাটায় দাঁড়িয়ে ছিলি না? তুই-ই তো? আমি ওপর থেকে দেখলুম যেন?'

'হ্যাঁ, ভাবছিলুম, আপনাদের নতুন দারোয়ান বাড়িতে ঢুকতে দেবে কিনা! আমাকে দ্যাখেনি তো আগে।' আমি কৈফিয়ত দিই: 'নাম লিখে পাঠাতে হবে ভেবে কাগজ পেনসিল খুঁজছিলাম, কিন্তু দরকার হলো না। সে একটু কাত হতেই আমি তার পেছন দিক দিয়ে সাঁত করে গলে পড়েছি।'

'ছাঁচতলাতে তুইই দাঁড়িয়েছিলি!' কাকীমার সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসে: 'তাই তো বলি! কেন আমার এমন সর্বনাশ হলো।'

কাকীমা পা টিপে টিপে পেছোতে থাকেন: 'চুপ করে বসে থাকো। নড়ো না যেন। আমি আসচি এক্ষুনি।'

কাকীমার এই অদ্ভুত বিহেভিয়ার আমি যতই ভাবচি ততই মনে মনে হেভিয়ার হচ্ছি। ওরকম ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মানে? আমিও কি একটা এঁচোড়ের চপ না কি?

একটু পরে কে যেন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। আবার কে একজন, একটু গলা বাড়িয়েই সরে যায়। আমার কাকতুত ভাইবোন সব, বুঝতে পারি। কাকার আর সব পরিবেদনা, কাকীমার অন্যান্য অনাসৃষ্টি। ইকোয়ালি অখাদ্য। এক একটি পাকা এঁচোড়ের চপ! কেন বাপু, অমন উঁকিঝুঁকি মারামারি কেন? আমি যদি এমনই দ্রষ্টব্য, সামনা সামনি এসে কি আমাকে দেখা যায় না?

ওদের সবার হাবভাব আমার ভারী খারাপ লাগে। কেমন কেমন ঠেকে যেন। আশপাশ থেকে চাপা গলা কানে আসে, চারধার থেকে ফিস ফিস গুজ গুজ শুনি, আর আমার দু-হাত নিসপিস করতে থাকে। ইচ্ছে করে, হাতের নাগাল না পাই, কসে এক ঘা—এই চপ ছুঁড়েই লাগাই না কেন এক একটাকে?

ভাবতে ভাবতে যেমন না দরজা তাক করে একটা চপ নিক্ষেপ করেছি ওই নেপথ্যের দিকেই—অমনি হুটপাট বেধে গেছে। হুড়মুড়, দুড়দুড়, হৈ-হৈ, দুদ্দাড়—রৈ রৈ কাণ্ড!

'বাবা রে! মা রে! ধরলে রে! গেছি রে! কি ভুত রে বাবা! খেয়ে ফেললে রে!' ভারী হৈ চৈ পড়ে গেল হঠাৎ।

আমি বিরক্ত হই। ভারী অসভ্য তো এরা! খেয়ে ফেললাম কখন? ও-চপ তো না খেয়েই আমি ফেলেচি, এঁটো তো নয়, তবে কেন?

অবশেষে কাকীমা এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এল সনাতন। সনাতন এ-বাড়ির পুরাতন চাকর। সনাতন-কাল থেকে ওকে দেখছি।

দুজনেই সসঙ্কোচে ঢুকল।

সনাতন একেবারে আমার অদূরে এসে দাঁড়াল। কীরকম চোখ পাকিয়ে কটমট করে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে; যেন চিনতেই পারছে না আমায়।

পুরানো চাল যেমন ভাতে বাড়ে, পুরানো চাকর তেমনি চালে বাড়বে, এ আর বিচিত্র কি? তবু আমি একটু অবাক হলাম।

'কাকীমা একি!' আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

কাকীমা কি রকম একটা সন্ত্রস্ত ভাবে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন, বেশি আর এগোননি। তিনি কোন জবাব দিলেন না। তাঁর পেছনে, চোখ বড়ো বড়ো করে বাড়ির যত ছেলেমেয়েরা, ঝি-চাকর যত!

সনাতন বিড়বিড় করে কী সব বকে, আর সরষে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমায় লাগায়। আমার সারা গায়ে।

আমার ভারি বিচ্ছিরি লাগে। এবং লাগেও মন্দ না বলি: 'সনাতন, এসব কি হচ্ছে? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কী বিড়বিড় করচ? তোমার ঐ কটাক্ষ আমার একেবারেই ভাল লাগছে না।'

সনাতন তবুও বিড় বিড় করে।

'কথং বিড়বিড়ায়সি—সনাতনং?' আমি সংস্কৃত করে বলি: 'সনাতন, তোমার এ বিড়ম্বনা কেন?'

'আপনি কে?' সনাতন এতক্ষণ পরে একটা কথা বলে।

'আমি—আমি তোমাদের মণ্টু। আমাকে চিনতে পারচ না, সনাতন?' আমি অবাক হয়ে যাই।

'মণ্টু না হাতি!' সনাতন বলে: 'বলুন আপনি কে? আপনি কি আমাদের বেলগাছের বাবা? দয়া করে এসেচেন পায়ের ধুলো দিতে, আজ্ঞে?'

'ওসব রসিকতা রাখো। কারো বাবা-টাবা আমি নই, তা বেলগাছেরই কি আর তালগাছেরই কি! ওসব গেছো ছেলেদের আমি ধার ধারিনে।'

'তবে কে তুমি? তুমি কি তাহলে আমাদের গোরস্থানের মামদো?' সনাতন একটু সভয়েই এবার বলে।

'বলচি না, আমি মণ্টু? ন্যাকামি হচ্ছে নাকি? কদ্দিন কতো চকোলেট খাইয়ে তোমায় মানুষ করলাম!' আমার রাগ হয়ে যায়।

'মণ্টু না ঘণ্টা। আমাকে আর শেখাতে হবে না। আমার কাছে চালাকি? ভূত চরিয়ে চরিয়ে আমার জীবন গেল। হাড় ভেঙে সুরকি বানিয়ে দেব। বল্, কোন্ ভূত আমাদের মণ্টুর ঘাড়ে চেপেচিস? বল্ আগে?'

'বোধ হয় কোন রামভূত!' আমি আর না বলে পারি না। আধা-গপ্পের মাঝখানেই বাধা দিয়ে বলি। স্বনামধন্য আমার নিজের প্রতিই কেমন যেন একটু কটাক্ষ হয়, কিন্তু না বলে পারা যায় না।

'সনাতনও ঠিক ঐ কথাই বলল। বলল, গিন্নীমা, এ হচ্ছে কোন রামভূত! সহজে এ ছাড়বে না। রাম নামেও না। সরষে-পড়া নয়, এর অন্য ওষুধ আছে।'

এই বলে—'

ছেলেটি আরো বিস্তারিত করে: 'সনাতন করল কি, জলভর্তি বড়ো একটা পেতলের ঘড়া এনে হাজির করল আমার সামনে। বলল, 'বুঝেচি তুই কে? ঐ অ্যাশশ্যাওড়ার শাঁকচুন্নী। টের পেয়েছি ঢের আগেই। তোল্, তোল্ এই ঘড়া দাঁতে করে।'

'ভাবুন দিকি, কী ব্যাপার! ঘড়া দেখেই তো আমার চোখ ছানাবড়া। আমাকে ওরা যে কী ঠাউরেছে তাও আর আমার বুঝতে বাকী নেই। ওদের কাছে আমি এখন কিম্ভূতকিমাকার! আমার প্রতি ওদের কারু যে মায়া দয়া হবে না তাও বেশ বুঝতে পেরেছি। আমার ভূত না ছাড়িয়ে ওরা ছাড়বে না।'

'তবু একবার কাকীমাকে ডাকি—শেষ ডাকা ডেকে দেখি: কাকীমা, এসব তোমাদের কি হচ্ছে? আমাকে তোমরা পেয়েছ কি? এসব কি বাড়াবাড়ি? আমার একদম ভাল লাগছে না।'

কাকীমা চোখের জল মুছে চুপ করে থাকেন।

তখন সনাতনকে নিয়েই শেষ চেষ্টা করতে হয়। তাকেই বলি: 'বাপু, তোমার এই সনাতনপদ্ধতি অতিশয় খারাপ। কি চাও বলো তো? চকোলেট না চারটে পয়সা? তাই দেব, ছেড়ে দাও আমায়।'

'শাঁকচুন্নী ঠাকরুণ, আর নাকে কান্না কেঁদনি! ভাল চান তো যা বলি তাই করুন দিকি এখন।' এই বলে সনাতন ঘড়াটাকে মন্ত্র পড়ায়।

'আমার মাথা ঘুরে যায়! জলভরা ঐ বড় ঘড়া—এক মণের কম হবে না। দু'হাতেই কোনদিন তুলতে পারিনি, আর তাই কিনা, মুষ্টিমেয় এই কটা দাঁতে আমায় তুলতে হবে?'

জাতও গেল, দাঁতও গেল, প্রাণও যায় যায়!

ধমক লাগায় সনাতন: 'ভাল চাস তো ন্যাকাপনা রাখ! তোল দাঁতে করে। নইলে দেখেছিস—'

বলতে না বলতে সনাতন—

ছেলেটি থেমে যায়। মুখ চোখ তার লাল হয়ে ওঠে। চকচকে চোখ ছলছল করতে থাকে।

আমার বন্ধুটি উৎসাহ দেয়: 'বলো বলো—জমেছে বেশ।'

আমি কিছু বলতে পারি না। মুখ কাঁচুমাচু করে বসে থাকি। সব দায়, সমস্ত অপরাধ যেন আমার—আমারই কেবল! এই কেবলি আমার মনে হতে থাকে।

'বলতে না বলতে সনাতন ঘা কতক আমাকে লাগিয়ে দেয়! এই সনাতন, যাকে আমি কত চকোলেট খাইয়েছি, ছোটবেলায় কত না ওর পিঠে চেপেছি, কতই না ওকে পিটেছি, আর সেই কিনা…'

ছেলেটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। আমার এক চোখ দিয়ে জল গড়ায়। আমার বন্ধু রুমালে নাক মোছেন।

'জগতের এই নিয়ম।' বর্ষণমুখর চোখটা মুছে ফেলে আমি দার্শনিক হবার চেষ্টা করি। 'তুমি কেঁদ না, কেঁদ না তোমরা,—সনাতন রীতিই এই! আজ তুমি যার পিঠে চাপছ, কাল সেই তোমার পৃষ্ঠপোষক! উপায় কি?' এই বলে আমার যথাসাধ্য ওদের সান্ত্বনা দিই।

ছেলেটি ম্লান একটুখানি হেসে আবার শুরু করে: 'বেশ বোঝা যায়, সনাতন আমার হাতে যত না মার খেয়েছে এর আগে, এখন বাগে পেয়ে সে সবের শোধ তুলে নিচ্ছে। এই সুযোগে এক ছুতো করে বেশ একচোট হাতের সুখ করে নিচ্ছে। সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছে, বেশ বুঝতে পারি।

কি করি? কাঁহাতক মার খাব? প্রাণের দায়ে ঘড়াকে মুখে তুলতে যাই। কিন্তু পারব কেন? একটু আগে আমি যে চপেই দাঁত বসাতে পারিনি, কিন্তু সে তো এর চেয়ে ঢের নরম ছিল। আর এর চেয়ে হালকা তো বটেই!

সনাতন কিন্তু ঘড়ার চেয়েও কড়া। সে ধাঁ করে তার ওপরেই—'

ছেলেটি আর বলতে পারে না।

বলতে হবে না। আবার ঘা কতক! বুঝতে পেরেচি।' আমার বন্ধুটি ভগ্নকণ্ঠে বলেন, এবং রুমালে নিজের চোখ মুছতে ভুল করে তাঁর পাশের আরেক জনের মুখ মুছিয়ে দেন।

আমার অপর চোখটি দিয়ে এবার জল গড়াতে থাকে।

'তখন আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। এই ধাক্কায় মূর্চ্ছিত হয়ে গেলে কেমন হয়? তাহলে হয়তো এ-যাত্রা বেঁচে যেতেও পারি। রোজার হাত থেকে ডাক্তারের খর্পরে পড়ব, হয়ত ইনজেকসনই লাগাবে, তেঁতো ওষুধ গেলাবে, কিন্তু সেও ঢের ভাল এর চেয়ে।

ব্যস, অমনি আমি পতন ও মূর্চ্ছা—একেবারে নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু!'

এই বলে এতক্ষণ পরে ছেলেটি একটু হাসল, এবার আত্মপ্রসাদের হাসি!

'মূর্চ্ছার মধ্যেই আমি শুনতে থাকি, চোখ বুজেই শুনতে পাই, সনাতন বলছে, 'গিন্নীমা, আমার মনে হয় ভুত নয়। ভুত হলে আলবৎ দাঁতে করে তুলতো। এর চেয়ে ভারী ভারী ঘড়া অক্লেশে তুলে ফেলে। আমার নিজের চোখেই দেখা! আমার মনে হয় মন্টুবাবুর মাথা বিগড়ে গেছে। যা বড় বড়

চুল, এই গরমে, তাই হবে। আপনি কাঁচিটা আমায় দিন ত ! চুলগুলো কদম ছাঁট করে মাথায় ঠাণ্ডা গোবর লাগালে দু-এক দিনেই খোকাবাবু শুধরে উঠবেন।'

এই কথা যেই না আমার কানে যাওয়া, আমি তো আর আমাতে নেই। অ্যাঁ, আমার এমন সাধের একচোখ-ঢাকা চুল—শিব্রাম চকরবরতির দেখাদেখি কত্ত করে বাড়িয়েছি—'

আমি বাধা দিয়ে বলি: 'তবে যে তুমি বললে, শিব্রাম চকরবরতিকে কখনো দেখনি ?'

ঠিক স্বচক্ষে দেখিনি। তবে আজকাল ওঁর যত বইয়ে ওঁর চেহারার যে সব কার্টুন বেরয় তাই দেখেই আন্দাজ করে রেখেছিলাম। আপনিও তো মশাই প্রায় তাঁর মত করেই চুল রেখেচেন দেখা যাচ্ছে !' আমার প্রতি কটাক্ষ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে ছেলেটি: 'কত কষ্ট করে কত বকুনি সয়ে, কত সমাদরে বাড়ানো এই চুল, তাই যদি গেল, তাহলে আর আমার থাকল কি !'

'সনাতনের গিন্নীমা কাঁচি আনতে গেছেন, আর আমি এদিকে চোখ টিপে টিপে চেয়ে দেখলাম, সনাতন ঘাড়টা সরাচ্ছে, সেই সুযোগে আমি না, একলাফে তিড়িং করে না উঠে, চৌকাঠ পেরিয়ে, কাকাতুত রাক্কোসদের এক ধাক্কায় কক্ষচ্যুত না করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে এক্কেবারে সেই সদরে—!

দারোয়ান হতভাগা, দ্বারে যার ওয়ান হয়ে সব সময়ে খাড়া থাকবার কথা, সে-ব্যাটা তখন জিরো হয়ে পড়েছিল। ইংরিজি ওয়ান-এর বদলে, বাংলা ১ বনে গিয়ে পা গুটিয়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে জিরোচ্ছিল, আমি না সেই ফাঁকে···

'ধর ধর ধর ধর ধর !' সোরগোল উঠল চারদিকে।

আর ধর ! এই ধুরন্ধর ততক্ষণে—' ছেলেটি থেমে গেল। গল্পটাকে সুচারুরূপে শেষ করার জন্য, কপাল কুঁচকে, যুৎসই একটা কথা খুঁজতে লাগল মনে হয়।

'পালিয়ে এসেচ। বুঝতে পেরেচি, আর বলতে হবে না।' আমার বন্ধুটিই পালা শেষ করেন। 'পালানো হচ্ছে একটা লম্বা ড্যাশ – ওর কোথাও ফুলস্টপ নেই।'

'তোমার নামটি কি ?' আমি জিগ্যেস করি: 'মণ্টু তো বলেছ। কিন্তু ভাল নামটি কি তোমার ?'

'ধ্রুবেশ।'

'বাঃ, বেশ !'—বলতে গিয়ে আমার বলা হয় না। গলায় আটকায়।

সেই থেকে নকুড় মামার মাথায় টাক। ফাঁস করছি সেকথা অ্যাদ্দিনে···

চালবাজি করতে গিয়ে—চালের ফাঁকিতে বানচাল হয়ে—মাথার আটচালায় ঐ ফাঁক! সেদিন যে হাল হয়েছিল—যা নাজেহাল হতে হয়েছিল আমাদের··· কী আর বলবো!

সাড়ে-এগারোটা থেকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে, ভিড় ঠেলে, ঘোড়ার ধাক্কা সয়ে কতো তপস্যার পর তো ঢুকলাম খেলার গ্রাউণ্ডে! ভিড়ের ঠেলায় পকেট ছিঁড়ে যা ছিল সব গড়িয়ে গেছে গড়ের মাঠে। মানে, মামার পকেটের যা-কিছু ছিল। আমার পকেট তো এমনিতেই গড়ের মাঠ!

ছিন্ন হয়ে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে ঢুকেছিলাম, ভিন্ন হয়ে বেরুলাম খেলার শেষে। —ঐ ভিড়ের ঠেলাতেই।

ভাগ্যিস্ মামা ছিলেন হুঁশিয়ার! খাড়া ছিলেন গেটের গোড়ায়, তাই একটু না আগাতেই দেখা মিলল, নইলে এই গোলের মধ্যে (মোহনবাগানের এত গোলের পর) আবার যদি মামাকে ফের খুঁজতে হতো তা হলেই আমার হয়েছিল! আমার হাঁকডাকে কতো জনার সাড়া মিলতো, কতো জনার কতো মামাই যে অযাচিত এসে দেখা দিতেন—কে জানে! এই জন-সমুদ্রে আমি

নিজেই হারিয়ে যেতাম কিনা তাই কে বলবে! আমার নিজেই খেই হারিয়ে গেলেই তো হয়েছিল।

মামা বললেন, 'একটু চা না হলে তো বাঁচিনে রে, যা তেষ্টা পেয়েছে; বাপ্স্! গলা শুকিয়ে যেন কাঠ মেরে গেছে—জিভ-টিভ সব সুখতলা।'

'আমারো তেষ্টা লেগেছে মামা।' আমি বলি: 'তবে চা যদি নেহাত নাই মেলে, শরবত হলেও আমার হয়।'

'হ্যাঁ, শরবত! বলে চায়েরই পয়সা জুটছে না, তো শরবত!' নকুড় মামা চ্যাঁচান: 'দু-আনা পয়সা হলে এক কাপ চা কিনে দু'ভাগ করে খাওয়া যায়। গলাটা একটু ভিজিয়ে বাঁচি—দু'জনেই বাঁচি। আছে না কি তোর কাছে দু-আনা?'

'না মামা।'

'একটা দুয়ানিও নেই? একদম না? দেখেছিস ভাল করে? তা দুয়ানি না থাক্—দুটো আনি? দুটো আনি হলেও তো হয়।

'অ্যাঁ! তাও না? একটা আনি আরদুটো ডবল পয়সা? নেইকো? যাকগে, তবে চারটে ডবল পয়সা—তাই দে? তাও পারবিনে? তাহলে ডবলে আর বে-ডবলে মিলিয়ে বার কর। মোটের ওপর যে করেই হোক আটটা পয়সা হলেই হয়ে যায়। তবুও ঘাড় নাড়ছিস? তাও নেই? তাহলে ফুটো পয়সাই সই—তাই বার কর দেখি আটটা—তাহলেই হবে, তাতেই চালিয়ে নেব কোন রকমে।'

'না মামা।' আমার পুনঃ-পুনরুক্তি।

'আহা, প্রাণে যেন আমর চিমটি কেটে দিলেন? কেতাথ হলুম। মামা আমায়—'ন্যা-ম্যা-ম্যা।'

কার্জন পার্কের কোণ অবদি মামা চুপচাপ আসেন, আধমড়ার মতন। তারপর চৌরঙ্গীর মোড়ে পেঁছিতেই যেন চমকে ওঠেন আবার।—'চ' তোদের পাড়ায় যাই, সেখানকার চায়ের দোকানে নিশ্চয় তোকে ধার দেবে। তোর চেনাশোনা লোক সব—ভাবসাব আছেই! তাই চল্।···চা না পেলে আজ আমি বাঁচবো না। পঞ্চত্ব লাভ করবো। দেখিস তুই।'

'আমার পাড়ার চা-ওয়ালারা? তুমি তাদের চেনো না মামা! এমন খুঁতখুঁতে লোক আর হয় না। এত কেপ্পণ তুমি সাতজন্মে দ্যাখোনি। আর, এমনি হুঁশিয়ার যে, তুমি যদি সিগ্রেট ধরাতে যাও আর দেশলায়ের বাক্স চাও, না?—তারা বাক্সর বদলে শুধু একটা কাঠি দেবে তোমাকে, আর খোলটা শক্ত করে ধরে রাখবে হাতের মুঠোয়। বাক্সটা হাতছাড়া-ই করবে না, এক মিনিটের জন্যেও নয়, ধার দেয়া দূরে থাক্। কেবল তার ধারে কাঠিটা ঘষে তোমার সিগ্রেট ধরিয়ে নাও, ব্যস। দেশলায়ের গায়ে ঘষতে দেবে কেবল, কিন্তু দেশলায়ের কাছে ঘেঁষতে দেবে না তোমায়। এমনি মারাত্মক লোক সব।'

'বলিস্ কিরে, অ্যাঁ? এই বয়সেই সিগ্রেট খাওয়ার বিদ্যে হয়েছে? গোঁফ না গজাতেই বিড়ি ধরাতে শিখেচো? বটে?' মামা ভারি খাপ্পা হয়ে ওঠেন।

'বা রে, তা আমি কখন বল্লুম? এতো আমার চোখে দেখার কথাই বলচি —চেখে দেখার কথা বলেচি কি?' আমি আপত্তি করি।

'খাস্নি? খাস্নি তো? খাস্নে তো? তা হলেই হলো! না খেলেই ভাল। তুই আমার একমাত্র ভাগনে নোস্ তা জানি, কিন্তু অদ্বিতীয় তো: তোর মতন মার্কামারা আরেকটা তো আমার নেই। তুইও যদি সিগ্রেট ফুঁকে অকালে যাদবপুর হয়ে কেটে পড়িস্, অবশ্যি, দুঃখে আমি মারা যাবো না, তা ঠিক—কিন্তু তাই ব'লে টি-বি হওয়াটা কি ভাল? তুইও যদি টিবিয়ে টেঁসে যাস্—সান্ত্বনা দেবার আরো ভাগনে আমার থাকবে বটে—'

'কিন্তু, ভাগে যে একটা কম পড়বে তাও বটে! ভয় নেই মামা, আমি তোমার ভাগবো না।' জানাতে হয় আমায়।

'আমার ভাগ্যি!···এখন আয়, এখানে বসে নিখরচায় চা খাবার একটা বুদ্ধি বার করি···' নকুড় মামা বলেন। দুজনে মিলে তখন মাথা খাটাই আমরা। ভিখিরি হলে যেমন ভেক্ এসে পড়ে, ফাকির হলেই তেম্নি যতো ফিকির দেখা দেয়।

'শোন্, এক কাজ করা যাক্', মামা বাত্লান: 'তুই যেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিস্ এই রকম ভাব দেখাবি। অ্যাক্টিং করবি আর কি। আমি তোকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে যাবো একটা চায়ের দোকানে, কিংবা ঢুকবো কোন একটা রেস্তোরাঁয়—'

'কীরকমের অ্যাক্টিং?' প্রথম অঙ্কের আগেই আমার প্রস্তাবনা: 'ভালো ক'রে বুঝিয়ে দাও আগে।'

'ডালুদি'র হিস্টিরিয়া হতে দেখেছিস্ তো? আমার ডালুদি, তোর ডালু-মাসি রে! তুই সেই ডালুদি'র মত সেইরকম গা নাড়তে থাক্বি—হাত-পা কাঁপাবি। যদি কাছে-পিঠে কেউ না থাকে তো হাত-পা ছুড়তে শুরু করতে—'

'নকুড় মামা, ন কুরু', আমি সংস্কৃত করে বলি—তার পরে ফের ব্যাখ্যা করে দিই সোজা বাংলায়—'অমন কার্যটি কোরো না। কদাপি না। হিস্টিরিয়া হচ্ছে মেয়েলী ব্যাপার। ছেলেদের ওসব রোগ কি কখনো হয়? কক্ষনো না।'

'না, হয় না! তোকে বলেছে! ছেলেমাত্রই তো এক-একটি রোগ। আর ও জি ইউ ই।' মামা সাদা বাংলায় ব'লে সিধে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দ্যান্ ফের: 'শোন্, ওসব আদিখ্যেতা রাখ, এখন যা বল্ছি তাই কর। আমি তোকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাবো চা-খানায়! এইতো গেল প্রথম দৃশ্য। তারপর আমি যা-যা বলি যা-যা করি দেখতেই পাবি। তুই ভান করবি আর আমি ভানিতা করবো, কিন্তু আড়চোখে দেখে রাখবি সব ভাল ক'রে কেন না—'

'ঐ মেঘটার আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য, তাই দেখতে পাচ্ছেন না।' তিনি জানালেন—'মেঘটা সরে গেলেই—'

বলতে বলতে মেঘ সরে গেলো প্রকাশ পেলেন সূর্যদেব।

'ও বাবা! অনেকখানি উঠে পড়েছেন দেখছি! বেলা হয়ে গেছে বেশ।' আপসোস করলেন হর্ষবর্ধন—'সূর্যোদয়টা হাতছাড়া হয়ে গেলো দেখছি আজ।'

'ওমা! একি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি—'নেমে যাচ্ছে যেন! নামছে কেন সূর্যিটা? নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে যে! এ-কি ব্যাপার?'

'এরকমটা তো কখনো হয় না!' আমিও বিস্মিত হই—'সূর্যের এমন বেচাল ব্যাপার তো দেখা যায় না কখনো।'

'হ্যাঁ মশাই, এরকমটা হয় নাকি এখানে মাঝে মাঝে? একটু না উঠেই নামতে থাকেন আবার—পথ ভুল হয় সূর্যদেবের?'

'তার মানে?'

'তার মানে, আমরা সূর্যোদয় দেখতে এসেছি কিনা, উদীয়মান সূর্য দেখতে না-পাই, উদিত সূর্য দেখেও তেমন বিশেষ দুঃখিত হইনি—কিন্তু একি! উঠতে না উঠতেই নামতে লাগলো যে!'

'আপনার জন্যে কি পশ্চিম দিকে উঠবে নাকি সূর্য? অস্ত যাবার সময় সূর্যোদয় দেখতে এসেছেন!' ঝাঁঝালো গলা শোনা যায় ভদ্রলোকের—

'কোথাকার পাগল সব!' আরেক জন উতোর গেয়ে ওঠেন তাঁর কথার।

এমন পাল্লায় পড়ে মানুষ !

চিরদিন সহর্ষ দেখেছি, বিগড়োতে দেখিনি কখনো, এমন যে মানুষ তাঁকেও সেদিন বিগড়ে যেতে দেখা গেলো···

সেই যে ডি এল রায়ের হাসির গানে আছে না ?

'রাজা গেলেন···

দিল্লী কিংবা বম্বে নয়,
মাদ্রাজ কিংবা ব্রহ্মো নয়,
ট্রেনে নয় প্লেনে নয়,
রেল কি স্টীমার চেপে
রাজা গেলেন ক্ষেপে।'

অনেকটা সেই রকমেরই ব্যাপার হলো যেন !

জীবনে হাজার মানুষের হাজারো রকমের পাল্লা কাটিয়ে এসে শেষটায় কিনা সামান্য এক জানলার পাল্লায় পড়লেন হর্ষবর্ধন !

আর সেই এক পাল্লাতেই তাঁর অমন দিলদরিয়া মেজাজ খিচড়ে গেল।

হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন আর আমি তিনজনই দূর পাল্লার যাত্রী। একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরার তিনটে বার্থ রিজার্ভ করে পাটনা যাচ্ছি আমরা। সন্ধেয় চেপেছি হাওড়ায়, সকালে পোঁছোবো পাটনা স্টেশনে।

ওপরের দুটো বার্থে গোবরা আর আমি। তলাকার একটা বার্থে

হর্ষবর্ধন। তলার অপর বার্থটায় ছিলেন অন্য এক ভদ্রলোক, কোথায় যাচ্ছেন কে জানে!

হর্ষবর্ধন পাটনায় তাঁর কারখানার কাঠের কারবারের একটা শাখা খুলতে যাচ্ছিলেন, আমাকে এসে ধরলেন—'চলুন! আপনি আমার দোকানের দ্বার উদ্ঘাটন করবেন।'

'আমি কেন? ও-সব কাজ তো মন্ত্রীরাই করেন মশাই! পাটনায় কি কোন মন্ত্রী পাওয়া যায় না?' আমি একটু অবাক হই, 'কেন, সেখানে কি মন্ত্রীর পাট নেই?'

সত্যি বলতে, এ-সব কাণ্ড-কারখানার মধ্যে যেতে আদৌ আমার উৎসাহ হয় না। উদ্ঘাটন, উন্মোচন, ফিতে-কাটা এগুলোকে আমি মন্ত্রীদের অভিনেয় পার্ট বলেই জানি।

'থাকবে না কেন?' বললেন তিনি, 'তবে তাদের কারো সঙ্গে আমার তেমন দহরম নেই—একদম নেই।'

একদমে কথাটা শেষ করে নবোদ্যমে তিনি পরের খবরটি জানালেন। 'তাছাড়া, জানেন কি মশাই…', দাদার কথায় বাধা দিয়ে গোবর্ধন ফোড়ন কাটল মাঝখান থেকে—'তাছাড়া, আপনিই বা মন্ত্রীর চেয়ে কম কিসে বলুন? দাদার মুখ্যমন্ত্রী আপনিই তো! দাদাকে যত কুমন্ত্রণা আপনি ছাড়া কে দেয় আর?'

'তাছাড়া, আরেকটা কথা', হর্ষবর্ধন তাঁর কথাটা শেষ করেন—'কলকাতায় তো এখন ছানা কণ্টোল হয়ে মিষ্টি-ফিষ্টি একেবারে নেই! এখানকার কারিগররা গেছে কোথায় জানেন? সবাই সেই পাটনায় গিয়ে সন্দেশ বানাচ্ছে! কলকাতার মেঠাই সব সেখানে। নতুনগুড়ের সন্দেশ যদি খেতে চান তো চলুন পাটনায়।'

নতুনগুড়ের এই নিগূঢ় সন্দেশ লাভের পর পাটনায় যাবার আর কোন বাধা রইল না তারপর।

বম্বে এক্সপ্রেস অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঘটাংঘটের ঘটঘটা তুলে ছুটে চলছিলো…

তলার সেই অপর বার্থটির ভদ্রলোক উঠে জানলার পাল্লাটা নামিয়ে দিলেন হঠাৎ।

হর্ষবর্ধন বললেন, 'একি হলো মশাই! জানালাটা বন্ধ করলেন কেন? মুক্ত বাতাস আসছিল বেশ।'

'ঠাণ্ডা আসছে কিনা।' বললেন সেই ভদ্রলোক।

'ঠাণ্ডা!' ওপরের বার্থ থেকেই যেন ধপাস করে পড়লেন হর্ষবর্ধন, তাঁর নিচেকার বার্থে শুয়ে থেকেই।—'ঠান্ডা এখন কোথায় মশাই! সবে এই অঘ্রাণ মাস! শীত পড়েছে নাকি এখনই?' উঠে জানলার পাল্লাটা তুলে

দিয়ে প্রাণভরে যেন তিনি অঘ্রাণের ঘ্রাণ নিলেন—'আহা! কী মিষ্টি হাওয়া!'

'রীতিমতন হাড় কাঁপানো হাওয়া মশাই!' জবাব দিলেন সেই ভদ্রলোক। তারপরই জানলাটা ফের নামিয়ে দিলেন তক্ষুনি।

'হাড় কাঁপানো হাওয়া! দেখছেন না, আমি ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছি!' বলে হর্ষবর্ধন জানলাটা তুলে দিলেন আবার।

'ফিনফিনে তো দেখছি ওপরে। কিন্তু তার তলায়?' শুধোলেন সেই অচেনা লোকটি, ফিনফিনের তলায় তো বেশ পুরু কোট এঁটেছেন একখানা, তার তলায় আবার একটা অলেস্টারও দেখছি...'

'আজ্ঞে'—এবার আমাকেই প্রতিবাদ জানাতে হয়, 'আজ্ঞে ওটা ওঁর কোট নয়, গায়ের মাংস! বেশ মাংসল দেহ দেখছেন না ওঁর? আর যেটাকে আপনি অলেস্টার বলে ভ্রম করছেন সেটা আসলে ওঁর ভুঁড়ি...।'

'ওই হলো মাংসের কোটিং তো, তা, সেটা কোটের চেয়ে কম না কি? ওতেও গা বেশ গরম থাকে? কোটের মতই গরম রাখে গা। হাড়ে তো ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতে পায় না। আমার এই হাড় জিরজিরে শরীরে অলেস্টার চাপিয়েও ঠাণ্ডার শিরশির করছে হাত পা!' বলতে বলতে সত্যিই যেন তিনি শিহরিত হতে লাগলেন শীতে; 'তারপর আমার মাফলারটাও আনতে ভুলে গেছি আবার! আমার টনসিলের দোষ আছে জানেন? গলায় যদি একটু ঠাণ্ডা লাগে তো আর রক্ষে নেই।'

'মুক্ত বাতাস দারুণ স্বাস্থ্যকর। তাতে কখনো টনসিল বাড়ে না।' হর্ষবর্ধন জানান '—বাড়তে পারে না।' বলে পাল্লাটা গম্ভীরভাবে তুলে দেন আবার।

'আপনার বাড়ে না। কিন্তু আমার বাড়ে। আপনার কি, গলায় তো বেশ মোটা একটা কমফর্টার জড়িয়ে রয়েছেন!'

'আমার গলায় কমফর্টার?' হর্ষবর্ধন ঊর্ধ্বনেত্রে আমাকেই যেন সাক্ষী মানতে চান।

'না মশাই! গলায় ওঁর কোনো কমফর্টার নেই।' বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমায়।—'আপনার টনসিলের দোষ বলছেন, কিন্তু চোখেরও বেশ একটু দোষ আছে দেখছি। ওঁর গলায় পুরু মতন ওটা যা দেখছেন, ওকে কী বলা যায় আমি জানিনে। গরুর হলে গলকম্বল বলা যেত, কিন্তু ওঁকে তো গোরু বলা যায় না—,' বলে হর্ষবর্ধনকে একটু কমফর্ট দিই। 'ওঁর ক্ষেত্রে ওটাকে গলার ভুঁড়িই বলতে হয় বাধ্য হয়ে, কিংবা ভুরি ভুরি গলাও বলতে পারেন।'

'গলায় কেউ কম্বল জড়ায় নাকি?' হর্ষবর্ধন আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানেন এবার—'গরুরাই গলায় কম্বল জড়ায়।'

'সেই কথাই তো বলেছি আমি।' কৈফিয়তের সুরে জানাই, 'গরুর

হলে ওটা গলকম্বল হত। আপনার বেলা তা নয়। তাই তো আমি বলছিলাম ওনাকে।'

'আপনার টনসিল ঢাকা একটা কিছু রয়েছে তো তবু।' বলে ভদ্রলোক উঠে জানলার পাল্লাটা নামিয়ে দিলেন আবার—'যাক, আমি কোন তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। নিজে সতর্ক থাকতে চাই।'

হর্ষবর্ধন উঠে তুলে দিলেন পাল্লাটা—'গরমে আমার দম আটকে আসে। বন্ধ হাওয়ায় স্বাস্থ্য খারাপ হয়। চারদিক বন্ধ করে দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে আমি মোটেই থাকতে পারিনে।'

'আপনি কি আমাকে খুন করতে চান নাকি?' ভদ্রলোক উঠে খুলে ফেললেন ফের পাল্লা—'ঠাণ্ডা লেগে আমার সর্দি থেকে কাশি, কাশি থেকে গয়া—আই মীন; টাইফয়েড, তার থেকে নিমোনিয়া···!'

'তার থেকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।' ওপরের বার্থ থেকে জুড়ে দেয় গোবর্ধন। ব্যঙ্গের সুরেই বলতে কি!

'তাই হোক আমার। তাই আপনি চান নাকি? আপনি তো বেশ লোক মশাই!' বলে তিনি পাল্লাটা নামিয়ে দিলেন জানলার।

'আর আপনি কী চান শুনি? দূষিত বন্ধ আবহাওয়ায় আমার হেঁচকি উঠুক, হাঁপানি হোক, যক্ষ্মা হোক, টি-বি হোক, ক্যানসার হোক, নাড়ি ছেড়ে যাক, দম আটকে মারা যাই আমি, তাই আপনি চান নাকি?'

হর্ষবর্ধন উঠে পাল্লাটা তোলেন আবার।

এই ভাবে চলল দুজনের···পালা করে—পাল্লা তোলা আর নামানো··· পাল্লা দিয়ে চলল দু-জনার। করতে করতে এসে পড়ল খড়গপুর।

বম্বে এক্সপ্রেস সেখানে থামতেই হর্ষবর্ধন তেড়ে-ফুড়ে নামলেন কামরার থেকে—'যাচ্ছি আমি গার্ড সাহেবের কাছে। আপনার নামে কমপ্লেন করতে চললাম।'

'আমিও যাচ্ছি।' তিনিও নামলেন সঙ্গে সঙ্গে।

আমিও নামলাম ওঁদের পিছু পিছু। কেবল গোবরা রইল কামরায় মালপত্র সামলাতে।

গার্ড সাহেব দু-পক্ষেরই অভিযোগ শোনেন। শুনে মাথা নাড়েন গম্ভীরভাবে—'এতো ভারী মুশকিল ব্যাপার দেখছি। শার্সি তুললে আপনার স্বাস্থ্যহানি হয়, আর শার্সি নামালে আপনার? তাই তো? ভারি মুশকিল তো! চলুন দেখিগে···।'

'কোন্ কামরাটা বলুন তো আপনাদের?···' বলতে বলতে তিনি এগোন 'ঐ ফার্স্ট ক্লাস কামরাটা বলছেন? জানলাটা এখন বন্ধ রয়েছে, না, খোলা আছে?'

'আমি নামিয়ে দিয়ে এসেছি পাল্লাটা' সেই ভদ্রলোক জানান।

'ওটার শার্সিটা তো ভাঙা বলেই জানতাম, ওর পাল্লার কাচটা তো বসানো হয়নি এখনো, যতদূর আমার মনে পড়ে। আপনি বলছেন, কাচের পাল্লাটা নামিয়ে দিয়ে এসেছেন? কিন্তু কে যেন মুখ বাড়াচ্ছে না। জানলা দিয়ে?'

'আমার ভাই গোবর্ধন।' হর্ষবর্ধন জানান।

'পাল্লার কাচটা ভাঙাই রয়েছে তাহলে। নইলে ছেলেটা শার্সির ভেতর দিয়ে মুখ বাড়ায় কি করে? যান, যান উঠে পড়ুন চট করে। এক্ষুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে···টাইম ইজ আপ··· ।'

বলতে বলতে গার্ড-সাহেবের নিশান নড়ে, গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ে। আর হর্ষবর্ধন কামরায় এসে গোবরাকে নিয়ে পড়েন।

'তোর কি সব তাতে মাথা না গলালে চলে না? কি আক্কেল তোর বল দেখি? কে বলেছিল তোকে কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে মাথা গলাতে? কে বলেছিল—কে?' সমস্ত চোটটা তার ওপরেই গিয়ে পড়ে তখন। এমন তিনি বিগড়ে যান যে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেন গোবরাকে।

'কাচের ভেতর দিয়ে মাথা গলানো। সত্যি, এমন কাঁচা কাজ করে মানুষ।' আমিও গোবরাকে না দুষে পারি না।

হর্ষবর্ধনের বাঘ শিকার

হর্ষবর্ধনকে আর রোখা গেল না তারপর কিছুতেই! বাঘ মারবার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন।

'আরেকটু হলেই তো মেরেছিল আমায়।' তিনি বললেন, 'ওই হতভাগা বাঘকে আমি সহজে ছাড়ছি না।'

'কি করবে দাদা তুমি বাঘ নিয়ে? পুষবে নাকি?'

'মারবো ওকে। আমাকে মেরেছে আর ওকে আমি রেহাই দেব তুই ভেবেছিস?'

'তোমাকে আর মারল কোথায়? মারতে পারল কই?'

'একটুর জন্যেই বেঁচে গেছি না? মারলে তোরা বাঁচাতে পারতিস আমায়?'

গোবর্ধন চুপ করে থাকল, সে-কথার কোন জবাব দিতে পারল না।

'এই গোঁফটাই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে বলতে কি!' বলে নিজের গোঁফ দুটো তিনি একটু চুমরে নিলেন—'এই গোঁফের জন্যেই বেঁচে গেছি আজ! নইলে ওই লোকটার মতই হাল হতো আমার...'

মৃতদেহটির দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন—'গোঁফ বাদ দিয়ে, বেগোঁফের বকলমে ও তো খোদ আমিই। আমার মতই হুবহু। ও না হয়ে আমিও হতে পারতাম। কি হতো তাহলে বল তো?'

গোবরা সে-কথারও কোন সদুত্তর দিতে পারে না।

'এই চৌকিদার!' হঠাৎ তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'একটা বন্দুক যোগাড় করে দিতে পার আমায়? যতো টাকা লাগে দেব।'

বন্দুক নিয়ে কি করবেন বাবু?'

'বাঘ শিকার করব আবার কি? বন্দুক নিয়ে কী করে মানুষ?' বলে আমার প্রতি ফিরলেন: 'আমার এই বীরত্ব-কাহিনীটাও লিখতে হবে আপনাকে। যত সব আজেবাজে গল্প লিখেছেন আমাকে নিয়ে। লোকে পড়ে হাসে কেবল। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে আমি শুনেছি।'

'তার কি হয়েছে? লিখে দেব আপনার শিকার-কাহিনী। এই বাঘ মারার গল্পটাই লিখে দেব আপনার। কিন্তু তার জন্যে বন্দুক ঘাড়ে এত কষ্ট করে প্রাণপণে বাঘ মারতে হবে কেন? বনে-বাদাড়েই বা যেতে হবে কেন? বাঘ মারতে এত হ্যাঙ্গামের কী মানে আছে? বন্দুকের কোন দরকার নেই। সাপ-ব্যাঙ একটা হলেই হলো। কলমের কেরামতিতে সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ মারা যায়।'

'মুখেন মারিতং বাঘং?' গোবরা টিপপনি কাটে।

'আপনি টাকার কথা বলছেন বাবু!' চৌকিদার এতক্ষণ ধরে কী যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, মুখ খুলল এবার—তা. টাকা দিলে এনে দিতে পারি একটা বন্দুক—দু-দিনের জন্য। আমাদের দারোগা সাহেবের বন্দুকটাই চেয়ে আনতে পারি। বাঘের ভারী উপদ্রব হয়েছে এধারে—মারতে হবে বাঘটাকে—এই বললেই তিনি ওটা ধার দেবেন আমায়। ব্যাভারের পর আবার ফেরত দিয়ে আসব।'

'শুধু বন্দুক নিয়ে কি করব শুনি? ওর সঙ্গে গুলি-কার্তুজ-টোটা ইত্যাদি এ-সবও তিনি দেবেন তো? নইলে বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে কি বাঘ মারা যায় নাকি? তেমনটা করতে গেলে তার আগেই বাঘ আমায় সাবড়ে দেবে?'

'তা কি হয় কখনো? বন্দুকের সঙ্গে কার্তুজ-টার্তুজ দেবেন বইকি বাবু।'

'তাহলে যাও, নিয়ে এসো গে চটপট। বেশি দেরি কোন না। বাঘ না-মেরে নড়ছি না আমি এখান থেকে। জলগ্রহণ করব না আজ।'

'না না, বন্দুকের সঙ্গে কিছু খাবার টাবার নিয়ে এসো ভাই।'

আমি বাতলাই: 'খালি পেটে কি বাঘ মারা যায়? আর কিছু না হোক, একটু গাঁজা খেতে হবে অন্তত।'

'আনব নাকি গাঁজা?' সে শুধায়।

'গাঁজা হলে তো বন্দুকের দরকার হয় না। বনে-বাদাড়েও ঘুরে মরতে

হয় না। বন্দুকের বোঝা বইবারও কোন প্রয়োজন করে না। ঘরে বসেই বাঘ মারা যায় বেশ।' আমি জানাই।

'না না গাঁজা-ফাঁজা চাই না। বাবু ইয়ার্কি করছে তোমার সঙ্গে। তুমি কিছু রুটি মাখন বিস্কুট চকোলেট—এইসব এনো, পাও যদি।' গোবরা বলে দেয়।

বন্দুক এলে হর্ষবর্ধন আমায় শুধাল—'কি করে বাঘ মারতে হয় আপনি জানেন?'

'বাগে পেলেই মারা যায়। কিন্তু বাগেই পাওয়া যায় না ওদের। বাগে পাবার চেষ্টা করতে গেলে উলটে নাকি বাঘেই পায়।

'বনের ভিতরে সেঁধুতে হবে বাবু।' চৌকিদার জানায়।

গভীর বনের ভেতরে পা বাড়াতে প্রথমেই যে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করল সে কোন বাঘ নয়, বাঘের বাচ্চাও না—আস্ত একটা কোলা ব্যাঙ।

ব্যাঙ দেখে হর্ষবর্ধন ভারী খুশি হলেন, বললেন, 'এটা শুভ লক্ষণ। ব্যাঙ ভারী পয়া, জানিস গোবরা?

'মা লক্ষ্মীর বাহন বুঝি?'

'সে তো প্যাঁচা।' দাদা জানান—'কে না জানে!'

'যা বলেছেন।' আমি ওঁর কথায় সায় দিই 'যতো প্যাঁচাল লোকই হচ্ছে মা লক্ষ্মীর বাহন। প্যাঁচ কষে টাকা উপায় করতে হয়, জান না ভাই?'

'তাহলে ব্যাঙ বুঝি সিদ্ধিদাতা গণেশের··না, না···'বলে গোবরা নিজেই শুধরে নেয়—'সে তো হলো গে ইঁদুর।'

'আমি পয়া বলেছি কারো বাহন টাহন বলে নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতায়। আমরা প্রথম যখন কলকাতায় আসি, তোর মনে নেই গোবরা? ধরমতলায় একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম?'

'মনে আছে। পেয়েই তুমি সেটা পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিলে, পাছে কারো নজরে পড়ে। তারপর বাড়ি এসে খুলে দেখতে গিয়ে দেখলে—'

'দেখলাম যে চারটে ঠ্যাং। মনিব্যাগের আবার ঠ্যাং কেন রে? তার পরে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি কি, ওমা, ট্রামগাড়ির চাকার তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ব্যাঙ একটা।'

'আর কিছুতেই খোলা গেল না ব্যাগটা।'

'গেল না বটে, কিন্তু তার পর থেকেই আমাদের বরাত খুলে গেল। কাঠের কারবারে ফেঁপে উঠলাম আমরা। আমরা এখানে টাকা উড়িয়ে দিতে এসেছিলাম, কিন্তু টাকা কুড়িয়ে থই পাই না তারপর!

'ব্যাঙ তাহলে বিশ্বকর্মার বাহন হবে নির্ঘাত।' গোবরা ধারণা করে;

'যত কারবার আর কারখানার কর্তা ঐ ঠাকুরটি তো। কী বলেন মশাই আপনি? ব্যাঙ বিশ্বকর্মার বাহনই তো বটে?'

'বাঙ না হলেও ব্যাঙ্ক তো বটেই। বিশ্বের কর্মীদের সহায়ই হচ্ছে ঐ ব্যাঙ্ক। আর বিশ্বকর্মাদের বাহন বোধহয় ওই ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক।'

'ব্যাঙ থেকেই ব্যাংক। একই কথা।' হর্ষবর্ধন উচ্ছ্বসিত হন।—'ব্যাঙ থেকেও আমার আমদানি, আবার ব্যাঙ্ক থেকেও।'

'ব্যাঙটাকে দেখে একটা গল্পের কথা মনে পড়ল।' আমি বলি—'জামপিং ফ্রগের গল্প। মার্ক টোয়েনের লেখা। ছোটবেলায় পড়েছিলাম গল্পটা।'

'মার্ক টোয়েন মানে?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করেন।

'এক লেখকের নাম। মার্কিন মুলুকের লেখক।'

'আর জামপিং ফ্রগ?' গোবরার জিজ্ঞাস্য।

'জামপিং মানে লাফান, আর ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাঙ। মানে যে ব্যাঙ কিনা লাফায়।

'লফিং ফ্রগ বলুন তাহলে মশাই

'তাও বলা যায়। গল্পটা পড়ে আমার হাসি পেয়েছিল তখন। তবে ব্যাঙের পক্ষে ব্যাপারটা তেমন হাসির হয়েছিল কিনা আমি জানি না। গল্পটা শুনুন এবার। মার্ক টোয়েনের সময়ে সেখানে, ঘোড়দৌড়ের মতন বাজি ধরে ব্যাঙের দৌড় হোত। লাফিয়ে লাফিয়ে যে ব্যাঙ যার ব্যাঙ আর সব ব্যাঙকে টেক্কা দিতে পারত সেই মারত বাজি। সেইজন্যে করত কি, অন্য সব ব্যাঙকে হারাবার মতলবে যাতে তারা তেমন লাফাতে না পারে—লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তো—সেইজন্য সবার আড়ালে এক একটাকে ধরে পাথর কুঁচি খাইয়ে বেশ ভারি করে দিত কেউ কেউ।'

'খেত ব্যাঙ সেই পাথর কুঁচি?'

'অবোধ বালক তো! যাহা পায় তাহাই খায়।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন।

'পরীক্ষা করে দেখলেই হয়।' গোবরা বলে: 'এই তো পাওয়া গেছে একটা ব্যাঙ— এখন বাজিয়ে দেখা যাক না খায় কি না।'

গোবরা কতকগুলো পাথর কুঁচি যোগাড় করে এনে গেলাতে বসল ব্যাঙটাকে। হাঁ করিয়ে ওর মুখের কাছে কুঁচি ধরে দিতেই, কি আশ্চর্য, তক্ষুনি সে গোপালের ন্যায় সুবোধ বালক হয়ে গেল। একটার পর একটা গিলতে লাগল টুপটাপ করে। অনেকগুলো গিলে ঢাউস হয়ে উঠল ওর পেট। তারপর মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে রইল ব্যাঙটা। ভারিক্কি দেহ নিয়ে লাফান দূরে থাক, নড়া চড়ার কোন শক্তি রইল না তার আর।

'খেলতো বটে, খাওয়ালিও তো দেখলাম, ব্যাটা এখন হজম করতে পারলে হয়।' দাদা বললেন।

'খুব হজম হবে। ওর বয়সে কত পাথর হজম করেছি দাদা।' গোবরা বলে: 'ভাতের সঙ্গে এতদিনে যতো কাঁকর গিলেছি, ছোটখাট একটা পাহাড়ই চলে গেছে আমাদের গর্ভে। হয়নি হজম?'

'আলবৎ হয়েছে।' আমি বলি: 'হজম না হলে তো যম এসে জমত।'

'ওই দ্যাখ দাদা!' আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে গোবরা।

আমরা দেখি। প্রকাণ্ড একটা সাপ, গোখরোই হবে হয়ত, এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

চৌকিদার বলে—'একটুও নড়বেন না বাবুরা। নড়লেই সাপ এসে ছোবলাবে। আপনাদের দিকে নয়, ব্যাঙটাকে নিতে আসছে ও।'

আমরা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাই বটে। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে ব্যাঙটাকে এসে আত্মসাৎ করল।

সাপটা এগিয়ে এসে ধরল ব্যাঙটাকে, তারপর এক ঝটকায় লহমার মধ্যে মুখের ভেতর পুরে ফেলল। তারপর গিলতে লাগলো আস্তে আস্তে।

আমরা দাঁড়িয়ে ওর গলাধঃকরণ-লীলা দেখতে লাগলাম। গলা দিয়ে পুরুষ্টু ব্যাঙটা তার তলার দিকে চলতে লাগল, খানিকটা গিয়ে থেকে গেল এক জায়গায়, সেইখানেই আটকে রইল, তারপর সাপটা যতই চেষ্টা করুক না, সেটাকে আর নামাতে পারল না। পেটের ভেতর ঢুকে ব্যাঙটা তার পিঠের উপর কুঁজের মত উঁচু হয়ে রইল।

উটকো ব্যাঙটাকে গিলে সাপটা উট হয়ে গেল যেন শেষটায়। তার মুখখানা যেন কেমনতর হয়ে গেল। খুব তীব্র বৈরাগ্য হলেই যেমনটা হয়ত দেখা যায়। ভ্যাবাচাকা মার্কা মুখে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জবুথবু নট-নড়ন-চড়ন সে পড়ে রইল সেইখানেই।

তারপর তার আর কোন উৎসাহ দেখা গেল না।

'ছুঁচো গেলার চেয়েও খারাপ দশা হয়েছে সাপটার বুঝলে দাদা? সাপের পেটে ব্যাঙ, আর ব্যাঙের পেটে যতো পাথর কুঁচি। আগে ব্যাঙ পাথর কুঁচিগুলো হজম করবে, তারপরে সে হজম করবে গিয়ে ব্যাঙটাকে। সে বোধহয় আর ওদের এজন্মে নয়।

'ওদের কে কাকে হজম করে দেখা যাক।' আমি তখন বলি, ততক্ষণে আমাদেরও কিছু হজম হয়ে যাক। আমরাও খেতে বসি এধারে।'

চৌকিদারের আনা মাখন-রুটি ইত্যাদি খবর-কাগজ পেতে খেতে বসে গেলাম আমরা। সাপটার অদূরেই বসা গেল। সাপটা মার্বেলের গুলির মতন ভালগোল পাকিয়ে পড়ে রইল আমাদের পাশেই।

এমন সময়ে জঙ্গলের ওধারে একটা খসখসানি আওয়াজ পাওয়া গেল।

'বাঘ এসে গেছে বাবু!' চৌকিদার বলে উঠল, শুনেই না আমরা তাকিয়ে দেখি সত্যিই ঝোপঝাড়ের আড়ালে বাঘটা আমাদের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে।

'রুটি মাখন-টাখন শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গেল দেখছি।' দেখে আমি দুঃখ করলাম।

'কি করে যাবে? আমরা চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছি না সব, ওর জন্যে রেখেছি নাকি?' বলল গোবরা—পাঁউরুটির শেষ চিলতেটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে।

'যেমন করে পাথর কুচিগুলো সাপের পেটে গেছে ঠিক সেই ভাবে।' আমি বিশদ করি।

'এক গুলিতে সাবাড় করে দিচ্ছি না ব্যাটাকে। দাঁড়ান না।' বলে হর্ষবর্ধন হাতে কী একটা তুললেন, 'ওমা! এটা যে সাপটা।' বলেই কিন্তু আঁতকে উঠলেন—'বন্দুকটা গেল কোথায়?'

'বন্দুক আমার হাতে বাবু!' বলল চৌকিদারঃ 'আপনি তো আমার হাত থেকে নেননি বন্দুক। তখন থেকেই আমার হাতে আছে।'

'তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জান?'

'না বাবু, তবে তার দরকার হবে না। বাঘটা এগিয়ে এলে এই বন্দুকের কুঁদার ঘায় ওর জান খতম করে দেব। আপনারা ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে হাতের সাপটাকেই তিন পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন বাঘটার দিকে।

সাপটা সবেগে পড়েছে গিয়ে তার উপর।

কিন্তু তার আগেই না, কয়েক চক্করের পাক খেয়ে, সাপের পেটের থেকে ছিটকে ব্যাঙটা আর ব্যাঙের গর্ভ থেকে যতো পাথর কুচি তীর বেগে বেরিয়ে—ছররার মতই বেরিয়ে লেগেছে গিয়ে বাঘটার গায়—তার চোখে মুখে নাকে।

হঠাৎ এই বেমক্কা মার খেয়ে বাঘটা ভিরমি খেয়েই যেন অজ্ঞান হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আর তার নড়া চড়া নেই।

'সর্পাঘাতে মারা গেল নাকি বাঘটা?' আমরা পায়ে পায়ে হতজ্ঞান বাঘটার দিকে এগুলাম।

চৌকিদার আর দেরি না করে বন্দুকের কুঁদোয় বাঘটার মাথা থেঁতলে দিল। দিয়ে বললো—'আপনার সাপের মারেই মারা পড়েছে বাঘটা। তাহলেও সাবধানের মার নেই বাবু, তাই বন্দুকটাও মারলাম তার ওপর।'

'এবার কি করা যাবে?' আমি শুধাইঃ 'কোন ফোটো তোলার লোক পাওয়া গেলে বাঘটার পিঠে বন্দুক রেখে দাঁড়িয়ে বেশ পোজ করে ফোটো তোলা যেত একখানা।'

'এখানে ফোটো-ওলা কোথায় বাবু এই জঙ্গলে? বাঘটা নিয়ে গিয়ে আমি ভেট দেব দারোগাবাবুকে। তাহলে আমার ইনামও মিলবে—আবার চৌকিদার থেকে একচোটে দফাদার হয়ে যাব আমি—এই বাঘ মারার দরুন। বুঝলেন?'

'দাদা করল বাঘের দফারফা আর তুমি হলে গিয়ে দফাদর।' গোবরা বলল—'বারে!'

'সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ শিকার করলেন আপনি দেখছি!' আমি বাহবা দিলাম ওর দাদাকে।

ডাক্তার ডাকলেন হর্ষবর্ধন

'বউয়ের ভারী অসুখ মশাই। কোন ডাক্তারকে ডাকা যায় বলুন তো?' হর্ষবর্ধন এসে শুধোলেন আমায়।

'কেন, আমাদের রাম ডাক্তারকে?' বললাম আমি। তারপর তাঁর ভারী ফীজ-এর কথা ভেবে নিয়ে বলি আবার: রাম ডাক্তারকে আনার ব্যয় অনেক, কিন্তু ব্যায়রাম সারাতে তাঁর মতন আর হয় না।'

'বলে বৌয়ের আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আমি কি এখন টাকার কথা ভাবছি নাকি!' তিনি জানান—'বউয়ের আমার আরাম হওয়া নিয়ে কথা।'

'কি হয়েছে তাঁর?' আমি জানতে চাই।

'কী যে হয়েছে তাই তো বোঝা যাচ্ছে না সঠিক। এই বলছে মাথা ধরেছে, এই বলছে দাঁত কনকন, এই বলছে পেট কামড়াচ্ছে ··'

'এসব তো ছেলেপিলের অসুখ, ইস্কুলে যাবার সময় হয়।' আমি বলি—'তবে মেয়েদের পেটের খবর কে রাখে। বলতে পারে কেউ?'

'বউদির পেটে কিছু হয়নি তো দাদা!' জিজ্ঞেস করে গোবরা! দাদার সাথে সাথেই সে এসেছিল।

'পেটে আবার কি হবে শুনি?' ভায়ের প্রশ্নে দাদা ভ্রূকুঞ্চিত করেন: 'পেটে তো লিভার পিলে হয়ে থাকে। তুই কি লিভার পিলের ব্যামো হয়েছে, তাই বলছিস?'

'আমি ছেলেপিলের কথা বলছিলাম।'

'ছেলেপিলে হওয়াটা কি একটা ব্যামো নাকি আবার ?'

হর্ষবর্ধন ভায়ের কথায় আরো বেশি খাপপা হনঃ 'সে হওয়া তো ভাগ্যের কথা রে। তেমন ভাগ্য কি আমাদের হবে?' বলে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

'হতে পারে মশাই। গোবরা ভায়া ঠিক আন্দাজ করেছে হয়ত।' ওর সমর্থনে দাঁড়াইঃ 'পেটে ছেলে হলে শুনেছি অমনটাই নাকি হয়— মাথা ধরে, গা বমি বমি করে, পেট কামড়ায়.. ছেলেটাই কামড়ায় কি না কে জানে।'

ছেলের কামড়ের কথায় কথাটা মনে পড়ে গেল আমার...

হর্ষবর্ধনের এক আধুনিকা শ্যালিকা একবার বেড়াতে এসেছিলেন ওঁদের বাড়ি একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে

ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখে কোলে করে একটু আদর করার জন্য নিয়েছিলাম, তারপরে দাঁত গজিয়েছে কিনা দেখবার জন্যে যেই না ওর মুখের মধ্যে আঙুল দিয়েছি—উফ! লাফিয়ে উঠতে হয়েছে আমায়।

'কি হলো কি হলো ? ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হর্ষবর্ধনের বউ।

'কিছু হয়নি।' আমি বললামঃ 'একটু দন্তস্ফুট হল মাত্র। হাতে হাতে দাঁত দেখিয়েছে ছেলেটা।'

'ছেলের মুখে আঙুল দিলেন যে বড় ?' রাগ করলেন হর্ষবর্ধনের শালীঃ আঙুলটা আপনার অ্যান্টিসেপটিক করে নিয়েছিলেন ?'

'অ্যান্টিসেপটিক ? ও কথাটায় আমি অবাক হই। —'সে আবার কি ?'

লেখক নাকি আপনি ?' হাইজীনের জ্ঞান নেই আপনার ?' বলে একখানা টেক্সট বই এনে আমার নাকের সামনে তিনি খাড়া করেন! তারপরে আমি চোখ দিচ্ছি না দেখে খানিকটা তার তিনি নিজেই আমায় পড়ে শোনানঃ

'শিশুদের মুখে কোন খাদ্য দেবার আগে সেটা গরম জলে উত্তমরূপে ফুটিয়ে নিতে হবে...'

'আঙুল কি একটা খাদ্য না কি ?' বাধা দিয়ে শুধান হর্ষবর্ধনপত্নী।

'একদম অখাদ্য। অন্ততঃ পরের আঙুল তো বটেই।' গোবরাভায়া মুখ গোমড়া করে বলেঃ 'নিজের আঙুল কেউ কেউ খায় বটে দেখেছি, কিন্তু পরের আঙুল খেতে কখনো কাউকে দেখা যায় নি।

'আঙুল আমি ফুটিয়ে নিইনি সে কথা ঠিক, আমতা আমতা করে আমার সাফাই গাইঃ 'তবে আপনার ছেলেই আঙুলটা আমায় ফুটিয়ে নিয়েছে। কিম্বা ফুটিয়ে দিয়েছে···যাই বলুন। এই দেখুন না।'

বলে খোকার দাঁত বসানোর দগদগে দাগ তার মাকে দেখাই। ফুটফুটে বলে কোলে নিয়েছিলাম কিন্তু এতটাই যে ফুটবে তা আমার ধারণা ছিল না সত্যি।

'রাম ডাক্তারকে আনবার ব্যবস্থা করুন তাহলে।' বললাম হর্ষবর্ধনবাবুকে : 'কল দিন তাঁকে এক্ষুনি। ডাকান কাউকে পাঠিয়ে।'

'ডাকলে কি তিনি আসবেন?' তাঁর সংশয় দেখা যায়।

'সে কি! কল পেলেই শুনেছি ডাক্তাররা বিকল হয়ে পড়ে - না এসে পারে কখনো? উপযুক্ত ফী দিলে কোন ডাক্তার আসে না? কী যে বলেন আপনি।'

'ডেকেছিলাম একবার। এসেও ছিলেন তিনি। কিন্তু জানেন তো, আমার হাঁস মুর্গি পোষায় বাতিক। বাড়ির পেছনে ফাঁকা জায়গাটায় আমার কাঠ চেরাই কারখানার পাশেই পোলট্রির মতন একটুখানি করেছি। তা হাঁসগুলো আমার এমন বেয়াড়া যে বাড়ির সামনেও এসে পড়ে একেক সময়। রাম ডাক্তারকে দেখেই না সেদিন তারা এমন হাঁক ডাক লাগিয়ে দিল যে…'

'ডাক্তারকেই ডাকছিল বুঝি?'

'কে জানে! তাদের আবার ডাক্তার ডাকার দরকার কি মশাই? তারা কি চিকিচ্ছের কিছু বোঝে? মনে তো হয় না। হয়ত তাঁর বিরাট ব্যাগ দেখেই ভয় খেয়ে ডাকাডাকি লাগিয়েছিল তারা, কিন্তু হাঁসদের সেই ডাক শুনেই না, গেট থেকেই ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন, বাড়ির ভেতরে এলেনই না আর। রেগে টং হয়ে চলে গেলেন একেবারে।'

'বলেন কি?' শুনে আমি অবাক হই।

'হ্যাঁ মশাই! তারপর আরো কতবার তাঁকে কল দেয়া হয়েছে — মোটা ফীয়ের লোভ দেখিয়েছি। কিন্তু এ বাড়ির ছায়া মাড়াতেও তিনি নারাজ।'

'আশ্চর্য তো। কিন্তু এ পাড়ায় ভাল ডাক্তার বলতে তো উনিই। রাম ডাক্তার ছাড়া তো কেউ নেই এখানে আর ..'

'দেখুন, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো রকমে আপনি আনতে পারেন তাঁকে…' হর্ষবর্ধন আমায় অনুনয় করেন।

'দেখি চেষ্টা-চরিত্র করে', বলে আমি রাম ডাক্তারের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

সত্যি, একেকটা ডাক্তার এমন অবুঝ হয়। এই রাম ডাক্তারের কথাই ধরা যাক না।

সেবার পড়ে গিয়ে বিনির একটু ছড়ে যেতেই বাড়িতে এসে দেখবার জন্যে তাঁকে ডাকতে গেছি, কিন্তু যেই না বলেছি, 'ডাক্তারবাবু, পড়ে গিয়ে ছড়ে গেছে যদি এসে একটু দয়া করে…'

'ছড়ে গেছে? রক্ত পড়ছে?'

'তা, একটু রক্তপাত হয়েছে বই কি।'

'সর্বনাশ! এই কলকাতা শহরে পড়ে গিয়ে ছড়ে যাওয়া আর রক্তপাত হওয়া ভারি ভয়ংকর কথা, দেখি তো…'

'তাতো দিই-ই। সব কোম্পানিই তা দেয়। তবে তারা দেয় বছরে তিনমাসের, আর আমি দিই প্রতিমাসে।'

'তার মানে?'

'মানে, মাস মাস তিন মাসের বেতন বাড়তি দিয়ে যাই। না দিলে চলবে কেন ওদের? জিনিসপত্রের দাম কি তিনগুণ করে বেড়ে যায়নি বলুন।

'বলেন কি মশাই—অ্যাঁ?' এবার কল্কেকাশি সত্যিসত্যিই হতবাক হন।

'বলে, দাদার ঐ বোনাস পেয়ে পেয়ে আমাদের কারিগররা বোনাই পেয়ে গেল সবাই।' গোবর্ধন জানায়।

'বোনাই পেয়ে গেলো? সে আবার কি?' কল্কেকাশি কথাটার কোনো মানে খুঁজে পান না—'বোনাস থেকে বোনাই!'

'পাবে না? ব্যাসিলাস-এর বেলা যেমন ব্যাসিলাই। ইংরিজি কি জানিনে নাকি একদম? বোনাস-এর বহুবচনে কী হয়? জিনিয়াসের প্লুরালে যেমন জিনিয়াই, তেমনি বোনাস-এর প্লুরালে বোনাই-ই তো হবে। হবে?'

গোবর্ধন আমার দিকে তাকায়।

'ব্যাকরণমতে তাই হওয়াই তো উচিত।' বলি আমি।

'বোনাস-এর ওপর বোনাস পেতেই ওদের আইবুড়ো বোনদের বিয়ে হয়ে গেলো সব। আপনিই বর-রা এসে জুটে গেলো যতো না! বিনাপণেই বলতে কি! বউয়ের হাত দিয়ে সেই বোনাস-এর ভাগ বসাতেই বোনাইরা জুটে গেলো সব আপনার থেকেই।'

'এই কথা!' কথাটা পরিষ্কার হওয়ায় কল্কেকাশি হাঁফ ছাড়লেন: 'তাহলেও বাড়তি টাকার অনেকখানিই মজুদ থেকে যায়—সে সব টাকা রাখেন কোথায়? ব্যাঙ্কে না বাড়িতে?···তিল তিল করে জমলেও তো তাতাল হয়ে ওঠে একদিন—আপনাদের সেই বিপুল ঐশ্বর্য······'

'অরণ্যেই ওঁদের ঐশ্বর্য!' কথাটা আমি ঘুরিয়ে দিতে চাই: 'ঐশ্বর্য কি আর ওঁদের বাড়িতে আছে? না, বাড়িতে থাকে? জমিয়ে রাখবার দরকারটাই বা কী? গোটা অরণ্যভূমিই তো ঐশ্বর্য ওঁদের। বনস্পতিরূপে জমানো। কাটা গাছই টাকার গাছ।' বলে উদাহরণ দিয়ে কথাটা আরো পরিষ্কার করি—'যেমন মড়া মড়া জপতে জপতেই রাম হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি কাটা উলটোলেই টাকা হয়ে যায় মশাই! মানে, কাটা গাছই উলটে টাকা দেয় কিনা! টাকার গাছ তখন।'

'বুঝেচি।' বলে ঘাড় নেড়ে কল্কেকাশি চাড় দেখান—'আবার আপনাদের বাড়ি সেই গোহাটি না কোথায় যেন বললেন না? আসাম থেকেই তো আসা আপনাদের এখানে—তাই নয়? তা আসামের বেশির ভাগই তো অরণ্য। তাই নয় কি? তাহলে বোধহয় সেই অরণ্যের কাছাকাছি কোথাও···মানে, আপনাদের বাড়ির কাছেই হয়তো কোনো গভীর জঙ্গলেই জমানো আছে, তাই না?'

কল্কেকাশির কথায় হর্ষবর্ধনের কোনো সাড়া পাওয়া যায় না আর। তিনি

শধ্ব বলেন—'হ্ম্ম।' বলেই কেমনধারা গ্মে হয়ে যান। কল্কেকাশির উদ্যম সত্ত্বেও তাঁর গাম্ভীর্যের বাঁধ ভেঙে কথার স্রোত আর গড়াতে পারে না।

'আচ্ছা, নমস্কার, আজ আমি আসি তাহলে।' বলে উঠে পড়েন—'আপনার নাম শ্বনেছিলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খ্ব আনন্দ হলো। নমস্কার।'

'লোকটার কথাবার্তা কেমনধারা যেন।' কল্কেকাশি গেলে পর ম্খ খ্ললেন হর্ষবর্ধন—'আমাদের টাকাকড়ির খোঁজখবর পেতে চায় লোকটা!'

'হ্যাঁ দাদা, কেমন যেন রহস্যময়।' গোবরা বলে।

তখন আমি ভদ্রলোকের রহস্য ফাঁস করে দিই। জানাই যে, 'ঐ কল্কেকাশি কোনো কেউকেটা লোক নন; ধ্রন্ধর এক গোয়েন্দা। সরকার এখন কালো-বাজার-এর টাকার সন্ধানে আছে কি না, কোথায় কে কতো কালো টাকা, কালো সোনা জমিয়ে রেখেছে…'

'কালো সোনা তো আফিঙকেই বলে মশাই! সোনার দাম এখন আফিঙের সমান।' দাদার টীকা—আমার কথার ওপর।—'আমার কি আফিঙের চাষ নাকি?'

'আবার কেষ্টঠাকুরকেও কালোসোনা বলে থাকে কেউ কেউ!' তস্য ভ্রাতার টিপ্পনি দাদার ওপরে।—'কালোমানিকও বলে আবার।'

'এখনকার দিনে কালো টাকা তো কেউ আর বার করে না বাজারে, সোনার বার বানিয়ে ল্বকিয়ে কোনোখানে মজ্বদ করে রাখে, ব্বঝেচেন?' আমি বিশদ ব্যাখ্যা করি তখন—'আপনারা কালো বাজারে, মানে, কাঠের কালো বাজার করে প্রচুর টাকা জমিয়েছেন, সরকার বাহাদ্বরের সন্দেহ। তাই তার আঁচ্ পাবার জন্যেই এই গোয়েন্দা প্রভুটিকে লাগিয়েছেন আপনার পেছনে।'

'তাহলে তো বেশ গনগনে আঁচ মশাই মান্ষটার!' গোবর্ধন বলে, 'না আঁচলে তো বিশ্বাস নেই…বাঁচন নেই আমাদের।'

'সর্বনাশ করেছেন দাদা!' হর্ষবর্ধনের প্রায় কাঁদার উপক্রম, 'আপনি ওই লোকটাকে আসামের অরণ্য দেখিয়ে দিয়েছেন আবার।'

এমন সময় টেবিলের ফোন ক্রিং ক্রিং করে উঠলো ওঁর। ফোন ধরলেন হর্ষবর্ধন,—'হ্যালো। কে?…কে একজন ডাকছেন আপনাকে।' রিসিভারটা উনি এগিয়ে দিলেন আমায়।

'আমাকে? আমাকে কে ডাকতে যাবে এখানে?' অবাক হয়ে আমি কর্ণপাত করলাম—'হ্যালো, আমি শিব্রাম…আপনি কে?'

'আমি কল্কেকাশি। কাছাকাছি এক ডাক্তারখানা থেকে ফোন করছি আপনাকে। ওখানে বসে থাকতে দেখেই আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি বোধহয় চিনতে পারেননি আমায়…শ্ন্ন, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। অনেকদিন পরে দেখা পেল্বম আপনার। আজ রাত্রের ট্রেনে গৌহাটি

যাচ্ছি, আসুন না আমার সঙ্গে। প্রকৃতির লীলাভূমি আসাম, আপনি লেখক মানুষ, বেশ ভালো লাগবে আপনার। দু-পাঁচ দিন অরণ্যবিহার করে আসবেন এখন। চেঞ্জের কাজও হবে। কেমন, আসছেন তো?'

'অরণ্যবিহার?' আমার সাড়া দিই: 'আজ্ঞে না। আমাদের বাড়ি ঘাটশিলায়, তার চারধারেই জঙ্গল পাহাড়। প্রায়ই সেখানে যাই আমি—সঠিক বললে, বিহারের বেশির ভাগই অরণ্য। খোদ বিহার-অরণ্যে বাস করি। আমাকে আবার গৌহাটি গিয়ে অরণ্য-বিহার করতে হবে কেন? অরণ্য দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে আমার। আর সত্যি বলতে, এক-আধটু লিখি-টিখি বটে, তবে কোনো প্রকৃতিরসিক আমি আদপেই নই।'

ফোন রেখে দিয়ে হর্ষবর্ধনকে বললাম—'ঐ ভদ্রলোক, মানে কল্কেকাশিই ফোন করেছিলেন এখন। আজ রাত্রের ট্রেনেই উনি গৌহাটি যাচ্ছেন কিনা…'

'অ্যাঁ? গৌহাটি যাচ্ছেন! কী বললেন? অ্যাঁ?' আতঙ্কিত হন হর্ষবর্ধন, সেরেছে তাহলে। এবার আমাদের সর্বনাশ রে গোবরা!'

'সর্বনাশ কিসের! বাঁচিয়ে দিয়েছি তো আপনাকে। এখানে আপনাদের বাড়িতে তল্লাশী করলে বিস্তর সোনা দানা পেয়ে যেতো, এখান থেকে কায়দা করে হটিয়ে দিলাম কেমন। এখন মরুক না গিয়ে আসামের জঙ্গলে। অরণ্যে অরণ্যে রোদন করে বেড়াক!'

'এখানে আমাদের বাড়ি তল্লাশী করে কিছুই পেতো না সে। বড়ো জোর লাখ খানেক কি দেড়েক—আমাদের দৈনন্দিন দরকার মিটিয়ে মাস খরচার জন্য লাগে যেটা! আমরা কি এখানে টাকা জমাই নাকি মশাই? চোর-ডাকাতের ভয় নেইকো? সেদিনের কারখানার সেই চুরিটা হয়ে যাবার পর থেকে আমরা সাবধান হয়েছি। আমাদের কারবারের লাভের টাকা আর বাড়তি যা কিছু, সব আমরা সোনার বাট বানিয়ে গৌহাটি নিয়ে যাই—বাড়ির কাছাকাছি একটা জঙ্গলে গিয়ে এক চেনা গাছের তলায় পুঁতে রেখে আসি।'

'চেনা গাছ!' অবাক লাগে আমার—'গাছ কি আবার কখনো চেনা যায় নাকি? একটা গাছের থেকে আরেকটাকে, এক গোরুর থেকে অন্য গোরু, এক চীনেম্যানের থেকে আরেক চীনেম্যান কি আলাদা করে চিনতে পারে কেউ? গাছ যদি হারিয়ে যায়?'

'ঐ একটা বস্তু যা কখনো হারায় না, টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় না কদাচ। হাত-পা নেই তো, একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়…'

'এই জন্যেই তো শুদ্ধভাষায় ওদের পাদপ বলেছে, তাই না দাদা?' গোবরার সটিক ভাষ্য—'বনে আগুন লাগলে দপ করে জ্বলে ওঠে বটে কিন্তু সেখান থেকে মোটেই পালাতে পারে না।'

'আমি তো মশাই চিনতে পারিনে, শাখা-প্রশাখা ডাল-পালা নিয়ে সব গাছই তো আমার চোখে এক চেহারা মনে হয়। ফুল ধরলে কি ফল ফললে

তখন যা একটু টের পাই তাদের জ্ঞাতগোত্রের—কোনটা আম, কোনটা জাম—কিন্তু কোন গাছটা যে কে; কোনজনা, তা আমি চিনে রাখতে পারিনে।'

'আমরা পারি। একবার যাকে—যে গাছটাকে দেখি তাকে আর এ জীবনে ভুলিনে…'

'যাক্ গে সে-কথা…এখন আপনাদের গোয়েন্দা যদি আমাদের বাড়ি গিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলের যতো গাছের গোড়ায় না খোঁড়াখুঁড়ি লাগিয়ে দেয় তাহলেই তো হয়েছে!'

'গোড়ার গলদ বেরিয়ে পড়বে আমাদের।' গোবরা বলে।

'একটা না একটার তলায় পেয়ে যাবে আমাদের ঐশ্বর্যের হদিস। অরণ্যেই আমাদের ঐশ্বর্য, যতই গালভরা হোক, কথাটা বলে আপনি ভাল করেননি। এভাবে হদিসটা দেওয়া ঠিক হয়নি আপনার।'

'তার চেয়ে আপনি কষে আমাদের গাল দিতে পারতেন বরং। কিছু আসতো-যেতো না। গালে চড় মারতেও পারতেন।' গাল বাড়িয়ে দেয় গোবরা। —'কিন্তু আমাদের ভাঁড়ারের নাগাল দেওয়াটা উচিত হয়নি।'

'কী করা যায় এখন!' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন হর্ষবর্ধন। বসে তো ছিলেনই, মনে হয়, আরো যেন তিনি একটু বসে গেলেন।

'চলো দাদা, আমরাও গৌহাটি চলে যাই।' গোবরা একটা পথ বাতলায়, 'ওই ট্রেনেই চলে যাই আজ। গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি করা যাক বরং! ডিটেকটিভ বই তো নেহাত-কম পড়িনি—ওদের হাড়-হদ্দ জানি সব। কিছুই আমার অজানা নয়।'

ওর পড়াশোনার পরিধি কদ্দুর জানার আমার কৌতূহল হয়। সে অকাতরে বলে—'কম বই পড়েছি নাকি? লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে আনিয়ে পড়তে কিছু আর বাকি রাখিনি। সেই সেকেলে দারোগার দপ্তর থেকে শুরু করে পাঁচকড়ি দে—আহা, সেই মায়াবী মনোরমা বিষম বৈসূচন…কোনোটাই বাদ নেই আমার! আর সেই নীলবসনা সুন্দরী!'

দাদার সমর্থন আসে—'আহা, মরি মরি!'

'থেকে আরম্ভ করে সেদিনের নীহার গুপ্ত, গৌরাঙ্গ বোস অব্দি সব আমার পড়া। ব্লেক সিরিজ, মোহন সিরিজ বিলকুল। জয়ন্তকুমার থেকে ব্যোমকেশ পর্যন্ত কারো কীর্তিকলাপ আমার অজানা নয়। এতো পড়ে পড়ে আমি নিজেই এখন আস্ত একটা ডিটেকটিভ, তা জানেন?'

'বলো কি হে?'

'সেবারকার আমাদের কারখানার চুরিটা ধরলো কে শুনি? কোন গোয়েন্দা? এই—এই শর্মাই তো! তেজপাতার টোপ ফেলে তৈজসপত্রের লোভ দেখিয়ে আমিই তো ধরলাম চোরটাকে। দাদার বেবাক টাকা উদ্ধার করে দিলাম! তাই না দাদা?'

'তোর ওই সব বই-টই এক-আধটু আমিও যে পড়িনি তা নয়। ওর আনা বই-টই অবসরমতন আমিও ঘেঁটে দেখেছি বইকি! তবে পড়ে-টড়ে যা টের পেয়েছি তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে গোয়েন্দাদের মৃত্যু নেই। তারা আপনার ঐ আত্মার মতই অজর অমর অবিনশ্বর অকাট্য অবিধ্য…'

'অকাট্য? অবিধ্য?'

'হ্যাঁ, তরোয়ালে কেটে ফেলা যায় না, গুলি দিয়ে বিঁধ করা যায় না—মেরে ফেলা তো অসম্ভব। কানের পাশ দিয়ে চলে যাবে যতো গুলিগোলা। এই পরিচ্ছেদে দেখলেন আপনি যে হতভাগা খতম হলো, আবার পরের পরিচ্ছেদেই দেখুন ফের বেঁচে উঠেছে আবার। অকাট্য অবিধ্য অখাদ্য।'

'তাহলে চলো দাদা! আমরাও ওকে টের পেতে না দিয়ে ওই ট্রেনেই চলে যাই আজকে। গুলি না করেও গুলিয়ে দেওয়া যাক ওকে—আসল জায়গার থেকে ভুলিয়ে অন্য জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবো দেখো তুমি।'

এতক্ষণে দাদা যেন একটু আশ্বস্ত হলেন মনে হলো। হাসিমুখে বললেন—'যাব তো, কিন্তু যাচ্ছি যে, ও যেন তা টের না পায়।…'

গোহাটি স্টেশনে নামতেই তাঁরা নজরে পড়ে গেলেন কল্কেকাশির। কল্কেকাশি তাঁদের দেখতে পেয়েছে সেটা তাঁরা লক্ষ্য করলেন বটে, কিন্তু তাঁরা যে লক্ষীভূত হয়েছেন সেটা তাঁকে টের পেতে দিলেন না একেবারেই। নজরই দিলেন না একদম তাঁর দিকে। আপনমনে হেলে-দুলে বাইরে গিয়ে একটা ট্যাকসি ভাড়া করলেন তাঁরা।

কল্কেকাশিও অলক্ষে পিছু পিছু আরেকটা ট্যাকসিতে গিয়ে উঠলেন তারপর। ছুটলেন তাঁদের পিছনে পিছনে।

হর্ষবর্ধনের গাড়ি কিন্তু কোন জঙ্গলের ত্রিসীমানায় গেল না, তাঁদের বাড়ির চৌহদ্দির ধারে তো নয়ই। অনেক দূর এগিয়ে একটা ছোটখাটো পাহাড়ের তলায় গিয়ে খাড়া হল গাড়িটা।

ভাইকে নিয়ে নামলেন হর্ষবর্ধন। ভাড়া মিটিয়ে মোটা বখশিস দিয়ে ছেড়ে দেলেন ট্যাকসিটা।

কল্কেকাশিও নেমে পড়ে পাহাড়ের পথ ধরে দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগলেন ওঁদের।

আড়চোখে পিছনে তাকিয়ে দাদা বললেন ভাইকে—'ছায়ার মতন আসছে লোকটা। খবরদার ফিরে তাকাস নে যেন।'

'পাগল হয়েছো দাদা? তাকাই আর তাক পেয়ে যাক?' দাদার মতন গোবরারও যেন আজ নয়া চেহারা: 'দু-ভায়ে এখেনেই ওকে আজ নিকেশ করে যাব। কাক চিল কেউ টের পাবে না, সাক্ষী-সাবুদ থাকবে না কেউ। শকুনি গৃধিনীতে খেয়ে শেষ করে দেবে কালকে।'

'কাজটা খুবই খারাপ ভাই, সত্যি বলছি !' দাদার অনুযোগ ; 'কিন্তু কি করা যায় বল ? ও বেঁচে থাকতে আমাদের বাঁচান নেই; আর আমাদের বেঁচে থাকাটাই যখন বেশি দরকার, অন্তত আমাদের কাছে……তখন ওকে নিয়ে কি করা যায় আর ? তবে ওকে আদৌ মারা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। এখনো পর্যন্ত কোনো বইয়ে একটা গোয়েন্দাও মরেনি কখনো।'

'কিন্তু বাবার যেমন বাবা আছে, তেমনি গোয়েন্দার উপরেও গোয়েন্দা থাকে……' জানায় গোবরা—'আর তিনি হচ্ছেন খোদ এই গোবর্ধন ! খোদার ওপর খোদকারি হবে আজ আমার।' ব্লেক আর স্মিথের মতই গোবরা দাদাকে নিজের সাকরেদ বানাতে চাইলেও হর্ষবর্ধন অন্যরূপে প্রকট হন, গোঁফ মুচড়ে বলেন—'তুই যদি গোবর্ধন, তাহলে আমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং গোবর্ধনকে ধারণ করে রয়েছি !'

বলে ভাইয়ের হাত ধরে বলেন—'আয়; আমরা এই উঁচু ঢিবিটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। একটুখানি গা ঢাকা দিই। লোকটা এখানে এসে আমাদের দেখতে না পেয়ে কী করে দেখা যাক……'

কল্কেকাশি বরাবর চলে এসে কাউকে না দেখে সোজা পাহাড়ের খাড়া দিকটার কিনারায় গিয়ে পৌঁছান। দেখেন যে তার ওধারে আর পথ নেই, অতল খাদ, তাঁর খাদ্যরা বিলকুল গায়েব। তাকিয়ে দেখেন চার দিকে—দুই ভাই কারোরই কোন পাত্তা নেই—গেলো কোথায় তারা ?

এমন সময় যেন মাটি ফুঁড়েই তারা দেখা দিলো হঠাৎ।

কল্কেকাশি সাড়া পেলেন পেছন থেকে—'হাত তুলে দাঁড়ান।'

ফিরে তাকিয়ে দেখেন দুই মূর্তিমান দাঁড়িয়ে—যুগপৎ শ্রীহর্ষ এবং শ্রীমান গোবর—বর্ধন ভ্রাতৃদ্বয়। দুজনের হাতেই দোনলা পিস্তল।

'এবার আপনি আমাদের কবজায়, কল্কেকাশিবাবু। হাতের মুঠোয় পেয়েছি আপনাকে। আর আপনার ছাড়ান নেই, বিস্তর জ্বালিয়েছেন কিন্তু আর আপনি আমাদের জ্বালাতে পারবেন না। দেখছেন তো আমাদের হাতে এটা কী !' হর্ষবর্ধন হস্তগত বস্তুটি প্রদর্শন করেন—'সব জ্বালাযন্ত্রণা খতম হবে এবার—আমাদেরও, আপনারও।'

'একটু ভুল করছেন হর্ষবর্ধনবাবু ! জানেন নাকি, আমাদের গোয়েন্দাদের কখনো মৃত্যু হয় না ? আমরা অদাহ্য অভেদ্য অমর।'

'জানি বইকি, পড়েওছি বইয়ে। আপনারা অসাধ্য, অকাট্য, অখাদ্য ইত্যাদি ইত্যাদি ; কিন্তু তাই বলে আপনারা কিছু অপত্য নন। দু-পা আগ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখুন একবার—আপনার সামনে অতল খাদ—মুহূর্ত বাদেই ওই খাদে পড়ে ছাতু হতে হবে আপনাকে। পালাবার কোনো পথ নেই। ওই পতন অপ্রতিরোধ্য। কিছুতেই আপনি তা রোধ করতে পারবেন না। সব হতে পারেন কিন্তু আপনি তো অপত্য, মানে; অপতনীয় নন।'

'আপনাকে প্রজাপুঞ্জের মতন অপত্যনির্বিশেষে আমরা পালন করবো।' গোবর্ধন জানায়, 'বেশির ভাগ বাবাই যেমন ছেলের অধঃপতনের মূল, মানুষ করার ছলনায় তাকে অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় ঠিক তেমনি ধারাই প্রায়—আপনাকে পুঞ্জীভূত করে রাখবো পাহাড়ের তলায়। হাড়মাস সব এক জায়গায়।'

'পায়ে পায়ে এগিয়ে যান এইবার।' হর্ষবর্ধনের হুকুম, 'খাদের ঠিক কিনারায় গিয়ে খাড়া হন। নিজে ঝাঁপিয়ে পড়বার সাহস আপনার হবে না আমি জানি। আপনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবো আমরা। এগোন, এগোন··· নইলেই এই দুড়ুম!'

অগত্যা কল্কেকাশি কয়েক পা এগিয়ে কিনারাতেই গিয়ে দাঁড়ান। হাতঘড়িটা কেবল দেখে নেন একবার।

'ঘড়ি দেখে আর কী হবে সার! অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন আপনার।' দাদা বলেন—'গোবরা, চারধারে একবার ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখ তো, পুলিস-টুলিস কারু টিকি দেখা যাচ্ছে নাকি কোথাও?'

উঁচু পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে গোবরা নজর চালায় চারধারে, 'না দাদা, কেউ কোথ্থাও নেই। পুলিস দূরে থাক, চার মাইলের মধ্যে জনমনিষ্যির চিহ্ন না। একটা পোকামাকড়ও নজরে পড়ছে না আমার।'

'খাদটা কতো নিচু হবে রে?' দাদা শুধায়, 'ধারে গিয়ে দেখে আয় তো।'

'তা, পাঁচশো ফুট তো বটেই।' আঁচ পায় গোবরা।

'কোথাও কোনো ঝোপ-ঝাড়, গাছের শাখা-প্রশাখা, লতাগুল্ম কিছু বেরিয়ে-টেরিয়ে নেই তো! পতন রোধ হতে পারে এমন কিছু—কোথাও কোনো ফ্যাকড়ায় লোকটা আটকে যেতে পারে শেষটায়—এমনতরো কোনো ইতর বিশেষ—আছে কিনা ভালো করে দ্যাখ।'

'বিলকুল ন্যাড়া এই খাড়াইটা—আটকাবার মতন কোথাও কিছু নেইকো।'

'বেশ। আমি রিভলভার তাক করে আছি। তুই লোকটার পকেট-টকেট তল্লাশী করে দ্যাখ এইবার। কোনো প্যারাচুট কি বেলুন-ফেলুন লুকিয়ে রাখেনি তো কোথাও?'

'এক পকেটে একটা রিভলভার আছে দাদা!'

'বার করে নে এক্ষুনি, আর অন্য পকেটটায়?'

'একখানা রুমাল।'

'নিয়ে নে ওটাও। কে জানে, ওটাকেই হয়তো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্যারাচুটের মতো বানিয়ে নিয়ে দুর্গা বলে ঝুলে পড়বে শেষটায়—কিছুই বলা যায় না। ওদের অসাধ্য কিছু নেই।'

গোবর্ধন হাসে—'রুমালকে আর প্যারাচুট বানাতে হয় না। তুমি হাসালে

দাদা !' বলে রুমালটাও সে হাতিয়ে নেয়।

'এখন কোনো ভূমিকম্পটম্প হবে না তো রে ? সে রকম কোনো সম্ভাবনা নেই, কী বলিস ?'

'একদম না। এ ধারটায় অনেকদিন ও-সব হয়নি আমি শুনেছি।'

'তাহলে তুই এবার রিভলভার বাগিয়ে দাঁড়া, আমি লোকটাকে ছুটে গিয়ে জোরসে এক ধাক্কা লাগাই।'

'ওই কমমোটি কোরো না দাদা! দোহাই! তাহলে ও তোমায় জড়িয়ে নিয়ে পড়বে, আর পড়তে পড়তেই, কায়দা করে আকাশে উলটে গিয়ে তোমাকে তলায় ফেলে তোমার ওপরে গিয়ে পড়বে তারপর। তোমার দেহখানি দেখছ তো! ওই নরম গদির ওপরে পড়লে ওর কিছুই হবে না। লাগবে না একটুও। তুমিই ছাতু হয়ে যাবে দাদা মাঝ থেকে। গোহাটি এসে আমাকে এমন ভাবে দাদহারা কোরো না তুমি—রক্ষে করো দাদা!'

'ঠিক বলেছিস! আমার চেয়ে বেশি পড়াশুনা তোর তো। আমি আর ক-খানা গোয়েন্দাকাহিনী পড়েছি বল! পড়বার সময় কই আমার।' ভাইয়ের বুদ্ধির তারিফ করেন হর্ষবর্ধন।—'দাঁড়া, তাহলে একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে আসি। তাই দিয়ে দূর থেকে গোঁত্তা মেরে ফেলে দিই লোকটাকে—কী বলিস ?'

তারপর হর্ষবর্ধনের গোঁত্তা খেয়ে কল্কেকাশি পাহাড়ের মাথার থেকে বেপাত্তা!

'কল্কেকাশির কল্কেপ্রাপ্তি ঘটে গেলো দাদা! তোমার কৃপায়।'

'একটা পাপ কমলো পৃথিবীর। একটা বদমাইশকে দুনিয়া থেকে দূর করে দিলাম।' আরামের হাঁফ ছাড়লেন হর্ষবর্ধন।

'একেবারে গোটুহেল করে দিয়েছো লোকটাকে। এতক্ষণ নরকের পথ ধরেছে সটান।' গোবর্ধন বলে : 'খাদের তলায় দেখবো নাকি তাকিয়ে একবার ? কিরকম ছরকুটে পড়েছে দেখবো দাদা ?'

'দরকার নেই। পাহাড়ের থেকে পড়ে পায়ের হাড় পর্যন্ত গুঁড়ো হয়ে গেছে। বিলকুল ছাতু! সে-চেহারা কি আছে নাকি আর ? তাকিরে দেখবার কিছু নেই।' দাদা বলেন—'চ, এবার আস্তে আস্তে ফিরে চলি আমরা। ইস্টিশনের দিকে এগুনো যাক। বড়ো রাস্তার থেকে একটা বাস ধরলেই হবে।'

পাহাড়তলীর পথ ধরে এগিয়ে চলেন দু-ভাই।

যেতে যেতে হঠাৎ পেছন থেকে সাড়া পান যেন কার—'হাত তুলে দাঁড়ান। দুজনেই।'

পিছন ফিরে দেখেন—স্বয়ং সাক্ষাৎ কল্কেকাশি। হাতে পিস্তল নিয়ে খাড়া।

'আপনারা টের পাননি প্যান্টের পকেটে আরেকটা পিস্তল ছিল আমার।' কৈফিয়তের মতই বলতে যান কল্কেকাশি।

'তা তো ছিলো। কিন্তু আপনি ছিলেন কোথায়?' হতভম্ব হর্ষবর্ধনের মুখ থেকে বেরোয়।

'আকাশে। আবার কোথায়! হেলির নাম শুনেছেন কখনো?' বাতলান কল্কেকাশি: 'তার দৌলতেই বেঁচে গেলাম এ-যাত্রা।'

'হেলই আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, বলছেন আপনি? মানে, জাহান্নামের পথ থেকেই ফিরে আসছেন সটান?'

'না। অন্দরে যেতে হয়নি অবশ্যি। হেলি—মানে হেলির ধূমকেতুর নাম শোনেননি নাকি কখনো? নিরনব্বই বছর অন্তর অন্তর—একবার করে পৃথিবীর পাশ কাটিয়ে যায় সেটা। সেই সময়টায় তার বিকর্ষণে কয়েক মুহূর্তের জন্যেই, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি লোপ পায় পৃথিবীর। তাই আমি তখন ঘড়ি দেখছিলাম বার বার—হেলির ধূমকেতু কখন যায় এ-ধার দিয়ে। আজ তার ফিরে আসার নিরনব্বইতম বছর তো! আর ঠিক সেই সময়েই ফেলেছিলেন আপনারা আমায়। আমাকে আর মাটিতে পড়তে হয়নি আছড়ে। আকাশের গায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ঠায়। আর আপনারা পেছন ফিরতেই, পাখির মতন বাতাস কেটে সাঁতরে এসে উঠেছি ওই পাহাড়ে। তারপর থেকেই এই পিছু নিয়েছি আপনাদের। রিভলভার দুটো লক্ষ্মী ছেলের মতন ফেলে দিন তো এইবার। ব্যস, এখন হাত তুলে চলুন দুজনে গুটিগুটি। সোজা থানার দিকেই সটাং!'

'নিরানব্বই বছর অন্তর অন্তর হেলির ধূমকেতু পাশ দিয়ে যায় পৃথিবীর? জানতাম না তো! কখনো শুনিও নি এমন আজগুবি কথা।'

অবাক লাগে হর্ষবর্ধনের।

'এখন তো জানলেন! পাক্কা নিরানব্বই বছর বাদ ধূমকেতুর আসার ধূমধাড়াক্কার মুখেই আপনার ধাক্কাটা এলো কিনা, তাই দুই ধাক্কায় কাটাকাটি হয়ে কেটে গেলো। বুঝলেন এখন?'

'এর নামই নিরনব্বইয়ের ধাক্কা, বুঝলে দাদা?' বললো গোবরা।

হর্ষবর্ধনের সূর্য-দর্শন

সূর্যদর্শন না বলে সূর্যগ্রাস বললেই ঠিক হয় বোধ হয়।

রাহুর পরে এক মহাবীরই যা সূর্যদেবকে বগলদাবাই করেছিলেন, কিন্তু যতো বড়ো বীরবাহুই হন না, হর্ষবর্ধনকে হনুমানের পর্যায়ে কখনো ভাবাই যায় না।

তাই তিনি যখন এসে পাড়লেন, 'সূর্যি মামাকে দেখে নেবো এইবার', তখন বলতে কি, আমি হাঁ হয়ে গেছলাম।

আমার হাঁ-কারের কোনো জবাব না দিয়েই তিনি দ্বিতীয় হেঁয়ালি পাড়লেন, 'সুন্দরবনের বাঘ শিকার তো হয়েছে, চলুন এবার পাহাড়ে বাঘটাকে দেখে আসা যাক।'

'যদ্দুর আমার জানা', না বলে আমি পারলাম না; 'বাঘরা পাহাড়ে বড়ো একটা থাকে না। বনে জঙ্গলেই তাদের দেখা মেলে। হাতিরাই থাকে পাহাড়ে। পাহাড়দের হাতিমার্কা চেহারা—দেখেছেন তো?'

'কে বলেছে আপনাকে?' তিনি প্রতিবাদ করলেন আমার কথার, 'টাইগার হিল তাহলে বলেছে কেন? নাম শোনেননি টাইগার হিলের?'

'শুনবো না কেন? তবে সে হিলে, যদ্দুর জানি, কোনো টাইগার থাকে না। বাবুরা বেড়াতে যান।'

'সূর্যিঠাকুর সেই পাহাড়ে ওঠেন রোজ সকালে সে নাকি অপূর্ব দৃশ্য!'

'তাই দেখতেই তো যায় মানুষ।'

'আমরাও যাবো। আমি, আপনি আর গোবরা। এই তিনজন।'

বিকেলের দিকে পেঁছিলাম দার্জিলিঙে। টাইগার পাহাড়ের কাছাকাছি এক হোটেলে ওঠা গেল।

খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে হোটেলের মালিককে অনুরোধ করলাম— 'দয়া করে আমাদের কাল খুব ভোরের আগে জাগিয়ে দেবেন……'

'কেন বলুন তো?'

'আমরা এক-একটি ঘুমের ওস্তাদ কিনা, তাই বলছিলাম…'

'ঘুম পাহাড়ও বলতে পারেন আমাদের।' বললেন হর্ষবর্ধন—'যে ঘুম পাহাড় খানিক আগেই পেরিয়ে এসেছি আমরা! তাই আমাদের এই পাহাড়ে ঘুম সহজে ভাঙবার নয় মশাই।'

'নিজগুণে আমরা ঘুম থেকে উঠতে পারবো না,' গোবরাও যোগ দিলো আমাদের কথায়—'তাই আপনাকে এই অনুরোধ করছি……'

'কারণটা কি জানতে পারি?'

'কারণ? আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, অ্যাদ্দুরে এসেছি কেবল সূর্যোদয় দেখবার জন্য।'

'সূর্যোদয় দেখবার জন্য? কেন, কলকাতায় কি তা দেখা যায় না? সেখানে কি সূর্য ওঠে না নাকি?'

'উঠবে না কেন, কিন্তু দর্শন মেলে না। চারধারেই এমন উঁচু উঁচু সব বাড়িঘর যে, সূর্যি ঠাকুরের ওঠা নামার খবর টের পাবার জো নেই।'

'তাছাড়া, তালগাছও তো নেইকো কলকাতায়; থাকলে না-হয় তার মাথায় উঠে দেখা যেতো…' গোবরা এই তালে একটা কথা বললো বটে তালেবরের মতন!

'তাল গাছ না থাক, তেতোলা বাড়ি আছে তো? তার ছাদে উঠে কি দেখা যেতো না?' বলতে চান ম্যানেজার।

'থাকবে না কেন তেতলা বাড়ি। তেতাল, চৌতাল, ঝাঁপতাল সবরকমের বাড়িই আছে।' বলে হর্ষবর্ধন তাঁর উল্লিখিত শেষের বাড়ির বিশদ বর্ণনা দেন, 'ঝাঁপতাল বাড়ি নামে যে-সব সাত-দশ তলা বাড়ির থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরবার তালে ওঠে মানুষ, তেমন বাড়িও আছে বই-কি! কিন্তু থাকলে কি হবে, তাদের ছাদে উঠেও বোধ হয় দেখা যাবে না সূর্যোদয়! দূরের উঁচু উঁচু বাড়ির আড়ালেই ঢাকা থাকবে পূব আকাশ।'

'এক হয়, যদি মনুমেণ্টের মাথায় উঠে দেখা যায়…'আমি জানাই।

'তা সেই মনুমেণ্টের মাথায় উঠতে হলে পুরো একটা দিন লাগবে মশাই আমার এই দেহ নিয়ে…দেহটা দেখেছেন?'

হর্ষবর্ধনের সকাতর আবেদনে হোটেলের মালিক তাঁর দেহটি অবলোকন করেন। তারপরে সায় দেন—'তা বটে।'

'তবেই দেখুন এ-জন্মে আমার সূর্যোদয়ই দেখা হচ্ছে না তাহলে—এই

মানবদেহ ধারণ বৃথাই হলো…'

'তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ…'

'এখানে নাকি অবাধে সূর্যোদয় দেখা যায়, আর তা নাকি একটা দেখবার জিনিস সত্যিই…'

'সেই কারণেই আপনাকে বলছিলাম…'

আমাদের যুগপৎ প্রতিবেদন—'দয়া করে আমাদের ভোর হবার আগেই ঘুম থেকে তুলে দেবেন। এমনকি; দরকার হলে জোর করেও।'

'কোনো দরকার হবে না।' তিনি জানান, 'রোজ ভোর হবার আগে এমন সোরগোল বাধে এখানে যে তার চোটে আপনার থেকেই ঘুম ভেঙে যাবে আপনাদের।'

'সোরগোলটা বাধে কেন?'

'কেন আবার? ঐ সূর্যোদয় দেখবার জন্যেই। যে কারণে যেই আসুক না, হাওয়া খেতে কি বেড়াতে কি কোনো ব্যবসার খাতিরে, ঐ সূর্যোদয়টি সবারই দেখা চাই। হাজার বার দেখেও আশ মেটে না কারো। একটা বাতিকের মতই বলতে পারেন।'

'আমরাও এখানে চেঞ্জে আসিনি, বেড়াতে কি হাওয়া খেতেও নয়—এসেছি ঠিক ঐ কারণেই…।'

'তাই রোজ ভোর হবার আগেই হোটেলের বোর্ডাররা সব গোল পাকায়, এমন হাঁকডাক ছাড়ে যে, আমরা, মানে এই হোটেলের কর্মচারীরা, যারা অনেক রাতে কাজকর্ম সেরে ঘুমতে যায় আর অত ভোরে উঠতে চায় না; সূর্য ভাঙিয়ে আমাদের ব্যবসা হলেও সূর্য দেখার একটুও গরজ নেই যাদের, একদম সেজন্য ব্যতিব্যস্ত নয়, তাদেরও বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হয় ঐ হাঁকডাকের দাপটে। কাজেই আপনাদের কোনো ভাবনা নেই কিচ্ছু করতে হবে না আমাদের। কোন বোর্ডারকে আমরা ডিসটার্ব করতে চাইনে, কারও বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো আমাদের নিয়ম নয়…তার দরকারও হবে না, সাত সকালেই সেই গোলমালে আপনাদের ঘুম যতই নিটোল হোক-না কেন, না ভাঙলেই আমি অবাক হবো।'

অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে হোটেলের ঘরে আমাদের মালপত্র রেখে বিকেলের জলযোগ পর্ব চা-টা সেরে বেড়াতে বেরুলাম আমরা।

তখন অবশ্যি সূর্যোদয় দেখার সময় ছিল না, কিন্তু তা ছাড়াও দেখবার মতো আরো নানান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মজুদ ছিল তো! সেই সব অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতেই আমরা বেরুলাম।

সন্ধে হয়-হয়। এ-ধারের পাহাড়ের পথঘাট একটু ফাঁকা ফাঁকাই এখন। একটা ভুটিয়ার ছেলে একপাল ভেড়া চরিয়ে বাড়ি ফিরছে গান গাইতে গাইতে।

শুনে হর্ষবর্ধন আহা-উহু করতে লাগলেন।

'আহা আহা! কী মিষ্টি! কী মধুর…'

'কেমন মূর্ছনা !' যোগ দিল গোবরা। শুনে প্রায় মূর্ছিত হয় আর কি !

'একেই বলে ভাটিয়ালি গান, বুঝেছিস গোবরা ? কান ভরে শুনে নে, প্রাণ ভরে শোন।'

'ভাটিয়ালি গান বোধ হয় এ নয়,' মৃদু প্রতিবাদ আমার—'সে গান গায় পূব-বাংলার মাঝিরা, নদীর বুকে নৌকার ওপর বৈঠা নিয়ে বসে। ভাটির টানে গাওয়া হয় বলেই বলা হয় ভাটিয়ালি।'

'আহলে এটা কাওয়ালি হবে।' সমঝদারের মতন কন হর্ষবর্ধন।

'তাই-বা কি করে হয় ? গোরু চরাতে চরাতে গাইলে তাই হতো বটে, কিন্তু cow তো নয়, ওতো চরাচ্ছে ভেড়া।'

'কাওয়ালিও নয় ?' হর্ষবর্ধন যেন ক্ষুণ্ন হন।

'রাখালী গান বলতে পারো দাদা !' ভাই বাতলায়, 'ভেড়া চরালেও রাখালই তো বলা যায় ছোঁড়াটাকে।'

'লোকসঙ্গীতের বাচ্চা বলতে পারেন।' আমিও সঙ্গীতের গবেষণায় কারো চাইতে কম যাই না, এই বেড়ালই যেমন বনে গেলে বনবেড়াল হয়। তেমনি এই বালকই বড়ো হয়ে একদিন কেষ্ট-বিষ্টু একটা লোক হবে। অন্তত যখন ওর গোঁফ বেরুবে তখন এই গানকে অক্লেশে লোকসংগীত বলা যাবে। এখন নেহাৎ বালকসঙ্গীত।'

ভেড়ার পাল নিয়ে গান গাইতে ছেলেটা কাছিয়ে এলে হর্ষবর্ধন নিজের পকেট হাতড়াতে লাগলেন—'ওকে কিছু বকশিস দেওয়া যাক। ওমা ! আমার মনিব্যাগটা তো হোটেলের ঘরে ফেলে এসেছি দেখছি। আপনার কাছে কিছু আছে ? নাকি, আপনিও ফেলে এসেছেন হোটেলে ?'

'পাগল ! আমি প্রাণ হাত ছাড়া করতে পারি, কিন্তু পয়সা নয়। আমার যৎসামান্য যা কিছু আমার সঙ্গে থাকে—আমার পকেটে আমার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তবে কিনা।....'

বলতে গিয়েও বাধে আমার। চক্রবর্তীরা যে কঞ্জুস হয়, সে-কথা মুখ ফুটে বলি কি করে ? নিজ গুণ কি গণনা করবার ?

'তাহলে ওকে কিছু দিন মশাই ! একটা টাকা অন্তত।'

দিলাম।

টাকাটা পেয়ে তো ছেলেটা দস্তুরমত হতবাক। পয়সার জন্যে নয়, প্রাণের তাগাদায় অকারণ পুলকেই গাইছিল সে। তাহলেও খুশি হয়ে, আমাদের সেলাম বাজিয়ে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে সে চলে গেলো।

খানিকবাদে সেই পথে আবার এক রাখাল বালকের আবির্ভাব ! সেই ভেড়ার পাল নিয়ে সেইরকম সুর ভাঁজতে ভাঁজতে···তাকেও এক টাকা দিতে হয়।

আবার খানিকবাদে আবার অরেক ! পঞ্চম-স্বরে গলা চড়িয়ে ফিরছে ঐ-

পথেই।

তার স্বরাঘাতের হাত থেকে রেহাই পেতে, অর্ধচন্দ্র দেওয়ার মতো একটা আধুলি দিয়ে তাকে বিদায় করা হলো।

তারপর আরো আরো আরো মেষপালকের গাইয়ে বালকের দল আসতে লাগল পরম্পরায়…ঐ পথে, আর আমিও তাদের বিদায় দিতে লেগেছি। তিনটেকে আধুলি, চারটেকে পঁচিশ পয়সা করে, বাকীগুলোকে পুঁজি হালকা হওয়ার হেতু বাধ্য হয়েই দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা ঝরে দিয়ে তাদের গন্তব্য পথে পাচার করে দিতে হলো।

'সেই একটা ছেলেই ঘুরে ঘুরে আসছে নাতো দাদা ?' গোবরা সন্দেহ করে শেষটায়—'পয়সা নেবার ফিকিরে ?'

'সেই একটা ছেলেই নাকি মশাই ?' দাদা শুধান আমায়।

'কি করে বলব ? একটা ভুটিয়ার থেকে আরেকটা ভুটিয়াকে আলাদা করে চেনা আমার পক্ষে শক্ত। এক ভেড়ার পালকে আরেক পালের থেকে পৃথক করাও কঠিন। আমার কাছে সব ভেড়াই একরকম। এক চেহারা।'

'বলেন কি ?' হর্ষবর্ধন তাজ্জব হন।

'হ্যাঁ সব এক ভ্যারাইটি। যেমন এক চেহারা তেমনি এক রকমের স্বরলহরী—কি ভেড়ার আর কী ভুটিয়ার !'

'আসুন তো, পাশের টিলাটার ওপর উঠে দেখা যাক ছেলেটা যায় কোথায় !' ছেলেটা যেতেই আমরা টিলাটার ওপরে উঠলাম।

ঠিক তাই ; ছেলেটা এই টিলাটার বেড় মেরেই ফের আসছে বটে ঘুরে… গলা ছেড়ে দিয়ে সুরের সপ্তমে।

কিন্তু এবার আর সে আমাদের দেখা পেল না।

না পেয়ে, টিলাটাকে আর চক্কর না মেরে তার নিজের পথ ধরল সে। তার চক্রান্তের থেকে মুক্তি পেলাম আমরাও।

কিন্তু ছেলেটা আমাকে কপর্দক শূন্য করে দিয়ে গেলো। আরেকটু হলে তার গানের দাপটে আমার কানের সবকটা পর্দাই সে ফাটিয়ে দিয়ে যেত। তাহলেও, কানের সাত পর্দার বেশ কয়েকটাই সে ঘায়েল করে গেছে, শেষ পর্দাটাই বেঁচে গেছে কোন রকমে। আমার মত আমার কানকেও কপর্দকশূন্য করে গেছে।

তাহলেও কোনো গতিকে কানে কানে বেঁচে গেলাম এ-যাত্রায়।

প্রাকৃতিক মাধুরীর প্রচুর ভুরিভোজের পর বহুৎ হণ্টন করে হোটেলে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেলো।

তখন ঘুমে আমাদের চোখ ঢুলুঢুলু, পা টলছে। কোনো রকমে কিছু নাকে মুখে গুঁজেই আমাদের ঘরের ঢালাও বিছানায় গিয়ে আমরা গড়িয়ে পড়লাম।

'গোবরাভায়া, দরজা জানলা খড়খড়ি ভালো করে এঁটে দাও সব। নইলে কোনো ফাঁক পেলে কখন এসে বৃষ্টি নামবে, তার কোনো ঠিক নেই।' বললাম আমি গোবর্ধনকে।

'এটা তো বর্ষাকাল নয় মশাই।'

'দার্জিলিঙের মেজাজ তুমি জানো না ভাই। এখানে আর কোনো ঋতু নেই, গ্রীষ্ম নেই, বসন্ত নেই, শরৎ নেই, খালি দুটো ঋতুই আছে কেবল। শীতটা লাগাতার, আর বর্ষণ যখন তখন।'

'তার মানে?'

'চার ধারেই হালকা মেঘ ঘুরছে—নজরে না ঠাওর হলেও। মেঘলোকের উচ্চতাতেই দার্জিলিং তো। জানলা খড়খড়ির ফাঁক পেলেই ঘরের ভেতর সেই মেঘ এসে বৃষ্টি নামিয়ে সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে।'

'বলেন কি?'

'তাই বলছি।' আমি বললাম—'কিন্তু আর বলতে পারছি না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম……'

'ঘুমোচ্ছেন তো! কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে ঘুমোবেন।' হাঁকলেন হর্ষবর্ধন।

'তেমন করে কি ঘুমোনো যায় নাকি?' আমি না বলে পারি না—'চোখ তো বুজতে হবে অন্তত।'

'কিন্তু কান খাড়া রাখুন। কান খোলা রেখে সজাগ হয়ে ঘুমোন। একটু সোরগোল কানে এলেই বুঝবেন ভোর হয়েছে। জাগিয়ে দেবেন আমাদের।'

'দেখা যাবে।' বলে আমি পাশ ফিরে শুই। কান দিয়ে কদ্দুর কতটা দেখতে পারবো, তেমন কোনো ভরসা না করেই।

এক ঘুমের পর কেমন যেন একটা আওয়াজে আমার কান খাড়া হয়। আমি উঠে বসি বিছানায়। পাশে ঠেলা দিই গোবরাকে—'গোবরা ভায়া, একটা আওয়াজ পাচ্ছো না?'

'কিসের আওয়াজ?'

'পাখোয়াজ বাজছে যেন। কেউ যেন ভৈরো রাগিণী সাধছে মনে হচ্ছে। ভৈরোঁ হলো-গে ভোরবেলার রাগিণী। ভোরবেলায় গায়।'

'পাখোয়াজ বাজছে?' গোবরাও কান তুলে শোনবার চেষ্টা পায়।

হর্ষবর্ধনও সাড়া দেন ঘুম থেকে উঠে—'কি হয়েছে? ভোর হয়েছে নাকি?'

'খানিক আগে কি রকম যেন একটা সোরগোল শুনছিলাম'—আমি বললাম।

'ভোর হয়েছে বুঝি?'

'ভাবছিলুম তাই। কিন্তু আর সেই হাঁকডাকটা শোনা যাচ্ছে না।'

'শুনবেন কি করে?' বলল গোবরা—'দাদা জেগে উঠলেন যে! দাদাই তো নাক ডাকাচ্ছিলেন এতক্ষণ।'

'কখনো না। বললেই হলো! কখনো আমার নাক ডাকে না, ডাকলে আমি শুনতে পেতুম না নাকি? ঘুম ভেঙে যেতো না আমার?'

'তুমি যে বদ্ধকালা। শুনবে কি করে? নইলে কানের অতো কাছাকাছি নাক! আর ওই ডাকাতপড়া হাঁক তোমার কানে যেতো না?'

'তুই একটা বদ্ধ পাগল! তোর সঙ্গে কথা কয়ে আমি বাজে সময় নষ্ট করতে চাই নে।' বলে দাদা পাশ ফিরলেন—আবার তাঁর হাঁকডাক শুরু হলো।

এরপর, অনেকক্ষণ পরেই বোধহয়, হর্ষবর্ধনই জাগালেন আমাদের—কোনো সোরগোল শুনছেন?

'কই না তো।' আমি বলি—'বিলকুল চুপচাপ।'

'এতক্ষণেও ভোর হয়নি? বলেন কি! জানলা খুলে দেখা যাক তো…' তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে জানলাটা খুললেন—'ওমা! এই যে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে…উঠুন! উঠুন! উঠে পড়ুন। চটপট।'

আমরা ধড়মড় করে উঠে পড়লাম।

'জামা কাপড় পরে না! সাজগোজ করার সময় নেই—তাছাড়া দেখতেই যাচ্ছেন, কাউকে দেখাতে যাচ্ছেন না। নিন, কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন। দেরি করলে সূর্যোদয়টা ফসকে যাবে।'

তিনজনেই শশব্যস্ত হয়ে আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

টাইগার হিলের উঁচু টিলাটা কাছেই। হন্তদন্ত হয়ে তিনজনায় গিয়ে খাড়া হলাম তার ওপর।

বিস্তর লোক গিজগিজ করছে সেখানে। নিঃসন্দেহ, সূর্যোদয় দেখতে এসেছে সবাই।

'মশাই। সূয্যি উঠতে দেরি কতো?' হর্ষবর্ধন একজনকে শুধালেন।

'সূয্যি উঠতে?' ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে ওঁর কথায় জবাব দিলেন।

'বেশি দেরি নেই আর।' আমি বললাম—'আকাশ বেশ পরিষ্কার। দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত…উঠলো বলে মনে হয়।'

কিন্তু সূর্য আর ওঠে না। হর্ষবর্ধন বাধ্য হয়ে আরেকজনকে শুধান—'সূয্যি উঠচে না কেন মশাই?'

'এখন সূর্য উঠবে কি?' লোক অবাক হয়ে তাকান তার দিকে।

'মানে, বলছিলাম কি সূর্য তো ওঠা উচিত ছিলো এতক্ষণ। পুবের আকাশ বেশ পরিষ্কার। সূর্যের আলো ছড়াচ্ছে চারিদিকে অথচ সূর্যের পাত্তা নেই।'

'সূর্য কি উঠবে না নাকি আজ?' আমার অনুযোগ।

'ঐ মেঘটার আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য, তাই দেখতে পাচ্ছেন না।' তিনি জানালেন—'মেঘটা সরে গেলেই—'

বলতে বলতে মেঘ সরে গেলো প্রকাশ পেলেন সূর্যদেব!

'ও বাবা! অনেকখানি উঠে পড়েছেন দেখছি! বেলা হয়ে গেছে বেশ।' আপসোস করলেন হর্ষবর্ধন—'সূর্যোদয়টা হাতছাড়া হয়ে গেলো দেখছি আজ।'

'ওমা! একি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি—'নেমে যাচ্ছে যেন! নামছে কেন সূর্যিটা? নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে যে! এ-কি ব্যাপার?'

'এরকমটা তো কখনো হয় না!' আমিও বিস্মিত হই—'সূর্যের এমন বেচাল ব্যাপার তো দেখা যায় না কখনো।'

'হ্যাঁ মশাই; এরকমটা হয় নাকি এখানে মাঝে মাঝে? একটু না উঠেই নামতে থাকেন আবার—পথ ভুল হয় সূর্যদেবের?'

'তার মানে?'

'তার মানে, আমরা সূর্যোদয় দেখতে এসেছি কিনা, উদীয়মান সূর্য দেখতে না-পাই; উদিত সূর্য দেখেও তেমন বিশেষ দুঃখিত হইনি—কিন্তু একি! উঠতে না উঠতেই নামতে লাগলো যে!'

'আপনার জন্যে কি পশ্চিম দিকে উঠবে নাকি সূর্য? অস্ত যাবার সময় সূর্যোদয় দেখতে এসেছেন!' ঝাঁঝালো গলা শোনা যায় ভদ্রলোকের—

'কোথাকার পাগল সব!' আরেক জন উতোর গেয়ে ওঠেন তাঁর কথায়।

বিগড়ে গেলেন হর্ষবর্ধন

এমন পাল্লায় পড়ে মানুষ!

চিরদিন সহর্ষ দেখেছি, বিগড়োতে দেখিনি কখনো, এমন যে মানুষ তাঁকেও সেদিন বিগড়ে যেতে দেখা গেলো…

সেই যে ডি এল রায়ের হাসির গানে আছে না?

'রাজা গেলেন…

দিল্লী কিংবা বম্বে নয়,
মাদ্রাজ কিংবা ব্রহ্মে নয়,
ট্রেনে নয় প্লেনে নয়,
রেল কি স্টীমার চেপে
রাজা গেলেন ক্ষেপে।'

অনেকটা সেই রকমেরই ব্যাপার হলো যেন!

জীবনে হাজার মানুষের হাজারো রকমের পাল্লা কাটিয়ে এসে শেষটায় কিনা সামান্য এক জানলার পাল্লায় পড়লেন হর্ষবর্ধন!

আর সেই এক পাল্লাতেই তাঁর অমন দিলদরিয়া মেজাজ খিচড়ে গেল।

হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন আর আমি তিনজনই দূর পাল্লার যাত্রী। একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরার তিনটে বার্থ রিজার্ভ করে পাটনা যাচ্ছি আমরা। সন্ধেয় চেপেছি হাওড়ায়, সকালে পোঁছোবো পাটনা স্টেশনে।

ওপরের দুটো বার্থে গোবরা আর আমি। তলাকার একটা বার্থে

হর্ষবর্ধন। তলার অপর বার্থটায় ছিলেন অন্য এক ভদ্রলোক, কোথায় যাচ্ছেন কে জানে!

হর্ষবর্ধন পাটনায় তাঁর কারখানার কাঠের কারবারের একটা শাখা খুলতে যাচ্ছিলেন, আমাকে এসে ধরলেন—'চলুন! আপনি আমার দোকানের দ্বার উদ্ঘাটন করবেন।'

'আমি কেন? ও-সব কাজ তো মন্ত্রীরাই করেন মশাই! পাটনায় কি কোন মন্ত্রী পাওয়া যায় না?' আমি একটু অবাক হই, 'কেন, সেখানে কি মন্ত্রীর পাট নেই?'

সত্যি বলতে, এ-সব কাণ্ড-কারখানার মধ্যে যেতে আদৌ আমার উৎসাহ হয় না। উদ্ঘাটন, উন্মোচন, ফিতে-কাটা এগুলোকে আমি মন্ত্রীদের অভিনেয় পার্ট বলেই জানি।

'থাকবে না কেন?' বললেন তিনি, 'তবে তাদের কারো সঙ্গে আমার তেমন দহরম নেই—একদম নেই।'

একদমে কথাটা শেষ করে নবোদ্যমে তিনি পরের খবরটি জানালেন। 'তাছাড়া, জানেন কি মশাই...', দাদার কথায় বাধা দিয়ে গোবর্ধন ফোড়ন কাটল মাঝখান থেকে—'তাছাড়া, আপনিই বা মন্ত্রীর চেয়ে কম কিসে বলুন? দাদার মুখ্যমন্ত্রী আপনিই তো! দাদাকে যত কুমন্ত্রণা আপনি ছাড়া কে দেয় আর?'

'তাছাড়া, আরেকটা কথা', হর্ষবর্ধন তাঁর কথাটা শেষ করেন—'কলকাতায় তো এখন ছানা কণ্টোল হয়ে মিষ্টি-ফিষ্টি একেবারে নেই! এখানকার কারিগররা গেছে কোথায় জানেন? সবাই সেই পাটনায় গিয়ে সন্দেশ বানাচ্ছে! কলকাতার মেঠাই সব সেখানে। নতুনগুড়ের সন্দেশ যদি খেতে চান তো চলুন পাটনায়।'

নতুনগুড়ের এই নিগূঢ় সন্দেশ লাভের পর পাটনায় যাবার আর কোন বাধা রইল না তারপর।

বম্বে এক্সপ্রেস অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঘটাংঘটের ঘটঘটা তুলে ছুটে চলছিলো ··

তলার সেই অপর বার্থটির ভদ্রলোক উঠে জানলার পাল্লাটা নামিয়ে দিলেন হঠাৎ।

হর্ষবর্ধন বললেন, 'একি হলো মশাই! জানালাটা বন্ধ করলেন কেন? মুক্ত বাতাস আসছিল বেশ।'

'ঠাণ্ডা আসছে কিনা।' বললেন সেই ভদ্রলোক।

'ঠাণ্ডা!' ওপরের বার্থ থেকেই যেন ধপাস করে পড়লেন হর্ষবর্ধন, তাঁর নিচেকার বার্থে শুয়ে থেকেই।—'ঠান্ডা এখন কোথায় মশাই! সবে এই অঘ্রাণ মাস! শীত পড়েছে নাকি এখনই?' উঠে জানলার পাল্লাটা তুলে

দিয়ে প্রাণভরে যেন তিনি অঘ্রাণের ঘ্রাণ নিলেন—'আহা! কী মিষ্টি হাওয়া।'

'রীতিমতন হাড় কাঁপানো হাওয়া মশাই!' জবাব দিলেন সেই ভদ্রলোক। তারপরই জানলাটা ফের নামিয়ে দিলেন তক্ষুনি।

'হাড় কাঁপানো হাওয়া! দেখছেন না, আমি ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছি!' বলে হর্ষবর্ধন জানলাটা তুলে দিলেন আবার।

'ফিনফিনে তো দেখছি ওপরে। কিন্তু তার তলায়?' শুধোলেন সেই অচেনা লোকটি, ফিনফিনের তলায় তো বেশ পুরু কোট এঁটেছেন একখানা, তার তলায় আবার একটা অলেস্টারও দেখছি…'

'আজ্ঞে'—এবার আমাকেই প্রতিবাদ জানাতে হয়, 'আজ্ঞে ওটা ওঁর কোট নয়, গায়ের মাংস! বেশ মাংসল দেহ দেখছেন না ওঁর? আর যেটাকে আপনি অলেস্টার বলে ভ্রম করছেন সেটা আসলে ওঁর ভুঁড়ি…।'

'ওই হলো মাংসের কোটিং তো, তা, সেটা কোটের চেয়ে কম না কি? ওতেও গা বেশ গরম থাকে? কোটের মতই গরম রাখে গা। হাড়ে তো ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতে পায় না। আমার এই হাড় জিরজিরে শরীরে অলেস্টার চাপিয়েও ঠাণ্ডার শিরশির করছে হাত পা!' বলতে বলতে সত্যিই যেন তিনি শিহরিত হতে লাগলেন শীতে; 'তারপর আমার মাফলারটাও আনতে ভুলে গেছি আবার! আমার টনসিলের দোষ আছে জানেন? গলায় যদি একটু ঠাণ্ডা লাগে তো আর রক্ষে নেই।'

'মুক্ত বাতাস দারুণ স্বাস্থ্যকর। তাতে কখনো টনসিল বাড়ে না।' হর্ষবর্ধন জানান '—বাড়তে পারে না।' বলে পাল্লাটা গম্ভীরভাবে তুলে দেন আবার।

'আপনার বাড়ে না। কিন্তু আমার বাড়ে। আপনার কি, গলায় তো বেশ মোটা একটা কমফর্টার জড়িয়ে রয়েছেন!'

'আমার গলায় কমফর্টার?' হর্ষবর্ধন ঊর্ধ্বনেত্রে আমাকেই যেন সাক্ষী মানতে চান।

'না মশাই! গলায় ওঁর কোনো কমফর্টার নেই।' বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমায়।—'আপনার টনসিলের দোষ বলছেন, কিন্তু চোখেরও বেশ একটু দোষ আছে দেখছি। ওঁর গলায় পুরু মতন ওটা যা দেখছেন, ওকে কী বলা যায় আমি জানিনে। গরুর হলে গলকম্বল বলা যেত, কিন্তু ওঁকে তো গোরু বলা যায় না—,' বলে হর্ষবর্ধনকে একটু কমফর্ট দিই। 'ওঁর ক্ষেত্রে ওটাকে গলার ভুঁড়িই বলতে হয় বাধ্য হয়ে, কিংবা ভুরি ভুরি গলাও বলতে পারেন।'

'গলায় কেউ কম্বল জড়ায় নাকি?' হর্ষবর্ধন আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানেন এবার—'গরুরাই গলায় কম্বল জড়ায়।'

'সেই কথাই তো বলেছি আমি।' কৈফিয়তের সুরে জানাই, 'গরুর

হলে ওটা গলকম্বল হত। আপনার বেলা তা নয়। তাই তো আমি বলছিলাম ওনাকে।'

'আপনার টনসিল ঢাকা একটা কিছু রয়েছে তো তবু।' বলে ভদ্রলোক উঠে জানলার পাল্লাটা নামিয়ে দিলেন আবার—'যাক, আমি কোন তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। নিজে সতর্ক থাকতে চাই।'

হর্ষবর্ধন উঠে তুলে দিলেন পাল্লাটা—'গরমে আমার দম আটকে আসে। বন্ধ হাওয়ায় স্বাস্থ্য খারাপ হয়। চারদিক বন্ধ করে দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে আমি মোটেই থাকতে পারিনে।'

'আপনি কি আমাকে খুন করতে চান নাকি?' ভদ্রলোক উঠে খুলে ফেললেন ফের পাল্লা—'ঠান্ডা লেগে আমার সর্দি থেকে কাশি, কাশি থেকে গয়া—আই মীন; টাইফয়েড, তার থেকে নিমোনিয়া ··!'

'তার থেকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।' ওপরের বার্থ থেকে জুড়ে দেয় গোবর্ধন। ব্যঙ্গের সুরেই বলতে কি!

'তাই হোক আমার। তাই আপনি চান নাকি? আপনি তো বেশ লোক মশাই!' বলে তিনি পাল্লাটা নামিয়ে দিলেন জানলার।

'আর আপনি কী চান শুনি? দূষিত বন্ধ আবহাওয়ায় আমার হেঁচকি উঠুক, হাঁপানি হোক, যক্ষ্মা হোক, টি-বি হোক, ক্যানসার হোক, নাড়ি ছেড়ে যাক, দম আটকে মারা যাই আমি, তাই আপনি চান নাকি?'

হর্ষবর্ধন উঠে পাল্লাটা তোলেন আবার।

এই ভাবে চলল দুজনের...পালা করে—পাল্লা তোলা আর নামানো··· পাল্লা দিয়ে চলল দু-জনার। করতে করতে এসে পড়ল খড়গপুর।

বম্বে এক্সপ্রেস সেখানে থামতেই হর্ষবর্ধন তেড়ে-ফুড়ে নামলেন কামরার থেকে—'যাচ্ছি আমি গার্ড সাহেবের কাছে। আপনার নামে কমপ্লেন করতে চললাম।'

'আমিও যাচ্ছি।' তিনিও নামলেন সঙ্গে সঙ্গে।

আমিও নামলাম ওঁদের পিছু পিছু। কেবল গোবরা রইল কামরায় মালপত্র সামলাতে।

গার্ড সাহেব দু-পক্ষেরই অভিযোগ শোনেন। শুনে মাথা নাড়েন গম্ভীরভাবে—'এতো ভারী মুস্কিল ব্যাপার দেখছি। শার্সি তুললে আপনার স্বাস্থ্যহানি হয়, আর শার্সি নামালে আপনার? তাই তো? ভারি মুস্কিল তো! চলুন দেখিগে···'

'কোন্ কামরাটা বলুন তো আপনাদের?···' বলতে বলতে তিনি এগোন 'ঐ ফার্স্ট ক্লাস কামরাটা বলছেন? জানলাটা এখন বন্ধ রয়েছে, না, খোলা আছে?'

'আমি নামিয়ে দিয়ে এসেছি পাল্লাটা' সেই ভদ্রলোক জানান।

'ওটার শার্সিটা তো ভাঙা বলেই জানতাম, ওর পাল্লার কাচটা তো বসানো হয়নি এখনো, যতদূর আমার মনে পড়ে। আপনি বলছেন, কাচের পাল্লাটা নামিয়ে দিয়ে এসেছেন? কিন্তু কে যেন মুখ বাড়াচ্ছে না। জানলা দিয়ে?'

'আমার ভাই গোবর্ধন।' হর্ষবর্ধন জানান।

'পাল্লার কাচটা ভাঙাই রয়েছে তাহলে। নইলে ছেলেটা শার্সির ভেতর দিয়ে মুখ বাড়ায় কি করে? যান, যান উঠে পড়ুন চট করে। এক্ষুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে···টাইম ইজ আপ···।'

বলতে বলতে গার্ড-সাহেবের নিশান নড়ে, গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ে। আর হর্ষবর্ধন কামরায় এসে গোবরাকে নিয়ে পড়েন।

'তোর কি সব তাতে মাথা না গলালে চলে না? কি আক্কেল তোর বল দেখি? কে বলেছিল তোকে কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে মাথা গলাতে? কে বলেছিল—কে?' সমস্ত চোটটা তার ওপরেই গিয়ে পড়ে তখন। এমন তিনি বিগড়ে যান যে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেন গোবরাকে।

'কাচের ভেতর দিয়ে মাথা গলানো। সত্যি, এমন কাঁচা কাজ করে মানুষ।' আমিও গোবরাকে না দুষে পারি না।

হর্ষবর্ধনের বাঘ শিকার

হর্ষবর্ধনকে আর রোখা গেল না তারপর কিছুতেই! বাঘ মারবার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন।

'আরেকটু হলেই তো মেরেছিল আমায়।' তিনি বললেন, 'ওই হতভাগা বাঘকে আমি সহজে ছাড়চি না।'

'কি করবে দাদা তুমি বাঘ নিয়ে? পুষবে নাকি?'

'মারবো ওকে। আমাকে মেরেছে আর ওকে আমি রেহাই দেব তুই ভেবেছিস?'

'তোমাকে আর মারল কোথায়? মারতে পারল কই?'

'একটুর জন্যেই বেঁচে গেছি না? মারলে তোরা বাঁচাতে পারতিস আমায়?'

গোবর্ধন চুপ করে থাকল, সে-কথার কোন জবাব দিতে পারল না।

'এই গোঁফটাই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে বলতে কি!' বলে নিজের গোঁফ দুটো তিনি একটু চুমরে নিলেন—'এই গোঁফের জন্যেই বেঁচে গেছি আজ! নইলে ওই লোকটার মতই হাল হতো আমার...'

মৃতদেহটির দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন—'গোঁফ বাদ দিয়ে, বেগোঁফের বকলমে ও তো খোদ আমিই। আমার মতই হুবহু। ও না হয়ে আমিও হতে পারতাম। কি হতো তাহলে বল তো?'

গোবরা সে-কথারও কোন সদুত্তর দিতে পারে না।

'এই চৌকিদার!' হঠাৎ তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'একটা বন্দুক যোগাড় করে দিতে পার আমায়? যতো টাকা লাগে দেব।'

বন্দুক নিয়ে কি করবেন বাবু?'

'বাঘ শিকার করব আবার কি? বন্দুক নিয়ে কী করে মানুষ?' বলে আমার প্রতি ফিরলেন: 'আমার এই বীরত্ব-কাহিনীটাও লিখতে হবে আপনাকে। যত সব আজেবাজে গল্প লিখেছেন আমাকে নিয়ে। লোকে পড়ে হাসে কেবল। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে আমি শুনেছি।'

'তার কি হয়েছে? লিখে দেব আপনার শিকার-কাহিনী। এই বাঘ মারার গল্পটাই লিখে দেব আপনার। কিন্তু তার জন্যে বন্দুক ঘাড়ে এত কষ্ট করে প্রাণপণে বাঘ মারতে হবে কেন? বনে-বাদাড়েই বা যেতে হবে কেন? বাঘ মারতে এত হ্যাঙ্গামের কী মানে আছে? বন্দুকের কোন দরকার নেই। সাপ-ব্যাঙ একটা হলেই হলো। কলমের কেরামতিতে সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ মারা যায়।'

'মুখেন মারিতং বাঘং?' গোবরা টিপপনি কাটে।

'আপনি টাকার কথা বলছেন বাবু!' চৌকিদার এতক্ষণ ধরে কী যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, মুখ খুলল এবার—তা, টাকা দিলে এনে দিতে পারি একটা বন্দুক—দু-দিনের জন্য। আমাদের দারোগা সাহেবের বন্দুকটাই চেয়ে আনতে পারি। বাঘের ভারী উপদ্রব হয়েছে এধারে—মারতে হবে বাঘটাকে—এই বললেই তিনি ওটা ধার দেবেন আমায়। ব্যাভারের পর আবার ফেরত দিয়ে আসব।'

'শুধু বন্দুক নিয়ে কি করব শুনি? ওর সঙ্গে গুলি-কার্তুজ-টোটা ইত্যাদি এ-সবও তিনি দেবেন তো? নইলে বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে কি বাঘ মারা যায় নাকি? তেমনটা করতে গেলে তার আগেই বাঘ আমায় সাবড়ে দেবে?'

'তা কি হয় কখনো? বন্দুকের সঙ্গে কার্তুজ-টার্তুজ দেবেন বইকি বাবু।'

'তাহলে যাও, নিয়ে এসো গে চটপট। বেশি দেরি কোন না। বাঘ না-মেরে নড়ছি না আমি এখান থেকে। জলগ্রহণ করব না আজ।'

'না না, বন্দুকের সঙ্গে কিছু খাবার টাবার নিয়ে এসো ভাই।'

আমি বাতলাই: 'খালি পেটে কি বাঘ মারা যায়? আর কিছু না হোক, একটু গাঁজা খেতে হবে অন্তত।'

'আনব নাকি গাঁজা?' সে শুধায়।

'গাঁজা হলে তো বন্দুকের দরকার হয় না। বনে-বাদাড়েও ঘুরে মরতে

হয় না। বন্দুকের বোঝা বইবারও কোন প্রয়োজন করে না। ঘরে বসেই বাঘ মারা যায় বেশ।' আমি জানাই।

'না না গাঁজা-ফাঁজা চাই না। বাবু ইয়ার্কি করছে তোমার সঙ্গে। তুমি কিছু রুটি মাখন বিস্কুট চকোলেট—এইসব এনো, পাও যদি।' গোবরা বলে দেয়।

বন্দুক এলে হর্ষবর্ধন আমায় শুধাল—'কি করে বাঘ মারতে হয় আপনি জানেন?'

'বাগে পেলেই মারা যায়। কিন্তু বাগেই পাওয়া যায় না ওদের। বাগে পাবার চেষ্টা করতে গেলে উলটে নাকি বাঘেই পায়।

'বনের ভিতরে সেঁধুতে হবে বাবু।' চৌকিদার জানায়।

গভীর বনের ভেতরে পা বাড়াতে প্রথমেই যে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করল সে কোন বাঘ নয়, বাঘের বাচ্চাও না—আস্ত একটা কোলা ব্যাঙ।

ব্যাঙ দেখে হর্ষবর্ধন ভারী খুশি হলেন, বললেন, 'এটা শুভ লক্ষণ। ব্যাঙ ভারী পয়া, জানিস গোবরা?

'মা লক্ষ্মীর বাহন বুঝি?'

'সে তো প্যাঁচা।' দাদা জানান—'কে না জানে!'

'যা বলেছেন।' আমি ওঁর কথায় সায় দিই 'যতো প্যাঁচাল লোকই হচ্ছে মা লক্ষ্মীর বাহন। প্যাঁচ কষে টাকা উপায় করতে হয়, জান না ভাই?'

'তাহলে ব্যাঙ বুঝি সিদ্ধিদাতা গণেশের · না, না ···'বলে গোবরা নিজেই শুধরে নেয়—'সে তো হলো গে ইঁদুর।'

'আমি পয়া বলেছি কারো বাহন টাহন বলে নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতায়। আমরা প্রথম যখন কলকাতায় আসি, তোর মনে নেই গোবরা? ধরমতলায় একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম?'

'মনে আছে। পেয়েই তুমি সেটা পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিলে, পাছে কারো নজরে পড়ে। তারপর বাড়ি এসে খুলে দেখতে গিয়ে দেখলে—'

'দেখলাম যে চারটে ঠ্যাং। মনিব্যাগের আবার ঠ্যাং কেন রে? তার পরে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি কি, ওমা, ট্রামগাড়ির চাকার তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ব্যাঙ একটা।'

'আর কিছুতেই খোলা গেল না ব্যাগটা।'

'গেল না বটে, কিন্তু তার পর থেকেই আমাদের বরাত খুলে গেল। কাঠের কারবারে ফেঁপে উঠলাম আমরা। আমরা এখানে টাকা উড়িয়ে দিতে এসেছিলাম, কিন্তু টাকা কুড়িয়ে থই পাই না তারপর!

'ব্যাঙ তাহলে বিশ্বকর্মার বাহন হবে নির্ঘাত।' গোবরা ধারণা করে;

'যত কারবার আর কারখানার কর্তা ঐ ঠাকুরটি তো। কী বলেন মশাই আপনি ? ব্যাঙ বিশ্বকর্মার বাহনই তো বটে ?'

'ব্যাঙ না হলেও ব্যাংক তো বটেই। বিশ্বের কর্মীদের সহায়ই হচ্ছে ঐ ব্যাংক। আর বিশ্বকর্মাদের বাহন বোধহয় ওই ওয়ার্লড ব্যাংক।'

'ব্যাঙ থেকেই ব্যাংক। একই কথা।' হর্ষবর্ধন উচ্ছ্বসিত হন।—'ব্যাঙ থেকেও আমার আমদানি, আবার ব্যাংক থেকেও।'

'ব্যাঙটাকে দেখে একটা গল্পের কথা মনে পড়ল।' আমি বলি—'জামপিং ফ্রগের গল্প। মার্ক টোয়েনের লেখা। ছোটবেলায় পড়েছিলাম গল্পটা।'

'মার্ক টোয়েন মানে ?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করেন।

'এক লেখকের নাম। মার্কিন মুলুকের লেখক।'

'আর জামপিং ফ্রগ ?' গোবরার জিজ্ঞাস্য।

'জামপিং মানে লাফান, আর ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাঙ। মানে যে ব্যাঙ কিনা লাফায়।

'লফিং ফ্রগ বলুন তাহলে মশাই

'তাও বলা যায়। গল্পটা পড়ে আমার হাসি পেয়েছিল তখন। তবে ব্যাঙের পক্ষে ব্যাপারটা তেমন হাসির হয়েছিল কিনা আমি জানি না। গল্পটা শুনুন এবার। মার্ক টোয়েনের সময়ে সেখানে, ঘোড়দৌড়ের মতন বাজি ধরে ব্যাঙের দৌড় হোত। লাফিয়ে লাফিয়ে যে ব্যাঙ যার ব্যাঙ আর সব ব্যাঙকে টেক্কা দিতে পারত সেই মারত বাজি। সেইজন্যে করত কি, অন্য সব ব্যাঙকে হারাবার মতলবে যাতে তারা তেমন লাফাতে না পারে—লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তো—সেইজন্য সবার আড়ালে এক একটাকে ধরে পাথর কুঁচি খাইয়ে বেশ ভারি করে দিত কেউ কেউ।'

'খেত ব্যাঙ সেই পাথর কুঁচি ?'

'অবোধ বালক তো ! যাহা পায় তাহাই খায়।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন।

'পরীক্ষা করে দেখলেই হয়।' গোবরা বলে : 'এই তো পাওয়া গেছে একটা ব্যাঙ—এখন বাজিয়ে দেখা যাক না খায় কি না।'

গোবরা কতকগুলো পাথর কুঁচি যোগাড় করে এনে গেলাতে বসল ব্যাঙটাকে। হাঁ করিয়ে ওর মুখের কাছে কুঁচি ধরে দিতেই, কি আশ্চর্য, তক্ষুনি সে গোপালের ন্যায় সুবোধ বালক হয়ে গেল। একটার পর একটা গিলতে লাগল টুপটাপ করে। অনেকগুলো গিলে ঢাউস হয়ে উঠল ওর পেট। তারপর মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে রইল ব্যাঙটা। ভারিক্কি দেহ নিয়ে লাফান দূরে থাক, নড়া চড়ার কোন শক্তি রইল না তার আর।

'খেলতো বটে, খাওয়ালিও তো দেখলাম, ব্যাটা এখন হজম করতে পারলে হয়।' দাদা বললেন।

'খুব হজম হবে। ওর বয়সে কত পাথর হজম করেছি দাদা।' গোবরা বলেঃ 'ভাতের সঙ্গে এতদিনে যতো কাঁকর গিলেছি, ছোটখাট একটা পাহাড়ই চলে গেছে আমাদের গর্ভে। হয়নি হজম ?'

'আলবৎ হয়েছে।' আমি বলি ঃ 'হজম না হলে তো যম এসে জমত।'

'ওই দ্যাখ দাদা !' আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে গোবরা।

আমরা দেখি। প্রকাণ্ড একটা সাপ, গোখরোই হবে হয়ত, এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

চৌকিদার বলে—'একটুও নড়বেন না বাবুরা। নড়লেই সাপ এসে ছোবলাবে। আপনাদের দিকে নয়, ব্যাঙটাকে নিতে আসছে ও।'

আমরা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাই বটে। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে ব্যাঙটাকে এসে আত্মসাৎ করল।

সাপটা এগিয়ে এসে ধরল ব্যাঙটাকে, তারপর এক ঝটকায় লহমার মধ্যে মুখের ভেতর পুরে ফেলল। তারপর গিলতে লাগলো আস্তে আস্তে।

আমরা দাঁড়িয়ে ওর গলাধঃকরণ-লীলা দেখতে লাগলাম। গলা দিয়ে পুরুষ্টু ব্যাঙটা তার তলার দিকে চলতে লাগল, খানিকটা গিয়ে থেকে গেল এক জায়গায়, সেইখানেই আটকে রইল, তারপর সাপটা যতই চেষ্টা করুক না, সেটাকে আর নামাতে পারল না। পেটের ভেতর ঢুকে ব্যাঙটা তার পিঠের উপর কুঁজের মত উঁচু হয়ে রইল।

উটকো ব্যাঙটাকে গিলে সাপটা উট হয়ে গেল যেন শেষটায়। তার মুখখানা যেন কেমনতর হয়ে গেল। খুব তীব্র বৈরাগ্য হলেই যেমনটা হয়ত দেখা যায়। ভ্যাবাচাকা মার্কা মুখে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জবুথবু নট-নড়ন-চড়ন সে পড়ে রইল সেইখানেই।

তারপর তার আর কোন উৎসাহ দেখা গেল না।

'ছুঁচো গেলার চেয়েও খারাপ দশা হয়েছে সাপটার বুঝলে দাদা ? সাপের পেটে ব্যাঙ, আর ব্যাঙের পেটে যতো পাথর কুঁচি। আগে ব্যাঙ পাথর কুঁচিগুলো হজম করবে, তারপরে সে হজম করবে গিয়ে ব্যাঙটাকে। সে বোধহয় আর ওদের এজন্মে নয়।

'ওদের কে কাকে হজম করে দেখা যাক।' আমি তখন বলি, 'ততক্ষণে আমাদেরও কিছু হজম হয়ে যাক। আমরাও খেতে বসি এধারে।'

চৌকিদারের আনা মাখন-রুটি ইত্যাদি খবর-কাগজ পেতে খেতে বসে গেলাম আমরা। সাপটার অদূরেই বসা গেল। সাপটা মার্বেলের গুলির মতন তালগোল পাকিয়ে পড়ে রইল আমাদের পাশেই।

এমন সময়ে জঙ্গলের ওধারে একটা খসখসানি আওয়াজ পাওয়া গেল।

'বাঘ এসে গেছে বাবু!' চৌকিদার বলে উঠল, শুনেই না আমরা তাকিয়ে দেখি সত্যিই ঝোপঝাড়ের আড়ালে বাঘটা আমাদের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে।

'রুটি মাখন-টাখন শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গেল দেখছি।' দেখে আমি দুঃখ করলাম।

'কি করে যাবে? আমরা চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছি না সব, ওর জন্যে রেখেছি নাকি?' বলল গোবরা—পাঁউরুটির শেষ চিলতেটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে।

'যেমন করে পাথর কুচিগুলো সাপের পেটে গেছে ঠিক সেই ভাবে।' আমি বিশদ করি।

'এক গুলিতে সাবাড় করে দিচ্ছি না ব্যাটাকে। দাঁড়ান না।' বলে হর্ষবর্ধন হাতে কী একটা তুললেন, 'ওমা! এটা যে সাপটা।' বলেই কিন্তু আঁতকে উঠলেন—'বন্দুকটা গেল কোথায়?'

'বন্দুক আমার হাতে বাবু!' বলল চৌকিদারঃ 'আপনি তো আমার হাত থেকে নেননি বন্দুক। তখন থেকেই আমার হাতে আছে।'

'তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জান?'

'না বাবু, তবে তার দরকার হবে না। বাঘটা এগিয়ে এলে এই বন্দুকের কুঁদার ঘায় ওর জান খতম করে দেব। আপনারা ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে হাতের সাপটাকেই তিন পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন বাঘটার দিকে।

সাপটা সবেগে পড়েছে গিয়ে তার উপর।

কিন্তু তার আগেই না, কয়েক চক্করের পাক খেয়ে, সাপের পেটের থেকে ছিটকে ব্যাঙটা আর ব্যাঙের গর্ভ থেকে যতো পাথর কুচি তীর বেগে বেরিয়ে—ছররার মতই বেরিয়ে লেগেছে গিয়ে বাঘটার গায়—তার চোখে মুখে নাকে।

হঠাৎ এই বেমক্কা মার খেয়ে বাঘটা ভিরমি খেয়েই যেন অজ্ঞান হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আর তার নড়া চড়া নেই।

'সর্পাঘাতে মারা গেল নাকি বাঘটা?' আমরা পায়ে পায়ে হতজ্ঞান বাঘটার দিকে এগুলাম।

চৌকিদার আর দেরি না করে বন্দুকের কুঁদায় বাঘটার মাথা থেঁতলে দিল। দিয়ে বললো—'আপনার সাপের মারেই মারা পড়েছে বাঘটা। তাহলেও সাবধানের মার নেই বাবু, তাই বন্দুকটাও মারলাম তার ওপর।'

'এবার কি করা যাবে?' আমি শুধাইঃ 'কোন ফোটো তোলার লোক পাওয়া গেলে বাঘটার পিঠে বন্দুক রেখে দাঁড়িয়ে বেশ পোজ করে ফোটো তোলা যেত একখানা।'

'এখানে ফোটো-ওলা কোথায় বাবু এই জঙ্গলে? বাঘটা নিয়ে গিয়ে আমি ভেট দেব দারোগাবাবুকে। তাহলে আমার ইনামও মিলবে—আবার চৌকিদার থেকে একচোটে দফাদার হয়ে যাব আমি—এই বাঘ মারার দরুন। বুঝলেন?'

'দাদা করল বাঘের দফারফা আর তুমি হলে গিয়ে দফাদর।' গোবরা বলল—'বারে!'

'সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ শিকার করলেন আপনি দেখছি!' আমি বাহবা দিলাম ওর দাদাকে।

ডাক্তার ডাকলেন হর্ষবর্ধন

'বউয়ের ভারী অসুখ মশাই। কোন ডাক্তারকে ডাকা যায় বলুন তো?' হর্ষবর্ধন এসে শুধোলেন আমায়।

'কেন, আমাদের রাম ডাক্তারকে?' বললাম আমি। তারপর তাঁর ভারী ফীজ-এর কথা ভেবে নিয়ে বলি আবার: রাম ডাক্তারকে আনার ব্যয় অনেক, কিন্তু ব্যায়রাম সারাতে তাঁর মতন আর হয় না।'

'বলে বৌয়ের আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আমি কি এখন টাকার কথা ভাবছি নাকি!' তিনি জানান—'বউয়ের আমার আরাম হওয়া নিয়ে কথা।'

'কি হয়েছে তাঁর?' আমি জানতে চাই।

'কী যে হয়েছে তাই তো বোঝা যাচ্ছে না সঠিক। এই বলছে মাথা ধরেছে, এই বলছে দাঁত কনকন, এই বলছে পেট কামড়াচ্ছে ··'

'এসব তো ছেলেপিলের অসুখ, ইস্কুলে যাবার সময় হয়।' আমি বলি— 'তবে মেয়েদের পেটের খবর কে রাখে। বলতে পারে কেউ?'

'বউদির পেটে কিছু হয়নি তো দাদা!' জিজ্ঞেস করে গোবরা! দাদার সাথে সাথেই সে এসেছিল।

'পেটে আবার কি হবে শুনি?' ভায়ের প্রশ্নে দাদা ভ্রূকুঞ্চিত করেন: 'পেটে তো লিভার পিলে হয়ে থাকে। তুই কি লিভার পিলের ব্যামো হয়েছে, তাই বলছিস?'

'আমি ছেলেপিলের কথা বলছিলাম।'

'ছেলেপিলে হওয়াটা কি একটা ব্যামো নাকি আবার ?'

হর্ষবর্ধন ভায়ের কথায় আরো বেশি খাপপা হন : 'সে হওয়া তো ভাগ্যের কথা রে। তেমন ভাগ্য কি আমাদের হবে ?' বলে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

'হতে পারে মশাই। গোবরা ভায়া ঠিক আন্দাজ করেছে হয়ত।' ওর সমর্থনে দাঁড়াই : 'পেটে ছেলে হলে শুনেছি অমনটাই নাকি হয়—মাথা ধরে, গা বমি বমি করে, পেট কামড়ায়.. ছেলেটাই কামড়ায় কি না কে জানে।'

ছেলের কামড়ের কথায় কথাটা মনে পড়ে গেল আমার...

হর্ষবর্ধনের এক আধুনিকা শ্যালিকা একবার বেড়াতে এসেছিলেন ও'দের বাড়ি একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে

ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখে কোলে করে একটু আদর করার জন্য নিয়েছিলাম, তারপরে দাঁত গজিয়েছে কিনা দেখবার জন্যে যেই না ওর মুখের মধ্যে আঙুল দিয়েছি—উফ! লাফিয়ে উঠতে হয়েছে আমায়।

'কি হলো কি হলো ? ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হর্ষবর্ধনের বউ।

'কিছু হয়নি।' আমি বললাম : 'একটু দন্তস্ফুট হল মাত্র। হাতে হাতে দাঁত দেখিয়েছে ছেলেটা।'

'ছেলের মুখে আঙুল দিলেন যে বড় ?' রাগ করলেন হর্ষবর্ধনের শালী : আঙুলটা আপনার অ্যান্টিসেপটিক করে নিয়েছিলেন ?'

'অ্যাণ্টিসেপটিক ? ও কথাটায় আমি অবাক হই। —'সে আবার কি ?'

লেখক নাকি আপনি ?' হাইজীনের জ্ঞান নেই আপনার ?' বলে একখানা টেকসট বই এনে আমার নাকের সামনে তিনি খাড়া করেন! তারপরে আমি চোখ দিচ্ছি না দেখে খানিকটা তার তিনি নিজেই আমায় পড়ে শোনান :

'শিশুদের মুখে কোন খাদ্য দেবার আগে সেটা গরম জলে উত্তমরূপে ফুটিয়ে নিতে হবে...'

'আঙুল কি একটা খাদ্য না কি ?' বাধা দিয়ে শুধান হর্ষবর্ধনপত্নী।

'একদম অখাদ্য। অন্ততঃ পরের আঙুল তো বটেই।' গোবরাভায়া মুখ গোমড়া করে বলে : 'নিজের আঙুল কেউ কেউ খায় বটে দেখেছি, কিন্তু পরের আঙুল খেতে কখনো কাউকে দেখা যায় নি।

'আঙুল আমি ফুটিয়ে নিইনি সে কথা ঠিক, আমতা আমতা করে আমার সাফাই গাই : 'তবে আপনার ছেলেই আঙুলটা আমায় ফুটিয়ে নিয়েছে। কিম্বা ফুটিয়ে দিয়েছে...যাই বলুন। এই দেখুন না।'

বলে খোকার দাঁত বসানোর দগদগে দাগ তার মাকে দেখাই। ফুটফুটে বলে কোলে নিয়েছিলাম কিন্তু এতটাই যে ফুটবে তা আমার ধারণা ছিল না সত্যি।

'রাম ডাক্তারকে আনবার ব্যবস্থা করুন তাহলে। বললাম হর্ষবর্ধন-বাবুকে : 'কল দিন তাঁকে এক্ষুনি। ডাকান কাউকে পাঠিয়ে।'

'ডাকলে কি তিনি আসবেন ?' তাঁর সংশয় দেখা যায়।

'সে কি ! কল পেলেই শুনেছি ডাক্তাররা বিকল হয়ে পড়ে—না এসে পারে কখনো ? উপযুক্ত ফী দিলে কোন ডাক্তার আসে না ? কী যে বলেন আপনি !'

'ডেকেছিলাম একবার। এসেও ছিলেন তিনি। কিন্তু জানেন তো, আমার হাঁস মুর্গি পোষায় বাতিক। বাড়ির পেছনে ফাঁকা জায়গাটায় আমার কাঠ চেরাই কারখানার পাশেই পোলট্রির মতন একটুখানি করেছি। তা হাঁসগুলো আমার এমন বেয়াড়া যে বাড়ির সামনেও এসে পড়ে একেক সময়। রাম ডাক্তারকে দেখেই না সেদিন তারা এমন হাঁক ডাক লাগিয়ে দিল যে···'

'ডাক্তারকেই ডাকছিল বুঝি ?'

'কে জানে ! তাদের আবার ডাক্তার ডাকার দরকার কি মশাই ? তারা কি চিকিচ্ছের কিছু বোঝে ? মনে তো হয় না। হয়ত তাঁর বিরাট ব্যাগ দেখেই ভয় খেয়ে ডাকাডাকি লাগিয়েছিল তারা, কিন্তু হাঁসদের সেই ডাক শুনেই না, গেট থেকেই ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন, বাড়ির ভেতরে এলেনই না আর। রেগে টং হয়ে চলে গেলেন একেবারে।'

'বলেন কি ?' শুনে আমি অবাক হই।

'হ্যাঁ মশাই ! তারপর আরো কতবার তাঁকে কল দেয়া হয়েছে—মোটা ফীয়ের লোভ দেখিয়েছি। কিন্তু এ বাড়ির ছায়া মাড়াতেও তিনি নারাজ।'

'আশ্চর্য তো। কিন্তু এ পাড়ায় ভাল ডাক্তার বলতে তো উনিই। রাম ডাক্তার ছাড়া তো কেউ নেই এখানে আর ..'

'দেখুন, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো রকমে আপনি আনতে পারেন তাঁকে···' হর্ষবর্ধন আমায় অনুনয় করেন।

'দেখি চেষ্টা-চরিত্র করে', বলে আমি রাম ডাক্তারের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

সত্যি, একেকটা ডাক্তার এমন অবুঝ হয়। এই রাম ডাক্তারের কথাই ধরা যাক না।

সেবার পড়ে গিয়ে বিনির একটু ছড়ে যেতেই বাড়িতে এসে দেখবার জন্যে তাঁকে ডাকতে গেছি, কিন্তু যেই না বলেছি, 'ডাক্তারবাবু, পড়ে গিয়ে ছড়ে গেছে যদি এসে একটু দয়া করে...'

'ছড়ে গেছে ? রক্ত পড়ছে ?'

'তা, একটু রক্তপাত হয়েছে বই কি।'

'সর্বনাশ ! এই কলকাতা শহরে পড়ে গিয়ে ছড়ে যাওয়া আর রক্তপাত হওয়া ভারি ভয়ংকর কথা, দেখি তো···'

বলেই তিনি তাঁর ডাক্তারি ব্যাগের ভেতর থেকে থার্মোমিটারটা বার করে আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন…

'এবার শুয়ে পড়ুন তো চট করে।' বলে আমায় একটি কথাও আর কইতে না দিয়ে ঘাড় ধরে শুইয়ে দিলেন তাঁর টেবিলের ওপরে ·

'শুয়ে পড়ুন। শুয়ে পড়ুন চট করে। আর একটি কথাও নয়।'

মুখগহ্বরে থার্মোমিটার নিয়ে কথা বলব তার উপায় কি। প্রতিবাদ করার যো-ই পেলাম না। আর তিনি সেই ফাঁকে পেল্লায় একটা সিরিঞ্জ দিয়ে একখানা ইনজেকশন ঠুকে দিলেন আমায়।

'ব্যাস! আর কোন ভয় নেই। অ্যানটি-টিটেনাস ইনজেকসন দিয়ে দিলাম। ধনুষ্টঙ্কারের ভয় রইল না আর।' বলে আমার মুখের থেকে থার্মোমিটারটা বার করলেন, করে দেখে বললেন—জ্বরটরও হয়নি তো। নাঃ। ভয় নেই কোন আর। বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।'

মুখ খোলা পেতে তখন আমি বলবার ফুরসত পেলাম —'ডাক্তারবাবু; আমার তো কিছু হয়নি। আমি পড়ে যাইনি, ছড়ে যায়নি আমার। আমার বোন বিনিই পড়ে গিয়ে ছড়ে গেছে। কথাটা আপনি না বুঝেই · '

'ওঃ তাই নাকি? তা বলতে হয় আগে! যাক, যা হবার হয়ে গেছে। চলুন তাকেও একটা ইনজেকসন দিয়ে আসি তাহলে। ছড়ে যাবার পর ডেটল দেওয়া হয়েছিল? ডেটল কি আইডিন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে তো হয়েইছে।' তবু চলুন, ইনজেকসনটা দিয়ে আসি গে। সাবধানের মার নেই, বলে কথায়।'

বিবেচনা করে বিনির ইনজেকসনের বিনিময়ে তিনি আর কিছু নিলেন না, আমারটার দাম দিতে হলো অবিশ্যি। প্লাস তাঁর কলের দরুন ভিজিট।

সেই অবুঝ রাম ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে আমায় আজ। বেশ ভয়ে ভয়েই আমি এগোই…বলতে কি।

বুঝে সুঝে পাড়তে হবে কথাটা, বেশ বুঝিয়ে সুঝিয়ে…যা অবুঝ ডাক্তার বাবা!

চেম্বারে ঢুকে দূর থেকেই তাঁকে নমস্কার জানাই।

'ডাক্তারবাবু! আপনাকে কল দিতে এসেছি। কিন্তু আমার নিজের জন্য নয়। আমার কোন অসুখ করেনি, কিচ্ছু হয়নি আমার। পড়ে যাইনি, ছড়ে যায়নি। আমাকে ধরে আবার ফুঁড়ে টুড়ে দেবেন না যেন সেই সেবারের মতন…'

বলে হর্ষবর্ধন বাবুর কথাটা পড়লাম।

শুনেই না তিনি, আমাকে তেড়ে এসে ফুঁড়ে না দিলেও এমন তেড়ে ফুঁড়ে উঠলেন যে আর বলবার নয়।

'নাঃ, ওদের বাড়ি আমি যাব না। প্রাণ থাকতে নয়, এ জন্মে না। ওরা ভারি অভদ্দর—'

'হর্ষবর্ধনবাবু অভদ্র! এমন কথা বলবেন না। ওঁর শত্রুতেও এমন কথা বলে না—বলতে পারে না।'

'অভদ্র না তো কি? বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করাটা কি ভদ্রতা না কি তাহলে?'

'আপনাকে বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করেছেন উনি? বিশ্বাস হয় না মশাই! আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনি যা অ—' বলতে গিয়ে 'অবুঝ' কথাটা আমি চেপে যাই একেবারে।

'উনি নিজে না করলেও ওঁর পোষা হাঁসদের দিয়ে করিয়েছেন। সে একই কথা হলো।'

'হাঁসদের দিয়ে অপমান? আমার বিশ্বাস হয় না।'

'হ্যাঁ মশাই! মিথ্যে বলছি আপনাকে? আমাকে দেখেই না তাঁর সেই পাজী হাঁসগুলো এমন গালাগালি শুরু করল যে কহতব্য নয়।'

'হাঁসেরা গাল দিল আপনাকে? আরে মশাই, হাঁসকেই তো লোকে গাল দেয়। আমার বোন পুতুল এমন চমৎকার ডাক-রোস্ট রাঁধে যে কী বলব! গালে দিলে হাতে স্বর্গ পাই।'

'সে যাই বলুন, হর্ষবর্ধনবাবুর হাঁসগুলো তেমন উপাদেয় নয়। বিলকুল বিষতুল্য। আমাকে দেখেই না তারা কোয়াক কোয়াক বলে এমন গাল পাড়তে শুরু করল যে—' বলতে বলতে তিনি রাঙা হয়ে উঠলেন: 'কেন, আমি—আমি কি কোয়াক? আমি কি হাতুড়ে ডাক্তার নাকি? লোকে বললেই হলো?

'ও! এই কথা!' আমি ওঁকে আশ্বাস দিই: 'না মশাই না, হাঁসগুলো আপনার কোন গুপ্ত কথা ফাঁস করেনি, এমনিই ওরা হাঁসফাঁস করছিল। হর্ষবর্ধনবাবুর ওগুলো বিলিতি হাঁস কিনা, তাই ওরা ওই রকম ইংরেজী ভাষায় কথা বলে। ইংরেজীতে কোয়াক বলতে যা বোঝায় তা ঠিক ওর অর্থ নয়, বাঙালী হাঁস হলে ওই কথাটার মানে হতো—মানে, বঙ্গভাষায় ওর অনুবাদ করলে হবে, প্যাঁক প্যাঁক।'

'প্যাঁক প্যাঁক? ঠিক বলছেন? তাহলে আর কোন কথা নেই। চলুন তবে।'

বলে তিনি রাজি হলেন যেতে। 'দাঁড়ান, আমার ব্যাগটা গুছিয়ে নিই আগে—এই ব্যাগ নিয়েই হয়েছে আমার যত হাঙ্গামা। এটাকে বাগে আনাই দায়! একেক সময় এমন মুশকিলে পড়তে হয় মশাই—!'

'ব্যাগাড়ম্বর বেশি না করে—' আমি বলতে যাই, বাধা দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন: 'বাগাড়ম্বর? বৃথা বাগাড়ম্বর করছি আমি?'

'না না, সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে—'

'কি বলছিলেন ?'

'বলছিলাম, একটু ব্যগ্র হবেন দয়া করে। রোগিণীর অবস্থা ভারী কাহিল ছিল কিনা।'

'ব্যগ্রই হচ্ছি তো। ব্যাগ না হলে কি করে ব্যগ্র হই ? এই ব্যাগের মধ্যেই তো আমার থার্মোমিটার, স্টেথিস্কোপ, রক্তচাপ মাপার যন্তর, ওষুধপত্তর যাবতীয় কিছু !'

বলে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে সব্যাগ হয়ে তিনি সবেগে আমার সাথে বেড়িয়ে পড়লেন।

কিন্তু এক কদম না যেতেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন একদম। পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে বকতে লাগলেন আমায় ঃ

'নাঃ, আমি যাব না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আপনার ঐ কোয়াক কোয়াকই হোক আর পেঁক পেঁকই হোক, ওই হাঁসরা থাকতে ও-বাড়িতে আমি পা দেব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমার শপথ আমি ভাঙতে পারব না। মাপ করবেন আমায়।'

বলে তিনি বেঁকে দাঁড়ালেন।

এবং আর দাঁড়ালেন না। তারপর আর না এঁকে বেঁকে সোজা তিনি এগুলেন নিজের বাড়ির দিকে।

রাম ডাক্তার এমন অবুঝ, সত্যি !

অগত্যা, কী আর করা ? সব গিয়ে খোলসা করে বললাম হর্ষবর্ধনকে। বললাম, 'বউকে যদি বাঁচাতে চান তো বিদেয় করে দিন আপনার হাঁসদের।' শুনে হর্ষবর্ধন খানিকক্ষণ গুম হয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন ঃ

'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র ! দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার !—এ কে কার ?...হাঁস কি আমার ? হাঁসের কি আমি ? হাঁস কি আমার সঙ্গে যাবে ? দুনিয়ায় হাঁস নিয়ে কেউ আসে না, যদিও সবাই হাঁস-ফাস করে মরে। হাঁস নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো ? যাক গে হাঁস।—রাখে রাম মারে কে ? মারে রাম রাখে কে ?—কার হাঁস কে পোষে।' বলতে বলতে তিনি যেন পরমহংসের পরিহাস হয়ে উঠলেন ঃ 'টাকা মাটি, মাটি টাকা—যাকগে হাঁস। যেতে দাও। বিস্তর টাকায় কেনা হাঁসগুলো। বহুৎ টাকা মাটি হলো এই যা।'

বলে খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর ককিয়ে উঠলেন আবার ঃ 'নাঃ, বৌকে আমি হাসপাতালে পাঠাতে পারব না। তার চেয়ে হাঁসগুলোই বরং রসাতলে যাক।'

তারপর গিয়ে তিনি পোলট্রির আগল খুলে দিয়ে খেদিয়ে দিলেন হাঁসদের।

পাড়ার ছেলেদের সমবেত উল্লাসের মধ্যে তারা ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে চলে গেল।

হংস-বিদায়ের খবরটা চেম্বারে গিয়ে জানাতে তারপরে ব্যাগ হস্তে ব্যগ্র হয়ে বেরুলেন আবার রাম ডাক্তার।

এলেন রাম ডাক্তার।

আসতেই হর্ষবর্ধন তাঁর হাতে ভিজিট হিসেবে করকরে দুখানা একশ' টাকার নোট ধরে দিয়ে তাঁকে নিয়ে গৃহিণীর ঘরে গেলেন। আমরাও গেলাম সাথে সাথে।

'কি কষ্ট হচ্ছে আপনার বলুন তো?' রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে শুধালেন রাম ডাক্তার।

'মাথা টনটন করছে, দাঁত কনকন করছে, গা শিরশির করছে, তার ওপর পেট কামড়াচ্ছে আবার।' জানালেন গিন্নি।

'বটে?' বলে রাম ডাক্তার মুখ ভার করে কী যেন ভাবলেন খানিক, তারপরে হর্ষবর্ধকে টেনে নিয়ে বাইরে এলেন।

'কেস খুব কঠিন মনে হচ্ছে আমার।' গম্ভীর মুখ করে বললেন রাম ডাক্তার।

'বউ আমার বাঁচবে তো?'

'না না, ভয়ের কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে তেমন মারাত্মক কিছু ঘটবার আশঙ্কা করিনে। তবে এসব রোগে সাধারণতঃ দশজন রোগীর ন'জনাই মারা যায়। একজন মাত্র বাঁচে কেবল।

'তাহলে?' হর্ষবর্ধনের আতংক এবার আরো যেন দশগুণ বেড়ে যায়।

'অ্যাঁ, বলেন কি মশাই? তবে তো বউদির বাঁচানোর আর কোনই আশা নাই।' গোবরা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে। বলে কাঁদতে থাকে।

'ইনি বাঁচবেন।' ভরসা দেন ডাক্তারবাবু: 'এর আগে এই রোগে ন'জন আমার হাতে মারা গেছে। ইনিই দশম। এঁকে মারে কে।·· যাক, আপনারা আমায় রুগীকে দেখতে দিন তো দয়া করে এবার। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি আগে, বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন আপনারা। রুগীর ঘরে আসবেন না যেন এখন।' বলে আমাদের ভাগিয়ে দিয়ে তিনি ভেতরে রইলেন!

আমরা তিনজন পাশের ঘরে এসে বসলাম। হর্ষবর্ধনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর গোবরার মুখ শুকিয়ে হয়েছে ঠিক নারকোলের ছোবড়ার মতই।

'মাথা টনটন, দাঁত কনকন, পেট চনচন—শক্ত অসুখ বই কি!' আমি বলি। আবহাওয়ার গুমোটটা কাটাবার জন্যই একটা কথা বলি আমি মোটের ওপর—সেই গুমোটের ওপর।—'এর একটা হলেই রক্ষে নেই একসঙ্গে তিন তিনটে।'

'ব্যামোটা বউদির শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে দাদা।' গোবরা মন্তব্য করে: সারা গা শির শির করছে, বলল না বৌদি ?'

'শীরঃপীড়াই হয়েছে তো।' আমিও একটু ডাক্তারি বিদ্যা ফলাই। 'মাথা টনটন করছে বললেন না ?'

রাম ডাক্তার দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন এসে—'উকো দিতে পারেন একটা আমায় ? নিদেন একটা ছেনি ?'

হর্ষবর্ধন একটা উকো এনে দিলেন। ছেনিও।

'উকো দিয়ে কি করবে দাদা ? বউদির মাথায় উকুন হয়েছে নাকি ?' গোবরা শুধোয়: 'উকো ঘষে ঘষে উকুনগুলো মারবে বলে বোধ হচ্ছে।'

'হতে পারে!' আমার সায় তার কথায়: 'তারাই হয়ত মাথায় কামড়াচ্ছে সেইজন্যেই এই শিরঃপীড়াটা হয়েচে বোধ হয়।'

হর্ষবর্ধন চুপ করে বসে রইলেন মাথায় হাত দিয়ে।

'কিম্বা দাতের জন্যেও লাগতে পারে উকো।' আমার পুনরুক্তি: 'দাঁতে কেরিজ হয়ে থাকলে তাতেও দাঁতের যন্ত্রণা হয়। উকো দিয়ে ঘষেই সেই কেরিজ তুলবেন হয়ত উনি। দাঁত নেহাত ফ্যালনা জিনিস না মশাই। দাঁত ফেলবার পর তবেই দাঁতের মর্যাদা বুঝতে পারে মানুষ। খারাপ দাঁত থেকে হাজার ব্যাধি আসে। মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, বুকের ব্যামো, হজমের গোলমাল, এমনকি বাতের দোষও আসতে পারে ঐ দাঁতের দোষ থেকে।'

রাম ডাক্তার আবার এসে উঁকি মারলেন দরজায়:

'হাতুড়ি কিম্বা বাটালি জাতীয় কিছু আছে আপনাদের কাছে ?'

হর্ষবর্ধন হাতুড়ি এনে ডাক্তারের হাতে তুলে দেন।

'হাতুড়ি নিয়ে কি করবে দাদা ?' আঁতকে ওঠে গোবরা: 'দাঁতের গোড়ায় ঠুকবে নাকি গো ? দাঁতের ব্যথা সারাতে দাঁতগুলোই সব তুলে না ফ্যালে বউদির ?'

'কি জানি ভাই ?' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন দাদা: 'লোকে রাম ডাক্তারকে কেন যে হাতুড়ে বলে থাকে কে জানে!'

'তার মানে তো পাওয়া যাচ্ছে হাতে হাতেই—' গোবরা হাতুড়ির সঙ্গে হাতুড়ের একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে চায়।

'দাঁত না হয়ে মাথাতেও পিটতে পারে হাতুড়ি···বাধা দিয়ে আমি বলি: 'শকট্রিটমেন্ট বলে একটা জিনিস আছে না ?'···

'দাদার শখ যেমন। আপনার মতন হাতুড়ে লেখকের পরামর্শ শুনে হাতুড়ে ডাক্তার এনে নিজের শখ মেটান উনি এবার।' গোবরা আমার কথার ওপর কথা কয়: 'বউদির মধুর হাসি আর দেখতে হচ্ছে না দাদাকে—এ জন্মে নয়। হায় হায়, এই ফোকলা বউদি ছিল আমার বরাতে শেষটায়—কি করব তার।' সে হায় হায় করতে থাকে।

'মাথায় হাতুড়ি ঠুকলে শিরঃপীড়া সারে বলে শুনেছি।' তবুও আমি ভরসা দিয়ে বলতে যাই।

'মাথা না থাকলে তো মাথাব্যথাই থাকে না মশাই।' হর্ষবর্ধন বলেন: 'শকট্রিটমেণ্ট মানে হচ্ছে হঠাৎ একটা ঘা মেরে শক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোগ সারিয়ে দেওয়া। শক্ত রোগ যা তা নাকি সব তাতেই সেরে যায়।' আমার বক্তব্য রাখি: 'রাম ডাক্তারের কোন কসুর নেই মশাই! যথাশক্তি করছে বেচারা।' 'তা যদি হয় তো আমার বলার কিছু নেইকো।' হাল ছেড়ে দেন হর্ষবর্ধন। 'যথাসাধ্য করতে দিন ডাক্তারকে, বাধা দেবেন না আপনারা।' আমার কথাটির শেষে পুনশ্চ যোগ করি।

'একটা করাত দিতে পারেন আমায়? ছোটখাট হলেও চলবে।' দরজার সামনে আবার রাম ডাক্তারের আবির্ভাব। হর্ষবর্ধনের কাঠ চেরাই করাতী কারখানায় করাতের অভাব ছিল না। এনে দিলেন একখানা। তারপরে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন তিনি: 'কি সর্বনাশ হবে কে জানে!'

'বউদির পেট কেটে ছেলেটাকে বার করবে বোধ হচ্ছে।' গোবর্ধন পরিষ্কার করে: 'বউদি কাটা পড়বে আর ছেলেটা মারা পড়বে, ডাক্তারের করাতে, আমাদের বরাতে এই ছিল, যা বুঝতে পারছি!'

'বেঁচে যাবে আপনার বউ।' আমি তাঁকে ভরসা দিই: 'বড়ো বড়ো যাদুকর দেখেননি, করাত দিয়ে একটা মেয়েকে দু আধখানা করে কেটে ফ্যালে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয় আবার, দ্যাখেননি কি? কেন, আমাদের পি সি সরকারের ম্যাজিকেই তো তা দেখা যায়! তেমনি ভেলকি দেখাতে পারেন বড় বড় ডাক্তাররাও। তাঁরাও কেটে জোড়া দিতে পারেন।'

কিন্তু হর্ষবর্ধন আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন না, লাফিয়ে ওঠেন হঠাৎ— আমার চোখের সামনে বউটাকে করাতচেরা করবে আর আমি বসে বসে তাই দেখব! লোকটাকে পেয়েছ কি?' বলে তিনি ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। গোবর্ধনও সাথে সাথে যায়। চকরবরতি আমিও তাঁদের পশ্চাদ্বর্তী হই।

'কি পেয়েছেন আপনি?' ঝাঁঝিয়ে ওঠেন তিনি ডাক্তারকে: 'করাত দিয়ে আমার বউকে কাটবেন যে? কেটে দু টুকরো করবেন আপনি? কেন? কেন? যতই কাঠের ব্যবসা করি মশাই, এতটা আকাট হইনি এখনো। কেন, কি হয়েছে আমার বউয়ের, যে করাত দিয়ে তার—'

'কিসের বউ!' বাধা দেন রাম ডাক্তার: 'আমি পড়েছি আমার ব্যাগ নিয়ে। বউকে আপনার দেখলাম কোথায়? হতভাগা ব্যাগটা একেক সময় এমন বিগড়ে যায়। হাতুড়ি পিটে, ছেনি দিয়ে উকো ঘষে কিছুতেই এটাকে খুলতে পারছি না। করাত দিয়ে কাটতে লেগেছি এবার। এর মধ্যেই তো আমার যন্তরপাতি, ওষুধপত্র, এমনকি থার্মোমিটারটি পর্যন্ত। আগে এসব বার করলে তবে তো দেখব আপনার বউকে। রাজ্যের রোগ সারাই আমি কিন্তু নিজের ব্যাগ সারাতে পারি না। এই ব্যাগটাই হয়েছে আমার ব্যায়রাম।'

হর্ষবর্ধনের কাব্যচর্চা

বাড়ির দরজায় কে যে এক-পাল ছাগল বেঁধে গেছল, তাদের চ্যাঁ-ভ্যাঁয় পাড়াটা মাত। হর্ষবর্ধন তখন থেকে উঠে-পড়ে লেগেছেন, কিন্তু মনই মেলাতে পারছেন না, তা কবিতা মেলাবেন কী !

'দূর ছাই !' বিরক্ত হয়ে বলেছেন হর্ষবর্ধন, 'পাঁঠার সঙ্গে খালি পেটের মিল হতে পারে—কবিতার মিল হয় না। পাঁঠারা অপাঠ্য।'

আজই একটু আগে গোবরার হাতে তিনি মোটা খাতাটা দেখেছিলেন। চামড়ায় বাঁধানো চকচকে—অবিকল বইয়ের মতো। কৌতূহল প্রকাশ করায় গোবরা জানিয়েছিলো—'এটা আমাদের কবিতার খাতা, আমরা কবিতা লিখবো। পরে ছাপা হয়ে বই আকারে বেরুবে ! আমাদের কবিতার বই।'

'আমরা—মানে ? আমরা কারা ?' ভাইয়ের কথায় দাদা একটু ঘাবড়েই গেছেন !

'আমরা অর্থাৎ তুমি আর আমি। আবার কে ?' গোবরা ব্যক্ত করেছে।

'আমি ! আমি লিখবো কবিতা ! কেন, কি দুঃখে ?' হর্ষবর্ধন আকাশ থেকে পড়েছেন ঃ 'আমাদের কাঠের কারবার বেঁচে থাক। কবিতা লিখতে যাবো কিসের দুঃখে ?'

'চিরটা কাল তো আকাট হয়েই কাটালে। কেন, কবি হওয়াটা কি খারাপ?'

'ধ্যুত্তোর কবি! কী পাপ করেছি যে আমায় কবিতা লিখতে হবে!' হর্ষবর্ধনের কভি-নেহি মেজাজ।

'কেন, পাপ কিসের!' গোবরা জবাব দিয়েছে, 'কবিতা লেখা কি পাপ? ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-কৃত্তিবাস, ওমর-ওমর—' বলতে বলতে গোবরার কোথায় যেন আটকে যায়।

'দূর বোকা! ওমর নয়, অমর। জানি কবিতা লিখে এঁরা সবাই অমর। জানা আছে।' হর্ষবর্ধন ভাইকে জানাতে দ্বিধা করেন না।

'অমর নয়, ওমর। আরেকজন নামজাদা কবি—তাঁর নামের সঙ্গে আরো দু-দুটো খাবার জিনিস জড়ানো কিনা। খাবারগুলো আমার মনে আসছে না ছাই!'

'ওমরত্ব ছাড়াও দুরকমের খাবার? ভাল খাবার?' ঠিক কাব্যরস না হলেও হর্ষবর্ধনের জিভে এক রকমের রস জমে।

'মনে পড়েছে। খই আর আম। ওমর খৈআম। হ্যাঁ, তুমি কি বলতে চাও ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাস আর আমাদের এই ওমর খৈআম—এঁরা সবাই কবিতা লিখে পাপ করে গেছেন?'

'ওমর খৈআম আমি পড়িনি। তবে খই আমের মতো ভাল হবে কি না বলতে পারবো না।' হর্ষবর্ধন আসল প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে যান।

'আমি পড়েছি। দই-চিঁড়ের চেয়েও ভাল।' গোবরা নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে, 'ঢের উপাদেয়।'

'তা ভাল হতে পারে। কিন্তু কবিতা লেখা ভারি শক্ত! মেলাতে হয়। কবিতা মেলাতেই অনেকের প্রাণ যায়। ওমরের কথা জানি না, আর সবাই মরো-মরো।'

'কিছু শক্ত না। তুমি এই ভূমিকাটা পড়ে দেখো। জনৈক আস্ত লেখকের লেখা। লোকটাকে হয়তো কবিও বলা যায়। হ্যাঁ রীতিমত টাকা দিয়ে লেখাতে হয়েছে—নগদ এক-কুড়ি টাকা। বইটা লেখবার আগেই বইয়ের ভূমিকাটি লিখিয়ে রাখলাম। কাজ এগিয়ে রইল।'

মোটা খাতাটার গোড়াতেই একটা গোটা প্রবন্ধ—কোন এক আস্ত লেখকের লেখা ছোট্ট এক ভূমিকা—ভূমিকাটার মাথায় বিশদ করে জানানো—'কবিতা লেখা মোটেই কঠিন না'। হর্ষবর্ধন ভূমিকার মাথাটা পড়েন, কিন্তু মোটেই তার ভেতরে মাথা গলান না। এমনিতেই তিনি মাথা নাড়েন: 'না, শক্ত না! খুব শক্ত। এ কি বাপু কাঠ যে হাটে গেলেই মিলে যায়? এ হলো কবিতা। মেলা দেখি কবিতার সঙ্গে? খবিতা, গবিতা, ঘবিতা, ঙবিতা, চবিতা, ছবিতা, জবিতা—মায় ইস্তক হবিতা পর্যন্ত কিছু মেলে না। কবিতা লেখা কি সহজ রে বাপু! বললেই হলো আর কি!'

'এই আস্ত লেখকটা তাহলে আস্ত গল্প ঝেড়েছে, এই তুমি বলতে চাও তো?'

'আলবৎ! কবিতা মেলাতে হয়—নইলেই কবিতাই হয় না। আর মেলানো ভারি শক্ত। দু-রকমের মেলা আছে, রথের মেলা আর কবিতার মেলা—কিন্তু দুটো মেলা একেবারে আলাদা রকমের। রথের মেলা ঠিক সময়ে আপনিই মেলে, কিন্তু কবিতা মেলায় কার সাধ্যি! তোর লেখক গল্প না ঝাড়তে পারে, কিন্তু ভুল করে দুটো মেলায় গুলিয়ে ফেলেছে বলে বোধ হচ্ছে।'

'জানি, জানি।' গোবরা ঘাড় নাড়েঃ 'মিলও তোমার দুরকমের। কবিতার মিল, আবার কাপড়ের মিল। কিন্তু মিল ছাড়াও যেমন কাপড় হতে পারে—ধরো যেমন তাঁতের কাপড়, তেমনি তোমার বিনা মিলেও কবিতা বানানো যায়। পড়ে দেখো না ভূমিকাটা।'

'আচ্ছা, যা তুই! ঘণ্টাখানেক পরে আসিস। আমি তোকে এমন একটা লম্বা কবিতা বানিয়ে দেবো যে তোর তাক লেগে যাবে। পারিস তো কোন কাগজে কিছু টাকা দিয়ে তোর নামে ছাপিয়ে দিস। তোর নামে উইল করে দিলাম।'

এই বলে শ্রীমান ভ্রাতৃরত্নকে ভাগিয়ে দিয়ে 'আমাদের কবিতার খাতা' নামক মরোক্কো চামড়ার বাঁধাই মোটা খাতাটাকে নিয়ে তিনি পড়েছেন। লাইন দুয়েকের কবিতা দেখতে না দেইতেই তাঁর এসে গেছে—পলায়মান তাদের ধরে-পাকড়ে খাতার পাতায় তিনি পেড়ে ফেলেছেন। লাইন দুটি এইঃ

মুখখানা থ্যাবড়া।
নাম তার গোবরা॥

কিন্তু এই দু-ছত্রের পরে আর একছত্রও তাঁর নিজের কিংবা কলমের মাথায় আসছে না। বাড়ির তলায় ছাগলদের সমবেত ঐকতান—সেই ছাগলাদ্য সঙ্গীত-সুরধ্বনী ভেদ করে কাব্য-সরস্বতীর সাধ্য কি যে তাঁর খাতার দিকে পা বাড়ায়! অগত্যা, বিতাড়িত হয়ে তিনি ভূমিকাটা নিয়ে পড়েছেন—তার মধ্যে যদি গোবরা-কথিত কবিতা লেখার সত্যি কোন সহজ উপায় থাকে।

ভূমিকাটার আরম্ভ এইঃ

'তোমাদের নিশ্চয় কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমরা হয়তো ভেবেছো, ওটা খুব শক্ত কাজ। কিন্তু মোটেই তা নয়। কবিতা লেখার মতো সহজ কিছুই নেই। নাটক গল্প প্রবন্ধ—এ-সব খুব কষ্ট করে লিখতে হয়, কিন্তু কষ্ট করে একটি জিনিস লেখা যায় না, তা হচ্ছে কবিতা। খুব সহজে ও আসবে, নয়তো কিছুতেই ও আসবে না। সহজ না হলে কবিতাই হলো না।'

এই অবধি পড়ে হর্ষবর্ধন আপন মনে বলতে থাকেন ঃ 'আরে, আমিও তো ঠিক সেই কথাই বলছি। কষ্ট করে কখনোই কবিতা লেখা যায় না। আর দেখো তো এই গোবরার কাণ্ড! আমার ঘাড়ে ইয়া মোটা একটা জাবদা খাতা চাপিয়ে গেছে—আমি অনর্থক কষ্ট করে মরছি। যতো সব অনাসৃষ্টি। দেখো না!'

হর্ষবর্ধন আবার ভূমিকার মধ্যে আরেকটু অগ্রসর হন—

'নির্মল জলে যেমন আকাশের ছায়া পড়ে, তেমনি মানুষের মনে কবিতার মায়া লাগে। মনের সেই আকাশকে রঙে রেখায় ধরে রাখলেই হয় ছবি, আর কথায় বাঁধলেই হয় কবিতা। তোমাদের মনে যখন যে ভাব জাগে তাকে যদি ভাষায় জাহির করতে পারো তাই হবে কবিতা—যেটা যতো ভাল প্রকাশ হবে, কবিতাও হবে ততো চমৎকার।'

অতঃপর হর্ষবর্ধন নিজের মনের মধ্যে হাতড়াতে শুরু করেন। কিন্তু সমস্তই তাঁর শূন্য বলে মনে হতে থাকে। অবশেষে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—তাহলে আর আমি কি করে কবি হবো!

ভূমিকায় আরো ছিল ঃ

'শরীরের যেমন ব্যায়াম দরকার, যেমন বই পড়া আবশ্যক, তেমনি প্রয়োজন কবিতা লেখার। বই পড়লে—চিন্তা করলে হয় মস্তিষ্কের ব্যায়াম, কবিতা-চর্চায় মনের। ভাবের ভাণ্ডার যত পূর্ণ হবে, মন হবে ততই বড়ো—ততই অগাধ। ভাব এলেই লিখে ফেল। তাহলে, সেই প্রয়াসের দ্বারাই ঘুরে ফিরে সেই ভাব তোমার চেতনা বা অবচেতনার মধ্যে গিয়ে জমা হয়ে থাকলো। ভাবনা হচ্ছে, মৌমাছির মত যদি উড়ে যেতে দিলে তো খানিক গুন-গুন করেই ও চলে গেলো—আর কখনো ফিরে না আসতেও পারে। কিন্তু কথার রূপগুণের মধ্যে—ভাষার মৌচাকে যদি ওকে ধরতে পারো তাহলে মধু না দিয়ে ও যাবে না। সেই মধুই হলো আসল। এবং তোমার সেই মনের মধু যখন পাঠকের মনকেও মধুময় করতে পারে তখনই তোমার কবিতা হয়ে ওঠে মধুর। তখনই তার সার্থকতা।

'কবিতার আসল কথা হচ্ছে—তা কবিতা হওয়া চাই। ছন্দ, মিল ইত্যাদি না হলেও তার চলে। ছন্দ যদি আপনিই এসে যায়, মিল যদি অমনি পাও, বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু ও না হলেও কবিতার কোন হানি হয় না। আকাশের সঙ্গে বাতাস বেশ মিল খায়, আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর কোথাও মিল নেই। অথচ আকাশ আর পৃথিবী মিলে চমৎকার একটা কবিতা।'

ভূমিকাটা, দু-একটা উদাহরণের পরে এইভাবে শেষ। পরিশেষে পৌঁছে হর্ষবর্ধন মুখ বাঁকান ঃ 'জানি, জানি। এ সবই আমার জানা। তুমি আর নতুন কথা আমাকে কি শেখাবে বাপু! তোমার চেয়ে ঢের ভাল ভূমিকা আমি লিখে দিতে পারি। আরে বাপু, কে না জানে 'শ্রীবৎস'

লিখলেই 'বীভৎস' দিয়ে মেলাতে হয়। 'কার খোকা' আনলেই অমনি 'ছারপোকা'কে আমদানি করতে হবে। 'গাড়ি ভাড়া' করলে 'ভারি তাড়া' না হয়ে আর যায় না। সবাই জানে, তুমি আর বেশি কি বলবে! কিন্তু একপাল ছাগল আর তাদের কান ফাটানো চ্যাঁ-ভ্যাঁর সঙ্গে যদি মেলাতে পারতে তাহলে জানতুম যে, হ্যাঁ—তুমি একজন আস্ত জাত কবি। এমন কি তোমাকে আমি কবি অমর মুড়ি-কাঁঠাল বলে মানতেও রাজি ছিলাম।'

গোবরা এসে এতক্ষণ পরে উঁকি মারে—'কি দাদা? কদ্দুর? বেরুল তোমার কবিতা?'

'হয়েছে, খানিকটা হয়েছে। দু-ছত্তর তোর বইয়ের ওপর গজিয়েছে, আর দু-ছত্তর আমার মাথায় গজগজ করছে, এখনো খাতায় ছাড়িনি!'

'দেখি তোমার কবিতা?' গোবরা দাদার কাব্য-গঞ্জনা শুনতে উৎসুক হয়।

কিন্তু খাতার দু-লাইন—'মুখখানা থ্যাবড়া, নাম তার গোবরা' দেখেই—নিজের মুখের সঙ্গে সে মিলিয়ে দেখে কি না বলা যায় না—গোবরার মুখ কবিতার আরেকটা মিল হয়ে ওঠে—একেবারে গোমড়া হয়ে ওঠে।

'আরে এখনি অবাক হচ্ছিস! আরো দু-লাইন আছে—বলছি শোন্!' হর্ষবর্ধন বাকি পংক্তি গুলোকেও নিজের দন্তপংক্তির সঙ্গে প্রকাশ করে দেন—'বাকিটাও শোন্ তবে—শুনলে খুশিই হবি—

তলায় এক পাল ছাগল!
আর ওপরে তুই এক পাগল॥'

'এই চার লাইনেই আমার অমরত্বলাভ। আজকের মতো এই যথেষ্ট। কেমন হয়েছে কবিতাটা? ওমর খৈআমের সমকক্ষ হয়তো হইনি, কিন্তু ওমর মুড়কিজাম কি বলা যায় না আমায়?'

কারো ধার ধারি না, এমন কথা আর যেই বলুক আমি কখনই বলতে পারি না। আমার ধারণা, এক কাবুলিওয়ালা ছাড়া এ জগতে এ-কথা কেউই বলতে পারে না। অমৃতের পথ ক্ষুরস্য ধারা নিশ্চিতা ; অকালে মুক্ত না হতে হলে ধার করতেই হবে।

ধার হলেও কথা ছিল বরং, কিন্তু তাও নয়। বাড়ি ভাড়া বাকি। তাও বেশি না পাঁচশো টাকা মাত্তর ! কিন্তু তার জন্যেই বাড়িওয়ালা করাল মূর্তি'টি ধরে দেখা দিলেন একদিন—'আপনাকে অনেক সময় দিয়েছি কোন অজুহাত শুনছি না আর—'

'ভেবে দেখুন একবার।' আমি তাঁকে বলতে যাই : 'এই সামান্য পাঁচশো টাকার জন্যে আপনি এমন করছেন ! অথচ এক যুগ পরে একদিন—আমি মারা যাবার পরেই অবিশ্যি—আপনার এই বাড়ির দিকে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, একদা এখানে বিখ্যাত লেখক শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক বাস করতেন।'

'বাস করতেন ! বাস করে আমার মাথা কিনতেন', জবাবে তাঁর দিক থেকে যেন ঝাপটা এলো—'শুনুন মশাই, আপনাকে সাফ কথা বলি—যদি আজ রাত্রি বারোটার ভেতর আমার টাকা না পাই তাহলে এক যুগ পরে নয়, কালকেই লোকে এই কথা বলবে।'

বাড়িওয়ালা তো বলে গেলেন, চলেও গেলেন। কিন্তু এক বেলার মধ্যে

এতো টাকা আমি পাই কোথায় ? পাছে ধার দিতে হয় সেই ভয়ে সহজে কেউ আমার মতো লেখকের ধার ঘেঁষে না। লেখক মাত্রই ধারাল, আমি আবার তার ওপর এক কাঠি—জানে সবাই।

হর্ষবর্ধনের কাছে যাবো ? তাদের কাছে এই ক-টা টাকা কিছুই নয়। কীর্তি-কাহিনী লিখে অনেক টাকা তাদের পিটেছি, এখন তাদের পিঠেই যদি চাপি গিয়ে ? তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যদি এই দায় থেকে উদ্ধার পাই।

গিয়ে কথাটা পাড়তেই হর্ষবর্ধন বলে উঠলেন—'নিশ্চয় নিশ্চয় ! আপনাকে দেবো না তো কাকে দেবো !'

চমকে গেলাম আমি। কথাটা যেন কেমনতরো শোনাল।

'আপনি এমন কিছু আমাদের বন্ধু নন ?' তিনি বলতে থাকেন।

'বন্ধুত্বের কথাই যদি বলেন—' আমি বাধা দিয়ে বলতে যাই।

'হ্যাঁ, বন্ধুত্বের কথাই বলছি। আপনি তো আমাদের বন্ধু নন। বন্ধুকেই টাকা ধার দিতে নেই, মানা আছে। কেননা, তাতে টাকাও যায় বন্ধুও যায়।' তিনি জানান : 'তবে হ্যাঁ, এমন যদি সে বন্ধু হয় যে বিদেয় হলে বাঁচি—তার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে ঐ ধার দেওয়া। তাহলেই চিরকালের মতন নিস্তার !'

আহা ! আমি যদি ওঁর সেই দ্বিতীয় বন্ধু হতাম—মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'কিন্তু আপনি তো বন্ধু নন, লেখক মানুষ। লেখকরা তো কখনো কারো বন্ধু হয় না।'

'লেখকদেরও বোধহয় কেউ বন্ধু হয় না।' সখেদে বলি।

'বিলকুল নির্ঝঞ্ঝাট ! এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে, বলুন ?' তিনি বলেন, 'আপনি যখন আমাদের আত্মীয় বন্ধু কেউ নন, নিতান্তই একজন লেখক তখন আপনাকে টাকা দিতে আর বাধা কি ? কতো টাকা দিতে হবে বলুন ?'

'বেশি নয়, শ-পাঁচেক। আর একেবারে দিয়ে দিতেও আমি বলছি না।' আমি বলি : 'আজ তো বুধবার, শনিবারদিনই টাকাটা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো।'

কথা দিলাম। এছাড়া আজ বাড়িওয়ালার হাত থেকে ত্রাণ পাবার আর কি উপায়, কিন্তু কথা তো দিলাম। না ভেবেই দিয়েছিলাম কথাটা—শনিবারের সকাল হতেই ওটা ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়াল।

ভাবতে ভাবতে চলেছি, এমন সময় গোবর্ধনের সঙ্গে মোলাকাত অকুল-পাথারে, চৌরাস্তার মোড়ে।

'গোবর্ধন ভায়া একটা কথা রাখবে ? রাখো তো বলি।'

'কি কথা বলুন ?'

'যদি কথা দাও যে, তোমার দাদাকে বলবে না তাহলেই বলি।'

'দাদাকে কেন বলতে যাবো, দাদাকে কি আমি সব কথা বলি ?'

'অন্য কিছু কথা নয়, কথাটা হচ্ছে এই, আমাকে শ পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারো—দিন কয়েকের জন্যে ? আজ তো শনিবার ? এই বুধবার সন্ধের মধ্যেই টাকাটা আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।'

'এই কথা ?' এই বলে আর দ্বিরুক্তি না করে শ্রীমান গোবরা তরা পকেট থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট বার করে দিল।

টাকাটা নিয়ে আমি সটান শ্রীহর্ষবর্ধনের কাছে।

'দেখুন আমার কথা রেখেছি কিনা। দরিদ্র লেখক হতে পারি, কথা নিয়ে খেলা করতে পারি—কিন্তু কথার খেলাপ কখনো করি না।'

হর্ষবর্ধন নীরবে টাকাটা নিলেন।

'আপনি তো ভেবেছিলেন যে টাকাটা বুঝি আপনার মারাই গেল, আমি আর এ-জন্মেও এ-মুখো হবো না। ভাবছিলেন যে—'

'না না। আমি সে-সব কথা একেবারেও ভাবিনি। টাকার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করুন, টাকাটা আপনাকে দিয়ে আমি কিছুই ভাবিনি কিন্তু ফেরত পেয়ে এখন বেশ ভাবিত হচ্ছি।'

'ভাবছেন এই যে, এই পাঁচশো টাকা ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ক্রেডিট খাটিয়ে এর পরে আমি ফের হাজার টাকা ধার নেবো। তারপর সেটা ফেরত দিয়ে আবার দু হাজার চাইবো। আর এমনি করে ধারটা দশ-হাজারে দাঁড় করিয়ে তারপরে আর এ-ধারই মাড়াবো না ? এই তো ভাবছেন আপনি ? এই ভেবেই তো ভাবিত হয়েছেন, তাই না ?'

আমি তাঁর মনোবিকলন করি। তাঁর সঙ্গে বোধহয় আমার নিজেরও ?

তিনি বিকল হয়ে বলেন, 'না না, সে-সব কথা আমি আদৌ ভাবিনি। ভাবছি যে এতো তাড়াতাড়ি আপনি টাকাটা ফিরিয়ে দিলেন ! আর এতো তাড়াতাড়ি আপনার প্রয়োজন কি করে মিটতে পারে ? বেশ, ফের আবার দরকার পড়লে চাইতে যেন কোন কুণ্ঠা করবেন না।'

বলাই বাহুল্য ! মনে মনে আমি ঘাড় নাড়লাম। লেখকরা বৈকুণ্ঠের লোক, কোন কিছুতেই তাদের কুণ্ঠা হয় না।

বুধবার দিনই দরকারটা পড়ল আবার। হর্ষবর্ধনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে গোবর্ধনকে গিয়ে দিতে হলো।

'কেমন গোবর্ধন ভায়া ! দেখলে তো কথা রেখেছি কিনা। এই নাও তোমার টাকা—প্রচুর ধন্যবাদের সহিত প্রত্যর্পিত।'

বুধবার আবার গোবরার কাছে যেতে হলো। পাড়তে হলো কথা—

'গোবর্ধন ভায়া বুধবারে টাকাটা ফেরত দেবো বলেছিলাম বুধবারেই

দিয়েছি, দিই-নি কি? একদিনের জন্যেও কি আমার কথার কোন নড়চড় হয়েছে?'

'এমন কথা কেন বলছেন?' গোবর্ধন আমার ভণিতা ঠিক ধরতে পারে না।

'টাকাটার আমার দরকার পড়েছে আবার। ওই পাঁচশো টাকাই—সেই জন্যেই তোমার কাছে এলাম ভাই। এই বুধবারেই তোমায় আবার ফিরিয়ে দেবো টাকাটা। নির্ঘাত।'

এইভাবে হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন, গোবর্ধন আর হর্ষবর্ধন—শনিবার আর বুধবারের দু-ধারের টানা পোড়েনে আমার ধারিওয়াল কম্বল বুনে চলেছি—এমন সময়ে পথে একদিন দু-জনের সঙ্গে দেখা।

দুই ভাই পাশাপাশি আসছিল। আমাকে দেখে দাঁড়াল। দু-জনের চোখেই কেমন যেন একটা সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

হয়তো দৃষ্টিটা কুশল জিজ্ঞাসার হতে পারে, কোথায় যাচ্ছি, কেমন আছি —এই ধরনের সাধারণ কোন কৌতূহলই হয়তো বা, কিন্তু আমার তো পাপ মন, মনে হলো দু-জনের চোখেই যেন এক তাগাদা!

'হর্ষবর্ধনবাবু, ভাই গোবর্ধন, একটা কথা আমি বলবো, কিছু মনে করো না—' বলে আমি শুরু করি: 'ভাই গোবর্ধন, তুমি প্রত্যেক বুধবার হর্ষবর্ধনবাবুকে পাঁচশো টাকা দেবে। আর হর্ষবর্ধনবাবু, আপনি প্রত্যেক শনিবার পাঁচশো টাকা আপনার ভাই গোবর্ধনকে দেবেন। হর্ষবর্ধনবাবু, আপনি বুধবার, আর গোবর্ধন, তুমি শনিবার মনে থাকবে তো?'

'ব্যাপার কি!' হর্ষবর্ধন তো হতভম্ব: 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ব্যাপার এই যে, ব্যাপারটা আমি একেবারে মিটিয়ে ফেলতে চাই। আপনাদের দুজনের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না।'

মাসতুতো ভাই

জীবন-মরণ সমস্যার দিন আজ একটা। বৌকে খুন করে সেশন কোর্টের আসামী ভজহরি। তার রায় বেরুবার দিন আজ।

মাসতুতো ভাইকে মাসতুতো ভাই না দেখলে কে দেখবে? কিন্তু আজ আর ভজহরিকে দেখা দিচ্ছেন না হর্ষবর্ধন।

দেখা শোনা, মামলার তদ্বির যা করবার তা এতদিন সবই করেছেন তিনি, এমন কি ষোলোআনার ওপর আঠারোআনাও। কিন্তু আজ আর আদালতের দিকে পা বাড়াবার তাঁর সাহস হয় না। নিজের চোখে ফাঁসি দেখা যেমন কষ্টকর, নিজের কানে সেই দণ্ডাজ্ঞা শোনাও তার চেয়ে কিছু কম কঠিন নয়। ভজুকে প্রাণদণ্ড থেকে যদি বাঁচানো না গিয়ে থাকে, এগিয়ে নিজের কানদণ্ড নেওয়া কেন?

ভাই গোবর্ধনকে বলে রেখেছেন, আদালতের লাঞ্চের সময়ে সেশন কোর্টের বার-লাইব্রেরিতে উকিলবাবুকে ফোন করে যেন খবরটা জেনে নেয়।

কিন্তু গোবর্ধনকে আর ফোন করতে হলো না, সাড়ে বারোটার সময় উকিলবাবুই খবর দিলেন টেলিফোনে। এই মাত্তর ভজহরির দ্বীপান্তর হয়ে গেলো। যাবজ্জীবন। যার মানে আসলে হচ্ছে বারো বছরের জেল, উকিলবাবু জানালেন।

'ভজুটা বেঁচে গেলো এ-যাত্রা।' হাঁপ ছাড়লেন হর্ষবর্ধন : 'ফাঁসিকাঠে লটকাতে হলো না বেচারাকে।'

তারপর একটু পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন : 'ভজুর ভাগ্যকে আমার হিংসে হয়, জানিস গোবরা ?'

'কিসের হিংসে ?'

'জানিস গোবরা, বছর বারো আগে আমারও মাথায় খুন চেপেছিলো একবার। খুন করবার ইচ্ছে হয়েছিলো তোর বৌদিকে।'

'বলো কি দাদা ?' গোবর্ধন আঁতকে ওঠে।

'তোর বৌদির জ্বালায় অস্থির হয়ে —আর বলছিস কেন ? ভেবেছিলাম যে খুন করে বরং ফাঁসি কাঠে চলে যাই, রেহাই পাই দুজনেই !'

'অমন কথা মুখেও আনতে নেই।'

'পারলাম কই করতে ? পারলে তো বাঁচতাম। হাড়মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেলো অ্যাদ্দিনে।'

'এখনো তোমার সেই মতলব আছে নাকি দাদা ?'

'এখন···এই বয়সে ? অসম্ভব। কিন্তু হায়, যদি পারতাম তখন···!' হর্ষবর্ধনের হায় হায় শোনা যায়। 'তাহলে বারো বছর বাদে আজ তো আমি মুক্ত পুরুষ রে !'

'জেল থেকে বেরিয়ে এসে বিয়ে করতে বুঝি আবার ?'

'আবার ? রামোঃ !'

'তুমি যে এমন সর্বনেশে লোক দাদা, আমি তো তা জানতুম না।'

'সর্বনেশেই বটে ভাই ! নইলে এমন করে নিজের সর্বনাশ করি !'

'আমাদের অতো ভালো বৌদি—' গোবরা মুখ গোমড়া করে—'আর তাকেই কিনা তুমি···?'

'তোর বৌদি তার ভালো, আমার কে !' দাদাও ফোঁস করে ওঠেন। 'ভজহরির বরাত জোর, নিজেও বাঁচলো বৌয়ের হাত থেকেও বাঁচলো ! বারো বছর বাদে ফিরে এসে দিব্যি স্বাধীন হয়ে চরে বেড়াবে।'

'ভজুদা তোমার জন্যই তো বাঁচলো দাদা !' গোবরা বলে।

'তা বলতে পারিস—ওকে বাঁচাতে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি আমায়—আবার তোর জন্যেও বটে !'

'সত্যি দাদা, এই বুড়ো বয়সে কেঁচে গণ্ডুষ করতে হলো আমায়।

লেখাপড়া শিখতে হলো আবার। তবে আসলে তোমার বুদ্ধিতেই বাঁচলো ভজুদা। যাই বলো দাদা, তোমার বুদ্ধি কিন্তু অঢেল।'

ভাইয়ের সার্টিফিকেট দাদার বুক বিস্ফারিত হলেও তিনি খতিয়ে দেখেন বুদ্ধিটা আসলে ভজুরই। নিজের বুদ্ধিতেই বেঁচে গেলো ভজু। কথায় বলে না—আপ্তবুদ্ধি শুভংকরী, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী! বৌ বেঁচে থাকলে আর বুদ্ধি দেবার সুযোগ পেলে ভজুকে আর বাঁচতে হোত না।

ভজহরির হাজত হবার খবর পেতেই ছুটে গিয়েছিলেন হর্ষবর্ধন। 'আমি বড়ো বড়ো উকিল লাগাবো, তুমি কিছু ভেবো না ভজু।' আশ্বাস দিয়েছিলেন মাসতুতো ভাইকে।

'উকিল তো ছাই করবে!' উকিলের বিষয়ে বিশেষ ভরসা নেই ভজহরির; 'উকিল বলবে এখন তো দুর্গা বলে ঝুলে পড়ো বাপু, তারপর তোমায় আপীলে খালাস করে আনবো।'

'তাহলে? মিথ্যা সাক্ষী দিলে হয় না?'

'মিথ্যে সাক্ষীতে কাজ হয় বরং, কিন্তু এখানে তো সাফাই দেবার পথ রাখিনি ভাই। খুন করে রক্ত মাখা দা হাতে নিজেই থানায় গিয়ে ধরা দিয়েছি। কবুল করেছি সব।'

'এক দা-য়ে তোমাদের দুজনকেই কেটেছে দেখছি!'

'তখন কি আমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিলো? যেমন করে পারো আমায় বাঁচাও ভাই। দ্বীপান্তরে আমায় দুঃখু নেই, ফাঁসিটা যেন আটকায়—'

'টাকার আমার অভাব নেই।' হর্ষবর্ধন জানায়ঃ 'তোমাকে বাঁচাবার জন্য খরচের আমি কোনো কসুর করবো না...'

'আন্দামান থেকে ফিরে এসে মনের মতো বৌ নিয়ে নতুন করে সংসার পাতবো আবার।'

'বৌ কখনো মনের মতো হয় না দাদা! নিজেকেই বৌয়ের মনের মতো করে নিতে হয়। আমি যেমন নিজেকে গড়ে-পিটে করে তুলেছি।'

'শোনো হর্ষ, নিচের কোর্টে আমার এ মামলার কোনো ফয়সালা হবে না। সেশনে জুরিদের ভাঙচি দিয়ে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে...।'

'বুঝেচি! আর বলতে হবে না—' হর্ষবর্ধন বাধা দেন, 'কেউ শুনতে পেলে আমাকেও ধরে ফাটকে পুরে দেবে। ঘুষ দিতে গেলেও জেলে যেতে হয়। তুমি কিছু ভেবো না। টাকায় যা হতে পারে তার কোনো ত্রুটি হবে না তুমি নিশ্চিত থাকো।'

কিন্তু সেশন কোর্টে পৌঁছে দেখলেন সে বড়ো কঠিন ঠাঁই। হোমরা-চোমরা যতো জুরি, গোমড় গোমড়া মুখ—সেখানে তাঁর জারিজুরি খাটবে না।

তবে ওদের মধ্যে চিনতে পারলেন একজনকে। তাঁদের পাড়াতেই থাকেন,

দরিদ্র স্কুল-মাস্টার। চল্লিশ টাকা বেতন নিয়ে বেতনের খাতায় একশো কুড়িটাকা পাইলাম বলে লিখতে হয় যাকে, উদয়াস্ত দশ প'াচটাকার গোটা দশেক টুইশানি করে সংসার চালাতে হয় যাকে।

ভাবলেন তাকেই পাকড়াবেন।

কথাটা পাড়লেন গোবরার কাছে—'বুঝলি শ-দুই টাকার একটা টুইশানি দিয়ে ওকেই হাত করতে হবে।'

'কিন্তু পড়বে কে? বাড়িতে পড়বার ছেলে কই তোমার?' গোবরা শুধায়।

'তা বটে।' হর্ষবর্ধন খতিয়ে দেখেন, বাড়িতে ছেলে বলতে গোবরা আর মেয়ে বলতে উনি, গোবরার বৌদি। ওঁকে পড়বার কথা বলতে তাঁর সাহস হয় না, তাহলে হয়তো বৌকে বিধবা করে বৌয়ের হাতে নিজেকেই খুন হতে হবে। অগত্যা—

'কেন তুই তো আছিস। ছোট ভাই তো ছেলের মতই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা বলে থাকে শুনিসনি। তুই-ই পড়বি।'

'আমি?' গোবরা আকাশ থেকে পড়ে। 'এই বয়সে?'

'পড়বার আবার বয়স আছে নাকি? সব বয়সেই বিদ্যা শিক্ষা করতে হয়। মরবার আগে পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করে যায় মানুষ।'

'না দাদা, লেখাপড়া করা আমার দ্বারা হবে না।'

'আরে পড়বি নাকি? পড়ার ছলনা করবি তো!'

'ছলনা করতে আমি পারবো না। মাস্টারকে আমার ভারি ভয়। নীল-ডাউন করিয়ে দেবে।'

'তা দেবে। সে কথা ঠিক।' সায় দিতে হয় দাদাকে: 'আমি না-হয় চেয়ার বেঞ্চির বদলে নরম গদির ফরাশ পেতে পড়বার ব্যবস্থা করবো। তাহলে তোর হাঁটুতে আর তেমন লাগবে না!'

'না লাগুক। আমার আত্মসম্মান হানি হবে তো? যদি আমার কান মলে দেয়?'

তখন বাধ্য হয়ে হর্ষবর্ধনকে উদাত্ত হতে হয়: 'কিন্তু ভাই গোবরা, বাঙালীকে বাঙালী না রাখিলে কে রাখিবে? কে বলেছিলো এ-কথা?'

'চন্দ্রশেখর।'

'চন্দ্রশেখর বলেছিলো?' শুনে দাদা তো হতবাক।

'না। কপালকুণ্ডলা।'

'কপালকুণ্ডলা বলেছিলো এ-কথা?'

'তাহলে বিষবৃক্ষ। বিষবৃক্ষই বলেছিলো বোধ হচ্ছে।'

'বিষবৃক্ষ! বৃক্ষে আবার কথা বলে নাকি?'

'তবে বঙ্কিমচন্দর।'

'যা বলেছিস! বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছিলো এ-কথা। কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ তুই। এখানে তো শুধুই বাঙালী নয়, বাঙালীর চেয়েও যে আপনার তার জীবনমরণের প্রশ্ন।...মাসতুতো বাঙালীকে মাসতুতো বাঙালী না রাখিলে কে রাখিবে?'

অগত্যা গোবর্ধনকে বুড়ো বয়সে পড়ুয়া হতে হয়। ক্লাস সিক্স যে পেরয়নি সে প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দিতে বসে। মাস্টারের কাছে পাটীগণিত নিয়েই পড়ে প্রথমে।

একেবারে সাঁইত্রিশের উদাহরণ মালা নিয়ে। 'এই আঁকটা আমায় বুঝিয়ে দিন সার।'

বুঝিয়ে দেন মাস্টার।

'এইবার এই আটত্রিশ উদাহরণ মালার আঁকগুলো বোঝান।'

'সাঁইত্রিশের গুলো কষো আগে। কষে দেখাও।'

'ও আর কষবো কি সার? ওতো বুঝে নিয়েছি।'

'বুঝেছ কিনা কষে দেখাও।'

'আপনি বলছেন বুঝিনি আমি? বলছেন কি আপনি! তাহলে এতক্ষণ ধরে আপনি কি বোঝালেন আমায়!'

এই রকম দিনের-পর-দিন উদাহরণের-পর-উদাহরণ এগুতে থাকে। অঙ্কের বোঝা বাড়ে। অবশেষে গোবরা আর পারে না, দাদা কাছে এসে কেঁদে পড়ে—'আর তো পড়তে পারি না দাদা? অঙ্ক কষতে বলছে কেবল। এবার রক্ষা করো আমায়!' তখন দাদা নিজেই ভাইয়ের বোঝা ঘাড় পেতে নেন।

বোঝার ওপর শাকের আঁটি নিয়ে এগোন। একশোখানা একশো টাকার নোট। তার অর্ধেক মাস্টারের হাতে তুলে দিয়ে বলেন—'এই বাকিগুলোও আপনার। পরে দেব আপনাকে।' বলে মাস্টারকেই একটা নতুন অঙ্ক বোঝাতে লাগেন।

'আপনাকে আর এর বেশি কিছু করতে হবে না। কেবল বাকি পাঁচজন জুরিকে নিজের মতে আনতে হবে। তা আপনি পারবেন। মাস্টারদের সবাই খাতির করে—ভক্তি করে যেমন ভয়ও করে তেমনি। আপনার পক্ষে এ-কাজ কিছুই নয়। ক্লাসে যেমন ছেলেদের পড়ান তেমনি এখানে এই বুড়ো খোকাদের একটু পড়াবেন—এই আর কি?'

'আপনি বলছেন যেমন করে হোক ওর জেলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এই তো? জেল ছাড়া আর কিছু যেন না হয় এই তো? বেশ, আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করবো। দেখি কদ্দুর কী পারা যায়।'

'তা মাস্টারমশাই ভালোই পেরেছেন দেখা যাচ্ছে।' হর্ষবর্ধন বলেন গোবর্ধনকে: 'ফাঁসিকাঠ থেকে যে করেই হোক বাঁচিয়ে দিয়েছেন ভজুকে।

আর এজন্য তোকেও বাহাদুরি দিতে হয় গোবরা! তুই কষ্ট করে এতো ত্যাগ স্বীকার করে পড়েছিলি বলেই তো!'

বলতে না বলতে মাস্টারমশাই এসে হাজির—সাফল্যের হাসি মুখে নিয়ে।

'আসুন আসুন মাস্টারমশাই! আসতে আজ্ঞা হোক!' তাঁকে দেখে হর্ষবর্ধন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন: 'নমস্কার—দণ্ডবৎ—প্রণাম! আপনার ঋণ আমরা জীবনে শুধতে পারবো না।'

মাস্টারমশাই বসলে তিনি ড্রয়ার থেকে নোটের তাড়াটা বের করে এগিয়ে দেন—'এই নিন, আপনার বাকি পাঁচ হাজার। আমাদের যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী। এই সামান্য দিয়ে আপনার মহৎ উপকারের প্রতিশোধ দেয়া যায় না।'

'না, না! এমন করে বলবেন না। কৃতজ্ঞতার মূল্য কম নয়। এ পৃথিবীতে ক-জন তা দিতে পারে?' মাস্টারমশাই বলেন: 'কথা রাখতে পেরেছি বলে আমিও কম কৃতার্থ নই হর্ষবর্ধনবাবু।'

'জুরিদের আপনার মতে আনতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল নিশ্চয়?'

'বেগ বলে বেগ! এরকম বেগ আমি জীবনে পাইনি।' তিনি জানান: 'মুশকিল হয়েছিল কোথায় জানেন? বাকি জুরিদের সবাই বিবাহিত, বৌয়ের জ্বালায় অস্থির! তাঁদের কাছে ভজহরিবাবু একজন হীরো। তাঁদের মতে ভজহরিবাবু কোনো দোষ করেননি বৌকে মেরে। তারা নিজেরাও পারলে তাই করতে চায়, কিন্তু তারা পারে না, ভজহরিবাবু পেরেছেন! তাদের চেয়ে তিনি একজন বীরপুরুষ!'

'তাই তারা বুঝি চাইছিল সে বীরের মতই মৃত্যুবরণ করুক? ফাঁসিতে লটকাক?'

'না ঠিক তা নয়, তবে আমি বৌয়ের মর্ম বুঝিনে, বিয়েই করিনি আদপে। সামান্য আয়ে নিজেরই কুলায় না, বৌকে খাওয়াবো কি? আমি দেখলাম না, এমন করতে হবে যাতে আইনের লাঠিও ভাঙে অথচ সাপও না মরে। অনেক কষ্টে দ্বীপান্তর দিতে পেরেছি মশাই! জুরিদের ঘরে গিয়ে—প্রায় তিনঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়ে তাদের বোঝালাম,...বুঝিয়ে নিজের মতে আনলাম।'

'তা নইলে তারা ফাঁসি দিয়ে দিত? নির্ঘাৎ!' গোবর্ধন প্রকাশ করে।

'না। তারা চাইছিলো বেকসুর খালাস দিতে।'

ছারপোকার মার

ছারপোকা আমি মারিনে। মারতে পারি নে। মারতে মারতে হাতব্যথা হয়ে যায় কিন্তু মেরে ওদের শেষ করা যায় না।

তাছাড়া, মারলে এমন গন্ধ ছাড়ে! বিচ্ছিরি! শহীদ হয়ে ওরা কীর্তির সৌরভ ছড়ায় এমন—আমার কীর্তি আর ওদের সৌরভ—যাতে আমাদের উভয় পক্ষকেই ঘায়েল হতে হয়।

প্রাণ দিয়ে ওরা আমাদের নাক মলে দিয়ে যায়। যা নাকি কানমলার চেয়েও খারাপ।

এই কারণেই আমি ছারপোকা কখনো মারি নে।

আমার হচ্ছে সহাবস্থান। ছারপোকাদের নিয়ে আমি ঘর করি। আত্মীয়-স্বজনের মতোই একসঙ্গে বাস করি তাদের নিয়ে।

আমার বিছানায় হাজার-হাজার ছারপোকা। লাখ-লাখও হতে পারে। এমন কি কোটি-কোটি হলেও আমি কিছু অবাক হব না।

কিন্তু তারা আমায় কিছু বলে না।

আমিও তাদের মারি নে, তারাও আমায় কামড়ায় না। অহিংসনীতির, গান্ধীবাদের উজ্জ্বল আবাদ আমার বিছানায়।

আমি করেছি কি, একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়েছি আমার বিছানায়। কম্বলের ঝুল চৌকির আধখানা পায়া অবধি গড়িয়েছে।

চৌকির ফাঁকে-ফোকরে তো ওদের অবস্থান। আমার গায়ে এসে পড়তে

হলে তাদের কম্বলের এবড়োখেবড়ো পথ ভেঙে আসতে হবে। আসতে হবে পশমের জঙ্গল ভেদ করে।

কিন্তু সেই উপশমের উপর নির্ভর না করেও আমি আর একটা কৌশল করেছি। চৌকির চারদিকে কম্বলের ঝুল-বরাবর ফিনাইলের এক পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছি। রোজ রাত্রেই শোবার আগে নিপুণ তুলির দক্ষতায় একবার করে লাগাই। তাই দিয়ে কম্বলের তলার দিকটা কেমন চটচটে হয়ে গেছে। হোকগে, তাতে আমার চটবার কোন কারণ নেই। ফিনাইলের গন্ধ, আমার ধারণা, মানুষের গায়ের চেয়ে জোরালো। সেই গন্ধের আড়ালে আমি গায়েব। আমার গন্ধ তারা পায় না। চৌকির উপরেই যে আমি তা তারা টের পায় না।

তাদের মধ্যে যারা ভাস্কো-ডি-গামা কি কলম্বাস গোছের, তারা হয়তো চৌকির তলার থেকে বেরোয়—আমার আবিষ্কার উদ্দেশে। কিন্তু ফিনাইলের বেড়া অবধি এসে ঠেকে যায় নির্ঘাত, এগুতে পারে না আর। তাদের নাকে লাগে, তারপর আরও এগুলে পায়ে লাগে, ফিনাইলের কাদায় তাদের পা এঁটে বসে যায়, চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত চটচটে কম্বলের সঙ্গে তাদের চটাচটি হয়ে যায় নিশ্চয়। বিশ্বসংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ তিতবিরক্ত হয়ে তারা ঐখানেই জবড়জং হয়ে পড়ে থাকে।

বছরের পর বছর আমার রক্ত না খেয়ে কী করে যে তারা বেঁচে আছে তাই আমার কাছে এক বিস্ময়। সেই রহস্যের আমি কিনারা পাইনি এখনও। যাকে উপোসী ছারপোকা বলে, আমার মনে হয়, সেই রকম কিছু একটা হয়ে রয়েছে তারা।

তা থাক, তারা সুখে থাক, বেঁচে থাক। তাদের আমি ভালোবাসি। তারাই আমাকে একবার যা বাঁচিয়ে দিয়েছিল—

সকালে সবে ক্ষুর নিয়ে বসেছি, আমার বন্ধু বদ্যিনাথ হন্তদন্ত হয়ে হাজির।

'পালাও পালাও, করছ কী।' বলতে বলতে আসে।

'পালাব কেন? দাড়ি কামাচ্ছি যে।'

'আরে হরেকেষ্টদা আসছে। এসে উঠবে এখানে—এই তোমার বাসায়।' সে জানায়, 'এইখানেই আস্তানা গাড়বে।'

'সস্তা না।' দাড়ি কামাতে কামাতে বলি, 'সস্তা নয় অত।'

'গতবারে যখন কলকাতায় এসেছিল, উঠেছিল আমার ওখানে। যাবার বলে গেছে 'আবার এলে তোর বাসাতেই উঠব, আর তোকে যদি বাসায় না পাই তো উঠব গিয়ে শিবুর কাছে'...। বলে সে একটু দম নেয়। তারপরে ইঞ্জিনের মতো হাঁফ ছাড়ে একখানা।

'আজ সকালে আমার এক টি-টি-আই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম

শেয়ালদায়। ইস্টিশানের প্লাটফর্মে পা দিয়েছি, দেখি কিনা, হরেকেষ্টদা ব্যাগ হাতে নামছে ট্রেন থেকে।'

'বটে ?'

'দেখেই আমি পালিয়ে এসেছি...'

'যাতে হরেকেষ্টদা বাসায় গিয়ে তোমায় না পায় ?'

'হ্যাঁ। চলে এলাম তোমার কাছেই। দিতে এলাম খবরটা। আমাকে যদি না পায় তো সটান তোমার এখানেই সে··· ।'

'আরে, আমার এখানে উঠবে কেন সে ?' আমি তাকে আশ্বস্ত করি, 'একখানা মাত্র ছোট্ট চৌকি আমার. দেখছ তো, এর মধ্যে আমার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করতে যাবে কেন ? তার কিসের অভাব ? দুশো বিঘে তার ধানের জমি, দশটা আমবাগান, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা—সে কলকাতার যে-কোনো নামকরা ভালো হোটেলে উঠতে পারে।'

'এক নম্বরের কঞ্জুস। গতবারে আমার মেসে উঠেছিল, গেস্টচার্জ দিয়ে ফতুর হয়ে গেছি। তিনটি মাস নড়বার নামটি ছিল না। যাবার সময় সর্বস্বান্ত করে গেল আমায়।'

'কি রকম ?'

'আমার শখের জিনিসগুলি নিয়ে গেল সব। ড্রেসিং টেবিলটা নিল, ডেক চেয়ারটাও ; ব্রাকেট, তার ওপরে অ্যালার্ম টাইমপিসটা অবধি। বললে খাসা হবে, এসব জিনিস পাড়াগাঁয়ের লোক চোখে দেখেনি এখনো ! শেষটায় আমার টুথব্রাশটা ধরে টানাটানি।'

'সে কী ! একজনের বুরুশ কি আরেকজন ব্যাভার করে নাকি ?'

'বললে, জুতোয় কালি দেওয়া যাবে এই দিয়ে। এমন কি, আলমারিটা ধরেও টানছিল বইপত্র-সমেত ! কিন্তু বড্ড ভারী বলে পেরে উঠল না। বলেছে পরের খেপে এসে মুটের সাহায্যে নিয়ে যাবে···'

'মোটের ওপর আলমারিটা তোমার বেঁচে গেছে। মুটের ওপরে চাপেনি।'

'আমি পালাই। এখুনি হরেকেষ্টদা ব্যাগ হাতে এসে পড়বে হয়তো।' সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

'বাড়ি যাবে এক্ষুণি ? বোসো, চা খাও।'

'বাড়ি ? আজ সারাদিন নয়। খুব গভীর রাত্রে ফিরব বাসায়। আমি ভাই এখন যাই।'

'হরেকেষ্টদার ভয়ে বাসাতেই ফিরবে না আজ ? সারাদিন থাকবে কোথায় শুনি ?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে—করে ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায়।' বলে সে আর দাঁড়ায় না।

দাড়ি কামিয়ে মুখ ধুতে-না-ধুতে হরেকেষ্টদা হাজির।

'আসুন আসুন হরেকেষ্টদা! আস্তাজ্ঞে হোক!' আমি অভ্যর্থনা করি। 'আমার কী ভাগ্যি যে আজ আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।'

'বদ্যিনাথকে বাসায় পেলাম না, তাই তোর কাছেই চলে এলাম।' ব্যাগ নামিয়ে তিনি বললেন।

'আসবেন বইকি! হাজারবার আসবেন। আপনি হলেন হরেকেষ্টদা। আমাদের গাঁয়ের মাথা। আমরা কি আপনার পর?'

'তা নয়। তবে বদ্যিনাথ ছেলেটি ভালো। তার ওখানেই উঠি। আমাকে পেলে সে ভারী খুশি হয়।'

'আমিই কি অখুশি? বসুন, চা খান। চা আনাই, জিলিপি শিঙাড়া কচুরি—কি খাবেন বলুন?

'যা ইচ্ছে আন। চা-টা খেয়ে চান করে দুটি ভাত খেয়ে বেরুব একটু। কলকেতায় এসেছি, এবার তোর এখানেই থাকব ভাবছি। বদ্যিনাথকে পেলুম না যখন...'

'তা, থাকুন না যদ্দিন খুশি। দাঁড়ান, চা-টা আনাই, পোর্টম্যানটো খুলে পয়সা বার করি। ওমা, এ কী, বাক্সর চাবি কোথায়? খুঁজে পাচ্ছি না তো। চাবিটা কোথায়! ভাঙতে হবে দেখছি বাক্সটা! চাবিওলা কোথায় পাই এখন? ভাঙতে হবে দেখছি।'

'না না, ভাঙবি কেন বাক্সটা? দুবেলা চাবিওয়ালা হেঁকে যায় রাস্তায়। চাবি করিয়ে নিলেই হবে। বেশ পোর্টম্যানটোটি! ভাঙবি কেন? আমায় দিয়ে দিস বরং। দেশে নিয়ে যাব!'

শুনে আমি হাঁ হয়ে যাই। নিজের চাবি নিজেই সারিয়ে ভাল করলাম কিনা খতিয়ে দেখি।

'এখন ক টাকার দরকার তোর বল না? দিচ্ছি না-হয়!'

'গোটা পাঁচেক দাও তাহলে।'

'পাঁচ টাকা?' ব্যাগ খুলে তিনি বলেন, 'পাঁচ টাকা তো নেই রে, দশ টাকার নোট আছে।'

'তাই দাও তাহলে। পরে বাক্স খুলে দেব'খন তোমায়।'

হরেকেষ্টদার পয়সায় চা কচুরি শিঙাড়া জিলিপি জিবেগজা রাজভোগ দরবেশ বসানো যায় বেশ মজা করে।

দুপুরের আহার সেরে হরেকেষ্টদা বললেন, 'যাই, এবার একটু বদ্যিনাথের বাসা থেকে ঘুরে আসি। সে আমাকে একটা আলমারি দেবে বলেছিল। আধুনিক ডিজাইনের আলমারিটা! দেখতে খাসা। তার ওপরে রবিঠাকুরের বই ঠাসা। আমাকে উপহার দিতে চেয়েছিল বদ্যিনাথ। মুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে আসি গে।'

সেই যে বেরিয়ে গেলেন হরেকেষ্টদা, ফিরলেন সেই রাত দশটায়।

হায় হায় করতে করতে এলেন—'কোথায় গেছে বদ্যিনাথটা সারাদিন দেখা নেই। বাসার লোক বলল সকালে বেরিয়েছে, কিন্তু এই রাত সাড়ে-দশটা অপেক্ষা করে···করে···করে'

'এতক্ষণ বদ্যিনাথের বাসাতেই ছিলেন তাহলে ?'

'না, বাসায় থাকব কোথায় ? ওর ঘরে তো চাবি বন্ধ। কার ঘরে থাকতে দেবে ? বাসার সামনের একটা চায়ের দোকানে বসে বসে এতক্ষণ কাটালাম।···'

'সেই দুপুরবেলার থেকে এতক্ষণ !'

'শুধু শুধু কি বসতে দেয় ? বসে বসে চা খেতে হল। তিনশো কাপ চা খেয়েছি। এনতার খেলাম। খান পঞ্চাশেক টোসট। আড়াই ডজন অমলেট। সব বদ্যিনাথের অ্যাকাউণ্টে। খেয়েছি আর নজর রেখেছি বাসার দরজায়, কখন সে ফেরে। কিন্তু নাঃ, এতক্ষণেও ফিরল না।··'

'তাহলে আর কী করবেন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন এবার।'

'না। কিছু খাব না। যা খেয়েছি তাতেই অম্বল হয়ে গেছে। তিনশো কাপ চা···বাপ. জীবনে কখনো খাইনি।...না, কিছু আর খাব না। শুয়ে পড়ব সটান। মেজেয় আমার বিছানা করে দে। আছে তোর বাড়তি বিছানা ? আমি তো বেডিং-ফেডিং কিছু আনিনি। বদ্যিনাথের বাসায় উঠব ঠিক ছিল। এই মেজেয়···এইখেনেয়···মাদুর-টাদুর যা হোক কিছু পেতে দে না হয়।'

'তুমি মেজেয় শোবে ? তুমি বলছ কী হরেকেষ্টদা ? অমন কথা মুখে এনো না, পাপ হবে আমার। তুমি আমার চৌকিতেই শোবে। আমি ঐ কম্বলটা বিছিয়ে শোব'খন মেজেয়···'

বলে আমি ফিনাইল-লাঞ্ছিত কম্লটা বিছানার থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে বিছোই। আর চৌকিতে তোশকের ওপর ধবধবে চাদর পেড়ে হরেকেষ্টদার জন্যে পরিপাটি বিছানা করে দিই।

হরেকেষ্টদা শুয়ে পড়েন। আমিও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি।

শুতে না-শুতে হরেকেষ্টদার নাক ডাকতে থাকে।

রাত বোধ হয় বারোটা হবে তখন, দারুণ একটা চটপটে আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

কী ব্যাপার ? হরেকেষ্টদার নাক আর ডাকছে না ! খালি মাঝে মাঝে চটাস চট চটাস চট···চটাপট চটাপট চটাপট চটাপট···শুনতে পাচ্ছি কেবল।

'ওরে, ওরে শিবু ! আলোটা জ্বাল তো।'

'আলো জ্বালা যাবে না হরেকেষ্টদা। এগারটার পর মেন সুইচ অফ করে দেয়।'

'কি কামড়াচ্ছে রে ? ভয়ঙ্কর কামড়াচ্ছে। দেশলাই আছে তোর ?'

'দেশলাই কোথায় পাব দাদা ? আমি কি সিগ্রেট খাই ?'

'তাহলে মোমবাতি ?'

'বাজারে।'

'কী সর্বনাশ ! টর্চ আছে ? টর্চ ?'

'রাতে দুপুরে কেন এই টর্চারি করছেন হরেকেষ্টদা ? চুপচাপ ঘুমোন !'

'ঘুমোব কী রে ? জ্বালিয়ে খাচ্ছে যে ! বাঁ পাশটা যে জ্বলে গেল রে—বাঁ পাশে শুয়েছিলাম···পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত জ্বলছে।—'

'পাশ ফিরে শোন।'

'পাশ ফিরে শোব কী রে ? শুতে কি দিচ্ছে ? উঠে বসেছি। বসতেও দিচ্ছে না। ভীষণ কামড়াচ্ছে রে ?'

'কে জানে !' আমি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলি : 'কি আবার কামড়াবে ?'

'এ তো দেখছি খুন করে ফেলবে আমায়। একদম তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। কী পুষেছিস তুই, তুই জানিস। ছারপোকা নয় তো রে ?'

'ছারপোকা ? অসম্ভব। আমি অ্যাদ্দিন ধরে শুচ্ছি, আমি কি তাহলে আর টের পেতুম না।'

'তুই একটা কুম্ভকর্ণ। নাঃ, বিছানায় কাজ নেই আমার। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই।'

তিনি বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকলেন ঠায়।

সকালে আমরা উঠে দেখি—আমি উঠে দেখলাম, তিনি তো আগের থেকেই উঠেছিলেন, তিনি শুধু দেখলেন কেবল—চৌকির ওপর হাজার হাজার মৃতদেহ। ছারপোকার। হরেকেষ্টদার চাপে আর চটাপট চাপড়ে ছারপোকাদের ধ্বংসাবশেষ।

'ইস, তুই এখানে থাকিস কি করে রে ? এই বিছানায় ঘুমোস কি করে ? তুই একটা রাসকেল। রাবিশ-কুম্ভকর্ণ। নাঃ, আর আমি এখানে নেই। মা কালীর দিব্যি, আর কখনো এখানে আসছি না বাবা ! আমার নাকে খত। বদ্যিনাথের বাসাতেই আমি থাকব। সেখানেই চললাম। সকাল সকাল গিয়ে পাকড়াই তাকে।' বলেই তিনি আর দাঁড়ালেন না। ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লেন, তাঁর ধার দেওয়া দশ টাকার উদ্ধারের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে।

কল্কে কাশির কাণ্ড

প্রফুল্ল গোড়া থেকেই গোমড়া মেরে আছে। হ্যাঁ, ভারি তো কাজ। তার জন্যে আবার কল্কে-কাশিকে তার ল্যাজে বেঁধে দেওয়া। হোন না গে তিনি নামজাদা এক ডিটেকটিভ (প্রফুল্ল শুনেছিল কোরিয়া অঞ্চলে এই কল্কে-কাশির ন্যায় এত বড় গোয়েন্দা নাকি আর নেই)! তবু এই সামান্য একটা মশা-মারার ব্যাপারে অমন ভারি কামান কাঁধে বয়ে আনতে প্রফুল্লর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সত্যি, কামস্কাটকা থেকে উনি না এলেও এমন কিছু আটকাত না।

বোম্বের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁর এক কোণের টেবিলে কল্কে-কাশির মুখোমুখি বসে গুম হয়ে এইসব কথাই ভাবছিল প্রফুল্ল। সামনে চপ-কাটলেট-ডিভিল-ডিম-কেক-পুডিং-এর সমারোহ সত্ত্বেও তার জিভ সরছিল না! বাস্তবিক, এই মূর্তিমান কোরিয়ার সম্মুখে কি করিয়া কিছু মুখে তোলার উৎসাহ হয়। এত বড় অপমান হজম করবার পর খেতে কারু রুচি থাকে? প্রফুল্ল তাই বিষণ্ণ।

কিন্তু মিঃ কল্কে-কাশি বেপরোয়া। ডিশের পর ডিশ তিনি সাবড়ে চলেছেন—কাঁটা চামচের কামাই নেই তাঁর। এক ফাঁকে সামনের যুবকটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। একি! কল্কে-কাশি একটু বিস্মিতই হন। একজন খুনে একটার পর একটা দশটা খুন করেছে, নিজের চোখেই এরকম দৃশ্য তাঁর জীবনে একাধিক বার তিনি দেখেছেন কিন্তু বিস্মিত হতে পারেননি। কিন্তু এক ভদ্রলোক দশ দশটা প্লেটের সামনে একদম নির্বিকার! একেবারে ঠুঁটো

জগন্নাথটি হয়ে বসে আছেন, একটাকেও কাবু করতে পারছেন না। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন-স্মৃতির মধ্যে এবম্বিধ কাণ্ড তাঁর স্মরণে পড়ে না।

বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে! কল্কে-কাশির বিরাট বপু-পরিধির তুমুল আন্দোলন (অবশ্য খাবার সময়েই যেটা সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়) অকস্মাৎ থেমে যায়; মাছের চোখের মতন ড্যাবডেবে চোখ প্রসারিত হয় ঈষৎ। তিনি প্রশ্ন করেন, 'প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্লতর হবার পক্ষে কী বাধা হচ্ছে, জানতে পারি কি?'

বাংলাতেই প্রশ্ন করেন। সোজা পরিষ্কার বাংলাতেই। কামস্কাটকার লোক হলে কী হবে! বাংলা, হিন্দি, উড়ে (এবং কোন-কোন জানোয়ারের ভাষাও) কল্কে-কাশির ভালভাবেই আয়ত্ত। তবে কামস্কাটকার ভাষায় তাঁর দখল আছে কি না বলা যায় না। এ বিষয়ে প্রফুল্লর সন্দেহ থাকলেও পরীক্ষক হবার সাহস তার নেই। কেননা সে নিজেও কামস্কাশিয়ানে অজ্ঞ, দারুণ অজ্ঞই।

প্রফুল্ল আরও বেশি গম্ভীর হয়ে যায়; মাথা চুলকোতে চুলকোতে জবাব দেয়, 'ভাবনায় মশাই, ভাবনায়! কীরকম গুরুদায়িত্ব মাথার ওপরে, বুঝতেই তো পারছেন।'

'বুঝতে পারছি বইকি।' কল্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, 'মিস্টার ব্যানার্জির কবে এসে ভারতবর্ষে পৌঁছবার কথা! অথচ তিনি কি-এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিলেতে আটকে গেছেন। আসতে পারলেন না। আর তাঁর সই করা নমিনেশন পেপার এয়ার মেলে কাল বিকেলে বোম্বে পৌঁছেছে; তাঁর অ্যাটর্নি গলস্টোন কোম্পানির আপিসের জিম্মায় আছে। সেই নমিনেশন-পেপার আজই সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ছুটতে হবে আমাদের। তবে আঠারো তারিখের আগে সেই নমিনেশন পেপার যথাস্থলে ফাইল হতে পারবে। আঠারোই হচ্ছে ফাইলিং-এর শেষ দিন। তা না হলে মিস্টার ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হলো না।'

'বিলেতে মিস্টার ব্যানার্জির আকস্মিক দুর্ঘটনার মূলে কি কোনও রহস্যজনক কারণ আছে বলে আপনি আশঙ্কা করেন?' প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করে।

কল্কে-কাশি এর জবাব দেন না। 'এই নমিনেশন পেপার ডাকে পাঠানো নিরাপদ নয়। কোন কারণে একদিন কিংবা কয়েক ঘণ্টা লেট হলেই সব কিছু পণ্ড—তার চেয়েও বড় আশঙ্কা হচ্ছে নমিনেশন পেপার মারা যাবার।'

'মারা যাবার?' প্রফুল্লর চোখ প্রকাণ্ড হয়, 'কেন, নমিনেশন পেপার মেরে কার কী লাভ? ওটা কি একটা মার্তব্য জিনিস?'

'হ্যাঁ, ডাকে পাঠালে, এমন কি রেজেস্ট্রি করে ইনসিওর করে পাঠালেও যথাস্থানে যথাসময়ে যথাযথ জিনিসটা পৌঁছবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কার কী লাভ আপনি জিজ্ঞেস করছেন? বাংলাদেশে দুটি দল আছে জানেন আপনি?'

'উঁহু', প্রফুল্ল বলে, 'জানি না তো!'

'এই দুটি দলই কাউন্সিলে ঢুকতে চায়। দু-দলে ভয়ানক রেষারেষি। কাউন্সিলে যে-দল ভারি হতে পারবে তাদেরই সারা বাংলায় আধিপত্য হবে কিনা! একটি দলের নাম হচ্ছে ফ্লু-ফ্লুকস ফ্যান; যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে,

রোগে ধ্যাকে, আর ফ্যানের তলায় হাওয়া খায় তারাই মিলে এই দল গড়েছে ; আমেরিকার বিখ্যাত ক্লু-ক্লুক্সস-ক্ল্যানের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই, একমাত্র নামের কতকটা সাদৃশ্য ছাড়া।'

'বটে ?' প্রফুল্লর নিঃশ্বাস পড়ে কি-পড়ে না। – 'আরেকটা দল কারা ?'

'মিস্টার ব্যানার্জি হচ্ছেন এই 'ক্লু-ক্লুকস-ফ্যানে'র পাণ্ডা। অন্য দলের নাম হচ্ছে 'বাই হুক আর ক্রুক'। এই বাই হুক আর ক্রুক-পার্টির নেতা হচ্ছেন মিস্টার সরকার। যেমন করেই হোক নিজের মতলব হাসিল করতে এঁরা সিদ্ধহস্ত !'

'আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সরকারি চালে মিস্টার ব্যানার্জি বিলেতে আটকা পড়েছেন ?'

'আপাতত আমি ঐ কোণের লোকটার দিকে।তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।' কল্কে-কাশি চোখ টিপে ইশারা করেন।

এতক্ষণে কল্কে-কাশির ওপরে প্রফুল্লর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। সত্যি, অনেক কিছু খবর রাখেন তো ভদ্রলোক ! এইজন্যে তাঁর দিক থেকে সহসা 'তুমি' সম্বোধনেও সে অপ্রসন্ন হতে পারে না। কল্কে-কাশির ইঙ্গিতের অনুসরণ করে সে তাকায়।

'ঐ যে—ঐ কাটখোট্টা গোছের চেহারা, মাথার চুল ক্রপ-করা, চোখে কুটিল ভঙ্গি, ঐ কোণের ছোট্ট টেবিলটায় বসে কাটলেটের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, ওকে লক্ষ্য কর। সহজেই বুঝতে পারবে, এরকম ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁয় গতিবিধি ওর স্বভাবসিদ্ধ নয়, কাঁটা চামচের কসরতে এখনো পোক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। খাদ্যের সঙ্গে কাটাকাটি নয়, হাতাহাতিতেই ও পরিপক্ব। ও এখানে এসেছে তোমার অনুসরণ করে।'

'আমার ?' প্রফুল্লর বিশ্বাস হয় না, 'তার মানে ?'

'একটু কায়দা করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, চোখ কাটলেটের দিকে থাকলেও ঝোঁক ওর আমাদের দিকেই। কলকাতার একটি বিখ্যাত চীজ উনি—ওর মতন কৌশলী আর ভয়লেশহীন ভদ্রবেশী গুণ্ডা দুটি আছে কিনা সন্দেহ। ওই শ্রেণীর ক্রিমিনাল ব্রেনের আমেরিকায় জোড়া মিলতে পারে, কিন্তু এদেশে দুর্লভ। মিস্টার ব্যানার্জি'র পার্টি আমাকে যে তোমার সঙ্গে দিয়েছেন, উনিই হচ্ছেন তার একমাত্র কারণ।'

প্রফুল্লর সহজে বাক্যস্ফূর্তি হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে বলে 'ওর নাম ?'

'ওর নাম হচ্ছে সমাদ্দার, ওরফে সমরেশ ঠাকুর, ওরফে গোপাল হাজরা, ওরফে নটেশ্বর রায়, ওরফে পোড়া গণেশ, ওরফে আরো এক ডজন। প্রেসিডেন্সি জেল আর হরিণবাড়ির ফেরতা। আমার সঙ্গে ওর অনেকদিনের পরিচয়,—অনেকটা হৃদ্যতার সম্বন্ধই বলতে পার। এই কারণে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে ও একটু সংকোচ বোধ করছে, নইলে এতক্ষণে তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না।'

প্রফুল্ল চমকে ওঠে, 'বলেন কি মশাই ?'

'ওই রকমই।' কল্কে-কাশি যৎসামান্যই হাসেন। 'সরকারের দল ওকে

লাগিয়েছে তোমার পেছনে, ব্যানার্জির নমিনেশন পেপার নিয়ে তুমি যথাসময়ের আগে যথাস্থানে যাতে পৌঁছতে না পার সেইজন্যেই। এজন্যে তোমাকে খুন করতেও ও পেছপা হবে না। তবে কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেই ও ভালবাসে—খুনোখুনি করার ততটা পক্ষপাতী নয়। এ বিষয়ে একটু সুরুচিই আছে বলতে হয় লোকটার!'

প্রফুল্ল আশ্বস্ত হতে পারে না, 'আপনি কেন ওকে অ্যারেস্ট করছেন না তাহলে? গ্রেপ্তার করে ফেলুন! এক্ষুনি—এই দণ্ডে!'

'দণ্ডমুণ্ডের মালিক কি আমি? তাছাড়া, এখন পর্যন্ত ও কোন অপরাধ করেনি, কেবল মনের মধ্যে এঁচেছে মাত্র; আর মনে-আঁচার জন্যেই যদি গ্রেপ্তার করা শুরু করতে হয় তাহলে অ্যাতো লোককে ধরতে হয় যে জেলখানায় তার জায়গা কুলোবে কি না সন্দেহ। কেবল মনের মধ্যকার প্ল্যানের জন্যে কাউকে তো জেলে পোরা যায় না।'

'তাহলে, তাহলে তো ভারি মুশকিল!' প্রফুল্ল ভীতই হয়; বলে, 'আমাকে খুন করে ফেলবে তবে?'

'যদি করেই ফেলে, তখন—হ্যাঁ, তখন ওকে ধরে ফেলতে আমার বিলম্ব হবে না, যদি নিতান্তই না পালিয়ে যায়। তবে, সমাদ্দারের সঙ্গে আমার হৃদ্যতারই সম্পর্ক। আমাকে দেখে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তোমাকে একেবারে খতম করবে না আমি আশা করি। এত ভয় কিসের তোমার?'

বিশেষ ভরসাও পায় না প্রফুল্ল।

'এইজন্যেই বলেছিলাম ভয়ানক গুরুদায়িত্ব তোমার মাথায়। যদি নমিনেশন পেপার নিয়ে আঠারোই এগারোটার মধ্যে কলকাতায় না পৌঁছতে পারো তাহলে ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হল না, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর পার্টিরও দফা রফা। মিঃ সরকারের দলেরই একচ্ছত্র আধিপত্য হবে কাউন্সিলে, মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও দখল করে বসবেন তাঁরাই। সামান্য একখানা সই করা কাগজের ওপরে একটা পার্টির কতখানি নির্ভর করছে ভেবে দ্যাখো। এবং, যে-সে পার্টি নয়, ফ্লু-ফ্লুকস-ফ্যান!'

'অর্থাৎ আপনার ভাষায় যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খ্যালে—ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো এদের দলের কেউ নই, বিন্দুবিসর্গও জানি না, আমাকে এই মারাত্মক কাজে পাঠাবার মানে?' প্রফুল্ল বিরক্তি প্রকাশ না করে পারে না।

'তার মানে, তুমি যে-আপিসের কেরানি তার বড়কর্তা ঐ দলের একজন হোমরা-চোমরা। তিনি তো ফ্যানের হাওয়া খান, তাহলেই হল। এসব কাজে অজ্ঞ এবং আনাড়িকে পাঠানোই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত, নাড়িজ্ঞানওয়ালা লোক অনায়াসেই অন্য দলের ঘুস খেয়ে—বুঝতেই পারছ! তাছাড়া, ওদের বিশ্বাস আছে তোমার ওপর। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ তোমার ওপরে দেওয়ায় তার প্রমাণ হয় না কি?'

'আমার গায়েও যথেষ্ট জোর!' প্রফুল্ল কোটের হাতা তুলে মাস্‌ল্‌

কণ্ট্রোল করে কল্কে-কাশিকে দেখায়, 'সহজে যে কেউ আমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবে তা প্রাণ থাকতে নয় !'

'এস, সমাদ্দারের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই'—কল্কে-কাশি প্রফুল্লকে আহ্বান করেন, 'কী ছুতোয় যে গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাবে তাই ভেবে কাহিল হয়ে উঠেছে বেচারা !'

'ওর সঙ্গে আলাপ ?' দারুণ বিস্মিত হয় প্রফুল্ল, 'বলেন কি আপনি ?'

'ক্ষতি কী তাতে ? গিলে ফেলবে না তোমায়।' কল্কে-কাশি প্রফুল্লকে টেনে নিয়েই চলেন, 'এই যে সমাদ্দার ! অনেক দিন পরে দেখা, কেমন, ভাল আছ তো বেশ ?'

সমাদ্দার চমকে ওঠে, 'মিস্টার কল্কে-কাশি যে ! এখানে এখন এইভাবে আপনাকে দেখতে পাব আমি আশা করিনি।'

'আমি কিন্তু আশা করেছিলুম, পরশু সন্ধ্যার আমাদের সঙ্গে একই বোম্বে মেলে যখন উঠতে দেখলাম তোমাকে।'

'বটে ?' সমাদ্দার যেন একটু অপ্রস্তুত হয়, 'আপনারাও তাহলে আজ সকালেই বোম্বে এসে পৌঁছেছেন ? উনি আপনার বন্ধু বুঝি ?'

'হ্যাঁ এই একটু আগে নেমেই এই রেস্তোরাঁতেই প্রাতরাশের চেষ্টা করছিলাম। এমন সময়ে—হ্যাঁ, কী জিজ্ঞেস করছিলে ? ইনি ? ইনি হচ্ছেন প্রফুল্লকুমার রায়, কেন যে এঁর বোম্বে আগমন তা তো তোমার ভালমতই জানা আছে ভাই সমাদ্দার !'

'আমার ?' সমাদ্দার থতমত খায়, 'না তো ! আমি কি করে জানব ? তবে, ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলে বিশেষ আপ্যায়িত হব অবশ্যই।'

'তা তো হবেই। হবার কথাই। বেশ, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু প্রফুল্লবাবু আর ইনি হচ্ছেন সমাদ্দার, আমার বন্ধু। অন্তত আমার শত্রু নন। এঁর পরিচয় তো টেবিলে বসেই তোমাকে দিয়েছি। প্রফুল্লবাবু কলকাতার এক সদাগরি আপিসে চাকরি করেন। প্রফুল্ল, তুমি সমাদ্দারমশাইকে নমস্কার করলে না ? প্রথম পরিচয়ে নমস্কার করাই তো ভদ্র রীতি।'

প্রফুল্ল এবং সমাদ্দার বোকার মতো পরস্পরকে প্রতিনমস্কার করে। 'সুখী হলাম, প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আলাপিত হয়ে।' সমাদ্দার জানাল।

'হবেই তো।' কল্কে-কাশি যোগ করেন, 'নিশ্চয় ! এইজন্যেই কি কলকাতা থেকে এতটা পথ কষ্ট করে তোমাকে আসতে হয়নি ? বলো ! ভাগ্যিস আমি ছিলাম এখানে ! বন্ধু-বান্ধবের উপকার করতে কখনই আমি পেছপা নই বলেই তোমাদের আলাপ করিয়ে দিলাম।'

'সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ কল্কে-কাশি !' সমাদ্দার বিস্ময়ের ভান করে, 'কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি বলছ ?' কল্কে-কাশি আকাশ থেকে পড়েন, 'আমার সঙ্গে তুমি জোচ্চুরি করবে একথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

'সত্যি, আপনার কথার কিছু আমি বুঝতে পারছি না। এখানকার একটা ফিল্ম স্টুডিওয় চাকরির চেষ্টাতেই আমার বোম্বে আসা।'

'তাই নাকি? তবুও তোমাকে বলে রাখছি, যদি তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমার কথাগুলো কাজে লাগবে। এখান থেকে প্রফুল্লবাবু যাবেন গলস্টোন কোম্পানির অফিসে, সেখানে তাঁর কী যেন কাজ আছে। আমি অবশ্য ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি না। আরেকটা জরুরি খবর, আমরা উঠেছি তাজমহল হোটেলে। তারপর, আজ রাত্রের গাড়িতেই আমরা ফিরছি কলকাতায়। আচ্ছা, এখন আসা যাক, হোটেলেই আমাদের আবার সাক্ষাৎ হচ্ছে আশা করি?'

হতভম্ব সমাদ্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে বেরিয়ে আসে। প্রফুল্ল অসন্তোষ প্রকাশ করে, 'মিস্টার কল্কে-কাশি! আপনি একজন বড় গোয়েন্দা হতে পারেন—'

'উঁহু উঁহু! আদৌ না! এই বরাতের জোরেই যা করে খাচ্ছি ভাই!'

'কিন্তু আপনি কি অনেক গুপ্ত সংবাদ ওকে দিয়ে দিলেন না?'

'কাকে? সমাদ্দারকে?' কল্কে-কাশি অবাক হন, 'কী রকম?'

'এই—আমার গলস্টোন অফিসে যাবার খবর? এবং তাজমহল হোটেলে আমাদের ওঠার কথা? তারপর আজ রাত্রের কলকাতা-মেলে ফেরা—'

'কেন, কী হয়েছে তাতে? ওর কত কষ্ট লাঘব হয়ে গেল! বেচারাকে এসব খুঁজে বের করতে আর হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।'

'সেটা কি ভাল হল খুব?' প্রফুল্ল বিরক্তি চাপতে পারে না।

'আহা, বুঝতে পারছ না? যতই ওকে কম হাঙ্গামা পোহাতে হবে, ততই বেশি ও ভাববার সময় পাবে। আর, যতই ও ভাবতে পাবে ততই নিজের কাজ মাটি করবে, সব ওর গুবলেট হয়ে যাবে, তা জান?'

অতঃপর প্রফুল্ল কল্কে-কাশির কাছে বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে। একটু পরেই আরেকখানা ট্যাক্সি প্রফুল্লর গাড়ির পিছু নেয়—এই ট্যাক্সি সমাদ্দারের। পরমুহূর্তেই আরো একখানা গাড়ি দূর থেকে দু-জনের অনুসরণ করে চলে—এ গাড়িতে আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীযুক্ত কল্কে-কাশি মহাশয়।

তিনখানি গাড়িই অনেক ঘুরে-ফিরে শহরের উপকণ্ঠে এসে হাজির হয়। চারধারে বাগান ঘেরা প্রকাণ্ড এক বাড়ির ফটকে। গলস্টোন কোম্পানির বড়সাহেবের রেসিডেন্স। প্রফুল্লর গাড়ি ফটকের ভেতরে ঢোকে। একটু দূরে সমাদ্দারের গাড়ি থামে—কল্কে-কাশির গাড়ি দ্বিতীয় গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ যেন থেমে যায়।

'সমাদ্দার মশাইকে এখানে এ অবস্থায় দেখব আশা করতে পারিনি!' কল্কে-কাশি বলেন। তাঁর মুচকি হাসিটিও লক্ষ্য করবার।

'এই, একটু শহর দেখতেই বেরিয়েছি।' সমাদ্দার থতমত খায়, 'হাওয়া খেতেও বটে!'

'শহর দেখতে শহরের বাইরে? মন্দ নয়! ফিলম অভিনেতার কাজটা তোমার পাকা তাহলে?' কল্কে-কাশি গলা পরিষ্কার করেন, 'আমিও তাই-ই আঁচ করছিলাম, যাচাই করে নিতেই এতদূর এলাম। যাক, আমার কাজ আছে। শহরেই ফিরলাম আমি।' তারপর একটু থামেন, 'হ্যাঁ, হয়ত তোমার জানাই

আছে, তবু খবরটা তোমাকে দিয়ে রাখাই ভাল! ঐ বাড়িটাই মিঃ গলস্টোনের—পার্টি'র নমিনেশনের কাগজপত্র আনতে প্রফুল্লবাবু ওখানেই গেছেন। দ্যাখো চেষ্টা করে—যদি তোমার বরাত খুলে যায়। বন্ধু-বান্ধবের ভাল চাওয়াই আমার দস্তুর, জানোই তো।'

কল্কে-কাশি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নেন। যে পথে এসেছিলেন সেইদিকেই ফিরে চলেন। সমাদ্দার কোন জবাব দিতে পারে না।

তারপরেও আরেক ঘণ্টা সমাদ্দারকে অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে প্রফুল্লর গাড়ি বাইরে বেরোয়। সমাদ্দারের আবার অনুসরণ। প্রফুল্লর ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় তাজমহল হোটেলের সামনে। সমাদ্দারেরও। প্রফুল্ল নেমেই ট্যাক্সিওয়ালার পাওনা চুকিয়ে সটান নিজের তেরো নম্বর ঘরে ঢুকেই খিল আঁটে। ম্যানেজারের সঙ্গে কিসের যেন বন্দোবস্ত করে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কল্কে-কাশির অভ্যুদয় হতেই প্রফুল্ল রুদ্ধনিঃশ্বাসে ছুটে যায়—'সর্বনাশ হয়েছে, মিঃ কল্কে-কাশি!'

কল্কে-কাশি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না—'কী সর্বনাশ?'

'সমাদ্দার এসে উঠেছে এখানে! আমাদের পাশের বারো নম্বর ঘরে!'

'তাই নাকি? তাহলে তো ওকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করতে হচ্ছে! আমিও ওর শুভাগমন আশা করছিলাম।'

কল্কে-কাশি রসিকতা করছেন প্রথমটা প্রফুল্ল তাই ভেবেছিল, কিন্তু সত্যিই ডিনারের টেবিলে সমাদ্দারের পাশে বসে নিজের চক্ষু-কর্ণকে ওর বিশ্বাস করতে হল। ওর চিরকালের ধারণা, গোয়েন্দায় আর দুশমনে মুখোমুখি হলেই ঝটাপটি বেধে যায়; শেষোক্তরা স্বভাবতই পলায়ন-তৎপর এবং প্রথমোক্তরা সর্বদাই ওদের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যতিব্যস্ত। মাসিক পত্রের পাতায় আর গোয়েন্দা-গ্রন্থমালার বইয়ে পড়ে পড়ে এই রকমের একটা বিশ্বাস ওর বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু এখন ওদের পরস্পরকে অন্তরঙ্গের মত কথাবার্তা কইতে দেখে তার সে-ধারণা দস্তুরমতই টলে গেল।

মধ্যাহ্নভোজ প্রফুল্লর মাথায় উঠে গেল, সে মাঝে মাঝে তার কোটের বুকপকেটে হাত দিয়ে গুরুতর বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগল। যে-কাগজের টুকরোটির ওপর একটা পার্টি'র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাকে সে যত্নের সঙ্গে কোটের ভেতরের লাইনিঙের মধ্যে সেলাই করে রেখেছে। গলস্টোণ সাহেবের সেই বাড়িতে বসেই। জিনিসটার সেখান থেকে অকস্মাৎ উবে যাবার কথা নয় কিছুতেই, তবু সাক্ষাৎ সমাদ্দার ওরফে উপেন্দ্রনাথের সমীপে বসে বারবার পরীক্ষার দ্বারা সে নিজেকেই যেন ভরসা দিতে চাচ্ছিল।

ওর হস্তচালনা কল্কে-কাশির নজর এড়িয়ে যায় না। তিনি হাসতে থাকেন, 'ভয় নেই প্রফুল্লবাবু, বস্তুটি নিরাপদেই আছে, এবং থাকবেও, যদি না নিতান্তই তোমার কোট তুমি খোয়াও।'

কল্কে-কাশির কথায় প্রফুল্লর ভারি রাগ হয়, তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। কল্কে-কাশি তা বুঝতে পারেন।

'আমি কি কোন গুপ্তকথা ফাঁস করে দিলাম নাকি? মোটেই না, প্রফুল্লবাবু! সমাদ্দার জানত যে কোথায় তুমি নমিনেশন পেপারটা রেখেছ। কিহে সমাদ্দার, জানতে না?'

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে—'নিশ্চয়! কোটের লাইনিং, ঐখানেই তো রাখবার জায়গা। দরকারী জিনিস সকলে ঐখানেই রাখে আর সেটা সকলেই জানে।'

গোয়েন্দা এবং বদমাইস দু-জনে মিলে অকপটে হাসতে থাকে। প্রফুল্ল ভারি মুশড়ে পড়ে। হতে পারে কোটের লাইনিংই মূল্যবান কাগজ-পত্র রাখবার মামুলি জায়গা এবং তা সকলেই জানে, তবু কী দরকার ছিল মিস্টার কল্কে-কাশির সমাদ্দারকে এই খবরটা দেবার? বরং যাতে সমাদ্দারের মনে এরূপ সন্দেহ না জাগে বা জেগে থাকলেও তা দূর হয় সে চেষ্টা করাই কি তাঁর উচিত ছিল না? কল্কে-কাশির গোয়েন্দাপনায় সে ঘাবড়ে যায় সত্যিই!

যাক, প্রফুল্লর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই। যতক্ষণ সে জেগে আছে ততক্ষণ তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া কারো ক্ষমতার বাইরে—এবং রাত্রে, রেলগাড়িতে, হয় সে গা থেকে কোট খুলবেই না, আর খোলেও যদি, তাহলে বালিশের মতই সেটাকে ব্যবহার করবে, সে ঠিক করে রাখল। তার ঘুম ভারি সজাগ, তার মাথার তলার থেকে কোট সরায় কার সাধ্য?

খাওয়া শেষ হলে কল্কে-কাশি বলেন—'এস সমাদ্দার, একটু দাবা খেলা যাক। প্রফুল্ল, জানো নাকি দাবা খেলা?'

'জানি সামান্যই।' প্রফুল্ল মুখ গোঁজ করে বলে।

'আমার আপত্তি নেই।' সমাদ্দার উত্তর দেয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা বেশ জমে ওঠে। কল্কে-কাশি আর সমাদ্দারের তো ভালই জানা আছে; প্রফুল্লও নেহাত কম যায় না। ক্রমশই ওর উৎসাহ বাড়তে থাকে, সমাদ্দারের চাল কেড়ে নিয়ে নিজে চাল দেয়। প্রফুল্ল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ওর গরম বোধ হয়, সে কোট খুলে ফ্যালে, সমাদ্দারের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওর কোনো হুঁশই নেই তখন। সমাদ্দারও নিজের কোট খোলে এবং প্রফুল্লর কোটের পাশেই রাখে। খেলা চলতে থাকে।

খানিক বাদে সমাদ্দার উঠে পড়ে, 'প্রফুল্লবাবু, আপনি ততক্ষণ মিস্টার কল্কে-কাশির সঙ্গে খেলুন। আমি এক্ষুনি আসছি।'

একটু পরেই সমাদ্দার ফিরে আসে—'প্রফুল্লবাবু, ভুল করে নিজের কোট ফেলে আপনার কোট নিয়ে গেছি কিছু মনে করবেন না!' কোট খুলতে খুলতে সে বলে।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে নিজের কোট কেড়ে নেয়। যেখানে নমিনেশন পেপার ছিল সেখানটা অনুভব করে। পরমুহূর্তেই সে সমাদ্দারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। কল্কে-কাশি মাঝে পড়ে বাধা না দিলে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বদমাশটাকে এই দণ্ডেই সে টুঁটি টিপে খুন করেই বসত হয়ত বা!

'প্রফুল্লবাবু, করছ কী? কী ব্যাপার?'

'ওই চোর—'

'আহা, গালাগালি কেন? কী হয়েছে শুনি না?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না? এই লোকটা এইমাত্র আমার কোট থেকে নমিনেশন চুরি করেছে।'

কক্কে-কাশি তেমনই অবিচলিত থাকেন, 'তাই নাকি হে সমাদ্দার? তাই নাকি?'

'প্রফুল্লবাবু তো সেইরকমই ভাবছেন।' সমাদ্দার বলে, 'কিন্তু আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কখন যে তা করলুম!'

সমাদ্দার উচ্চহাস্য করে, কক্কে-কাশিও হাসতে থাকেন। প্রফুল্ল রেগে আগুন হয়ে ওঠে, কিন্তু একলা সে কী করবে? আপনমনেই জ্বলতে থাকে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার কেমন কেমন ঠ্যাকে যেন! সমাদ্দার ও কক্কে-কাশির মধ্যে যেরকম অন্তরঙ্গতা, তাতে ওর মনে নিদারুণ সন্দেহ হতে থাকে। ওরা দুজনে মাসতুতো ভাই নয় তো?

'তুমি যদি এখুনি আমার কাগজ না ফিরিয়ে দাও, তোমার হাড় ভেঙে আমি ছাতু করব!' প্রফুল্ল ঘুসি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়।

'আহা, হচ্ছে কী এসব! মারামারি করাটা কি ভদ্রলোকের কাজ?' কক্কে-কাশি ওকে সামলাতে যান।

'আপনি থামুন মশাই! আপনারা দুজনেই এক গোত্র! আমি বেশ বুঝেছি! গোড়াতেই ধরতে পেরেছিলাম, কিন্তু—সে যাক। আপনার কোন কথা আমি শুনছি না আর!' প্রফুল্ল মরীয়া হয়ে ওঠে।

এবার সমাদ্দার কথা বলে—'আপনি যদি আমার গায়ে হাত দ্যান প্রফুল্লবাবু, তাহলে এক্ষুনি আমি হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে আপনাকে পুলিসে দেব—আপনার কাগজ যে আমি নিয়েছি তার প্রমাণ কী?'

'বেশ, আমি তোমাকে সার্চ করব! দেখব তোমার কামরাও!'

'স্বচ্ছন্দে! এক্ষুনি।' সমাদ্দার কক্কে-কাশির দিকে ফেরে, 'আপনিও কি সার্চ করতে চান নাকি? আসুন আমার সঙ্গে, দুজনেই আসুন। কোন আপত্তি নেই আমার!'

'বাজে কাজে সময় নষ্ট করি না আমি',—কক্কে-কাশি একটা সিগারেট ধরান। 'তুমি যদি সত্যিই ও-কাগজ নিয়ে থাকো সমাদ্দার, তাহলে এখন তোমাকে সার্চ করে কোনই লাভ নেই। কোথায় তুমি তা রেখেছ তাই যদি আমি ভেবে বার করতে পারি, তাহলে তা পেতে আমার বেশি বিলম্ব হবে না।'

'আপনি কি তাহলে সার্চ করতে প্রস্তুত নন?'—প্রফুল্ল এবার ক্ষেপে ওঠে।

'উঁহু!' কক্কে-কাশির সংক্ষিপ্ত জবাব। 'আপাতত না।'

'বেশ, আমি নিজেই করব তাহলে।'

প্রফুল্ল সমাদ্দারের ঘরে যায়, ওর আপাদমস্তক অনুসন্ধান করে, জুতোর সুকতলাও বাদ দেয় না। সবগুলো জামার ভেতরের-বাইরের সমস্ত পকেট হাতড়ায়, কোটের যাবতীয় লাইনিং পরীক্ষা করে; ঘরের আঁতিপাঁতি আনাচকানাচ সব জায়গায় ওর তল্লাশী চালায়। অবশেষে মুহ্যমানের মত যখন নিজের কামরায়

ফেরে তখন কল্কে-কাশি জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। মুখ না ফিরিয়েই তিনি বলেন, 'তখনই বললাম, প্রফুল্লবাবু, এখন ওকে সার্চ করে কোন ফলই হবে না। কোথায় ও জিনিসটা সরিয়েছে যতক্ষণ তাই না আঁচ করতে পারছি—'

সমাদ্দার ফিরতেই কল্কে-কাশির কথায় বাধা পড়ে। প্রফুল্ল কোন জবাব দেয় না। নিজের মধ্যে নিজেই সে যেন নেই তখন; এতটাই সে দমে গেছে।

'তবে, সত্যি বলতে কী, দোষ তোমার নিজেরই প্রফুল্লবাবু। তুমিই বল, তোমার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল না কি?' কল্কে-কাশি তাঁর কথাটা শেষ করেন।

কিন্তু এ-কথায় প্রফুল্লর এখন আর সান্ত্বনা কোথায়? সে গুম হয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কল্কে-কাশি সমাদ্দারকে বলেন, 'ভারি দমিয়ে দিয়েছ তুমি বেচারাকে! ওর মুখ দেখলে মায়া হয়!'

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে। স্বভাবতই সে কোমল-হৃদয়, সত্যি সত্যিই দুঃখ হয় ওর। 'বিজনেস ইজ বিজনেস, মিস্টার কল্কে-কাশি!' সে বলে।

'সেকথা হাজার বার! কিন্তু ভেবে দেখ দিকি কী সর্বনাশটা হল ওর, হয়ত চাকরিই থাকবে না আর। ও তো ভেঙে পড়েছেই, আমিও খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছি না।' কল্কে-কাশি সমাদ্দারের চোখের ওপর চোখ রাখেন—'কাগজখানা রাখলে কোথায় হে সমাদ্দার?'

সমাদ্দার হাসে, 'আমি যে রেখেছি আমি তো তা স্বীকারই করিনি।'

'না। এবং তোমাকে স্বীকার করতে বলছিও না। তবে একথাও ঠিক, ও-কাগজ নিয়ে তুমি সটকাতে পারছ না। হাওড়ায় নেমেই আমি তোমাকে আটকাব এবং খানাতল্লাসি করব—যাকে বলে পুলিসের খানাতল্লাসি।'

সমাদ্দার আতঙ্কিত হয়। 'সেটা কি সঙ্গত হবে মিঃ কল্কে-কাশি? কাগজখানা যে আমার কাছে আছে তার তো আপনি বিন্দুমাত্রও প্রমাণ পাননি!'

'না পাই। কিন্তু কাগজখানা আমি পেতে চাই।'

কল্কে-কাশির সংকল্প শুনে সমাদ্দারের শঙ্কা হয়। সে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে যায়, গিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অনেক ভেবে সে একটা উপায় ঠাওরায়। ঘরের দরজায় খিল আঁটে। তারপর নিজের সুটকেস বার করে এক কোণের একটা গুপ্ত বোতাম টেপে, তার ফলে ডালার দিকের লুকোনো একটা খুপরি খুলে যায়। তার ভেতর থেকে সদ্য-অপহৃত নমিনেশন পেপারটা বেরিয়ে পড়ে।

সমাদ্দার কাগজটা পরীক্ষা করে। সেইসঙ্গে আরেকখানা অনুরূপ নমিনেশন পেপারও। দ্বিতীয় কাগজখানা ফাঁকা, এখানা তাকে দেওয়া হয়েছিল আসল কাগজ চেনার সুবিধের জন্যে। সমাদ্দার দ্বিতীয় কাগজের যথাস্থানে প্রথম কাগজের দেখাদেখি ব্যানার্জির সই নকল করে বসিয়ে দেয়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে একই কাগজ, হুবহু একই সই; কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেই এ সই যে জাল করা তা স্পষ্টই ধরা পড়ে যাবে।

অবশেষে জাল কাগজখানা গুপ্ত ডালার মধ্যে এঁটে রেখে, আসল কাগজটা একখানা লেফাফায় ভরে। খামের ওপরে লেখে মিস্টার সরকারের নাম আর ঠিকানা। কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে রেজিস্ট্রি করে পাঠানোই সে সমীচীন মনে করে। ডাকে গেলেও কাগজটা তার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছবে এবং একেবারে তার নিয়োগকর্তার কাছেই, সুতরাং তার অসুবিধে হবার কিছু নেই। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে, কাছাকাছি পোস্ট-অফিসের উদ্দেশে সে রওনা হয়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢোকে। আপন মনেই বলে যেন, 'দরজায় তালা লাগিয়ে সমাদ্দারকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

'তাই নাকি?' কল্কে-কাশি সিগারেটের সামান্য অবশেষটা ফেলে দিয়ে উঠে বসেন, 'তাহলে তো ওর ঘরটা একবার তল্লাস করতে হয়! এই তো সেরা সুযোগ।'

সব-খোল চাবির সাহায্যে সহজেই তালা খুলে যায়। সবিস্ময় প্রফুল্লকে নিয়ে তিনি সমাদ্দরের ঘরে ঢোকেন।

'কোথায় কোথায় তুমি খুঁজেছিলে?'

তদুত্তরে প্রফুল্ল তার অনুসন্ধান-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে।

'এই সুটকেসটা দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ। ওর ভেতরেও দেখেছি। ওতে নেই।'

'দেখেছ ঠিকই। কিন্তু আরেকবার দেখা যাক।'

কল্কে-কাশি সুটকেসটাকে উন্মুক্ত করেন, ভেতরের যা কিছু জিনিসপত্র সব তাঁদের পায়ের কাছে উজাড় হয়।

'দেখলেন তো? বললাম ওতে নেই।' প্রফুল্ল বলে।

কল্কে-কাশি ওর কথায় কান দেন না; খুঁজতে খুঁজতে সেই গুপ্ত বোতাম আবিষ্কৃত হয়। 'পেয়েছি প্রফুল্লবাবু, এতক্ষণে পেয়েছি।'

'কী?'

'এই দেখ।' চাবি টিপতেই সেই লুকানো ডালা প্রকাশ পায়। আর, তার মধ্যে একটা লম্বা লেফাফা। লেফাফাটা না খুলেই তিনি প্রফুল্লর হাতে তুলে দেন। 'এই নাও, কিন্তু সাবধান, আর যেন খোয়া না যায়।'

প্রফুল্ল কম্পিত হাতে লেফাফা খোলে। কাগজখানা দেখেই সে লাফিয়ে ওঠে। তারপর দুহাতে কল্কে-কাশির একখানা হাত চেপে ধরে—'আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম, আমাকে মাফ করুন—'

উত্তরে কল্কে-কাশির শুধু অল্প হাসি দেখা যায়। ব্যাগের যাবতীয় জিনিসপত্তর যথাযথ রেখে তেমনি তালা এঁটে তাঁরা বেরিয়ে আসেন আবার।

সমাদ্দার হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে কল্কে-কাশির কাছে। 'এটা কি ভাল হল আপনাদের মশাই? আমার অবর্তমানে আমার ঘরে ঢুকে, সুটকেস খুলে—'

কল্কে-কাশি বাধা দেন—'আমরাই যে তোমার ঘরে ঢুকেছি, সুটকেস খুলেছি তার কী প্রমাণ তুমি পেয়েছ? প্রমাণ ছাড়া তুমি তো চল না সমাদ্দার।'

প্রফুল্ল এতক্ষণে মন খুলে হাসতে পারে।

সমাদ্দার গজরাতে থাকে, ভয়ানক রাগের ভান করে; কিন্তু সেও মনে মনে হাসে।

আর মিস্টার কল্কে-কাশি? তাঁর মুখে কোনো হাসি দেখা যায় না কিন্তু।

সমাদ্দার চলে গেলে প্রফুল্ল মুখ খোলে—'একবার বাগাতে পেরেছে, আর পারবে না। এ-কোট আর আমি গা থেকে খুলছি না। রাত্রেও নয়!'

'ঠেকে শেখা ভয়ানক শেখা প্রফুল্লবাবু!' কল্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, 'এবং একবারই এই শিক্ষা একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।'

'আচ্ছা, মিস্টার কল্কে-কাশি, সুটকেসটার যে একটা গোপন খুপরি আছে, কি করে আপনি তা বুঝলেন?'

'তোমার কোটের লাইনিং আছে যেমন করে সমাদ্দার বুঝেছিল।' কল্কে-কাশি ব্যাখ্যা করে দেন—'ও থাকতেই হবে। তোমার কি ডিটেকটিভ উপন্যাস-টুপন্যাস একেবারেই পড়া নেই প্রফুল্লবাবু?'

প্রফুল্ল নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করতে লজ্জা পায়। একেবারেই যে এক-আধখানা ওর পড়া নেই তা নয়, তবু সে সসংকোচেই বলে, 'এবার থেকে পড়ব কিন্তু। নিশ্চয় পড়ব।'

'আসুন, আসুন! আমার কী সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন!' সমাদ্দার শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'সরকারদের কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে গেছ তো?' কল্কে-কাশি জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ, কালই দিয়েছে। নগদ পাঁচটি হাজার।' সমাদ্দার উত্তর দেয়, 'কেন, কী হয়েছে তাঁর?'

'না, এমন কিছু না।' কল্কে-কাশি তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকান। 'এখন দশটা, আর এক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্সি কোর্টে নমিনেশন পেপার সব দাখিল করা হবে কিনা! তোমাকে আমি কেটে পড়ার জন্যেই বলতে এলাম। বন্ধুভাবেই বলতে এসেছি বলাই বাহুল্য!'

'কেটে পড়ব! আমি? কেন?' সমাদ্দার সচকিত হয়।

'সরকারদের পার্টির কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছ সেই জন্যে। ওদের হাতে খুনে গুণ্ডা তো নেহাত কম নেই, যাদের তুলনায় তুমি তো আস্ত একটি দেবদূত!'

'ফাঁকি দিয়েছি কি রকম?' সমাদ্দার এবার হাসে, 'আপনি কি তাহলে এখনো বুঝতে পারেননি, মিঃ কল্কে-কাশি, আমার স্যুটকেস থেকে যে-কাগজ আপনি বের করে নিয়েছিলেন তা আসলে জাল-সই করা?'

'আগাগোড়াই তা আমি জানতাম।' কলকে-কাশির গলার স্বর গম্ভীর।

'তবে?'

'আসলে একটা কথা তুমি নিজেই এখনো বুঝতে পারোনি, সমাদ্দার! প্রফুল্লর পকেট থেকে যে কাগজ তুমি বাগিয়েছিলে, সেটাও জাল ছাড়া কিছু নয়।'

'অ্যাঁ?' এবার সত্যিই চমকে ওঠে সমাদ্দার—'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়! যে-সময়ে তুমি বাগানবাড়ির গেটে প্রফুল্লর জন্যে অপেক্ষা করছিলে, সেই সময়ে আমি শহরে ফিরে গলস্টোন কোম্পানির আপিস থেকে আসল কাগজখানা হস্তগত করি। স্টেশনে নেমেই গলস্টোন সাহেবকে ফোন করে আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যাতে সাহেবের বাড়ি থেকে প্রফুল্লকে একখানা নকল নমিনেশন পেপার দেওয়া হয়। যাক, এখন সব বুঝতে পারছ তো—যাতে তোমার নজর একেবারেই আমার দিকে না পড়ে, সেইজন্যেই আমার এত কাণ্ড করা। প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং সব কিছু। অমন মূল্যবান কাগজ আমি নিতান্ত অবহেলাভরে আমার এই কোটের পকেটে করে নিয়ে এসেছি, ইচ্ছেমতন জামা খুলেছি; আমিই রেখেছি যে, তা তুমি জানতে পারোনি ঘুণাক্ষরেও। প্রফুল্লও তা জানে না, কোনদিন জানবেও না। যাক বেচারা, আনন্দেই আছে, ওর মাইনে বেড়ে গেছে খবর পেলাম—'

আমি আত্মহত্যা করার পর দিনকতক তাই নিয়ে খুব জোর হৈচৈ হয়েছিল। গত ১৯৫৩ সালের দোসরা এপ্রিলের কাগজে-কাগজে কেবল এই কথাই ছিল। বেশি দিনের কাণ্ড নয়, অতএব তোমাদের কারো কারো মনে থাকতেও পারে।

আত্মহত্যার খবরটাই শুধু তোমরা পেয়েছ, কিন্তু কেন এবং কোন্ দুঃখে আর এ-জন্যে আর কারুকে না বেছে নিয়ে হঠাৎ নিজেকেই খুন করে বসলাম—তার নিগূঢ় রহস্য তোমরা কেউই জান না। সেই মর্মন্তুদ কাহিনীই এখানে বলব। খুব সংক্ষেপেই সারব।

রেড-টেপিজম্ কাকে বলে, জান তোমরা হয়তো। যদি কোন আপিসে কখনো গিয়ে থাকো, তাহলে লালফিতেয় বাঁধা ফাইল নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ—ফাইলের পর ফাইল সাজানোর বড় বড় বাণ্ডিলের থাক্-ও তোমাদের চোখে পড়েছে নিশ্চয়। সরকারী দপ্তরখানায় তোমরা কখনো ঢুকেছ কিনা জানি না, কিন্তু আমার একবার সেখানে ঢোকার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। আর তখন ঐ রকম লালফিতের ফাইল—ফাইলের স্তূপাকার আর বাণ্ডিলের আণ্ডিল দেখেই হঠাৎ কেমন আমার মাথা বিগড়ে গেল; আর আমি ঐ মারাত্মক কাণ্ড করে বসলাম।

লালফিতার একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। পৃথিবীতে যত ism আবিষ্কৃত হয়েছে, Buddhism থেকে শুরু করে Rheumatism পর্যন্ত—Red-Tapism তাদের কারুর থেকেই কম যায় না। আমার মতে লালফিতার ধর্মই সবচেয়ে বেশি পরাক্রান্ত, কেননা পরকে আক্রমণ করতে আর করে কাবু করতে এর জুড়ি আর নেই।

এখন আসল ঘটনায় আসা যাক—টিপু সুলতানই হোন বা তাঁর বাবা হায়দার

আসলই হোন—অবিশ্যি আজকের কথা নয়, কোম্পানির আমলের কাহিনী—যাই হোক, ওঁদের একজন ওয়ারেন হেস্টিংসের বেজায় বিরক্তির কারণ হয়ে পড়েন। হেস্টিংস সাহেব সেই বিরক্তি দমন করতে না পেরে হায়দার আলিকেই দমন করবেন—এই স্থির করলেন। স্থির করেই তিনি কর্নেল কুটকে সসৈন্যে পাঠিয়ে দিলেন হায়দারের উদ্দেশ্যে। সেই সময় অর্থাৎ সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল নাগাদ, বিক্রমপুরের বলরাম পাঠকের সঙ্গে হেস্টিংসের সরকারের এই চুক্তি হয় যে, উক্ত পাঠক উক্ত কর্নেল কুটকে তাঁর গোরা পল্টনের রসদ বাবদ এক হাজার খাসি অথবা পাঁঠা সরবরাহ করবেন।

এই হল গোড়ার ইতিহাস অথবা আদিম কাণ্ড।

এত আগে শুরু করবার কারণ এই যে, এর সঙ্গে আমার অন্তিম কাণ্ড ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্রমশই সেই রহস্য উদঘাটিত হবে।

এখন বলরাম পাঠক প্রাণান্ত পরিশ্রমে এক হাজার খাসি এবং পাঁঠা দিগ্বিদিক থেকে সংগ্রহ করে কলকাতার কেল্লার দরজা পর্যন্ত যখন তাড়িয়ে এনেছেন, তখন শুনতে পেলেন, কর্নেল কুট পাঁঠাদের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করে সসৈন্যে মহীশূরের দিকে সটকে পড়েছেন কখন।

বলরাম ভাবিত হয়ে পড়লেন, কী করবেন? সরকারী চুক্তি তো অবহেলার বস্তু নয়! পাঁঠার যোগাড়ে টাকা জোগাতে হয়েছে (কম টাকা না!) আর অতগুলো পাঁঠা (কিংবা খাসিই হোক) একা কিংবা সপরিবারে খেয়ে খতম করা বলরামের একপুরুষের কম্ম নয়!

অনেক ভেবেচিন্তে বলরাম স্থির করলেন, পাঁঠাদের সমভিব্যাহারে তিনিও কুটের অনুসরণ করবেন এবং কোথাও না কোথাও তাঁকে পাকড়াতে পারবেনই—তাহলেই তাঁর চুক্তি বজায় রাখা যাবে।

অতএব যেমন এসেছিলেন, তেমনি তিনি চললেন পাঁঠা তাড়িয়ে কুটের পেছন পেছন ধাওয়া করে মহীশূরের দিকে।

কটকে উপনীত হয়ে তিনি শুনলেন, কুট আরও দক্ষিণে বহরমপুরের দিকে পাড়ি মেরেছেন। তখন তিনিও পাঁঠাদের সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরের উদ্দেশ্যে ধাবিত হলেন, কিন্তু সেখানেও পেঁছিলেন দেরি করে—দিন কয়েক আগে কুট চলে গেছেন হায়দ্রাবাদের অভিমুখে। অদ্ভুত এই কূটনীতি। কুটের চালচলনে বলরাম তো নাজেহাল হয়ে পড়লেনই, পাঁঠারাও হিমসিম খেয়ে গেল।

তারপর—তারপর আর কী? হায়দ্রাবাদ থেকে এলোর, এলোর থেকে মছলিপত্তনম, সেখান থেকে কোন্দাপা (হাঁটতে হাঁটতে পাঁঠাদেরই চার পায়ে খিল ধরে গেল, বলরামের তো মোটে দুটো পা)। এই রকমে তিনি কর্নেলের পশ্চাদ্ধাবন করে চললেন, কিন্তু গোদা পা নিয়ে কোন্দাপা পার হয়েও কর্নেলের পাত্তা তিনি পেলেন না। পল্টনের নাগাল পাওয়া তাঁর আর হল না। তিনি তো হয়রান হয়ে হাঁপিয়ে উঠলেনই, পাঁঠারাও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাহাত্তর দিন এইভাবে দারুণ দৌড়োদৌড়ির পর মহীশূরের প্রায় সীমান্তে এসে অবশেষে যখন তিনি কর্নেল কুটের কাছাকাছি অর্থাৎ তাঁর ফৌজের ছাউনির চার

পাঁচ মাইলের মধ্যে পেঁছেছেন তখন এক বর্গীর দল এসে তাঁর দলে হানা দিল।

আক্রান্ত হয়ে তার দলবল এমন চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করল যে, সে আর কহতব্য নয়! সেই দারুণ গণ্ডগোল আর ছত্রভঙ্গের ভেতর পাঠক মহাশয় (পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তখন তাঁরই এক সহযাত্রীর ঝোল বানিয়ে সবেমাত্র মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন!) ভাতের থালার অন্তরালে আত্মগোপন করতে যাবেন, এমন সময় অতর্কিতে বর্শাবিদ্ধ হয়ে তাঁকে প্রাণত্যাগ করতে হল।

বর্গীরা পাঁঠাদের নিয়ে পিটটান দিল। সেই পলায়নের মুখে কয়েকটা পাঁঠা (অথবা খাসি) পথ ভুলেই হোক বা বর্গীদের সঙ্গ না পছন্দ করেই হোক (সংখ্যায় অবিশ্যি তারা মুষ্টিমেয়), কর্নেল কুটের ছাউনির মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং ধৃত হয়। বলা বাহুল্য কর্নেল সাহেব সসৈন্যে তাদের উদরসাৎ করতে দ্বিধা করেননি। সুতরাং রসদ রূপে তাদের সদ্ব্যবহার হয়েছিল বলতে হবে। এই রূপে বীর বলরাম পাঠক মারা গিয়েও পাঁঠাদের সাহায্যে কোন প্রকারে আংশিক-ভাবে নিজের চুক্তি বজায় রেখেছিলেন।

পাঠক মহাশয় মহীশূর-মহাপ্রস্থানের প্রাক্কালেই সরকারী চুক্তিপত্রটি তাঁর ছেলে বাবুরামকে উইল করে দিয়ে যান। বাবুরাম তাঁর বাবা মারা যাবার খবর পাবামাত্র নিম্নলিখিত বিলটি ওয়ারেন হেষ্টিংসের দরবারে পেশ করেন, করবার পর তিনিও খতম হন। বিলটি এইরূপ :

মহামান্য কোম্পানি সরকার বরাবরেষু—বিক্রমপুরের বাবু বলরাম পাঠক, সম্প্রতি বিগত, উক্ত মহাশয়ের প্রাপ্য সম্পর্কে হিসাব···হিঃ—

মান্যবর কর্নেল কুট সাহেবের ফৌজের রসদের জন্য এক হাজার পাঁঠা কিংবা খাসি প্রত্যেকটির মূল্য ৫ টা হিসেবে— ৫০০০ টাকা
মহীশূর পর্যন্ত তাহাদের যাতায়াত এবং
খোরপোষের খরচা বাবদ— ১৬০০০ টাকা
একুনে মোট— ২১০০০ টাকা

বাবুরাম তো মরলেন, কিন্তু মরবার আগে তাঁর ভাগনে ত্রিবিক্রম মহাপাত্রকে ডেকে তার ওপর ভার দিয়ে গেলেন বিলের টাকাটা আদায় করার। ত্রিবিক্রম উপযুক্ত পাত্র : আদায়ের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিক্রমের সূত্রপাতের আগেই তাঁকে দেহরক্ষা করতে হয়। তাঁর থেকে দিগম্বর তরফদারের হাতে এল ঐ বিল। কিন্তু তিনিও বেশিদিন টিকলেন না। তস্যভ্রাতা সুদর্শন তরফদার ঐ উত্তরাধিকার সূত্রটি লাভ করলেন। কিছুদূর ঐ সূত্র টেনেও ছিলেন তিনি, এমন কি খাজাঞ্চিখানায় সপ্তম সেরেস্তাদার পর্যন্ত তিনি পেঁছেছিলেন, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে কালের কঠোর হস্ত এমন আদর্শ-অধ্যবসায়ের মাঝখানে অকস্মাৎ পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল।

সুদর্শন তাঁর এক আত্মীয়ের হাতে এই বিল সমর্পণ করে যান, সে বেচারা তার ঠেলায় মাত্র পাঁচ হপ্তা পৃথিবীতে টিকতে পারল। তবে এই অল্প সময়ের ভেতরেই সে রেকর্ড রেখে গেছে। লাল-ফিতা দপ্তরখানার তের নম্বর সেরেস্তা

সে পার হয়েছিল। তার উইলে এই বিল সে নিজের মামা আনন্দময় চৌধুরীকে উৎসর্গ করে যায়। আনন্দময়ের পক্ষে এই আনন্দের ধাক্কা সামলানো সহজ হয়নি। তারপর খুব অল্পদিনই তিনি এই ধরাধামে ছিলেন। অন্তিম নিঃশ্বাসের আগে তাঁর বিদায়-বাক্য হচ্ছে এই—'তোমরা আমার জন্যে কেঁদো না, বড় আনন্দেই আমি যেতে পারছি। মৃত্যু – হ্যাঁ—মৃত্যুই আমার পক্ষে এখন একমাত্র কাম্য।'

তিনি তো মরে বাঁচলেন, কিন্তু মেরে গেলেন আরো অনেককে। তারপর সাত জনের দখলে এই বিল আসে, কিন্তু তাদের কেউই আর এখন ইহলোকে নেই। অবশেষে এই বস্তু এল আমার হাতে, আমার এক মামার হাত হয়ে।

আমার দূর সম্পর্কের খুড়তুতো মামা—গুরুদাস গাঙ্গুলী—হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে আমাকে তার পাঠালেন। কোনদিনই যে আমাদের মধ্যে প্রাণের টান ছিল, এমন কথা বলা যায় না; বরং বলতে গেলে বলতে হয়, বরাবরই তিনি আমার প্রতি অহেতুক বিরাগ পোষণ করতেন; কখনো তিনি সইতে পারতেন না আমাকে, চিরকাল এইটেই দেখেছি, কাজেই টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক হয়ে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু অবাক হবার তখনো বুঝি কিছুটা বাকি ছিল। তিনি তো সর্বান্তকরণে আমাকে মার্জনা করলেনই, এমন কি তাঁর প্রিয়পাত্রদের আর নিজের প্রিয়পুত্রদের বঞ্চিত করেই এই মূল্যবান সম্পত্তি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন।

আমার কবলে আসা পর্যন্ত এর ইতিহাস হচ্ছে এই। মামাতো ভাইদের ডবল শোকাতুর করে একুশ হাজার টাকার এই বিল নিয়ে তো আমি লাফাতে লাফাতে কলকাতা ফিরলাম। ফিরেই উঠে-পড়ে লেগে গেলাম টাকার উদ্ধারের চেষ্টায়। এক-আধ টাকা নয়, একুশ হাজার! ইয়াল্লা!

প্রথমেই গিয়ে লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম। কার্ড পাঠাতেই কিছু পরে বেয়ারা আমাকে তাঁর খাসকামরায় নিয়ে গেল।

আমাকে দেখবামাত্র তিনি প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ, কী দরকার আমার কাছে? আমার সময় খুব কম, ভারি ব্যস্ত আমি; তা কী করতে পারি তোমার জন্যে বল দেখি?'

সবিনয়ে বললাম, 'আজ্ঞে হুজুর, সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল তারিখে বা ঐরকম সময়ে বিক্রমপুর জিলার বাবু বলরাম পাঠক কর্নেল কুট সাহেবের সঙ্গে মোট এক হাজার পাঁঠা কিংবা খাসি সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন—'

এই পর্যন্ত শোনামাত্র তিনি আমাকে বিদায় নিতে বাধ্য করলেন। এর বেশি কিছুতেই তাঁকে শোনানো গেল না। আমাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর টেবিলের কাগজপত্রে এমন গভীরভাবে মন দিলেন যে স্পষ্ট বোঝা গেল—বলরাম, আমার বা পাঁঠার—কারো ব্যাপারেই তাঁর কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই।

পরের দিন আমি কৃষি-মন্ত্রীর সঙ্গে মুলাকাত করলাম।

'কী চাই?' দেখেই আমাকে প্রশ্ন হল তাঁর।

'আজ্ঞে মহাশয়, সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল নাগাদ বিক্রমপুর জেলার বাবু বলরাম—'

তিনি আমাকে বাধা দিলেন, 'আমার মন্ত্রিত্ব তো মাত্র তিন বছরের, তিন শতাব্দীর তো নয় ! আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন ।'

তবে ? তিনশো বছরের প্রাচীন লোক আর কে আছে এখন ? কার কাছে যাব আমি ? ওয়ারেন হেস্টিংসও তো এখন বেঁচে নেই ! তবে ? তাহলে ? আমি মনে-মনে ভাবি ।

কী করব ? নমস্কার করে সেখান থেকে সরে পড়লাম ।

পরের দিন ভয়ানক ভেবে-চিন্তে ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে গিয়ে হাজির হলাম । তিনি মন দিয়ে আনুপূর্বিক শুনলেন । একটু চিন্তাও করলেন মনে হল । শেষে বললেন, 'চতুষ্পদ পাঁঠা তো ? তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কী সম্পর্ক ? তারা তো আর আমাদের ছাত্র না ! ও ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি বল ?'

অগত্যা সেখান থেকেও চলে আসতে হল ।

কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কর্পোরেশন চলে, এইরকম একটা কথা কানে এসেছিল, সেইখানেই হয়ত এই বিলের ব্যবস্থা না হোক, এর সুরাহার একটা হদিশ মিলতে পারে, এই রকম ভেবে মেয়রের সঙ্গে দেখা করলাম তার পরদিন ।

'মহাশয়, সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল বা ওর কিছু আগে বা পরে বিক্রমপুর জিলানিবাসী, সম্প্রতি বিগত শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম পাঠকের সঙ্গে কর্নেল কুট সাহেবের এক চুক্তি হয় যে—'

এই পর্যন্ত কোনরকমে এগুতে পেরেছি, মেয়র মহাশয় আমাকে থামিয়ে দিলেন—'কর্নেল কুটের সঙ্গে কর্পোরেশনের কী ? ওসব ব্যাপার এখানে নয় । তা ছাড়া, কোনো রাজনৈতিক কূটনীতির মধ্যে আমরা নেই ।'

সবাই একই কথা বলে । এখানে নয়, ওখানে নয়, সেখানে নয়,—তবে কোন্‌খানে ? চুক্তি হয়েছিল, এ তো আলবত ; সে চুক্তি পাঁঠাদের তরফ থেকে যদ্দুর সম্ভব বজায় রাখা হয়েছে । এখন টাকা দেবার বেলায় এইভাবে দায় এড়ানোর অপচেষ্টা আমার আদপেই ভাল লাগে না । এ যেন আমার একুশ হাজারের দাবি না মিটিয়ে টাকাটা মেরে দেবার মতলব ! আমাকেই দাবিয়ে মারার ফিকির !

পরদিন জেনারেল পোস্টাপিসের দরজায় গিয়ে হাজির হলাম । পোস্টমাস্টার জেনারেল তখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন । তাঁর মোটরের সম্মুখে গিয়ে ধরনা দিয়ে পড়লাম ।

'কী চাও বাবু, চাকরি ?' গাড়ির জানালা দিয়ে তিনি মুখ বাড়ালেন—'দুঃখের বিষয়, এখন কিছুই খালি নেই ।'

'আজ্ঞে না, চাকরি নয় ।'

ভরসা পেয়ে তখন তিনি আরো একটু মুখ বাড়ান, 'তবে কি চাই ?'

'আজ্ঞে, ১৭৭৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে—'

'১৭৭৭ সাল ?' ঈষৎ যেন ভ্রূকুঞ্চিত হল ওঁর—'সে তো এখানে নয়, ডেড লেটার আপিসে । সেখানে খোঁজ কর গিয়ে ।'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মোটর দিল ছেড়ে।

এরপর আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। যেমন করে পারি এই বিলের কিনারা করবই, এই আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হল। যদি প্রাণ যায় সেই দুশ্চেষ্টায়, সেও স্বীকার। হয় বিলের সাধন, নয় শরীর পাতন! বিল নিয়ে আমি দিগ্বিদিকে হানা দিতে লাগলাম; একে-ওকে-তাকে ধরপাকড় শুরু করে দিলাম তারপর।

কোথায় না গেলাম? ক্যাম্বেল হাসপাতাল, গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল, ডেড লেটার আপিস, কমার্শিয়াল মিউজিয়ম, মেডিক্যাল কলেজ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, টেকস্টাইল ডিপার্টমেণ্ট, টেক্সটবুক কমিটি, পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস—কত আর নাম করব? আলিপুরের আবহাওয়াখানা থেকে আরম্ভ করে (এসপ্ল্যানেডের ট্রাম ডিপোর আপিস ধরে) বেলগেছের ভেটারিনারি কলেজ পর্যন্ত কোনখানে না ঢুঁ মারলাম? এককথায়, এক জেলখানা ছাড়া কোথাও যেতে আর বাকি রাখলাম না।

ক্রমশ আমার বিলের ব্যাপার কলকাতার কারু আর অবিদিত রইল না। টাকাটা কেউ দেবে কিনা, কে দেবে এবং কেনই বা দেবে আর যদি সে না দেয় তাহলেই বা কি হবে, এই নিয়ে সবাই মাথা ঘামাতে লাগল; খবরের কাগজে কাগজেও হৈ-চৈ পড়ে গেল দারুণ। এক হাজার পাঁঠা আর একুশ হাজার টাকা —সামান্য কথা তো নয়! ভাবতে গেলে আপনা থেকেই জিহ্বা লালায়িত আর পকেট বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

অবশেষে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের অ-স্বাক্ষরিত পত্রে একটু যেন আশার আলোক পাওয়া গেল।

তিনি লিখেছেন—'আমি আপনার ব্যথার ব্যথী। আপনার মতই ভুক্তভোগী একজন। আমারো এক পুরানো বিল ছিল, এখন তা খালে পরিণত হয়েছে। এখন আমি সেই খালে সাঁতার কাটছি, কিন্তু কতক্ষণ কাটব? কতক্ষণ কাটতে পারব আর? আমি তো শ্রীবোকা ঘোষ নই! শীঘ্রই ডুবে যাব, এরূপ আশা পোষণ করি। যাই হোক, আপনি সরকারী দপ্তরখানাটা দেখেছেন একবার?'

তাই তো, ওইটেই তো দেখা হয়নি। গোলেমালে অনেক কিছুই দেখেছি—দেখে ফেলেছি, কেবল ওইটাই বাদে!

খোঁজখবর নিয়ে ছুটলাম দপ্তরখানায়। গিয়ে সোজা একেবারে সেখানকার বড়বাবুর কাছে আমার সেলাম ঠুকলাম।

'মশাই, বিগত ১৭৭৭ সালের পয়লা এপ্রিলে বিক্রমপুরে স্বর্গীয়—'

'বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না! আপনিই সেই পাঁঠা তো?'

'আজ্ঞে, আমি পাঁঠা ···? আমি······' আমতা আমতা করি আমি—'আজ্ঞে, পাঁঠা ঠিক না হলেও পাঁঠার তরফ থেকে আমার একটা আর্জি আছে। বিগত ১৭৭৭ সালের পয়লা—'

'জানি, সমস্তই জানি। ওর হাড়হদ্দ সমস্তই আমার জানা। সব এই নখদর্পণে। কই, দেখি আপনার কাগজপত্র?'

এরকম সাদর আপ্যায়ন এ পর্যন্ত কোথাও পাইনি। আমি উল্লসিত হয়ে উঠি। বলরামের আমলের বহু পুরাতন চুক্তিপত্রটা বাড়িয়ে দিই। বাবুরামের আমলের বিলও। হাতে নিয়ে দেখে শুনে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এই কনট্র্যাক্টর বটে।'

তাঁর প্রসন্ন হাসি দেখে আমার প্রাণে ভরসার সঞ্চার হয়! হ্যাঁ, এতদিনে ঠিক জায়গায়, একেবারে যথাস্থানে পেঁছিতে পেরেছি বটে! তখন সেই ভুক্তভোগীটিকে আমি মনে মনে ধন্যবাদ জানাই।

তারপরই তিনি কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করলেন। এ-ফাইল, সে-ফাইল এ-দপ্তর, সে-দপ্তর। এর লালফিতা খোলেন, ওর লালফিতা বাঁধেন। দপ্তরিকে তলব দেন, আরো ফাইল আসে। আরো—আরো ফাইল। গভীরভাবে দেখা শোনা চলে। আবার তলব, আরো আরো বহু পুরাতন বাণ্ডিলরা ফাইলের সূত্রে এসে পড়ে।

হ্যাঁ, এইবার কাজ এগুচ্ছে বটে। আমারই কাজ। সমস্ত মন ভয়ানক খুশিতে ভরে ওঠে। সারা কড়িকাঠ জুড়ে যেন ঝমাঝম আওয়াজ শোনা যায় টাকার। এক্ষুনি সশব্দে আমার মাথায় ভেঙে পড়ল বলে। আমিও সেই দৈব দুর্ঘটনার তলায় চাপা পড়বার জন্যে প্রাণপণে প্রস্তুত হতে থাকি। হৃদয়কে সবল করি।

অনেক অন্বেষণের পরে বলরামী চুক্তিপত্রের সরকারী ডুপ্লিকেটের অবশেষে আত্মপ্রকাশ হয়। অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত মিলিয়ে দেখে তিনি ঘাড় নাড়েন, 'কাজ তো অনেকটা এগিয়েই রয়েছে, তা এতদিন আপনারা কি করছিলেন? কোন খবর নেননি কেন?'

'আজ্ঞে, আমি নিজেই এ বিষয়ের খবর পেয়েছি খুব অল্পদিন হলো।'

সরকারী দপ্তরের ডুপ্লিকেটটা সসম্ভ্রমে হাতে নিই। হ্যাঁ, এই সেই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ, যার দরজায় মাথা ঠুকে আমার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ ইতিপূর্বে গতাসু হয়েছেন এবং আমিও প্রায় যাবার দাখিল! ভাবের ধাক্কায় আমার সমস্ত অন্তর যেন উথলে ওঠে—যাক এই রক্ষে যে, আমাকে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে না। এ আনন্দ আমার কম নয়! আমি তো বেঁচেই গেছি এবং আরো ঘোরতরভাবে বাঁচব অতঃপর—বালিগঞ্জের বড়লোকদের মধ্যে সটান নবাবী স্টাইলে। পুলকের আতিশয্যে কাবু হয়ে পড়ি আমি।

ভদ্রলোক সমস্তই উল্টে-পাল্টে দেখেন—'হ্যাঁ, সুদর্শন তরফদার। সুদর্শনবাবুই তো কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছেন দেখছি। সাতটা সেরেস্তার সই তাঁর সময়েই হয়েছে। তাঁর পরে এলেন—কী নাম ভদ্রলোকের। ভাল পড়াও যায় না! পুরন্দর পত্রনবীস? হ্যাঁ, পুরন্দরই বটে, তা তিনিও তো ছটা সই বাগাতে পেরেছেন দেখছি। আর বাকি ছিল মাত্র চারটে সই। চারজন বড়কর্তার। তার পরের ভদ্রলোক তো আনন্দময় চৌধুরী। আপনার কে হন তিনি?'

'আজ্ঞে, তা ঠিক বলতে পারব না।' আমি নিজের মাথা চুলকাই—'অনেকদিন আগেকার কথা। তবে কেউ হন নিশ্চয়ই।'

'তা, তিনিও দুটো সই আদায় করেছেন। বাকি ছিল আর দুটো সই। তিনি আর একটু উঠে-পড়ে লাগলেই তো কাজটা হয়ে যেত। তা, তিনি আর চেষ্টা করলেন না কেন? এরকম করে হাল ছেড়ে দিলে কি চলে?'

'খুব সম্ভব তিনি আর চেষ্টা করতে পারলেন না। কারণ তিনি মারা গেলেন কিনা! চেষ্টা করতে করতেই মারা গেলেন।'

'ও, তাই নাকি? কিন্তু তারপরে কাজ আর বিশেষ এগোয়নি। দু-জন বড়কত্তার সই এখনো বাকিই রয়েছে। তবে, এইবার হয়ে যাবে সব।'

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম—'আজ্ঞে হ্যাঁ! মশাই, যাতে একটু তাড়াতাড়ি হয়, অনুগ্রহ করে—'

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'দেখুন, তাড়াতাড়ির আশা করবেন না। এসব হচ্ছে সরকারী কাজ—দরকারী কাজ—বুঝতেই তো পারছেন? অতএব ধীরে সুস্থে হবে।' 'কিন্তু'—

'স্লোলি, বাট শিওরলি। এর বাঁধাদস্তুর চাল আছে, সবই রুটিন-মাফিক,—একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই! একেবারে কেতাদুরস্ত।' এই বলে মৃদু হাস্যে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন—'আস্তে আস্তে হয়ে যাবে সব, কিচ্ছু ভয় নেই আপনার।'

অভয় পেয়ে আমার কিন্তু হৃৎকম্প শুরু হল। 'তবু একটু স্মরণ রাখবেন অধমকে, যাতে ওর মধ্যেই একটু চট্‌পট্‌—' করুণ সুরে বলতে গেলাম।

'বলতে হবে না, বলতে হবে না অত করে। সেদিকে আমাদের লক্ষ্য থাকে বইকি। এত বড় দপ্তরখানা তবে হয়েছে কী জন্যে বলুন? আর আমরাই বা এখানে বসে করছি কী? রয়েছি কী জন্যে? তবে, আর একবার আগাগোড়া সব চেক হবে কি না, সেইটুকু হলেই যথাসময়েই আপনি কল পাবেন। আপনাকে বারবার আসতে হবে না কষ্ট করে, আমরাই চিঠি দিয়ে জানাবো আপনাকে। আর দুটো সই বইতো নয়! এ আর কি?'

অন্তরে বল সঞ্চয় করে বাড়ি ফিরি। তারপর একে-একে দশ বছর কেটে যায়। খবর আর আসে না। বিলের ভাবনা ভেবে ভেবে চুল-দাড়ি সব পেকে ওঠে,—পেকে ঝরে ফাঁকা হয়ে যায় সব। কেবল থাকে—মাথার ওপরে টাক, আর মাথার মধ্যে টাকা; কিন্তু খবর আর আসে না।

বিলক্ষণ দেরি দেখে আর বিলের কোন লক্ষণ না দেখে মাঝে-মাঝে আমি নিজেই তাড়া করে যাই, খবরের খোঁজে হানা দিই গিয়ে। 'অনেকটা এগিয়েছে', 'আর একটু বাকি', 'আরে হয়ে এল মশাই, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন', 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন, হয়ে যাবে—হয়ে যাবে।' 'সময় হলেই হবে, ভাববেন না, ঠিক হবে!' 'সবুরে মেওয়া ফলে, জানেন তো?' ইত্যাদি সব আশার বাণী শুনে চাঙ্গা হয়ে ফিরে আসি। তারপর আবার বছর ঘুরে যায়।

অবশেষে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে বহু বাঞ্ছিত চিঠি এলো। তাতে পরবর্তী মাসের পয়লা তারিখে উক্ত বিল সম্পর্কে দপ্তরখানায় দেখা করার জন্যে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

যাক, এতদিনে তাহলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। আমি মনে মনে লাফাতে শুরু করে দিলাম। আর কি, মার দিয়া কেল্লা, কে আর পায় আমায়! সটান বালিগঞ্জ! কেন বালিগঞ্জ কেন? সোজা লণ্ডন! কি সোজা নিউ ইয়র্ক! কিংবা হলিউডই বা মন্দ কি? জীবনের ধারাই এবার পাল্টে দেব বিলকুল—বিলের যখন কূল পেয়েছি? হ্যাঁ। আধঘণ্টা পরে পা মচ্‌কে বসে পড়ার পর খেয়াল হল যে, ও হরি! কেবল মনেই নয়, বাইরেও লাফাতে শুরু করেছিলাম কখন!

পয়লা এপ্রিল তারিখে দুরু-দুরু বক্ষে দপ্তরখানার দিকে এগুলাম। সতেরেশো সাতাত্তর সালের পয়লা এপ্রিল যে নাটক শুরু হয়েছিল, আজ উনিশশো তিপান্ন সালের আর-এক পয়লা এপ্রিলে সেই বিরাট ঐতিহাসিক পরিহাসের যবনিকা পড়ে কিনা, কে জানে!

দপ্তরখানার সেই বাবুটি সহাস্যমুখে এগিয়ে আসেন: 'ভাগ্যবান পুরুষ মশাই আপনি! কাজটা উদ্ধার করেছেন বটে!' বলে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দেন একবার।

'একুশ হাজার পাব তো মশাই?' ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞেস করি।

'একুশ হাজার কী মশাই! এই দেড়শো বছরে সুদে-আসলে আড়াই লাখের ওপর দাঁড়িয়েছে যে! বলছি না—আপনি লাকি!' তিনি বলেন।

'আড়াই লাখ!' আমার মাথা ঝিম-ঝিম করে—'তা চেকটা আজই পাচ্ছি তাহলে তো?'

'চেক? এখনই? তবে হ্যাঁ, আর বেশি দেরি নেই।'

'বেশ, আমি অপেক্ষা করছি—সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত।'

'না, আজ হবার আশা কম। আপনি শুধু সই করে যান এখানে। পরে আমরা খবর দেব আপনাকে।'

অ্যাঁ এখনো পরে? পরে খবরের ধাক্কায় তো দশ বছর কাটল—আবার পরে খবর? সসঙ্কোচে বলি—'আজ্ঞে, আজ আপনাদের অসুবিধেটা কী হচ্ছে, জানতে পারি কি?'

'এখনো একটা সই বাকি আছে কিনা!' অবশেষে গূঢ় রহস্যটা অগত্যা তিনি ব্যক্ত করেন।

'এখনো একটা সই বাকি!' শুনে আমার মাথা ঘুরে যায়। এখনো আরো একটা! তবেই হয়েছে। ও আড়াই লাখ আমার কাছে তাহলে আড়াই পয়সার সামিল।

ক্যালেণ্ডারে আজকের তারিখের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটু হাসবার ভান করি—'পয়লা এপ্রিল বলে পরিহাস করছেন না তো মশাই?'

'না-না, পরিহাস কিসের।' তিনি গম্ভীরভাবেই বলেন—'শুধু সেই ফাইন্যাল সইটা হলেই হয়ে যায়।'

ততক্ষণে আমার মাথায় খুন চেপে গেছে; আমি বলতে শুরু করেছি—'তবে দিন মশাই, দিন আমাকে কাগজ-কলম! আমার এই বহুমূল্য সম্পত্তি আমি এই দণ্ডে আপনাকে ও ভগবানকে সাক্ষী রেখে উইল করে দিয়ে যাচ্ছি আমার জাতিকে,

মানে—আমার দেশবাসীকে—অনাগত-কালের যত ভারতীয়দের। দেখুন, আমরা সব নশ্বর জীব। অল্প দিনের আমাদের জীবন, বেশিদিন অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। বিল মানেই বিলম্ব—বিলক্ষণ বিলম্ব। কিন্তু জাতির পরমায়ু—কেবল সে-ই অপেক্ষা করতে পারে অনন্তকাল, মানে—যদ্দিন তার খুশি।'

এই কথা বলে সামনের টেবিল থেকে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা তুলে আমূল বসিয়ে দিই আমার নিজের বুকে অম্লানবদনে।

'উইল করে দিচ্ছি বটে, তবে আমার স্বদেশবাসী যেন না ভুল বোঝে যে, তাদের ওপর আমার খুব রাগ ছিল, তারই প্রতিশোধ নেবার মানসে এই বিল তাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম—আমাকে তারা যেন মার্জনা করে।' এই বলে অবশেষ সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস দিয়ে আমার অন্তিম বাণীর উপসংহার করি।

আড়াই লাখের বিল আমার দেশবাসীকে বিলিয়ে দিয়ে সেই-ই আমার শেষ বিলাসিতা। বিল-আশীতার চরম।

পিগ মানে শুয়োর ছানা

পিগ মানেই শুয়োরের ছানা তা সে গিনিরই হোক আর নিউ গিনিরই হোক। এই নিয়েই গোলমাল—এই নিয়েই ভীষণ তর্ক-বিতর্কের শুরু।

তখনকার দিনে কাঁকুড়গাছি ইস্টিশনে নকুলবাবুই ছিলেন মালবাবু আর স্টেশনমাস্টার। একাধারে দুই।

আমার নকুড়মামারা থাকতেন তখন কাঁকুড়গাছিতে।

কামারহাটি থেকে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একজোড়া গিনিপিগের বাচ্চা উপহার পাঠিয়েছিলেন। সেই মাল খালাস করতে তিনি ইস্টিশনে গেছলেন।

আর সেই মাল নিয়েই তুলকালাম কাণ্ড!

'ন্যায্য মাশুল দিয়ে নিয়ে যান আপনার মাল।' বলেছিলেন নকুলবাবুঃ 'আর তা যদি না দিতে চান তো রেখে যান আপনার মাল। আইন হচ্ছে আইন—আমি তার রদবদল করতে পারব না। আমার সে এক্তিয়ার নেই।'

'কী বলছেন মশাই?' খাপ্পা হয়ে উঠলেন নকুড়মামাঃ 'এইতো আপনাদের আইন। দেখুন না! আপনাদের মাশুলের বইয়েই লেখা আছে। এখানে কি লেখা আছে দেখুন দেখি। লিখে দিয়েছে এই যে সরল ভাষায়—'

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী—যাহা আদর করিয়া পুষিবার মত তাহা—কাঠের বাক্সে ভাল করিয়া পাঠাইলে পঁচিশ মাইলের জন্য তাহার মাশুল"—'কামারহাটির থেকে কাঁকুড়গাছি ক' মাইল মশাই?'—"প্রত্যেকটি জন্য চার আনা করিয়া পড়িবে।"

যাদের নিয়ে এত কাণ্ড সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী দুটি একজোড়া গিনিপিগের বাচ্চা এসব বিতর্কে কান না দিয়ে তাদের ছোট্ট কাঠের বাক্সের খাঁচায় বসে একমনে বাঁধাকপির পাতা চিবুচ্ছিল।

'চার আনা করিয়া পড়িবে!' নকুলবাবু আওড়ালেন—'পড়িলেই হইল—বলিলেই হইল? আদর করিয়া পুষিবার মত! তাই বটে আর কি!'

'আদর করিয়া পুষিবার মত নয়? বলছেন কি? চেয়ে দেখুন দিকি বাচ্চাগুলোকে একবার! গিনিপিগের বাচ্চা কি আদর করে পোষে না মানুষ? কেটে খায় নাকি তাদের ধরে ধরে?' পকেট হাতড়ে তিনি একটি আধুলি বার করলেন—'চার আনা করে প্রত্যেকটির মাশুল হলে, দুটোর হয় চার দু-গুণে আট আনা! এই নিন আপনার আটানা—'

'নেব না আমি আটানা—' জানালেন নকুলবাবু। মাশুলের বইটা হাতে নিয়ে পাতা উলটিয়ে তিনি বললেন -'দেখুন না কি লেখা আছে এখানে—গৃহপালিত জন্তুর মাশুল হারঃ শুকরছানার হার প্রত্যেকটি পাঁচআনা। দেখেচেন?'

'ও তো শুকরছানার দর। গৃহপালিত জন্তুর মাশুল। আর এ হচ্ছে গিনিপিগ—আদরের জিনিস।'

'আদরের জিনিস বুঝি না মশাই! পিগ মানে শুকরছানা। সে গিনির হোক আর নিউগিনিরই হোক—কি আমাদের গোঁসাইপুরের হোক গে। আমি পিগ-এর মাশুল নেব আপনার কাছ থেকে। মানে, দুটোর জন্য আপনাকে দশ আনা দিতে হবে।'

'কোন্ আইনে শুনি?'

'রেলের আইনে। এইত এখানে লেখাই আছে, সন্দেহস্থলে রেলকর্মচারী যে হারটি বেশি সেইটাই চার্জ করিবেন। মালখালাসকারী ইচ্ছা করিলে পরে বাড়তি মাস্তল ফেরত পাইবার জন্য যথাস্থানে দাবি জানাইতে পারেন।

'বেশ। তাহলে জেনে রাখুন, আমি আপনাকে আটানা দিতে গেলাম আপনি তা নিলেন না। তাহলে রাখুন আপনি ওদের—যদ্দিন না আপনার সুমতি সুবুদ্ধি হয়। থাকুক ওরা আপনার হেফাজতে। কিন্তু মনে রাখবেন যদি এদের একটারও কোনো অনিষ্ট ঘটে, তাহলে আমি খেসারতের নালিশ আনব।'

বলে নকুড়মামা তো চটে মটে কাঁকুড়গাছি ইস্টিশনের থেকে চলে এলেন। এসেই বাড়ি ফিরে তিনি লম্বা একখানা চিঠি লিখলেন রেলওয়ের এজেন্টকে। তারপর চিঠিটা ডাকে ছেড়ে দিয়ে বিজয়ীর হাসি হেসে আপনার মনেই বললেন—'এইবার শ্রীমান নকুলচন্দ্রের চাকরি খতম্! হন্যে হয়ে নতুন চাকরি খুঁজে বেড়াতে হবে বেচারাকে। আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছে—ইয়াকি?'

দিন সাতেক পরে লম্বা একটা খামে জবাব এল কোম্পানির থেকে। নকুড়মামা ব্যগ্রভাবে খামখানা ছিঁড়ে ছোট্ট একটুকরো স্লিপ পেলেন তার ভেতর। তাতে লেখাঃ

'ক ৭ ৫ ৯ ৬। বিষয়—গিনিপিগ সম্পর্কে মাশুলের হার।

এজেন্ট-এর উদ্দেশে লিখিত আপনার চিঠি আমরা পাইয়াছি। বাড়তি ভাড়া ফেরত পাইবার জন্য রেলওয়ের ক্লেমস্ বিভাগে আপনার দাবি পেশ করুন।'

পড়ে পত্রপাঠ ছ পাতা ফলাও করে ক্লেমস্ বিভাগে তাঁর চিঠি পাঠালেন নকুড়মামা।

জবাব এল তিন হপ্তা বাদে!

'মহাশয়, আপনার ষোলো তারিখের পত্র অনুযায়ী আমারা কাঁকুড়গাছি স্টেশনে খোঁজ করিয়া জানিলাম যে, আপনি আপনার মাল খালাস লইতে রাজি হন নাই। অতএব বর্ধিত মাশুল ফেরত পাইবার কোনও প্রশ্নই উঠে না! তবে আপনি যদি কামারহাটি হইতে কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত দুইটি গিনিপিগের মাশুলের হার কত হইতে পারে তা অবগত হইতে ইচ্ছুক থাকেন তো আমাদের রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগে লিখিতে পারেন। ইতি—'

সঙ্গে সঙ্গে নকুড়মামা এবারে ন পাতার এক চিঠি ঝাড়লেন ট্রাফিক বিভাগের উদ্দেশে।

ট্রাফিকের বড় সাহেব যথাসময়ে, মানে সাত হপ্তা বাদে সেই চিঠিতে নেকনজর দিলেন! আদ্যোপান্ত পড়ে সব মর্ম অবগত হয়ে আপন মনে তিনি বললেন 'আহা, বাচ্চাদুটো তো এতদিন না খেতে পেয়ে মরেই গেছে বোধ হয়!' বলে তৎক্ষণাৎ তিনি কাঁকুড়গাছিতে খবর পাঠালেন— মালের বর্তমান অবস্থা জানাও।'

বর্তমান অবস্থা জানাও! তলব পেয়ে নকুলবাবুর চোখ কপালে উঠল। উপরওয়ালা কি জানতে চায় শুনি? আমি কি ডাক্তার যে নাড়ি টিপে মালের খবর দেব? গিনিপিগের দেহ পরীক্ষা করতে হলে তো ঘোড়ার ডাক্তার হওয়া লাগে। তবে একটা কথা বলতে পারি, খিদে যদি স্বাস্থ্যের কোনো লক্ষণ হয় তো ওই একরত্তি চেহারার মানুষের পক্ষে ওরা যা খায় আমরা যদি তা খেতে পেতাম ও পারতাম তো বর্তে যেতাম! ভাগ্যিস, ওদের একজোড়াই এখন আছে এখানে। এরকম আরো দু-দশটি থাকলে এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত!

তাহলেও, তাঁর রিপোর্ট আপটুডেট করার মতলবে তিনি সরজমিন তদারকে গেলেন। অফিসের পেছন দিকে একটা বড় কাঠের বাক্সে তাদের রাখা হয়েছিল। ট্রেনের ঘণ্টিমারা লোকটির হেফাজতে।

গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির! একটু আগের কপালে ওঠা চোখ এখন ছানাবড়ার মতন হয়ে গেল।

'ওমা! এর মধ্যেই ছানা পেড়েছে। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত-আট!' তিনি গুনে গেলেন।—'মোটমাট আটজন। 'ইস্, সবকটাই পাগলের মত বাঁধাকপির পাতা চিবুচ্ছে!'

নকুলবাবু কর্তাকে তাঁর জবাবে জানালেন—'দুজনের সংসার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এখন সর্বসাকুল্যে আটজনের পরিবারে দাঁড়িয়েছে। সবাই বেশ সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে রয়েছে। আশা করি আপনিও সেইরকম আছেন। পুনশ্চ - ইতিমধ্যে ওদের খাবার জন্য বাঁধাকপির বাবদে আমার যে দশ টাকা খরচা হয়েছে সেটার জন্যে কি হেড অপিসে বিল করে পাঠাব?'

জবাব এল: 'যাহার মাল তাহার নিকট হইতেই মালের দরুণ যাবতীয় খরচ আদায় করিতে হইবে।'

বললেই হলো! বলে দিলেই হলো! নির্দেশ পেয়ে নকুলবাবুর স্বগতোক্তি শোনা গেল।

'আমি নকুড়বাবুর কাছে বাঁধাকপির বাবদে দশ টাকা চৌদ্দ আনার বিল

নিয়ে যাব, আর অমনি উনি আপ্যায়িত হয়ে বলবেন—'এই যে এসেছেন! আসুন, আজ্ঞাজ্ঞে হোক। এই নিয়ে যান আপনার দশটাকা চৌদ্দ আনা। টাকাটা আমায় কামড়াচ্ছিল, ভারী খুশি হলাম আপনাকে দিতে পেরে।'

তাহলেও কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার নয়। রেলের ভ্যানে চেপে বিল হাতে নকুড়মামার ঠিকানায় গিয়ে কলিংবেল টিপলেন নকুলবাবু!

'এই যে! এসেছেন অবশেষে।' তাঁকে দেখে বলে উঠলেন নকুড়মামা: 'অ্যাদ্দিনে আপনার সুবুদ্ধি হয়েছে তাহলে। গিনিপিগের বাক্সটা এনেছেন তো সঙ্গে করে?'

'না, বাক্স নয়। বিল এনেছি। এতদিন ধরে গিনিপিগদের খোরপোষের খরচা বাবদে দশ টাকা চৌদ্দ আনার খরচা বিল। টাকাটা কি আপনি এখন দেবেন?'

'বাঁধাকপির বাবদে টাকা দিতে হবে?' নকুড়মামা যেন খাবি খেলেন: 'আপনি কি বলতে চান আমার এই দুটো গিনিপিগের বাচ্চা—'

'এখন আর দুটো নেই মশাই, আটটা।' জানালেন নকুলবাবু: 'পিতা মাতা পুত্র কলত্র নিয়ে সর্বসাকুল্যে আটজন।'

এর উত্তরে আমার নকুড়মামা মুখে কিছু আর না বলে দড়াম করে নকুলবাবুর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

'এর মানে?' নকুলবাবু রুদ্ধদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আপন-মনেই আওড়ালেন: 'এর মানে আর আমার জানতে বাকি নেই। মানে হচ্ছে, 'বাঁধাকপির এক চিলতে পাতারও দাম আমি দেব না।' নকুড় দেবে দাম! তাহলেই হয়েছে! চার আনার জায়গায় পাঁচ আনাই দিতে চায় না যে সে দেবে দশ টাকা চৌদ্দ আনা? কঞ্জুষের ধাড়ি কাঁহাকা!'

টারিফ বিভাগের বড়কর্তা ইতিমধ্যে খোদ এজেন্ট সাহেবের ঘরে গিয়ে জানতে চেয়েছেন, গিনিপিগরা পিগ, কি পিগ নয়? ওরা কি পিগ-এর পর্যায়ে পড়বে, নাকি, খরগোস ইত্যাদির ন্যায় ছোট্ট পোষ্য জন্তুর পর্যায়ে পড়ে?

'পিগ-এরই বা কি রেট, পোষ্য জন্তুরই বা কি?' শুধিয়েছেন এজেন্ট।

'পিগ হলে পাঁচ আনা আর খরগোস জাতীয় হলে চার আনা।' জানালেন টারিফএর বড় কর্তা: 'এখন কথা হচ্ছে এগুলি খরগোস, না, শূকর গোষ্ঠীর—কী ওগুলো?'

'শুয়োর আর খরগোসের দুই স্টেশনের মাঝামাঝি কোন হলটিং স্টেশনের বলে আমার মনে হয়—' ঘাড় চুলকে বললেন এজেন্ট সাহেব: 'যাই হোক, এ সম্বন্ধে বিলেতে গর্ডন সাহেবকে আমি লিখছি। তিনি এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। জন্তুজানোয়ারদের ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই। কাগজ-পত্র সব আমার টেবিলে রেখে যান।'

চিঠি গেল গর্ডন সাহেবের কাছে। কিন্তু তিনি তখন খাস বিলেতে ছিলেন না। উত্তরমেরুতে দুর্লভ প্রাণীর খোঁজে বেরিয়েছিলেন এক আবিষ্কার অভিযানে। সেই চিঠি তাঁর উদ্দেশে ঠিকানা বদলে চলল। স্থান থেকে স্থানান্তরে ঠিকানার বদল হতে হতে চলল।

এজেণ্ট সাহেব ভুলে গেলেন গিনিপিগের কথা। টারিফের বড় কর্তাও বিস্মৃত হলেন। এমন কি, আমার নকুড়মামারও তা আর মনে রইল না।

কিন্তু বেচারী নকুলবাবু ভুলতে পারলেন না।

হেড অফিসে তাঁর চিঠি এল একদিন—তার মর্ম: 'সেই গিনিপিগদের নিয়ে কি করব? যে হারে তাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে এবং যেমনটি দেখছি তাতে মনে হয়, তাদের জীবনে বিবাদ বিসম্বাদ মারামারি খুনোখুনি বলে কিছু নেই এবং এ পর্যন্ত তাদের কেউ একটা আত্মহত্যাও করেনি। বত্রিশ জনায় দাঁড়িয়েছে এখন। কমতির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খেয়ে খেয়ে আমার ভুষ্টিনাশ করছে তারা সবাই। এমতাবস্থায় কি করব আমি? বেচে দেব কি? চট্‌পট্ জানান।'

উপরওয়ালা পত্রপাঠ তার পাঠালেন—'না, বেচিবে না।'

তারপরে বিস্তারিত চিঠি এল কর্তার কাছ থেকে, তাতে বিশেষ ভাবে জানানো: 'উক্ত মালগুলি রেল কোম্পানির নয়, ঐগুলি কেবল আমাদের হেফাজতে রহিয়াছে। বিবাদের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সেই ভাবেই থাকিবে। ঐগুলি দান বিক্রয়ের কোনও অধিকার আমাদের নাই। তুমি যথাসম্ভব যত্নসহকারে উহাদের তত্ত্বাবধান করিবে।'

চিঠি হাতে নিয়ে নকুলবাবু গিনিপিগদের মুলাকাত করতে গেলেন। তারপরে মিস্ত্রি মজুর লাগিয়ে আপিসের একধারে থাকে থাকে বিরাট উঁচু এক সেলফ্ বানালেন। তার খুপরিতে খুপরিতে যত গিনিপিগরা শোভা পেতে লাগল। খুপরিগুলি এমনভাবে বানানো যাতে বেশ হাওয়া বাতাস খেলতে পায়। মুক্ত বাতাসে মনের আনন্দে থাকতে পারে তারা। তারপর তাদের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করে দিয়ে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

অবশেষে কয়েক মাস বাদে একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি লম্বা একটা কাগজের শীটে লিখলেন—১৬০; পাতা-জোড়া বড় বড় হরফে শুধু ঐ একটি সংখ্যা। আর কিছু না। তারপর সেই কাগজখানা তিনি হেড অফিসে পাঠিয়ে দিলেন।

হেড অফিস থেকে জানতে চাইল—একশো ষাট মানে কি?

'ঐ হতভাগা গিনিপিগের বাচ্চা। দোহাই আপনাদের, ওর কতকগুলো আমায় বেচতে দিন। নইলে আমি ক্ষেপে যাব। আপনারা কি চান আমি পাগল হয়ে যাই?' জবাব গেল নকুলবাবুর।

'বেচিবে না! খবর্দার।' চট্‌পট্ জবাব এল হেড আপিসের—'উহাদের একটিও বেচিবার আমাদের অধিকার নাই।'

এর কিছুদিন পর গর্ডন সাহেবের জবাব এল বিলেত থেকে। সাহেব তাঁর চিঠিতে বহুত ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন যে গিনিপিগদের আদৌ শূকর জাতীয় বলা যায় না! বরং ওরা খরগোস গোষ্ঠীর। তবে ওদের বিশেষত্ব যে খুব ক্ষিপ্রগতিতে ওরা বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

এজেণ্ট চিঠি পেয়ে টারিফ সাহেবকে খবর দিলেন, চার আনা করে চার্জ

নাও। টারিফসাহেব নথিপত্র সব অডিট বিভাগে পাঠিয়ে দিলেন। তাতে নজর দিতে অডিট সাহেবের কদিন গেল। অবশেষে নকুলবাবুর কাছে হুকুম এল—'একশো ষাটটি গিনিপিগের বাবদে মালের প্রাপকের নিকট হইতে প্রত্যেকটির জন্য চার আনা হারে চার্জ করিবে।'

নকুলবাবু তখন গিয়ে গিনিপিগদের নিয়ে পড়লেন। পেল্লায় দুটো খাঁচা বানিয়ে তাদের সবগুলোকে ধরে প্রথমে খাঁচার ভেতর পুরে ছোট্ট একটা দরজার মত ছ্যাঁদা দিয়ে দ্বিতীয় খাঁচার ভেতরে পাচার করতে লাগলেন আর গুনতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে।

নকুলবাবু চিঠি দিলেন হেড আপিসে আবার—'আপনাদের অডিট বিভাগ গিনিপিগদের চেয়ে ঢের পিছিয়ে পড়েছে। তারা এখন আর একশো ষাট নেই। মা ষষ্ঠীর দয়ায় ষাটের বাছারা এখন প্রায় আটশোর কাছাকাছি। আমি এখন এই আটশোর প্রত্যেকটার জন্যেই কি চার আনা করে চার্জ করব? ওদের খাওয়াতে পরাতে বাঁধাকপির বাবদে যে দুশো টাকা ব্যয় হয়েছে তারই বা কি হবে?'

তারপর কিছুদিন ধরে উভয় পক্ষের অনেক চিঠি চালাচালি হল! কি করে অডিট বিভাগের হিসাবের গলদে আটশোর জায়গায় একশো ষাট হল তার অনুসন্ধানে সময় গেল কম নয়। আরো কিছু সময় গেল অডিট বিভাগের পক্ষে বাঁধাকপির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে।

এদিকে নকুলবাবুর দুর্গতির অন্ত নেই। আপিস থেকে প্রায় দূর হবার মতই অবস্থা। গোটা আপিস জুড়ে খালি গিনিপিগ আর গিনিপিগ। মেজেয়, চেয়ারে, টেবিলে, মাল ওজনের মেশিনের ওপর গিনিপিগেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। খিদের জ্বালায় তারা কাউন্টারে উঠে বিভিন্ন ইস্টিশনের টিকিট ফিষ্টি করে খেয়ে চিবিয়ে শেষ করে দিচ্ছে সব। কিছু বলবার নেই। টিকিট বেচার ঘুলঘুলির কাছে কোনরকমে হাত পা তুলে বসে তিনি যথাসম্ভব তত্ত্বাবধানতা সহকারে গিনিপিগদের হটাচ্ছেন। আপিসের ঐ তিন চার ফুটের মধ্যেই এসে ঠেকেছেন তিনি এখন। গিনিপিগরা কোণঠাসা করে দিয়েছে তাঁকে। উপরের আপিস থেকে উচিত চার্জ নিয়ে আটশো বাচ্চাকে দিয়ে দিবার হুকুম যখন এল, তখন গিনিপিগরা সংখ্যায় আরো বেড়ে গেছে। আর নকুলবাবুর নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই তখন। লোক লাগিয়ে, নিজে লেগে, বড় বড় কাঠ চিরে ফালি ফালি করে লম্বা লম্বা সেলফ বানাচ্ছেন তিনি গিনিপিগদের জন্য। স্টেশনের মালগুদামেই ভরবেন সবাইকে। চার চারজন চাকর লেগেছে গিনিপিগদের সেবাশুশ্রূষার জন্য। গাড়ি গাড়ি বাঁধাকপির অর্ডার দিয়েছেন।

গুদাম জোড়া গিনিপিগ কালোনী তৈরি করে সবার পুনর্বাসন করে কদিন পরে তিনি হেড আপিসের হুকুম পড়ার ফুরসত পেলেন। গিনিপিগদের সেনসাস তখন দাঁড়িয়েছে চার হাজার ষাট! এবং আরো আরো আরো তারা আসছে। দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিনিটে মিনিটে।

এমন সময়ে অডিট বিভাগ থেকে আরেকটি হুকুমনামা এল।—'গিনিপিগের

বিলে সামান্য ত্রুটি হইয়াছে। দুইটি গিনিপিগের মাশুল আট আনা মাত্র আদায় করিয়া সমস্ত গিনিপিগ প্রাপককে দিয়া দিবে।'

এই খবর পেয়ে নকুলবাবু এবারে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠলেন। হ্যাঁ, এইবার এতদিনে মাল খালাস হবে। নিতে রাজী হবেন নকুড়বাবু। তৎক্ষণাৎ তিনি মালের বিল-বইয়ের একটি পাতায় খসখস করে আট আনার বিলটা লিখে ফেললেন। আর সেই বিল নিয়ে দৌড়লেন নকুড়বাবুর বাড়ির দিকে।

বাড়ির দরজায় পেঁছে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল হঠাৎ! বাড়িটা যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। জানালায় পরদা টাঙানো নেই, জানালাগুলি খোলা। খাঁ খাঁ করছে ভেতরটা, হাঁ হাঁ করছে সারা বাড়ি। জানালার ভেতর দিয়ে ফাঁকা বাড়ি তাঁর দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টি হানতে লাগল। উপরে চোখ তুলে দেখলেন, বারান্দায় রেলিং থেকে একটা কাঠের বোর্ড ঝুলছে, তাতে 'To Let' এর নোটিশ লটকানো।

আবার দৌড়তে দৌড়তে তিনি ফিরে এলেন স্টেশনে! তাঁর অনুপস্থিতির অবকাশে আরো উনসত্তরটি গিনিপিগের জন্ম হয়েছে। আবার তিনি ছুটলেন নকুড়বাবুর পাড়ায়—ঐ অঞ্চলের পাড়াপড়শীর কারো কাছে খোঁজ নিয়ে নকুড়বাবুর ঠিকানা পাওয়া যায় কিনা। বা তিনি পাড়ার আর কোথাও গিয়ে যদি উঠে থাকেন। না, তিনি ঐ এলাকাতেই নেই। কাঁকুড়গাছির তল্লাট ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাঁর খবর দিতে পারল না কেউ।

স্টেশনে ফিরে এসে তিনি দেখলেন তাঁর অবর্তমানে আরো দুশো ষাটটি গিনিপিগ ধরাধামে এসে উপস্থিত।

অডিট বিভাগকে তার করে দিলেন নকুলবাবু—'দুটি গিনিপিগের দরুন আট আনা মাশুল আদায় করতে পারলাম না। নকুড়বাবু এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। বর্তমান ঠিকানা কেহই জানে না। এ অবস্থায় কী করব?'

হেড আপিস থেকে জানাল—যাবতীয় মাল পত্রপাঠ হেড আফিসে পাঠাইয়া দাও।

খবর পাবামাত্রই কাজে লেগে গেলেন নকুলবাবু। আর, যে আধ ডজন চাকরকে লাগিয়েছিলেন তারাও কাজ করতে লাগল। সবাই মিলে কাঠ চিরিয়ে লোহার পাত মুড়ে পেরেক ঠুকে বড় বড় প্যাকিং বাক্স বানাতে লাগল। আর সেই সব বাক্স ভর্তি করে গিনিপিগদের তিনি চালান করতে লাগলেন ওয়াগন বোঝাই—হেড আপিসের উদ্দেশে। হন্যে হয়ে দিনের পর দিন এই হল সবার কাজ।

এক সপ্তাহে সাতটা ওয়াগন বোঝাই করে দুশো নিরানব্বই বাক্স গিনিপিগ তিনি পাচার করলেন। কিন্তু এই সাতদিনে আরো সাতশো সাতাশটা গিনিপিগ এসে হাজির হয়েছে।

হেড আপিস থেকে হঠাৎ জরুরি তার এল—আর গিনিপিগ পাঠাইতে হইবে না। পাঠাইবে না খবর্দার। এখানকার গুদাম ভর্তি হইয়া গিয়াছে। গুদাম উপচাইয়া পড়িতেছে। অতএব প্রেরণ বন্ধ কর।

'না, বন্ধ করিতে পারিব না' কেবল এই কথাটি তারযোগে জানাবার জন্যই নকুলবাবু কয়েক মিনিট থামলেন। তার পরেই পূর্ববৎ প্যাক করতে লাগলেন গিনিপিগদের।

পরের ট্রেনে হেড আপিস থেকে ইনস্‌পেক্টার সাহেব ছুটে এলেন। তাঁর ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল—যেমন করে পারো গিনিপিগদের এই স্রোত থামাও। তাঁর গাড়ি এসে কাঁকুড়গাছিতে যখন থামল, তিনি দেখলেন, রেললাইনে তিনটে ওয়াগন পর পর দাঁড়িয়ে। দুটি ওয়াগন গিনিপিগে বোঝাই হয়ে ছাড়বার জন্য তৈরি, আর তৃতীয়টিতে তখনও বোঝাই হচ্ছে।

নকুলবাবুর ছ'জন চাকর মাল বয়ে আনছে, ওয়াগনে তুলছে, আবার খালি প্যাকিং বাক্স নিয়ে খাড়া হচ্ছে নকুলবাবুর সামনে। আর নকুলবাবু ক্ষুদ্র দু হাতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে মস্ত বড় এক বেলচা নিয়ে লেগেছেন, বেলচা দিয়ে গিনিপিগদের তুলে তুলে প্যাকিং বাক্স ভরাট করছেন।

গিনিপিগদের উপসর্গ চুকিয়ে দেবার জন্য তিনি মরীয়া।

'এই ওয়াগনটা ভর্তি হলেই হয়ে যায়। এতদিনে ফয়সলা!' ইনস্‌পেক্টারের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন: 'না মশাই, এর পরে আর আমি গিনিপিগদের ব্যাপারে নেই। ভয়ংকর একটা ফাঁড়া আমার কাটল।—' বলার সাথে সাথে তাঁর হাতের বেলচাও চলতে লাগল। বাক্স ভরতে ভরতে দম নিয়ে তিনি বললেন—'এর পরে আর জন্তুজানোয়ারের ভাড়া নিয়ে কোনদিন আমি মাথা ঘামাবো না। শুয়োরই হোক কি গরুই হোক কি গাধাই হোক, গণ্ডারই হোক কি হাতিই হোক আমার কাছে সবার ঐ এক মাশুল—চার আনাই—'

ইনস্‌পেক্টার তো ব্যাপার দেখে হতভম্ব।

'হ্যাঁ, আমার কাছে গিনিপিগের বাচ্চা আর হাতির বাচ্চার এক রেট এক হার। এরপর এই নিয়ে আর দ্বিতীয়বার কেউ আমায় পিগ বানাতে পারবে না—জানোয়ার নিয়ে এসে আবার আমায় বোকা বানাবে এমন জানোয়ার আমি নই। তোবা তালাক—তোবা তালাক—তোবা তালাক! এই ওয়াগন ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাস্নান করে ফিরব। বাবা, পূর্বজন্মের কত পাপের কে জানে, আজ প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল আমার।'

যে গুটি কয় গিনিপিগ তখনো বাকি পড়েছিল বেলচায় তুলে বাক্সে ভরে দিয়ে কাজ খতম করে নকুলবাবু যেন অকূল পাথার থেকে সাঁতার কেটে উঠলেন। কূল পেয়ে কপালের ঘাম মুছে খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই তাঁর মুখে মন্দমধুর হাসি ফুটে উঠল—'যাই বলুন, মন্দের ভাল আছে বই কি! সে কথা বলতেই হবে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই। মনে করুন, এগুলো গিনিপিগের বাচ্চা না হয়ে যদি হাতির বাচ্চা হোত? তাহলে?'

'প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে' চাণক্য বলে গেছেন, 'পুত্রমিত্রবদাচরেৎ!' কিন্তু সে পুত্রই যদি বদ হয় তাহলে তার সঙ্গে কি রকমের আচরণ করবে, সে বিষয়ে চাণক্যের একটা কিছু বাতলে যাওয়া উচিত ছিল, বাবা এই কথা ভাবছিলেন। কিন্তু বদ হলেও ছেলেকে তো একেবারে বধ করা যায় না—বিশেষ যদি সে নিজের ছেলে হয়।

কিন্তু যারা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারা বলল, 'অত দুঃখ করছেন কেন মশাই? একেবারে না হোক, এক কোপে না হোক, ছেলেটাকে তো আপনি তিলে তিলে বধ করছেনই! বলতে কি, আদর দিয়ে দিয়েই ওর মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছেন আপনি।'

এ কথায় বাবা সান্ত্বনা পান না! ছেলেকে আদর করবেন না, তো কী করবেন? পরের ছেলে কাকে আবার আদর করতে যাবেন গায় পড়ে? আজ সকালেই তাঁর ষোড়শবর্ষীয় ছেলে তাঁর সঙ্গে ঘোরতর কলহ করে বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে। কলহের হেতু এমন কিছু না! উল্লেখের অযোগ্য একটা যা-তা ছুতো উপলক্ষ করে—এক ধারে বাবার গোঁ, অন্যদিকে ছেলের গোঁয়ারতুমি—যা নিয়ে সচরাচর যাবতীয় বাবা আর যতো ছেলের মধ্যে সনাতন দ্বন্দ্ব—সেই যৎসামান্য অছিলা থেকেই, নিউটনের আপেল-পড়ার মতো, অভাবিত অভাবনীয় এই বিপর্যয়।

দিকে দিকে, এদিকে-ওদিকে, দিগ্বিদিকে তিনি লোক পাঠিয়েছেন ছেলের খোঁজে! অবশেষে খবর এল, ছেলে কদমতলা ইস্টিশনে হাওড়া-আমতা রেলগাড়ি

ধরে পিট্টান দিয়েছে। কদমতলার ছেলে কদমতলা ইস্টিশনেই চাপবে, এতে বিস্ময়ের কিছু না ; কিন্তু সেই লোকটির মারফত ছেলের যে-চিরকুট পেলেন, তাই পড়েই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়েছে। হতবাক হয়ে গেছেন তিনি।

তাতে লেখা ছিল ঃ "বাবা, তুমি মিছে আমার অনুসন্ধান কোরো না। আমার খোঁজ পাবে না। এখান থেকে সোজা আমি করাচী চললাম। সেখানে এয়ার্‌ট্রেনিং নিয়ে, পাইলট হয়ে সরাসরি যুদ্ধে যাব। আমার জন্যে ভেবো না তুমি। আমার জন্যে ভাবনার কি আছে? আমি—আমি তো মারা যাব না! সহজে মরবার ছেলে আমি নই, তা তুমি বেশ জানো। আর আমিও এইটুকু বলতে পারি। ইতি—"

চিরকুট পড়ে বাবা বললেন—"য়্যাঁ? হাওড়া-আমতার রেলগাড়ি চেপে করাচী চললাম কী রকম? ও গাড়ি তো করাচী অব্দি যায় না। ও তো আমতায় গিয়েই থেমে যাবে, যদ্দুর আমি জানি।"

কিছুক্ষণ তিনি আমতা-আমতা করলেন। তারপরেই একটা ট্যাক্সি ডেকে যে-কাপড়ে ছিলেন, সেই কাপড়েই, হাফ-হাতা-জামা গায়ে আর তালিমারা জুতো পায়ে, হাওড়া-আমতা করতে করতে, ভোঁ—ভোঁ—ভরর্—ভর্র্—ভর্র্র্র্ —সবেগে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

সান্তবনাদাতারাও বলতে-বলতে চলে গেল—হতাশ হয়ে চলতে-চলতে বলে গেল "—যান, ছেলে করাচী গেছে, আপনিও ওর কাছাকাছি যান—রাঁচিতেই চলে যান না হয়।"

ট্যাক্সি চেপে যেতে-যেতে বাবা মনে-মনে মানসাঙ্ক কষেন—কদমতলায় গাড়ি চেপেছে আটটা-চারে ; এতক্ষণে সে গাড়ি বলটিকারি, বাঁক্ড়া, শালাপ—এ সমস্ত পেরিয়ে গেছে নিশ্চয়! এখন আন্দাজ নটা-পনেরো? তাহলে কুন্তলিয়া, মাকড়দা, ডোমজুড়—এ সব স্টেশন পার হয়ে গেছে। আটটা-চারে কদমতলায় চাপলে, মাকড়দায় পোঁছুতে আটটা-চল্লিশ—ডোমজুড় আটটা-একান্ন —দক্ষিণবাড়ি নটা-দুই! (হাওড়া-আমতা লাইনের গাড়িটা কখন-কখন ছাড়ে, কোথায় ছাড়ে আর কোথায় ধরে, লেট খেতে-খেতেও কখন কোথায় ধরা পড়ে, এসব-নামতার মতন বাবার নখদর্পণে!) তাহলে তাকে ধরতে হলে ধরতে হবে—সেই গিয়ে বারগাছিয়ায়। বারগাছিয়ার জংশনে! তার এধারে নয়। বারগাছিয়ায় গাড়ি পোঁছুবে নটা-আঠারোয় আর ছাড়বে নটা-ছাব্বিশে। এই আট মিনিটের ফাঁকেই হতভাগাকে হাতে-নাতে পাকড়াতে হবে। করাচীতে পোঁছুবার ঢের আগেই।

হাওড়া-আমতা-রেলগাড়ির গার্ডের কাছে এ-অঞ্চলের যাত্রীরা সব মুখস্থ। কে যে কোথায় ওঠে আর কোথায় নামে, কারা কোন্ ইস্টিশনের, কার দৌড় কদ্দুর, তা তাদের দেখলে তো কথাই নেই, না দেখেও বলে দিতে পারেন। এবং এ-গাড়ির যাত্রীরা যে কোন্ গাঁই গোত্রের, তাও গার্ডবাবুর জানতে বাকি নেই।

এই কারণে হাওড়া-আমতা ফাস্ট্-প্যাসেঞ্জারের গার্ড যখন কদমতলা

ইস্টিশনে বছর-ষোলোর এক ফুটফুটে ছেলের কলেবরে একেবারে এক আনকোরা অচেনা মুখ, একখানা ফার্স্ট-ক্লাস কামরা একলাই দখল করল দেখলেন, তখন তাঁর বেশ-একটু বিস্ময় হলো! ছেলেটিকে দেখে, তার সোনার হাত-ঘড়ি, বুক-পকেটে দামী ফাউণ্টেন, পায়ের পাম্পশু, কর্ডের হ্যাফপ্যাণ্ট আর স্মার্ট চক্‌চকে চেহারার সঙ্গে শার্কস্কিনের ঝকঝকে জামা মিলিয়ে দেখলে,—না কোনো জমিদারের জামাই বলে মনে না হলেও, যে-কোনো বড়লোকের ছেলে বলে সন্দেহ হয় বই কি! হাওড়া-আমতা-রেলগাড়ির কামরাতে এই দৃশ্য অতি দৈবাৎ আর অতীব বিরল। কিন্তু তাই যে তাঁর বিস্ময়ের একমাত্র হেতু, তা বললেও হয়ত অত্যুক্তি হবে। অথচ এই সমস্ত জড়িয়েই তিনি নিজেকে বিস্ময়-জর্জর বোধ করছিলেন।

কে এই ছেলেটি? কোত্থেকে এল? কাদের ছেলে? আর যাবেই বা কোথায়? গাড়ির আন্দোলনের সঙ্গে মিশে এই সব প্রশ্ন তাঁর মনে রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল।

এবং এই আলোড়ন একেবারে উত্তাল হয়ে উঠল, যখন বারগাছিয়া ইস্টিশনের প্লাটফর্মে তাঁর গার্ড-কামরার কাছাকাছি বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন ছাড়বার পূর্ব-মুহূর্তে তিনি দেখলেন—হাফ হাতা জামা গায়, আধ-ময়লা কাপড়-পরা, উসকো-খুসকো এক মুশকো লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল এবং ঐটুকু সময়ের ফাঁকেই গাড়ির এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক কামরার মধ্যে কুটিল কটাক্ষ হেনে এক-চক্করে ঘুরে এল—যেন গোটা গাড়িটাকেই তার হাঁ করে গেলবার মতলব! অবশেষে প্রথম শ্রেণীর কামরার কাছে এসে চক্ষের পলকে স্থগিত হয়ে পড়ল সে! কামরার মধ্যে যেন সে গোলকুণ্ডার হীরার খনি আবিষ্কার করেছে, তার গোল-গোল চোখ দুটো জ্বলে উঠলো এমনি করে! হাওড়া-আমতা ফাস্ট্-প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু এ-সমস্তই স্পষ্ট দেখলেন।

এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি পতাকা উড়িয়ে বাঁশি বাজিয়ে দিলেন. গাড়িও ছেড়ে দিলো; আর সেই মুশকো লোকটাও ইঞ্জিন আর গার্ড-কামরার মাঝামাঝি একটা তৃতীয় শ্রেণীর হাতল হাতের কাছে পেয়ে তাই ধরেই এক ঝট্‌কায় উঠে চট করে সেঁধিয়ে গেল গাড়ির ভেতর।

গাড়ি বারগাছিয়া ছাড়ল, আর গার্ডের উত্তেজনাও সীমা ছাড়ালো!

প্রথম দর্শনেই তিনি পরিষ্কার বুঝে ফেললেন—এই মুশকো লোকটি আস্ত একটা বদমাশ, পাক্কা ডাকাত এক নম্বরের। কোন এক বড়লোকের ছেলে হাতঘড়ি-ফাউণ্টেন পেন লাগিয়ে এই গাড়িতে চলেছে, কোত্থেকে এই খবর পেয়ে রাহাজানির মতলবে পিছু-পিছু ধাওয়া করে এসেছে। বারগাছিয়াতেই ছেলেটার নাগাল মিলবে—এমনও হতে পারে—হয়তো আগে থেকেই তার জানা ছিল।

কলকাতার থেকে যতগুলো রহস্য-রোমাঞ্চ-সিরিজের শস্তা গোয়েন্দা-কাহিনী বেরোয়, আমাদের গার্ডবাবুটি তার এক একনিষ্ঠ পাঠক। এবং তাঁর পড়াশোনা যে ব্যর্থ হয়নি, বিফলে যায়নি, কেবলমাত্র আকার-প্রকার দেখেই এই মুশকো লোকটিকে বুঝতে পেরে তার মতলবের আঁচ করতে পারাতেই তার চূড়ান্ত প্রমাণ!

সেই সব রোমাঞ্চকর বইয়ে যা পড়েছেন, যে সব কাণ্ড ঘটতে দেখেছেন, তাই কিনা আজ তাঁর গাড়িতেই ঘটতে চলল! ভাবতে-ভাবতে তাঁর উত্তেজনা একেবারে চরম সীমায়।

কিন্তু তিনি আর কি করতে পারেন? আইনত তাঁর কতটুকু ক্ষমতা?

বড় জোর লোকটার কাছে গিয়ে টিকিট চাইতে পারেন। যদি সে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখিয়ে দ্যায়, তাহলেই তো চিত্তির! কোনো ট্যা-ফোঁই চলবে না তারপর। আর যদি নিতান্তই বিনা টিকিটেই উঠে থাকে, তাহলে বাড়তি গাড়িভাড়া জরিমানা-সমেত ধরে দিলেই ব্যস্! চুকে গেল সব!

দেখতে-দেখতে আর ভাবতে-ভাবতে পাতিহাল এসে পড়ল। পাতিহালে থামতেই চারধারের হালচাল দেখবার জন্যে গার্ডবাবু নামলেন। মুশকোর কামরার ধার ঘেঁসে যাবার সময় তাঁর চোখ পড়ল লোকটির পানে। কনুইয়ের ওপর মাথা রেখে সে যেন কী ভাবছে দেখলেন আড়চোখে। কি করে তার কাজ হাশিল করবে, সেই মতলবই ভাঁজছে নিশ্চয়!

হাওড়া-আমতা ফাস্ট্-প্যাসেঞ্জারের গার্ড নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে ফিরে এলেন।

পাতিহাল থেকে গাড়ি ছাড়ল, কোনো অঘটন ঘটল না। সেই বদ্ লোকটাও কামরা বদলালো না, গার্ডবাবু তাকিয়ে দেখলেন। দেখে একটু অবাক হলেন।

পাতিহালের পরের ইস্টিশন—মুন্সীরহাট। সেখানে ট্রেন পেঁছুতেই মুশকোটা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। এখানে নেমে এখান থেকেই সরে পড়বে নাকি? নিজের মুন্সীয়ানা না দেখিয়েই? আঃ, বাঁচা যায় তাহলে! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে! গার্ডবাবুও লোকটার গতিবিধির দিকে নজর রাখলেন।

কিন্তু না, লোকটা গেটের দিকে এগুলো না! প্ল্যাটফর্মের এক ধারে দাঁড়িয়ে কিসের যেন অপেক্ষা করতে লাগল। ওর কি আরো সঙ্গী-সাথী আছে না কি? তারা সব এখানে এসে জুটবে বুঝি? গার্ডবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। অর্ধেক লোক না উঠতে-নামতেই আধ-মিনিটের মধ্যে হুইশল ফুঁকে গাড়ি ছাড়বার হুকুম বাজিয়ে দিলেন।

তারপর গার্ডবাবু নিজের কামরার পা-দানিতে পা না দিতেই সেই দুশমন লোকটা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো সেই প্রথম শ্রেণীর কামরায়। যে কামরায় সেই অসহায় ছেলেটি একেবারে একলাটি রয়েছে। এদিকে গাড়িও তখন ছেড়ে দিয়েছে।

গার্ডবাবুর মাথা ঘুরতে লাগলো। এখন তাঁর কর্তব্য কী? অ্যালার্ম দিয়ে এই দণ্ডেই গাড়ি থামিয়ে লোকটাকে হাতে-নাতে পাকড়ানো? কিংবা বিপদ বুঝে ছেলেটা নিজেই চেন টেনে গাড়ি থামাবে সেই আশায় বসে মুহূর্ত গোনা?

মুন্সীরহাট থেকে মাজু—পরের ইস্টিশনে পেঁছুতে পনের মিনিটের ধাক্কা। এ-লাইনের এধারে এই দুটো ইস্টিশনের মাঝখানের সময়ই সবচেয়ে বেশি। আর-আর সব ইস্টিশন পাঁচ-মিনিট সাত-মিনিট বাদ বাদ।

এখন মুন্সীরহাট থেকে মাজু—এর মাঝামাঝি কী ঘটে কে জানে!

প্রথম শ্রেণীর জানালায় ছেলেটি বিস্ফারিত নেত্রে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল—তার হুঁশ ছিল না কোনোদিকে। বাবা আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে বসলেন। নরম গলায় ডাকলেন—"খোকা!"

ছেলে চমকে উঠে ফিরে বসল: "এ কি! বাবা! তুমি? তুমি এখানে? তুমি এখানে এলে কি করে?"

"রাগ করিসনে খোকা! বাড়ি চল।" বাবার গদগদ কণ্ঠ।

"না না—কিছুতেই না। প্রাণ থাকতে আমি বাড়ি যাব না।" ছেলেটির সশস্ত্র জবাব: "আমি যুদ্ধে যাবো।"

"উঁহু।" বাবার মৃদু প্রতিবাদ। "উঁহুহু।"

"যাবই আমি।" ছেলের তরফ থেকে আবার অস্ত্রের ঝনঝনা! বাবার মুণ্ডু ঘুরে যায়। ঘুরে গিয়ে ছেলেটির সামনে এসে বসেন।

"না, যুদ্ধে যায় না। যুদ্ধে যেতে নেই।" তিনি তাকে বোঝাতে থাকেন: "তাছাড়া এরোপ্লেন কতো উঁচুতে ওড়ে জানিস? অত উঁচু থেকে তুই পড়ে যেতে পারিস!"

"পড়ে যাই যাবো, আমি যাবো। পড়ে মরে যাই, সেও ভাল। আমার কে আছে?"

"আমার কে আছে—তার মানে?" এবার বাবার রাগ হয়। এমন জলজ্যান্ত বাবা থাকতে ছেলে বলে কি না—আমার কে আছে!—এমনি ছেলের কথা!

তিনি রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন, তার চোখ থেকে যেন আগুন ফেটে বেরোয়—"বটে! তোর কে আছে? কে আছে দেখতে পাচ্ছিস নে? তোর বাবাই আছে! তোর বাবা এই—এইখানেই রয়েছে! থ্যাক চাপড়ে দেখিয়ে দেব নাকি? বাড়ি যাবিনে, বটে? ঘাড় ধরে নিয়ে যাবো। দেখি, কোন্ ব্যাটা আটকায়!"

বাবার এমন রূপ ছেলে এর আগে আর কখনো দ্যাখেনি। সে হকচাকিয়ে চেয়ে থাকে।

বাপ হাত বাড়িয়ে ছেলের কান ধরে টান লাগান।

না, বাবার হাতে এমন অপমান অসহ্য! ছেলে চারধারে তাকায়—গাড়ির কাঁধে লাগানো একটা নোটিশের ওপর তার নজর পড়ে যায়। হাওড়া-আমতা-রেলোয়ে খুব সম্ভব তার উপকারের জন্যই যেন নোটিশখানা ওখানে ঝুলিয়ে রেখেছে। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় উক্ত নোটিশে লেখা:

থামাতে হলে এ ট্রেন (হাওড়া-আমতা বলছেন)
টানো ধরে এই চেন!

এবং সেই সঙ্গে সরল গদ্যে (গদ্য কবিতাই খুব সম্ভব!) সতর্ক করে দেওয়া যে—অকারণে বা অপ্রচুর কারণে চেন টানলে তার শাস্তি—নগদ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।

গদ্য রচনার দিকে মনোযোগ দেবার মতো মনের অবস্থা নয় তখন ছেলের! অতএব থামাতে হলে এ ট্রেন, টানো ধরে এই চেন! আর এক-মুহূর্ত

বিলম্ব না করে হাওড়া-আমতার সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ছেলে চেন ধরে দিলে এক টান।

চেন-টানার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার চেহারা বদলে গেল। উছলে-ওঠা বীররস মুহূর্তে করুণ রসে প্রগাঢ় হয়ে এলো। কাঁদো-কাঁদো স্বরে তিনি বললেন—"য়্যাঁ, কী করলি? এ তুই কী করলি! কী সর্বনাশ করলি তুই! আমি যে টিকিট কেটে আসিনি রে! বিনা-টিকিটে উঠে পড়েছি গাড়িতে! গার্ডের হাতে ধরা পড়ে যাব যে!"

"তার আমি কী জানি!" ছেলে বলল—"আমি—আমি কি—" বলতে বলতে ছেলেও যেন ভয় খেয়ে থেমে যায়।

চেন ছেড়ে দিলেও সে-চেন তখনো ঝুলছিল। চেন ছেড়ে দিলেই আবার তা রবারের মত আগের রূপে ফিরে ফের নিজমূর্তি ধারণ করবে এমনি একটা ধারণা বুঝি তার ছিলো। কিন্তু চেনকে এখন অসহায়ের মত বোঝুলামান দেখে, এই হঠকারিতার দ্বারা হাওড়া-আমতা-রেলোয়ের না জানি, কী সর্বনাশ সে সাধন করেছে ভেবে কাহিল হয়ে পড়ল ছেলেও।

এদিকে গাড়িও আস্তে আস্তে থেমে আসছে।

"কী হবে বাবা?" ছেলে দিশেহারা হয়ে কি করবে ঠিক না পেয়ে, বাপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েঃ "গাড়ি যে থেমে যাবে এক্ষুনি? আর এক মিনিটের মধ্যেই—গার্ড-ফার্ড এসে পড়বে সব্বাই!"

বাবাও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলেন!

তাঁর মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি খ্যালে। তিনি ঝট্ করে গাড়ির মেঝেয় লুটিয়ে পড়েন—সটান!

"আমি ফিট হয়ে গেছি। যাই ঘটুক, এই কথাই বলবি যে, আমার মূর্ছা দেখে ভয় পেয়ে তুই গাড়ির শেকল টেনেছিস। বুঝলি?"

"তুমি ফিট হয়েছ আর আমি শেকল টেনেছি! এই তো? এই তো? এ আর বুঝব না?"

"তাহলেই দুদিক রক্ষা! বুঝলি তো? তোর দিক আমার দিক। আমার বিনা-টিকিটে গাড়ি চড়া—আর তোর বিনা-প্রয়োজনে চেন-টানা।"

বলতে বলতে তিনি দুই চোখ বোজেন, আর ট্রেনও বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়।

চেনে টান পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের গার্ডবাবুর হয়ে এসেছিল! তার হ্যাঁচকা টান কেবল গাড়িতে নয় তাঁর নাড়ীতে পর্যন্ত গিয়ে লেগেছিল। এতক্ষণ যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই আশানুরূপ হলো এতক্ষণে।

এখন বাকি যেটুকু আছে, তাঁর কর্তব্যের বাদবাকি, বদমাশটাকে ধরে বেঁধে-ছেঁদে পুলিসের হাতে তুলে দেয়া—সে-কাজ যে দুঃসাধ্য, লোকটার হোঁৎকা চেহারা মনে হতেই তিনি টের পেলেন; দুরু-দুরু বুকে কাঁপতে-কাঁপতে নিজের কামরা থেকে তিনি নামলেন।

হাওড়া-আমতার গাড়ি চলতে-চলতে থামে, থামতে-থামতে চলে, যখন যেমন

খেয়াল—এই তার চিরকালের রেওয়াজ ; এই নিয়ে তার যাত্রীরা কোনোদিন মাথা ঘামায় না ! আজও তাই তাদের মাথা ঘামাতে বয়ে গেছে ।

অগত্যা ফাস্ট্-প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবুকে একলাই এগুতে হলো ! কর্তব্যের আহ্বান, কী করবেন ? নিজের বাহুবল সম্বল করে স্খলিত পায়ে টলিত গতিতে একাই তিনি এগুলেন ।

হাতল ধরে উঠে কামরাটার ভেতরে উঁকি মারতেই তাঁর চক্ষু-চড়ক ! পা ফস্কে পা-দানি থেকে পড়ে যান আর কি !

সেই ছেলেটি গাড়ির দরজার দিকে পিছন ফিরে খাড়া, আর হোঁৎকা লোকটা তার পায়ের কাছে পুরো চোদ্দ পোয়া ! এক ঘুসিতে অমন জোয়ানকে শুইয়ে দিয়েছে সটান ! য়্যাঁ ! কী সব ছেলে আজকালকার ! দুধের ছেলেও যুযুৎসুর প্যাঁচ জেনে ঘুসোঘুসিতে যুৎসই ! অদ্ভুত !

এহেন দৃশ্যের পর কামরার ভেতরে ঢুকতে তাঁর কোনো দ্বিধা রইল না—তাঁর সাহসও বেড়ে গেল বিস্তর। তিনি সবল হস্তে ঘট্ করে দরজা খুলে ঘটা করে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন !

ছেলেটি পিছন ফিরল ।

"এই যে গার্ডবাবু !" বলল ছেলেটি ঃ "এই লোকটি—এই ভদ্রলোকটি হঠাৎ ফিট হয়ে গেছেন—আমি কী করব ভেবে না পেয়ে, ঠিক করতে না পেরে, আপনার চেন ধরে টেনে ফেলেছি !"

গার্ডবাবু ঝুঁকে পড়ে চিৎপটাং-লোকটার বুকের ওপর কান পাতলেন। নাঃ, হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ-হয়নি, দুমদাম্ আওয়াজ হচ্ছে বেশ ! নাড়ী টিপে দেখলেন—চলছে দুপ্দাপ্ ।

"ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই, তেমন কিছু জখম হয়নি। মারা যাবার কোনো লক্ষণ দেখছিনে।" ছেলেটিকে তিনি আশ্বাস দিতে চাইলেন ঃ "বেঁচে আছে।"

"বেঁচে আছেন ? আঃ, তবু ভাল !"

"কিন্তু বাহাদুর ছেলে বটে তুমি ! কী দিয়ে বসালে বদমাশটাকে ? য়্যাঁ ?"

"আমি ! আমি তো বসাইনি ! আমি কি দিয়ে বসাবো ?" ছেলেটি বিস্মিত হয় ঃ "আমি কেন ওঁকে বসাতে যাবো ? উনি নিজেই বসলেন—বসেই শুয়ে পড়লেন—আপনা-আপনি !"

"বাহাদুর ছেলে তুমি ! অমন একটা হোঁৎকা লোককে শুইয়ে দেওয়া সোজা নয় ! তোমার ঘুসির জোর আছে হে ! বাচ্চা হলে কী হবে, আচ্ছা মার দিয়েছ লোকটাকে।"

ছেলেটি এবার অবাক্ হয় আরো ঃ "আমি ? আমি তো ওঁকে মারিনি। আমি কেন মারতে যাবো ? গায়ে হাতটাত না দিতেই, এমনিতেই উনি ফেন্ট হয়ে গেছেন ! আমি সত্যি বলছি !"

"বলতে হবে না, বলতে হবে না !" গার্ডবাবু বাধা দিয়ে বললেন ঃ "তুমি

মিথ্যে ভয় খাচ্ছ খোকা। ভয়ের কিছু নেই। আত্মরক্ষার জন্যে আততায়ীকে আঘাত করবার ন্যায্য অধিকার তোমার আছে। আইনেই তোমাকে দিয়েছে সেই অধিকার। মেরেছ, বেশ করেছ। তাতে হয়েছেটা কি?"

"কিন্তু—কিন্তু—আমি তো মারিনি! এই লোকটি—এই ভদ্রলোকটি—আমার একজন বন্ধু!"

"বন্ধু! হ্যাঁ, বন্ধুই বটে!" মনে-মনে আওড়ালেন গার্ডবাবু! থানা-পুলিসের হাঙ্গামার ভয়েই ছেলেটি চেপে যাচ্ছে, বুঝতে তাঁর বাকি থাকে না।

"কেয়া গার্ডসাহেব,—কেয়া ভয়া!" এতক্ষণ পরে হাওড়া-আমতা ফাস্ট্-প্যাসেঞ্জারের ড্রাইভারও গার্ডের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"ভয়া? বহুৎ ভয়া! এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার এ লাইনে আর কখনো না-ভয়া।" গার্ডবাবু জানান: "এই লোকটা, এই গুন্ডাটা এই ছেলেটিকে আক্রমণ করেছিল। ছেলেটি ওকে—এক ঘুসিতে কি যুযুৎসুর প্যাঁচে, কিসে বলা যায় না,—একদম বেহুঁশ করে দিয়েছে। আর এখন ও বলছে কিনা যে, এই বদ্মাশ লোকটা নাকি ওর প্রাণের বন্ধু!"

"সত্যি বলছি, আমার বন্ধু।" ছেলেটি জোর গলায় জাহির করে: "হাওড়া থেকে একসঙ্গে আসছি আমরা!"

"এইখানেই গলদ হে ড্রাইভার, গোলমাল এইখানেই! ও বলছে ওরা একসঙ্গে আসছে; অথচ আমি নিজে দেখেছি, এই ছেলেটি উঠেছে কদমতলায়, আর এই লোকটা উঠল বারগাছিয়ায়। তাও এ কামরায় নয়—লোকটা কামরা বদলেছে, আমার নিজের চোখে দেখা—এই আগের ইস্টিশনে। এখন—এর থেকে কী বুঝবে বোঝো!"

"হামি বুঝতে পারছে।" ড্রাইভার আস্তে-আস্তে ঘাড় নাড়ে: "হুম, আদ্মিটাকে দেখলেই বুঝা যায়।"

"কী বোঝা যায়, শুনি?" ছেলেটার এবার বেশ রাগ হয়েছে।

"উসি মাফিক আদ্মি বটে!" ড্রাইভারের গম্ভীর মুখ: "মালুম হয় বেশ।"

"মোটেই উসি মাফিক না! আমি স্পষ্ট বলছি আপনাদের।" ছেলেটি গর্জন করে ওঠে: "ইনি আমার বাবা!"

"ছিঃ! অজানা-অচেনা লোককে এমন করে বাবা বলে না। পুলিশের ভয়ে পরের বাবাকে বাবা বলতে নেই খোকা!"

"বাঃ! আমার নিজের বাবাকে বাবা বলব না? বা রে!"

"এইমাত্র তুমি বললে, তোমার বন্ধু—আর এখন বলছ, তোমার বাবা! এটা কি ভাল করছ, তুমি নিজেই একবার ভেবে দ্যাখো ভাই?"

"যানে দিজিয়ে! দিজিয়ে বোলনে। বাচ্চা লোক কেয়া না বোলে!" বলে ড্রাইভার আধা হিন্দিতে যা বলল বাংলায় তার সাদা বাংলা করলে দাঁড়াবে: পাগলে কী না বলে! ছাগলে কী না খায়! ছেলেদের কথা আর পাগলের

কথা ছেড়ে দিন। এখন আমাদের কী করবার আছে তাই বলুন! ড্রাইভারের এই জিজ্ঞাসা।

"লোকটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পুলিসের হাতে গছিয়ে দেওয়া। তাছাড়া আর কী!" গার্ডবাবুর সাফ জবাব!

তারপর গার্ড আর ড্রাইভার দুজনে মিলে ধরাধরি করে ধরাশায়ীকে পাঁজাকোলা করে তুলে লাইনের ধারে ঘাসের ওপরে নামিয়ে রাখে।

"আভি হামাদের পয়লা কাম হচ্ছে লোকটাকে হুঁসে আনা—" ড্রাইভার জানায়ঃ "তারপর উকে পুছা-ইসকা মতলব? এইসা কাম কাহে কিয়া? আপ খাড়া রহিয়ে, হাম্ আভি আতা। মগর এ-আদ্মিকো ফিন্ হুঁশ আ যায়, উঠকে ভগেনেকা মৎলব করে তো হুঁশিয়ার! এই হ্যাণ্ডল্‌কা এক ডাণ্ডা দে কর্ ফিন্ বেহুঁশ বনা দেনা—সমঝিয়ে?" হ্যাণ্ডেল দ্বারা গার্ডকে সমঝে দিয়ে চোখ মটকে ড্রাইভার ইঞ্জিনের দিকে চলে যায়।

ইতিমধ্যে হাওড়া-আমতার টনক হয়েছে, অঘটন কিছু একটা ঘটে গেছে ধারণা করতে শুরু করেছে যাত্রীরা। একে-একে গাড়ি থেকে নামতে লেগেছে তারা। সবাই এসে সেই 'ওয়েল-গার্ডেড' অচৈতন্য লোকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, এবং গার্ডবাবুও ছেলেটির সঙ্গে লোকটার ভীষণ সংঘর্ষের রোমাঞ্চকর কাহিনীকে সবিস্তারে যথাসাধ্য তাঁর সুগঠিত গোয়েন্দা-কাহিনীর মত ফলাও করে বলার সুযোগ পেয়েছেন!

শুনে তো হাওড়া-আমতার যাত্রীদের গায়ে কাঁটা দেয়। কাঁটাটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই হাওড়া-আমতার বিরক্তি চরমে ওঠে! ছোট্ট ছেলের ওপর রাহাজানি? তাদের ফিস্‌ফাস্ ক্রমেই জোরালো আর ঘোরালো হতে থাকে —বিরক্তিও কূল ছাপিয়ে যায়। প্রত্যেক মুখ-পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যই প্রায় এক রকমের দেখা যায়—লোকটাকে উচিত-মত শিক্ষা দেওয়ার দরকার—হাড়ে হাড়ে শিক্ষা! এবং হাতে হাতে নগদ। সবাই মিলে চাঁদা করে বেশ ঘা-কতক উত্তম মধ্যম—

ছেলে দেখলে সর্বনাশ! আর দেরি করলে, বাবাকে আস্তানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, আস্ত রাখাই দায় হবে!

"শুনুন মশাই! শুনুন আপনারা,—" ছেলে বলতে শুরু করলঃ··· "আসল কথা শুনুন আমার কাছে! আপনারা ভুল করছেন ভয়ানক। এই ভদ্রলোক আমার বাবা—আমার নিজের বাবা। একমাত্র বাবা আমার! এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! আজ সকালে আমাদের খুব ঝগড়া হয়েছিল। আমি বাড়ি থেকে পালাচ্ছিলাম—এই হাওড়া-আমতার গাড়ি চড়েই। বাবা সেই খবর পেয়ে আমার পেছনে-পেছনে ধাওয়া করে এসেছেন! আর আমার কামরাতে ঢুকেই আমাকে দেখেই না, মনে হচ্ছে, আনন্দের আবেগেই উনি ফিট হয়ে গেছেন! এই হলো আসল ঘটনা। যা সত্যি কথা, তাই বললাম আপনাদের! এর একটি বর্ণও মিথ্যে না। বানানো নয়।"

এতদূর বলে ছেলেটি থামল।

ছেলেটির স্বীকারোক্তির সরলতা, স্পষ্টতা আর তীক্ষ্ণতা, আস্তে-আস্তে হাওড়া-আমতার মস্তিষ্কের মধ্যে সেঁধয়। হ্যাঁ, এমন হওয়া সম্ভব! এ রকমও হতে পারে -খুবই হতে পারে। ছেলেরা কি বাড়ি থেকে পালায় না? আখচারই তো পালাচ্ছে। আর বাবারাও খবর পেলে পেছনে-পেছন তাড়া করে আসে না কি?

তাহলে এই অধঃপাতিত ভদ্রলোক একজন পুত্রবৎসল পিতা। হাওয়ার গতি ফিরে যায়।

হাওড়া-আমতার মন চলে। জন-মত বদলায়। সমবেত জনতা লোকটার প্রতি সহানুভূতি পরবশ হতে থাকে।

বাবার এবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসে। তিনি আস্তে আস্তে চোখ মেলেন।

"আমি? আমি কোথায়?"

এ-রকম অবস্থায় যে-রকম করা দস্তুর—চিরাচরিত প্রথা, যা নিত্যকাল ধরে হয়ে আসছে—তাই করাই তিনি সমীচীন বোধ করলেন।

তারপর কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে তুললেন: "বৎস। পুত্র আমার! অবোধ সন্তান মম—" বলতে-বলতে তিনি পড়ে গেলেন ফের। তাঁর দুচোখ বুজে এল আবার!

নাটক জমে উঠেছে, দৃশ্যের পর দৃশ্য - একটার পর একটা অবলীলাক্রমে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, এমন সময় নিরুদ্দিষ্ট ড্রাইভারটি রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে অবতীর্ণ হয়ে—বিচ্ছিরি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলো!

লোকটার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্যে সে জলের সন্ধানে গেছলো। তার ইঞ্জিনের জল টগবগে গরম। সেই ফুটন্ত জল বদলোকদের চৈতন্য-সঞ্চারের পক্ষে যথোচিত হলেও, ঠিক সেই ধরনের চৈতন্য দান করা তখনি তার উদ্দেশ্য ছিল না। কয়লার বালতিটা নিয়ে পাশের ডোবা থেকে জল কুড়িয়ে এনেছিলো সে! সেই ঘোলা জলে কাদার ভাগই বেশি, পানারও অভাব নেই, আর এন্‌তার ব্যাঙাচি! এ ছাড়া, বালতির তলার দিকে কয়লা-গুঁড়োর পুরু একটা পলেস্তারাও জমাট।

এই ধরনের জলে জ্ঞান ফেরানো চৈতন্যলব্ধের পক্ষে সন্তোষজনক হবে কিনা, এ-সব খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবার সময় তার ছিল না। তা ছাড়া, সুরুচির পরিচয় দেবার মতো মেজাজও তার নেই তখন। তার উদ্দেশ্য, প্রথমে লোকটার চৈতন্য সম্পাদন করা, তার পরে জিগ্যেস করা, এ-সবের মানে কি? এবং সে-মানে যদি তেমন মানানসই না হয়, তাহলে তার পরে আবার অন্য ধরনে তার চৈতন্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা।

বালতি-হাতে গট্‌মটিয়ে এসে জনতা ভেদ করে সে ঢোকে। ইতিমধ্যে জনমত যে বদলে গেছে, হাওয়া পালটে গেছে একেবারে, এ-বিষয়ে কেউ তাকে কিছু বলবার আগেই কাদাটে-পানাটে ব্যাঙাচি-বহুল সেই বালতিটা সে হুড় হুড় করে ভূপতিত লোকটার মুখের উপর উপুড় করে দিয়েছে!

এর ফলে চৈতন্য-সম্পাদন না হয়ে যায় না! বাবাকে চমকে উঠে বসতে

হলো। পানাগুলো তাঁর চুলে জড়িয়েছে, গাল বেয়ে কয়লা আর কাদা গড়িয়ে পড়ছে, আর বাঙাচিরা ভারী বিব্রত বোধ করে তার কোলের ওপরেই নাচানাচি লাগিয়ে দিয়েছে—কারো মুখাপেক্ষা না করেই।

"বাবা! বাবা!" ছেলে চেঁচিয়ে উঠে বাবার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। "আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট—এই দুর্দশা!" দুহাত দিয়ে সে বাবার দেহ থেকে পানা আর ময়লা আর ব্যাঙের ছানাপোনাদের সরাতে লাগল।

একজন নিরপরাধের ওপর একী-রকম দুর্ব্যবহার! হাওড়া-আমতার যাত্রীরা এবার ড্রাইভারের ওপর রুখে দাঁড়াল! "এ-রকম করবার মানে? অর্থ কি এর··· শুনি?"—সবাই জানতে চাইলো সমস্বরে।

যে-প্রশ্ন সে-ই নাকি সদ্যচেতন লোকটিকে জিগ্যেস করতে যাবে, অবিকল সেই প্রশ্নটি তার প্রতিই উৎক্ষিপ্ত হতে দেখে, ড্রাইভারের মেজাজ বিগড়ে গেল।

"মানে-টানে হামি জানে না। এক—দুই—তিন বলতে না বলতে তুমরা গাড়িতে এসে উঠলে তো উঠলে! নইলে সোজা হামি এই খালি গাড়ি লিয়েই মাজু চললাম! হুম!"

চড়া গলার হুকুম চারিয়েই সে নিজের ইঞ্জিনে গিয়ে চড়াও হলো।

এবং হাওড়া-আমতার যাত্রীরা বিজাতীয় বিরক্তি বিস্মৃত হয়ে—কঠোর যত মতামত তখনকার মত মুলতুবি রেখে, পড়ি-কি মরি করে এক দৌড়ে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে জমাট হলো।

ছেলে তখন বাবার পঙ্কোদ্ধারে ব্যস্ত, এবং বাবাও ছেলের স্নেহের বহরে এমনই মশগুল যে, ইতিমধ্যে কখন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য বদলে সম্পূর্ণ পটপরিবর্তন হয়ে গেছে, দুজনের কারো সেদিকে নজর ছিল না।

ফাস্ট্-প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবু গাড়ির পা-দানিতে দাঁড়িতে পতাকা ওড়ান—আমতা-আমতা করে বলেন—"শুনছেন মশাই, আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি—ও মশাইরা······"

কিন্তু কে কার কথা শোনে! হারানো পুত্ররত্নকে পুনরায় লাভ করে বাবার তখন কোনোদিকেই খেয়াল নেই।

"বাবা, আমি কখনো আর তোমার অবাধ্য হব না···!" ছেলে বলছিল।

বাবার মুখে কৃতার্থতা!

'আর কখনো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না···'

বাবার বত্রিশপাটিতে বিজয় নিশান!

'ও মশাই, আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি যে! আপনারা দয়া করে আসুন তাড়াতাড়ি!' গার্ডবাবু মাঝখান থেকে বলতে যান।

কিন্তু কে তাঁর কথায় কান দেয়? ছেলের কথামৃতে বাবার কান জোড়া তখন, অন্য কথায় কর্ণপাত করার ফাঁক কই তাঁর?

'আর কখনো আমি বাড়ি থেকে পালাব না।' ছেলে বলে।

'চ খোকা, আর দেরি করে না, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—দেখছিসনে?'

বলতে বলতে বাবার হুঁশ হয় ঃ এক্ষুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে। দেরি করলে আমাদের ফেলে রেখেই চলে যাবে বোধ হচ্ছে।

এই কথা মনে হতেই মাটিতে যেন তাঁর পা পড়ে।

তার পরেই তিনি উঠে পড়ে গাড়ির দিকে ছুট লাগান, ছেলেও তাঁর পিছু নেয়।

হাওড়া-আমতা ফাস্ট প্যাসেঞ্জারের গার্ডবাবুও পতাকা হাতে তাদের পেছনে পেছনে আসতে থাকেন।

পতাকা ওড়াবার কথা তিনি ভুলেই গেছেন একদম!

দেওঘর থেকে দূরে দেহাতের বাড়িটাই পছন্দ করলাম। চেঞ্জে গিয়ে, যদি শহরের ঘিঞ্জির মধ্যেই থাকা গেল তবে আর হাওয়া বদলানো কী? তোমরাই বলো!

বাড়িটা বেশ বড়ই, বছরের পর বছর ধরে খালিই পড়ে ছিল। পোড়ো বাড়ি নাকি বলছিল যেন কে। আমার বিশ্বাস হয় না। শহরের সুখ-সুবিধা ছেড়ে, এতদূরে, মাঠের মধ্যিখানে, কে আর বাড়ি ভাড়া করতে আসবে, বলো? সেইজন্যই ভূতুড়ে বাড়ি বলে সুখ্যাতি রটেছে, তাছাড়া আর কী? অন্তত, আমার তো তাই মনে হলো।

আমার বেশ পছন্দসই হয়েছে বাড়িটা। আমিও একা, বাড়িটাও একাকী, সন্ধ্যার মুখেই আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়ে গেল।

দীর্ঘকালের ধুলো আর মাকড়সার জাল ভেদ করে ঢুকলাম তো বাড়ির মধ্যে। ভূতের আস্তানার মতই হয়ে আছে বটে! ঘরদোরের কেউ কোনদিন যত্ন নেয়নি, এ বাড়ির যে কখনো ভাড়াটে জুটবে তা বোধহয় কারুর প্রত্যাশাও ছিল না।

টেবিল, চেয়ার, চৌকি, আয়না, দেরাজ, আলমারি, খাট, তোশক, বিছানা, পাপোশ—আসবাবের কোনো কিছুরই অভাব নেই, ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নিজেকেই ঝেড়ে মুছে নিতে হবে এ-সব। ভূতুড়ে বাড়ি বলে কেউ আসতে চাইল না আমার সঙ্গে। মোটা বেতনের লোভ দেখিয়েও, সারা দেওঘর খুঁজে একটা চাকর যোগাড় করা গেল না।

যাক, নিজেই সব ঠিকঠাক্ করে নেব! তবে আজ আর নয়,—সেই কাল সকালে সে সব হবে। এখন কেবল খাটটা ঝেড়ে-ঝুড়ে নিজের বিছানাটা পেতে, আজকের রাতের মতো ব্যবস্থা করে নিতে পারলেই হয়।

আপাতত তাই করা গেল। কিন্তু ঘরের মেঝেতে জমে রইল বহুদিনের জড়ো-করা ধুলো। চারিধারের পাঁজি-করা ধুলোবালি-জঞ্জালের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। কিন্তু কী আর করা যাবে? এখন রাতের মুখে একা একা এত পরিষ্কার করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

আলো জ্বালালাম। উস্‌কে দিলাম ওর শিখাটা।

তারপর বিছানায় গিয়ে লম্বা হলাম। অবিশ্যি, ঘুমোবার সময় হয়নি এখনো, সবেমাত্র, সন্ধে উৎরেছে বলতে গেলে, তবু একটু গড়িয়ে নিতে ক্ষতি কী?

বিছানায় গড়াতে গিয়ে কখন যে নিদ্রার কোলে ঢুলে পড়েছি, নিজেই জানিনে। হঠাৎ এক ঝটকা আওয়াজে চট করে ভেঙে যায় আমার চটকা। বুক ধড়াস করে ওঠে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসি।

বিছানা ছেড়ে, আস্তে আস্তে ইজি চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম।

বাতিটা দিলাম আরও উস্‌কে।

চারিধার নির্জন আর নিস্তব্ধ।

চিন্তাটাকে অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করলাম। যে সব দিন চলে গেছে তার মধুর স্মৃতি মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চাইলাম। কত পুরোনো দৃশ্য, আধভোলা মুখ, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, কত গান যা আগে লোকের গলায় গলায় ছিল কিন্তু আজকাল কেউ গায় না—যারা প্রিয়জন হতে পারত অথচ ভাব হলো না যাদের সঙ্গে—ইত্যাদি ইত্যাদি—

আপনা থেকেই কেমন গা ছম্‌ ছম্‌ করতে থাকে।

ঘণ্টা দুয়েক এইভাবে কাটালাম। নিঃসঙ্গতার বোধ ক্রমশই আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। বাতি নিবিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

এর মধ্যে কখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, বাতাস সোঁ সোঁ করছে, আমি শুয়ে শুয়ে তাই শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল; সব নীরব নিস্তব্ধ, কেবল আমার আর্ত হৃদয় বাদে—তার গুর গুর আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুনছিলাম। গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম, কম্বলটি আস্তে আস্তে, কথা নেই বার্তা নেই, পায়ের দিকে সরে যেতে শুরু করল। কেউ কেউ সেধার থেকে টানছে যেন। আবার নড়বার-চড়বার এমন কি প্রতিবাদ করবার পর্যন্ত শক্তি রইল না। যতক্ষণ না আমার কোমর এস্তক খালি হলো। কম্বল সরতেই লাগল। কী আর করি আমি? ভদ্রতা আর চলে না দেখে টানাটানি শুরু করে দিলাম। অনেক ধস্তাধস্তি করে কম্বলকে ধরে এনে আপাদমস্তক ঢেকে দিলাম আবার।

আমি কান পেতে প্রতীক্ষায় রইলাম। কী হয় দেখি! আবার কম্বল সরতে শুরু করল। এবার পা-বরাবর গিয়ে পেঁছিল। আবার তাকে পা থেকে টেনে আনলুম। এমনি করে অপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে আমার অদৃশ্য টাগ্‌ অব্‌ ওয়ার্‌ চলতে থাকল। যখন তৃতীয় বার কম্বল সরে গেল তখন টানবার

শক্তি পর্যন্ত অন্তর্হিত হলো আমার। এবার কম্বলটা একেবারেই উধাও হয়ে গেল। আমি হতাশ হয়ে অস্ফুটধ্বনি করলাম। পায়ের কাছ থেকে প্রতিধ্বনির মতো সেই স্বরে প্রত্যুত্তর হলো। আমার কপাল ঘেমে উঠল। মনে হলো যতটা বেঁচে আছি তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে মারা গেছি নিশ্চয়।

কিছু পরেই হাতির পায়ের মতো একটা থপ্ থপ্ শব্দ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। মানুষের পায়ের শব্দ কখনই অমন হতে পারে না, অবিশ্যি অতি-মানুষের কথা বলতে পারিনে। থপ্-থপে আওয়াজটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল, শুনলাম, তারপর হুড়কো এবং দরজা না খুলেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

মানসিক উত্তেজনা শান্ত হলে, আমি স্বগতোক্তি করলাম, এ হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্নই—ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন। ভাবতে চেষ্টা করছি যে, হয় এ বিভ্রম, নয় শুধু স্বপ্ন, তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্যামেরার সামনে লোকে যেমন করে থাকে তেমনি হঠাৎ হাসতেও যাচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলাম, দূরে এবং নাতিদূরে, বাড়ির আর সব ঘরের দরজা-জানলা জোরে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। এও কি মতিভ্রম? আমারই?

চট করে উঠে আলোটা জ্বাললাম। জ্বেলে দেখি, আমার ঘরের দরজা আগের মতই বন্ধ রয়েছে, অকস্মাৎ খুলবার ও বন্ধ হবার কোন অভিসন্ধি নেই তার। তখন আরামের নিঃশ্বাস ফেলে, সিগারেট ধরিয়ে আমার ডেক চেয়ারটায় এসে বসলাম।

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে আমার পিলে পর্যন্ত চমকে উঠল। সিগারেট খসে পড়ল মুখ থেকে। শ্বাসপ্রশ্বাসও ভারী সংক্ষিপ্ত হয়ে এল আমার। এ কী! ঘরের পুঞ্জীকৃত ধুলোর উপরে আমার পায়ের দাগের পাশাপাশি এ দাগ কার আবার? আরেক পায়ের দাগ, এতো বড় যে তার তুলনায় আমার পায়ের দাগ নিতান্তই শিশুর বলে সন্দেহ হয়।

কিছু পূর্বে যে-বন্ধুটি কম্বল টানাটানি করে গেছেন এ কি তাঁরই শ্রীচরণের চিহ্ন?

ভয়ে ভয়ে বিছানায় ফিরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাও আপনা থেকেই নিবে গেল। অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে পড়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো, কে যেন তার বিশাল বপুটি টেনে নিয়ে আসছে, কিন্তু ঘরের যে-জানালাটা খোলা ছিল সেটা নিতান্তই খাটো বলে কিছুতে গলতে পারছে না তা দিয়ে। আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম—"বন্ধু, তোমার ঐ গোদা পা নিয়ে আর এ ঘরে এসো না, বেজায় স্থানাভাব।"

কিন্তু সে যে আমার আপত্তিতে কর্ণপাত করেছে এমন মনে হলো না।

খানিক পরে একটা ভয়ানক গোলমাল দরজার বাইরে অবধি এসে, একটু ইতস্ততঃ করে, যেন ফিরে যাচ্ছিল। আমার বিছানার চার পাশে ফস্ ফস্ গুজ্ গুজ্ শব্দ শুনতে পেলাম, ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ, অদৃশ্য পাখার ঝটাপট্ আর কী রকম একটা গুমরানো গোঁয়ানো ধ্বনি। মহা মুশকিলেই পড়া গেল

তো ! কেননা আমার স্পষ্ট বোধ হলো ঘরে কারা যেন এসেছে, আমি আর নিঃসঙ্গ নই ।

ঈষৎ উজ্জ্বল কী যেন একটা পড়ল খাটিশে । দুফোঁটা আবার পড়ল আমার মুখে পড়েই গলে তরল শীতলতা হয়ে সুখময় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। তারপরেই দেখতে পেলাম আবছা আবছা মুখ, সাদা সাদা, হাত যেন বাতাসে ভাসছে এই ভেসে উঠছে এই মিলিয়ে যাচ্ছে ! বুঝলাম আমার অবিলম্বে দরকার—হয় আলো নয় মৃত্যু ; অবশ্য মৃত্যুর চেয়ে আলোটাই বেশি বাঞ্ছনীয় ! ভয়ে অবশ হয়ে গেছে সারা দেহ, আস্তে আস্তে যেমন উঠতে গেছি, কার চ্যাপটা হাতের সঙ্গে আমার মুখের ঠোকাঠুকি বেধে গেল । এই অনাকাঙ্ক্ষিত মিলনের জন্য আমি একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম ! ধড়াস্ করে, আবার বিছানায় শুয়ে পড়ি । তার খানিক বাদে বোধ হলো একটা কাপড়-চোপড়ের খস্ খস্ শব্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ।

আবার সব চুপচাপ ! কতকালের রোগীর মতো আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম । কম্পিত হাতে বাতি জ্বালালাম । আলো জ্বেলে, ধুলোর পরে যে ভয়ানক সব পায়ের দাগ পড়েছে তারই গবেষণা করছি, হঠাৎ বাতি যেন নিবু নিবু হয়ে এল, সেই মুহূর্তে আবার সেই হাতির পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা দরজার কাছাকাছি এসে যেন কিছু চিন্তা করবার অজুহাতে চমকে থেমে গেল হঠাৎ । বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এসে হঠাৎ কেমন নীল আলো বিকিরণ করে নিবল কিনা জানি না সমস্ত ঘরটা ছায়াপথের আলোতে ভরে উঠল ।

দরজা খোলা নেই, অথচ এক ঝট্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস কোথা থেকে আমার সামনে বাষ্পময় কি একটা যেন খাড়া হয়ে রইল । দারুণ অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু কী যে করব !

প্রথমে একটা হাত তারপরে দুটো পা, তারপরে সমস্ত শরীরটা, মায় এক বিষণ্ণ বদন ক্রমশঃ সেই বাষ্প থেকে আত্মপ্রকাশ করল । দেখলাম আমার সামনে এক প্রায়-নগ্নকায় প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো চেহারা সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

লোকটার বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার ভয় দূর হলো । মনে হলো এ কোনো ক্ষতি করবে না—ক্ষতিজনক ভূত এ নয় বোধ হয় । আমার স্বাভাবিক মনের অবস্থা ফিরে এল তখন, সঙ্গে সঙ্গে আলোও আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল । আমি একলা ছিলাম, নিঃসঙ্গতার বদলে এই ভূতটাকে কাছে পাওয়া গেল—এ ভালই। খুশিই হলাম আমি। অচেনা জায়গায় হঠাৎ আত্মীয় পাওয়ার মতোই— আর কি !

আমি তাকে অভ্যর্থনা করে বললাম—"কে হে তুমি ? তুমি কি জানো যে আমি দু তিন ঘণ্টা যাবৎ মুমূর্ষু হয়ে রয়েছি ? যাক তোমাকে দেখে খুশিই হওয়া গেল ! আমার যদি একটা চেয়ার থাকতো, অবশ্য তোমাকে ধারণ করবার মতো—আহা, থামো, থামো, ঐ জিনিসটার উপর বসে পড়ো না যেন !"

কিন্তু কাকেই বা বলা ! ততক্ষণে অমন দামী চেয়ারটিতে সে বসে পড়েছে, চেয়ারটিও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গুঁড়িয়ে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেল ।

"দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি সবই ভাঙবে দেখ্ছি—"

বলা বাহুল্য ! ইজিচেয়ারটিরও সেই দুর্দশা !

"তোমার ঘটে কি বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নেই ? ঘরের সব জিনিসপত্তর ভেঙে কি তছ্নছ্ করতে চাও তুমি ? করো কি, করো কি সর্বনাশ—"

বলা নিষ্ফল ! তাকে বাধা দেবার আগেই সে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ে। বিছানাটাও চেয়ারগুলোর সঙ্গী হলো। কী ভয়ানক !

"এটা কী রকম ভদ্রতা হচ্ছে শুনি ?" এবার দস্তুরমতো চটেই উঠলাম আমি—"প্রথমে তো হাতির মতো গোদা পায়ের শব্দে ভয় দেখিয়ে, প্রায় মরি আর কি, সেটা না হয় সহ্য করা গেল, কিন্তু এখন এসব হচ্ছে কী ? বায়স্কোপের পর্দাতেই এরকমের রসিকতা বরদাস্ত করা চলে, লরেল্-হার্ডির ছবিতেই কেবল ! তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বোঝবার মতো বয়েস হয়েছে তোমার। নেহাত ছেলেমানুষটি নও তো !"

"আচ্ছা, আর আমি কিছু ভাঙব না। কিন্তু কি করব বলো, একশ বছর ধরেই আমি হাঁটছি, কেবল হাঁটছি, একদণ্ড কোথাও বসতে পাইনি য়্যাদ্দিন।"

তার চোখ থেকে দরবিগলিতধারে অশ্রুপাত হতে থাকে। ভূতের চোখে জল ! এ যে রাম-নামের মতই অভাবনীয় ব্যাপার ! বেচারি ভূত ! আমার দুঃখ হলো দস্তুরমত।

আমি বললাম, "আমার রাগ করা উচিত হয়নি সত্যি ! তুমি যে একটি বাপমা-হারা সত্যি অনাথ বালক তা কি আমি জানি ? তা কী করবে, এই মাটিতেই বসো—কিছুই তোমার ভার সইবে না যে। নইলে হয়ত কোলে করেই বসতুম তোমায়। হ্যাঁ, সামনে ঐখানটাতেই ! তাহলে এই চেয়ারে বসে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা কইতে পারব।"

সে মাটিতেই বসে পড়ল। আমার দামী কম্বলটা সে ঘাড়ে ফেলল এবং বিছানাটাকে জড়িয়ে মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধল। তখন তার আয়েশ একটা দেখবার মতো !

"ভাল কথা, এত হাঁটাহাঁটি করছ কেন তুমি ?" আমি জিজ্ঞাসা করি, "পাছে বাতে ধরে সেই ভয়ে ?"

"আর কেন ? খবর পেলাম কোথায় নাকি আমার স্ট্যাচু খাড়া করা হয়েছে ? ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, এই ঠিক আমার মতোই–ঘোড়ার উপর বসানো। আমার সেই পাথুরে চেহারা দেখতেই আমি বেরিয়েছি। কিন্তু কোথায় যে রয়েছে, তা খুঁজে পাচ্ছি না !"

"ভাবনার কথাই তো বটে।" আমি বলি—"নিজের চেহারা নিজে না দেখতে পাওয়ার মতো দুঃখ কি আর আছে ? তা এক কাজ করো না কেন ? এত না হেঁটে, একটা ঘোড়া-টোড়া নিলেও তো পারো। ঘোড়ায় চেপে—"

"এক বেটা ঘোড়াকে, মানে ঘোড়ার ভূতকে বহুৎ বলেকয়ে রাজিও করেছিলাম, কিন্তু শেষটায় সে বিগড়ে গেল হঠাৎ !" তার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ বিরক্তি প্রকাশ পায়—"একেবারে বেঁকে বসল আর বলল যে, সারাজন্ম

ছুটোছুটি করেই মরেছি, এখন মরে গিয়েও সেই ছুটোছুটি ? একটু জিরোতে পার না ?

"তারপর ?"

"আমি তাকে অনেক করে বোঝালাম ; বলি যে, আমার মতো তোরও স্ট্যাচু বসিয়েছে তারা, খবর পেয়েছি আমি। আমাকে কিনা, তারা, সেখানেও; তোর পিঠেই চাপিয়ে রেখেছে—। সেইজন্যেই তো তোর পিঠে চেপেই আমি যেতে চাই !— এই না যেই শোনা, ঘোড়াটা চটেমটে এমন চিঁহিঁচিঁহি ডাক ছাড়তে লাগল যে, ঘোড়ায় চাপার বায়না রেখে দিয়ে সোজা পদব্রজেই আমি বেরিয়ে পড়ি !"

আমি সহানুভূতি জানাই—"ভারী মুশকিলের কথা ! এত বেশি বয়সে এতখানি হাঁটাহাঁটি কি পোষাবে তোমার ? তার চেয়ে এক কাজ করলে তো পার। রেলে যাতায়াত করলেও তো পার। তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায় ঘোরা হয় তাতে !"

"হেঁটেই মেরে দেব। রেল আবার কেন ?"—সে আশঙ্কা প্রকাশ করে, "রেলে ভারী কাটা পড়ে লোক, ভারি কলিশন্ হয় ! সেই ভয়েই তো রেলে চাপি না।"

"তা, চাপোনা যে ভালই করো !" ওর কথায় আমি সায় দিই। "ওতে খরচাও বাঁচে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, কদ্দিন তুমি এই রকম পায়চারি করছ পৃথিবীতে ?"

"পৃথিবীতে ? তা প্রায় একশো বছর !" সে জবাব দেয়—"পৃথিবীতে এবং পৃথিবী ছাড়িয়েও।"

"পৃথিবী ছাড়িয়েও কি রকম ?" আমি অবাক হই, অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহেও যাতায়াত আছে নাকি তোমার ?"

"আহাহা ! তা কি আমি বলেছি ? আর, সে সব জায়গায় যাবই বা কেন ? তারা কি আমার স্ট্যাচু খাড়া করেছে ?"

"তবে পৃথিবী ছাড়িয়ে কি রকম ?"

"যোগবলে। আকাশ-পথেও চলাফেরা করতে পারি কিনা আমরা। অনেক সময়ে, মাটির থেকে দুহাত, আড়াই হাত, পৌনে চারহাত পর্যন্ত ওপরে উঠি।"

"বলো কি ?"

আমার মাথায় চকিতে বিজলী খেলে যায়, সেই যে কিছুদিন আগে খুব সোরগোল্ করে—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, ইনিই ! ইনিই তবে ! এ না হয়ে আর যায় না।

"ওঃ, এখনি বুঝেছি—" হঠাৎ আমার টনক নড়ে ঃ "তোমার পায়ের দাগের সঙ্গে মিলে যায় হুবহু—।"

"কী—কী ?" কৌতূহলী হয়ে ওঠে—সে।

'কিছুদিন আগে জায়গায় জায়গায় যে সব—বড় বড় পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া গেছল, যা-নিয়ে খবরের কাগজে কাগজে খুব হৈ চৈ পড়েছিল সেই সময়ে —এখন বুঝতে পারছি সে-সব কার কীর্তি !"

"কার ?"

"কার আবার ? তোমার।"

"তা হবে।" বিষণ্ণ ভাবে সে ঘাড় নাড়ে—"খবরের কাগজও দেখিনি অনেকদিন !"

"দেখাতাম তোমায়, কিন্তু রাখিনি তো ! তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জানত কে ! জানলে রাখতাম।" আমি বলি,—"কিন্তু বলো দেখি, আমার বাড়িতেই পায়ের ধুলো দিলে কেন হঠাৎ ;"

"তোমার আস্তানার কাছ দিয়ে এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম কিনা !" সে বলতে থাকে—"আর এই বাড়িটায় আলো জ্বলছিল। তারপর খড়ি দিয়ে সদর দরজায় তোমার নিজের নাম লিখেছ দেখলাম, তার সঙ্গে আমার নামের ভারী মিল ! ভাবলুম আমারই আত্মীয় হয়তো, কিম্বা আমারই স্যাঙাত টাঙাত কেউ হবে, তবে তোমার কাছ থেকেই জেনে নিই না কেন আমার স্ট্যাচুর ঠিকানা ! যাক, তুমি যখন জানই না, তখন আর বসে থেকে কি লাভ ? আমার পথে আমি বেরিয়ে পড়ি আবার।"

"সে কথা মন্দ নয় !"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি বলি—"কিন্তু—"

সে সকরুণ চোখ তুলে তাকায় আমার দিকে।

"তোমার নামটি কি তা তো বলে গেলে না ?"

"আমার নাম ? আউটরাম।" সে বলে—"জাঁদরেল আউটরাম ! বেঁচে থাকতে লড়াই করাই ছিল আমার কাজ। তখন জেনারেল বলে আমায় ডাকতো সবাই। এ রকম অদ্ভুত নাম শুনেছ এর আগে ? অবশ্য তোমার নিজের নাম ছাড়া। আচ্ছা, আসি তবে—কেমন ?"

আমার বাক্যস্ফূর্তি হবার আগেই আউটরাম আউট হয়ে গেলেন। আমার লাল কম্বলটাও সঙ্গে নিয়ে গেলেন, বিছানাটাও আর ফিরিয়ে দিলেন না।

স্বাধীনতার দিন যে এমন স্বাদহীন হয়ে উঠবে আমার কাছে এ বছর, আগে তা কে ভাবতে পেরেছিল ?

যে আমি নাকি চিরকাল পরের বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি, ভুলেও কাকেও কোনদিন নিজের বাড়িতে খেতে ডাকি না, ভাগ্যের বিপাকে সেই আমার বাড়িতেই আজ বিরাট ভোজের ব্যাপার !

কিন্তু আসন্ন এই ভোজসূয় যজ্ঞের ভোজপুর থেকে এখনই আমাকে পালাতে হবে।

সূয্যি না উঠতেই, তার ঢের আগেই, ঘুম থেকে উঠেছি আজ। দাড়িটাড়ি কামিয়ে তৈরি হয়েছি, এখন ব্যাগটা গুছিয়ে নিলেই হয়। নিমন্ত্রিতরা আসছেন সবাই, কিন্তু মা-কালীর দিব্যি, তাঁদের কাউকেই আমি নেমন্তন্ন করিনি। তাঁরা এসে পেঁছিবার আগেই আমাকে তাই সুদূরপরাহত হতে হবে। আমার ভাই সতুর কাছে ঘাটশিলা, কি, আমার বোন ইতুর কাছে পাটনার দিকে গতি করতে হবে আমার। বাড়ির সদরে তালা লাগিয়ে টু-লেট লট্‌কে দিয়ে পালাতে হবে এখান থেকে। সটকে পড়ব এখুনি।

এখন, সেদিন যে ভাবে শুরু হল এই নেমন্তন্ন-পর্বটা······

সন্ধেবেলায় ঘরে বসে আছি, টেলিফোনটা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং !

'হ্যালো হ্যালো !' সাড়া দিলাম আমি।

'প্রতুলবাবু, ধন্যবাদ!'

'অ্যাঁ?'

'আপনার আমন্ত্রণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যাব যাব, আপনার নতুন বাড়িতে যাব বইকি।' জানালেন ধন্যবাদদাতা।—'সপরিবারেই যাব আর পেট ভরে খেয়ে আসব। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।'

'যত খুশি খান, খান গিয়ে প্রতুলবাবুর বাড়িতে, কিন্তু এটা প্রতুলবাবুর বাড়ি নয়' বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই তিনি ফোনটা কেটে দিয়েছেন।

খানিক বাদেই আরেকটি উৎফুল্ল কণ্ঠঃ 'দিনটা খাসা বেছেছো হে! স্বাধীনতা দিবসেই তো এমনটা চাই। এই রকম ভূরিভোজের ব্যবস্থা।'

'কে আপনি?'

সে কথায় কান না দিয়ে ভদ্রলোক বলেই চলেন—'লেট করে যাব না, পেট ভরে খাব। খেয়ে গড়াবো তোমার বাড়িতেই। ঢালাও বিছানার ব্যবস্থা রেখো কিন্তু।'

বলে আমাকে দ্বিরুক্তি করার অবকাশ না দিয়ে তিনিও ফোনটা রেখে দিলেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে আবার এক ফোন এল।

'হ্যালো প্রতুলচন্দর।'

'আজ্ঞে আমি প্রতুল নই।' বলতে হল আমায়।

'প্রতুলকে একটু ডেকে দিন না দয়া করে।'

'প্রতুল কে?'

'হ্যাঁ, প্রতুলকেই তো ডাকতে বলছি। সে কি বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে?'

'না, বেরয়নি। ঢোকেওনি কোনদিন এ বাড়িতে। তাকে আমি চিনিই না।'

'কী আশ্চর্য! আপনি কে তাহলে?'

'আমি প্রতুল নই।'

'তাহলে প্রতুল এলে তাকে বললেন……'

'প্রতুল আসবে না। আসে না এখানে। ভবিষ্যতেও কোনদিন আসবার নয়। অতএব তাকে আমি কিছু বলতে পারব না।'

'এলে বলবেন যে……'

'বললাম তো আসার কোন সম্ভাবনাই নেই তার… ..'

'এই কথাটা বলবেন কেবল যে তার নেমন্তন্ন আমরা পেয়েছি। শনিবার দিন সবাই আমরা যাব……'

তারপর আধঘণ্টা আমি বিমূঢ় হয়ে কিংকর্তব্য ভাবতে লাগলাম। ভাল বিপদে পড়া গেল তো প্রতুলকে নিয়ে। কে এই প্রতুল? তাকে তো আমি চিনিনে। দেখিওনি কস্মিনকালে। নামও শুনিনি কখনো তার।

আবার এল ফোন। কান পাততেই আওয়াজ পেলাম—'সাধুবাদ দিই তোমায় ভায়া!'

'এত লোককে বাদ দিয়ে হঠাৎ কেন এই অধমকেই...?'

'দেব না ? এই আক্রার বাজারে কে কাকে খাওয়ায় বলো ? এমন দুর্দিনেও যে তোমার বন্ধুদের তুমি মনে রেখেছো···নতুন গৃহপ্রবেশের দিনটায়...'

'কাকে বলছেন বলুন তো ?'

'কেন, তোমাকে ? তোমাকেই তো।' বলে বোধহয় তাঁর কোথায় খট্‌কা লাগে···'তুমি কি···আপনি কি প্রতুল নন ?'

'একদম না।'

'সে কি তাহলে বাইরে ?'

'একেবারে। সম্পূর্ণভাবে। সর্বপ্রকারে। আমার ধারণা আপনি রং নম্বরে ফোন করেছেন।'

'মাপ করবেন। আমি আবার চেষ্টা করব তাকে ধরবার।'

নিশ্চিন্ত হয়ে রিসিভার তুলে রাখলাম।

কিন্তু একটু পরেই ফের কিড়িং কিড়িং···

'হ্যালো, এটা কি একশ চৌত্রিশ নম্বর ?'

'সেই বাড়িই বটে।'

'আর ফোন নম্বর ছয় নয় নয় ছয় নয় নয় ?'

'নয় কে বলেছে ?'

'তাহলে প্রতুলকে একবারটি দয়া করে ডেকে দিন না।'

'প্রতুল আমার ডাকে সাড়া দেবে না। সে এখানে থাকে না। একটু আগেই তো বলে দিয়েছি আপনাকে।'

'সে কী ! তার কার্ডে এই তো বাড়ির ঠিকানা আর ফোন লেখা আমার হাতেই তো কার্ডখানা। তার কার্ডে আপনার নম্বর ঠিকানা এল কেন তাহলে ?'

'সেকথা প্রতুলবাবুকেই জিজ্ঞাসা করবেন। তার কৈফিয়ৎ আমি কি দেব ? আচ্ছা, নমস্কার।'

তারপর আবার এল ফোন। আমি আর তুললাম না। বাজতেই লাগল ফোনটা।

কিন্তু কাঁহাতক আর বাজনা শোনা যায় ? তুলতেই হলো এক সময়ে—

'হ্যালো।'

'হ্যালো। আমি নীলিমা।' সুমধুর কণ্ঠে জানাল একজন।

'দেখুন ডালুপালুরাও যেতে চাইছে, নিয়ে যাব কি ?'

'ডালুপালুরা কে ?'

'বারে ! আমার বোনঝিদের আপনি চেনেন না নাকি ? ভারী আব্দার ধরেছে প্রতুলকাকুর নতুন বাড়িতে তারাও যাবে শনিবার দিন···'

'আসুন নিয়ে।' বলে দিলাম। মেয়েদের বিমুখ করতে আমার বাধে। 'ডালপালা শাখাপ্রশাখা সবাইকে নিয়ে আসুন।'

কদিন ধরে কেবল এই ধরনের ফোন এল। তারপর একদিন পাল্টালো ধারাটা⋯নতুন পালা শুরু হলো তখন।

'হ্যালো⋯বেলেঘাটার আড়ত থেকে বলছি, শনিবার সকালেই পেঁছে যাবে আমাদের মাল......আপনার বাড়িতেই পেঁছে দেব।'

'কীসের মাল?'

'যেমনটি অর্ডার দিয়েছেন। পনের কিলো পোনা, দশ কিলো ইলিশ আর পাঁচ কিলো ভেটকি মাছ—ফিশ ফ্রাইয়ের জন্যে⋯গলদা চিংড়িও চাই নাকি?'

'আজ্ঞে না।'

'কিন্তু দেখুন দরটা দশ টাকা করে কিলো পড়বে কিন্তুক্।'

'কিন্তু কেন এভাবে কিলোচ্ছেন আমাকে বলুন তো!'

'কিলোবার কথা কী বলছেন! বাজারদর এই তো আজকাল। সরকারের বাঁধা দরের কথা বলছি না...সে দরে কি আর মাছ মেলে কোথাও? বেসরকারী বাজারে, বলুন, এর চেয়ে কমে কি পাবেন আপনি?'

খানিক পরের অপর এক ফোনে...

'হ্যালো, আমরা গঙ্গারাম অ্যাণ্ড সন্স্ মানে, মিষ্টির দোকান থেকে বলছি...।'

'গাঙ্গুরাম!' শুনেই আমার জিভে জল এসে গেল।

'গাঙ্গু নয়, গঙ্গা। শুনুন, আপনার অর্ডার আমরা পেয়েছি। যথাকালেই, মানে, শনিবার সকালেই আমাদের সন্দেশ আপনার বাসায় পেঁছে যাবে..'

'কী কী সন্দেশ?' শনিবার সকালে আমার গঙ্গাযাত্রার খবরটা বিশদ করে নিতে হয়।

'নরম পাক, কড়াপাক, দই, রাবড়ি, রাধাবল্লভী, ক্ষীরমোহন, ছানার পোলাও আর মিহিদানার পায়েস...'

আয়েস করে শুনছিলাম, শোনাতেও কিছু কম সুখ নেই। কিন্তু ধাক্কা এলো তারপরেই—'দামটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়ে দিতে হবে প্রতুলবাবু! ডেলিভারি এগেনস্ট্ ক্যাশ! চেক টেক নয়।'

'দেখুন আমি প্রতুল নই। তাছাড়া আমার টাকাকড়িও খুব অপ্রতুল...'

'কী বলছেন! আপনাকে আমরা চিনিনে মশাই! আপনি আমাদের পুরনো খদ্দের। আপনার বোনের বিয়েয়, বাপের ছেরাদ্দে কারা মেঠাই যুগিয়েছিল? এইতো সেদিন আপনার ভাগনির পাকা দেখায় আমরাই মিষ্টি দিয়েছি। কী যে বলেন! আপনার আবার টাকার অভাব।'

তারপর থেকে সব কিলোমিটার। একে একে চালওলা, তেলওলা, চিনিওলা, ডিমওলা, মাখনওলা—সবাই সাক্ষাৎ কালোবাজারের—সবাইকে ধরতে হল পরম্পরায়। অবশেষে গতকাল রাত্তিরে...আনকোরা এক গলা পাওয়া গেল ফোনে।

'হ্যালো। ছয় নয় ছয় নয় নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। নয় ছয়ই ত।'

'আমাকে মাপ করবেন মশাই। আপনাকে আমি চিনিনে। নামও জানিনে আপনার...।'

আমার নাম জানালাম।

'অদ্ভুত নাম তো। কখনো শুনিনি এমন নাম। আমি প্রতুল।'

'ও! আপনি!' চমকে উঠতে হল আমায়।

'দেখুন ভয়ঙ্কর একটা ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। ভুলটা আবার আমারও নয়। ছাপাখানার। ছাপাখানার ভূতের কথা নিশ্চয় জানা আছে আপনার।'

'ছাপাখানার ভূত!'

'হ্যাঁ, ছাপাখানার ভূত। তার কথাই বলছি। এক ছাপাখানায় আমার নেমন্তন্ন পত্র ছাপতে দিয়েছিলাম। কতকগুলো পোস্টকার্ড কেবল। সেখানে হয়ত আপনিও ভুল করে আপনার লেটার প্যাড ছাপতে দিয়ে থাকবেন। যাক্, কি করে ভুলটা হয়েছে বলতে পারব না। আপনার ঠিকানা আর ফোন নম্বর হয়তো তাদের কম্পোজ করা ছিল, ছাপাখানার ভূতমশাই সেটা আর বরবাদ না করে আমার কার্ডেও তাই বসিয়ে দিয়েছেন। ফলে...'

এই পর্যন্ত বলে তিনি আর ভাষা খুঁজে পান না।

'ফলে বলাই বাহুল্য।' আমাকেই বলতে হল।

'সবাই আপনাকেই ফোন করে করে খুব বিরক্ত করছে বোধহয়?'

'বেশি নয়। মাত্র বাহান্ন জন। তার মধ্যে নীলিমা আবার ডালুপালুকে নিয়ে আসতে চেয়েছে।'

'আনুক গে। কিন্তু সে কথা নয়। কথা এই, দই মাছ মিষ্টি সবকিছুই তো আপনার বাড়িতে গিয়ে পড়েছে। নিমন্ত্রিতরাও সবাই গিয়ে পৌঁছচ্ছেন কাল। স্বভাবতই তাঁরা সবাই সেখানে আমাকে আশা করবেন কালকে...'

'স্বভাবতই।'

'অতএব আপনি যখন এত কষ্টই করলেন, এতটা অর্থ ব্যয়, এতখানি ত্যাগ স্বীকার করলেন যখন, তখন বলছিলাম কি, বোঝার ওপর শাকের আঁটি হিসেবেই বলছিলাম—'

আবার তিনি চুপ।

'বলে ফেলুন। বাধা কীসের?' অগত্যা প্ররোচিত করতে হল আমাকে।

'একটা কথা বলছিলুম কি, দেখুন আপনি যখন এতজনাকেই ডাকছেন তখন আমাকে বাদ দিয়ে আর আপনার কি সাশ্রয় হবে? যাহা বাহান্ন তাহা তেপান্ন! মানে, তখন আমার পরিবারের কটা লোক আর বাকি থাকে কেন? আমার বাড়ির মানুষ খুব বেশি নয়—ডজন খানেক মাত্তর। তাদেরকেও আমার সঙ্গে নেমন্তন্ন করে ফেলুন তাহলে। কি বলেন? যাহা তেপান্ন তাহা পঁয়ষট্টি!'

'তাহা পঁয়ষট্টি? বেশ তবে তাই হোক!' আমি তথাস্তু করে দিলাম।

তাই হল শেষ পর্যন্ত। পঁয়ষটি দিতে হচ্ছে এখন আমায়!

পদ্মলোচন পোস্টাপিস থেকে ফিরছে, মানসের সঙ্গে দেখা হলো পথে।

—তোর হাতে ওসব কি রে?

পদ্মলোচন বলল—যত রাজ্যের খবরের কাগজ। স্টেটসম্যান, বঙ্গবাসী, এডুকেশন গেজেট এইসব। বাবা পড়েন। হ্যাঁ রে মানকে, পণ্ডিতমশাই আমাদের খাতা দেখেছেন? কত নম্বর পেয়েছি আমি?

মানস গম্ভীরভাবে জবাব দিল—বোধ হয় এগারো।

—মোটে? আর তুই?

—পাঁচ কি সাত। তবে আমি বাবার অজান্তে নম্বরের পাশে সংখ্যা বসিয়ে পঞ্চান্ন কি সাতচল্লিশ করে নেবখন। ভাগ্যিস এগারো পাইনি, তাহলে কি মুশকিল যে হত। একশোর মধ্যে একশো দশ তো আর পাওয়া যায় না?

—আর সব ছেলেরা?

—তিন, দুই, জিরো। অনেকে আবার মাইনাস পাঁচ, মাইনাস সাত পেয়েছে; তারা সব 'ফ্রিজিং পয়েন্টে'—সব বিলো 'জিরো'।

পদ্মলোচন হাসতে পারল না।—তোর আর কি, তুই পণ্ডিতের ছেলে; তোকে ত আর কিছু বলবেন না! মার খেয়ে মারা যাব আমরা।

পদ্মলোচন বাড়ি ফিরে যেন ভাবনার অকূল পাথারে পড়ল। সংস্কৃতে মোটে এগারো পেয়েছে! তার ওপর পণ্ডিতমশায়ের আবার সব চেয়ে বেশি রাগ তারই ওপর—সে তাঁর কথার চোটপাট জবাব দেয় বলে। সেদিন তো বেঞ্চের

নড়বড়ে পায়াটা ভেঙে নিয়েই কয়েক ঘা তাকে কশাবেন এমনি প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়েছিলেন ; পদ্মর সৌভাগ্যক্রমে বেঞ্চিটা তার পক্ষ নিয়েছিল তাই রক্ষে— অনেক টানাটানিতেও কিছুতেই পায়াটা ছাড়তে সে রাজি হয়নি। অবাধ্য বেঞ্চিটাকে পদচ্যুত করতে না পেরে সেবারটা তাদের দুজনকেই তিনি পরিত্রাণ দিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর যে রাগ সে দেখেছে, এর পরে ফের ইস্কুলে গেলে কি আর নিস্তার আছে ?

খবরের কাগজগুলো বাবাকে দেওয়া তার হলো না, নিজের পড়ার টেবিলে ফেলে রেখে, নাওয়া খাওয়া ভুলে সে ভাবতে বসলো। ভাবতে ভাবতে সমস্ত যখন তার এলোমেলো হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হলো একটা পথ যেন পাওয়া গেল পণ্ডিতমশাইকে জব্দ করবার…একটা উপায় যেন সে আবিষ্কার করেছে। সংবাদপত্রগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে হাসিমুখে টেবিল থেকে উঠল।

ইস্কুলে গিয়ে শুনল, সংস্কৃত পরীক্ষায় তাদের নম্বরের বহর দেখে হেড-মাস্টারমশাই এমনই হতভম্ব হয়ে গেছেন যে তিনি স্বয়ং আজ পণ্ডিতমশায়ের ক্লাশে আসবেন। খবর পেয়ে পদ্মলোচন খুশিই হলো। সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে—আজ একটা বিহিত সে করবেই ; তার নাম পালটে ধূম্রলোচন বলে ডাকার, যখন তখন বেধড়ক পিটন দেওয়ার প্রতিশোধ আজ তাকে নিতেই হবে। ক্লাশে ঢুকে নাকে নস্যি গুঁজে চল্লিশ মিনিট তিনি ঘুমিয়ে সুখ করবেন, আর বাকি দশ মিনিট সুখ করবেন পড়া নেবার অছিলায় তাদের পিটিয়ে– এটি আর হচ্ছে না। পদ্মলোচন মরীয়া আজ।

হেডপণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে হেডমাস্টার মশাই ক্লাশে ঢুকলেন। ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—সবাই মিলে তোমরা সংস্কৃতে ফেল করলে কি করে হে ?

ছেলেরা নিরুত্তর। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—তোমাদের কোনো গভীর ষড়যন্ত্র ছিল না কি ?

পদ্মলোচন জবাব দিল—পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়ান না সার্।

পণ্ডিতমশাই চোখ পাকিয়ে বললেন—কি ? অধ্যাপনা করি না ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !

হেডমাস্টার মশাই পণ্ডিতকে বাধা দিলেন—আপনি থামুন। কি বলবার আছে তোমার বলো।

—সেদিন আমি পণ্ডিতমশাইকে একটা শ্লোকের মানে জিজ্ঞাসা করলুম, অবশ্যি পড়ার বইয়ের বাইরে। আনসীন প্যাসেজ তো আমাদের থাকে অ্যাডিশনালে। তা পণ্ডিতমশাই তার মানেই বললেন না।

পণ্ডিতমশাই রাগে ফুলতে লাগলেন—কি ? কোন শ্লোকের অর্থ আমি করি নাই ? শ্লোকার্থ জানি না—আমি !

দাঁত কিড়মিড় করে পণ্ডিতমশাই যেন ফেটে পড়তে চাইলেন—নিয়ে আয় তোর কোন শ্লোক আমি অর্থ করিতে পারি নাই !

হেডমাস্টার আশ্বাস দিলেন—বলো ভয় কি ! তোমার মনে নেই বুঝি ?

পদ্মলোচন ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ, আছে আমার। এই শ্লোকটা সার—

হবার্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেজুয়ে।
আণ্ডীবঃ অণ্ডক্ষয়েণ মানস্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ ॥

শ্লোক শুনে পণ্ডিতমশায়ের চোখ কপালে উঠল। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন তাঁর সারা জন্মে এমন অদ্ভুত শ্লোকের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন কি না। পণ্ডিতকে নিঃশব্দ দেখে হেডমাস্টার মশাই বুঝতে পারলেন শ্লোকটা তেমন সহজ নয়; তাই তাঁকে উৎসাহ দেওয়া তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন—একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন; উপনিষদ কিংবা পাঁজির বোধ হয়, কি বলেন?

পণ্ডিতমশাই মাথা চুলকাতে লাগলেন—কোনো উদ্ভট শ্লোক। উদ্ভট গ্রন্থ থেকে এর মর্মোদ্ধার করতে হবে। আমি আজ বৈকালেই এর অর্থ করে দেব। ও যেন মানকের সমভিব্যাহারে আমার বাড়ি যায়।

পদ্মলোচন বলল—না সার, সামনে দুর্গা পুজো, আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না সার।

পণ্ডিতমশায়ের প্রহারের ভয়ানক প্রসিদ্ধি ছিল। হেডমাস্টার পদ্মলোচনের ভয় দেখে হাসতে লাগলেন—পণ্ডিতমশাই, ওটা কাল আপনি স্কুলে বলবেন, তাহলেই হবে। আমারও জানার কৌতূহল হয়েছে। একটু ঘেঁটে দেখবেন, পাঁজির কিংবা উপনিষদের হবে—ওই দুটোই তো আমাদের যত রাজ্যের শ্লোকের আড়ত!

পণ্ডিতমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—বেশ, আমার স্মরণে রইল।

বাড়ি ফিরে পণ্ডিতমশাই শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে পড়লেন; উদ্ভট-সংগ্রহটাও পাতি পাতি করে খুঁজলেন। কোনদিকেই শ্লোকটার কোনো সুরাহা হলো না। নাকে এক টিপ নস্য দিয়ে তিনি দারুণ মাথা ঘামাতে লাগলেন—'হবার্তাবা'? সংস্কৃত বলে বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু অভিধানে তো এ শব্দ নাই! বার্তা মানে তো সংবাদ কিন্তু 'হ···বা'র মাঝখানে পড়ে এতো বোধগম্য হবার বহির্ভূত হয়েছে। 'কহিপ্তাশা'? হিপ্ত ছিল আশা হলো হিপ্তাশা! কিন্তু হিপ্ত মানে কি? একি আমাকে ক্ষিপ্ত করার চক্রান্ত? 'শিবাঙ্গবঃ'—কেবল এই শব্দটার অর্থ অনুধাবন করা কঠিন নয়, কিন্তু 'টজেগেণঃ' বা কি আর ঐ 'শকেজুয়ে'···?

পণ্ডিতমশাই অসুখের অজুহাতে তিনদিন ছুটি নিলেন—কিন্তু তিনদিনের জায়গায় সাত দিন হয়ে গেল তবু ইস্কুলে তাঁর পদার্পণ নেই! তখনো তিনি শ্লোকটার কিনারা করে উঠতে পারেননি! সেদিনই সকালে উদ্ভট কল্পতরু নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছেন, এমন সময়ে নেপথ্যে পায়ের আওয়াজ কানে আসতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন—কে যাচ্ছিস ওখান দিয়ে? টেটো?

—উঁ।

—মানকে নাকি? টেটোকে তামাক দিতে বলত। কিঞ্চিৎ ধূম্রপান আবশ্যক।

মানস বলল—টেটো এখন কোথায় টো টো করছে কে জানে!

তবে তুই সাজ। গড়গড়াটা আমায় দিয়ে ধূম্রলোচনকে ডেকে আন তো একবার।

—সে আসবে না।

—বলিস, মাভৈঃ। আমি অভয় দিয়েছি। কোনো ভয় নেই অতঃপর।

শশিধর গোড়ায় ধোঁয়া লাগলে কিছু সুবিধা হবার আশা করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশই তাঁর কাছে সব আরো ধোঁয়াটে ঠেকতে লাগল। 'আণ্ডীবঃ অণ্ডফ্রয়েণ'—এ যে কি বস্তু তার রহস্য ভেদ করা থাক অনুমান করতেও তিনি অপারগ!

—এই যে ধূম্রলোচন, এসেছ? বাবা পদ্মলোচন, আর প্রণাম করতে হবে না, বসো। তুমি কি শ্লোকটার সদর্থ জানো? জানো না কি?

—জানলে কি আর জিজ্ঞাসা করি সার্?

—তাওতো বটে, তাওতো বটে। আচ্ছা, তোমার কি ঠিক স্মরণে আছে কথাটা আণ্ডীব, গাণ্ডীব নয়? গাণ্ডীব কথার হয়ত অর্থ হয়; গাণ্ডীবী মানে সব্যসাচী।

—কথাটা আণ্ডীব, আমার বেশ মনে আছে।

পণ্ডিতমশাই ঘন ঘন তামাক টানতে লাগলেন—সমস্ত শ্লোকটাই তোমার বেশ স্মরণ আছে, কোথাও কিছু ভুল করোনি? তাই ত—তবে—তাই ত!

পদ্মলোচন চলে গেলে পণ্ডিতমশাই এবার বৃহৎ শব্দার্থসংগ্রহ নিয়ে পড়লেন। মানস সাহস সঞ্চয় করে বলল—আমি ওর একটা লাইনের মানে করতে পারি, বাবা!

বাবা অভিধানের পাতা থেকে চোখ তুললেন—কোন লাইনের?

দ্বিতীয় লাইনের, যদি 'আণ্ডীব'-এর জায়গায় আণ্ডিল হয়, আর 'শিবাঙ্গব'-এর জায়গায় হয় গবাংগব।

পণ্ডিতের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তিনি মহামহোপাধ্যায় হয়ে হিমসিম খেয়ে গেলেন আর এই দুগ্ধপোষ্য বালকের মূঢ়তা দেখ। আগে হলে তিনি মেরেই বসতেন, কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা অনেকটা নিমজ্জমান লোকের মত, তাই কুটো হলেও মানসকে তিনি আশ্রয় করলেন।—কি শুনি?

মানস তথাপি ইতস্তত করতে থাকে—বলব?

—বলতেই ত বলছি।

—আণ্ডিলঃ! মানে এক আণ্ডিল, কিনা এক গাদা, অণ্ডফ্রয়েণ অর্থাৎ অণ্ড মানে ডিম্ব...ফ্রয়েণ মানে ফ্রাই করে অর্থাৎ কিনা এক ঝুড়ি ডিম ভেজে নিয়ে,—মানস্টেট মানস্টেট ··

—ওইখানে ত আমারও আটকাচ্ছে রে!—পণ্ডিতমশাই বিজ্ঞের মত এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন—ওই মানস্টেটই হলো মারাত্মক। যত নষ্টের গোড়া!

—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি বাবা! মানস্টেটঃ—বলব? ওটাতে পদ্ম হতভাগা আমাদের ওপর কটাক্ষ করেছে। অর্থাৎ কিনা মানস আর টেট, আমি আর আমার ভাই।

—বটে? গম্ভীরভাবে পণ্ডিতমশাই বললেন—সমস্তটা জড়িয়ে মানে কি হলো তবে?

—অর্থাৎ কিনা, এক গাদা ডিম ভেজে মানস আর টেট গবাংগবঃ—গব গব করে গিলছে। বোধহয় ও দেখেছিল।

দেখতে দেখতে পণ্ডিতের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, কি? আমার পুত্র হয়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে তোদের এই জঘন্য কীর্তি? তোরা কিনা ডিম্ব গলাধঃকরণ করিস? হংসডিম্ব কি কুক্কুটাণ্ড কে জানে!

বলেই তিনি মানসের পৃষ্ঠপোষকতার মতলবে তাঁর পাদুকা উত্তোলন করেছেন। মানস নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে বলল—ওই জন্যেই তো আমি বলতে চাই না। আপনার মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল বলেই ত বললাম।

—মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল! আর, এখন যে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হলো, তার কি!

পণ্ডিতমহাশয়ের আস্ফালন কানে যেতেই পণ্ডিত-গৃহিণী রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। তিনি যে-ভাবে ও যে-ভাষায় মানসের পক্ষ সমর্থন করলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে অণ্ড-ফ্রয়েণের ব্যাপারে কেবল তাঁর সহানুভূতিই নয়, দস্তুরমত সহযোগিতাও আছে। অগত্যা মানসকে মার্জনা করে দিয়ে পন্ডিত-মশাই আবার তাঁর শ্লোকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হলেন।

ইস্কুল থেকে হেডমাস্টারমশাই লোক পাঠিয়েছিলেন, পণ্ডিতমহাশয়ের খবর নিতে। আটদিন হয়ে গেল কেন তিনি ইস্কুলে আসছেন না—তাঁর কি হয়েছে?

পণ্ডিতমশাই উত্তর পাঠালেন—সমস্তই হয়েছে, বাকি কেবল 'শকেভুয়ে'—ওইটা হলেই হয়ে যায়।

উত্তর পেয়ে হেডমাস্টার তো হতভম্ব! শ্লোকটার কথা তিনি কবেই ভুলে গেছেন; আর তাছাড়া সংস্কৃত তাঁর আদপেই মনে থাকে না—উপনিষদেরই কি আর পাঁজিরই বা কি!

তিনি ভাবলেন—পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো? কাল নিজে গিয়ে দেখতে হবে।

পরদিন পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে দেখলেন, সদর দরজায় তালা লাগানো, তারই উপরে ঝুলছে To Let।

পন্ডিতের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, কোথায় গেছেন কেউ জানে না, বাড়িওয়ালার পাওনা চুকিয়ে প্রতিবেশীদের কিছু না বলে রাতারাতিই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

পদ্মলোচন পোস্টাপিস থেকে ফিরছে, যত রাজ্যের খবরের কাগজ তার হাতে। সরিতের সঙ্গে পথে দেখা হলো।

সরিৎ বলল—আচ্ছা শ্লোক ঝেড়েছিলিস ভাই! পণ্ডিত বেচারা পালিয়ে বাঁচল।

পদ্মলোচন শুধু হাসে।

—দারুণ শ্লোক বাবা! পণ্ডিতমশায় একেবারে 'টজেগেণঃ! লাভের আশা ত্যাগ করে উধাও হলেন!

পদ্মলোচন তবু হাসে।

—অবশ্যি মানকে একটা মানে করেছিল বটে, অর্থাৎ তুই নাকি তাকে আর তার ভাইকে লক্ষ্য করে ওটা বেঁধেছিস ?

পদ্মলোচনের হাসি আর থামে না—মানকের ছাই মানে। ও তো ডিমের মানে !

সমুৎসুক হয়ে সরিৎ জিজ্ঞেস করে—তবে আসল মানেটা কি ভাই। বলবিনে আমাদের ?

—মানে এই যে আমার হাতেই রয়েছে !

—ও তো সব খবরের কাগজ।

—আরে, এই নামগুলোই তো ওলটপালট করে দিয়েছি ! উল্টো দিক থেকে একটু এদিক ওদিক করে পড়লেই ওর মানে হবে, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ, বঙ্গবাসী, স্টেটসম্যান আর ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া।…

সেই বছরই সে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হল।

যেমন ষণ্ডামার্কা চেহারা, তার উপরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—চুলে তেলও দিত না, চিরুনিও না। রুক্ষ রুক্ষ চুলে তাকে দেখাতো ঠিক গুণ্ডার মতো। নামটাও তার বিদঘুটে, সেটা মনে রাখা বা মুখে আনা সহজ ছিল না। উপাধি ছিল ঘটক, সবাই তাই ধরেই তাকে ডাকত।

আমি বলতাম, ঘটক না ঘটোৎকচ! সেটা অবশ্য মনে মনে।

তার সঙ্গে বিবাদ করা তো বিপজ্জনক ছিলই, বন্ধুত্বও নিরাপদ ছিল না—কি রে ভাল আছিস? বলে সে যখন বন্ধুর পিঠে বিরাশী-সিকের আদর বসাতো, তখন তার জবাবে ভাল আছি জানানো নেহাত মিথ্যা কথা হত। বরং 'হ্যাঁ একটু আগে ছিলাম' বললেই যথার্থ উত্তর হত। অকস্মাৎ এমন কিল খাওয়ার পর মানুষ কখনো ভাল থাকতে পারে?

নিঃস্বার্থভাবে চড়-চাপড় বসানো ছাড়াও তার আরও গুণ ছিল। ক্লাশের প্রায় প্রত্যেক ছেলের একটা করে অদ্ভুত নাম সে বের করেছিল। সেই নামে তাদের ডাকত—যাকে ডাকা হত তখন সে ছাড়া আর সবাই খুব হাসত। একদিন সে আমাকেই ডেকে বসল—কিগো লট্‌পট্‌ সিং কি হচ্ছে?

নতুন নামে দস্তুরমতো আপত্তি ছিল আমার। বিশেষ করে এতে আমার চেহারার প্রতি কটাক্ষ ছিল, কেন না ভারী রোগা ছিলাম আমি। কাজেই আমার রাগ হয়ে গেল। বলে ফেললাম, আর তুমি কী? তুমি যে আস্ত একটি ঘটোৎকচ!

বলে ভাল করলাম না। সেটা পরমুহূর্তেই টের পেলাম। টের পেলাম নিজের পিঠে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা আমি আদপেই পছন্দ করি না।

তখুনি কিন্তু আমি তার শোধ তুলেছিলাম। অবশ্য আর এক দিক দিয়ে। সে পিরিয়ডটা ছিল ইংরেজীর, কিন্তু আমাদের ইংরেজীর সার্ সেদিন স্কুলে আসেননি। ক্লাশে ভারী গোল হচ্ছিল, তাই হেডমাস্টারমশাই নিজে আমাদের ক্লাশ নিতে এলেন। ঘটোৎকচ নিজের সীট ছেড়ে চলে এসেছিল, সে তাড়াতাড়ি আমার পাশেই বসে পড়ল।

হেডমাস্টারমশাই তাকেই প্রশ্ন করলেন, মুখে মুখে ট্রান্স্লেট কর, ক্লাসে বড় গোল হচ্ছিল।

সে আমার হাত টিপে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, গোলের ইংরেজি কীরে?

আমি চুপি চুপি উত্তর দিলাম, রাউন্ড।

—আহা সে গোল নয় গো-ল।

—কি গোল? ফুটবল খেলার গোল? সে তো জি-ও-এ-এল।

—দূর ছাই, তা নয়—

হেডমাস্টারমশাই তাড়া দিলেন, সোজা ট্রান্স্লেশন, এত দেরি কিসের?

উপায় না দেখে সে বলে ফেলল—There was much rounds in the class.

হেডমাস্টারমশাই এত অবাক হয়ে গেলেন যে তাকে কিছু না বলে আমাকে বললেন তার কান মলে দিতে। তার পর তাকে ছেড়ে আর সব ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কান মলে দিতে দিতে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, much নয়, ওটা big rounds হবে—বড় গোল কিনা!

সে-কথা কানে না তুলে সে বললে, যা জোরে মলেছিস, আচ্ছা, দেখব তোকে ছুটির পর।

সমস্ত ক্লাশ ঘুরে আবার তার পালা এল, হেডমাস্টারমশাই তাকে প্রশ্ন করলেন, আমি ঐ কাপড়টি পরি—পারবে এটা?

বড় রকমের ঘাড় নেড়ে সে বলল, হ্যাঁ।

বলল এবং উঠেও দাঁড়াল, কিন্তু তার পরে আর কোন উচ্চবাচ্য নেই। মুখ নড়তে থাকে কিন্তু মুখ আর খোলে না। ভাবটা যেন এই যে এর অনেক রকম উত্তর তার জিভের গোড়ায় এসেছে, কিন্তু কোনটা বলবে ভেবে পাচ্ছে না!

আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না দেখে সে আমাকে একটা চিমটি কাটল, নিচু গলায় বলল, কাপড় পরা কি হবে রে?

—না, আমি বলব না। তুমি যে ছুটির পর আমাকে দেখাবে বলেছ।

—না ভাই দেখাব না, তুই লিখে দে।

আমি তার রাফ-খাতাটা টেনে নিয়ে দেখার সুবিধার জন্য এক পাতা জুড়ে বড় বড় ছাঁদে লিখলাম—কাপড় পরা—to read the cloth.

সে তখন চট্‌পট্ উত্তর দিল, আই রিড দ্যাট ক্লথ।

হেডমাস্টারমশায়ের বিস্ময় তখন সপ্তমে উঠেছে—হ্যাঁ? কাপড় পরার ইংরেজী তুমি জানো না? পরার ইংরেজী! পরা!

—পড়ার ইংরেজী? পড়া—পড়া? ও। মনে পড়েছে—to fall!

Stand up on the bench সমস্ত ঘণ্টা থাকবে, নেমেছ কি ফাইন।—বলে হেডমাস্টারমশাই চলে গেলেন। ক্লাশ সুদ্ধ সবাই ঘটোৎকচের এই দুরবস্থাটা উপভোগ করলাম। যখন তখন মুষ্টিযোগের জন্য আমরা কে না ওর উপর চটা ছিলাম?

বলা বাহুল্য, সেদিন শেষ পিরিয়ডে আমার বেজায় পেট কামড়াতে লাগল। ক্লাশ টিচারের কাছে ছুটি নিয়ে বেরুচ্ছি, ঘটোৎকচ বইয়ের আড়াল থেকে ঘুসি দেখাল। ভাবখানা যেন এই—বড্ড ফসকে গেলি আজ। তা বলে তোর নিস্তার নেই!

তার পরদিন কিন্তু তার সঙ্গে আমার ভারী ভাব হয়ে গেল। হলও খুব অদ্ভুত রকমে।

বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে একটা ছারপোকা ভারি কামড়াচ্ছিল আঙুলে, অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বের করে খতম করতে যাচ্ছি, সে বলে উঠল, আহা আহা, মারিস নে, মারিস নে, মরে যাবে। অমন করে বেচারাকে মারিস নে।

সহপাঠীর প্রতি যে এত নিষ্ঠুর, ছারপোকার প্রতি তার এমন মমতা! বিস্মিত হয়ে বললাম, তবে কি করব একে? মাটিতে ছেড়ে দি?

সে ব্যস্ত হয়ে বলল, আরে না না, পালিয়ে যাবে যে! দাঁড়া।···আহা বেশ ছারপোকাটি তো। কেমন মোটাসোটা! নধর নধর। বেশ চাকন চিকন! দেখতেও চমৎকার! গায়ের রঙে কালচে লাল আর লালচে কালো একসঙ্গে মিশ খেয়েছে। এ রকম আমার একটিও নেই।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম—বলে কি এ?

—ছারপোকাটা দিবি আমায়? তাহলে আর তোকে মারব না। কোনদিন না।

আমি বললাম, এক্ষুনি এক্ষুনি। যেখানে তোমার খুশি একে নিয়ে যাও।

খুব আনন্দিত হয়ে পকেট থেকে একটা বেঁটে চেহারার গোলমুখো শিশি সে বার করল। ও বাবা! তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ছারপোকা! লাখ লাখ না হলেও হাজার হাজার তো বটেই! আমার উপহারটাকে সযত্নে তার মধ্যে পুরে নিয়ে বলল—এতেই ধরে রাখি ওদের। আমার অনেক দিনের পোষা!

—পাখি, খরগোস এ সব লোকে পোষে দেখছি। ছারপোকা আবার কেউ পোষে না কি?

ছারপোকার তুই কি জানিস? আমি অনেক দিন থেকে ওদের সঙ্গে মিশছি, ওদের নাড়ী-নক্ষত্র সব আমার জানা। ওদের বুদ্ধির কথা ভাবলে—

কিন্তু টীচার ক্লাশে এসে পড়ায় ছারপোকার কাহিনী মাঝখানেই তাকে থামাতে হল। সেজন্য সে ক্ষুণ্ণ হল বিশেষ।

টিফিনের সময় পাশের গ্রামের টীম এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করল ফুটবল

ম্যাচে। ওরা ভারি গোঁয়ার—হারতে থাকলেই ওদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, বল ছেড়ে অপর দলকে ধরে পিটতে শুরু করে দেয়। গত বছর আমাদের বেচারামের পা ভেঙে দিয়েছিল, তার স্কোরেই ওরা one nill-এ হেরে যায়। তাই ওদের সঙ্গে খেলতে আমাদের উৎসাহ ছিল না।

কিন্তু ঘটোৎকচ বলল, আরে এবার আমি আছি। ভয় কিসের! সব তুলো ধুনে দেব!

কিন্তু মাঠে গিয়ে ঘটোৎকচ হল গোলকিপার! আমরা বললাম, না-না, তুই আমাদের সঙ্গে ফরোয়ার্ডে আয়।

সে বলল—আরে এখন কি! খেলা শেষ হোক না! তখন ধুনে দেব।

বেচারামের কথা আমার মনে পড়ল। বেচারার পা সেরেছে বটে কিন্তু জীবনে তাকে বল ছুঁতে হবে না। অবশ্য পা-ভাঙাকে আমি কেয়ার করি না, আরাম করে বিছানায় শুয়ে থাকা তো! কিন্তু আসছে হপ্তায় মামার বাড়ি যাব যে—। আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন আমরা হেরে যাই, অনেক গোল খেয়ে এমন ঢোল হারা হারি যে, ওরা খুশি হয়ে সন্দেশ খাওয়ায়।

কিন্তু হারব যে তার কোনো উপায় দেখা গেল না। ওরা বল নিয়ে এগুতেই পারে না—এগোনো দূরে থাক, নিজেদের গোল-এরিয়ার ভেতর থেকে বল ক্লিয়ার করাই ওদের মুশকিল! বিপদ অনিবার্য দেখে আমি খুব সাবধানে খেলতে লাগলাম—পাছে ওদের না গোল দিয়ে ফেলি। আমাদের কেউ শুট করেছে, তাতে গোল নির্ঘাত—বাধ্য হয়ে আমাকে বল আটকে গোল বাঁচাতে হয়। কর্নার হতে যাচ্ছে, ওদের হয়ে কর্নারের বল কেড়ে নিয়ে আমিই আউট করে দিই!

কিন্তু কপালের লেখন খণ্ডাবে কে? ভাবলাম এবার আস্তে একটা শুট করি, গোলকিপার অনায়াসেই তা আটকে ফেলবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই বলটাই গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে গোল হয়ে গেল। তারপর থেকেই ওরা যেমন করে আমাকে ছেঁকে ধরল, তাতে বাধ্য হয়ে ব্যাকের সঙ্গে আমাকে জায়গা বদল করতে হল। প্রাণের ভয় আমি করি না, কিন্তু পা বাঁচাতে হবে তো! মামার বাড়ি রয়েছে।

গোল খেয়ে ওরা একটু গোঁ ধরে খেলতে লাগল। দু-একবার বল নিয়ে এগিয়েও এল, কিন্তু গোল দেবার কোনো লক্ষণই তাদের দেখলাম না! দৈবাৎ যদি গোলটা শোধ হয়ে যায় তো বাঁচা যায়। খেলা সেরে আমাদের ফিরতে তো সন্ধ্যে—হারলে ওরা কি আর আস্ত ফিরতে দেবে?

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ওরা একটা শুট করল গোলের মুখে। ঘটোৎকচ ভাবল আমি শুট ফিরিয়ে দেব, কিন্তু আমি দেখলাম এ সুযোগ আর ছাড়া নয়। বলটা ছেড়ে দিয়ে ঘটোৎকচকে এমনভাবে আড়াল করলাম যে আটকাবার কোনো সুবিধাই সে পেল না।

গোল দিয়ে ওরা যা লাফাতে লাগল—সে এক দৃশ্য! দেখে আমার আনন্দ হল! তারপর শেষ দশ মিনিট দ্বিগুণ উৎসাহে ওরা আমাদের চেপে রইল। কোনো রকমে আর একটা গোল খেলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ভাবলাম

আশা সফল হবে, কিন্তু এমনি ওদের শুট করার কায়দা যে গোলে মারলে সে বল গোলপোস্টকে সেলাম ঠুকে দশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে যায় ! সময় উত্তীর্ণ হয় দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না, নিজেই গোলে শুট করে দিলাম। আমিও গোল দিলাম আর খেলাও ওভার হল।

ওদের হাত থেকে তো কোনো গতিকে বাঁচলাম, কিন্তু পড়লাম ঘটোৎকচের কবলে। গোড়ায় জিতিয়ে আমিই শেষে ডুবিয়ে দেব, এমনটা ও আশা করেনি। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম—ভাই, খেলা আর পরীক্ষা, ও-দুটোই হচ্ছে 'লাক'। পড়লে-শুনলেও কিছু হয় না, ভাল করে খেললেও নয়। এই তো তুমি এত পড় কিন্তু কাল ক্লাসে হেডমাস্টারের কাছে—! বরাত ভাই, বরাত।

কিন্তু ও কি বোঝবার ? ঘুসি বাগিয়ে আমার দিকে এগুচ্ছে, এমন সময়ে সাঁই করে কোত্থেকে একটা ইট এসে পড়ল। তারপর আর একটা। ভেবেছিলাম জিতলে ওদের রাগ পড়বে, হয়তো সন্দেশ খাওয়াবে, কিন্তু শেষে কি না জলযোগের বদলে এই ইটযোগ ! আমরা আর কোনো দিকে না চেয়ে পই পই করে দৌড়তে শুরু করে দিলাম।

খানিক দূর দৌড়ে দেখি আর ইট আসছে না, কিন্তু ঘটোৎকচ কই ? সে তো আমাদের সঙ্গে নেই ! তবে কি সে একাই তাদের তুলো ধুনতে লেগে গেছে না কি ? যা গোঁয়ার সে—সব পারে। ফিরলাম তার খোঁজে। দেখি, সে এক গাছে উঠে বসে আছে। আমরা কোথায় ছুটে মরছি আর সে কি না নিরাপদে গাছে চেপে অবলীলাক্রমে তাদের ইট চালানো আর আমাদের দৌড়ঝাঁপ দেখছে মজা করে ! আমাদের দেখে সে গাছ থেকে নামল। নেমেই আমার দিকে চেয়ে বলল, কাল ইস্কুলে এর শোধ তুলব। তারপর সমস্ত রাস্তা আর কোনো কথাই সে বলল না।

পরদিন আমি ক্লাশে গেলাম ইস্কুল বসে গেলে পরে। আমি যাবা মাত্রই ঘটোৎকচ কট্‌মট্ করে আমার দিকে চাইল, তারপর টীচারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিকবাদেই সে ফিরে এল, কিন্তু ফিরে নিজের জায়গায় না গিয়ে বসল এসে আমার পাশে। আমি মনে মনে কাঁপতে লাগলাম এই বুঝি কোপ বসায়।

মাস্টারমশাই ক্লাশে ছিলেন বলে বিশেষ কিছু করতে পারছিল না, কিন্তু যা এক-একটা রাম-চিমটি কাটছিল তাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছিল মাস্টারমশাই চলে গেলে ওর কিলগুলো কি আন্দাজের হবে। আত্মরক্ষার জন্য আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। আস্তে আস্তে ওর পকেট থেকে ছারপোকার শিশিটা বার করে নিলাম। সুযোগ বুঝে ছিপি খুলে তার অর্ধেক ছারপোকা ওর মাথায় ছেড়ে দিয়ে আবার শিশিটা তেমনি ওর পকেটে রেখে দিলাম।

একটু পরেই ঘটোৎকচ একেবারে লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তার দারুণ চীৎকার ! তার পরেই সে দু হাতে ভীষণভাবে চুলকাতে লাগল।

ব্যস্ত হয়ে টীচার জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো, হলো কি তোমার ?

ক্লাসের সব ছেলে অবাক হয়ে ওকে দেখছিল, বিকৃত মুখে ও জবাব দিল, ভয়ানক কামড়াচ্ছে।

—চুল ছিঁড়লে কি মাথা কামড়ানো সারে? যাও, জলখাবারের ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক গে।

— মাথার ভেতরে নয়, বাইরে সার।

—বাইরে মাথা কামড়াচ্ছে, সে আবার কি? মাথার বাইরে মাথা কামড়ায়?

ততক্ষণে ঘটোৎকচ ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। সকলে মিলে তখন তার মস্তক পরীক্ষায় লাগা গেল, কিন্তু ঝাঁকড়া চুলের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতরে বাঘ কি ভালুক কিছু আবিষ্কার করা কঠিন। ছারপোকারাও ছিল অনেক দিনের উপোসী—ছাড়া পেয়ে তারা আত্মহারা হয়ে কামড়াচ্ছিল।

গোলমাল শুনে হেডমাস্টারমশাই এলেন, সমস্ত ক্লাশ ছেড়ে ছেলেরা ছুটে এলো। হট্টগোলে সেদিন ইস্কুল গেল ভেঙে, কিন্তু ঘটোৎকচের লম্ফঝম্প দেখে কে! ডাক্তার এলেন, কিন্তু তিনিও এই নতুন ধরনের মাথা-ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না।

অবশেষে এল নাপিত। কিন্তু মাথা মুড়োতে ঘটোৎকচ ভয়ানক নারাজ, তার অমন সাধের চুল—বোধ হয় ছারপোকার পরেই সে ভালোবাসে চুলকে। কিন্তু চুল না গেলে প্রাণ যায়, তাই অগত্যা ন্যাড়া হতে হল তাকে।

পরদিন ঘটোৎকচকে আর চেনাই যায় না। চুলের সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ তার উবে গেছে। সে আর মুখও চালায় না, হাতও নয়। শান্ত, শিষ্ট, গম্ভীর গোবেচারা—একেবারে আলাদা লোক। চুলের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মাথা কাটা গেছল।

ছারপোকার নাড়ী-নক্ষত্র সব সে জানতো, কিন্তু তবু একটা বিষয় তার জানা ছিল না। ওরা বিশ্বাসঘাতক—যে আশ্রয় দেয়, এমন কি যে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তাকেও ওরা কামড়াতে ছাড়ে না, তারও সর্বনাশ ওরা করতে পারে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনাবোধ ওদের নেই,—এটা সে আগে জানতো না। তাই ওদের এই ব্যবহার ওর হৃদয়ে লেগেছিল। আর হৃদয়ে আঘাত লাগলে মানুষের বুঝি এমনি হয়।

যখন যেমন তখন তেমন

আগের থেকেই ওদের স্থির ছিল যে এবারের মহরমে তাজিয়াটা ওরা খুব প্রকাণ্ড করে করবে। হয়েছেও তাই, অন্যবারের চেয়ে এবারের তাজিয়াটা অন্তত ছ গুণ বড় হয়েছে—আর উঁচুও হয়েছে প্রায় দোতলা বাড়ির সমান! তাজিয়াটা দেখে ওদের আনন্দ আর ধরে না—হ্যাঁ, একখানা তাজিয়ার মত তাজিয়া বটে! এ অঞ্চলের আর কারুর তাজিয়াকে ওদের ছাড়িয়ে উঠতে হবে না সে সম্বন্ধে ওরা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু একটা হলো মুশকিল। যে যে রাস্তা দিয়ে তাজিয়াটা যাবে তার দুপাশের কোন কোন গাছের শাখা-প্রশাখায় ওটার বাধা পাওয়ার আশঙ্কা রইলো। এটা ওদের ধারণায় আসেনি, আজই প্রথম চোখে পড়ল হঠাৎ। তাই আজ মহরমের দিনে সকাল থেকেই গাছে গাছে লোক লেগে গেছে ডালপালা ছাঁটার কাজে!

এই নিয়ে আলোচনা চলছিল তর্কচঞ্চু ও ন্যায়বাগীশের মধ্যে—'এবার মুসলমানদের তাজিয়াটা বড় হলো কেন জানো হে তর্কচঞ্চু! আমার জন্যই।'

বিস্ময়াবিষ্ট তর্কচঞ্চু বলল—'বলো কি হে ন্যায়বাগীশ, তুমি—তুমি—তোমার—'

'আহা, আমি কি ওদের কানে কানে বলতে গেছি! আমার অভিশাপের জন্যই এটা হলো।'

'তুমি অভিশাপ দিয়ে ওদের তাজিয়া বাড়িয়ে দিলে? শাপে বর হয়ে গেল যে হে!'

'আহা, আমি কি তাজিয়াকে অভিশাপ দিতে গেছি? সেদিন তোমায় বললাম না? বড় রাস্তা দিয়ে যেতে একটা ক্ষুদ্র প্রশাখা এসে পড়ল আমার পৃষ্ঠদেশে—তোমাকে বলিনি কথাটা? এখনো পৃষ্ঠে বেশ বেদনা রয়েছে!'

'বলেছিলে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তাজিয়া বুদ্ধির সম্পর্ক তো খুঁজে পাচ্ছি না ভায়া।'

'তৎক্ষণাৎ আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বৃক্ষদের ব্রহ্মশাপ দিলাম, বড্ড বাড় বেড়েছিস তোরা। ভস্ম হয়ে যা। বুঝলে হে তর্কচঞ্চু, এখনো প্রত্যহ কাঁচকলা দিয়ে হবিষ্যান্ন করি, আমার ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হবার?'

তর্কচঞ্চু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল—'ঠিক বুঝতে পারলাম না ভায়া! বড় রাস্তার গাছগুলো তো আজ প্রাতঃকালেও সজীব দেখেছি, ভস্ম হয়ে যায়নি তো।'

'এইবার হবে। সবুরে মেওয়া ফলে! সাপের বিষ ধরতে সময় লাগে, ব্রহ্মশাপের বেলাই কি অন্যথা হবে? কেন, দেখতে পাচ্ছ না? আজ প্রত্যুষ হতেই বড় রাস্তার শাখা-প্রশাখা সব কাটা পড়েছে, তাজিয়া যাবার জন্য। সেই সব ছিন্ন শাখা-প্রশাখা জমিদারবাড়ি চলে যাচ্ছে ইন্ধনের নিমিত্ত। একবার উনুনে ঢুকলে ভস্মসাৎ হতে আর কতক্ষণ হে?'

তর্কচঞ্চু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'ও, এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা। তোমার ব্রহ্মশাপের ফল যে এতদূর গড়াবে আগে ভাবতে পারিনি।'

ন্যায়বাগীশ আস্ফালন করতে লাগলেন—'ঠিক হয়েছে, চূড়ান্ত হয়েছে। আজকাল ব্রহ্মশাপ ফলে না যারা বলে তারা দেখুক এসে। ওঃ, এখনো আমার পৃষ্ঠদেশে বেদনা রয়েছে হে!'

বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকো টানতে টানতে উপস্থিত হলেন—'বুঝলে হে তর্কচঞ্চু, সমস্তই মায়া!'

তর্কচঞ্চু বললেন—'তবু একটু সতর্ক হয়ে টানাই ভাল। যেভাবে হুঁকোটাকে ধরেছ, যদি কলকের আগুন নলচে টপ্‌কে গায়ে এসে পড়ে তখন সমস্তটা ঠিক মায়া বলে বোধ হবে না।'

হুঁকোটা পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হয়ে এসেছিল, বেদান্ত শিরোমণি ওকে রাইট অ্যাঙ্গলে স্থাপন করে বললেন—'যা বলেছ। বিশেষত গায়ে না পড়ে যদি বস্ত্রে লাগে তবে ত পাঁচ সিকের ধাক্কায় ফেলেছে। বস্ত্র কি আক্রা হে আজকালকার বাজারে—আড়াই মুদ্রা জোড়া! ঠিক বলেছ তুমি তর্কচঞ্চু! সাবধানের বিনাশ নাই।'

ন্যায়বাগীশ বললেন—'স্মৃতিরত্নকে দেখছি না, আজ সকাল থেকে কোথায় গেল সে?—'

জঙ্গীপুর গ্রামটিকে ব্রাহ্মণ-প্রধান বলাই উচিত কেননা ব্রাহ্মণরাই এখানে প্রধান—অন্তত তাদের নিজেদের কাছে। হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি শ্রেণীর কয়েক ঘর থাকলেও, তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কোন সম্পর্ক নেই—না অন্তরের, না বাইরের। স্মৃতিরত্ন, তর্কচঞ্চু, ন্যায়বাগীশ, কাব্যতীর্থ আর বেদান্ত-

শিরোমণি—এই পাঁচঘর, চারিধারের ম্লেচ্ছতা আর অস্পৃশ্যতার সমুদ্রে মোহনার পাঁচটি ব-দ্বীপের মতো কোন রকমে নিজেদের মাহাত্ম্য ও শুচিতা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ম্লেচ্ছতার সমুদ্রই বলতেই হবে, কেননা এর আশপাশ থেকে শুরু করে বহু দূর পর্যন্ত কেবল মুসলমান আর মুসলমান। চারিধারেই মুসলমানের বস্তি—জঙ্গিপুর নামের মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে। যখন পোলাও, কালিয়া আর মুরগী রান্নার সৌরভ এসে আক্রমণ করে তখন স্মৃতিরত্ন ঘন ঘন নাকে নস্য দিতে থাকেন, কাব্যতীর্থ ওর ফাঁকে এক আধটু ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন করে নেন হয়ত, কেবল বেদান্ত শিরোমণি ঘন ঘন হুঁকো টানেন আর বলেন—মায়া, মায়া, সমস্তই মায়া!

বলতে বলতে স্মৃতিরত্ন এসে উপস্থিত। তর্কচঞ্চু বললেন—'বহুদিন বাঁচবে তুমি হে! বহুকাল জীবিত থাকবে! এই মাত্র ন্যায়বাগীশ তোমার নাম উচ্চারণ করছিল।'

বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকোটা তর্কচঞ্চুর হাতে দিয়ে বললেন—'বাঁচলে কি হবে, সমস্তই মায়া। ওর বাঁচাও যা, মরাও তাই।'

ন্যায়বাগীশ বললেন,—'উঁহু, মরাটাকে ঠিক তাই বলতে পারি না! মরলে শ্রাদ্ধের একটা ভোজ পাওয়া যাবে, সেটাকে কি ঠিক মায়া বলা যায়? তুমি এই সাতসকালে কোথায় গেছলে হে স্মৃতিরত্ন?'

'আর বোলো না! একটা জাতিচ্যুতির ব্যাপার।'

সবাই আগ্রহে ঘন হয়ে এল—'বলো কি হে? কার জাতিচ্যুতি হলো আবার?'

'নতুন কূপটার। বুঝতে পারছ না? বাজারের নতুন ইঁদারাটার গো! মুচিরা বালতি ডুবিয়েছিল।'

কাব্যতীর্থ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিলেন, এইবার এগিয়ে এলেন, 'তা ডুবিয়েছিল, অমনি কূপের জাত মারা গেল? এই দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে যা জল পিপাসা হয় তা কহতব্য নয়—আর মুচি বলে কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই ওদের? কোথায় যায় বেচারারা কও দেখি।'

স্মৃতিরত্ন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'তুমি থামো কাব্যতীর্থ! কাব্যের অনুশাসনে কিছু সংসার চলছে না। মনুসংহিতার বিধান মেনে চলতে হবে আমাদের। তোমাদের কি—কথায় বলে, নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।'

ন্যায়বাগীশ বললেন—'তা তুমি কি বিধান দিলে স্মৃতিরত্ন?'

'যা শাস্ত্রে রয়েছে তা ছাড়া আবার কি? প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিলাম!'

বেদান্ত শিরোমণি বিস্ময়ে বললেন—'ইঁদারার প্রায়শ্চিত্ত, সে আবার কি হে? ইঁদুরের প্রায়শ্চিত্ত হলেও না হয় বুঝতাম; তবে একটা কথা, কিছুই বোঝার আবশ্যক করে না—সমস্তই মায়া কি না!'

স্মৃতিরত্ন বললেন—'মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালার নামই প্রায়শ্চিত্ত—কূপের বেলায় কি তার অন্যথা হবে? শান-বাঁধানো মাথাটা চেঁছে ফেলা হলো, তারপর

পঞ্চগব্য দিয়ে সমস্ত জায়গাটা ভাল করে মাজা হলো, তারপর কলসপূর্ণ ঘোল ঢেলে দেওয়া হলো কূপের মধ্যে।'

কাব্যতীর্থ দুঃখ প্রকাশ করলেন—'আহা, পেটে গেলে কাজ দিত হে! এই দারুণ গ্রীষ্মে ঘোলের শরবত অতি উপাদেয়।"

ন্যায়বাগীশ বললেন—'কিন্তু পাপ করল মুচিরা, প্রায়শ্চিত্ত কূপের। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে, এটা কি রকম ন্যায়সঙ্গত?'

স্মৃতিরত্ন বললেন—'তারও ব্যবস্থা করেছি। আমি কি সহজে ছাড়বার পাত্র? জমিদার-বাড়ি হয়েই আসছি, ভিটেমাটি-উচ্ছেদ করে মুচিদের গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলে এলাম। একেবারে প্রায়শ্চিত্তের বাবা, কি বলো হে তর্কচঞ্চু?'

তর্কচঞ্চু মাথা নাড়তে লাগলেন—'ভাল কাজ করো নি হে! হাঁড়িজনরা সব হরিজন হচ্ছে আজকাল, একটু সতর্ক থাকতেই হয়। যদি বাগে পেয়ে গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়? অবশ্য আমরা গরু নই এবং এখনও মরিনি—মরা গরুরই ওরা ছড়ায়। কিন্তু ভ্রম হতে কতক্ষণ? রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, আর ব্রাহ্মণে গরু ভ্রম হবে এ আর বেশি কথা কি?'

বেদান্ত শিরোমণি হুঁকোটা হাতে নিয়ে বললেন—'হাঁ, এখন কিছুদিন সতর্ক থাকতেই হবে, যা ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন স্মৃতিরত্ন! যদিও সমস্তই মায়া তবু প্রাণের মায়াটাই হলো তার মধ্যে প্রধান। সাবধানের বিনাশ নেই, কি বলো হে তর্কচঞ্চু?'

তর্কচঞ্চু এমন সময়ে প্রস্তাব করলেন—'চলো, মহরমের তাজিয়াটা দেখে আসিগে! ন্যায়বাগীশের ব্রহ্মশাপের ফলে ওটার কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসা যাক।'

স্মৃতিরত্নের নাসিকা কুঞ্চিত হলো—'ম্লেচ্ছদের ব্যাপার......'

ন্যায়বাগীশের উৎসাহ দেখা গেল—'তাতে কি! দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে।'

কাব্যতীর্থ যোগ দিলেন—'তাজ আর তাজিয়া উভয়ই এক বস্তু শুনেছি। তাজমহল থেকেই তাজিয়ার উৎপত্তি মনে হয়! তাজমহল চাক্ষুষ করার আশা তো নেই কোনদিন, তাজিয়া দেখেই আশ মিটানো যাক।'

বেদান্ত শিরোমণি বললেন—'সবই মায়া জানি, তবু চলো। একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার যে তাতে সন্দেহ নাস্তি!'

যা শোনা গেছল সত্যি! এত বড় উঁচু তাজিয়া এ অঞ্চলে দেখা যায়নি, অন্তত স্মৃতিরত্ন তো জন্মাবধি দেখেননি, কাব্যতীর্থ যে রকম হাঁ করেছেন তাতে মনে হয়, পরজন্মেও যে এত বড় তাজিয়া তিনি দেখতে পারেন তেমন প্রত্যাশা তিনি রাখেন না। বেদান্ত শিরোমণির কাছে সমস্তই মায়া, তিনি হুঁকোর ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এই অপূর্ব সৃষ্টিটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। আর ন্যায়বাগীশের কথা বলাই বাহুল্য, তাঁরই ব্রহ্মশাপের জোরে যেন তাজিয়া মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, সাফল্য-গর্বে হাসি তাঁর ধরে না আর।

কেবল কাব্যতীর্থের মুখ দিয়ে বাক্য বেরয়—'হ্যাঁ, তাজমহলই বটে!'

মহরমের শোভাযাত্রা বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু মুশকিল বেধেছিল ঐ তাজমহলকে নিয়েই। ওটাকে বইবে কে? কারা? যেমন উঁচু, ভারিও সেই অনুপাতে কিছু কম হয়নি। তাছাড়া সবাই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে যেতে চায়, তাজিয়া বয়ে মরতে রাজি নয় কেউ। সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দেখিয়ে ওদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করল, 'ওই হাঁদু মৌলবীদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিলে হয় না?'

ওদেরই মধ্যে যে একটু বিশেষজ্ঞ সে বলল—'চুপ চুপ, ওরা সব পানডিৎ। মৌলবী কইলে ওনাদের গোঁসা হইবে, তখন আর ওনারা কাঁধ দিতে রাজি হবেননি।'

প্রস্তাব শুনে 'পাণ্ডিৎদের' চক্ষু তো চড়কগাছ! ন্যায়বাগীশের এখনো পৃষ্ঠপ্রদেশের বেদনা মরেনি, তার উপর ওই ভারি তাজিয়া বইতে হলেই তো তাঁর হয়েছে! কতদূর নিয়ে যেতে হবে কে জানে! স্মৃতিরত্নের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, তিনি আমতা আমতা করে বললেন—'বাপু আমরা হলেম গিয়ে—আমরা গিয়ে—ও হে কাব্যতীর্থ, ম্লেচ্ছ কথাটার পারসিক প্রতিশব্দটা কিহে?'

শুষ্ক মুখে কাব্যতীর্থ বললেন—'কাফের।'

'হ্যাঁ, আমরা হলাম গিয়ে কাফের। আমরা ছুঁলে তোমাদের দেবতা অশুদ্ধ হবে না?'

যাদের মিলিটারি মেজাজ তারা কথার ঘোরপ্যাঁচ পছন্দ করে না, আইন-কানুনের সূক্ষ্ম তর্কেও তাদের উৎসাহ নেই। স্মৃতিরত্নের অত বড় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার জবাবে এই সংক্ষিপ্ত কথাটা ওরা জানাল যে তাজিয়া বইতে রাজি না হলে মাথাগুলো রেখে যেতে হবে।

তর্কচঞ্চু স্মৃতিরত্নকে প্রশ্ন করলেন—'এ সম্বন্ধে মনুর কি বিধান? যবনদের তাজিয়া বওয়া কি শাস্ত্রসম্মত?'

স্মৃতিরত্ন হতাশভাবে মাথা নাড়লেন। কাব্যতীর্থ বলেন—'এ সম্বন্ধে বেদবাক্য কিছু না থাকলেও প্রবাদবাক্য একটা আছে বটে, তাতে বলে—পড়েছ মোগলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে।'

বেদান্ত-শিরোমণি বললেন—'যদিও সমস্তই মায়া তবু মাথাকে স্কন্ধচ্যুত করার চেয়ে তাজিয়াকে স্কন্ধে নেওয়াই আমার মতে সমীচীন। কি বলো হে ন্যায়বাগীশ?'

ন্যায়বাগীশ কিছুই বলেন না, কেবল পিঠে হাত বুলান। শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে চলল জোয়ান ছোকরার দল লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে, তাদের অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স যাদের তারা সবাই লম্বা লম্বা লাঠি উঁচু করে—মুহুর্মুহু লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি বাধানোই হলো তাদের কাজ। তারপর চলছিল ছয়টা জয়ঢাক, তাদের আওয়াজে কানে তালা লাগবার যোগাড়। তাদের পেছনেই আরেকদল চলল—তাদের বুক বোধকরি পাথরের—তারা খালি 'হাসান হোসেন' বলে আর বুক চাপড়ায়। তারপরেই পানডিৎদের পৃষ্ঠারূঢ় চলমান তাজমহল। চলমান এবং টলমান।

তর্কচঞ্চু কাঁধ বদলে নিয়ে বলেন—'শাপটা দিয়ে ভাল করোনি হে ন্যায়বাগীশ! এখন ঠেলা সামলাও।'

ন্যায়বাগীশের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ শোনায়—'আর ভাই, কে জানে ব্রহ্মশাপের জের এতদূর গড়াবে!'

কাব্যতীর্থ অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন—'ব্যাটারা অমন করে বুক চাপড়ায় কেন হে?'

বেদান্ত-শিরোমণি ভারী গম্ভীর হয়ে যান—'সমস্তই মায়া, কিন্তু মায়াদয়া নেই ব্যাটাদের। এত ভারী করার কি দরকার ছিল এমন! তাছাড়া যা পেঁয়াজের গন্ধ ছেড়েছে—'

করাঘাতকারীদের একজন পণ্ডিতদের বলে—'হ্যাঁ দ্যাখো। তোমরা চাপড় দাও না ক্যান? ছাতি চাপড়াও।'

স্মৃতিরত্ন বললেন—'এর ওপর যদি আবার বুক চাপড়াতে হয় তাহলে তাজিয়া পড়ে যাবে কিন্তু।'

ন্যায়বাগীশ ভীত হয়ে ওঠেন—'সর্বনাশ! একেই আমার পৃষ্ঠে ব্যথা তারপর তাজমহল-চাপা পড়লে আর বাঁচব না।'

ওরা বিরক্তি প্রকাশ করে—'চাপড় যদি না দিবা তো আমরা যা কইতেছি তাই কও।'

স্মৃতিরত্ন চাপা গলায় প্রশ্ন করেন—'কি বলছে ব্যাটারা বুঝতে পারছ কিছু?'

'বোধ হয় বলছে—' তর্কচঞ্চু চুপি চুপি কথাটা জানান। স্মৃতিরত্ন ঘাড় নাড়েন—'ঠিক বলেছ, তাই হবে।'

ওরা বলতে বলতে চলে—'হাসেন হোসেন, হাসেন হোসেন, হাসেন হোসেন…'

পণ্ডিতেরা অগত্যা যোগ দেন—'যখন যেমন, তখন তেমন! যখন যেমন, তখন তেমন…'

হারাধনের দুঃখ

আমাদের হারাধনের বড় দুঃখ। দুঃখের কারণ তার মাথায়। তার যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তা নয়, তাহলে তার বন্ধু-বান্ধবরা তার সম্বন্ধে দুঃখিত হলেও সে নিজের সম্বন্ধে কোনো দুঃখবোধ করত না। কেননা তার যে মাথা খারাপ হয়েছে আর সকলে তা জানলেও তার অজানা থাকত।

তার দুঃখের কারণ তার মাথার চুলে। হারাধনের বয়স বেশি নয়। এই বাইশ বছর মোটে, কিন্তু এরই মধ্যে তার দারুণ চুল উঠতে আরম্ভ করেছে। প্রত্যহ তেল মাখতে, চুল আঁচড়াতে, এত বেশি চুলক্ষয় হচ্ছে যে সে ভারী ভাবনায় পড়ে গেছে। এভাবে আর কিছুদিন চললে টাক পড়তে আর দেরি কি? আর টাক পড়বে—এই বয়সে?

তার ওপর হারাধন আবার কবিতা লেখে। যাকে বলে তরুণ কবি। রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রায় প্রত্যেক কবিরই কেশাধিক্য দেখতে পাওয়া যায়—তাই থেকে হারাধনের ধারণা চুলের সঙ্গে কবিতার নিকট সম্পর্ক কিছু আছে। বোধ হয়, আকাশের উড়ন্ত ভাবগুলো চুলে এসে আটকে যায়, যেমন বেতারের তারে শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে। চুল গেলে কি আর সে কবিতা লিখতে পারবে? বোধ হয় না! আজ যদি রবীন্দ্রনাথের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয় তিনি কি আর কবিতা লিখতে পারবেন?

না। কবিতাও লিখতে পারবেন না। আবার, নোবেলতলাতেও আর যেতে হবে না তাঁকে। এবং চুল উঠে গেলে সেই নোবেল আর তার বরাতেও কোনোদিন পাকবে না!

তাই হারাধন ভারী ভাবনায় পড়ে গেছে। চুল চলে গেলে ব্যক্তিত্ব যায়, যৌবন যায়, মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত আকর্ষণ চলে যায়—কেবল জীবনটা থাকে। তাও কেবল প্রাণে থাকে মাত্র, সেই জীবনের কোনো মানে থাকে না। তাই হারাধন বড় ভাবিত।

অবশেষে হারাধন, 'ভিষগ্রত্ন, ভিষগাচার্য, ধন্বন্তরী'—এই সব উপাধি সাইনবোর্ডে দেখে এক কবিরাজের শরণ নিল! গিয়েই প্রশ্ন করল, 'মশাই, আপনাদের কবিরাজিতে কি সমস্ত আধিব্যাধির প্রতিকার আছে?'

কবিরাজ মহাশয় বিস্ময়ের বিমূঢ়তা অতি কষ্টে কাটিয়ে উঠে উত্তর দিলেন—'বলেন কি আপনি! ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিদের আবিষ্কৃত এই আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র। আপনি যে অবাক করলেন আমাকে!'

'না, না, আমি তা বলচিনে। শাস্ত্রর ওপর কোনো কটাক্ষপাত করচিনে আমি। আমি বলচি কি—'

বাধা দিয়ে কবিরাজ বললেন—'কটাক্ষপাত আর কাকে বলে! আজ না হয় ওই সদ্য বিষ—এই এলোপ্যাথিগুলো এসেছে, কিন্তু আগে কোন্ ওষুধ খেয়ে বাঁচতেন? সত্যে, ত্রেতায়, দ্বাপরে—?'

'আপনি ভুল করচেন! আমি সত্য কি ত্রেতাযুগে ছিলুম না, দ্বাপরেও আমি বাঁচিনি। এমন কি বাইশ বছর আগেও—'

'ওই তো আজকালকার ছেলেদের দোষ! মুনিঋষিতে বিশ্বাস নেই, শাস্ত্রে বিশ্বাস নেই। তাতেই তো উচ্ছন্ন গেল দেশটা! বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ—বিশ্বাস করতে শিখুন!'

'কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হতে পারে এমন কোনো মারাত্মক রোগ আমার হয়নি! আমার যে রোগ, আদপে তা রোগ কিনা, তাই এখনো আমি জানি না। সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা!'

'বলুন আপনার কি ব্যাধি? যা কোনো চিকিৎসায় না সেরেছে তা কবিরাজীতে সারবে। সারবেই। আপনাকে মুখে বলতেও হবে না, দেখি আপনার হাতটা! নাড়ি টিপলেই সব টের পাব।'

কবিরাজ মশাই হতভম্ব হারাধনের হাতখানা টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি টিপে অবশেষে বল্লেন—হুঁ, হয়েচে। জলৌকাগতিঃ। আপনার নাড়ির গতি ঠিক জোঁকের মত! বায়ু-পিত্ত-কফ! আপনার বায়ু কুপিত।—যন্ত্রণাটা কোথায়?'

'যন্ত্রণা কিছুই নেই। বেজায় চুল উঠছে।'

কবিরাজ মশাই ঠিক বুঝতে না পেরে বললেন—'য়্যাঁ?'

হারাধন বলল—'মাথার চুল উঠে যাচ্ছে এই আমার অসুখ। এবার কবিরাজ মশাই রোগটা ধরতে পেরে নিজেকে সামলে নিলেন, ও! আপনার চুলের রোগ! বায়ু কুপিত কিনা, সেই কারণেই উঠচে। টাকের লক্ষণ দেখা দিয়েচে, অচিরেই টাক পড়বে।'

কাঁচুমাচু হয়ে হারাধন বলল—'টাক পড়বেই? এর কি কোনো প্রতিকার

নেই? আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কিম্বা ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিদের ব্যবস্থায় কিম্বা আপনার ওই কব্‌রেজিতে?'

'আলবত আছে! দেখান দিকি রামায়ণ কি মহাভারত খুলে যে যুধিষ্ঠির কিম্বা রামচন্দ্রের কখনো টাক পড়েছিল? দ্রোণাচার্য কিম্বা ধৃষ্টদ্যুম্নের? দশরথের কিম্বা দশাননের? রাবণের বারোটা মাথার একটাতেও টাক পড়েনি। তখনই কেন চুল উঠত না আর এখনই বা কেন ওঠে—তা বলতে পারেন?'

'বোধ হয় আমরা এলোপ্যাথি ওষুধ খাই বলে।'

'ঠিক তাই। যাই হোক্, ও আপনার সেরে যাবে। আপনি ভাববেন না। শাস্ত্রীয় মহাভৃঙ্গরাজ তৈল দিন সাতেক ব্যবহার করলেই আর দেখতে হবে না। তখন চিরুনী-ঠেলা দায় হবে।'

আশা ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে হারাধন বলল—'বলেন কি, এমন ওষুধ আছে আপনাদের?'

'নিশ্চয়ই। আয়ুর্বেদে নেই কি?'

'দিন, তাহলে এখুনি সেই ভৃঙ্গরাজ আমাকে দিন। যা দাম লাগে দিচ্ছি।'

দেখুন শাস্ত্রীয় ওষুধের দাম একটু বেশি। তাই সব সময়ে তৈরি থাকে না। আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে। অল্প করে তৈরি করতে আবার খরচা বেশি পড়ে যায়। আপনার কাছে বেশি কিছু নেব না, তৈরির যা খরচ তাই কেবল দেবেন।'

'কত পড়বে বলুন আমি আগাম দিচ্ছি। আজই তৈরি শুরু করে দিন।'

'নিশ্চয়ই। আপাতত টাকা ষোলো দিয়ে যান—তাতেই শিশিটাক্ হবে। এক শিশি এক মাসের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্টই।'

ষো-লো-টা-কা! অতগুলো টাকার কথায় হারাধনের টনক্ নড়ল। কিছুক্ষণ সে ভাবল। টাকা আর চুল—কাকে সে ছাড়বে? অবশেষে চুলেরই জয় হলো। রবিঠাকুরের কথা-কাহিনীতে সে পড়েছিল কে-এক মুসলমান সম্রাট কোন্-এক পরাজিত শিখকে প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন তার চুলের বিনিময়ে, কিন্তু সেই শিখ চুল দিতে রাজি না হয়ে একেবারে মাথাটাই ধরে দিতে চেয়েছিল। সুতরাং হারাধন যে টাকা দিতে প্রস্তুত হবে এ আর বেশি কথা কি? যদিও ষোলো টাকা সামান্য টাকা নয়—বিশেষত হারাধনের পক্ষে।

হারাধন টাকা ষোলটা দিয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'দেখুন আমার একটা প্রশ্ন আছে! এটা আপনার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ওপর কটাক্ষপাত বলে ভাববেন না! আমার জিজ্ঞাসা এই, আপনি তো মহাভৃঙ্গরাজের মালিক, তবে আপনার মাথায় এমন চৌকস টাক কেন মশাই?'

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে মধুর হাস্য করে কবিরাজ বললেন, 'বুঝলেন না, ওটা বিজ্ঞাপন! তেলের নয়, আমার নিজের। টাক প্রবীণতার লক্ষণ, আর প্রবীণ চিকিৎসক না হতে পারলে কি পসার জমে? টাকা হলে টাক হয়, কথায় বলে না? এর উলটোটাও সত্যি, টাকের চাক্‌চিক্য থেকেও টাকার চাক্‌চিক্য।'

হারাধন তথাপি যেন আশ্বস্ত হতে পারল না। কবিরাজ পুনরায় বললেন—

'দেখুন, এজন্য ভৃঙ্গরাজ মাথা দূরে থাক্, আমরা তা শুঁকি না পর্যন্ত। পাছে টাক না পড়ে আবার। এখন ত টাক পড়ে গেছে কিন্তু এখনও মশাই বিশ্বাস করি না ওই তেলটাকে!'

'তেলের এমন গুণ—শুঁকলেও চুল গজায়। এতক্ষণে হারাধন নিশ্চিন্ত হলো। ধন্বন্তরী মশায়কে নমস্কার করে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল সে! অবশ্য মনে মনে লাফিয়ে। ইচ্ছে থাকলেও বাইশ বছর বয়সে বারো বছরের মতন লাফানো যায় না তো।

কয়েকটা দিন হারাধন খুব কষ্টে কাটাল—ভৃঙ্গরাজের প্রতীক্ষায়। অবশেষে ওষুধ তৈরি হয়ে এল। ও বাবা! এর যে নিদারুণ গন্ধ। তার সৌরভের সঙ্গে তুলনা দেবার উপযুক্ত শব্দ নেই। সে তেল মেখে খেতে বসলে পেটের ভাত গিয়ে মাথায় উঠবে। অর্থাৎ মাথায় উঠবার চেষ্টায় সামনেই সদর দরজা খোলা পেয়ে গলা দিয়ে গলে বেরুবে। সে-তেল মাথায় মেখে রাস্তায় বার হলে পেছনে কুকুর লাগবে কিনা বলা যায় না তবে পথের লোকেরা তাড়া করবে নির্ঘাত, তাতে ভুল নেই।

কি করে বেচারা হারাধন? চুলের দায় প্রাণের দায়ের চেয়ে বড়। তেল মেখে অন্য লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকে কিন্তু নিজের থেকে দূরে থাকা যায় না তো? মাথাটা আবার নাকের বেয়াড়া রকম কাছে। এই সত্যটা এতদিন একেবারে অজানা না থাকলেও এখন খুব প্রবলভাবেই যেন তার গোচর হতে থাকে।

কিন্তু হারাধনের কপাল! ক্রমেই তা প্রশস্ত হচ্ছিল। আগে যদি বা দশটা বিশটা উঠত, এখন মুঠো মুঠো উঠতে লেগেছে। বোধ হয় চুলের গোড়ায় ওষুধ যাচ্ছে না! সেই জন্য সে মরীয়া হয়ে একদিন রাত্রে শোবার আগে সমস্ত মাথা বেশ করে তেলে ভিজিয়ে নিল। পরদিন সকালে কেশ প্রসাধনে যেমন না ব্যাক্‌ব্র্যাশ্ শুরু করেছে, তার মনে হলো সমস্ত চুল যেন পরচুলার মত পেছনে খসে পড়লো। হারাধন আয়নার সাম্‌নে দৌড়ে গিয়ে দেখে—ওমা, তাই ত। প্রতিপদের রাত্রে চন্দ্রোদয়ের মত, চুলের অন্ধকার ঘুচে গিয়ে সারা মাথা জুড়ে চাঁদির ন্যায় দিব্যি চক্‌চকে টাক বেরিয়ে পড়েছে!

হারাধন প্রথমে ভাবল ডাক ছেড়ে কাঁদে। তারপর মনে হলো, এখনি গিয়ে টুঁটি টিপে ধন্বন্তরিকে তার স্বস্থানে অর্থাৎ স্বর্গে পাঠিয়ে দেয়। একবার তার ইচ্ছা হলো, লোটা-কম্বল নিয়ে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে, আর সংসারে থেকে লাভ কি, সন্ন্যাসী হয়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যায়! শুধু গেরুয়াটা পরে নিলেই চল্‌বে, কষ্ট করে আর মাথা মুড়োতে হবে না, সে কাজটা এগিয়েই রয়েছে। অবশেষে মনে করল, নাঃ, বেঁচে আর সুখ নেই, সে আত্মহত্যা করবে।

কিন্তু কিছুই তার করা হলো না। ভাবতে ভাবতে হারাধন তার সদ্যোজাত টাকে হাত বুলোতে লাগল। হাত বুলিয়ে সে বেশ আরাম পেল। প্রত্যেক খারাপ জিনিসেরই ভাল দিক আছে, টাকের ভাল দিকটা এতক্ষণে তার চোখে পড়ল, আর হাতেও ঠেকল!

হারাধন অবশ্য এখন আবিষ্কার করেছে যে টাক নিয়েও বেশ টেকা যায়, কিন্তু কবিরাজের রাস্তা সে আর মাড়ায় না! তার কেমন যেন লজ্জা করে। ও-পাশের ফুটপাত ধরে সে কেটে পড়ে। এক একবার তার মনে হয় বটে যে টাকাগুলো বড্ড ঠকিয়ে নিয়েছে কিন্তু তা তো আর ফেরত পাবার কোনো উপায়ই নেই! এক আধটা নয়—ষোলো ষোলোটা টাকা! তাতে ষোলো দিন আরাম করে দেলখোসে খাওয়া যেত—বত্রিশ দিন বায়োস্কোপে যাওয়া যেত—দুমাস ফুটবল্ ম্যাচ্ দেখা চলত। টাকের চেয়ে টাকার শোকটাই এখন তার বেশি।

একদিন হারাধন দেখতে পেল, তার এক বন্ধু কবিরাজের দোকান থেকে বেরুচ্ছে। আসন্ন বিপদ থেকে বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য সে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরল—'কিহে? কব্‌রেজের কাছে গেছলে কেন? ও যে সাক্ষাৎ—'

বন্ধু বলল—আর ভাই বলচ কেন! কোনো পুরুষে নেই কি এক ব্যাধি এসে জুট্‌ল আমার!

হারাধন তার মাথাভরা চুলের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলল—'সে কি! তোমারো চুল উঠচে নাকি?'

'না ভাই! বাত! তাও আবার পায়ে! কেউ বলছে সায়াটিকা, কেউ বলছে নিউরাল্‌জিয়া। ভারী বিপদেই পড়েছি। এলোপ্যাথি তো করলুম, কিছু হল না। দিন-কতকের জন্য সারে তারপর আবার সেই! দেখি এবার একবার কবিরাজি করিয়ে—'

'তা কব্‌রেজ কি বললে?'

'বললেন কি একটা তেল। একেবারে অব্যর্থ—দিন সাতেকের মালিশেই সারবে। বৃহৎবাতচিন্তামণি তৈল! তা তুমি কি বলছিলে—উনি সাক্ষাৎ কি?'

'আমি বলছিলাম উনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! নামেও এবং কাজেও! আমাকেও একটা তেল দিয়েছিলেন, বলেছিলেন সাত দিন পরে আর দেখতে শুনতে হবে না। তা কথা যা বলেছিলেন একেবারে খাঁটি!'

'বল কি? কিন্তু আমার কপাল, সে তেল এখন তৈরি নেই! দামী জিনিস সব সময় তৈরি থাকে না। এক শিশির দাম পড়বে টাকা চব্বিশ, তা দিতে আমি এখনই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু তৈরি হতে লাগবে তিন-চারদিন। আমার আবার আজই এলাহাবাদ যেতে হবে বদ্‌লি হয়েছি কিনা। একদিনও আর থাকবার উপায় নেই—কি করি বলত?'

'তাই ত! কি করবে তাহলে!'

'হ্যাঁ, কি বলছিলে তোমাকেও ঐ তেল দিয়েছিলেন না? তা তার কি কিছু আছে?'

'হারাধন আম্‌তা আম্‌তা করে বলল—তার প্রায় সমস্তটাই আছে। সামান্য একটু ব্যবহার করেই যা ফল পেলুম না!'

'তা ভাই, তুমি এই টাকা চব্বিশটা নাও, আর তেলটা আমাকে দাও! তাহলে বন্ধুর যথার্থ উপকার করা হবে—'

'তা, তা কি করে হয় ? সে যে—'

'তা তোমার বাত তো সেরেই গেছে ভাই, আর ও তেল রেখে কি করবে ?'

'কিন্তু—'

'না না আর কিন্তু না। বাড়ির কাছেই কোব্‌রেজ—দরকার হলে তৈরি করিয়ে নিয়ো। না আমাকে ওটা দিতেই হবে তোমায়। তিন মাসের জন্য এলাহাবাদে ঠেলেছে। তোমার কাছে যা শুনলাম, তাতে বিদেশে বিভুঁয়ে ওই তেল না নিয়ে এক পাও আমি আর এগুচ্ছি না।'

এক রকম জোর করেই টাকা চব্বিশটা হারাধনকে গুঁজে দিয়ে তার বন্ধু তেলটা নিয়ে চলে গেল। হারাধন ভাব্‌ল, মন্দ কি! একদিক দিয়ে তো দেড়গুণ ফিরে এলো! আর মহাভৃঙ্গরাজে বাতের যত ক্ষতিই করুক, বৃহৎ বাতচিন্তামণির চাইতে বেশি করবে না নিশ্চয়ই। টাক হলেই টাকা হয় বলেছিল, কবিরাজের কথাগুলো খাঁটি, হারাধন বিবেচনা করে দেখল।

অষ্ট মুদ্রা হাতে হাতে আমদানি হল স্পষ্ট দেখল।

কিন্তু সাত দিন বাদে এলাহাবাদ থেকে বন্ধুর চিঠি পেয়ে হারাধন তো অবাক! বন্ধু লিখেছে—ভাই, ধন্য তোমাদের কবিরাজ! সাত দিন মাত্র ব্যবহার করছি এর মধ্যেই আমার বাত সম্পূর্ণ সেরে গেছে। তাঁর ওষুধে মন্ত্র-শক্তির মতই অব্যর্থ। কি বলে যে তাঁকে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাবো—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিন মাস পরে বন্ধু কলকাতায় ফিরেছে জেনে হারাধন তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। একটি ছোট ছেলে বৈঠকখানার দরজা খুলে তাকে বসিয়ে বলল—'মামা কামাচ্চেন, আপনি বসুন একটু।'

হারাধন বসেই আছে, পনের মিনিট, আধঘণ্টা, একঘণ্টা যায়—বন্ধুর দেখা নেই। অবশেষে দু'ঘণ্টা বাদে, বসবে কি চলে যাবে এই কথা যখন সে ভাবছে তখন তার বন্ধু নামল।

হারাধন ভারি চটে গেছল মনে মনে। কাজেই প্রথম সাক্ষাতে কুশল প্রশ্ন, কেমন ছিলে, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে বলল—'মন্দ না! এতক্ষণে লাটসাহেবের নামা হলো।'

বন্ধু বলল—'কিছু মনে কোরো না ভাই! কামাচ্ছিলুম।'

হারাধন সবিস্ময়ে বলে—'দাড়ি কামাতে কি একযুগ লাগে নাকি ?'

'দাড়ি নয় হে! পা। এই শ্রীচরণ।'

'পা কামাচ্ছিলে কি রকম ? পায়ের রোঁয়া কি কেউ কামায় নাকি আবার ?'

'রোঁয়া নয় হে রোঁয়া নয়, চুল। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে কেশকলাপ, কেশদাম। তাই কামাচ্ছিলাম।'

'পায়ে কেশদাম—অবাক করলে তুমি আমায়!'

দুঃখের কথা আর বোলো নাই ভাই! বাত সেরে গিয়ে এই এক উৎপাত! রোঁয়ায় আর চুলে তফাত তো জানো ? সে তফাত এই, রোঁয়া খানিকটা বাড়ে তারপর আর বাড়ে না, কিন্তু চুল ক্রমশঃ বেড়েই চলে। ভুরু আর চুলে যে

তফাত। আমার দুটো পায়ের সব জায়গা জুড়ে যা গজিয়েছে, তা রোঁয়াও নয়, ভুরুও নয়, আদি ও অকৃত্রিম চুল। না কামালে চলে না। বেড়েই চলে। ছাঁটারও উপায় নেই, কেননা এমন ঘন বিন্যস্ত যে কেউ তাকে চুল ছাড়া অন্য কিছু বলে ভ্রম করবে না। তাই দাড়ির মত নিয়মিত পা কামাই কি করব ?'

হারাধন নিষ্পলক নেত্রে বন্ধুর দুই পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বন্ধু বলল—'নিত্যি এক হাঙ্গাম বটে, কিন্তু ঐ বাতের চেয়ে এ ভাল। চুলের রোগের জন্য তো ডাক্তারের কাছে ছোটার দরকার করে না। কোনো যন্ত্রণাও নেই এর, আর এ রোগ কামালেই কমে যায়।'

হারাধনের কণ্ঠ থেকে একটিও কথা বেরুল না। সে মাথায় হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

ঠিক মাথায় নয়, তার টাকে হাত দিয়ে।

পঞ্চাননের অশ্বমেধ

ভাল আপদ হয়েছে ঘোড়াটাকে নিয়ে। পঞ্চানন কি যে করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। কলিযুগ হয়ে অবধি আজকাল অশ্বমেধের রেওয়াজ নেই। তা না হলে সে হয়তো একটা অশ্বমেধ যজ্ঞই করে বসত। কথা নেই, বার্তা নেই একটা কৃষ্ণের জীবকে তো অধর্ম করে অমনি মেরে ফেলা যায় না। তাই পঞ্চানন ভেবে রেখেছে সুবিধা পেলেই একবার ভট্টপল্লীর দিকে যাবে মা কালীর কাছে অশ্ববলি দেওয়া যায় কি না, তার ব্যবস্থাটা জিজ্ঞাসা করবে।

সে মনে মনে আলোচনা করেছে, কেনই বা না দেওয়া যাবে? পাঁঠা যখন দেওয়া যায়—অশ্ব তো পশুর মধ্যেই গণ্য? পাঁঠাও একটা পশু ছাড়া আর কি? পাঁঠার চারটে পা, ঘোড়ারও,—সর্বাদিকেই প্রায় মিল আছে, যা কিছু তফাত তা কেবল লেজের ও আওয়াজের। তা শাস্ত্রেই যখন রয়েছে মধবাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, তখন পাঁঠাভাবে ঘোড়াং দদ্যাতের বিধান কি আর শাস্ত্রে নেই? নিশ্চয়ই আছে।

এক কালে অবশ্য ঘোড়াটা খুবই কাজ দিয়েছিল, কিন্তু বুড়ো হয়ে অবধি আজকাল কোনো কাজেই লাগা দূরে থাক, তার পেছনে লেগে থাকা একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে ভারি পেটুক হয়েছে ঘোড়াটা। জামার হাতা, খবরের কাগজ, ছেলেদের পুঁথিপত্র, দরকারী চিঠি, কখন কি খায় স্থির নেই। সেদিন তো কাশ্মীরী শালের আধখানাই প্রায় সাবাড় করে বসল। তা ছাড়া রান্নাঘরের দিকেও বেশ নজর আছে।

এদিকে পঞ্চাননের সঙ্গে তার দস্তুর মতো প্রতিযোগিতা। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছোঁক আওয়াজ কিংবা বেগুন ভাজার গন্ধ এলে কার সাধ্য তাকে থামায়? পাড়াগাঁয়ে মেটে বাড়ি পঞ্চাননদের—ধানের গোলাগুলো ঘুরে উঠোন পেরিয়ে গেলেই রান্নাঘর—মুহূর্তের মধ্যে অশ্ববরকে সেখানে উপস্থিত দেখা যাবে। পঞ্চাননের গিন্নির কি পরিত্রাণ আছে ওকে বেগুন ভাজা না দিয়ে? বেগুন ভাজার প্রতি পঞ্চাননের দারুণ লোভ, অথচ এই ঘোড়াটার জন্যই সে পেট ভরে বেগুন ভাজা খেতে পায় না।

সেদিন পঞ্চানন-গিন্নি বেগুন না ভেজে, বোধ হয় ঘোড়াটাকে ঠকাবার মতলবেই, বেসন দিয়ে বেগুনি ভাজছিলেন। গন্ধ পাওয়া-মাত্র ঘোড়াটা সেখানে হাজির! দু-একবার সে গিন্নির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—চিঁহি চিঁহি!

সংস্কৃত ভাষায় যার মানে হচ্ছে—দেহি দেহি।

কিন্তু গিন্নি কর্ণপাত না করায় সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নিকে ঠেলে ফেলে সেই ঝুড়িভরা সমস্ত বেগুনি আত্মসাৎ করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে শুরু করে দিয়েছে। সেদিন থেকে ঘোড়াটার প্রতি আর পঞ্চাননের চিত্ত নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে ভাটপাড়া সে যাবেই।

গিন্নিকে সে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, ফের যদি তুমি ঘোড়াটাকে আশকারা দাও, তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন। সত্যি বলছি, একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। ঘোড়াটা কিন্তু গ্রাহ্যও করে না পঞ্চাননকে।

তার পরের দিনই সে কলকাতা থেকে সদ্য আনানো পঞ্চাননের টর্চ লাইটটা মুখের মধ্যে পুরেছিল, কিন্তু ভাল করে চিবিয়ে যখন বুঝল যে ওটা ঠিক বেগুনি নয়, তখন বিরক্ত হয়ে ফেলে দিল।

টর্চ লাইটটার অবস্থা দেখে পঞ্চানন তো অগ্নিশর্মা। সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার কান ধরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল—হতভাগা, তোর কি একটুও আক্কেল বুদ্ধি নেই? তুই যে একটা গাধারও অধম হলি?

ঘোড়া মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে চিঁহিঁহি! অর্থাৎ—যা বল তাই বল!

পঞ্চানন যখন মাথা ঘামাচ্ছে, এই হঠকারিতার জন্য কি শাস্তি ওকে দেওয়া যায়, তখন ওর ছোট ছেলে বটকৃষ্ট এসে পরামর্শ দিল—বাবা, ওর লেজ কেটে দাও, তাহলে আর মশা তাড়াতে পারবে না।

পঞ্চানন ভেবে দেখল, একথা বেশ! ওর শাস্তির ভারটা মশার উপরে ছেড়ে দেওয়াটা মন্দ না।

কিন্তু কাঁচি নিয়ে উদ্যোগ-আয়োজনের মুখেই ন-মেয়ে রাধারানী বলল, বাবা করছ কি! মশার কামড়ে তাহলে ও আমাদের মশারির মধ্যে এসে ঢুকবে যে।

বাধ্য হয়ে পঞ্চানন কাঁচি থামিয়েছে, একটা ভাবনার কথা বইকি। ঘোড়াটার যে-রকম বুদ্ধি-শুদ্ধির অভাব, তাতে সবই ওর পক্ষে সম্ভব। মশারির মধ্যে ঢোকা কিছু কঠিন না ওর পক্ষে।

এমনই সমস্যার মুহূর্তে জ্যোতিষ বোস এসে উপস্থিত।—কিহে পঞ্চানন, কি হচ্ছে ?

—এই ভাই, ট্রেন্ করছি ঘোড়াকে।

—তুমি হর্স ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে ?

পঞ্চানন মাথা নেড়ে বলে, আর ভাই শিক্ষা না দিলে নিজের ছেলেই গাধা হয়ে যায়, তা ঘোড়া তো পরের ছেলে।

—তা বেশ। কিন্তু তোমার দেনার কথাটা একেবারে ভুলে গেছ! আমাদের পাড়াই মাড়াও না দু বছর থেকে—ব্যাপার কি ?

পঞ্চানন আকাশ থেকে পড়ল, কিসের দেনা !

— সেই যে একদিন বাজারে নিলে। বছর দুই আগে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে চার আনা পয়সা। পদ্মার ইলিশ এসেছিল হাটে, পয়সা কম পড়ল, তোমার কাছে নিলাম বটে! মনে ছিল না ভাই।

জ্যোতিষ বোস ছেলেবেলা থেকেই হিসেবী একথা পঞ্চানন জানত। কিন্তু বুড়োবয়সে সে যে এত বেশি হিসেবী হয়ে উঠবে যে, চার আনা পয়সার কথা দু বছর ধরে মনে করে রেখে ভিন গাঁ থেকে তিন মাইল হেঁটে চাইতে আসবে, পঞ্চানন তা ধারণা করতে পারেনি। বাপ পাঁচশ টাকা রেখে গেছল, সুদে খাটিয়ে তেজারতি কারবারে সেই টাকা পঞ্চাশ হাজারে সে দাঁড় করিয়েছে—কিন্তু সামান্য চার আনার মায়া সে ছাড়তে পারেনি ভেবে পঞ্চানন অবাক হলো।

—তা ভাই পঞ্চানন, প্রায় আড়াই বছর হলো তোমার ধার নেওয়া। আমার খাতায় সমস্ত হিসাব লেখা আছে; নিজে গিয়ে দেখতে পার একদিন। এইবার একটু গা করে দিয়ে দাও।

—কি যে বল তুমি? সামান্য চার আনা পয়সার জন্য আমি অস্বীকার করব? তা তুমি কষ্ট করে এত দূরে এসে আমাকে লজ্জা দিলে। রাধু, তোর মার কাছ থেকে চার আনা নিয়ে আয় তো। আর বলগে তোর জ্যোতিষ কাকার জন্যে বেগুনি ভাজতে। বেগুনি দিয়ে তেল মেখে মুড়ি খেতে বেশ লাগে হে! তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা—

জ্যোতিষ বোস বাধা দিয়ে বলল, 'তা হবেখন! খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না। কিন্তু একটা ভুল করছ তুমি, আড়াই বছর পরে পয়সাটা তো আর চার আনা নেই ভাই।'

কিছু বুঝতে না পেরে পঞ্চানন বলল, 'চার আনা নেই কি রকম ?'

—আহা, বুঝতে পারছ না! সুদে-আসলে তা পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌনে তিন পাই দেওয়া একটু শক্ত হবে তোমার পক্ষে, তা তুমি পাঁচ টাকা এগারো আনাই দাও আমায়।

—অ্যাঁ? পঞ্চাননের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাই! পৌনে তিন পাই দেওয়া তার পক্ষে শক্ত নিশ্চয়ই। এই বাজারে ওই পাই পয়সা কে পাইয়ে দেয়! কিন্তু পাঁচ টাকা এগারো আনাটা দেওয়াই যে তার পক্ষে এমন কি সহজ, তা সে ভেবে পেল না।

পঞ্চানন ভেবে কিনারা পায় না। হ্যাঁ, জ্যোতিষটা ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবী, একথা তার অজানা নয় কিন্তু তার হিসেবিতা যে বয়সের সঙ্গে এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে, তা কে জানত? নাঃ, জব্দ করতে হবে ওকে।

কাষ্ঠ-হাসি হেসে পঞ্চানন জবাব দেয়—তা নেবেই না হয় পাঁচ টাকা এগারো আনা। তোমাকে দিলে তো জলে পড়বে না। বস, জিরোও, গল্প কর—অনেকদিন পরে দেখা।

—হ্যাঁ, বসব বইকি! বেগুনিও খাব! কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে মন্দ না—কিন্তু কচি শশা আছে তো?

পঞ্চানন মনে মনে মতলব এঁটে বলে, 'এতটা রোদে তিন কোশ দূর থেকে হেঁটে এসেছ, এই বয়সে এমন পরিশ্রম করা কি ভাল তোমার পক্ষে? একটা ঘোড়া রাখ না কেন? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হাঁটার পরিশ্রম হয় না। তাছাড়া রাইডিং একটা ভাল ব্যায়ামও। দেখছ না, আমিও একটা ঘোড়া রেখেছি।'

জ্যোতিষ পঞ্চাননের ঘোড়ার দিকে দৃক্‌পাত করে জবাব দেয়, 'বেশ ঘোড়াটি তোমার। দেখে লোভ হয়। আমিও অনেক দিন থেকে ভাবছি কথাটা। সত্যিই, এ বয়সে আর হাঁটাচলা পোষায় না। কিন্তু মনের মতো ঘোড়া পাই কোথায়?'

—কি রকম মনের মতো শুনি?

—এই ধর খুব তেজী হবে না, আস্তে আস্তে হাঁটবে। এই বুড়ো বয়সে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই তাহলে কি হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে? এবং হাড় ভাঙলে কি আর তা জোড়া লাগবে এই বয়েসে?

—তা সে রকম ঘোড়া কি আর পাওয়া যায়? কিনে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়। এই আমার ঘোড়াটা কি কম তেজী ছিল! অনেক কষ্টে ওকে শিক্ষিত করেছি। এখন যদি ওর পিঠে তুমি চাপ, তাহলে ও হাঁটছে বলে তোমার মনেই হবে না। এমন শান্ত এত বিনয়ী এরকম নম্র স্বভাব—মানে সুশিক্ষার যা কিছু সদ্‌গুণ সব আছে এই ঘোড়ার।

—তা ভাই তোমার এই ঘোড়াটির মতো শিক্ষিত ঘোড়া পাই কোথায়? আমি তো আর তোমার মতো ট্রেনার নই। তা তোমার ঘোড়াটি কত দিয়ে কিনেছিলে?

—দাঁওয়ে পেয়েছিলাম ভাই, মোটে পনেরো টাকায়।

—তা তুমি এক কাজ কর না, পঞ্চানন। পনেরো টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে ঘোড়াটা আমাকে দাও-না কেন? তোমার তো এগারো আনা পৌনে তিন পাই লাভ থাকল, তাছাড়া এতদিন চড়েও নিয়েছ। এই নাও দশ টাকার নোট—ধরো!

—না ভাই, ঘোড়াটা শিক্ষিত যে।

—আবার নতুন ঘোড়া সস্তায় কিনে শিখিয়ে নিতে পারবে—তোমার যখন ট্রেন্ করার ক্যাপাসিটি আছে! ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে বেশি লাভ নাই বা করলে। এই নোটখানা নাও, তোমার বাকি ধারও শোধ হয়ে গেল—

তা নইলে ভেবে দেখ, পৌনে তিন পাই যোগাড় করা তোমার পক্ষে খুব শক্ত হত না কি?

পঞ্চানন হাসি চেপে আমতা আমতা করে বলে, তা তুমি যখন এত করে বলছ। ছেলেবেলার বন্ধুর একটা কথা রাখলাম না হয়। বেশ, নাও তুমি ঘোড়াটা।

ভালই হলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়েছে থানায়, যাচ্ছিলাম তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। মনে করলাম পথে তো তোমার বাড়ি পড়বে, দেখা করে টাকাটা নিয়ে যাই। ভালই করেছি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে হেঁটে গেলে কি ভাল দেখাতো? ইজ্জত থাকত না।

জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা হলেন। সত্যি, এমন শিক্ষিত ও শান্ত ঘোড়া প্রায় দেখা যায় না। পঞ্চানন যা বলেছিল, হাঁটছে বলে মনেই হয় না; অনেক তাড়াহুড়ো দিলে এক পা হাঁটে।

এদিকে পঞ্চাননও খুশি; নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচা গেল এতদিনে! আপদ বিদায়, সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা লাভ! অশ্বমেধ করতে যাচ্ছিলাম, তা জ্যোতিষ বোসকে দেওয়া যা, অশ্বমেধ করাও তা! পৌনে তিন পাই দেওয়া বেজায় শক্ত হত।

কেবল গিন্নি একটু দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশ করেছেন - খেতে পেত না বেচারা, তাই ও রকম ছোঁক্-ছোঁক্ করতো! ঘোড়ায় দানা খায়, ছোলা খায়, কত কি খায়—সে-সব ও কখনো চোখেও দেখেনি। টর্চ খাবে, বেগুনি খেতে চাইবে, তা ওর দোষ কি! কথায় বলে পেটের জ্বালা—

পঞ্চানন বলল, তাহলে ঘোড়াটার ভাগ্য বলতে হবে। জ্যোতিষরা বড়লোক, সুখে থাকবে ওদের বাড়ি। আমরা গরিব মানুষ; নিজেদেরই দানা পাই না, কোথায় পাব ঘোড়ার খানা!

হেঁটে গেলে যতক্ষণে থানায় পেঁছানো যেত, তার তিনগুণ সময় লাগল জ্যোতিষ বোসের ঘোড়ায় চেপে যেতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভারী খুশি। এতখানি রাস্তা তিনি অশ্বারোহণে এসেছেন, কিন্তু একবারও পড়ে যাননি, কেবল ওঠার আর নামার সময় যা একটু কষ্ট হয়েছে। ওঠার সময় তিনি টুলে দাঁড়িয়ে চেপেছিলেন। কিন্তু নামবার সময় তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, যাতে ঘোড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে আর তাঁর পক্ষে নামাটা সহজ হয়, কিন্তু ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটু কাত হল না পর্যন্ত। তাঁর আশা ছিল শিক্ষিত ঘোড়া তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে, কিন্তু ঘোড়াটা না বুঝল তাঁর ইঙ্গিত, না কান দিল তাঁর সাধ্যসাধনায়! বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেকটা প্রাণের মায়া ছেড়েই, লাফিয়ে নামতে হলো, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁর হাড়গোড় ভাঙেনি কিংবা তিনি একটুও জখম হননি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষ বোসের আগে থেকেই আলাপ ছিল। জ্যোতিষ সেলাম ঠুকতেই তিনি 'হ্যালো মিস্টার বোস' বলে তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে দানা দেবার হুকুম হল আরদালির উপর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও জ্যোতিষ বোস আলাপ করছেন এমন সময়ে আস্তাবল থেকে এক বিরাট আওয়াজ এল—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ !

কি ব্যাপার ? ম্যাজিস্ট্রেট এবং জ্যোতিষ দুজনেই চমকে উঠলেন। ঘোড়ার আওয়াজ বটে, কিন্তু এ রকম আওয়াজ তাঁরা জীবনে কখনো শোনেননি ! এমন কি, যে ঘোড়া ডার্বি জিতেছে, সেও এ রকম উচ্চধ্বনি করে না ! দুজনেই আস্তাবলের দিকে ছুটলেন। সেখানে তখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আর ঘোড়াটা কেবল করছে—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ !

ঘোড়ার সামনে দু বালতি ভরে ছোলা আর দানা সাজানো রয়েছে, কিন্তু ঘোড়াটা সেসব স্পর্শও করেনি। সে বোধ হয় তার এতখানি সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছে না। সে একবার করে বালতির দিকে তাকাচ্ছে আর তার ভিতর থেকে অট্টহাস্য ঠেলে উঠছে—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ !

কি করে ওর অট্টহাস্য থামানো যাবে সবাই দারুণ ভাবনায় পড়ল। ঘোড়ার হাসি থামানো কি সহজ ব্যাপার ? কিন্তু বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হল না কাউকে। চিঁ হিঁ হি হি হি হি হি !

হাসতে হাসতেই মারা গেল ঘোড়াটা।

———

বনমালী ডাক্তারের নাম-ডাক ভারী। নাম তাঁর খুব এবং নামের চেয়ে ডাক আরও বেশি! কলের তাঁর বিরাম নেই—কেন না, ডাক্তার হলেও পরোপকার করতে মজবুত তার মতো আর দুটি ছিল না। অনেক সময়ে ভিজিট না নিয়েই তিনি রোগী দেখতেন, এমন কি, তেমন পীড়াপীড়ি করে ধরলে ওষুধ-পথ্যের দামটাও দিয়ে ফেলতেন নিজের পকেট থেকেই। এমনও শোনা গেছে, দু-এক অপারগ-ক্ষেত্রে রোগীর সৎকারের ব্যয়ভারও তিনি নিজেই বহন করেছেন—নিজের কর্মফলটাই বা বাদ যায় কেন!

মোটের উপর, কখনও কারও উপকার করার সুযোগ পেলে তা থেকে আত্মসম্বরণ করা তার পক্ষে শক্তই ছিল। এই কারণে, ছোট্ট মফস্বলের শহরে পসার তার খুব জমলেও পয়সা তিনি খুব বেশি জমাতে পারেননি!

একদিন কল সেরে বনমালীবাবু বাড়ি ফিরছেন। রোদ তখন চড়চড়ে, বেলা দুপুর বয়ে গেছে—অবস্থাও তার বিকল! হেঁটে ফিরতে হচ্ছে তাঁকে,—কেন না, ঐ তো বলেছি, পসার তেমন জমেনি,—এই কারণেই গাড়ি-ঘোড়া আর করা হয়ে ওঠেনি!

বাড়ি ফিরছেন, এমন সময়ে পথপ্রান্ত থেকে এক করুণ আবেদন তাঁর কানে এল—কেঁউ!

বনমালীবাবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকান। নিতান্তই পাশবিক আহ্বান। মানবিক ভাষায় অনুবাদ করলে যার মানে হবে—কে যায়?

বনমালীবাবু চলতে থাকেন এই চড়ন্ত রোদে, সামান্য একটা উত্তর দিয়ে

ভদ্রতা রক্ষা করার জন্যও দাঁড়ানো কঠিন হয় তাঁর পক্ষে। জবাব দেবার প্রয়োজনও মনে করেন না তিনি। কে যায়? দেখতে পাচ্ছ না, যাচ্ছেন বনমালীবাবু, আমাদের শহরের সবার সেরা ডাক্তার? পিছন থেকে ডাকার জন্য মনে মনে বিরক্তই তিনি হন।

কিন্তু দু পা এগুতেই—আবার কেঁউ কেঁউ!

এবার কেবল শব্দের সংখ্যাই দ্বিগুণ নয়, আর্তনাদও তীক্ষ্ন করুণতর। মুখ আরও কাঁচুমাচু।

এবার বনমালীবাবুর করুণার তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত করে! একেবারে সটান তাঁর হৃদয়ে—তাঁর অ্যানাটমির সব চেয়ে দুর্বল জায়গায়। পরোপকার স্পৃহা জাগতে থাকে তাঁর। ফিরে আসতে হয় তাঁকে।

বেচারী কুকুর, একটা পা তার গেছে ভেঙে। কোন দুর্ঘটনার ফলেই, নিশ্চয়। ডাক্তারকে দেখতে পেয়েই ডাকাডাকি শুরু করেছে; বুঝতে দেরি হয় না বনমালীবাবুর। বনমালীবাবু তার পা দেখেন, তার পর ঘাড় নাড়েন।

কুকুরের ব্যবস্থা তিনি কী করবেন? এ পর্যন্ত মানুষ ছাড়া অন্য জানোয়ারের চিকিৎসা করেননি তিনি—অন্তত, তাঁর সজ্ঞানে। অবশ্য অনেক মানুষকে জানোয়ার সন্দেহ না করেই, তিনি আরাম করে এনেছেন। যেমন সেবার এক পাওনাদারকে বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচালেন, আর সে কিনা সেরে উঠেই ডিক্রি জারি করে তাঁর বসতবাড়ি নিয়ে টানাটানি শুরু করল! ভাল বিভ্রাট!

আস্ত জানোয়ার সে ব্যাটা, তাতে আর ভুল নেই। কিন্তু সে তবু পদে আছে; তার দুই পদে। কিন্তু এই চার-পদের জানোয়ার নিয়ে তিনি কি করবেন এখন! এদের চিকিৎসার কী জানেন তিনি? ভারী বিপদের ব্যাপার হলো তো।

ঘাড় নেড়ে তিনি চলতে শুরু করেন। একধারে অগ্নিশর্মা সূর্য, আরেক ধারে পদস্খলিত কুকুর—এর মাঝামাঝি সমস্ত বিশ্বজগতের উপর নিদারুণ বৈরাগ্য আসে তাঁর।

কুকুরটা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল—কেঁউ?

ওর অর্থ, কি রকম দেখলে হে? ওদের ভাষায় শব্দ মাত্র দু-একটি—কেবল উচ্চারণের আর এমফ্যাসিসের তারতম্যে মানে আলাদা হয়ে যায়।

দেখে আর করব কি? তিনি উত্তর দিয়েছেন তার ঘাড় নেড়েই। বাক্য ব্যয় পর্যন্ত করেননি।

চলতে চলতে ছোটবেলায়-পড়া ঈশপের গল্প তাঁর মনে পড়ে যায়—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, এবং তাকে ভাল করতে গিয়ে বক-ডাক্তারের কি ঝকমারি আর নাকালটাই না হলো! তার বাঘা-পাওনাদারের কাহিনীও তাঁর মনে পড়ে। নাঃ, জানোয়ারদের উপকার করার কোনো মানেই হয় না, ও কোনো কাজের কথাই নয়।

তাঁকে চলে যেতে দেখে কুকুরটা আবার আরম্ভ করে—কেঁউউ—কেঁউউ—কেঁউউ।

থমকে দাঁড়ান বনমালীবাবু। বাঘ এবং বকের বৃত্তান্তটা আবার ভাবেন।

সেক্ষেত্রে ডাক্তারের ক্ষেত্রে রোগী ছিল বেশি দুর্দান্ত। কুকুরটাকে বাঘের মধ্যে তিনি গণ্য করতে পারেন না। এবং নিজেকে বক বলে বিবেচনা করতে তাঁর বিবেকে বাধে। তাঁকে ফিরতে হয়।

আর তা ছাড়া, পরোপকারের কথাই যদি ধর, কুকুর তো কিছু মানুষ নয় যে তাকে পর বলে ভাবতে হবে। মানুষই কেবল পর হতে পারে, মানুষের মতো এত পর আর আছে কে এই জন্যই, মানুষের উপকার করার মানেই পরোপকার করা। কিন্তু কুকুর তো মানুষ নয়, তার উপকার অনেকটা নিজের উপকার বলেই ধরা উচিত— এমন ধারণা হতে থাকে বনমালীবাবুর।

কুকুরটাকে বাড়ি নিয়ে যান তিনি। অনেক যত্নে এবং বহুত পরিশ্রমে পায়ের হাড় জোড়া দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে ছেড়ে দেন বেচারাকে! আরাম হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যায় সে। অবশ্য যাবার আগে ধন্যবাদ জানিয়ে যায়—ক্যাঁও।

অর্থাৎ কিনা—'বহুত আচ্ছা, ডাগ্‌দার্ সাব্!'

বনমালী ডাক্তারের বাইরের ঘরেই ডিসপেনসারী! এবং সেইখানেই তাঁর রাত্রের শয়নের ব্যবস্থা। কি জানি, গভীর রাত্রে যদি কোন ব্যারামীর ডাক পড়ে। বাইরের ঘরে শুলে সহজেই ডেকে পাবে তাঁকে। পরোপকারের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতে নিতান্তই তিনি নারাজ।

পরদিন ভোর হতে না হতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। অদ্ভুত রকমের শব্দ। তিনি কান খাড়া করেন, রোগীর বাড়ি থেকে কেউ ডাকতে এসেছে বোধ হয়! কিন্তু তাতো না, দরজার গায়ে কেবল একটা হাঁচোড়-পাঁচোড়ের আওয়াজ।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খোলেন তিনি। খুলেই ভারী আশ্চর্য হয়ে যান। সেই কালকের কুকুরটা এবং তার সঙ্গে আর একজন! নতুন কুকুরটার আকার প্রকার দেখে মনে হয়, এ-পাড়ার কেউ না! বোধ হয় বিদেশী কেউ কিম্বা কোনো ভবঘুরেই হয়তো!

'ব্যাপার কি?'

মুখ থেকে প্রশ্ন খসতে না খসতে আরামগ্রস্ত কুকুরটা নিজস্ব ভাষার তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। 'দেখছ না! এ বেচারারও একটা পা ভেঙেছে যে!'

ডাক্তারের চক্ষুস্থির হয়, তাই তো বটে!

আগের কুকুরটা আবার যোগ করে: 'কেঁউ কেঁউ-কেঁউউ।'

ওর বাংলা অনুবাদ—'আমার বন্ধুকেও সারাতে হবে তোমায়।'

তৎক্ষণাৎ ওষুধ-পত্র, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বনমালী ডাক্তার এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দেন এই ভেবে, যে তাঁরই দয়ায়, হতভাগ্য জীবদের উদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। সুযোগ এবং শক্তি।

অল্পক্ষণেই আরাম হয়ে দুই বন্ধু পুলকিত-পায়ে চলে যায়। যাবার সময় নমস্কার করে যায় ডাক্তারবাবুকে—ল্যাজ তুলে।

তারপর দিন প্রাতঃকালে আবার সেই দুটো কুকুর—তারা তখন বেশ পদস্থ ব্যক্তি—এবং তাদের সঙ্গে আরো দু'জন। নবাগতরা খোঁড়া! এদের সারাতে বেশ বেগ পেতে হয় ডাক্তারকে, অনেক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

তারা চলে গেলে ডাক্তারবাবু বিস্ময়ের আতিশয্যে ভেঙে পড়েন। এতদিন মানুষের মহলেই তিনি খ্যাত ছিলেন, এখন কি ইতর-প্রাণীর সাম্রাজ্যেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল? অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন তিনি। বেশ গর্বও হয় মনে মনে।

তারপর দিন আটটা কুকুরের আবির্ভাব। ঐ একই দুর্ঘটনাপীড়িত! ওদের নতুন করে নির্মাণ করতেই ডাক্তারের সারা সকালটা কেটে যায়—মানুষের কলে আর বেরুনো হয় না তাঁর!

নাই হোক, তাতে দুঃখিত নন বনমালী ডাক্তার! মানুষকে ভাল করে যত না আনন্দ পেয়েছেন জীবনে, তার শতগুণ বেশি আনন্দ তিনি বোধ করছেন কদিন থেকে। অনেক মানুষের সঙ্গে এক বিষয়ে এদের একটা ভীষণ মিলও তিনি লক্ষ্য করেছেন। এরাও কেউ ভিজিট দেয় না। দিতেই চায় না, দেবার মতলবই নেই! অচল টাকা হস্তগত হবার বালাই কম। কাজেই কোনো দুর্ভাবনাই নেই বনমালীর।

পরদিন দরজা খুলতেই তার চোখে পড়ে ষোলটা কুকুর। সবাই সমান লালায়িত! তাঁর চিকিৎসার জন্যই, অবশ্য। এবার আনন্দের ধাক্কা সামলানো দুরূহ হয় তাঁর পক্ষে।

চার-পেয়ে রোগীদের ব্যবস্থা করতেই বিকেল হয়ে যায় তাঁর! স্নানাহারের ফুরসত পান না।

তার পরের দিন বত্রিশটা।

যারা 'সারতব্য' তারা তো এসেছেই, যারা সেরে গেছে তারাও এসেছে তাদের সঙ্গে। সমস্ত ডিসপেনসারিতে আর তিল ধারণের স্থান নেই। কিম্বা তিল ধারণেরই স্থান আছে কেবল। সেদিন তাকে দুজন কম্পাউণ্ডার ভাড়া করে আনতে হয়।

সেদিনও কেটে যায়।

তার পরদিন কুকুরে-কুকুরে একেবারে ছয়লাপ! সামনের রাস্তার একধার কেবল কুকুরে ভর্তি, অন্য ধারে পাড়ার যত ছেলে-বুড়ো দাঁড়িয়ে। তারা সব মজা দেখতে এসেছে।

'এত কুকুর ছিল কোন রাজ্যে!' চোখ কপালে তুলে চমৎকৃত হন বনমালী-বাবু!

কুকুরদের চেঁচামেচির আর অন্ত নেই। সবাই আগে দেখাতে চায়, সারাতে চায় সবার আগে। সরতে চায় না কেউ।

সব জিনিসেরই সীমা আছে। বনমালীরও। বনমালী ডাক্তারের অসহ্য হয় আজ। কুকুরদের কাতর প্রার্থনায় আজ তাঁর মাথা গরম হতে থাকে। তাঁর মানুষরোগী দেখার ফুরসত নেই; নাওয়া-খাওয়া তো মাথায় উঠেছে, দিন দিন কেবল কুকুর আর কুকুর। ধুত্তোর—তিনি ক্ষেপে ওঠেন হঠাৎ।

'আর আমার নিজের উপকার করে কাজ নেই। পরোপকারেও ইস্তফা দিলাম আজ থেকে। নিয়ে আয় তো আমার বন্দুক।'

বলে নিজেই গিয়ে নিয়ে আসেন বন্দুকটা। 'আজ এই দিয়েই শেষ করব ব্যাটাদের তবেই আমার নাম বনমালী ডাক্তার।'

বন্দুক নিয়ে বেরুতেই, একটা কুকুরের ল্যাজে তাঁর পা পড়ে যায়! সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁকে কামড় দ্যায় খ্যাক্ করে। তাকিয়ে দেখেই তাকে চিনতে পারেন —তার সব প্রথমের পদভ্রষ্ট রোগী।

কামড় খেয়ে তারপর রাগে আর তাঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বন্দুক হাতে যেন তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয় তাঁর। বন্দুক ছোঁড়ার কথা তিনি ভুলেই যান একদম, বন্দুককে ছড়ি বলেই তাঁর ভ্রম হয়; রুগীদের বন্দুক-পেটা করতে আরম্ভ করেন তিনি। ফলে যারা খোঁড়া ছিল তাদের খোঁড়ামির মাত্রাতো বেড়ে যায়ই, ভূতপূর্ব খোঁড়াদেরও অনেকে আবার পা ভাঙা হয়ে বাড়ি ফেরে। (অর্থাৎ, রাস্তাই কুকুরদের ঘর-বাড়ি কিনা।)

এর একমাস পরের ব্যাপার।

বনমালী ডাক্তার নিজেই হাসপাতালে পড়ে আছেন; কুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্কে তাঁকে ধরেছে, জীবনের তাঁর আশা নেই।

শেষ মুহূর্ত ঘনীভূত হবার আগে নার্সকে তিনি ইঙ্গিতে ডাকেন—'আমার একটা কথা রাখবে?'

নার্স ব্যস্ত হয়ে ওঠে—'ডাক্তার সাহেবকে ডাকব?'

'না না, তার কোন দরকার নেই। একটা কথা রাখতে বলছি তোমায়। ঈশপের গল্প পড়েছ?'

নার্স ঘাড় নাড়ে।

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, সেই গল্পটা?'

পড়েছি ডাক্তার!'

'আমার গল্পটাও যেন সেই বইয়ে যোগ করা হয়। একদা এক কুকুরের পা ভাঙিয়াছিল। বকের চেয়েও আমার পরিণাম শোচনীয়, বক মাথা বাঁচাতে পেরেছিল, আমি কিন্তু পারিনি। যোগ করতে বলবে তো?'

'কাকে বলব স্যার?' নার্স ঠিক বুঝতে পারে না।

'কেন, ঈশপকে?' একেবারে অবাক হবার আগে বনমালী আর একবার অবাক হন। 'কাকে আবার? সেই-ই তো তার বইয়ে এটাও যোগ করবে।'

'ঈশপ।' নার্সের বাক্যস্ফূর্তি হতে ঈষৎ দেরিই হয়, 'তিনি তো মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন? কবে? কেন? তাকেও কি কুকুরে কামড়েছিল নাকি?'

ঈশপের মৃত্যু-শোক তাঁর সহ্য হয় না। বলতে বলতে তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে যায়। সেই ধাক্কাতেই তিনি হার্টফেল করেন।

নকুড়ের মতো ঘুমোতে ওস্তাদ দুটি ছিল না। ওর মতো একনিষ্ঠ 'ঘুমিয়ে' ভুভারতে বিরল। ওরকম ঘনঘন আর অমন ঘুমকাতুরে বড় একটা দেখা যায় না। যে-কোনো সময়ে, যে কোনো অবস্থায়, এমন কি যে-কোনো দুরবস্থায় ওকে একবার ঘুমোতে বলো না। অবিশ্যি না বললেও চলে—বলবার অপেক্ষা রাখে না সে। মোষের মতো ঘুম দিতে বাহাদুর আমাদের এই নকুড়। চাই কি, মোষকেও হারিয়ে দেয় মোশাই!

ঘুমোনোর বিষয়ে কোনো খুঁতখুঁতেপনা ওর কোনোদিন দেখিনি। যে কোনো জায়গায়—স্থানে, অস্থানে—কেবল একটু শুতে পেলেই হলো। ইটের বালিশ হলে তো কথাই নেই, বেঞ্চির হাতলে মাথা দিয়েও ওর সুখশয্যা—স্টিলট্রাঙ্কে মাথা রেখেও ওকে অকাতরে ঘুমুতে দেখেছি। বলব কি, চলন্ত বাসে গাদাগাদি যাত্রী, দাঁড়াবার জায়গা নেই, এমন কি ভিড়ের চাপে বাসের পাটাতনে পা রাখবারও ঠাঁই হয় না—ঠেকানো দূরে থাক, পা ছোঁয়ানোর যো নেই পর্যন্ত—সেই ঠাসাঠাসির ভেতরে স্রেফ আকাশে দাঁড়িয়েই আরাম করে ঘুমিয়ে চলেছে সে, এমনও দেখা গেছে।

এমন যে আমাদের নকুড়বাবু, শুনলে তোমরা অবাক্ হবে, তারও কি না একদিন—দিনেও যার নিদ্রার সীমা ছিল না—একরাত্রে অনিদ্রা দেখা দিল। সারারাত ওর দুচোখের পাতা এক হলো না—এমন কি শেষ অবধি সে বিস্ফারিতনেত্রে মোরগের ডাক শুনতে পেল। মোরগের ডাক আর ভোরের কা-কা-ধ্বনি শুনল! বেশ উৎকর্ণ হয়েই শুনল—তার জীবনে এই প্রথম। তার চোখের সামনেই জানলার ফাঁক দিয়ে কালো আকাশকে ক্রমশ ফিকে হয়ে—ফাঁকা হয়ে—পরিষ্কার হয়ে যেতে দেখল! আস্তে আস্তে সবই তার চোখে পড়ল। আর মুহ্যমান হয়ে পড়ল আমাদের নকুড়। এই বিরাট বিশ্বে এমন

দৃশ্যও যে তাকে দেখতে হবে, এও তার জীবনে ছিল, তা সে কোনোদিনই ভাবতে পারেনি।

এই ব্যাপারে যারপরনাই বিস্ময় হলো নকুড়ের—বিস্মিতের চেয়ে বেশি হলো সে বিমূঢ়। কিন্তু সব চেয়ে বেশি হলো তার অসোয়াস্তি। এরকম তো হয় না! এমনটা তো কদাচ হয়নি! কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে ছট্ফট্ করতে লাগল নকুড়!

সেদিন সকালেই নকুড় আমাদের আড্ডায় এসে তার এই বিস্ময়কর আর বিরক্তিজনক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল। চোখে ঘুম না এলে প্রতিটি মুহূর্ত কিরকম এক-এক যুগ বলে মনে হয়—এ-রাত যেন আর কাটবে না বলে মনে হতে থাকে—তার সবিস্তার কাহিনী চোখ বড় বড় করে শোনালো সে। মনে হয়, পলগুলি যেন পলায়ন করছে! না, আগের মতন চপল নয় যেন আর! প্রত্যেকটি দণ্ডই দণ্ড—হ্যাঁ যেন সত্যিকারের! ঠ্যাঙাচ্ছে ধরে তাকে। ভোরের মোরগ কিরকম ডাকে—কাকের ঐক্যতানই বা কি ধরনের হয়—বিশদ বিবরণে কান পেতে ধৈর্য ধরে শুনতে হলো আমাদের। একে-একে সবকিছু সে শুনিয়ে ছাড়ল—কাকস্য পরিবেদনা! শুনলে মনে হয়, ধরিত্রীতে সেই যেন এই প্রথম এইসব তথ্য আবিষ্কার করেছে। আদ্যোপান্ত জানিয়ে অবশেষে সে জানালো, নিশ্চয়ই ভাগ্য বিরূপ, গ্রহরা সব্বাই তার বিপক্ষে আর রাহু তুঙ্গী—তাই তার অদূর-ভবিষ্যতে নিশ্চিতরূপে দারুণ এক বিপর্যয় অনিবার্য হয়েছে—সেই অবধারিত আসন্নতার কথা অভিব্যক্ত করে আমাদের সকলের আশীর্বাদ যাচঞা করল সে!

'এরকমটা কক্খনো হয়নি এর আগে।' মুখ ভার করে বলল নকুড়ঃ 'কিচ্ছু এর মানে বুঝিনে!'

আমাদের তরফ থেকে উপদেশ-প্রদানের কোনো কার্পণ্য হলো না, অনিদ্রাব্যাধি বিদূরিত করার প্রত্যেকেই আমরা এক-একটা উপায় বাতলে দিলুম। কেউ যাচঞা করলে তো কথাই নেই, অযাচিতভাবে পরামর্শদানের সুযোগ পেলেও পেছপা হওয়া স্বভাব নয় আমাদের। সবগুলো ব্যবস্থাপত্র মন দিয়ে শুনে-গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল নকুড়। তার ব্যারাম এতদূর এগিয়েছে যে, এসবে আর শানাবে কি না সন্দেহ। এ-রোগ আরোগ্যের বাইরেই এখন— তাকে সারানো না, দূরীভূত করা নয়—আদপে তাকে আসতে না দেওয়াই হচ্ছে এর উপযুক্ত দাওয়াই! প্রতিষেধক-হিসেবে যদি কিছু থাকে, তো তাই এখন বলো—তাই নকুড়ের দরকার! জীবনের বাকি কটা দিন (এবং রাতও ধর্তব্যের মধ্যে) বিনিদ্র-দশাতেই তাকে কাটাতে হবে—এর মধ্যেই এই বিশ্বাস তার বদ্ধমূল হয়েছে। চিরনিদ্রার এধারে, বাদ বাকি রাত (এবং দিনও ইনক্লুডেড) না ঘুমিয়েই তাকে অতিবাহিত করতে হবে, এই অদৃষ্টলিপিতে আস্থা পোষণ করে ফোঁস্ ফোঁস্ করছে নকুড়।

নকুড় বলছে—'কী আশ্চায্যি বলব ভাই! মোরগের ডাক শুনতে পেলুম! মুরোগ ডাকছে—কোঁকর কোঁ—কোঁকর কোঁ—! এখনও যেন শুনতে

পাচ্ছি কানের কাছে!—' বলছে, আর শিউরে শিউরে উঠছে নকুড়—বারংবার।

অগত্যা আমাকেই ও রোগের চিকিৎসায় এগুতে হলো। বিজ্ঞাপনের পেটেণ্ট আর টোট্‌কা ওষুধের ব্যবস্থায় সুখ্যাতি ছিল আমার। আগেকার যশ অম্লান রাখতে—পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার খাতিরেই নিজের ফর্দ নিয়ে আমায় এগুতে হলো! আমি অবিশ্যি ওকে বিলিতি একটা পেটেন্টই বাতলে দিলাম—বিনিদ্রা রোগের যেটি চিরাচরিত দাওয়াই—ভেড়া-গোনার দস্তুর। ঘুম না এলে ভেড়াদের এক-দুই করে গুনতে হবে, খালি গুনে যাও, আর কিছু না। ভেড়ারা একটা বেড়া টপকে আসছে—একে-একে—তাদের গুনতে থাকো; তারা নিজগুণেই লাফাবে, তোমার খালি না লাফিয়ে গুনে যাওয়া। দেখবে, দশ গুনতে না গুনতেই তুমি অবশ হয়ে পড়েছ! বিশেষ আগেই ঘুমে বেহুঁশ। উক্ত অব্যর্থ আর একমাত্র মহৌষধের একমাত্রা ওকে দিয়ে দিলুম।

আমাদের পাঁচজনের পঞ্চাশ রকমের প্রেস্‌ক্রিপশনের মধ্যে আমারটাই নকুড়ের মনে ধরেছে বলে মনে হলো। এটার জন্যে ডাক্তারখানায় যেতে হবে না, পয়সা খরচ নেই, অতএব আমার ব্যবস্থাটাই আজ রাত্রে বাজিয়ে দেখবে, বলল নকুড়!

'তোমার ওষুধটায় খরচা কম।' এই কথা বলল সে।

'টোট্‌কা ওষুধের মজাই তো ওই!' আমি জবাব দিলুমঃ 'চট্‌ করে লেগে যায়, অথচ কোনো খরচা নেই! স্বচ্ছন্দে তুমি পরীক্ষে কোরো, 'ফলেন পরিচীয়তে'।'

'তাছাড়া, ভেড়াদের আমি ভালবাসি। গুনতে পারব খুব। বিস্তর খেয়েছি তো! খেতে বেশ!' এই বলে সকৃতজ্ঞ মুগ্ধনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে রইল নকুড়!

তার বাধিত-দৃষ্টি লাভ করে আমি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলুম। যদিও মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়ে গেছেন—'মানুষ আমরা নহি তো মেষ!'—আর বলে গেছেন বেশ একটু সগর্বেই বলতে হয়; তবুও এখন থেকে, আর এখান থেকেই যে সে গণনা শুরু করবে, এমনটা আমি আশা করিনি। এতটা সে তালিম হবে আমার হুকুম তালিমের জন্যে, এতখানি প্রত্যাশা আমার ছিল না। আমি ওর কৃতজ্ঞতার বোঝাটা হালকা করবার মানসে জানালাম—'গুনে দেখোই না রাত্রে! রাত্রেই গুনো—হাতে হাতে গুণ দেখবে!'

বুক ফুলিয়ে বলল নকুড়—'দেখো, গর্ব আমি করতে চাইনে, চালমারা আমার অভ্যেস নয়। মুখে মুখে বড় বড় যোগ কষতে পারি, এমন বাহাদুরিও আমি করব না। সোমেশ বোসও নই আমি; কিন্তু এও তোমাদের বলে দিচ্ছি, আমার গণনার ভেতর থেকে একটা ভেড়াও যে কোনো ফাঁক দিয়ে ফসকে বেরিয়ে যাবে, সেটি হতে দেব না। আমার সেন্সাস্‌ এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে একজনও যদি যেতে পারে, তাহলে জানবে যে—হ্যাঁ! সে বাহাদুর! তা সে ভেড়াই হোক, মোষই হোক, আর দুম্বাই হোক!...'

সারাদিন আমাদের আডডায় কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে সন্ধের মুখে নকুড় বিদায়

নিল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে, এমনি তার অবস্থা তখন, শুতে পারলেই বাঁচে।

'বাড়ি যাই। তোমার সেই ভেড়া-গোনা রয়েছে আবার।' দুচোখ ভারী, সে ঢুলছে; টলতে টলতে বলে গেল নকুড়।

বাড়ি গিয়ে বালিশ আঁকড়ে বিছানায় আশ্রয় নিতে না নিতেই সারাদেহ তার ঘুমে আর ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করে এসেছে। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় গত কালকের ঘুম না হবার কারণ সে ভাবতে চেষ্টা করল। এখন ওর মনে হলো, গতরাত্রের গুরুভোজন—বেশি রাত্তির করে বেশিরকম খাওয়াই ওর জন্যে দায়ী। বিশেষ করে গুরুতর চর্বিওয়ালা সেই মটনচপ কটাই! তারাই তার দেহের মধ্যপ্রদেশে চাপ সৃষ্টি করেছিল। আর মটনের কথা মনে পড়তেই—তার পূর্বপুরুষ—ভেড়ার কথাটা তার মনে পড়ে গেল তক্ষুনি।

'ঐ যাঃ! ভেড়াদের গুনতে হবে না?' আপনমনে বলে উঠল নকুড়, 'গোনাগুনির কাজ শেষ না করেই ঘুমোতে যাচ্ছি—বেশ তো!'

পরের দিন সকালে নকুড়কে দেখে আগের নকুড় বলে চেনাই যায় না আর! যেন কতকালের রুগী বলে মনে হয়! সারারাত কাল মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা বুজোতে পারেনি নকুড়। অঢেল ঘুমের ঢেউয়ে যেই না সে তলিয়ে যেতে চলেছে, অমনি সেই মেষ-গণনার কথা তার মনে উদয় হয়েছে; আর তার উন্মেষ হতেই তারপর থেকে চোখের ঘুম যে কোথায় পালালো, তার পাত্তা নেই। তবে পঁয়তাল্লিশ হাজারের ওপর ভেড়া গুনে সে শেষ করেছে—এইটুকুই তার সান্ত্বনা! সেই পঁয়তাল্লিশ হাজারের ভেতরে একটা আবার যা বেয়াড়া! বিশ্রীরকমের! কিছুতেই সেটা বেড়ার ওপর দিয়ে টপকে আসতে রাজি হয়নি। বেড়ার তলায় কোথায় একটুখানি ফাঁক ছিল, তারই তলা দিয়ে গুটিসুটি মেরে কোনোগতিকে এসেছে সে। তার যথারীতি না আসার কথাটা এখনো নকুড় ভুলতে পারেনি। সেই অসৌজন্যের কথা স্মরণ করতেই নকুড়ের এখন হাই উঠছে আরো।

'এরকম কাণ্ড কখনো দেখিনি ভাই!' আমাদের আড্ডায় এসে পাংশুমুখে প্রকাশ করল সে; 'যেই না মনে করছি এই খতম, গোনাগাঁথা সব ফিনিশ হলো আমার, ঘুমোবো এবার—ও-মা! আবার দেখি, কোত্থেকে আরেক পাল ভেড়া লাফাতে লাফাতে এসে হাজির! পঙ্গপালের মতই আসতে শুরু করে দিয়েছে! পালের পর পাল। যেন পাল-রাজ্য। এবং—'

এবং আর কি? সেই লম্ফমানদের সেন্সাস্ না দিয়ে কন্‌সেন্‌সাস্ নকুড় আমাদের কি করে? এইভাবে দলের পর দল—নব-নব দলবলে আগুয়ান পালবংশীয়দের তালিকাভুক্ত করতে করতেই গোটা রাতটা বেচারার কাবার হয়ে গেল।

'কী বলব ভাই, এতখানি পরিশ্রম করলুম!' নকুড় আপশোস করে; 'কিন্তু পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ একটুখানি যে বিশ্রাম করবো তার আর ফুরসৎ হলো না!'

'ভেব না কিসসু।' আড্ডায় সবাই ওকে উৎসাহ দিতে লাগল : 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি গুনতে থাকো। ঘুমোবার পক্ষে ওর চেয়ে মোক্ষম ওষুধ আর নেই। চকরবরতিটা বাতলালে কি হয়, আমারা সক্কলেই জানতুম ওই দাবাইয়ের কথা! সব্বার জানা। ঘুম না এলে আমরাও তো তাই করি হে! সক্কলেই করে, বিশ্বসুদ্ধু মানুষ! অতএব কোনোদিকে না তাকিয়ে তুমি খালি গুনে যাও, দেখতে পাবে, খুব শীগ্গিরই তুমি আঁতুড়ের শিশুর মতো অকাতরেই ঘুম দিচ্ছ!'

'কালকেই তো দিতুম।' হাই তুলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল নকুড় : 'যদি না ওইসব বিচ্ছিরি বদ্ ভেড়ার পালদের গুনতে হতো আমায়। তার মধ্যে একজন আবার এমন ত্যাঁদোড় যে তার ভদ্রতা বলে কোনো বোধ নেই। ভেড়া হয়ে জন্মেছিস, ভেড়ার মতো থাক—সবাই যা করছে, তাই কর; সবাইকে ফলো কর্! সবাই লাফাচ্ছে, তুইও লাফা! তা না - কোথায় বেড়ার তলায় সামান্য একটু ফাঁক রয়েছে, কখন থেকে পড়ে আছে, খেয়াল করিনি—বোজাবার কথা মনেও ছিল না—সত্যি কথা বলতে কি, ওটা আগে চোখেই পড়েনি আমার—আর সে ব্যাটা করেছে কি, না সেই গর্ত দিয়ে গলে হামাগুড়ি মেরে—আরে ছি-ছি-ছি! সেই মেষ-শাবকের অপচেষ্টাই আরো বেশি কাহিল করে দিয়েছে আমায়।'

তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, ওই ভেড়ারাই নকুড়কে সারা সপ্তাহ ধরে বিব্রত করে রাখল। নকুড় চোখ বুজতে গেলেই তারা ভিড় করে আসে, অবুঝের মতো এসে ভিড়ে যায় দলে-দলে, পালে-পালে, কাতারে-কাতারে। চোখ বুজেও রেহাই নেই—চেষ্টা না করতেই সেই মেষপাল তার আধবোজা অনিমেষ-দৃষ্টির সামনে অত্যন্ত স্পষ্টাকারে বারে বারে দেখা দিতে থাকে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই নকুড় আধখানা হয়ে গেল। নকুড়কে দেখলে নকুড় না মনে হয়ে নকুড়ের ছায়া বলেই ভ্রম হয়। নাদুস-নুদুস নিদ্রায় ঢল-ঢল, অমায়িক নকুড়ের আমাদের এ কী হলো—এ যে তার প্রেতমূর্তি!

নকুড় বলে—'বলব কি ভায়া, পৃথিবীর যত মেষ ছিল, সব আমি গুনে শেষ করেছি!'

এ বিষয়ে তার অনড় বিশ্বাস। তবে এখনো তারা ফুরোচ্ছে না কেন? তার কারণ এই, তার মনে হয়, ভেড়ারা নকুড়ের সঙ্গে ছলনা করতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই তারা অন্য দিক দিয়ে ঘুরে ফিরে আবার তার সামনে এসে হাজির হচ্ছে—এহেন পুনঃপুনঃ হাজিরা দেবার তলায় কোনো রাজনৈতিক মতলব নেই তো? নইলে এইভাবে সেন্সাসে গোলমাল বাধিয়ে তলে তলে সংখ্যা-বাড়ানোর এহেন অপচেষ্টা কেন? নকুড় আমাকে জিগ্যেস করে—

আমাকেই জিগ্যেস করে! ওদের মতলব আমাদের কাছে জানতে চায়! আমি যেন ভেড়াদের দলের এক মাতব্বর! তাদের ভেতরের খবর সব জানি।

'না কি, পৃথিবী গোল বলেই এত গোলযোগ?'

আমি এর কী জবাব দেব? সাতদিন যে ঘুমুতে পায়নি, তার মাথা কিভাবে যে নিজেকে ঘামায়, আমার তো তা জানা নেই। ঘুমোনোর ব্যাপারে

অতদূর না হলেও প্রায় নকুড়ের সগোত্রই আমি। এক হাফ্ নকুড়। তবে সুখের বিষয়—আমাকে কদাপি ভেড়া গুনতে হয় না। ঘুম না এলে আমার প্রিয়পাত্রদের কথা ভাবি—তাদের গণনা করার প্রয়াস পাই, আর তাতেই আমার ঘুম এসে যায়—চোখের নিমেষেই। আমার স্মৃতিশক্তিই বিস্মৃতিশক্তি এনে দেয়।

নকুড় নিজেই তার প্রশ্নের সমাধান করে দিল। পৃথিবী গোলাকার বলেই এইটা হচ্ছে, বলল সে! বার বার পৃথিবী পরিক্রমা করে ভ্রমণকারীর দল ঘুরে ঘুরে দেখা দিচ্ছে আবার। ঘুরে ফিরে হানা দিচ্ছে। পার্থিব গোলত্ব পৃথিবীর যাবতীয় গোলমালের মতো এই গণ্ডগোলেরও মূলে।

'নিশ্চয়ই তারা ঘুরে ঘুরে আসছে! আলবত!' নকুড় সুদৃঢ়কণ্ঠে আমায় বলল: 'একথা আদালতে গিয়ে আমি হলপ করে বলব। একটা কানকাটা দুম্বাকে আমি সাতবার গুনেছি। এক হাজার দুম্বার মধ্যে দেখলে তাকে চেনা যায়। কক্খনো আমার ভুল হতে পারে না।'

'তা না হোক'—আমি বাধা দিয়ে বলতে যাই।

'না হোক, তার মানে? সেই অবাধ্যটাও, সেটাও আছে! এত জায়গা থাকতে বেড়ার তলার সেই ফাঁকটা দিয়ে গুঁড়ি মেরে আসবেই সেই ব্যাটা!'

আমিই ওকে দাওয়াই দিয়েছিলাম—আমাকেই প্রেস্‌ক্রপশন্ পালটাতে হয়।

'দিনকতক ওষুধ বন্ধ থাক এখন। তুমি আপাতত দুম্বা গোনা ছেড়ে দাও।' কাতরকণ্ঠে আমি বলি।

'ছাড়ব, তার যো কি?' বিষণ্ণমুখে সে ঘাড় নাড়ে: 'না গুনে কি আমার নিস্তার আছে? একমুহূর্তের জন্যেও কি ওরা রেহাই দিচ্ছে?'

এইবার একেবারে উপসংহারে আসা যাক। যদিও লম্বা গল্পকে খাটো করে বলা আমার অভ্যেস নয়, স্বভাব-বিরুদ্ধই আমার, তবুও এক্ষেত্রে তার অন্যথা করে এইখানেই দাঁড়ি টানব।

···দিনকয়েক আগে নকুড়ের সাথে দেখা হয়েছিল! দেখে নকুড়ের ছায়ার চেয়ে নকুড় বলেই বেশি সন্দেহ হলো। শুষ্ক-বিবর্ণ গালে ফের রক্তমাংস লেগেছে। প্রেতমূর্তির বদলে তার অভিপ্রেত মূর্তিই দেখলাম আবার; দেখে খুশিই হলাম। ঘুমোনোর পুরানো দক্ষতা আবার সে লাভ করেছে মনে হলো। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনো সংশয় ছিল না। নষ্ট-ক্ষমতা কি করে সে পুনরুদ্ধার করল, জানতে চাইলাম আমি।

'আশ্চর্য্যি একটা উপায় বের করেছি ভাই!' লম্বা একখানি হাসি হেসে জানাল নকুড়: 'একহপ্তা আগেই যে কেন এটা বের করতে পারিনি, তাই ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি। গালে চড় মারতে ইচ্ছে করছে আমার।' এই বলে দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বহস্তে নিজেকে পুনঃ পুনঃ চর্চিত করে নকুড় বলল—'আর যাই হই না, আমি যে এক চতুর লোক এটা তো তুমি মানবে?'

'নিশ্চয়ই! অঙ্কে যে তুমি সোমেশ বোস, একথা তো মানতেই হয়।' আমি মুক্তকণ্ঠে সায় দিই: 'আর যোগবলে ত্রৈলঙ্গ স্বামী!' ওর চাতুর্যের প্রশংসাপত্র চাউড় না করে পারা যায় না।

'ঠিক বলেছ। ঐ যোগবলে! যোগবলেই আমি অদ্বিতীয়। মাত্তর কাল রাত্তিরে এই যোগ-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি ভায়া! মাথার তলায় বালিশ দিয়ে চোখ বুজেছি কি বুজিনি, এমন সময়ে সেই বিচ্ছিরি ভেড়াটা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল—আর তার পরমুহূর্তেই সেই ভেড়ার প্যাল! পালবংশের ভেড়ারা! এক-আধটা না! লক্ষ-লক্ষ ভেড়া! সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাড়া করে তারা ছুটে আসছে দেখতে পেলাম। সকলের চক্ষে সেই এক ক্ষুধিত-দৃষ্টি—সেন্সারের তালিকায় ভর্তি হবার সকরুণ আবেদন! দলে-দলে, পালে-পালে—রেজিমেণ্ট আফটার রেজিমেণ্ট—তীরবেগে অগ্রসর হচ্ছে! দেখেই তো আমার চক্ষুস্থির। তার ভেতর সেই কান-কাটাটাও রয়েছে আবার—হামাগুড়ি-দেওয়াটাকেও দেখতে পাওয়া গেল! 'এই যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' তক্ষুনি আমি করলাম কি আমার কুকুরটাকে তাদের পাহারায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। তাকেই বললাম—'স্থিরো ভব! থোরা ঠহর্ যাও!' সহজে বুঝবে বলে রাষ্ট্র-ভাষাতেই বললাম! আর সেই ফাঁকে বেড়ার তলাকার ফাঁকটা বন্ধ করে ফেললাম—সেই বাচ্চা মেষটি তার তলা ঘেঁষে ফের না আমাকে কলা দেখায়! এদিকে সেই কানকাটা দুম্বার ওপরেও নজর রেখেছি—ব্যাটা ভারী ফিচেল—বেজায় হুঁশিয়ার, খালি লুকিয়ে-চুরিয়ে আসে, পাছে সে কোনো পাশ দিয়ে কেটে পড়ে—তীব্র লক্ষ্য রেখেছি তার ওপর। তারপর এদিকে করলাম কি শোনো!'

আমি অধীর-আগ্রহে উদ্গ্রীব হয়ে তার সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনি।

সুচতুর নকুড় প্রকাশ করে যায়—'এদিকে করলাম কি, বেড়ার দুধারে দুটো গেট না করে দিয়ে তার সামনে শেয়ালদা আর হাওড়ার মতো বড়ো-বড়ো দুটো ইস্টিশন্ খাড়া করে দিলাম। সবই রাতারাতি—সঙ্গে-সঙ্গে। তারপর ভেড়াদের সার বেঁধে দিয়ে সারবন্দী করে—সেই দুই পথে একে-একে ছাড়বার ব্যবস্থা করলাম। আর ইস্টিশনে ঢুকলেই টিকিট কেনো—তা তুমি যেখানেই যাও না কেন—ভাগলপুর কি মোগলসরাই, দম্দম্ কি দুম্দুমা—আর কোথাও না গেলেও প্ল্যাটফর্ম-টিকিট তো তোমায় কাটতেই হবে। টিকিট কেনবার কড়াক্কড়ি নিয়ম করে কয়েকজন টিকিটচেকার বহাল করে দিলাম। দিয়ে বেড়ার আর ভেড়ার পথ মুক্ত করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে গেলাম আমি। তারপর—'

দম নিতে একটুখানি থামল নকুড়—'তারপর আর কি? সকালে উঠেই আমার ইস্টিশনের কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করে সর্বসমেত কতগুলো টিকিট বিক্রি হয়েছে জেনে নিয়েছি! কতো, জানতে চাও? কাল এক রাত্তিরেই পাঁচলাখ ভেড়া পার হয়েছে। নিখুঁত সংখ্যা হচ্ছে পাঁচলাখ আশি হাজার চারশো পঁচাশি।

নকুড়ের অপূর্ব কাহিনী শুনে বিস্ময়ে আমি হতবাক্।

'একটু মাথা ঘামালেই, বুঝলে কিনা, পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। এমন কি, তোমার ওই অনিদ্রা-ব্যামোরও। দেখলে তো, ভেড়া-গোনা আর ঘুম-আনার—একঢিলে এই দুই পাখি মারার—কেমন খুব সহজ উপায় বের করে ফেললাম! নকুড়ের মুখে হাসি আর ধরে না।'

———

বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্থ প্রাপ্তি

পটল আর কদিন খাওয়া চলে ? ঐ পৌষমাসের গোড়ার কদিনই যা ! হ্যাঁ, ঐ প্রথম উঠতির মুখেই, যা এক-আধটা পটল-ভাজা মুখে তোলা যায়। কিন্তু কদিনই বা পটলের দর থাকে ? ষোলো টাকা হতে না হতে চার টাকায় নেমে গেছে, আর চার টাকা থেকে, দেখতে দেখতে, একবারে চার-চার আনা সের সটান্ !

তারপর আর পটল খাওয়া পোষায় না।

অন্তত, বিশ্বপতিবাবুর পোষায় না। রামা-শামা যদু-মধু যে-ই চার আনা ফেলতে পারে, সে-ই যখন পটল তুলতে পারে, তখন আর তাঁর পটলে রুচি থাকে না, পটলের ওপর থেকে তাঁর চিত্তই চলে যায়। তাঁর লোলুপতা লোপ পেয়ে, পটল-ভীতিই জাগতে থাকে তখন। রীতিমতোই জাগতে থাকে।

পটলের সাধারণ-তন্ত্রে তাঁর উৎসাহ নেই। বাজারে পটলের দর গেল, তো, বিশ্বপতিবাবুর কাছে তার আদরও গেল।

সেদিন সাহেব পাড়ায় ইউয়িং কোম্পানীর দোকানে জামাটা করিয়ে অবধি মনটা ওঁর ভাল নেই। প্রাণের মধ্যে কেমন যেন খচ্খচ্ করছে—সত্যি, ওহেন দুর্ঘটনার পর, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো আর মানেই হয় না, জীবন-ধারণের আনন্দই তাঁর অন্তর্হিত হয়েছে সেদিন থেকে।

অমন যে ইউয়িং কোম্পানী, কতবার ওখানে জামা করিয়েছেন, কত ডজনই তো করিয়েছেন, সেখানে কিনা এবার পঞ্চাশ টাকা গজের উপরে সার্জ'ই নেই। বরাত মন্দ আর বলে কাকে ? এই তো গেল শীতেও দুশো টাকা গজের ভিনিসিয়ান্ সার্জ পেয়েছেন পীককুরঙের এবং কত সব তোফা ডিজাইনের, কিন্তু এবার কী দুঃসময় পড়েছে, দ্যাখো দিকি ? পঞ্চাশ টাকা গজের সস্তা খেলো কাপড়ে ক'খানাই বা জামা করানো যায় ? বা করাতে সাধ হয় মানুষের ? আর সে-জামা

গায়ে দিয়ে কি বাইরে বেরুনোই চলে? কোনোরকম দায়-সারা-গোছ ঘরে পরে বসে থাকা ছাড়া গতি কি? একেবারে ঘর-জামাই হবার গতিক!

কারা যে আগে এসে তাঁর ওপরে টেক্কা মেরে গেছে, টের পাচ্ছেন না বিশ্বপতি-বাবু। নেটিভ্ স্টেটের রাজারাই কি না কে জানে? কিন্তু মনটা ওঁর খুঁতখুঁত করছে সেদিন থেকেই।

কিন্তু যখন তিনি দেখতে পান, তাঁর আলাপীদের অনেকে তিন টাকা গজ সার্জের শার্ট্ করিয়েই আহ্লাদে আটখানা, তখন আর তাঁর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। নিশ্চয় ওরা চার আনা সেরের পটলও খায়। হ্যাঁ, তিনি ঠিকই ধরেছেন। এমন কি জিজ্ঞাসাবাদে এও জানা যায়, ও-জিনিস চার পয়সা সের হলেও ওদের মুখে তুলতে বাধে না। এত সস্তার পটল খেয়ে কি করেই যে টিকে থাকে সেই এক আশ্চর্য, আর কেনই বা খায়? ভেবেই থই পান না তিনি, বাস্তবিক কি ভয়ানক টেঁকসই এরা! যতই ভাবেন ততই বিস্মিত হন বিশ্বপতিবাবু।

সত্যি, এত বিস্ময়জনক বস্তুও আছে এই পৃথিবীতে! চার আনা সেরের পটলও খায়, চার টাকা গজের জামাও গায়ে দেয়! অদ্ভুত! বিশ্বপতিবাবু ভেবেই কাহিল হয়ে পড়েন, ভাবতেই তাঁর গায়ে কাঁটা দেয় কিরকম।

আসল কথা বলতে কি, সস্তার কিস্তিতেই তো তিনি মাত হবার দাখিল! আক্রা জিনিসের অভাবেই বেজায় কাবু হয়ে রয়েছেন, বলতে গেলে! দামী জিনিস, বেশি কই আর বাজারে? অথচ এই সব সস্তা আর খেলো জিনিস নিয়েই তো হেসে খেলে চলে যাচ্ছে দুনিয়ার, এবং ব্যবহার করে সবাই বেঁচে বর্তে আছেও তো বেশ। ভাবেন আর অবাক হন বিশ্বপতিবাবু।

এহেন বিশ্বপতিবাবুর বরাতে বোধ করি আরো বিস্ময়ের ধাক্কা লেখা ছিল। তা নইলে একদা বিকেলে, গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গিয়ে তাঁর মোটরের কলই বা বিগড়োবে কেন হঠাৎ?

বছর-পুরনো গাড়িখানা বদলে কদিন আর এটাকে কিনেছেন! নাইনটিন থারটি নাইনেরই মডেল! কিন্তু সেই বস্তুই যে বলা নেই কওয়া নেই বদমাইশি শুরু করবে, কে আর জানে বলো! বিরক্ত হয়ে বিশ্বপতিবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। বিড়ম্বনা আর বলে কাকে!

শোফার বলেছে: 'পেছন থেকে একটু ঠেললে বোধহয় গাড়িটাকে চালু করা যায়! কিন্তু আমার—আমার একার দ্বারা কি হবে?'

ইঙ্গিতটা সে ইশারাতেই সারে।

কিন্তু বিশ্বপতিবাবুর মনে কোনো 'কিন্তু' নেই, তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন: 'না বাপু, ও-সব ঠেলাঠেলি-কর্ম আমার না। গায়ে অতো জোর নেই আমার। চার আনা সেরের গোঁয়ার পটলখোররাই পারে মোটর ঠেলতে। আমি পারব না বাপু। তুমি বরং তার চেয়ে—'

এই পর্যন্ত বলে তিনি পকেট থেকে গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের খুদে চেক-বইটা বার করেছেন এবং ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের আরেকটা এবং তাঁর দামী পার্কার কলমে এক একটা মোটা অঙ্ক লিখে, দুখানি পাতা ছিঁড়ে শোফারের হাতে দিয়েছেন:

'যাও, এই নিয়ে দ্যাখো গে সাহেব কোম্পানীগুলোয়। ডজ্ হয়, শেভ্রলে হয়, বুইক্ হয়—যা হয় আপাতত একটা কিনে আনো গে পছন্দ মতন। আমি এধারে হাওয়া খাচ্ছি—বেড়িয়ে-বেড়িয়েই হাওয়া খাচ্ছি ততক্ষণ।'

ট্রামে করে, রিকশায় কিম্বা ফিটনে, এমন কি ট্যাক্সি চেপেও বাড়ি ফেরার কথা ঘুণাক্ষরেও তাঁর মনে হয়নি। রিকশা ইত্যাদি তো ধর্তব্যের মধ্যেই না, তবে দায়ে পড়ে ট্যাক্সিতে দুএকবার চাপতে হলেও, ট্রামে তিনি জীবনে কখনো

পদার্পণ করেছেন কিনা সন্দেহ। কি করে যে অত লোক একটা মাত্র কামরায় কামড়াকামড়ি করে যায়! কামড়াকামড়ি না হলেও গুঁতোগুঁতিতো বটেই! কিছুতেই তা তিনি ভেবে পান না। আর ট্যাক্সি-মিটারের আট আনা মাইল, ভাবতেই তো তিনি কাহিল হয়ে পড়েন! মাত্র আট আনা! বাড়ি পৌঁছতে তাঁর দেড় টাকাও হয়ত পড়বে না—ছি ছি, লোকচক্ষের সমক্ষে চক্ষুলজ্জার চরম!

যাকগে! ততক্ষণ হাওয়াই খাওয়া যাক। প্রথম শীতের পড়ন্ত রোদের সঙ্গে শির্‌শিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বেশ মিষ্টিই লাগে! কিন্তু অত সস্তা দামের জামা গায়ে, পাছে কেউ দেখে ফেলে, এই যা তাঁর আশঙ্কা! গরিব লোক বলে গণ্য হতে, অপরের অবজ্ঞা-ভাজন হতে অত্যন্তই তিনি নারাজ।

হাওয়াগাড়ি করে বেড়ানোই চিরদিনের অভ্যাস, বেড়িয়ে হাওয়া খাওয়ার দুরদৃষ্ট এই তাঁর প্রথম। বেড়াতে বেড়াতে কেবলি তাঁর মনে হয়, এ কী করছেন! নিতান্তই নিজের পায়ের ওপর নির্ভর করছেন অবশেষে। এটা কি খুব ভাল হচ্ছে? নিজের কাছেই বিশ্বপতিবাবু কেমন যেন সলজ্জ হয়ে পড়েন। নিজেকে অতি নিঃস্ব মনে হয়।

ক্রমশ, প্রতি পদেই নিজের কাছে তাঁকে সাফাই গাইতে হয়। কেন? মোটর না হলো তো কি হলো? সবাই কি মোটরে করেই হাওয়া খাচ্ছে? বেড়িয়ে বেড়িয়ে কি হাওয়া খাওয়া যায় না? খায় না কি মানুষ? খেতে কি নেই? কি হয় খেলে? আর, যদি তিনি খানই কে তাঁকে আটকাতে পারে, তাঁর সেই আহারে কে বাধা দিতে পারে, শুনি? না না, বেড়ানোর হেতু তাঁর তেমন কিছু অসুবিধা নয়, কেবল ঐ একটা যা তা জামা তাঁর গায়ে কিনা, সেই জন্যই না···

তবে তাঁর বরাত ভাল। মাঠের ও-ধারটায় দুটি ছোট্ট ছেলে আর মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না। কেবল তারাই দুজনে খেলা করছিল! হুটোপাটি করে ছুটোছুটি করে খেলছিল নিজেদের মধ্যে।

না, সন্দিগ্ধস্বভাব কোনো ব্যক্তি—এমন কি ভদ্রলোক বলে সন্দেহ করা যেতে পারে এমন কোনো প্রাণীরই সে অঞ্চলে প্রাদুর্ভাব নেই! বিশ্বপতিবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করলেন—আঃ।

কিন্তু কতক্ষণেরই বা স্বস্তি। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে, টুনু লাফিয়ে এসেছে তাঁর কাছে: 'দাওতো তোমার ফাউণ্টেনটা!'

ঈষৎ ইতস্তত করে বিশ্বপতিবাবু কলমটা হাতছাড়া করেছেন।

নেড়ে-চেড়ে দেখে-টেখে টুনু বলেছে: 'এর চেয়ে আমার ফাউণ্টেন্‌টা ঢের ভাল। কেমন রঙচঙে সেটা। বড়দা দিয়েছিল আমায়। বা-রো আ-না দাম! বুঝলি রে বেণু, বারো আনা?'

বেণু এগিয়ে আসে বিশ্বপতিবাবুর কাছে: 'আমার কপালে একটা টিপ এঁকে দাও।'

উবু হয়ে বসে—হ্যাঁ, সেই ধুলো-মাটির ওপরেই, ঘেসো জমির কোল ঘেঁষে উবু হয়ে বিশ্বপতিবাবু টিপ আঁকার দুঃসাধ্য কর্মে ব্রতী হন। আশ্চর্য কাণ্ডই বটে।

'আর গোঁফ করে দাও আমার।' গুম্ফ-লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা টুনুর। এক নিঃশ্বাসে বড় হবার দুরভিসন্ধি।

বিশ্বপতিবাবুকে গোঁফ বানিয়ে দিতে হয়। গুম্ফলোভী ছোড়দা এবং টিপ-লুব্ধ তার ছোট বোন দুজনেরই যথাসাধ্য ভাল করে আঁকতেই চেষ্টা করেন, তবু তাঁর শিল্প-রচনায় খুঁত থেকে যায়। এক পাশের চেয়ে অন্য পাশের গোঁফটা বেশি লম্বা হয়ে পড়ে, একটার চেয়ে আরেকটা অধিকতর ঘনীভূত দেখায়, বিশ্বপতিবাবুর ঠিক মনঃপুত হয় না। নাঃ, তাঁর নিজের পরিপুষ্ট এবং লীলায়িত গোঁফের কাছে এসব গোঁফ দাঁড়াতেই পারে না, নিজের ঘন-সন্নিবিষ্ট সূচ্যগ্রতায় তা দিতে দিতে তাঁর মনে হয়।

কিন্তু টুনু-বেণুর কোনো বিকার নেই। ততক্ষণে তারা নতুনতর প্রস্তাব পেড়ে ফেলছে বোধ করি, বিশ্বপতিবাবুকে পুরস্কৃত করবার মতলবেই।

'তুমি ঘোড়া হও। হও না?' গুম্ফবতী বেণুই বলেছে।

বিশ্বপতিবাবুর বিস্ময় লেগেছে। 'ঘোড়া! ঘোড়া আবার কি?' শুধিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণা ঘোড়া নাকি হবার নয়, হলে পরে এমনি হয়।

'বাঃ! ঘোড়া হতে জানো না? এই যে, এমনি করে ঘোড়া হতে হয়। হও না তুমি।'

টুনু স্বয়ং উদাহরণস্বরূপ চতুষ্পদ সেজে, পথ-প্রদর্শন করতে চেয়েছে।

'কেন? ঘোড়া হতে যাবো কেন?' বিশ্বপতিবাবুর তথাপি বিস্ময় যায়নি।

'বাঃ, আমরা চাপব যে! চাপব তোমার পিঠে।' বেণুর সরল স্বীকারোক্তি।

বিশ্বপতিবাবু কিন্তু বিব্রত বোধ করেছেন—হ্যাঁ, একটু বিব্রতই। অবশ্য উবু যখন হতে পেরেছেন, তখন ঘোড়া হওয়া আর বেশি কি? খুব সুদূরপরাহত ছিল না সত্যিই, তেমন কল্পানাতীত কাণ্ড কিছু নয়তো! তথাপি বিশ্বপতিবাবু গ্রীবা বক্র করে মৌন অসম্মতি জানিয়েছেন—ঘোড়াদের যেমন চিরকেলে দস্তুর।

জানোয়ারদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা টুনুর স্বভাবসিদ্ধ নয়। সে তাঁর পিঠে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং বেণু ঠিক তার পিঠোপিঠি। কাজেই চতুষ্পদে পরিণত হবার যেটুকু মাত্র বাকি ছিল, এ-হেন পৃষ্ঠপোষকতার ধাক্কায় তার আর বিলম্ব থাকেনি।

তারপর মহাসমারোহে, হেই-হেট, হুস্-হুস করে তারা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে ফিরেছে। যদিও তাঁর নিজের ধারণায়, তিনিই চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তাদের। বলাবাহুল্য, এই পরিচালনার ব্যাপারে, কি আসল আর কি ভেজাল, সব ঘোড়ারই ধারণা একেবারে একরকম, এবং দস্তুরমত বদ্ধমূল।

অশ্বত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুলকিত হননি বিশ্বপতিবাবু। এমনকি, তিনি যে পদমর্যাদায় বর্ধিত হয়েছেন, এহেন সন্দেহও তাঁর মনে উদিত হয়নি। কিন্তু টুনু যখন লাগামের অভাবে এবং বোধ করি, নাগালের মধ্যে পেয়ে, একান্ত অসহায় পেয়েই, তাঁর লীলায়িত বিলাসিতায়, তাঁর পরিপুষ্ট গোঁফের দুই সীমান্তপ্রদেশে হস্তক্ষেপ করতে চাইল, তখন তিনি সত্যিই ভারী বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ঘাড়-ঝাঁকি দিলেন, স্কন্ধ-বিন্যস্ত কাল্পনিক কেশরদের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা করলেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা। টুনু বেজায় মুক্তহস্ত এবং তাঁর গো-

বেচারা গোঁফ-দুটি একেবারেই বেহাত হবার দাখিল ! অগত্যা তাঁকে হ্রেষাধ্বনি করতে হলো। স্বভাবতই, এরকম অবস্থায় না করে তিনি পারেন না !

কেন যে শিশুপালের প্রতি মনে মনে তাঁর ভীতি ছিল, এখন বুঝতে পারলেন বিশ্বপতিবাবু। কেন যে সেই মর্মান্তিক ভয়ের বশবর্তী হয়ে এতদিন বিয়ে পর্যন্ত করবার তার দুঃসাহস হয়নি, তাও এখন তাঁর হৃদয়ঙ্গম হলো। হ্যাঁ, এইজন্যেই তিনি নিজের বিয়ে দিতে পারেননি এতদিন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে এতদূর মারাত্মক হতে পারে, এতখানি তাঁর ধারণার বাইরেই ছিল। অথচ, এমন এক আধটা নয়—কত গণ্ডা, কত লক্ষ গন্ডাই এজাতীয় দুর্বহ ভার পিঠের ওপর নিয়ে পৃথিবীকে চলতে হচ্ছে। পৃথিবী যে কি করে সঠিক চলছে, সেইটাই আশ্চর্য ঠেকে বিশ্বপতিবাবুর !

হ্রেষা-ধ্বনিতে ঘাবড়াবার ছেলে নয় টুনু। এমন কত দুষ্টু ঘোড়াকেই সে শায়েস্তা করেছে অনতিদীর্ঘ জীবনে। উক্ত হ্রেষা-রবে সেই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরুক্তি শুনতে পায়। গোঁফ ছেড়ে দিয়ে সে বিশ্বপতিবাবুর কান পাকড়ে ধরে।

এবার অশ্ববরের অসহ্য হয়ে পড়ে ! ভারী এবং ভরাট গলায়, ভারিক্কি চালের তিনি গগনভেদী এক চিঁহিহি ডাক ছাড়েন। সমুচ্চ কণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ ঘোষণা করেন, এবং উৎকণ্ঠাও।

'চিঁহিহি—চিঁহিহি—চিঁহি—হিহি !'

টুনু কিন্তু নাছোড়বান্দা। পাকা সওয়ার মাত্রই তাই। সহজে তারা লাগাম ছাড়ে না। টুনুও আরো শক্ত করে ধর্তব্যকে বাগিয়ে ধরল, এমনকি টেনে ছিঁড়ে ফেলবার মতই করল প্রায়।

অন্য ঘোড়ার কথা বলা যায় না, কিন্তু বিশ্বপতিবাবুর নিজের লাগামের প্রতি সামান্য কিছু মমতা ছিল। অবশ্য এটা একটু অস্বাভাবিকই বটে, এমন কি, এটাকে অন্যায় রকমের পক্ষপাতই বলা যেতে পারে। লাগাম বাঁচাবার জন্য তিনি ঘাড় বাঁকিয়ে টুনুর হাত কামড়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না। ঘোড়াদের তাবৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি সফল হয় ?

কী করবেন বিশ্বপতিবাবু ? তাঁর পিঠের উপর টুনু, এবং টুনুর সঙ্গে ওতোপ্রতো হয়ে—প্রায় পৃথ্বীরাজ আর সংযুক্তার মতই (ঐতিহাসিক ছবিতে হুবহু ঠিক যেমনটি দেখা যায়)—একেবারে অব্যবহিত ভাবে বিজড়িত শ্রীমতী বেণু। ওজনে অবশ্য খুব বেশি নয়, কিন্তু প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশি ! বিশ্বপতিবাবু এবার পিঠ নাড়তে শুরু করে দিলেন, পছন্দসই সওয়ার না পেলে সব ঘোড়াই সাধারণত যা করে থাকে। এমনকি ওদের ধরাশায়ী করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে নিজের পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক রকম ভূমিকম্পই লাগিয়ে দিলেন শেষটায়।

টুনুদের কিন্তু ওস্তাদ অশ্বারোহীই বলতে হবে, ঘোড়ার দুর্ব্যবহারে ওরা ভড়কায় না। হেলে পড়ে, না হয় দুলতে থাকে, পড়ো-পড়ো হয় পর্যন্ত, কিন্তু ভূমিসাৎ হয় না কিছুতেই। সুবিধে করতে না পেরে, বিশ্বপতিবাবু অগত্যা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন—ঘোড়াদের অব্যর্থ অস্ত্র। পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে তিনি সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন···অন্য উপায় না দেখে অগত্যা।

ঘোড়ার বেচালের মুখে টুনু কান ছেড়ে কামিজ ধরে ফেলেছিল, ফলে ইউয়িং কোম্পানির অমন দামী জামাটা ঘাড় থেকে বরাবর দুফালি হয়ে নেমে এসেছে, টুনুর নামার সঙ্গে সঙ্গেই। এবং বিশ্বপতিবাবুর প্রতিক্রিয়া হয়েছে টুনুর পিঠে, শ্রীমতী বেণুর শ্রীহস্তে। বেণুও দাদার জামাটা ছিঁড়তে পেরেছে একই সময়ে।

বিশ্বপতিবাবুর কামিজে নিজের কীর্তি দেখে টুনুর লজ্জা হয়, সে নিজের জামার বিচ্ছিন্ন দুরবস্থা দেখিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। বিশ্বপতিবাবু টুনুর দ্বিধাগ্রস্ত শার্ট দেখেন, অনাবৃত পিঠও দেখতে পান। অস্তায়মান সূর্যালোকে সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠদেশ—গোলাপী গায়ের রঙ! বিশ্বপতিবাবুর বিস্ময় লাগে। ভগবান নিজের হাতের জ্বলজ্বলে পোশাক পরিয়ে ওকে পাঠিয়েছেন, তার ওপরে জামা পরা ওর বাহুল্যমাত্র! এমনকি ইউয়িং কোম্পানির জামাও। খালি গায়েই ওর আরো খোলতাই। বিধাতার স্বহস্ত রচনা ওর সর্বাঙ্গে ওতোপ্রোতো—হীরে-জহরতের পোশাকও তার সঙ্গে খাপ খায় না। বিধাতার নিজের হাতের দর্জিগিরির কাছে কিছু লাগে নাকি? অচিন্ত্যনীয় এবং অনির্বচনীয় এহেন পরমাশ্চর্য দেখে বিশ্বপতিবাবু তো বিস্ময়াবনত হয়ে পড়েন—মুহূর্তের মধ্যেই।

বিশ্বপতিবাবু নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখতে পান না, কিন্তু তাঁর আবলুস বিনিন্দিত রঙের সঙ্গে তাল রেখে, সেটা কেমন খোলতাই হয়েছে আন্দাজ করা শক্ত হয় না তাঁর পক্ষে। বিশ্বের লজ্জা বিশ্বপতিবাবুর পিঠে ভারী হয়ে ওঠে—বিশ্বপতির অর্ধনগ্ন পিঠে। জীবনে এই প্রথম নিজের জন্য তিনি দুঃখবোধ করেন—ষোলো টাকা সেরের পটল খেয়েও, অমন বহুমূল্য মোটরে চেপেও, নিজেকে তাঁর নগণ্য মনে হয় আজ। একটুকরো সোনার কাছে একগাদা লোহার মতই অকিঞ্চিৎকর বোধ হতে থাকে।

ততক্ষণে বেওয়ারিশ মোটরকারটা নজরে পড়েছে টুনুর। সে এক ছুটে দৌড়ে গেছে তার কাছে।

'কার গাড়ি? তোমার?'

বিশ্বপতিবাবু উদাস মুখে ঘাড় নেড়েছেন: 'কে জানে কার!'

'বেণু আয়, ঠেলি এটাকে। তুমি ঠেল না কেন, ভদ্রলোক? কেউ তো নেই এখানে, বকবে না কেউ!'

তাঁরা তিনজনে মিলে মহা উৎসাহে মোটরটা ঠেলতে শুরু করেছেন। এবং কী আশ্চর্য, ঠেলেও নিয়ে চলেছেন, বেশ অনেক দূর পর্যন্তই। ঠেলাগাড়ির মতো হেলাভরেই নিয়ে চলেছেন। বিশ্বপতিবাবুর আজ আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। টুনু এবং বেণুর সৌজন্যে, নেহাৎ আজে-বাজে নামমাত্র অশ্বই তিনি হননি, সেই সঙ্গে সত্যিকারের অশ্বশক্তিও সাক্ষাৎ অর্জন করেছেন। নইলে অত বড় গাড়ি তিনি ঠেলতে পারেন, ঘুণাক্ষরেও তা কোনোদিন তাঁর আশঙ্কার মধ্যে ছিল না।

মোটর-চালনা সাঙ্গ হলে বেণু বলল: 'সন্ধে হয়ে গেল ছোড়দা, বাড়ি যাবি নে?'

টুনু বলল : 'কালকে তুমি এসো আবার। কেমন, আসবে তো? কাল তোমাকে হাতি বানাবো।'

টুনুর জবাবে বিশ্বপতিবাবু কেবল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেন। তার মানে, বয়েই গেছে আমার হাতি হতে। ওদের আস্পর্ধা দেখে বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরে না। আগামী হাতিত্বের সম্ভাবনাতেও তেমন উল্লসিত হতে পারেন না। বাক্যস্ফূর্তি তো গেছেই, মনের স্ফূর্তিও তাঁর চলে যায়।

বিশ্বপতিবাবু বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে মাঠ ভাঙতে শুরু করেন। কোন দিকে যে চলেছেন তাঁর খেয়াল থাকে না। তাঁর একটা মোটর বানচাল, এবং আর একটা সদ্য আসন্ন, সে কথাও তিনি ভুলে যান। চেক-বই পকেটে থেকেও তিনি আজ নিঃস্ব, অতি বিস্ময়ের ভারে মুহ্যমান!

বাস্তবিক, কী ভয়ানক এই সব ছেলেমেয়ের দল। কী বিভীষিকা এরা পৃথিবীর! এদের জন্য কী না করা যায়, কী যে না হওয়া যায়! হাতি কিম্বা ঘোড়া হওয়া তো সামান্য কথা, হয়ত চেষ্টা করলে, জলহস্তীও হওয়া যায় এদের খাতিরে। এদের আওতায় থাকবার জন্য কোনরকমে টিকে থাকাটাই চমৎকার, কায়ক্লেশে বেঁচে থাকাও বাঞ্ছনীয়, দুঃখের মধ্যেও যেন সুখের বিষয়! এদের জন্যই চার পয়সা সেরের পটল খেয়েও জীবিকা নির্বাহ করে পৃথিবীর লোক। সস্তা জামা গায়ে, কিম্বা বিনা-জামাতেই জীবদ্দশা কাটিয়ে দেয়। বিস্ময়াতুর বিশ্বপতিবাবুর সবই যেন কিছু কিছু বোধগম্য হতে থাকে এখন!

হ্যাঁ, অশ্ব-হওয়া আর এমন কি। উঠে-পড়ে লাগলে, হয়ত কষ্টে-সৃষ্টে উটও হওয়া যায় এদের অজুহাতে, এদের পৃষ্ঠে ধারণের পরম পরিকল্পনায়। অন্যের কথা কি, বিশ্বপতিবাবু নিজেই হতে পারেন। কাল যে তিনি এ মাঠে আসবেন না, পা-ই বাড়াবেন না আর এধারে, ওইসব রাক্ষুসে ছেলে-মেয়ের ছায়াও মাড়াবেন না, এমন গ্যারাণ্টি তিনি দিতে পারেন না কাউকে। না, নিজেকেও নয়। বিশ্বপতিবাবু ক্রমশই বেশি বিস্ময়াপন্ন হয়ে পড়েছেন, নিজের সম্বন্ধেই বেশি রকম আরও। এমনকি, কাল যদি আবার তিনি ঘোড়া হবার সুযোগ পান, তাহলে আজকের চেয়ে ঢের ভাল ঘোড়াই তিনি হতে পারবেন। কালকে তাঁর গতিবেগ আরো ক্ষিপ্র, আরো নিরুদ্বেগ, এবং আরো খরতর হবে এবং চিঁহিহিটাও তিনি আশানুরূপ করতে পারবেন, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস। বেশি কথা কি, কানকেও তিনি আমল দেবেন না কালকে; প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করবেন চাইকি!

চারিদিক তাকিয়ে দেখে সন্ধ্যার আবছায়ায়, মাঠের নির্জনতার মধ্যে, বিশ্বপতিবাবু অনেক বিবেচনা করে আবার চতুষ্পদ হয়ে পড়েন অকস্মাৎ। একাকী, এখন থেকেই, রীতিমত রিহার্সাল দিতে শুরু করে দেন তিনি।

চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ—চ্যা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ!!! তাঁর হ্রেষা ধ্বনিটাও যেন ঠিক হর্ষধ্বনির মতই বোধ হয়। একটুও অস্বাভাবিক নয়, রীতিমতন অশ্বভাবিক।

———

সকালবেলা বিছানা ছেড়েই, হাত-মুখও ধুইনি, অসমাপ্ত উপন্যাসটার উপসংহারে উঠে পড়ে লেগেছি। প্লট কথাটার অর্থের মধ্যেই একটা চক্রান্ত আছে, উবে যাওয়ার, উধাও হবার, অপর কারো খপ্পরে পড়ে খোয়া যাবার ইঙ্গিত উহ্য রয়েছে যেন, যদি সময়মত আগিয়ে গিয়ে বাগিয়ে না রাখো তাহলে চট করে উনি সটকে পড়েছেন কোন দিকে।

অতএব বিছানা ছেড়ে প্লটের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছি। এমন সময়ে, হাফপ্যাণ্টপরা একজন হুড়মুড় করে টেবিলের কাছে এসে হাজির।

'মিস আইভি আপনাকে ডেকে দিতে বললেন। শুনছেন মশাই?'

শুনতে না শুনতেই ফ্রকপরা আরেকজন ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে, 'আইভিদি একবারটি ডাকছেন আপনাকে।'

মিস আইভি আমার ক্ষুদ্রকায় পাড়াপড়শিদের অন্যতম নন, দস্তুরমতন একজন শিক্ষয়িত্রী, এই বৎসরে কলেজ থেকে বেরিয়ে এক মেয়ে ইস্কুলে ঢুকেছেন। আর বাসা নিয়েছেন আমাদের পাড়ায়, আমারই পাশের বাড়ি মেয়েদের বোর্ডিং-এ।

কাজেই ডাক পেয়ে উঠতে হলো।

প্লট উবে যায় যাক, ওঁকে উপেক্ষা করা যায় না তো।

তাছাড়া মাস্টারদের প্রতি আমার চিরকালের ভীতি, তা সে মেয়ে মাস্টারই কি আর ছেলে মাস্টারই কি। নাম শুনলেই কাঠ হয়ে যাই, কেমন ঘাবড়ে যাই ভয়ানক। ওই জন্যেই বোধ হয়, আর এজন্মে ইস্কুল-কলেজের চৌকাঠ ডিঙোনো গেল না আমার। কি করে যাবে? ইংরিজি আর অঙ্ক, ইতিহাস আর ভূগোল

সবতাতেই আমি কাঁচা, বিশেষ করে অঙ্কটায় তো বেধড়ক। আর এই বাঙলাতেই কি খুব সুবিধা করতে পেরেছি?

আমার তো মনে হয় না।

অতএব, ভয়ে ভয়েই উঠে পাড়ি। কি জানি, এক্ষুনি যদি আইভি দিদি এসে পড়ে আমার বানান ভুল কাটাকাটি করতে শুরু করেন, আমাকে মার্জনা না করে আমার লেখার পরিমার্জনায় লেগে যান, ভাষাকে আরো সাধু আর সুস্বাদু করতে সচেষ্ট হন, অসমাপ্ত গল্পের আগাপাশতলা শুধরে দেন সব? তাহলেই তো গিয়েছি! হয়ে গেছে আমার!

আমার ঘরে অবিশ্যি বেঞ্চি নেই, কিন্তু তাতেই বা কি ভরসা? টেবিল তো রয়েছে। আর ঐ ছোট্ট টেবিলের ওপরে এই ভারী বয়সে আমি···আবার যদি দণ্ডায়মান···? না, না, কিছুতেই না। ভাল করে ভাবতে না ভাবতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হয়ে গেছি।

'এই যে মিস সেন। ডেকেছেন আমাকে?' রুদ্ধশ্বাসে গিয়ে বলি।

শ্রীমতী আইভি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, একটু ডেকেছিলাম। আপনি হন্তদন্ত হয়ে এসেছেন দেখছি। হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি কিনা আজ। সামার ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে গেল! বোর্ডিং-এর মেয়েরা সবাই চলে গেছে, কালই বাড়ি চলে গেছে সব। আমিও চেঞ্জে যাচ্ছি ছুটিতে।'

'ও তাই নাকি? তা বেশ তো।'

এর বেশি কি বলব? ছুটি হয়েছে তো আমার কি? আমাকে ছুটোছুটি করানো কেন? এই সকালে এমন উদ্‌ভ্রান্ত করে এইভাবে আমার গল্পের কবল থেকে সবলে ছিন্ন করে এনে উদ্বাস্তু করা? সামার ভ্যাকেশনের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? বিন্দুবিসর্গও আমি ঠাউরে উঠতে পারি না।

'চেঞ্জে যাচ্ছি কিনা' আমতা আমতা করে শুরু করেন উনি।

'দেখুন' বাধা দিয়ে আমি বলি ঃ 'কলকাতা ছেড়ে কোথাও এক পা-ও যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সব কথা খুলেই বলছি আপনাকে। চেঞ্জে যেতে একদম ভাল লাগে না আমার। নড়চড়ার কথা ভাবতে গেলেই জ্বর এসে যায়। আমাকে যদি একতলা থেকে দোতলায় চেঞ্জে পাঠান তাহলেই আমি মারা পড়ব। তাছাড়া আমি হাত-মুখ ধুইনি। চা খাইনি পর্যন্ত।'

'না, না, আপনাকে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। সেজন্যে ডাকিনি। ডেকেছিলাম, একটা অনুরোধ ছিল···'

'বলুন, কি করতে হবে?'

'একটা অদ্ভুত অনুরোধ। কিছু মনে করবেন না যেন।'

'কিচ্ছু মনে করব না। বলেই দেখুন। আমাকে বলতে বাধা কি?'

'সিটি বুকিং থেকে কালই টিকিট কেনা হয়েছে। মালপত্র সব চাকরের সঙ্গে ইস্টিশনে পাঠিয়ে দিয়েছি সকালে। দরজায় তালা লাগানো হয়ে গেছে। এখন ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লেই হয়। কেবল—'

কেবল বলে কী বলবার জন্য তিনি থামেন।

আমাকেই ট্যাক্সি ডাকতে হবে নাকি? সেইজন্যেই কি ডাকা হয়েছে এত তাড়া দিয়ে? এবং দরজায় তালা লাগিয়ে? ব্যাপারটা ক্রমশই একটু যেন ট্যাকসিং হয়ে পড়ছে মনে হয়।

'রিকশা করে গেলে হয় না? একটা রিকশা ডেকে দিই বরং?'

'উঁহু, রিকশা নয়! আপনাকে দয়া করে আমার বাড়ির মধ্যে একবারটি সেঁধুতে হবে। সেই কথাই বলছিলাম।'

'বাড়ির মধ্যে? কিন্তু তালা লাগিয়ে দিয়েছেন তো।' আমি একটু আশ্চর্যই হই!

'হ্যাঁ, সেইজন্যেই ডেকেছি। তালা ভাঙা যাবে না তো। আর ওই বিলিতি চাবস্ ভাঙা সোজাও নয়। তালা না ভেঙেই, কষ্ট করেই, একটু সেঁধুতে হবে আপনাকে।'

'ও! চাবি হারিয়েছেন বুঝি? না, ভেতরে ফেলে এসেছেন ভুলে?' ব্যাপারটা তলিয়ে দেখি: 'কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? বাইরে এসেই তো তালা লাগাতে হয়েছে? তবে? এর মধ্যেই এইটুকুর ভেতর আবার চাবি হারালেন কোথায়?'

সে কথার জবাব না দিয়ে তিনি বলেন—'চাবির কথা রাখুন! বাড়ির দেয়ালের খাঁজ বেয়ে বেয়ে উঠে—উঠতে পারবেন না আপনি? তেতলার কোণের কারনিস ঘেঁষা ঐ জানালাটা খুলে ফেললেই ভেতরে ঢোকা যাবে। ও জানালাটায় শিক লাগানো নেই। খুব শক্ত হবে কি আপনার পক্ষে?'

'না, এমন আর শক্ত কি?' একটু ম্লান হেসে বলি: 'তবে একটা কথা। খুব জরুরি জিনিস ভেতরে ফেলে এসেছেন নাকি? এমন কিছু যা না হলেই চলে না? তেমন যদি না হয় তবে—যদি এমনিতেই চলে যায় তাহলে—চেঞ্জের পর ফিরে এলে তখনই না হয় চেষ্টা করে দেখা যেত। উঠে পড়ে লাগা যেত তখনই। কি বলেন?'

'চেঞ্জের পর ফিরে? তখন? তখন কেন?' শ্রীমতী আইভির সন্দিগ্ধ স্বরই শোনা যায় যেন!

'এর মধ্যে তাহলে একটা লাইফ ইনসিওর করে নিতে পারতাম।'

'আপনার যেমন কথা! তেতলা থেকে পড়লে কেউ মারা পড়ে না। বড়জোর খোঁড়া হয়ে যেতে পারে।' মিষ্টি করে একটুখানি হেসে আইভি বলেন: 'তা, খোঁড়া হতে এত ভয় কিসের? বিয়ে-থা তো করেননি, করতে যাচ্ছেনও না, কেউ মেয়েও দিচ্ছে না আপনাকে! তবে?'

'দেখুন, পায়ে খোঁড়া হতে আমি তেমন ভয় পাইনে। কোনদিন দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন হবার দুরাকাঙ্ক্ষা নেই আমার। পা থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? আসলে পায়ের বদলে কাঠের পা বরং ভালই। কাঠের পায়ে বাত ধরবার ভয় নেইকো। বেশি বয়সে কোনো বাতচিত হবার কথাই নেই বলতে গেলে। বাতে চিত হয়ে পড়ে থাকতে হবে না। কিন্তু—কিন্তু লিখেটিখেই পেট চালাতে হয় কিনা। যদি বেকায়দায় পড়ে গিয়ে হাতে খোঁড়া হয়ে যাই?'

'সাবধানে উঠবেন, পড়বেন কেন? চোরেরা ওঠে কেমন করে?' শ্রীমতী আইভির অনুপ্রেরণা পাই।

পাবা মাত্রই, অন্তরের মধ্যে আপনাকে প্রেরণ করি। মনের মধ্যে হাতড়াই। চুরি করিনি যে এমন নয়, না, নিজের প্রতি এতবড় দোষারোপ করতে পারব না, কিন্তু দেয়াল বেয়ে কখনো চুরি করেছি কিনা, কিছুতেই স্মরণ করতে পারি না।

'বেশ, দেয়াল বেয়ে উঠতে আপনার আপত্তি থাকে'—শ্রীমতী আরো সহজ পথ বাতলান: 'ড্রেনের পাইপ ধরে উঠতে পারেন। সেইটাই সোজা বরং। পাইপ ধরে ধরে কারনিসটার কাছে গিয়ে ভেতরে হাত গলিয়ে জানালাটা খুলে ফেলুন, তারপর ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি ধরে নেমে এসে খিড়কির দরজাটা খুলে দিন আমায়।'

খুব সহজ কাজ। আইভির কথা জলের মতো তরল।

'ভারী ভীতু দেখছি আপনি!' আইভির অনুযোগ শুনতে হয়।

তা বটে! সেই রকম আমারও সন্দেহ। নিজের সম্বন্ধেই বলতে কি ভারী সংকোচ বোধ করি। মনের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চয়ের প্রয়াস পাই। গীতার সেই মারাত্মক বাক্যটা—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—মনে মনে ঝালিয়ে নিই একবার।

নৈতৎ ত্বয্যু পপদ্যতে!—আওড়াতে না আওড়াতে পা উদ্যত হয়ে ওঠে। কাপুরুষতা কাঁপতে কাঁপতে পালায়!

ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!

পরন্তপ তৎক্ষণে পাইপ ধরে উঠে পড়েছেন। বেশ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়েই উঠেছেন, তা আর বলতে হবে না।

পাইপ বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে উঠি। কখনো দেওয়ালের খাঁজে পা পড়ে, নিজেকে আটকে নিয়ে একটু জিরিয়ে নিই, কখনো খাঁজ-ফাঁজ কোনো কিছুর খোঁজ পাইনে, দেওয়ালের গায়ে পা দিয়ে হাতড়াতে থাকি, অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে হয়ত কখনো খাঁজের বদলে পাইপেরই একটা গাঁট পা দিয়ে হাতিয়ে ফেলি। এদিকে হাত অবশ হয়ে প্রায় বেহাত হবার গতিক। জরাজীর্ণ পাইপ কোনো উপায়ে একবার হাতছাড়া হলেই পদস্খলনের আর কিছু বাকি থাকে না।

হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে যে সব পাপ করেছি, বেশ বুঝতে পারি এতদিনে তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। বাড়ির সঙ্গে বাড়াবাড়ি আর কাকে বলে?

'অতো দেয়াল ঘেঁষবেন না'—করুণাময়ী আইভির কোমল কণ্ঠ কানে আসে: 'দেয়ালে ঠেস দেবেন না অতো। দেখছেন না কি রকম শ্যাওলা জমেছে দেয়ালে? জামাকাপড় খারাপ হয়ে যাবে যে।'

কিন্তু দেয়াল না ঘেঁষে দাঁড়াবো কি করে? শ্যাওলারা সব আমার ন্যাওটা হয়ে পড়ছে তা টের পাচ্ছি বেশ, কিন্তু এ অবস্থায় দেয়ালের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা আমার পক্ষে সুদূর পরাহত। হ্যাঁ—একদম সুদূর পরাহত, সুদূর পরাহতই যাকে বলা যেতে পারে। অক্ষরে অক্ষরে হুবহু, একেবারে অনতিদূরে মুহূর্তেই, এক দমে এবং একমাত্র কদমে, সুদূরে মাটিতে পড়ে আহত হবার ধাক্কা!

'আমি তো দেয়াল ছাড়তে চাচ্ছি কিন্তু দেয়াল আমাকে ছাড়ছে কই?' সকাতর কণ্ঠে আমি জানতে চাইঃ 'দেয়াল বাদ দিয়ে উঠব কি করে?'

'আহা, একটু আলগা হয়ে উঠুন না। আকাশের দিকটায় হেলান দিয়ে, তাহলেই হবে।'

'আকাশে ভর দিয়ে উঠতে বলছেন? আকাশে?' আইভির অনুজ্ঞায় আমি ঈষৎ বিস্ময় বোধ করিঃ 'না, আকাশ ঘেঁষে ওঠা আমার পক্ষে অসাধ্য। এমন কি, আকাশে ঠেসান দেয়া পর্যন্ত অসম্ভব। একটুক্ষণের জন্যও। হ্যাঁ—'

আমার পরিস্থিতি, কিম্বা উপরিস্থিতি বললেই বোধ হয় যথার্থ হবে—আইভির ঠিক বোধগম্য হয় না। নিচে থেকে সে চেঁচাতে থাকেঃ

'কী যা তা বলছেন! অমন লম্বা পাইপ। এতখানি ফাঁকা আকাশ। জামাকাপড় সামলে ওঠা যায় না নাকি?'

এমনভাবে বলে যেন সদাসর্বদা এই পথেই ওর যাতায়াত। আমি আর কিছু বলি না, কেবল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিইঃ 'জামাকাপড় মাথায় থাক, নিজেকে সামলে নিয়ে যদি উঠতে পারি, সেই আমার যথেষ্ট। এমনকি এখান থেকে এখন নিরাপদে নেমে যেতে পারলেও আর উঠতে চাই না।'

'এই তো দোতলায় পোঁছে গেছেন! এইবার খুব সহজেই উঠতে পারবেন। আর কষ্ট হবে না আপনার! আর একটু গেলেই জানালার কারনিসটা!'

আর একটু গেলেই! তাই নাকি? সেই শ্যাওলা-সংকুল পাইপ-জটিল পরিত্রাহি অবস্থাতেই যতটা সম্ভব, ঘাড় বেঁকিয়ে, কাত হয়ে দেখবার চেষ্টা পাই, কিন্তু উক্ত কারনিসদুষ্ট জানালাটা মাটি থেকে তখন যতটা দূরে ছিল, এখনও ঠিক ততটা দূরেই রয়েছে বলে বোধ হতে থাকে।

'আচ্ছা, দোতলার একটা জানালা খুলে ঢুকলে হয় না? হাতের কাছাকাছি আছে যেটা এখন?' আমি প্রস্তাব করি।

'উঁহু! ওগুলোয় সব লোহার শিক দেয়া। তেতলার জানালাটা ছাড়া আপনার সুবিধে হবে না।'

'তাই তো—ভারী মুশকিল তো!'

আমার পা আর উচ্চবাচ্য করে না; হাতও যেন অবশ হয়ে আসে। আমি স্থগিত হয়ে পড়ি।

'একি, থেমে গেলেন যে! করছেন কি, ট্রেনের বেশি দেরি নেই আমার।' আইভি আমাকে তারস্বরে জানাতে থাকেন।

'একটু ভেবে নিচ্ছি।'

সংক্ষেপেই জবাব দিই। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই আমার ভাবনার মধ্যে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।

'এই কি আপনার গল্পের প্লট ভাববার সময়?' আইভির আর্তনাদ ওঠেঃ 'আমার ট্রেন ফেল করিয়ে দেবেন দেখছি।'

ট্রেন? ট্রেনের কথা মোটেই ভাবছিনে! নিজের ফেল বাঁচাই কি করে সেই এখন সমস্যা। মাস্টারদের হাতে পড়লে নিস্তার নেই, ফেল করতেই হবে, তা

মেয়ে মাস্টারই কি আর ছেলে মাস্টারই কি, তাদের কাছ থেকে পাশ কাটানোই দায়।

'আমি বলি কি, মিস্ আইভি, তোমার এই পাইপ—সত্যি কথা বলব? মানুষের যাতায়াতের পক্ষে তেমন খুব প্রশস্ত নয়। উপাদেয় তো একেবারেই বলা যায় না।'

'পাইপ বেয়ে কখনো ওঠেননি কিনা তাই একথা বলছেন। প্র্যাকটিস থাকলে এমন কথা বলতেন না কখনো। বাড়ির মধ্যে যাবার ড্রেন-পাইপই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। কত মানুষ দুদ্দাড় করে পাইপ বেয়ে উঠে যায়, পড়েছি বিস্তর বইয়ে! এমনকি সদর দ্বার খোলা পেয়েও পাইপটাই তারা বেশি পছন্দ করে। পাইপ পেলে দরজার দিকে ফিরেও তাকায় না। পড়েননি আপনি?'

'না তো! কবে আর পড়লাম? বইটই আমি বেশি পড়িনি! লেখাপড়ায় আমার ভারী ভয়।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি বলিঃ 'উৎসাহই পাইনে, বলতে গেলে। তা ছাড়া লিখে আর ঘুমিয়েই কুলিয়ে উঠতে পারিনে, পড়ব কখন?'

যাক, আইভির কাছে একটা নতুন জিনিস শেখা গেল আজ! পুঁথিগত পাইপ-গতির রহস্য। সেইখানে, পাইপের উপর দাঁড়াবার ভান মাত্র করে—কেননা নিখুঁতভাবে বলতে গেলে হাতের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল আমায়—সেই ভাবে দাঁড়িয়ে ছোটবেলায় বেঞ্চিতে দাঁড়ানোর মর্যাদা বাঁচিয়ে, তটস্থ অবস্থায় নতুন শিক্ষা লাভ হতে থাকে আমার।

'বেশ, চেঞ্জ থেকে ফিরে এসে দেব আপনাকে খানকতক।' মিসেস আইভি আশ্বাস দেন ঃ 'পড়ে দেখবেন।'

'পাইপ থেকে ফিরতে পারলে পড়ব বইকি!' আমিও ভরসা দিই, এবং অভিযান শুরু করি। ঝুলনযাত্রাকে ধারাবাহিক করে অবশেষে আমি তেমাথায় এসে হাজির হই। পাইপের তেমাথায়। সেখান থেকে, একটা সটান ঊর্ধ্বে, আর দুটো, তেরছা হয়ে ছাদের দুদিকে গিয়ে পৌঁছেছে।

'এইবার কোন পথে যাই!' জিগ্যেস করি আমি। আইভির এবং আমার নিজের উদ্দেশেই প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

'সোজা ডানহাতি পাইপ ধরে চলে যান। তাহলেই জানালার কাছে গিয়ে পৌঁছবেন। তারপর একটু এগোলেই সেই কারনিশ!'

ডানদিকে পাইপের দৈহিক অবস্থা দেখে আমার আশঙ্কা হতে থাকে। সুস্থ সবল বলতে যা বোঝায়, সেরকম আখ্যা কিছুতেই দেয়া যায় না সেই পাইপকে। খুব যে হৃষ্টপুষ্ট এমনও বলা চলে না। তেমন শক্তসমর্থ নয় বলেই আমার সংশয় হয়। আদৌ ওতে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হবে কি না আমি ভাবতে থাকি।

যে রকম ওর আকার প্রকার তাতে ওর ওপর নির্ভর করা যাবে কি না কে জানে। ও কি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে? হয়ত ওকে বিশ্বাস করেই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে আমায়। শেষ নাভিশ্বাস।

'ওকি যুঝতে পারবে আমার সঙ্গে?' ওর প্রতি আমার অনাস্থা জ্ঞাপন করি: 'যা ওর চেহারা!'

কিন্তু আইভির তাগাদা এদিকে।

'একদম নিরাপদ! কিচ্ছু ভয় নেই।' নিচের থেকে উচ্চস্বরে জানান দেয় আইভি। বহুবারের ভ্রমণ-কাহিনীর প্রবীণ অভিজ্ঞতা ওর কণ্ঠস্বরের নিঃসংশয়তার ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হতে থাকে।

কতক্ষণ আর সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান থাকা যায়? দুর্গা বলে ঝুলে পড়ি এবং বিশেষণের অযোগ্য সেই পাইপের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে, ঝুলতে ঝুলতে, তেতলার কারনিসের দিকে এগুতে থাকি। প্রাণ এবং পাইপ এক সঙ্গে হাতে করে যাই।

'বরাবর চলে যান। কোথথাও আপনার আটকাবে না। আমি বলছি!'

তা বটে। কোথায় আর আটকাবে। কেই বা আটকাচ্ছে? নাঃ, আটকাবার কোথাও কিছু নেই! মুখস্থ পড়ার মতো অবলীলায় গড়িয়ে গেলেই হলো।

আর উচ্চবাচ্য করি না। কম্পিত কলেবরে দুরু দুরু বক্ষে এগোই। আমার তাড়সে, ড্রেন পাইপটা একটু দমে যায় যেন! আমিও দমি।

পাইপের বিপথে নিজেকে চালিত করি, তেতলার দিকেই বটে, তবু কেন জানি না, তেতলা আর নিমতলা, খুব যেন কাছাকাছি, প্রতি হস্তক্ষেপেই এমনই যেন মনে হতে থাকে, এবং সেই অনিষ্টকর ঘনিষ্ঠতার দিকেই অম্লানবদনে এগিয়ে চলি। তেতলায় মাথা ঠুকবার আগেই নিমতলায় গিয়ে ঠেকব কিনা কে জানে।

এক জায়গায় এসে ড্রেন পাইপটা মড় মড় করে। আমি একটা চীৎকার ছাড়ি! পাইপের মতই লম্বা এক চীৎকার!

'কী হলো—কী হলো আপনার?'

'আইভি! আইভি!—কিছু মনে কোরো না! লক্ষ্মী বোনটি আমার! কাউকে দিয়ে আমার বিছানাটা নামিয়ে নিয়ে, ঠিক আমার নিচেই এনে পাতো দেখি!'

আইভি অবাক হয়ে যায়: 'বিছানা! কী যা তা বকছেন!'

আইভিকে আপনি বলতে বাধে আমার! মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা রক্ষা করা কঠিন, আদবকায়দা বজায় রাখা ভারী শক্ত তখন। নিতান্ত পরও—অত্যন্ত শত্রুও সেই মারাত্মক মুহূর্তে ভারী আত্মীয় হয়ে ওঠে, অন্তত সেই রকম বলে ভ্রম হয়—সর্পতে রজ্জুভ্রম আর কি! যদিও তার কয়েক দণ্ড পরেই একান্ত আত্মীয়ও একেবারে পর ছাড়া কিছু নয়। আইভিকেও আমার ভয়ানক আপনার বলে বোধ হতে থাকে তখন।

'একটা বিছানায় কুলোবে না, আইভি! পাড়ার সব বিছানা এনে যোগাড় করো! করে পুঁজি করো নিচেটায়। ঠিক আমার নিচেই! উঁচুটাতো কম নয়, দেখছই! পড়লে কিছু কম লাগবে তবু।' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলি।

'পাইপই ভেঙে পড়ল বোধ হয়। দেরি নেইকো আর। সম্ভবত আর বাঁচা গেল না। এ যাত্রাই খতম্।'

'পড়ছেন কোথায়? দিব্যি আটকে রয়েছেন তো।'

'অ্যাঁ! আটকে রয়েছি? তাই নাকি? তাহলে পাইপ ভেঙে পড়ে যাইনি এখনো?' এতক্ষণে আমার নিঃশ্বাস পড়েঃ 'পাইপটা ভাঙো ভাঙো হয়েছিল যেন। মর্মর ধ্বনি শুনলাম কিনা।'

'কানের ভ্রম। ভুল শুনেছেন। দিব্যি লাগানো রয়েছে পাইপ—দেওয়ালের সঙ্গে আস্ত।'

আইভির আশ্বাসে সত্যিই ভরসা পাই এবার! মনে মনে ওকে ধন্যবাদ জানাই। ওকে এবং পাইপকে, দুজনকেই।

'কিন্তু যাই বলুন, মিস আইভি! পাইপগুলোয় গলদ আছে। তৈরি করবার সময়ে জল নামানোর দিকে যতটা লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, মানুষ তুলবার দিকে ততটা নজর দেয়া হয়নি। এই পাইপটার কথাই ধরুন না কেন। জল নামানোর পক্ষে যথেষ্টই, এমন কি, একে ওস্তাদও বলা যায়, কিন্তু মানুষ তুলতে একেবারেই কোন কাজের না!'

'কতটাই বা আর। হাত তিনেক তো মোটে! আর একটু পা চালিয়ে গেলেই, ব্যস।'

পা চালিয়ে? পা? পা কোথায় দেখতে পেলেন মিস আইভি? পা তো কবেই ইস্তফা দিয়েছি। পাইপ পথে পা অপারগ। তবে কি আমার সামনের পা দুটোকেই, যাকে হাত বলেই ভ্রম করার কথা, মিস আইভি এভাবে কটাক্ষ করছেন? হাতের পদচ্যুতিতে প্রাণে লাগে, কিন্তু লাগলেই বা কি করব? হাতও আমার চলৎশক্তিরহিত।

'না, আপনি মাটি করলেন। গাড়ি আর পেতে দিলেন না দেখছি।' আবার শ্রীমতী আইভির ভয়ার্তনাদ।

আমার ভয় হয়। উনি এখানে পড়ে থাকলেন, আমি উপরে থাকলাম, আর ওধারে ওঁর মালপত্র, চাকরের সঙ্গেই কিনা কে জানে, চেঞ্জে চলে গেল বেবাক!

আবার আমাকে সামনের পায়ে জোর দিতে হয়। পেছনের হাত দুটোকে দেয়ালের খাঁজে লাগিয়ে পুনরুন্নতি লাভের প্রয়াস পাই।

অবশেষে পাইপ ফুরোয়, নিঃশেষ হয় এক জায়গায় এসে। আমিও নিঃশ্বাস ফেলে জানালাটাকে ধরে ফেলি। কারনিসের ওপর বসি পা ঝুলিয়ে। পা এবং হাতকে যথাস্থানে উপভোগ করি আবার। এতক্ষণ বাদে—যদিও খুব সংক্ষেপের মধ্যে—তবুও বসে বেশ আরাম পাই।

'এইবার জানালাটা খুলে ফেলুন ঝট করে।' আইভি আবার উত্তাল হয়ঃ 'ঝরকার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে দিন!'

কিন্তু হাত গলাই কোন ফাঁকে? যতই সাধি না কেন, একটা ঝরকাও হাঁ করে না, হাঁ করলে তো হাঁকড়াবো? ভেতর থেকে কে যেন ওদের চেপে রয়েছে। লোহার পাত মেরেই আটকানো কিনা কে জানে?

'খুলছে না যে!' করুণ স্বরে বিজ্ঞাপন দিই।

'খুলছে না? কী মুশকিল! ফ্যাসাদ বাধালেন দেখছি।' আইভির আইটাই ফুরোতে চায় না: 'আচ্ছা লোক তো আপনি!'

আবার আমি প্রাণপণে লাগি, ঝরকার সঙ্গে ঝটাপটি বাধিয়ে দিই—কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তা ছাড়া—কারনিসের কিনারায় বসে—ওই ভাবে কায়ক্লেশে থেকে—ঝরকার কি আর কিনারা করতে পারব? ওইটুকু জায়গার মধ্যে কতখানি গায়ের জোর ফলানো যায়? বসে থাকাই দায়, বলতে গেলে।

'উঁহু, এসব ঝরকা খুলবার নয়। ভারী অবাধ্য এরা।' এই বলে জবাব দিই। আইভিকে আর ঝরকাদের।

'তাহলে সিঁধকাঠি দিয়ে খোলে কি করে? তাহলে?' আইভির সাধাসিধে জিজ্ঞাসা।

এহেন ধারালো প্রশ্নে আমি কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। তাইতো, সিঁধকাঠি দিয়ে খোলে কি করে? চোরেরা কি আমাদের চেয়েও চোখা আর চালাক? ভদ্রলোকদের চেয়েও বেশি ওস্তাদ এসব বিষয়ে? কিন্তু হঠাৎ আমার রাগ হয়ে যায়। নিজেকে আমি আর সম্বরণ করতে পারি না। বলে উঠি: 'কি করে সিঁধকাঠি দিয়ে খোলে আমি জানব কি করে?' রীতিমতই রাগ হতে থাকে, সামলানো একটু শক্তই হয় আমার পক্ষে। আর তাছাড়া, সিঁধকাটি পাচ্ছিই কোথায় এখন?

হঠাৎ আমার মনে সংশয়ের ধাক্কা লাগে। খটকা জাগে কি রকম। ওর এই প্রশ্নটা—এই সিঁধকাঠির প্রশ্নটা একটু কেমন কেমন যেন না? আমাকেই ঘুরিয়ে একটু নাক দেখানোর মত নয় কি? ওর এই অমূলক প্রশ্নে—এই অন্যায় সন্দেহে আমার মেজাজ খিচড়ে যায়। আমি চেঁচিয়ে উঠি:

'তাছাড়া, তাছাড়া সিঁধকাঠির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আমি কি... আমি কি ...?'

আমি যে কী, আমি তা আর ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারি না। একটা অবান্তর ব্যাকুলতা আমার বুকের মধ্যে হুটোপুটি লাগিয়ে দেয়। কিন্তু ওর সন্দেহ ক্রমশ আমার মনে সঞ্চারিত হয়, আমার অন্তরেও ছায়াপাত করে। সামান্য ছায়া ঘন হয়ে ঘনীভূত হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে। আমিও নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করি।

এবং বেশ কাচুমাচু হয়েই বলি, বলে ফেলি এবার: 'তা ছাড়া সিঁধকাঠিটা সঙ্গে করে আনা হয়নি তো'—অনুতপ্ত কণ্ঠেই প্রকাশ করি যেন: 'বাসাতেই পড়ে রয়েছে। ভুলে ফেলে এসেছি।'

'তাহলে আর কি করবেন? ছুরি দিয়েই ঝরকাটা কাটুন তবে।' আইভি নতুন ব্যবস্থাপত্র বার করে।

পকেট হাতড়ে দেখি—অবশ্য, না হাতড়ালেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, ছুরি-টুরির ধার বড় ধারিনে, দাড়ি কামানো প্রাক্তন ব্লেডেই পেনসিল চেঁছেচি চিরদিন; তবু যাবতীয় সন্দেহভঞ্জন করে ফেলাই ভাল।

'না ! ছুরিও কাছে নেইকো !'

'ওঠবার আগে বলতে হয় । আমার কাছে ছিল ছুরি । এখন আবার ছুরি নেবার জন্য আপনাকে নেমে আসতে হবে । আরেকবার ।'

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মা দুর্গা, মা কালী, খোদাতাল্লা এবং মেরী মাতা প্রভৃতি আমার প্রিয়পাত্র সব দেবতার নাম স্মরণ করে নিই, তারপরে হাত পা ছেড়ে দিয়ে, পাইপ বেয়ে নেমে আসি সটান । উঠতে যতটা সময় লেগেছিল—তার চেয়ে ঢের কম সময় লাগে নামতে । তেতলা থেকে একতলা পর্যন্ত সারাপথে আমার স্মৃতিচিহ্ন ছড়াতে ছড়াতে আসি । কোথাও একটা বোতাম, কোনখানে আধখানা পকেট, কোথাও জামার একটু হাতা, কোথাও বা কাপড়ের একটুকরো, এবং পাইপের সব নিচের গাঁটটায় খানিকটা চামড়া । প্রায় আধ ইঞ্চিটাক ; আমার নিজেরই গায়ের ।

'এই নিন ছুরি । এবার উঠতে বেশি বেগ পেতে হবে না আপনাকে । এখন মুখস্থ হয়ে গেছে কিনা ! সহজেই উঠতে পারবেন এবার । কি করে পাইপ বেয়ে উঠতে হয় এখন বেশ বুঝে নিয়েছেন আপনি ।'

হ্যাঁ, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ! মনে মনে বলি ।

পুরো আধঘণ্টা লেগে গেল জানালা খুলতে আমার । পুরো আধঘণ্টার প্রাণান্ত পরিশ্রম । যাক্, খুলেছি, খুলতে পেরেছি শেষটায় ! নিচে, অব্যবহিত নিচেই, জনৈকা ভদ্রমহিলা না থাকলে, টার্জানের মতন পেল্লায় এক হাঁক ছাড়তাম !

বিরাট এক ডাক ছেড়ে দিগ্বিদিকে নিজের বিজয় ঘোষণা করে দিতাম । নিজের জয়ডঙ্কা ! গৃহপ্রবেশের চূড়ান্ত করেছি ।

পাল্লাগুলো ছাড়িয়ে, জানালার মধ্যে সবেমাত্র মাথা গলিয়েছি, কপালের ঘাম মুছেচি কি মুছিনি, শ্রীমতী আইভি বললে ?

'ভেতরে আসতে পারছেন না ? টপ্‌কে চলে আসুন !'

আওয়াজটা এত কাছাকাছি যে প্রথমে আমার মনে হলো শ্রীমতী আইভিও যেন ড্রেন পাইপ ধরে, আমার পেছনে পেছনে ধাওয়া করে প্রায় আমার আশেপাশেই এসে দাঁড়িয়েছেন ।

তার পরমুহূর্তেই তাঁকে দেখতে পেলাম ঘরের মধ্যিখানে !

'য়্যাঁ ! একি ?' আমি চম্‌কে যাই, দম আটকে আসে আমার ।

'ঘরের মধ্যে ঢুকলেন কি করে আপনি ? চাবি খুঁজে পেয়েছেন নাকি ?'

'চাবি তো হারায়নি', আইভি বলে—বেশ মর্যাদার সঙ্গেই বলে ঃ 'চাবি হারালো কখন ?'

'কি ? তার মানে ? তাহলে এত কাণ্ডকারখানা—এত হাঙ্গাম—এসব করা কেন ?'

'আমি চলে যাচ্ছি কিনা, আজ দুপুরের গাড়িতেই চলে যাচ্ছি । শিলং যাচ্ছি চেঞ্জে । বাড়ির মধ্যে সহজে সেঁধুনো যায় কিনা, কেউ ঢুকতে পারে কিনা, সিঁধ কেটে আসা যায় কিনা সিধে, সেইটে জানার দরকার ছিল আমার ।

সদরে তো তালা—কারুর সাধ্যি নয় খোলে, জানালাও সব নিরাপদ, কেবল আমার ঘরের এইটাতেই গরাদ দেয়া নেইকো। আমার এই জানালাটা নিয়েই ভাবনা ছিল ভীষণ। কিন্তু যাক, গরাদ না থাকলেও খড়খড়ি ফাঁক করে ছিটকিনি খুলে জানালা গলে সেঁধুনো যত সোজা বলে ভাবা গিয়েছিল, আসলে দেখা যাচ্ছে কাজটা তত সহজ নয় আদৌ। আপনার মতন এক্স্‌পার্ট লোককেও যখন হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে। আর আপনি ছাড়া—না, সিঁধ কাটার কথা বলছিনে—তবু আপনি ছাড়া এ-পাড়ায় আর এমন দুঃসাহস কার আছে বলুন? এ-পাড়ায় আপনিই তো কেবল গল্প লেখেন? এবার আমি, হ্যাঁ, অনেক নিশ্চিন্ত মনে চেঞ্জে যেতে পারব। খুব ধন্যবাদ আপনাকে···আপনি যে আমার জন্যে এতখানি ত্যাগ···

তারপর শ্রীমতী আইভি যে আরো কী কী বললেন, তার একটা কথাও কানে এল না। ততক্ষণে আমি নিজের আরো ত্যাগ স্বীকার করেছি—মাথা ঘুরে তিন পাক বেয়ে কী করে যে নেমে এসেছি মাটিতে, নিজেই আমি জানিনে!

ডিটেকটিভ গল্পের জোঁক সে—পড়াশুনার ফাঁকে যে অবকাশ পায় ডিটেকটিভ বই পড়ে সে কাটায়। তাছাড়া আর কোন ঝোঁক তার নেই, না ক্যারাম খেলার, না ঘুড়ি ওড়ানোর—না অন্য কোন খেলাধুলোর। তার জীবনের আকাঙ্খাই হোল যে বড় হয়ে ডিটেকটিভ হবে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে যত সব ভয়ানক চোর, ডাকাত, খুনে—তাদের গ্রেপ্তার করবে। তার ধারণা, ইতিমধ্যেই তার মাথা এমন পেকেছে যে এখুনি সে বড় বড় চুরি, ডাকাতি, খুনের কিনারা করতে পারে—যদি এসবের রহস্যভেদের ভার তার ওপর দেওয়া হয়! কিন্তু সে যে এসব পারে সে সম্বন্ধে আর কারোই ধারণা হয় না, তার কারণ বোধহয় তার অল্প বয়স। নাঃ, বড় না হলে কিছুই হচ্ছে না ক্ষুণ্ণমনে এই কথা প্রায়ই ভাবে আলেকজান্ডার।

কিছুদিন থেকে তাদের পাড়ায় চুরি লেগেই আছে—ছোটখাট ছিঁচকে চুরি নয়, রীতিমতন সিঁধ কেটে চুরি। ফি হপ্তাই একটা-না-একটা বাড়িতে হচ্ছে—এই হুদ্দার থানার দারোগা-পুলিস হিমসিম খেয়ে গেল, একটারও কিনারা করতে পারল না। এই সব চুরির রহস্য ভেদ করতে পারত একমাত্র আলেকজান্ডার—কিন্তু তাকে এ সবের তদ্বির করতে কেউ ডাকে না। দুঃখের কথা বলব কি, তাদেরই হোস্টেলের চৌবাচ্চার কলের স্টপারটা যখন চুরি গেল তখন সে নিজেই অযাচিতভাবে অগ্রসর হয়ে তার কিনারা করতে চেয়েছে, কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করল না। তাদের হোস্টেল এবং তাদেরই কলের স্টপার, সুতরাং এর একটা বিহিত করার তার সম্পূর্ণ অধিকার; তবু এই প্রস্তাব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে করতেই তিনি প্রথমত বললেন—'গেছে যাগ গে, ভারি

তো দাম ! বারো আনা মোটে !' তথাপি আলেকজাণ্ডার তার প্রস্তাবের পুনরুক্তি করায় তিনি চটে গিয়ে বললেন—'তোমাকে আর গোয়েন্দাগিরি ফলাতে হবে না। যাও, নিজের কাজ করো গে, পড়ো গে তুমি।'

সেদিন আলেকজাণ্ডার ভারি মর্মাহত হয়েছিল এবং তার মনে হয়েছিল যে এই স্টপার চুরির ব্যাপারে হয়ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কোনো যোগাযোগ আছে, সেই রহস্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়েই তিনি—হুঁ, ঠিক তাই।

তার আসল নাম আলেকজাণ্ডার নয়, এই নাম তার অল্পদিনের উপার্জন—এর পেছনে একটু ইতিবৃত্ত আছে। ক্লাসে একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—জেণ্ডার কয় প্রকার ?

সে উত্তর দিল—'তিন প্রকার ; ম্যাসকুলিন, ফেমিনিন, আর আর—আর'—আর-টা কিছুতেই তার মনে আসছিল না। পাশের ছেলেটি ফিস-ফিস করে তাকে কী বলেছে। তার প্ররোচনা আর মাস্টারের প্রতাড়না, এই দুয়ের তাড়ায় সে বলে ফেলল—'আর আলেকজাণ্ডার।'

বলে ফেলেই সে বুঝতে পারল যে ভুল হয়েছে ; কেননা এই তৃতীয় জেণ্ডারটি গ্রামারের নয়, ইতিহাসের। কিন্তু তখন আর ফিরিয়ে নেবার তার উপায় ছিল না, বিশেষত নিউটার জেণ্ডার যখন কিছুতেই তার মাথায় আসছিল না। মাস্টারমশাইও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বললেন—'উদাহরণ দাও।'

ম্যাসকুলিন ও ফেমিনিনের উদাহরণ সে দিল, কিন্তু তাই দিয়েই কি তার পার আছে ! মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করেছেন—'আর আলেকজান্ডার ?'

তার উদাহরণ সে কি দেবে ? তার উদাহরণ যে মোটে একটিই ছিল এবং সেটিও বহুদিন আগে বিগত হয়েছে, ইতিহাস পাঠে একথা জানা যায়। সেই একমাত্র ও অবর্তমান উদাহরণে ইতিহাসের মাস্টার পুলকিত হতে পারেন কিন্তু তাতে কি গ্রামারের টিচারকে তেমন খুশি করা যাবে ? সে ভরসা তার খুব কমই ছিল, তাই সে অগত্যা মুখখানাকে এরকম সশব্যস্ত করল যেন উদাহরণটা তার গলার গোড়ায় এসেছে কিন্তু জিভের ডগায় আসছে না।

মাস্টারমশাই বললেন—'ভেবে পাচ্ছ না ? তার উদাহরণ যে সামনেই রয়েছে গো !'

সামনেই রয়েছে ? অথচ সে ভেবে পাচ্ছে না ! আলেকজাণ্ডার উচ্চকিত হয়ে সামনের সমস্তটা একবার পর্যবেক্ষণ করে নিল।

মাস্টারমশাই বললেন—'তার উদাহরণ তুমি নিজে। তুমিই আলেকজাণ্ডার !'

প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে সেদিন থেকে তার ওই নামটাই রটে গেল, সকলেই তাকে ওই নামে ডাকতে শুরু করল। ফলে, তার যে পৈতৃক আর একটা নাম আছে সে সম্বন্ধে তার নিজেরও অনেক সময়ে সন্দেহ হতে লাগল।

এই হলো তার অভিনব নামকরণের ইতিহাস।

সেদিন সকালে উঠেই আলেকজাণ্ডার শুনল যে আবার তাদের পাড়ায় চুরি হয়েছে, এবার আর বেশি দূরে নয়, তাদের হোস্টেলের রাস্তাটা যেখানে

মোড় ঘুরেছে সেইখানে কুন্দন সিং-এর কোঠায়। ছোটখাট চুরি নয়, একেবারে সিঁধ কেটে চুরি—বেগারা কুন্দন সিং-এর যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে চোরে। কুন্দন সিং ভোজপুরী মানুষ, এক লোটা ভাঙ আর এক সের পুরি ভোজন করে সারা রাত নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে—সকালে ঘুম ভেঙেই দেখে এই কাণ্ড!

আলেকজাণ্ডার ভাবল, এই চুরিটার তদারক করা তার কর্তব্য। নাঃ, চোরদের অত্যাচার চরমে উঠেছে একেবারে। কুন্দন সিং তার আলাপি মানুষ, ভারি ভাল লোক, ভাঙা বাংলায় আর আধ-ভাঙা হিন্দিতে অনেক দিন ধরে উভয়ের মধ্যে আলাপ জমেছে আর সেই কুন্দনেরই এ সর্বনাশ। দারোগা, পুলিস তাদের হোস্টেলের রাস্তা দিয়ে এল এবং চলেও গেল কিন্তু তারা যে এই চুরির কিনারা অন্য চুরিগুলোর মতই করবে এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না।

কুন্দন সিং-এর বাড়ি গিয়ে আলেকজাণ্ডার দেখলে বেচারা মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে। পাকা ডিটেকটিভরা যেভাবে খুঁটিনাটি সব কিছু ভাল করে আগে দেখে নেয় সে সমস্তই বই পড়ে আলেকজাণ্ডারের জানা ছিল। কুন্দনের সঙ্গে কোন কথা না বলে প্রথমেই সে তার ঘরের ভেতর, বাড়ির চারিধার খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করল কিন্তু কোথাও কোন হাতের ছাপ, কি আঙুলের টিপ কিংবা পায়ের দাগ আবিষ্কার করতে পারল না।

তারপরে সে ভোজপুরী বন্ধুর দিকে মনোযোগ দিল, বলল - 'কুন্দন সিং! কিছু ভেব না তুমি। চোরদের ধরে তোমার সমস্ত জিনিস বের করে দেব, তুমি দেখে নিয়ো। এখন তুমি আমায় বলো দেখি, কাল রাত্রে কি হয়েছিল? যা যা জানো সমস্ত বলো, সবই আমার কাজে লাগবে। কিচ্ছু গোপন করো না।'

কুন্দন তার কথায় কতটা আশ্বস্ত হলো সেই জানে, তবে সে যা বলল তার মর্ম এই যে, ভোর রাতের দিকে সে তার ঘরের ভিতরে বিল্লির আওয়াজ শুনতে পায়, বোলছিল ম্যাও ম্যাও—তাতে তার নিদ্ টুটে যায়! একবার সে ভাবতেও ছিল যে কেয়ারি তো বন্দ্ আছে, বিল্লি আসছে কন্ পাকে? কিন্তু কাল রাত্রে নেশাটা বড়ি জোর হয়ে গিয়েসিল বলে তার উঠবার ফুরসত হইল না।

আলেকজাণ্ডার ভাবিত হয়ে বলল—'হুঁ! তারপর?'

'তারপর ফজিরে উঠে দেখি এহি ব্যাপার! হামার লোটাভি লিয়ে গেসে। একটা বর্তনভি নেই যে রোটি পাকাই!'

আলেকজাণ্ডার বলল—'কে চুরি করেছে বলে তোমার মনে হয়? কাকে তোমার সন্দেহ? কোন হদিশ দিতে পারো যদি তাতে আমার গোয়েন্দাগিরির সুবিধা হবে!'

কুন্দন বলল—'হামার তো মনে লাগে ওই যে ম্যাও ম্যাও বোলছিল—উসিকা ভিতর হদিশ আছে! কুনোদিন হামার ঘরে বিল্লী আসে না, কভি আসছে না, হামি তো বাংগালীর মতো মছলি খায় না।'

আলেকজাণ্ডার বিস্মিত হয়ে বলল—'বল কি! বেড়ালে সিঁধ কাটবে? তাতে আবার এতবড় সিঁধ? অসম্ভব! তবে যদি বনবিড়াল হয়—বলা যায় না তাহলে!'

বনবিড়াল সে কখনো চোখে দেখেনি, সেজন্য তাদের সম্বন্ধে তার উচ্চ ধারণাই রয়েছে।

কুন্দন বলল—'না, বিড়াল কেনো কাটবে? চোর ঢুকে বিড়াল ডাকতে-ছিল, হামি নিদতে আছি না জাগতে আছি ওহি জানবার মতলবে।'

আলেকজাণ্ডার বলল—'হ্যাঁ, তা হতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে কি আর চোর ধরা যাবে? বেড়াল-ডাকা খুবই সোজা, সবাই ডাকতে পারে। আচ্ছা, চোরেরা কোনো হরতনের নওলা কি চিড়িতনের সাতা ফেলে যায়নি?'

কুন্দন বলল—তাস? নাঃ, উলোক তো তাস খেলতে আসে নাই, চোরির মতলবেই আসছিল।'

আলেকজাণ্ডার বলল—'তা তো এসেছিল, কিন্তু অনেক সময় সামান্য একখানা তাস থেকে বড় বড় খুনের পর্যন্ত কিনারা হয়ে যায়, তা জানো? তোমার এ চুরিটা বড় রহস্যপূর্ণ! তা, আমি এর রহস্যভেদ করবই করব—চোরদেরও ধরব, তোমার জিনিসও ফেরত পাবে। আচ্ছা, একটা কথা মনে পড়েছে, আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দোলগোবিন্দবাবুর সঙ্গে কি কাল-পরশু তোমার কোন কথা হয়েছিল?'

কুন্দন সিং জানাল যে কাল বিকালেই রাস্তায় দেখা হয়েছিল, কুন্দন সিং-এর সেলামের জবাবে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—'কি কুন্দন, ভাল আছ তো? এই বাত।'

হুঁ, ঠিক? এতক্ষণে আলেকজাণ্ডারের মনে আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিল, এইবার যেন রহস্যভেদের মত হয়েছে। সেই স্টপার চুরি যাওয়ার পর থেকেই দোলগোবিন্দবাবুর ওপর তার সন্দেহ জন্মেছিল, এইবার সেটা গাঢ় হলো। ওই যে বসন্ত-চিহ্নবিকৃত খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা মুখ—এ সমস্তই ডিটেকটিভ বইয়ের অপরাধীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। খিটখিটে মেজাজের জন্য আলেকজাণ্ডার লোকটার ওপর মনে মনে ভারি চটা ছিল—সে বুঝতে পারল যে তার রাগ নেহাৎ অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি।

আলেকজাণ্ডার গম্ভীর মুখে বলল—'তোমার চোরাই মাল কোথায় আছে আমি জানতে পেরেছি। কালকের মধ্যেই তুমি সব পাবে, কিন্তু চোরকে আমি ধরে দিতে পারব না তা বলে দিচ্ছি। কেননা আমার চেয়ে তার গায়ে জোর ঢের বেশি, তা ছাড়া সে যেরকম বদ্‌রাগী মানুষ, ধরতে গেলে আমাকে হয়ত কামড়েও দিতে পারে।'

কুন্দন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার বালক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল—'মাল ফিরে পেলেই সে বহুত খুশি—চোরকে নিয়ে তার কুনো দরকার নাই।'

এক রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে আলেকজাণ্ডার হোস্টেলে ফিরে এল।

তাহলে এই পাড়ায় যত চুরি হচ্ছে এ সবই তাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ? তিনি একাই করছেন, না তাঁর আরও দলবল আছে? লোকটা যে রকম চার্জ নেয় আর যা খারাপ খাওয়ায় তাতে তার অসাধ্য কিছুই নেই।

আলেকজাণ্ডারের ওটা প্রাইভেট হোস্টেল। দোলগোবিন্দবাবু একটা ছোটমত বাড়ি লীজ নিয়ে জনা পঁচিশেক ইস্কুলের ছাত্র জুটিয়ে এই বোর্ডিং হাউসটা ফেঁদেছেন—তার আয়ে তাঁর উপরি উপায় হোক আর না হোক, কলকাতা শহরে খাওয়া-থাকাটা নির্বিবাদে চলে যায়।

সেদিন রবিবার ছিল। দোলগোবিন্দবাবু ছেলেদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে স্টিমার ট্রিপের আয়োজন করেছিলেন। ছেলেদের স্বাস্থ্য এবং স্ফূর্তির জন্য তাদেরই খরচে মাঝে মাঝে তিনি এই রকম 'আউটিং'-এর ব্যবস্থা করতেন। আলেকজাণ্ডার হোস্টেলে ফিরে দেখল, আর সব ছেলে ততক্ষণ খাওয়াদাওয়া সমাধা করে তৈরি হয়ে তার জন্যই অপেক্ষা করছে।

সে ফিরতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—'এতক্ষণ ছিলে কোথায়? যাও, চট্‌পট্ খেয়ে তৈরি হয়ে নাও গে, দেরি করো না।'

আলেকজাণ্ডার বলল—'আমি যাব না। আমার শরীরটা ভাল নেই, আমি খাবও না কিছু।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—'আমরা কাল দুপুরে ফিরব! চাকর বামুনদেরও ছুটি দিয়ে দিয়েছি। তুমি থাকতে পারবে ত একলা?'

আলেকজাণ্ডার বলল—'খুউব।'

সে ভেবে দেখল এ-ই চমৎকার সুযোগ। কেউ থাকবে না, সে বিনা বাধায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের জিনিসপত্রের আড়াল থেকে কুন্দনের চোরাই মাল আবিষ্কারের অবকাশ পাবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে গিয়ে সে তাঁর সাজসজ্জা দেখতে লাগল, কিন্তু তার আসল লক্ষ্য রইল তাঁর ঘরের আনাচে-কানাচে। ওই যে কোণটায় এক পেট-মোটা থলে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, এটা তো কাল ছিল না—তবে কি ওরই মধ্যে কুন্দনের যতো মাল—লোটা, বর্তন ইত্যাদি?

মনে মনে আঁচ করল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এক মিনিটের জন্য বেরুলে সে একবার উঁকি মেরে থলের ভেতরটা দেখে নেবে, কিন্তু তিনি আদপেই নড়লেন না। অবশেষে মরীয়া হয়ে আলেকজাণ্ডার জিগ্যেস করে বসল—'সার্, আপনি কি বেড়াল ডাকতে পারেন?'

দোলগোবিন্দবাবু অন্যমনস্ক ছিলেন, কথাটা তাঁর কানে যায়নি, তিনি চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি?'

তাঁর শাণিত কটাক্ষে বিচলিত হয়ে আমতা আমতা করে সে বলল—'বেড়ালের ডাক কি রকম তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

'—কেন? তাদের সাথে কি তোমার ভাব নেই তেমন? আলাপ করলেই জানতে পাবে।'

তার উত্তরে আলেকজাণ্ডার ভারি দমে গেল। বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই—সহজে ধরা দেবার পাত্র দোলগোবিন্দবাবু নন। গল্পের বইয়ে যেমন যেমন

পড়েছে একেবারে লাইনে লাইনে মিলে যাচ্ছে! হুবহু। কিন্তু সেও সেই সব ডিটেকটিভের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না, দোলগোবিন্দবাবুকে ঢোল-গোবিন্দ করে তবে সে ছাড়বে।

দোলগোবিন্দবাবু তাঁর ঘরের চাবি এঁটে তালা টেনে পরীক্ষা করে চারিধারের চুরির উপদ্রবের কথা উল্লেখ করে, কুন্দন সিং-এর বাড়ির কালকের উদাহরণ দেখিয়ে আলেকজান্ডারকে সাবধানে থাকবার উপদেশ দিয়ে আর সব ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় ওকে একটা টাকা দিয়ে গেলেন দরকার মত খরচ করবার জন্য এবং সেই সঙ্গে এও বলে গেলেন, সে আলু-কাবলি, ফুচকা, বাজে দোকানের চপ-কাটলেট ইত্যাদি খেয়ে অসুখ আরো না বাড়ায় যেন।

কতগুলো চাবি যোগাড় করে আলেকজাণ্ডার সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দরজার তালা খোলার কাজে মনোনিবেশ করল। কিন্তু নাঃ—সেই প্রচণ্ড রামতালা কিছুতেই খুলবার নয়। চাবিগুলো ঘষে মেজে তৈরি করতেই তার গোটা দুপুরটা কেটে গেল, কিন্তু কোন চাবিই লাগল না। সারাদিন খেটে হয়রান হয়ে তার ভারি খিদে পেয়েছিল, বিকেলের দিকে টাকাটা পকেটে নিয়ে খাদ্যের অন্বেষণে বড় রাস্তার দিকে বেরুল। একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে ইচ্ছামত চপ, কাটলেট, কারি, কোর্মা খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে যখন হোস্টেলে ফিরল তখন বেশ রাত হয়েছে।

হোস্টেলের ভেতরে পা দিতেই তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। চাকর-বাকরের সেদিন ছুটি, কেউ কোথাও নেই; আলোও জ্বলেনি, চারিধার ঘুটঘুটে অন্ধকার! তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক কনেকশন ছিল না, কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলত। কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে সে সিঁড়ির কাছে এল। অন্যদিন এই সময়ে ছেলেদের সোরগোল কি রকম জমজমাট থাকত আর আজ কী ভয়ানক নিস্তব্ধতা! আলেকজাণ্ডারের বুকটা গুড়ে গুড়ে করে উঠল—সে এক ছুটে দোতলায় তার নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে খিল এঁটে দিল।

ল্যাম্প! ওই যা—তার ল্যাম্পটাও যে নিচে রান্নাঘরে রয়েছে, তেল ভরতে সকালে দেওয়া হয়েছিল। দেশলাই একটা আছে, কিন্তু সেটা যে কোনখানে এই অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যায়! তার স্মরণ হলো যে সদর দরজা বন্ধ করে আসা হয়নি। থাক গে খোলা পড়ে, লাখ টাকা দিলেও সে আর নিচে নামছে না।

কী করবে আলেকজাণ্ডার? খানিকক্ষণ বিছানার ধারে চুপ করে বসে রইল—ঘরের জমাট অন্ধকারের মধ্যে চোখ চালিয়ে দেখল যেন কত কি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি! ভূতের তার ভারী ভয় এবং অন্ধকারে ভূত ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায় না। চোখ বুজে কোন রকমে চাদরটা খুঁজে নিয়ে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা আওয়াজে তার ঘুম গেল ভেঙে। মনে হলো পাশের ঘরে কে দড়াম করে পড়ে গেল যেন! আলেকজাণ্ডারের সর্বাঙ্গ শিউরে

উঠল। তার পরেই যেন চাপা হাসির শব্দ। ফিস্ ফিস্ করে কারা যেন কথা কইছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে কারা! কারা যেন তেতলায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে গটমট করে।

বাঘের চেয়েও ভূত মারাত্মক। ভূতের সান্নিধ্য থেকে একটা খুনের সঙ্গ পেলেও লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। কিছুদিন আগে একটা ছেলে এই হোস্টেলে মরেছিল সেই কথা তার মনে পড়ল। না, আর এখানে এক মুহূর্ত নয়! তাহলে আলেকজাণ্ডারকে কাল আর দেখতে হবে না।

আলেকজাণ্ডার খিল খুলে চোখ-কান বুজে এক ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, তার যেন মনে হলো ভূতেরা তার পিছু পিছু তাড়া করে আসছে। রাস্তায় নেমেই সে সদর দরজা বাইরে থেকে এঁটে দিল। দিয়েই নিকটবর্তী গ্যাস-পোস্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল—না, অত আলোয় ভূতের চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে একটা রোয়াকে বসে ভুতুড়ে বাড়িটার দিকে সে তাকিয়ে রইল। তার মনে হতে লাগল, দোতলার ঘরগুলোতে কী সব যেন অস্পষ্ট ছায়ার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখন আলোর প্রাচুর্যের মধ্যে বসে অন্ধকারের ভূত দেখতে ভালই লাগে, ভয় করে না।

ভোরের দিকে একজন পুলিস-কর্মচারী ওই পথে সাইকেলে যেতে আলেকজাণ্ডারকে ওখানে ওই ভাবে দেখে প্রশ্ন করলেন—'তোমার বাড়ি কোথা—থাকো কোথায়?'

আলেকজাণ্ডার বাড়ি দেখিয়ে দিল।

'তবে এখানে বসে কেন এমন করে?'

'ওখানে ভারি ভূতের উপদ্রব···পালিয়ে এসেছি তাই!'

'আর কেউ নেই বাড়িতে?'

'না, বেড়াতে গেছে সবাই।'

'দেখি কেমন ভূত?' বলে পুলিস-কর্মচারী হুইস্ল্ দিয়ে কয়েকজন কনস্টেবল ডাকলেন, তার পরে শেকল খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। আলেকজাণ্ডারও সঙ্গে সঙ্গে গেল। কারণ তার ধারণা ছিল ভূত যদি পৃথিবীতে কারুর পরোয়া করে তবে পুলিসের। সুতরাং পুলিস সঙ্গে থাকলে ভূতের ভয় কিসের! তাছাড়া তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে—দিনের বেলায় তো ভূত বলে বস্তু কিছু নেইকো!

দোতলায় উঠে দেখা গেল প্রত্যেক ঘরের বাক্স-পেট্রা সব ভাঙা পড়ে আছে কিন্তু কেউ কোথাও নেই! আলেকজাণ্ডার খুব আশ্চর্য হলো···ভূতে তো ঘাড়ই ভাঙে জানা ছিল, বাক্সও আবার ভাঙে নাকি? তেতলায় উঠে দেখা গেল, একটা ঘরে সমস্ত জিনিসপত্র একত্র জড় করা, আর তারই পাশে বসে দুজন লোক কী পরামর্শ করছে।

ইন্সপেক্টর বললেন—'ভূত নয় চোর! খালি বাড়ি পেয়ে ঢুকেছে, কিন্তু তুমি বুদ্ধি করে বাইরে থেকে শেকল এঁটে দিয়েছিলে বলে আর বেরুতে পারেনি। এখন বুঝতে পারছি, এ পাড়ায় এতদিন যত চুরি হয়েছে সব কাদের কীর্তি!'

চোর দুজন গ্রেপ্তার হয়ে থানায় গেল। সেখানে তারা সব স্বীকার করল, তার ফলে তাদের দলের আরো ক'জন ধরা পড়ল, অনেক চোরাই মালও বার হলো। কুন্দন সিং তার বর্তন, লোটা এবং আর যা যা গেছল সব ফিরে পেল। ও-পাড়ার আরো সব চুরির অনেক জিনিস উদ্ধার হলো। চৌবাচ্চার কলের স্টপারটা পর্যন্ত পাওয়া গেল।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছেলেদের নিয়ে স্টিমার-ট্রিপ থেকে ফিরে আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় কাহিনী শুনলেন! শুনে তিনি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হলেন। তাঁর ঘরেরও তালা ভেঙেছিল এবং তাঁর সেই থলেটাও সেইখানে ছিল, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের তার ভেতরে উঁকি মারার উৎসাহ আর ছিল না।

দোলগোবিন্দবাবু আলেকজাণ্ডারের পিঠ চাপড়ে বললেন—'বাহাদুর ছেলে! আমি ভাবি, কী সব ছাইপাঁশ পড়, কিন্তু না, গোয়েন্দাগিরি করে ধরেছ তো ঠিক—এই সব দুর্ধর্ষ চোরের জ্বালায় পাড়া অস্থির। পুলিস পর্যন্ত নাস্তানাবুদ, আর এইটুকু ছেলে তাদের ধরেছে—কম কথা নয়। নাঃ, ডিটেকটিভ বই পড়লে বুদ্ধি পাকে একথা মানতেই হবে, তুমি বইগুলো দিয়ো একবার আমায়, এবার থেকে আমিও পড়ব।'

আলেকজাণ্ডার বলল—'না সার, ও-সব বই পড়লে বরং বুদ্ধি আরো গুলিয়ে যায়, এত লোকের উপর এমন বাজে সন্দেহ হয় আর এরকম ভুল বোঝায়! ওতে আগাগোড়া সব মিথ্যে কথা। নাঃ, আমি আর ডিটেকটিভ বই পড়ছি না।'

কুন্দন সিং-এর আনন্দ আর ধরে না, সে এসে আলেকজাণ্ডারকে খাবার নেমন্তন্ন করে গেছে। ভোজপুরী বন্ধুর পুরির ভোজ সম্ভবত সে ঠেলতে পারবে না।

———

একলব্যের মুণ্ডপাত

সেকালে একলব্য যেমন গুরুদেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে (দিয়ে, না দেখিয়ে?) অস্ত্রবিদ্যায় লায়েক হয়েছিল, আমার বন্ধু বটুকও তেমনিধারা এক একলব্য।

কিন্তু তার যে একটি লভ্য হয়েছে, তা যেন কারু ভাগ্যে না হয়!

গুরুভক্তির গূঢ়তত্ত্বই হচ্ছে গুরুর হাতে আত্মদান। সেইটেই নাকি গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা। আর, গুরুর কাজ হচ্ছে ভক্তের ঘাড়ভাঙা। আত্মনিবেদনের এই আদর্শই আমাদের একেলে একলব্যের জীবনে (এবং মরণে) অপরূপ মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কি করে হলো সেই কথাই বলি এবার। খুব দুঃখের সঙ্গেই বলি···

পৌষের এক সকালে বটুক এল আমাদের বাড়ি। ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি গায় দিয়ে হাজির!

অবাক্ হয়ে তাকাই। বলি, 'কিরে বটুক! তোর শীত করছে না?'

বটুক জানালো, 'শীত? আমার? নাঃ, শীত আমার করে না।···তারপর এখনি ব্যায়াম করে আসছি যে!'

'কী! কিসের ব্যারাম বললি?' আমি তো থ! ঠাণ্ডা লাগলেই জানি ব্যারাম হয়। ব্যারাম হলে যে আবার ঠাণ্ডা লাগে না, কি, ঠাণ্ডা লাগাতে হয়, এ তো আমার জানা ছিল না। শুনিও নি কখনো।

'ব্যারাম না রে, ব্যায়াম না—ব্যা-য়া-ম?' বটুক বলে, 'ব-য়ে শূন্য র নয়, অন্তঃস্থ য-য়ে শূন্য য়—বুঝেছিস্? 'ব্যা' আর 'ম'য় মাঝখানে যে শব্দটা আছে সেটা 'রা' নয় 'য়া'। বুঝলি এবার?'

'ব্যা—ম-র মাঝখানে ?' আমি বলতে যাই—'তা সে যাই থাক, কোনো ব্যামোর মধ্যে যাবার আমাদের কি দরকার ?···অসুখ-বিসুক, রোগ ব্যামো এ-সব কি আবার আমাদের জিনিস ?'

'এই দ্যাখ্ তা'হলে।' উদাহরণ দিয়ে দেখায় বটুক। 'দ্যাখ্ এইবার।'

পাঞ্জাবির আস্তিন সে গুটিয়ে ফ্যালে—কাঁধ বরাবর। তারপর হাতটাকেও গুটায়, অ্যাকিয়ুট্ অ্যাঙ্গলে এনে কাঁধের ওপর মুড়ে রাখে—ঘাড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয় ঃ 'এখন ? কী দেখছিস ?'

'কী আবার ? বক দেখাচ্ছিস আমায় ?' আমি বক বক করি।

'এই হাত—এখন স্ট্রেট্ লাইনে।' হাতটাকে সে লম্বালম্বি করে—'কি রকম প্লেন এখন। তারপর এখন দ্যাখ্'—হাতটাকে সে ভাঁজ করে—'গোটালুম এইবার। আমার বাহুর কাছটা—এই জায়গাটা ফুলে ডবোল হয়ে উঠলো কিনা ? উঠলো তো ? কী বলে একে ?'

'বলাই বাহুল্য।' আমি বলি, 'বাহুল্যই বলা যায়।' বাহুলতার এই বহুলতা অপর কী ভাষায় আমি ব্যক্ত করতে পারি ?

'বাহুল্য নয় রে, ব্যায়াম। একেই বলে ব্যায়াম।' বটুকের মুখে অদ্ভুত এক আরাম দেখা দেয়। আরাম, কিম্বা ওর ভাষায়, হয়তো সেটা আরামই হবে। তা সে যাই হোক, বারম্বার সে হাতটাকে দরাজ করে আনে আর ভাঁজ করতে থাকে। ওর হাতের আয়-ব্যয় দেখিয়ে তাক্ লাগাতে চায় আমায়।

'রক্ষে কর্, আর না। দেখে ভাই আমার মাথা ঘুরছে।'

'তুই কোনো ব্যায়াম করিস নে বুঝি ?' শুধায় ও।

'করি। শুয়ে শুয়ে। এই বিছানায় গড়িয়ে যতটা হয়। সত্যি বলতে, বেশি ব্যায়াম আমার ধাতে সয় না। দু'বারের বেশি চারবার এপাশ-ওপাশ করেছি কি, অমনি কাহিল ! একটুতেই আমি ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়ি।'

'হাঃ হাঃ হাঃ। এই বুঝি তোর ব্যায়াম ? তবেই হয়েছে। আরে ও না, ও রকম শুয়ে শুয়ে নয়, এমনি ওঠ্-বোস্ করতে হয়।' বলে বার দশেক সে ওঠ-বোস্ করে, নিজের কান না ধরেই। ইস্কুলের পড়া না পেরে মাস্টারের ঠেলায় করছে না তো ! কান ধরতে যাবে কোন্ দুঃখে ? আমাকে ও বাংলায় 'ডন-বৈঠক, ডাম্বেল, মুগুর, দৌড়-ঝাঁপ—এই সব'—ওর মতে, কারো বিনা অনুরোধেই নাকি করতে হয়। এদের বলে ব্যায়াম।—'একশোটা ডন্ দুশো বৈঠক দিতে পারিস্ ?' সে শুধোয়।

'তাহলে আমি মারাই যাবো। দশটা বৈঠক যদি দিই তো আমি আর দাঁড়াতে পারব না। উঠলেই তক্ষুণি বসে পড়ব—আপনা আপনিই। বসলে আর ভাই উঠতে পারব না।'

'কার শিষ্য আমি জানিস ? ব্যায়ামবীর বলরামের। যাবি নাকি তার কাছে ? বলরামের কাছে ?'

'রাম বলো ! কোন্ দুঃখে ? সুখে থাকতে ভূতের মার খেতে যাবো কিসের জন্যে ?'

'ভূতের মার বলছিস? আহা, জিম্‌নাসিয়ামে যা দলাইমলাই দেয় একখানা—সারা গা গরম হয়ে ওঠে। ঘাড়ের কাছে এমন রদ্দা মারে - বলবো কি! এমনি আরাম লাগে! মারতো যদি তোর ঘাড়ে—'

শুনেই যেন মুখ থুবড়ে পড়ি—'ব্যায়ামবীর বলরাম লাগায় বুঝি তোকে?'

'হায় রে, সে ভাগ্য কি করেছি! এখনো তাঁর সঙ্গে দেখাই হয়নি আমার।' বটুক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে।

'তবে যে তুই বল্লি তুই তার সাক্‌রেদ্‌?'

'সাক্‌রেদ্‌ নই, শিষ্য। গোপন শিষ্য—একলব্য ছিলো যেমন দ্রোণাচার্যের। ব্যায়ামের যে ছাপানো চার্ট তিনি বার করেছেন তাই দেখে দেখে আমি ব্যায়াম করি। আহা, তাঁর মতন দেহখানা যদি আমার হয়! সেই বিশ্বশ্রী কান্তি যদি পাই একবার!'

'তাহলে কেউ আর তোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না। ভয়ে সাত হাত পিছিয়ে থাকবে। অবশ্যি হাতী, হিপোপটেমাস, গণ্ডার, পাগলা ষাঁড়—এরা ছাড়া।'

'ভাবছি আজ ব্যায়ামাচার্যের আখড়ায় যাবো। তোর মোটর সাইকেলটা দিস যদি—'

'কোথায় আখড়াটা তাঁর শুনি একবার?'

'ইটিণ্ডা ঘাট রোডের মাঝখানে কোথায় যেন! মতিঝিল কলোনি-টলোনি পেরিয়ে...তবে, কলকাতা থেকে খুব বেশি দূর নয়। আট-দশ মাইলের মধ্যেই হবে। তুইও চ' না কেন আমার সঙ্গে?'

'শীতের এই সকালে? কলকাতার বাইরে যে বেজায় ঠাণ্ডা রে! বরফ পড়ছে কিনা কে জানে!'

'হ্যাঁ, মতিঝিল কলোনিতে বরফ পড়ছে!' সে হাসতে থাকে: 'দার্জিলিং কলকাতার দশ মাইলের মধ্যে কিনা!'

'তাহলে চ'।'

সত্যি বলতে, কোনো ব্যায়ামবীরের হাতে সাধের সাইকেল ছাড়তে আমার মায়া লাগে। কী জানি, যদি সে সাইকেলটাকে বাগিয়ে ব্যায়াম লাগায়—আমি যেমন বিছানার সঙ্গে করে থাকি? ব্যায়ামীদের মেজাজ তো, কিছুই বলা যায় না। মোটর সাইকেল নিয়ে যদি মুগুরের মতন ভাঁজতে লাগে। কিম্বা ডাম্বেলের মত বেলতে শুরু করেত দেয়—তাহলে কি আর ও-বেচারা আস্ত থাকবে!

'আচ্ছা, চ' তবে, এত করে তুই বলছিস যখন। বলরামবাবুকে দেখেই আসা যাক না হয়। তোর বাহুল্য তো দেখলাম, এখন তাঁর বাহুল্য আবার কেমন, কতোখানি দেখে আসি।'

'তোর বুকের বেড়ের চেয়ে বেশি। দেখলে তুই অবাক হবি।'

শুনেই আমি অবাক হই। কী জানি, তাঁর আঙুলগুলো হয়ত আমার কবজির মতই। হাতঘড়িটা আংটির মতন তিনি আঙুলেই পরে থাকেন বোধহয়। কড়ে আঙুলে কি বুড়ো আঙুলে কে জানে!

জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নিই। পশমের গেঞ্জি গায়ে চড়াই, তার ওপরে

সার্জের শার্ট, আমার বোনের বোনা পুল্‌ওভার তার ওপর। গরম কোট্‌টা চড়িয়ে অলেস্টারটা গায় দেব কিনা ভাবছি, বটুক আপত্তি করে—

'এর ওপর তোর বালাপোষ-টোষ যদি থাকে তবে চাপিয়ে নে! নেই? তাহলে কম্বোল, কিম্বা লেপ?···'

'জড়িয়ে নিলে হতো।' প্রস্তাবটা ওর আমি বিবেচনা করে দেখি—'নিতে পারলে মন্দ হতো না। যা শীত বাবা! কিন্তু অতগুলো নিয়ে মোটর সাইকেলে সামলাতে পারবো কিনা তাই ভাবছি অলেস্টার থাক্‌ ওভারকোটটা নিই বরং।

'আর এই দ্যাখ্‌! আমি এই আদ্দির পাঞ্জাবি গায় দিয়ে যাচ্ছি। ব্যায়ামের ফল বোঝ্‌ এইবার।' সে নিজের দৃষ্টান্ত দেখায়।

ব্যায়ামের ফল বুঝেও জাব্বাজোব্বা চড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সাইকেলের পিছনের সীটে চড়ি গিয়ে। ওই চালিয়ে নিয়ে যায়।

কলকাতার হুদ্দো পেরুতেই যা ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়, বলবো কী! হাড়ের মধ্যে কাঁপন ধরিয়ে দেয়! ওভারকোট-ফোভারকোট কিছুই মানে না। দারুণ শীত অন্ধকারের ন্যায় সূচীভেদ্য হয়ে সমস্ত ফুটো করে গায় এসে বিঁধতে থাকে।

'কি রে, কাঁপছিস যে? শীত করছে নাকি তোর?' আমি শুধোই। কাঁপতে কাঁপতেই।

'দূর! আ-আমার আ-আ-আমার শী-শীত করে? ব্যা-ব্যা-ব্যায়ামের গু-গুণ কি?' বটুক বলে—দাঁত খট্‌খটিয়ে।

'কাঁপছিস তুই, মনে হলো কিনা আমার!'

'ও-ওরকম হয়। মো-মো-মোটর সা-সা-সাইলের চা-চাপলে ওরকমটা-টা-টা-টা টা··'

ও না কাঁপলেও, ওর কথাগুলো কাঁপতে কাঁপতে বেরয়। দাঁতের ঘাটশিলা পেরিয়ে টাটায় গিয়ে থামে।

আরো মাইল আড়াই যাবার পর ও খাড়া হয়। একেবারে মোটর সমেত। পথের মাঝে থেমে—সাইকেল থেকে নেমে বলে—'না ভাই, এ-এবার তু-তুই একটু চা-চালা। একটু শী-শীতের মতন ক-করছে যেন আমার। এ-একেবারে সো-সোজা বু-বুকের ও-পর এসে লাগছে কিনা হাহাহাহাহা—' ওর হাহাকার শোনা যায়।

হাওয়ার চোটটা আমার ওপর দিয়েই যাবে, জেনেও অগত্যা আমাকেই এগিয়ে বসতে হয়। মাইলখানেক না যেতেই বটুক দুহাতে আমায় পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে—

'এই, কি হচ্ছে? পড়ে যাবো যে! উলটে পড়বো যে।'

'গা-গাটা একটু গ-গরম করে নিচ্ছি ভাই। ব-বলেছিস ঠিক! কলকাতার চে-চেয়ে কলকাতার বা-বাইরে শীত একটু বে-বেশিই বটে!'

'দাঁড়া, তোকে আমার ওয়েস্টকোটটা দিই তাহলে। বুক খোলা, তা হোক, তাতেও অনেকটা বাঁচোয়া।'

সাইকেল থামিয়ে ওভারকোটের তলা, আর কোটের দু'তলা থেকে ওয়েস্টকোটটা বার করে আনি, হাতকাটা বুক খোলা কোট, তাহলেও, তাই গায়ে দিয়ে বটুক 'আঃ!' বলে আরামের হাঁপ ছাড়ে।

'এই! এইবার এসে পড়েছি মনে হচ্ছে।' যেতে যেতে বটুক জানায়—'এইখানেই কোথাও ব্যায়ামবীরের আখড়াটা হবে। ডাইনে-বাঁয়ে একটু নজর রেখে যাবি।'

'তুই নজর রাখ্। আমাকে সামনে দেখতে হবে। ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে গেলে অ্যাক্সিডেণ্ট করে বসবো।'

তারপর আমি হাঁকাতে হাঁকাতে যাই আর বটুক তাকাতে তাকাতে যায়। যেতে যেতে বটুকের উঃ আঃ শুনি। মাঝে একবার সে বলে ওঠে—'তবু যে ভারী শীত করছে ভাই! বুকের খোলা জায়গাটায় হাওয়া লাগছে কিনা! কী জোর হাওয়া রে! হাড়গোড় যেন ছ্যাঁদা করে দিচ্ছে!'

'তবে এক কাজ করা যাক্। দাঁড়া! ওয়েস্টকোট্টা তুই ঘুরিয়ে পর বরং। তাহলে, পিঠের দিকে খোলা থাকলেও, পেছন থেকে তো তোর আর হাওয়ার মার সইতে হবে না।'

গাড়ি খাড়া করে ওর কোট্ বদলে দিই। খুলে উল্টো করে পরিয়ে পেছন দিকে বোতাম এঁটে দিই ওর। তারপর আবার আমাদের সাইকেল চলতে থাকে···ভর্···ভোঁ ভোঁ ভর্ র্ র্ র্ র্···

মিনিট কয়েক যাবার পর আমি জিগগেস করি—'কি রে, এখনো তোর শীত করছে নাকি রে?'

দু'তিনবার প্রশ্নের পরেও কোনো সাড়া না পেয়ে পেছনে ফিরে তাকাই! ওমা, কোথায় বটুক! কোথায় গেল ও? চল্তি গাড়ির থেকে নেমে পড়ার তো কথা নয়। পথের মাঝখানে কোথাও পড়ে গেল নাকি ফস্কে? না বলে কয়েই কখন?

ঘোরালাম সাইকেল। ফিরিয়ে নিয়ে চললাম যে পথ পেরিয়ে এসেছিলাম তাই ধরেই।

খানিকটা আসতে আসতেই এক জায়গায় বেশ হৈ চৈ দেখা গেল। গোলাকার এক জটলা কাকে ঘিরে যেন হট্টগোল পাকিয়েছে। বেজায় চেঁচামেচি।

কাছাকাছি আসতেই পাশের ঘেরাও জায়গাটার ওপর আমার নজর পড়লো। দেখলাম, জিম্নাশিয়াম ধাঁচের আটচালার মত কাঠের একটা বাড়ি। গড়ের মাঠের ফুটবল ক্লাবগুলির চেহারা যেমনধারা! সেই বাংলো প্যাটার্নের এক কাঠচালার মাথায় সাইন্বোর্ড লাগানো ঃ

ব্যায়ামবীর বিশ্বশ্রী বলরাম আচার্যের আখড়া

আহা, এইখেনেই যে আসবার কথা ছিল আমাদের! আখড়াটা পার হয়ে যাচ্ছে দেখে বটুক হয়তো, আমাকে না জানিয়েই, টুক করে নেমে পড়েছে! চল্তি ট্রাম থেকে লোকে যেমন অফুটপাথে লাফ দেয়, তেম্নি এই অকূলে ঝাঁপ দিয়েছে!

আখড়াকে না ফস্‌কাতে দিয়ে নিজেই ফস্‌কেছে হঠাৎ—ফস্‌ করে কখন! পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙেছে কিনা কে জানে!

ব্যায়ামপুষ্ট হাত পা সহজে ভাঙার নয়, এই আশায় বুক বেঁধে সভয়ে আমি এগোই।

ভিড় ঠেলে ঢুকে দেখি বটুকই বটে! হতজ্ঞানের মতন পড়ে রয়েছে পথের মাঝখানে।

আমাকে দেখে বলরামবাবু এগিয়ে আসেন। এর আগে তাঁকে কখনো না দেখলেও চিনতে অসুবিধা হয় না। বটুক যেমনটি বর্ণনা দিয়েছিল তার থেকেই টের পাই! আমার বুকের বেড়ের সঙ্গে ওর বাহুর ঘের, মানসাঙ্ক কষার মতই, মনের ফিতেয় মেপে নিতেই মিলে যায় হুবহু।

ব্যায়ামবীর বলেন আমায়ঃ 'আপমার বন্ধু বুঝি? আপনার মোটর সাইকেলের পিছনে বসে যাচ্ছিলেন—না? এখান দিয়েই তো গেলেন আপনারা একটু আগে। আমি তখন এখানেই দাঁড়িয়ে। এইখানটায় এসে আপনার বন্ধুটি সাইকেল থেকে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন হঠাৎ। গিয়ে দেখি সত্যিই! যথার্থই ভদ্রলোকের মাথা ঘুরে গেছে। কোটের বোতাম যেদিকে, মাথাটা ঠিক তার উল্‌টো দিকে দেখা গেল। তখন কি করি, ভদ্রলোককে শক্ত করে পাকড়ে ওঁর মুণ্ডুটা ধরে আবার সোজা করে দিলাম। কিন্তু সোজা করে দিলে কি হবে—আপনার বন্ধুর কেমন মাথা কে জানে—তারপর থেকে মশাই যতই নাড়াচাড়া করি, ভদ্রলোকের আর কোনো হুঁ হাঁ-ই নেই!'

তোমাদের কারো ওদিকে ঝোঁক আছে কি না আমার জানা নেই, তবে আমি—সত্যি কথা বলতে কি—তারে চড়তে একেবারেই ভালোবাসিনে। চলাচলের পক্ষে রাস্তা হিসেবে ওকে খুব প্রশস্ত বলা চলে না ; তাছাড়া, (টেলিগ্রাফেরই বল, আর সার্কাসেরই বল) যেসব পোস্টের উপরে সাধারণত তার খাটানো হয়, মাটির থেকে তার বেশ উচ্চতা থাকে। আর, এই কারণে প্রতিপদেই বিপদের আশঙ্কা। তারে চড়ার ফ্যাসাদ এনতার !

কিন্তু এককালে, টেলিগ্রামের মতো, তারে যাতায়াত করাই আমার কাজ ছিল। আমি সার্কাস ছেড়েছি, তা খুব বেশি দিনের কথা নয়। তারের উপর দিয়ে হাঁটাচলা, কায়দা-কসরত দেখানোর চেষ্টা করা, নানাবিধ তারের খেলা দেখানোই ছিল তখন আমার রোজকার কাজ এবং রোজগারের কাজ—ঐ উপায়েই আমার দিন গুজরান হতো। কিন্তু একদা তার-যোগে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাবার ফলেই দারুণ বিরক্ত হয়ে সার্কাস আমি ছেড়ে দিলাম। সে-কথা ভাবতে গেলে এখনো আমার—, কিন্তু সে-কথা থাক।

তোমরা হয়তো অনুমান করছ আমি পড়ে গেছলাম ? উঁহু, মোটেই তা নয়। পড় পড় হয়েছিলাম, কিন্তু পড়িনি। কিন্তু না পড়ে যা হয়েছিলাম তার চেয়ে পড়ে যাওয়াই ছিল ভাল। আমার সেই অপদস্থ অবস্থায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেণীর দর্শকেরাই এক বাক্যে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন একথা অস্বীকার করব না। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো সেই খেলাটা আর একবার দেখতে চেয়েছিলে। আবার দেখার প্রত্যাশায় পরের দিনের টিকিটও হয়তো কিনে থাকবে, কিন্তু সে-খেলা দেখাতে আমি আর রাজী হইনি। তারপর কোনো খেলাই আমি আর দেখাইনি, তারে চড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

আঃ, সেই জুতো জোড়ার কথা মনে হলে আজও আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। আমার তার-পথের সহযাত্রী, আমার বিপজ্জনক সহচর সেই জুতো জোড়া —তাদের সহায়তায়, এমন কি তাদেরই প্ররোচনায় সার্কাসে তারের খেলা দেখাবার প্রস্তাবে আমি সম্মত হয়েছিলাম। কত বার সত্যি-সত্যিই তারা আপদ বিপদ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু বিপদ থেকে যে বাঁচায়, প্রয়োজন হলে এবং প্রয়োজন না হলেও, সে-ই বেশি বিপন্ন করতে পারে এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছ থেকেই আমার হলো। সার্কাস ছাড়ার পর আমি আর তাদের মুখদর্শনও করি না। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি তাদের। কোথায় ফেলেছি মনে নেই, আমারই ঘরের আনাচেকানাচে, দেরাজ-আলমারির পেছনে-টেছনে কোথাও হবে। আমার দৃষ্টির সম্মুখসীমার বাইরে।

কেন তারে চড়া ছাড়লাম সে-কথা বলব না—কিন্তু হ্যাঁ, তারে চড়া ছেড়ে দিয়েছি তার পর। আমার আর ঝোঁক নেই ওদিকে। কিন্তু মানুষ যা চায় না তা-ই এসে তার ঘাড়ে চড়ে—তাকে নাচায়! সেই কথাই আজ তোমাদের বলব।

আমাদের বাসার সামনে সুহৃদদের বাড়ি—সেই সুহৃদ, ক্রিকেট খেলায় যার জোড়া মেলে না। কিন্তু খেলোধুলোর কথা নয় কোনো, কথা হচ্ছে এই, আমাদের তেতলার ছাদ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে তাদের বাড়ির গা ঘেঁসে গেছে একটা জিনিস। আর কিছু নয়, এক টেলিফোনের তার।

সেদিন সকালে উঠে দেখলাম একটা ঘুড়ি কোত্থেকে সেই তারে এসে আটকেছে। রঙিন ঘুড়ি, বেশ চৌকোনো, তারে বেধে দোল খাচ্ছে হাওয়ায়।

ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বাল্যকালকে স্মরণ করছি। বাল্যকাল এবং সার্কাসকাল। দুই-ই যুগপৎ মনে পড়ল আমার।

দুয়ের যোগাযোগ হলে তো কথাই ছিল না। সেই মার্কামারা জুতো জোড়ার সাহায্য নিয়ে তারের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সটান ওটাকে পেড়ে এনে এতক্ষণ ওড়াতেই আরম্ভ করে দিতাম হয়তো।

ইত্যাকার চিন্তা করছি এমন সময়ে নিচের রাস্তা থেকে বালসুলভ কণ্ঠস্বর এসে ধাক্কা মারে—মশাই, ও মশাই!

রাস্তার দিকে তাকাই। এমন কেউ না, আমারই জনৈক বালক প্রতিবেশী।

রঙচঙে ঘুড়িটা ওরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পড়তে বসেছিল, সেই দুর্যোগের মুহূর্তে ঘুড়িটা চোখে পড়ল—বই ফেলে এসেছে, কিন্তু মই নিয়ে আসেনি। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, মই না আনার মূর্তিমান কারণ নাকি আমি।

—ঘুড়িটা আমায় পেড়ে দিন না মশাই।

—কি করে পাড়ব? নাগালের বাইরে যে! হাত বাড়িয়ে ওকে দেখালাম। আমার দোতলায় বারান্দা থেকে যতদূর সম্ভব হস্ত বিস্তার করলেও মস্ত ব্যবধান।

—আপনি তারের উপর দিয়ে গিয়ে এনে দিন। ছেলেটি আবদার ধরে।

—বাঃ, পড়ে যাব না? দেখছ তো কত উঁচুতে? ওখান থেকে পড়লে কি

বাঁচব আর? সমুজ্জল ভবিষ্যৎটা যতদূর সম্ভব ওর দিব্যদৃষ্টির কাছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করি—একদম ছাতু একেবারে, বুঝেছ, তারপর আর দেখতে-শুনতে হবে না।

—বাঃ আপনি পড়বেন কেন? আপনি আবার পড়েন না কি?

—পড়াশোনা করি না তা বটে! কিন্তু তাই বলে কি উলটে পড়ি না? তিনতলার থেকে পড়ি না একেবারে?

সে শুনতেই চায় না—তারে চড়তে পারেন যে আপনি!

—বটে? তারে চড়তে পারি? বল কি! এমন দুঃসংবাদ কে দিল তোমায়?

—হুম, মামার কাছে শুনেছি আমি। মামা বলেন, আপনি সার্কাসে তারে চড়তেন।

মামার কাছে যে শোনে তাকে থামানো সহজ নয়। আমি বলি– তুমি এক কাজ করো, তোমার মামার ঘাড়ে চড়ে দেখ না, যদি নাগাল পাও। পেয়ে যাও যদি?

এ পরামর্শ সে অগ্রাহ্য করে, তার মামা না কি ভারি বেঁটে। অগত্যা তাকে সান্ত্বনা দিই– ঘুড়ি ওড়াবে, তোমার একটা ঘুড়ি চাই, এই তো? এই পয়সা নাও, ঘুড়ি কেনগে।

আনিটা পেয়ে ছেলেটা লাফাতে লাফাতে চলে যায়। খানিক বাদে আর একটি ছেলে—তার চেয়ে কিছু ক্ষুদ্রাকার—দেখি সামনের রাস্তায় ঘুড়ির ওপর নজর দিয়ে তার ঠিক নিচেই এসে দাঁড়িয়েছে।

—আমাকে ঘুড়িটা দেবেন?

—স্বচ্ছন্দে। তুমি নিয়ে যেতে পার, আমার কোনো আপত্তি নেই।

ও বাবা! এও তারে চড়ার কথা বলে যে! ভয়ে ভয়ে বলি—তা আমিই কি আর চড়তে জানি?

—বাঃ, আপনি জানেন না আবার! চড়ে চড়ে কত তার ক্ষইয়েই ফেললেন! সবাই তো বলে! আপনি আমায় পেড়ে দিন।

—এককালে পারতাম বটে। স্বীকার করতে আমি বাধ্য হই—কিন্তু এখন তো আর চড়ার অভ্যেস নেই অনেক দিন—যদি পড়েই যাই?

—পড়বেন না, ছেলেটি খুব জোরের সঙ্গে বলে—কিছুতেই পড়বেন না, বলছি আমি আপনি পারবেন—হ্যাঁ।

তার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে বিস্মিত করে। আমি কিন্তু সহজে বিচলিত হই না—সে কথা কি বলা যায়? পড়ে গিয়ে কি পা ভাঙব শেষটায়?

—ভাঙে যদি আমি দায়ী। ও আমাকে ভরসা দেয়।

পরের দায়িত্বে পদচ্যুত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কিনা একবার ভাবি। পা-ই যদি ভাঙে, তাই ভেঙে ক্ষান্ত হবে কি না কে জানে? মাথার উপর দিয়েও চোটটা যেতে পারে। তেতালা থেকে পড়বার সময় বেতালা হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি—সাধারণ মানুষের তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকার কথা নয়। ছেলেটার

শিরোদেশ থেকে ঘুড়ির উড়ন্ত দূরত্ব (অথবা দুরন্ত উড়ন্ত) পর্যন্ত মনে মনে একবার মেপে নিই। পর্যালোচনা করে দেখি।

—আপনি অত ভীতু কেন? সে আমাকে প্রেরণা দেবার প্রয়াস পায়।

আমি লজ্জিত হই, কিন্তু সাহসী হতে পারি না।—ভয় আমার নেই, তবে কি জানো, কদিন থেকে পায়ে একটা ব্যথা—

ছেলেটি কথা শেষ হতে দেয় না—তাহলে দাদাকে আপনি যা দিয়েছেন আমাকেও তাই দিন। ঘুড়ি আমি কিনেই নেব।

—ও, তাই বল। জোর করে একটু হাসি—সে-কথা মন্দ না।

আনিটা হস্তগত হবামাত্র ছেলেটা অস্তগত হয়।

নাঃ, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়—এখুনি হয়তো আবার কার ভাগনে এসে ঘুড়িটার ভাগ নিতে চাইবে। অনেক ছেলের চোখেই ঘুড়িটা এতক্ষণে পড়েছে নিশ্চয়। এ পাড়ার অনেকেরই বেশ উঁচু নজর আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। রাস্তার সীমান্তে একটি বালকের আবির্ভাব হতেই আমি আতঙ্কিত হয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করি। অতদূর থেকেই আমার মনোভাব টের পেয়েই বোধ হয়—ছেলেটা দৌড়াতে শুরু করে দেয়। পেছন ফিরতে না ফিরতে ওর ডাক পেঁছয়—মশাই, ও মশাই!

ডাক পাড়তে পাড়তে সে আসে; কাতর আহ্বানে কর্ণপাত করতে হয়; (আমি তো কি ছার, ভগবান পর্যন্ত করে থাকেন বলে শোনা গেছে)।—কি খবর তোমার? বলে ফেল চট্‌পট্‌।

—ওই ঘুড়িটা আমায় দিন না। ছেলেটা হাঁপাতে থাকে।

—ও কি আমার ঘুড়ি যে আমি দেব? এবার আমি সত্যি সত্যিই চটে গেছি।—কার ঘুড়ি যে, আমি জানিও না।

—তবে ঘুড়ি কেনার পয়সা দিন। ছেলেটা স্পষ্টবক্তা এবং বেশি কথা বলতে ভালবাসে না।

অগত্যা ওকেও একটা আমি ছুঁড়ে দিই। তিন-তিনটা আনির বাজে খরচে মনটা খচ খচ করতে থাকে।

টেবিলে গিয়ে বসতে না বসতেই নিচের থেকে হেঁড়ে গলায় আওয়াজ আসে—আগস্টাস সার্কাসের বিখ্যাত তারের ক্রীড়াপ্রদর্শক তারেশ্বরবাবু কি বাসায় আছেন?

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই—আজ্ঞে হ্যাঁ, রয়েছি। কি দরকার বলুন? ঘুড়িটার দিকে একবার বঙ্কিম কটাক্ষে তাকিয়ে নিই, এঁরও যেন ওর উপরেই নজর—এই রকম একটা আশঙ্কা হতে থাকে!

তা, তারেশ্বরবাবু—ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেন।

(তারের ঈশ্বর ইতি তারেশ্বর; সার্কাস থেকে এই নাম পাওয়া আমার। যে-লোকটা ঘোড়ার খেলা দেখাত তার নাম হয়েছিল ঘোড়েল। এ নিতান্ত মন্দ না, নাম-কে-নাম খেতাব-কে-খেতাব!)

—তারেশ্বরবাবু, একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না করেন। ভদ্রলোকের হাতের কাজ চলতেই থাকে। দেখুন, আমার ভাগনেরা আবদার ধরেছে—

বাক্যটা আমি সংক্ষিপ্ত করে আনি—কিন্তু তাদের তো আমি—

—হ্যাঁ, তারা কিনছিলও বটে। আমিই সেই মনোহারী দোকানে দাঁড়িয়ে। আমিই বারণ করলাম, বললাম, ঘুড়ি কিনে পয়সা বাজে নষ্ট করছিল কেন? আমাদের পাড়ায় বিখ্যাত তারের ক্রীড়া-প্রদর্শক তারেশ্বরবাবু রয়েছেন—

আমি তাঁকে বাধা দিই— তারেশ্বর হতে পারি কিন্তু তারকেশ্বর তো নই— সবার প্রার্থনা সব প্রার্থনা পূর্ণ করা কি সাধ্যি আমার?

তিনি আমার কথায় কানই দেন না, বলে চলেন—তাঁকে বললেই তিনি একটু কষ্ট করে দু-পা হেঁটে গিয়ে ঘুড়িটা এখুনি তার থেকে খুলে এনে দেবেন। তাঁর কাছে ও তো এক মিনিটের মামলা, পা বাড়ালেই হলো। আমিই ওদের কিনতে বাধা দিলাম। সেই পয়সায় ওদের চকোলেট কিনে দিয়েছি!

প্রমাণস্বরূপ. তাঁর নিজের শেয়ারের চাকোলেট আমাকে দেখালেন; দেখিয়ে মুখে পুরে দিলেন। তার পরে প্রসন্ন মুখে বললেন, ও পাড়তে আপনার কতক্ষণ আর? এক মিনিটের ব্যাপার! তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওদের।

এর আর কি জবাব দেব আমি? বিরসবদনে চেয়ারে এসে বসি! একটু পরেই অনতিপূর্বপরিচিত সেই দুই ভাগনে, তাদের তিন বোন, ভদ্রলোকের নিজস্ব সাত ছেলে মেয়ে এবং অপোগণ্ড-কোলে একজন ঝি—এই চৌদ্দজন, এক বিরাট শোভাযাত্রা করে এসে হাজির।

একাদিক্রমে সকলের দিকেই দৃক্‌পাত করি! এরা সবাই-ই কি এই একমাত্র ঘুড়িটার প্রত্যাশী? জিজ্ঞাসা করে জানলাম—তা-ই বটে! অনন্যোপায় হয়ে পকেট-ঝেড়ে-ঝুড়ে খুচরা-খাচরা যা ছিল সব বার করতে হয়। প্রাণ এবং পয়সা এই দুয়ের মধ্যে টানাটানি বাধলে লোকে প্রথমত পয়সাই বার করে, প্রাণ সহজে বার করতে চায় না। পয়সা-বিয়োগ বরং সহ্য যায়, প্রাণ-বিয়োগের শোক একেবারে অসহ্য।

—দেখ, কদিন থেকেই পায়ে ব্যথা যাচ্ছে তাই, নইলে ঘুড়িটা আমি তোমাদের পেড়ে দিতে পারলেই খুশি হতাম।

ওদের একটু হেঁটে দেখিয়ে দিই। জন্ম-খঞ্জের চেয়েও আমার পায়ের অবস্থা যে অধুনা খারাপ: হাঁটার নমুনা দেখেই তা বুঝতে ওদের দেরি হয় না।

—দেখছ তো, এমনিতেই হাঁটতে কেমন খ্যাঁচ লাগছে। তার উপরে তারের উপর দিয়ে চলতে হলেই—বুঝতেই পারছ।

ওরা সমবেদনা প্রকাশ করে। সবাই সব সহানুভূতিসম্পন্ন।

—তা তোমাদের আমি পয়সাই দিচ্ছি, ঘুড়ি তোমরা কিনে নাও গে, কেমন?

দেখলাম কেউই এ প্রস্তাবে গররাজী নয়! পরের দুঃখ এরা বোঝে। প্রত্যেকের হাতেই চারটে করে পয়সা দিই।

অবশেষে ঝি-ও দেখি হাত বাড়ায়।

—য়ঁ্যা? তুমিও ওড়াও না কি ঘুড়ি? আমি ঈষৎ অবাক হই,—বটে? তোমারও ঐ বদ-অভ্যেস আছে?

এক গাল হেসে মাথা নেড়েই ঝি তার জবাব দেয়, বাক্যব্যয়-বাহুল্য করে না।

অগত্যা ঝিকেও একটা আনি দিই; এবং ওর কোলের অপোগণ্ডটাকেও দিতে হয়। কি জানি ওরও হয়তো ঘুড়ি ওড়ানোর শখ থাকতে পারে। কিছুই বলা যায় না। এক যাত্রায় পৃথক ফল—ওই বা কেন বাদ যাবে একলা?

আমারই চৌদ্দটি আনির তেরটি আমারই চোখের সামনে অপরের ট্যাকস্থ হয়—আমি অম্লান বদনে সহ্য করি। কেবল শিশুটি তার আনিটা মুখ-স্থ করতে থাকে।

এরপর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে। পাড়ায় ছেলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। কিন্তু ঘরে বসেও কি পরিত্রাণ আছে? একটি ছোট মাথা দরজার ফাঁকে উঁকি মারে।

উঁকি মারে, আবার অন্তর্হিত হয়। ডাক দিই।

অভ্যর্থনা পেয়ে কাছে আসে। খুব সম্ভব, আগের জন্মের আলাপী; কেন না ইহজন্মে তাকে কোথাও দেখেছি মনে হয় না।

সংকোচে ছেলেটির মুখে কথা সরে না। একটা আনি দিই ওর হাতে—কিছু বলতে হবে না, এই নাও।

যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি চলে যায়।

নাঃ ঘরের মধ্যে থাকাও আর নিরাপদ নয়। ধড়াচূড়া পরে বেরিয়ে পড়তে হলো।

বেরোবার মুখেই দুর্ঘটনা! একটি বালক তীরবেগে আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকছিল, তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। ভয়াবহ কলিশন, কিন্তু ফিরে আর তাকাই না; হত অথবা আহত, ফলাফল কি হলো দেখবার দুঃসাহস হয় না। কেবল একটা আনি পেছনে ছেলেটার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিই, দিয়েই দ্রুত এগোই।

গলির মোড়ে আর একটি কিশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। হন হন করে সে চলেছে, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তাকে ধরে থামাতে হয়।—কোথায় যাচ্ছ বুঝতে পেরেছি। এই নাও। আনিটা ওর হাতে গুঁজে দিই।

ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। —অনেক দূর থেকেই আসছ বলে বোধ হচ্ছে। বাড়িতে আমাকে না পেলে মনে কষ্ট পাবে, সেইজন্যই এই মাঝ-পথেই দিলাম।

তবু যেন সে বুঝে উঠতে পারে না।

—আমার পায়ে ব্যথা কিনা, তারে চড়তে পারব না তো, সেইজন্যই! আমি ওকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করি।

ছেলেটি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে আমি সরে পড়ি।

অনেকক্ষণ এধারে ওধারে কাটিয়ে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরি। সন্ত্রস্ত হয়ে চলতে হয়, বালকের তো অভাব নেই পৃথিবীতে, বিশেষ করে যে-পার্থিব

অংশটায় আমার বসবাস। একটা অপার্থিব ভীতি আমাকে বিচলিত করতে থাকে, পা টিপে টিপে পাড়া দিয়ে চলি। যে-রকম ছেলেপিলের সংক্রামকতা আজকাল!

বাড়ির কাছাকাছি পেঁছিতেই প্রচণ্ড কোলাহল কানে লাগে। আর একটু এগোতেই সমস্ত বিশদ হয়। সামনের, পাশের, পেছনের অলিগলি এবং আমার বাড়ির আশপাশ জুড়ে কম-সে-কম প্রায় দেড় হাজার বালক! তারা একবার ঘুড়ির দিকে আর একবার আমার বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। কিসের জন্য এত আন্দোলন। বুঝতে আর বাকি থাকে না।

'ন যযৌ ন তস্থৌ'—বুকনিটা বড় বড় পণ্ডিতদের লেখায় বার বার চোখে পড়েছে, তোমরাও হয়ত চাক্ষুষ করে থাকবে, কিন্তু কথাটার যথার্থ মানে সেই মুহূর্তেই যেন প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম।

তারপর কেবল এই বাক্যগুলি অস্পষ্টভাবে আমার কানে এল; 'ঐ ঐ', ঐ যে তারেশ্বরবাবু!' 'তারেশ্বরবাবু এই দিকে—', 'আসুন আসুন, আমরা আপনার জন্যই—', 'ওঃ কখন থেকে দাঁড়িয়ে, বাপ্‌স!' 'কি হলো ওঁর, ভদ্রলোক এগোচ্ছেন না তো!' গেঁটে বাত ধরল না কি!' 'ওদিক দিয়ে সরে পড়ছেন যে! 'ও বাবা, তারেশ্বরবাবুর পেটে-পেটে এত!' 'কি সাংঘাতিক মানুষ দেখছিস!' 'আরে পালায় যে!' 'তারেশ্বরবাবু পালাচ্ছেন।' 'পালাল রে, তারেশ্বর পালাল!' 'সটকে পড়ল—ধর ধর তারশাকে!'

উপসংহারে এই কথাগুলো শুনলাম:

'আপনি কখনো দৌড়ে পারেন আমাদের সঙ্গে?' 'রানিং-এর অভ্যেস থাকা চাই মশাই!' 'হ্যাঁ, আমাদের মতো প্র্যাকটিস করা চাই রেগুলার, রোজ সকালে উঠেই ছুটতে হবে মাঠে।' 'বলে রানিং-সু-ই কিনে ফেললাম ছ জোড়া!' 'কত গণ্ডা মেডেলই পেয়েছি প্রাইজ!' 'আমাদের সঙ্গে ছুটে পারবেন আপনি— ছোঃ! 'আর এই দেহ নিয়ে? দেহ না তো কলেবর!' 'তারের উপর দৌড়-ঝাঁপে কি হয় বলতে পারি না, তবে ফাঁকা রাস্তায় আপনি আমার সঙ্গে—হুঁঃ-হুঁঃ, জানেন আমি রানিং-এ চ্যাম্পিয়ন?' 'ছি ছি, ছুটে পালাচ্ছেন, আপনার ভারি অন্যায়।' 'আপনি ভারি কাপুরুষ তারেশ্বরবাবু।'

তার পর যা হলো তা আর কহতব্য নয়। সম্মিলিত হট্টগোলের মধ্যেই কার্যকলাপ সব ঘটতে লাগল! মোহনবাগানের সেণ্টার-ফরওয়ার্ড গোল দিতে পারলে যা হয় (প্রায়ই দিতে পারে না বা নিজেদের গোলে দিয়ে ফেলে, তাই রক্ষে) সেই দুরবস্থাই আমার হলো। ছেলেদের কাঁধে কাঁধেই ঘুড়ির নিচ বরাবর এসে পেঁছিলাম প্রায় পিছমোড়া হয়ে। আমার তখন কাঁদবার অবস্থা।

—কি চাও তোমরা বল তো? অশ্রুপাত সংবরণ করে কোনোরকমে কথাগুলো বলি।

—ওই ঘুড়িটা আমরা চাই। তারের উপর দিয়ে গিয়ে ওটা আপনি আমাদের পেড়ে দিন।

—পায়ে ব্যথা যে, আমি অভিযোগ জানাই,—বাঁ পা-টায়।

—তাতে কি হয়েছে? এক পায়ে কি যাওয়া যায় না? এই রকম করে একটা ছেলে অন্য পা তুলে একমাত্র পায়ে লাফিয়ে চলার কৌশলটা আমাকে দেখিয়ে দেয়।

তবু আমি বলবার চেষ্টা করি, তারের উপর কি অমন লাফানো চলবে? কতটুকুই বা জায়গা! অত স্কোপ কই?

—খুব খুব, সকলের সমবেত উৎসাহ পাই—

—ও তার ছিঁড়বে না, ভয় নেই। আপনি যত খুশি লাফান না কেন!

—তবে তাই হোক। আমি 'মরীয়া' হয়ে উঠি। সেই হতভাগা জুতো জোড়াকে খুঁজে পাই কি না, দেখা যাক।

বাড়ির মধ্যে ঢুকি। বেরোবার মুখেই বাধা পড়েছিল আজ, তা না মেনেই এই দুর্দশা এখন। পৃথিবী থেকেই আজ বেরিয়ে যেতে হবে কি না কে জানে! আড়াই ডজন ছেলে আমার বডিগার্ড হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে আসে।

সেদিনই একটা গল্পের বই বেচে একশ টাকা পেয়েছিলাম, নোটখানা বুকপকেটে কড়-কড় করছিল। সেইটাই ভাঙিয়ে আনি-য়ে ফেলব না কি? আনি-য়ে মানে আনি করে। মনে মনে ভাবি। কিন্তু এই করেই কি নিস্তার আছে? কাঁহাতক, কতদিন এমন পারা যাবে? দুনিয়ার যাবতীয় আনি ফুরিয়ে গেলেও ছেলে ফুরাবে না। জীবাণুর চেয়েও ছেলেরা সংখ্যায় ও পরিমাণে বেশি। তবে? তার চেয়ে বরং তারেই চেপে পড়া যাক একেবারে ধনেপ্রাণে মারা যাওয়ার চেয়ে শুধু প্রাণে মারা যাওয়াই শ্রেয় বোধ হয়। আমার মনে হয়।

এঘর ওঘর খুঁজে, ভাঙা এক আলমারির পেছনে জুতো জোড়াকে আবিষ্কার করা গেল। কালিঝুলি মেখে ভৌতিক চেহারা নিয়ে পড়ে আছে আমার সার্কাসের সহচরেরা, আমার এককালের পরম আত্মীয়!—দেখে দুঃখিত হলাম! বেচারাদের সারা গায়ে অগুন্তি আলপিন আর যত রাজ্যের পেরেক। আমার বাক্সের, দেরাজের আর ঘরের চাবি কেন যে কেবলই হারিয়ে যায়, এতদিনে তার কারণ প্রত্যক্ষ হল। সেই জুতোর গায়ে সংলগ্ন রয়েছে সব একত্র হয়ে; মিলেমিশে বাস করছে সবাই। স্যুটকেসের একটা ছোট তালা সেই সঙ্গে। একটা কর্ক-স্ক্রুও।

আমার আড়াই ডজন বডিগার্ডের এক এক জনের উপর এক-একটার ভার দিই। দশ জন আলপিনগুলো নিয়ে বাইরে বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে আসে। চার জনে পেরেকগুলো সংগ্রহ করে। তিন জন মিলে অনেক ধস্তাধস্তিতে তালাটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বাকি তের জন প্রত্যেকে একটা করে চাবি সজোরে ছিনিয়ে বহু কষ্টে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে রাখে; কর্কস্ক্রু-টাকেও।

তারপরে আমি সেই মারাত্মক জুতো আমার পদগত করি। বিস্তর পয়সা ব্যয় করে তাল তাল চুম্বক লাগিয়ে 'স্পেশ্যাল' ভাবে ওদের তৈরি করানো হয়েছিল সার্কাসে ব্যবহারের জন্যই, যাতে তারে যাতায়াতের দুর্যোগে আকস্মিক পদস্খলন না ঘটে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে। এবং কৃতজ্ঞতাসূত্রে একথা অবশ্যই স্বীকার করব,

ওদের অনুগ্রহে তার থেকে কোনদিন ভূপতিত হতে হয়নি আমায়। হ্যাঁ, ভূপতিত হতে হয়নি, সত্যিই।

কান-ফাটানো করতালির ভেতর তেতলার ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। আবার যেন সার্কাসের দিন ফিরে এল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি অগুন্তি কাঁচ কাঁচ উন্নত মুখ। উৎসুক এবং উদ্দীপ্ত। চারিধারে বালকের জনতার মধ্যে উৎসাহের আর অবধি নেই। এতক্ষণ হৃৎকম্প হচ্ছিল, কিন্তু ওদের উচ্ছ্বাস যেন আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয় ক্রমশ—একটা বিজাতীয় আনন্দ বোধ হতে থাকে।

ভগবান মাথার উপরে এবং জুতো পায়ে—তখন আর ভয় কিসের? আকাশও মাথায় ভেঙে পড়বে না এবং ভূপতনের আশঙ্কাও নেই। অবলীলাক্রমে তারের উপর দিয়ে উত্রে যাব! লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে শুরু করি। সমস্ত তারটায় দু-দুবার টহল দেওয়া হয়ে যায়। একবার মনে হয়, উন্মুক্ত আকাশের মুক্ত বায়ুতে প্রাতঃভ্রমণের এমন সোজা রাস্তা থাকতে এত দিন ব্যবহার করিনি কেন? এত উচ্চতায় আর এমন ফাঁকা জায়গায় অক্সিজেন নিশ্চয়ই যথেষ্ট থাকে, তবে রোজ সকালে উঠে এখানে পায়চারি করলেই তো হয়! নিচের থেকে হাততালির আর বিরাম নেই।

নিচে থেকে আওয়াজ পাই—ঘুড়ি ঘুড়ি। দেরি করছেন কেন? ঐ তো সামনেই! ধরে ফেলুন ঘুড়িটাকে।

হ্যাঁ, ঘুড়ি! প্রাতঃভ্রমণের ভাবনার মধ্যে ঘুড়ির কথা ভুললে চলবে না। ধরবো তো বটেই।

কিন্তু আমি আছি তারের উপরে আর ঘুড়ি ঝুলছে তারের নিচে—কি করে বাগাই ওটাকে? উঁকি ঝুঁকি মারি, অনেক চেষ্টাচরিত্র করি, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর এক পা নিচে যতদূর সম্ভব নামিয়ে দিই; দিয়ে ইতস্তত সঞ্চালন করি, কিন্তু ঘুড়ি তেমনি থাকে—আমার হাত-পা দুজনেরই নাগালের বাইরে। বিলকুল বেপরোয়া।

তাই তো, এতো ভারি মুশকিল হল দেখছি!

—বসে পড়ুন মশাই। হামাগুড়ি দিয়ে বসুন। কিংবা শুয়েই পড়ুন না! পাশ ফিরে শুলেই ঠিক ধরতে পারবেন ওটাকে।

নিচের থেকে আদেশ-উপদেশের কামাই নেই, কিন্তু পালন করাই কঠিন। ভাল করেই ভেবে দেখি যে তারের উপর শুয়ে পড়া আমার পক্ষে তেমনটা সহজ হবে না। না, বালিশের অভাবের জন্য বলছি না, এক ঘুমের পর বালিশ খুব কম রাত্রেই আমি খুঁজে পাই (আমার মাথার তলার চেয়ে চৌকির তলাই তাদের বেশি পছন্দ)—সেজন্য নয়; কিন্তু শয্যার সূক্ষ্মতাটাও তো লক্ষ্যণীয়। সেটাও বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।

নিচ থেকে তাগাদার রেহাই হয় না, হাত-তালিও খুব জোর বাজতে থাকে।

অকস্মাৎ আমি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি—যা থাকে কপালে, জয় মা দুর্গা, ঘুড়িটাকে আমি হাতাবই! তারের উপর হামাগুড়ি দিয়ে পড়ি। কিন্তু দুঃসাধ্য-সাধনার সূত্রপাতেই দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

তার থেকে আমার পা ফসকায়। ছেলেদের উত্তেজিত চীৎকারে আকাশ যেন অকস্মাৎ চৌচির হয়ে ফাটে, কিন্তু সমস্ত চেঁচামেচি ক্রমশ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে।

তার থেকে আমি পড়ে যাই। কিন্তু পড়ে যাবই বা কোথায়? যে চুম্বক লাগানো জুতো পায়ে, তাতে পড়া অত সহজ নয়। এতক্ষণ আমি ছিলাম তারের উপরে, আমার উপরে এখন তার থাকে—আমি ঝুলতে থাকি ঘুড়ির মতই, ঘুড়ির পাশাপাশি। সেই সার্কাসের দুর্ঘটনার মতই আবার।—কী বিপদ ভাব দেখি!

নিচে মহা হৈচৈ! ততক্ষণে ছেলেরা সব ভারী লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। তাদের উৎসাহ দেখে কে! আমার, 'ঝোঝুল্যমান' অবস্থা—আমি নিরুপায়। ঘাড় বাঁকিয়ে আড় নয়নে কেবল তাকাই। সমবেত সকলের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করি—কি আর করব?

এতক্ষণ বাদে সকালের সেই মামা এগিয়ে আসেন—চকোলেট খাওয়া মামা।
—আহা কি করছ তোমরা! ভদ্রলোককে নামাবার ব্যবস্থা কর। শুধু লাফালে কি হবে?

মামা, তোমাকে ধন্যবাদ। আমার মনোব্যথা তুমি বুঝেছ। মনে মনে তাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞ হই।

—অমনি করে ঝুলে থাকা যায়? ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে না? ওইভাবে কতক্ষণ ওখানে থাকবেন?

বলুন মামা, আপনিই বলুন। এভাবে কতক্ষণ থাকা যায় এই শূন্যমার্গে?

মামা একটা দড়ি যোগাড় করে আনেন নিজেই। তাতে ফাঁস লাগিয়ে ঘুরিয়ে ছেড়ে দেন উপরে আমার দিকে। বার কয়েক ব্যর্থ চেষ্টার পর দড়ির ফাঁসটা আমার গলায় এসে বাধে।

মামা বলেন, বি রেডি সব্বাই! এক হ্যাঁচকায় নাবিয়ে আনব। তোরা হাত পেতে তৈরি থাক—পড়লেই লুফে নিবি। হেঁইয়ো!

এইবার সত্যিই আমার হৃৎকম্প শুরু হয়।—অমন কাজও করবেন না মামা। আমি প্রতিবাদ করার প্রচেষ্টা করি,—তাহলে ফাঁসি হয়ে যাব যে। এখনো তো আপনাদের কাউকে আমি খুন করিনি!

মামা বলেন, তাহলে? তাহলে উপায়? তাহলে একটা মই নিয়ে আয়। হরেকেষ্টর বাড়ি আছে তেতলা-সমান মই, চেয়ে আন গে। মই ধরেই নেমে আসতে পারবেন তারেশ্বরবাবুঃ

হ্যাঁ, তা হয়তো পারবেন। তারেশ্বরবাবু মনে মনে ঘাড় নাড়েন।

মই আসে।

আমার বরাবার খাটানো হয়।

মইয়ে আমি হস্তক্ষেপ করি।

পা আমার উপরের দিকে, মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও মহত্তর আকর্ষণের কবলে—একান্ত অসহায়। কিন্তু হাত আছে, হাতই পায়ের অভাব মোচন

করবে এখন। লোকে যেমন পা চালিয়ে নামে, আমাকে তেমনি এখন 'স্টেপ বাই স্টেপ' হাত চালিয়ে নামতে হবে।

নামবার উদ্যোগ করছি, আবার ছেলেদের আর্তধ্বনি।—ঘুড়ি ঘুড়ি! ওটাকেও আনবেন ঐ সঙ্গে—

হ্যাঁ, ওকেও নিয়ে যাওয়া চাই। তা নইলে সেই একশ টাকার নোটখানাই হয়তো ঘুড়ির মতো উড়িয়ে দিতে হবে। আর, যার জন্য এত কাণ্ড, এত হাঙ্গামা, তাকেই কি ফেলে যাওয়া চলে?

ঘুড়িটাকে করতলগত করার জন্য হাত বাড়াই।

কিন্তু এমনি দুর্বিপাক—

এতক্ষণ ব্যাটা পাশেই ঝুলছিল অম্লানবদনে, কোনো উচ্চবাচ্য করেনি, কিন্তু এখন এই মুহূর্তেই কোত্থেকে দমকা বাতাস এসে পড়ল আর সেটা গেল নাগালের বাইরে চলে।

এখন সে উড়ছে তারের উপরে—ঠিক যেখানে একটু আগে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, সেই জায়গায়।

আমি আছি ত্রিশূন্যে, আর সে আমার শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে।

প্রকৃতিরসিকের রসিকপ্রকৃতি

হীরু নিজের নামই পালটে ফেলল—মনে মনে। পালটে রাখলো কণ্ঠভূতি। গুরুভক্তি গুরুতর ভক্তি হয়ে দাঁড়ালে যা হয়।

গোমো-প্যাসেঞ্জারের ইণ্টারক্লাসে দু'জন মোটে যাত্রী। একজন আধাবয়সী, অপর জনের বয়স বাইশ থেকে বিয়াল্লিশ—এর মধ্যে যা-কিছু আন্দাজ করে নেয়া যায়। এই অপরজন অপর কেউ নয়, আমাদের হীরু।

রামরাজাতলা পেরুতেই আধাবয়সীটি পাঞ্জাবীর পকেট থেকে আধপোড়া বিড়িটা বার করেছেন। সহযাত্রীর দিকে নেক্‌নজর দিয়েছেন তারপর—"দেশলাই আছে মশাই?'

হীরু যেন শুনতেই পায় না।

আধাবয়সী দ্বিতীয় বার মনোযোগ-আকর্ষণের প্রচেষ্টা—'দেশলাই—ম্যাচিস?'

'নাঃ।' ভুরু কুঁচকেই বলে হীরু—'ভাল জ্বালাতন!' এই দ্বিতীয় বক্তব্যটা অর্ধস্ফুটস্বরেই ব্যক্ত হয় ওর।

বিড়ি-হাতে ইতস্তত করেন ভদ্রলোক, কিন্তু মৌড়ীগ্রাম পেরুবার পর আর তাঁর ধৈর্য থাকে না। বাঁ-পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটাকে বাহির করেন। এতক্ষণ পরে অগত্যা অত্যন্ত দুঃখের সহিত একটা কাঠি তাঁকে বর্‌বাদ করতে হয়। দুনিয়ার যা গতিক—বাজে খরচ এড়াবার যো কি! সামান্য একটা দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে সাহায্য করবে, এমন কেউ কি আছে কোনোখানে? দেশের কোথাও নেই। পরের বাড়া-ভাতে কাঠি দেয়ার লোক আছে, কিন্তু পরের বারকরা বিড়িতে কাঠি দিয়ে উপকার করবে, তেমন মতিগতি কি আছে কারো এই স্বার্থপ্রবণ সংসারে?

দু'জনেরই দৃষ্টি জানালার বাইরে। অনেকক্ষণ থেকেই। দেখতে দেখতে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন আধাবয়সী—'দেখছেন মশাই, দেখছেন? কী সুন্দর, কী অবর্ণনীয়।'

হীরু ভাল করে দেখে—'কোথায় বলুন তো?' স্বভাবতঃই তার কৌতূহল হয়।

'কেন, ঐ। ঐ মাঠেই তো! ঐ মাঠের ধারে! দেখুন না, আমার শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে!'

'কই দেখি।' উৎসাহবোধ না করলেও সে রোমাঞ্চ দেখতে উদ্‌গ্রীব হয়।

'আহা, আমার গায়ে কি দেখছেন? ঐ মাঠে! মাঠেই দেখুন না!'

'হ্যাঁ, দেখেছি। গাইগুলো বেশ পুরুষ্টু পুরুষ্টু।' হীরু মাঠের দিকে তাকায়, তাকিয়ে আরো গম্ভীর হয়ে যায় হীরু।

'গরু কি মশাই, ঘেঁটু ঘেঁটু।'

এবার হীরু খুব মনোযোগ দিয়েই দেখার চেষ্টা করে। চোখ পাকিয়েই দেখে, কিন্তু যতই পালিয়ে দেখুক, প্যাসেঞ্জার গাড়ি হলেও তত আর কিছু আস্তে চালাচ্ছে না যে, গরুর সঙ্গে গরুর অপভ্রংশ ইত্যাদিরাও তার চক্ষুগোচর হবে।

'গরুই দেখছি, ঘুঁটে তো দেখতে পাচ্ছি না মশাই?'

'ঘুঁটে নয়, ঘেঁটু—ঘেঁটুফুল। ঐ যে এন্তার ফুটে রয়েছে—মাঠ ছেয়ে।'

'ওঃ তাই বলুন!' হীরু তেমন উদ্দীপনা পায় না! ঘেঁটু তো কি! কি তাদের নিয়ে এমন ঘোঁট পাকাবার? সারা মাঠ যদি ঘেঁটুফুলে ঘুট ঘুট করে—তাহলেই বা কি? ঘুঁটে হলেও কথা ছিল বরং—কাজে লাগে।'

'হায়! ফুলের চোখ নেই আপনার!' আধাবয়সী দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই একটি সুদীর্ঘ বাক্য ত্যাগ করেন—'ফুলের চোখ ক'জনের আছে, ফুলের মর্ম বোঝে ক'জন, প্রকৃতি রসিক ক'জনা হয়?'

হীরু কান খাড়া করে শুনে যায়, বুঝতে পারে না কিন্তু। মুখ বুজে থাকে চুপ করে।

'আপনি বুঝি ফুল ভালবাসেন না?'

হীরু একটু হকচকিয়েই গেছে। এত মাথাব্যথা কেন রে বাপু, ফুল-টুল নিয়ে? হঠাৎ সে কিছু বলে বসতে চায় না। কে জানে, ফুলকে না চেনা হয়তো অমার্জনীয় একটা অপরাধ; ফুলকে ভাল না বাসা বোধহয় ঘোরতর বোকামি! কে জানে!

অনেক ভেবে চিন্তে, স্মৃতি-সমুদ্র তোলপাড় করে বেশ ওয়াকিব্‌-হাল্ হয়ে তবে সে জবাব দেয়—'হ্যাঁ, ভালবাসি—'মাথা নেড়ে সে বলে—'ভালবাসি বই কি!'

আপ্যায়িত হন আধাবয়সী—'কোন্ ফুল আপনার সবচেয়ে প্রিয়? বলুন শুনি?'

হীরু আঙুল কামড়ায় আর ভাবে। মাস্টারের দুরূহ প্রশ্নের সামনে বিগত শতাব্দীতে ক্লাসের বেঞ্চে দাঁড়িয়ে যা ছিল তা চিরকালের বদভ্যাস।

'কোন্ ফুল ?' ভদ্রলোক একে একে নাম জাহির করেন, 'কুমুদ, কহলার, করবী ? বেলি, চামেলী, যূঁই ? মালতী, বেলা, বকুল ? জবা, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ ? হেনা, কেয়া, হাস্নুহানা ? জলপদ্ম ? না স্থলপদ্ম ?'

হীরু তখনও দাঁত খুঁটছে—তার প্রিয়তম ফুলের নামটি সর্বজনসমক্ষে ঘোষণা করবে কিনা ভাবছে মনে মনে।

ভদ্রলোকের দ্বিতীয় দফার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তৎক্ষণে—'চাঁপা, ডেইজি, ভায়োলেট ? রোজ, টিউলিপ্, ড্যাফোডিল্ ? ক্রিসেন্‌থিমাম্, রডোডেন্‌ড্রন্ ?'

এবার পিলে চম্‌কে যায় হীরুর। মরীয়া হয়ে সে বেফাঁস করে ফ্যালে ফস্ করে—'আমি ? আমি ভালবাসি—বলবো ? কুমড়োর ফুল। ব্যাসমে ভেজে কেমন বড়া করেন না। খেতে বে—শ।'

বড়াই করার মতই ভালবাসো, কিন্তু তারই আঘাত যেন বজ্রাঘাত! বিনামেঘেই মাথার ওপর! সামলে উঠতে সময় লাগে ফুল-দরদীর।

তৎক্ষণে আদ্দুল ছাড়িয়েছে গাড়ি। ভাবতে ভাবতে চলেছেন ভদ্রলোক। প্রকৃতির প্রতি প্রেমই প্রকৃত প্রেম—সেই রসের রসিক কি করে নেবেন এই আনাড়িকেও ? এই মেহাত কুমড়ো-কাতরকে তাঁর স্বধর্মে দীক্ষিত করা কি সহজ হবে ? এই কুমড়োপটাশকে নিয়ে করবেন তিনি সেই মহৎ দুশ্চেষ্টা ?

অবশেষে বহুত—বিবিধ চিন্তার পর প্রকৃতি-প্রেমের প্রথম ভাগ তিনি খুলে ধরেন—'ওই যে দূরে—দেখতে পাচ্ছেন ? কি দেখছেন ?'

ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে হীরু—'ঘেঁটু ? কই ঘেঁটু তো আর দেখছি না ?'

'আহা, ঘেঁটু কেন গো ? গাছপালা ! গাছপালা দেখছেন না ?'

'দেখব কি, পালায় যে। রেলগাড়িতে বসে কি দেখবার যো আছে মশাই ?'

অক্ষর-পরিচয়ের গোড়াতেই বাধা। বৃক্ষ-বিশারদ একটু বিচলিতই হন, 'এখন গাড়ি ছুটছে কিনা, তাই গাড়ির তাড়ায় পালাচ্ছে অমন করে ! নইলে ওরা পালায় না, দাঁড়িয়ে থাকে ঠায় ! নড়ে না চড়ে না পর্যন্ত। মানুষের চেয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসার ওই তো সুবিধে। ওইখানেইতো ! মানুষ পালিয়ে যায়, প্রকৃতি পালায় না ! তাড়া করলেও না !'

হীরু বলে—'হুঁ।'

'মানুষকে আমরা ভালবাসি কেন ?' শিক্ষা এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে—গাড়ির সঙ্গে তাল রেখে—'হাত-পা আছে বলেই তো ? তাও তো মোটে দু'টো হাত আর দুখানি পা, তার বেশি আর একটাও না। কিন্তু গাছপালার ? শত শত হাত—কত শত বাহু ! ঐগুলোই তো ওর শাখা-প্রশাখা। তবে গাছপালা ফেলে মানুষকে ভালবাসতে যাব কেন ?'

'গাছের কিন্তু পা নেই।' হীরু ক্ষোভ প্রকাশ করে। পাহাড় প্রমাণ এই খুঁতটির জন্যই খুঁতখুঁতে হয়ে উঠে।

'তাই তো পালাতে পারে না, তাই তো ওর নাম পাদপ। সেই কারণেই তো মানুষের চেয়ে ওরা উপাদেয়।'

'মানুষকে ?' সন্দিগ্ধ হয় হীরু : 'মানুষকে ভালবাসব কেন ?'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে কয় : 'অবিশ্যি একেবারে যে ভালবাসা যায় না তা নয়। হাতে কোনো কাজ না থাকলে নাহোক খইভাজার বদলে মানুষকে হয়ত ভালবাসা যায়। কিন্তু তাকে ভালোবাসার কী আছে বলুন ?'

'তাই বলে কে। মানুষকে ভালবাসতে যাব কেন ? কী আছে মানুষের ! প্রকৃতির রূপগুণের কাছে মানুষের রূপগুণ ? আরে ছ্যা ! প্রকৃতির ভালবাসার কাছে মানুষের ভালবাসা ? মানুষকে ভালবাসার ঝক্কি কত ? ঝামেলা কম নাকি ? তাকে কাট্‌লেট খাওয়াও, বায়োস্কোপ দেখাও। তাকে প্রেজেণ্ট দাও, তার কাছে প্রেমেই থাকো ! কেবল খরচা আর খরচা ! দূর দূর ! মানুষকে আবার ভালবাসে মানুষ ! তারপর সে যদি ভুলে প্রতিদান দিতে শুরু করে, তখন আবার আর এক ঠ্যালা—তার ভালবাসার ঠ্যালা সামলাও তখন ! মানুষ একবার ক্ষেপলে ভালবাসতে লাগলে রক্ষে আছে আর ? তখন পালিয়ে বাঁচো—পারো যদি ! বাব্‌বা সে কী ঝনঝাট্‌ !'

'যা বলেছেন !' হীরুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যেন খাপে খাপ মিলে যায়।

'প্রকৃতির বেলা এসব মুশকিল নেই কিন্তু ! এক পয়সার বাজে খরচাও হয় না।'

রসিক লোক প্রথমে রসি দিয়ে বাঁধেন, পরে সিক্‌ দিকে বেঁধেন—আসল কথাটি তিনি ব্যক্ত করেন অবশেষে—'নিখরচায় ভালবেসে নাও—যতো পারো। যেমন খুশি।'

হীরু মুহ্যমান হয়ে পড়ে : 'আমিও আজ থেকে মানুষকে তালাক্‌ দিয়ে দিলাম।'

'আমি বন ভালবাসি, জঙ্গল ভালবাসি, বুনো জংলীদের ভালবাসি, বনমানুষকেও ভালবাসি। কিন্তু মানুষ ? মানুষ আমার দুচক্ষের বিষ ! টাকা ধার নেয়, নিয়ে সুদ দেয়, ঐ দিনকতক—দু-এক মাসই কেবল—তারপর আর সুদও দেয় না। শোধ তো দেয়ই না, দেখাই দেয় না শেষটায় ! হাড় ভাজাভাজা করে খায় ! নাঃ, হাড়-হাভাতেদের ওপর আমি চটে গেছি।'

'আমিও', হীরুও ঘোরতর রেগে যায় অকস্মাৎ। যদিও টাকাকড়ি নিয়ে কিংবা দিয়ে কোনোদিন কেউ তার সঙ্গে ছলনা করেনি কখনো, তবুও রাগবার কথাই বটে !

'ছোটবেলা থেকেই আমি প্রকৃতির বুকে লালিত, প্রকৃতির স্তন্যে পালিত, প্রকৃতির কোলেই মানুষ। আমার খান দুই বই আছে, পড়ে দেখবেন, 'গাছপালার ভালবাসা,' আর 'বনজঙ্গলের বাহুপাশে'—বাই ভবভূতি ভট্টাচার্য। দেখবেন পড়ে, অনেক কিছু শেখবার রয়েছে তাতে।'

ভবভূতি ভট্টাচার্য ! ইনিই—ইনিই কি সেই সুবিখ্যাত—সেই প্রায় অপরাজেয়—? হীরু অভিভূত হয়ে পড়ে ; নিজের নামই বদলে ফেলে, বদলে রাখে কঠভূতি ! গুরু বলে মনে মনে মেনে নেয় ভবভূতিকে—এতদিনে, সৌভাগ্য-বশে, নিজের গাড়িতে বসেই সে অকস্মাৎ পেয়ে গেছে বনের মানুষকে—

তার মনের মানুষকে! কঠভূতি! কী মানে হয়, কে জানে! কিন্তু গুরুর নামের সঙ্গে গুরুতর মিলে মিলিত করে নিজেকে সে সম্মানিত করে। বিগলিত হয়ে বলে—'আমিও! আমিও প্রকৃতির বুকে খুব দৌড়েছি ছেলেবেলায়। কত কাপ আর মেডেলই না উইন্‌ করলাম! গড়ের মাঠে কি কম প্র্যাক্‌টিস্‌টাই করেছি মশাই?'

'গড়ের মাঠে?'

'কেন, গড়ের মাঠ কি প্রকৃতি নয়?' হীরুর সংশয়াকুল প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, প্রকৃতি বই কি! প্রকৃতিই। তবে কেল্লার কাছে, এই যা!'

'একটু কঠোর প্রকৃতি। এই তো? তা, যা বলেছেন! পা হড়কে গিয়ে কত আছাড়ই না খেতাম—বাপস্‌! তখনই হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম যে, জায়গাটার প্রকৃতি ভাল নয়। ততো সুবিধে প্রকৃতির নয়!'

'আপনি বুঝি দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন্‌ ছিলেন এককালে? নামটি কি, জানতে পারি আপনার?'

'আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকঠভূতি চট্টোপাধ্যায়।'

'কঠভূতি? কঠভূতি আবার কি?' ভবভূতিকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দেয়।—'এরকম নাম আবার হয় নাকি? মানে কি এ নামের?'

'খুব টানা-হ্যাঁচড়া করলে মানে একটা বেরয় অবিশ্যি। কঠভূতি, কিনা কাঁঠালের ভূতি!' হীরু প্রকাশ করে বলে—'বেশ একটু প্রাকৃতিক গন্ধও আছে, নয় কি?···হেঁ হেঁ···! কাঁঠালের কোয়াটোয়া খেয়ে ওটাকে বাইরে ফেলে দিন না, দেখবেন, কেমন মাছি ভন্‌ ভন্‌ করছে—রাজ্যের মাছি! প্রকৃতির রাজ্য থেকেই আমদানি সব। আমদানি বা কাঁঠালদানি—যাই বলুন!'

যাকে আনাড়ি ভেবেছিলেন, তার নাড়িতে পর্যন্ত প্রকৃতির ছাপ—পেল্লায় রকমের! ভবভূতি ধাক্কা খান এবার! অতি কষ্টে আত্মসংবরণের পর তাঁর প্রশ্ন হয়—'তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে মশায়ের?'

'আজ্ঞে, রাঁচি। মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি কিনা!'

'আমিও রাঁচিতেই। তবে মামা-টামার বাড়ি নয়—প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে। শুনেছি ভারী সুন্দর—সুঠাম জায়গাটা।'

এইভাবে ওদের আলাপ আর গোমো-প্যাসেঞ্জার সবেগে এগিয়ে চলে। প্রকৃতির মারপ্যাঁচটা একবার বুঝে নিয়েই কঠভূতি তারপর অনেক বিষয়েই ভবভূতির তুরুপের পিঠে নিজের টেক্কা মেরে বসেছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কঠভূতির টক্করে-বেটক্করে পড়ে কতোবার যে নাজেহাল হতে হয়েছে ভবভূতিকে!

পরদিন প্রাতঃকালে মুড়ি-জংশন—গাড়ি অদল-বদলের জায়গা। ভবভূতি ও কঠভূতি দুজনেই নেমে পড়েন। ওপারের ছোটো লাইনে রাঁচির গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

নেমেই এদিক-ওদিক কী যেন খোঁজাখুঁজি করেন ভবভূতি। 'নাঃ, কোথায় আছে, কে জানে!'

'ও! প্রাকৃতিক সৌন্দর্য? প্রকৃতিকে খুঁজছেন?' গুরুদক্ষিণা-দানে উদগ্রীব কণ্ঠভূতি—'কেন, ঐ যে সামনে, এই যে পিছনে—ওই ওপরে—আশে-পাশে চারিদিকেই তো! নেই কোথায়? ঐ দেখুন, ওধারে পাহাড়, এধারে রাঙামাটির পথ, কতো দেখবেন! আর ঐ দূরে ঘন—ঘনায়মান ঘনীভূত অরণ্য!'

'থামুন মশাই!' ভবভূতি বাধা দেন—একটু বিরক্ত হয়েই।

'থামব? থামব কেন? প্রকৃতির সামনে কেউ কখনো থামতে পারে? এমন হৃদয়াবেগ থামানো যায় কখনও? ঐ—ঐ দূরে দিগ্বলয়রেখা—সুনীল আকাশের গায়ে ভাঙা মেঘের—? কি বলব—? ভাঙা মেঘের কারচুপি! কিন্তু ঐ কারচুপি ভেঙে শিশু-সূর্যের পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ? প্রকৃতির শিশুকে কি লুকিয়ে রাখা যায়? রাখতে পারে—ঢাকতে পারে—রুখতে পারে কেউ? আর—আর সূর্য—সূর্য তো প্রকৃতিরই শিশু! নয় কি?' সন্দেহজনক জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকায় কণ্ঠভূতি। 'প্রকৃতির নগ্নশিশু, কি বলছেন?'

'আপনি যে—আপনি যে—' কণ্ঠভূতির প্রতি কঠোর হতে হয় তাঁকে। 'আমাকেও ডিঙিয়ে যাচ্ছেন একলাফে। চোখ আমাদেরও আছে মশাই! আমি খুঁজছি—কোথায় মুড়ি পাওয়া যায়, আর উনি লাগিয়েছেন প্রকৃতির ব্যাখ্যানা।'

'মুড়ি? মুড়ি কেন? মুড়ি কি এখানে মেলে?'

'বাঃ, মুড়ি-জংশন্ যে! মুড়ি থাকবে না? কাল সারারাত তো পেটে কিল মেরেই কেটেছে!'

'মুড়ির দরকার কি? আমার সঙ্গে এক বাক্স খাবার আছে। লুচি, আলুর দম, সন্দেশ—কতো কি! টিফিন্-ক্যারিয়ার্ ভর্তি একবারে।'

'বাঃ, বলেননি এতক্ষণ একথা? ভবভূতি লুফে নেন কথাটা—লাফিয়ে ওঠেন কথার সঙ্গে—'বেশ লোক তো আপনি!'

'কাল রাত্রে আপনিও খাওয়ার কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। আমি ভাবলাম, প্রকৃতি-প্রেমিকদের বুঝি খাবার লালসা থাকতে নেই। তাদের হয়তো একবেলা খেলেই হয়!' হীরু আস্তে আস্তে বিশদ হয়—'তাই—তাই আমিও—আপনার দেখাদেখি খেলাম না আর।'

'তা না খেয়েছেন, ভাল করেছেন'—বলতে না বলতে রাঁচির ছোটো গাড়িতে উঠেই না আহারের বহর ছোটান ভবভূতি। টিফিন্ ক্যারিয়ারের তিন তালা একাই তিনি ফাঁক করেন, কণ্ঠভূতির তালু দেবার জন্যে কেবল নিচের তালাটা অবশিষ্ট থাকে।

পেট ঠাণ্ডা হবার পর প্রকৃতির সৌন্দর্য আবার পরিব্যক্ত হতে থাকে। রাঁচির গাড়ি চলেছে ঢিমে তেতালায়। দুধারেই শালবন—শাল দোশালার সমারোহ! উত্তুঙ্গ গাছগুলির দিকে তাকিয়ে ভবভূতির প্রকৃতি ভুঙ্গী হয় আবার—'কণ্ঠভূতিবাবু, দেখুন দেখুন! চেয়ে দেখুন! না চাইতেই ঢেলে দিচ্ছে। প্রকৃতির লীলা বলতে হয় তো একেই। আমি কেবল আশ্চর্য হয়ে এই ভাবি, যেখানে জনমানবের বসতি নেই, সেখানেই প্রকৃতি-রানীর এমন অগাধ ঐশ্বর্য ছড়িয়ে রাখার কী মানে! কে দেখবে এত রূপ—বুঝবে কে?'

কঠভূতিও উত্তাল হয়ে ওঠে—'কেন, বাঘ-ভালুককে ? তাদের জন্যেই তো এত ! চোখ আছে মশাই তাদের—তাদেরও। বেশ ধারালো চোখ—মানুষের চাইতেও চোখা ! প্রকৃতির মর্ম পশুতেই বোঝে—মানুষ কি বুঝবে বলুন ?'

'তা বটে !' সখেদে বলেন ভবভূতি—'বিউটি অ্যান্ড্ দি বীস্ট' বলে একটা বয়েতই রয়েছে বটে ! কিন্তু কথা তো তা নয়, কথা হচ্ছে যখন চাল্শে ধরবে, চোখে ছানি পড়বে, ভাল দেখতে পাব না—এই শালগাছের সার, ঐ দূরের পাহাড় আর আমার চোখে ধরা দেবে না—তখন—তখন আমি বাঁচব কি করে ! কী নিয়ে বাঁচব—কিসের জন্যেই বা ! এই কেবল আমি ভাবি।'

তাঁর পরিত্যক্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই কঠভূতির ব্যবস্থাপত্র বেরিয়ে যায়—'কেন, আপনি আত্মহত্যা করবেন তখন। কিজন্যে বাঁচতে যাবেন আর ?'

'আত্মহত্যা !' ভবভূতির প্রাকৃতিক পিত্ত জ্বলে ওঠে—'মরা কি এতই সোজা নাকি মশাই ? তাহলে আর ভাবনা ছিল না।'

'এমন আর শক্ত কি ? টীকে না নিয়ে বসন্ত-রুগীর মড়া ফেলুন, কাঁঠাল খেয়ে কলেরা-রুগীর সেবায় লেগে যান, তাহলেই আর দেখতে শুনতে হবে না ; আত্ম-হত্যার পাপও ফস্কাবে, অথচ বেশ সহজেই টেঁসে যেতে পারবেন।'

দেহরক্ষার এই অবলীলাক্রম—ঘুরিয়ে নাক দেখার এই ঘোরালো কায়দা একেবারেই ভাল লাগে না ভবভূতির ! আত্মমেধের একটা রাজসূয় ব্যাপার এ যেন ! তিনি পাশ কাটিয়ে কেটে পড়তে চান—'নাঃ, কি দরকার ! চাল্শে আর হবে না। এই বয়সে কি চাল্শে হবার ভয় আছে আমার ? ষাটের পর কি চাল্শে হয় কারো ? পাগল !'

ষাটের বাছাদের চাল্শে-গ্রস্ত হবার অপূর্ব সুযোগলাভের এমনই বা কি অসম্ভব ও অসঙ্গত রকমের বাধা আছে, এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঘোরতর তর্কের উপক্রম বাধতেই সিলি ইস্টিশন প্রসঙ্গের মাঝখানে এসে পড়ে, মাঝে পড়ে বিরল-দর্শনের সমস্যাকে বেমালুম চাপা দেয়।

সিলি পেরুতেই ফের সেই দীর্ঘকায় শালগাছের জনতা—দু'ধারে সেই দিগন্তবিস্তারী বিশালতার দিকে তাকিয়ে আচম্বিতে উথ্লে ওঠেন ভবভূতি—'কতক্ষণই বা এই অপরূপ রূপসুধা পান করতে পাবো ! কী জোরেই যে ছুটছে গাড়িটা ! এক্ষুনি সব পেরিয়ে যাবে, এড়িয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে, ছাড়িয়ে যাবে, উড়িয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে—চিরদিনের মতই !'

'দেবো চেন টেনে ?' গাড়ির শেকলের দিকে ভ্রূকুটিকুটিল ভ্রূক্ষেপ কঠভূতির !

'চেন ? চেন কেন ?'

'তাহলে এখনই থেমে যাবে গাড়িটা—এইখানেই ! থেমে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে খানিক।'

'বাঃ, আর পঞ্চাশ টাকা গুণোগার দিতে হবে না ?' কঠভূতির উদ্ধত হস্তকে তিনি শশব্যস্তে বিনীত করে আনেন। 'কে ? টাকাটা দেবে কে শুনি ?'

ভবভূতির কথায় কঠভূতির খুবই ঘা লাগে, সে অবাক্ হয়ে যায় ! বাস্তবিক ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন ঠেকে তার কাছে। টাকার জরীপে যারা সুষমার

পরিমাপ করে—জরিমানার ভয়ে হাত গুটিয়ে নেয়, কঠভূতি তাদের কখনও মাপ করতে পারে না। তাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই ! রূপের রাজ্য হুহু-শব্দে হটেই চলে, কঠভূতিও ক্রমেই আরো গুম্ হতে থাকে।

এরপরেই একটা ওয়াটারিং ইস্টিশন। ইঞ্জিনের জলযোগের সুযোগে গাড়ি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ায় সেখানে। 'আসছি' বলে উঠে পড়ে কঠভূতি ; ইস্টিশনের উলটো দিকে নেমে অন্তর্হিত হয় হঠাৎ। বহুক্ষণ আর দেখাই নেই তার, ভবভূতি ভারী ব্যতিব্যস্ত হন ! এখুনি ছেড়ে দেবে যে গাড়ি !

গুরুই বড় বটেন, কিন্তু শিষ্য দড় হয়ে উঠলে গুরুকে লঘুপাক করতে কতক্ষণ ? গুরুর লঘুকরণে চ্যালারা খুব মজবুত ! ফিফ্‌থ্ ক্লাসের ছেলে যখন ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ে, তখন একেবারে ওস্তাদ হয়ে দাঁড়ায় ! এক নম্বরের ইয়ার ! প্রাক্তন ইস্কুলের ফিফ্‌থ্ মাস্টারের কি পুনরায় কান্ মলতে পাবার কোনো প্রত্যাশা আছে তার কাছে ? কঠভূতির প্রকৃতি-প্রীতি উন্মাদনার কাছে নিজেকে পরাস্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয় ভবভূতির !

এই প্রকৃতির সাম্রাজ্যে হারিয়ে গেল না তো ছোক্‌রা ? চতুর্দিকে ব্যাকুল-দৃষ্টি ভবভূতির, মায় শালগাছগুলোর আপাদমস্তক। বন্য-প্রকৃতিকে তন্নতন্ন করে তিনি দেখেন। কে জানে, কোথায় কোন্ গাছের ডগায় চড়েই বসে আছে কিংবা ডাল ধরেই দোল খাচ্ছে হয়তো বা—ক্ষেপে গেলে অসম্ভব কিছুই তো নয় ! কিন্তু ছাড়বার মুখেই হাঁস্-ফাঁস্ করতে করতে গাড়িতে এসে উঠে পড়ে কঠভূতি।

'কাজ সেরেই এলাম।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—'আফশোস্ আর রাখলাম না।'

'কিসের আফশোস্ ?'

'কোথায় গেছলুম, বলুন দেখি ?'

'কি করে বল্‌ব ?' ভবভূতির মেজাজ তখনও বেশ তেতে, 'কোনোও গাছের সঙ্গে পটে গিয়ে লট্‌কে গেছলে নাকি ?'

'আজ্ঞে না।'

'যা গেছো কাণ্ডাকারখানা দেখিয়েছ, আশ্চর্য নয় !'

'এই কুড়ি মিনিটে আমি দেড় মাইল দৌড়ে গেছি আর দৌড়ে এসেছি, জানেন ?'

'এই ফাঁকে একটু হাওয়া খেয়ে এলে বুঝি !'

'হাওয়া নয় মশাই, দেড় মাইল দূরে এক জায়গায় রেলের লাইনটা বেঁকে গেছে, সেই বাঁকের মুখের ফিসপ্লেট্‌টা সরিয়ে রেখে এলুম !'

'কেন বল তো ? ফিস্‌প্লেট যতদূর বুঝেছি, তোমার এক প্লেট ফিস্ নয় যে, সরিয়ে রেখে খাবে—খেয়ে আরাম পাবে ?' ভবভূতির বিশ্বাস হয় না। 'ফিসপ্লেট কি জিনিস ?' জিগ্যেস করেন তিনি।

'ফিস্‌প্লেট্ হচ্ছে লাইনের জোড় ! জোড়ের মুখের প্যাঁচ। গাড়ির মারপ্যাঁচ হীরু জানায়—'গাড়িকে মারবার মারপ্যাঁচ !'

'তার মানে'। কথাটা যেন কেমনতর লাগে ভবভূতির।

'মানে, ওখান দিয়ে গেলেই গাড়িটা ডিরেলড্ হবে, উল্টেও যেতে পারে—ব্যস্, তখন বসে বসে মজাসে প্রকৃতির রূপসুধা পান করুন! কারও খেসারত গুনতে হবে না। এক পয়সা খরচা নেই—তোফা!'

এতক্ষণে সমস্ত রহস্যভেদ হয়। মুখে বাক্ সরে না, ভবভূতির দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। অ্যাঁ! তিনি কি তবে শুধু রাঁচিই যাচ্ছেন না, রাঁচিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন—এক কামরায়, নিজের কাছাকাছি বসিয়ে? বিদ্যোমাত্রই গুরুমারা, কিন্তু তার চোট কি এতদূর—গুরুকে প্রাণে মারা অব্দি গড়াবে—কী সর্বনাশ! কঠভূতির প্রকৃতিনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখে তাঁর তাক্ লাগে।

'এবার আমাদের সৌন্দর্যের স্বর্গ থেকে এক পা সরায় কার সাধ্যি! চেন্ টান্তেও হবে না, জরিমানারও ভয় নেই, বেশ মজাসে—হেঁ-হেঁ।' টেনে টেনে হাসে হীরু।

হীরুর প্রাণ-টানা হাসির ধমকে অব্যক্ত আতঙ্কে সর্বশরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে ভবভূতির! কী ভয়ঙ্কর! আর কমুহূর্তই বা বাকি রয়েছে লাইনের বাঁকে পৌঁছোতে? ওল্টাতেই বা কতো দেরি আর? ভাববারই কি সময় রেখেছে ছাই! কী করবেন ভবভূতি। সময় থাকতে চেন টেনে গাড়ি থামাবেন? তাহলে আবার জরিমানার দায় আছে! এক-আধ টাকা নয়—নগদ কর্করে পঞ্চাশ। গুনে বাজিয়ে নেবে! না দিলে ফের জেলেই দেয়, কি পাগলা-গারদেই পোরে, খোদাই জানে!

ভারি সমস্যায় পড়ে গেলেন ভবভূতি! প্রাণরক্ষা ও ধনহানি—না, ধনরক্ষা ও প্রাণহানি—এর কোন্টা তিনি বাছবেন?

গাড়ির এবং মুহূর্তের চাকা এগিয়ে চলেছে দ্রুতবেগে, কিন্তু তিনিও ভাবতে ভাবতে চলেছেন - নিজের আবেগে। ভাবনার কূলকিনারা পাচ্ছেন না কোথাও। মহামারী ব্যাপার!

গাড়ি বলেই চলেছে—'ঘট্ ঘটাঘট্'—ঘট্ ঘটাঘট্—খুব ঘটা করে চলেছে গাড়িটা, কিন্তু কি করা যায় এখন? ওধারে অতগুলো টাকা যায়, আর এধারে যায় কেবল একখানি প্রাণ—একমাত্র এবং একমাত্রার একটুখানি প্রাণ। আপাতত নিজের প্রাণটাকেই তিনি গণনা করেছেন—গাড়ির আর সব প্রাণীর নিয়ে তাঁর কোনো দুর্ভাবনা নেই।...বাস্তবিক কী করা যায়?

'ঘটাং ঘট্—ঘটে ঘটুক—ঘটাং ঘট্—ঘটে ঘটুক!' গাড়িটার একঘেয়ে আওয়াজ একটু যেন পালটেছে মনে হয়। যেন হতাশ হয়ে ছেড়ে হাল দিয়েছে বেচারা!

টানবেন তিনি চেন, রুখবেন গাড়ির গতি—করবেন ক্ষতি স্বীকার? কেবল প্রাণহানি হলেও কথা ছিল, কিন্তু এযে ধনপ্রাণহানি—একধারে ধনান্তকর ও প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ! এহেন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে একান্ত কাতর আমাদের ভবভূতি।

'ঘটাং ঘট্—ঘটাং ঘট্—' আচমকা গাড়িটা আর্তনাদ ছাড়তে থাকে—'ঘটাং ঘট্ট—ঘট্ - ঘট্ ঘটাং ঘট্ট—ঘটাং দুর্ঘটাং! দুর্ঘটাৎ—ঘটাৎ!' অর্থাৎ 'যা ঘটাবার, ঘটে গেল, মাভৈঃ!' রেলগাড়ির ভাষায়।

বিরাট্ এক চীৎকার, তারপরেই বিকট বিপর্যয় ! চক্ষের পলকে পিছন দিকের কামরাগুলো নেমেছে পাশের খাদে, কয়েকটা কামরার উঠবার দুশ্চেষ্টা ব্রেকভ্যানের ছাদে এবং খোদ ইঞ্জিন-সাহেব তাঁর চাকার বাহুগুলি ঊর্ধ্বে তুলে করতাল বাজাবার কায়দায় উবু হয়ে বসে গেছেন ! মাঝের কামরাগুলো পরস্পরের সঙ্গে এমন কোলাকুলি বাধিয়েছে যে সেই মারাত্মক আলিঙ্গন থেকে তাদের টেনে ছাড়াবার কথা ভাবাও যায় না ! চারধারেই দারুণ চেঁচামেচি, হৈ-চৈ, হাহাকার ! খবরের কাগজে এহেন ব্যাপারের বর্ণনা যেমনটি আমরা পড়ে থাকি, অবিকল সেই সব কাণ্ড ।

কিন্তু এই ইলাহি দৃশ্য উপভোগ করার অবকাশ তখন কোথায় ভবভূতির ? তিনি গড়িয়ে পড়েছেন এক গভীর গর্তে । পড়ে-পড়েই প্রথমেই তিনি পকেট দেখেছেন, তারপরে ট্যাঁক হাতড়েছেন, তারপরেই কাছাকে অনুভব করছেন—কাছাই তার তৃতীয় মানিব্যাগ কিনা । আর এ সবের পরেই তিনি নিজেকে চিমটি কেটে দেখেছেন । 'উঃ, বাপ্‌রে !' নিজের চিম্‌টির ঠেলায় কঁকিয়ে উঠেছেন ভবভূতি । নাঃ, ধনে-প্রাণে মারা যাননি তাহলে—এযাত্রা !

সারা দেহ তাঁর ছেঁচড়ে, ছড়ে ছড়িয়ে একাকার ! সর্বাঙ্গে একটা জ্বালাময়ী অনুভূতি ! করুণস্বরে তাঁর কাতরোক্তি হতে থাকে—'বাবা কঠভূতি, এ কী করলি বাপ ? এই কি তোর মনে ছিল রে হতভাগা !'

কঠভূতি গড়াগড়ি যাচ্ছিল অদূরেই—তেমন কিছুই তার হয়নি । একেবারে যথাযথই রয়েছে সে । কেবল ল্যাজের কাছটায়—কঠভূতির ল্যাজ নেই, কিন্তু থাকলে ঠিক যেখানে থাকত, সেইখানটায়—কেমন যেন একটা সূচীভেদ্য যাতনা ! হাসিমুখ বার করেই সে জবাব দেয়—'ভবভূতিদা, চারধারে একবার তাকিয়ে দ্যাখো দিকি । কী অপূর্ব—কী অপরূপ - কী অপরিসীম—আহা, কী খাসা গো ! একেবারে প্রকৃতির গর্ভে এসে পড়েছি আমরা—প্রকৃতি-রসের রসাতলে ! প্রকৃত রসের রসগোল্লায় । এখন খুব মজাসে—আরাম করে—মশগুল হয়ে—হেঁ··· হেঁ···হেঁ···হেঁ···'

সেই প্রাণকাড়া টানা-টানা হাসি তার ।

ভবভূতি রোষ-কষায়িত নেত্রে তাকিয়ে থাকেন ;

প্রকৃতির প্রতি নয় কিন্তু—তাঁর কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ কেবল কঠভূতির দিকে ।

কী ছেলে রে বাবা! দিনরাত মুখ ভার করেই আছে। কেউ ওকে কখনো হাসতে দেখেনি।

চার বছর বয়স—এইটুকুন গলা, বোধ হয় একটা মুঠোর মধ্যে ধরা যায়—কিন্তু তারই কী কানফাটানো আওয়াজ! কাঁদতে শুরু করলে আর রক্ষা নেই—ঢাক-ঢোলকে ছাড়িয়ে যায়, কাক-চিলকে পাড়া ছাড়ায়।

ডাক্তার ওকে দেখে অদ্ভুত একটা অসুখের নাম করে বলছেন—যদি কখনো হাসাতে পারো তা হলেই ও ভাল হবে, তা ছাড়া ওর এই কান্না-রোগের আর কোনো দাবাই নেই।

শুনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দোলগোবিন্দবাবু তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ওকে হাসানো জলে পাথর ভাসানোর মতই যে অসম্ভব! কে ওকে হাসাবে? সে কি এই পৃথিবীতে জন্মেছে?

আলেকজাণ্ডারের পরোপকারের প্রেরণা বড় প্রবল। সে নিজে সেধে গিয়ে বলেছে—'দেখি আমি একবার চেষ্টা করে।'

বেচারা সকাল থেকে হিমসিম খেয়ে গেল। গম্ভীর লোককে হাসাবার যে কটা প্রণালী ওর জানা ছিল সবই সে প্রয়োগ করেছে—এত রকম করে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, ব্যাঙ সাজল, উট সাজল, নাড়ুগোপাল হলো—কিন্তু নাঃ, সমস্তই নিষ্ফল! এমন কি, তার বক দেখানো অব্দি নাহক হয়। ছেলেটা গম্ভীরভাবে ওর তাবত কার্যকলাপ লক্ষ্য করে, কিন্তু হাসে না।

অবশেষে আলেকজাণ্ডার বললে—'আচ্ছা, এবার ব্রহ্মাস্ত্র আছে। দেখি কাতুকুতু দিলে কেমন না হাসে।'

কিন্তু চেষ্টার শুরুতেই ছেলেটা এমন বেসুর ছাড়লে যে আলেকজাণ্ডারকে

ভড়কে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিতে হলো। কাতুকুতুতে যে কাঁদে কার সাধ্য তাকে হাসায়! বঙ্কু বিদ্রূপ করল—'তুই না ভাই দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার! খবরের কাগজে কাগজে না তোর দিগ্বিজয়ের কাহিনী বেরিয়ে গেছে, আর তুই হার মানলি একটা সামান্য শিশুর আছে?'

এতক্ষণ আলেকজাণ্ডারের প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখে ওরা হেসে লুটোপুটি খেয়েছে—সমবেত ভদ্রবালকদের মধ্যে হাসেনি কেবল দুজনা, এক সে নিজে, আর এক ঐ দুর্দান্ত অপোগণ্ডটা।

আলেকজাণ্ডার গম্ভীর মুখে জবাব দিল—'হবেই তো! পুরুর কাছে আলেকজাণ্ডার হারবে এ তো নতুন কথা নয়। বইয়েই লেখা রয়েছে না?'

বঙ্কু আশ্চর্য হয়ে বললে—'এখানে পুরু আবার কে রে?'

'কেন, ওর গলার আওয়াজ কি কিছু কম পুরু নাকি?' বলে, সে আর দ্বিতীয় বাকব্যয় না করে বিরক্ত হয়ে হোস্টেল থেকে বেড়িয়ে পড়ল। ঐ কণ্ঠস্বর আর ওদের ঠাট্টা থেকে যতক্ষণ দূরে থাকা যায় ততক্ষণই শান্তি।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দোলগোবিন্দবাবু কয়েকদিন হলো দেশ থেকে তাঁর স্ত্রী আর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে এসেছেন—ছেলের অসুখ সারানোর জন্যই কলকাতায় আনা। কোথাও সুবিধামত একটা বাসা পাচ্ছেন না বলে আপাতত বোর্ডিং-এ তাঁদের উঠিয়েছেন। আলেকজাণ্ডার মনে মনে বলল—'যেমন অদ্ভুত ব্যায়রাম, তেমনি তার চিকিৎসা! না হাসলে কাঁদুনে-রোগ সারবে না! কিন্তু যে ওকে সারাতে যাবে তাকে না ধরে ঐ রোগে! নাঃ, দেখছি আমাকেই ওদের বাসা খুঁজে দিতে হলো।' আলেকজেণ্ডার তার ভোজপুরী বন্ধু কুন্দন সিং-এর সন্ধানে চলল, সে যদি বাসার কোনো খবর দিতে পারে!

রাত হলেই ওর কান্নার উৎসাহ যেন বেড়ে যায়। দিনের বেলায় তবু মাঝে মাঝে ক্ষান্তি আছে, খাবার কিছু পেলেই থেমে থাকে, কিন্তু সারা রাত তার কী চীৎকার! দেয়াল ফুঁড়ে আওয়াজ আসে, ঘুমোনোর দফারফা! রুম-মেট বঙ্কু বিরক্তি প্রকাশ করে—'কী আপদ! থামাতে পারছে না ছেলেটাকে!'

আলেকজাণ্ডার সান্ত্বনা দেয়—'ভাই, গ্রীনল্যাণ্ডে ছমাস করে রাত—ভাগ্যিস আমরা সেখানে নেই! তা হলে কি মুশকিল যে হতো!'

বঙ্কু সান্ত্বনা পায় কি না সেই জানে! সমস্ত রাত এ-পাশ ও-পাশ করে, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের মতামত আর চায় না।

সন্ধ্যাবেলা দোলগোবিন্দবাবু অফিস থেকে ফিরতেই আলেকজাণ্ডার গিয়ে অভিযোগ করল—'দেখুন আপনার খোকা—'

'কি হয়েছে? কি করেছে খোকা?'

—'এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি করেনি আমার, তবু—' 'আলেকজাণ্ডার চুপ করে থাকে।

'বল না, যদি কিছু ভেঙে থাকে কি নষ্ট করে থাকে আমি দাম দেব।'

এবার আলেকজাণ্ডার একটু উৎসাহ পায়—'আমার একটা কপিং পেন্সিল, তার অবশ্য আধখানাই ছিল—খোকা সেটা খেয়ে ফেলেছে।'

'অ্যাঁ, বল কি! খেয়ে ফেলেছে। কখন?' দোলগোবিন্দবাবুর চোখ কপালে উঠল।

'আজ দুপুরে।'

'আজ দুপুরে? এতক্ষণ তুমি কি করছিলে?'

'ফাউন্টেন পেনে লিখছিলাম কি আর করব?'

'ডাক্তারকে খবর দাওনি কেন?'

আলেকজাণ্ডার দারুণ বিস্মিত হয়।—'ডাক্তারকে? কেন, তা হলে কি জিনিসটা পাওয়া যেত? সে যে একেবারে গিলে ফেলেছে দেখলাম।'

'কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ!'—বলতে বলতে দোলগোবিন্দবাবু অফিসের জামা-কাপড় না ছেড়েই খোকাকে নিয়ে ডাক্তার-বাড়ি ছুটলেন।

আলেকজাণ্ডার ভেবেছিল পুরো দামটা পাওয়া গেলে আবার একটা নতুন পেনসিল কেনা যাবে কিন্তু দোলগোবিন্দবাবুকে একটু আগের প্রতিশ্রুতি একটু পরেই ভুলে যেতে দেখে সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। সে পর্যালোচনা করে দেখল, ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া বৃথা, ও পেনসিল যে আর বেরুবে এ তার বিশ্বাস হয় না–ওটা যে একদম পেটে চলে গেছে, বেরুলেও গলপথে বেরুবে না, তলপথে যদি বেরয়! এতক্ষণে তার হজম হয়ে যাবার কথা।

সে গজরাতে লাগল—'হুঁঃ, মোটে তো একটা পেনসিল খেয়েছে আজ। ও যা রাক্ষুসে ছেলে, আর কিছুদিন থাকলে আমাদের জামা-কাপড়, বই-খাতা সব পেটে পুরবে, কিচ্ছু বাকি রাখবে না।'

দোলগোবিন্দবাবু ডাক্তার দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা বাসা দেখে হোস্টেলে ফিরলেন—আজ রাত্রেই স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে তিনি স্থানান্তরিত হবেন। তখন থেকে তাঁর বকবক শোনা যাচ্ছে—'কি সর্বনাশ ভাবো দেখি! এখানে রাখলে ছেলেটাকে এরা দুদিনে মেরে ফেলবে। একে ওর ওই শক্ত ব্যায়রাম, তার ওপর ওকে পেন্সিল খাইয়ে দিয়েছে! ওইটুকুন ছেলে, পেন্সিল কি ওর পেটে সইবে। আর কয়েকটা খেলেই ব্যস—তখন আর দেখতে হবে না। একেবারে যাকে বলে লেড পয়জন!'

আলেকজাণ্ডারকে এই সব স্বগতোক্তি শুনতে হচ্ছিল। পেন্সিলটা তার বড় আদরের—জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে কেনা–চার আনা দামের! একটা মৌচাক কেনা যায়, একবার সিনেমা দেখা যায় তাতে। একখানা সন্দেশ পড়া যায় কি খাওয়া যায়। পেন্সিলের ভাগ্যে যে এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটবে কোনোদিন সে তা ভাবেনি, তার এই শোচনীয় পরিণামে তার মন খারাপ হয়ে গেছল—সে কোন উত্তর দিল না।

দোলগোবিন্দবাবু বকে চললেন—'আজ তো শুধু আধখানা পেন্সিল খেয়েছে মোটে! কিন্তু কাল যদি আস্ত একটা ছুরি কি কাঁচি খেয়ে ফ্যালে, তখন কী সর্বনাশ! তখন বেচারার নাড়ি ভুঁড়ি সব কেটেকুটে যাক! তা হলে কি আর ও বাঁচবে—নাড়ি ভুঁড়ি না নিয়ে বাঁচে কেউ! একে ওর ওই শক্ত ব্যায়রাম! নাঃ, আর এখানে থাকা নয়, স্থান ত্যাগেন দুর্জনাৎ। ভালবাসা পাওয়া

গেছে, কুন্দন সিং-এর আস্তানার পাশেই। লোকটাও বড় ভাল ছেলেটাকে দেখবে-শুনবে।'

আলেকজাণ্ডার কোনো উত্তর দেয় না। এই ভেবে সে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে—ভাগ্যিস, আধখানা পেন্সিলের ওপর দিয়েই গেছে! তার বদলে যদি তার অমন চমৎকার ছুরিটা খেত, তা হলে কি ক্ষতিই না হতো তার। ছেলেটার পেটুকপনা আগে থেকে জানা গেল ভালই হলো। এর পরে ও ঘরে এলে ছুরি-কাঁচি এবং আর যা যা দামি জিনিস তার আছে সব সামলে রাখতে হবে—কি জানি, যখন ওর মতলব ভাল নয়। এ রকম রাক্ষুসে খিদে আর অদ্ভুত খাদ্যরুচির সে মোটেই সমর্থন করতে পারে না।

পরদিন কুন্দনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই সে বলল—'বাবুজি! কাল সমুচা রাত বহুত তকলিফ গিয়া, নিদ মোটে হোয়নি।'

'কেন, ফিন চোর-লোক আয়া নাকি? ফিন বিড়াল ডাকছিল?'

'না, বিল্লি আউর ডাকসে না—বিল্লিসে কি হামি ডোর কোরি? ইস্ দফে—ইস্ দফে—উস্‌সেভি জবর!'

'কি, কি হয়েছে এবার?' আলেকজাণ্ডার সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

'বিলাই নেহি, তবে বিলাইকে বাবা—ওই সুপারিনটেন্‌ডন্ বাবুকো লেড়কা। সমস্তো রাত এতনা চিল্লায়া! সে হামি কি বোলবে—হামি মোটে নিদতে পারেনি।'

চোখ লাল, দৃষ্টি উদাস—এক রাত্রির নিদ্রা-অভাবে ওই বিরাট দেহ ভোজপুরীর প্রায় ক্ষেপে যাবার দশা হয়েছে দেখে আলেকজাণ্ডারের দুঃখ হলো। সে সহানুভূতি প্রকাশ করল—'কানমে তুলা দিয়ে দেখেছ?'

কুন্দন সিং হতাশ ভাবে হাত নাড়ে—'তুলাসে কি করবে? কানমে অঙ্গুলি দোবে থাকসে, তাতে ভি কিসু হোয় না।' বলে, সমস্ত রাত কেমন সজোরে কানে আঙুল চেপে ছিল আলেকজাণ্ডারকে দেখায়।

পড়ার চাপে সপ্তাহ খানেক সে কুন্দনের খবর নিতে পারেনি—ইতিমধ্যে তার অবস্থা আরো কী শোচনীয় দাঁড়িয়েছে কে জানে! সেদিন সকালে উঠেই আলেকজাণ্ডার কুন্দনকে দেখতে গেল।

কুন্দন তখন মান্ধাতার আমলের মরচে-পড়া একটা তলোয়ার নিয়ে প্রাণপণে শাণ দিচ্ছে—তার দিকে দৃক্‌পাতও করল না।

'কুন্দন সিং, তোমার তলোয়ারটা তো চমৎকার!' কুন্দন সিং উত্তরও দেয় না, তাকায়ও না। তার ভ্রূক্ষেপই নেই।

'বাঃ এমন চমৎকার জিনিসটা এর আগে দেখিনি তো! হ্যাঁ, একখানা তলোয়ার বটে!' এবার কুন্দন কথা বলল—'হামার বাবা চন্দন সিংকা হাতিয়ার!'

কুন্দনের চোখের দৃষ্টিটা যেন কী রকম! এমন অদ্ভুত চাউনি সে এর আগে ওর দ্যাখেনি।—'তা এতে ধার দিচ্ছ যে! এ দিয়ে তুমি কি করবে?'

'হামি দুশমনকে মারবে। একদম মার ডালবে।'

'যে রকম হাতিয়ারের অবস্থা, কাউকে মার ভাগতে গেলে কি ও আর আস্ত থাকবে ? যাকে মারবে তার কিছু হবে না, মাঝখান থেকে তোমার তলোয়ারটাই ভাঙবে। পৈতৃক সম্পত্তি, তার ওপরে এমন একটা দামি জিনিস এইভাবে নষ্ট করা কি ভাল ?'

কুন্দন সিং অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বলল—'চন্দন সিং-কা বাচ্চা কুন্দন সিং, হামি ভি তলোয়ার চালানো জানে।'

'জানো না তা কি আমি বলছি ! তবে তোমার দুশমন আবার কে ?'

'ওঁহি খাড়া হ্যায়, হুঁয়া সে তাকতা হ্যায় !—কুন্দন সিং-এর ইঙ্গিত অনুসরণ করে দো-তলার জানালায় দোলগোবিন্দবাবুর বংশধরকে সে দেখতে পেল। গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তারই ফাঁক দিয়ে কুন্দন সিং-এর কার্যকলাপ গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে।

কুন্দন সিং শূন্যে ঘুসি ছুঁড়তে লাগল—'সাত রোজ হামি নিদতে পারেনি, আজ হামকে ঘুমতে হোবে।'

একটু পরেই সারা পাড়ায় খবর রটল যে কুন্দন ক্ষেপে গেছে, একটা তলোয়ার হাতে নিয়ে খাড়া, ও-পথে যে যাচ্ছে তাকেই তাড়া করছে। এমন ক্ষেপা ক্ষেপেছে যে তলোয়ার কি করে ধরতে হয় তা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে, ধারালো দিকটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বাঁটের দিক দিয়ে যে সামনে আসছে তাকেই দু এক ঘা কসিয়ে দিচ্ছে। বাঁটিয়েও দিচ্ছে বলা যায়।

আলেকজাণ্ডার দৌড়ে গিয়ে দূর থেকে দেখল, ব্যাপার তাই বটে ! কুন্দনের লম্ফঝম্ফ দেখে কে ! সে বুঝতে পারল, তলোয়ারের মায়ায়, পাছে ভেঙে যায় এই ভয়ে তার ধারালো দিকটা সে ব্যবহার করছে না, ভাগ্যিস, তাই বাঁচোয়া ! নইলে অনেককে প্রাণের মায়া ছাড়তে হতো।

সত্যিই কুন্দন ক্ষেপে গেছে—তা নইলে লাফিয়ে দো-তলায় ওঠার চেষ্টা কেউ করে কখনো ? খোকা তখনো জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে, তার মুখ চোখ দেখলে মনে হয়, সারা ব্যাপারটায় সে ভারী উৎসাহ বোধ করছে। সব কিছুতেই মুখ ভার ছাড়া আর কোন মৌখিক অবস্থা এর আগে খোকার দেখা যায়নি ; আলেকজাণ্ডার প্রথম তার এই ভাবান্তর দেখল।

কুন্দন সিং তলোয়ার ঘুরিয়ে তাকে বলে—'আও বাচ্চা, তুম নিচ আও, তুমকো দেখেগা হাম।'

খোকা রেলিং-এর ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে আগ্রহ সহকারে কুন্দনের আস্ফালন লক্ষ্য করে।

কুন্দন সিং লাফিয়ে তার নাগাল পেতে চায়, খোকা কিন্তু মোটেই ভীত নয় —মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব তার জানা আছে বোধহয়। সে গরাদ থেকে নড়ে না, তাকে দেখে মনে হয়, সমস্তটাই সে খুব উপভোগ করছে।

কুন্দন সিংকে ঘিরে ফার্লংটাক দূরে চারিদিকেই বেশ জনতা দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু কারু সাহস হয় না যে ওর হাত থেকে গিয়ে তলোয়ারটা কেড়ে নেয় কিংবা ওকে ধরে।

একটা ষাঁড় যাচ্ছিল ঐদিক দিয়ে, এত ভিড় দেখে তার কৌতূহল হলো। হয়ত ভেতরে কেউ ম্যাজিক দেখাচ্ছে কিংবা খাবারের ঠোঙা পড়ে রয়েছে—এমনি কিছু একটা সে ভেবে থাকবে, জনতা ভেদ করে সে অগ্রসর হলো, এবং অগ্রসর হলো কুন্দনের দিকেই।

ষাঁড়টার অপঘাত আশঙ্কা করে সবাই সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগল, কিন্তু ওকে বাঁচাবার জন্য এগুতেও কারুর সাহস হলো না! আলেকজাণ্ডার সংকল্প করল, সে-ই এ দুঃসাহসিক কাজ করবে, ষাঁড় মারলে যদিও গোহত্যা হয় না তবুও। ষাঁড়ের অমূল্য জীবন রক্ষার দায়িত্ব সে নিজেই নেবে। মহাপ্রস্থানের পথ থেকে ষাঁড়কে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিরস্ত করবে।

ষাঁড়টা কিন্তু অকুতোভয়! আলেকজাণ্ডার অনেক করে তার মতিগতি ফেরাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সে তাকে আমলই দিল না। অবশেষে আর কোনো উপায় না দেখে আলেকজাণ্ডার তার ল্যাজ ধরে টানতে শুরু করল। কেন না এটা সে বুঝেছিল যে তার শিঙের দিকে গিয়ে মুখোমুখি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করাটা ঠিক সমীচীন হবে না।

তার ফলে ষাঁড়টা কিন্তু উলটো বুঝল, ফেরা ত দূরে থাক সে দৌড়তে শুরু করল—এবং কুন্দনের দিকেই। মহাপ্রস্থানের পথে একা নয়, আলেকজাণ্ডারকেও নিয়ে চলল ল্যাজে বেঁধে, কেন না ষাঁড়ের লেজ ধরে দৌড়ানো ছাড়া তার উপায় ছিল না। গাহন থামলে আলেকজাণ্ডার দেখলে সে একেবারে কুন্দনের সামনা-সামনি গিয়ে পড়েছে—মাঝে শুধু এক ষাঁড়ের ব্যবধান মাত্র।

কুন্দন সিং বাঁট উঁচিয়ে তার দিকে এগুতে লাগল—আলেকজাণ্ডার দেখল, ষাঁড়কে এখন ঢালের মত ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই! লাগামের দ্বারা যেমন ঘোড়াকে চালায়, তেমনি ল্যাজের দ্বারা ষাঁড়কে পরিচালিত করবে স্থির করল সে। যুদ্ধে সে পিছু হটবে না, পালাবে না, তার ঐতিহাসিক নাম সে কলঙ্কিত করবে না। সে হচ্ছে আলেকজাণ্ডার—নিজেকে এবং ল্যাজকে বাগিয়ে নিয়ে সে প্রস্তুত হলো।

কুন্দন ভাবল, আলেকজাণ্ডারকে আঘাতের আগে তার অস্ত্রনৈপুণ্যটা ষাঁড়ের মাথায় একবার পরীক্ষা করলে কেমন হয়। ষাঁড়টা এতক্ষণ নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু হঠাৎ কপালের গোড়ায় বাঁটের ঘা পড়তেই তার মেজাজ গেল বিগড়ে, তার শিঙের চাঞ্চল্য দেখা গেল, সে কুন্দনকে দিল গুঁতিয়ে। কুন্দন আর এক ঘা তাকে কসাল, সেও কুন্দনকে দিল গুঁতিয়ে। একদিকে বিরাট দেহ ভোজপুরী, অন্যদিকে বিপুলকায় বড়বাজারের ষাঁড়—কেউই কম যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ রোমাঞ্চকর সংঘর্ষ এর আগে কেউ দেখেনি।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগল না! একটু পরেই দেখা গেল, কুন্দন সিং হাতিয়ার ফেলে দিয়ে দু হাতে কোমর চেপে ধরে ধুলোর ওপরেই বসে পড়েছে। এহেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণাম এই রকমটাই হবে আলেকজাণ্ডার আশংকা করছিল। হঠকারিতার 'কুফল' নামে যে রচনাটা তাকে লিখতে দিয়েছে তাতে কুন্দনের উদাহরণটা যুতসই মত সে লাগিয়ে দেবে এঁচে রাখল।

কুন্দনকে কাত করে ষাঁড়টা এতক্ষণে আলেকজাণ্ডারের প্রতি মনোযোগ দিল, কিন্তু কিছু বলবার আগেই কেবল পেছন ফিরে তার ভ্রূক্ষেপ করতেই আলেকজাণ্ডার তৎক্ষণাৎ তার ল্যাজ ছেড়ে দিয়েছে। ষাঁড়টার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, এই যুদ্ধের আগাগোড়া পেছন থেকে একজনের ল্যাজ ধরে থাকাটা সে আদৌ পছন্দ করেনি - এই পিছুটান না থাকলে এ-যুদ্ধে সে আরো অনেক সুবিধা করতে পারত।

ষাঁড়টা বিজয়ী বীরের মত ধীর পদবিক্ষেপে সেখান থেকে চলে যাবার পর আলেকজাণ্ডার নিঃশ্বাস ফেলে ওপরে চেয়ে দেখে—কী আশ্চর্য! খোকা হাসছে, ভীষণ হাসছে—খিল খিল করে হাসছে।

কুন্দন সিং ওদিকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে, ধুলোর ওপরেই। সম্ভবত সে অজ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু—

কিন্তু তার নাক ডাকছে তখন দস্তুরমতন!

সেবার গ্রীষ্মকালটা যেন একমাস আগেই এসে পড়েছিল। দারুণ গরমে আম-কাঁঠাল সব আগাম পেকে উঠল। কিন্তু সামার ভ্যাকেশানের তখনো ঢের দেরি। বোর্ডিং-এ আমাদের মন তো আর টেকে না! ছুটিটা এসে পড়লে হয়, বাড়ি গিয়ে বাঁচি!

আমরা সত্তর আশীজন ছেলে সুদূরবর্তী পাড়াগাঁর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেলার স্কুলে পড়তে এসেছি, বাধ্য হয়ে বোর্ডিং-এ থাকি। বাধ্য হয়ে থাকা ছাড়া কি বলব, যা খাওয়া-দাওয়ার ছিরি—রেঙ্গুন চালের ভাত, লাল রঙের এমন হৃষ্টপুষ্ট ভাত তোমাদের অনেকে চোখেও দেখনি; তার সঙ্গে জলবত্তরলং ডাল আর এই একটুকরো একটুখানি মাছ,—ঝোলের বর্ণনা না-ই দিলাম! উঠেই একবাটি মুড়ি আর এক টুকরো আম নিয়ে বসব; দুপুরে আবার দুধ দিয়ে ভাত দিয়ে আমের রস দিয়ে আরেক প্রস্থ হবে—ভাবতেও জিভে জল আসে!

আমাদের মধ্যে জগা-ই হচ্ছে মাতব্বর। সে বললে, আয়, হেডমাস্টারের কাছে ছুটির দরবার করিগে।

জগা মাতব্বর, কেন না সে সবার সেরা স্পোর্টসম্যান, ফুটবল ও ক্রিকেটে সমান চৌকস; হাই-জাম্প, লং-জাম্প ও বল থ্রোইং-এ তার জুড়ি নেই। তার প্রতি মাস্টারদের যেন একটু পক্ষপাত আছে, সে ফেল করলেও দেখি বারবার প্রোমোশন পেয়ে এসেছে; এখন ফার্স্ট ক্লাসে উঠে আর কিছুতেই টেস্ট-এ এলাউ হতে পারছে না। জগা বলে, জানিস, আমি পাস করে বেরিয়ে গেলে তোদের স্কুলের মুখ রাখবে কে? আর সব স্কুলের সঙ্গে কম্পিটিশন ম্যাচে তোরা কি আর জিততে পারবি, তাই আমাকে ফেল করিয়ে এমনি করে আটকে রাখছে।

আমরা তার কথা বিশ্বাস করতাম। স্বয়ং সে ছুটির দরবার করবে জেনে আশ্বস্ত হৃদয়ে আমরা সবাই তার পিছু পিছু গেলাম। হেডমাস্টার মশাই

শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন, কি? এখনো কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা হয়নি, এখন ছুটি? যাও যাও, পড়গে মন দিয়ে।'

'বড্ড গরম পড়েছে সার—'

'গরম পড়বে না তো কি? শীতকালে বড্ড শীত পড়বে, গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম পড়বে, বর্ষাকালে ভারী বর্ষা হবে—এ তো জানা কথা। তাই বলে পড়াশুনা কে ছেড়ে দিয়েছে? জগা, তোমার বাড়ি কি দার্জিলিং যে বাড়ি যেতে চাইছ? সেখানে গরম পড়েনি? যাও যাও, পড়গে, সময় নষ্ট কোরো না।

জগা বিফল হলো—এ রকম ঘটনা আমাদের বোর্ডিং-এর ইতিহাসে এর আগে ঘটেনি। ছুটি না পাওয়াতে আমাদের দুঃখ যত না হোক, জগার লজ্জা তার চারগুণ। কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলে সে নয়, বললে, 'ছুটি আদায় করি কি না, দ্যাখ তোরা!'

রোজ সন্ধ্যায়, ছেলেরা ফুটবল খেলে মাঠ থেকে ফিরলে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে রোল-কল হতো। তিনি নিজে সবার নাম ডাকতেন। সেদিন সন্ধ্যায় রোল-কলের সময় জগার সাড়া না পেয়ে তিনি ভারী চটে গেলেন; আমাকে ডেকে বললেন, 'শিবু, যা একটা বেত কেটে নিয়ে আয়!'

ব্যাপার যতদূর বোঝা গেল তা এই, ছেলেদের মধ্যে ছুটির হুজুগ তোলার জন্য সকাল থেকেই হেডমাস্টার মশাই জগার উপর চটেছিলেন, তারপরে সে আজ স্কুল কামাই করেছে, অথচ দুপুরে হোস্টেলেও ছিল না। এখন রোল-কলের সময়েও তার পাত্তা নেইকো! আমি বেত নিয়ে হাজির হতেই, তাঁর হুকুম হলো—'যা, জগাকে ধরে নিয়ে আয়!'

আমি ধরে আনব—জগাকে? চটেছেন বলে কি সারের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? যে-জগা ব্যাকে খেললে অন্য দলের ফরোয়ার্ডদের দুর্বিপাক, আর ফরোয়ার্ডে খেললে বিপক্ষের ব্যাকের এবং গোলকির দফারফা, তাকে ধরে আনব কি না আমি! আর কিছু না, হাত যদি সে না-ও চালায়, কেবল যদি হাই-জাম্প আর লং-জাম্পের সাহায্য নেয়, তাহলে তো ঝোপ-ঝাড়, খাল বিল ডিঙিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পগার পার। বিলকুল আমার নাগালের বাইরে!

কিন্তু দরকার হলো না, পর মুহূর্তেই শ্রীমান জগার সাড়া পাওয়া গেল। তাকে দেখে হেডমাস্টার মশাই গর্জন করলেন—'এগিয়ে এস—' বলে টেবিলের উপর সপাং করে বেতটা ঝাড়লেন একবার। যেন ওটাকে রিহার্সাল দিয়ে নিলেন।

এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল, হেডমাস্টার মশাই যেখানে বেত ঝাড়লেন ঠিক তারই উপরে সহসা কড়িকাঠ থেকে সশব্দে একটা চাপড়া খসে পড়ল। একাশী-জোড়া বিস্ফারিত চোখ মেলে আমরা দেখলাম তা বালির চাপড়াও নয়, টালির টুকরোও না—আস্ত একটা মড়ার মাথার খুলি।

হেডমাস্টার মশায়ের হাত থেকে বেত খসে পড়ল; আমাদের মধ্যে

কয়েকজন ভয়ে চীৎকার করে উঠল—তারপর সব নিস্তব্দ। কারো যেন নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না।

হেডপণ্ডিতমশাই প্রথম কথা কইলেন—'আজ তিথিটা কি হে? ত্রয়োদশী—কই তিথি দোষ তো নেই। তবে বেস্পতিবারের বারবেলা বটে। দাও তো হে মাথার খুলিটা, ওটা আমার কাজে লাগবে।'

স্কালটা হাতে নিয়ে, গম্ভীরভাবে তিনি বেরিয়ে গেলেন। হেডপণ্ডিত-মশাই তান্ত্রিক মানুষ, কালী-সাধনা করেন। অমাবস্যা চতুর্দশীর গভীর রাত্রে শ্মশানে তাঁর গতিবিধি আছে বলে কানাঘুষা। কে জানে, ওই খুলিটা তিনি কোন্ কাজে লাগাবেন!

ততক্ষণে হেডমাস্টার মশাই সামলে উঠেছেন, কম্পিত কণ্ঠের ভেতর থেকে তাঁর বাণী শোনা গেল—'যাও সব, পড়তে বসগে, হৈ-চৈ কোরো না।'

বলা বাহুল্য, আমরা হৈ-চৈ করছিলাম না, তা করবার মতো উৎসাহ তখন আমাদের কারো মধ্যেই ছিল না। নীরবে আমরা যে যার সীটে গিয়ে বই খুলে বসলাম; কিন্তু পড়ব কি, সবার বুকের মধ্যে কি রকম যেন কাঁপুনি ধরে গেছে। দুরু দুরু বুকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই কি যেন আবছায়া দেখি! এক নিমেষে এত লোকজনভরা অতবড় বোর্ডিং যেন একেবারে ভূতের রাজত্ব হয়ে উঠল।

সে-রাত্রে আর পড়াশুনা হল না; হেডমাস্টার মশায়ের হুকুমে তাড়াতাড়ি দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছেলেরা সব শুয়ে পড়ল; আমি হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে থাকতাম, তিনি নিজের মশারি খাটানো সেরে আমার দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে বললেন, 'আলোটা জ্বালা থাকলে কি তোমার ঘুমের খুব অসুবিধা হবে, শিবু?'

'না স্যার।'

'অন্ধকার ঘরে তুমি ভয় পেতে পারো কিনা, তাই বলছিলাম। নইলে আমার কোন দরকার নেই। নিভিয়ে দিই তাহলে, কেমন?'

'দিন তবে।'

কিন্তু জ্বালানো থাকলেই যেন ভাল ছিল। জমাট অন্ধকারের মধ্যে কাদের যেন ছায়ামূর্তি দেখতে লাগলাম। মনে হতে লাগল, এই বুঝি চৌকির তলা থেকে কে পা-টা টেনে ধরে! যতদূর গোটানো সম্ভব পা-দুটো গুটিয়ে নিয়েছি, হাতের তালু আর পায়ের চেটো প্রায় আমার একাকার এখন। এইভাবে একটু তন্দ্রা আসছিল যেন, হঠাৎ কখন চীৎকার করে উঠেছি। ঘরের অপর দিক থেকে হেডমাস্টার মশায়ের ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা গেল—'কি হল, কি হল শিবু?'

'কার যেন হাত ঠেকল আমার কপালে।'

'য়্যাঁ?'

খানিকক্ষণ উভয়ের আত্মসংবরণ করতে গেল। অবশেষে বুঝতে পেরে বললাম, আমারই নিজের হাত মাস্টারমশাই।

'তাই বলো। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছে! তুমি যে রকম চেঁচিয়ে উঠেছিলে! কেবল ভয়ের কথা ভাবছ বুঝি তখন থেকে?'

'না সার।'

খানিক বাদে আমার হেডমাস্টারমশায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।—'শিবু কাগজের গাদাগুলো কে যেন হাঁটকাচ্ছে না?'

ভয়ে আমার গলা থেকে শব্দ বেরুল না।

'বোধ হয় ইঁদুর। কিছু ভেব না, ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়।'

ঘুমিয়ে পড়ব কি, খানিক বাদে যা কাণ্ড শুরু হলো, তাকে ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বাইরের উঠোনময় কারা যেন দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। কে যেন রান্নাঘরের কোণের ছাইগাদায় বসে গোঙাচ্ছে, আবার ঠিক আমাদের ঘরের বাইরেই চট-চট করে হাততালির আওয়াজ! কিছুক্ষণ বাদে আমাদের জানালার খড়খড়িগুলো যখন খুলতে আর বন্ধ হতে শুরু হলো হেডমাস্টারমশাই একলাফে আমার বিছানায় এসে বসলেন!

আমি এতক্ষণ মড়ার মতো পড়েছিলাম, সার আসতে সাহস হলো। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কি হবে শিবু?'

আমার ততক্ষণে সাহস অনেক বেড়েছে; এমন কি তখন আমার ভয় করতেই ভাল লাগছিল। বললাম, 'ভয় কি সার? ভয় কিসের?'

'না না, আমার আবার ভয় কি?' তোমার জন্যই ভাবছি—

'আপনি আমার কাছে বসে থাকুন, তাহলেই আমার আর ভয় করবে না।'

'সেই ভাল শিবু। রাত তো আর বেশি নেই, দুজনে বসে বসেই কাটিয়ে দিই।'

হেডমাস্টারমশাই কতক্ষণ বসেছিলেন জানি না আমি কিন্তু বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি সারা উঠানময় মড়ার হাড়গোড় ছড়ানো। কিন্তু সকালবেলায় হেডমাস্টারমশাইকে দেখে রাত্রের লোকটিকে আর চেনাই যায় না। তিনি ভয়ানক হাঁকডাক জুড়ে দিয়েছেন—এসব হচ্ছে দুষ্টু লোকের কাজ। ভূত আমি মানিনে। এক্ষুণি পুলিসে খবর দিচ্ছি; পুলিসের কাছে বাবা চালাকি নয়, সব ধরা পড়ে যাবে।

হেডপণ্ডিতমশাই বললেন, 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? পুলিসে খবর দেবেন দিন, কিন্তু ভূত নেই এ কেমন কথা? ভূত অবশ্যই আছে তবে তাকে ভয় করবার কিছু নেই, একথা আপনি বলতে পারেন বটে।'

'যান যান, আপনি আর কথা বলবেন না। ফি অমাবস্যায় শ্মশানে গিয়ে কী যে করেন, আপনিই তো এসব উপদ্রব টেনে এনেছেন।'

অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে হেডমাস্টারমশাই, বোধ হয়করি, থানাতে খবর দিতেই সবেগে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমাকে ডেকে বলে গেলেন, 'ঘরের কোণে যত সব পুরানো কাগজের জঞ্জাল জড়ো হয়ে আছে, সব সাফ করে কাগজওয়ালাদের বিক্রি করে দাওগে। নইলে ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে রাত্রে তো চোখ বুজবার যো নেই।'

কাগজের গাদা নাড়তে গিয়ে দেখি, কী সর্বনাশ! তার তলায় এত হাড়গোড় আর মড়ার মাথার খুলি। এসব কে জড়ো করল এখানে? আমি ভয়ে-বিস্ময়ে ভ্যাবাচাকা—এমন সময়ে জগা দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকল এসে।

'খবরদার, কাগজের গাদায় হাত দিবিনে বলছি! ও বাবা, এর মধ্যেই আবিষ্কার করা হয়ে গেছে? যাক, কাউকে বলিসনি। বললে তোকে আস্ত রাখব না!'

'এ সব কি ব্যাপার, জগাদা?'

কাগজের গাদা আবার আগের মতো ঠিকঠাক করে রেখে আমার হাত ধরে জগা বলল, 'আয়, তোকে সব বলছি।'

তার সমস্ত কীর্তি-কাহিনী ব্যক্ত করে রুমালে বাঁধা একটা জিনিস আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এখন কথা শোন। এটা যেন দেখিসনে। হেডমাস্টারমশাই শুয়ে পড়লে আস্তে আস্তে তাঁর মশারির চালে এটা রেখে দিবি, রুমালটা খুলে নিবি অবশ্যি। পারবি তো? যদি পারিস, তাহলে কাল থেকে আমাদের ভ্যাকেশান—একেবারে অব্যর্থ।

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে আমি বললাম—খুব পারব।

সেদিন ভোররাতের দিকে হেডমাস্টারমশাই এক দারুণ চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর আর্তনাদে, আমার কেন, বোর্ডিং সুদ্ধ সবার ঘুম ভেঙে গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'শিবু, শিবু, আলো জ্বাল—শীগ্‌গির… শীগ্‌গির।'

'কি হয়েছে স্যার?'

'বলছি, আলো জ্বাল আগে। মশারির মধ্যে কে যেন—'

'সে কি?'

'কার সঙ্গে যেন মাথা ঠুকে গেল—'

'মনের ভ্রম নয় তো স্যার? কালকের আমার মতন?'

'না—না। মাথাটা ফেটে যাবার যোগাড়—আর মনের ভ্রম! আলো জ্বাল, এঃ, কপালটা ফুলে উঠেছে একেবারে!'

আলো জ্বাললাম। ততক্ষণে ঘরের বাইরে বোর্ডিং-এর ছেলেরা, মাস্টাররা সবাই জড়ো হয়েছে। হেডপণ্ডিতমশাই পর্যন্ত খড়ম খট খট করে উপস্থিত। লণ্ঠন ধরে দেখা গেল মশারির চালে একটা আস্ত মড়ার মাথা!

হেডপন্ডিত বললেন, 'ওমা! এ যে টাটকা দেখছি, মায় দাড়ি সমেত!'

কারো মুখ থেকে একটা শব্দ বেরুল না; তিনিই মাথা নেড়ে আবার বললেন, 'হুঁ তা তো হবেই, কাল চতুর্দশী ছিল যে! আজ অমাবস্যা আছে আবার!'

চতুর্দশীতেই এই মাথা-ঠোকাঠুকি ব্যাপার, অমাবস্যাতে না জানি কি কাণ্ড হয়! ভাবতেই সবার হৃৎকম্প হলো!

হেডপণ্ডিতমশাই বললেন, 'একে শনিবার, তায় অমাবস্যা। আজ একটা গুরুতর কথা বটে!'

ছোট ছেলেদের মধ্যে অনেকে কেঁদে ফেলল, দু-একজনের মূর্ছার উপক্রম হলো। জগা মুখখানা অতিমাত্রায় কাঁচুমাচু করে বলল, 'সার, আমাদের ছুটি দিয়ে দিন, আমরা বাড়ি চলে যাই, নইলে এখানে থাকলে আমরা বাঁচব না !'

হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের ছুটি। আজ সকালেই যে যার বাড়ি চলে যাও। আমিও সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরি। চতুর্দশীতে মাথা ঠুকে ছেড়ে দিয়েছে, অমাবস্যায় যদি ঘাড় ধরে মটকে দেয় ! কাজ নেই !'

হেডপণ্ডিতমশাই বললেন, 'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি ! কোনো মহাপুরুষ তান্ত্রিক যোগী সন্নিকটে কোথাও সাধনা করছেন, এই ভৌতিক উপদ্রব তাঁর সিদ্ধিলাভের অনুষ্ঠান—তাছাড়া আর কিছু না। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।'

জগা বললে, 'আমারও তাই মনে হয় পণ্ডিতমশাই। কোনো মহাপুরুষ কার্যসিদ্ধির জন্য —'

পণ্ডিতমশাই তার সায়-দেওয়াকে ঠাট্টা মনে করে বললেন, 'হ্যাঁ, তুই তো সব জানিস। তুই থাম !'

পৃথিবীতে সুখ নেই

হেডমাস্টারমশাই রোলকল করে চলেছেন—'···থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন্‌···' টেন্‌-এ এসে তিনি হোঁচট খেলেন।

'টেন? নম্বর টেন? আসেনি সমীর? আজও আসেনি সে?'

সমীরের পাশের বাড়ির ছেলে অশোক দাঁড়িয়ে বললো—'তার অসুখ করেছে সার।'

'অসুখ? সমীরের অসুখ?' হেডমাস্টার বিস্মিত হয়ে উঠলেন—'সে তো খুব হেল্‌দি ছেলে। তার আবার কী অসুখ হলো?'

'আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারবো না।' অশোক ইতস্তত করে—'অপস্মার, না—কী।'

'অপস্মার? সে আবার কি ব্যারাম?' হেডমাস্টার মশায়ের বিস্ময় যার পর নাই।

'কি জানি সার। ও-তো তাই বললো।' তারপর কি যেন ভেবে নিয়ে অশোক একটা কৈফিয়ত দিতে যায়—'পরশু দিন একটা ষাঁড় ওকে তাড়া করেছিল, তাই থেকেই হয়েছে কিনা, কে জানে।'

'ষাঁড় থেকে অপস্মার?' হেডমাস্টারমশাই ঘাড় নাড়ে—'সে আবার কি? আচ্ছা, আমাদের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখবো।'

পরের দিনও সমীর গরহাজির ফের। হেডমাস্টার মশায়ের 'ফার্স্ট' পিরিয়ড; রোলকল করতে গিয়ে আবার তাঁর চোট লাগে—'টেন? নম্বর টেন্‌? রোল নম্বর টেন? আজও—আসেনি সমীর?'

অশোক উত্তর যোগায়—'না সার! তার শরীর আজ আরো খারাপ।'

'ও হ্যাঁ! মনে পড়েছে! অপস্মার! ষাঁড়ের অপভ্রংশ না—কি। তুমিই কাল বলছিলে না?'

'না স্যার, আজ অন্য অসুখ।' মুখখানা কিরকম করে অশোক রাফখাতার একখানা পাতা বার করে। 'টুকে এনেছি আমি স্যার! আজ হলীমক।' পত্রপাঠ জানায়।

'হলীমক? সে আবার কি?' হেডমাস্টারমশাই এবার তো ঘাবড়েই যান—'সে আবার কী অসুখ—অ্যাঁ? হোলিখেলার থেকে কিছু হয়েছে না কি ওর?'

'আমিও তো তাই ওকে জিগ্যেস করতে গেছলাম। ও বললে—'সে তুই বুঝবিনে রে। হলীমক ভারী শক্ত ব্যারাম। হোলির সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই এর। ও একটা কোবরেজি অসুখ।' বিরসমুখে অশোক বিবৃতি দেয়।

'কোবরেজি অসুখ? আমাদের ডাক্তারকে যেতে বলব আজ তাহলে ওদের বাড়ি।' হেডমাস্টারমশায়ের ভাবনা হয়—'কিন্তু কোবরেজি অসুখ কি ডাক্তারি-ওষুধে সারবে? আমি নিজেই একবার যাব না হয়।'

'যাবেন স্যার। নিশ্চয়ই যাবেন। ও ভারী ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে!' অশোক জানাল।

সমীরের অসুখ নিয়ে সারা ইস্কুলে সোরগোল পড়ে গেল বেজায়। এমন কি মাস্টারদের মধ্যেও। ফোর্থ ক্লাসে ভর্তি হয়ে এই ফার্স্ট ক্লাসে ওঠা অবধি একটি দিনের জন্যেও তার কোনো অসুখ করেনি, একদিনও তার ইস্কুল-কামাই নেইকো। রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্সের প্রাইজ পর-পর তিন বছর একা সমীরই মেরেছে। সেই সমীরেরই উপর্যুপরি তিন-তিনদিন কামাই! অসুখের অজুহাত করে—সমীরের মত ছেলের গাফিলতি! ভাবতেই পারা যায় না যে!

সমীর সে-ধরনের ছেলেই নয় যে, যতই দশটার দিকে কাঁটা এগোয়, ততই তার গায় কাঁটা দিতে থাকে, কেমন যেন মাথা ধরে ওঠে, আর পেট কামড়াতে লেগে যায়। ডায়ারিয়া, ডিসেণ্ট্রি আর ডিপ্‌থেরিয়া সব হৈ চৈ করে একসঙ্গে এসে পড়ে-সে-ধরনের ছেলেই সে নয়। অসুখের ছুতোনাতা করে একটা বাঁধা প্রাইজ—একচেটেই তার—এমন হাতধরা বাৎসরিক পুরস্কার একখানা—সে যে এত সহজে হাতছাড়া করবে, সে ছেলেই নয় সে।

'হল কি তবে সমীরের?' ড্রিলমাস্টার হেডমাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করলেন। বলতে কি, সমীর-বিহনে তাঁরও মন খারাপ, ড্রিল করানোর উৎসাহই নেইকো আর। সমীরের ড্রিল ছিল একটা দেখবার মতো। তার অ্যাটেন্‌শান্‌, তার অ্যাবাউট-টার্ন, তার ফল্‌ইন্‌—সে যে কি জিনিস, না দেখলে বোঝা যায় না। এমন এক মিলিটারী কায়দা যে, দেখলেই চমক লাগে; এমন কি ড্রিলমাস্টার-মশাই নিজেই এক-একবার চমকে যান। বয়স্কাউট-দলের সমীরই তো ছিল আদর্শ। সেই সমীরেরই এ-কি কাণ্ড!

সমীরের অভাবে ড্রিলমাস্টারের ড্রিলের কোনো উদ্দীপনাই আসছে না আদৌ। সমীরের ফল্‌ইন্‌ ছাড়া সমস্তই যেন বিফল!

'হোলি হায়, না—কি-যেন একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম হয়েছে তার, অশোক

বললো আমায়।' গম্ভীরমুখে প্রকাশ করছেন হেডমাস্টার ঃ 'কাল বিকেলে দেখতে যাবো আমি, যদি কালকেও সে না আসে!'

তারপর দিন সমীর ক্লাসে এসে হাজির। সেই সমীরই বটে—কিন্তু অশোক যা বলেছিল তার চেয়েও বেশি—তার ডবল ম্রিয়মাণ।

হেডমাস্টারমশাই তাকে দেখে রোলকল বন্ধ রেখেই বললেন—'এই যে সমীর! এসেছ আজ! কি খবর বল তো তোমার? হোলির হামাঙ্গা টাঙ্গামা চুকেছে সব?'

'না, সার! হলীমক নয়। যা ভেবেছিলাম, তা নয়। আমার লক্ষণ-নির্ণয়ে ভুল হয়েছিল।' বিবর্ণ মুখে সমীর বিবৃত করে—'খুব সম্ভব এটা আমার পাণ্ডুরোগ; কিংবা গুল্মও হতে পারে পেটে।'

পাশ থেকে অশোক ফিসফাস করে—'কোন্ গুল্ম? লতাগুল্ম নাকিরে? পাদপ নয় তো? পেট ফুঁড়ে তোর গাছ বেরোবে? পা দিয়ে না মাথা দিয়ে?' সবিস্ময়ে জানতে চায় সে।

'সে তুই বুঝিবনে! শক্ত কোবরেজি অসুখ।' সমীরের কণ্ঠস্বরে গম্ভীর বিষণ্ণতা।

'এক কাজ কর।' হেডমাস্টারমশাই বলেন—'আমাদের ডাক্তারবাবুকে বলে রেখেছি। যেও তাঁর কাছে। তিনি ভাল করে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন।'

সেদিন বিকেলেই ড্রিলমাস্টার এসে জানালেন—'নাঃ সমীরের গতিক সুবিধের না। সে সমীর আর নেই সার। ড্রিল করতে গিয়ে তার পা-ই ওঠে না আর। বলে যে—কি যেন বললে—কী না কি হয়েছে তার পায়ে!' বলে কোনোরকমে তিনি দুঃখের কথাটা উচ্চারণ করলেন।

'শ্লীপদ?' হেডমাস্টারমশাই হকচকিয়ে যান—'তবে যে বললো—গুল্ম নাকি? এর মধ্যেই—এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই—অসুখ আবার বদলে গেল কিরকম?'

'কি করে বলব! সমীরই জানে!' বললেন ড্রিলমাস্টার।

'কি বলল সমীর?' হেডমাস্টার দুচোখ তাঁর কপালে তোলেন—'কি হয়েছে বললে? এর মধ্যেই আবার কি বিপদ হলো তাঁর?'

'শ্লীপদ, না—কি!' ড্রিলমাস্টার মশাই স্মরণশক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্ত করেন আবার—'বলছে যে—'সার বোধহয় আমার শ্লীপদ হয়েছে, কই, পা তেমন আর তুলতে পারছিনে তো'।'

'শ্লীপদ কি বস্তু?' বিশদরূপে জানতে চান হেডমাস্টারমশাই—'কি জাতীয় অসুখ?'

'কি করে জানবো?' ড্রিলমাস্টার মশাই মুখ বেঁকান—'বলছে যে, শ্লীপদ কিংবা ধনুষ্টম্ভ—এই দুটোর একটা কিছু হবে বোধহয়। শুনে তো মশাই! আমি নিজেই স্তম্ভিত হয়ে রয়েছি!'

'এসব আবার কী ব্যামো? কোত্থেকে আসে?'

'কি করে জানব মশাই? পক্ষাঘাত হলেও বুঝতুম। ধনুষ্টঙ্কার হলেও

বোঝা যেত।' ড্রিলমাস্টার জানান—'আবার বলছে—এই শ্লীপদ থেকে শেষটায় নাকি গৃধ্রসীও দাঁড়াতে পারে।' এই বলে ড্রিল ছেড়ে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে সমীর। বসে আছে তখন থেকেই। ড্রিলমাস্টার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন—'মুখ চুন করে এককোণে গিয়ে বসে রয়েছে! দেখে-দেখে এমন বিচ্ছিরি লাগছে আমার!'

'কী সর্বনাশ! কী বললেন—গৃধিনী, না—ধ্রাস? যাকগে, তাহলে তো ওকে গাড়ি করে বাড়ি পাঠানো দরকার!' হেডমাস্টারমশাই তক্ষুনি ওকে ছুটি দিতে ব্যস্ত হন।

পরদিন সমীর ফের অ্যাবসেন্ট। আবার তার দেখা নেই!

অশোক বললো, রাফখাতার পাতা উল্টে, ভাল করে খতিয়ে দেখে সে বললো—'ওর অশ্মরী হয়েছে স্যার! পাছে আমার মাথায় না থাকে, তাই আমি খাতায় টুকে নিয়ে এসেছি।'

হেডমাস্টারমশাই এবার আর ভড়কান না; বোধহয় এমনই একটা বিজাতীয় কিছুর জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন মনে হয়। সহজেই ধাক্কাটা সামলে নেন তিনি—'অশ্মরী? কোনো অশ্ব-টশ্ব তাড়া করেছিল নাকি এবার?'

'কি করে জানবো সার! আমিও তাই জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কিন্তু—কি বলবো! আগে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে তেড়ে আসতো, এখন কেবল মুখ কাঁচু-মাচু করে চুপ করে থাকে, আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। আর বলে—'আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না রে।'

'আমি মানে—সে।' অশোক আরো ভাল করে খোলসা করে—'আমি নিজে মরতে যাচ্ছিনে সার! সমীর যাচ্ছে! সে খালি বলছে সার—তোদের সঙ্গে এই আমার শেষ-দেখা হয়তো।'

'অশ্মরী? কস্মিনকালেও শুনিনি এমন। কোনো অমানুষিক ব্যাধি নিশ্চয়! মানুষের তো এসব রোগ হবার কথা নয়। অশ্ব-টশ্বরই হয়তো এসব হয়ে থাকে!'

'গাধাদেরও তো হয় না, যদ্দুর জানা গিয়েছে, কি বলেন সার?' অশোক জানতে চায়! 'আমিও তো সেই কথাই বলেছি ওকে।'

'কী করে বলব! নামও শুনিনি কখনো। বিলিয়াস্-ফিভার, কি বিলিয়ারি কলিক্ হলেও না-হয় বুঝতাম।' বলেন হেডমাস্টার—'এমন কি, মেনিনজাইটিস্, ফেনিনজাইটিস্, হুপিংকাফ, ব্রংকাইটিস্—এসব হলেও কিছু-কিছুটা বোঝা যেতো।'

ইস্কুল-ছুটির পর বাড়ি ফিরে অশোক সমীরের কাছে গেল। 'এই যে, তুই এখনো বেঁচে রয়েছিস দেখছি! মরিসনি তো এখনো তাহলে?'

'না এখন পর্যন্ত না।' ম্লানমুখে সমীর জানায়!

'কেন? মরিস না কেন? এমন-সব তোর শক্ত-শক্ত ব্যামো! ভারী-ভারী উচ্চারণ! শুনে হেডমাস্টারমশাই পর্যন্ত উল্টে পড়েছেন। কি হল তোর? মরিস না যে?' অশোক জবাবদিহি চায়।

'কি করে বলবো!' সমীর বিষণ্ণ স্বরে বলে—'আমিও তো তাই ভাবছি।'

'ভেবেছিলাম এসে দেখব তুই মারা গেছিস।' অশোক ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রকাশ করে। তার স্বরে হতাশার সুর!

সমীর কিছু বলে না, শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে!

'আচ্ছা, মরলি কিনা, কাল আবার এসে খোঁজ নেবো!' অশোক নিজের মুখখানা যদ্দুর সম্ভব করুণ করে আনে—'এখন খেলতে যাই? কেমন?'

পরদিন ক্লাসে সমীরকে দেখতে পেয়েই হেডমাস্টারমশাই উস্‌কে ওঠেন—'আজ—আজ আবার কি অসুখ তোমার? বিসূচিকা নয়তো?'

'অ্যাঁ? আজ্ঞে?' সমীর একটু চম্‌কেই যায় বলতে কি!

'মানে, কলেরা-টলেরা হয়নি তো?' হেডমাস্টারমশায়ের ব্যাখ্যায় একেবারে প্রাণ-জল-করা প্রাঞ্জলতা—'কলেরা আরো কঠিন হলে কোব্‌রেজি হয়ে ওঠে কিনা! তখন বিসূচিকা হয়ে দাঁড়ায়—বিসূচিকা দাঁড়ালেই মারা পড়ে মানুষ, বাঁচে না আর।'

'বিসূচিকা বুঝি কিছুতেই সারে না সার?' জিগ্যেস করে অশোক।

'হ্যাঁ, সারে বইকি। সূচিকা দিয়ে নুন-জল ভরলে তবেই সারে। কিন্তু সে ভারী হ্যাঙ্গাম।' হেডমাস্টারমশাই জানান—'তার চেয়ে মারা যাওয়া ঢের সহজ। হ্যাঁ ঢের-ঢের সোজা।'

'না সার! কোনো অসুখ না সার' সমীর জানালো—'আমি ডাক্তারবাবুর কাছে গেছলাম। তিনি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, আমার নাকি কোনো অসুখই হয়নি।' সমীর বলল, বেশ-একটু ক্ষুণ্ণস্বরেই বলল।

'অসুখ হয়নি? যাক, বাঁচা গেল!' হেডমাস্টার মশাই উছলে উঠলেন—'তবে আর কি! তবে তো ভালই! খাও-দাও আর পড়াশুনা কর মন দিয়ে। আর হ্যাঁ, ড্রিল! ড্রিলটাও কোর।'

'না সার, ভাল না। আমি নিজে বুঝতে পারছি—আমার শরীর ভাল নেইকো।' সমীর চিঁ-চিঁ করে।

'তোমার কিচ্ছু হয়নি সমীর! সত্যি কিছু হয়ে থাকলে ডাক্তারবাবু ধরতে পারতেন। এসব তোমার কাল্পনিক অসুখ। তুমি আমাদের ইস্কুলের আদর্শ ছেলে, তোমার কি এরকম সাজে কখনো?' হেডমাস্টারমশাই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন।

তবুও সমীর কোনো প্রেরণা পায় না। কাতরদেহে সারা পৃথিবীর সমস্ত পীড়া বহন করে প্রপীড়িত সমীর মলিনমুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর সমীর—ইস্কুলের আদর্শ ছেলে সমীর উপরো-উপরি চারদিন ইস্কুল কামাই করল।

আর অশোক তার রাফখাতা উল্টে পাতার পর পাতা পাল্টে চারদিনে চার-রকমের অসুখের ফিরিস্তি দিল। শোথ, রক্তাতিসার, গলক্ষত আর কামলা। সেইসঙ্গে এও জানালো যে, এই চারদিনেই তার হাড়-কখানা ছাড়া দেখবার মতো আর কিচ্ছুই নেই।

ড্রিলমাস্টার বললেন—'অগ্নিমান্দ্য হলেও বুঝতুম। কামলা আবার কি ব্যামো মশাই?'

'কানমলা দিলেই সারবে।' জানালেন হেডমাস্টার—'তবে মনে হচ্ছে, বেশ কসে মলা দরকার।'

সেই মতলবে হাত কসে রোষকষায়িত হয়ে সেদিন বিকেলেই সমীরের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন তিনি।

'সমীর বাড়ি আছো?' বলে একখানা বাজঁখাই ডাক ছাড়লেন। হেডমাস্টারি জাঁদরেল হাঁক।

'রয়েছি সার!' ওপর থেকে কাহিল-গলায় জবাব এলো সমীরের—'এখনো রয়েছি সার!'

জীর্ণ-শীর্ণ সমীর কম্পিত-চরণে নিচে নেমে এসে দরজা খুলে দাঁড়ালে। শরীরে তার কিছুই নেই, এই গরমের দিনেও মোটা একটা কোট—সেই কোট ছাড়া আর কিছুই নেই তার শরীরে। আর তার কোটের কোটরে একতাড়া কী যেন সব। দেখলে তাকে চেনাই যায় না সত্যি!

কান মলবেন কি, হাতই উঠলো না তাঁর। হেডমাস্টারের মনে হলো, ডাক্তারেরই ভুল, একটা কোনো শক্ত অসুখ নিশ্চয়ই সমীরের হয়েছে—না হয়ে যায় না। না হলে তা হতে আর বাকি নেই।

'এ-কি! কি হয়েছে তোমার?' তিনি আকাশ থেকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'কী যে হয়েছে, তাই তো ঠিক ধরতে পারছিনে সার! খুব যে শক্ত অসুখ, তার কোনো ভুল নেই আর, কিন্তু একটা তো অসুখ নয়—একসঙ্গে একশোটা আমাকে ধরেছে। আমি আর বাঁচব না সার!'

'আরে না-না, বাঁচবে বই কি! বাঁচবে বইকি! অসুখ হলে কি আর সারে না? সারবার জন্যেই তো অসুখ! শরীরটাকে আরো ভালো করে সারবার জন্যেও তো অসুখরা আসে।' হেডমাস্টারমশাই ওকে উৎসাহ দেন। 'কি হয়েছে সব খুব বলো তো তোমার?'

'কী হয়েছে, তাই তো জানিনে সার। আচ্ছা, আচ্ছা—'খানিক ইতস্তত করে সমীর অবশেষে প্রবাহিত হয়—'আচ্ছা, আমার কি অকাল-বার্ধক্য হতে পারে?'

'অকালবার্ধক্য? তোমার? এই বয়সে?' তবু একবার ওর আগাপাশতলা ভাল করে তাকিয়ে তিনি দেখে নেন। 'অকালবার্ধক্য তোমার হতেই পারে না। অসম্ভব।'

'তাহলে কী যে হলো, সেই তো এক মুশকিল!' সমীর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—'বাতরক্ত—না রক্তপিত্ত এর কোনটা যে—কি করে বলবো। আচ্ছা স্যার, আমবাত আর আমাশা কি একই ব্যাপার? ওরই একটা, কিংবা দুটোই হয়তো একসঙ্গে আমার হয়ে থাকবে। তা কি কখনো হয় না?'

'কিরকম হয় বলো তো? পেট কামড়ায় খুব? মোচড় দিতে থাকে?'

'হয়তো দেয়, কিন্তু কিছুই টের পাই না।' সমীর জানায়—'তবে—তবে

মনে হচ্ছে হয়ত সন্ন্যাস হওয়াও সম্ভব। আমার কি এ-বয়সে সন্ন্যাস হতে পারে না ?'

'সন্ন্যাস ? তা এমন আর অসম্ভব কি ? শ্রীচৈতন্যের প্রায় এই বয়সেই তো হয়েছিল। কিন্তু এবার ম্যাট্রিক পাস করবার বছর, এখন সন্ন্যাসের কথা ভাবছো কেন ?'

'না সার, সে সন্ন্যাস নয়। সন্ন্যাস-ব্যামো। হঠাৎ হয়—হলে মানুষ শ্রীচৈতন্য নয়, একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে! কিন্তু সার, আজ ক'দিন ধরে আমার গলার ভেতরটা ভারী খুস্‌খুস্‌ করছে, গলগণ্ড হয়েছে কিনা, কে জানে! না কি গোদ—না কি আপনি বলেন অন্য-কিছু ? গলার ভেতর কি গোদ হয় না স্যার ? গলগণ্ড কি বুঝি পিঠেই হয় কেবল ? দিনরাত এইসব ভেবে—ভেবেই আমি আরো কাহিল হয়ে পড়েছি। এত রকমের অসুখ আছে এই পৃথিবীতে—এত বিচ্ছিরি সব অসুখ নাঃ, পৃথিবীতে আর সুখ নেই সার। চোখটাও কেমন যেন কর্‌কর্‌ করছে তখন থেকে।'

'চোখ ? কেন চোখে আবার কি হলো তোমার ?'

'কত-কিছুই তো হতে পারে। ইন্দ্রলুপ্ত হলেই বা কে আটকাচ্ছে ?'

'ইন্দ্রলুপ্ত ? চোখে ইন্দ্রলুপ্ত ? হেডমাস্টার মহাশয়ের চোখ কপালে ওঠে—'আমার যদ্দুর ধারণা, চোখ যদিও একটা ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ই বটে, তবু চোখে কদাচ ইন্দ্রলুপ্ত হয় না, হতে পারে না, কারো কক্‌খনো হয়নি।'

'তাহলে ছানিই পড়ছে হয়তো!' সমীর করুণচক্ষে তাকায়।

'হ্যাঁ, সেটা বরং সম্ভব।' হেডমাস্টার সমর্থন করেন—'কিংবা চাল্‌সেও হতে পারে। আমার একবার হয়েছিল ; কিন্তু তাতেই বা হয়েছে কি ? তার জন্যে অত ভাবছ কেন তুমি ? অতো ভয়ই বা কিসের ? ঘাবড়াবার কিছু নেই। ছানার মতো ছানিও তো কাটানো যায়!'

'চোখ কাটালে কি আর বাঁচব সার ?' সমীরের দৃষ্টি আরো কাতর হয়ে আসে—'চোখ গেলে আর কী থাকবে আমার ? সেইজন্যেই বুঝি ক'দিন ধরে খালি চোখের জল পড়ছে। সেইজন্যেই, না—কি ? না—চোখের মধ্যে উদরী হয়েছে ? আপনি কি বলেন ?'

উদরীর উচ্চারণেই সমীরের উদরের দিকে হেডমাস্টারের নজর পড়ে।

'তোমার কোটের পকেটে উঁচু হয়ে রয়ে ওটা কি হে ? টেলিফোন ডিরেক্টরি ?' হেডমাস্টারমশাই জিগ্যেস করলেন।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় সমীর পকেটের জঠোর থেকে মোটা একখানা বই বের করলো! হেডমাস্টারমশাই হাতে নিয়ে দেখলেন—বইটার মলাটে বড়-বড়, মেজ-মেজ ছোট-ছোট হরফে লেখা—'শরীর সুস্থ রাখুন, পাঁচশত বিষম- ব্যাধির সরল কবিরাজি-চিকিৎসা। প্রথম সংস্করণ—সন ১২৯২ সাল। মূল্য মাত্র একমুদ্রা।'

'বুঝেছি।' হেডমাস্টারমশাই ঘাড় নাড়লেন—'কোনো পুরানো বইয়ের দোকান কি ফুটপাথ থেকে কিনেছ নিশ্চয়। এতক্ষণে তোমার সব ব্যারামের

হদিশ পেলাম। আসল কারণ বোঝা গেলো এখন। সমস্ত রহস্য পরিষ্কার এতক্ষণে। এ-বই আমি বাজেয়াপ্ত করলুম। আজ থেকে তোমার কোনো অসুখই নেই আর। বুঝেছ?' হেসে-হেসে বললেন হেডমাস্টারমশাই—'তোমার সব অসুখ বেহাত হয়ে গেল—আমি হস্তগত করে নিয়ে চললুম! বুঝলে? যাও খেলোগে এখন—খেলাধুলো করোগে!'

সমীর বললো—'হ্যাঁ সার!' প্রকাণ্ড একটা ঘাড় নেড়ে বললো সে। মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে যেতেই ঘাড়টা যেন হাল্কা হয়ে গেছে তার।

আর তারপরেই—হেডমাস্টারমশায়ের অন্তর্ধানের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে-লাফাতে খেলতে চলে গেলো সে।

হেডমাস্টারমশাই ফেরবার পথে ড্রিলমাস্টারের বাড়ি গিয়ে চড়াও হলেন—সদ্যলব্ধ 'শরীর ভাল রাখুন' বইখানা বগলদাবাই করে।

'এই দেখুন মশাই, আপনার সমীরের যত আধিব্যাধি—এই দেখুন—এই আমার শ্রীহস্তে। দেখেছেন?'

'ও বাবা! এ যে খালি অসুখ! অসুখেই ভর্তি! পাঁচশো রকমের ব্যামো দেখছি এখানে! নিদারুণ যতো ব্যায়রাম! অ্যাঁ?' ড্রিলমাস্টারের বাক্‌স্ফূর্তি লোপ পায়।

'হ্যাঁ, সমীরের শুধু দশটার ওপর দিয়েই গেছে। চারশ নব্বইটার বাকি ছিল এখনো—কিন্তু তাদের আক্রমণ থেকে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছি—এক ধাক্কায় সারিয়ে দিয়েছি সবকটাই!' হেডমাস্টারমশাই ড্রিলমাস্টারকে হাসতে হাসতে বলেন।

পরদিন প্রথম-ঘণ্টা পড়বার ঢের আগেই সমীর ক্লাসে এসে হাজির। সারা ইস্কুলে কেবল দুজন সেদিন অনুপস্থিত। ড্রিলমাস্টারমশাই আর হেডমাস্টারমশাই! তাঁরা এখনো এসে পৌঁছোতে পারেননি এবং আসতে পারবেন না বলে, খবর পাঠিয়েছেন!

ড্রিলমাষ্টারমশায়ের পিত্তবিকার হয়েছে। পিত্তশূলও হতে পারে—এমন কি জ্বরাতিসার হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়! আর হেডমাস্টারমশায়ের—

কী হয়েছে ভেবে তিনি কূল পাচ্ছেন না। বিছানায় শুয়ে তিনি কুল্‌কুল্‌ করে ঘামছেন—সেই সকাল থেকেই! সারাদিন কিচ্ছুটি খাননি, টি পর্যন্ত না কেবল একবার বুকে, একবার পেটে, আরেকবার মাথায় নিজের মাথাতেই হাত বুলোচ্ছেন থেকে থেকে।

হৃদরোগ কিংবা উদরাধ্মান—দুটোর কোনো-একটা যে তাঁকে পেয়ে বসেছে সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। শিরঃশূলেও হতে পারে।

খুব শক্ত অসুখ যে তার আর সন্দেহ কি?

নাক নিয়ে নাকাল

'আপনার কী অভিযোগ বলুন তো।'

হেডমাস্টার মশাই ড্রিলমাস্টারের দিকে তাকালেন।

ইস্কুলের বেয়ারাও আড়চোখে তাকাল তাঁর দিকে।

ড্রিলমাস্টার মশাই বিরূপ দৃষ্টিতে কার দিকে যে তাকান বোঝা যায় না ঠিক।

'অভিযোগ এক নম্বর, ড্রিলে ফাঁকি দেওয়া ; দু'নম্বর, অবাধ্যতা ; তিন নম্বর, আমার বদনাম রটানো'—তিনি বলতে থাকেন।

'বদনাম রটানো ! বলেন কি মাস্টারমশাই, ইস্কুলের ছেলে হয়ে সেই ইস্কুলের মাস্টারের নামে বদনাম রটাবে ?'

হেডমাস্টারমশায় একটু অবাক হন। অবাক হয়ে তাকান আমার দিকে। বেয়ারাটাও আমার দিকে তাকায়।

ড্রিলমাস্টার আমার দিকে তাকান না। বলে যান, 'বদনাম মানে, আর কিছু বদনাম না—আমার নাম বদলে দেয়া। আমার নাম—আমার নাম—'

'জানি আমরা। বলতে হবে না। রণ-দুর্মদ বড়ুয়া।'

'আজ্ঞে হাঁ। সবাই জানে। কিন্তু ঐ ছোকরা আমার নামের প্রতি কটাক্ষ করে—নাম না বলে নাক বলাই উচিত—আমার নাকের প্রতি কটাক্ষ করে—'

হেডমাস্টারমশাই বাধা দেন 'নাকের প্রতি কটাক্ষ ! কিন্তু নাক আপনার কই মাস্টারমশাই, যে নাকের প্রতি কটাক্ষ করবে ?'

হেডমাস্টার মশাই ড্রিলমাস্টার মশায়ের দিকে তাকান—তাঁর নাকের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বেয়ারাও তাকায়—তারও নাকের দিকেই তাক।

আমিও তাঁর নাসিক শহরে লক্ষ্য রাখি। তাকিয়ে দেখবার মতই একটা জিনিস ছিল তাঁর নাক। নাক তাঁর ছিল না।

একেবারে যে ছিল না তা নয়। ছিল, তবে নামমাত্র। দর্শনীয় ঐ বস্তুটি যথাস্থানে যথোচিত পরিমাণে না থাকার জন্যই তিনি দ্রষ্টব্য হয়েছিলেন।

'সেই কথাই তো বলছিলাম,' ড্রিলমাস্টার মশাই বলেন ঃ 'ছেলে মহলে আমার নাম রটেছে নাকেশ্বর। নাকেশ্বর ওরফে নাকু। ওরফে আরো সব কী যেন! কাণাঘুষায় কথাটা কানে এসেছে আমার। আর আমি বুঝতে পেরেছি, এ কাজ আর কারো নয়, এ হচ্ছে—এ হচ্ছে ওর···ওরই—'

হেডমাস্টার বলেন—'কিন্তু আপনি তো ওদের হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। হোস্টেলে থেকে ছেলেদের এতবড় বুকের পাটা হবে—বলেন কি! দেখি, দেখি তো রেজিস্টারী বইটা—দেখি ওর ড্রিলের রেকর্ড। কদিন ড্রিল কামাই করেছে দেখা যাক।'

হেডমাস্টারমশাই ড্রিলের রেজিস্টারি খাতা দেখেন।

বেয়ারাও হেডমাস্টারের কাঁধের ওপর দিয়ে তফাৎ থেকে দেখার চেষ্টা করে—আমার রেকর্ড।

ড্রিলমাস্টার কী দেখেন তিনিই জানেন।

'এ ছাড়াও আমার আরেকটি অভিযোগ আছে। গুরুতর অভিযোগ! আমাকে মারবার চেষ্টা, এমন কি, মারাই বলা উচিত। হোস্টেলের বারান্দাটা অন্ধকার—জানেন বোধ হয়? রোজ সন্ধ্যার পর বাইরে থেকে আমি বেড়িয়ে ফিরি—ঐ বারান্দা দিয়েই। বারান্দায় কলা খেয়ে খোসা ছড়িয়ে রাখা ওরই কাজ, ও আর কারো নয়। কাল সন্ধ্যায় ফেরার সময় বারান্দায় কলার খোসায় আমার পা পড়লো। পা হড়কে আমি পড়ে গেলাম।'

'এর জন্য ওর প্রতি সন্দেহ হবার আপনার হেতু?' হেডমাস্টারমশাই প্রশ্ন করেন। 'কলা কি আর কেউ খায় না?'

'কলা খাওয়ার হেতু···হেতু···' তিনি বলতে যান।

ভাষায় যোগাচ্ছে না দেখে আমি—আমিই তাঁর হয়ে যোগ করি—'হেতু? হেতু আর কি, নাকামো।'

কিন্তু হেডমাস্টারমশায়ের সামনে গলা দিয়ে গলানো যায় না বলে আমার কথাটা কানেই যায় না কারো।

'আমার পতনের সময় ও তখন ওইখানেই ছিল। কী করছিল ও সেখানে? মজা দেখবার জন্যই ওৎ পেতে ছিল নিশ্চয়ই!'

ড্রিলমাস্টার মশাই নিজের কারণ ব্যক্ত করেন ঃ 'আমাকে নিপাত করার জন্যই ওর কলার খোসা ছড়িয়ে রাখা—আমি হলপ করে বলতে পারি। আর শুধু তাই নয়, আমি আছাড় খাবার পর, তার ওপর, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে আসা।' তাঁর অভিযোগের ওপর অভিযোগ।

'কি রকম?'

'ঠিক যে রকম কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। নেমকহারামি যাকে বলে। আমাকে এসে বলা হচ্ছে, 'আহা, আপনি পড়ে গেলেন স্যার? শুনেছিলাম, বেড়ালে অন্ধকারে দেখতে পায়।' আমি বললাম, 'আমি কি বেড়াল?' ও বলল, 'আহা, তা কেন, আপনি তো বেড়িয়ে ফিরছেন। সেই কথাই বলছিলাম আমি। বেড়ালে তো অন্ধকারে দেখতে পায় এইরকম আমার শোনা ছিল। শুনুন ওর কথা—জটপাকানো কথার ছিরিটা দেখুন একবার! কথায় কথায় কেমন তালগোল পাকিয়ে বসে আছে।'

'তাই তো দেখছি।' হেডমাস্টারমশাই দেখেন: 'বেড়ালরা বেড়ায় তাই বলে বেড়ালেই কিছু বেড়াল হয় না। যে বেড়ায় সেই কখনো বেড়াল নয়।'

হেডমাস্টারমশাই ঘাড় নাড়েন।

বেয়ারা কিছু বলে না, কেবল ঘাড় নাড়ে।

ড্রিলমাস্টারমশাই আপাদমস্তক আপনাকে নাড়েন: 'নয়ই তো। সেই কথাই তো বলছি। আমার প্রতি ওর বিহেভিয়ারটা দেখুন—দেখলেই বুঝবেন মোটেই ভাল নয়। প্রথম, আমার নাক নিয়ে নাকাল করার চেষ্টা—ছাত্রমহলে আমার মর্যাদাহানি—আর যেহেতু নাকের সঙ্গে আমি জড়িত, কিংবা নাক আমার সঙ্গে জড়িত, সেই হেতু নাকের অমর্যাদায় আমারই অসম্মান; তারপরে ঐ কলার খোসা। ওর এই সব আচার-ব্যবহারের পর আমার প্রতি—আমার প্রতি ওর ঐ—ঐ—' ড্রিলমাস্টারমশায়ের আবার আটকায়।

'ঐ আছাড় ব্যবহার।' আমাকেই বলে দিতে হয়।

'হ্যাঁ, এবং তারপর, এবং ঐখানেই না থেমে তার ওপরে আবার আমার নামে যাচ্ছেতাই করে নিজের বাড়িতে লেখা—'

'বাড়িতে লেখা? আপনার বিষয়ে আবার বাড়িতে লেখার কী থাকতে পারে মাস্টারমশাই?' হেডমাস্টারমশাই একটু বিস্মিতই হন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাইতো বলি: মাকে লেখা ওর সেই চিঠি—মনে হয় কাল রাত্রের লেখা, ওর বিছানায় পড়েছিল—আজ সকালে কি কাজে ওকে ডাকতে ওর ঘরে যেতেই চিঠিখানা আমার নজরে পড়ল। সেই পত্রে, আমার নামে, এই ইস্কুলের নামে বিস্তর কুৎসা করা হয়েছে দেখলাম।'

'ইস্কুলের নামে কুৎসা করে বাড়িতে লেখা? তাহলে তো সত্যিই ভারী খারাপ!' হেডমাস্টারমশাই আমার দিকে তাকান।

বেয়ারাও আমার দিকে তাক করে।

আমি ড্রিলমাস্টারের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তিনি কোনোদিকে না তাকিয়ে গড় গড় করে গড়িয়ে যান—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই চিঠিতে লিখেছে আমি নাকি ড্রিলের ছলনায় ছেলেদের কেবল নাজেহাল করি—ওঠ-বোস করিয়ে করিয়ে এমন করি যে তাতে নাকি ওরা একেবারে শুয়ে পড়ে। তাছাড়া ওর ওপরই আমার নাকি বেশি আক্রোশ—ড্রিলের নাম করে রোজ নাকি ওকে আমি পাঁচক্রোশ করে হাঁটাই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পা ফেলে পা তুলে এই হাঁটনিটা ওকে হাঁটতে হয়। আমার যত রাজ্যের ফরমাস খেটে

খেটে বেচারা কাহিল। আমার যত ময়লা কাপড়-জামা রুমাল কামিজ—' বলতে বলতে ড্রিলমাস্টারমশাই থেমে যান।

'বলুন বলুন। থামলেন কেন? গোপন করবেন না কিছু।'

'না, গোপন করার কি আছে?' বলে একটু আমতা আমতা করে ড্রিল-মাস্টার বলেন: 'আমি নাকি ওকে দিয়ে আমার যত সব ময়লা কাপড়, জামা, পায়জামা, পিরান, কুর্তা, কামিজ, রুমাল, গেঞ্জি, সালোয়ার, বালিশের ওয়ার, চাদর—চাদর আবার দুরকম—গায়ের এবং বিছানার—বোম্বাই এবং এন্ডির—এই সব ওকে দিয়ে কাচাই। হরদম কাচাই, দম ফেলতে দিই না। লিখেছে লিখুক, তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু এমন করে লিখেছে—এমন করে লিখেছে—এমন এক বিচ্ছিরি ভাষায়—যে তাতেই আমি আরো বেশি আঘাত পেয়েছি।'

'কী রকম ভাষা?' হেডমাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করেন।

বেয়ারা কিছু না জিজ্ঞেস করেই নিজের আগ্রহ প্রকাশ করে।

'ভাষা? সে ভাষার কোনো মানে হয় না, মাথামুণ্ডু নেই, বোঝা যায় না কিছু। তাতেই আমি আরো মর্মাহত হয়েছি! লিখেছে যে রাতদিন ওই সব কাচতে কাচতে ও হন্দ হয়ে গেল। তার ওপরে এই কাচা কাজকে রোদে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে পাকা কাজ করা আরেক হাঙ্গাম্। আরো লিখেছে যে—না, সে-কথা মুখেই আনা যায় না।'

'কোনো খারাপ কথা?'

'বোধহয় খারাপ কথাই। মানে ঠিক বোঝা যায় না বটে, তাহলেও তাই আমার মনে হয়।'

'তাহলেও বলুন। দরকার আমার।'

হেডমাস্টারমশাই জানান।

জানাটা যে বেয়ারারও প্রয়োজন, তার হাবভাবে সেটা ব্যক্ত হয়। বেয়াড়া কৌতূহল ছাড়া আর কি?

'আজ্ঞে, লিখেছে যে······লিখেছে ঐ ইস্ত্রি করার বিষয়েই। লিখেছে যে ইস্ত্রি আবার ড্রিলমাস্টার মশায়ের নিজের না, পাশের ধোপার বাড়ি থেকে ধার করে আনতে হয়। তাহলেও, পরের ইস্ত্রি নিয়ে এই টানাটানি করাটা কি ভাল? কখনোই ভাল নয়। এই ছোটবেলা থেকেই যদি ওকে পরের ইস্ত্রি নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করতে শেখানো হয়···'

'টানাহ্যাঁচড়া?' কথার মাঝখানে হেডমাস্টারমশায়ের হ্যাঁচকা টান।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ঠিক ওর ভাষাই ব্যক্ত করছি। চিঠির মর্ম ঠিক না বুঝলেও, আজ সকালেই এতবার করে পড়েছি যে কথাগুলো আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। চিরকালের মতই আমার মর্মে গাঁথা হয়ে গেছে।'

ড্রিলমাস্টারমশায় নিজের মর্মগাথা গান করেন: 'লিখেছে যে, বাল্যকালেই যদি এইভাবে পরের ইস্ত্রি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় তাহলে এই বয়সেই ওর চরিত্র ভয়ানক ক্ষণভঙ্গুর হয়ে যাবে।'

'কাপড় কাচার সঙ্গে চরিত্রের কি? উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায়?' হেডমাস্টারমশায়ের জিজ্ঞাসা।

ড্রিলমাস্টারের জবাবঃ 'আমি—আমিও তাই ভাবি। কিন্তু ও যা লিখেছে তাই আমি বলছি। ওর মতে কাচা কাজ নাকি চরিত্রকে কাঁচিয়ে দেয়। কাপড় আছড়াতে আছড়াতে পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে যায় নাকি—যার অপর নাম মেরুদণ্ড। আমার কাপড় কাচতে গিয়ে ওর সেই মেরুদণ্ড কাহিল হয়ে পড়ে; আর চরিত্রকে খাড়া রাখতে শিরদাঁড়াই হচ্ছে আসল। মেরুদণ্ডের জোরেই মানুষ চরিত্র রক্ষা করে। মেরুদণ্ডের মধ্যেই নাকি আসল মজ্জা।'

'মজ্জা? অ্যাঁ?'

'মজ্জা কি মজা—কী লিখেছে ওই জানে! আমি ঠিক বলতে পারব না। এমন জড়ানো পাকানো লেখা যে পড়া দায়। যাক্ যা বলছিলাম। এই কাচা কাজ থেকে আর ঐ ইস্ত্রির ব্যাপার নিয়ে ওর চরিত্র নাকি কেঁচে গিয়ে কাঁচের কাজ হয়ে দাঁড়াবে! আর তা হলেই ওর বয়ে যাবার দারুণ সম্ভাবনা। কেননা, চরিত্র যদি একবার কাঁচের মত স্বচ্ছ নির্মল আর সুন্দর হয়—মানে সেই রকম পরিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে আপাতমনোহর সেই আদর্শ চরিত্রের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এ পৃথিবীতে নাকি আর কিছুই নেই।'

'মানে কী এর?' হেডমাস্টারমশায় নিজেও ঠিক বুঝতে পারেন না।

বেয়ারাও হাঁ করে থাকে।

'তাই কে বলে!' 'ড্রিলমাস্টার বলেন—'এছাড়াও আরও লিখেছে যে আমি যদি এই সবের কাচাকাচির ওপর ফের আবার কম্বল, সতরঞ্চি, লেপ, তোশক, বালিশ, বিছানা, পাপোশ, সুটকেশ, বাক্স-প্যাঁটরা প্রভৃতি ওকে কাচতে দিই—তাও দিতে পারি নাকি—আর ওকে যদি এইভাবে পুনঃ পুনঃ ধোপার মত ব্যবহৃত হতে হয়, তাহলে ও নাকি বেশিদিন এখানকার ধোপে টিঁকবে না। একেবারে গাধা বনে যাবে। বিস্তারিত করে এই সব কথা লিখেছে ওর বাড়িতে।'

'কই, দেখি সে চিঠি।' হেডমাস্টার মশায় হাত বাড়ান।

বেয়ারা হাত বাড়ায় না. মুখ বাড়ায়।

ড্রিলমাস্টারমশাই চিঠিটা পকেট থেকে বার করেন।

হেডমাস্টারমশাই পড়তে থাকেন গড়গড় করে।

বেয়ারা কান খাড়া করে শোনে।

ড্রিলমাস্টারের কানেও কথাগুলো গড়িয়ে আসে।

'শ্রীচরণকমলেষু, মা, তুমি আমার জন্য মোটেই ভেব না। আমি এখানে দিব্যি আরামে আছি। চমৎকার এখানকার স্বাস্থ্য, আবহাওয়া আর বন্ধুরা। হোস্টেল আর মাস্টারদের তুলনা হয় না। আর আমাদের ড্রিলমাস্টারমশায়—এমন উপাদেয় যে কি বলব! আমাদের ড্রিলের আর শরীরের দিকে ওঁর খুব নজর। অন্য মাস্টারদের পড়া করতে হয় কিন্তু ড্রিলমাস্টারমশায়ের খালি প্যারেড। তার জন্যে মোটেই পড়তে হয় না, খালি পা-র aid লাগে। পায়ের সাহায্য নিতে হয়।

আর আমাদের হেডমাস্টারমশাই এত ভাল যে একরকম আমি জীবনে দেখিনি। অবশ্য, হেডমাস্টার আমার নশ্বর জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি—হেডমাস্টাররা একটি বালকের জীবনে অতি বিরল। কখনও কাকের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা দেয় না, তাহলেও আমি বলব আমাদের মত হেডমাস্টার আর হয় না। আমার দৃঢ় ধারণা শীঘ্রই তিনি কোনো কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে যাবেন। এমন কি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হলেও সেটা অত্যুক্তি হবে না। আমি তো মোটেই একটুও আশ্চর্য হব না। তিনি একজন গ্রেটম্যান—আর গ্রেটম্যানেরা ইতিহাসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান লাভ করতে বাধ্য।

তুমি কেমন আছো? তোমার জন্য ভাবিত আছি। শ্রীমান টম্ আর সত্যকে আমার ভালবাসা জানিও। শ্রীচরণে শতকোটি প্রণামপূর্বক। ইতি—

তোমার স্নেহের

রাম।

চিঠি শেষ করে হেডমাস্টারমশায় চোখ তুলে তাকান। তাকান আমার দিকে। বেশ স্নিগ্ধচক্ষেই তাকান।

ড্রিলমাস্টারও চেয়ে থাকেন—চোখে বিস্ময়ের বোঝা নিয়ে। বেয়ারাটাও তাকায়—যদিও ঠিক তাক পায় না। তার যেন কিছুটা কৃপাদৃষ্টির মতই, কিন্তু কার প্রতি যে বোঝা দায়!

'কই, এ চিঠির ভেতর তো স্কুলের বা কারো কোনো কুৎসা দেখলাম না। কুৎসিত কিছু পেলাম না তো। আপনার সম্বন্ধেও তো খারাপ কিছু লেখেনি। আর—আমার সম্বন্ধে—সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। আপনার ধারণা ঠিক নয় দুর্মদবাবু অভিযোগও অমূলক। ছেলেটি আদৌ খারাপ নয়—অন্তত তত খারাপ নয়।' এই বলে তিনি আর একটি স্নিগ্ধ কটাক্ষ ঝাড়েন আমার দিকে।

আমি সলজ্জমুখে ঘাড় হেঁট করে থাকি। আড়চোখে ড্রিলমাস্টারের দিকে তাকাই একবার।

ড্রিলমাস্টার কোনোদিকে চান না, তাঁকে যেন কেমন একটু বিড়ম্বিতই দেখা যায়।

বেয়ারাটাও ব্রীড়াবনত।

ড্রিলমাস্টার থ। থই পান না যেন।

বুঝতে পারেন না যে আজ দশটার সময় ইস্কুলে আসবার আগে তাঁর কামিজ ইস্ত্রি করতে দেওয়ার কালেই তাঁর কাল হয়েছে! গলদ যা ঘটবার ঘটে গেছে তখনি। কেননা, সেই ফাঁকেই আমি কাম সেরেছি। তাঁর পকেট থেকে আমার আগের চিঠি বের করে সেখানে অন্য চিঠি লিখে রেখেছি। কি করে তিনি তা বুঝবেন? নিজের দিকে—কামিজের দিকে—চিঠির দিকে—কতদিকে চোখ রাখবেন তিনি? নাক নিয়ে যারা নাকাল, চোখের দিক দিয়ে তারা তেমন চোখা হয় না।

নাকে ফোঁড়ার নানান ফাঁড়া

ভারী বিপদে পড়া গেছে নাক নিয়ে। নিজের নাক নিয়ে। নাক যে তার মালিককে এতখানি নাকাল করবে, কোনকালে তা ভাবতে পারিনি।

নাকের জ্বালায় বাড়ি থেকে বেরুতে পারছি নে। এক গাল জঙ্গল—দাড়ি কামালে তবে তো বেরুবো বাড়ি থেকে? আর আমার দাড়ি কামানোর কথা ভাবতে গেলেই প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু দাড়ি কামাই আর না কামাই, আপিস কামাই করা চলবে না তো! এ হেন মুখ নিয়ে, বাড়ি থেকে বেরুনো না গেলেও, এ চীজ ভদ্রসমাজে অপ্রকাশ্য হলেও, আপিসে কিন্তু বেরুতেই হয়। আপিস ভদ্রসমাজের বাইরে।

কিন্তু ফ্যাসাদ আর বলে কাকে! তখন থেকে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে খুঁজছি সেলাই-বুরুশ, কিন্তু হতভাগা একটা নাপিতেরও যদি পাত্তা মেলে!

ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি তো পাবার যো নেই এখানে, তবে আর কলকাতা কেন? যখন তোমার জুতো সারানোর দরকার, তখন কেবল ছাতা সারানো যাবে রাস্তা দিয়ে; আর যখন চুল ছাঁটবার একেবারে গরজ নেই, আলুকাবলিওলার সন্ধানেই রয়েছো—হয়ত তখনই আসবে এনতার পরামাণিক! একেবারে প্রোসেশন করে আসবে।

আর পরামাণিক খুঁজেছ কি তার টিকিও দেখতে পাবে না, তার বদলে দেখবে হয়ত, ধুমধাম করে চলেছে যত রাজ্যের ধুনুরিরা!

তাই চালাকি করে সেলাই-বুরুশওলাকেই খুঁজছিলাম। প্রাণপণেই খুঁজছিলাম, সকাল থেকেই খুঁজছি, কানা খোঁড়া গলগণ্ডওলা, কেবল নুলো নয়,

এমন একটা নাপিতেরও দৈবে যদি দেখা মিলে যায়! কিন্তু না, সওয়া নটা বাজে, আপিসের টাইম হতে চলল প্রায়, অন্যদিন তো গাদি লেগে থাকে, আজ কি শ্রীমানদের দুর্ভিক্ষই লেগেছে নাকি? নরসুন্দররা ধর্মঘট করেছে বোধ হয়! নইলে এতগণ্ডা রিকশাওলা গেল, শিলকুটানোওলা গেল, ঘটি-বাটি-সারাবিও নেহাত চারটি না, সেলাই-বুরুশই চলে গেল কত, অথচ হাতে-ক্ষুরওয়ালা কি একজনও যেতে নেই এ পথে?

কালকেই সবে চাকরিটা পেয়েছি, কিন্তু আজই যদি দাড়ি না কামিয়ে আপিসে যাই, তাহলে আজই হয়ত কাজ খুইয়ে চলে আসতে হবে। একে তো বড় সাহেবের বেজায় মেজাজ, তার ওপরে দাড়ি-টাড়ির দিকে তাঁর যেরকম কড়া নজর, তাতে কাল যদি বা কোনো গতিকে—

কালকের কথাটাই বলি। বিনয়চরণ ব্রহ্মচারী—এমন কি আমার শক্ত নামটা, শুনি? সাহেব তো উচ্চারণ করতেই হিমসিম!

'হোয়াট? বিন্ চারণ্ ব্র্যাম্—ব্র্যাম্—ব্র্যাম্—'

'নো ব্র্যাম্ সার। বাট্ ব্রহ্মচারী!' শুদ্ধ ভাষায় সবিনয়ে আমি বলি।

'ব্রহ্মচারী! পিওর য়্যাণ্ড্ সিম্পল!' পুনরায় যোগ করি, সাহেবের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঘাবড়াই না।

'ব্র্যোম—ব্র্যোম—ব্র্যোম—হোয়াট?'

শব্দটাকে গলার বার করার বারম্বার চেষ্টায় তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। কপালের ঘাম মুছে, অবশেষে তিনি বলেন, 'হোয়াই! আই উইল কল ইউ য়্যাজ বোসবাবু!'

'বাবু চার্ন বোস! ওন্ট্ দ্যাট উড্ সুট ইউ?'

'য়্যাজ ইউ উইল প্লিজ সার!' আমি আরো বিনীত হয়ে পড়িঃ 'বাট দেয়ার ইজ্ এ বিট ডিফিকালটি ইন দ্যাট! উই ব্রহ্মচারীজ আর অল ব্রাহ্মিন্স্ হোয়াইল দোজ বোস পিপল আর—আর—আর নট্ দ্যাট। মাই রিলেশনস উইল বি ভেরি মাচ সরি, ইফ্ আই, উইদাউট এনি নোটিশ, স্যাডেনলি বিকাম এ বোস। দে উইল গেট গ্রেট শক! ইয়েস!'

'বাট হোয়াট এ শকিং নেম ইউ হ্যাভ গট, মাই ম্যান! ব্রো—ব্রো—ব্রোম—হোয়াট?'

'য়্যাণ্ড মাই ডিসট্যাণ্ট আংকল—' এক নিঃশ্বাসেই আমার সমস্ত আর্জি'টা আমি করতে চাই—

'ওয়ার্লড ফেমাস সার ইউ এন ব্রহ্মচারী—হু ডিসকভারড্—ডিসকভারড—ডিসকভারড সাম থিং আই সাপোজ্—উইল অলসো বি ভেরি ভেরি অফেণ্ডেড।'

অত্যন্ত সুদূর আত্মীয়-প্রবরের যুগান্তকারী আবিষ্কারটা মনের মধ্যে অনুভব করছিলাম বটে, কিন্তু সামান্য বিদ্যায়, ওকে ইংরেজি বানিয়ে বাগিয়ে আনতে বেগ পেতে হচ্ছিল। যাক, ওতেই হবে, নামটা করেছি তো, ওই যথেষ্ট, অভ্রভেদী উদাহরণেই বেশ কাজ হবে।

'ডিস্‌কভারড হোয়াট ?' সাহেব জিগ্যেস করেন—জমকালো নামে তিনি চমকান না মোটেই, 'দ্যাট ওয়ার্লড ফেমাস ব্রোম ?'

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। একটু আমতা আমতা করে বলেই ফেলি, 'ডিসকভারড কালাজ্বর, সার !'

বলা উচিত ছিল কালাজ্বরের প্রতিষেধক, মানে; প্রতিষেধকের ইংরেজি প্রতিশব্দ কিন্তু লম্বা চওড়া ঐ বাংলা কথাটাই তখন আসছিল না মাথায়, বেশি আর কী বলব !

'দি কালা আজর ?' সাহেব যেন বিস্মিতই হন, 'আই থট ইট ওয়াজ দেয়ার লং বিফোর দি য়্যাডভেণ্ট অফ ইওর ব্লেসেড আংকল—হোয়াটস হিজ নেম ? হাওয়েভার, আই মে বি রং !'

'ইয়েস সার।' আমি বলি, 'হিজ নেম ইজ সার ইউ এন ব্রহ্মচারী।'

গর্বের সঙ্গেই উচ্চারণ করি। হ্যাঁ. নামের মত নাম বটে একখান ! দারোয়ানের গোঁফের ন্যায়, এধার-থেকে-ওধার-পর্যন্ত—চলে—যাওয়া দিগন্ত-বিস্তারী নাম !

'ব্রো—ব্রো—ব্রোম—হোয়াট ?' নবোদ্যম করতে গিয়ে সাহেব আবার বেদম হয়ে পড়েন, 'ইটস ট্রিমেণ্ডাস ! ইটস হরিবল ! গড সেভ মি ফ্রম দিজ ড্যাম ব্রোমস !'

তারপর দম নিয়ে কপালের ঘাম মুছে, সাহেবের প্রশ্ন হয় আবার, একটু কৌতূহল-ভরেই যেন,—'বাট আই সে, মাই ম্যান, হু ডিসকভারড দ্য ম্যালেরিয়া ?'

সাহেবের চোখপাকানো কট-মট্ চাহনি দেখে আমি ঘাবড়ে যাই। ভয়ে ভয়ে জানাই, 'মী ? নো সার ! আই ডিড নট ডিসকভার ম্যালেরিয়া ?

নেভার, নর এনি থিং অফ দি সর্ট ! নট ইয়েট।'

'ইয়েস। আই নো দ্যাট। নট ইউ বাট এনি অফ ইওর ব্রোমিং আংকলস ?—'

আমি ঘাড় নাড়ি ! 'নো—নো সার ! ইউ শুড নট সাসপেকট সো।'

'দ্যাট রটন ডিসকভারি পুট মি ইন বেড ফর থ্রি উইকস দ্য লাস্ট মানথ। দ্য ম্যালেরিয়া ! ইয়েস, দিজ থিংস আর নট গুড টু ডিসকভার.—লাইক দোজ ম্যানীকিলিং আর্মামেণ্টস, আই মাস্ট সে সো…ইয়েস্।'

'ইয়েস সার ! উই অল সাফার ফ্রম দিজ ডিসকভারিজ অফ—অফ আওয়ার আংকলস !' সাহেবের কথায় আমি সায় দিই।

'বাট, ওয়ান থিং ! নো মোর অফ দোজ ব্রোমস হোয়াইল ইন মাই অফিস, মাইণ্ড দ্যাট !—' সাহেব স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেন, 'হোয়াই ! হোয়াই নট টেক মিস্টার সুভাষ বোস ফর ইওর আংকল ? হোয়াটস দি হার্ম ?'

'নো হার্ম—নাথিং—বাট—'

ভারী কিন্তু-কিন্তু হয়ে পড়ি, কিন্তু সুভাষবাবুকে পিতৃব্যপদে বরণ করতে, কোথায় যে অসুবিধা, এবং কেন যে আমার দ্বিধা, সুকঠোর সেই বক্তব্যটা, দুরূহ বৈদেশিক বাক্যে কিছুতেই ব্যক্ত করে উঠতে পারি না।

সুভাষবাবুর ভাইপো হতে পারা হয়ত সৌভাগ্যই আমি ভাবতে পারতাম, কিন্তু কেন যে সেটা অসম্ভব, সনাতন-হিন্দু-আমাদের জাতিকুলের সেই নিগূঢ় রহস্য বিজাতীয় ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারা চারটিখানি নয় তো। বলি, 'আংক্‌ল্‌স্‌ সার্‌, আর বর্‌ন, নেভার মেড্‌। অ্যাজ লাইক ইওর পোয়েট্‌স্‌।'

'হোয়াই, হ্যাজ হি নট ডিসকভারড এনি থিং ? মিস্টার সুভাষ বোস ?'

তার আমি কি জানি ? কী জবাব দেব আমি এর ? কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টশিপ একবার—একবার কেন, বলতে গেলে প্রায় দুবারই আবিষ্কার করেছিলেন বটে—কিন্তু কথা কি সাহেবকে বোঝানো যায় ? চুপ করেই চেপে থাকি।

'প্লেগ ? অর এনি থিং অফ দ্য সর্ট্‌ ?'

'নট টু নলেজ, সার।'

ঈষৎ একটুখানি আলো যেন পাই আত্মরক্ষার। সুযোগটাকে ফস্‌কাতে দিই না।

'ইউ সি সার ? দ্যাট ইজ্‌ মাই রিয়্যাল ডিফিকালটি টু ওন হিম য়্যাজ মাই আংকল। ইভ্‌ন্‌ ফর্‌ এ ভেরি রিমোট্‌লি ডিস্‌ট্যাণ্ট্‌ আংকল্‌। য়্যাজ ইউ সি সার্‌, উই বিলং টু দ্য ফেমিলি অফ গ্রেট ডিসকভারারস! দ্যাটস্‌ আওয়ার প্রাইড।'

'নো, মাই ফ্রেণ্ড! ইউ মাস্ট নাও মুভ্‌ টু দ্য বোস্‌ ব্র্যান্‌চ্‌! ইউ মাস্ট গিভ্‌ আপ্‌ দ্য বম্ব্‌ থ্রোইং! ফ্রম নাও অন্‌ ইউ আর বাবু চার্ন বোস্‌! পিওর অ্যাণ্ড্‌ সিম্‌পল! অ্যাণ্ড ইওর আংক্‌ল্‌ ইজ্‌ মিস্টার সুভাষ বোস্‌! ডোণ্ট্‌ ফর্‌ গেট্‌ ইট্‌ মাই বয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ সার!'

বলে' যেই না পিছন ফিরেছি, অমনি সাহেবের ফের আবার হাঁক পড়েছে ঃ 'হ্যালো বাবু! ডু ইউ টেক ইয়োরসেলফ ফর এ চাইনিজ ?'

আমি তো হকচকিয়েই গেছি, 'বেগ্‌ ইয়োর পার্ডন, সার।'

'টোমার কি সণ্ডেহ হয় টুমি একটি চীনাম্যান আছ ?'

রাগ হলে আমরা যেমন হিন্দি চালাই, তেমনি খুব রেগে গেলে, আমাদের সাহেবের মুখ থেকে পরিষ্কার বাংলা বেরুতে থাকে।

'নো—নো, সার! নেভার সার সার্টেনলি নট সার্‌!'

'টবে ডারি কামাও নাই কেনো ? ওন্‌লি দ্য চাইনিজ, দোজ্‌ ব্লেসেড্‌ পিপল কুড য়্যাফোর্ড নট টু শেভ! উহাডের ডারি হইটেছে না। টুমি এভরি ডে টোমার সমুডায় ডারি ওয়েল করিয়া কামাইয়া টবে এখানে আসিবে, ইউ মাস্ট অলওয়েজ লুক স্মার্ট; আদারওয়াইজ—'

সাহেব আর বলেন না, অধিক বলা বাহুল্যবোধ করেন। কিন্তু ওর বেশি বলার দরকারও ছিল না, ওতেই আমি বিলক্ষণ সমঝে যাই, আদারওয়াইজ টের পেতে বেশি দেরি হয় না আমার। জাহাজের ব্যাপারে আনাড়ি হতে পারি, কিন্তু কেরানীগিরি করতে এসে আদার ব্যাপারে ওয়াইজ নই এ কথা কি করে বলব ?

'থ্যাঙ্কিউ সার !'

বলে সহাস্যবদনে সাহেবের কামরা থেকে বেরিয়ে আসি। গম্ভীর মুখে গিয়ে বসি নিজের টেবিলে। সেই দণ্ডেই ইস্তফা দিয়ে ছেড়ে যাব কিনা গুম হয়ে ভাবতে থাকি।

বাস্তবিক দাড়ির প্রতি কটাক্ষপাত প্রাণে লাগে ভারী। দাড়ি তো কি হয়েছে? দাড়ি কি হতে নেই? দাড়ি কি হয় না মানুষের? দুর্ভাগ্যক্রমে ছাগল হয়ে জন্মাতে পারিনি বলে কি দাড়ির অধিকারে বঞ্চিত হয়েছি? দাড়ি রাখা চলবে না আর এ জীবনে? এ কি অন্যায় কথা। দাড়ির স্বাধীনতায় এ কি রকমের হস্তক্ষেপ?

তক্ষুনি একখানা কাগজ টেনে নিয়ে ফসফস করে লিখতে শুরু করে দিই—

নাঃ, যেখানে দাড়ির বিষয়ে এতখানি কড়াকাড়ি সেখানে চাকরি করা পোষাবে না আমার।

ইস্তফা-পত্রে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিই, দাড়ির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। তার স্বচ্ছন্দ-বিস্তারে এবং স্বাধীন আন্দোলনে বাধা দিতে আমি অক্ষম। তাছাড়া, দাড়ির যেমন বার্থরাইট আছে আমার ওপরে, আমরাও তেমনি দাড়ির ওপরে বার্থরাইট রয়েছে। দুজনের কেউই আমরা জন্মগত অধিকার পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। ছাগল হয়ে জন্মানোর সুযোগ হারিয়েছি যদিও, তথাপি, মেয়েছেলেও হয়ে জন্মাইনি এ কথাও তো ঠিক। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই ডেমোক্রাসির যুগে (ডেমোকেই কেবল ক্রাশ করা যায়,) দাড়িকে ক্রাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক উচ্চাঙ্গের কথা। ইস্তফাই যখন দিতে যাচ্ছি তখন আর কিসের তোয়াক্কা? বড় সাহেব তো ভারী।

আমার মতলব জানতে পেরে, আপিসের বন্ধুরা ছুটে আসেন বাধা দিতে। আমার অদ্য-আলাপিত আপিসের বন্ধুরা। একদিনের সামান্য আলাপেই—এক ঘণ্টার ঘনিষ্ঠতায়—তাঁদের সঙ্গে কতকালের যেন আত্মীয়তা জমে উঠেছিল।

কেষ্টবাবু ওরফে খ্যাসটো, বিজলী বিকল্পে ব্যাজলি, গোবিন্দগৌরবের গাবেডা, প্রণব সংক্ষেপে শুধু স্নব, প্রমথেশ সম্বোধনে প্র্যাটমেশ, নৃপেন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ হয়ে ন্যাপান, রাধারঞ্জন দস্তিদার বিপর্যয়ে শুধুমাত্র র‍্যাড ড্যাস—এঁরা সকলেই, সদ্যলব্ধ বাবু চার্ন বোসের কাছে ছুটে এলেন। শ্রীযুক্ত বিনয়চরণ ব্রহ্মচারী, সংক্ষিপ্ত হয়ে, তদুপরি নিজের দাড়ির বিরুদ্ধ-সমালোচনায় সম্যক ব্যথিত হয়ে, চটেমটেই চলে যাচ্ছেন জেনে সবাই সহানুভূতি পরবশ হয়ে সান্ত্বনা দিতে আসেন।

সহকর্মীদের সকলেই আমাকে চাকরি ছাড়তে নিষেধ করেন, একবাক্যে বারম্বার বারণ করেন, বরং তার বদলে, যদি নিতান্ত কষ্টকর না হয়, দাড়িটা কামিয়ে ফেলতেই সকাতর অনুরোধ জানান।

সবার মুখেই ঐ এক কথা! 'বিনয়বাবু, বলেন কি? দাড়ির জন্য চাকরি

ছাড়বেন ? ছি ছি, দাড়িকে কখনও এতটা প্রশ্রয় দেবেন না মশাই ; দাড়ি তাহলে আপনার মাথায় উঠবে নির্ঘাৎ।'

'বললেই হলো কামিয়ে ফেলুন ! জানেন ? নাকের মধ্যে ফোড়া হয়েছে যে, খবর রাখেন তার ?' রেগেমেগে ব্যক্ত করেই ফেলি, 'যার জ্বালা সেই জানে, পরের কি ! কামিয়ে ফেলুন বললেই হলো ? আপনাদের কি ! আপনাদের তো আর দাড়ি নয় !'

'ও, তাই নাকি !' তাঁরা সবাই যেন একসঙ্গে আকাশ থেকে পড়লেন ঃ 'নাকের মধ্যে ফোড়া, বলেন কি মশাই ?'

'তবে আর বলছি কি ! শুনছেন কী তবে ! আপনারা তো বলছেন কামান আর কামান। আপনারা তো বলেই খালাস। আমি এদিকে কামাই কি করে কন দেখি ?'

তারপর তাঁরা একাদিক্রমে আমার নাকের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করেন ঃ 'ফোড়া কই—য়্যাঁ ? দেখতে পাচ্ছিনে তো !'

'দেখতে পাচ্ছেন না ? অবাক করলেন মশাই ! নাকের মুখটাতেই হয়েছে যে ! ফুসকুড়িটা চোখে পড়েছে না আপনাদের ? আশ্চর্য !'

'ফুস—কুড়ি !' সবার হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে একসঙ্গে। 'ফুসকুড়ি কেবল ! তাই বলুন !'

'কেন, কমটা কি হয়েছে বলুন তো ? আপনারাই অবাক করলেন দেখছি ! নাকের মধ্যে কি আবার কার্বাঙ্কল হবে নাকি ? বড়ো বড়ো ফোড়ার কি তত জায়গা আছে অ্যাটটুক ফাঁকে ? নাক তো কেবল, মৈনাক তো নয় আর ! কত বড়ো ফোড়া চান নাকের মধ্যে শুনি ?'

'নাকের মধ্যে ফুসকুড়ি, তো দাড়ি কামাতে কি হয়েছে ?'

'আপনারা তো বলবেনই ! বলে ওর ঠেলাতেই রক্ষে নেই, প্রাণ যাবার যোগাড় ! মাথা পর্যন্ত ধরে গেছে তার তাড়সে।'

'তাই তো, তাই তো ! ভারী মুশকিল তো !'

আমার নাক অথবা নোকরি, কোনটারই ভবিষ্যৎ তাঁদের খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না।

'যাক, চাকরি ছাড়বেন না। ছুটি নিয়ে বাড়ি যান আজকের মত। নিজের হাতে না পারেন, দেখুন যদি নাপিত-টাপিত ডাকিয়ে কামিয়ে ফেলতে পারেন কোনরকমে—'

স্বয়ং বড়বাবুও বললেন—'দাড়ির জন্যে চাকরি ছাড়ে ? পাগল ! দাড়ির ভাবনা কি ? দাড়ি তো বিরল নয় ! কতই না পাওয়া যাবে ! দুদিন না কামালেই দাড়ি ! বাজারেও কতো কিনতে পাওয়া যায় পরচুলার মতো। কিন্তু চাকরি একবার গেলে এ বাজারে, আবার মেলা—হুম—!'

বড়বাবুও বিজ্ঞ লোক। অধিক বলা বাহুল্য বিবেচনা করেন। হুম দিয়ে এক হুংকারেই সেরে দেন।

আমিও, ট্রামে, বাসে, রাস্তায় ভিড়ে, কোনরকমে নাক এবং নিজেকে বাঁচিয়ে

আপিস থেকে ফিরি। বাসায় আর ফিরি না - আপিস-ফেরতা সোজা চলে যাই শ্যামবাজারে—মাসীমার বাড়ি।

ফোড়ার কথা শুনে মাসীমা আশ্বাস দেনঃ 'ফোড়া তো কি হয়েছে! দাঁড়া, তিসির পুলটিশ বানিয়ে আনছি! লাগাতে না লাগাতে ফেটে যাবে এক্ষুনি। বলে কত গণ্ডা ফোড়াই ফাটালুম পুলটিশ দিয়ে। উরুস্তম্ভই সারিয়ে দিলাম কত না! এ তো কেবল, ওর নাম কি, নাকের ফোড়া!'

সর্বাণী বলে উঠেছেঃ 'বোতলের সেঁক দিলে হয় না বিনুদা? বাবা যে দিচ্ছিলেন সেদিন তলপেটে। আমি জল ফুটিয়ে বোতলে পুরে আনছি। তাই দেয়া যাক, কি বলো, বিনুদা?'

সায় দিতে আমার দেরি হয় না। চাকরি তো বহুমূল্য, নাকও কিছু ফ্যালনা নয়—দুইই যদি এক যাত্রায় রক্ষা পায়, মন্দ কি?

বলতে না বলতে, স্পিরিটের বোতলে গরম জল ভরে সর্বাণী এনে হাজির করে। 'এই নাও বিনুদা, সেঁক দাও নাকে।'

কিন্তু বোতল হচ্ছে পেল্লাই এবং আমার নাক হচ্ছে নামমাত্র। নাকরা সচরাচর যেমন হয়ে থাকে আর কি! তাকে যৎকিঞ্চিৎও বলা যায় যৎপরোনাস্তি বলতেও বাধা নেই। যত প্রকারেই বোতলটাকে বাগাতে যাই এবং নাকে লাগাতে চাই, কিছুতেই দুজনের মিলন ঘটানো যায় না। মাঝখান থেকে হাত পুড়ে ফোস্কা পড়ার দাখিল।

'নাঃ, বোতলের কম্ম নয়!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলিঃ 'য়্যাতো বড়ো বোতলের কাজ না। হোমিওপ্যাথির ক্ষুদে শিশি টিশি থাকে তো দ্যাখ্! নাকের সঙ্গে এটাকে ঠিপ খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না।'

ততক্ষণে মাসীমা প্রকাণ্ড এক পুলটিশ নিয়ে এসেছেন, 'বিনু, লক্ষ্মীটি, এইটে চেপে বসিয়ে দাও তো নাকে। ব্যথা-ট্যথা সব সেরে যাবে এক্ষুনি!'

সৌখীন রুমালে সুবিস্তৃত মাসীমার শ্রীহস্তের স্বরচনা দেখেই তো আমার চক্ষুস্থির!

'করেছ কি মাসীমা? এত বড় পুলটিশ! নাকে জায়গা কই অত? আমার তো আর হাতির নাক নয়!' আমি জানাই।

'হাতির নাক কিনা জানি নে। হাতির নাক আছে কিনা তাও জানি না। পুলটিশ দিয়ে ফোড়া ফেটে যায় এই জানি!' মাসীমা গজগজ করেন।

'কিন্তু—কিন্তু—এই তো একটুখানি নাক! নামমাত্তর কোথায় এর লাগাবো পুলটিশ, তুমিই বলো না?' তথাপি আমি কিন্তু-কিন্তু করি।

'যদি জায়গাই নেই তবে নাকে ফোড়া করার শখ কেন বাপু!' মাসীমা ভারী বিরক্ত হন। সেবাধর্মের এতখানি বাজে খরচ তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু কি করে খুশি করি? অত বড় পুলটিশকে বাজেয়াপ্ত করা আমারও ক্ষমতার বাইরে।

অন্তু একটা কথা বলে এতক্ষণেঃ 'আমি তোমার ফোড়া ফাটিয়ে দেব বিনুদা? বিনা পুলটিশেই পারব আমি।'

'তুই!' এত দুঃখেও আমার হাসি পায়।

'বাঃ, আমি শিখেছি যে জে-কে-শীলের কাছে।'

'কে জে-কে-শীল? কোথাকার ডাক্তার?'

'ডাক্তার নয়, বক্সিং করেন তিনি। কিন্তু, কি বলব তোমায় বিনদা, ফোড়া আর বেশি কি, কত লোকের নাকই ফাটিয়ে দেন এক ঘুসিতে—' অন্তু রহস্যটা পরিষ্কার ব্যক্ত করে, 'দেব আমি তেমনি করে সারিয়ে?'

'দূর! ও সব হাতুড়ে চিকিৎসার কর্ম নয়!' আমি ঘাড় নাড়ি, 'তা ছাড়া মুষ্টিযোগ—টোট্‌কায়—বিশ্বাসই নেই আমার।'

'বাস্‌! কি যে বল বিনদা! হাতে হাতে ফল পাবে, বলছি! দাঁড়াও, দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।' এই বলে বক্সারের মামুলি পোজ নিয়ে ঘুসি বাগিয়ে সে একেবারে আমার নাকের সম্মুখীন।

সেরেছে রে! কি সর্বনাশ! অন্তুর হাতেই আমার অন্তিম দশা ঘটল বুঝি! ওর জে-কে-শীলতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সেই যে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়েছি, উঠেছি আজ সকালে।

উঠেই মেসোমশায়ের কাছে আমার প্রথম খোঁজ হয়েছে—না, কোনো ডাক্তার কবিরাজ-হাকিমের কাজ নয়-দরকার একজন নাপিতের! যে-করেই হোক, দাড়ি কামিয়ে তবেই আজ আপিস যাওয়া।

মেসোমশাই বলেছেন, 'একটা কালা নাপিত আছে বটে এ-পাড়ায়। কামাতে আসেও বটে এ-বাড়িতে। ভালই কামায়, কিন্তু—'

'আর কিন্তু নয় মেসোমশাই! কালা হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক, গোদালো হোক, গলগণ্ড-ওলা হোক, কিছু যায় আসে না। কেবল নুলো না হলেই হলো! তাকে আমার এক্ষুনি চাই।'

'কিন্তু কখন যে সে আসবে তার কিচ্ছু স্থিরতা নেই!' মেসোমশাই তাঁর ভনিতা শেষ করেন।

তবেই হয়েছে! নাপিতের স্থিরতা নেই জেনে আমি তো আর স্থির থাকতে পারি না! আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়।

কিন্তু তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার মোড়ে, পরামাণিকের খোঁজে, কিন্তু এত গণ্ডা সেলাইবুরুশ গেল, ধুনুরি গেল, ঘটি বাটি সারাবিরা গেল পাড়া বাজিয়ে, আরো কত কি যে গেল, গোরু মোষও গেল কম না! কিন্তু একজনও কি হাতে-ক্ষুর-ওয়ালার পাত্তা নেইকো? এদিকে সওয়া-নটা বাজে, আপিসের টাইম হতে চলল প্রায়···

বিশেবর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফিরছি, দেখি, মেসোমশায়ের গলির খুঁজিতেই একটা নাপিত! একজনের বাড়ির রোয়াকে অযাচিত ভাবে বসে রয়েছে।

দুজনকে পেয়ে দুজনেই যেন হাতে স্বর্গ পেলাম!

গোড়াতেই নাপিতকে সাবধান করে দিইঃ 'দেখো বাপু, নাকটা বাঁচিয়ে! নাকের মধ্যে ফোড়া হয়েছে কিনা! খুব সামলে, বুঝেছ? হাত-টাত লাগে না যেন হঠাৎ।'

নাপিত ঘাড় নেড়ে বলে ঃ ‘ভাল করেই কামাব বাবু কাটবে না। কোনো ভয় নেই আপনার।’

‘না, না। কাটুক, তাতে কি? একটু-আধটু কেটে গেলে কি হয়? অমন কতই যায়! কেবল নাকটা দেখো। ওটাতে ধাক্কা-টাক্কা লাগলেই গেছি!’

নাপিত বলে ঃ ‘ক্ষুরে ধার থাকবে না কেন বাবু? কত লোককেই তো কামাচ্ছি রোজ! কেউ বলে না যে দীনু নাপ্তের ক্ষুরে ধার নেই।’

‘আহা, ধার থাকুক না কেন! ক্ষতি কি তাতে? কিন্তু এ-ধারটাও যেন থাকে।’

‘না বাবু! সাবান খারাপ পাবেন না আমার কাছে। তবে যদি বলেন, কেবল জল বুলিয়েও কামিয়ে দিতে পারি। রসিক নাপ্তের ছেলে সে-ক্ষমতাও রাখে।’ এই বলে বারো-আনা টাক পড়ে যাওয়া বুরুশ দিয়ে, কাপড়কাচা সাবানই, খুব সম্ভব, ঘষতে শুরু করে দেয় আমার গালে।

সূত্রপাতেই বুরুশের একটা পোচরা লাগিয়ে দেয় আমার নাকের উপত্যকায়। আমি চমকে উঠি ঃ ‘আহা হা! করছ কি? নাকে ব্যথা যে, বললাম না তোমাকে?’

‘হ্যাঁ, ফিটকিরিও আছে বইকি বাবু! কামাবার পরে লাগিয়ে দেবখন। সবই রাখতে হয়। না রাখলে কি চলে আমাদের।’

বলে দ্বিগুণ উৎসাহে বুরুশ চালাতে থাকে।

আধখানা গাল নিরাপদে উত্তীর্ণ হয়েছে, হঠাৎ ক্ষুরের খোঁচ লেগে যায় নাকে আমি আর্তনাদ করে উঠি ঃ ‘গেছি রে বাবা! এ কোন্ খুনে নাপিতের পাল্লায় পড়লাম রে বাপ্!’

মুখ টেনে নিয়ে. নাকের উপর হাত বুলাতে থাকি, নাক এবং হাতের এক ইঞ্চি সমান্তরাল বজায় রেখেই হাত বুলাই! ব্যবধান রেখে এবং সাবধান থেকে সসম্ভ্রমে শুশ্রূষা করতে হয়।

‘তোমাকে তখন থেকে বলছি না—নাক সামলে? একটা সামান্য কথা মনে থাকে না তোমার?’ এইবার ভাল করে তাকে প্রত্যঙ্গটা দেখিয়ে দিই—‘এই নাকটা বাদ দিয়ে কামানো যায় না কি? এইটুকু তো নাক!’

নাপিত এবার আরো এগিয়ে এসে ভাল করে নাকটাকে লক্ষ্য করে। অবশেষে সমস্ত মুখটাকে প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন বানিয়ে বলে ঃ ‘কই, কামাবো যে বলেছেন, তা, নাকে দাড়ি কই আপনার? কারু কারু কানে দাড়ি হয় বটে, দেখেছিও কামিয়েওছি বহুৎ, কিন্তু নাকে দাড়ি না থাকলে কামাবো কোনখানে?’

কথা শুনে আমি তো অবাক! নাকে দাড়ি কালা নাকি লোকটা?

নাপিত আপন মনেই ঘাড় নাড়ে আবার ঃ ‘বেশ, যখন বলছেন, তখন দিচ্ছি ক্ষুর বুলিয়ে।’

বলে সাঁড়াশীর মতো শক্ত দুই আঙুলে আমার নাকটাকে বাগিয়ে ধরে, এবং অন্য হাতে ক্ষুরটাকে আগিয়ে আনে।

আমার অন্তর ভেদ করে এমন এক অভ্রভেদী আর্তনাদ বেরয়, টার্জানের ডাকের সঙ্গেই কেবল তার তুলনা চলে। বিধাতার মত বধির, তার কর্ণেও সে-ডাক গিয়ে পেঁছিয় বোধ হয়; হতবাক হয়ে সে আমার নাক ছেড়ে দ্যায়।

কিন্তু পরক্ষণেই বলে: 'মুখ দিয়েই নিঃশ্বাস নিন না ততক্ষণ! কতক্ষণ লাগবে আর নাকটা কামাতে? দেখতে না দেখতে কামিয়ে দিচ্ছি দেখুন না!'

সক্ষুর পুনরায় সে হাত বাড়ায়।

সভয়ে আমি পিছিয়ে আসি। বসে বসেই পিছুই, রোয়াকটার পিছনের দিকে পিঠ্টান দিই! এবং সেও এগুতে থাকে। শনৈঃ শনৈঃ।

কামাবেই সে, নাছোড়বান্দা। জীবনে গাল সে বিস্তর কামিয়েছে, মাথাও বাদ যায়নি, কানও দুচারটা না কামিয়েছে তা নয়। কিন্তু নাক এই প্রথম! এহেন সুদুর্লভ সুযোগ 'কালাচাঁদ' নাপিত হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

ভারী বিদ্ঘুটে ব্যাপার! কত আর পেছোনো যাবে? রোয়াক এক জায়গায় এসে শেষ হয়েছে। এবং তারপরে আরো মুশকিল, ক্ষুরটা আবার ওর হাতেই!

যাই হোক, অনেক ধস্তাধস্তি করে নাপিতের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনি! কোনরকমে নাক রক্ষা করে বাড়ি ফিরি।

কিন্তু নাক আর তাকে বলা যায় না তখন। তাকানই যায় না তার দিকে। আড়ে-বহরে তার বাড়-বাড়ন্ত তখন এমন চূড়ান্ত রকম, যে শুধু নাক বললে তার অপমান করাই হয়; তাকে নাসিকা বলাই তখন উচিত।

যাই হোক, নাসিকা নিয়ে এবং আধখানা গাল না-কামানো রেখেই না খেয়ে-দেয়েই, আপিসের দিকে ছুটতে হয়। ভাত শিকেয় থাক, এমন কি নাক যদি যায় তো যাক, কিন্তু তা বলে চাকরি খোয়ানো চলে না তো?

সমস্ত শুনে আপিসের বন্ধুরা তো হেসেই খুন! আমি ভারী রেগে যাই। সত্যি, পরের দুঃখে কাতর লোক সংসারে দিনদিনই বিরল হয়ে পড়ছে বটে।

কেষ্টবাবু বললেন, 'এক কাজ করুন! সাহেবের কামরায় দিকে যেন আর ঘেঁষবেন না আজ!'

প্রণব বলল, 'যা বদমেজাজী সাহেব, কামড়ে দিতেও পারে। বলা যায় না!'

বিজলীবাবু বললেন, 'কেন, সাহেবের অর্ধেক কথা তো উনি রেখেছেন, আর কত রাখবেন? পুরো রাখতে গিয়ে তো প্রাণ দিতে পারেন না? আমার মতে সাহেবের খুশিই হওয়া উচিত!'

একে নাকের আগুন, তার ওপরে এই উপদেশের ছিটে! ইচ্ছে করল, সবাইকে ধরে ধরে এক এক ঘা কসিয়ে দিই বেশ করে। কিন্তু নাকের কথা ভেবেই নিজেকে সামলে রাখলাম।

অবশেষে, স্বয়ং বড়বাবু, রাধারঞ্জন দস্তিদার, ওরফে, মিস্টার র‍্যাড ড্যাস, আমারই মতো, সি আর দাশের কোনো ভাইপো খুব সম্ভব,—অতএব, নতুন সম্পর্কে আমার খুড়তুত ভাই- এসে বললেন: 'বোস মশাই, আই মীন, মিস্টার ব্রহ্মচারী, নাকের জন্য আপনি বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন, যাক, আপনাকে আজ আর

কাজ টাজ কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু ঐ ঘরটার দিকে লক্ষ্য রাখুন। আজ আমাদের আপিসে ডাক্তারের ভিজিটের দিন কি না! আর একটু পরেই তিনি আসবেন, ঐ কোণেই এসে বসবেন তিনি। ডাক্তার মাদ্রাজী ভদ্রলোক—চিনতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। তাঁকে একবার নাকটা দেখাবেন, বুঝলেন?'

তাকাতে তাকাতে মাঝে হয়ত একটু ঝিমিয়ে নিয়েছিলাম, চোখ খুলেই একজন মাদ্রাজীকেও দেখতে পাই—সাহেবী-পোশাক-পরা, অতএব ডাক্তার না হয়ে যায় না। কিন্তু যেখানে তাঁর বসবার কথা, সেখানে না বসে, ভুলক্রমে বসেছেন আমাদের ওয়েটিং রুমে। ভারী ভারী লোকেরা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলে যেখানটায় বসেন। সেখানে বসে, সামনেই একজনকে বসিয়ে, হাতমুখ নেড়ে কি যেন তিনি বোঝাচ্ছিলেন। হয়তো কোনো রুগীটুগী হবে, রোগ পরীক্ষা করে ওকে দাবাই বাতলে দিচ্ছিলেন বোধ হয়। অতএব ওঁর অবস্থানে বসবার একটা অর্থ বের করা শক্ত হয় না। অতঃপর আমিও আমার নাক নিয়ে ওঁর সন্নিধানে যাই। গিয়ে অনুনয় করে বলিঃ 'উড ইউ প্লিজ মাইণ্ড টু লুক ইনটু মাই নোজ, কাইন্ড্লি?'

নাকটাকে উঁচু করে, দেখাইঃ 'আই য়্যাম ভেরি মাচ্ সাফারিং!'

'কেন, কি হয়েছে আপনার নাকে?' মাদ্রাজী ডাক্তার-সাহেবের মুখ থেকে পরিষ্কার বাংলা বেরিয়ে আসে।

'দেখুন না, ক'দিন থেকে একটা ফোড়ায়—নাকের ভেতর একটা ফুসকুরি হয়ে বেজায় কষ্ট পাচ্ছি। বড্ড যন্ত্রণা!'

ডাক্তার আমাকে বসতে বলে নিজে উঠে দাঁড়ান—এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সুকৌশলে আমার নাকের সমস্ত অভ্যন্তরভাগ পর্যবেক্ষণ করেন।

'তাইত! একটা ফোড়ার মতই তো হয়েছে বটে! তা, কি খেয়েছেন আজ?'

'খাব? খাব আর কি? যে যাতনা, আজ তো নয়ই, কাল রাত্রেও কিছু খাইনি।'

'ভালই করেছেন! ফাস্টই হচ্ছে বেস্ট কিওর! উপবাসে সব রোগ আরাম হয়। কথায় বলে, জ্বর আর পর—খেতে না পেলেই পালায়! আপনার লোকই কত পালিয়ে যাচ্ছে নশাই আজকাল খেতে না পেয়ে। সামান্য একটা ফোড়া অনশনে দূরীভূত হবে সে আর বেশি কি?'

যাক, না খেয়ে—সঠিক বললে, কিছু না খেতে পেরে, ভালই করেছি তাহলে। নিজের বাহাদুরির জন্যে নিজেকে ধন্যবাদ জানাই!

এমন সময়ে বড় সাহেবের ঘর থেকে হাঁক আসে—বোস বাবু! বোস বাবু!

আমি প্রায়-বিচলিত হয়ে উঠেছি, এমন সময়ে আমার বোসতুত দাদাকে—দীপ্তদার-মশাইকে দৌড়তে দেখে নিরস্ত হই।

'তাহলে আপনি এর জন্যে কী প্রেসক্রাইব করেন?'

'নুনের সেক দিয়ে দেখেছেন?'

'আজ্ঞে না। তবে পুলটিশ দিয়ে দেখেছি,—তা একরকম পুলটিশ দেয়াই শখিক।—তবে তাতে কোনো কাজ হয়নি।'

'তাহলে বোরিক কম্প্রেস করে দেখতে পারেন। আমার পা-ফোলা একবার তাইতো সেরেছিল।'

ডাক্তারটির প্রতি আমার সত্যিই ভারী ভক্তি হয়। ডাক্তারদের পেট কামড়ায় না, ঘাম হতে নেই, আমবাত হয় না, সমস্ত অসুখ-বিসুখের ও'রা অতীত, চিরদিন এই কথাই জেনে আসছি; কিন্তু আজ এই প্রথম একজন ডাক্তার দেখলাম, যার পা ফোলে, সাধারণ লোকের মতই ফোলে এবং তিনি তা ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করেন না, এমন কি, নিজের বেলাও যিনি, অসঙ্কোচেই, নিতান্ত সাধারণ বোরিক কমপ্রেসেরই ব্যবস্থা করে ফেলেছেন! বা!

এবং আমার বেলাও তার অন্যথা করছেন না। সত্যি, এরকম সর্বজীবে সমদৃষ্টি ডাক্তারের প্রতি সশ্রদ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

'বেশ, বরিক কম্প্রেসই দেব তবে আপনি যখন বলছেন; কিন্তু ঐ সঙ্গে, খাবার কোনো ওষুধ—একটা মিকচার টিকচার দিলে ভাল হত নাকি?'

'মিকচার! বেশ, আর্নিকা থার্টি খেয়ে দেখতে পারেন এক ডোজ।—'

য়্যালোপ্যাথরা হোমিওপ্যাথির নিন্দা না করে স্টেথিসকোপ ধরে না, এই তো আমি জানতাম! কিন্তু এ ব্যক্তি য়্যালোপ্যাথিক, অথচ হোমিওপ্যাথিতেও পারদর্শিতা আছে—কেবল পারদর্শিতা নয়, হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থা না দেবার কুসংস্কার নেই···এ দেখে আমি তো বিস্ময়ে আর ভক্তিতে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। ক্ষণেকের জন্য, নাকের জ্বালাও ভুলে যাই যেন।

বড়সাহেবের ঘর থেকে আবার হাঁক-ডাক শোনা যায়—এবার লম্বা লম্বা আওয়াজ।

'বরমচারিয়া! বরমচারিয়া!'

ডাক্তারের এবার ডাক পড়েছে বুঝতে দেরি হয়না, কিন্তু ভদ্রলোকও আমাকে নিয়েই এদিকে আত্মহারা···আচ্ছা ডাক্তারির নেশা, যাহোক! অগত্যা, আমাকেই ও'কে, 'স্টপ প্রেসের' বার্তাটা শুনিয়ে দিতে হয়।

''আমাকে! আমাকে কেন ডাকবেন?' ডাক্তার তো আকাশ থেকে পড়েন। 'বরমচারিয়া তো আমার নাম নয়!'

'মাদ্রাজীদেরই ঐরকম নাম হয় কিনা! তাই আমি ভেবেছিলাম যে আপনাকেই বুঝি—'

'আমাকে! হোয়াট ডু ইউ মীন? য়্যাম আই এ ম্যাডরাসী?' ডাক্তার তো ভারী খাপ্পা হয়ে ওঠেন আমার ওপর—এক মুহূর্তেই ও'র অন্য মূর্তি বেরিয়ে পড়ে। 'আর ইউ ম্যাড?'

'নাঃ, চেহারা যাই বলুক, এর পর আর সন্দেহ করা চলে না। রেগে গেলে যখন ইংরিজি বেরুচ্ছে তখন বাঙালী না হয়ে আর যায় না। আসল মাদ্রাজী হলে হয়ত চোস্ত হিন্দী বেরুত!

'প্লিজ একসকিউজ মি সার। আই থট ইউ আর দি অফিসিয়াল ডক্টর!'

'হোয়াট ডক্টর! ডু ইউ সাপোজ মি টু বি এ ডক্টর? আই য়্যাম এ বিগ ব্রোকার। ডোণ্ট ইউ সি আই য়্যাম ওয়েটিং ফর মিস্টার লিণ্ডসে, দ্য ডিরেক্টার অফ দ্য ফার্ম? হি ইজ মাই ফ্রেণ্ড।'

ওরে বাবা! মিস্টার লিণ্ডসে! সে যে বড় সাহেবেরও বড় সাহেব। সামান্য নাক থেকে কি দুর্ঘটনা বাধলো দ্যাখো দিকি! কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ল শেষটায়! নাকের জন্য নাকাল হলাম কি সর্বনাশ!

ডিরেক্টার এলেই যে আমাকে এখান থেকে রিডিরেক্টেড হতে হবে—বেয়ারিং-ডাকেই পত্রপাঠ, বুঝতে আমার বেশি দেরি হয় না। আপাত-দৃষ্টিতে মাদ্রাজী বলে প্রতীয়মান এই ভদ্রলোক যা ক্ষেপেছেন, তাতে সহজে তিনি এ ক্ষেপে ছাড়বেন বলে মনে হয় না।

এহেন কালে তৃতীয়বার বড় সাহেবের চড়া গলা শোনা যায়, 'বোনাই বাবু! বোনাই বাবু! বোনাই বাবু!...' প্রায় রেকারিং ডেসিমেলের রেটে।

'ব্যাজলি! খ্যাসটো র‍্যাডবোস। নাপান! নাপান! ব্রিং দ্য বোনাই হিয়ার!' বড়সাহেবের ডাকাডাকি আর থামে না। ব্যাপার কি?

দপ্তিদার-মশাই শশব্যস্তে ছুটে আসেন: 'এখানে বসে কি গল্প করছেন? বড় সাহেব ডাকছেন যে আপনাকে?'

আমাকে? বোনাই বাবু বলে আমাকেই ডাকছেন? ত্রস্ত পদে সাহেবের কামরায় গিয়ে ঢুকি, একটু লজ্জিত হয়েই ঢুকি: 'বেগ ইওর পার্ডন, সার!' অত্যন্ত সসঙ্কোচে বলি। বড়সাহেবের সঙ্গে সুমধুর সম্বন্ধে বিজড়িত হবার কথা ভাবতেই আমার কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে।

'হোয়াটস দি ম্যাটার উইথ্ ইউ, বোনাই? হ্যাভ ইউ গন হার্ড অফ হিয়ারিং?'

সাহেবের গলা যেন আমার কানের ওপর চড়াও হয়ে আসে। কানমলার মতনই প্রায়। একটা চড়ই যেন বসিয়ে দেয় সজোরে।

'নো-নো সার! আই ওয়াজ টকিং উইথ দ্য ডক্টার, আন্‌ফরচুনেটলি, হু ওয়াজ নট দ্য ডক্টার।'

'ইউ হ্যাভ ওরাইজড মি! হোয়াট—হোয়াট—লেট্ মি সি দি আদার সাইড!' সাহেবের কণ্ঠ যেন বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে অকস্মাৎ।

'হোয়াট আদার সাইড, সার?'

'দা আদার সাইড অফ্ ইওর রট্‌ন্ ফেস!'

সাহেব কি আমার গালের না-কামানো অন্য দিকটা দেখে ফেলেছে নাকি? নাঃ, কি করে দেখবে, আমি তো আগাগোড়াই খুব সতর্ক রয়েছি। কামরায় ঢোকার সময় থেকেই স্মরণ করে রেখেছি, আমার বদনমণ্ডলের একটা ধারই সাহেবের দৃষ্টিগোচর রাখব। বাধ্য হয়ে, আকাশের চাঁদের মতই দুর্ব্যবহার করতে হবে আমাকে। এ এক দিক্‌দারি!

সাবধানের বিনাশ নেই—ভয়ের পথটা মেরে রাখাই ভাল। আমতা আমতা করে বলি:

'আই হ্যাভ কেপ্ট ইওর য়্যাডভাইস, সার। হ্যাভ কাম টু-ডে ওয়েল-শেভড!'

'ইয়েস্। আই সি দ্যাট। বাট্ আই ওয়াণ্ট টু সি দা আদার সাইড অফ্ ইট। দা আদার সাইড অফ্ দি শীল্ড।'

আমার মুখচন্দ্র কি নিজেকে ঘোরাতে-ফেরাতে বিলকুল নারাজ? অগত্যা সাহেব নিজেই ঘুরে আদার সাইডে এসে উদিত হন। তাঁর গলার ভেতরে যেন বাজ পড়ে।

'ই—য়েস—ইয়েস—স্যর।' আমার সারা দেহে কাঁপন লাগে।

ক্রমশই তাঁর চোখ গোল হয়ে ওঠে, পাকিয়ে ওঠে, লাল হয়ে ওঠে—আর এদিকে আমার হৃৎস্পন্দ স্থির হয়ে আসতে থাকে।

'ইউ রটন্ বোনাই চার্ন—আই উইল স্ম্যাশ ইওর বোনস!'

এই বলেই সাহেব প্রচণ্ড এক ঘুঁসি ঝেড়ে দেন—একেবারে ফাঁড়ার মাথায়—আমার ফোড়ার ওপরেই সটান।

তারপর?

তারপরের কথা আমার মনে নেই। তারপরের অনেক কথাই আমার ধারণার অতীত। কষ্টকল্পনা করেও আন্দাজ পাই না।

তবে এইটুকু জানানো দরকার, সেদিন আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল আমার। বেশ একটু দেরিই, পাক্কা প্রায় তিন মাসেরই ধাক্কা। হাসপাতাল ঘুরেই আসতে হয়েছিল কিনা!

বিনয়চরণ হয়ে চাকরিতে ঢুকে, বোনাই-চুর্ণ হয়ে ফিরে এলাম!

বেশি আর কী এমন? সামান্যই ইতর-বিশেষ!

সেদিন সকালে আমার ছোট্ট টেবিলটার ওপর ঝুঁকে—আগের রাত্রে যে একস্ট্রা-টা কিছুতেই কষতে পারিনি তাই নিয়ে কাতর হয়ে রয়েছি এমন সময়ে—

ঢং ঢং—ঢঢাং ঢং ঢঢাং ঢং······

সকাল সাতটা না বাজতেই খাবারের ঘণ্টা ?

তবু, খাবারের ঘণ্টা হচ্ছে খাবারের ঘণ্টা—তা ভোর ছটাতেই হোক বা দিনে ছবার করেই হোক্—কিম্বা দিনভোরই হতে থাক ! তাকে grudge করবার—গ্রাহ্য না করবার আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কেননা আমাদের পেটে খিদের ঘণ্টা সব সময়েই বাজতো।

ঘণ্টাধ্বনি কানের ভেতর দিয়ে মরমে ভাল করে প্রবেশ করতে না করতেই, সব ছেলে আমরা, সোরগোল করে হোস্টেলের হেঁসেল ঘরে গিয়ে হাজির।

কিন্তু না দুঃখের বিষয়, খাবার ঘণ্টা নয় !

হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিজের কি এক দরকার পড়েছে তাই তিনি ঘণ্টার মারফতে সমবেত আমাদের উদ্দেশে এই ভাবে হাঁক-ডাক ছেড়েছেন। সেই কারণেই এই এক চিঠিতেই সকলের আমন্ত্রণ !

খাবারের ঘণ্টা নয়—বরং খাবারের বেলায় ঘণ্টা ! ভারী দমে গেলুম। ভোগ নেই কিছু নেই, তেমন ঘণ্টাকর্ণপুজায় আমাদের উৎসাহ নেই—সার্বজনীন হলেও না। ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। বেয়ারিং পোস্টে ফের যে নিজের বিছানায় ফিরে আসবো—যথাস্থানে ফেরত এসে চিৎপাত হয়ে মনের দুঃখ লাঘব

কারণ তারও যো নেই—ঠিকানা বদ্‌লি হয়ে ক্ষুণ্ণমনে সবাইকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে গিয়ে জমা হতে হলো।

'দেখেচ? দেখেচ কাণ্ডখানা? ইঁদুরের বাঁদরামিটা দেখেচ একবার?—'

যাবামাত্রই, এই প্রশ্ন মুখে করে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এবং বলতে না বলতে ইঁদুরে-কুরে-খাওয়া, প্রায় সাড়ে তিনভাগ সাবড়ে-দেয়া, একখানা খামের চিঠি আমাদের সবার নাকের সামনে তিনি তুলে ধরলেন।

'দেখেচ! চিঠিখানার কিছু রাখেনি! হাড়পাঁজরা ঝরঝরে করে দিয়েচে! আগাপাশতলা সব খতম; দ্যাখো দেখি একবার; চেয়ে দ্যাখো!'

আমরা, রবীন্দ্রনাথের কৃত নয়, ইঁদুরের কাণ্ড—সেই ছিন্নপত্র—উক্ত দুষ্কৃতকর্ম দুচক্ষে নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখলাম। আহত খামখানাকে খামোখা দুঃখের ভান করে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

'আমার বাড়ির চিঠি! পারিবারিক চিঠি আমার। ভয়ঙ্কর জরুরি চিঠি; এখনো এর জবাব দেয়া হয়নি—দ্যাখো তো কীক্—কাণ্ড!'

'খারাপ! খুবই খারাপ!' আমাদের মধ্যে থেকে মনিটর বলে উঠল আগে: 'ইঁদুরদের এ খুব অন্যায় কাজ একথা বলতে আমি বাধ্য।'

'ইঁদুরদের এটা উচিত হয়নি।' আমিও না বলে থাকতে পারিনে: 'খামটার ওপরে কি 'প্রাইভেট' বলে' কিছু লেখা ছিল না নাকি?'

'থাক্‌লেই বা কি? কী তাতে? ইঁদুররা কি প্রাইভেট পার্সনাল, এসব কিছু মেনে চলে?' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কথায় ভারী খাপ্পা হয়ে উঠ্‌লেন: 'তারা কি ইংরেজি পড়তে পারে? না, পড়লে বুঝতে পারে? মাথামুণ্ডু সাহিত্যের কোনো কিছু কি বোঝে ওরা?'

'ওর কথা ধরবেন না সার। ও নেহাৎ ছেলেমানুষ।' বললে মনিটার।

'হায় হায়! এখন আমি কী যে করি। কী করে এর উত্তর দিই! কী যে জবাব দেবার ছিল, চিঠিটার বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমার মনে নেই—কিচ্ছু মনে পড়ছে না। চিঠিটার ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে গেছি কেবল,—কে জানে এমন হবে! প্রকাণ্ড একটা কেনাকাটার ফর্দ ছিল এইটুকুই শুধু স্মরণে আছে!'

ইঁদুরদের অমানুষিক আচরণে, ইতর প্রাণীসুলভ এই নিতান্ত অভদ্রতায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই এমনই কাতর হয়ে পড়েন যে মর্মাহত সমস্ত ছেলের সমবেদনা, আমার সহানুভূতি, মনিটারের সান্ত্বনা কিছুই তাঁকে শান্ত করতে পারে না।

বিস্তর হাহুতাশের পর অবশেষে তিনি প্রকাশ করেন—'কিন্তু বারম্বার এরকম হলে তো চলবে না। জরুরি চিঠিপত্র সব আমার! কখন্ আসে তার ঠিক নেই, ইঁদুরদের তাড়াবার তোমারা ব্যবস্থা করো!'

এতদিন আমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রুদ্র মূর্তিই দেখে এসেছি, তাঁর বীরোচিত হাবভাব দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম, সামান্য একটা পত্রের বিরহে তাঁর যাবতীয় বীরত্ব

যে এভাবে খসে পড়বে, সমস্তটা এতখানি করুণ হয়ে দেখা দেবে তা কে ভাবতে পেরেছিল ?

কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর বীর-রস ফিরে আসতে থাকে – হঠাৎ তিনি ভয়ংকর চোট্‌পাট্ করে' ওঠেন ঃ

—'না না – না ! ওসব কথা শুনছিনে ! ইঁদুরদের দূর করো। এক্ষুনি তাড়াও ওদের। মেরে ধরে যেমন করে পারো ভাগাও ! আগে ওরা বিদায় নেবে তারপরে আমি জলগ্রহণ করব।'

মনিটারকে লক্ষ্য করে কেবল এই হুকুম্‌ই নয়, একটা হুম্‌কিও তিনি ত্যাগ করলেন।

'আজ্ঞে—আজ্ঞে—কি করে তাড়াব ?' মনিটার ভারী কিন্তু-কিন্তু হয়ে পড়ে।—'ওরা কি যাবার ?'

'নোটিশবোর্ডে একটা নোটিশ্ লটকে দিলে হয় না ?' কে একজন বলে ওঠে আমাদের ভেতর থেকে।

'তাছাড়া, তাড়ালে কি ওরা যাবে ? মানে, মানে—তাড়ানো কি যাবে ওদের ?'

মনিটার আম্‌তা আম্‌তা করে বলবার চেষ্টা পায়। ওর মনের সংশয় ওর চোখেমুখে আর প্রত্যেক কথায় ফুটে উঠতে থাকে।

'মানে মানে না যায়, অপমান করে তাড়াও।' আমি বাতলাই। আমাকে 'ছেলেমানুষ' বলার জন্যে মনিটারের ছেলেমানুষির প্রতিশোধ নিই।

মনিটার আমার দিকে কটমট করে তাকায়।

'হ্যাঁ, আমারও সেই কথা।' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কথায় সায় দেন্ ঃ 'সহজে না যায়, উত্তম মধ্যম দিয়ে যেমন করে পারো দূর করো ! হ্যাঁঃ, ওদের আবার মান অপমান।'

'দেখুন সার্, ইঁদুরদের আমরা যতই ডিস্‌লাইক্ করিনে কেন, ওরা হয়তো আমাদের ততটা অপছন্দ নাও করতে পারে—এই ধরুন, যেমন ছারপোকারা—'

মনিটার ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে ঃ 'আমরা দূর করতে চাইলেও ওরা হয়তো আমাদের ছেড়ে যেতে চাইবে না। —কারণ,—কারণ—'

'কারণ ওদের তো হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার খরচা দিতে হয় না।' কারণটা কোন্ একটি ছেলে ভিড়ের ভেতর থেকে বিশদ করে দেয়।

'আর অখাদ্য খেয়েও ওরা টিকে থাকতে পারে।' আমি বলে উঠি ! 'ঠিক আমাদের মতন নয়।'

'ওসব আমি জানিনে ! হয় ইঁদুরদের তাড়াও যেমন করে পারো নয়তো তোমার মনিটারিও গেল !'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই শব্দভেদী বাণ ছেড়ে মনিটারের মর্মভেদ করে, ছিন্নপত্র হাতে, প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে রওনা দিলেন।—

আর আমরা সবাই খুশিতে টইটুম্বুর হয়ে উঠলাম। এই ছেলেটির মনিটারির ওপরে আমরা সবাই হাড়ে হাড়ে চটে ছিলাম। খারাপ খাওয়াতে

এরকম ওস্তাদ আর দুটি ছিল না। অখাদ্য তবু বা কোনোরকমে সওয়া যায়, কিন্তু তার ওপরে—তারও ওপরে বোঝার উপরন্তু শাকের আঁটিটির মতো হোস্টেলের ডিউ আদায় করতে যা জোর জুলুম লাগাতো তা অসহ্য। সারা মাস ধরে এক ঘ্যাঁট-চচ্চড়ির গাদা আর সারা মাস ধরে একই তাগাদা—খেয়ে খেয়ে আমরা তো অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। যাক, ইঁদুর আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই দুই জবরদস্তের পাল্লায় পড়ে হতভাগা এবার খুব জব্দ হবে, ভেবে আমাদের এমন আনন্দ হলো যে কী বলব!

অসহায় দৃষ্টিতে মনিটার একবার আমাদের সবাকার দিকে তাকালো। তারপর সকাতর কণ্ঠে বললেঃ 'ইঁদুর তাড়াতে হলে কি করতে কি করে থাকো তোমরা?'

'কিচ্ছু করি না।' আমরা একবাক্যে বলে দিই। 'তাছাড়া, সে মাথা ব্যথা তো আমাদের নয়; তোমার।'

'হুঁ, হয়েছে!' বড়দরের আবিষ্কারকের মত মুখখানা করে মনিটার অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠেঃ ইঁদুরধরা কল। জাঁতিকল যার নাম!—তাই! তাইতো দরকার! এক্ষুনি বাজারে গিয়ে আমি কিনে আনছি গোটাকতক।'

এই বলে ভুরু কুঁচকে, আমাদের দিকে দু চোখের দারুণ বিষদৃষ্টি হেনে, হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল মনিটার।

সেই সকালে বেরিয়ে সন্ধের মুখে এক ঝাঁকা জাঁতিকল ঘাড়ে করে মনিটার ফিরে এল। এক আধটা নয়, আটচল্লিশটা জাঁতিকল, কেবল বাজারে কুলোয়নি, বাড়ি বাড়ি ঘুরে যোগাড় করতে হয়েছে। ইঁদুরদের বজ্জাতির বিরুদ্ধে মনিটারের এই বিজাতীয় অভিযান।

জাঁতিকলগুলোর মাথায় ছোট ছোট চালের পুঁট্লির নিমন্ত্রণপত্র লাগিয়ে এখানে ওখানে সেখানে—স্থানে অস্থানে চারধারে সে চারিয়ে দিল। ইঁদুরদের জন্য ওৎ পেতে রাখলে সব জায়গায়। এমন সব জায়গায়, যেখানে কোনো ভবঘুরে ইঁদুরও ভুলেও কখনো পা বাড়ায় না। আর পা বাড়ালেও—এই সব পাতানো সম্পর্কে এই ধরনের ফাঁদে মাথা গলাবে কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। বরং, আজকালকার চালাক চতুর যতো ইঁদুর—এই সেকেলে ব্যবহারে—চটে যদি নাও যায়, একটু মুচকি হেসেই চলে যাবে, এই আমার বিশ্বাস।

আমাদের মনিটার কিন্তু খুব সিরিয়স্। এই সব ক্রিয়াকাণ্ড সেরে ইঁদুর পড়ার প্রতীক্ষায় সে উৎসুক—একাগ্র—উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। খানিক পরেই ধারালো একটা তার-স্বর চারিধার বিদীর্ণ করে ফেটে পড়ল। কিন্তু কোনো ইঁদুরের কণ্ঠনিঃসৃত নয়, খোদ্ আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের।

মনিটার ইঁদুর তাড়াবার কী যেন সব করেছে তাঁর কানে গেছল, তার ফলে কতগুলি ইঁদুর এতক্ষণে বিদূরিত হলো জানবার জন্যে তাঁর তর্ সইছিল না। মনিটারের সঙ্গে সাক্ষাতের লালসায় দোতলা থেকে তিনি তর্ তর্ করে নামছিলেন, এমন সময়ে সিঁড়ির ধাপে, লুক্কায়িত ভাবে অপেক্ষমান একটা জাঁতি-

কলে তার পা আট্‌কে যাওয়াতেই এই আর্তনাদ! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-নির্গত এই তীব্র নিনাদ!

মনিটারের প্রথম শিকার—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তিন তিনটে পায়ের আঙুল;

'কী কাণ্ড! উঃ কী কাণ্ড!' চেঁচিয়ে হোস্টেল ফাটিয়ে মনিটারকে সামনে পেয়ে তেলেবেগুনে তিনি জ্বলে উঠলেন: 'এই তোমার ইঁদুর তাড়ানো? কী সব মারাত্মক যন্ত্র!—এক্ষুনি এইসব যন্ত্রণা এখান থেকে খেদিয়ে দাও! হোস্টেলের কোথ্‌থাও যেন এসব যন্ত্রপাতি না থাকে! নইলে তোমার মনিটারি তো গেলই, তুমিও গেলে! ইঁদুর তাড়াতে না পারি, তোমাকে আমি তাড়াবো।'

জাঁতিকলটাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পা থেকে ছাড়িয়ে এনে নিঃশব্দে অধোমুখে মনিটার যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছল। তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আর সেই যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চূড়ান্ত কথাটি বলে দিয়ে আহত আঙুল তিনটি স্বহস্তে ধারণ করে—তখনো তারা পদচ্যুত হয়নি একেবারে—ঠায় এক পায় দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ মনিটার তার সমস্ত ভরাবহ কলকৌশল কুড়িয়ে বাড়িয়ে হোস্টেলের ত্রিসীমানার বাইরে একেবারে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করে ফিরে এল, ততক্ষণ সিঁড়ির সেই ধাপ্‌টি থেকে আর এক পাও তিনি নড়লেন না।

জাঁতিকলরা চলে গেল কিন্তু ইঁদুরজাতি গেল না—মনিটারের মুরুব্বিগিরি এদিকে যায় যায়! কী করে বেচারী! তক্ষুনি আবার সে বাজারের দিকে রওনা দিল। সেই রাত্রেই নিয়ে এল একগাদা ইঁদুরমারা বিষ আর দ্বিগুণ উৎসাহে তাই সে ছড়িয়ে দিল হোস্টেলের দিগ্বিদিকে।

'এত গন্ধ কেন?' পরদিন সকালে তদারকে এসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে: 'এমন বিচ্ছিরি গন্ধ কিসের!'

'মনিটারের গন্ধ সার্‌।' আমরা জানালাম।

'মনিটারের গন্ধ? তার মানে?' সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। বোধ হয় তাঁর নিজের নাকের ওপরেও অবিশ্বাস জন্মে যায়।

'আজ্ঞে, মনিটারের নিজের গন্ধ না।' আমাকেই তাঁর নাসিকা-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দিতে হয়: 'ইঁদুর তাড়ানোর জন্যে চার ধারে সে কী সব ছড়িয়েচে তারই সৌরভ!'

'সৌরভ! ছি—ছি—ছি!' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একবাক্যে ছি ছি করতে লাগলেন: 'ভারী বিচ্ছিরি তোমাদের রুচি। নাক বলে কিছু কি নেই তোমাদের? কোথায় গেল সে নাক-না-ওয়ালা?

হাঁক পড়তেই সে হাজির।

'কী এসব ছড়িয়েচ? দুর্গন্ধে আমার গা বমি বমি করছে। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এল বলে। এক্ষুনি এই সব গন্ধমাদন হটাও এখান থেকে।' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গলায় করাত: 'আগে হটাও, তারপরে অন্যকথা।'

'কি করে হটাবো সার?' কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল মনিটার: 'এতো জাঁতিকল না যে সরিয়ে ফেলব! ইঁদুরমারা বিষ; ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, লেখ্‌টে সেঁটে গেছে মাটিতে—এখন একে তুলি কি করে?'

'এমনি না ওঠে, না উঠতে চায় যদি—তুমি চেটে শেষ করো! অতশত আমি জানিনে!' এই বলে চটেমটে, চাটবার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে, নাকে রুমাল চেপে চলে গেলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

যতই চাটুকারিতা থাক, বিষ চেটে সাবাড় করা কোনো মনিটারের কর্ম না।

জনমজুর ডাকিয়ে চারশো বালতি জল ঢেলে সমস্ত দিন হন্তদন্ত হয়ে হোস্টেল সাফ করতে হলো মনিটারকে। একদিনের এই পরিশ্রমেই আধখানা হয়ে গেল বেচারা!

ইঁদুর-মারা বিষ দূরীভূত হলো। আমারা নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

ইঁদুররা কি করে এতক্ষণ কাটিয়েছে ওরাই জানে, কিন্তু কাল রাত থেকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাস করে কী কষ্ট যে গেছে আমাদের, ভাবতেও—উঃ!

মনিটার কিন্তু বেপরোয়া। যে করেই হোক, ইঁদুর তাড়িয়ে তার মনিটারি বজায় রাখবেই—যেমনি মরিয়া তেমনি সে নাছোড়বান্দা! তৃতীয় দিনে বাজারে গিয়ে সে একটা হুলো বেড়াল পাকড়ে নিয়ে এল। মিশমিশে কালো বেড়াল। 'এইবার জব্দ হবে ইঁদুর!' মনিটারের চোখেমুখে পরিতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ে: 'এই বেড়ালই ওদের জলযোগ করে ফিনিশ করবে।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁদুরদের পিকনিক করার দিকে বেড়ালটির তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ইঁদুরের চেয়ে রান্নাঘরের মাছের দিকেই ওর বেশি আগ্রহ প্রকাশ পেল।

এমন কি, তার ফিনিশিং টাচ দিতেও সে দ্বিধা করল না। খোদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পাত থেকেই মাছের মুড়োটা থাবা মেরে তুলে নিয়ে সটকান দিল একদিন!—

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কঠোর মন্তব্যে মনিটারের কুরুচির প্রতি ক্রূর কটাক্ষ করলেন —ধেড়ে ছেলের বেড়াল পোষবার সখ দ্যাখো! এসব মামার বাড়ির আবদার এখানে শোভা পায় না, স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিলেন। এবং বেড়ালটার প্রতি কেবলমাত্র কটাক্ষ করলেন, তার বেশী আর কিছু করলেন না। করবার ছিলও না কিছু, কেননা, নাগালের বাইরে গিয়েই মুড়োটাকে গালের ভেতরে বাগাবার চেষ্টায় সে ব্যস্ত ছিল তখন!

কিন্তু যেদিন রাত্রে অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে বেড়ালটার তিনি ল্যাজ মাড়িয়ে দিলেন আর বেড়ালটা খাঁক করে তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে একশা করল সেদিন আর রক্ষা থাকল না!

সারা হোস্টেলময় সমস্ত রাত তিনি দাপাদাপি করে বেড়ালেন!—'কী সর্বনাশ, দ্যাখো দিকি! বেড়ালে কামড়ালে কী হয় কে জানে। কুকুরে কামড়ালে তো জলাতঙ্ক হয়, ইঁদুরে কামড়ালে র‍্যাট ফিভার হয়ে যায়—এখন বেড়ালের কামড়ের ফলে—কী জানি কী যে হবে!—' এই কামড় কতদূর যে গড়াতে পারে ভেবে ভেবে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন!

'হয়তো স্থলাতঙ্ক হতে পারে।' ওরকম ব্যাকুলতা দেখে, তাঁর দুর্ভাবনা দূর করার মানসেই সান্ত্বনাচ্ছলে আমি বলি।—'তার বেশি কিছু হবে না সার্!'

'য়্যা ? কি বললে ? স্থলাতঙ্ক ? তাহলেই তো গেছি ! বেড়াল কামড়ানোয় স্থলাতঙ্ক হয় না কি ? কী সর্বনাশ ! তাহলে কোন্ স্থলে গিয়ে বাঁচবো ? এবার আমি মরলুম—সত্যই মারা গেলুম এবার। এতদিন বেঁচে থেকে আর বাঁচা গেল না। এই মনিটারটি আমায় মারল। ওর বোকামির জন্যেই এইভাবে বেঘোরে আমায় মরতে হলো !'

মনিটার যতই তাঁকে বোঝায় বেড়ালে কাম্‌ড়ালে কিস্‌সু হয় না, সমস্ত কেবল আমার চালাকি, ততই তিনি আরো ক্ষেপে ওঠেন ঃ

'হ্যাঁ, কিস্‌সু হয় না ! হয় না। তোমার মাথা ! তুমি জানো ! তুমি জানো সব ! ফের যদি তোমার ঐ ইস্টুপিট বেড়ালকে এই হোস্টেলে দেখি তাহলে দেখে নেব। এতই যদি তোমার বেড়াল পোষার বাতিক, নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে শখ মেটাও না বাপু !'

এ পর্যন্ত মনিটার কোনো রকমে সয়েছিল—এত লাঞ্ছনাতেও কিছু বলেনি, কিন্তু নিজের শখের খাতিরে ওর বেড়াল পোষার বাতিক এই অভিযোগে এমন ও শক্ পেল যে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল। আর সহ্য করতে না পেরে, এক পদাঘাতে, সামনের মুক্ত দ্বারপথে বেড়ালটাকে বিবাগী করে দিল। টি-এম-ও করে দিল তৎক্ষণাৎ।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, পেছনের দরজা দিয়ে ফিরে এল বেড়ালটা !

মনিটার এবার ওকে করায়ত্ত করে ক্রিকেটবলের মতো হাঁক্‌ড়ে ফের আবার বার করে দিল।

এবং পুনরায় সে ঘুরে এল—এবার এল জানালা দিয়ে।

মনিটার তার দিকে তাক্ করে বই খাতা ছুঁড়তে লাগায় আর সেও যার পা সামনে প্রায় আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে তার শোধ তোলে। এই ভাবে সে একবারে খোদ প্রিন্সিপালের পা সম্মুখে পেয়ে গেল—এমন হৈ-চৈ-কাণ্ডটা কিসের এই খোঁজ নিতেই আসছিলেন—এখন নিজের পায়েই তার পরিচয় পেয়ে, লেটেস্ট নিউজ্ বহন করে বিরক্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন। যাবার সময়ে শাসিয়ে গেলেন, কালকেই তিনি রাস্টিকেট করে ছাড়বেন।

তারপর সত্যিই যেন স্থলাতঙ্ক বেধে গেল ! বেড়ালতো ক্ষেপে ছিলই, মনিটারও ক্ষেপে গেল যেন ! প্রিন্সিপাল পরিষ্কার করে না বলে' গেলেও, বেড়াল যে নয়, ওর বরাতেই যে উক্ত রাজটিকা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, কেমন করে যেন ওর ধারণা হয়ে গেছল। চেঁচিয়ে মেচিয়ে তুল্‌কামাল্ করে তীরবেগে বেরিয়ে গেল মনিটার।

তারপর বহুক্ষণ বাদে, টল্‌তে টল্‌তে, কোথ্‌থেকে এক খেঁকি কুকুর নিয়ে এসে সে হাজির হলো।

'কই, কোথায় গেল সেই অপয়া হতচ্ছাড়া ?' এসেই, চোখ মুখ পাকিয়ে, চারধারে সে বেড়ালের খোঁজ করতে থাকল।

তারপর থেকে ঘটনার গতি দ্রুতবেগে ধাবিত হলো। এবং বেড়ালটাও। কুকুরের আভাস দেখবামাত্রই সে উধাও হয়েছিল। আর বেড়ালের অন্তর্ধানের

সঙ্গে সঙ্গে পলকের মধ্যে, ইঁদুররা সদল-বলে ফিরে এল আবার। প্রকাশ্যভাবেই তারা পায়চারি করতে আরম্ভ করল—কুকুরটার চোখের সামনেই অসঙ্কোচে এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। এবং সেই খেঁকি কুকুরটা ইতিমধ্যে আর কোনো কাজ না পেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অন্য পায়ে কামড়ে দিয়েছে, খাবার ঘরের বাসনপত্র ভেঙে চুরে তছনছ করে একাকার করেছে আর রান্নাঘরের অধিষ্ঠাতা দেবতা উড়ে ঠাকুরকে (কুকুরের ধমক্ শোনবামাত্রই তো সে উড়ে দৌড়!) পেয়ারা গাছের মগডালে তুলে রেখে এসেছে।

এবং দুর্ঘটনার ওপর দুর্ঘটনা! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিপদের বার্তা পেয়ে,—বেড়ালের কামড়ের পরে কুকুরের কামড়ানির কথা তাঁর কানে যেতেই—স্বয়ং প্রিন্সিপাল মনিটারকে পরদিবস রাস্টিকেট করবার কর্তব্য আপাতত মুলতুবি রেখে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তল্পি তল্পা গুটিয়ে সেই দণ্ডেই সরে পড়েছেন শোনা গেল।

আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও, এক পায়ে বেড়ালের, অন্য পায়ে কুকুরের দংশন-চিহ্ন ধারণ করে, অনন্যোপায় হয়ে প্রিন্সিপালের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন কি না স্থির করতে লাগলেন। তাঁর পোঁটলা পুঁটলি বাঁধতেই যা বাকি! আর মনিটার? তার কোনো পাত্তা নেই! খুব সম্ভব, কুকুরকে নিষ্কাশিত করার মৎলবে, হাতিঘোড়া একটা কিনে আনবার জন্যেই সে বাজারের দিকে ধাওয়া করেছে এবার। অন্তত, আমার তো তাই ধারণা!

আমরা বিছানার উপর টেবিল চাপিয়ে যে যার ছোট্ট টেবিলের ওপরে কম্পান্বিত কলেবরে দাঁড়িয়ে আছি।

এদিকে ইঁদুররাও সগৌরবে আনাচে কানাচে সর্বত্র ফের ঘুর ঘুর করতে শুরু করেছে! কোনো দিকে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

আর এধারে কুকুরের লম্ফ ঝম্প দেখে কে!

আমার বড়কাকী আর ছোটকাকীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। তাদের চেঁচামেচিতে পাড়ায় কাক-চিল বসতে পারত না। দিনরাতের এক দণ্ড কামাই নেই।

কিন্তু আমাদের মেজকাকীর মুখে কোনদিন কেউ টু শব্দটিও শোনেনি! তিনি মুখটি বুজে ঘর-গেরস্থালির কাজ করে যেতেন।

জায়েদের কোঁদলে কখনো তিনি যোগ দিতেন না। সর্বদাই চুপচাপ। এক পরিবারে এমন বৈষম্য কেন, এই নিয়ে অনেক সময়ে আমি অবাক হয়ে ভেবেছি—

পরে অবশ্যি এর কারণ আমি টের পেয়েছিলাম···ঘটনাটা বলি তোমাদের—

আমার তিন কাকা। কুঞ্জ কাকা, নিকুঞ্জ কাকা আর কুঞ্জর কাকা।

কুঞ্জর কাকা মানে কুঞ্জ কাকুর কাকা নয়। কাকা আর ভাইপোয় ভাই ভাই হয় কি কখনো? এখন পর্যন্ত হয়নি। কুঞ্জর মানে হাতী হয়—জানো নিশ্চয়! আমার ছোট কাকাই হচ্ছেন হাতীমার্কা সেই কুঞ্জর কাকা।

একবার বৃন্দাবন ঘুরে এসে আমার ঠাকুর্দার কুঞ্জ কথাটার ওপর বেজায় ঝোঁক পড়ে গেল। তারপরে তিনি একটা বাড়ি বানালেন, তার নাম দিলেন কুঞ্জধাম। আমার বাবাকে বাদ দিয়ে, কেননা তিনি তার আগেই হয়ে গেছলেন, নাম ঠিকুজি হয়ে গেছল তাঁর, তার পরে যে-সব ছেলে তাঁর হয়েছিল—যেমন একটার পরে একটা পুঞ্জিত হতে লাগল, তিনিও তাদের ধরে ধরে কুঞ্জিত করতে লাগলেন। এই ভাবে তাঁর কুঞ্জবনে শেষ পর্যন্ত এক কুঞ্জর এসে হানা দিল।

কিন্তু যাক সে কথা···! ঠাকুর্দা তো গত হলেন...কাকারাও সব বেড়ে উঠতে লাগল। বেড়ে উঠে বিয়ের যুগ্যি হল সবাই। বড় কাকু আর ছোট

কাকু বিয়ে করে বৌ নিয়ে এলেন বাড়িতে, কিন্তু মেজকাকু বিয়ে করতে চাইলেন না। বললেন, খাচ্ছি দাচ্ছি খাসা আছি। বিয়ে আবার করে মানুষে? বৌ আনলেই অশান্তি!

কিন্তু বৌ না আনলেও অশান্তি কিছু কম হয় না! বৌদিরাই বাড়ি মাত করে রাখতে পারে। কুঞ্জকাননে সেই অশান্তি দেখা দিল ক্রমে।

তাহলেও তার চোট কুঞ্জর আর কুঞ্জ-র ওপর দিয়েই গেল, নিকুঞ্জর গায়ে আঁচড়টি লাগে না। খাবার আর শোবার সময় ছাড়া নিকুঞ্জকাকু বাড়ির ত্রিসীমানায় থাকত না।

'আর তো পারা যায় না রে নিকু! কুঞ্জকাকু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন একদিন। 'তোর বৌদির জ্বালায়...'

'বৌদির নিকুচি করেচে!' জবাব দিল নিকুঞ্জ কাকু: 'তোমাদেরই দোষ তো! পারবার সময় গেছে। এখন কি আর পারবে? পারতে হলে প্রথমেই পারতে। তখনই সুযোগ ছিল পারবার। তখনই পারা যেত। এখন তো অপার পারাবার। পারা উচিত ছিল সেই গোড়াতেই···'

'কী পারবার কথা তুই বলচিস!' জানতে চান কুঞ্জকাকু।

'বৌকে শায়েস্তা করতে পারতে। নিকুঞ্জকাকু বলেন—'তা সে কেবল গোড়াতেই পারা যায়। তারপরে আর পারা যায় না কোনোদিন। পারাপারের বাইরে চলে যায় বৌ!'

'ইতিহাস পড়েছিস তুই?' জিগ্যেস করেন কুঞ্জকাকু।

ইতিহাসের কথায় নিকুঞ্জকাকুর মুখখানা পাতিহাঁসের মত হয়।

'শায়েস্তা খাঁর নাম কী ছিল জানিস্?'

'না তো!'

'জানবি কি করে? কেউ জানে না।' কুঞ্জকাকুর আবার এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে: 'আমিও জানিনে। তার আসল নামটাই ইতিহাসে নেই; কেউ লিখে রাখেনি। তার বিয়ের পরের নামটাই জানে সবাই।'

'বিয়ের পরের নাম?'

'বিয়ের পরে বৌয়ের হাতে পড়ে যখন সে শায়েস্তা হল—বৌ তাকে শায়েস্তা করে দিল যখন—তখন—তারপর থেকেই তার নাম হল শায়েস্তা খাঁ।' জানালেন কুঞ্জকাকু: 'বৌকে কি কেউ শায়েস্তা করতে পারে কখনো! অতবড়ো নবাবও পারেনি। বৌই সবাইকে ধরে শায়েস্তা করে দেয়···'

'সেটা পরে।' নিকুঞ্জকাকুর সেই এক কথা: 'তার আগেই বৌ শায়েস্তা করার আগেই তাকে শায়েস্তা করে দিতে হয়। প্রথম রাত্রেই বেড়াল মারতে হয় জানো না! Kill the cat at the first night! জানো না সেই গল্পটা?'

'না ভাই! যা দিনরাত বেড়ালের ঝগড়া লেগে রয়েছে বাড়িতে, গল্পের বই পড়বার সময় কোথায়!' কুঞ্জকাকুর আরেক দীর্ঘনিঃশ্বাস।

'শোনো তাহলে সেই গল্পটা···' নিকুঞ্জকাকু কথা পাড়েন। কুঞ্জকাকু গল্প শোনার জন্য একটু হাঁ করেন।

'বলি তোমায়।' নিকুঞ্জকাকু বলতে থাকেন: 'কোনো দেশের এক সুলতানের ছিল তিন মেয়ে। তিনটিই রূপসী বিদুষী কিন্তু হলে কী হবে, বেজায় অহংকারী। সুলতানের মেয়ে বলে ভারী দেমাক তাদের। সুলতান তাদের বিয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু তারা বলে বিয়ে তারা তাকেই করবে যে রোজ তাদের জুতোর ঘা সইতে পারবে। স্বামীকে রোজ খাবার আগে বিশ ঘা করে জুতোর মার মাথা পেতে নিতে হবে—অবশ্যি তাদের হচ্ছে জরির কাজ করা মখমলের জুতো, তার মারে তেমন লাগবার কথা নয়।...

তা, মাথায় না হলেও মারটা মনে লাগে—এমন কি জরির কাজ-করা পরীর জুতো হলেও। তাই সারা রাজ্য কোনো পাত্রই তাদের বিয়ে করতে এগুচ্ছিল না।...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই রাজ্যের তিনজন সৈনিক এগিয়ে এল। তিন ভাই তারা, কিন্তু তাদের বীরপুরুষ বলতে হয়।

সুলতানের কাছে এসে বললে—'জাহাঁপনা, আমরা আপনার কন্যাদের পাণি গ্রহণে প্রস্তুত।'

'শর্তের কথা শুনেছ তো? রোজ রাত্রে খাবার আগে··'

'হাঁ খোদাবন্দ, শুনেছি সব। কিন্তু বড়াই করিনে, লড়াই করতে গিয়ে কতো তরোয়ালের ঘা-ই তো মাথা পেতে নিতে হয়েছে, এ আর তার কাছে কী! সুলতানকন্যার ফুলের পাপড়ির মতো নধর পায়ের নরম মখমলের জুতো! মাথায় করতে পারলে বর্তে যাব আমরা—আমাদের সাত পুরুষ ধন্য হয়ে যাবে।'

তবে আর কী! পাত্রদের যেমন লম্বা চওড়া চেহারা তেমনি মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলের বাবরি! সুলতান দেখলেন, অন্তত মাথার দিক দিয়ে ছোকরাদের জুতসই বলা যায়। জুতো সইতে পারবে মনে হয়।

তারপর তাদের বিয়ে হয়ে গেল সুলতানকন্যাদের সঙ্গে। মহাসমারোহেই বিয়ে হলো।

বড় মেয়ে মেজ মেয়ে রইলো রাজপ্রাসাদেই, পাশাপাশি মহলায়। ছোট মেয়ে নিজের বরকে নিয়ে চলে গেল দূরের এক প্রমোদ-উদ্যানে।

বড় ভাই মেজ ভাই রাজপ্রাসাদে এসে উঠল। আর ছোট ভাই তার বৌয়ের সঙ্গে বাস্ করতে লাগল সেই বাগানবাড়িতে।

বাসর রাত্রে খানার শতরঞ্জি পাতা হলো। সোনার পাত্রে সাজিয়ে দেওয়া হলো পোলাও, কালিয়া, মুর্গির কাবাব—কতো কী! বড় ভাই শতরঞ্জে বসতে যাচ্ছে, এমন সময়ে সুলতানের বড় মেয়ে বলে উঠল—'এ কি, না খেয়েই খেতে বসছো যে?'

বড় ভাই একটু অবাক হল কথাটায় 'খাব না? না খেয়েই রয়েছি যে অনেকক্ষণ! না খেয়ে আছি বলেই ভারি খিদে পেয়েছে তাই···'

'আহা, সে কথা হচ্ছে না। খাবে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু খাবার আগে খাবার কথাটা ভুলে যাচ্ছো এর মধ্যেই?' মেয়েটি তার পায়ের মখমল দেখায়।

'ও সেই কথা!' বড় ভাই সুলতান-দুহিতার সামনে নতশিরে হাঁটু গেড়ে বসলো আর সুলতান-কন্যা পায়ের মখমলি চটি খুলে···

পটাপট্, পটাপট্, পটাপট্… ! চালাতে লাগলো চটাপট্। বিশ ঘায়েই চটি জুতোর চটা উঠে গেল।

ঠিক সেই সময়েই পাশের মহলা থেকে আওয়াজ আসতে লাগল—ফটাস্, ফটাস্ ফটাস্ ফটাস্… !

বড় ভাই বুঝতে পারল তার মেজ ভায়েরও আচমন করা শুরু হয়েছে।

জুতো খেয়ে শ্রীজুত হয়ে তারপর বড় ভাই খেতে বসলো ফরাশে। ছোট ভাই তখন সাত মাইল দূরে, ছোট মেয়ের কাছে বাগানবাড়িতে। এখান থেকে তার মহলার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তাহলেও সেও যে নেহাত বেজুত হয়ে নেই, তারা দু' ভাই সেটা আন্দাজ করতে পারল।

অনেক দিন পরে ছোট ভাই এলো দাদাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজপ্রাসাদে। দাদাদের চেহারা দেখেই সে চমকে গেছে।

'একি দাদারা ! তোমাদের মাথার এ দশা কে করল ! অমন যে চমৎকার কোঁকড়া চুলের বাবরি ছিল মাথায়। এর মধ্যেই টাক পড়ে গেছে দেখছি।'

'পড়বে না ? রোজ রোজ জুতো সইলে চেহারার আর জুত থাকে ?' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল বড় ভাই।

'বলে মারের চোটে ভূত পালায় আর চুল থাকবে ?' মেজ ভাই বলে—'সুলতানের জামাই হয়ে চালচুলো কিছুই থাকলো না। আর সেই আগের চালও নেই, চুলও গেছে !'

'ও, তোমরা বুঝি বেড়াল মারতে পারোনি গোড়াতেই ?' ছোটভাই শুধায় : 'প্রথম রাত্তিরেই বেড়াল মারতে হয় যে !'

'কেন, বেড়াল মারতে যাব কেন ?' অবাক হয় বড় ভাই।

'বেড়াল মারতে পারলে আর তোমাদের মাথার ওপর এই মারটা পড়ত না। বেড়ালের ওপর দিয়েই চোটটা যেত।'

'তা ভায়া', মেজ ভাই জিগগেস্ করে ছোট ভাইকে : 'তোমার চেহারা তো ঠিক তেমনটিই রয়েছে দেখছি। চুলটুলও সব বজায় রয়েছে তেমনি—'

'আমি প্রথম রাত্রেই বেড়াল মেরেছিলাম কিনা !' ব্যক্ত করলো ছোট ভাই : 'খানার ফরাশে গিয়ে খেতে বসব, বৌয়ের আদরের মেনী বেড়ালটা আমার পায়ের কাছে এসে ম্যাঁও ম্যাঁও লাগিয়েছে আর আমি করলাম কি, আমার তরোয়ালটা খাপ থেকে খুলে একচোটে তাকে সাফ করে দিলাম। একেবারে দু'টুকরো। আর আপন মনে বললাম—এরকম বেয়াদবি আমি একদম পছন্দ করিনে, তা বেড়ালেরই কি আর বৌয়েরই কি ! বৌ কাছেই ছিল, শুনলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার মুখে কথাটি নেই। খোলা তলোয়ার খাবার থালার পাশে রেখে খেতে বসলাম…জুত করেই বসলাম খেতে…'

'জুতো খাবার কথা তুললো না তোমার বৌ ?'

'আবার ! বেড়ালের কাবাব দেখেই তার হয়ে গেছল। তারপর থেকে কোনো বেয়াদবি কথা কোনো দিন তার মুখ থেকে শুনিনি। কথা কিংবা

আচরণ। সেই রাত থেকে বিলকুল বাধ্য হয়ে গেছে আমার বৌ। উঠ বললে ওঠে, বোস বললে বসে।'

'বটে?' 'বটে?' বড় ভাই আর মেজ ভাই নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকে।

'এখন আর হায় হায় করলে কি হবে! বৌদিদিদের আর দুরস্ত করা যাবে না। প্রথম রাত্রেই বেড়াল মারতে হত দাদারা!' এই কথা বলল তখন ছোট ভাই। আর তোমাদের বেলাও আমার হচ্ছে সেই কথা!' এই বলে নিকুঞ্জকাকু তাঁর গল্পের উপসংহার করলেন।

কুঞ্জকাকু বললেন 'বলা সহজ ভায়া, করা কঠিন। বৌদের কি কেউ কখনো বাধ্য করতে পারে? তারাই অভাগাদের বিয়ে করে বাধিত করেন···!'

'বাধিত না কচু! আমি যদি বিয়ে করতাম দেখতে আমার বৌ কিরকম আমার বাধ্য থাকত। বৌদিদের মতন অবাধ্য হতো না আদপেই।'

'করে দেখা ভাই, করে দেখা। একটা বিয়ে কর আগে, তারপর বলিস।'

'বেশ, দাও তোমরা আমার বিয়ে। দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কুঞ্জকাকু তখন মেজ ভাইয়ের কনে দেখবার জন্যে বেরুলেন! সাত গাঁ খুঁজে সাত মাইল দূরের এক গাঁয়ে ডাকসাইটে এক পাড়াকুঁদুলীকে পেলেন।—তাঁর বৌ আর ভাদ্রবৌয়ের চেয়েও সাত গুণ বেশি খাণ্ডারনী!

তার সঙ্গেই নিকুঞ্জকাকুর বিয়ের সব ঠিক করে এলেন কুঞ্জকাকু। নিকুঞ্জকাকুর বিয়ের দিন এল। নিকুঞ্জকাকু বললেন—'আমার বিয়েয় কেউ তোমরা যেতে পাবে না। কেউ যাবে না আমার সঙ্গে। ঢাকঢোল ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ কিছু নয়। পাল্‌কি বেহারাও চাইনে। আমি একলা যাব বিয়ে করতে বুঝেছ।'

'পায়ে হেঁটে যাবি?'

'কেন, ঘোড়ায় চেপে যাব আমি। সেকালের রাজপুতরা যেমন করে বিয়ে করতে যেত?'

'বেশ, তাই সই।' বললেন কুঞ্জকাকু ঃ 'বৌ আনা নিয়ে কথা।' বিয়ে বাবদে বাজে খরচা বেঁচে গেল দেখে তিনি খুশিই হলেন। ভাইয়ের চেয়ে পয়সার মায়া ছিল কাকুর বেশি।

নিকুঞ্জকাকু বেছে বেছে একটা বেতো ঘোড়া নিলেন, তাতেই চেপে যাবেন বিয়ে করতে।

'বেতো ঘোড়ায় চেপে বিয়ে করতে যাবি?' শুধালেন কুঞ্জকাকু।

'বে তো করতে যাচ্ছি! বেতো ঘোড়াই ভাল।'

'ওটা যে চলতে পারে না রে।'পায়ে পায়ে হোঁচট খায়। ওকি! আবার বন্দুক ঘাড়ে নিচ্ছিস যে। বন্দুক নিয়ে করবি কি? নতুন বৌকে খুন করবি নাকি!'

'পাগল! বৌকে কেউ খুন করে কখনো? বলে বৌয়ের জন্য খুন হয় মানুষ। বন্দুকটা নিলাম পথে যদি পাখপাখালি দেখতে পাই শিকার করে আনব। বৌ-ভাতের কাজে লাগবে। মাংসের পোলাও হবে খাসা।'

কুঞ্জকাকু খুশি হলেন আরো। বৌভাতের খরচটাও বাঁচবে তাহলে।

বন্দুক ঘাড়ে করে বেতো ঘোড়ায় চেপে নিকুঞ্জকাকু বেরুলেন বিয়ে করতে। বরযাত্রী গেল না কেউ, বরপক্ষের কেউ নয়।

মন্ত্র পড়ে ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল।

বেতো ঘোড়ায় চড়ে বৌকে পাশে বসিয়ে নিকুঞ্জকাকু নিজের বাড়ির দিকে পাড়ি দিলেন।

বেতো ঘোড়া এমনিতেই চলতে পারে না, তার উপরে দু-দুজন সোয়ারি। পাড়াগাঁর মেঠো পথে নানা খন্দ পেরিয়ে যেতে যেতে হোঁচট খেল বেচারা। হোঁচট খেয়েই চেঁচিয়ে উঠলো ঘোড়াটা—চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

নিকুঞ্জকাকু বললেন—'একবার হলো।'

মাঠের একটা আল ডিঙোতে গিয়ে আরেকবার টাল সামলাতে হলো ঘোড়াটাকে। আবার তার—চিঁ হি হিঁ হি হিঁ হিঁ ··

নিকুঞ্জকাকু বললেন—'দুবার হলো।'

আরো কিছুদূর গিয়ে ঘোড়াটা যখন আরেকবার চোট খেল, কাকু তখন থাকতে পারলেন না আর। নেমে পড়লেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। বৌকেও নামালেন।

ঘোড়াটা প্রতিবাদের সুরে বলতে যাচ্ছিল ফের চি হি···কিন্তু চি চি করবারও ফুরসত পেল না···

ঘোড়াকে বললেন 'তিনবার হলো, আর নয়।' এই না বলে বন্দুক উঁচিয়ে নিকুঞ্জকাকু দড়াম্! দড়াম্! ঘোড়াটাকে গুলি করে মেরে ফেললেন তক্ষুনি।

এমন ব্যাপার নিকুঞ্জকাকুর বৌ বরদাস্ত করতে পারল না। নতুন বৌ হলেও মুখ ফুটে সে বলল 'এটা কি করলে? এটা কি উচিত কাজ হলো? ওর কি দোষ? অবোলা জীব, আহা! ওকে অমন করে মারে? পাড়াগাঁর আবরো খাবরো পথ—জোয়ান মানুষই চলতে হোঁচট খায় আর এতো একটা বেতো ঘোড়া! ভেবে দেখ, এই ঘোড়া, যখন এতটা বুড়ো হয়নি, তোমার কত কাজ দিয়েছে, কতো উপকার করেছে তোমার। ঘোড়ার মতন বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত উপকারী জীব আছে আর?'

এইভাবে আমার মেজকাকী মুখে মুখে ঘোড়ার এক রচনা বানিয়ে দিলেন। নিকুঞ্জকাকু শুনলেন সব চুপ করে। তারপরে বৌয়ের বক্তৃতা শেষ হলে বললেন 'একবার হলো।'

এই কথাই বললেন শুধু নিকুঞ্জকাকু। এই একটি কথাই।

তারপর আর কোনো কথা নয়! চলতে শুরু করলেন তিনি বৌয়ের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করেই। বৌ তাঁর পিছনে পিছনে সুড় সুড় করে হাঁটতে লাগল।

সাত মাইল পথ বৌকে হাঁটিয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন নিকুঞ্জকাকু।

কিন্তু সেই যে আমাদের মেজকাকী চুপ মেরে গেলেন, তারপরে মুখ থেকে তার একটি কথাও কেউ শোনেনি কখনো।

নিকুঞ্জকাকী বিলকুল নিশ্চুপ।

পাকপ্রণালীর বিপাক

'তুমি রাঁধতে জানো দাদা ?' সকলে চা খাবার সময়ে বিনি জিগ্যেস করল।

'রাঁধতে জানিনে ? কী বলিস !' সগর্বে আমি বলি : 'এক্ষুনি একটা ডিম সেদ্ধ করে তোকে দেখিয়ে দেব ?'

'ডিম তো নিজগুণেই সেদ্ধ হয়, তার মধ্যে আবার দেখাবার কি আছে ? ওটা কি একটা রান্না ?'

'হংসডিম্ব আর পরমহংসরা অন্যের অনায়াসে স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে থাকেন, মানি একথা, কিন্তু তা বলে' স্টোভ ধরাতে হয় না ? স্পিরিট যোগাড় করতে হয় না বুঝি ? তাছাড়া, আরো কতো ইত্যাদির যোগাযোগ নেই ?' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসবের কথাও ওকে জানাতে হয়।

'তবে আর কি, তাহলে তুমি পারবে। রান্না কিছু না, তার যোগাড়যন্ত্রটাই আসল, তাই যখন তুমি পারো, তখন উনুনে কড়া চাপিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করার যন্ত্রণা, তা আর তোমার পক্ষে এমন কি !'

'কেন, এসব কথা কেন হঠাৎ ?' আমাকে সন্দিগ্ধ হতে হয়।

'মামার বড্ড অসুখ, ভাবচি একবার মামার বাড়ি যাব। এই দিন দশ বারোর জন্যই। সেবা-শুশ্রূষার হাঙ্গাম্ মামীমা পেরে উঠচেন না একলা।'

'মামাকে দেখতে যাবে ? আর এধারে আমাকে কে দ্যাখে ?'

'আয়না রইলো। নিজেই দিন কতক নিজেকে একটু দেখলে না হয়।' বিনি হাসে। 'ভাঁড়ার ঘরে চাল ডাল নুন লঙ্কা পেঁয়াজ আটা ঘি ময়দা গুঁড়ো মশলা—চিনি বাদে—আর সবই মজুদ রইলো। কোন্‌টা কি চিনতে পারবে নিশ্চয়। তাছাড়া একখানা পাকপ্রণালীও কিনে রেখে গেলাম। ইচ্ছে মত পাকাবে, খাবে।'

'কী সর্বনাশ !' পাকানোর কথায় আমি কাঁকিয়ে উঠি।

'সর্বনাশটা কি ? মরুভূমিতে পড়োনি যে হাহাকার করছ। দশ বারো দিন নিজেকে নাইয়ে খাইয়ে টিকিয়ে রাখতে পারবে না ? কিসের মানুষ তবে ?

রবিনসন ক্রুসোর মতন যদি বিজন দ্বীপে একলাটি গিয়ে পড়তে হতো কি করতে?'

'কাঁদতাম, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম।' একটা সত্যি কথা বলে ফেলি।

অনেক বললাম, অনেক করে বোঝালাম, অনেক অনেক কাকুতি মিনতি করলাম, দীর্ঘ দশ বারো দিনের জন্যে একটি অসহায় অনাথ বালককে এভাবে একলা পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া তার উচিত হচ্ছে না, হয়তো আমিও এক অসুখে পড়তে পারি—মামার চেয়েও ঢের শক্ত অসুখে, নানাদিক থেকে নানারকমে ওর প্রাণে সমবেদনা জাগানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হোল না। বিনি চলে গেল।

লেখকদেরও পৌরুষ বলে একটা জিনিস থাকে। টের পাওয়া না গেলেও থাকতে পারে। এবং অনেক সময়ে গিয়েও যায় না। রবিনসন ক্রুসোর মত মহাপুরুষ না হলেও, আপাতদৃষ্টিতে তারা যতই অপদার্থ মনে হোক, কোনো কোনো লেখকের মধ্যে, লেখা ছাড়াও আন্যান্য সদগুণের এক-আধটু ছিটে ফোঁটা থাকা সম্ভব। এই যেমন আমি। আমার নিজের মধ্যে পৌরুষের কোনো সম্ভাবনা কখনই আমি সন্দেহ করিনি, কিন্তু দেখলাম আছে। দেখা গেল, মরিয়া হয়ে উঠলে রাঁধতেও পারি। আমি রাঁধতামও শেষ পর্যন্ত; যদি না মাঝখানে ঐ আছাড়টা আমাকে খেতে হতো।

বিনির অন্তর্ধানের পরদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই চমৎকার করে এক কাপ চা বানিয়েছি। একজোড়া ডিম সেদ্ধ করতেও দ্বিধা করিনি। অবশেষে সডিম্ব সেই চায়ের পাত্র বিছানায় নিয়ে এসে আরাম করে খেয়ে আবার এক ঘুম লাগিয়েছি। হজম করতে হলে ঘুমানো দরকার। উত্তমরূপে পরিপাকের জন্য উত্তমরূপে নিদ্রার প্রয়োজন। আর আমার মতে, ঘুমোনোর জন্যেই আমাদের খাওয়া। খালিপেটে থাকলে খিদে পায়, আর খিদে পেলে ঘুম পায়না বলেই নেহাৎ কষ্ট করে আমাদের দুবেলা কি তিনবেলা কিম্বা চারবেলা খেতে হয়। তাই না?

তারপর এগারোটার পর ঘুম থেকে উঠে পাকপ্রণালীটা হাতে করেছি। স্টোভটা পায়ের কাছেই রয়েছে, ধরাতে যা দেরি। পাকপ্রণালীটার পাতা ওল্টাচ্ছি, আজ আর বেশি কিছু না, বিশেষ কিছু নয়, সবচেয়ে সোজা রান্না একখানা রেঁধে সোজা-সুজি খেয়ে সহজভাবে শুয়ে পড়ব। তারপর ওবেলা রেস্তরাঁ দেখলেই হবে। তারপর কালকের কথা আবার কাল। এই করে এই দশ বারোটা দিন তো তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারব। বিনিকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই। চাই কি. নিজেকেও একহাত দেখাতে পারি—চটেমটে হয়ত পোলাও কালিয়াও রেঁধে ফেলতে পারি—এর মধ্যেই একদিন—কিছু আশ্চর্য নয়।

'পেঁয়াজের সুপ রান্নার সহজ প্রণালীটাই' সবচেয়ে আমার লাগসই লাগল। পেঁয়াজের সুপ সাহেবি রেঁস্তারায় বহুৎ খেয়েছি—চমৎকার লাগে। তাই না হয়

বানিয়ে খাওয়া যাক আজকে। খেতেও ভালো, রাঁধতেও শক্ত না—যেমন পুষ্টিকর তেমনি উপাদেয়।

বইটায় দেখলাম, পেঁয়াজের স্যুপকে নামমাত্র খরচায় অল্প পরিশ্রমে প্রস্তুত বিলাসিতার চূড়ান্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি বিলাসিতার পক্ষপাতী নই, তবু বাধ্য হয়ে আজ একটু বিলাসিতাই করতে হবে, কি করা যাবে? আর এই বিলাসিতা সমস্তটা একলাই উপভোগ করতে হবে আমায়, উপায় নেই। আমার রান্নার সৌরভ যে কতদূর যাবে জানিনে, তবু কোনো বন্ধু যে গন্ধ পেয়ে আমার পেঁয়াজের ঝোলে ভাগ বসাতে আসবেন তা মনে হয় না। সমস্ত সুরুয়াটা এক এক চুমুকে চেখে চেখে আর তারিয়ে একটুও তাড়াতাড়ি না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুরৎ সুরৎ আওয়াজে একাই আমি আত্মসাত করতে পাবো। কেউ বাগড়া দেবার বখরা নেবার নেই। আ—হ্।

পাকপ্রণালীর নিয়মাবলী অনুসরণে লাগা গেল। স্টোভটা ধরিয়েছি এবং বিছানা থেকে বেশ দূরে সরিয়ে এনেছি—পাছে বিছানা-টিছানা ওর অনুকরণে ধরে যায়। আগুনরা ভারি সংক্রামক। সাবধানতা ভাল।

'প্যানে আন্দাজ মতো জল দাও'—বলেছে পাকপ্রণালী।

আন্দাজ মতো জল দিলাম – যতদূর আন্দাজ করতে পারা গেল।

'জল ফুটতে থাকুক।' থাকুক আমার কোন আপত্তি নেই।

'আধসেরটাক পেঁয়াজ কুঁচিয়ে ফ্যালো। একেবারে কুচি কুচি করে।'

তথাস্তু। কিন্তু এইটেই এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রমসাপেক্ষ দেখা যাচ্ছে। এবং একটু বিপজ্জনকও বই কি। পেঁয়াজের সঙ্গে নিজের কড়ে আঙুলটাও প্রায় কুঁচিয়ে ফেলেছিলাম একটু হলে! আর পেঁয়াজ কুঁচাতে বসলে, কেন জানিনা, ভারি কান্না পায়। আজই প্রথম এটা দেখতে পাচ্ছি—এমনকি, চোখের জলে ভাল দেখতেই পাচ্ছিনে। কোথ্থেকে চোখে এত জল আসে আর এমন চোখ জ্বালা করে! যাঁরা মারা গেছেন, মারা, দিদিমারা, দিদিমার মা আর মার দিদিমারা সব একে একে স্মরণ পথে আসতে থাকেন। ভারি কান্না পায়, আরো চোখ জ্বলে, এবং আরো কান্না হাউ হাউ করে ঠেলে আসে সেই শোকের উজান ঠেলে অবশেষে দিদিমার দিদিমারা পর্যন্ত ভেসে আসেন। কান্না আর থামে না। গাল বেয়ে, গলা জড়িয়ে দরবিগলিত ধারে বুক ভাসিয়ে দেয়। কান্নার আবেগে আরো কাঁদি। অকারণে কাঁদি। অশ্রুপ্লুত হয়ে পেঁয়াজ কুচি করি।

হাপুস্ হয়ে কেঁদে নেয়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে উঠি। উঠে চোখ মুছে প্যানের ফুটন্ত জলে সেই কুঁচানো পেঁয়াজদের জলাঞ্জলি দিই। দিয়ে আবার চোখ মুছি। এমন কি, ওই পেঁয়াজদের দশা ভেবে ওদের জন্যও চোখে জল আসে আবার। কাঁদতে কাঁদতে বইয়ের পাতা ওলটাই।

'এইবার কয়েকটা গোল আলু ওর ওধ্যে ছুঁড়ে দাও। গোল আলুগুলো খোসা ছাড়ানো হওয়া দরকার।' বইয়ে বাৎলায়।

সারা ভাঁড়ার ঘর আঁতি পাঁতি করে খুঁজি, কিন্তু খোসা ছাড়ানো গোল

আলু একটাও আমার চোখে পড়ে না। প্রত্যেক আলুর গায়েই খোসা লাগানো। অথচ বইয়ে লিখেছে, খোসা ছাড়ানো আলুই চাই। তা না হলে—অন্য আলু দিয়ে হবে না। কি মুশকিল দ্যাখো দিকি? কী যে করি এখন!'

সুশীলাদির বাড়ি ছুটতে হয়। সুশীলাদি আমার রান্না বান্নায় ওস্তাদ। আলুপটলদের নাড়ীনক্ষত্র ওঁর জানা।

'দিদি, আমাকে গোটাকতক খোসা ছাড়ানো আলু দিতে পারো? ভারি দরকার। অথচ বাজারে কি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

বলতেই সুশীলাদি হাসতে হাসতে তাঁর রান্নাঘর থেকে ঐ আলু আধ ডজন আমার হাতে তুলে দ্যান। আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসি। এসে দেখি সারা প্যান দিব্যি আনন্দে টগ্ বগ্ করছে! গন্ধ ভুর্ ভুর্!

'এবার আলুগুলো ওর ভেতরে ছুঁড়ে দাও।'

ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করি কিন্তু একটার পর একটা, চারটেই তাক ফসকে গেল দেখে বাকি দুটোকে আর ছুঁড়ে না দিয়ে, এগিয়ে গিয়ে, প্যানের ভেতরে ছেড়ে দিই। পাকপ্রণালীর উপদেশের অন্যথা করা হলো, অন্যায় হলো বুঝলাম। কিন্তু কি করব, পাকা রাঁধুনির মত হাতের তাক যদি আমার না থাকে, (থাকা স্বাভাবিকও নয়,) তাহলে কি করা যায়? সবাই কি দূর থেকে তাক মাফিক ছুঁড়তে পারে?

'এইবার অল্প করে গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দাও।'

অল্প করে গোলমরিচের গুঁড়ো কখনও ছিটিয়েছ? ছিটিয়ে দেখেছ কি হয়? রান্নার কি হয় তা বলচিনে, রাঁধুনির কি হয়, তাই আমার বক্তব্য। এক কথায় হাঁচি হয়, দুর্দান্ত রকমের হাঁচি। মশলার কৌটো ছিটকে যায়—কোথায় যায় জানা যায় না—খুন্তি উড়তে থাকে—আত্মসম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

হাঁচির হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কোনোরকমে সামলে প্রায় তিনশো হাঁচি হাঁচার পর চোখ খুলতে পেরেছি—চেয়ে দেখি, পেঁয়াজের কারি প্যানের গলা ছাড়িয়ে উঠছে। আধ প্যানের বেশি জল দিইনি, অথচ তাই যে, এতক্ষণ ফুটেও কি করে এক প্যান্ হয়ে উঠল—প্যান্‌টা নেহাৎ ছোট ছিল নাতো—তাই দেখে আমার তাক লাগে। আর সেই কারির টগবগানি কি! কী তার লম্ফ ঝম্ফ! বইয়ের কথা তো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, তবু কোথায় যে কি গলদ ঘটল আমি বুঝি না।

দেখতে দেখতে সেই স্যুপ প্যান ছাপিয়ে স্টোভ ছেয়ে গেল। স্টোভ ছেয়ে উপচে পড়তে লাগল। আর অত উপচেও প্যান ভর্তি কারির কিছু কম্‌তি দেখা গেল না। আশ্চর্য কারি-কুরি! এবং এর ওপরে ফোঁস্ ফোঁসানিও তার যেন বেড়ে গেল আরো! আরো বেশি লাফাতে শুরু করে দিল আবার। আমাকে দেখেই কিনা কে জানে!

অবশেষে সেই স্যুপ আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল ইতস্ততঃ। স্ততঃর মধ্যে আমাকে ধরা যেতে পারে। তীরবেগে ছুটে এসে

আমার পায়ে ছাঁৎ করে লাগতেই আমি এক লাফ মেরেছি। আর তার পরেই পিছন ফিরে দে-ছুট্।

কিন্তু ছুট দিলে কি হবে, 'একশ গজের দৌড়ে' কোনোদিনই আমি পুরস্কার পাইনি। স্যুপের সঙ্গে দৌড়েও আজ হেরে গেলাম। স্যুপ আমার আগে আগে যাচ্ছিল, তার গায়ে পা লেগে পেল্লায় এক আছাড় খেয়েছি। আর সেই এক আছাড়েই বিছনায় এসে আমি ধরাশায়ী। আমার ঘরের ওধার থেকে এধার পর্যন্ত পেঁয়াজের কারি থই থই করছে—কোথাও পা ফেলার যো নেই—কিন্তু ভয় নেই আর—আমি এখন বিছানার ওপরে—যতই লাফাক, য়্যাতোদূর ওরা লাফিয়ে উঠতে পারবে না নিশ্চয়।

স্যুপের থেকে ভীত নেত্র সরিয়ে বইয়ের পাতায় রাখতেই চোখে পড়ল, সব শেষে লেখা আছে, 'এইবার বারো জনের উপযুক্ত চমৎকার পেঁয়াজের স্যুপ বানানো হলো।'

আমার বাবা রেখে গেছলেন বাইশ হাজার টাকা নগদ ; আর একেবারে বড়ো-রকমের না হলেও মেজরকমের একখানা বাড়ি। এই তাঁর স্থাবর আর অস্থাবর সম্পত্তি—এ ছাড়া আমি। আমি ঠিক পৈতৃক-সম্পত্তির মধ্যে বিবেচ্য হবো কিনা জানিনে, তবে আমাকেও তিনি রেখেই গেছলেন।

অবিশ্যি এখন আমি আর স্থাবর নই, অস্থাবরও নই—বরং আমাকে এখন যাযাবর বলাই উচিত। আমি এখন যাবার মুখে।

বাবার থোক বাইশ হাজার আর মেজ কিংবা সেজরকমের একটা বাড়ি নগদ পেয়েও আমি যে সুস্থশরীরে বাহাল-তবিয়তে এমনভাবে না খেতে পেয়ে মারা যাবো, একথা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল ?

কেন যে মারা গেলাম (অবশ্য এখনো ঠিক মারা পড়িনি যদিও, তবে কেন যে মরতে বসেছি) তা এক অদ্ভুত রহস্যই আমার কাছে। কেবল আমার কাছে না—আমার বন্ধুদের কাছে, কলকাতার যাবতীয় ডাক্তারের কাছে—রাস্তা দিয়ে যে লোক হন্যে হয়ে ছুটছে তার যদি খবর-কাগজ পড়ার বাতিক থাকে, তবে তার কাছেও।

খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ হলেও খাদ্যের সঙ্গে বনিবনা করেই বেঁচে থাকে মানুষ। আমার বেলায় শুধু একটু ব্যত্যয় ঘটেছিল এর। এইটুকুই শুধু!

তবে অবনিবনা বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তেমন-কিছু নয় অবিশ্যিই।

খাদ্যের অভাব আমি বোধ করিনি কোনোদিন। প্রচুর খাদ্য পুঞ্জীভূত থাকতো সর্বদা আমাদের বাড়িতে। স্বদেশী, সর্বদেশী খাদ্যের মহাসমারোহে

শোভাযাত্রা করে এসেছিল আমার জীবনে। বাবা তো বেঁচে থাকতে খাবারের চূড়ান্তই করে ছেড়েছিলেন! আমাদের রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর আর খাবারঘর একরকম বিভীষিকাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার কাছে!

আর খেলে, খেতে পারলে, হজম করতেও পারতুম। গরহজমের গোলোযোগ তো নয়ই, পৈটিক কোনো ব্যারামের বালাই পর্যন্ত ছিল না আমার।

সত্যিকথা বলতে কি, খাবার কথায় ভয়ই খেতাম দস্তুরমত। কোনো কিছু খেতে হলে এতো আমার খারাপ লাগতো যে, তা আর কহতব্য নয়। কি সুখে যে লোক খায়—ঘণ্টায় ঘণ্টায় খায়, দিবারাত্রই খায় এবং প্রায় আমাদের প্রথম ভাগের গোপালের মতন যাহা পায়, তাহাই খায়—সুযোগ পেলেই খায় এবং শখ করেই খায়, আমি তো তা ভেবেই পাই না! আর আমি? খাবারের সঙ্গে আমার একেবারে আদায়-কাঁচকলায়! খাদ্যকে অন্তরঙ্গ করতে হলেই আমার হয়েছে!

বাবা বেঁচে থাকতে তো খাদ্যের কবলে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়েছিল আমাকে!

সকালবেলা চোখ মেলতে না মেলতেই বিছানার পাশে ছোট্ট টিপয়ে চা আর বিস্কুট এসে হাজির!

ধূমায়মান চায়ের আবেদন নীরবেই আমি অগ্রাহ্য করতাম ঘুমায়মান হয়ে। ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকতাম পাশ ফিরে।

তারপরে আসতো ব্রেকফাস্টের তলব; বাবার সঙ্গে যোগ দিতে হতো মুখ-হাত ধুয়ে। কিন্তু আমার তরফের টোস্ট, পোচ আর ওভালটীন অবহেলায় পড়ে থাকতো। উৎসাহই পেতাম না খাবার।

বাবা বলতেন—'একটা অমলেট করে দেবে তোকে? দিক না!'

'অমলেট? না, থাক!' খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি করতাম আমি। পৃথিবীর প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়তাম হঠাৎ।

দুপুরে তো ফলাও রকমের ফলার! এক অন্ন আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে দস্তুরমতন মধ্যাহ্নভোজ! বাবার সঙ্গে খাবার টেবিলে গিয়ে বসতে হতো আমাকে। ব্যঞ্জনবর্ণ সব বাদ দিয়ে স্বরবর্ণের সামান্য এক আধটু সাধনায় দু-এক চামচ চেখেই চটপট উঠে পড়তাম।

বাবা আফশোষ করতেন—'সবই পড়ে থাকল যে!'

'ওঃ, যা খাওয়া হয়েছে!' প্রকাণ্ড এক ঢেঁকুর উঠতো আমার - 'উব্-ব্-ব্-বো—ঔ!' সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠতাম।

'ও বাব্বা!' ঢেঁকুরের বহর দেখে বাবা নিজেকেই উচ্চারণ করে বসতেন!

দু'ঘণ্টা যেতে না যেতেই ফের লাঞ্চ। ওজোর করে কাটাতাম—'দুপুরের খাওয়াই হজম হয়নি, এর মধ্যেই এক্ষুনি আবার খেতে পারে কেউ?'

বিকেলের টিফিনের বেলা কিন্তু জোর করেই পাশ কাটাতে হতো। 'অ্যাতো খাওয়া কি ভাল বাবা? রাক্কোস্ বলবে যে লোকে!'

'হ্যাঁ, বলবে! বললেই হলো! লোকের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!'

বাবা বলতেন 'যা-যা, একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আয়গে! ঘুরে-ফিরে এলে খিদে হবে তখন!'

বেরুতে না বেরুতেই বন্ধুরা এসে ছেঁকে ধরে। সবার মুখেই ঐ এক বুলি 'খাওয়া ভাই, খাওয়া আজকে!' 'চল্ চাঙ্গোয়ায় যাই।' কিংবা 'আমাদের পাড়ার রেস্তোঁরাতেই খাওয়া যাক না আজ? বেশ মটন-চপ বানায় কিন্তু!'

খাওয়া খাওয়া করেই এই দুনিয়াটা গেল! খাবার জন্যেই সবাই পাগল এখানে! কি খাবো, কখন খাবো, কেমন করে খাবো, কার ঘাড় ভেঙ্গে খাবো এই ভেবেই নাস্তানাবুদ! এমন খারাপ লাগে আমার এক এক সময়ে এই খেয়োখেয়িকাণ্ডে। অ্যাতো খেয়ে এরা কি সুখ পায়? খোদাই খালি জানেন!

কই, আমার তো খাবার ইচ্ছেও হয় না কখনো। ভালই লাগে না খেতে। খাবার নাম করলেই গায়ে জ্বর আসে, খেতে হলে ভয়ে কাঁপতে থাকি। এক অ-খিদের কষ্ট ছাড়া (সে কষ্ট আমার নিজের চেয়ে আমার আশ-পাশের আর সবারই যেন বেশি-বেশি আমার জন্যে—বাবার তো বিশেষ করে আরো)—অন্য কোনো কষ্টই নেই আমার। বেশ তো আছি।

বন্ধুদের নিয়ে রেস্তোঁরায় সেঁধুতে হয়। আমার সামনেই অম্লানবদনে ওরা ডিশের পর ডিশ পোলাও আর রোস্ট শেষ করে, কারি আর কোর্মা, চপ আর কাটলেট ঝড়ের মত উড়িয়ে যায়। নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই নিঃশেষ! টেবিলে পড়তে না পড়তেই লোপাট! আর আমি এদিকে বসে থাকি চুপ করে হাত গুটিয়ে একদম কোনো প্রেরণা পাইনে উদর থেকে।

অবিশ্যি রেস্তোঁরার বিল আমাকেই মেটাতে হতো। আর তাতেই ছিল আমার আনন্দ—হ্যাঁ, তাতেই যা-কিছু!

একবার ওরা খাবার জন্যে আমাকে খুব চেপে ধরায় চটেমটে চলে এসেছিলাম রেস্তোঁরা থেকে। সেদিন ওদের রাত বারোটা পর্যন্ত বাঁধা থাকতে হয়েছিল সেই আড়তে, সেখান থেকে—সেই খানার সীমা থেকে ছাড়া পেয়েছিল থানার সীমান্তে—দারোগার জিম্মায়। সেই থেকে আর ওরা আমাকে খেতে বলে না কক্খনো, পীড়াপীড়িও করে না আর।

আমিও বেঁচেছি!

বেড়িয়ে ফিরলেই বাবা বলতেন 'বেশ খিদে হয়েছে তো? চনচনে খিদে—অ্যাঁ? হবেই। তখনি বলেছিলাম না—বেড়ানো খুব ভাল ব্যায়াম। দু'বেলা বেড়াবি, বেড়িয়ে খাবি, খেয়ে বেড়াবি—তাহলেই খিদে হবে! না বেড়ালে-চেড়ালে কি খিদে হয়রে পাগলা?'

'খিদে হয়েই বা কি হবে! আর বেড়িয়েই বা হবেটা কি?'

'বাঃ, খিদে হলে খেতে পারবি। আর—খেলে-দেলে গায়ে জোর হবে, তখন বেড়াতে পারবি আরো। আমি এই ঘরের মধ্যেই কত হাঁটি, রোজ কত মাইল পাইচারি করি জানিস? তবেই না খিদে হয়! বেড়িয়ে খাই, আবার খেয়ে বেড়াই—এই ঘরের মধ্যেই বসে।'

'তোমরা তো খিদে-খিদে করেই অস্থির, আমি তো বুঝতেই পারি না যে,

খিদে হলে কি হয়? আর না হলেই বা কি? কেনই বা তার জন্যে এত কষ্ট করে দৌড়োদৌড়ি করবো? করতেই বা যাবো কেন? কেন?'

'বুঝবি, বুঝবি—বড়ো হ, বুড়ো হ আগে, বুঝবি তখন! এখন যা, জামা-কাপড় ছেড়ে আয়গে। ডিনারের সময় বয়ে যাচ্ছে। খেতে বসা যাক। খিদে পেয়েছ বেজায়, দেরি করিসনে। খেতে যখন হবেই, দেরি করে লাভ কি?'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলির পাঁঠার মতো খাদ্য-খাদকের সম্মুখীন হই। খাদ্য? তা সে কম নয় নেহাৎ! লুচি, পাঁঠা, দুধ, ক্ষীর, দই, রাবড়ি, পায়েস, সন্দেশ কী নেই সে-তালিকায়? আর খাদক? তিনি স্বয়ং আমার পিতৃদেব। অবশ্য আমার খাদক নন, নিখিল খাদ্য-জগতের।

উক্ত জগতের সৃজন-পালনে অনেকের অধ্যবসায় আছে জানি; যোগাযোগ থাকাও সম্ভব। কিন্তু ওর ধ্বংসকর্তা-হিসেবে বাবাকেই আমার কেবল সন্দেহ হয়। খাবার টেবিলে গিয়ে বসি, সভয়ে তাকাই বাবার দিকে।

খেতেও পারেন এমন! ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খাচ্ছেন! আর সঙ্গে-সঙ্গেই হজম! আবার খিদেও হচ্ছে বেশ! দেখতে না দেখতেই! আশ্চর্যি!

বাবার অভিযোগ শুনতে হতো—'কই, খাচ্ছিস কই রে? ঠোকরাচ্ছিস কেবল। এই না বললি 'বেড়িয়ে এসে খিদে হয়েছে বেশ।'—'

'আমি কোথায় বললুম? তুমিই তো বললে।' আমিও আমার অনুযোগ শোনাতাম। 'বেড়িয়ে এলেই বেশ খিদে হবে এতো তোমার কথা।'

বাবা শুনতেন, কিন্তু দ্বিরুক্তি করতেন না। খাবার সময়ে বাবার যা ঐ দু-একটি বাক্যব্যয়, তা কেবল গোড়ার দিকেই, তারপরেই তাঁর অখণ্ড মনোযোগ গিয়ে পড়তো খাদ্যখাদ্যের ওপর। আমার প্রতি দৃষ্টি দেবার, কি কথাবার্তা অপব্যয় করবার ফুরসৎ পেতেন না আর। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম। তবে আমিও যে নিতান্তই পেছিয়ে নেইকো, প্রায় সমতলেই তাঁর সঙ্গে এগুচ্ছি আমার কাঁটা-চামচের ঠুন্‌ঠুনিতে তাঁর কানকে মাঝে-মাঝে জানান দিলেই চলে যেতো।

রাত্রে বিছানায় শুয়েও নিস্তার নেই। প্রকাণ্ড দু'গেলাস হরলিকস নিয়ে দশটা বাজতে না বাজতেই বাবা এসে পোঁছোতেন—'নাইট-ষ্টার্‌ভেশান্‌ বেজায় সাংঘাতিক। ভারী খারাপ জিনিস, ভীষণ হচ্ছে আজকাল। রাত-উপোষে হাড্ডিও পড়ে, জানিসতো? নাও, এখন চোঁ-চোঁ করে এইটুকু মেরে দাও তো বাপু।'

তখন আর ঠনৎকারের দ্বারা আত্মরক্ষার উপর থাকতো না। বাবা নিজের গেলাসে না তাকিয়েই সোজা আমার দিকে চোখ রেখে দিব্যি ঢক্‌ ঢক্‌ করে হরলিকস খেতে পারতেন।

'কী বলছো বাবা! ডিনারই হজম হয়নি এখনো, তা আমার নাইট-ষ্টার্‌ভেশান্‌। এর মধ্যেই এই টামব্লার-ভর্তি উব্‌-ব্‌-ব্‌-বো-ও-ও।' বাধ্য হয়ে আরেকটা রাম-ঢেঁকুর ছাড়তে হতো আমায়।

'যা-যাঃ! আর তোর বৌকে ডাকতে হবে না। এইটুকু খাবেন, তার

জন্যে মা, বৌ কতো কি! নে-নে, অনেক হাঁকডাক হয়েছে।' খেপে উঠতেন বাবা 'বিয়েই হলো না, তা আবার বৌ! বুদ্ধি দ্যাখো না বাঁদরের!'

পান করতে হতো আমায় প্রতিবাদ না করে। তারপর শেষ চুমুক খেয়ে ঢেঁকুর চেপে বলতাম 'জানো বাবা, কে-একজন বড়ো ডাক্তার নাকি বলেছেন — না খেয়ে মানুষ মরে না, বরং খেয়েই—বেশি বেশি খেয়েই মারা যায়।' এইভাবে প্রায়ই মারা পড়ে কতো লোক তা জানো?'

'ধুত্তোর তোর বড়ো ডাক্তার!' বাবার জবাব আসতো—'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দ্যায় দেখিসনি, নাইট্-স্টার্ভেশান্ ভারি মারাত্মক। জীবনের চেয়ে বড়ো ডাক্তার আবার আছে নাকি? আর, সেই জীবনকে জানা যায় শুধু বিজ্ঞাপন পড়লে। আর সেই বিজ্ঞাপন পড়ে আমার জানা।' বাবা জানাতেন 'না খেয়ে কি বললি? না খেয়ে মারা পড়ে না মানুষ? না খেয়ে মারা পড়ে কি লাভ—বেঁচে থেকেই বা কি সুখ? তার চেয়ে খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকা ঢের-ঢের ভাল। হ্যাঁ, ঢের-ঢের! আমার নিজের মতে অন্তত।'

বাবা মারা যাবার আগে আমার প্রতিদিনের খাবার ইতিহাস এই। তার পরের ব্যাপারটা এইবার বলি —

দেহরক্ষার আগে বাবার শেষবাণী—'দ্যাখ, কক্খনো খাওয়া-দাওয়ায় অবহেলা করিসনে। কদাপি না। খাবি। মাঝে-মাঝেই খাবি। সুযোগ পেলেই খাবি। খিদে হোক আর না হোক। খাবি। খাওয়া-দাওয়া যেন একেবারে ছেড়ে দিসনে, বুঝলি?'

অন্তিমকালে বাবাকে আশ্বস্ত করতেই হয়েছিল - 'খাবো বইকি বাবা। সুযোগ পেলেই খাবো। ফাঁক পেলেই ফুরসত হলেই খাবো—ফাঁকি দেবো না মোটেই। কিচ্ছু ভেবো না তুমি।'

বাবা আমাকে আবার বোঝাতেন—'না খেলে-দেলে বাঁচবি কি করে রে? না খেয়ে কি বাঁচা যায়? খাবি বুঝলি? দ্যাখ্ অ্যাতো অ্যাতো খেয়েও আমি মারা পড়লাম! মরতে হলো আমায়! দেখছিস তো।'

'আমি মরবো না—কিছুতেই না—ভয় নেই তোমার!' ভরসা দিয়েছিলাম বাবাকে, 'সে তুমি দেখে নিয়ো।'

'তা যদি নিশ্চিত হতুম, তবে তো নিশ্চিন্তে মরতে পারতুম। আমি চলে যাচ্ছি, এখন কে আর তোকে ধরে-বেঁধে খাওয়াবে এর পর!'

তারপরেই বাবার দীর্ঘনিঃশ্বাস; সে-ই তাঁর শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাস।

বাবা গতাসু হবার পরেই উঠে-পড়ে লাগি আমি। নাঃ, বাবার অন্তিম আদেশ রাখতেই হবে আমাকে! বাপের কথায় রামচন্দ্র বনেই গেছলেন সোজা, আমি না হয় পেটুক বনে যাবো—এ আর এমন বেশি কি? যেমন করেই হোক, খেতেই হবে আমায়—কসে খাবো, গিলে খাবো, ধরে খাবো, কোঁৎকোঁৎ করে খাবো, বিনাবাক্যব্যয়েই খাবো, হন্যে হয়ে খাবো, হন্তদন্ত হয়ে খাবো, তেড়ে-ফুঁড়ে খাবো, ধস্তাধস্তি করে খাবো। হ্যাঁ, খাবোই—আস্ত খাবো, আস্তে আস্তে খাবো, ধীরে সুস্থে খাবো—গিলে খাবো তার কী হয়েছে!

কিন্তু খাবো কি ছাই, খিদেই নেই আসলে? মরীয়া হয়ে খেতে বসি, কিন্তু হায়! খিদেই পায় না আমার!

খাবার অনিচ্ছা যদি-বা কোনোরকমে দূর করলুম, খাবার সদিচ্ছা আর জাগে না? ভারি মুস্কিল তো।

কলকাতার বড়ো-বড়ো ডাক্তার আমাদের বাড়ি এলো। এলো আর গেল —কেউ কিছু কিনারা করতে পারল না।

ভারি রাগ হয় আমার! খাই, আর না খাই, সে আমার খুশি কিন্তু খিদে হবে না কেন? খিদের আপত্তিটা কিসের? বাধাটাই বা কোনখানে? সবারই খিদে হয়, মানুষ-মাত্রেরই হয়—জন্তু-জানোয়ারেরও হয়ে থাকে, কীটপতঙ্গরাও বাদ যায় না—আমি কি তবে একটা জীবের মধ্যেই গণ্য নই?

রাগ থেকে আসে তখন বৈরাগ্য! দূর, যখন মানুষের মধ্যেই নই, ইতরপ্রাণীর মধ্যেও না—তখন ইতর-ভদ্রের যে-সবে দরকার, কি দরকার আমার তাতে? কি হবে এই বাড়ি-ঘরে, এতবড় বাড়িতে—এই টাকার কাঁড়িতে? এতো টাকাকড়িরই-বা কি প্রয়োজন আমার? খাবার জন্যেই তো পয়সা! খেলেই তো পয়সা খরচ! খাবো কি—খিদে পায় না আমার—খিদের নাম-গন্ধই নেই! তবে?

ধুত্তোর! ঝোঁকের মাথায় সব দানখয়রাত করে বসলাম। বাড়িখানা দিয়ে দিলাম এক অনাথ-আশ্রমে! আর নগদ যা-কিছু এক নামজাদা মঠের সেবাশ্রমে — শ্রীশ্রীঅমুকের নামে, তাঁদের নিজেদের সেবার জন্যে।

ব্যস্, এইবার নিশ্চিন্ত! পকেটেও নেই একটা পয়সা, পেটেও নেই কোনো ধান্দা। সটান এক পার্কে গিয়ে উঠি। হ্যাঁ, পার্কেই। দিনের বেলাটা ঘুরে-ফিরে, আর রাত্রে ওখানকারই এক বেঞ্চে ঘুমিয়ে, এখন পার্কে হাওয়া খেয়ে বেশ আরামেই কাটবে আমার।

হ্যাঁ, মিথ্যে নয়, হাওয়া যথার্থই একটা খাদ্যের মধ্যেই। বিনেপয়সায় এনতার মিললেও কেন যে লোকে এত খরচপত্তর করে, এত তোড়জোড় করে, এত সোরগোল করে, এমন ঘটা করে এদেশে-সেদেশে এই হাওয়া খেতে দৌড়ায়, বুঝতে পারি এখন। একরাত্রের বায়ুভোজনেই কেমন যেন ফুর্তি লাগে! বেশ হালকা ঝরঝরে মনে হয় শরীরটা! বাঃ, বেশ তো! বেড়ে মজাই তো! এই হাওয়া-খাওয়াই তো ভাল!

কিন্তু রোদ-বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পেটের মধ্যে একটা যাতনা বোধ করি। কেমন একটা সূচীভেদ্য যাতনা! পেটের মধ্যে যেন ছুঁচ ফুটছে টের পেতে থাকি।

প্রভাত—আমাদের পাড়ারই প্রভাত—ভারী খাদ্যবাগীশ ছেলে! পাতায় করে কি একটা যেন চাখতে চাখতে পার্কে এসে ঢোকে। হরদমই দেখি তার মুখ চলছে, চলছেই ভর্‌দম্‌।

আমি লোলুপ-দৃষ্টিপাত করি ওর দিকে—'কি খাওয়া হচ্ছে হে?'

'আলু-কাব্‌লি। খাবেন?' ওর নিস্পৃহ নিমন্ত্রণ।

'দেবে? তা দাও একটু! খেতে পারবো কি? খাওয়া টাওয়া আমার সয় না আবার। তবু দেখি চেষ্টা করে।'

নিই একটুখানি। 'বাঃ, বেশ তো খেতে! দিব্যি তো খাসাই! কি বললে? আলু-কাবুলি? চমৎকার জিনিস তো! আছে আর?'

'উহু।' পাতাটা চটপট চেটে নিয়ে সে বলে—'খাবেন? আনবো আরো? তবে দিন—দিন দুটো পয়সা। মোটে দুটোই দেবেন? চারটেই দিন না! অনেকখানি হবে তাহলে।'

পয়সা? হায়! পয়সা আমার কই! যখন পয়সা ছিল, তখন কি জানতুম যে, এমন সব উপাদেয় খাদ্য আছে এই ধরাধামে। আর এতই সস্তাদামে? খাবার ইচ্ছাই ছিল না তখন আমার, সন্ধানও পাইনি তাই। প্রভাতও তখন উদয় হয়নি আমার জীবনে।

'না থাক। খেলে আবার হজম করতে পারবো কিনা, কে জানে।'

'কী যে বলেন! খেলে আরু খিদে বাড়ে। আরু খেতে ইচ্ছে করে। সত্যি বলছি অসুখ করে না পর্যন্ত' আলু-কাবলির ওকালতি আর থামতে চায় না ওর।

আমি পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ি এবার শহরের হাওয়া খেতে। স্রেফ হাওয়া খেলেও মাঝে মাঝে মুখ বদলে না নিলে চলবে কেন? একরকমের হাওয়া কি ভাল লাগে সব সময়ে? হাওয়া খাওয়াতেও অরুচি ধরে যায়!

আমার সেই ভূতপূর্ব বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই পুরানো দারোয়ানের সাথে মুলাকাত। প্রকাণ্ড একটা বর্তনে, একগাদা হলদে গুঁড়ো নিয়ে ভারি দলাই-মলাই লাগিয়েছে সে।

'পাঁড়েজি, ও কি বানানো হচ্ছে তোমার?'

'সাত্তু বাবুসাহেব!' বসতে পিঁড়ি দিয়ে সে বলে! আমি বসি।

'সাত্তু? সে আবার কি জিনিস? কি করবে ও দিয়ে?'

'আপনারা যে কেছাতু বোলেন না? হামলোক ওই-কেই সাত্তু বোলে বাবুজি।' দারোয়ানজী প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে দেয়। একেবারে প্রাণ-জল-করা ব্যাখ্যা!

'ছাতু? সেতো ছাত থেকে পড়লেই হয় জানি!' আমি অবাক হই। 'আর ছাতু হলেই মানুষ আর বাঁচে না। তক্ষুনি মারা যায়।'

'মানুষ মোরবে কেনো বাবুজি? কেতো কেতো লোক এই সাত্তু খাকে জিন্দা আছে। কেতনা আমীর-ওমরাভি!

'বলো কি? তোমার ও-কি খাবার জিনিস নাকি? বটে?'

'আলবোৎ খাবার জিনিস। বহুৎ উম্‌দা খানা। বঢ়িয়া। আপনি তো খাবন্ না, আপনাকে তো ভুখ্ না লাগে, নেহি তো হামি আপনাকে দিতম আরাসে। খাইয়ে দেখতেন!'

'না-না—খাবো না কেন? নতুন জিনিস খেতে কার না সখ হয়? বেশ তো—দাও না একটু দেখি। খুব অল্প করে—জানো তো আমার খিদেই হয় না একদম। এর ওপরে আবার অগ্নিমান্দ্য হলে আর বাঁচবো না!'

প্রথমে একটু চাখি। বাঃ! খাসা তো! আলু-কাবলির চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়। তারপরে আরো একটু—বাঃ! তোফাই! উম্‌দা চীজই বটে, আমীর-ওমরাদের আর অপরাধ কি—দস্তুরমতই চোস্তো খাবার। দোষ তো আর দেওয়া যায় না তাদের।

ক্রমশ ওর সমস্ত খোরাকটাই ফাঁক করে আনি, থোড়াই পড়ে থাকে বর্তনে। আমার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। উৎসাহ জাগে কেমন! এতক্ষণে পেটের সেই অদ্ভুত জ্বালাটারও যেন অনেকখানি লাঘব হয়ে আসে; আর, কেন জানি না, ভারি ভাল লাগতে থাকে।

বেশ লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে পড়ি। এঃ, আজ এ কি হয়েছে আমার? খালি খালি খাবার ইচ্ছে, যা দেখছি সামনে, আশেপাশে, দোকানের হাতায়, হকারের মাথায়—ছেলে-পিলেদের হাতে অব্দি।

এরকম তো আমার করে না কোনোদিনও! শ-খানেক টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরুতে পারলে দুনিয়ার খাদ্যসম্ভার আর আমার পকেটের ভার এতক্ষণে হালকা করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু হায়! কানাকড়িটাও ট্যাঁকে নেই আজকে।

এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে উঠি—'আমাকে কিছু খাওয়া না ভাই।' বলেই ফেলি অকাতরে। 'বড্ডো খিদে পেয়েছে।'

'হ্যাঁঃ, তুই আবার খাবি! তুই খাস নাকি!' অম্লানবদনেই সে বলে—'ইয়ার্কি করছিস। তোর নাকি আবার খিদে পায়। হুঁঃ।'

বন্ধু আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে।

'হ্যাঁরে, ভারি খিদে পেয়েছে ভাই—পাগলের মত খিদে। সত্যি বলছি তোকে কেন জানি না, খালি খালি খিদে পাচ্ছে আজ।'

'বললেই হলো।' সে আমায় হেসেই উড়িয়ে দ্যায়। 'হ্যাঃ, কোনোদিন এই চর্মচক্ষে তোকে খেতে দেখলুম না, তুই আবার খাবি। যা-য্যাঃ। ঠাট্টা করছিস, বুঝেছি।'

দ্বিতীয় আরেক বন্ধুকে পাকড়াই ফিরতি-পথে। অনুরোধের উপক্রমেই সে বলে ওঠে—'খাবি? এই তো কথা? তা বললেই তো হয়। খাওয়া তো পড়েই রয়েছে। গদাম্—গদাম—গুম্।'

আমার পিঠের উপর ওর খাদ্যের অকাল-বর্ষণ শুরু হয়। দস্তুরমতন অখাদ্যই। দোস্তের মতন নয়!

উপরোধে ঢেঁকি গেলা যায় বলে, কিন্তু এরকম ঢেঁকির পাড় পিঠের ওপর সয় বা কার?

তারপর আর কোন বন্ধুকে উপরোধ করি না। অবারিত পৃষ্ঠদেশ নিয়ে সে-কথা ভাবতেই ভয় খাই। সোজা ফিরে আসি আমার আস্তানায়। আমার সেই পার্কে।

এসে জলবায়ু সেবন করি। মাঠের হাওয়া আর পার্কের ঘাটের জল। কিন্তু কেবল জলবায়ু সেবা করে কতদিন—কতক্ষণ আর টেকা যাবে, কে জানে। খাদ্যহিসেবে বেশ উপাদেয় হলেও হাওয়াই যথেষ্ট কিনা, সে বিষয়ে স্বভাবতই আমার সংশয় জাগছে এখন। মনে হয় বেশিদিন কিংবা বেশিক্ষণ আর সংশয়াকুল থাকতে হবে না। অধিক আর বিলম্ব নেই, চরম খাদ্যই খেতে হবে আমাকে। খাবি, খাবি, খাবি—বারবার করে বলে গেছেন বাবা। বাবার সেই কথাই শেষ পর্যন্ত রাখতে হবে আমায়। খাবিই খেতে হবে হয়তো।

আস্তে আস্তে ভাঙো

এমন এক-একটা দুঃসংবাদ আছে, যা আস্তে আস্তে ভাঙতে হয়। নতুবা, যার কাছে ভাঙবার, তাকে যদি একচোটে বলে ফেলো, সে নিজেই ভেঙে পড়তে পারে। তাকে আস্ত রাখাই কঠিন হবে তখন। এই ধরো না কেন, কেউ হয়ত লটারীতে লাখখানেক পেয়ে বসেছে। তাকে কি ঝট করে সে কথা বলতে আছে কখনো? যদি বলো, সে টাকা আর তার ভোগে লাগবে না; তার শ্রাদ্ধে, বারো ভূতের ভোজেই বেরিয়ে যাবে সব, সেইটেই সম্ভব।

শোনা যায়, কবে কোন এক সহিস নাকি ডার্বি জিতেছিল, এবং তার সাহেব, সে খবরটা, না—না—সহজে বেঁফাস করেননি—সইয়ে সইয়েই বলেছিলেন। প্রথমেই একচোট—শঙ্কর মাছের হুইপেই—দস্তুরমত এক দফা তাকে চাবকে নিলেন; তারপর, যখন সে প্রায় আধমরা—যায়-যায় অবস্থা তার, তখন তার কাছে চাবকানির অর্থ ব্যক্ত করলেন! এবং সে অর্থ খুব সামান্য নয়—ডার্বির ফার্স্ট প্রাইজ, বুঝতেই পারছো। দুঃখের বিষয়, আমার কোনো শত্রুও, ভুলেও কখনো ডার্বি জেতে না যে, মনের সুখে কসে গিয়ে ঘা-কতক তাকে বসাতে পারি,—মনের দুঃখ মিটিয়ে নিই।

ডার্বির ফার্স্ট প্রাইজ কোন শত্রুতে, কিংবা কোন বন্ধুতেই মেরেছে (বন্ধু মারলেই বা ক্ষতি কি?) এটা সত্যিই খুব শোকাবহ সংবাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু মাসতুতো ভাইয়ের খুড়শ্বশুর মারা যাওয়ার খবরটাই কি তার চেয়ে কিছু কম শোচনীয়? অথচ সেই দুঃসংবাদটাই টেলিগ্রামের মারফতে এইমাত্র আমার হাতে এসেছে। নকুড়ের খুড়শ্বশুর আর ইহলোকে নেই! এবং নকুড় যে-রকম শ্বশুর-কাতর, খুড়শ্বশুর-অন্ত প্রাণ, সে কেবল আমিই জানি। কি ভাগ্যিস তার খুড়তুতো শালার পাঠানো তারটা, তার হাতে না পড়ে, আমার হাতে এসে

পড়েছিলো ! নয়তো এতক্ষণে সে হয়তো হার্টফেল করেই বসেছে, কিংবা, খুড়শ্বশুরের সহমরণে যাবার জন্যে সাজগোজ করতে লেগে গেছে অথবা মানে—এতক্ষণে অভাবিত কিছু একটা বাধিয়ে যে বসেছে, তার ভুল নেই আর ! নকুড় যে রকম সেনসিটিভ—একটুতেই যে রকম—! তার ওপরে আবার খুড়শ্বশুরের ওপর যা টান ওর !

যাক, ভগবান বাঁচিয়েছেন খুব ! তারটা তার হাতে না পড়ে আমার হাতেই পড়েছিল। এখন আমায় অতীব সুকৌশলে এই খবরটা ওর কাছে ভাঙতে হবে, যাতে আকস্মিক বিয়োগ-ব্যথায় বিমূঢ় হয়ে নিতান্ত নাজেহাল হয়ে না ভেঙে পড়ে ও। খুড়শ্বশুর হানি—নেহাত সামান্য ক্ষতি নয়তো ! শোকাতুর হবার কথাই বইকি ! তাঁর আওতাতেই ও ছোটবেলার থেকে মানুষ—যে-বয়সে ওর খুড়তুতো জামাই হবার অতি দূর সম্ভাবনাও কেউ সন্দেহের মধ্যে পোষণ করেনি সুদূরপরাহতই ছিল—এমন কি, জামাই হওয়া দূরে থাক, জামা-ই গায়ে দিতে শেখেনি যে বয়সে, তখন থেকেই তাঁর খড়ম পায়ে তাঁর গড়গড়ার নল মুখে লাগিয়ে তাঁর বিছানার গড়াগড়ি দিয়েও মানুষ ! এহেন খুড়শ্বশুরের অহেতুক খরচ—দুঃখের খাতায় গিয়ে কি রকম জমাট বাধবে, ভাবতে পারাই দুষ্কর। নাঃ. খুব আস্তে আস্তেই ভাঙতে হবে কথাটা—বেশ কায়দা করেই—যাতে এত বড় ক্ষতিকে ও ক্ষতি বলেই না গ্রাহ্য করে ; বরং সব দিক খতিয়ে, সমস্ত বিবেচনা করে, ভগবানের ওই মারকে লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ মারার মতই নিদারুণ লাভের ব্যাপার বলে ঠাওরাতে পারে, সেই ভাবেই কথাটা পাড়তে হবে তার কাছে।

পাড়বো তো বটে কিন্তু পাড়ি কি করে ? ওর খুড়শ্বশুরের আর কি বলা নেই কওয়া নেই. হট করে গেছেন—অম্লানবদনে নিজের ভবলীলা সম্বরণ করে বসে আছেন ! কিন্তু ওঁর এই হটকারিতার ধাক্কা অপরে সামলাতে পারবে কিনা, বিশেষ করে তাঁর খুড়তুতো—না কি, ভাইপোতুত জামায়ের পক্ষে তা কতদূর শোচনীয় হবে, সে কথা ভাববার অবকাশও হয়তো তিনি পাননি—কিন্তু নকুড়ের খুড়তুতো শালাকেও বলিহারি ! সেও কিনা বিনাবাক্যব্যয়ে তক্ষুনি এক টেলিগ্রাম করে—টেলিগ্রামের একটি মাত্র বাক্যে— খুব সংক্ষেপের মধ্যেই—এতবড় একটা মর্ম্মন্তুদ খবর এক লাইনেই সেরে দিয়েছে ! তার এক কিস্তিতেই যে কেউ মাত হতে পারে, সেদিকে মাথা না ঘামিয়ে !

সেই এক বাক্য—একটি মাত্র বাক্যই—সেই এক সেনটেনসই যে একজনের বেলায় ডেথ সেনটেনস হতে পারে সে খেয়াল ছিল তার ?

বাস্তবিক, আশ্চর্যই এরা ! অদ্ভুত এদের কার্যকলাপ ! মর্মভেদী কাণ্ড-কারখানা সব—যার মর্মভেদ করাই কঠিন !···কিন্তু আমাকে কী ফ্যাসাদে ফেলেছে ভাবো দিকি একবার—কী মুস্কিলই যে বাধলো এখন ! ওঁদের আর কি, ওঁরা তো চট করে সেরেছেন সরেছেন নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন, বলতে কি ! কিন্তু আমার অত চটুকারিতা নেই। আমার পক্ষে তো ওঁদের মতো এমন ব্যস্তবাগীশ হওয়া চলবে না, আমার একটা দায়িত্ববোধ আছে, কাণ্ডজ্ঞান হারাইনি আমি, আমাকে আস্তে আস্তে, যেমন করে পেঁয়াজের খোসা

ছাড়ায়, তেমনি করে খবরটার খোলা যতো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে, ধীরে ধীরে সব খোলসা করতে হবে।

মাথা ঘামাতে লেগে গেছি, দস্তুরমতই লেগেছি—এমন সময়ে, ভাল করে মাথা ঘামতে না ঘামতেই, নকুড় এসে হাজির! আমি টুক করে টৌলখানা গেঞ্জির তলায় লুকিয়ে ফেলি।

'এই যে, নকুড় যে। কি মনে করে হঠাৎ?' কাষ্ঠহাসি হেসে আমি কই।

'কি মনে করে—তার মানে?' নকুড় বেশ অবাক হয়ঃ 'এই তো একটু আগেই তোমার সঙ্গে কথা কয়ে মেট্রর ম্যাটানি শো-র দুখানা টিকিট কাটতে গেলাম।—আর এখন বলছ, কি মনে করে? কেটে ফিরছি এই। তার মানে?'

'ও, তাই নাকি? তাই তো! হ্যাঁ, তাই তো বটে!—' আমাকে একটু অপ্রস্তুত হতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে, আমাকে যে প্রস্তুত হতে হবে সে কথাটাও আমার মনে পড়ে যায়।

'তা বটে, তা বটে। তা, টিকিট কিনে ফেলেছো নাকি? আমি বলছিলাম কি, বায়োস্কোপটা আজ না দেখলে হতো না?'

'বাঃ চার্লি চ্যাপলিন যে!' নকুড় বলে কেবল। ওর বেশি বলার সে প্রয়োজনই বোধ করে না। 'চার্লির কীড।'

'ওঃ! তাই নাকি? চার্লি চ্যাপলিন? তাহলে তো তো—তাইতো বটে! তাহলে আর কি করে কী হয়? তাহলে তো অবশ্যই—বিড এ ম্যান গো টু দি কীড (ফার্স্ট বুকের পড়াও যে ভুলিনি এখনো, তার জানান দি) সে ম্যান আর আমি—হ্যাঁ আমি ছাড়া কে আর? বলছিলাম কি, আজকের দিনটা গীতা পাঠ করে কাটালে কেমন হতো?'

'গীতা!'

নকুড়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। ও একেবারে আকাশ থেকে পড়ে, আমার ইজিচেয়ারটার ওপরেই পড়ে। কোথায় চার্লি, আর কোথায় গীতা। এতখানি ফারাক—উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুর মধ্যেকার চাইতেও বেশি—ওর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সে ধারণাই করে উঠতে পারে না। অনেকক্ষণ বিহ্বলের মতো থেকে অবশেষে সে বলেঃ 'তুমি বলছ কি?'

—'তাই বলছিলাম…' আমি বলতে যাই।

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো?' সে বলে বিস্মিত হয়েই।

কিন্তু ততক্ষণে আমি তাক থেকে গীতাকে পেড়ে এনেছি, এবং ওর কোন-খানটা থেকে শুরু করব, মানে—ওর কোনখানটায় যে সেইখানটা আছে—সেই কথার মনে মনে তাকনি করছি…কোথায় ঠিক খুলতে হবে—কোন জায়গায় যে শ্রীভগবানের সেই সব মোক্ষম বাণী লুক্কায়িত রয়েছে—সেই সব অমোঘ উপদেশ—দুঃখশোকের অব্যর্থ দাবাই—সংস্কৃত শ্লোকের দুর্ভেদ্য এই অরণ্যের ভেতর থেকে, বিনা রোদনে খুঁজে পাবো কি পাবো না—ইত্যাদি সংশয়ে জর্জর হয়ে ঝরঝর করে পাতা উল্টে যাচ্ছি—পাতার পর পাতা—এমন সময়…

সত্যি, ভগবান কী জাগ্রত—কী দারুণ জাগ্রত যে—!

ভাল করে মেলতেই বইয়ের ঠিক জায়গাটাই গিয়ে ঠেলে বেরিয়েছে! নকুড়কে সম্বোধন করে তখনই আমি শুরু করি : 'গীতায় শ্রীভগবান কি বলেছেন শোনো—সম্বোধন করেই আমার উদ্বোধন শুরু : গীতায় শ্রীভগবান কি বলেছেন শোনো—শোনো আগে—'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ। এর মানে কিছু বুঝলে? বুঝতে পারলে কিছু? এর মানে হচ্ছে—'

বলতে বলতে নীচের সাদা বাংলায় প্রাঞ্জল-করা ব্যাখ্যার ওপর নজর বুলাই—নজরানা দিই···

'—মানে, এর মানে হচ্ছে, শস্ত্রসকল ইঁহাকে কাটিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে পারে না, এবং জল সকল?' আমার নিজের মনেই জিজ্ঞাসা জাগে : উঁহু, জল নয়, ওটা অশ্রুজল হবে, অর্থাৎ কিনা, কাহারো অশ্রুজলই ইঁহাকে ভিজাইতে পারে না, এবং বায়ু ইঁহাকে শোষণ করিতে—

নকুড় বাধা দেয়—'কি সব আজে বাজে বকছো! ইঁহাকে—কাহাকে? কি এসব যাচ্ছেতাই?'

'ইঁহাকে—কাঁহাকে? দাঁড়াও, দেখি।—' আবার তলার ফুটনোটে আমার চোখ ছোটে : 'ইহাকে, মানে, এই আত্মাকে! অর্থাৎ কিনা—' প্রাণ জল করা ব্যাখ্যায় ফের পরিষ্কার করে আমাকে পরিস্ফুট হতে হয় : 'মারা যাবার পর যা আমরা টের পাই। মানুষ মরে গেলেও যা টিকে থাকে। মানুষের ভেতরকার আসল সেই পদার্থ—অথচ আসলে যা কোন পদার্থ নয়—একেবারেই অপদার্থ—সেই বস্তুই হচ্ছে, সমস্ত ভ্যাজাল বাদে—একেবারে আদত জিনিস—সেই আত্মা—আসল সেই সোল—বুঝলে কিনা? এবং তাকেই কিনা অস্ত্র সকল কাটিতে পারে না, অগ্নিসকল পোড়াইতে পারে না, এবং জলসকল অর্থাৎ অশ্রুজলকণাসমূহ ভিজাইতে পারে না—'

'না পারল বয়েই গেলো!' নকুড় বলে আর বুড়ো আঙুল দেখায়। 'তার সঙ্গে আমার কি? আমাদের বায়োস্কোপ দেখায় কি সম্বন্ধ?'

নকুড়ের অর্বাচীনতা আমাকে কাহিল করে! তবুও সহজে আমি ঘাবড়াইনে—হাল ছাড়িনে চট করে—তার পরবর্তী শ্লোকে হোঁচট খাই : 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, গৃহ্লাতি নবানি নরোঽপরানি—'

নকুড় তেড়ে মারতে আসে এবার : 'জানি জানি। ওর সব জানি। তোমার চেয়ে ঢের ভাল জানি। ঢের ভাল মানে করে দিতে পারি। তোমার চেয়ে আওড়াতেও পারি ঢের ভাল। তোমার উচ্চারণ হচ্ছে না পর্যন্ত। গীতা আমি কখনো পড়িনি, তবে অনেক লেখায় ঐ সব কোটেশান পড়ে পড়ে হদ্দ হয়ে গেছি। ওর আগপাশতলা সব আমার মুখস্থ। তা—ও-সব শোলোকের সঙ্গে আমাদের মত লোকের—কি সম্পর্ক আমাদের? কেউ আমরা মরতে বসিনি। আমরা কিছু কলেবর ত্যাগ করে নতুন কাপড় পরতে যাচ্ছিনে হঠাৎ? তুমিও আজ মরছ না, আমিও না—তবে? তবে কেন?'

'তা বটে। সে কথা বটে। মরছিনে অবশ্যি।' আমি আমতা-আমতা করতে

থাকি ঃ 'কিন্তু মরতে কতক্ষণ ? কখন মরবো কেউ কি বলতে পারে ? মরলেই হলো। এই আছি—এই নেই ! সেজন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকা ভাল নয় কি ? বীরের মতন মরাটাই কি পুরুষোচিত নয় ? তাছাড়া—তাছাড়া কাল রাত্তিরে বিচ্ছিরি এক স্বপ্ন দেখেছি—'

'তুমি পটল তুলেছো ?'

'উঁহু, আমি না।'

'তবে আমি ?' নকুড় হো-হো করে হেসে ওঠে ঃ 'ছোঃ ! এই সব স্বপ্নে-টপ্নে আমার বিশ্বাস নেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার ওয়ার্ড অফ অনার দিচ্ছি তোমায়—তোমার দেয়ালে লিখে রাখতে পারো, আমি আজ মরবো না, কাল মরবো না, এ সপ্তাহে না, আগামী সপ্তাহে না—এ বছরে না, এ শতাব্দীতেই নয়। তুমি দেখে নিয়ো।'

নকুড় হেসেই উড়িয়ে দেয় এবং গীতাটাকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাক করে তার আগের তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় ফের।

'হ্যাঁ, অনেকে ওই রকম বলে বটে, কিন্তু মরতেও কোন কসুর করে না। আমার জানা আছে বেশ।' আমিও বলতে ছাড়িনে।

'আমাকে কি তুমি সেই ছেলে পেয়েছো ? আমি এক কথার মানুষ। তেমন মিথ্যেবাদী লায়ার পাওনি আমায়। আমার কথা তুমি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিয়ো—দেখে নিয়ো, প্রাণ থাকতে কিছুতেই আমি মরতে যাচ্ছিনে। তেমন ছেলেই নই আমি।'

এই বলে নকুড় আরেক দফা হেসে নেয়।

'হ্যাঁ, তুমি সিন্ধবাদের কাঁধের সেই বুড়ো, সেই আহাম্মোক বুড়ো, তা আমি বেশ বুঝেছি।' আমি কাঁধঝাড়া দিই। রাগে আমার চোখ করকর করে।

'ছিঃ ! মন খারাপ করে না। কাঁদে না, ছিঃ।' নকুড় রুমাল বার করে আমার চোখ মুছোতে আসে ঃ 'অশ্রুজল-সকল ইঁহাকে ভিজাইতে পারে না, সেকথা অবশ্যি ঠিক, কিন্তু ইঁহাকে পোড়াইতে পারে, এ-কথাও মিথ্যে নয়। তোমার ছলছলানো চোখ দেখে আমার মনের ভেতরটা—সেইখানেই তো আত্মা ? —পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ভাই ! আহা বাছারে !—' সে আমায় সান্ত্বনা দেয় ঃ 'কিন্তু ভাই অকারণ শোক করে তো লাভ নেই। আমার মতন বন্ধুর বিয়োগ তুমি সইতে পারবে না, তা জানি। কেই বা পারে ? কিন্তু আমি না মরতেই মারা গেছি ভাবছো কেন তুমি ?'

আমি মুখ টেনে নিই, চোখ মুছোতে এসে নকুড় আমার নাক মুছিয়ে দেয়।

'তোমার ভাবনাই ভাবছি কিনা আমি।—' বিরক্ত হয়ে আমি বলি। 'ভারী আমার গুরুপুত্তুর ! কী আমায় দায় ঠেকেছে।'

'তুমিও না, আমিও না, তবে কে আবার মরতে গেলো ?' নকুড় এবার সত্যিই বিস্মিত হয় ঃ 'তুমি আমি ছাড়া আবার কে আছে ? কার মরার স্বপ্ন দেখে তুমি এত কাতর হচ্ছো তাহলে ?'

'তোমার সেই খুড়শ্বশুর—' আমি আর ইতস্ততঃ করিনে,—'সে আর বেঁচে নেই।'

'দূর! তা কি হয়?' নকুড় চম্‌কে ওঠে।—'তা কি হতে পারে? এই সেদিনও চিঠি পেলাম শ্বশুর মশাই যথেষ্ট ভাল রয়েছেন, বহাল তবিয়তেই আছেন, আর এর মধ্যেই— ? দূর, তা কি হয়? অবশ্যি, দিনকতক থেকে তাঁর দেহ ভাল যাচ্ছে না, শরীর-গতিক সুবিধের নয়, একথাও কি লিখেছিলেন বটে—কিন্তু তা বলে এত শীগ্‌গির? না, না, অসম্ভব। ইদানীং একটু বাতেও ধরেছিল, ব্লাড-প্রেসারও বেড়েছিল নাকি, পক্ষাঘাতের মতোই হয়েছিল প্রায়, কিন্তু তবুও এত তাড়াতাড়ি তিনি আমাদের মায়া কাটাবেন, তা ভাবতেও পারা যায় না—'

দেখতে না-দেখতে ওর মুখচোখ কাঁচুমাচু হয়ে আসে: 'কেন, ভালমন্দ কোন খবর পেয়েছো নাকি? চিঠি-ফিঠি এসেছে কোন?'

'না। খবর আবার কি আসবে—চিঠি আবার পাবো কার?' আমি টাল্ সামলাই: 'বলছি না যে স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন অনেক সময়ে সত্যি হয়। এ-ধরনের স্বপ্ন প্রায়ই ফলে যায়। ফস্‌কায় না প্রায়, আক্‌চার দেখা গেছে। না, তুমি আমার মন খারাপ করে দিলে হে! খুড়শ্বশুর আমাকে অনাথ করে গেলে আমি আর বাঁচবো না—কী নিয়ে বাঁচবো? কার জন্য বাঁচবো কী জন্যে? বেঁচে কিসের সুখ? জীবনধারণে তখন আর আমার কী প্রয়োজন? অ্যাঁ?'

নকুড় একেবারে কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে। নাতজামাই না হয়েও নিজেকে অনাথ জামাই ভেবে কাঁদতে থাকে।

'পাগল কোথাকার!' আমি ওকে ভরসা দিই: 'স্বপ্নের কথায় কেউ আবার বিশ্বাস করে? ও কি সত্যি হয় কখনো? স্বপ্ন তো সব বাজে।'

'হপ্তাখানেক কোন চিঠি-পত্র আসেনি—সত্যিই তো! খবরটা নিতে হয় তাহলে। একটা টেলিগ্রাম করে দিই নটবরকে। আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম। প্রিপেড আর্জেণ্ট—কি বলো? সেই বেশ হবে? একেবারে প্রিপেড আর্জেণ্ট?'

'য়্যাতো তাড়াহুড়ো কিসের? খবর যখন আসেনি, তখন বুঝতে হবে যে, ভালই খবর। তোমার খুড়শ্বশুর দিব্যি আরামেই রয়েছেন।'

'না কি বলছো—চলেই যাই নেকস্‌ট্ ট্রেনে? ঢাকা পৌঁছতে কতক্ষণ আর? কি বল তুমি?'

'অবাক করলে নকুড়! সামান্য একটা স্বপ্নের ব্যাপারে তুমি এমন বেহুঁস হয়ে পড়বে ভাবতে পারিনি। আচ্ছা লোক তুমি যাহোক।'

'নাঃ, আমার কিছু আর ভাল লাগছে না। ভারি বিচ্ছিরি লাগছে সব। নাঃ, বায়স্কোপ আর যাবো না আজ—' বলতে বলতে নকুড় সিনেমার টিকিট-গুলো ছিঁড়ে কুটিকুটি করে—'যতক্ষণ না শ্বশুরের একটা সুখবর পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার সোয়াস্তি নেই।'

'দ্যাখোতো—দ্যাখোতো। আরে আমার টিকিটখানাও কুঁচিয়ে ফেললে যে,

বলি, আমার তো আর শ্বশুর মরেনি। আচ্ছা খ্যাপা লোক যাহোক। আর যদি মরেই থাকে নটবরের বাবা, তেমন মন্দ কী হয়েছে শুনি? তোমার দিক থেকে ভাবতে গেলে সত্যিই খুব দুঃখের, ভুল নেই, কিন্তু তাঁর দিকটাও তো দেখতে হয়। বুড়ো খুড়শ্বশুরের কথাটাও ভাবতে হয় তো? এই না তুমি বলছিলে, একে বাত, তাতে পক্ষাঘাত, তার ওপরে আবার ব্ল্যাড-প্রেসার—এত দুর্ভোগ নিয়ে এই দুর্যোগে কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে নিস্তার পাওয়াটা কি ভাল নয়? মরলেই তো আবার নতুন জন্ম, নব কলেবর ফের, আনকোরা নতুন-নতুন ফুর্তি আবার—গীতায় না বলেছে! ভেবে দেখলে আমারই তো মরতে লোভ হয়। এই ভাবে বেঁচে মরে না থেকে, মরে বেঁচে যাওয়াটা ভাল নয় কি?'

'অতো ভালয় আমার কাজ নেই। ভাল চাও তুমি মরোগে। আমার খুড়শ্বশুরের ভাল তোমায় করতে হবে না।' নকুড় রাগ করে।

'আমি আর কি করে ভাল করবো? আমি কি ডাক্তার? ডাক্তার-বদ্যি হলেও বরং কথা ছিল। একবার চেষ্টা করে দেখতাম—এক ওষুধেই সেরে দিতাম। মানে—সারিয়ে দিতাম—না না, সারিয়ে দিতাম, সেই কথাই বলছি।'

'আমি ভাল চাইনে—আমার নিজের খারাপ হোক, যারপরনাই মন্দ যা হবার তা হোক্, কিন্তু আমার খুড়শ্বশুর বেঁচে থাকুন।'

'অতো কষ্ট পেয়েও?'

'হ্যাঁ। একশো বছর। আরো একশো বছর। একশ বাহাত্তর বছর বেঁচে থাকুন তিনি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বর্ত্তে থাকুন। আমি মারা গেলে তবে যেন তিনি মারা যান, আমায় না তাঁর মরা মুখ দেখতে হয়, এই আমি চাই।' অম্লানবদনে নকুড় জানায়।

'তাহলে আর কী হবে!' আমি হতাশ হয়ে পড়িঃ 'তুমি যখন এমন স্বার্থপর! কিন্তু ভেবে দেখলে, কে কার বলো। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ! কার সঙ্গে কার কী সম্বন্ধ! কেই বা কার বাবা, কেই বা কার খুড়ো, আর কেইবা কার জামাই, ভাল করে ভেবে দ্যাখো যদি। আর আমি—এই আমি যদি আমার মাস্তুতো খুড়শ্বশুরের মৃত্যুশোক সইতে পেরে থাকি, বেশ সহাস্যবদনে সয়ে থাকি, তাহলে তুমিই বা কেন পারবে না? মানুষ তো তুমি? আর মানুষে কী না পারে! চেষ্টা করলে কী না পারে! চেষ্টা করলে কী না হয়! চেষ্টার অসাধ্য কী আছে?'

'তোমার শ্বশুর! সে আবার কবে মোলো!' নকুড় বিস্ময়াকুলঃ 'তুমি আবার বিয়ে করলেই বা কবে?'

'মাস্তুতো খুড়শ্বশুরের কথা বলছিনে?' আমি বুঝিয়ে দিইঃ 'তুমি আমার মাস্তুতো ভাই, সেটা ভুলে যাচ্ছো?'

'কিন্তু তোমার মাস্তুতো খুড়শ্বশুর তো সত্যিই মরেনি—' নকুড় প্রতিবাদ করেঃ 'তুমি তো স্বপ্ন দেখেছো শুধু।'

'স্বপ্নই তো দেখেছি!' আমি জানাইঃ 'কিন্তু মরলেও কোনো ক্ষতি ছিল

না! পরলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা জানো না তো! মরবার পরে কী অদ্ভুত আরাম যদি জানতে! সে যে কী আয়েস! এক দণ্ডও এখানে বাঁচতে না তাহলে! দাঁড়াও, 'পরলোকের কথা' বইটা পড়ে শোনাই তোমায়—'

'পরলোক আমার মাথায় থাক্! টেলিগ্রামটা করে আসি আগে।' নকুড় বেরিয়ে পড়ে। হু হু শ্বাসে বেরিয়ে যায়।

আমি ভাবতে থাকি, এটা কি খুব ভাল হলো? খবরটা না ভেঙে, এই ভাবে মচকে রাখাটা অনুচিত হলো না কি?

দুপুরের দিকে ফিরে এলো নকুড়। হাসি হাসি মুখেই ফিরলো। এসেই বল্ল: 'হ্যাঁ, পরলোকের কথা কি বলছিলে তখন? কই, বইটা পড়ে শোনাও তো শুনি। বৌ বল্লে, স্বপ্ন ফলে বটে, কিন্তু হুবহু ঠিক-ঠিক কখনো ফলে না; যার মারা যাবার স্বপ্ন দেখবে, সে মরবে না; তার কাছাকাছি আর কেউ অক্কা পাবে। তার মানে, খুড়শ্বশুরের কোনো ভয় নেই, যদি মরতেই হয়, তাঁর কাছাকাছি আর কে? আমিই আছি! আমিই মারা যাবো তাহলে। অতএব, পরলোকের হাল-চাল জানতে হলে আমারই তা জানা দরকার এখন।' নকুড় জানায়। সমুজ্বল মুখে জানায়, অকুতোভয় নকুড়! শ্বশুর-গদগদ নকুড়!

'পরলোকের কথা' বইটা খুঁজে বার করতে হয়। কিন্তু সেটা বেরোয় না; বিস্তর খোঁজাখুঁজির ফলে, ওর হিন্দী সংস্করণ, 'পরলোকাকি বাৎ' বেরিয়ে আসে। অল্প-স্বল্প হিন্দী যা জানি, তারই সাহায্যে, কথ্য বাংলা আর অকথ্য হিন্দীর সহায়তায় যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করে উৎরে যাই। ও উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে।

সমস্ত শুনে-টুনে নকুড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে: 'পরলোকটা নেহাৎ মন্দ নয় তাহলে, ইহলোকের চেয়ে ঢের ভালই দেখছি!'

'কি বলছিলাম তবে? সেই কথাই তো বলছিলাম তখন।' আমি ওকে উৎসাহ দিই।

'হ্যাঁ, মারা গেলে মন্দ হয় না নেহাৎ।' নকুড় বলে।

'আমি তো তাই বলছি হে! মারা পড়বার মতো আর কিছুই নেই। ভারী উপাদেয়, সে কথাই তো বলছি আমি। মারা যাওয়া অতিশয় ভাল—তোমার পক্ষে—আমার পক্ষে—তোমার খুড়শ্বশুরের পক্ষে—'

নকুড় ব্যাঘাত দেয়: 'না, না,—খুড়শ্বশুরের কথা বোলো না। তুমি-আমি মারা যাই ক্ষতি নেই, কিন্তু খুড়শ্বশুরেই বা নয় কিজন্য? তিনিই বা কেন এখানে একলাটি পড়ে থাকবেন? কী সুখেই বা পড়ে থাকবেন? তাঁকে ছেড়ে আমারই বা—আমিই বা সেখানে থাকবো কি করে?'

'তাই বলো? সেইটেই তো ভাবতে বলছি। আমি তোমার খুড়শ্বশুরকেও সঙ্গে নিতে বলছি, খুব মন্দ বলেছি কি?'

নকুড় নতুন করে ভাবতে থাকে। নতুন দৃষ্টি খুলে যায় ওর—ঢালের অন্য ধারটাও ওর নজরে পড়ে!

'খুরশ্বশুর ব্যতিরেকে জীবন-ধারণ যেমন বৃথা, মরণ-লাভও তেমনি ব্যর্থ। তবেই বোঝো।' আমি ওকে পুনরায় প্রণোদিত করি। মড়ার ওপরেই খাঁড়ার ঘা মারতে হয়—কি করবো? আগুনের-মধ্যে আগানো লোহাকেই তার গরমির মাথায় মারো। মারের চোটে বাগাও! তাই নিয়ম।

'তা বটে!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘাড় নাড়ে নকুড়—'তাই বটে!'

'তাছাড়া আরো দ্যাখো, মারা যাবার সুবিধাও অনেক;—এই আমার মাস্তুত খুরশ্বশুরের কথাই ধরো না! তিনি না-হয় বেঁচেই আছেন,—থাকুন তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু কিরকম অসুবিধায় ফেলেছেন তোমায়, ভাবো দিকি? কেমন আছেন, টেলিগ্রাম করে কখন খবর আসবে—হা-পিত্যেশে বসে থাকতে হচ্ছে। অথচ, তিনি মারা গিয়ে থাকলে আর কথাটি ছিল না। প্লানচেট করে কখন তাঁকে টেনে আনা যেতো—সশরীরেই টেনে আনা যেতো এখানে—সূক্ষ্মশরীরেই যদিও! তারপর যতক্ষণ খুশি তাঁর সঙ্গে আলাপ করো—বাধা ছিল না কোনো! দিন-রাত—দুবেলাই তাঁকে টেনে এনে গল্প জমাও কেন—আপত্তি কি? বাধা কোথায়? পরলোকের কথা নিজের কানেই শুনলে তো!'

'এখন খুড়শ্বশুরকে প্লানচেটে আনা যায় না এখানে?' নকুড় জিজ্ঞেস করে।—'এই এখনই।'

'এখন কি করে যাবে? জলজ্যান্ত বেঁচে যে এখনো!' আমি বলিঃ 'প্লানচেটে শুধু আত্মারাই আসতে পারে। জ্যান্ত মানুষ আসবে কি করে? জ্যান্ত মানুষের কি আত্মা আছে?'

'তা বটে! তাদের কেবল হাড় আর মাংস—তার ভেতরে আত্মা থাকলেও তার পাত্তা নেই।' নকুড়কে সায় দিতে হয়।

'তার ওপরে বাত আর পক্ষাঘাত—তা নিয়ে নড়াচড়া করাই দায়।' আমি যোগ করে দিই!—'নড়লেও খুব কষ্ট আবার।'

'তাহলে তোমার মতে আমার খুড়শ্বশুরের মরাটাই বাঞ্ছনীয়?' নকুড় প্রশ্ন করে। 'তুমি তো তাই বলছো?'

'আমি কিছু বলছিনে। তুমি যদি সদাসর্বদা তাঁকে হাতে-নাতে পেতে চাও, কাছাকাছি রেখে কথাবার্তা কইতে চাও সব সময়, তাহলে, তোমার দিক থেকে তুমি নিজেই ভেবে দ্যাখো না কেন!

নকুড় ভাবে। 'ভেবে দেখলে তোমার কথাটা ঠিক!' থেমে থেমে সে বলে।

'আমি কি আর বেঠিক বলি? ভাবো তো, কোথায় তুমি এখানে, আর কোথায় তোমার খুড়শ্বশুর—ঝাকড়দা-মাকড়দা—না কোথায়—ঢাকা পড়ে রয়েছেন! কতোদিন তুমি তাঁর কথামৃতে বঞ্চিত তাঁর সঙ্গসুখ লাভ করোনি কদ্দিন! তাঁর রূপসুধা পান করতে পাওনি। অথচ তিনি মারা যেতে পারলেই—আজকেই—এই মুহূর্তেই—তাঁকে তুমি নিজের হৃদ্দার মধ্যে আনতে পারো। তারপর মনের সাধে আলাপ জমাও—মন্দ কি?'

'বাস্তবিক ভেবে দেখলে অনেকদিন আগেই দেহরক্ষা করা উচিত ছিল ওঁর।' নকুড় বলে অবশেষেঃ 'এভাবে বেঁচে থেকে, দূরে সরে থেকে কি লাভ হচ্ছে

ওঁর ? তার চেয়ে—কিন্তু একটা কথা, মরব বল্লেই তো আর ঝট করে মরা যায় না ; মরলে তো উনি বাঁচেন, বুঝেছি ; কিন্তু মরবেন কি উপায়ে ? বাতে পক্ষাঘাতে তো পরমায়ু আরো বেড়ে যায় শুনেছি—ভাল বদ্যিরাও নাকি বধ করতে পারে না তখন ?,—তবে ? তাহলে ? তার পথ কিছু ভেবেছ ?'

নকুড়ের শেষ প্রশ্নে পথের দাবি !

'ভগবানের কৃপা থাকলে কি না হয় ? সবই হতে পারে। জ্যান্ত মাছেও পোকা পড়ে—তাঁর দয়ায় !' বলে কুক্ষিগত টেলিগ্রামখানা বার করে ওর হাতে দিই : 'মারে হরি তো রাখে কে ?

ওর সমস্যা-পীড়িত মুখমণ্ডল থেকে থেকে আলো বিকীরিত হতে থাকে : 'যাক, ভালই হয়েছে তাহলে ! একটা দুর্ভাবনা দূর হলো ! ফিরতি পথে একটা প্ল্যান্‌চেট্ নিয়ে ফিরলেই হবে ! তিনটে তো প্রায় বাজে, চলো এখন মেট্রোয় যাওয়া যাক ! নতুন করে টিকিট কেটে চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখিগে !'

শারদীয়ার অবকাশটা প্রায়ই আমি ঘাটশিলায় আমার ভাইয়ের কাছে কাটাতে যাই।

স্টেশনের থেকে কাছেই ঘাটশিলার ইস্কুল কাম কলেজ। আর, তার কাছাকাছি স্কুল-কলেজের হেড মাস্টার ওরফে প্রিন্সিপাল অর্থাৎ আমার ভাইয়ের আস্তানা। তখনো সে অবসর নেয়নি।

বছর কতক আগে সেখানে গিয়ে, বলতে কি, চমকাতেই হয়েছিল আমায়।

ওমা, একি! এত মাইল পেরিয়ে এসেও এই গণ্ডশহরে সেই কলকাতাকেই দেখি যে!

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে বাড়ির রাস্তায় পা বাড়াতেই হাজামজা জলাশয়টার পাশে রাস্তার ওপরেই এক মন্দির খাড়া দেখলাম!

এটাকে কই আগে কখনো দেখিনি তো! কবে গজালো?

ভুঁইফোড় ঠাকুরদের নিয়ে রাতারাতি দেবস্থান খাড়া করে মাতামাতি সেই কলকাতার ফুটপাথেই যা দেখেছি। সেই কলকাতাই কি অ্যাদ্দুর অব্দি এসে হামলা করতে লেগেছে নাকি? কী সর্বনাশ!

অতি ক্ষীণ ফুটপাথও ধারে কাছে নেই। সুবিস্তৃত জলাশয়ের পৈঠা ঘেঁষে সদ্যোজাত পীঠস্থানটি দাঁড়িয়ে। ফুটপাথেই যখন দেবতাদের পদপাত হয়ে থাকে তখন আশা করা যায় অচিরেই এখানে একটা ফুটপাথ গজাতেও দেখা যাবে।

অঘটন ঘটার দিন কাটেনি এখনও। দৈবলীলা সর্বত্রই প্রকট। সকালে যেখানে আজ দেবশিলা দেখে এসেছি সেইখানেই বিকেলে দেবীলীলা দেখা গেল।

পথচাওয়া আমাদের বাড়িটার বারান্দায় বসে রয়েছি। টুকটুকি বই বগলে ফিরল ইস্কুল থেকে-আফ্রক্‌মস্তক জলে ভিজে জবজব করছে। তার ওপর শ্যাওলার পলস্তারা জায়গায় জায়গায়। বালিকা শৈবালিকা হয়ে ফিরেছে।

আমি তো তাজ্জব! 'এই অবেলায় চান করেছিস যে? তোর দিদা না দেখতে পায় আবার! দেখলে সিধা করে ছাড়বে।'

ফ্রকটা নিঙড়ে সে জল ঝাড়তে থাকে।

'এই পড়ন্ত বিকেলে চান করতে গেলি যে বড়ো? তোর মা যদি দেখতে পায় না! যা, চটপট ফ্রক্‌টক্‌ বদলে ফ্যাল গে।'

'বন্ধুদের সঙ্গে ইস্কুল থেকে ফিরছিলাম না বড়দাদু? একজনকে যে উদ্ধার করতে হলো আমায়, করব কি?'

'আমাদের সাত পুরুষ তো উদ্ধার করেছিস! তার বাইরে ফের কাকে আবার উদ্ধার করতে গেলি রে?' অবাক লাগে আমার।

'সেও এক পুরুষ! এখনো পুরোপুরি পুরুষ না হলেও নেহাত বালকও না, বালক আর পুরুষের মাঝামাঝি।'

'এক নাবালক তাহলে। কি হয়েছিল শুনি তো?'

'ছুটির পর ইস্কুল থেকে ফিরছিলাম না বড়দাদু, বন্ধুদের একটু এগিয়ে দিয়ে ফিরে লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে মন্দিরটার পাশে আসতেই দেখি কি, একটা ছেলে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসেছে···'

'তোর নজরে পড়ল বুঝি?' আমি বলি: 'সে-ও নিশ্চয়ই এই ছিপছিপে মেয়েটির ওপর নজর দিতে ভুল করেনি?'

'তাই করতে গিয়েই তো এই কান্ডটা ঘটল দাদু···' টুকটুকি কয়: 'যেই না সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে গেছে আমার দিকে, অমনি না ঝপাং! জলের মধ্যে পড়ে গেছে বেচারা।'

'একেবারেই জলাঞ্জলি?' আমি বলি: 'মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে ছিলিস ছেলেটার বোধ হচ্ছে।'

'কী যে বলো দাদু। শহরের ছেলে হবে হয়ত, সাঁতার জানে না একদম, ঐটুকুন জলের মধ্যেই নাকানি চুবানি খাচ্ছে দেখে তখন বাধ্য হয়ে··'

'তুইও ঝপাং?'

'আমাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো, কি করব? চোখের ওপর তো জলজ্যান্ত ছেলেটাকে মরতে দিতে পারি না···'

'জল থেকে জ্যান্ত অবস্থাতেই তুলতে হয়। তা বটে।'

'জলে পড়েও সে মাথা ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিল আমার দিকে···'

'বারবার তুই তার মুন্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছিলিস বোঝা যাচ্ছে।' আমি বলি—'মুন্ডু না ঘুরলে···মুন্ডু না ঘোরালে বোধ হয় জলে পড়তো না সে।'

'জলে পড়ে সে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে পাছে ডুবে মরে তাই আমায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচাতে হলো শেষটায়।'

'বেশ করেছিস। সামান্য আমার নাতনি হয়ে তুই যে এমন বাঘা মেয়ে হবি তা আমার ধারণা ছিল না।'

'বারে! আমি বাঘা যতীনের নাতনি না? তোমার মতন বাঘা যতীনেরো তো!'

তাইতো বটে! তখন আমার মনে পড়ে যায়। আমাদের এক ভাইঝি বাঘা যতীনের ঘরেই তো পড়েছিল বটে, তাঁর ছেলে বীরেনের সাথে বিবাহসূত্রে জড়িয়ে গিয়ে। আর আমি···আরে, এই সেদিনও তো, একটা ছড়া লিখে দিয়েছি টুকটুকিকে···

বাঘা যতীন ছিল বাংলাদেশের রাজা,
শিব্রাম ছিল কোন্ ভ্রমে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে
নাতি ও নাতনি মাধ্যমে।

'যাক্ গে, তোকে দেখে যে উল্‌টে পড়েছিল তাকে জল থেকে তুলে সোজা পথে এনেছিস, বেশ করেছিস। কি হলো শুনি তারপর? জল থেকে উঠে প্রাণদানের জন্যে তোকে তার ধন্যবাদ জানালো ছেলেটা?'

'মোটেই না। একটা কথাও কইল না সে। দাঁড়ালোই না একদম। একবার চার ধারে তাকিয়ে না, ভোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল কোথায়! তাকে আর দেখতে পেলুম না। টিকিই দেখা গেল না তার আর।'

'পাবিও নে আর। মেয়ের হাতে উদ্ধার পেয়েছে একটা ছেলের পক্ষে এটা কম লজ্জার কথা হয়? পাছে সেটা কারো নজরে পড়ে যায় সেই লজ্জায় সে অমনি করে পালিয়েছে। যাক্ গে, যেতে দে! মেয়েদের জীবনে এমন কতই আসে। সারা জীবন ধরে কতজনকে এমনি উদ্ধার করে ডাঙায় তুলতে হয় তাদের। ও কিছু না!'

'গা ধুতে আমি কুয়োতলায় গেলাম।' বলে সে চলে যায়।

খানিক বাদে ওর মা আসেন—'শুনছো কাকু! দিনকে দিন টুকটুকি কী ধিঙি হচ্ছে যে···আজ নাকি একটা ছেলেকে··· ।'

'জানি। আগেই বলেছে আমাকে। মনে হয় আমাদের মুখ চেয়ে বসে না থেকে নিজেই সে স্বয়ম্বরা হতে এগিয়েছে—'

'কী যে বলো তুমি! মাথা নেই, মুণ্ডু হয় না।'

'এমনি করেই তো হয় রে! ও তো কাজটা আদ্দেক আগিয়েই রেখেছে, এখন আমাদের কাজ হলো ছেলেটাকে বাগিয়ে এনে ছাঁদনাতলায় খাড়া করে দেওয়া। যা হবার হয়ে গেছে, ওকে এখন আর বকাঝকা না করে স্যাক্‌রা ডাকার ব্যবস্থা করো বরং।'

'তাই হয় নাকি আবার!' বলে ওর মা গুম হয়ে চলে গেছে!

খুকির মুখের গুমোট দেখে আমায় ভেবে খুন হতে হয়।

ভাবনার কথাই বই কি! অভাবিতের কাল এসে পড়েছে। যা ভাবাই যায় না, কল্পনার অতীত, সেই সবই যেন এখন ঘটে যায়!

চিরকাল ধরে দেখে আসছি, বইয়েও পড়া, জলের মেয়ে উদ্ধারে ছেলেরাই এগিয়ে আসে ! তারপরে জল থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেরাই গিয়ে জলে পড়ে, অথই-এ থই না পেয়ে জীবনভর হাবুডুবু খায়, উদ্ধার পায় না আর ।

পানিথেকে গ্রহণ করার ফলে সেই মেয়েটিরই পাণিগ্রহণ করতে হয় শেষটায় । এড়ান ছাড়ান নেই তার । যা হবার হয়ে যায় । তাই মাথা পেতে মেনে নিতে হয় ।

কিন্তু এখানে কি রকম উল্টোধারা হয়ে গেল না ? অবশ্যি এ-যুগটাও পালটানো । উলট পুরাণের যুগই যেন এটা ! সেই পুরনো কাহিনীটা এখানে উলটে দেখা দিয়েছে ।

ফলে, দাঁড়াবেটা কী তাই ভাবি ! ছেলেরা উদ্ধার করলে তারাই পাণিগ্রহণ করত । কিন্তু এখানে মেয়ের হাতে কাজটা হওয়ায় কেমনটা দাঁড়াবে কী জানি ! মেয়েরা তো পাণিগ্রহণ করতে পারে না । তারা দয়া করে পাণিগৃহীত হয়ে ছেলেদের অনুগৃহীত করে ! কিন্তু এখানে ? এ কী বিতিকিচ্ছির উল্টোপাল্টা হয়ে গেল ।

এর পরিণতিটা পরিণীতায় গিয়ে ঠেকলে হয় ।

কিন্তু যাই হোক স্যাকরাকে তো ডাকতেই হবে শেষ পর্যন্ত !

কিন্তু স্যাকরা ডাকার আগেই এদিকে এক ফ্যাকরা বেরিয়ে বসেছে ।

ঘাটশিলার মতো অপোগণ্ড এলাকায়, সেখানে একটা ঘাটও আমার চোখে পড়েনি, কোনো শিলালিপিও কদাচ নয়, সেখানে যে রয়টার মার্কা, কোনো রিপোর্টার ঘাপটি মেরে থাকতে পারে তা আমি ধারণাও করিনি ।

ইস্কুলের একটা বাচ্চা মেয়ে কলেজের এক ছেলেকে উদ্ধার করেছে রটনা করার মতই ঘটনাটা বটে । এবং সেই সাংবাদিকের সৌজন্যে দেশে দেশে সেই সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে ।

আর তার পরই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত !

দিল্লী থেকে তলব এলো টুকটুকিকে নিয়ে সেখানে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সনদ নিয়ে আসার ।

কে এখন এই হিল্লী দিল্লী করে ?

টুকটুকির অভিভাবক বলতে আমার ভাই । সে তার ইস্কুল কলেজ নিয়েই ব্যস্ত । এক মুহূর্ত তার সময় নেই নিশ্বাস ফেলার । বিকল্প বলতে আমি ।

দিল্লির দরবারে গেলে দর বাড়ে জানি ! কিন্তু এই হিল্লী দিল্লী করার উৎসাহ আমার হয় না । তার উপরে এই উন্মাদন-রূপের গন্ধমাদন ঘাড়ে করে ! চতুর্দশীর চাঁদ সেই সমুদ্র মন্থনের পরে যেন ষোড়শীতেই উপচে পড়েছে হঠাৎ ।

কলকাতার বাইরে আমি কদাচই পা বাড়াই । বাড়ালেও আমার দৌড় ঐ ঘাটশিলা অব্দি ! ভূ-ভারত পরিক্রমা করার মতন অত পরিক্রম আমার নেই । দিল্লীকে দূরে রেখে তার লাড্ডুর মত না চেখেই আমি পস্তাতে চাই দিল্লী দূর-অস্ত ! আমার কাছে তিনি সেইরকম সুদূরপরাহতই থাকুন । তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে তাঁকে দুরন্ত করার বাসনা আমার কদাপি হয় না ।

কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডায়? নিতান্ত অনীহা সত্ত্বেও ইহা ঘটে যায়। টুকটুকির দৌলতে যাই-যাই দশা হলো আমার।

অবশেষে দেখি, ওকে বগলদাবা করে রাজধানী এক্‌সপ্রেসে একদিন আমি চেপে বসেছি!

রাজধানীর দরাজ পথে পা দিয়েই আমার প্রাণ খাই খাই করে উঠল। এখানকার না-খাওয়া লাড্ডুর জন্য পস্তাতে লাগলাম।

'দ্যাখ তো টুকটুকি? আশপাশে কোথাও কোনো লাড্ডু পেড়ার দোকান তোর নজরে পড়ে কিনা। ভালোমন্দ কিছু মুখে না দিলে তো বাঁচিনে ভাই!'

সে মুখ তুলে তাকায়—আমার মুখের দিকে।

'মুখে তো দেবে, এদিকে মুখের কি ছিরি হয়েছে তা দেখেছো? এক মুখ দাড়ি বেরিয়ে গেছে তোমার—এই এক রাত্তিরেই। এক মুখ ঐ নিয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে কি করে গো?'

'তাই নাকি, অ্যাঁ?' গালে হাত বুলোতে হয়—নিজের গালেই! 'তাই তো দেখছি রে। এই পশ্চিম মুলুকের আবহাওয়া এমনি যে রাতারাতি চেহারা ফিরে যায়। শাক-সবজির বাড়ও হয় বেজায়। অবশ্যি, গালের ওপর আমার সবজি আর নেই বোধ হয়, সবটাই এখন শাকাবহ।'

খাবার মাথার থাক, এখন দাড়িটাকে সাবাড় করা যাক। কোথায় দাড়ি চাঁছা সেলুন, নজর চালাই চারধারে।

নাপিত দেখলে যেমন নখ বাড়ে শোনা যায় তেমনি নখ বাড়লেও নাপিতরা নিজ গুণে দেখা দেন বোধ হয়।

নজর দিতেই চোখ পড়ে গেল রাস্তার পাশেই এক সেলুন! গোদের ওপর বিষফোঁড়া—বাঙালীর সেলুন তার ওপর। বাঙালী পরামাণিক, উত্তমরূপে চুল ছাঁটে ও দাড়ি কামায়—সাইনবোর্ডে স্পষ্টাক্ষরে জানানো।

'এই দাড়ি কামানো-ওলার কাছেই যাওয়া যাক। কি বলিস? কিছু তো কমাবেই।' বলে আমরা সেলুনের মধ্যে সেঁধুলাম।

'দ্যাখো বাবু, আমাদের এক মুহূর্ত টাইম নাই। চটপট দাড়ি কামিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। রাজধানীতে বিশেষ কাজে এসেছি আজ।'

'আপনাকে বহুৎ বোলতে হোবে না বাবু। রাজধানীর কাজ কামাই, কে না জানে? সবাই ইখানে কুছু না কুছু কামাবার মতলবেই হামেশা আসে। আমি যে এই ক্ষুর কাঁচি নিয়ে বসেছি—আমারো ওই কামাবার মতলব বাবু! কামাইয়ের কাজ আমারও।'

'বেশ বেশ! খুব ভাল। তুরন্ত তাহলে তোমার কাজটা সেরে নিয়ে ছেড়ে দাও আমাদের।'

'দেখুন না বাবু! আমি এক মিনিটে আপনার কাজ সেরে দিব। আমার ক্ষুর যেন রাজধানী এক্সপ্রেস্—বুঝলেন বাবু!'

তারপর আমি তার ক্ষুরের তলায় গাল গলা পেতে দিয়েছি।

দু গালে ক্ষুরের দু পোঁচ না টেনেই সে বলে উঠেছে—'খতম বাবু! হো গিয়া। দেখুন কেমোন হোয়েছে।'

সামনের আয়নায় তো দেখছিলামই, তার পরে গালের দুধারে হাত বুলিয়ে ভাল করে দেখি—

'এ কী কামালে হে! গালের সব জায়গা তোমার ক্ষুরের নাগালই পেলো না তো! একী হলো! দুধারে একবারটি করে টেনে দিলে—ব্যস্? চারদিকেই খোঁচা খোঁচা ঠেকছে—রয়ে গেছে দাড়ি। এ কি?'

'বললাম না বাবু, আমার ক্ষুর যেন রাজধানী এক্সপ্রেস। রাজধানী এক্সপ্রেস কি সব জায়গায় দাঁড়ায় হুজুর?'

ম্যাও ধরা কি সহজ নাকি?

ঘুম দিয়ে আমি মহাত্মা কুম্ভকর্ণকে হারাতে পারি না তা ঠিক; তিনি এক ঘুমে ছ-মাস কাটিয়ে দিতেন। তা হলেও আমি প্রায় তাঁর কাছাকাছিই যাই। এক ঘুমেই রাত কাবার হয় আমার।

ডাকাত পড়লেও আমার নাক ডাকার ব্যাঘাত ঘটে না নাকি! এমন কি দেখেছি, মানে, পরদিন সকালে উঠে আমি দেখেছি যে আমার ঘুমের ওপর দিয়ে ভূমিকম্প চলে গেছে তথাপি আমার ঘুমের ব্যত্যয় হয়নি। আশেপাশের বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে, পাড়ার সবাই দারুণ সোরগোল তুলেছিলো, কিন্তু ঘুম আমার টস্‌কাতে পারেনি।

এমন যে ঘুম আমার, তাও সেদিন মাঝরাতে ভেঙে গেলো আচমকা। ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায়।

ব্রামবাবু···ব্রামবাবু···ব্রামবাবু··· একটানা একটা আর্তনাদ ধাক্কা মারছিলো সদরে। ভেঙে ফেলছিলো যেন দরজাটা।

ব্রামবাবু? ব্রামবাবু আবার কে রে বাবা? কার এই নামডাক? ওই নামওয়ালা তো কেউ থাকে না এই বাসায়। তবে এই ঘুম-ভাঙানো ধুমধাড়াক্কা কিসের জন্যে?

চোখ মুছতে মুছতে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দেখি— শ্রীমান গোবর্ধন চন্দর!

'গোবরা ভায়া যে? এই রাত-দুপুরে? ডাকাত পড়ার মতন ডাক ছাড়ছিলে কেন? কি হয়েছে?'

'ঘুম বটে আপনার একখানা! আমার বৌদির ঘুমকেও টেক্কা মারে···বাবা! কম ডাক ছাড়ছি, কম হাঁক পাড়ছি আমি তখন থেকে? আমার গলা ভেঙে গেলো, আপনার ঘুম ভাঙার নামটি নেই।'

'তা তো হলো। কিন্তু রাম রাম বলে ডাকছিলে কেন ? আমি রাম নাকি ? আমি শিরাম না ?' ঘুমভাঙার চাইতেও নামের ভগ্নদশায় আমার রাগ হয় বেশি—'আমার শি গেল কোথায় ? শি ?'

'শি তো আপনার কখনো দেখিনি মশাই ! বৌদিকে আর দেখলাম কোথায় ? আপনার হি-ই দেখছি বরাবর।' বলে সে হি-হি করে হাসে ঃ 'অবশ্যি মাঝে এখানে এসে ইতুদি বিনিদিকে দেখেছি বটে, কিন্তু তাঁরা তো আপনার শি নন। বোনই তো আপনার রামবাবু !'

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আবার ওকে রাম বলতে শুনে ইচ্ছে করে ওর মুখের ওপরে দরজাটা দ্রাম করে বন্ধ করে দিই। কিন্তু সামলে নিয়ে বলি—

'তা তো হলো ! কিন্তু ব্যাপারটা কি ?'

'দাদা আসতে বললো আপনার কাছে...ছুটতে ছুটতে এসেছি...'

'কারণ ?'

'কারণ, বৌদি হাঁ করে ঘুমোচ্ছিলো তো ? একটা নেংটি ইঁদুর করেছে কি, সেই ফাঁকে না, বৌদির মুখের মধ্যে গিয়ে সেঁধিয়েছে...'

'অ্যাঁ ? কী সর্বনাশ !' আমি আঁতকে উঠি ঃ 'গলায় আটকে গেছে বুঝি ইঁদুরটা ? তারপর তাকে লেজ ধরে টেনে বার করা হয়েছে তো ?'

'লেজ-টেজ কিচ্ছু বেরিয়ে নেই, কি করে টানবো ?' গোবরা বলে ! 'আটকায়নি তো গলায় !'

'গলায় আটকায়নি ? যাক, বাঁচা গেলো।' আমি হাঁফ ছাড়লাম।

'গলায় আটকায়নি তলায় চলে গেছে সটান।' গোবর্ধন প্রাঞ্জল করে ঃ 'পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে একেবারে।'

'ও বাবা ! ...তা, তোমার বৌদি কি করছেন এখন ?'

'কিচ্ছু না। তেমনি ঘুমোচ্ছেন অকাতরে। পেটের ভেতরে যে একটা ইঁদুর ঢুকেছে তাও টেরও পাননি বোধ হয়। যা ঘুম বাবা বৌদির !'

'হ্যাঁ, ঘুম বটে একখানা !' মানতে হয় আমায় ঃ 'একেই বলে যথার্থ ঘুম। আমার ঘুমকেও টেক্কা দেয় বটে ! এরই নাম বোধহয় সুষুপ্তি।'

'সুষুপ্তি কি দুষুপ্তি জানিনে, দাদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। এই রাত-দুপুরে কি রাম-ডাক্তারকে পাওয়া যাবে ? আসবেন রাম-ডাক্তার ? চারগুণ ভিজিট দিলেও আসবেন কি ?' গোবর্ধন শুধায়।

'আসতে পারেন হয়তো। চেষ্টা করে দেখতে হয়।'

'তাই দাদা পাঠালেন আপনার কাছে। আপনি যদি চেষ্টা-চরিত্র করে কোনো রকমে...'

'চলো দেখা যাক।'

রাম-ডাক্তারের বাড়ির সামনে গিয়ে খাড়া হলাম আমরা। গোবরাকে বললাম —'সেইরকম একখানা ছাড়ো দেখি এইবার, আমার দরজায় যা ছেড়েছিলে ! রামবাবুর ঘুম কতটা প্রগাঢ় আমার জানা নেই তো।'

'কি ছাড়বো বলছেন ?'

'রামডাক। কিংবা দরজার উপর করাঘাত। কিংবা দরজাটার কড়া নাড়া—যা খুশি। বেশ কড়া রকমের একখানা ছাড়তে হবে।'

দরজার ওপর কোনো কড়াকড়ি না করে বাজপড়ার মতো কড়াক্কর আওয়াজ ছাড়লো গোবরা—'তারবাবু···তারবাবু···তারবাবু।···'

বেয়াক্তার হয়ে গোবরা বেয়াড়া ডাক ছাড়তে লাগলো।

আমি বাধা দিলাম—'ডাক ছাড়তে বলেছি বলে কি তুমি ডাক্তারের 'ডাক' ছাড় দিয়ে ডাকবে নাকি ? তার তার বলে ডাকলে হেনস্থা ভেবে ডাক্তারবাবু রাগ করতে পারেন।'

'বাঃ আপনি ডাক ছাড়তে বললেন না। তাই তো আমি ডাক ছেড়ে ছেড়ে···'

অবাক হয়ে যায় সে আমার কথায়।

ডাক্তারদের ঘুম স্বভাবতই ক্ষণভঙ্গুর। সব সময় কলের অপেক্ষায় বিকল হয়ে থাকেন বলেই এমনটা হবে বোধ হয়। খানিক না ডাকতেই ডাক্তারবাবুর মুখ বাড়ালেন দোতলার বারান্দার থেকে—'ক্যা ?'

'আজ্ঞে আমরা। কল দিতে এসেছি আপনাকে।' জানায় গোবরা।

'কী ব্যায়রাম ?' হাঁকলেন তিনি।

আমি যেন শুনলাম—কে ব্যায়রাম। 'আজ্ঞে কোনো ব্যায়রাম নয়। শিবরাম।' জানালাম আমি তখন।

'শিবরাম।' তো বুঝলাম—'রোগটা কি ?'

রোগটা কে ? এমনি যেন শুধোলেন আমার মনে হলো।

'আজ্ঞে হুঁ, ঠিকই ধরেছেন।' ঘাড় নাড়লাম আমি—'রোগই বটে। তবে আর-ও-জি-ইউ-ই রোগ। ওর নাম গোবরা। তস্য ভ্রাতা—'

'তস্য ভ্রাতা—সে আবার কি ?'

'আজ্ঞে, হর্ষবর্ধনকে জানেন তো ? হর্ষবর্ধনবাবু ? তস্য ভ্রাতা, মানে তাঁর ভাই শ্রীগোবর্ধন।'

'যাঃ! কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। নামছি, দাঁড়াও।'

নেমে তিনি তাঁর চেম্বারের দরজা খুললেন। ভেতরে ঢুকলাম আমরা। গোবরা বেশ বিশদ করে তার বৌদির ব্যাপারটা বললো।

'তোমার বৌদি কি করছেন এখন ?'

'তেমনি বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন—হাঁ করে···তেমনি।'

'হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন ? তা হলে এক কাজ করো, তাঁর ঐ হাঁ-করা মুখের সামনে ইঁদুরধরা কল পেতে রাখো একটা—ইঁদুরের খাবার দিয়ে কলটায়। খাবারের লোভে আপনি বেরিয়ে আসবে ইঁদুরটা।'

'তা তো আসবে কিন্তু অ্যাতো রাত্তিরে এখন কল পাবো কোথায় ? ইঁদুর-ধরা কল নেই তো আমাদের বাড়ি।'

'তা হলে এক কাজ করোগে। পাতে পড়ে থাকা রুটির টুকরো সুতোয় বেঁধে বৌদির হাঁয়ের সামনে নাড়তে থাকো, বুঝলে ? রুটির গন্ধ পেলেই···

এছাড়া তো বার করার কোনো উপায় দেখছি না আর। নিজগুণে যদি না বেরোয়...' বলে ডাক্তারবাবু নিজরূপে প্রকট হন—'রাত্রে আমার কলের ফী চার ডাবোল, তা জানো ?'

'জানি। তাই দেব আমরা।'

'বেশ। যাচ্ছি আমি খানিক বাদেই। তৈরি হতে আমার একটু টাইম লাগবে। তুমি গিয়ে ততক্ষণ রুটির টুকরোটা নাড়তে থাকো নাকের গোড়ায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে রুটির গন্ধ পেটে গেলেই, গন্ধ পেলেই বেরিয়ে আসবে ইঁদুরটা। আমার যাবার আগেই হয়তো বা।'

'আমি রুটির টুকরো নাড়ছি গিয়ে। আপনি আসুন। আপনি না এলে দাদা ভরসা পাচ্ছেন না।' বলে গোবরা ছুটতে ছুটতে চলে যায়। বলে যায় আমায়, ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

ডাক্তারবাবু সহ গিয়ে দেখি হর্ষবর্ধন বেশ একটা বড়ো সড়ো তেলাপিয়া মাছ ধরে তার বৌয়ের মুখের কাছে নাড়াছেন। জলজ্যান্ত তেলাপিয়া।

তেলাপিয়াটা নড়ছিল। তার ওপরেও তাকে ধরে তিনি নাড়ছিলেনন আবার। আর তাঁর বৌ ঘুমিয়ে যাচ্ছিলেন বেমালুম ··

'এই রাত্তিরে আপনি জ্যান্ত তেলাপিয়া পেলেন কোথা থেকে মশাই ?' অবাক লাগে আমার 'হাটবাজার তো সব বন্ধ এখন।'

'তেলাপিয়া আমাদের চৌবাচ্চায় জিয়ানো থাকে।' জানান তিনি ঃ 'আমার বৌ তেলাপিয়ার ভারি ভক্ত কি না।'

'আমি রুটির টুকরো নাড়তে বললাম না ?' ডাক্তারবাবু আবার আমার চেয়েও অবাক 'রুটির বদলে এই মাছ আমদানি করা হলো যে ? মাছের গন্ধে কি ইঁদুর বেরোয় নাকি ?'

'আজ্ঞে, হয়েছে কি, শুনুন তাহলে।' বলতে শুরু করলেন হর্ষবর্ধন, 'আমার বৌ হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল তো ? হাঁ করেই ঘুমোয় রোজ। ভারি বদভ্যেস। যাক গে, বৌয়ের মুখ বুজোয় সাধ্য কার ? ঘুমোয় হাঁ করে আর জেগে থাকলে হাঁ হাঁ করে···'

'জানি জানি। বৌদের চিরকালের হাহাকার জানা আছে আমার।' বাধা দেন ডাক্তার, 'আমি বলেছিলাম···'

'শুনুন না।' বাধা দিয়ে বলে যান হর্ষবর্ধন ঃ 'ইঁদুররা গর্তের থেকে বেরোয় জানেন বোধ হয় ? আর গর্তের ভেতরেই গিয়ে সেঁধোয় তাও আপনার জানা আছে নিশ্চয়···'

'কে না জানে !' আমার বাক্যব্যয়।

'এখন দেখছেন তো, বৌয়ের আমার কতো বড়ো হাঁ। অমন ফাঁক পেলে কতো মশা-মাছিই সেঁধিয়ে যায়, তো ইঁদুর···!'

'জানি জানি। ফাঁক পেয়ে সেঁধিয়ে গেছে ইঁদুরটা শুনেছি আমি। ভালো করে জানা আছে আমার।' অধীর হয়ে ওঠেন রাম-ডাক্তার।

'আর ইঁদুরটা সেঁধিয়ে যেতেই না আমি গোবরাকে পাঠিয়েছিলাম

আপনাদের খবর দেবার জন্যে। কিন্তু সে চলে যাবার পরেই হয়েছে কি...' বলতে গিয়ে হর্ষবর্ধন রোমাঞ্চিত হন: 'আমি কি জানি যে একটা বেড়াল ওদিকে ওৎ পেতে রয়েছে শিকার ধরবার জন্যে? তাক করে ছিল সে ঐ নেংটি ইঁদুরটাকে ধরবার জন্যে, তাকে দেখতে পেয়েই সে তাড়া করেছে। আর ইঁদুরেরা ভয় পেলেই গর্তের মধ্যে গিয়ে সেঁধোয়। সামনে হাঁ করা আমার বৌকে পেয়েই নিজের গর্ত মনে করেই হয়তো বা...'

'সেঁধিয়ে গেছে। জানা কথা। ছাড়ুন এ-সব। আসল কথায় আসুন।' রাম ডাক্তার ব্যায়রামের গোড়ায় যেতে চান।

'আর, তারপরেই ইঁদুরটাকে তাড়া করে বেড়ালটাও বৌয়ের পেটের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।'

'অ্যাঁ!' চমকে ওঠেন ডাক্তার: 'আস্ত একটা বেড়াল চলে গেল পেটের মধ্যে আর উনি টের পেলেন না আদৌ? ঘুম ভাঙল না ওঁর? বলেন কী!'

'এমনি ওঁর ঘুম মশাই। হাতি চলে গেলেও টের পাবেন কি না কে জানে।'

'ল্যাজ ধরে টানলেন না কেন বেড়ালটার তখন? তক্ষুনি তক্ষুনি।'

'গেছলাম টানতে, কিন্তু দেখলাম ল্যাজ-ফ্যাজ কিচ্ছু বেরিয়ে নেই। সব সমেত চলে গেছে পেটের তলায়। গলার এদিকে বেরিয়ে নেই কিছু; তাই গোবরা এসে যখন রুটির টুকরো নাড়বার কথা বলল, আমি বললাম, আর ইঁদুরের জন্যে ভেবে কী হবে, এখন বেড়ালটাকে বার করার দরকার। যা, চৌবাচ্চার থেকে একটা তেলাপিয়া ধরে নিয়ায়।' খোদার ওপর খোদকারি করার মতন হর্ষবর্ধন ডাক্তারের ওপর ডাক্তারি করার ব্যাখ্যা দেন তাঁর, 'তাই এই মাছটা ধরে মুখের কাছে নাড়ছি। আপনার প্রেসক্রিপশনটাই একটু পালটে নিলাম...বেড়ালটা বেরুলে সে ইঁদুরটাকে মুখে করেই বেরুবে তো!'

'রোগিণীর অবস্থা কেমন দেখি একবার।' রাম ডাক্তার তাঁর স্টেথিসকোপ বার করেন।—'এরকম রুগী এর আগে কখনো পাইনি। বিলকুল আনকোরা বিচ্ছিরি ব্যায়রাম।' মুখ বিকৃত করে তিনি জানান।

কিন্তু স্টেথিসকোপ তো বুকে বসাবার? অথচ তিনি সেখানে না বসিয়ে কলের চোঙটা মেয়েটির পেটেই বসান। অবাক লাগে আমার। এটা আবার কী হলো? এ-ধরনের খাপছাড়া চিকিৎসা কেন? না কি, বেখাপপা রুগী পেয়ে খাপপা হয়ে গেলেন ডাক্তার?

অবশ্যি, হৃদয় কারো কারো বেশ উদার হয়ে থাকে আমি জানি, কিন্তু উদর তা কখনই হয় না। মাঝখানে আ-কারের তারতম্য থেকেই যায়। তবে কি ইঁদুর-বেড়ালের পাল্লায় পড়ে বিগড়ে গিয়ে ইতর-বিশেষের জ্ঞান লোপ পেল ওঁর?

'যন্ত্রটা ওঁর পেটে বসাচ্ছেন যে?' না বলে আমি পারি না—সঙ্গে সঙ্গে 'কেমন বুঝলেন হার্টের অবস্থা?' বলে কথাটা ঘুরিয়ে ওঁর ভুলটা ধরিয়ে দিতে যাই।

'হার্ট' দেখছি না। ওঁর পেটের খবর জানবার চেষ্টা করছি।' বলেন রাম-ডাক্তার। 'কোন সাড়া পাচ্ছি না বেড়ালটার। ম্যাও-ট্যাও কিচ্ছু না।'

'ইঁদুরটার আওয়াজ পেলেন কোন ?' আমি জানতে চাই!

'ইঁদুর কি টুঁ-শব্দটি করতে পারে···বেড়ালের সামনে ?' আমার প্রশ্নে গোবরা হতবাক হয়ঃ 'বেড়ালের মুখের ওপর মুখ নাড়ার ক্ষমতা আছে ওর ?'

'তাছাড়া, সে কি আর পেটের মধ্যে আছে এতক্ষণ ?' জবাব দেন ডাক্তারবাবুঃ 'বেড়ালের পেটেই চলে গেছে কোন্‌কালে। আমি শুধু তাই বেড়ালটার ম্যাও ধরবারই চেষ্টা করছিলাম আমার এই স্টেথিসকোপ দিয়ে।'

'ম্যাও ধরা কি সহজ নাকি মশায় ?' আমি বলি, 'তারপর তো ধরে তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা···ঢের পরের কথা !'

পৈটিক জাস্‌টিস্‌ করার পর ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়ালেন নিজের ফীজের জন্য !– 'ওঁকে ওমনি ঘুমোতে দিন এখন—ঘুম ভাঙাতে যাবেন না যেন কেউ !' বললেন তিনি।

'ক্ষেপেছেন !' এক ক্ষেপেই নিজের জবাব সেরে দেন হর্ষবর্ধন।

'কে ভাঙাবে ওঁর ঘুম ?' বলতে গিয়ে শিউরে ওঠে গোবরাঃ 'ঘুম ভাঙলে বৌদি কি রক্ষে রাখবে নাকি কারো ?'

'না না, ঘুমুন উনি যেমন ঘুমুচ্ছেন—ডিসটার্ব করবেন না ওঁকে।' ডাক্তার বাতলানঃ 'রাতভোর ঘুমোন।'

'বেড়ালটার কী গতি হবে ?' আমি জিগ্যেস করিঃ 'ওটা কি ওঁর পেটেই থেকে যাবে নাকি ?'

'মেয়েদের পেটে কোন কথা থাকে না বলে না কি ? কিন্তু বেড়াল তো চাট্টিখানি কথা না।' বলে হর্ষবর্ধনবাবু স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন–'আস্ত একটা চারপেয়ে বেড়াল···'

'পেটের ভেতর গিয়ে নাচার হয়ে পড়েছে এখন বেচারা।' আমার ধারণা প্রকাশ করিঃ 'নাড়িভুঁড়ির গোলকধাঁধায় বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না বোধহয়।'

'পেটের মধ্যেই থাক। মেয়েদের পেটে কথা না থাকলেও এটা মনে হচ্ছে থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত। থাক্‌ গে !' ভিজিটের টাকা পকেটে গুঁজতে গুঁজতে রাম ডাক্তার ফাঁস করেন—'মেয়েদের পেটে কথা হজম না হলেও বেড়ালটা মনে হচ্ছে হজম হয়ে যেতে পারে।'

'কোন ওষুধ-টষুধ দেবেন না ?' হর্ষবর্ধন জিগ্যেস করেন তাঁকে।

'সেটা কাল সকালে উনি ঘুম থেকে উঠবার পর কেমন বোধ করেন সেটা জেনে তারপর।' ডাক্তারবাবু জানতে চানঃ 'কত ওজন হবে বেড়ালটার ? আন্দাজ ? সাত-আট কে-জি হতে পারে বলছেন ? সাত সের প্রোটিন ? বাবা ! এই গুরু ভোজনে গরহজম হতে পারে হয়তো। যদি চোঁয়া ঢেঁকুর-টেকুর মারে

তো একটু হজমি দাবাই দিতে হবে। নয় তো কড়া জোলাপ। তখন সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

ব্যবস্থাপত্র দেবার পর তিনি সযত্নে রোগিণীর মুখটা বুজিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হন। কিন্তু সহজে কি সেই হাঁ-কার বুজবার? প্রায় ছোট ছেলের মতই অবুঝ। অনেক চেষ্টার পর তাঁর হাঁ-কে না করানো যায়।

'মুখটা বুজিয়ে দিলেন যে?' জানার কৌতূহল হয় আমার।

'কী জানি, বেড়ালটার খোঁজে যদি কোন কুকুর এসে ঢুকে পড়ে আবার! এর ওপর কুকুর গিয়ে পেটের মধ্যে সেঁধুলে সে শিবের অসাধ্য হয়ে যাবে। সামান্য রাম ডাক্তার থই পাবে না তখন আর। মুখের দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম তাই, ওই কুকুরের রাস্তা বন্ধ করবার জন্যেই—বুঝলেন মশাই?'

কুকুরের দাবাই দিয়ে মুগুরের মতন মুখখানা ভারি করে রাম ডাক্তার নিজের বাড়ির পথ ধরেন।

চাঁদে গেলেন হর্ষবর্ধন

চাঁদে গেলেন—হ্যাঁ! তবে চন্দ্রলোকে নয়কো ঠিক, চন্দ্র নামক বালকেই বলতে হয়।

আমার ভাগনে চাঁদুকে নিয়েই তিনি গেলেন।

হয়েছিল কি, হর্ষবর্ধন খেদ করছিলেন একদিন—'এতটা বয়েস হলো কোন ছেলেপুলে হলো না, আমার এই বিরাট কারবার, এতো টাকা-কড়ি আমি মারা গেলে কে সামলাবে? ভাবছি তাই একটা পুষ্যিপুত্তুর নেবো···।'

'কেন গোবরা?' আমি বলতে যাই: শ্রীমান গোবর্ধন তো আছে?'

'গোবরা আমার সহোদর ভাই যে!' আমার কথায় তিনি যেন অবাক হন—'ভাইকে পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া যায় নাকি আবার?'

'তা কেন? আপনার অবর্তমানে কে দেখবে বলছিলেন! গোবরাই তো রয়েছে।'

'গোবরা কদ্দিন আর? আমার চেয়ে ক-বছরের ছোট ও? আমি মারা যাবার পরেও কি সে টিকবে আর? টেকেও যদি, কদ্দিন? বড়ো জোর দু-চার বছর? তারপর আমার এই বিষয়-সম্পত্তি··'

'না না, টিকবে বই-কি সে!' আমি বলি: 'যদিও আপনার টিককাঠের মতন নয় জানি, তাহলেও গোবরাকে আমার টিকসই মনে হয়। আকাঠ তো! আকাঠরা টেকে বেশ।'

'আপনি জানেন না। ও যে রকম দাদুভক্ত, আমি মারা গেলে আমার বিরহে ও আর বাঁচবে কি না সন্দেহ। না না, আপনি অনাথ বালক-টালক দেখুন মশাই!'

'অনাথ বালক?'

'হ্যাঁ, আমার বৌ দুঃখ করছিল, জীবনে মা ডাক শুনতে পেল না। মা

'মা' মধুর ধ্বনি শোনার ওর ভারী বাসনা। ওর এই বাসনা আমি চরিতার্থ করতে চাই। বেঁচে থাকতে থাকতেই। তাছাড়া আমারও শখ হয় না কি, ঐ সুমধুর ডাক শোনার?'

'মা-ডাক?'

'না না—মা কেন, বাবাই তো! ও তো তবু মধুর ধ্বনি শুনতে পায় মাঝে মাঝে, গয়লা ধোপা ফেরিওয়ালা সবাই ওকে মা বলেই ডাকে। কিন্তু আমাকে বাবা বলতে কাউকে শোনা যায় না। আমাকে বাবা বলবার কেউ নেই। আমি চাই আমাকেও কেউ বাবা বলুক। বাবা ধ্বনি শুনে জীবন সার্থক করে যাই। তাই, আমাদের একটি অনাথ বালক চাই।'

'কোথায় পাই!' আমি জানাই—'আচ্ছা, আমাকে হলে হয় না? আমি আর বালক নই যদিও, তা বটে, কিন্তু অনাথ ঠিকই। আমার মা-বাবা কেউ নেই—মারা গেছেন কস্মিন কালে। আমিই প্রায় বাবার বয়েস পেলাম বলতে গেলে!'

'আপনি হবেন পুষ্যিপুত্তুর?' চোখ তাঁর ছানাবড়া—'বাবা বলে ডাকতে পারবেন আমায়?'

'চেষ্টা করবো। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?' তাছাড়া···তাছাড়া···সেটা আর বেফাস করি না—মনেই আওড়াই, মহাশয়ের বিষয়-সম্পত্তির দিকটাও তো দেখতে হবে!

'লজ্জা করবে না বাবা বলতে? এতো বেশি বয়সে, বিলকুল পরের বাবাকে?'

'তা হয়তো করবে একটু। ভাববাচ্যেই ডাকবো না-হয়।'

'বাবার ভাববাচ্য হয় নাকি আবার?'

'হাবভাবে জানাই যদি? কিংবা যদি সমস্কৃত করে পিতৃ সম্বোধন করি··· যদি বলি, পিতঃ!'

'ভারী ইতরের মতো শোনাবে। পিত্তি জ্বলে যাবে পিতঃ শুনলে।' তিনি প্রায় জ্বলে ওঠেন: 'তাছাড়া যে জন্যে নেওয়া তাই তো হবে না আপনাকে দিয়ে। আপনি আমার ঢের আগেই খতম্ হবেন—যদ্দুর আমার ধারণা। আমাদের জলপিণ্ড দেবে কে? সেই জন্যেই তো লোকে ছেলেপিলে না-হলে পুষ্যিপুত্তুর নেয়—তাই না? আপনার সন্ধানে কোন বাচ্চা-টাচ্চা নেই কো?'

'তাহলে তো আমার ভাগনেদের মধ্যেই দেখতে হয়। তবে তাদের মধ্যে অনাথ কেউ নেই...একজন বাদ। সে বেচারার বাপ-মা নেই, থাকতে কেবল এক ডবোল মা।'

'ডবোল মা?'

'মানে, আমি—তার মা-মা। তাছাড়া কেউ নেই আর। তাহলেও সে একাই একশো—একশ্চন্দ্র স্তমো হন্তি···সেই চাঁদুকেই নিন না হয়।'

'চাঁদুর বয়েস কতো?'

'এই বারো কি তেরো। বেঁটে-খাটো।'

'কি রকম দেখতে?'

'ঠিক চাঁদের মতন। নাম শুনছেন না চাঁদু? চাঁদপানা চেহারা!'—আমি জানালাম।

তারপর বাড়ি ফিরে জপাতে বসলাম চাঁদুকেঃ 'হর্ষবর্ধনকে মাঝে মাঝে ডাকলেই হবে, তবে ওর বৌকে কিন্তু হরদম্। উনি সব সময় মা-ডাক শুনতে চান! যখন তখন মা-মা রবে সুমধুর স্বরে...পারবি তো?'

'ঠিক বেড়ালের মতন?'

'প্রায়। তবে অ্যা-কার ও-কার বাদ দিয়ে। ম্যাও নয়, মা কেবল। খাওয়া-দাওয়ার ভারী যুৎ রে ও-বাড়িতে। হরদম্ খেতে পাবি। সব রকম খাবার সব সময় মজুত।'

চাঁদুও খুব মজবুত ও-বিষয়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাজী।—'আর কী করতে হবে মামা?'

'তারপর হর্ষবর্ধন মারা গেলে, যদি আমি বেঁচে থাকি তখনো...তুই ওর টাকা-কড়ির সব্ মালিক হবি তো? আমাকে কিছু ভাগ দিতে হবে তার থেকে। বুঝেছিস?'

'তুমি বলছো কি মামা? ভাগনে কি মামাকে ভাগ দেয় নাকি কখনো? তুমি ভাগনের ভাগ নিয়ে বড়লোক হতে চাও?'

'দিবি না যে তা জানি। তা যাক্ গে, না দিস নাই দিস, নাই দিলি, তোর ভাগ্য ফিরলেই আমি খুশি। বাপ-মা মরা ছেলে তুই, আহা, অনাথ বালক!' আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

'অমন ফোঁস ফোঁস কোরো না মামা, তাহলে আমি কেঁদে ফেলবো কিন্তু।' সে বলে—'টাকার বখরা না দিতে পারি কিন্তু তোমার ওই গোমরা মুখ আমি সইতে পারি না। আমার প্রাণে লাগে।'

নিয়ে গেলাম ওকে হর্ষবর্ধনের কাছে। তিনি কিন্তু ওকে দেখে নাক সিঁটকালেন—'এই আপনার চাঁদু? চাঁদের মতন দেখতে? মুখময় ব্রণ বিশ্রী আব্রো খাব্রো মুখ। এই আপনার নাকি চাঁদপানা চেহারা?'

'চাঁদের চেহারা আপনি দেখেছেন ইদানিং? সেদিন যে খবর-কাগজে চাঁদের টাটকা ফোটো বেরিয়েছিল, দেখেছিলেন? আপনার চন্দ্রাভিযাত্রী আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে কী বলেছিলেন আপনার মনে নেই?'—আমার স্ট্রং আর্ম বার করি—'বলেছিলেন না যে চন্দ্রপৃষ্ঠ হচ্ছে ব্রণক্লিষ্ট মানুষের মতন?'

'বলছিলেন বটে, তবুও···' বলে তিনি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে থাকেন। 'কিন্তু বাচ্চা ছেলের মুখে এতো ব্রণ! দেখতেই কেমন বিচ্ছিরি!'

'কি করা যাবে?' আমি বলি—'কবিতার মতই ব্রণস্ হচ্ছে বর্ন্ নেভার মেড্। আপনার থেকেই হয়েছে, আপনিই মিলিয়ে যাবে একদিন।'

হর্ষবর্ধনের বৌয়ের কিন্তু মনে ধরে গেছে চাঁদুকে। তিনি আসতেই সে মা বলে কোমল কণ্ঠে ডেকেই না, তাঁর পায়ের গোড়ায় টিপ করে এক প্রণাম ঠুকেছে। আমার শিক্ষাদানের ওপরেও আর এক কাঠি এগিয়ে গিয়েছে সে। বলেছে—'মা, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে গলে গেছেন গিন্নী। ওর থুতনিতে হাত দিয়ে আদর করে বলেছেন —'বেঁচে থাকো বাবা, সুখী হও।' বলেই আমার দিকে ফিরেছেন...'আপনার ভাগনেটি বেশ। এমন মিষ্টি ছেলে আমি দেখিনি। দিব্যি ছেলে—সোনার চাঁদ।'

হর্ষবর্ধনের তবুও খুঁত-খুঁতুনি যায় না—'এই বিদঘুটে মুখ দিন-রাত্তির দেখতে হবে আমায়·· উঠতে বসতে···নাইতে খেতে।'

'আপনি সম্মুখের কথা ভাবছেন কেন, দূরের দিকে দৃষ্টি দিন।' বাধ্য হয়ে বলতে হলো আমায়—'পরকালের জল-পিণ্ডির জন্যেই তো ছেলের দরকার। হাঁ করে তাকিয়ে দেখার জন্যে তো ছেলে নয়। আর, সেইজন্যেই তো চেয়েছিলেন আপনি।'

'আপনি আমায় কতক্ষণ দেখতে পাবেন বাবা?' চাঁদু বলে—'আমি তো...' বলতে গিয়ে চেপে যায়।—'আমি কতক্ষণ আপনার সামনে থাকবো আর?'

'ও! তুমি বুঝি সারাদিন পাড়াময় টো-টো করে বেড়াবে? যতো বকাটে ছেলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ডাণ্ডাগুলি খেলে সেই রাত্তিরবেলায় খাবার সময় বাড়ি ফিরবে বুঝি?'

'না, আমি বলছিলাম যে আপনি তো সারাদিন আপনার কারখানাতেই পড়ে থাকবেন, কতক্ষণ আর দেখতে পাবেন আমায়? এই কথাই আমি বলছিলাম। আমি তো মার কাছেই থাকবো সব সময়। তাই না, মা?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'তবে তাই হোক।' হর্ষবর্ধন বৌয়ের কাছে হার মানেন।

রাহু না হয়েও, আর্মস্ট্রং না হলেও চন্দ্রগ্রহণ হয়ে গেল হর্ষবর্ধনের। বৌয়ের উপরোধে আমার ঢেঁকিটা তিনি গিললেন।

তারপরের ঘটনাটা বলি এবার।

দিন কয়েক বাদ পার্ক-সার্কাস দিয়ে কী কাজে যাচ্ছিলাম, বেশ ভিড় জমেছিল এক জায়গায়। মেলার ভিড়; মেলাই মানুষ আমার সহ্য হয় না, পাশ দিয়ে এড়িয়ে যেতে দেখলাম, চাঁদু একধারে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছচে।

'কিরে? কী হয়েছে?' আমি শুধাই: 'এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস কেন?'

'বাবা হারিয়ে গেছে।' চোখের জল মুছে সে জানাল।

'বাবা হারিয়ে গেছে কিরে?' আমি হাসলাম—'তুই হারিয়ে গেছিস বল্।'

'না আমি হারাইনি, আমি ঠিক আছি। মেলা দেখতে এসেছিলাম আমরা, আমার হাত ধরেই যাচ্ছিল তো বাবা, কখন যে হাতছাড়া হয়ে গেল! টেরই পেলাম না!'

'ডাকিসনি বাবাকে?'

'ডাকছি তো! কখন থেকেই ডাকছি। সাড়া পাচ্ছিনে।'

'সাড়া পাচ্ছিস্ নে?'

'পাবো না কেন?' সে বিরস মুখে জানায়—'অনেক সাড়া পাচ্ছি তবে তারা কেউ আমার বাবা নয়।'

'কী বিপদ ! আরে, তাই তো হবে রে ! বাবা বাবা বলে ডাকছিস কিনা ?'

'কী বলে ডাকবো তবে ?'

'চাঁদু না হোক, তোর মতন ছেলে তো সবারই ঘরে আছে, সবাই কোন-না-কোন এক চাঁদপনা ছেলের বাবা। তারা ভাবছে যে তাদের ছেলেরাই ডাকছে বুঝি। বাবা বলে ডাকলে তো সবাই সাড়া দেবে, এর ভেতর প্রায় সবাই যে বাবা রে।'

'তাহলে কী বলে ডাকবো !'

'কী বলে ডাকবি ! ভাবনার কথাই বটে ! ঐ বাবা বলেই ডাকতে হবে, উপায় কী ?'

'না। বাবা বলে আর ডাকতে পারবো না আমি। ডাক শুনে একে একে না, একবার করে এসে আমাকে দেখে মুচকি হেসে চলে যাচ্ছে সবাই।'

'আহা, রাগ করছিস কেন ? তাদেরও সব ছেলে হারিয়ে গেছে মনে হয়, মানে ছেলেরা হারায়নি, মেলায় এসে ভিড়ের ঠেলায় ছেলের হাতছাড়া হয়ে তারাই সব হারিয়ে গেছে, তাই এমনটা বুঝেছিস ?'

'তাহলে কী হবে ? তুমি আমায় বাড়ি নিয়ে চলো মামা !'

'সে কিরে !' শুনেই আমি চম্‌কাই। চাঁদুর মতন বিচ্ছু ছেলে, ভগবানের কৃপায় অনেক কষ্টে যার সদ্‌গতি করা গেছে, সে আবার আমার আশে পাশে বিচ্ছুরিত হবে ভাবতেই আমার বুক কাঁপে।

'তা কি হয় নাকি রে ? আমাদের বাড়ি যাবি কি তুই !'

'কেন, মামার বাড়ি কি যায় না নাকি কেউ ?'

'আরে, আমি আবার তোর মামা কিসের। পুষ্যিপুত্তুর হয়ে তোর গোত্রান্তর হয়ে গেল না ? জ্ঞাত গোত্তর পালটে গেল যে। তুই আর চকর্‌বরতিকুলের কেউ নোস্‌, বর্ধন বংশে চলে গেছিস এখন ! দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় সেখানেই বর্ধিত হবি।'

'শশীকলা ?'

'মানে, চাঁপা কলার থেকে কাঁঠালি কলা হয়ে মর্তমানে দাঁড়াবি আর কি !'

'না। আমি তোমাদের বাড়ি যাবো।'

'তোর বাবা মা থাকতে তুই—কাকস্য-পরিবেদনা, কোথাকার কে—আমার কাছে যাবি কেন রে আবার ? তুই কি আর অনাথ বালক নাকি ?'

'বাবাকে পাচ্ছি না যে !' আবার ওর চোখে জল গড়ায়—'কি করবো।'

'এক কাজ কর, নাম-ধরে ডাক না হয়।' আমি বাতলাই শেষটায়—'হর্ষবর্ধন বলেই হাঁক পাড়। তাহলেই আসল বাবার সাড়া পাবি, কানে তার গেলেই হলো একবার।'

'হর্ষবর্ধন ! হর্ষবর্ধন !!' বলে দুবার ডাক ছাড়ল সে, তারপরে বললে 'এটা কি ঠিক হচ্ছে মামা ?'

'আবার মামা ? আমি তোর মামা নই রে। গোত্রান্তর কাকে বলে বুঝতে পারছিস নে বুঝি ? ভীষণ খারাপ। আমাকে মামা বললে তোর পাপ হবে এখন। আমাকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তার জন্যে।'

'আমি বলছিলাম কি, বাবার নাম ধরে ডাকাটা কি ঠিক? বাবার নাম কি ধরতে আছে? ধরে কেউ কখনো?'

'না ধরে উপায় কি? নইলে সে টের পাবে কি করে? সাড়াই বা পাবি কেমন করে?'

তখন সে নিজেই ঠিক করে নিয়ে ভদ্রতা বাঁচিয়ে বোধহয়, চিৎকার ছাড়লে 'হর্ষবর্ধন বাবু! হর্ষবর্ধন বাবু।...'

এক নাগাড়ে চলতে লাগল তার হাঁক-ডাক।

তারপর নিজেই আবার পালটে নিয়ে (বলল যে, বাবাকে বাবু বলাটা ঠিক হচ্ছে না বোধহয়।) হাঁকতে লাগল 'হর্ষবর্ধন বাবা...হর্ষবর্ধন বাবা... হর্ষবর্ধন...'

তারপর পর্যায়ক্রমে চলতে লাগল তার ধারাবাহিক—

'হর্ষবর্ধন বাবু। হর্ষবর্ধন বাবা। হর্ষবর্ধন বাবা বাবু। হর্ষবর্ধন বাবু বাবা। হর্ষবর্ধন বুবা। হর্ষবর্ধন বাবা বুবু। হর্ষবর্ধন বুবা বুবা। হর্ষবর্ধন বুবু বুবু।'

চিৎকারের সঙ্গে বুৎকার মিলিয়ে সে-এক ইলাহী ব্যাপার!

হর্ষবর্ধন তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন মেলার থেকে। বেরিয়েই ঠাস করে চড় কসালেন ওর গালে—'হতভাগা ছেলে! বাপের নাম ধরে ডাকচিস? এতো বড়ো বুড়ো-ধাড়ি ছেলে লজ্জা করে না?'

আমি কৈফিয়ৎ দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছি।...উনি আমার ওপরেও চোট ঝাড়লেন 'এমন ছেলে আমার চাই নে মশাই? -নিয়ে যান আপনার ছেলেকে। পোষ্য-পুত্তুরের নিকুচি করেছে। চাইনে আমার পুষ্যিপুত্তুর। আমি বরং নরকেই যাবো—আজন্ম সেখানেই পচে মরবো না-হয়...আর জলপিণ্ডির দরকার নেই আমার। সাতজন্ম আমি নরকে পচবো তবু এমন ছেলের মুখদর্শন করবো না আর।'

'ওর অপরাধটা কী হয়েছে? আমারই বা...' আবার আমি বলতে যাই, উনি ফের আমায় দাবড়ে দেন—

'না, আপনাদের দু-জনের কারোই কোন অপরাধ হয়নি—যতো অপরাধ সব আমার। ঘাট হয়েছে মানছি আমি। এই নাকে-খৎ কানে-খৎ আপনার পুষ্যিপুত্তুর আপনি নিয়ে যান মশাই! আমার চাইনে। খুব হয়েছে, খুব শিক্ষা হয়েছে। দয়া করে আর আপনারা আমায় মুখ দেখাবেন না। দু-জনের কারোই চাঁদমুখ আমি আর দেখতে চাইনে। আপনাদের দু-জনকেই আমি ত্যজ্যপুত্তুর করে দিলাম।'

অগত্যা চাঁদুকে বগলদাবাই করে বজ্রাহত হয়ে ফিরলাম নিজের ডেরায়। ভেবেছিলুম ওকে হর্ষবর্ধন পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ভবিষ্যতের পেট-স্থানের ব্যবস্থা হবে নিজের—কিন্তু এমনি বরাত! কী হতে কী হয়ে গেল!

ত্যজ্যপুত্তুর হয়ে গেলাম আমরা মামা ভাগনে দু-জনাই।

চেঞ্জে গেলেন হর্ষবর্ধন

দার্জিলিং গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর শখ হলো দুই ভায়ের। দু-জনে দুটো ঘোড়া কিনে ফেললেন।

'ঘোড়ায় চড়া একটা ভাল একসাইজ, জানো দাদা?' বলল গোবরা।

'তা আর জানিনে, তবে ঘোড়া দুটো এক সাইজের হয়ে গেল, এই যা মুশকিল।'

'একসাইজের জন্যে কেনা ঘোড়া—এক সাইজের হবে না? কী বলছো তুমি?'

'ওরে, সে একসাইজের কথা বলছি না, যার মানে কিনা ব্যায়াম! আমি বলছি এক সাইজের—মানে এক রকম চেহারার। এক রকম লম্বা চওড়া, আড়ে বহরে—পায় মাথায় অবিকল একই রকম। সেই কথাই বলছি আমি।'

'তাই বলো।' হাঁফ ছাড়ে গোবরা।

'সবকিছুরই তর-তম থাকা দরকার ভাই, নইলে তারতম্য বুঝবো কিসে? যেমন, মহৎ মহত্তর মহত্তম, উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম…'

'যথা?' উদাহরণস্বরূপ প্রমাণ পেতে উদ্‌গ্রীব গোবর্ধন।

'যেমন ধর্, তুই হলি উচ্চ—লম্বায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। আমি আবার তোর চেয়ে ঢ্যাঙা—আমি হলাম উচ্চতর। আবার ঐ হিমালয় আমার চেয়েও সমুচ্চ—একেবারে উচ্চতম।'

'বুঝলাম।'

'ঘোড়া দুটোর কোন তর-তম নেই মোটেই। তোর ঘোড়ার থেকে কি করে যে আমারটাকে আলাদা করা যাবে, ভাবছি তাই। যে ঘোড়া তোর পলকা শরীর বইবে, আমি যদি ভুল করে তার পিঠে কখনো চাপি তো অনভ্যাসের দরুণ সে হয়তো বসেই পড়বে তক্ষুনি—তারপরে হয়তো আর নাও উঠতে পারে! আমার ভার বইতে গিয়ে হয়তো বা ভবলীলা সাঙ্গ হবে বেচারার।'

'তাহলে তো ভারি ভাবনার কথা।' ভাবিত হয়ে পড়ে ভাই।—'তোমার চাপনে আমার ঘোড়া মারা না পড়ুক, খোঁড়া হয়ে যেতে পারে তো! আর খোঁড়া পা খালি খানায় পড়ে। খানায় পড়ে কানা হয়ে যাবে হয়তো আমার ঘোড়াটা।'

'যাবেই তো। তার আমি কি করবো?' দাদা কোন সান্ত্বনার বাক্য শোনাতে পারেন না—'গোড়াতেই গলদ হয়ে গেছে, এখন ঘোড়ায় গলদ হবে সেটা আর বেশি কথা কি?'

'একটা কাজ করা যাক, আমার ঘোড়ার লেজটা ছেঁটে দি, কেমন?' একটা উপায় বার করে গোবরা: 'তাহলে তো তুমি টের পাবে। তখন চিনতে পারবে সহজেই।'

গোবরা কাঁচি এনে ঘোড়াটার লেজ ছেঁটে দিল আধখানা—'তুমি তর-তম চাইছিলে দাদা, কেমন এইবার তার উত্তর পেলে তো?'

'তোর লেজটাকে তুই কাঁচিয়ে দিলি, আমার লেজটাকে তাহলে আমি পাকিয়ে দিই।' বলে তিনি নিজের ঘোড়ার লেজটা পাকিয়ে তাতে একটা গিঁট বেঁধে দিলেন ভাল করে—'তোর যদি উত্তর হয়ে থাকে তবে আমারটা হলো উত্তম।'

উভয়ের লেজের প্রশংসায় দু-ভাই-ই পঞ্চমুখ।

দু-ভাই ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খাচ্ছিলেন বেশ, এমন সময়ে হলো কি, এক কাঁটাতারের বেড়ায় লেগে দাদার ঘোড়াটার আধখানা লেজ ছিঁড়ে হাওয়া হয়ে গেল।

'দেখ, কী হলো আমার দশা', দাদা দেখালেন ভাইকে—'লেজের দিক দিয়ে আর আলাদা করবার কোন উপায় রইল না! দেখ, দেখেছিস?'

'দেখছি তো।' বলল গোবরা—'আমার ঘোড়াটার ঘাড়ের কেশরগুলো ছেঁটে দিই তাহলে। তাছাড়া আর কি উপায়?'

ঘাড় ছাঁটাই হবার পর ঘোড়াটার চেহারা খোলতাই হলো খুব। একেবারে আধুনিক।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে হর্ষবর্ধন বললেন—'তোর ঘোড়াটা তো ভারি ভদ্র দেখছি! তুই ওর লেজা মুড়ো দু-দিকই মুড়িয়ে দিলি তবুও একটা কথা কইছে না। নেহাত গাধাও বলা যায়।'

'গাধা বলে গাল দিয়ো না আমার ঘোড়াকে, বলে দিচ্ছি।' দাদার কথার প্রতিবাদ করে গোবরা: 'পাছে তোমার চাপনে আমার অশ্ব খতম হয়ে যায়, তাই ওকে অশ্বতর করে দিলুম।'

'বেশ করেছিস। তোর অশ্বতরের খুরে খুরে দণ্ডবৎ!' মাথায় হাত ছোঁয়ান দাদা।

তারপর আর একদিন আর এক দুর্ঘটনা।

দুইভাই পাশাপাশি চলেছেন ঘোড়ায় চেপে। হর্ষবর্ধন আরাম করে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চলেছেন, নাক সিঁটকাল গোবরা—'ইস্, তোমার চুরুটটা কী বড় দাদা, ভারি বিচ্ছিরি গন্ধ ছাড়ছে।'

'হুম্। গন্ধটা আমিও পাচ্ছি তখন থেকে। কড়ায়-গণ্ডায় দাম নিয়েছে বলে কি চুরুটটাও এতো কড়া দিতে হয়!' দোকানদারের উদ্দেশ্যে তিনি নাক খাড়া করেন।

নাক সিঁটকোতে গিয়ে তাঁর নজর পড়ে ঘোড়াটার ঘাড়ের ওপরে! ওমা, একি, কখন চুরুটের ফুলকিতে আগুন লেগে ঘোড়ার ঘাড়ের কেশরগুলো পুড়তে শুরু করেছে। গর্দান প্রায় ফাঁক!

'যাক্, আগুন লেগে আমার ঘোড়ার ঘাড়টাও ফাঁকা হয়ে গেল! তোর মতই হয়ে গেল, দেখছি। এরপর আর দুটোকে আলাদা করে চেনার উপায় রইল না।'

'তাহলে উপায়?

'উপায় আর কি! আমি যদি ভুল করে তোর ঘোড়াটায় চেপে বসি আর আমার চাপে ওটা পদচ্যুত হয় তাহলে আমাকে দোষ দিতে পাবিনে কিন্তু।'

'বিপদ বাধালে দেখছি।' ঘোড়ার বিপদ নিজের বিপদ বলেই জ্ঞান হয় গোবরার।

কী করবে এখন? ভেবে পায় না সে। তার নিজের ঘোড়াটার এক কান কেটে, তার দাদার—না, দাদা নয়, দাদার ঘোড়াটার দুটো কানই ছেটে দেবে নাকি? কিন্তু ঘোড়ারা ওদের কথায় কান না দিয়ে যদি চার-পা তুলে ছুট লাগায়? তাহলে?

অনেক ভেবে ভেবে তার মাথা থেকে একটা উপায় বার হয়—'আচ্ছা দাদা, তোমার ঘোড়াটা সাদা রঙের, দেখছো তো?'

'তা তো দেখছি।'

'আর আমারটা হচ্ছে মেটে রঙের। দেখতে পাচ্ছো?'

'তাও দেখছি।'

'তাহলে তোমারটা সাদা আর আমারটা মেটে—এই সাদামাটা কথাটা তোমার মনে থাকবে না, দাদা?'

গোঁফের জ্বালায় হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন স্টীমার-পার্টি দিয়েছিলেন।

তিনি, তাঁর ভাই শ্রীমান গোবর্ধনচন্দর, তস্য বৌদি শ্রীমতী হর্ষবর্ধন সেই সঙ্গে আমি, আমার বোন ইতু, ইতুর কাজিন-রত্নরা, তাদের বন্ধু আর বন্ধুনীরা সহযাত্রী।

একটা মাঝারি সাইজের স্টীম-লঞ্চ ভাড়া করে গঙ্গাসাগরের মোহনা অবধি পাড়ি দেবার মতলব ছিল আমাদের।

'নাঃ, কিছুই হলো না এ-জীবনে···'

লঞ্চে উঠেই প্রথম স্টীম বার করলেন হর্ষবর্ধন ফোঁস করে হঠাৎ।

মোহনায় পেঁছিনোর আগেই তাঁর এই মোহভঙ্গ আমায় অবাক করে দেয়।

'কেন, এই যে স্টীমার-পার্টি হলো এমন! কতদিনের সাধ ছিল আমাদের! আপসোস মিটল,' গোবর্ধন কয়।

'আমার জীবনে তো এই প্রথম! স্টীম লঞ্চে চাপলাম।' আমি জানাই। 'এর আগে অবিশ্যি স্টীমারে, ইয়াব্-বড়ো বড়ো স্টীমারে চেপেছি সেই সেকালে পদ্মা পাড়ি দেবার কালে। কিন্তু স্টীম-লঞ্চে স্টীমার পার্টি এই প্রথম ভাই।'

'আমি বজরায় চেপেছিলাম একবার।' আমাদের কথার মাঝখানে শ্রীমতী ইতুর বজরাঘাত।

'অনেক কিছুই পাওয়া হয়নি এ-জীবনে এখনো।' তিনি কন—'বিস্তর পাওনা বাকি।'

'জানি। টাকা ধার দিলে ফেরত পাওয়া যায় না। মার খায় টাকাটা' আমি নিজের প্রতিই যেন বাঁকাচোখে তাকাই—'কিন্তু যার নাকি অঢেল টাকা

টাকা তো আপনার কাছে ঢেলার মতই, এবং আমার কাছেও যদি সেটা পরের টাকা হয়। পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ—বলে গেছেন না চাণক্য ঋষি? আপনি কি ধার দিয়ে পাবার আশা রাখেন আবার? ফেরত পেতে চান আপনার টাকা?'

'চান যদি তো বন্ধুর সঙ্গে ঐক্যটা যাবে' ইতু জানায়—'এবং এটাও পাবেন না, চাণক্য এ-কথা না বললেও। এখন, ঐক্য চান না টাকা? সেই কথা বলুন।'

'সে কথাই নয়, টাকায় কী হয়? জীবনের সব কিছু কি পাওয়া যায় টাকায়? টাকা দিয়ে কী নাম-টাম হয়?'

'টাকা দিয়ে?' দাদার জিজ্ঞাসার জবাব তাঁর ভাই দিয়ে দেয়, 'হ্যাঁ, টাকা দিয়ে বদনাম হতে পারে সেই টাকা ফিরে চাইলে পরে। আর সেটা কি এক রকমের নাম হওয়া নয় কি?'

'দূর্ দূর্! সে-সব নাম নয়। খবরের কাগজে নাম বেরোয় তাতে?'

'খবর কাগজের নাম করতে হলে খবর হতে হয় আগে।' আমার বক্তব্য।

'খবর, না খাবার? কাকে খাওয়াতে হবে? সম্পাদককে, না তোমায়?' ইতুর জিজ্ঞাসা।

'খাবার নয়, খবর।' আমি জানাই, 'যিনিই খবর হবেন তাঁর নামই কাগজে বেরুবে এমনিতেই তিনি না চাইলেও।'

'কী করে খবর হওয়া যায়?'

'মনে করুন, কুকুর যদি আপনাকে কামড়ায় সেটা কোন খবরই নয়, কিন্তু আপনি যদি কোন কুকুরকে কামড়ান তবেই এমনটা খবর হয়।' বিখ্যাত পুরনো বয়েৎটা আমি পুনশ্চ আওড়াই।

'কুকুর আমি এখন পাই কোথায়? কুকুর তো আনা হয়নি স্টীমারটায়।'

'আনা হয়েছে, এসেওছে।' ইতু জানায়, 'কুকুর বাঁদর ভালুক সবাই এসেছে ওপর ওপর দেখে ঠাওর পাওয়া যাচ্ছে না। তারা সবাই ছদ্মবেশে আছে। ভোল পালটে রয়েছে কিনা এর ভেতরে। কি করে টের পাবেন?'

ভালুক বলে সে আমার প্রতিই কটাক্ষ করে কিনা কে জানে!

'দেখুন আবার, কুকুর বলে ভুল করে যেন কোন ঠাকুরকে কামড়ে বসবেন না—হাজার লোভনীয় হলেও।' আগে-ভাগেই আমার সাবধান করে দেওয়া, 'ইতু একটা ঠাকুর, জানেন তো? ইতু পুজো, হয়ে থাকে এদেশে।'

'আমিই তো করি ইতু পুজো।' হর্ষবর্ধনের শ্রীমতী প্রকাশ পান, 'তবে আপনার ইতুকে নয়। কুমোরটুলির থেকে ইতু ঠাকুর গড়িয়ে আনি। বামুন ভোজে আপনাকে ডাকা হয়, মনে নেই।'

'কুকুরও নেই, কিচ্ছু নেই, তবে আর আমি খবর হবো কি করে?' হর্ষবর্ধনের হা-হুতাশ।

'না থাকল তো কী! ইতুই একটা সমাধান বাতলায়, 'ধরুন, কেউ যদি এখন এই স্টীমারটা থেকে পড়ে যায়—যেতে পারে না? আকস্মিক দুর্ঘটনা তো অকস্মাৎ ঘটে থাকে। আর আপনি যদি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করেন তবে তৎক্ষণাৎ আপনি একটা খবর হয়ে উঠবেন। আপনার নাম বেরোবে কাগজে

'হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে।' আমি সায় দিই ওর কথায়, 'কিন্তু কে এখন নিজেকে জলাঞ্জলি দিতে যাবে? কার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে সাধ করে জলে ঝাঁপ দিতে যাবে? কেউ যদি নিজগুণে জলে পড়ে তবেই না উনি নিজরূপে প্রকট হতে পারেন। অবশ্যি ফিনফিনে সিল্কের শাড়িপরা কোন মেয়ে পড়লে তিনি গুণপনার সঙ্গে নিজের রূপযৌবনও প্রকাশ করতে পারবেন' বলে আড়চোখে আমি শ্রীমতী হর্ষবর্ধনের দিকে তাকাই।

'উনি আমার জীবনটা তো জলেই ভাসিয়ে দিয়েছেন, আবার আমি ওর জন্যে সাধ করে জলে ভাসতে যাব? গলায় দড়ি আমার!' শ্রীমতীর তীব্র কটাক্ষ হর্ষবর্ধন এবং আমার প্রতি যুগপৎ।

'আর আমিও ওনাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপাতে যাচ্ছিনে—আমার দায় পড়েছে! উনি যতো খুশি ভেসে যান না!'

'তা জলে ঝাঁপিয়ে কাউকে বাঁচাবেন যে, সাঁতার জানেন আপনি?' জল ঘোলা হবার আগেই আমি অন্য কথা পাড়ি।

'মোটামুটি জানা আছে এক রকম।'

'মোটামুটি?'

'হ্যাঁ, মোটা লোকেরা ফুটবলের মতন সহজে ডোবে না, ভাসতে থাকে জলের ওপর। ডুববো না যে কিছুতেই, এটা আমি বেশ জানি।'

'ত্রৈলঙ্গ স্বামী কাশীর গঙ্গায় ভাসতেন, দেখেছি ছবিতে।' গোবর্ধন দাদার কথায় সায় দিতে গিয়ে ভাসমান একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এনে ফেলে।

'সেটা উনি মোটা বলে নয়, যোগবলে।' আমি ব্যক্ত করি।

'ত্রৈলঙ্গ স্বামীর আসল নাম ছিল নাকি শিবরাম। জানো দাদা?'

'আমি কিন্তু জলে পড়লে মার্বেলের মতই ডুবে যাব—হাজার মোটা হলেও। আর ঐ শিবরাম হলেও।' গোবরার ফ্যাকরা থেকে আমি নিজেকে কাটিয়ে আনি, 'পরের ঘাড় ভেঙে ভাল-মন্দ চর্বিতচর্বণের ফলেই আমার এই চর্বিযোগ। এ-যোগ সে-যোগ নয়?'

সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই—আমার কথাটায় না—হঠাৎ ইতুর অধঃপতনে। কে জানে কি করে নিজের কিংবা রেলিংয়ের হাত ফসকে জলে পড়ে গেছে সে ফস্ করে!

কে এখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে সলিল-সমাধি থেকে উদ্ধার করে? খবর-কাগজে নাম বার করার কারোরই তেমন উৎসাহ দেখা গেল না—এমন কি হর্ষবর্ধনেরও নয়।

হর্ষবর্ধন উল্‌টে এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল এটা যেন আমারই এক দায়!

তাঁর চাউনিটা আমি গায়ে মাখি না। বরং তাঁকেই বলি, 'এই তো সুবর্ণ সুযোগ! এ সুযোগ আপনি হাতছাড়া করবেন না।'

'হ্যাঁ, সুবর্ণ সুযোগ বটে, কিন্তু আমার নয়, যে মেয়েটাকে জল থেকে তুলবে তাকে আমি হাজার টাকা পুরস্কার দেব···' তিনি ঘোষণা করেন—'হাজার, দু'হাজার, পাঁচ-হাজার···' তিনি বলে যান।

কিন্তু লঞ্চ-ভরতি সোনার চাঁদদের শোনানোই সার, কাউকেই জলে নামানো যায় না। খাঁটি সোনা কেউ নয় বলেই বোধহয় সবার মুখেই কেমন একটা গিলটি গিলটি ছাপ। সবাই চুপচাপ।

'পাঁচ-হাজার···ছ-হাজার···সাত···'

বলতে না বলতেই ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি।

ইতু ভাল সাঁতার জানে, সে অবলীলায় জল কাটছিল। আর হর্ষবর্ধনও, পড়েও কিন্তু ডুবলেন না—ফুটবলের মতই ভেসে রইলেন—যা বলেছিলেন তাই।

হর্ষবর্ধনকে ঘিরে তাঁর চারপাশে সাঁতার কাটতে লাগল ইতু। ঘুরে-ফিরে—নানান ভঙ্গিমায়।

খানিক বাদেই দেখা গেল, ইতুকে ল্যাজে বেঁধে তিনি ফিরে এসেছেন, এসে ভিড়েছেন লঞ্চের কিনারায়।

সঙ্গে সঙ্গে দড়ির-মই ফেলে দু-জনকেই হেঁ-হেঁ করে টেনে তোলা হলো।

ক্যামেরা ছিল কয়েকজনের, চটপট ছবি তুলল তারা।

'আপনার সচিত্র ছবি ছাপা হবে এবার। বার হবে তা খবর-কাগজেই।' উৎসাহিত হয়ে আমি ওঁকে অভিনন্দন জানাই।

'যে নাম তুমি নাকি চাইছিলে দাদা, হলো তো এবার? আর কী চাও?'

'কে চাইছে নাম? কে চেয়েছে? উঃ! এমন গোঁফ ব্যথা করছে না আমার।' গোঁফের ওপর তিনি হাত বুলোতে থাকেন।

'ঝপাং করে জলে পড়লে গায়ে লাগতে পারে হয়তো···' ওঁর কথায় আমি অবাক হই—'কিন্তু গোঁফে লাগবার তো কথা নয়!'

'গোঁফটা এমন টাটিয়েছে না আমার' রোষভরে তিনি সমুৎসাহিত সবার দিকে তাকান, তার পরে কন—'কে আমায় জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল শুনি? উফ্! কেন যে গোঁফ আমার এমন টাটিয়ে উঠল হঠাৎ! একবার যদি তাকে ধরতে পারি না—দেখে নেব একবার!' বলে সবার ওপরে চোখ বুলিয়ে আমার ওপরেই তাঁর দৃষ্টি দিয়ে রাখেন,···দেখতে থাকেন।

'ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে আপনাকে? সে কী!···'

তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এড়াতে আমি বলি—'আমি তো দেখলাম আপনি নিজেই শখ করে জলে ঝাঁপ দিলেন!'

'শখ করে? শখের প্রাণ গড়ের মাঠ! মাইরি আর কি!'

'এখানে গড়ের মাঠ নয় দাদা, গঙ্গাঘাট।' দাদার ভ্রম-সংশোধন করে ভ্রাতায়—'শখের প্রাণ গঙ্গাঘাট!'

'তুই থাম্। আমার প্রাণ যাচ্ছে এদিকে। গোঁফের জবালায় গেলাম। কেন যে লোকে সাধ করে বড়ো বড়ো গোঁফ রাখে!' হর্ষবর্ধনের প্রাণের আর গোঁফের জবালা একসঙ্গে দাউ দাউ করে জবলে।

'ইস্! এমন জবলছে গোঁফ যে কী বলবো!'

'কোন্ গোঁফটা?' জিগ্যেস করে ইতু চন্দ।

'দুটো গোঁফই। দুধারের গোঁফই। কেন জ্বলছে কে জানে! জলে পড়লে গোঁফ জ্বলে—আমার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম।'

'আমারও। যদিও আমার গোঁফ নেই আর কখনো জলেও পড়িনি। ইতু, এদিকে আয় তো।' বলে ইতুকে আমি সরিয়ে আনি। হর্ষবর্ধনের ক্রুদ্ধদৃষ্টির আওতা থেকে সরে লঞ্চটার অন্যধারে চলে যাই।

'হ্যাঁরে, তুই ওঁকে জলে ফেলে দিসনি তো?' শুধাই ইতুকে।

'বা রে! আমি কী করে ফেলবো? ফেলতে যাব কেমন করে শুনি? আমি ওঁর আগে জলে পড়লুম না?'

'তাও তো বটে!' কথাটা মানতে হয় আমায়।

সে বলে: 'কষ্টে-সৃষ্টে ওই কনকনে জলে আমি নিজেকেই ফেলতে পেরেছি কেবল। লঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে কী দশা হয়েছে আমার দ্যাখো। ফ্রক-টক সব ভিজে একশা—একাকার।' নিজের লাঞ্ছনা দেখায় ইতু।

'এখন চট করে ফ্রক-ট্রকগুলো বদলে ফ্যাল তো। ভিজে পোশাকে থাকলে অসুখ করবে না!'

'আমি কি বাড়তি পোশাক-টোশাক এনেছি? জলে পড়তে হবে কি জানতাম?'

'তবে? তাহলে? এক কাজ কর।' আমি ওকে স্টীমারের অন্য ধারে টেনে নিয়ে যাই—'আমার গেঞ্জিটাকে আণ্ডারওয়ারের মতো পরে জামাটাকে গায়ে চড়াই—আপাততর মতন এটাই ফ্রক হোক। এই ফ্রক-শার্ট যেমন কিনা—ফ্রক-কোট হয় না ছেলেদের?'

'আর তুমি?'

'আমি খালি গায় একটু গঙ্গার খোলা হাওয়া খাই। গা জুড়াই। যাক, হর্ষবর্ধন যে তোকে উদ্ধার করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।'

'উনি উদ্ধার করেছেন? আমায়? না আমি উদ্ধার করলুম ওনাকে?' ইতু প্রকাশ করে—'সাঁতারই জানেন না উনি। আমিই তো ওঁকে জলে ভাসিয়ে টেনে নিয়ে এলাম।'

'তুই? কি করে আনলি রে তুই—ওই লাশটাকে?'

'কি করে আবার? ওঁর গোঁফ ধরে। হাতের কাছে ধরবার কিছু পেলাম না তো আর। ভাগ্যিস্ ওনার অমন ডাগর গোঁফ ছিল তাই রক্ষে।'

দোকানে গেলেন হর্ষবর্ধন

বাসে উঠেই হর্ষবর্ধন ভাবিত হন। ভাইকে ডেকে বলেন—'সনাতন খুড়ো বলেছিল সাহেবি দোকানে পাওয়া যায় জিনিসটা। কিন্তু সাহেবি দোকান যে কোথায় কে জানে!'

'খুড়োর আর কি, বলেই খালাস।' গোবর্ধন গজ্‌রায়—'এখন আমরা ঘুরে মরি সারা কলকাতা।'

হর্ষবর্ধন মুখভঙ্গী করেন—'কাকেই বা জিগ্‌গেস করি—কেই বা জানে।'

ওরা ছাড়া আরো একটি আরোহী ছিল বাসে, তিনি মহিলা। গোবর্ধন সেই দিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—'ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না? মেয়েদের অজানা কি আছে?'

প্রস্তাবটা হৃদয়গ্রাহী হয় হর্ষবর্ধনের। এ দুনিয়ার সব কিছুই মেয়েদের নখদর্পণে, সে-কথা সত্য—'তুই জিজ্ঞাসা কর।'

'তুমিই করো দাদা।' গোবর্ধনের সাহসের অভাব।

'কী ভীতু রে!' তিনি ফিস্‌ফিস্‌ করেন—'কর না তুই, গোবরা! ভয় কিরে? আমি তো তোর কাছেই আছি।'

'উঁহু।' গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে।

অগত্যা হষবর্ধনকেই মরিয়া হতে হয়। অনেকবার হাত কচ্‌লে অবশেষে তিনি বলেই ফেলেন—দেখুন আমরা একটা মুশ্‌কিলে পড়েছি,'—সমস্যাটা তিনি প্রকাশ করেন মহিলাটির কাছে।

মহিলাটি জবাব দেন—'আপনারা 'হল অ্যান্ডারসনের' দোকানে যান না কেন? আর কিছুদূর গেলেই তো—!'

এই বলে তিনি বাসের কনডাক্টারকে ওদের যথাস্থানে নামিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে নেমে যান এলগিন রোডের মোড়টায়।

পাঞ্জাবী কনডাক্টর চৌরঙ্গীতে এক সাহেবি দোকানের সামনে ওদের নামিয়ে দেয়—'হলন্দর-সন্‌কো মকান এহি হ্যায় বাবুজি!'

তারপর হর্ন বাজিয়ে চলে যায় বাস।

বাড়িটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'হ্যাঁ, এই দোকানটাই বটে, কি বলিস গোবরা?'

'ঠিক। সনাতন খুড়ো যেমনটা বলেছিল তার সঙ্গে মিলছে হুবহু।' গোবর্ধন ঘাড় নাড়তে কার্পণ্য করে না।

'পড়তো! পড়ে দ্যাখ্‌তো, কি লিখেছে বড়ো বড়ো ইংরজীতে?'

গোবর্ধন বানান করে করে পড়ে মনে মনে। তারপর বলে—'বুঝেছি দাদা, এরা হচ্ছে সব হল্যাণ্ডের। হল্যাণ্ড বলে একটা দেশ আছে জানো তো? ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ইস্‌কট্‌ল্যাণ্ড্—'

'যা যাঃ! তোকে আর ভূগোল ফলাতে হবে না। ভারী তো বিদ্যে! তার আবার ইস্‌কটল্যাণ্ড!' হর্ষবর্ধন ধম্‌কে দেন—'কি পড়্‌লি তাই বল।'

'ঐ কথাই। হল্যাণ্ড আর তার ছেলেপুলে।'—গোবর্ধন ব্যাখ্যা করতে চায়—'ঐ তো স্পষ্টই লিখে দিয়েছে। পড়েই দ্যাখো না! হল্যাণ্ড্—অ্যাণ্ড্—অ্যাণ্ড্ মানে তো এবং? অ্যাণ্ড্ হার্—হার্ মানে তো তার? হিজ্—হার্—মনে নেই তোমার? অ্যাণ্ড্ হার্ সন্—এবং তার ছেলেপুলে।'

হর্ষবর্ধনের চোখ এবার স্বভাবতই কপালে ওঠে। অ্যাঁ! এতো বড়ো কথা লিখে দিয়েছে! কলকাতায় এসে কারবার করছে কি না স্বয়ং হল্যাণ্ড? সঙ্গে আবার তার ছেলেপুলে নিয়ে? অবাক কাণ্ড!

হর্ষবর্ধনকে চোখ খাটাতে হয় বাধ্য হয়েই। যদিও একটু খাটালেই তাঁর চোখ টাটায়—চল্লিশের পর থেকেই এমনি। যাই হোক, বদন-ব্যাদান করে, আকর্ণ চক্ষু বিস্তার করার চেষ্টা পান তিনি।

নাঃ, অতটা ভয়াবহ কিছু নয়। ক্রমশ তাঁর হাঁ বুজে আসে—চোখও সংক্ষিপ্ত হয়।

'হার্ কই? হার?' উষ্ণ হয়ে ওঠেন তিনি। 'এইচ গেল কোথায়? হার্‌সনের এইচ—শুনি তো একবার?' গোবরাকে তাঁর প্রহার করার ইচ্ছা হয়।

'পড়ে গেছে।' গোবর্ধন আমতা আমতা করে। 'পড়ে যায় না কি?'

'তোর মাথা! পড়ে গেলেই হলো! তক্ষুনি তুলে ধরে আবার লাগিয়ে দিতো না তাহলে?' হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন—'ও কথাই নয়! কথাটা হচ্ছে…হুম্!'

দাদার আবিষ্কার অবগত হবার জন্য উদগ্রীব হয় গোবর্ধন।

'কথাটা হচ্ছে আর কিছু না। হলধর আর ইন্দ্রসেন—বুঝলি?' বলে, গোঁফের ডগায় তিন ডবল হস্তক্ষেপ করেন তিনি।

গোবর্ধন অবাক হয়ে যায়—'অতবড় লম্বা-চওড়া কথাটা হয়ে গেল হলধর আর ইন্দ্রসেন!'

'হবে না কেন?' হর্ষবর্ধন বলেন—'ইংরেজীতে বানান করতে গেলে তাইতো হবে। কলকাতা কেন ক্যালকাটা হয়, তবে? ব্রহ্মদেশ কেন বারমা হয় শুনি? গঙ্গা গ্যাঞ্জেস? ইংরেজীতে আমার নাম বানান করে দ্যাখ্ না, তাহলেই টের পাবি। করে দ্যাখ্।'

সে দুশ্চেষ্টা গোবর্ধন করে না—দুঃসাধ্য কাজে স্বভাবতই সে পরাঙ্মুখ এবং পরমুখাপেক্ষী।

অগত্যা হর্ষবর্ধনই প্রয়াস পান—'আমার নামের বানান নেহাত সোজা নয় রে! অনেক মাথা ঘামিয়ে তবে বের করেছি। প্রথমে ধর্, এইচ্—ও—আর—এস্—ই, কি হলো? হর্স। তারপরে হবে বি—আই—আর—ডি,—কি হলো? বার্ড। তারপর গিয়ে ও—এন—অন…তার ওপরে। হর্স-বার্ড-অন। হুম্।'

গোবর্ধনের বিস্ময় ধরে না। দাদার বেশ প্রতিভা আছে বাস্তবিক।

'মানেও বদলে গেল কতো না!' নিজের অর্থ নিজেকেই তাঁর খোলসা করতে হয় আবার—'কোথায় আমি হর্ষবর্ধন না কোথায় আমি ঘোড়ার ওপরে পাখি! কিংবা পাখির ওপরে ঘোড়া! ও একই কথা!'

মানেটা মনঃপূত হয় না গোবরার। ঘোড়ার সঙ্গে তার দাদার তুলনা—ছ্যা! দাদাকে ইতর প্রাণীর আসন দান করতে স্বভাবতই তার কুণ্ঠা হয়।

সে বিরক্তি প্রকাশ করে—'কিন্তু যাই বলো দাদা! ইংরেজী করলে নামের আর কোন পদার্থ থাকে না। হর্ষ কথাটার বাংলা মানে হলো আনন্দ, আর ইংরেজী মানে কিনা ঘোড়া! ঘোড়ায় আর আনন্দে কত তফাৎ…ভাবো তো একবার!'

গোবর্ধন একটা হাত আকাশে আর একটা হাত পাতালে পাঠিয়ে যেন ব্যবধানটাকে পরিস্ফুট করতে চায়।

'কিচ্ছু তফাত নেই! ঘোড়ার পিঠে চেপেছিস কখনো? চাপলেই বুঝবি।' হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি হয়—'ঘোড়া আর আনন্দ এক।'

'হ্যাঁ, যদি পড়ে না যাও তবেই।' গোবর্ধন নিজের গোঁ ছাড়ে না।

'তোর যেমন কথা! আমি বুঝি পড়ে যাই কখনো? দেখেছে কেউ? তা আর বলতে হয় না!' ঘোড়ার সঙ্গে নিরানন্দের কোন ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনে কখনো হয়েছিল কি না হর্ষবর্ধন সে-কথা ভুলে থাকতেই চান। 'কিন্তু আমার ছবিটা কেমন হয় বল দেখি? একটা ঘোড়া তার পিঠের ওপর একটা পাখি! কিংবা একটা পাখি তার পিঠে একটা ঘোড়া—সে যাই হোক! কেমন খাসা হয় না? চ…মৎকার!'

নিজের ছবির কল্পনায় নিজেই যেন তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন তবু গোমড়া হয়ে থাকে—'এর চেয়ে তোমার সেই ছবিই ছিল ভাল।'

'কোন ছবি ?'

'সেই যে সেদিন একটা লোক মইয়ে উঠে আমাদের বাড়ির দেওয়ালে সাটছিল ?'

'সেই কোন রাজা-মহারাজার ছবি ?' ভ্রূকুঞ্চিত করে, বিস্মৃতির পংকোদ্ধার করেন হর্ষবর্ধন। 'নারে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কিং-কং না কী যেন !' গোবর্ধন সায় দেয়।

'এবার মনে পড়েছে।' হর্ষবর্ধন বলেন—'ওঃ! আমার সেই আরেক প্রতিমূর্তি! যা দেওয়াল থেকে খুলে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে গিয়ে তোর বৌদিকে উপহার দেবো বলেছিলুম না? সে-ছবি তো, হ্যাঁ, সে তো খুব ভালই—।' হর্ষবর্ধন বাক্যটাকে সজোরে শেষ করেন—'কিন্তু আমার এ-ছবিটাই বা এমন মন্দ কি ?'

'কি জানি!' গোবরা ঘাড় নাড়ে। 'তোমার এই চারপেয়ে ছবি বৌদির পছন্দ হলে হয়।'

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন—'হ্যাঁ, তাই নিয়েই আমি মাথা ঘামাচ্ছি কি না! তোর বৌদির মনের মতো হবার জন্যে হাত-পা সব আমার একে একে ছেঁটে ফেলতে হবে আর কি।'

ঘোড়ার কথা ছেড়ে গোড়ার কথায় ফিরে আসে গোবর্ধন। 'তা ইন্দ্রসেন না হয় হলো। কিন্তু 'ধর' কই ? 'ধর' ? হলধরের 'ধর' ?'

'চল চল, আর বকতে হবে না তোকে। কেন, 'হল্' তো ঐ রয়েছে। মাথা থাকলেই হলো, 'ধড়' নিয়ে কি হবে ?' বলে তিনি অনুযোগ করেন আবারঃ 'মাথা থাকলেই ধড় থাকে। অনেক সময় উহ্য থাকে—এই যা।'

হর্ষবর্ধনের পদক্ষেপ শুরু হয়। গোবর্ধন আর বাক্যব্যয় করে না।

দোকানের ভেতরে ঢুকতেই এক বাঙালী কর্মচারী এগিয়ে আসে—'কি চাই আপনার ?'

'আমার কিছু চাই না।' হর্ষবর্ধন বলেন। 'আমাদের দেশের সনাতনখুড়ো—তারই একটা জিনিস চাই, তার জন্যেই কিনতে আসা আমাদের।'

'কী জিনিস বলুন।'

'আপনাদের এই হলধরের দোকান থেকে অনেকদিন আগে একটা মাখন তোলার কল কিনে নিয়ে গেছলেন আমাদের সনাতনখুড়ো। সেই কলের মশাই, একটা খুরি গেছে হারিয়ে। সেই কলেই লাগানো থাকতো সেই খুরি—সেই খুরিটা চাই।' গোবরা সায় দেয় দাদার কথায়।

'মাখন-কলের খুরি ? কি রকম সেটা, বুঝিয়ে দিন তো মশাই।'

'আমি কি আর দেখতে গেছি ? হারিয়ে গেল তার আর দেখলাম কখন ?'

গোবর্ধন যোগ দেয়—'কি রকম আর ? এই খুরি যেমন ধারা।'

একটু পরেই ওদের বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়।

বাক্‌বিতণ্ডা দেখে এক সাহেব সেলস্‌ম্যান এগিয়ে এসে দাঁড়ায়—'হোয়াট বাবু ?'

বহুদিন থেকেই হর্ষবর্ধনের মনের বাসনা নিজের ইংরেজী বিদ্যার বহর কোথাও জাহির করেন—এমন অযাচিতভাবেই সেই আকস্মিক যোগ যেন আবির্ভূত হয় এখন তাঁর জীবনে।

তিনি আর কালবিলম্ব করেন না—'ইয়েস্ সার্—ইয়েস্—উই ওয়াণ্ট্—উই ওয়াণ্ট্ এ খুরি—'

'খুরি—হোয়াট ?'

'ইয়েস, খুরি। খুরি সার।'

'খুরি ? দি স্পেল ?' সাহেব জিজ্ঞেস করে।

'হোয়াট সার ?' হর্ষবর্ধনের বোধগম্যতার বাইরে পড়ে প্রশ্নটা।

'বানান করতে বলেছেন সাহেব।' বাঙালী বাবুটি বুঝিয়ে দেয়।

'ও! বানান ? খুরি—খ-য়ে হ্রস্-উ—'

'উহু-হু!' গোবর্ধন বাধা দেয়—'ইংরেজী বানান। বাংলা কি বুঝবে সাহেব ?'

'ও! ইংরেজী ? খুরি—কে-এচ্-ইউ-আর-আই—।'

'আই—তুমি ঠিক জানো ? ওয়াই-ও তো হতে পারে।' গোবর্ধন ফিসফিসায় কানের কাছে।

'পাগল, ওয়াই হয় কখনো ? বি-এল্-এ ব্লে, বি-এল্-ই ব্লি, বি-এল-আই ব্লাই। তারপরে বি-এল্-ও ব্লো, বি-এল্-ইউ ব্লিউ, আর—বি-এল্-ওয়াই ব্লোয়াই।'

'তাই নাকি ? তাই তো!' হর্ষবর্ধন আকাশ থেকে পড়েন। 'নো সার্ নট্ 'আই'—' তিনি তৎক্ষণাৎ ভ্রমসংশোধন যোগ করেন—'বাট্ ই'—ওন্লি 'ই' সার্।'

বানানটা মনে মনে নাড়াচাড়া করে বাঙালী কর্মচারীটিকে উদ্দেশ্য করে সাহেব বলে—'ব্রিং মি দি চেম্বারস্, বাবু!'

চেম্বারস আনীত হলে সাহেব পটাপট পাতা উল্টে যায়। ক্রমশ সাহেবের কপালে রেখা পড়ে, ভুরু কুঁচকায়, নাক সিঁটকায়—সারা মুখ বিকৃত হয়, কিন্তু খুরির কোন পাত্তা পাওয়া যায় না কোথাও; ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে অনেক ঘোরাঘুরি করেও খুরির কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় না কোন।

গোবর্ধন মন্তব্য করে—'বাবাঃ। কী মোটা বই একখানা! বোধ হয় ইংরেজী মহাভারত!'

'ড্যাম্ ইওর্ খুরি।' সাহেব ঝাঁঝিয়ে ওঠে—ব্রিং অক্সফোর্ড!'

ইতিমধ্যে এক মেম সেলস্ম্যান এসে কি এক জরুরী কথা বলে, সাহেব তার সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের অন্যধারে চলে যায়। বেয়ারাকে হাঁক দিয়ে যায়—'চেম্বারস্ লে যাও।'

'বাবা কি আওয়াজ!' গোবর্ধনের পিলে চমকায়!

'হবে না কেন ? গোরু খায় যে। গোরুর আওয়াজটা কি কম নাকি ? হাম্—'

গো-ডাকের গোড়াতেই দাদার মুখ চেপে ধরে গোবর্ধন। 'করচ কি দাদা! ধরে নিয়ে যাবে যে!'

'হ্যাঃ! নিয়ে গেলেই হলো!' হর্ষবর্ধন বুক ফোলান। 'মাইরি আর কি! আমি কি কচি খোকা?'

'ভুল করে গোরু মনে করে ধরতে পারে তো? তখন কেটেকুটে খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ?'

বেয়ারা এসে ওদের ডাকে—'চলিয়ে বাবু। চেম্বারমে চলিয়ে!'

সাদর অভ্যর্থনায় হর্ষবর্ধন আপ্যায়িত হয়ে এগিয়ে চলেন।

যেতে যেতে গোবর্ধন কিন্তু কানাঘুষা করে—আশঙ্কা অব্যক্ত রাখা অসম্ভব হয় ওর পক্ষে—'আমাদের সেই অভিধানের মধ্যে নিয়ে ঢুকিয়ে দেবে নাকি দাদা?'

'হ্যাঃ! ঢোকালেই হলো!' হর্ষবর্ধন ভড়কাবার ছেলে নন—'কেমন করে ঢোকায় দেখাই যাক না একবার! এতো বড়ো লম্বা চৌড়া মানুষটাকে চেম্বারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে—অতো সোজা না! আমরা কি জলছবি নাকি, যে লাগিয়ে দিলেই অভিধানের গায়ে সেঁটে যাব অমনি?'

ভাইকে অভয় দেবার জন্যে গটমট করে চলতে চলতেই তাঁকে বুকের ছাতি ফোলাতে হয় অতি কষ্টে।

ওঁদের দু-জনকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় বেয়ারা।—'আভি বড়া সাব চেম্বারমে বাত করতেহেঁ—আপলোগ হিঁয়া বৈঠিয়ে। কল হোনে সে হাম তুরন্ত লে যায়েঙ্গে।'

'কলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পিষে ফেলবে না তো দাদা।' গোবর্ধন আবার মুষড়ে পড়ে।

'হ্যাঃ, পিষলেই হলো।' অনুচ্চকণ্ঠে যতটা সম্ভব পরাক্রম প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কলের কথায় উনিও যে বেশ বিকল হয়ে এসেছেন ওঁর ভাবান্তর থেকে বুঝতে সেটা দেরি হয় না।

'হ্যাঃ, পিষলেই হলো! আমরা ঢুকতে যাব কেন কলে? আমরা কি ইঁদুর? ইঁদুররাই কেবল বোকার মতো ঢোকে কলের মধ্যে।'

মুখে সাপোর্ট দেন বটে, কিন্তু বেয়ারার ভাবভঙ্গী ক্রমশই যেন ওঁর কেমন কেমন ঠেকে। গোবর্ধনের কাপৌরুষ ওঁর মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে। সনাতন খুড়োর খুরির খোঁজ করতে না এলেই যেন ভাল হতো কেবলি ওঁর মনে হয়। মনে মনে সনাতনের মুণ্ডপাত করেন ওঁরা।

এমন সময়ে সেই মেমটি বড়ো সাহেবের খাস-কামরা থেকে বেরিয়ে এসে শুধায়ঃ 'হোয়াট্ আর ইউ ডুইং হিয়ার বাবু?'

হর্ষবর্ধন তটস্থ হয়ে ওঠে—'ইয়েস সার।'

'ডোণ্ট সার মি! সে—ম্যাডাম।'

'ইয়েস সার!' পুনরুক্তির কোথায় ত্রুটি ঘটছে হর্ষবর্ধন তা বুঝতে পারে না—ভারি বিব্রত হয়। মেমটা এবার দাব্‌ড়ি দেয়, 'সে ম্যাডাম।'

'ইয়েস্ ড্যাম্।'

'হু দি ডেভিল্ ইউ!'

মেমটা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

'তুমি ড্যাম্ বললে কিনা, মেমটা চটে গেল তাইতো।' গোবর্ধন উল্লেখ করে।

'হ্যাঁ, আমি ওকে মা বলতে যাই আর কি!' হর্ষবর্ধন ঈষদুষ্ণই হন, 'আমার বাবা কি ওকে বিয়ে করতে গেছে সাতপুরুষে!'

'মা কেন? ম্যা তো! বললেই পারতে!'

'মা-ও যা ম্যা-ও তাই একই মানে।' হর্ষবর্ধন টীকা করেন।

'আমাদের ভাষায় যাকে মা বলি, ওদের ভাষায় তাকেই বলে ম্যা!'

গোবরা আপত্তি করতে যায়, কিন্তু ওর কথায় কান দেন না হর্ষবর্ধন।

'ইংরেজীর তুই কি জানিস রে? তুই শেখাবি আমাকে? আমাকে আর শেখাতে হয় না ইংরেজী!'

'কিন্তু চটে তো গেল মেমটা'—গোবর্ধন তথাপি কিন্তু-কিন্তু করে।

'বয়েই গেল আমার! মেয়ে ইংরেজ দেখে ভয় খাইনে আমি। আমি কি তোর মতন কাপুরুষ নাকি?' বীরবিক্রমে ভাইকে বিধ্বস্ত করে দ্যান তিনি।

'ছাগলরাও তো ম্যা বলে! তুমি কি বলতে চাও যে ছাগলরাও তাহলে ইংরেজ?' বেশ গুরুগম্ভীর মুখেই প্রশ্ন হয় গোবর্ধনের।

'বেড়ালও তো ম্যাও বলে, তবে কি তুই বলছিস যে বেড়ালরা সব ছাগল?' হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না। 'যদি আমার মতো অনেক ভাষা তুই জানতিস তাহলে আর এমন কথা বলতিস না। ইতর-প্রাণীদের ভাষার মধ্যে ওরকম মিল থাকেই প্রায়। না থেকে পারে না।' ভাইয়ের বোধোদয়ের জন্যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে দ্বিধা হয় না দাদার।

অনেক ভাষা না জেনেও ক্ষোভ যায় না গোবর্ধনের! সে খুঁৎখুঁৎ করে তবুও, 'ছাগলের ভাষায় আর ইংরেজদের ভাষায় তোমার কিন্তু মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি দাদা। ছাগলের ভাষা শিখতে বেশি দেরি লাগে না, ইস্কুলে না গেলেও চলে, ঘরে বসেই শেখা যায় বেশ। কিন্তু ইংরেজের ভাষা শেখা শক্ত কত!'

'শক্ত না ছাই! তোর মতো ছাগলের কাছেই শক্ত।' হর্ষবর্ধন গোঁফ চুমরে নেন, 'আমার কাছে জল।'

এবার গোবর্ধন চটে! বলে বসে 'তাহলে বলো দেখি খুরির ইংরেজীটা?'

'কেন, বানান তো করেছি? কে এচ্ ইউ—'

'বানান করা আর ইংরেজী করা এক হলো?'

'পারব না নাকি ইংরেজী করতে? পারবো না বুঝি?' হর্ষবর্ধন কথা চিবুতে শুরু করেন। 'এমন কি শক্ত কথা শুনি? এক্ষুনি করে দিচ্ছি।' হর্ষবর্ধন স্মৃতির ক্ষেত্র-চষে ফেলতে থাকেন—সেই দারুণ কৃষিকার্যের দাগ পরতে থাকে তাঁর কপালে। প্রাণান্ত পরিশ্রমে তিনি ঘেমে ওঠেন আপাদমস্তক।

গোবর্ধন গুম হয়ে দাদাকে লক্ষ্য করে।

নিতান্তই মুষড়ে এসেছেন এমন সময়ে এক আইডিয়া আসে ওঁর মাথায়, ডুবন্ত লোকে যেমন কুটো খুঁজে পায়। ডুবন্ত লোকেরাই পায়, পাওয়াটাই দস্তুর, ডুবন্তরা আর কুটোরা প্রায় কাছাকাছি থাকে কিনা! কুটোর জন্যেই ডোবা, তাও নেহাত হাতে না পেলে কে আর কষ্ট করে ডুবতে যাবে বলো?

'পেয়েছি! পেয়েছি ইংরেজী!' হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন।

'কি শুনি?' গোবর্ধন সন্দেহের হাসি হাসে।

'পেয়েছি! মানে আরেকটু হলেই প্রায় পেয়ে যাই!' হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন, 'মানুষের পিঠে সেই যে কী হয় বল দেখি তুই, তাহলে এক্ষুনি আমি বলে দিচ্ছি তোকে।'

বিরাট আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে বৈজ্ঞানিকের ভাবভঙ্গী যেমন হয়, হর্ষবর্ধনের চোখ-মুখের এখন সেই অবস্থা। 'বল না কি হয় পিঠে?'

'পিঠে তো চুল হয় না।' গোবর্ধন ঘাড় চুলকোয়—'বুকে হয় বটে। কারু কারু আবার কানেও হতে দেখেচি অবিশ্যি।' গোবরা নিজের কান চুলকায়—কানে চুল হয়েছে কিনা দেখবার জন্যেই কিনা কে জানে?

'যা হয় না আমি কি তাই জিজ্ঞেস করেছি?' হুমকি দেন হর্ষবর্ধন।

'পিঠে তবে কি হয়? শিরদাঁড়া?'

'সে তো হয়েই আছে। আবার হবেটা কি?' ভারি বিরক্ত হন তিনি—'আহা, সেই যে যা হলে কেটে বাদ দিতে হয়, তবেই মানুষ বাঁচে। প্রায়ই বাঁচে না আবার।'

'কুঁজ নাকি গো দাদা?'

'তোর মাথা! বাবা কি আর সাধে নাম দিয়েছিল গোবর্ধন। মাথায় কেবল গোবর!'

'কেন কুঁজই তো হয়ে থাকে পিঠে। কুঁজ ছাড়া আর কি হবে? তুমি কি বলতে চাও তবে গোদ? না, গলগণ্ড?'

'আহা, সেই যে সনাতন খুড়োর যা হয়েছিল রে একবার! জেলার ডাক্তার এসে অপারেশন করল শেষটায়!'

'ও! সেই কার্বাংকল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কার্বাংকল। এইবার পাওয়া গেছে।' হর্ষবর্ধনের হর্ষ আর ধরে না। সারা মুখ যেন হাসিখুশির একখানা পৃষ্ঠা হয়ে যায়, 'কার্বাংকল থেকে এলো আংকল। আংকল মানে খুড়ো, তাহলে খুড়ি মানে কি বলতো?'

'আমি কি জানি!' গোবর্ধন ঠোঁট উলটায়, 'তুমিই তো বলবে!'

'আহা, আমিই তো বলবো! তুই বলবি কোত্থেকে? তোর কি পেটে বিদ্যে আছে ততো? তাহলে ঘোড়ার পিঠে পাখি না বসে গাধার পিঠেই বসতো গিয়ে! নামই পালটে যেতো তোর! খুড়ির ইংরেজী হলো আণ্ট। আণ্ট মানে খুড়ি।'

'জানতাম। তোমার আগেই জানতাম।' মুখ বেঁকায় গোবর্ধন। 'আবার আণ্ট মানে পিঁপড়েও হয় তা জানো?'

'হয়ই তো।' হর্ষবর্ধন জোরাল গলা জাহির করেন। 'আণ্ট তো দুরকমের, এক পিঁপড়েরা আর এক খুড়ি-জেঠী। আমি বললুম বলেই জানলি নইলে আর জানতে হতো না তোকে। আমার জানা আছে বেশ।'

গোবর্ধন অনেকটা কাহিল হয়ে আসে 'আচ্ছা, আচ্ছা, আণ্ট বানান করো তো দেখি!'

'কেন? সোজাই তো বানান। এ-এন্-টি—আণ্ট! 'এ'-তে 'অ'-ও হয়, 'আ'-ও হয়। ইংরেজীর মজাই ঐ!' মুরুব্বির চালে উনি মাথা চালেন।

'আবার 'এ'-ও হয়, জানো?' গোবর্ধন অনুযোগ করে। দাদার অগ্রগতির ধাক্কা সামলানো ওর পক্ষে শক্ত তবু খুব বেশি পিছিয়ে থাকতেও রাজি নয় ও।

'আচ্ছা, সে তো হলো। খুরি তো পাওয়া গেল। এখন মাখন-কলের ইংরেজী পেলেই তো হয়ে যায়—সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে খুঁজে বার করাই জিনিসটা।' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন 'জানিস ওর ইংরেজী?'

'মাখন-কল? কলের ইংরেজী তো জানি মিল। যেমন কিনা পেপার মিল—'

হর্ষবর্ধন উৎসাহ পান 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। সেই যে একবার কোন পেপার মিল একরকমের কাঠের খোঁজ করেছিল না আমাদের কাছে?'

'হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে।' গোবর্ধন সাড়া দেয় 'আর মাখন? মাখন হচ্ছে বাটার, জানই তো তুমি। বাট-বাটার-বাটেস্ট। বাট মানে হলো 'কিন্তু', বাটার মানে 'মাখন', আর 'বাটেস্ট'? বাটেস্ট মানে?'

বিদ্যার পরিচয় দেবার মুখেই হোঁচট খেতে হয় গোবরাকে।

'বাটেস্টে কাজ কি আমাদের? বাটারই যথেষ্ট।' হর্ষবর্ধন বলেন। 'তাহলে মাখন-কল মানে হলো গিয়ে বাটার-মিল। কেমন তো?'

দাদাকে পরামর্শ দেবার সুযোগ পেয়ে গোবর্ধন যেন গলে যায়। 'মিল আবার কবিতারও হয় দাদা।' গদগদ ভাবে সে জানায়! 'তবে কবিতার কলকারখানা হলো আলাদা।'

'তুই বড্ডো বাজে বকিস গোবরা।' হর্ষবর্ধন একটু বিরক্তই হন বলতে কি 'তাহলে কী দাঁড়াল? মাখন-কলের খুরি অর্থাৎ আণ্ট অফ্ এ বাটার-মিল এই তো? তাহলে সাহেবকে গিয়ে এই কথাই বলা যাক, কেমন?'

এমন সময়ে বেয়ারাটা আবার আসে 'চলিয়ে চেম্বারমে বড়া সাবকো পাশ।'

দুরু দুরু বক্ষে দু-ভাই আপিস ঘরে ঢোকে। অভিধানের মতই প্রকাণ্ড বটে ঘরটা তবে ততটা ভয়াবহ নয়। দু-জনে গিয়ে দাঁড়ায় টেবিলের কাছে।

'হোয়াট ইউ ওয়াণ্ট বাবু?' প্রশ্ন এবং চুরুটের ধোঁয়া প্রকাণ্ড এক লালমুখের দু-পাশ দিয়ে একই সময়ে যুগপৎ বাহির হয়।

হর্ষবর্ধন সাহস সঞ্চয় করেন, 'উই ওয়াণ্ট ইওর্ আণ্ট—'

হর্ষবর্ধনের বাক্য শেষ হতে পায় না, সাহেবের চুরুট চমকে ওঠে মাঝখানেই, 'হোয়াট?'

'হর্ষবর্ধন একটু জোর পান এবার, 'উই ওয়াণ্ট ইওর্ আণ্ট অফ এ বাটার-মিল।'

'ইউ ওয়াণ্ট মাই আণ্ট?' গোল চোখ আরও গোলাকার হয়ে আসে সাহেবের। 'ইজ্ দ্যাট্ সো?'

গোবর্ধন জবাব দেয় 'ই-য়েস্ সার।' কম্পিত কণ্ঠ ওর।

সাহেবের মুখ থেকে চুরুট পড়ে যায় এবং দাঁত কড়মড় করে। কোট খুলে টেবিলের উপর ফেলে দেয়—আস্তিন গুটায় সে—মাংসপেশীবহুল বিরাট হাত বিরাটতর বদ্ধমুষ্টিতে পরিণত হতে থাকে।

এই বদ্ধমুষ্টি অকস্মাৎ হয়তো ওঁদের নাকের সম্মুখীন হতে পারে ; কেন জানি না, এই রকমের একটা ক্ষীণ আশংকা হতে থাকে গোবরার।

প্রায় তাই ঘুষিটা প্রায় মুখের কাছাকাছি এসে যায়…

'ওরে দাদারে!'

দুর্ঘটনার পূর্বমুহূর্তেই গোবর্ধন দাদাকে জাপ্‌টে ধরে উদ্যত মুষ্টিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ঊর্ধ্বশ্বাস হয়। বেরুবার মুখে মেমের পা মাড়িয়ে দেয়, বেয়ারার সঙ্গে কলিশন বাধে, ধাক্কা লেগে একটা শো-কেস যায় উলটে ; বাঙালী বাবুটি ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হয়ে কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ে কে জানে! এ-সব দিকে ভ্রূক্ষেপের অবসর কই তখন ? তীরের ন্যায় বেরিয়ে একেবারে চৌমাথায় গিয়ে হাঁপ ছাড়ে ওরা।

'বাবাঃ! খুব বেঁচেছি।' গোবর্ধন বলে।

'আরেকটু হলেই হঁ।' হাঁপাতে থাকেন হর্ষবর্ধন।

'বাজার করা সোজা নয় এই কলকাতায়।' গোবর্ধন বলে, 'বুঝলে দাদা ?'

'সনাতনখুড়োর যেমন কাণ্ড!' হর্ষবর্ধন বেজায় রুষ্ট হন —

'কলকাতায় খুরি কিনতে পাঠিয়েছে। ওর খুরির জন্যে প্রাণে মারা পড়ি আর কি!'

'একটা বিয়ে করলেই তো পারে বাপু!' দারুণ অসন্তোষে গোবর্ধনও তেতে ওঠে—'খুড়ির আর দুঃখ থাকে না! মাখন-কলেও লাগিয়ে রাখতে পারে তাকে দিনরাত!

'যা বলেছিস গোবরা!' হর্ষবর্ধন ভায়ের তারিফ করেন—'একটা কথার মতো কথা বলেছিস এতক্ষণে।'

'হ্যাঁ, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। একটা সনাতন খুড়ি হয় আমাদের!'

'আমি শুধু ভাবচি ব্যাটারা খুরি বোঝে না, আণ্টও বোঝে না—কী আশ্চর্য! এই বিদ্যে নিয়ে হল্যাণ্ড থেকে ব্যবসা করতে এসেছে হেথায়, আশ্চর্য!' হর্ষবর্ধন ক্রমশই আরো অবাক হন!—'কি করে যে এরা দোকান চালায় খোদাই জানেন। যে লাল মুখোটা গোড়ায় এগিয়ে এলো সেটা তো আস্ত এক আকাঠ। খুরি বানান করে দিলুম তবু বুঝতে পারে না।'

'একেবারে হলধর,' গোবর্ধন সায় দেয়।

'হ্যাঁ, সেইটাই হলধর! ঠিক বলেছিস তুই।' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের কথাই মেনে নেন—অম্লানবদনেই।

'অনেক কাঠ দেখেছি আমরা। কিনেছি বেচেছিও বিস্তর। কিন্তু এমন আকাঠ দেখিনি কখনো।' গোবর্ধন বলে—'কাঠের ব্যবসা আমাদের। এই আকাঠ নিয়ে কি করবো দাদা ?'

'কিছু না।…আর যেটা অভিধানের মধ্যে ঢুকে বসে আছে—মুখ গোঁজ করে ঘুষি পাকিয়ে—' ধীরে ধীরে রহস্যকে বিস্তারিত করেন তিনি - 'সেই ব্যাটাই হলো গে—ইন্দ্রসেন। আসল ইন্দ্রসেন। বুঝেছিস ?

গোবরধনের প্রাপ্তিযোগ

কী যেন কাজে ভাইকে ল্যাজে বেঁধে হর্ষবর্ধনকে যেতে হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে—যেতেই এবার নোটিসটা নজরে পড়ল তাঁর। এর আগে পড়েনি কখনো আর।

'দ্যাখ্ দ্যাখ্, দেখেছিস?' নোটিস বোর্ডটার দিকে গোবরার চোখে আঙুল দিয়ে দেখান—'পড়ে দ্যাখ্।'

'বিজ্ঞাপন তো!' গোবরার মুখ বিকৃতি দেখা যায়—'পড়বার কি আছে?'

'অনেক কিছু। ইস্কুলের লেখাপড়ায় কি আর শেখায়? দুনিয়ার হালচাল জানা যায় কিছু? কিছু না। যা কিছু শেখার এই সব বিজ্ঞাপন দেখেই, এর থেকেই শেখা যায়, জানিস?'

'তুমি দ্যাখো দাদা! তুমিই শেখো। তুমি শিখলেই হবে।' বিজ্ঞাপনসহ বিজ্ঞ আপন দাদাকেও যেন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চায়।

'কাল ওটা না দেখেই যা শিক্ষালাভ হয়েছে আমার না!' বলেই তিনি ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলেন—'আগে দেখলে কাজ দিত। এখন খালি হাহুতাশ করা!'

কথাটা হেঁয়ালির মতন লাগে যেন গোবরার—'কি হয়েছিল কালকে?' সে জানতে চায়।

'আমাদের ঠাকুরমশাই দেশে গেলেন না কাল? তাঁর টিকিট কাটতে গেছলাম শেয়ালদায়···তখন যদি সামনের ঐ বিজ্ঞাপনটা আমার চোখে পড়তো···'

'তুমি অবাক করলে দাদা! শেয়ালদায় গিয়ে তুমি হাওড়ার বিজ্ঞাপন দেখতে চাও? যতই তোমার দূরদৃষ্টি থাক না দাদা। তা, কি কখনো হতে

পারে?' দাদার ইতিহাস আর ভূগোলে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সেটা সে না দেখিয়ে পারে না।

'সেই তো দূরদৃষ্টি আমার! তবে আর বলছি কী!' বলে তিনি গতকালের বৃত্তান্তটা বিশদ করেন।

সেখানেও টিকিট ঘরের সামনে ঠিক এই রকম ভিড়—এখানকার মতই লম্বা লাইন। তিনি সেই কিউয়ের ভিড়ে গিয়ে ভিড়ছেন। একটা লোক এগিয়ে এলো অযাচিতই; এসে বলল আপনি মোটা মানুষ এর ভেতরে গিয়ে কষ্ট করবেন কেন? আমায় দিন, আমি আপনার টিকিট কেটে দিচ্ছি। নিজের টিকিট তো কাটতেই হবে আমাকে, যেতেই হবে ওর মধ্যে।

তিনি তার হাতে টিকিটের টাকাটা দিয়েছেন। তারপরে কড়া নজর রেখেছেন তার ওপরে।

লোকটা ধীরে এগুতে থাকে। কিউয়ের লেজ ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূর। সেই লেজ ধরে এগিয়ে চলেছে লোকটা। লাইনের লেজ মুড়ো দু-দিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল, কিন্তু মধ্যে লেজ খেলে কোথায় যে লোপাট হলো তার পাত্তা পাওয়া চকিতের গেল না! নিমেষে হাওয়া!

এই বলে দাদা আবার সেই বিজ্ঞাপনটার ওপর নজর দেন, সেখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা, জ্বলজ্বল করছে এখনো—'চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই রহিয়াছে, সাবধান!'

তারপর তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা ভাইয়ের ওপরে টেনে আনেন—'এর মানে বুঝলি এবার?'

'বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে তুমি অমন করে সন্দেহ ভরে আমার দিকে তাকাচ্ছো যে?' ফোঁস করে ওঠে সে, 'আমি তোমার নিকটেই আছি বটে কিন্তু কোন চোর ছ্যাঁচোর নই—স্পষ্ট করে কই।'

'সে কথা আমি বলেছি? চোরামি ঠকামি করতে বুদ্ধি লাগে—সেই বুদ্ধি তোর ঘটে কই? আর সে জন্যেই আমার এতো ভয়। এই শহরের চতুর্দিকেই যতো বদলোক'—হর্ষবর্ধনের বিস্তৃত বিবরণ—'অলিতে গলিতে পোস্টাপিসে ইস্টিশনে। শহরটার হাড়ে হাড়ে বদমায়েশি। পোস্টাপিসে যাও, কেউ না কেউ গায়ে পড়ে তোমার মনিঅর্ডার করে দিতে চাইবে। ইস্টিশনে গেলে তো কথাই নেই, সেখানে যতো লোক টিকিট কেনার তালে ঘুরছে তাদের বেশির ভাগই টিকিট কেনার পাত্র না। ঐ রকম ভাব দেখাচ্ছে বটে কিন্তু কেউ তার নিজের টিকিট কিনবে না। পরের টিকিট কিনে দেবার জন্য ওৎ পেতে রয়েছে তারা—একেকটা আস্ত জোচ্চোর। তাদের একটাকে কাটলে দু-খানা বদমায়েশ বেরোয়। এখানে যতো ঘাঘী আর ঘুঘু আনাড়ীদের শিকার করার ফিকিরে ঘুরছে, আমি দেখে, এমন কি না দেখেই এখান থেকে বলে দিতে পারি। এখন থেকে সাবধান।'

বলে হর্ষবর্ধন মুখখানা এমন ধারা করেন যে তাঁকে বিমর্ষবর্ধন বলে গোবরার ভ্রম হয়।

'তুমি কিছু ভেবো না দাদা। কেউ আমায় ঠকাতে পারবে না। আমিও বড়ো সহজ পাত্র নই।' ভাই দাদাকে ভরসা দিতে চায়।

'হ্যাঁ, পারবে না। তোর দাদাকে, দাদার দাদা ঠাকুরদাকে পেলে ওরা ঠকিয়ে ছাড়বে। তোর আমার চেয়ে বড়ো বড়ো ওস্তাদকে ওরা ঘায়েল করছে হরবখত। চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—তাই করে বেঁচে রয়েছে ওরা। পারবে না।'

পারতপক্ষে ওরা কতো রকম পারে তার কতকগুলো দৃষ্টান্ত তিনি এনে খাড়া করেন তার পরে। কেমন করে চকচকে পেতলকে সোনা বলে চালাতে আসে, রাস্তায় কুড়িয়ে অমন সোনা-দানা কতো রাস্তায় বিলিয়ে দিতে চায়, দশ টাকার নোটকে চোখের ওপর ডবোল করে দেখিয়ে দেয়, তিনখানা তাস ফুটপাতে বিছিয়ে কতো রকমের কেরামতি করে—সেই কেরামতুল্লাদের কতো রকমের রোমাঞ্চকর কাণ্ডকারখানা তিনি কাহিনী পরম্পরায় বর্ণনা করে যান, এক বর্ণও যার নাকি মিথ্যে নয়।

'মা-ও বলেছিল আমায়', গোবরা জানায়—'যাসনে কলকাতায়। সেখানে ধরে নিয়ে আসে, এই এখানেই নিয়ে আসে আমাদের এই আসামে এনে আসামের চা-বাগানে চালিয়ে দেয় নাকি! অচল টাকার মতন।'

'তোর মা তো সব জানে। আমার কথা শোন।' মার কথার ওপর তিনি নিজের কথা পাড়েন—'সে দিতো আগে। চা-টা খাইয়ে বাগিয়ে নিয়ে চা-বাগানে চালান দিতো বটে। তারপর চা-বাগিচায় জন্মভোর খাটো খাও, চা বাগাও, খেটে মরো। সে-সব ছিল আগে, কিন্তু এখনকার এ-সব দৈত্য নহে তেমন। এরা তাদের ওপরে যায়। এরা তোকে আস্ত গিলবে। আস্ত রেখেই বার করে দেবে কিন্তু তুই ভেতর-ফোঁপরা হয়ে যাবি। তোকে একেবারে অন্তঃসারশূন্য করে দেবে। গজভুক্ত কপিত্থ দেখেছিস? দেখিস নি? আমিও দেখিনি, তবে শুনেছি। গজরা আর বিদ্যাদিগ্‌গজরাই সে চিজ দেখেছে কেবল—সে ভারী ভয়ানক। দেখলে লোকে ভির্মি খায়। এ-সব ঠক' জোচ্চোররা তোকে সেই কপিত্থ করে দেবে। কপির চেয়েও তা খারাপ নাকি, তাই বানিয়ে দেবে তোকে। কোথাও তোকে চালান না দিয়েই তোর যা-কিছু-সব আমদানি করে নেবে। তুই টেরটিও পাবি না। যদি পাস তো পাবি অনেক পরে, কিন্তু তখন পেয়ে আর লাভ?'

দাদার মুখখানা এক গাদা প্রশ্নপত্র নিয়ে দেখা দেয়, যার কোন সদুত্তর গোবর্ধনের যোগায় না।

দাদার বলার পর থেকে দিনগুলো এমন ভয়ে ভয়ে কাটে যে, রাস্তায় বেরুলে সে ভয়ে ভয়ে হাঁটে, দেখে দেখে পা ফেলে, কি জানি কোনো আধুনিক ঠগীকে ভুলে মাড়িয়ে বসে। চারধারে তাকিয়ে চলে। ঐ জাতীয় কিছু তার পিছু নিয়েছে কিনা। কারু সঙ্গে একটা কথা কওয়ার তার সাহস হয় না। এমন কি পার্কে-টার্কে যে সব প্রস্তর মূর্তিদের সাক্ষাৎ পায়, তাদেরো যেন তার বিশ্বাস হয় না, তাদের কাছেও ফিসফিস করতে ভয় পায়।

আর প্রতিদিন বাড়ি এসে দাদার কাছে তার নিরাপদ ভ্রমণ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করতে

হয়। ঠগ জোচ্চোর দূরে থাক, পুলিস পাহারাওলাকে পর্যন্ত এড়িয়ে সন্দেহজনক সব কিছুর পাশ কাটিয়ে কেমন করে ফিরে এসেছে, তার রোমাঞ্চকর ফিরিস্তি! ঠগদের ঠোক্কর খাওয়া দূরে থাক, কারুকে একটুখানি ঠোকরাতে অব্দি দেয় নি।

কিন্তু একদিন ভারী গোলে পড়ল গোবরা। বেড়াতে বেরিয়ে ফেরার পথে মোড় ভুল করে গুলিয়ে ফেলল রাস্তা। কাউকে ডেকে জিগ্যেস করে যে পথের নিশানা জেনে নেবে, সে ভরসা তার হয় না। সে পথ হারিয়েছে কেউ টের পেলে আর রক্ষে নেই। মা বলেছে চা বাগানের কথা, আর দাদা বলেছে টাকা বাগানোর ব্যাপার—দুটো কথাই বলতে গেলে এক কথা, সমান ভয়াবহ, বানানের সামান্য হেরফের মাত্র। তা বানানের এই তারতম্যে বানানো কোন ব্যতিক্রম হবে না। বেচারী গোবরাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে—যে পথেই যাও।

সারা বিকেলটাই সে এ-পথে ও-পথে ঘুরে কাটাল, নিজের পথের কোন কিনারা পেল না। হঠাৎ তার খটকা লাগল কেমন। কে যেন তার পিছু নিয়েছে না!

পিছন ফিরে দেখল তাকিয়ে—তাই তো! অনেকক্ষণ থেকেই তো ওই লোকটা তার আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করছে, কিছু যেন তাকে বলতে চায়!

আর যায় কোথায়! দেখেই হয়ে গেছে গোবরার। তারপর যতই সে তার নজর এড়াতে চায়, এদিকে যায় ওদিকে যায়, দিগ্বিদিকে কেটে পড়ে, ততই যেন লোকটাকে আরো আরো দেখতে পায়। কি সর্বনাশ!

গোবর্ধন টক্ করে এক মেঠায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। ঠন্ করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে এক ঠোঙা জিলিপি নিয়ে সামনের টেবিলে গিয়ে চিবুতে বসে যায়। ওমা! লোকটাও তার খানিক পরেই ঢুকেছে এসে সেখানে। আরেক ঠোঙা সিঙাড়া কচুরি নিয়ে বসে গেছে তার সামনে।

ঠক জুয়াচোর গাঁটকাটা নিকটেই আছে; সাবধান। বিজ্ঞাপনের কথাটা আর দাদার সাবধান বাণী মিথ্যে না! ফাঁক পেলেই লোকটা এখন তার পকেট মারবে। যার-পর-নাই হালকা করে দেবে তাকে।

'আধাবয়সী লোকটা—কেমন তর যেন।' গোবর্ধনের সামনে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক মারে আর অর্ধ-বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকাতে থাকে যেন এমন আহামরি এর আগে আর কখনো সে দেখেনি জীবনে! এমন অস্বস্তি লাগে গোবরার। উস্খুস্ করতে থাকে।

'আপনার মুখ যেন খুব চেনা-চেনা ঠেকছে আমার। কোথাও যেন দেখেছি আপনাকে এর আগে?' কথা পাড়ে লোকটা।

'হুম্!' বলেই দুম করে উঠে পড়ে গোবরা। এক ছুটে বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। বলতে বলতে যায় - মনে মনেই—আমার মুখ আগে দেখেছো বলছো তুমি। কিন্তু তোমার ঐ পোড়া মুখ আমি এ জন্মে দেখিনি। কিন্তু না দেখেও চিনতে পেরেছি তোমাকে · তুমি হচ্ছো একটি···আস্ত একটি···তা তুমি যাই হও, আর বেশি চেনাচিনির কাজ নেই, হাড়ে হাড়ে আর চিনতে চাইনে তোমায়। নমস্কার।

নমস্কার জানিয়ে সে দূরে সরে যেতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা তার অদূরেই থাকে। ছায়ার মতন তাকে অনুসরণ করে।

গোবরা নিরুপায় হয়ে একটা পার্কের চারধারে তিন চক্কর মেরে ভেতরে ঢুকে একটা বেঞ্চির ওপরে বসে পড়ে। লোকটিও তার পাশে এসে বসে—সেই বেঞ্চেই।

এতো ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে এতো করে সে হারিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, তবুও লোকটার দৃষ্টি এড়ানো যায় নি। বৃথা আর দুশ্চেষ্টা না করে অসহায়ের মতো সেই বেঞ্চিতেই জড়োসড়ো হয়ে সভয়ে সে বসে থাকে। কি করবে?

বসেই না সে গাঢ় স্বরে ব্যক্ত করে, 'আপনাকে আমি চিনতে ভুল করিনি ছোটবাবু। আপনি মিত্তির বাড়ির ছেলে, কলকাতার কে না আপনাকে চেনে। দেখবামাত্রই চিনতে পেরেছি।'

ও বাবা! এ যে আবার মিত্রপক্ষ বলে ঠাওরায় আমায়! গোবর্ধন আঁতকায়। লোকটি যে নিতান্তই শত্রুপক্ষের তা বুঝতে তার বিলম্ব হয় না।

'স্বর্গীয় দিগম্বর মিত্তিরের ছেলে আপনি। চিনেছি আপনাকে।'

গোবরা চুপ করে থাকে। আপনি সম্বোধনে সে একটু খুশি হলেও আপনা-আপনির সম্বন্ধটা তার ভাল লাগে না।

'এতক্ষণ ধরে তাই তো ভাবছিলাম, কেন এমন চেনা চেনা ঠেকছে আপনাকে। চিনতে পারলাম এতক্ষণে। আপনাদের সেরেস্তায় সেদিন গেছি, তখনই তো দেখেছি আপনাকে। বেশি দিনের কথা তো নয়।'

গোবর্ধন তার প্রতিবাদে কেবল না-না আওড়াতে পারে কোন রকমে।

কিন্তু লোকটা তার না-কারকে আমল না দিয়ে আরো নানা কথা কইতে থাকে, 'আমার প্রস্তাবটা কি আপনি এর মধ্যে বিবেচনা করে দেখেছেন? আপনার বেলতলার বাড়িটা আমি কিনতে চেয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন ভেবে-চিন্তে পরে আমায় জানাবেন। আশা করি এখন আর আপনার কোন অমত নেই?'

গোবর্ধন বলতে যায়—কিন্তু আমি তো মশাই উক্ত চন্দ্রবিন্দু দিগম্বরের কোন দিগন্তেই যে সে-নই, এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল গোবরা, এবং সুবিধে পেলে, ন্যাড়া নয় যে তাকে বেলতলায় যেতেই হবে পৈতৃক বাড়ির কেনাবেচায় নিতান্তই এ কথাটাও সে জানাতো হয়তো কিন্তু কোন কথাই সে কইতে পারল না।

সে সুযোগই তাকে দিলেন না ভদ্রলোক। কোন কথা কানে না তুলে বলেই চললেন তিনি, 'না, আপনার কোন আপত্তি আমি শুনবো না। এখুনি কথাটার একটা নিষ্পত্তি আমি চাই। এই নিন পাঁচশ টাকা, ধরুন, আমার বায়নাস্বরূপ এটাই আপাতত দিচ্ছি...না না, হাত নাড়লে হবে না, কোন কথা শুনছিনে আপনার। বাড়িটার ওপর ভারী ঝোঁক আমার গিন্নীর, বুঝেছেন? আর অমত করবেন না দোহাই! না হয় হাজার টাকাই বায়না নিন, তারপর দাম দর ঠিক করে যা হয় বিক্রি করবার সময় চুকিয়ে দেবো আপনাকে। এখন এই হাজার টাকাই আমার কাছে আছে···দয়া করে টাকাটা নিন, কথাটা পাকাপাকি হয়ে যাক।

এই বলে ভদ্রলোক কোন ওজোর না শুনে জোর করেই একতাড়া নোট

গোবর্ধনের হাতে গুঁজে দিয়ে, পাছে দিগম্বর তনয় মত বদলে না বলে ফেলে সেই ভয়ে, তক্ষুনি সেখান থেকে উঠে এক ছুটে পার্কের গেট দিয়ে বেরিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।

গোবরা হাঁ করে বসে থাকে।

তারপর অন্যমনস্কের মতো চলতে চলতে এক সময় নিজের বাড়ির দরজায় গিয়ে পেঁছিয়।

হাঁ করে বসেছিলেন হর্ষবর্ধনও—গোবরার প্রতীক্ষায়। হারিয়ে গেল নাকি ছেলেটা? নাকি, কোন ছেলেধরার পাল্লায় পড়ে গেল? প্রায় ওকে খরচ লিখতেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় ভ্রাতৃবর এসে হাজির।

'কোথায় ছিলিস এতক্ষণ?'

'একটু ব্যবসা-বাণিজ্য করছিলাম দাদা।'

'ব্যবসা-বাণিজ্য? তোকে বার বার বারণ করে দিয়েছি না যে কোন ধড়িবাজের পাল্লায় পড়তে যাসনে। যতো সব ঘোড়েল লোক ছেলেছোকরা দেখলে ব্যবসা বাণিজ্যের নাম করে ফাঁদ পেতে ফাঁকি ফোকরা দিয়ে টাকা আদায় করে এখানে। শেয়ার বেচার কেরামতি দেখিয়ে লাটে তুলে দেয় কোম্পানি। পই পই করে বলিনি তোকে? সাধ করে তুই তাদের খর্পরে পড়তে গিয়েছিস? কতো টাকা ঠকিয়ে নিলো শুনি? ক-শো টাকা গচ্ছা গেল?'

'গচ্ছা যায়নি তেমন, বরং কিছু গছিয়ে দিয়ে গেছে আমায়। ঠকিনি বিশেষ। তবে দাদা, একটা কথা বলবো? ঠকার চেয়ে না ঠকানো বেশি শক্ত—এই জ্ঞান আমার হয়েছে।'

'এইমাত্র আমি আমার বেলতলার বাড়িখানা বেচে—বেচিনি ঠিক এখনো—বেচার বায়না, বেশি নয়, এই হাজার খানেক নিয়ে আসছি। এই দেখো।'

এই বলে ফ্যানের হাওয়ায় ঘরের ভেতরে নোটের ঝুরি সে ওড়ায়।

'অ্যাঁ! শেষটায় তুই আমার ভাই হয়ে স্বর্গত শ্রীমৎ পৌণ্ড্রবর্ধনের পুত্র হয়ে—বর্ধন-বংশের সন্তান হয়ে তুই কিনা ঠক জোচ্চোর হলি? লোক ঠকাতে শুরু করলি শেষটায়?'

ভুরি ভুরি নোট তাঁর চোখের উপর উড়ি-উড়ি আর তার নিজের চোখ ভুরুর কড়িকাঠে।

একটা চোর জুয়াচোর তাঁর এতো নিকটে এমন কাছাকাছি একেবারে বংশের মধ্যে এসে পড়বে, এ যেন তিনি ভাবতে পারেন নি। সেই ধারণাতীত দৃশ্য অবধারণ করেই তিনি হিমশিম খান।

'আমি ঠকিয়েছি কিনা ঠিক বলতে পারি না। তবে আমি লোকটাকে না ঠকাতেই চেয়েছিলাম। যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম দাদা। এমন কি এ কথাও বলেছিলাম দিগম্বর মিত্তিরের কোন পুরুষের আমি কেউ নই। কিন্তু লোকটা আমার কথায় কানই দিল না, কি করবো?'

হর্ষবর্ধনের চৌকিদারি

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন দু'ভাই বেরিয়েছেন বাজার করতে। সামান্য যা-তা কিনতে নয়, ঘর-জোড়া প্রকাণ্ড কেনা-কাটার ব্যাপারেই তাঁরা বেরিয়েছেন। একটা চৌকি কেনার দরকার।

হর্ষবর্ধনের নিজের জন্যেই দরকার। গোবরার সঙ্গে এক খাটে শোয়া তাঁর পোষাচ্ছে না আর। ঘুমোলো তো দিগ্বিদিক জ্ঞান লোপ পায় গোবরার। কথায় বলে, ঘুমন্ত না মড়া, কিন্তু ঘুমোলেই যেন গোবর্ধন ভায়া বেশি সজীব হয়ে উঠতো। তখন তার হাত-পা ছোঁড়ার বহর দেখে কে! গোবর্ধনের সঙ্গে গুঁতোগুঁতিতে পেরে উঠছেন না হর্ষবর্ধন। সারারাত যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে কিংবা আত্মরক্ষার মহড়া দিয়েই কাটাবেন, তাহলে ঘুমোবেন তিনি কখন?

এই কাল রাত্রের কথাই ধর না কেন? বেশ ঘুমোচ্ছেন, প্রায় মড়ার মতই; নির্বিবাদেই ঘুমিয়ে যাচ্ছেন; এমন সময়ে, বলা নেই, কওয়া নেই গোবর্ধন তাঁর সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি বাধিয়ে বসেছে। গোবরার ওই নিরেট মাথার সঙ্গে ঠোক্কর লাগলে, ঘুম তো ঘুম, ঘুমের বাবা অবধি চুরমার হয়ে যায়, হর্ষবর্ধনেরও তাই হয়ে গেল।

এক হাতে নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, অপর হাতটি তিনি বাড়িয়েছেন গোবরার উদ্দেশ্যে। না, ওটার কষে কান মলে দেওয়া দরকার, এক্ষুনিই — কাল-বিলম্ব না করে। এবং কানটাকে বেশ বাগিয়ে ধরেছেন, হাতে-নাতেই পাকড়েছেন, যুৎসই করে মলতেও শুরু করেছেন, কিন্তু গোবরার কোন উচ্চবাচ্য নেই অনেকক্ষণ। অবশেষে ঘুমের ঘোরেই তার আর্তনাদ শোনা যায়: 'আহ্!'

আওয়াজটা আসে কিন্তু হর্ষবর্ধনের পায়ের দিক থেকে।

হর্ষবর্ধন চোখ বুজেই হাত বাড়িয়েছিলেন, কর্ণমর্দনের জন্য। চক্ষুলজ্জার যে কোন কারণ ছিল তা নয়, তবে কানমলা এমন কি কাণ্ড যে তার জন্যে আবার কষ্ট করে চোখ খুলতে হবে? এখন চোখ খুলে এবং কেবল খুলে নয়, চোখ পাকিয়ে, ভাল করে তাকিয়ে দেখেন, কান মনে করে এতক্ষণ প্রাণপণে গোবরার পায়ের বুড়ো আঙুল তিনি দলেছেন।

ভাইয়ের পদাঘাতেও তিনি ততটা অপমান জ্ঞান করেননি, কিন্তু ভুলবশতঃ ভাইয়ের পদসেবা করে ফেলে তখন থেকে তিনি ভারি মর্মাহত হয়ে রয়েছেন। কায়ক্লেশে কোন রকমে রাত্রি কাটিয়ে সকালে উঠেই তাঁর প্রথম প্রতিজ্ঞা হয়েছে, খাট হোক, পালঙ্ক হোক, তক্তপোশ হোক, চৌকি হোক—নিদেন পক্ষে জলচৌকি, এমন কি বেঞ্চি হয় সেও স্বীকার, নিজের আলাদা শোবার জন্যে একটা-কিছু না কিনে আজ আর তিনি বাড়ি ফিরছেন না। এমন কি যদি কেবল সিংহাসনই পাওয়া যায়, তাছাড়া সামান্যতর বস্তু যদি এই কলকাতায় আর নাই মেলে, তবু তিনি পেছপা হবার নন, তা যত টাকাই লাগুক, তিনি মরীয়া আজ।

'ও-ধারের ওই দোকানটা ভারি সোরগোল লাগিয়েছে, চলতো দেখি গে, কী ব্যাপার!'

এই বলে হর্ষবর্ধন, ফুটপাথের কিনারায় এসে, রাজপথে পদক্ষেপের আগে গোবর্ধনকে হস্তগত করতে চেয়েছেন।

গোবর্ধন কিন্তু দাদার হাতে যেতে রাজি হয়নি। সে কি এখনো সেই ছোট্ট ছেলেটি রয়েছে নাকি যে, বড় ভাইয়ের হাত ধরে রাস্তা পারাপার করবে? দাদার করায়ত্ত হবার পাত্র আর সে নয়। দাদার সঙ্গে করমর্দন করবার গোবরার একেবারেই আগ্রহ নেই, সেজন্য হাতাহাতি করতে হয় সেও ভাল। আপত্তি করেছে সে, করবেই ত:

'আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি এক ছুটে, তুমি দেখ না!'

'দাঁড়া দাঁড়া! এ তোর গৌহাটির রাস্তা পাসনি, আসামের জঙ্গলও না, চলে গেলেই হলো? দেখছিস নে চারদিকে কি রকম মোটর, টেরাম আর দোতলা গাড়ি। একদম খোয়া যাবি যে! বিদেশে এসে বেঘোরে চাপা পড়বি।'

'হ্যাঁ, চাপা পড়লেই হলো। পৃথিবীটাই যেমন চাপা পড়েছে তেমনি সোজা আর কি!' গোবরা তথাপি প্রতিবাদ চালায়।

'পৃথিবী। পৃথিবী চাপা পড়ল?' বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করেন হর্ষবর্ধন: 'কবে পড়ল? পৃথিবীকে আবার চাপল কে?'

'বাঃ, জানো না? পৃথিবী যে উত্তর-দক্ষিণে চাপা, কমলা লেবুর মত—জানোনা বুঝি!'

'অতো ভূগোলের বিদ্যে ফলাসনে—' হর্ষবর্ধনের ভারি রাগ হয়ে যায় এবার: 'পাগল বলবে লোকে!' গোবরার উত্তর শুনে তাঁর ইচ্ছে করে তক্ষুনি রীতিমত দক্ষিণে দিয়ে দেন ওকে, তাঁর দক্ষিণ হাতের বিরাশী সিক্কের আন্দাজে।

কোন কথায় কর্ণপাত না করে হর্ষবর্ধন ভাইকে সবলে মুঠোর মধ্যে এনেছেন, তারপরে চারিদিকে ভাল করে, ভ্রূক্ষেপ করে দুধারের ধাবমান মোটর, ট্রাম, দোতলা বাস, সাইকেল এবং গরুর গাড়ি সন্তর্পণে বাঁচিয়ে, কখনো ঈষৎ ছুটে, কখনো থমকে থেমে, কদাচ একটা লাফ মেরে, অকস্মাৎ বা একপাক ঘুরে গিয়ে অতি সাবধানে, কোনরকমে অন্য তরফের ফুটপাতের নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। হয়েছেন এবং নির্বিঘ্নে হাঁফ ছেড়েছেন।

'আর কিছু না -' দাদার বাহুপাশমুক্ত হয়ে গোবর্ধন ব্যক্ত করেঃ 'গান-বাজনার দোকান, দাদা!'

'অ্যাঁ! তাইত! হর্ষবর্ধন বিস্ময় প্রকাশ করেছেনঃ 'কলের গানই ত লাগিয়েছে দেখছি! অবাক কাণ্ড! কলকাতার কায়দাই আলাদা? গান বাজিয়ে কান মলে পয়সা নিচ্ছে! আশ্চর্য! কিন্তু যাই বল গোবরা, শুনতে মন্দ না নেহাত! তোর বৌদির গলার চেয়ে ভাল—ঢের ঢের ভাল।'

গোবরা বৌদির ওকালতি করতে গেছেঃ 'বৌদি এখানে নেই কিনা তাই বলছ।'

'যাঃ যাঃ, তোকে আর সাউথুরি করতে হবে না। তোর বৌদি কাছে থাকলেই আমি ভয় খেতাম? ভয় খাবার ছেলে নই আমি, কেউ ভয় দেখাতে পারে না আমায়। তাহলে তোর বৌদির ওই জাঁহাবাজী গলা শুনেই ঘাবড়ে গিয়ে মারা যেতাম য়্যাদ্দিন - হ্যাঁ!'

'কেন, বৌদির গান কি খুব মন্দ?'

'চেহারাই বা এমন কী খারাপ? কেবল দুঃখ এই, চোখ বুজে থাকা যায় কিন্তু কানের পাতা বোজা যায় না কিছুতেই।' হর্ষবর্ধন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেনঃ 'চল, ভেতরে গিয়ে শোনা যাক। টাকা তো আছে, বিস্তর টাকাই সঙ্গে আছে, কত আর টিকিট কে জানে, যা লাগে দেওয়া যাবে'খন।'

দু-ভাই ভেতরে গিয়ে দু-খানা চেয়ার দখল করে বসেন। কেউ বাধা দিতে আসে না, টিকিট কিনতেও সাধাসাধি করে না কেউ। খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে গান শোনার পর হর্ষবর্ধনের কান ক্ষান্ত হয়, ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর চোখ চলকে ওঠে, দোকানের এদিকে-ওদিকে দিগ্বিদিকে পায়চারি শুরু করে দেন। দাদার কৌতূহলে বিচলিত হয়ে গোবরাও চারিদিকে তাকাতে থাকে, কিন্তু দেখবার মতো তেমন কিছুই তার চোখে পড়ে না।

'ওই যে রে! ওই দেখ! ওই কোণে রে!' হর্ষবর্ধন ভায়ের দৃষ্টি সুপরিচালিত করেনঃ 'যা কিনতে বেরিয়েছি আমরা।'

গোবরা তাকিয়ে দেখে তাইত, চমৎকার পরিপাটি একটি শয়ন-ব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলাতেই যেন কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে।

'বিলিতি চৌকি বোধহয়। কোন্ কাঠের কে জানে! কেমন রঙ! কী চমৎকার পালিশ দেখেছিস?'

'চোদ্দপুরুষেও এমন চৌকি দেখেনি!' গোবরার উৎসাহ অদম্য হয়। উচ্ছ্বাস সে চাপতে পারে নাঃ 'চুয়াত্তর পুরুষেও না, দাদা!'

'একেবারে নতুন ফ্যাশানের! বিলিতি জিনিস কিনা? পায়া-টায়া কিছু নেই, চারধার ঢাকা আবার! দেখতেও খাসা! তোর বৌদির চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ নয়! চল্, দাম করা যাক।'

'এই জিনিসটার মূল্য কত?' দোকানীকে তাঁরা জিগোস করেন।

'আড়াই হাজার।' বলে দোকানী: 'আর আপনার বাড়ি পৌঁছে দেবার কুলি খরচা একশ টাকা। স্পেশাল কুলি লাগবে কিনা এর জন্যে, যাবার ভারি হাঙ্গাম এ-সবের।'

'আড়াই হাজার! বলেন কি মশাই?' গোবরা যেন গাছ থেকে পড়েছে: 'একটা চৌকির দাম আড়াই···?' তারপর আর কথা বেরোয়নি তার।

'যাতায়াত-খরচাও ত কম না।' হর্ষবর্ধন বলেছেন: 'রাহা খরচ এত?'

'রাহা-খরচ না রাহাজানি!' টিপ্পনী কেটেছে গোবরা।

হর্ষবর্ধন নিজেকে সামলে নিয়েছেন: 'বিলেতের আমদানি, কি বলেন?' শুধু এই প্রশ্নটুকু করেছেন। তারপর তাঁর অনুমানসঙ্গত জবাব পেয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে গোবরার জ্ঞান সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছেন তিনি: 'তা এমন কি আর? তেমন কি বেশি?' দম নিয়ে নবোদ্যমে লেগেছেন, 'আড়াই হাজার বেশি কী এমন? খাস বিলেতের যে! লাটেরা শোয় এর ওপর। লাটেরা, সম্রাটেরা, সাহেবরা সব শোয়, দামী হবে না? একটু আক্রাই হবে বৈ কি!'

'ওই ধারের ওই ছোট পিয়ানোটা যদি পছন্দ হয়—' দোকানী পুনরপি জানিয়েছে: 'ওটা তেরশো টাকায় ছাড়তে পারি। মায় মুটে-খরচা, সব।'

'নাঃ, জলচৌকিতে আমার কুলোবে না মশাই! আড়ে-বহরে শরীরটা তো দেখছেন? দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কি কম কিছু?' প্রশস্তভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন হর্ষবর্ধন। নিজের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত দুঃখ।

'এই বড়টাই আমার চাই, এই নিন ছাব্বিশ শো! আজই পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু, রাত্রের আগেই যেন গিয়ে পড়ে, বুঝেছেন?'

ছাব্বিশখানা নোট গুণে দিয়ে, বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তিনি। সহাস্য বদনেই ফেলেছেন।

সেদিন রজনীতে হর্ষবর্ধনের আনন্দ দেখে কে! তাঁর নিজের বিছানা পড়েছে সেই প্রকাণ্ড পিয়ানোটায়, সমস্ত ঘরখানা জুড়েই জিনিসটার আড্ডা জমেছে বলতে গেলে।

হর্ষবর্ধন আরামে গড়াগড়ি দেন তার উপর—'বাঃ, কী চমৎকার, কী তোফা, কী তাজ্জব! আমার মতোই লম্বা-চওড়া, বাঃ! আবার কী সব কারুকার্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে! খাস বিলেতের, আজব জিনিস···'

চৌকির প্রশস্ততার স্বপক্ষে তাঁর প্রশস্তি ফুরোতে চায় না: 'ভারি সুখ হবে আজ ঘুমিয়ে। সত্যি!'

গোবরা অদূরে সাবেক খাটে ম্রিয়মান হয়ে শুয়ে থাকে। দাদার বিরহের আসন্ন সম্ভাবনা (অদ্য রাত্রে ঘুমের ঘোরে গুঁতোবার জন্যে আর কাকে পাবে?) কিংবা দাদার আনন্দের কলোচ্ছ্বাস কী তাকে বেশি কাতর করে তা বলা যায় না।

হর্ষবর্ধনের পুলক ধরে না। লাটেরা শোয়, সম্রাটেরা শোয়, বড় বড় সাহেব-সুবোয় শুয়ে থাকে যাতে, সেই দেবদুর্লভ চৌকি কিনা তাঁরই পদতলে আজ! তাঁরই দেহভার বহন করেছে সম্প্রতি! সমস্তটাই আগাগোড়া স্বপ্ন বলে তাঁর সন্দেহ হতে থাকে! বকুনি ক্রমাগত বেড়েই চলে: 'কাল সেই পাঁচশ টাকার শালখানা কেচে এসে পড়লেই ব্যস! যেমন দামী আসবাব তেমনি তার দামী ঢাকনা চাই বৈকি? শালদোশালাতেই তো মুড়তে হবে একে! তারপর আমায় পায় কে আর! তখন আমিই বা কে আর ছোট লাটই বা কে?'

যতই শোনে গোবরা ততোই আরো মুমূর্ষু হয়ে যায়; ঐ যৎসামান্য সেকেলে পদার্থটায় শুয়ে নিজেকে নিতান্ত অপদার্থ বলে ধারণা হতে থাকে তার। মুষড়ে গিয়ে ভারি সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে সে।

'গোবরা, সেই পদ্যটা কি রে? সেই যে তুমি মোরে? আহা, সেই যে পাশের বাড়ির ছোঁড়াটা পড়ছিল সেদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে?'

'রবিবাবুর না কার ছড়া নয়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রবিবাবুর! তা এমন খাটে গড়াগড়ি দিয়ে তোদের ঐ রবিবাবুর মেয়েলী পদ্য কেন, আমাদের মাইকেলের অমন দাঁতভাঙা গদ্যও গড়গড় করে পড়া যায়। আরামেই পড়া যায়। এমনি খাটে শুয়েই ত পড়তে হয়, এখনই ত পড়বার সময়! বল না, কী পদ্যটা।' গোবরাকে তিনি পুনঃ পুনঃ তাগাদা লাগান।

'কই স্মরণে আসছে না ত!' সাধু ভাষাতেই সে বলে। মনে করে গাদা করতে গোবরার ছাই গরজ পড়েছে! ও ত আর কিছু স্বর্গে যায়নি!

'নাঃ, কিছু মনে পড়ে না তোর! তোর মাথাটা বেজায় ফাঁকা, যা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় সব। ভারি উজবুক তুই। আহা, সেই যে রে, সেই তুমি মোরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে। তুমি মোরে করেছ সম্রাট!'

কিন্তু এর বেশি আর এক লাইনও তাঁর মনে পড়ে না; অগত্যা, বারবার, প্রায় বাইশবার, সেই একটা লাইন তিনি আবৃত্তি করে যান। অবশেষে, আবৃত্তির উপসংহারে, আনন্দের আতিশয্যে, পিয়ানোটাকে তিনি প্রণাম করে ফেলেন। দণ্ডবৎ ত হয়েই ছিলেন, কেবল উদ্দেশে মাথাটা ঠেকান—ঠেকান কিংবা ঠোকেন বালিশে তাঁর নিজের সাম্রাজ্যে—তার জন্যে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না তাঁকে।

তারপর আবার সেই এক লাইনের পুনরাবৃত্তির শুরু হয় তাঁর।

গোবরার অসহ্য হয়ে ওঠে! 'বাড়ছে না কেন ছড়াটা?' অনুসন্ধিৎসা সে ব্যক্ত করেই ফেলে: 'কেবল ত তখন থেকেই একটা কথাই আওড়াচ্ছ। আর গৎ নেই নাকি?'

বাড়ছে না কেন, সেই তো তার দাদারও বক্তব্য। বক্তব্য এবং জিজ্ঞাস্য। কিন্তু মনে পড়লে ত বাড়বে? তাঁর বেশ স্মরণে আছে সেই ছেলেটা আরও বেশি বাড়িয়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে অনেকখানি বাড়িয়েছিল। তা একেবারে তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়ে আছে, অন্তরের মধ্যে অন্তর্গত হয়ে। সে-সব পঙ্‌ক্তির

একমাত্রাও মুখের চৌকাঠের এধারে আনতে পারছেন না হর্ষবর্ধন। অন্দর থেকে বৈঠকখানায় আসতেই চাইছে না তারা। ভারি মুশকিল ব্যাপার!

বহুৎ ভেবে-চিন্তে, রবিবাবুর সাহায্য না নিয়ে, এমন কি কবির তোয়াক্কা না রেখেই, একান্ত নিজের অধ্যবসায়ে, তিনি আরো একটু বাড়ান। 'শুতে দিয়ে তোমার উপরে তুমি মোরে করেছ সম্রাট!'

'মিলছে না যে!' গোবরার তথাপি অসন্তোষ থেকে যায়, 'মিলছে কই? পদ্যরা সব মিলে যায় যে, সবাই জানে!'

'মিলিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি, দাঁড়া না!'

ভাইকে সবুর করতে বলে নিজেকে কবুল করতে থাকেন তিনি। আবার তাঁর আন্তরিক প্রয়াস আরম্ভ হয়। প্রায় আধঘণ্টা ব্যাপী, বহু দুশ্চেষ্টা, বিস্তর টানা-হ্যাঁচড়ার ফলে রবিবাবুর কি গোবরার কিংবা ও বাড়ির ছেলের কারু নাক-ঢোকানোর অপেক্ষা না করে অন্য কারো বিনা পৃষ্ঠপোষকতায়, সম্পূর্ণ আপনার যোগদানেই, নিজেই তিনি, নিজের অভ্যন্তর থেকেই (সেইটাই আরো বেশি আশ্চর্য ঠেকে তাঁর!) আরো একটা গোটা, বেশ মোটাসোটা লাইনকে বাগিয়ে ধরে সবলে বার করে আনেন। এবং আরো বেশি বিস্ময়কর, এবার ওরা গলাগলি মিলে যায়, নিজের থেকেই, ছড়াদের যেমন বয়াটে দস্তুর, চিরকেলে বদভ্যাস।

বাল্মীকির মত গর্বিত হন হর্ষবর্ধন। তাঁর 'মা নিষাদ' উচ্চারিত হয়, 'হে আমার খাট! উঁহু, একটা বিশেষণ দরকার খাটের সঙ্গে, খাটে খাপ খায়, মানায়, এমন বিশেষণ। হে আমার লাটকরা খাট! শুতে দিয়ে তোমার ওপরে, তুমি মোরে করেছো সম্রাট!'

এরপর গোবরা আর একটি কথাও বলতে পারে না, মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তিনশ বারো বার, একাদিক্রমে সেই তিন লাইনের বক্তৃতা শোনাবার পর তার চৈতন্য লোপ পায়। হর্ষবর্ধনও নাজেহাল হয়ে নিজের হাল ছেড়ে দেন, বেহালের মাথায়, ঘুমিয়ে পড়েন শেষে।

হর্ষবর্ধনের বপুর বিপুল চাপ ক্রমশ চৌকি বেচারার কাঠের চামড়া দাবিয়ে, তার হাড়-পাঁজরায় গিয়ে লাগে। মাঝরাতে যেমনি না তিনি পাশ ফিরেছেন অমনি বাজনা শুরু হয়ে গেছে পিয়ানোটার। হর্ষবর্ধনের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে, চমকে উঠে বসেছেন তিনি, একি! ভৌতিক কাণ্ড নাকি? নানাবিধ সুমিষ্ট আওয়াজ আসছে চৌকির ভেতর থেকেই! আশ্চর্য!

ডাকাডাকি করে তিনি গোবরার ঘুম ভাঙিয়েছেন: 'আরে, আরে, এই গোবরা! চৌকিটা বাজে যে রে। চৌকিটা বাজে?'

ভয়ানক হাঁকডাক চালিয়েছেন, গোবরার শক্ত ঘুম কি সহজে ভাঙে! কিন্তু ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঝনৎকার বেরিয়ে আসে, 'বাজেই ত হবে! অত দামী জিনিস কখনো বাজে না হয়ে যায় নাকি?'

'আরে সে বাজে নয় বাজছে যে! বাজনা লাগিয়েছে চৌকিটা! আপনা থেকেই! আশ্চর্য!' হর্ষবর্ধনের বাক্য বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে।

এবার গোবর্ধন ধড়মড়িয়ে বসে, 'তাই নাকি? অ্যাঁ? তাইত!'

দাদার লম্ফঝম্ফ এবং চৌকিদার জগঝম্ফ সমান তালে চলেছে!

হর্ষবর্ধন উৎসাহের বশে, বিছানায় ইতস্ততঃ হাত-পা ছুঁড়তে থাকেন, আর এক-এক রকমের চমৎকার আওয়াজ বেমালুম বেরিয়ে আসে। চৌকির বক্তব্য আর ফুরোয় না!

'দেখ ছস এর আগাপাশতলাই রাগ-রাগিণী! একি ব্যাপার?' হর্ষবর্ধন হাঁ করে থাকেন।

'ভারি উপদ্রব বাধালে তো!' সবরকম শুনেটুনে, গোবরা পরিশেষে বিরক্তি প্রকাশ করেঃ 'ঘুমের দফা রফা। এ আর ঘুমোতে দেবে না কোনদিন!' তার বদনমণ্ডলে বিকারের চিহ্ন দেখা যায়ঃ 'যতদিন বেঁচে থাকবে জ্বালিয়ে মারবে।'

'বাবাঃ, কে জানত বিলেতের লোকেরা চৌকিতে শুয়ে গান শোনে। এমন জানলে কিনত কে? তা, তোর বৌদি পেলে খুশি হবে খুব! স্বর্গই পাবে হাতে। এ ত চৌকি না, রোশনচৌকি!

সমস্ত খতিয়ে, সববিছু বিবেচনা করে অচিরেই তিনি আনন্দিত হয়ে ওঠেন, 'না, এতে আর শোয়া নয়, শাল মুড়ে রেখে দিতে হবে কালকে। পরে একদিন সুবিধে মতো বাড়ি পাঠিয়ে দেব, রেলগাড়ি চাপিয়ে তোর বৌদির জন্যে। সে গান-বাজনা ভারি ভালবাসে। তার সঙ্গেই ঠিক খাপ খাবে, ভাব জমবে, পোষাবে এর। শোয়াকে-শোয়া, গানকে-গান। হাঃ হাঃ। দুটোই বেশ হরদম চলবে। হ্যাঁ।'

তারপর সসম্ভ্রমে রোশনচৌকি ছেড়ে দিয়ে গোবরার খট্টাঙ্গে নিজেকে চালান করেন তিনি।

দাদাকে পুনর্মূষিক হতে দেখে গোবরা পুনরায় খুশি হয়। এমন কি, এজন্যে সে অনেকখানি কষ্ট করে ফেলে, দাদাকে আশ্বাস দিয়ে, তক্ষুনি উঠে, এ-ঘরে ও-ঘরে দৌড়ে গিয়ে, সমস্ত বিছানার যাবতীয় বালিশ যোগাড় করে আনে, তার সঙ্গে নিজের মাথার বালিশটারও ত্যাগ স্বীকার করে। সবগুলো জোট পাকিয়ে দলবদ্ধ করে তার আর দাদার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক পাহাড় বানায় সে।

'এই তো বেশ বারান্দা করে দিলাম, আর ভয় নেই দাদা! প্রাচীর ভেদ করে আমার হাত-পা চলবে না ত, ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে তক্ষুনি।' গোবর্ধন অগ্রজকে উৎসাহ দিতে চায়ঃ 'এবার তুমি অকাতরে ঘুমুতে পার দাদা— আর ভাবনা কি?'

হর্ষবর্ধন পর্বতের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেন। সভয়েই নেন, কেননা সেখানের নিদ্রার খুব বেশি ভরসা তাঁর ছিল না। ঘুসি চালিয়ে পাহাড়ে ধস নামাতে গোবরার কতক্ষণ! গান শুনতে শুনতে ঘুম দেয়া শক্ত খুব সত্যিই, কিন্তু প্রাণ হাতে করে ঘুমনোও কি খুব সহজ ব্যাপার? হর্ষবর্ধন হর্ষিত পারেন না।

হর্ষবর্ধনের বিড়ম্বনা

বাড়ি ফিরেই হর্ষবর্ধন গোবরাকে ডেকে বললেন : 'এইমাত্র একটা স্কাউট বয়েটের সঙ্গে ভাব হলো।'

'স্কাউট বয়েট! সে আবার কি?'

'স্কাউট বয়েট! তাও জানিসনে? এই যারা পরের উপকার করে বেড়ায়, তারাই হলো স্কাউট বয়েট।'

'স্কাউট বয়েট! ভারি অদ্ভুত নাম ত!' গোবর্ধন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে : 'কথাটার মানে কি, দাদা?'

'মানে? মানে আর এমন শক্ত কি? ইংরেজী কথার যা মানে হয় তাই! স্কাউট মানে হলোগে গোরু, আর বয়েট! বয়েট মানে—

গোবর্ধন এবার নিজের মধ্যে খোঁজাখুঁজি লাগায় : 'বয়েট মানে বয়াটে নয় ত?'

'বয়াটে? বয়াটে গোরু? তার মানে?' হর্ষবর্ধন বেশ একটু অবাক হন : গোরু আবার বয়াটে কি?

'অর্থাৎ যে-সব গোরু একেবারে বয়ে গেছে।' গোবর্ধন বাতলে দেয় : 'বারোটা বেজে গেছে যাদের।'

'তা ত বুঝলাম। হর্ষবর্ধন বলেন : 'কিন্তু গোরু কেন হতে যাবে ছোট্ট একটা ছেলে! একসঙ্গে এক ট্রামে এলাম এতক্ষণ। দিব্যি খাকি রঙের হাফ প্যান্ট, খাসা পোশাক পরে গলায় রুমাল জড়িয়ে পরের উপকার করতে বেরিয়েছে। কিন্তু ছেলেটা যে স্কাউট বয়েট তা আমি টের পাইনি। কি করে পাব, একটা

ছেলে পাশে বসে চলেছে এই জানি, জানলাম ঢের পরে, যখন মরতে মরতে বেঁচে গেছি তখন। আরেকটু হলেই ট্রামে কাটা পড়ে গেছিলাম আর কি! সেই স্কাউট বয়েটটাই তো বাঁচিয়ে দিলে! মানুষের উপকার করা ওদের নিয়ম কিনা!'

'বাঃ, বাঃ! সত্যি, ভারি উপকারী ত ছেলেটা! আর সব ছেলের মত নয় ত?'

'যা বলেছিস! আমি তাই ঠিক করেছি, আমিও একটা স্কাউট বয়েট হব। যাকে পাব, যাদের পাকড়াতে পারব, তাদের উপকার করে দেব। দেবই! তুই কি বলিস?'

'স্কাউট বয়েটের পোশাক ত চাই। পোশাক কই তোমার?'

'নাঃ, সে পোশাক আমার পোশাবে না। মার্কা-মারা স্কাউট বয়েট নাই-বা হলাম, এমনিই লোকের উপকার করা যায় না? ধরে-বেঁধে করা যায় না কি? করলে কী ক্ষতি?'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই হর্ষবর্ধনের টনক নড়ল, আগের দিনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

'হ্যাঁ, আজই! আজই তো! আজ থেকেই আমি পরের উপকারে লাগব। বেকার জীবন কোন কাজের না। যো পেলেই কারু না কারু, কিছু না কিছু, একটা না একটা উপকার আমি করবই! করতেই হবে, নইলে জীবন ধারণই বৃথা!'

হঠাৎ হর্ষবর্ধনের খেয়াল হলো, আচ্ছা, বাড়ি থেকে আরম্ভ করলে কেমন হয়? গোবর্ধন থেকেই শুরু করলে মন্দ কি? নিজের ভাইকেই প্রথমে পর বিবেচনা করে, পরোপকারের হাতেখড়ি হোক না কেন?

তারপর? তারপর পরের ভাইরা ত পড়েই আছে! খুশিমতো করলেই হলো।

হর্ষবর্ধন হাতের পাঁচ ধরেই আগে টান মারেন: 'গোবরা! গোবরা রে! এই গোবরা! গেল কোথায় হতভাগা?'

আশ্চর্য! তিনি উপকার করবেন, হাত ধুয়ে বসে আছেন, অথচ যার উপকার হবে তারই কিনা পাত্তা নেই। দেখো দিকি কাণ্ড!

হাঁক-ডাক পাড়তেই গোবরা এসে হাজির—'এই সকালে এত ডাক পাঁড়াপাড়ি কিসের শুনি?'

'আমি ভাবছি তোর একটা উপকার করলে কেমন হয়? অ্যাঁ?' দাদার গুরু-গম্ভীর মুখ থেকে বেরোয়।

'আমার? আমার আবার কী উপকার করবে?' গোবরা আকাশ থেকে পড়ে: 'আমার কেন?' এবং খুব ভীত হয়।

'করতে হয়। তুই বুঝিস নে। যা, এখন একটা চ্যালা কাঠ নিয়ে আয় আগে। নিয়ে আয় বলছি।'

'চ্যালা কাঠ কি হবে?' আরো অবাক হয় গোবরা।

'আনলেই টের পাবি।' দুর্বহ দায়িত্বের মোট মাথায় করে হর্ষবর্ধনের সারা মুখ তখন গুমোট : 'হাতে-নাতেই দেখিয়ে দেবো।'

চ্যালা কাঠটা হাতিয়ে নিয়ে দাদা বলেন : 'আচ্ছা, তোকে যদি আজ থেকে আমি কেবল পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়াই, সেটা কি তোর খুব উপকার হবে না?'

'আমাকে? পিঠে করে? কেন, পিঠে কেন?'

'বাঃ, চলতে-ফিরতে তোকে তাহলে বেগ পেতে হয় না। হাঁটা-চলায় কত-না কষ্ট তোর। তার বদলে কেউ যদি তোকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায় মন্দ কি?'

গোবর্ধন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে : 'বলতে পারি না। তা হয়ত একরকম মজাই হবে।'

'তাই ভাবছি, আজ থেকে তোকে পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াব। দিন-রাত তুই আমার পিঠে-পিঠেই থাকবি। বড়-বড় দেবতার যেমন পীঠস্থান থাকে, তেমনি আমার পিঠ-স্থানে তোকে প্রতিষ্ঠা করব। কেমন?'

এতখানি দেবত্বের প্রলোভনও গোবর্ধনকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, সে আপত্তির সুর তোলে : 'কিন্তু সেটা কি খুব ভাল হবে?'

'কেন হবে না? তোর উপকার হবে, তোর ভাল করা হবে, অথচ ভাল হবে না, সে কেমন কথা?'

'একটু-আধটু মাঝে-সাঝে চাপতে পেলে মন্দ হয় না—কিন্তু দিন-রাত—' তথাপি গোবর্ধনের কিন্তু কিন্তু যায় না।

'তাহলে আর কি? তাহলে আগে তোকে খোঁড়া হতে হয়, এই যা। পা-ওয়ালা কাউকে ত পিঠে বয়ে বেড়ানো ভাল দেখায় না। মানায়ও না তেমন। সেটা আর কি এমন উপকার করা হলো? খোঁড়া মানুষকে যে পিঠে তুলে নেয় সেই তো যথার্থ দয়ার্দ্র সত্যিকারের উপকারী সেই ত।'

'সে-কথা ঠিক দাদা।' গোবর্ধন সায় দেয়। 'আমার চেয়ে বরং কোন একটা খোঁড়াকে—'

'আরে, তাইত কাঠটা আনিয়েছি! আগে তোর পা ভাঙি, খোঁড়া করি, তারপর—তারপর ত—' এই বলে যেই না হর্ষবর্ধন চ্যালাকাঠসহ গোবর্ধনের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করেছেন, গোবর্ধন কি করে বলা যায় না এক মুহূর্তেই সমস্ত রহস্যটা যেন সহজে বুঝে নেয়, অপদস্থ হবার অনির্বচনীয় একটা আশঙ্কা তার ভেতরে সংক্রামিত হয়ে অকস্মাৎ তাকে ভয়ানক বিচলিত করে তোলে। তিন লাফে সিঁড়ি টপকে ছাদে উঠে চিলে-কোঠায় ঢুকে সে খিল এঁটে দেয়।

'ধুত্তোর! বাড়ির কারুর কোন উপকার আমার দ্বারা হবার নয়। দেখি, বাইরের কারোর সুবিধেমত কিছু করা যায় কিনা।' এই বলে চ্যালাকাঠকে সুদূরপরাহত করে হর্ষবর্ধন বেরিয়ে পড়লেন। গলায় একটা রুমাল জড়িয়ে নিতে ভোলেননি! পুরোপুরি বয়স্কাউট না হতে পারুন, কেননা, হাফ প্যাণ্ট পরা তাঁর পক্ষে যতটা অসম্ভব, Boy হতে পারা এতখানি বয়সে তার চেয়ে কিছু কম অসাধ্য নয়, তাই যতটা রয়-সয়, ততটাই কেবল করেছেন। রুমাল বেঁধেছেন

গলায়। বিশ্বপ্লাবী পরোপকারের বাসনা গলায় নিয়ে তিনি যে বেরিয়েছেন, সেইটে জানানোর জন্যেই ওটা জড়ান।

বড় রাস্তার মোড়ে যখন হর্ষবর্ধন পেঁছিলেন তখন তাঁর অন্তর্গত বিশ্বপ্রেমের দানা বেশ ভাল করেই জমাট বেঁধে গেছে, বিশ্বের হিত-লালসায় তখন তিনি লালায়িত। কারো-না-কারো, কিছু-না-কিছু ভাল তিনি করবেন, ভাল করেই করবেন, সুযোগ পেলেই করে দেবেন এবং করেই সরে পড়বেন। কেউ টের পাবে না, জানতে পারবে না, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জয়ঢাক বাজিয়ে তা জাহির করা হবে না। নামের জন্যে নয়, লাভের জন্য নয়, নিঃস্বার্থভাবে পরের আর নিঃস্বের উপকার—খুব বেশি না হোক, একটুও, একজনেরো অন্ততঃ। একটাই যথেষ্ট আজ।

হ্যাঁ, একটাই বা কম কি? আজ একটা ভাল কাজ, কাল হয়ত আরেকটা। পরশু আবার আরেকটা। এইভাবে বারবার। এমনি করতে করতেই ভাল কাজ করার অভ্যেস হয়ে যাবে, বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে শেষটায়। এই করে করেই ত মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

ভাবতে ভাবতে হর্ষবর্ধন একটা ফাঁকা ট্রাম দেখে উঠে পড়েন। গালিফ স্ট্রীটের গাড়ি ধর্মতলা ঘুরে যাবে। এসপ্লানেডে পেঁছিতেই প্যাসেঞ্জার ভরে ওঠে। হর্ষবর্ধনও ভাবনায় ভরতি হতে থাকেন।

কত কি ভাবনা। বাস্তবিক, পরের উপকার করা কী দুঃসাধ্য ব্যাপার! কখন, কোথায়, কার উপকার বলবেন? কি করে—কি কি করেই বা করবেন? ফাঁক কই করবার?

হঠাৎ তিনি চোখ তুলে দেখেন তাঁর সামনের সীটে হাতখানেকের মধ্যেই, একটি বয়স্ক মেয়ে কখন এসে বসেছে। তার কোলে ছোট্ট একটি শিশু। মেয়েটির রোগা লম্বা মুখ; পরিচ্ছন্ন হলেও কাপড়ে-চোপড়ে পরিষ্কার দারিদ্র্যের ছাপ। জীবন-সংগ্রামে ও যে নাজেহাল হয়ে পড়েছে, সেটা বেশ বোঝা যায়।

দেখবামাত্রই হর্ষবর্ধনের হৃদয় বিগলিত হতে থাকে। এই ত তাঁর সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগই বলতে গেলে। মেয়েটির কব্জি থেকে ময়লা একটা হাতব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগের মুখ খোলা—হর্ষবর্ধন তা লক্ষ্য করেন।

ব্যাগের ঐ অর্ধোদয়যোগে একটা আধুলি কিংবা একটা টাকাই হোক, অনায়াসে অজ্ঞাতসারে তিনি ফেলে দিতে পারেন। বাড়ি ফিরে মেয়েটি কি আহ্লাদিতই না হবে তাহলে। অপ্রত্যাশিত অর্থের মুখ দেখে কী আনন্দই না হবে ওর। না, টাকা নয়, পাঁচ টাকার একটা নোট তিনি গলিয়ে দেবেন। অচেনা উপকারের কথা ভেবে কী উদ্ভাসিতই না হয়ে উঠবে মেয়েটি! নিজে ভেবে নিজের মনেই পুলকিত হতে থাকেন হর্ষবর্ধন।

পাঁচ টাকার একটা নোট করতলগত করে আস্তে আস্তে তিনি সামনের দিকে ঝোঁকেন। উপকার করবার দুঃসাহসে তাঁর বুক দুরদুর করতে থাকে! তাক বুঝে ফাঁক গলিয়ে ফেলতে যাবেন এমন সময়ে একটা কান-ফাটানো-গলা খন্-খন্ করে উঠল, 'লোকটা আপনার পকেট মারছে।'

পাশের আসনের এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাঁর দিকে আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

মেয়েটি আর্তনাদ করে ব্যাগ সামলে নেয়। কোলের ছেলেটা ককিয়ে ওঠে। কণ্ডাক্টর টিং টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। বিপদসূচক ঘণ্টা। ট্রামের প্রত্যেকে হর্ষবর্ধনের দিকে তাকায়। হর্ষবর্ধন সঙ্গে সঙ্গে হাত টেনে নেন এবং নিজের পকেটে পুরে দেন। বোকার মতো কাজ করেন অবশেষে।

সারা গাড়িতে ভারি হৈ-চৈ পড়ে যায়। সবাই কথা বলতে থাকে। কেবল একজন অতি বলিষ্ঠ লোক বিনা বাক্যব্যয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে হর্ষবর্ধনের হাত চেপে ধরে। তারপর শান্তকণ্ঠে জিগ্যেস করে: 'দেখুন তো, আপনার ব্যাগ থেকে কিছু সরাতে পেরেছে কিনা!'

ট্রাম থেমে যায়। হর্ষবর্ধন আমতা আমতা করেন: 'আমি বলছি—বলছি—আমি—সে রকম কিছু না—'

কিন্তু কি করে তিনি খোলসা করবেন যে, ঠিক উলটোটাই তিনি করতে যাচ্ছিলেন! গাড়ির একজনও কি তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে? তাঁর নোট গলানোর কথায়?

'নাঃ, কিছু নিতে পারেনি!' মেয়েটি গজগজ করে: 'বেচারার পোড়া বরাত। চারটে সিকি আর দুটো পয়সা ছিল মোট। তাই রয়েছে। কিচ্ছু নিতে পারেনি।'

'আপনি কি ওকে পুলিসে দিতে চান?' কণ্ডাক্টার শুধোয়।

'চুরি তো করতে পারেনি, তবে আর পুলিসে দিয়ে কি হবে।'

'চুরি! চুরি না?' হর্ষবর্ধনের বর্ধস্ফুট গলা থেকে বেরোয়: 'আমি—আমি - আমি—'

'ধিক্ ধিক্! মেয়েছেলের পকেট মারতে গেছ! গলায় দড়ি দাওগে! কেন আমাদের কি পকেট ছিলো না? না, পকেটে কিছু ছিল না আমাদের? দাও ওকে ট্রাম থেকে ফেলে! দূর করে দাও!' ইত্যাদি নানান কণ্ঠ থেকে নানাবিধ বক্তব্য প্রকাশ হতে থাকল।

কণ্ডাক্টরের সময় বয়ে যাচ্ছিল। ধৈর্যও যায় যায়। তাই সে হর্ষবর্ধনকে তাড়া লাগায়: 'এই, নেমে যাও গাড়ি থেকে।'

এর উপরে আপীল চলে না। ট্রাম থেকে হর্ষবর্ধন নেমে গেলেন আস্তে আস্তে।

প্রথম পরহিত চেষ্টার এই বিপরীত ফল দেখে তাঁর মেজাজ তখন খিঁচড়ে গেছে। তিনি বেশ ঘা খেয়েছেন এবং দলে, দুমড়ে, হতাশ হয়ে গেছেন। উৎসাহের অনেকখানিই তাঁর উপে গেছে তখন। কিন্তু ভেবে দেখলে পরহিতকারীদের পথ চিরদিনই কি এমনি অপ্রশস্ত—এ-হেন ক্ষুরধার নয়? এই রকম কণ্টকাকীর্ণ-ই নয় কি? পৃথিবীর যে-সব মহৎ লোক অকালে মহাপ্রয়াণ করেছেন, যীশুখ্রীষ্ট থেকে শুরু করে যে-সব মহাত্মা পরের ভাল করতে গিয়ে বেঘোরে মারা পড়েছেন! তাঁদের এবং হর্ষবর্ধনের ইতিহাস কি প্রায় এক নয়? আস্তে আস্তে আবার তাঁর প্রেরণা আসতে থাকে।

এইভাবে ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদা স্টেশন পায়ে পায়ে পার হয়ে যান, চলতে চলতে শহর ছাড়িয়ে ক্রমে গাঁয়ের পথে গিয়ে পড়েন হর্ষবর্ধন। বেশ কিছুটা উত্তরে এসেছেন সন্দেহ নেই, কয়েক মাইলই হয়ত হবে, আধা-শহর আধা-পাড়াগাঁর মত একটা জায়গায় এসে পড়েছেন! হ্যাঁ, এই পাড়াগাঁই তিনি চান, গেঁয়ো লোকের সঙ্গই তাঁর কাম্য। শহরের লোকেদের মত সন্দিগ্ধ স্বভাব নয় তাদের। স্বভাব সন্দিগ্ধ নয়—তারাই মানুষ। কোঁচা দুরন্ত শহুরেদের মতো ওঁচা নয়—ওরাই ওঁর বাঞ্ছনীয়।

এবং এই গ্রামের মধ্যে কেউ না কেউ অভাবাপন্ন থাকতে পারে, উপকৃত হবার যার উপস্থিত প্রয়োজন, হর্ষবর্ধনের সাহায্যপ্রস্ত হতে যে বিন্দুমাত্র বাধা দেবে না। উপকৃত হয়ে যে বাধিত হবে, ধন্যবাদ জানাবে, চিরকৃতজ্ঞ থেকে যাবে—চিরদিন হর্ষবর্ধনকে বদান্য বলে সন্দেহ করবে, শহুরে লোকদের মত তাঁকে বদ বা অন্য কিছু ঠাওরাবে না।

ইতস্ততঃ দৃষ্টি চালাতেই দেখতে পান, একটি চাষার মেয়ে তরকারির মোট মাথায়—বোঝার ভারে কাতর ও কুঁজো হয়ে পথে চলেছে। তক্ষুনি তাঁর পুরোনো সংকল্প ফিরে আসে। পরের গুরুভার বহন করে হাল্কা করে দেবার বাসনা তাঁর বক্ষে চাগাড় দেয়।

হর্ষবর্ধন মেয়েটির কাছে এগিয়ে যান। স্বাভাবিক হেঁড়ে গলাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে মিঠে করে আনেন: 'দাও, ওই বোঝা আমায় দাও, আমি তোমার বাড়িতে বয়ে দিয়ে আসছি।'

মেয়েটি সন্দিগ্ধ নেত্রে ওঁর দিকে তাকায় ও বলে, 'তুমিই বুঝি? তুমিই বুঝি সেই লোক?'

'আমি, কি?' হর্ষবর্ধন ঘাবড়ে যান। 'কী বলছো?'

'পচার মার কাঁখ থেকে গুড়ের নাগরি নিয়ে পগার-পার করেছিলে তুমিই তো? সাতদিনও হয়নি যে গো। এর মধ্যেই ভুলে গেছ?'

'আমি, আমি কেন পালাব?' হর্ষবর্ধনের ধোঁকা লাগে।

'বাঃ, বাড়ি বয়ে দিয়ে আসছি এই বলে—যেমন আমার গায়ে পড়ে এসেছ গো! পচার-মার কান্নায় সাত-রাত্তির পাড়ার কারুর ঘুম হয়নি আমাদের, আর বলা হচ্ছে—আমি কেন পালাব! মরে যাই আর কি?'

'আমি নই! আমার মত অন্য কেউ হতে পারে।' হর্ষবর্ধন আমতা আমতা করেন: 'গুড়ের নাগরি আমি কখনো চোখেও দেখিনি।'

'আবার সাফাই গাওয়া হচ্ছে? ড্যাকরা কোথাকার, ডাকব নাকি সবাইকে, ডেকে জড়ো করব লোক? পচার-মা বলছিল মানুষটার গোঁফ ছিল না, এখন দেখছি দিব্যি গোঁফ! শখ করে রাতারাতি গোঁফ লাগান হয়েছে। পরকে ঠকাবার ফন্দি! ঠগ কোথাকার! দেখি তো, গোঁফটা ঝুটো কি সাচ্চা—টেনে ছিঁড়ে নিয়ে দিইগে পচার-মাকে।'

এই বলে সেই চাষার মেয়ে স্বহস্তে মাথার মোট অবলীলাক্রমে মাটিতে নামিয়ে রেখে, তার চেয়েও আরো বেশি অবলীলাক্রমে, হর্ষবর্ধনের গোঁফের দিকে অগ্রসর হয়।

হর্ষবর্ধন আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালেন না। কোথায় পরের গুরুভার বহন করবেন, না সেখানে নিজেরই গুরুভার লাঘব হবার যোগাড়। উল্টো আর বলে কাকে!

সর্বনাশ আসন্ন হলে পণ্ডিতেরা যেমন সম্পত্তির অর্ধেক ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন না—হর্ষবর্ধনও তেমনি এহেন গোলোযোগে কর্তব্যের গুরুভার পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র নিজের গুরুভার বহন করেই সরে পড়েন।

নাঃ, আর পরোপকার না। পরোপকারের আশা দুরাশা মাত্র। সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হলো! মনে মনে এই সব পর্যালোচনা করতে করতে, উর্ধ্বশ্বাসে হর্ষবর্ধন একেবারে আধ মাইল দূরে গিয়ে তবে হাঁফ ছাড়েন।

নাঃ, প্রাণান্ত করলেন, নানাভাবেই চেষ্টা করে দেখলেন, আর কিভাবে পরের উপকার তিনি করতে পারেন? অবশ্য ডুবন্ত লোককে সলিল সমাধি থেকে বাঁচানো যায়, তবে কিনা, এখন হাতের কাছে তেমন ডুবু ডুবু লোক কই, পাচ্ছেনই বা কোথায়, আর যদিই পান—হাত ধরা কাউকে পেয়েই যান তাহলেই বা কী! সাঁতারের স-ও তো তাঁর জানা নেই। উঁচু মই বেয়ে উঠে প্রজ্বলন্ত পাঁচতলা বাড়ির ধূমায়মান কুঠুরির ভেতর সেঁধিয়ে—লেলিহান অগ্নিশিখাদের ভেদ করে ছোট্ট একটা কচি মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা, পরোপকার হিসেবেই বা এমন মন্দ কি? পরোপকারের বাড়াবাড়িই বলা যায় বরং। মই-টই পায়ের কাছে রেখে, আড়ালে-আবডাল থেকে সুবিধে মত একটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে, পরোপকার করবার স্বর্ণ সুযোগ একটা সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে খুব যে কঠিন তা নয়, কিন্তু যেমন সুবিধে এলেও, হাতের লক্ষ্মী পায়েই তাঁকে ঠেলতে হবে। পায়ের মইয়ে হাত দিতেও পারবেন না। বাধ্য হয়ে নিতান্ত দুখের সঙ্গেই ঐ পরোপকারে তাঁকে বঞ্চিত থাকতে হবে—কেবল বঞ্চিত না, প্রবঞ্চিত বলা উচিত। এই দেহ নিয়ে মই বেয়ে ওঠা কি তাঁর সাধ্য? সা—তাঁর ঐ বপুকে ঠেলে তোলা কোন পার্থিব মইয়ের ক্ষমতা? না, এ জাতীয় পরোপকার-স্পৃহা তাঁর সংবরণ করাই সমীচীন··· এ-সব তাঁর নাগালের বাহিরে।

না আর পরোপকার নয়। কাল থেকে ফের তিনি মাছের ঝোল ভাতে ফিরে যাবেন—চির পুরাতন সেই সাবেক জীবনে প্রত্যাবর্তন করবেন। পৃথিবী পড়ে পড়ে পচুক, মানুষরা সব গোল্লায় যাক, তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই—ফিরেও তাকাবেন না তিনি। পরোপকারের জন্যে প্রাণ দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তার বেশি—প্রাণদানেরও বেশি, এগুতে তিনি অপারক। কিছুতেই তিনি গোঁফ বিসর্জন দিতে পারবেন না, প্রাণান্ত হতে সক্ষম হলেও, গোঁফান্ত হতে তিনি একান্তই নারাজ। তাতে কারো পরোপকার হলো চাই নাই হলো।
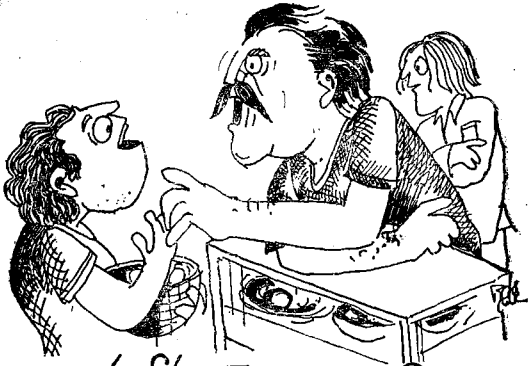
হর্ষবর্ধনের ওপর টেক্কা

হর্ষবর্ধনের বাড়ি চেতলায়। বাড়ির পিছনের ফাঁকা জায়গাটা ঘিরে করাত দিয়ে কাঠ-চেরার এক কারখানা তিনি বানিয়েছেন। তাঁর আপিস-ঘর বাড়ির একতলায়।

হর্ষবর্ধন একদিন আপিসে বসে আছেন, হিসাব দেখছেন কারবারের। এমন সময়ে একটা লোক তাঁর দরবারে এসে দাঁড়াল। নিজের এক দরকার নিয়ে বলল, 'বাবু, আপনার বাড়ির সামনের অতবড় রোয়াকটা ত একদম ফাঁকা পড়ে থাকে, ওখানে আমার মিঠায়ের দোকান খুলতে দেন না একটা।'

'কিসের মেঠাই , হর্ষবর্ধন শুধোন।

'এই সন্দেশ, দরবেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, পান্তুয়া, বোঁদে, খাজা, গজা, মিহিদানা, মতিচুর, দই রাবড়ি····' বলে যায় লোকটা।

হর্ষবর্ধন হাঁ করে শোনেন। শুনতে শুনতে তাঁর হাঁ যেন আরো বড় হয়ে ওঠে—'সন্দেশ দরবেশ······সন্দেশের দর যে বেশ তা আমার জানা আছে ভালই,' তিনি বলেন।

'আবার খাবো, দেদার খাবো,······হরেক রকমের মেঠাই বানাব আমরা।' জানায় লোকটা।

'আবার খাবো আমরা দেদার খেয়েছি।' ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন : 'ভীম নাগের দোকানের।'

'আবার খাবেন এখানে। আবার খাবোর পরে আরো আছে—দেদার খাবো, আমাদের নিজেদের বানানো। আনকোরা নিজস্ব পেটেন্ট।' লোকটি প্রকাশ করে : দেদার খেতে হবে—এমন খাসা মেঠাই মশাই!'

'বাঃ বাঃ! সে তো খুব ভাল কথা।' বলে হর্ষবর্ধনের খট্‌কা লাগে—'প্রত্যেক খাবারটাই তো পেটেন্ট। পেটে দেবার জন্যেই তো সব। তাই নাকি? ...তাহলে?'

হর্ষবর্ধনের উৎসাহ দেখে উৎসাহিত হয়ে লোকটি বলেঃ 'পেটেণ্ট মানে পেটে না দিয়ে রক্ষে নেই। তা বাবু দোকান ঘরের জন্যে আমরা কোন সেলামি-টেলামি দিতে পারবো না কিন্তু। এধারে দোকান-ঘরের দরুণ সবাই সেলামি চায়—পাঁচ-দশ হাজার টাকা। অত টাকা আমরা কোথায় পাব বাবু? তাই আপনার দুয়ারেই এলাম। সেলামি দেব না, তবে ভাড়া দেব যা ন্যায্য হয়। আর সেলামির বদলি আপনাকে সন্দেশ খাওয়াব রোজ রোজ—তার কোন দাম লাগবে না আপনার।'

'তোমাকে কোন ভাড়াও দিতে হবে না তাহলে।' হর্ষবর্ধন সঙ্গে সঙ্গে তার আর্জি মঞ্জুর করেনঃ 'আমার রোয়াক তো ফাঁকাই পড়ে আছে অমনি। তোমার কাজে যদি লেগে যায় তো মন্দ কি।'

'কাঠের তক্তা দিয়ে ঘিরে ঘরের মতন করে দোকান বানিয়ে নেব আমরা নিজের খরচায়। আর সেই দোকান-ঘরে আমি আর আমার ছেলে মাথা গুঁজে পড়ে থাকব। আমি আর ছোটকু দুজন তো লোক মোট আমরা।'

'আমার বাড়ির পিছনে কাঠের কারখানায় তুমি তক্তাও পাবে—যত চাও। এনতার নাও আর বানাও তোমার দোকান। তক্তারও কোন দাম দিতে হবে না তোমাকে।'

ব্যস্, বসে গেল মেঠাই-এর দোকান। হর্ষবর্ধনের আপিস ঘর সন্দেশের গন্ধে ভুর-ভুর করতে লাগল। আর তিনি সেই গন্ধে মাত হয়ে আরাম কেদারায় কাত হয়ে আবার খাব দেদার খেতে লাগলেন। দেদার খাব-ও খেলেন আবার—আবার।

অসন্তোষ প্রকাশ করল গোবর্ধন।—'দাদা, তুমি এসব কী বাধালে বল দেখি?'

'কেন, কী বাধালাম?' শুধালেন দাদা।

'এই রোয়াক জোড়া মেঠায়ের কারবার। পেছনে ত কাঠের কারখানা বাধিয়েছেই। এবার সামনেও একটা কাণ্ড বাধাও। কাণ্ডকারখানা কোনটারই তুমি রাখলে না।'

'কাণ্ড না বলে প্রকাণ্ড বল। কত বড় বড় সন্দেশ বানায় দেখেছিস? এক একটার দাম নাকি আট-আট আনা।'

'রোয়াকে বসে পাড়ার ছেলেদের ড্যাংগুলি খেলা দেখতাম তাতেও তুমি বাগড়া দিলে শেষটায়।' ফোঁস ফোঁস করে গোবরা।

'আপসোস করিসনে। ডাণ্ডাগুলি চোখে দেখার চেয়ে সন্দেশগুলি চেখে দেখা ঢের ভাল রে। যত খুসি খা না সন্দেশ পয়সা লাগবে না তোর। আমাদের জন্যে বড় করে স্পেশাল সাইজের বানায় আবার।'

'খাব কেন অমনি? খেতে যাব কেন? আমাদের কি কিনে খাবার পয়সা নেই নাকি? আমরা কি গরীব? পরের মিষ্টি খাব কেন অমনি অমনি?'

'মিষ্টি ত পরের থেকেই খেতে হয় রে বোকা। যে মিষ্টিই বল না, পরের পেলে, পরের খেলে মিষ্টি লাগে আরো যদি তা অমনি মেলে আবার। দেখিস না খেয়ে তুই একদিন। তা যদি না হবে তো বড় লোকেরা নেমতন্ন বাড়ি গিয়ে গাণ্ডে পিণ্ডে গিলে আসে কেন বল তো? তাদের কি পয়সার অভাব? বাড়িতে কি খেতে পায় না নাকি?'

'অমনি অমনি পরের মিষ্টি খাব তাই বলে? দাদা, তুমি চেতলায় এসে ভারী হীনচেতা হয়ে পড়েছ দেখছি!'

'অমনি কিসের? ভাড়ার বদলি তো।' দাদা জানান: 'ওইটুকুন রোয়াক-এর ভাড়া হ'ত নাকি মাসে তিনশ টাকা আর সেলামি অন্ততঃ তিন হাজার, লোকটাই বলেছে আমায়। তার বদলেই দিচ্ছে তো। ওই যে ভাঁর ভাঁর সন্দেশ দেয়, আসলে তা হচ্ছে দোকানের বদলে ওর সন্দেশের ভাড়া।'

এমন সময় দোকানদার প্রকাণ্ড এক রেকাব ভরতি সন্দেশ এনে দুজনের সামনে রাখল: 'আমার একটা আর্জি ছিল কর্তা!'

হর্ষবর্ধন একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিয়ে কান খাড়া করলেন—'শুনি তোমার আর্জি।'

'আমার ভাইঝির বিয়ে—দিন দুয়ের জন্যে দেশে যেতে হবে। কাছেপিটেই—এই হাওড়াতেই বিয়ে। বেশী দূর না। আমার ছেলে আর আমি দুজনাই যাব—এই সময়টা আমার দোকানটা দেখাশোনার ভার কার ওপর দিয়ে যাই তারই একটা পরামর্শ নেবার ছিল আপনার কাছে।'

'কেবল চেখে দেখার ভার হলে নিতে পারতুম আমরা।' হর্ষবর্ধন বলেন—'কিন্তু—'একটু কিন্তু কিন্তু হয়েই থামতে হলো তাঁকে। 'আজ্ঞে সেই ভারই ত নিতে বলছি আপনাদের—ঐ চেখে দেখার ভার। চাখবেন বইকি, হরদমই চাখবেন! যখন খুশি তখনই, সেই সঙ্গে দোকানটায় বসে একটু চোখে দেখতেও হবে, চোখও রাখতে হবে তার ওপর।'

'চোখ রাখতে হবে! কার ওপর? মেঠাই-মণ্ডার ওপরেই ত?' গোবর্ধনের প্রশ্ন।

হর্ষবর্ধন বলেন, 'সে আর এমন শক্ত কি! মেঠাই-মণ্ডা সামনে থাকলে নজর কি আর অন্যদিকে যায় কারো ভাই।'

'আজ্ঞে, নজর রাখতে হবে পাড়ার ছোঁড়াদের ওপরেই।' জানায় দোকানী: 'তারা বড় সহজ পাত্র নয় মশাই।'

'তা আপনার ছেলেকে দোকানে বসিয়ে রেখে যান না? বিয়ে বাড়িতে গিয়ে সে আর করবেটা কি। ছেলেরাই ভাল নজর রাখতে পারে ছেলেদের ওপর।' গোবর্ধন বাতলায়।

'ছোটকা থাকবে দোকানে? তাহলেই হয়েছে। এই দুদিনেই আমার দোকান ফাঁক হয়ে যাবে মশাই। সেই জন্যেই ত আরো ওকে এখানে না রেখে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওর যা এক-একজন বন্ধু আছে জানেন, দেখতেন যদি, ঘোঁৎকা,

হোঁৎকা, কোঁৎকা—কী সব নাম যেন। কিন্তু এক একটি চীজ ভারী ইতর তারা। ও তাদের লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ খাওয়ায় রোজ।'

ছোটকা বাবার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব, প্রতিবাদ করতে যায়, কিন্তু বাধা পায় হর্ষবর্ধনের কথায়—

'তা, ইতর লোকদের জন্যেই ত মেঠাই-মণ্ডা মশাই। শাস্ত্রে ত বলেই দিয়েছে মিষ্টান্ন মিতরে জনা। অর্থাৎ কিনা, মিষ্টান্নম্‌···ইতরে জনা···'

ছেলেটি বলে ওঠে ঃ 'মোটেই তারা ইতর নয় বাবু। তারা আমার বন্ধু সব। শোনো বাবা, বাবুর মুখেই শোনো—তোমার শাস্তরে কী বলছে—শোনো ওঁর মুখে। মিষ্টান্ন—মিতরে—জনা। মানে কিনা, তোমার মিতাদের জন্যেই যত মিষ্টি। তাদের তুমি খুব কসে মিষ্টি খাওয়াও। মিতা মানেই মিত্র। আর, মিত্র আর বন্ধু এক কথা — তাই নয় কি বাবু?'

গোবরা সায় দেয়—'ঠিক কথা, যাকে বলে মিতা, তাকেই বলে মিত্র, তাকেই বলে বন্ধু, ইংরেজিতে আবার তাকেই বলে ফেরেণ্ডো।'

'ওর ফেরেণ্ডোদের ঠ্যালাতেই আমায় ভেরেণ্ডা বাজাতে হবে মেঠাইয়ের দোকান তুলে দিতে হবে। হয়ত পাট তুলতেও হবে না, আপনিই উঠে যাবে দোকান। ছোটকাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর ঘাড় ভেঙ্গে বজ্জাতগুলো রোজ রোজ যা রসগোল্লা পান্তুয়া সাবাড় করে যায়—কী বলব বাবু।'

'তা বেশ ত। দুদিনের জন্যেই যাচ্ছেন ত।' গোবর্ধনের বুঝি সহানুভূতি জাগে—'এই দুদিন না হয় আমিই দেখব আপনার দোকান। এমন আর কি শক্ত কাজ। রসগোল্লার দাম দু আনা, সন্দেশের দাম ঐ, পান্তুয়ার দাম ঐ। নগদ দাম নিয়ে বেচতে হবে—এই ত ব্যাপার। তা এ আর এমন শক্ত কি?'

'সেই সঙ্গে আবার একটু নজরও রাখতে হবে যে।' মনে করিয়ে দেয় মেঠাইওলা।

'ঐ তিনজনের ওপরেই ত। কী বললেন—হোঁৎকা, ঘোঁৎকা—আর কোঁৎকা—তাই না? অবশ্যি, আমি চিনি না তাদের কাউকে, তবে নামেই বেশ মালুম হচ্ছে। হোঁৎকা চেহারার কেউ এলে তাকে আর ঘেঁষতে দেব না দোকানে—সেইটাই হোঁৎকা হবে নিশ্চয়। আর ঘোঁৎকা নিশ্চয় ঘোঁং ঘোঁৎ করতে করতে আসবে—নইলে আর নাম ওরকমটা হলো কেন?—ওর আওয়াজেই টের পাওয়া যাবে। আর কোঁৎকা যদি আমার ত্রিসীমানায় আসে—আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করে যদি, এইসা এক কোঁৎকা লাগাব ওকে যে নিজের নাম ভুলে যাবে বাছাধন।'

'ব্যস। তাহলেই হবে!' হাসিখুশির প্রচ্ছদ হয়ে উঠল দোকানদার—'কাল দুপুরের গাড়িতে যাচ্ছি আমরা। আপনি দুপুর থেকেই বসবেন তাহলে। কাল আর পরশুটা কেবল। তার পরদিন ভোরেই আমরা ফিরে আসছি।'

'কিন্তু—কিন্তু—' এবার গোবরা একটু কিন্তু কিন্তু করে—'দেখুন মেঠাই খেতে জানি, বেচতেও পারি হয়ত, কিন্তু বানাতে জানি না যে, সেটার কী হবে?'

'দুদিনের মতন সন্দেশ রসগোল্লা আর পান্তুয়া বানিয়ে রেখে গেলাম। এক কড়াই পান্তুয়া, এক হাঁড়ি রসগোল্লা, আর এক খোরা সন্দেশ।

'বেশ! বেশ! তাহলেই হলো। আমার কাজ ত এই দুদিন চোখে দেখা কেবল! তা আমি পারব খুব। তবে আমার চেখে দেখাটা তেমন হবে না হয়ত। দাদার মতন আমার তেমন হজমশক্তি নেইত বাপু!'

'তাহলে দয়া করে আপনিই বসবেন বাবু!' অনুনয় করল দোকানদার—হয়ত বা হর্ষবর্ধনের প্রতি একটু কটাক্ষ করেই মনে হয়।

পরদিন দুপুরে দোকানে বসেছে গোবর্ধন। খদ্দেরের তেমন ভীড় থাকে না দুপুর বেলাটায়—বেচাকেনার হাঙ্গামা কম। মাঝে মাঝে অবশ্যি দু-একজন আসছিল বটে, একটা জিলিপি কি একটু বোঁদে কিনতে দু-চার পয়সার। কিন্তু দু আনার নীচেই কোন খাবার তৈরি নেই জেনে ফিরে যাচ্ছিল আবার।

খানিক বাদে একটা ছেলে এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। গোবর্ধনকে সেখানে বসে থাকতে দেখে ছেলেটি যেন একটু থতমত খেয়েছে বলে মনে হলো গোবরার।—'কী চাই হে তোমার?' তাকে জিজ্ঞেস করেছে সে।

'পান্তুয়া খেতে এলাম।' সোজা বলল ছেলেটা।

'পান্তুয়া খেতে এলে! তার মানে?'

'পান্তুয়া খাই যে! রোজই খাই ত।' ছেলেটি জানায়।

'রোজই খাও, বটে। তোমার নাম কি হোঁৎকা নাকি গো?'

'কেন, হোঁৎকা হতে যাবে কেন? পান্তুয়া খেলে কি কেউ হোঁৎকা হয় নাকি?' ছেলেটি যেন অবাক হয় একটু।

'না, তা কেন হবে। এমনি শুধোচ্ছিলাম।' জানায় গোবরা।

হোঁৎকা-কথিত ছেলেটির তবুও যেন আপত্তির কারণ যায় না—'হোঁৎকা-পনাটা কোথায় দেখলেন শুনি?'

'তা বটে! ফড়িংয়ের মতই টিঙটিঙে—হোঁৎকা তোমাকে বলা যায় না বটে। তবে কি তুমি কোঁৎকা?'

'রামো! কোঁৎকা আমার চৌদ্দপুরুষের কেউ নয়!'

'তবে তোমার নামটা কি জানতে পারি একবার?'

'আমার নাম মশা। বুঝলেন মশাই।'

'মশা! অদ্ভুত নাম ত।' গোবর্ধন অবাক হয়ঃ 'এ রকম ত কখনো শুনিনি ভাই! তা, এমন নাম হবার কারণ?'

'শুনেছি আমি নাকি ছোটবেলায় মশার মতন পিনপিন করে কাঁদতাম, তাই আমার ওই নাম হয়েছে।'

'তা হতে পারে।' গোবর্ধন ঘাড় নাড়েঃ 'তা পান্তুয়া খাবে যে, পয়সা এনেছ সঙ্গে?'

'পয়সা কিসের? আমি ত অমনি খাই। রোজ-রোজই খেয়ে থাকি।'

'না, অমনি খাওয়া চলবে না বাপু। পয়সা দিতে হবে, দাম লাগবে তোমার খাওয়ার।'

'বারে, মালিকের ছেলের সঙ্গে ভাব আছে, পয়সা লাগে না আমার। শুধোন না দোকানের মালিককে!'

'মালিক নেই—সে হাওড়া গেছে তার ভাইঝির বিয়েয়।'

'মালিক হাওয়া হয়ে গেছে? কী বললেন আঁ্যা?'

'হাওয়া নয় হাওড়ায় গেছে। ভাইঝির বিয়ে দিতে।'

'বেশ ত, তাঁর বদলি যিনি রয়েছেন, তাঁকেই শুধোন না কেন। একজন ত আছেন তাঁর জায়গায়। আপনি ত দোকানের কর্মচারী—আপনি তার কী জানবেন। আমি এই পান্তুয়া খেতে বসলাম—যেমন খাই রোজ।' বলে সে পান্তুয়ার কড়াইয়ের কাছে বসে গেল ধপ্ করে।

'দাদা, ও দাদা।' হাঁক পাড়ল গোবরা—'মশায় পান্তুয়া খাচ্ছে। পান্তুয়া খেয়ে যাচ্ছে।'

'মশায় পান্তুয়া খাচ্ছে! কী যে বলিস তুই!'

ভেতরের আপিস ঘর থেকে সাড়া এল দাদার।

'বসে গেছে পান্তুয়ার কড়ায়।' গোবরা জানায়।

'বসুক গে। মশা আর কত খাবে।' দাদা জবাব দিলেন—'রসেই লেপটে যাবে। পান্তুয়ার গায়ে আর হুল বসাতে হবে না বাছাধনকে।'

'দেখলেন ত, কী বলল নতুন মালিক?' বলে ছেলেটা টপাটপ মুখে পুরতে লাগল, আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে।

হাঁ করে দেখতে লাগল গোবর্ধন। তার চোখের ওপর আধখানা কড়াই ফাঁক হয়ে গেল দেখতে না দেখতে! খেয়ে দেয়ে সে চলে যাবার খানিক বাদে আরেকটি ছেলে এল সেখানে।

'তুমি আবার কে বটে হে?' শুধাল গোবরা: 'হোঁৎকা-ফোঁতকাদের কেউ নয় তো?'

'আজ্ঞে না, আমি দোকানদারের আপনার লোক। তার মাস্তুতো ছেলে।'

'মাস্তুতো ছেলে! তা হয় নাকি আবার? কখনো তো শুনিনি। এমনটা কোন কালে হয়েছে বলে তো জানি না।'

'শোনেননি তো দেখুন এখন। মাস্তুতো ছেলে মানে, তার ছেলের মাস্তুতো ভাই। বুঝলেন এবার?'

'বুঝেছি। তা নামটা কি তোমার শুনি একবার?'

'আজ্ঞে, আমার নাম মাছি। আপনার রসগোল্লা খেতে এসেছি। রোজ রোজ আমি খাই এখানে এসে।' এই না বলে রসগোল্লার হাঁড়িটা টেনে নিলে সে।

'দাদা, ও দাদা!' আবার হাঁক পাড়ল গোবরা—'এবার মাছি এসে বসেছে তোমার রসগোল্লার হাঁড়িতে।'

আপিস ঘর থেকে এবার রাগত গলা শোনা গেল দাদার—'তুই কি আমাকে কাজ করতে দিবি না নাকি? ইয়ারকি পেয়েছিস্? একটা মাছি তাড়াতে পারছিস নে। তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে—সামান্য একটা মাছিকে তাড়াতে কতক্ষণ লাগে?'

'তাড়ানো যাচ্ছে না যে।' গোবরা জানায়ঃ 'মোটেই সামান্য মাছি নয়।'

'তাহলে বসতে দে মাছিকে। বলে আঁস্তাকুঁড়েতেই বসে, আর রসগোল্লা পেলে বসবে না?'

'বসুক তাহলে। খাক রসগোল্লা।' বলে হাল ছেড়ে দেয় গোবরা। আস্ত এক হাঁড়ি রসগোল্লা সাবাড় করে মুখ মুছে উড়ে যায় মাছিটা।

তার খানিক বাদে হাতের কাজ সেরে দাদা এসে হাজির সেখানে। দোকানের হাল-চাল দেখে তার সারা মুখ আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল: 'বাঃ, খাসা চালিয়েছিস ত দোকান।' বাহবা দিলেন তিনি গোবরাকে—'অর্ধেক মাল ত এর মধ্যেই বেচে ফেলেছিস দেখছি।'

'বেচতে আর পারলাম কই? মশা-মাছিতেই সাবাড়ে দিয়ে গেল সব।'

'কী বললি! মশা-মাছিতে সাবাড় করে দিয়ে গেল খাবার! বলছিস কিরে?'

'তবে আর বলছিলাম কি, এতক্ষণ হেঁকে হেঁকে তোমায়? তা তুমি ত কানই দিলে না। গেরাজ্জিই করলে না আমার কথা।'

'উড়ন্ত মাছি? উডন্ত মশা?'

'মোটেই উড়ন্ত নয় দাদা। রীতিমতন দুরন্ত। দুরন্ত মশা, দুরন্ত মাছি। দুপেয়ে সব।'

'মশা-মাছিদের পাল্লায় পড়ে একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে গেছিস দেখছি!' হর্ষবর্ধন বলেন—'এরাই সেই হোৎকা কোৎকার দল ত বুঝলি রে? দাঁড়া, এবার আমি বসছি দোকানে। অর্ধেক খেয়ে গেলেও অর্ধেক পড়ে আছে এখনো। নগদ দামে এটা বেচতে পারলেও লাভ না হোক, দোকানের লোকসানটা বাঁচবে অন্ততঃ।'

গোবর্ধন উঠে দাঁড়াল। হর্ষবর্ধন বসলেন পাটিতে।

একটি ছেলে এসে পান্তুয়া চাইল এবার। গোবর্ধন বলল: 'ঐ দাদা, আবার একজন এসেছে। ওদের জাত-গুষ্টিই নিশ্চয়।'

'তুমি কি পিঁপড়ে নাকি হে?' জিজ্ঞেস করেন দাদা। পিঁপড়ে মানে পিপীলিকা। সাধু ভাষায় কথাটা আরো পরিষ্কার করেন তিনি, 'মানে, এখানকার বেশির ভাগ লোকই তো মশক, মক্ষিকা, আর পিপীলিকা।'

'বেশির ভাগ লোকই পিপীলিকা?'

'কেন, কথাটা কি ভুল হলো নাকি? লোকদের ইংরাজিতে কী বলে শুনি? পীপল বলে না?'

'গাছকে ত বলে থাকে জানি।' ছেলেটি জানায়: 'বলে পিপুলের গাছ।'

'তা তোমার লোকেরা মশা মাছি না হোক, এখানকার বালকরা ত বটেই।' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন এবার।

'কিন্তু আমি পিঁপড়ে হতে যাব কেন শুনি! আমি ত পান্তুয়া কিনতে এসেছি।'

'ও, পান্তুয়া কিনবে? তা বেশ বেশ।' উৎসাহিত হন এবার হর্ষবর্ধন—'কত পান্তুয়া চাই তোমার?'

'কিলো খানেক।'

'পাঁচ টাকা দাম পড়বে কিন্তু।'

'পড়বে ত কি হয়েছে। দেব দাম।' ছেলেটি বলল ঃ 'পান্তুয়ার কিলো পাঁচ টাকা করে—তা কে না জানে?'

'যাক্, কেনার বদভ্যেস আছে তাহলে তোমার—ভাল কথা।'

একটা বড় ভাঁড় ভর্তি কিলো খানেক পান্তুয়া ওজন করে তার হাতে তুলে দিলেন হর্ষবর্ধন—'এই নাও। দামটা দাও ত দেখি এবার।'

'না, এ পান্তুয়া আমি নেব না। কেমন যেন দেখছি পান্তুয়াটা। খাবলানো খাবলানো।' ছেলেটি বিরস মুখে ফিরিয়ে দেয় ভাঁড়।

'হ্যাঁ ভাই, যা বলেছ। একটা মশায় একটু আগে খাবলে গেছে ওগুলো।' গোবর্ধন সায় দেয় তার কথায়।

'মশায় পান্তুয়া খায়? বলছেন কি আপনি?' অবাক হয় ছেলেটা, তারপর নিজেই সে তার কথার জবাব দেয় ঃ 'তা খেতেও পারে মশাই। চেতলার মশার অসাধ্য কিছু নেই। শুনেছি একবার তেতলার থেকে একটা লোককে চ্যাং-দোলা করে তুলে নিয়ে গেছল হাজার হাজার মশায়। তারপর তার রক্ত শুষে খেয়ে না, ছিবড়েটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছল রাস্তায়। শুনেছি বটে।'

'তুমি তা শুনেছ কেবল। আমি নিজের চোখে দেখলাম।' গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

'তাহলে ঐ পান্তুয়া আমার চাইনে। আপনারা আমায় কিলো খানেক রসগোল্লা দিন ওর বদলে। তার দামটা কত পড়বে?'

'রসগোল্লা পান্তুয়া ঐ একই দাম। ঐ পাঁচ টাকাই। দু আনা করে পিস যখন দুটোরই।'

'রসগোল্লাটা আবার মাছি বসা নয়ত মশাই?'

'ধরেছ ঠিক।' বলল গোবরা—'মাছি বসাই বটে।'

'আপনারা মাছি বসানো রসগোল্লা দিচ্ছেন আমাকে। মাছিরা যেখানে সেখানে—যতো নোংরা জায়গায় গিয়ে বসে। যতো বীজাণু ফীজাণু নিয়ে আসে। খেলে অসুখ করে। নাঃ, আপনি ওর বদলে পাঁচ টাকার সন্দেশ দিন আমায়। সন্দেশও ঐ দু আনা করেই পিস ত?'

'হ্যাঁ।' বলে ঘাড় নেড়ে হর্ষবর্ধন তাকে খোরার থেকে চুবড়ি ভরে সন্দেশ সাজিয়ে দেন। সন্দেশের চুবড়ি নিয়ে ছেলেটি চলে যেতে উদ্যত হয়।

'ওহে দামটা দিয়ে গেলে না?' বাধা দেয় হর্ষবর্ধন ঃ 'আসল কাজই ভুলে যাচ্ছ যে।'

'কিসের দাম?' চুবড়ি হাতে ফিরে দাঁড়াল ছেলেটা।

'সন্দেশের দামটা।'

'সন্দেশের দাম দিতে যাব কেন? সন্দেশ ত আমি রসগোল্লার বদলে নিলাম।'

'বেশ, রসগোল্লার দামটাই দাও তাহলে।'

'রসগোল্লা ত আমি পান্তুয়ার বদলেই নিয়েছি।'

'আহা, পান্তুয়ার দামটাই দাও না গো।'

'পান্তুয়ার দাম দিতে হবে কেন শুনি?' ছেলেটি ভারী বিরক্ত হয় এবার। পান্তুয়া আমি নিলাম কখন? ও ত আমি নিইনি। যা নিলাম না, তার আবার দাম দেব কেন? যা নিইনি, তারও দাম দিতে হয় নাকি?'

ছেলেটি চলে যায় দেখে হর্ষবর্ধন তাকে ফিরে ডাক দেন আবার—'ওহে, শোনো শোনো। দাম চাচ্ছিনে, একটা কথা কেবল জানতে চাইছি। একটু আগে যারা মশা মাছির ছদ্মবেশে এসে খেয়ে গেছে, তাদের নাম কি হোঁৎকা আর…?'

'আর ঘোঁৎকা। ধরেছেন ঠিক।' ছেলেটি ফিক করে হেসে ফ্যালে।

'আর তোমার নামটা?'

'আর আমি হচ্ছি কোঁৎকা।' যেতে যেতে চুবড়ির থেকে সন্দেশ খেতে খেতে বলে যায় ছেলেটা। কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলতে গিলতে চলে যায়। হর্ষবর্ধন হতবাক হয়ে থাকেন।

'গেছে, গেছে, তার জন্য মন খারাপ কোর না দাদা।' গোবর্ধন সান্ত্বনা দেয় দাদাকে—'তোমাকে ত আমার মতন তেমন ল্যাজে গোবরে হতে হয়নি। তাহলেও বলতে হয় দাদা, তোমার এই কোঁৎকাটাই ভারী জবর হয়েছে। তাই না দাদা?'

নিজের ল্যাজের গোবরটাই যেন দাদার মুখের উপর ভাল করে লেপে দেয় গোবরা।

'কোঁৎকা দিয়ে গেল বলছিস কিরে! কোঁৎকার ওপর আরো কোঁৎকা লাগিয়ে গেল আমায়!' হা-হুতাশ করেন দাদা: 'আধ খোরা সরেশ সন্দেশ নিয়ে গেল ছোঁড়াটা। আমার—আমার একবেলাকার খোরাক।'
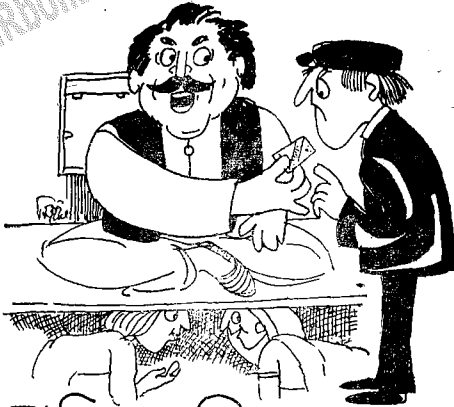
মামির বাড়ির আবদার

'রানাঘাট যাবে বলেছিলে, বেরুবে কখন ?' গোবর্ধন এসে দাদাকে শুধাল ঃ 'মামার বাড়ি যাবে না আজকে ?'

'যাবই ত।' জবাব দিলেন হর্ষবর্ধন ঃ 'যা তোর বৌদির কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ায় গে। ট্রেন ভাড়া লাগবে না ?'

গোবরা ছুটল বৌদির কাছে। হর্ষবর্ধন পেছন থেকে হাঁক দিলেন ঃ 'তোর বৌদিকে তৈরি হতে বল। সেজে-গুজে তৈরি হয়ে নিক, বুঝলি ?'

গোবরা একখানা একশো টাকার নোট নিয়ে ফিরে আসে ঃ 'এতে কুলোবে ? জিগেস করছে বৌদি।'

'ঢের ঢের।' জানালেন দাদা ঃ 'আমার কাছেও ত খুচরো কিছু আছে। তাতেই ট্যাক্সি ভাড়া-টাড়া হবে। চাই কি—' বলে একটু মুচকি হাসলেন হর্ষবর্ধন—'এই ফাঁকে এই টাকাতেই তোদের আবার মামির বাড়িও ঘুরিয়ে আনতে পারি।'

মামির বাড়ি!' গোবরা শুনে ত অবাক ঃ 'মামির বাড়ি কি আবার আলাদা জায়গায় নাকি ?'

'মামি দেখেছিস কখনো ?'

'দেখব না কেন ? মামার সঙ্গেই দেখেছি মামিকে। এক জোড়া মামা-মামিকে একসঙ্গে। একবার নয়, একশোবার !'

'আরে সে মামি নয় রে মুখ্যু। এ হচ্ছে সেই মামি যে মামির মামা নেই। মামা হয় না।'

'যাঃ, তা কি কখনো হতে পারে ?' গোবরার বিশ্বাস হয় না। মামারা হচ্ছে কবিদের মতই বর্‌ন্‌ (born) জিনিস। যেমন কিনা হয়ে থাকে বর্‌ন্‌ পোয়েট। মামাজ্‌ আর বর্‌ন্‌, বাট মামিজ্‌ আর মেড। মায়ের ভাই হয়ে জন্মাতে পারলেই মামা হয়, কিন্তু অনেক ঘটা করে আনতে হয় মামিদের। মামা বিয়ে করলে তবেই মামি। মামাকে যে বিয়ে করে সেই হচ্ছে মামি! মামি কিছু দাঁতের মতন আপনা থেকে গজায় না।

'আরে, সে মামি নয়। মিশরের মামি।'

'মিশর আবার কেটা ? নামও শুনিনি ত। মিশর আমাদের কোন্‌ মামা গো ?'

'মিশর আমাদের কোন মামা নয়। যাদুঘরে থাকে যে মিশরের মামি সে-ই মামি আজ তোদের দেখিয়ে আনব চ। মামির বাড়ি হয়ে তারপরে আমরা মামার বাড়ি যাব।'

যাদুঘরে গিয়ে মামি দেখে ত গোবরার বৌদি হতবাক !—'ওমা, এই তোমার মামির ছিরি ! এই তোমার মিশরের মামি ?'

'মড়া যে। অনেকদিন আগেই মারা গেছে। মারা গেলে কি আর চেহারা ঠিক থাকে গা ? ধরো, আমি মারা যাবার পর কি আমার এই চেহারা থাকবে ?'

'আ-মরণ ! কথার ছিরি দ্যাখ।' হর্ষবর্ধনের বৌ বলেন ঃ 'বালাই ষাট !'

হর্ষবর্ধন আরও ব্যক্ত করেন ঃ 'ওষুধ লাগিয়ে এমন করে রেখেছে।'

'বাসি মড়া—তাই বল। রীতিমতন বাসি মড়াই।'

মামির কফিনের গায়ে একটা টিকিট লাগান ছিল, তাতে লেখা—B. C. 2299 ; গোবরা সেইদিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ 'এটা কি গো দাদা ? কিসের নম্বর ?'

দাদারও চোখে পড়েছিল টিকিটটায়। তিনি মাথা নেড়ে বললেন ঃ 'এটা আর বুঝতে পারছিস নে হাঁদা ?' বুঝিয়ে দেন দাদা ঃ 'যে মোটর চাপা পড়ে মেয়েটি মরেছিল এটা হচ্ছে সেই গাড়ির নম্বর রে।'

'আহা-হা ! মোটর চাপা পড়ে মারা গেল মেয়েটা !' শ্রীমতী হর্ষবর্ধনের শুনে দুঃখ হয় ঃ 'এইজন্যেই বলি তোমাদের, সাবধানে চারপাশ দেখে, হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলতে। তা কি তোমরা আমার কথা শুনবে ? এখন, এই দেখে যদি তোমাদের শিক্ষা হয় ত বাঁচি।'

'হেঁ-হেঁ, আমাকে আর কোন মোটরের চাপা দিতে হয় না।' কথাটা হেসেই উড়িয়ে দেন হর্ষবর্ধন ঃ 'বপুখানা দেখেছ ত গিন্নী ? কোন মোটর ভুলে আমার সঙ্গে লড়তে এলে নিজেই উল্‌টে পড়বেন—' বলে হাসতে হাসতে হর্ষবর্ধন একটা সিগ্রেট ধরালেন।

'কোন লরী ?' গোবর্ধন জানতে চায় ঃ 'লরী আসে যদি ?'

'লরী ? লরীর সঙ্গে লড়ালড়িতে বোধ হয় আমি পারব না।'

এমন সময়ে যাদুঘরের এক কর্মচারী এসে বলল—'মশাই, সিগরেটটা নিবিয়ে ফেলুন আপনার।'

'কেন বলুন ত? নিজের পয়সায় খাচ্ছি। আপনার পয়সায় নয়।' হর্ষবর্ধন বলেন: 'মামার বাড়ির, আই মীন মামির বাড়ির আবদার নাকি?'

'হ্যাঁ মশাই, তাই।' কর্মচারী জানান: 'মামির ঘরে সিগরেট খাওয়া নিষেধ।'

'কেন, খেলে কী হয়?' গোবরা জানতে চায়।

'জরিমানা হয়। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। সামনেই ত নোটিশ ঝুলছে দেখছেন না?'

সত্যিই তাই। দেওয়ালে লটকান নোটিশ: 'সিগারেট খাওয়া দণ্ডনীয়। এখানে সিগারেট টানিলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।'

'নেবানো তো যায় না। সবে ধরিয়েছি মাত্তর। দু-টানও টানিনি এখনও।' হর্ষবর্ধন বলেন: 'এই নিন আপনার জরিমানা। একশ টাকার নোটখানা হর্ষবর্ধন ভদ্রলোকের হাতে দেন।

'আমার কাছে ত ভাঙানি নেই।' কর্মচারী বলেন: পঞ্চাশ টাকা এখন পাই কোথায়?'

'তাহলে কী হবে?' ভদ্রলোকের হয়ে হর্ষবর্ধন ভাবিত হন: 'তাই ত, কোথায় আপনি পাবেন এখন পঞ্চাশ টাকা। গোবরা, তুইও ধরা না হয় একটা। তাহলে ডবল জরিমানা হয়ে ওটার পুরো টাকাটাই কেটে যাবে এখন।'

'কী যে বল তুমি দাদা!' শ্রীমান গোবর্ধন ব্রীড়াবনত হয় 'তোমরা হলে গুরুজন। তোমাদের সামনে আমি কখনো সিগরেট টানতে পারি? আড়ালে আবডালে হলে না হয়—'

'তাহলে তুমিই এক টান টানো না হয় গিন্নি! টেনে দ্যাখ না একবার।'

'মরণ আর কি!' হর্ষবর্ধনের বৌ মুখ ব্যাজার করেন।

'তবে আর কী হবে? আপনিই একটা সিগরেট ধরান তাহলে—' এই বলে নোটখানা আর একটা সিগরেট ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বৌ আর ভাইকে নিয়ে হর্ষবর্ধন বাইরে এসে ট্যাক্সিতে চাপেন।

শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে তাঁর খেয়াল হলো: 'ঐ যা, আমাদের ট্রেন ভাড়ার টাকা কই? টাকা যা ছিল তা তো যাদুঘরেই খুইয়ে এসেছি—মামির বাড়ির আবদার রাখতেই গেছে একশ টাকা। এখন কি হবে, তিনখানা রানাঘাটের টিকিটের দাম সতের টাকা সাত আনা এখন পাই কোথায়?'

'গোবরা, তোর কাছে আছে নাকি কিছু? গিন্নি, তোমার কাছে?'

'ওমা, আমি কোথায় পাব?' গিন্নী বলেন: 'আমার ট্যাঁকে কি টাকা থাকে? আমার কি ট্যাঁক আছে নাকি!' গোবরা কিছু বলে না, পাঞ্জাবির পকেট উলটে দেখিয়ে দেয়।

'তবেই তো মুশকিল।' হর্ষবর্ধন মাথা চুলকান: 'গিন্নি, তোমার ট্যাক ট্যাক আছে কিন্তু ট্যাঁক নেই?' তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

'বাড়ি ফিরে যাই দাদা।' গোবরা বাতলায়।

'পাগল হয়েছিস? মামার বাড়ির জন্যে পা বাড়িয়ে বাড়ি ফিরে যাব—

বলিস কি রে ? একবার সেখানে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। তখন মামার কাছে চাইলেই হবে। ফিরতি ভাড়ার জন্য কোন ভাবনা নেই।'

'মামার বাড়ির আবদার, বলেই দিয়েছে।' গোবরা বলে দেয়।

'কিন্তু সমস্যা এখন যাই কি করে ? গিয়ে পৌঁছুই কি করে ? আমার কাছে খুচরো যা আছে, হর্ষবর্ধন এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে কুড়িয়ে বাড়িয়ে দ্যাখেন, তাতে কুল্লে একটা হাফ-টিকিট হয়, তার বেশি হয় না ঃ 'যাক, ওই হাফ-টিকিটেই হয়ে যাবে !'

'তুমি বল কি গো ?' হর্ষবর্ধনের বৌ আপত্তির স্বর তোলে ঃ 'তিন তিনজন সোমত্ত মানুষ একটা হাফ-টিকিটে যাব আমরা ?'

'তা কি কখনো হয় দাদা ?' গোবরাও গাঁইগুঁই করে।

'হয় বই-কি। অঙ্কের মাথা থাকলেই হয়। অঙ্কের জোরেই যাওয়া যায়।'

এই বলে হর্ষবর্ধন আর কথা না বাড়িয়ে রানাঘাটের থার্ড কেলাসের একটা হাফ-টিকিট কিনেন ঃ 'একবার ত মামার বাড়ি গিয়ে পড়ি কোন রকমে, তারপর দেখা যাবে। ফিরব দেখিস ফাস্ট ক্লাসে।'

রানাঘাট লোকাল প্লাটফর্মে খাড়া ছিল। একটা খালি কামরা দেখে তাঁরা উঠলেন। উঠে বসলেন বেঞ্চিতে।

হর্ষবর্ধন বললে ঃ 'তোমরা বেঞ্চির উপরে বস না গো। তলায় ঢুকে যাও, বুঝলে ? কেবল আমি একলা বেঞ্চির ওপর বসব।'

'কেন ? তুমি কি লাট সায়েব ?'

'আবার জিগোস করে কেন ! টিকিট কই তোমাদের ? এক্ষুনি চেকার আসবে, বিনা টিকিটে যাচ্ছ দেখলে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেবে, তখন। যাও, ঢুকে পড় চট করে। তুইও সেঁধিয়ে যা গোবরা।'

জেলের ভয় দেখিয়ে ভাই আর বৌকে তিনি বেঞ্চির তলায় ঠেলে দেন। নিজে বসেন বেঞ্চির ওপর গ্যাঁট হয়ে। গাড়িও ছেড়ে দেয়।

কয়েক স্টেশন যেতে যেতে পাশের কামরা পেরিয়ে চলতি গাড়িতেই চেকার এসে ওঠে ঃ 'টিকিট দেখি।'

হর্ষবর্ধন টিকিট দেখান।

'হাফ টিকিট, এ কি ?' চেকার তো অবাক ঃ 'এত বড় বুড়ো ধাড়ি হয়ে হাফ টিকিটে যাচ্ছেন, সে কি মশাই ?

'কেন যাব না ?' হর্ষবর্ধন প্রতিবাদ করে ঃ 'অঙ্কের জোরেই যাচ্ছি।'

'অঙ্কের জোরে, সে আবার কি ? বুঝতে পারলাম না ত !'

'অঙ্কের মাথা থাকলে ত বুঝবেন ? বেঞ্চির তলায় একবার তাকিয়ে দেখুন না ! বুঝবেন তাহলে।'

সোনার ফসল

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে ডাক দিলেন, 'আয় গোবরা, আজ আমরা বন-মহোৎসব করি, আয়।'

'আজকে বন-মহোৎসব ? আজ কি ভাইফোঁটার দিন নাকি ?' গোবরা ত অবাক।

'ভাইফোঁটার সঙ্গে বন-মহোৎসবের কি ?' হর্ষবর্ধনও কম অবাক হন না।

'ভাইদের নিয়ে বোনদের উৎসব সে ত ভাইফোঁটার দিনেই হয় আমি জানি,' গোবরা প্রকাশ করে।

'তুই একটা হস্তীমূর্খ্য !' হর্ষবর্ধন রেগে যান, 'আরে হতভাগা, সে হলো ব-এ-ওকার বোন। আর এ বন হলো গিয়ে 'ব' আর 'ন' ঢুকল তোর গোবর ভরা মাথায় ?'

'ব' আর 'ন' ? গোবর্ধন মাথা চুলকায়।

'হ্যাঁ। এ বনের মানে হলো অরণ্য—গাছপালা···বিটপী-দ্রুম। বুঝেছিস এবার ?'

দ্রুম শুনে একটু ভড়কে গেলেও গোবরা বুঝবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে তার দাদা আর একটি প্রশ্নবাণ ছাড়েন, 'কি করে ফল লাভ হয়, বল ত ?'

'ফল লাভ ? পরিশ্রম করলে ফল লাভ হয়। কে না জানে ?'

আরে আরে সে ফল না। যে ফল গাছের ফল। আম গাছে, জাম গাছে কাঁঠাল গাছে ফলে থাকে। আম, জাম, কাঁঠাল এইসব ফল। কি করলে হয় ?'

'আমি কি করে বলব ?' গোবরা বলে, 'সে তোমার ওই গাছেরাই জানে।'

'গাছেরা ত জানবেই। কিন্তু আমাদেরও জানতে হবে। বাগান করলে সেই ফল লাভ হয়! আম বাগান, জাম বাগান, কাঁঠাল বাগান—'

'বাগানের থেকে যেমন হয় দাদা, তেমনি আবার বাগানোর থেকেও হতে পারে।' গোবর্ধন বলতে যায়, 'বাগানোর দ্বারাও হয়ে থাকে···'

'বাগানোর দ্বারাও হতে পারে, কি রকম বাগানো? শুনি তো?

'এই যেমন ধর, পরের বাগানে ফল আছে, তুমি করলে কি, চারিধারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গাছে উঠে সেই ফল বাগালে, তারপর নিঃশব্দ···'

বলতে গিয়ে গোবর্ধন স্তব্ধ হয়ে যায়।

'চুপ করলি যে! নিঃশব্দ বলেই আর শব্দটি নেই!'

'কথাটা শক্ত কিনা, মনে আসছিল না। তারপরে করলে কি, সেই সব ফল বাগিয়ে নিয়ে তুমি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গাছের থেকে নেমে এলে।'

'হয়েছে, বুঝেছি। পরের গাছে শুধু তোর মতন হনুমানরাই হানা দেয়। তুই দিতে পারিস। আমি ত আর হনুমান নই। আমার ত ল্যাজ নেই। ও-সব বাজে কথা রাখ—আমার সঙ্গে আয়।'

এই বলে হর্ষবর্ধন গোবরাকে নিয়ে বাড়ির পেছনে যে বিঘেটাক তাঁর পড়ো জমি পড়েছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হলেন।

'এই জমিটা দেখছিস? আর দ্যাখ ওই ধারে একটা কোদাল পড়ে আছে, তার পাশে একটা খুরপিও পাবি। এই জমিটা আগাগোড়া কোপাতে হবে। পারবি ত?'

'কেন দাদা, এই জমিটার ওপর তোমার এত কোপ কেন? এ ত বেশ পড়ে আছে। তোমার কী করেছে এ?'

'কিছু করেনি। কিচ্ছু করে না···একদম না। তোর মতন আলসেমি করে উচ্ছন্ন যাচ্ছে দিনের পর দিন। আমি বরং কিছু করতে চাই এখানে। আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছ পুঁতে পেল্লায় এক বন-মহোৎসব। আর যদি বন-মহোৎসব না-ই ত আলু-মহোৎসব। আলু, মুলো, বেগুন এইসব ফলালে কেমন হয় বল ত?'

'ভাল হয় না। তাতে কোন ফল নেই।' গোবরা জানায়।

'কেন ফল নেই শুনি?'

'আলু, মুলো কি একটা ফল যে তাতে ফলোদয় হবে? তার চেয়ে তুমি যদি বল ত আমাদের পাশের রায়দের আম বাগান থেকে বরং কিছু আমদানি করতে পারি। চেষ্টা করলে তার থেকে কিছু ফলাও করা যায়!'

এই বলে গোবরা নিজের বক্তব্যটা সুললিত ভাষায় দাদার কাছে সুবিশদ করে দেয়। ফলাও করা কাকে বলে বুঝিয়ে দেয় তার দাদাকে।

ফলকে 'আও' বললেই কি ফল আসে? আর বাগান কুপিত করেও, কিছু ফলাও হয় না। ফল পরের বাগানে ধরে থাকে, দূর থেকে কেবল 'আও আও' করলেই তা আসবে না। তার কাছে নিজে যেতে হবে—এই চিরকালের দস্তুর। পরের বাগান আর তোমার বাগানো এই হচ্ছে নিয়ম। পরের ফল আপনার করে

আনাতেই পরম ফল। ফলের এই পরোয়ানা সবার জন্যেই। এইভাবেই ফললাভ। পরের থাকতে তোমার নিজের আবার কষ্ট করে বাগান ফলাবার দরকার কি ?'

দাদা কিন্তু ঘাড় নাড়েন—'চুরি করা হয় না তাতে ?'

'চুরি করবে কেন ? ছুরি নিয়ে বেরুবে।' বাতলায় গোবরা, 'গাছে গাছে ঘুরবে, ডালে ডালে আর পাতায় পাতায়—কারো নজরে না পড়লেই হলো।'

দাদা হাঁ করে শোনেন।

'তারপর ডাঁসাই হোক আর পাকাই হোক, আম দেখ আর কাটো—চাকলা ছাড়াও। আর চাকলাগুলো পেটের মধ্যে চালাও। চালান দাও সটান। কোথাও কোন চিহ্ন রেখ না। নিজের গায়ের ভেতর বেমালুম সব গায়েব করে ফিরে এস—হাতে করে না আনলেই হলো, ধরা পড়লেই ত চুরি ?'

কিন্তু হর্ষবর্ধনের সেই এক কথা ঃ 'আমের আমার কাজ নেই। এতখানি জমি বিফলে যেতে দেব না। আলু ফলাব। আমি। আমাকে আলু ফলাতে হবে। আলু ত তোর গাছের ডালে ফলে না! গোবর্ধনকে তিনি বলতে যান।

'কিন্তু আমি ছোলার ডালে দেখেছি যে'—গোবরা বাধা দিয়ে বলে।

'জ্যাঠাইমা বাপের বাড়ি চলে গেলে জ্যাঠামশাই নিজেই রেঁধে'খেতেন ত। ডালের মধ্যে আলু ছেড়ে দিতেন। বলতেন, তোর ঐ আলুভাতে ভাতে না দিয়ে ডালে দিলেই ভাল হয়। ডালের আলুভাতেই খেতে ভাল। আবার খিচুড়ির আলুভাতে খেতে আরো ভাল। এই কথাই বলতেন আমাদের জ্যাঠামশাই।'

'যা যা, তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না। যা বলছি কর। এই ধর কোদাল, এই নে খুরপি···আমি এখন ঘুমোতে চললুম। বিকালে উঠে যেন দেখতে পাই গোটা বাগানটা তুই কুপিয়ে রেখেছিস।'

আর বেশি কিছু না বলে দাদা পিছু ফেরেন। গোবর্ধন কোদাল নিয়ে পড়ে। ক'ষে একটা কোপ মারে মাটির ওপর—তার সমস্ত রাগ বাগানের ওপর এককোপে ঝেড়ে দেয়।

'এই যাঃ!' বলে পরমুহূর্তেই সে এক চিৎকার ছাড়ে।

হর্ষবর্ধন কয়েক পা গেছলেন। ফিরে এলেন আবার। দেখলেন গোবর্ধন এককোপে এক খাবলা মাটি তুলে ফেলেছে। সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস দেখতে পেলেন। খাবলানো মাটির গর্ভে চিকমিক করছে কি একটা।

'ওমা, এ যে মোহর রে! তিনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ 'সোনার টাকা! কোথায় পেলি রে ?'

'দেখতেই ত পাচ্ছ। ঐ গর্তের ভিতর।'

'আকবরী মোহরই হবে হয়ত! এখানে এল কি করে ?

'তা আমি কি করে জানব! আমি ত একটা কোপ মেরেছি কেবল, আর তার পরেই এই।'

'বুঝতে পেরেছি, বাদশাহী আসরফি। আগেকার লোকেরা চোর-ডাকাতের ভয়ে সোনা-দানা মাটির তলায় পুঁতে রাখত। তখন ত আর ব্যাঙ্ক ছিল না এখনকার মতন!'

'আরো আছে নিশ্চয়।' গোবরা আন্দাজ পায়ঃ 'এই মাটির তলায় আরো আছে মনে হচ্ছে।'

'আছেই ত। চারধারেই আছে! স্বভাবতই আছে।' হর্ষবর্ধন বলেনঃ 'লুক্কায়িতভাবেই রয়েছে। কুপিয়ে তুলে নেবার অপেক্ষা কেবল।'

'তাহলে আরো কোপাই, কি বল দাদা?'

'না না, তোকে আর কোপাতে হবে না। অনেক কপচেছিস। এখন যা, একটু গড়াগে যা। বিকালে ঘুম থেকে উঠে তখন আবার কাজে লাগিস—কেমন?'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে, দাদার হাতে মোহরটা জমা দিয়ে জমির কাজ বাজিয়ে নিজের চৌকির উপর জমতে যায়। জমিদারির চেয়ে চৌকিদারির কাজেই তার বেশি আনন্দ।

তারপর লম্বা একটা ঘুম লাগিয়ে ওঠে সেই বিকেলে।

উঠে উঠান থেকে মুখ বাড়িয়ে দ্যাখে—তার দাদা নিদারুণ কোপে জমি কুপিয়ে চলেছেন। সারা জমিটার কোন ধার আস্ত রাখেননি। আগাপাছতলা ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়েছেন।

'একি দাদা, করেছ কি! বাগানটার কোথাও যে তুমি বাকি রাখনি। আমি তাহলে আর হাত দেব কোথায়?'

'আর হাত দিয়ে কী হবে? কি করবি হাত দিয়ে? তারপর আর একটা মোহরও বেরয়নি।' করুণ-স্বরে জানালেন হর্ষবর্ধনঃ সেই সকাল থেকে না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে এত বেলা অব্দি এতখানি জমিই ত খামচালাম, কিন্তু আর মোহর কই?' দাদার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েঃ 'কোথায় সেই সোনার টাকা?'

'সোনার জন্য ভাবনা কিসের দাদা! এইবার তোমার কৃষিবীজ ছড়িয়ে দাও। 'ফসল আরো ফলাও'-এর সরকারী ইস্তাহারটা নিয়ে আসব? তাতে যা-যা বলছে তার-তার বীজ ছড়িয়ে দাও এখানে। তাহলেই তোমার সোনার দুঃখ ঘুচবে। এই জমিতেই সোনা ফলবে। দেখে নিয়ো।' এই বলে দাদাকে সান্ত্বনা দিয়ে গোবরা নিজের হাত বাড়ায়, 'এখন আমার মোহরটা দাও ত আমাকে।'

'তোর মোহর তার মানে? আমার জমি থেকে উঠল আর তোর মোহর?'

'আমারই ত! আমার অন্নপ্রাশনের সময় জ্যাঠামশাই যে মোহরটা আমায় দিয়েছিলেন। মনে নেই? এতদিন আমার কোমরের ঘুনসিতে বাঁধা ছিল, 'আজ কোদালের এক কোপ বসাতেই ঘুনসিটি কচাং করে হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে খসে পড়ল না মোহরটা?'

কানা গলি থেকে বার হতেই হোঁচট খেলাম। পায়ের ওপর দিয়েই চোটটা গেল। টায় টায় বেঁচেছি, প্রায় অধঃপতনের মুখে গিয়ে ঠেকেছিলাম।

কলকাতায় কানা গলি আছে এটাই শুধু জানা ছিল। তার পাশে এখন যে ফের খোঁড়া রাস্তারাও দেখা দিয়েছে তা কে জানতো! একেবারে মুখ থুবড়ো পড়ার মওকা।

কলকাতায় হাবা গলির অভাব নেই জানি। মার্কাস স্কোয়ারের মুখোমুখি যে বাসাটায় আমি থাকি, তার সুমুখের গলিটাই তো হাবা। এতো হাওয়া যে বলবার নয়। সিলিং পাখাটা না চালালেও চলে যায়।

কিন্তু হাবা হলেও বোবা নয় রাস্তাটা। মুহূর্তে মুহূর্তে হরেক রকমের হকার এমন বিচিত্র আর বিটকেল আওয়াজ হেঁকে যায় যে, অমন হাওয়াদার গলি হলে কী হবে, তাদের হাঁকডাকেই অস্থির! একটুও কান পাতা যায় না, চোখের পাতা বুজবো কি!

খোঁড়া রাস্তাটার গোড়ায় এসেই থম্‌কে গিয়ে দেখি পাশের এক ভদ্রলোক অধোমুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। আমার পতন ও মূর্ছার প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়ায় তাঁকে দুঃখিত মনে হলো। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'খুব বেঁচে গেছেন মশাই! কিন্তু···আমি···আমি কিন্তু বাঁচিনি।'

বলে তিনি লাথি দেখালেন আমাকে। সেখানে লাথি ছিল না, প্লাসটার বাঁধা ছিল: 'ক'দিন আগে পড়েছিলাম—এখানেই।' তিনি জানালেন।

'তাই তো দেখছি। আহা!' সমবেদনায় আমি সহর্ষ।

'সারা কলকাতা জুড়েই এই দশা এখন। সি. এম. ডি. এ. না কে! তাদের কীর্তি! রাস্তা গলি সব খুঁড়ে-ফুঁড়ে একাকার! উল্টোডাঙ্গায় গিয়ে দেখুন না একবার। সেখানকার সব মাটি উল্‌টে রেখেছে দেখবেন।'

'এতদিনে নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার মতন হয়েছে বটে ?' আমি বলি ঃ 'এটার দরকার ছিল।'

'মাটি পরীক্ষা করছে সেখানকার। তলা দিয়ে পাতাল রেল চলবে কি না।' তিনি জানান, 'কলকাতার চারদিকেই মাটি পরীক্ষা চলছে এখন। কবে পাতাল রেল হবে কে জানে, এখন তো হাসপাতাল।'

'হ্যাঁ, চারধারে মাটির পরীক্ষা আর শহরের ঠিক মাঝখানটিতে পরীক্ষা মাটি করার কারবার চালু হয়েছে এখন, বুঝছেন ?' আমার জবাবদিহি।

'মাঝখানটিতে আবার অন্য রকম হচ্ছে নাকি ?' তিনি জানতে চান ঃ 'ওই পরীক্ষা মাটি করার কাজটা কোথায় হচ্ছে বললেন।'

'ওই গোলদিঘির এলাকাতেই ? কেন আপনি জানেন না নাকি ?' 'বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ বি-এ সব পণ্ড করার—লণ্ডভণ্ড করার কথা বলছেন ?'

বলতে না বলতে আরেক ধাক্কা খাই ! এবার আর পায়ের দিকে হোঁচট খাওয়া নয়, একেবারে মাথায় মাথায়। এবারকার চোটটা মাথার ওপর দিয়ে যায়। ঘিলুর জায়গায় আমার যা কিছু গোবর ছিল না, চলকে ওঠে এক চোটেই !

'উফ্ ! উঃ !' হাত বুলোতে বুলোতে মাথা তুলে তাকাই—দেখি আরেক গোবর ! আমার চোট খাওয়া মাথার বার হওয়া নয়—আমাদের গোবর্ধন !

প্রকাণ্ড এক দেয়ালঘড়ি ঘাড়ে করে খোঁড়া রাস্তার কিনারা ধরে যাচ্ছে।

'এ কীক্কাণ্ড !' আমি কই ঃ 'এ আবার তোমার কি রকম দেয়ালা হে !'

'ঘড়ি ? দেখছেন না ?'

'তা তো দেখছি। কিন্তু ঘাড়ে কেন ?' আমি রাগত হই ঃ 'এ কী অনাচ্ছিস্‌টি !' 'ঘড়ি দেখতে হয় জানেন না ?'

'জানবো না কেন ? ঘড়ি ঘড়িই দেখতে হয় তাও জানি—সময়ের কোন দাম না থাকলেও সময়টা দেখার দরকার। ঘড়ির জন্য কাঁদে হয়তো কেউ কেউ, কিন্তু তাই বলে ঘড়িকে কেউ কাঁধে করে না, নাই দিয়ে মাথায় তোলে না তাকে। ঘড়ি তো ঘাড়ে করে ফেরার বস্তু নয়, হাতে পরে বেড়াবার। তুমিও ওই পেল্লায় ঘড়ি ঘাড়ে চাপিয়ে না-বার হয়ে এতই যদি মুহুর্মুহু তোমার সময় দেখার দরকার—আর সবাই যা করে—তেমনি একটা ছোটখাটো রিস্‌টওয়াচ হাতে বেঁধে বেড়াতে পারো না ?' গোবরা আমতা আমতা করে কী যেন জানায়, তার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না।

আমার সব রাগটা হর্ষবর্ধনের ওপর গিয়ে পড়ে—'তোমার দাদাই বা কেমন ? এতো টাকা উপায় করছেন ! একে ওকে তাকে বিলিয়ে দিচ্ছেন এতো এতো ? আর ছোট ভাইটিকে একটা ভাল রিস্‌টওয়াচ কিনে দিতে পারছেন না ?'

গোবরার কোন জবাব নেই—গুমরায় না মোটে, গুম হয়ে থাকে আমার কথায়।

'এর পরে রিস্‌টওয়াচ পরে বেড়াবে, বুঝেচ ?—যদি তোমার কব্জিতে কোন ঘা ফোঁড়া না থাকে। ফোঁড়া কিংবা খোস-পাঁচড়া। আর, দাদার খোশামোদ করে যদি না পাও তখন বোলো আমায়।'

'আপনি দেবেন নাকি কিনে?' মুচকি হেসে শুধায় সে।

'না, আমি কেন? কোথায় পাবো আমি? আমার তো এই একটি ঘড়ি, দিয়েছে একজন। এই টাইনি —'

'এ তো লেডিজ্ ওয়াচ মশাই?'

'হ্যাঁ তাই। আমার এক বোন তার জন্মদিনের উপহারে অনেকগুলো ফাউণ্টেন পেন আর হাতঘড়ি উপহার পেল কিনা—মেয়েরা পায় ভাই, এই দুনিয়ায় আমাদের বরাতে শুধু ছাইপাঁশ।

'মেয়েদের আপনি ছাইপাঁশ বলছেন?' সে ফোঁস করে ওঠে।

'কখন বললাম?' আমি হতবাক।

'বললেন না? ওই মেয়েরাই তো ছেলেদের বরাতে জুটে যায়।'

'সে যাই হোক' আমি কইঃ 'আমার সেই বোন তার এক একটা আমায় উচ্ছুগ্যু করে দিয়েছে?'

'সেই বৃষোৎসর্গের মতই নাকি?' সে অবাক হয়ে শুধোয়—'কিন্তু সে তো জানি শুধু বৃষকেই উৎসর্গ করা হয়?'

'এও প্রায় তাই না? আমি তো আর গোরু নই তোমার মতন। বলতে গেলে একটা বৃষই -যদিও কোন গাইয়ের ধারে কাছে যাই না। গানে ভয় খাই। কানের ভয় আছে তো!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তা, যা বলছিলাম, জানিয়ো আমায়। তোমার দাদাকে যদি কব্জা করতে না পারো তো তোমার বৌদিকে বলে আমিই না-হয় একটা কব্জি-ঘড়ি তোমাকে বাগিয়ে দেবো।'

আমার জবাবে গাঁইগুঁই করতে করতে সে নিজের পথ ধরে! ঘাড়ে ঘড়ি ক'রে রাস্তার ধার ঘেঁষে এগোয়।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কখন গোলদিঘির এলাকায় গিয়ে পড়েছি। মাথায় টক্করটা লাগার পর হয়তো আমার অবচেতনায় মনে হয়েছিল যে এখানে একটু হাওয়া লাগানো দরকার—গোলদিঘির চারধারে চক্কর মেরে হাওয়া খাইগে। মাথায় জলপট্টি লাগালেই ভাল হোত ব্যথা, কিন্তু কোথায় পাচ্ছি এখন? কার কাছে গিয়ে পট্টিবাজি করবো? তাই জলের বিকল্পে হাওয়াই লাগানো যাক না হয়। জল-হাওয়ার একটা হলেই আপাতত একটুখানি জুড়োবে।

গোলদিঘির চারিদিকে ভারি গোল—রোজকার মতই। স্কোয়ারের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় ছেলেরা গোল পাকিয়েছে আর ভেতরের আনাচে-কানাচে পেনসন প্রাপ্ত পিলেরা। যতো পিলেরুগীর দল—যাঁরা পেটের পিলে নিয়ে ডাক্তারের Pill-এ বেঁচে রয়েছেন কোনগতিকে।

গোলদিঘিতে এলেই এখানকার ইয়াব্ বড়ো বড়ো পাকা মাছের মতন একটা চোখা প্রশ্ন প্রায়ই ঘাই মেরে ভেসে ওঠে আমার মনের মাথায়—এহেন চৌকো দিঘির নামটা হঠাৎ গোল হতে গেল কী কারণে? এতদিন তার কোন হদিস পাইনি, কিন্তু আজ টক্কর লেগে মাথার একটুখানি খোলতাই হতেই বুঝতে

পারলাম এখন। চার ধারে চক্কর খেতে খেতেই টের পেলাম—যতো চৌকোস লোকের (এবং বাসকের) তাবৎ গোলমালের চক্রান্ত যে এইখানেই ! সে হেতুই ?

চক্কর মারতে গিয়েই আরেক টক্কর খেলাম আবার !

এবারও মাথায় মাথায়। তবে শ্রীমান গোবর্ধনের সঙ্গে নয় সম্প্রতি। 'উফ্ !' মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে হর্ষবর্ধন কনঃ 'ওঃ ! আপনি ! একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছেন !'

'আপনি ? তাই তো দেখছি !' আমিও হাত বুলোই আমার কপালে। চোট খাওয়া জায়গাটাতেই চোট লেগেছে আবার ?—'আপনি এখানে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছেন জানবো কি করে ? মোটেই দেখতে পাইনি। কাজকর্ম ফেলে আপনি এখানে—ভাবতেও পারা যায় না এমনটা।'

'ছেলেরা সব সাঁতার কাটছে না ! দেখছিলাম দাঁড়িয়ে।'

'মেয়েরা কাটলে আরও দ্রষ্টব্য হোত।' আমার অকাট্য কথা।

তিনি বলেন ঃ 'আসুন না, জামা কাপড় খুলে রেখে জাঙ্গিয়া পরে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ি, চলুন ! যা গরম পড়েছে না ? খানিকটা সাঁতার কাটলে গা জুড়োবে।'

'আপনার তো খালি গা জুড়োবে, আমার একেবারে জীবন।'

'জীবন ? অর্থাৎ ?'

'জীবন জুড়োবে বলছিলাম- মায় জীবন-যন্ত্রণার সব কিছু নিয়ে। আমি তো সাঁতার জানি নে, হাবুডুবু খেতে হবে আমায়। জলে পড়লেই মার্বেলের মতন টুপ করে ডুবে যাবো তক্ষুনি।'

'তাই নাকি ? সাঁতার জানেন না একদম ?' তিনি কনঃ 'তাহলে তো ভারি মুশকিল মশাই !'

'মুশকিল তো বটেই। সেই কথাই তো ভাবতে ভাবতে আসছিলাম এতক্ষণ।' আমি জানাই ঃ 'কলকাতা উন্নয়ন কল্যাণে আমাদের রাস্তার মোড়টা খোঁড়া হয়েছে—এদিকে বর্ষা আসন্ন। এখন কেবল মোড়ে গেলেই হয়, তক্ষুনি আমায় মরতে হবে।'

'সেই জন্যই ভাবছেন নাকি ?'

'ভাববো না ? আমাদের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের হেতু ভাবিত হবো না —বলেন কী ! কলকাতা তো ব্যাঙের প্রস্তাবনাতেই জল জমে যায়। রাস্তার এইসব খোঁড়া খানা খানিক বর্ষণেই কানায় কানায় ভরে উঠবে। কোনখানে পথ আর কোথায় বিপথ তার কিছু ঠাওর পাব না। তেমন তেমন একটা খানায় পড়লে খানা নয়, খাবি খেতে হবে। আমারও কোন ঠিকঠিকানা থাকবে না।'

'তার কী হয়েছে ! পড়লেই উঠে পড়বেন তক্ষুনি।'

'পারলে তো ! পড়লেই ডুবে যাবো যে ! সাঁতার কাটতে জানিনে তো ! আর জানলেই বা কি তা কাটা যায় ? কেউ সাঁতার কাটতে পারে সেখানে ?'

'জলে না পড়িলে কেহ শেখে না সাঁতার !' তিনি আওড়ান।

'জানি। সব কিছুই তলিয়ে শিখতে হয় তাও আমার জানা আছে। কিন্তু

সাঁতারটা সম্ভবত তলিয়ে শেখার বস্তু নয়। ওপর ওপর শেখবার। জলের ওপর ভাসতে পারলেই শেখা যায়। তাই না?'

'কে জানে! কিন্তু সে-কথা আমি ভাবছিনে মশাই!' তিনি হাঁপ ছেড়ে জানান: 'আমার কি ইচ্ছে করে জানেন?'

কিন্তু তিনি পুনরুক্ত হবার আগেই আমার বাধা পড়েছে, আগের কথাটা মনে পড়ে উষ্মা জেগেছে আমার।

'যাই আপনার ইচ্ছে করুক না, সর্বাগ্রে নিজের ছোট ভাইটিকে একটা হাত-ঘড়ি কিনে দিতে ইচ্ছে করে না আপনার? ইয়া পেল্লায় একটা দেয়ালঘড়ি ঘাড়ে করে ঘুরতে হচ্ছে তাকে—সময় দেখবার জন্যে? কিন্তু এটা কি দেখতে-শুনতে ভাল? পরের মাথার পক্ষে ভাল কি না সে-কথা নাই বললাম।'

'সময় দেখবার জন্যে? কী কন!' তিনি অবাক হন!

'তা না তো কী! দেখুন তো আমার কপালটা কেমন ফুলেছে? আপনার জন্যই না!'

'আমার জন্য? কখন? কোন সময়ে?'

'গোবরার সময়ে। আমার দুঃসময়ে।' আমি জানাই—'ঘড়িটা ঘাড়ে নিয়ে সে ঘুরছিল রাস্তায় আর আমার কপালে ছিল এই চোট্‌টা! কী বলবো আর।'

'ঘড়ি ঘাড়ে নিয়ে ঘুরছে সে? ও বুঝেছি!' তিনি উদ্দীপ্ত হন: 'আমাদের ঠাকুর্দার আমলের ঘড়িটা, জানেন? কিছুদিন থেকে চলছিল না ঠিক। দুটোর সময় চারটে বাজতো, সাতটার সময় পাঁচটা, আজ সকালে ভোর ছটার সময় বারোটা বাজাতে ঘুম ভেঙে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই গোবরাকে বলেছি যা, আজ ঘড়ির দোকানে গিয়ে সারিয়ে নিয়ে আয় এটাকে···তাই সে ঘড়িটা নিয়ে বেরিয়েছে বুঝি বিকেলে। আপনি বলুন না। এটা কি কোন ঘড়ির পক্ষে ভাল? ভোর ছটার সময় বারোটা বাজানো? এতে করে ঘুমের হানি হয় না? ঘুমের এই অকালমৃত্যু কি ভাল?'

'না। মোটেই ভাল নয়। সন্ধে ছটার সময় আমার মাথার বারোটা বাজানো আরো খারাপ।'

'আমার এই রুমালটা নিন, ধরুন। গোলদিঘির জলে ভিজিয়ে কপালে সেঁটে লাগিয়ে দিন। সেরে যাবে এক্ষুনি।'

হর্ষবর্ধনের পট্টিবাজির পর আমি শুধাই: 'এবার আপনার ইচ্ছের কথাটা ব্যক্ত করুন, শোনা যাক। আপনি তো বাঞ্ছাকল্পতরু, অপরের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আপনার বাঞ্ছাটা কি আবার?'

'আমার ইচ্ছে করে, আমি যদি বড়লোক হতুম না?···'

'অ্যাঁ!' শুনেই আমি চমকাই—আমার পিলে পর্যন্ত: 'আপনি তো বড়লোক আছেনই মশাই? আবার কি বড়লোক হবেন?'

'মানে, আরো বড়লোক। এ আর কী বড়লোক! এমন কী টাকা আছে আমার?'

'এতো পেয়েও এখনো আপনার টাকার জন্য খুঁত খুঁত?' তাক লাগে আমার। 'অভাব আছে এখনো?'

'থাকবে না?' আমার কথায় তিনি যেন আরো হতবাক—পৃথিবীতে যা নাকি নিখুঁত তারও কেবল খুঁতখুঁতুনি নেই—কোন না কোন খুঁতই নেই তার। আরো নিখুঁত হবার যো নেই। নিখুঁতকে আরো নিখুঁত করা যায় না, হতে পারে। তা হবার দায়ও নেই তার। যেমন কিনা সুন্দর···সুন্দর যে, সে আরো বেশি সুন্দর হতে পারে কি? করাও যায় না তাকে আর···সুন্দর বোঝেন?'

'সুন্দরের আমি কী বুঝি!' আমার দীর্ঘশ্বাস পড়েঃ 'হায়, সুন্দরকে বুঝতে গিয়ে সুন্দরবনের শ্বাপদ-সঙ্কুলতায় যে নাকি হারিয়ে গেছে, সুন্দরের সে কী কিনারা পাবে!'

'সুন্দরের কি কিছু বোঝা যায় মশাই? তার রহস্য কে জানে, কে বোঝে? সুন্দর নিজেই একটা বোঝা। যার ঘাড়ে চাপে সে বেচারা বেঘোরে মারা পড়ে।'

'তা নাই বুঝুন, নাই বুঝলেন—ক্ষতি নেই। বলছিলুম কি যে, তারই কোন খুঁত নেই, খুঁতখুঁতুনি নেই কোন। সে আরো সুন্দর হতে চায় না—পারেও না। যা হয়েছে তাতেই খুশি। নিজের সৌন্দর্যে তৃপ্ত সে—আর সবার সঙ্গে সে-ও। কিন্তু বড়লোক আরো বড়লোক হতে চায়, হতে পারে। টাকার খুঁতখুঁতুনি কোনদিনই কারো যায় না।'

'জানি।' তাঁর কথায় সায় দিই আমিঃ 'শতপতি সহস্রপতি হতে চায়। সহস্রপতি হাজারে ব্যাজার, লক্ষ্যভেদে উৎসুক, লক্ষপতির লক্ষ্যভেদে সুখ নেই, সে ক্রোড়তটে পৌঁছতে উদ্‌গ্রীব ক্রোড়পতি পরের ক্রোড়ে।'

'তা বেশ, আপনি যদি আরো বড়লোক হতেন কি করতেন তাহলে?'

'তাহলে এই গোলদিঘির মতন আরো তিনটে বড়ো বড়ো পুকুর বানাতাম এই কলকাতায়—অনেকখানি জায়গা নিয়ে।' 'তিনটে! কিন্তু কি কারণে?'

'লোকের চান করার জন্যে, আবার কি?'

'একটাতেই তো সবাই নাইতে পারে? তিনটে কেন তবে? কিসের জন্যে?'

'তার একটা থাকবে গরম জলে ভর্তি—খুব গরম না, ঈষদুষ্ণ, গা সওয়া গরম। আরেকটা ঠাণ্ডা জলে ভরাট। মানে, যার যেমন পছন্দ, যেমনটা অভিরুচি তার জন্য সেই রকমটাই।'

'আর তিন নম্বরের পুকুরটা? কিসে টইটুম্বুর হবে? রাবড়িতে নাকি?'

'না, সেটা আপনাদের মত লোকের জন্যেই। যারা জলকে ভয় খায়, সাঁতার জানে না, পুকুরে নামতে চায় না, তাদের জন্যই।' 'তাই নাকি?'

'তাতে কিন্তু এ রকম সবই থাকবে। ডাইভ খাবার জন্য সিঁড়ি লাগানো উঁচু পাটাতন খাটানো, এই রকমটাই। স্বচ্ছন্দে আপনি ডাইভ খেতে পারবেন। সবই একরকম, কেবল···কেবল তাতে—'

পুকুরটার কৈবল্য কাহিনী জানতে আমি কৌতূহলী হই।

'কেবল তাতে কোন জল-টল থাকবে না! না গরম, না ঠাণ্ডা। পুকুরটা হবে শুকনো খটখটে।' শুনে আমার মাথায় চোট লাগে আবার। তৃতীয় বার! সেই পুকুরে ডাইভ খেতে গিয়ে কৈবল্যদশা লাভের সম্ভাবনায় আমি মূর্ছা যাই এবার। ও বাবা! আরো চোট রয়েছে আমার কপালে।

হর্ষবর্ধনের পাখি শিক্ষা

সেদিন হঠাৎ হর্ষবর্ধনের বাড়ি হাজির হয়ে দেখি তিনি একটা পাখিকে নিয়ে পড়েছেন। পড়েছেন, কি পড়াচ্ছেন, কি নিজেই তিনি পড়ছেন ধারণা করাও ভার। মোটের ওপর পাখিটাকে নিয়ে ভারী গোল পাকিয়েছেন দেখলাম।

'পড় বাবা, রাধাকান্ত! পড়ে ফ্যাল—'

'পাখি পড়াতে লেগেছেন বুঝি? পড়াচ্ছেন, নাকি পটাচ্ছেন?' আমি পট্‌পট্ করলাম, 'একেবারে উঠে পড়ে লেগেছেন দেখছি।'

'যা বলেন। মোটের ওপর একই কথা। পড়বে কি? পড়ানই কি যাবে নাকি? আরে মশাই নিজের ছেলেই পড়তে চায় না! তাকেও চকলেট দাও, লজেনচুস দাও, তার জন্য ঘুড়ি লাটাই দিয়ে পটাও। তবেই বাছাধন পড়বে। তার নানান বায়নাক্কা রাখলে তবে না সে পড়াশোনার ধাক্কা সামলাবে? আর এ তো বনের পাখি। পরের ছেলে! কত কষ্ট করে মানুষ করতে হবে একে।'

'মানুষ হলে হয়।' আমার সংশয় প্রকাশ করি: 'এই রাধাকান্ত দিয়েই ওর শুরু হয়েছে বুঝি?'

'রাধাকান্ত আমার দাদার নাম।' হর্ষবর্ধন কন: দাদার ভারী পাখির শখ। দেশের থেকে লিখে পাঠিয়েছেন, কলকাতার চিড়িয়াখানা থেকে একটা পাখি নিয়ে তার জন্য যা টাকা লাগে তা দিয়ে, তাকে উত্তমরূপে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। বলিয়ে-কইয়ে শিক্ষিত হওয়া চাই, কিন্তু তাকে লেখাপড়া শেখানোর ফুরসত নেই তাঁর, পাখি পোষার শখ কিন্তু পাখিকে মানুষ করার মেহনত তাঁর পোষায় না, সে কামটার দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন দয়া করে। কী করি, দাদার কথা তো আর অমান্য করা যায় না. তাই '

বুঝতে পারি। আমার ঘাড় নাড়ি: 'তাই বুঝি ওকে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে আপনার দাদার নামটাই আওড়াতে শেখাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, এইটেই প্রথম পাঠ। আর এইটেই শেষ। অন্তত আমার তরফে তো

বটেই। পাখি মানুষ করার কি কম ধকল মশাই? ছেলে মানুষ করার চেয়ে কোন বিষয়ে কম নয়। দেখছি, পাখি আর ছেলে কেউই সহজে মানুষ হতে চায় না। পাখিকে পড়া ধরানো ছেলেকে পাখি পড়ানোর মতই দুরূহ। দুই-ই অসম্ভব। এটা হলো গে আমার তিন নম্বর, বুঝেছেন?'

'তিন নম্বর? তার মানে?' আমি একটু কৌতূহলী হই: 'ও পাখিটা আপনার পরীক্ষার খাতায় এই পড়াটায় মোট তিন নম্বর পেয়েছে বুঝি? ক-নম্বরে পাশ আপনার? ক্লাস প্রোমোশন পেতে হলে ক-নম্বর পাওয়া চাই?'

'আহা, সে নম্বর নয় মশাই, পাখির নম্বর। আমার জীবনে এটি তিন নম্বরের পাখি। এর আগে আরও দুটো পাখি আমার হাত থেকে পাস করে গেছে কেন তিনটে বলাই ঠিক। ধরতে গেলে এটার নম্বর হচ্ছে চার। এর আগে তিনবার আমি ফেল করেছি, নাচার হয়ে এবার চার নম্বরকে ধরেছি, দেখি, পাস করতে পারি কি না। পারে কি না...' বলে পাশিং ঘটনাগুলোর ইতিবৃত্ত তিনি আমায় পাশান। বৃত্তান্ত সে নিতান্ত একটুখানি না। বলতে গেলে গোড়ার থেকেই তিনি ফেল করছেন। পাখি আর উনি উভয়েই যুগপৎ। পরম্পরায় ধারাবাহিক ফেল চলছে দু-জনার। প্রথমটাই তাঁর ফেলিওর।

দাদার নির্দেশমত গোড়ায় তিনি চিড়িয়াখানাতেই গেছলেন পাখির খোঁজে। গিয়ে জানলেন সেটা নামেই ঐ, আসলে সেখানে তেমন কোন চিড়িয়া নেই। এমনকি, একটা চড়ুইও না। সেটা জীবজন্তুদের আড্ডাখানা। এই বাঘ সিংহি কুমির হাতি ভালুক গণ্ডার জেব্রা উট এমনি নানান উটকো জীব। নামী নামী পাখিও আছে, দামী পাখিই, বেশির ভাগ বিদেশী কিন্তু যাই থাক না, তার কোনটাও ওঁরা হাতছাড়া করতে পারবেন না। চিড়িয়াখানা কোন পাখির বাজার নয়। রেঁধে-বেড়ে খানা বানাবার মতন পাখিও মেলে না, পাখির কেনাবেচা হয় না সেখানে। 'আপনি ক্ষেপা না পাগল! পাখি কিনতে এসেছেন চিড়িয়াখানায়!' বলে চিড়িয়াখানার কর্তারা ভাগিয়ে দিয়েছে তাকে।

তারপর পাড়ার একটা ছেলে, গোবরার বন্ধু, সে আবার পরামর্শ দিল আমায়: আপনি বরং চিড়িয়ামোড়ে গিয়ে দেখুন তো! সেখানে যদি পেয়ে যান। জায়গাটার নামে চিড়িয়া আছে যখন, তখন মিললেও মিলতে পারে ভেবে গেলাম সেখানে। বি-টি রোড ধরে এগিয়ে সিঁথি এলাকার কাছাকাছি গিয়ে সেই চিড়িয়ামোড়। খোঁজাখুঁজি লাগালাম পাখির। কেউ কোন খবর দিতে পারল না।

'সে কি মশাই!' স্থানীয় এক ভদ্রলোককে বলি, 'এখানকার বাসিন্দে আপনি, চিড়িয়ামোড়ে থাকেন, আপনারা প্রতিবেশী, পাড়ার চিড়িয়াদের খবর রাখেন না। পাকা আমার—চিড়িয়ামোড়ে পাখি পাওয়া যায়, নামটার মধ্যেই তার ইঙ্গিত রয়েছে, আর আপনি কইছেন এটা চিড়িয়াবাজির জায়গা নয়। আশ্চর্য!'

'চিড়িয়ামোড়ে পাখি থাকবেই বলছে নাকি কেউ?' বলল সেই ভদ্রলোক: 'তা থাকলে হয়ত থাকত, ছিল হয়ত কোনকালে, কিন্তু এখন আর নেইকো। সে-সব চিড়িয়া মরে ভুত হয়ে গেছে কবে। এখন আর চিড়িয়ামোড়ে পাখি মেলে না।' বলে চিড়িয়ার কথাই উনি উড়িয়ে দিলেন আমার এক কথায়।

সেখানেও একটি ছেলে আমায় বাতলালো…'যথার্থ'! সত্যি বলতে ছেলেরা ভারী উপকারী জন্তু'

'জন্তু! ছেলেদের জন্তু বলছেন? জানোয়ার বলুন বরং।' প্রতিবাদ আমার, 'জন্তুরা তো সব চতুষ্পদ। পদমর্যাদায় তাদের পায়া ভারী আপনার ছেলেমেয়েদের চেয়ে তাহলে। তারা অপমানবোধ করতে পারে। আর ছেলেদের কি চার পা নাকি? বুড়ো মানুষের মতো পায়চারিও করে না তারা। এমন কি, আপনার চারপায়ায় শুয়ে থাকতেও ভালবাসে না—সারাদিন ছুটোছুটি হুটোপাটি হৈ-হল্লা করে কাটায়। জানোয়ার বরং বলা যায় তাদের। জানোয়ার যে চতুষ্পদ হতেই হবে তার কোন মানে নেই, সব পদেই তারা রয়েছে, এমন কি ঐ পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও।'

'বেশ, তাহলে ঐ জীবই বলা যাক না হয়। আর বলতে গেলে, জীব তো বটেই ছেলেরা।' তিনি বলেন, 'এবং তাদেরও জিব বটে। জিবই তাদের একমাত্র মাকালীর মতই বার করে রয়েছে দিনরাত। খালি খাই খাই, সর্বদাই নিজের জিবে কিছু না কিছু দিচ্ছেই। পটাটো চিপ, চানাচুর, ঘুঘনি, আলুকাবলি, ছোলা, বাদাম, লজেনচুস, বিস্কুট, চকলেট, সন্দেশ যা পাচ্ছে। জিব বটে একখানা।'

'যা বলেছেন!' আমার সায় তাঁর কথায়ঃ 'মুহূর্তের জন্যও তারা নির্জীব নয়। তা বটে!'

'না নির্জীব নয়।' আমার কথাতেও তাঁর সায়।

আমি তার পরে মতান্তর প্রকাশ করিঃ 'বৈষ্ণব সাহিত্যে তাদের বালগোপাল আখ্যা দিয়েছে, তার ননী-মাখন চুরির আখ্যান থেকে ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায় তাতে মনে হয় তিনিও ওই কৃষ্ণের জীব ছাড়া কিছু নন।'

'যাক গে সে-কথা', সেই ছেলেটা বললে, 'কাছেই কোথায় যেন কিসের মেলা বসেছে, পাখি কেনা-বেচা হচ্ছে সেখানে, তার এক বন্ধু চমৎকার একটা কাকাতুয়া কিনে এনেছে সেখান থেকে। মেলাই পাখি সেই মেলায়। সেখানে পাখি মিলতে পারে নাকি!'

গেলাম মেলায়। পাখিওয়ালা বলল, 'কাকাতুয়া তো নেই আর। যা ছিল বিক্রি হয়ে গেছে সব।'

আমি বললাম, 'তাহলে?'

'আপনি ডাকাপাখি চাইছেন তো? যে-সব পাখি ডাকবে, বোল শুনাবে, বুলি শিখবে এই রকমটাই একটা চাই তো আপনার? তাহলে আপনি এই পাখিটা নিন। এ বেশ ডাকাবুকো পাখি। এর নামই হলো গে ডাকাতে-পাখি।'

তাকিয়ে দেখলাম পাখিটার ডাকাতের মত চেহারা বটে। ভাবলাম বাড়িতে এনে পুষবো শেষটায়। তারপর খতিয়ে দেখি, ক'দিনের জন্যেই বা? দু-একটা বুলি শিখিয়েই তো পাঠিয়েই দিচ্ছি দাদার কাছে। পাখিওয়ালা সাবধান করে দিয়েছিল, সব এর গুণ, কিন্তু একটা ভারী দোষ, সব সময় ফিকির খোঁজে। ফাঁকি দেবার ফিকির। সর্বনেশে পাখি মশাই, শক্ত খাঁচার ভেতর রাখবেন, ফাঁক পেলেই, এমন কি খাঁচাটাই ঠুকরে ভেঙে বেরিয়ে পড়তে পারে হয়তো।'

'তাই নাকি ?' শুনে পাখিটাকে আর হস্তগত করার সাহস হলো না, হাতে পেয়ে আমাকেই যদি ঠুক্‌রে দেয়। ঠোক্কর মেরে উড়ে পালায় যদি ? তাই ডাকাবুকো ওই পাখিটাকে বিনা মাশুলে বেয়ারিং ডাকে নিয়ে এলাম।

'পাখিটাখিও ডাকযোগে আনা যায় নাকি ?' আমি শুধাই : 'জানতাম না তো ! বুকপোস্টে পাঠালেন ওকে ? বেয়ারিং করে ?'

'বুকে ধরে আনব ঐ পাখিকে ? পাগল হয়েছেন ! চোট খাব এই বুকে, না, তা নয়। করলাম কি, এক লাটাই সুতো কিনে পাখিটার একটা পায়ে বেঁধে ওকে শূন্যে ছেড়ে দিলাম ; সুতোর অন্য ধারটা আমার হাতে রইলো, ঘুড়ির মতো করে উড়িয়ে নিয়ে এলাম বাড়িতে। কাঁধে করে আনতে হলো না, বেয়ারিং ডাকেই আনতে গেলাম। কিন্তু এল কি ? ডাকাত বটে সত্যিই ! কেমন হাওয়া খাইয়ে আনছিলাম, কিন্তু নেমখারাম পাখিটা কিছুদূর না আসতেই সুতো ছিঁড়ে সরে পড়ল। বাকি সুতোটা আমার হাতে গছিয়ে দিয়েই না নিরুদ্দেশ !'

তাঁর জীবনে সেই প্রথম পাখির সূত্রপাত।

কিন্তু সূত্রপাতে হতাশ হলেও হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তিনি নন। জানালেন আমায় হর্ষবর্ধন, আবার তিনি ছুটলেন মেলায়, পাখিওলাকে বললেন, 'ডাকাত আমার চাইনেকো আর, সাদা-সিধে চোর-ছ্যাঁচোর হলেই চলবে ওঁর। কিন্তু ভাই দেখ, মুখচোরা যেন না হয়। কথাবার্তায় চৌকস চটপটে হওয়া চাই।'

পাখিটাকে কিনে এবার আর গাঁটছড়া বাঁধাবাঁধি নয়, সটান নিজের ভুঁড়ির হেফাজতে চালান দিলেন, জামার জিম্মায় জমিয়ে নিয়ে চললেন। তাঁর জামার চাপে আর ভুঁড়ির ভাঁজে পাখিটির তো দম বন্ধ হবার যোগাড় ! কি করে বেচারী, প্রাণের দায়ে ঠুকরে ঠুকরে, জামার গায়ে ফুটো করে একটা জানলা বানিয়ে নিয়েছে সে। তার পরে পায়ের নখ দিয়ে এমন প্রখর ভাবে আঁচড়াচ্ছে ভুঁড়িটা...ত্রাহি ত্রাহি করে তিনি কোটের বোতাম খুলে ফেলেছেন, দেখা যাক, যদি পাখিটাকে পাশ ফিরিয়ে শোয়ানো যায়। দেখতে গিয়ে দেখেন পাখিটা তাঁর ভুঁড়ির কিছুই আর বাকি রাখেননি, ভুরি ভুরি আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। আর, তাঁর কোটের আড়ালের নয়া সিলকের পাঞ্জাবিটার গয়া হয়ে গেছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে একেবারে দফা রফা !

আর এদিকে, যেই না সে কোটের কোটর থেকে একটু ফাঁক পেয়েছে অমনি ফুড়ুৎ ! আঁচড়নের পর তার এই আচরণে হর্ষবর্ধন মর্মাহত হন। জামার ভেতরে করে এতো জামাই-আদরে যাকে বাড়ি আনছিলেন সেই কিনা এমন জামাহারামি কাম করে বসল।

বার বার তিনবার ! আবার ছুটলেন তিনি মেলার দিকে। পাখি না কিনে তাঁর সোয়াস্তি নেই, চিঠির পর চিঠি দিয়ে দাদা যা তাগাদা লাগিয়েছে না !

তবে এবার আর আপন গর্ভে ধারণ করে নয়, একটা খাঁচায় ভরে আনবেন পাখিটাকে। গোড়াতেই তিনি মেলার থেকে বেশ মজবুত দেখে একটা খাঁচা কিনে ফেললেন, তারপর গেলেন সেই পাখিওলার কাছে।

গিয়ে তাঁর অনুযোগঃ 'কী পাখি তুমি দিয়েছিলে আমায় ? তোমার ওই পাকিস্তানের পাখি নাকি ? তাই গছিয়ে দিয়েছিলে তুমি আমায় ?'

'কি করে টের পেলেন বাবু ?'

'আমার পাঞ্জাবিটার দশা দেখে। পাঞ্জাবিদের ওপর তাদের যে রাগ তা কে না জানে ? আনাড়ি পেয়ে তুমি তাই গছিয়ে দিয়েছো আমাকে - পাখির নাম করে তুমি আমায় ফাঁকি দিচ্ছ খালি। আমার চোর-ডাকাত কিছু চাই না— বোকা-সোকা দেখে একটা পাখি দাও—একটু আওয়াজ ছাড়তে পারলেই হলো··· তারপরে আমি তাকে চেষ্টা চরিত্র করে নিজের মতো করে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো।'

'তাই এবার দিলুম আপনাকে বাবু ! দেখে বোকাসোকাই মনে হয়, তবে বোধহয় তা নয়। এটাও আপনার পাকিস্তানেরই—এক মিঞা সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া ! মিঞা সাহেব পাখি পড়ানোর মতো করে শিখিয়ে-পড়িয়ে ছিলেন একে, কিন্তু বহুত্ চেষ্টাতেও মানুষ করতে পারেননি। শেষে বিরক্ত হয়ে প্রায় কানাকড়ির দামেই এটা বেচে দিয়েছেন আমায়। দেখুন, আপনি যদি কিছু করতে পারেন—আওয়াজ আছে পাখিটার। আপনি যে রকমটি চাইছেন তাই। কাকাতুয়ার জাতভাই, এর নাম বোকাতুয়া, বোকাটিয়াও বলে কেউ কেউ।'

'পাকিস্তান মানে সাবেক পাকিস্তান—এখনকার বাংলাদেশ ? সেখানকার পাখি বলছো তো ? তাহলে তো একে যা শেখাবো তার ঠিক উল্টোটাই শিখবে গো ! আমার শেখানো বুলি না আওড়ে নিজের বোলচাল ঝাড়বে খালি ? যাক্, নিয়ে তো যাই, চেষ্টা-চরিত্র করে দেখি কী হয় !'

'পড়ো বাবা ! রাধাকান্ত ! রাধাকান্ত পড়ে ফ্যালো.. হন্দমুন্দ চেষ্টা চলে হর্ষবর্ধনের।

পাখিটা মনোযোগী ছাত্রের মতো পড়া নেয়। কান পেতে শোনে, কিন্তু পড়া দেবার কোন লক্ষণ তার দেখা যায় না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে পা তুলে চুলকায়, মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক করে মুখ নাড়ে যেন অতি কষ্টে স্মরণ করার চেষ্টা করছে, কথাটা মাথায় আসছে ঠোঁটে আসছে না, এইরকম ভাবখানা। ঘাড় বাঁকিয়ে মাস্টারের দিকে তাকায়, তাকিয়ে ফের আবার পা তুলে মাথা চুলকাতে থাকে। মনে হয় এক্ষুনি পড়া দিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে মাস্টারের।

হর্ষবর্ধন ধমক দেন—'ছি ! পড়তে পড়তে মাথা চুলকায় না, এদিক ওদিক তাকাতেই নেই। ঘাড় বাঁকাতে আছে কি ? সেটা অসভ্যতা।··· এইটুকুন তো পড়া ! বলে ফ্যালো—লজ্জা কিসের ! বলো, রাধাকান্ত রাধাকান্ত রাধাকান্ত··· '

পাখি তার বদাভ্যাসগুলির পুনরাবৃত্তি করে কেবল।

কিন্তু উনিও নাছোড়বান্দাঃ 'পড়ো বাবা ! বলো রাধাকান্ত ! তোমায় বিস্কুট দেবো, চকোলেট দেবো, লজেনচুস দেবো। ঘুড়ি লাটাই কিনে দেবো তোমায় ! গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবো গাড়ি করে ! চাও তো সিনেমাও দেখাতে পারি। পড়ো—কট্টুকুনই বা পড়া ! চারটে তো কথা ! কতক্ষণ লাগে পড়তে ? মন দিয়ে পড়লে এক্ষুনি হয়ে যায়। চারটে অক্ষর—রা—ধা— কা - ন্ত ! মুখস্থ হতে কতক্ষণ ? পড়ো, ছিঃ ! পড়ার সময় অন্যমনস্ক হয়

না। তোমায় তো কোন শাস্তি দিইনি, অমন করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন? স্ট্যান্ড-আপ আপন ওয়ান লেগ বলিনি তো। ভাল হয়ে বোসো, বসে মন দিয়ে পড়ো। পড়ো রাধাকান্ত। পড়ো, পড়তে থাকো।'

হর্ষবর্ধনের নিজের কাঠ-কারবার সব চুলোয় গেল—খাঁচার মধ্যে পাখি—দিনরাত তিনি খাঁচার সামনে। দু-বেলাই তাঁর টুইশানি—পাখি নিয়ে পড়তে হয়, পড়াতে হয় পাখিকে। একবেলাও কামাই নেই। জল-ঝড়, রেনিডে, কিছু বাদ যায় না। এমন কি হলিডেতেও ছুটি নেই তাঁর, নেই ওই পাখিটারও।

এ-হেন সময় একদিন আমি গিয়ে হাজির।

আমাকে দেখে তিনি মোটেই খুশি হলেন না—'আপনি আবার এই সময় ডিস্টার্ব করতে এলেন। একেই আমার ছাত্রের পড়াশোনায় মন নেই, পড়তেই চায় না একদম, তারপর আপনার মতন বাউণ্ডুলে সাথী পেলে···'

কিন্তু আমাকে দেখেই পাখিটা ডাকতে শুরু করে—ক্যা···ক্যা···ক্যা···

'আপনি যেতে বলছেন, ও কিন্তু আমায় ডাকছে, দেখুন।'

বলি—'ডাকবেই তো। নিজের সগোত্র ঠাউরেছে যে। আপনার মতই আজে-বাজে লোকের সঙ্গে আড্ডা জমাবার বদাভ্যাস আছে বোধহয় ওর··'

'ক্যা ক্যা···ক্যা···।'

'মনে হচ্ছে ও পিতৃভাষা ভুলতে পারেনি এখনো। আমি কই, ঃ 'ক্যা ক্যা করে কইছে কি জানেন? ক্যা বাত্ ক্যা বাত্? তার মানে, আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দীতে যাকে কয়, কৌন সমাচার? বুঝেচেন? বিদেশী বুলি ভুলে মাতৃভাষা শিখতে সময় লাগবে ওর।'

'না শিখিয়ে আমি ছাড়বো ওকে ভেবেছেন, যতো বড়ই গাধা হোক না কেন?' তিনিও তেরিয়া ঃ 'পড়্ ব্যাটা, রাধাকান্ত···পড়্···'

'ক্যা—ক্যা—ক্যা—পড়র্ র্ র্ র্ র্···

'এই যে আদ্দেক শিখে গেছে এর মধ্যেই!' আমি উৎসাহ দিই ওঁদের দু-জনকেই—'কিন্তু প্রথমেই দ্বিতীয় ভাগ কান্ত-টান্তর ঐ যুক্তাক্ষর না ধরিয়ে প্রথম ভাগের সোজা সোজা পড়া দিলে হোত না? গোড়াতেই ওই রাধাকান্ত কেন?'

'আমি ঐ এক কথাতেই মাত করতে চাচ্ছি দাদাকে। এক কিস্তিতেই। আমার দাদার নাম তো রাধাকান্ত - পাখিটা গিয়েই যদি দাদার নাম ধরে ডাকতে শুরু করে, তাক্ লাগবে না দাদার? ভাববে, দারুণ উচ্চশিক্ষিত পাখি পাঠিয়েছি! তাছাড়া, পরের মুখে নিজের নাম-ডাক চাউর হলে কার না ভাল লাগে বলুন? পড়ো বাবা···রাধাকান্ত—রা—ধা—কা—ন্ত, রাধাকান্ত।'

শেষমেষ আওড়ে বসে পাখিটা—মাস্টারের দিকে কটাক্ষ করে। তাঁকে সম্বোধন করেই কিনা কে জানে।

'গা—গা—গা—রাধাকান্ত! গাধাকান্ত! পড়র্ র্ র্ র্ র্—'

'দাদা ! অনেকদিন আমরা দেশছাড়া। যাব একবারটি দেশে ?' গোবর্ধন সাধলো দাদাকে।—'দেশের জন্য ভারী মন কেমন করছে আমার।'

'দেশ আবার কোথায় রে ?' জবাব দিলেন দাদা ঃ 'যেখানে রয়েছি এখানটা কি আমাদের দেশ না ? সারা ভূভারতই তো আমাদের দেশ।'

'তা তো জানি। কিন্তু স্বদেশ বলে একটা কথা নেই ? যেখানে জন্মেছি বড় হয়েছি খেলাধুলা করেছি সে দেশকে বড় হয়ে ফিরে দেখবার সাধ হয় না একবার ? এই ভূভারত তো সবার দেশ। আমার কিসের আপন! আমাদের দেশের জন্য মন কাঁদছে দাদা।'

'সে দেশ কি আর আছে রে ? কবেই নিরুদ্দেশ হয়েছে। সেখানে গিয়ে বাস্তবেই তুই চিনতে পারবি না ! তোকেও কেউ চিনবে না। সব নিশ্চিহ্ন। কি করবি সেখানে গিয়ে ? পাত্তা পাবিনে কোথাও।'

'তবু একবারটি যাব। যাই-না দাদা ?'

'তবে যা। আর যাচ্ছিস যখন, একটা কাজ সেরে আসিস্ আমার। আমি তো কাজের মানুষ, সময় নেইকো কোথাও যাবার। তুই যখন যাচ্ছিসই, স্বামিজীর কাছে আমার ঋণটা শোধ করে আসিস্ এই সুযোগে।'

'স্বামিজীর ঋণ ? স্বামিজীর কাছে তুমি আবার ধার করলে কবে গো !' অবাক হয় গোবরা।

'আহা, টাকা কড়ির ধার কি আবার ধার নাকি একটা ? ও তো টাকা ফিরিয়ে দিলেই তা শোধ হয়ে যায়।' দাদা কন ঃ 'সে-ঋণ নয় রে, এ ঋণ অপরিশোধ্য।'

'শুনি কী ঋণ ? তোমার এ-ধার আবার কেমন ধারা ?' জানতে চায় গোবরা ?

'যাবার আগে জানিয়ে দেব তোকে। তবে এইটুকু কই এখন, সেবারে পা ভেঙে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়ে পড়েছিলুম না বেশ কিছুদিন? তখন এক স্বামিজী এসে, অযাচিতভাবে ধর্মশিক্ষা দিতেন। কেবল আমাকে না, আমাদের সব রুগীকেই। সেই শিক্ষার ঋণ শুধতে হবে আমায়।'

'এই কথা! তা দেব শুধে। সুদেআসলে। কী করতে হবে বোলো আমায়।'

বলবো রে বলবো। অঢেল টাকাও দেব সেইজন্যে। অনেক টাকার দায় চাপিয়ে দেব তোর মাথায়।'

গৌহাটি ইস্টিশনে নেমে গোবরা দেখল যে দাদার কথাটাই খাঁটি। তার দেশ কোথায় নিরুদ্দেশ! প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধার অব্দি দু দুবার চষে গিয়েও চেনাজানা একজনেরও সে উদ্দেশ পেল না।

এমনকি, স্টেশনটাকেই যেন অচেনা মনে হয়। যে গৌহাটি স্টেশনে উঠে তারা কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল তার চেহারাটাই পালটে গেছে। আরো অনেক লম্বা চওড়াই যেন এখন। তবু ওরই মধ্যে একজনকে একটুখানি চেনা চেনা বলে তার ঠাওর হলো। প্লাটফর্মের একধারে বসে একমনে সে জুতো সেলাই করছিল।

তার কাছে গিয়ে শুধালো—'হারুদা যে! চিনতে পারো আমাকে?'

'এই যে গাবু ভায়া! চিনবো না তোমাকে, সে কি কথা! আমার চোখের ওপর এত বড়টা হলে! এত সাত-সকালে উঠে চলেছো কোথায় শুনি?'

'যাব কি গো? এলাম যে! এই ট্রেনটাতেই এলাম তো!'

'ট্রেনে এলে!' হারু হতবাক্—'গেছলে কোথায় এর মধ্যে গো?'

'কলকাতায়। সেখানেই ছিলুম তো অ্যাদ্দিন! ওমা! তুমি কিচ্ছু খবর রাখো না! অবাক করলে হারুদা!'

'কলকাতায় ছিলে নাকি অ্যাদ্দিন? কই জানি নে তো কিচ্ছু। কেউ বলেনি আমায়। যা দিনকাল, কারুর খবর কেউ রাখে না ভাই! ফুরসত কই খবর রাখার—তাই বলো।'

গোবর্ধন সায় দিলো—'যা বলেছো। তা হারুদা, তুমি কি আজকাল ইস্টিশনে তোমার কাজ করো নাকি?'

'না করলে চলে না ভাই! যা দিনকাল পড়েছে না, ঘরে বসে রোজগারে কুলায় না। এই বড় বড় মেল গাড়িগুলো যাওয়া আসার সময়টায় আসি কেবল। গাড়ি তখন বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়ায় তো। যাত্রী বাবুরা সেই সময়টায় জুতো পালিশ করিয়ে নেয়, তাড়াহুড়ার মুখে কম মেহনতে বেশি উপায় হয়ে যায়।'

'তাই বুঝি? আচ্ছা, কলকাতা যাবার আগে আমার জুতোজোড়া মেরামত করতে দিয়ে গেছলাম, বছর সতেরো আগেকার কথা, মনে আছে তোমার?'

'এই তো সেদিন! মনে থাকবে না?'

'সারানো হয়েছে নাকি? তুমি বলেছিলে আর দিন দুই বাদ এসে নিয়ে যেতে···এতদিনে হয়েছে নিশ্চয়?'

'নিশ্চয়। এতদিনে সারানো হবে না, বলো কি গো?' হারু আশ্বাস দেয়। 'চলো-না, দিয়ে দিচ্ছি এখনই তোমায় হাতে হাতে।'

ইস্টিশন ছেড়ে বেরুলো দুজনে।

'ইস্টিশনের এ রাস্তাটা তো বড় রাস্তাই ছিল জানি, কিন্তু এখন আরো যেন বেশ বড় হয়েছে মনে হচ্ছে।' গোবরা বলে।

'শুধু এইটে? অনেক বড় বড় রাস্তা হয়েছে এই এলাকায়। এই শহরে। সে শহর আর নেই রে ভাই! দুদিন বাদ এলে চেনাই দায়।'

'আরে, এইখেনে কোথায় যেন আমাদের বাড়ি ছিল না?' না দেখে চমকে ওঠে গোবরা ঃ 'গেল কোথায় বাড়িটা?'

'বেওয়ারিশ পড়েছিল তো এতদিন। মুন্সিপালী তোমাদের বাড়িটা আর তার লাগাও আর সব বাড়ির দখল নিয়ে ভেঙেচুরে এই রাস্তাটা চওড়া করেছে।'

'তাহলে এখন উঠবো কোথায় গো?'

'জলে পড়েছো নাকি? আমার বাড়িতেই উঠবে না হয়। তার কী হয়েছে?'

'তোমাদের পরিবারে ক'জনা? আমি আবার বাড়তি বোঝা হবো না তো গিয়ে?'

'সব মিলিয়ে আমরা একান্নজন। একান্নবর্তী পরিবার আমাদের। যেখানে একান্নজনের মাথা গোঁজার জায়গা হয়েছে সেখানে তোমারও ঠাঁই হবে ভাই। আর ক'দিনের জন্যই বা!'

'এবার অবশ্যি দিন কয়েক।' গোবরা জানায় ঃ 'তবে যে কাজের জন্যে এসেছি না, সেটা সমাধা হলে তারপরে দাদাও আসবেন আবার একবারটি। তাঁকেও আসতে হবে। তবে ঐ কয়েকদিনের জন্যেই।'

'তার কী হয়েছে? বললাম না, আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। যাঁহা একান্ন তাঁহা বাহান্ন, যাঁহা বাঁহান্ন তাঁহা তিপান্ন।'

'তা বটে।' যেতে যেতে ওদের কথা হয়—'তা হারুদা, এই রাস্তারই কোন গলিতে যেন আমিনাবিবিরা থাকত না! তাদের বাড়ির পিছনে বেশ কয়েকটা পেয়ারা গাছ ছিল, খাসা পেয়ারা। ইস্কুলে যাবার পথে পেড়ে খেতুম আমরা।'

'এ তল্লাটে তারা নেইকো আর। এখানকার সব বেচেবুচে শহরের ওধারে গিয়ে তারা বাসা বেঁধেছে এখন।'

'পেয়ারা বেচে সংসার চলত তাদের। ভারী গরিব ছিল তারা···'

'গরিব বলতে! আমিনাবিবির খসম্ সেই পেয়ারা খাঁ মারা গেলে তাকে গোরস্থানে নিয়ে কবর দেবার পয়সা জোটেনি···'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ ভাই। তাই বাধ্য হয়ে বাড়ির পিছনটায় পেয়ারা গাছগুলোর গোড়াতেই তাকে গোর দেওয়া হয়েছে।···আর বিধাতার কী লীলা! সেই গোর দেওয়ার থেকেই···সেইখানেই গোড়া! এত যে গরিব ছিল আমিনাবিবি না···।'

'দাদা বলছিল সেই কথাই। যাচ্ছিস যখন তখন মনে করে আমিনাবিবিকে যদি কিছু সাহায্য···'

'তা দিতে পারে সে সাহায্য। কিছু কেন, বেশ কিছু সে দিতে পারে এখন। চাও না গিয়ে তার কাছে।' হারু বাতলায়।

'তার কাছে গিয়ে চাইব কি? তাকেই কিছু দিতে বলেছে দাদা। দিয়েও দিয়েছে আমার সঙ্গে।'

'তাদের আবার দেবে কি গো? তাদের কি সেদিন আছে আর? না যে পেয়ারা খাঁর সেই গোর দিতে গিয়ে—সেইখানেই গোড়া! সেই থেকে বরাত ফিরে গেল তাদের। শাবলের ঘায় ঠন করে উঠে মাটি চাপা মোহরের ঘড়া বেরিয়ে পড়ল। সেই থেকেই তারা বড়লোক। শহরের বড়লোকদের পাড়ায় বাড়ি কিনে ছেলেমেয়ে সব নিয়ে সুখে রয়েছে এখন আমিনাবিবি।'

'বাঃ বাঃ! খুব ভালো খুব ভালো!' গোবরা আনন্দে গদগদ। 'কিসের থেকে কি করে কার বরাত ফিরে যায় কেউ বলতে পারে?'

'তা এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে কিরকম বরাত ফিরল তোমাদের শুনি তো?' হারু শুধোয়, 'টাকা কামাতেই তো যাওয়া কলকাতায়। তাই না?'

'আমিনাবিবির মতন অমন না হোক, হয়েছে কিছু কিছু।'

গোবরা বলে: 'দাদা একটা কারখানা ফেঁদেছে—কাঠ চেরাইয়ের কারখানা··· সেখানে যত আসবাবপত্তর বানায়।'

'ভালোই করেছো তোমরা। চাকরি বাকরি বড় একটা মেলে না ভাই আজকাল। ঘরে ঘরেই আজকাল ছোটখাট কারখানা দেখতে পাবে। এমনকি আমারটাকেই তুমি একটা জুতো সেলাইয়ের কারখানা বলে ধরতে পারো। বললেই হয় কারখানা। বাধা কি?'

'হ্যাঁ, বললে কিছু বেজুত হয় না।' যুতসই জবাব গোবরার: 'তবে আমাদের এমন একালে কারখানা নয় গো! কত জনা কাজ করে সেখানে। বিরাট এক শেডের তালায়···।'

'শেড কি?'

'করোগেটের শেড। ছাদ বলেই ধরতে পারো। সবাই আমরা সেখানে এক পরিবারের মতই···অতোলোক—সব! এক শেডের তলায়।'

'আমাদের পরিবারটাই বা কম কিসের! আমি, আমার বৌ, আমার শালী, কাচ্চাবাচ্চারা সব, গোরু বাছুর, ছাগল ভ্যাড়া, খচ্চর, ঘোড়া, কুকুর বেড়াল।

হাঁস মুরগি, তার ওপর নেংটি ইঁদুরের কথা বাদই দিচ্ছি···সব মিলিয়ে পঞ্চাশজনার ওপর। সবাই আমরা এক ছাদের তলায়। একান্নবর্তী পরিবার বললাম না ?'

'এক ছাদের তলায়—তার মানে ?'

'মানে, এক ঘরের ভেতরে। একটিই তো ঘর। আর ঘর কই আমাদের ?'

'গোরু ভ্যাড়া সব নিয়ে একসঙ্গে থাকো ?'

'মিলে মিশে বেশ আছি। নেংটি ইঁদুরদের আমি ধরছি না অবিশ্যি। তারা তেমন মিশুকে নয়।'

'আর তোমার কারখানা ? জুতো সেলাইয়ের ?'

'বাড়ির উঠোনে। আবার কোথায় ?'

যেতে যেতে পথের মাঝে থমকে দাঁড়ায় গোবর্ধন—'মনে পড়েছে। মনে হচ্ছে এইখানে ছিলো আমাদের ইস্কুল বাড়িটা। প্রাইমারি ইস্কুলের···।'

'মনে পড়ছে তোমার ?'

'পড়বে না ? কান ধরে কতোদিন দাঁড়িয়েছিলাম বেঞ্চির উপরে। কোথায় গেল সেই ইস্কুল ? গেল কোথায় ?'

'ওপর দিয়ে রাস্তা কেটে বেরিয়ে গেছে—দেখছ না ?'

'তা তো দেখছি। রাস্তাই তো বাড়ি-চাপা পড়ে জানতাম, উলটে বাড়িও যে রাস্তা-চাপা পড়ে দেখছি এখন।'

বলতে বলতে তারা হারুর আস্তানায় এসে পড়ল। উঠোনে উঠে গোবরা বলল—'এই তো তোমার সেই কারখানা হারুদা ? এইখেনেই বসি কোণের এই মোড়াটায়। এই কারখানায় বসেই তোমার কাণ্ড দেখা যাক।'

'কাণ্ড আর কী দেখবে ভাই ! কাজটাজ আজকাল আর তেমন নেই। সেই-জন্যেই তো উপরির উপায়ের আশায় ইস্টিশনে যাওয়া।'

'আমার জুতো জোড়াটাই নিয়ে এসো দেখা যাক। বানানো হয়ে রয়েছে বললে না ? সেইটেই তো প্রকাণ্ড। তাই দেখি।'

হারু ঘরে ঢুকে আনাচে কানাচে খুঁজে পেতে নিয়ে এলো জোড়াটিকে—'এই নাও !'

'ও মা ! এ যে কিচ্ছুই সারাওনি গো। তেমনিই রয়েছে···'

'দুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে'খন। তুমি তো দুদিন রয়েছো হে এখন।'

'সেবারও তুমি ওই কথাই বলেছিলে—দুদিনের ভেতর সারিয়ে দেবে। এখনো তোমার মুখে সেই দুদিন ?'

'লাগলে ঐ দুদিনই লাগে, বুঝেচ ভাই ? তবে ঐ লাগাটাই মুশকিল। এই আর কি ! এত ব্যস্ত কিসের। সুস্থির হয়ে বোসো এখন, চা-টা খাও। ভালো করে দেখি তোমায়।'

ভালো করে দেখতে গিয়ে হারুর চোখ ছানাবড়া।

'তোমার মুখটা আগের চেয়ে ঢের চকচকে হয়েছে দেখছি। ইস্নো পাউডার লাগিয়েছ বোধহয়!···তা বেশ, তা বেশ!···' মুখের পর তার চুলের চাকচিক্যে নজর পড়েঃ 'উ বাবা! তোমার চুলের বাহারও তো কম নয় হে! কলকাতার হাওয়া লেগে মাথার ভোল পালটে গেছে···' গোবরার শীর্ষস্থানের দৃশ্য তার চোখ কেড়ে নেয়—'বাঃ, দিব্যি টেরি বাগিয়েছো দেখছি। এখানে থাকতে তো কই তোমার টেরি-ফেরি দেখিনি কোনোদিন! ও বাবা! গায়ে কী আবার! এ তো সিলক্ নয় ভাই, প্রায় সিল্কের মতই যদিও···কী বললে, টেরিলিন? নয়া বিলিতি আমদানি? কলকাতার হালের ফ্যাশান এই বুঝি?'

গোবরার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে মাথার থেকে পায়ের পাতায় সে তলিয়ে দেখে 'অদ্ভুত কাটছাঁটের এ জুতো কোথাকার হে! এ তো এখানকার না—আমার বানানো নয়ত! কী বললে? চীনে বাড়ির জুতো, টেরিটি বাজারে কেনা?'

টেরিলিন টপকে মাথার থেকে পায়ের টেরিটি পর্যন্ত বুলিয়ে হারুদার চোখ একেবারে ট্যারাটি!

'বাঃ, ডবোল টেরিটি বাগিয়ে বসেছো দেখছি। বেশ বেশ।' হারু বলেঃ 'আমাদের গাবু যে গাবুরনর হয়ে গেল গো! একেবারে লাট সাহেব।'

এই আলোচনার ফাঁকে একটা মুরগির বাচ্চা কোঁকর কো করতে করতে কোত্থেকে ছুটে এসেছে···

'তোমার পরিবারভুক্ত একজন? তাই না হারুদা? একান্নবর্তীর এক?'

'না। ভুক্ত হয়নি এখনো। তবে একান্নবর্তী পরিবারের একজন তা ঠিক। আজ পরিবারভুক্ত হবে।'

'আজ হবে? তার মানে?'

'মানে, তোমার খাতিরে ওকে কেটে খাব আজ আমরা। তাই বলছিলাম।'

'তোমার পরিবারের একজন কমে যাবে তো তাহলে?'

'বাড়লোও তো একজনা। তোমাকে নিয়ে সেই একান্নই রইলো।' হাসতে থাকে হারু।

'আমি আর কদিন এখানে! দাদা তার কাজের যে-বরাত আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েচে সেটার ব্যবস্থা করেই চলে যাব এখান থেকে- দু'একদিনের মধ্যেই।'

'ভালো কথা। তোমার দাদার কথাটাই তো জানা হয়নি এখনো! কি কারণে এখানে তোমার আসা তাই তো এখনো বলোনি ভাই!'

'বলছি শোনো। গোড়ার থেকেই বলি সব। হয়েছিল কি, গত বছর দাদার আমার একটু পদস্খলন হয়েছিল···'

'ওরকম হয়। কারু কারু হয়ে থাকে বুড়ো বয়সে। হলে ভারী মারাত্মক। সহজে জোড়া লাগে না। ভাঙা বুক ভাঙাই থেকে যায়। যাকে বলে গিয়ে ঐ — ভগ্নহৃদয়।'

'না গো, বুক টুক নয়। পড়ে গিয়ে একটা পা ভেঙেছিলেন দাদা। কাছাকাছি এক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পায়ে প্লাস্টার লাগিয়ে হাসপাতালে পড়েছিলেন দিন কতক।'

সেই অন্য কথাই। সেখানে এক স্বামিজী, ও'দের ঐ মঠেরই, রোজ বিকেলে ধর্মশিক্ষা দিতে আসতেন রুগীদের। দাদাকেও দিতেন। সেই থেকে দাদা সর্বধর্ম-সমন্বয় সমন্বয় করে প্রায় ক্ষেপে উঠেছেন।'

'সর্বধর্ম সমন্বয়টা আবার কী ব্যাপার? শুনিনি তো কখনো।' হারুর কাছে কথাটা নতুন ঠ্যাকে।

'মানে হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রিশ্চান বৌদ্ধ জৈন সব ধর্মই এক। এমন কিছু করতে হবে যেখানে সবাই এক হয়ে সমান সমান মিলতে মিশতে পারবে—ধর্মকর্ম করতে পারবে এক সাথে। পরমহংসদেবের সেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য দাদার এখন প্রাণ কাতর।'

'কিন্তু এ তো দু-চারদিনের কম্মো নয় দাদা। তুমি বলছ দুদিন থাকবে এখানে, তাতে কি করে হয়?'

'কলকাতায় আমাদের কাজ না? অঢেল কাজ। দাদা কি পারে একলাটি? দাদার কাছে আমারও থাকার দরকার যে!'

'তাহলে কী করে হয় ভাই? সমন্বয় বলে কথা, তাও আবার সর্বধর্মের। মন্দির মসজিদ গির্জা কতো কী বানাতে হবে। কতো কাঠখড় পুড়বে। মিস্ত্রি মজুর খাটবে কতো। কতো ইঞ্জিনীয়ার কন্ট্রাকটারের দরকার। টাকাও কতো লাগে কে জানে?'

'টাকার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। লাখ টাকার একটা সেলফ চেক কেটে দাদা আমার সঙ্গে দিয়েছে। সেটা আমি তোমার নামে এখানকার কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি না হয়। তারপর আরো যতো লাগে পাঠাবে দাদা। তুমি এই সব মিস্ত্রি মজুর ইঞ্জিনীয়ার কন্ট্রাকটার নিয়ে এর তদারকির ভার নিতে পারবে না?'

'পারব না কেন? এই মুল্লুকের যতো ইঞ্জিনীয়ার কন্ট্রাকটার সব আমার চেনা। তাদের মাথা আমার কেনা না হলেও তাদের পায়ের জুতো আমার থেকেই কেনা। তাদের হাত পা বাঁধা আমার কাছে। আমার কথায় রাজি হবে সবাই। আমার অবসর মত তাদের দিয়ে একাজ আমি ভালোই করতে পারবো। তাছাড়া, পুণ্য কাজও তো বটে।'

'তাহলে তার ব্যবস্থা করো আজকের মধ্যেই। আমি যেন রাতের ট্রেনেই ফিরতে পারি কলকাতায়। এখন ব্যাংকে চলো, তোমার নামে চেকটা জমা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে দিই গে।'

হারুর নামে লাখ টাকাটা ব্যাংকে দিয়ে সেদিনই গোবরা কলকাতায় ফিরে গেল।

সর্বধর্ম সমন্বয়-মন্দির বানানোর ভার নিল হারু।

ঠিক হলো, এই এলাকার যে জায়গায় সাপ্তাহিক হাট বসে, দূর দূরান্তর থেকে কেনাবেচা করতে আসে যতো লোক, হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান পার্শী সব্বাই – সেই হাটের মাঝখানেই হবে এই মন্দিরটা।

আগামী রথযাত্রার দিনে দাদা হর্ষবর্ধন এসে সেই সমন্বয় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন ঠিক রইল।

রথযাত্রা তিথির যথাদিবসে হর্ষবর্ধন ভাইকে নিয়ে যথাস্থানে হাজির। সর্বধর্ম সমন্বয় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন।

'হারুদা, ঐ লাখ টাকাতেই তোমার মন্দির-ফন্দির গড়া হয়ে গেল সব? লাগলো না আর? লাগবে না আর?'

প্রথম দর্শনেই হর্ষবর্ধন চেক বই খুলে তৎপর।

'না না! আবার কিসের লাগবে! ঐ টাকাতেই হয়ে গেছে সমস্ত। কয়েক হাজার বেঁচে গেছে বরং। যারা ওর দেখাশোনা করবে, চালাবে, ঐ টাকার সুদে, তাদের বেতন বাবদে চলে যাবে। আর কিছু দিতে হবে না তোমাদের।'

'চলো, বাজারে গিয়ে ধর্মস্থানটা দেখে আসি আগে।' হর্ষবর্ধন কন: আমাকে আবার মন্ত্রিদের মতন দ্বারোদ্ঘাটন করতে হবে তো!'

'মন্ত্রিদের মতই তোমার জন্যেও আমি ফটোগ্রাফার মজুদ রেখেছি তাই। কিছু ভেবো না ভাই। শহরের সেরা ফটোগ্রাফার।'

বাজারে গিয়ে হর্ষবর্ধন তো হতবাক্!

বাজারের মধ্যিখানে বৃত্তাকারে সারি সারি পায়খানা!

'এ কী! হারুদা, মন্দির কই! আমার সমন্বয় মন্দির? এ তো কেবল পায়খানা দেখছি দাদা!'

'প্রথমে ভেবেছিলাম যে মন্দির বানাবো। শিবমন্দির। তারপর ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। সেখানে কেবল হিন্দুরাই আসবে, মুসলমান ক্রিশ্চান এরা কেউ ছায়া মাড়াবে না তার। মসজিদ গড়লেও সেই কথা। মুসলমান ছাড়া আর কেউই ঘেঁষবে না তার দরজায়। গির্জা হলেও তাই। যাই করতে যাই, সর্বধর্ম সমন্বয় আর হয় না। তাছাড়া, পাশাপাশি মন্দির মসজিদ গির্জা গড়লে একদিন হয়ত মারামারি লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে এই পায়খানাই বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে বরাবর। হিন্দু মুসলমান জৈন পার্শী খেরেস্তান। কেউ বাকি থাকবে না।'

বল দম নেবার জন্য হারু একটুখানি থামে।

এ ধারের আদ্ধেক জুড়ে ঐ পায়খানাই। আর ওধারে অদ্ধেকটা জুড়ে হয়েছে এক পাইস হোটেল। হাটেবাজারে যারাই আসে সস্তায় যেন তারা দুমুঠো খেতে পায়…।'

'এধারটা পাইখানা, আর ওধারটায় তোমার খানা পাই? এই ব্যাপার?' টিপ্পনি কাটে গোবরা।

'এই দুই জাগাতে তুমি সব ধার্মিকের মিল পাবে ভাই! আহার করা আর বাহার করা—তাইতেই। সর্বধর্ম সমন্বয় এইখানেই। ধর্ম আর কর্ম—দুইয়ের সমন্বয় এখানে। বলো তাই কিনা?'

'যা বলেছো!' বলেই হর্ষবর্ধন মুক্তকচ্ছ হন।

কাছা সামলাতে সামলাতে সামনে যেটা পড়ে সেটার দরজা খুলে সেঁধিয়ে পড়েন শশব্যস্তে।

সারধর্মের দ্বারোদ্ঘাটন হর্ষবর্ধনই করলেন সর্ব প্রথম।

বাড়ির ওপর বাড়াবাড়ি

কলকাতার বাইরে কোথাও হাওয়াবদলে যাবার তোড়জোড় হচ্ছিল। বোঁচকাবুঁচকি বাঁধা বিছানাপত্র ঠিকঠাক, সব কিছুর গোছগাছ করছিলেন গিন্নি। গোবর্ধন ছিলো তদারকিতে।

'একজন কী বলেছেন তা জানিস?' মুখ খুললেন হর্ষবর্ধন, 'হাওয়া-বদলের আসল কথাটা হলো খাওয়াবদল। তামাম্ মুল্লুকেই তো এক হাওয়া! হাওয়া আবার বদলায় নাকি! মুখ বদলাতেই মানুষ ভিন্ দেশে যায়।'

'কে বলেছিলো জানি।' টিপ্পনি কাটলেন ওর বৌ, 'মেসের হাওয়া বদলাতে যিনি প্রায়ই আমার হেঁসেলে এসে থাকেন।'

'শিবরামবাবু না।' গোবরার উত্থাপনা।

'হ্যাঁ। দেওঘরে বেড়াতে যাবার কথাটা বাতলেছে সে-ই। সেখানকার প্যাড়ার মতন আর হয় না কি।'

'তা, কথাটা যখন তুললেই তখন বলতে হয় কাশীর চাইতে ডাকসাইটে কেউ না। কাশীর পেয়ারা বিশ্ববিখ্যাত। কাঁচা খাও.ডাঁসা খাও—'

'পেয়ারা নয় রে, প্যাড়া।'

'ওই হলো। যা পেয়ারা তাই প্যাড়া। প্রিয় বস্তুর হিন্দি নামই ওই।'

'প্যাড়া আর পেয়ারা এক হলো? একটা হলো ক্ষীরের আরেকটা হলো গিয়ে গাছের—দুই-ই এক?' জবাব দিতে গিয়ে তিনি অবাক। 'গোবরা আর গোবর—এক চিজ?'

কথাটার চুলচেরা বিচারে এগুতে সে নারাজ, কথান্তরে যেতে চায়—'তা কী বলেছেন সেই ভদ্রলোক ?'

'বলেছে যে পাড়া যদি ছাড়তেই হয় তো ঐ প্যাড়ার জন্যই। দেওঘরের প্যাড়ার জন্যে দেশান্তরী হওয়া যায়। তার প্যাড়ার নাকি প্যারালাল নেই।'

'তা তোমার সেই প্যাড়ালালকেও সঙ্গে নিলে না কেন ? আমাদের সঙ্গে প্যাড়া খেতে যেতো না হয়।'

'তাকে বলবার সময় পেলাম কই ? হুট্ করে আমাদের এই যাওয়াটা হয়ে গেলো না হঠাৎ ?'

'সত্যি, কাউকেই কোনো খবর দেওয়া হলো না। কত লোক আমাদের খোঁজে এসে ফিরে যাবে। খবর-কাগজওয়ালা কাগজ ফেলে দিয়ে যাবে রোজ রোজ। বারণ করা হয়নি তাকে। গয়লা, ঘুঁটেউলী, কয়লাওয়ালা কাউকেই না।'

'সারা মাসের কাগজ বারান্দায় গাদা করা থাকবে। এক সঙ্গে পড়তে পাবে দাদা।'

'সে এক ঝঞ্ঝাট।'

'আর দোরগোড়ায় সারি সারি দুধের বোতল। আর তার মুখোমুখি পাড়ার যতো হুলো বেড়াল···'

'কী মুশকিল। সেই সঙ্গে আবার ওনার মিনি বেড়ালটাও যদি থাকে তো হয়েছে।'

'আমার মিনিকে মিছিমিছি দুষো না।' খোঁটাটা গিন্নীর গায়ে লাগে। 'পাড়ার হুলোদের সঙ্গে সে মেশে নাকি ?'

'আবার যাদের তুমি মাস মাস কিছু সাহায্য করো সেই সব মাসোহারাদার ···নাকি নিয়মিত ইনকম্‌ট্যাক্‌সোওয়ালা যাই বলে···তারাও কিউ বেঁধে দাঁড়িয়ে তোমার অপেক্ষায়—'

'সব্‌বোনাশ !'

'আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা করছি···বলে গোবরা একটা সাদা পিজবোর্ড নিয়ে পড়লো, কী যেন লিখতে শুরু করলো তার ওপর।

'তার চেয়ে কোন আত্মীয় স্বজনকে ডেকে এই কমাসের জন্যে বসিয়ে গেলে হতো না ? বাড়িটাও আগলাত আর ওদেরকেও সামলাতো···'

'আত্মীয়দের কাউকে ?' শুনেই শিউরে ওঠেন হর্ষবর্ধন। 'নিজের বাসায় সাধ করে তাদের নিয়ে এসে বসানো ? নিজের উঠোনে তাদের টেনে আনা যায় কিন্তু তার পরে কি উঠোনো যায় আবার ?'

'যা বলেছো দাদা।' লিখতে লিখতেই গোবরা টিপ্‌পনি কাটে। 'এলেই তারা মাটি কামড়ে বসবে শেকড় গেড়ে একেবারে তারপর মূলসুদ্ধ টেনে তোলে সাধ্য কার ? মোটেই উঠন্তি মুলো নয়, পত্তনের পরেই টের পাওয়া যায়।'

'তাহলে এই কয় মাসের জন্যে কাউকে ভাড়া দিয়েই গেলে না হয়? দু-পয়সা আসতো এই ফাঁকে।' গিন্নী কন।

'বেশ মোটা টাকায় ফার্নিশড্ বাড়ি ভাড়া দিয়ে কেউ কেউ দেশছাড়া হচ্ছে এমন বিজ্ঞাপন তো প্রায়ই দেখা যায় কাগজে।'

'ভাড়া? ভাড়ার কথাটি বোলো না আর গিন্নী।' কর্তা তাড়া লাগান। সেই একজনকে ভাড়া দিয়েই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—একবারই। এক কথা কবার করে শিখতে হয় মানুষকে?'

সেই একবারের কথাটাই তাঁর মনে পড়ে এখন। বেলতলার তাঁর খালি বাড়িটা বন্ধুমতন একজনকে ভাড়া দিয়েছিলেন—মাস মাস ভাড়া পেতেন নিয়মিতই। কোন আক্ষেপ ছিলো না। একবারটি শুধু বিলম্ব হলো পাবার। কর্মসূত্রে ঐ এলাকায় গেছলেন, ফেরার পথে বন্ধুটির খবর নিতে গেলেন - ভাড়ার তাগাদায় নয়, বন্ধুটির কী হলো, কেমন আছেন, তাই জানতে। তাঁকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, 'দাঁড়াও ভাই, তোমার ভাড়াটা এনে দিচ্ছি। খিড়কির দিকে এক খদ্দের এসে দাঁড়িয়ে আছে তাকে মিটিয়ে দিয়েই এক্ষুনি আসছি আমি। সদরে না থেকে খিড়কির দোরে খদ্দের? কৌতূহল হলো হর্ষবর্ধনের। বাড়িটা ঘুরে পেছনে গিয়ে দ্যাখেন, বাড়ির খিড়কির দামী কাঠের দরজাটা খুলে ফেলা হয়েছে, একজন লোক দাম চুকিয়ে দিয়ে দরজার সেই খোলতাইটা মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে গটগট করে চলে যাচ্ছে···। বন্ধুটি খদ্দেরের দেওয়া টাকাটা তক্ষুনি হর্ষবর্ধনের হাতে দিলেন, বললেন, 'এই নাও ভাই, তোমার ভাড়াটা। এবারটি দিতে একটু দেরি হয়েছে, কিছু মনে কোরো না।' কিন্তু মনে করার অনেক কিছুই ছিলো। খিড়কির মুক্তদ্বার দিয়েই তিনি ঢুকলেন—গিয়ে পড়লেন বুঝি এক মুক্তাঙ্গনে। বাড়ির পেছন ধারের জানালা দরজা সব লোপাট—আসবাবপত্র সমস্ত—এমন কি দোরগোড়ার পাপোশ অব্দি। খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে থেকে অবশেষে জানতে চেয়েছেন—'এর মানে?', এর মানে, মানে মাছের তেলেই মাছ ভাজা - আর কী!' 'তা বুঝেছি, এটা কি আমার বুকে বসে আমারই দাড়ি উপড়ানো হলো না?' 'একটু ভুল হলো তোমার, ব্যাকরণের ভুল। বরং বলো যে, তোমার বাড়িতে বাস করে তোমারই বাড়ি উপড়ানো। 'সে যাই বলো, আসলে তো জিনিসটা ভালো নয়।' 'কে বলছে তা? তবে মন্দের ভালো বলে না? মাস মাস তোমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছি সম্পূর্ণ—বাকি রাখিনি কিছু। এটা কি ভালো নয় ভাই? যদি মন্দের ভালোই বলি।' 'তা বটে।' মানতে হয় হর্ষবর্ধনকে—'ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়াই মেলে না আজকাল। সেটা তুমি ঠিক ঠিক দিয়েছ বটে।' 'তবেই বলো। আজকেরটাও দিলাম না কি? তেমনি দিয়ে যাবো মাস মাস—যতদিন না তোমার এই আস্তানার দরজা জানলারা আস্ত থাকে। তারপর যেদিন সদর দরজাটাও বেচা হয়ে যাবে সেদিন আর এই বেচারাকে ত্রিসীমানায় পাবে না।'

'সদর দরজাটার কতো দর?' শুধালেন হর্ষবর্ধন। 'কতো দর? কাঠের কারবারী, তোমারই তো জানবার কথা হে। দামী মেহগনি কাঠের দরজা। হাজার টাকা তো হবেই।' 'বেশ, তোমার দরজাটা আমিই কিনে নিচ্ছি, আমার বাড়ির আগাম ভাড়া বাবদ। 'তোমার দরজা মানে?' আপত্তি করেন ভদ্রলোক।' 'নিজের দরজাকে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছো যে। আমার বলে চালাচ্ছো কেন?' 'মনে করো না তাই এখন। আর শুধু দরজাই বা কেন, তোমার পুরোবাড়িটাই আমি কিনে নিচ্ছি তোমার থেকে।' এই বলে চেক লিখে দিয়ে ঘরদোর খোয়ানো নিজের বাড়ি নিজেই বেচে কিনে হাসিমুখে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু বারবার সেই এক খোঁয়ারে, যাওয়া কেন ফের? আপনাকেই তিনি প্রশ্ন করেন আপন মনে। নিজের বাড়ির খদ্দের হয়ে নিজেই কেনাবেচার সেই খোঁয়ার কেন আবার? একবার ন্যাড়া হবার পর সেই বেলতলায় মানুষ ক-বার যায়?

'নাঃ, ভাড়াটে বসিয়ে কাজ নেই আর। সদর-দোরে চাবি দিয়ে চলে যাব আমরা। দরজায় মজবুত তালা লাগিয়ে গেলে বাড়িকে তালাক দেবার ভয় থাকবে না।'

'এই যে, আমি ব্যবস্থা করলাম···' গোবরা চেঁচিয়ে ওঠে তখন।

'কী ব্যবস্থা? কিসের ব্যবস্থা?'

'বাজে লোকজনদের হটাবার। গয়লা, কয়লা, কাগজওয়ালা সবাইকে সরাবার—দ্যাখোনা, কেমন নোটিস লিখে দিলাম এই।'

পিজবোর্ডে তার নিজের কলমের বাহাদুরি ব্যবস্থাপত্রটা দেখায় সে।

'এখানে কেউ তোমরা কিছু রেখে যেয়ো না। আমরা বেশ কিছু দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি।'

তালার ওপর নোটিস মেরে পালালেন তাঁরা তারপর।

লেখালেখির ধান্দায় সাক্ষাৎ হয়নি অনেকদিন। যাইনি ও-পাড়ায়, ফুরসত পেতে সেদিন যেতেই রাস্তায় দেখা মিলে গেলো দু-জনার। গোবরা আর তার বৌদির।

মুটের মাথায় হোল্‌ড-অল্‌ সুটকেস চাপিয়ে কোথ্‌থেকে যেন আসছিলেন তাঁরা, দাঁড়ালেন আমায় দেখে।

'কেমন আছেন আপনি?' শুধালেন বৌদি।

'অনেকদিন মুলাকাত পাইনি।' বললো গোবরা।

'সময় পাইনে ভাই। আজ একটু ফাঁক পেতেই চলে এলাম—হ্যাঁ, ভালোই আছি বেশ। তবে আরো ভালো থাকার জন্য যাচ্ছিলাম আপনাদের বাড়ি।'

'আসুন। আমরাও যাচ্ছি তো।'

'আপনারাও যাচ্ছেন মানে? কোথায় গেছলেন এই সকালে? ফিরছেন কোথ্‌থেকে?'

'দেওঘর থেকে। সকালের ট্রেনে ফিরেছি। ট্যাক্‌সিওয়ালা চেতলার ভেতরে সেঁধুতে চাইলো না কিছুতেই, বললো যে উধর বহুত খুনখারাপি হোতা হ্যায়। নেহি জায়গা। এই বলে জজকোর্টের সামনে নামিয়ে দিলো আমাদের। সেখান থেকে একটা মুটে ধরে ফিরছি এই!'

'তাই নাকি! তা দাদাকে দেখছি নে যে?'

'দাদা আমাদের সঙ্গে এলেন না। বললেন থাকলাম এখন, কিছুদিন বাদ যাব। তোরা যা। আসতে চাইলেন না। প্যাড়ায় মজে রয়েছেন।'

'প্যাড়ায়, দেওঘরের প্যাড়া—আহা! পাড়া মজানোই বটে ভাই। কি-সব মজানো। এঁর দাদাটি এখন মজাদার হয়ে রয়েছেন।'

'প্যাড়া নিয়ে আর তাঁর প্যাড়ালালদের নিয়ে দিনরাত মশগুল।'

'প্যাড়ালাল আবার এলে কোত্থেকে?' আমি তো হতবাক!—'কোথায় জোটালেন?'

'জোটাবেন কেন। প্যারালাল কি জোটাতে হয় নাকি? প্যারালাল বলেছে কেন তবে? আশেপাশেই সহচরের মতো সঙ্গে সঙ্গে যায় সঙ্গ ছাড়ে না কখনই। সর্বদা সমান্তরালে। জানেন নাকি?'

'ও সেই প্যারালাল, তা, তোমার দাদার জোড়া কি ভূভারতে মেলে নাকি?'

'মিলে গেছে দেওঘরে। পাড়ার যতো কাচ্চাবাচ্চা ছিলো পাড়ার লোভে জুটে গেছে এসে। চেলাচামুণ্ডা সেই প্যারালাল নিয়ে প্যাড়া আর পাড়া দুই মাত্‌ করছেন। কবে ফিরবেন কে জানে।'

মনে হচ্ছে যেদিন ওর প্যাড়ায় অরুচি হবে আর প্যারালালরা অন্তরালে যাবে তার আগে নয়' গিন্নী জানান, 'একী, ফিরচেন যে, আমাদের সঙ্গে আসবেন না?'

'আজ থাক, আর একদিন আসব। আজ যাই। সারারাত রেলগাড়ির ধকল পুইয়েছেন, এখন ব্যাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করুন। আপনাদের আরামের ব্যাঘাত করতে চাই না।—গোবরা ভাই, দাদা ফিরলে জানিয়ো। খবরটা যেন পাই।'

বলে পশ্চাদপসরণ করি।

সত্যি বিশ্রামের হেতু নয়, আজ ওদের আশ্রমে হানা দেওয়ার কোনো ম্যানে হয়? এই মাত্তর ওরা এসেছেন, এখনো ওদের বাজার-টাজার কিছু আসেনি? আমি এখন ওদের বাড়ির উপর চড়াও হয়ে কী করবো?

ওদের আমন্ত্রণটা আন্তরিক ঠিকই, কিন্তু আমার দিক থেকে আপাদমস্তকের (যার মধ্যে উদরটাই অনেকখানি) কোথাও কোনো সাড়া পাইনে, বৃথা অধ্যবসায়ে আমার সায় নেই।

পরের খবর সংক্ষিপ্তই। পরে যেটা জেনেছিলাম—

গোবরা তার বৌদিকে নিয়ে তো বাসায় ফিরলো।

বাড়ির দরজায় চমক লাগলো—'এ কী, দরজাটা হাট করা কেন, ঠাকুর পো? তালা লাগিয়ে যাইনি আমরা?' 'লাগিয়ে ছিলাম বইকি। বেশ আমার মনে আছে।' গোবরা জানায়—'তার ওপর আরো লাগানো হয়েছিল…'

'আরো একটা তালা লাগিয়েছিলে আবার?'

'তালা নয়, পিজবোর্ডের আমার সেই নোটিসখানা লাগাইনি? যাতে কেউ কিছু এখানে ফেলে রেখে না যায় সেই নোটিসটা মানে সেই তোমার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাগিয়েছিলে তো নোটিস। তাই বা গেলো কোথায়। সেই তালাটাই বা কই?'

তালার তালাশে তাঁরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে দ্যাখেন, বিলকুল খালাস। চেয়ার, টেবিল, দেরাজ সব হাওয়া। খাট, পালঙ্ক, লেপ, বালিশ, বিছানা উধাও। জানালার পর্দা ফর্দা ফাঁক। হেঁসেলের হাঁড়িকুড়ি, বাসন-কোশন, হাতা খুন্তি লোপাট। ড্রেসিং টেবিল, আর্শি-টার্শি সব ফর্সা। সিন্দুক, আয়রন-সেফের চিহ্ন নেই। দরজার পাপোশটি পর্যন্ত নাস্তি।

'এ কী ব্যাপার ভাই।' হাঁ করে থাকেন গোবরার বৌদি।

ঘুরতে ঘুরতে পিজবোর্ডের সেই নোটিসখানা নজরে পড়লো—'এই যে সেই নোটিস।' লাফিয়ে উঠেছে গোবরা।

'হ্যাঁ, তাই বটে! তোমার সেই নোটিসটাই বটে!'

নোটিসের নিচে গোবরার দেবাক্ষরের নিচে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

খবরটা দিয়ে ভালো করেছিলেন, নিশ্চিন্ত মনে ধীরে সুস্থে ক্ষেপে ক্ষেপে এসে সব নিয়ে যেতে পারা গেল। আর যেমন বলেছিলেন কিছুটি রেখে যাইনি। ইতি—

'ইতির নিচে নামটি কী পড়ো দেখি?' বৌদি শুধোয়—'ইতি, শ্রীচিচিং ফাঁক।'

হর্ষবর্ধন আপিস থেকে ফিরলে বৌ এগিয়ে এসে তাঁর গা থেকে কোটটা নিলো।

তারপর নিজের বঙ্কিমদৃষ্টি, না, হর্ষবর্ধনের দিকে নয়, কোটের পকেটে নিক্ষেপ করে চেঁচিয়ে উঠল সে—

'ওমা! আজো তুমি চিঠিটা ডাকে দাওনি। ভুলে গেছ আজকেও! কী সর্বনেশে ভুলো মন তোমার গো!' আঁতকে উঠেছে বৌঃ 'এই ভোলা মন নিয়ে কি করে সংসার চালাবে বলো তো?'

জবাবে, আমি কি আর সংসার চালাই! সংসার চালায় আমার কর্ণধার—চালাও তো তুমি!—এই কথাটাই বলবার ছিল বুঝি হর্ষবর্ধনের, কিন্তু গদ্যকাব্যের মতন এই কথাটা বৌয়ের কানের ধারে গেলে সে গদগদ হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ! তাই কথাটাকে তিনি সরল করে একটু ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন, 'এই ভোলা মন দিয়েই তো সংসার চালাই গো! আমি ভোলা, আর তুমি আমার মন। আমার ভোলা মনেই সংসার চলে!'

'খুব আদিখ্যেতা হয়েছে! কাল যেন আর ডাকে দিতে ভুলো না লক্ষ্মীটি! ভারী জরুরি চিঠি···মাকে লিখেছিলাম···! আর তুমি কি না··· এত পইপই বলে দিলাম তোমায় আপিস যাবার সময়! তোমার কারবার চালাও কি করে শুনি? সামান্য একটা চিঠি ডাকে দেবার কথা মনে রাখতে পারো না।'

'কে বললে মনে রাখিনি?' হর্ষবর্ধন প্রতিবাদ জানান: 'মনেই তো রেখেছি। এখনো আমার মনে আছে।'

'ছাই আছে! কাল যাতে আর না ভোলো দেখব আমি।'

'সেবারকার মত আমার কোঁচার খুঁটে গেরো বেঁধে দেবে নাকি?' তিনি আতঙ্কিত হন: 'না বাপু, আমি গেরো দুলিয়ে আপিস যেতে পারব না।'

সেবার কোঁচার গিঁট দেখে আপিসসুদ্ধ লোকের টিটকিরির কথা তাঁর মনে পড়ে।......বলেছিল তারা—আমাদের গেরো কপালে, আর আপনার গেরো দেখছি কোঁচায়। আমার আপাদমস্তক গেরো ভাই, বলে সাফাই গেয়ে কোনরকমে সেবার তিনি রেহাই পেয়েছিলেন।

'আবার সেই গেরো?'

'না, গেরো নয়।'

'যাক, বাঁচলাম।' ললাটের একটা গেরো কাটল জেনে স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো তাঁর। কপালের রেখাটা দূর হল।

'না, গেরো টেরো নয়। তবে কাল যাতে ডাকে দিতে না ভোলো তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'চিঠিটা মাকে না লিখে যদি আমাকে লিখতে তাহলে আর কোন হাঙ্গামা থাকত না। আমার পকেটে থাকলেই চলে যেত; না হয়, বুকের কাছটায়—আমার বুকপকেটেই রেখে দিতাম ওটাকে।'

বিয়ের পরের দিনগুলির কথা মনে পড়ে তাঁর। বৌ চিঠি লিখত বাপের বাড়ির থেকে, সেসব চিঠি তো দিনরাত পকেটে পকেটেই ঘুরত তাঁর। সেসব চিঠির কোন মানে হয় না কিছু, কোন কথারই কোন অর্থ নেই। তারপরের চিঠিগুলিতে কেবলই অর্থ; অর্থের কথাই কেবল। খালি টাকা পাঠাও আর টাকা পাঠাও। পকেটে থাকতে থাকতেই চিঠিগুলি একদিন ধোপাবাড়ি ঘুরে সাফ হয়ে আসত। সব অর্থ পরিষ্কার হয়ে যেত এক ধোপেই।

পরদিন আপিস যাবার আগে কর্তার গায়ে কোট চড়াবার সময় শ্রীমতী ফের মনে করিয়ে দিলেন—'চিঠি ফেলার কথাটা মনে থাকবে তো আজ?'

'নিশ্চয়! আজ আবার ভুলি!' বলে বেরিয়ে গেছেন হর্ষবর্ধন।

চিঠি ফেলতে হবে চিঠি ফেলতে হবে, মনে মনে এই জপ করতে করতে যেই বেরিয়েছেন, পথের মোড়েই পাড়ার এক ছোকরা মনে করিয়ে দিল আবার—'চিঠির কথাটা মনে আছে তো দাদা?'

'কার চিঠি? কিসের চিঠি বল তো?'

'বৌদির চিঠির কথাই বলছিলাম তো! ডাকে দেবার কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম আপনাকে।'

'বটে ? বৌদি তোমার কানে কানে বলে দিয়েছেন নাকি ?' বলে হনহন করে এগিয়ে গেলেন ! 'ভারী ইয়ার হয়েছেন।' বললেন আপন মনেই।

কিন্তু একটু না যেতেই পেছন থেকে ডাক এল আবার। হাঁক ছাড়ছেন এক ভদ্রলোক—'ও মশাই ! দাঁড়ান একটুখানি।'

'ডাকছেন আমায় ?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই তো ! বলি, গতি করেছেন চিঠিটার ?' শুধালেন তিনি।

'কিসের চিঠি ? আপিসের কোনো···'

'না না, আপিসের নয়। আপনার গিন্নির চিঠির কথাই বলছিলাম··· ডাকে ফেলেছেন চিঠিটা ?'

'সে আমি বুঝব। আপনার কি !' রাগ হয়ে যায় হর্ষবর্ধনের। তিনি দাঁড়ান না আর।

আশ্চর্য, এর মধ্যেই পাড়াময় চাউর হয়ে গেছে কথাটা ! গিন্নির মুখ থেকে পাড়ার যাবতীয় গিন্নি, তাদের বর আর দেবর কারো জানতে বাকি নেইকো আর। পাড়ার সীমানা পার হতে পারলে তিনি বাঁচেন যেন।

কিন্তু পাড়ার বাইরে গিয়েই কি নিস্তার আছে !

বড় রাস্তার মোড়ে ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়েছেন—একপাল ইস্কুলের ছেলে—'চিঠি চিঠি - ডাকে দেবেন মনে করে'—ডাকতে ডাকতে চলে গেল তাঁর পাশ কাটিয়ে।

এবার তাঁকে অবাক হতে হলো একটু।

কিন্তু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কই তখন ! আপিসটাইম !

সামনে ট্রাম আসতেই উঠে পড়তে হলো। কিন্তু ভালো করে বসতেই পেছনের লোকটি কাঁধে হাত রেখেছেন তাঁর—

'কিছু মনে করবেন না মশাই···'

ফিরে তাকিয়ে তিনি অবাক হয়ে গেছেন, তাঁর পরিচিত কেউ বলে তো স্মরণ হয় না।

'একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না করেন। চিঠিটা ডাকে দিয়েছেন কি ?'

আর অবাক না, এবার তিনি চটেই যান বেশ। একি ? অ্যাঁ ? সব শেয়ালেরই এক ডাক যে ? কেন রে বাবা ?

'কেন বলুন তো ? আমার চিঠি—দিই না দিই সে আপনার কি ?'

'না আমার কিছু নয়, তবে বলতে হয় তাই বললাম। এখন আপনি দিন না দিন আপনার খুশি।'

'চিঠির কথা আপনি জানলেন কি করে ? শুনি তো ? আপনি কি আমাদের পাড়ার কেউ নাকি ? পাশের বাড়ির পড়শী কি ?···

'না না না···'

'তবে ? তাহলে ? আপনার সঙ্গে আমার, কি, আমার বৌয়ের কোন সম্পর্ক আছে বলে তো মনে করতে পারছি না !'

'তা যদি বলেন তো, বসুধৈব কুটুম্বকম্।' অমায়িক হাস্যে ওতপ্রোত ভদ্রলোক।

কুটুম্ব! তিনি একটু চকিতই হন এবার। বসুধানামীয় কারো সঙ্গে তাঁর মধুর সম্বন্ধের কেউ নন তো?

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দশশালা বন্দোবস্ত হয়ে থাকে জানা কথা, কিন্তু তার সব খবর কি সবাই রাখতে পারে? শালীনতার দিকেই দৃষ্টি থাকে সবার। শালীদের নজর বাঁচিয়ে নজরানা দিয়ে শালাদের দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত পায় কি কেউ?

'...আপনার স্ত্রীর অনুরোধেই বলা, নইলে আমার কি বলুন!'

'অ্যাঁ?...আমার স্ত্রী বলতে গেছেন আপনাকে? আমার বিশ্বাস হয় না।'

কিন্তু তাহলেও তাঁর খটকা লাগে। না বললেই বা এই ভদ্রলোক জানবেন কি করে? নাঃ, বাড়ির কথাটা পঞ্চশরের মতন ভস্ম করে পঞ্চমুখে বিশ্বময় এইভাবে ছড়িয়ে দেয়াটা তাঁর বৌয়ের পক্ষে নিতান্তই বাড়াবাড়ি।

কিন্তু এইটুকুন সময়ের মধ্যে এত লোককে সে জানালোই বা কি করে? খটকাটা মনের ভেতর খচখচ করতে থাকে।

তবু, যত বড়ই কুটুম্বই হোক, বকাবকি করার সময় আর নেই, তাঁর আপিসের জায়গা পেঁছে গেছে। ট্রাম থেকে নেমে পড়তে হলো তাঁকে।

আপিসে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসেই এক গ্লাস জলের জন্যে তিনি হেঁকেছেন —বেয়ারা!

বেয়ারা ছুটে এসে হাত পেতেছে—দিন।

'অ্যাঁ? কী চাচ্ছিস?'

'চিঠি দেবেন তো?'

'কিসের চিঠি?' অবাক হতে হয় তাঁকে। ছাতিফাটা তেষ্টায় জল চাইতে গেলে কে যেন কাকে আধখানা বেল এনে ঠেকিয়েছিল বলে শোনা যায়, কিন্তু এটা যে সেই বেলেল্লাপনাকেও হার মানলো!

'গিন্নিমার চিঠিঠা ডাকে ফেলবার জন্যেই ডাকছেন তো?' বেয়ারা বলে। 'তা, দিন চিঠিটা।'

'কে বললে? ভাগ তুই এখান থেকে। ভারী বেয়াড়া তো! বেয়াদব কোথাকার!' তিনি গর্জে ওঠেন: "উজবুক কাঁহাক্কা।'

যেমন রাগেন তেমনি আবার তাঁর বিস্ময় জাগে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন কেমন ঠ্যাকে—একটা দুর্ভেদ্য রহস্য বলেই মনে হতে থাকে। জল তেষ্টা তাঁর মাথায় উঠে যায়।

আপিস থেকে ফেরার পথে ফিরতি ট্রামে আবার নানান লোক গায়ে পড়ে চিঠির প্রশ্ন তোলে। একজন তো বলেই বসে—'যদি না দিয়ে থাকেন ডাকে

তো দিন আমাকে। সামনের স্টপে জেনারেল পোস্টাপিসের কাছে আমি নামব। ফেলে দিয়ে যাব এখন।'

'মাইরি আর কি! আমার বৌয়ের চিঠি আপনার হাতে দিতে গেলুম আর কি! পরের বৌয়ের চিঠি চান···আপনি কেমন ধারা লোক মশাই?'

'না না, আমি আপনার চিঠি খুলে পড়ব না, সে ভয় নেই। পাছে আপনি ভুলে যান সেই জন্যেই···'

'যাই যাব, আপনার কি তাতে!' তাঁর ইচ্ছে করে লোকটার গালে একটা চড় কসিয়ে দেন ঠাস করে।

'জরুরি চিঠি···তার ওপর আবার জরু-র চিঠি···ডবোল জরুরি বলতে গেলে আপনার···'

'চিঠিটা দেব কুটি কুটি করে আপনার সামনে? তাহলে হবে?'

'না না, রক্ষে করুন! ' বলে লোকটা জি-পি ওর কাছটায় নেমে যায়।

'আচ্ছা বিপদ!' বলে হর্ষবর্ধন আপন মনে গজরাতে থাকেন—'ভালো চিঠির জ্বালা হয়েছে দেখছি!'

বাড়ি ফিরতে সিঁড়িতেই গোবর্ধনের সঙ্গে দেখা।

'বৌদি সিনেমায় গেছে। বৌদির চিঠিটা ডাকে দিয়েছো তো দাদা?'

'ভারী যে সাউখুরি হচ্ছে বৌদির জন্যে? নিজে ফেলে দিয়ে আসতে পারিসনে? এই নে তোর চিঠি···ফেলে আয় গে!'

'বাড়ির সামনেই ডাকবাক্স! আর, একটা চিঠি ফেলবার কথা তোমার মনে থাকে না।' চিঠি নিয়ে বেরিয়ে যায় গোবরা।

নিজের ঘরে গিয়ে কোটটা খুলে ফেলে হাঁফ ছাড়েন হর্ষবর্ধন। আলনার উপর লটকে দেন কোটটাকে।

এতক্ষণে তাবৎ রহস্য পরিষ্কার হয় তাঁর চোখের ওপর।

কোটের পিঠে আলপিন দিয়ে একটা কাগজ আঁটা। আর, তাতে তাঁর বৌয়ের হাতের দেবাক্ষরে লেখা—

'আমার কর্তাকে চিঠিটা ডাকে দেবার কথাটা মনে করিয়ে দেবেন দয়া করে।'

ঘুম থেকে উঠেই হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণটা পেলাম। কিন্তু তেমন হৃষ্ট হতে পারলাম না যেন। কেননা কানাঘুষায় শুনেছিলাম যে……

গোবর্ধনই এসেছিল নেমন্তন্ন নিয়ে—

'ব্যাপার কি হে? তোমাদের কারো জন্মদিনটিন নাকি আজ?' জিগ্যেস করলাম।

'না মশাই।'

'তবে কি বৌদির বিয়ের নাকি?'

'সে আবার কি?' সে অবাক হয়ঃ 'বৌদির বিয়ে ত কবেই হয়ে গেছে! দাদার সঙ্গেই হয়েছে ত!'

'আহাহা! সে কথা বলছি কি!' আমি শুধরে নিই কথাটা—'তা কি আমি আর জানিনে! দিদিজ আর বর্ণ বাট বৌদিজ মেড্।—' বলে আমার মেড্ইজি বার করি—'জন্মসূত্রেই আমরা দিদিদের পাই, কিন্তু বৌদি পেতে হলে দাদার বিয়ে দিতে হয়। দাদা বিয়ে করলে তবেই না আমাদের বৌদি মেলে। আমি তা বলিনি, আমি বলেছি যে বৌদির বিয়ের .. মানে, তোমার বৌদির বিবাহতিথির উৎসব না কি আজ, তাই আমি জানতে চাইছিলাম—অবশ্যি সেটাকে তোমার দাদারও বিয়ের দিনের পরব বলা যায়।'

'না, তেমন কিছু কাণ্ড নয়।' সে জানায়, 'এমনি আপনাকে খেতে ডেকেছেন দাদা। দুপুরের খাওয়াটা আমাদের ওখানে সারবেন আজকে।'

'তা বেশ!' আমি বললাম। আর ভাবলাম আরো বেশ হল সকালের

খাওয়াটা না খেলেই চলবে আজ। পয়সাটাও বেঁচে গেল আর খিদেটাকেও বেশ চাগিয়ে তোলা যাবে। দুপুরেই ভূরিভোজের ডবল ডোজে সুদে আসলে উসুল হয়ে যাবে সব।

'তা, কী বাজার হয়েছে বলত ? বাজারে গেছল কে আজ ? তুমি না তোমার দাদা ?'

ভূরিভোজের গোড়াগুড়ির থেকে এগুনোই আমার অভিলাষ।

'বাজার কিসের ! বাজারে কেউ যায়ই না আজকাল। বাজারমুখোই হয় না কেউ।' ব্যাজার মুখ করে সে জানায়।

'বল কি হে ? কারণ ?'

'কারণ দাদার কিছুই আর হজম হয়না আজকাল। কবরেজ কিন্তু বলছে যে অগ্নিমান্দ্য। তা সে গরহজম বা অগ্নিমান্দ্য যাই হোক না, কিচ্ছু খেতে দিচ্ছে না দাদাকে এখন। না কবরেজ, না বৌদি। কেবল ভাস্কর লবণ খেয়ে খেয়ে রয়েছে আমার দাদা। আর কী একটা যেন হজমিগুলি।'

'অ্যাঁ ?' শুনে আমায় চমকাতে হয়। তাহলে গুজবটা যা শুনেছি নেহাত মিথ্যে নয়।

'হ্যাঁ। কবরেজ বলেছে যে গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলে গিলেই—নানারকম খাদ্যাখাদ্য খেয়েই নাকি এই শক্ত ব্যামোটা দাঁড়িয়েছে। এখন সব খাওয়া দাওয়া বন্ধ তাই।'

'তাহলে আমি··· ' একটু ইতস্তত করে বলি—'তোমার দাদা কিচ্ছুটি খাবেন না। আর আমি তাহলে ·· এমতাবস্থায়··· ভেবে দ্যাখো। যাওয়াটা কি খুব ঠিক হবে ? মানে, গিয়ে খাওয়াটা ? তারপর বলছো যে বাজার টাজারও বিশেষ কিছু হয়নিকো······'

'না না ! বৌদি নিশ্চয়ই আপনার জন্যে কিছু আনাবেন। আলাদা করে বানাবেন নিশ্চয় কিছু।'

'কিন্তু তাহলেও······।' বলতে গিয়েও বলতে আমার বাধে।

তাহলেও দৃশ্যটা তেমন হর্ষজনক নয়। হর্ষবর্ধন কিছুটি খাবেন না, আর আমি তাঁর সামনে বসে মাছ মাংস দই রাবড়ি পায়েস পিস্টক ইত্যাদির ইস্টক ক্লিয়ার করব—বসে বসে গিলতে থাকব, দেখতে তেমন যেন সুচারু নয়। হর্ষবর্ধক তো নয়ই।

আরও খারাপ লাগল এই ভেবে, যে-হর্ষবর্ধন খাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সহর্ষ—নিজে যেমন খেতে চান নানান রকম, তেমনি খাওয়াতে চান অপরকে—সেই তিনি নাকি দাঁতে কুটোটি না দিয়ে পড়ে রয়েছেন ! এর চেয়ে রোমহর্ষক আর কিছু হতেই পারে না।

কিন্তু কিন্তু করেও গেলাম শেষ পর্যন্ত।

আমাকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন হর্ষবর্ধন। খেয়ো লোককে দেখলে

কোন্ খাইয়ের না আনন্দ হয়।—'এই যে আপনি এসেছেন! এসে গেছেন ঠিক সময়েই!' বললেন তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে।

'বৌদির সঙ্গে একটু কথা কয়ে আসি।' বলে আমি সটান রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াই। ছিঁচকাঁদুনের ঝোঁক যেমন কান্নার দিকে, চোরের মন বোঁচকার দিকে, তেমনি আমায় টানে স্বভাবতই রান্নাঘরের পানে খাবারের খোঁজ-খবরে।

হর্ষবর্ধনও এলেন আমার পিছু পিছু।

'কী রেঁধেছেন বৌদি আজ?' আমার সোৎসুক জিজ্ঞাসা।

'কী আর রাঁধবো ঠাকুরপো, উনি তো গাঁদাল পাতার ঝোল আর পুরোনো চালের চারটি ভাত ছাড়া কিছু খান না—কবরেজের নিয়ম সেই রকম। তাই রেঁধেছি আজ ডবোল করে।'

'ডবোল করে কেন? ও, গোবরাও তাই খাচ্ছে বুঝি--দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে? পেটের অসুখ না হলেও খাচ্ছে?'

'খেলে তো বাঁচতুম। তাহলে কোনদিন আর পেটের অসুখ করত না ওর —পেটের অসুখ হলে খাওয়ার চাইতে, না হতেই তাই খাওয়াটা কি আরো ভালো নয় ভাই? ওকে তো বোঝাচ্ছি এত করে। তোর দাদার মতন বাইরে গিলে ব্যারাম বাধাবি কোন্‌দিন—কিন্তু শুনছে কি? ও একদম বাড়িতে খায় না আজকাল। বাইরে কোথায় কোন হোটেল টোটেল থেকে খেয়ে আসে নাকি।'

'আর আপনি? আপনি তো এই গাঁদাল—'

'না, আমি দিদির বাড়ি খাই গিয়ে। যেদিন থেকে ওঁর অসুখ করেছে দিদি বলেছেন আমার বাড়িতেই খেয়ে যাবি—যা হয় চারটি খাবি এসে।'

'তাহলে ডবোল রেঁধেছেন কেন?'

'কেন আবার! ওঁর আর আপনার দুজনের জন্যেই রেঁধেছি তো!'

শুনে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে।—'কিন্তু আমার তো কোন পেটের অসুখ করেনি বৌদি। কক্ষনো করে না—কস্মিন কালেও নয়।'

'ব্যারাম হবার আগেই সারানো ভালো নয় কি ভাই? রোগ হলে ত হয়েই গেল, যাতে না হয় তার চেষ্টা করাই কি উচিত নয় আমাদের? কবরেজের ব্যবস্থাটা তো বেশ ভালো বলেই বোধ হচ্ছে আমার……।'

'তা তো হবেই।' ক্ষোভে যেন ফেটে পড়েন হর্ষবর্ধন—'এক গাদা রাঁধতে হচ্ছে না তোমায়—আর এদিকে এক গাঁদাল পাতার ঝোল আর ভাত গিলে গিলে হাড়গিলে চেহারা হয়ে গেল আমার।'

'সত্যি, হাড়ে বাতাস লেগেছে আমার।' হাঁপ ছেড়ে বলেন বৌদি: 'রাত-দিন রান্নাঘরের হাঁড়ি ঠেলা আর নানান খানা রান্নার হাঙ্গামা মিটে গেছে সব। ভালোই হয়েছে একরকম। আর বলতে কি, বলতে নেই, চেয়ে দ্যাখো ওঁর দিকে-- এই খেয়ে চেহারাটা কি কিছু খারাপ হয়েছে তোমার দাদার?'

তারপর মনে হল, ওঁর টাকা যেমন অগাধ, শরীরের পুঁজিও তেমনি গাদা-খানেক! ওই পুঞ্জীভূত দেহের থেকে, ওঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মতই, অল্পবিস্তর খসে গেলেও টের পাবার যো নেই কিছু। সমুদ্র থেকে দু কলসি জল তুললেই কি আর তাতে ফেললেই বা কী!

'চলুন, একটু ঘুরে ফিরে আসা যাক।' বললেন আমায় হর্ষবর্ধন ঃ 'খিদেটা একটু চাগিয়ে আনিগে। খিদেটাকে চাগাড় দিয়ে আনা যাক। এসেই ত সেই এক গাদা গাঁদাল পাতার ঝোল নিয়ে বসতে হবে। চলুন খানিক ময়দানের হাওয়া খেয়ে আসি।'

পথে যেতে যেতে সুর ভাঁজতে লাগলেন তিনি। আওয়াজটা স্পষ্ট হতে টের পেলাম, না, গান না, কান্নাই বলা যায় একরকম। খিদের জ্বালায় বুঝি মহাকাব্য ফেঁদেছেন হর্ষবর্ধন।

তিনি আওড়াচ্ছেন, স্পষ্ট আমি শুনলাম---

'পেটের বড় জ্বালা···দুই হাত পা লটর পটর···কর্ণে ধরে তালা!' উৎকর্ণ হয়ে আমি শুনলাম। তারপর তাঁকে শুধালাম—'তার মানে?'

'তার মানে, চলুন না আপনি, টের পাবেন এক্ষুনি।' তিনি জানান--- 'আপনাকে কেমন লটর পটর খাওয়াব।'

'সে আবার কি?' আমি থমকে দাঁড়াই--'না, কোথাও গিয়ে লটপটানি খেতে—লটপট করতে আমি রাজি নই।'

'করতে না মশাই, খেতে হয়। লটপট একরকমের খাবার। এক পাইস হোটেলে খাইয়ে থাকে। সেইখানেই যাচ্ছি আমরা।'

অলিগলি পেরিয়ে আমাকে নিয়ে উঠলেন এক পাইস হোটেলে।

বললেন, 'নামে পাইস হোটেল মশাই, কিন্তু পয়সায় কিছু মেলে না আর আজকাল। টাকার কারবার সব। মাছের টুকরোই বলুন আর মাংসের টুকরোই বলুন, সব এক টাকা করে দাম। কোন্‌কালে কেবল পাইসে মিলত খোদাই জানেন! পুরো একপ্লেট ভাতের দামও এখানে একটাকা।'

দুজনে ভেতরে গিয়ে বসলাম একধারের লম্বা টেবিলে—একাধারে টেবিল-বেঞ্চিও বলা যায় এটাকে—ঠিক ইস্কুলে যেমনটি থাকে।

'চেয়ে দেখুন না খাদ্য তালিকার দিকে—ঐতো টাঙানো রয়েছে সামনেই।' তিনি দেখালেন।

দেখলাম—সত্যিই! মাছভাজা, মাছের ঝোল, মাছের কালিয়া, দমকারি, মাংসের প্লেট, রকমারি খাদ্যাখাদ্য—থরে থরে সাজানো—চক্‌খড়ির দামে কেউ একটাকার কম যায় না।

আরো দেখলাম, কলকাতায় বাজারে মাছের তাল না পাওয়া গেলেও এখানে তাদের বিরাট সম্মিলনী। পাবতা মাছ, টেংরা মাছ, রুই মাছ, ভেটকি মাছ, ইলিশ মাছ, গলদা চিংড়ি, আড় মাছ—আরো কত কী মাছ—তার ইয়ত্তা হয়

না। ঝাল ঝোল কালিয়া কোর্মা কোপ্তা কাবাব সব মিলিয়ে এক পেল্লায় ভোজন পর্ব। ভোজ্য পর্বতও বলা যায়।

'পয়সায় কুলোয় না মশাই! পয়সা দিয়ে কিছু মেলে না এখানে। রুপিয়া ফেলে খেতে হয় সব কিছু। ঐ যে লোকটি দেখছেন বসে আছেন কাউণ্টারে—উনিই এই হোটেলের মালিক। অনেক টাকার মালিক মশাই। দেখলে চেনবার যো-টি নেই, বসে বসে রুপিয়া গুনছেন খালি।'

'বহু-Rupee বলুন তাহলে!' আমি বললাম।

'পয়সায় কুলোবে না বলে একশ টাকার নোটখানা এনেছি।' দেখালেন তিনি—'সব টাকাটাই উড়িয়ে দিয়ে যাব। তার কমে ভাল খাওয়া হয়না আজকের দিনে।'

বলে কি লোকটা? এর না অগ্নিমান্দ্য? কিচ্ছুটি নাকি হজম হয় নাকো। খালি গাঁদালপাতার ঝোল আর ভাত বরাদ্দ? না খেয়ে খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়। তাই হন্যে হয়ে পাগলের মতন এই খাদ্যের অরণ্যে এসে ঢুকেছে···

ভেবেছিলাম খাবারের লিস্‌ট্ দেখে ঘ্রাণেন অর্ধভোজন সেরে হৃষ্ট হয়ে ফিরে যাবে, কিন্তু না, পরক্ষণেই ভুল ভাঙলো আমার। দুম করে তিনি হুকুম দিয়ে বসলেন—

'দু থালা ভাত। সব চেয়ে সরেস চালের। আর যত রকমের ভাজাভুজি আছে সব। সেই সঙ্গে দুপিস করে মাছ ভাজা, পোনা মাছ, ইলিশ মাছ, ভেটকি মাছ প্রত্যেকটার ভাজা। আরো যা যা মাছ ভাজা আছে দিতে পারেন। ভাতের সঙ্গে মাখন চাই এবং পাতি নেবু দুপিস্ করে।'

এসে গেল সব একে একে। বসে গেলাম খেতে। আলু পটল বেগুন উচ্ছে ইত্যাদির ভাজাভুজির সহযোগে মাখন মাখানো গরম ভাত মাছভাজাগুলির সঙ্গে খেতে যা খাসা লাগলো! দুজনে মিলে সাবাড় করতে লাগা গেল।

একটু না এগুতেই হর্ষবর্ধনের ফরমাস আবার—'নিয়ে আসুন, রুই মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর মাগুর মাছের ঝোল। ডবোল ডবোল।'

এসে গেল চাইতে না চাইতেই। খানিক বাদেই হাঁকলেন উনি আবার—'দই মিষ্টি সব রেডি আছে ত? কথায় বলে মধুরেন সমাপয়েৎ!'

কর্ণারের লোকটি কান নাড়ল—'আজ্ঞে হ্যাঁ—সমাপয়েৎ আছে বইকি আপনার।'

'এরপর তো গঙ্গাযমুনা? এর পরেরটা কই?' ওঁর তলব সব ডবল ডবল।

অতিকায় কই মাছ এসে পড়লো পাতে। তার এক পিঠ ঝাল অপর পিঠ অম্বল। সেই গঙ্গাযমুনা বেশিক্ষণ প্রবাহিত হতে পেল না। উঠে গেল পাতে পড়তে না পড়তেই।

'এইবার আনুন সেই ইলিশ মাছের ইলাহী।'

'ইলাহী ? ইলাহী কী আবার ?' ইলাহীর মানে আমার যৎসামান্য বিদ্যায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে বাধ্য হয়ে শুধোতে হল ওনাকে।

'ইলাহী কারবার।' জানালেন উনি ঃ 'ওরা জানে। ওর মানে হচ্চে সাত প্রস্থের ইলিশ মাছ—সাত রকমের সাতখানা। সপ্তরথী।'

'এক প্রস্থ ত হয়েই গেছে—ইলিশ মাছ ভাজা ত পেয়েই গেছি গোড়ায়।' আমি প্রকাশ করি ঃ 'আর ছ প্রস্থ বলুন তাহলে।'

'ছয় নয়।' উনি বলেন, 'আরো সাত রকমের বাকি আছে এখনো।'

'যথা ?'

'যথা, ইলিশ মাছের ঝোল, ইলিশ মাছের ঝাল, ইলিশ মাছের কালিয়া, ইলিশ ভাতে, সর্ষে ইলিশ, দই ইলিশ, ইলিশ মাছের রোস্ট এই সাত এবং পুনশ্চ······।'

পুনশ্চ ! আমি হাঁ হয়ে গেছলাম। —'পুনশ্চ আবার ?'

'দেখতেই পাবেন। এগুলো খেয়ে শেষ করুন ত আগে।' শেষ না হতেই তিনি হাঁকলেন ফের—'এবার আনুন আপনাদের সেই লটরপটর। এবার আমরা লটরপটর খাব দুজনায়।'

'লটর পটর নয়, লটপটি।' জানালো সেই কোণঠাসা লোকটা—'আমাদের ইলিশ মাছের লটপটি, ত্রিভুবন বিখ্যাত।'

লটপটি খেয়ে ঢেঁকুর তুলে হর্ষবর্ধন বললেন—'এবার সেই আপনাদের শেষ বেশ। ইলিশ মাছের অম্বল।'

'এর পর আবার অম্বল ?' না বলে আমি পারি না—'যা খাওয়া হয়েছে এতেই অম্বল হবে অমনিতেই ; না হয়ে যায় না। এর পরও আবার অম্বল আরো ?'

'ইলিশ মাছের অম্বল। সেটা মাছের মধ্যে ধর্তব্য নয়, ইলিশ মাছের মাথা আর কাঁটা ফাঁটা দিয়ে। কিন্তু খেতে যা খাসা!' তিনি অম্বলের ঝোলের সঙ্গে নিজের জিভের ঝোল টানলেন।

'ইলিশ মাছের একেবারে নয় ছয় বলুন না ! কিন্তু আপনার না অগ্নিমান্দ্য ? কিছুই নাকি হজম হয় না আপনার—বলছিল যে আপনার ভাই ?'

'হয়ই নাত। বার্লিটুকুও সহ্য হয় না আমার পেটে। মিথ্য নয় মশাই।'

'তাহলে এসব, এত······সব ?'

'এ হতভাগা কবরেজটার জন্যই। এমন এক বিদঘুটে দাবাই দিয়েছে আমায়'...বলে পকেট থেকে একটা কৌটো তিনি বার করলেন—'এই ওষুধের জন্যেই তো।'

'তার মানে ?' আমি তো আরো অবাক।

'কবরেজি ওষুধ খাবার বিধি ব্যবস্থা জানেন কিছু ? সব ওষুধের সঙ্গে একটা করে লেজুড় থাকে—তার নাম অনুপান। সেটা ওষুধের সঙ্গে খেতে

হয়। তা না হলে তেমন নাকি ফল হয় না। এরও একটা অনুপান গোছের ছিল।'

'তা তো থাকবেই।' আমি ঘাড় নাড়ি—কিছু না জেনেও অনুমান করে নিই।

'সেই অনুপানটা আরো বিদঘুটে। কী সব শেকড় বাকড় রোজ বাজার থেকে কিনে আনো। তারপর চার সের জলে চার ঘণ্টা ধরে সেদ্ধ করে চার ছটাক থাকতে নামাও, তারপরে চারঘণ্টা ধরে ঠাণ্ডা করে ওষুধের সঙ্গে গেলো। শেকড় বাকড়ের নাম শুনেই মনে হয়েছিল সে খেলে আর বলতে হবে না, খাবারদাবার সব গুলিয়ে উঠে এই গুলির সঙ্গেই বিলকুল বেরিয়ে আসবে তক্ষুনি। তাই আমি ভাবলাম, পানীয়ের বদলে খাদ্যেই যাই না কেন? অনুপানের বদলে অনুখাদ্যে।'

'এই কি আপনার অনুখাদ্য? এই খাদ্যকে কি অণুপরিমাণ বলা চলে? বরং আণবিক—মানে, আণবিক বোমার মতই দানবিক ডোজের ভোজ বলতে হয়।' বলতে আমি বাধ্য হই।

'করব কি মশাই! মোক্ষম দাওয়াই যে। না যদি কিছু খাই তো সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষলাভ—সাক্ষাৎ মৃত্যু তখুনি......'

'অ্যাঁ? এমন ওষুধ?'

'তবে আর বলছি কি!'

অবাক হয়ে শুনতে হয় আমায়—

'কবরেজি ওষুধ কথা কয়, কথায় বলে নাকি! এই গুলি-গুলিও কম কথক নয় মশাই। খাবার সঙ্গে সঙ্গে সব হজম। অবার সেই চোঁ চোঁ খিদে। আবার কসে সাঁটান আবার খান গুলি। আবার এক গুলিতে সব সাবাড়। আবার খিদে......আবার খাবার ...... আবার গুলি......আবার......'

'থামুন! থামুন! আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।'......ইলিশ মাছের পাথারে সাঁতার কাটতে কাটতে বলি। মাথা গুলিয়ে যায়!

'দুবেলায় পুরো একশ টাকার খেতে হয় আমায়। এই এক টাকার গুলির জন্যে মশাই! যদি এত এত না খাই তাহলে আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে মারা পড়বো নির্ঘাৎ। এই গুলিতেই আমার খতম।'

'কিন্তু গোবরা বলছিল আপনার কি হজম হয় না।'

'হয়ই নাতো। সাবু দানাটি পর্যন্ত হজম হয় না। বলেছে ঠিকই। কিন্তু কী করব, এতসব না খেয়েও আমার উপায় নেইকো। যা অব্যর্থ আমার কবিরাজ! এই যে হজমগুলি দিয়েছেন আমাকে—আপনিও খান না একটা—' বলে আমায় একটা গুলি দিয়ে নিজেও তিনি একখানা গিললেন।

'এ খেলে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যায়। এই গুলি রোজ তিনটে করে খেতে হবে আমার—এই ব্যবস্থা। পাছে নিজের নাড়িভুঁড়ি অব্দি হজম করে না বসি সেই ভয়ে বাধ্য হয়েই এত এত খেতে হচ্ছে আমায়। কি করব?'

হর্ষবর্ধনের অঙ্কলাভ

অবশেষে সেই দিনটি এল। শেষের সেই শোকাবহ দিনটি ঘনিয়ে এল হর্ষবর্ধনের জীবনেও···

আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ যেন তিনি ধুঁকতে লাগলেন। বললেন, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। কন কন করছে কেমন! বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন সটান।

বুঝতে আর বাকি রইল না। রোজ সকালের দৈনিক খুলেই যে-খবরটা সব প্রথম নজরে পড়ে—তেমন খবর একটা না একটা থাকেই রোজ—কালকের কাগজ খুলেও আরেকটা সেইরকমের দুঃসংবাদ দেখতে পাব টের পেলাম বেশ।

যে-খবরে আত্মীয়বিয়োগ নয়, আত্মবিয়োগের ব্যথা অনুভব করে থাকি ··· আমারো তো উচ্চ রক্তচাপজনিত হার্টের দোষ ঐ—রোজই যে খবর পড়ে আমার বুক ধড়ফড় করে আর মনে হয় আমিই যেন মারা গেলাম আজ, আর আধঘণ্টা ধরে প্রায় আধমড়ার মতই পড়ে থাকি বিছানায় মনে হলো তেমন ধারার একটা খবর যেন আমার চোখের ওপর ঘটতে চলেছে এখন।

ক'দিন ধরেই ভদ্রলোকের শরীর তেমন ভালো যাচ্ছিল না, বুকের বাঁ দিকটায় কেমন একটা ব্যথা বোধ করছিলেন—দেখাই দেখাই করে, কাজের চাপে পড়ে সময়াভাবে আর ডাক্তার দেখানো হয়ে উঠেছিল না তাঁর···অবশেষে তিনি

ডাক্তারের দেখাশোনার একেবারেই বার হতে চলেছেন…মারাত্মক সেই করোনারি থ্রম্‌বোসিস্‌ এসে তাঁর হৃদয়ের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়েছে এখন।

তাহলেও ডাক্তার ডাকতে হয়।

ছুটলাম ট্যাকসি নিয়ে রাম ডাক্তারের কাছে। এই এলাকায় নামকরা ডাক্তার বলতে গেলে তিনিই একমাত্র।

গিয়ে ব্যাপারটা বলতেই রাম ডাক্তার গুম হয়ে গেলেন। কিছু না বলে দুম করে তাঁর বিখ্যাত ডাক্তারি ব্যাগর ভেতর থেকে একটা অ্যামপিউল বার করে নিজের ইনজেকশনের সিরিঞ্জে ভরলেন।

ভয় খেয়ে আমি বলি—'আজ্ঞে না, আমি নই। আমার কিছু হয়নি। কোনো অসুখ করেনি আমার। দোহাই আমাকে যেন ইনজেকশন দেবেন না। হর্ষবর্ধনবাবুর বুকেই…'বলতে বলতে আমি সাত হাত পিছিয়ে গেলাম ভয় খেয়ে। রাম ডাক্তারের ঐ এক ব্যারাম, অসুখের নাম করে কেউ সামনে এলে, কাছে পেলেই, ধরে তাকে এই ইনজেকশন ঠুকে দেন।

তিনি আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে সিরিঞ্জ হাতে বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ট্যাকসিতে গিয়ে উঠলেন। সিরিঞ্জ হাতে নামলেন ট্যাকসির থেকে আমার হাতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ গছিয়ে দিয়ে।

গিয়ে দেখি হর্ষবর্ধন বিছানায় লম্বমান। দেখেই বুঝলাম হয়ে গেছে! দেহরক্ষা করেছেন ভদ্রলোক।

সিরিঞ্জটা আমার হাতে দিয়ে 'ধরুন, এটা ততক্ষণ' বলে রাম ডাক্তার হর্ষবর্ধনের নাড়ি টিপে দেখলেন। তারপর স্টেথিসকোপ বসালেন। অবশেষে গম্ভীর মুখে জানালেন সব শেষ।

আমি 'ফল ধররে লক্ষ্মণের' মতন তাঁর সিরিঞ্জ হাতে কম্পাউণ্ডারের দুর্লক্ষণের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি তখনো।

'দিন ত সিরিঞ্জটা—' আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন– 'ওষুধটা আর নষ্ট করব না। ওঁর নাম করে সিরিঞ্জে যখন ভরেছি তখন ইন্‌জেকশনটা বরবাদ না করে দিয়েই যাই বরং ওনাকে।'

বলে মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা মারার মতই ইনজেকশনটা স্বর্গত তাঁর বুকের ওপর ঠুকে দিয়ে ভিজিটের টাকাগুলো গুনে নিয়ে ব্যাগ হাতে ট্যাকসিতে গিয়ে চাপলেন আবার।

হর্ষবর্ধনের বৌ পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন। আমি একখানা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম শবদেহকে।

গোবর্ধন চোখের জল মুছে বলল—'কান্না পরে। ভায়ের কাজ করি আগে। আমি নিউ মার্কেটে চললাম, ফুল নিয়ে আসি গে। তারপর খাট সাজাতে হবে। আপনি যদি পারেন তো ইতিমধ্যে কীর্তনীয়াদের ডেকে নিয়ে আসুন—বন্ধুর কর্তব্য করুন।'

'তার আগে চাই ডেথ সার্টিফিকেট।' আমি জানাই ঃ 'তা না হলে ত মড়া নিয়ে কেওড়াতলায় ঘেঁষতেই দেবে না। তাড়াহুড়োর মধ্যে ডাক্তারবাবু চলে গেছেন ভুলে—ডেথ সার্টিফিকেটটা না দিয়েই—সেটা লিখিয়ে আনিগে তাঁর কাছ থেকে। তার পরে ফেরার পথে তোমার সংকীর্তন পার্টির খবর নেব নাহয়।'

ডেথ সার্টিফিকেট পেলাম কিন্তু কেত্তুনেদের খোঁজ পাওয়া গেল না। তারা যে কোথায় থাকে, কোথায় যায় কেউ তা বলতে পারল না। শুধু এইটুকু জানা গেল যে আজকাল নাকি তাদের ঘোর চাহিদা। ঘৃত দুগ্ধপুষ্ট মনস্বী যতো বড় লোকদের মড়ক যেন লেগেই আছে চারধারে এখন।

ডেথ সার্টিফিকেট হাতে দরজাতে পা ঠেকাতেই চমকে উঠতে হলো। বাড়িতে পা দিতেই যাঁর ক্রন্দন ধ্বনি কানে আসছিল তিনি আর্তনাদ করে উঠছেন যে অকস্মাৎ!

ঢুকে দেখলাম, হর্ষবর্ধনের স্ত্রীও নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ সটান!

'সতীসাধ্বী সহমরণে গেলেন!' বলে তাঁর পায়ে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে নাকের গোড়ায় হাতটা ঠেকাতেই—ওমা! নিশ্বাস পড়ছে যে বেশ! অজ্ঞান হয়ে গেছেন মাত্র।

মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতেই নড়েচড়ে উঠে বসলেন উনি।

'হঠাৎ অমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন যে! হয়েছিল কী?' আমি জিজ্ঞেস করি।

তিনি ভীতিবিহ্বল নেত্রে বিগত হর্ষবর্ধনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—'নড়ছিল যেন মনে হলো।' বলে নিজের আশঙ্কাটা ব্যক্ত না করে পারলেন না—'শনিবারের বারবেলায় গত হলেন, দানোয় পায়নি ত? ভূত-প্রেত কিছু হননি ত উনি?'

'প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন কিনা শুধোচ্ছেন? তা কি করে হয়? ওঁর মতন দানব্রত পুণ্যাত্মা লোক সটান স্বর্গে চলে গেছেন। উনি ত ভূত হবেন না—না কোনো ভূত ওঁর দেহে ভর করতে পারবে।' বলে, মুখে সাহস দিই বটে কিন্তু সত্যি বলতে আমার বুক কেঁপে ওঠে—'রাম নাম করুন, তাহলেই আর কোনো ভয় নেইকো।'

'আমার শ্বশুর ঠাকুরের নাম যে, করি কি করে?' তিনি বলেন—'আপনি করুন বরঞ্চ।'

'আমাকে আর করতে হবে না রাম নাম। আমার নামের মধ্যেই স্বয়ং রাম আছেন, তার ওপর আমার হাতে সাক্ষাৎ রাম ডাক্তারের সার্টিফিকেট—এই দেখুন—ভূত আমার কাছে ঘেঁষবে না।'

দেখতে দেখতে হর্ষবর্ধন নড়েচড়ে উঠে বসলেন বিছানার ওপর। খানিকক্ষণ যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন চারদিকে। তারপর নিজেকে চিমটি কেটে দেখলেন বারকয়েক—'নাঃ, বেঁচেই আছি বটে।' বলে তারপর শুধোলেন

আমাদের—'শিবরাম বাবু ! আপনি অমন গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে কিসের জন্যে ? গিন্নি, তোমার চোখে জল কেন গো ?'

কারো কোনো বাক্যস্ফূর্তি না দেখে আপন মনেই যেন শুধালেন আবার—'কী হয়েছিল আমার ?'

প্রশ্নটা আমার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত মনে করে আমি তাঁকে পালটা জিজ্ঞেস করলাম—'আপনিই ত বলবেন আপনার কী হয়েছিল।'

'কিছুই হয়নি।' তিনি জানালেন তখন—'একটা ভারী বিচ্ছিরি দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম যেন। এই রকমটাই মনে হচ্ছে এখন।'

'কিছুই হয়নি তাহলে। আপনি কিছু আর ভাববেন না। কর্তাকে গরম গরম এক কাপ কফি করে দিন তো।' বললাম আমি শ্রীমতীকে।

উনি দু কাপ কফি করে নিয়ে এলেন—আমার জন্যও এক কাপ ঐ সঙ্গে।

কফির পেয়ালা নিঃশেষ করে তিনি বললেন—'আপনার হাতের কাগজটা কী দেখি তো।'

কাগজখানা হস্তগত করে নাড়াচড়া করলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন—'ডাক্তারদের প্রেসক্রপশনের মাথামুণ্ডু কিছু যদি বোঝা যায় ! কম্পাউণ্ডাররাই বুঝতে পারে কেবল।'

ইতিমধ্যে গোবরা কয়েক তোড়া ফুল নিয়ে এসে হাজির।

'এত ফুল কিসের জন্যে রে ? ব্যাপার কি আজ ?' অবাক হয়ে শুধিয়েছেন তিনি।

'আজ যে আপনাদের বিয়ের তারিখ তা একদম মনে নেই আপনার ? সে কারণে আমার কথায় গোবর্ধন ভায়া ফুল কিনে আনতে গিয়েছিল বাজারে। নতুন ফুলশয্যার দিন না আজ আপনার ?'

'বিয়ের তারিখ বুঝি আজ ? তাই নাকি ? একেবারেই মনে ছিল না আমার !' বলে আপন মনেই যেন তিনি গজরান—'মনেও থাকে না তারিখটা। রাখতেও চাইনে মনে করে। বিয়ের তারিখ তো নয়, আমার তারিখ। অপমৃত্যুর দিন আমার।'

আমি একবার বক্রকটাক্ষে শ্রীমতী হর্ষবর্ধিনীর দিকে তাকাই। তিনি কিছু বলেন না। তাঁর ভারিক্কী মুখ যেন আরো ভারী হয়ে উঠছে দেখা যায়।

হর্ষবর্ধন রাম ডাক্তারের সার্টিফিকেটখানা গোবরার হাতে দিয়ে বললেন—'যা তো গোবরা ! রাম ডাক্তারের এই প্রেসক্রপশনটা নিয়ে সামনের ডিসপেন-সারির কম্পাউণ্ডার বাবুকে দে গিয়ে—যেন এই ওষুধটা চটপট বানিয়ে দেন দয়া করে।'

গোবর্ধন বেরিয়ে গেলে আমার দিকে ফিরলেন তিনি—'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম মশাই বলব স্বপ্নটা ! আপনাকে একসময়।

আপনি গল্প লিখতে পারবেন তার থেকে। কিন্তু স্বপ্ন দেখে আমি তেমন অবাক হয়নি মশাই স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি, ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখতে হয়। কিন্তু এই অবেলায় হঠাৎ এমন ঘুমিয়ে পড়লাম কেন, এমন তো ঘুমোই না, তাই ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি আরো।'

'ঘুমের আবার বেলা অবেলা আছে নাকি?' ঘুমের তরফে সাফাই গাইতে হয় আমায়—'সব সময়ই হচ্ছে ঘুমের সময়। তার ওপর রাতের বেলা ত বটেই। যখন ইচ্ছে ঘুমোন। আমি তো সময় পেলেই একটুখানি ঘুমিয়ে নিই মশাই! অসময়ে ঘুমোই আবার। ঘুমোতে তো আর ট্যাকসো লাগে না...'

বলতে বলতে গোবর্ধন একটা শিশি হাতে ফিরে এল—'এই মিকচারটা বানিয়ে দিল কম্পাউণ্ডার। তিন ঘণ্টা বাদ বাদ খাবে। এক দাগ খেয়ে ফ্যালো চট করে এক্ষুনি।'

হর্ষবর্ধন এক দাগ গিলে যেন একটু চাঙ্গা বোধ করলেন—'বাঃ বেড়ে ওষুধ দিয়েছে তো! খেতে না খেতেই বেশ সুস্থ বোধ করছি। থাক প্রেসক্রপশনটা আমার কাছে।' বলে গোবর্ধনের হাত থেকে সেই ডেথ-সার্টিফিকেটখানা নিয়ে নিজের বালিশের তলায় গুঁজে রাখলেন তিনি—'মনে হচ্ছে ওটা খেয়ে যেন নবজীবন লাভ করলাম। চালিয়ে যেতে হবে ওষুধটা। রাম ডাক্তারের দাবাই বাবা! ডাকলে সাড়া দেয়!'

'আপনার এয়োতির জোরেই বেঁচে গেছেন উনি এ যাত্রা!' কানে কানে ফিসফিস করে এই কথা বলে ওঁর বৌয়ের হাসিমুখ দেখে আর ওঁকে বহাল তবিয়তে রেখে ওঁদের বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম সেদিন।

দিন কয়েক বাদে হর্ষবর্ধন রাম ডাক্তারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক পশলা বৃষ্টি আসতেই তিনি বাড়ির দোর গোড়াটায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

তারপর সেখানেও বৃষ্টির ছাঁট আসছে দেখে ভাবলেন, রাম ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে এমন ভালো আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে ধন্যবাদটা জানিয়ে যাই।

ভেবে যেই না তাঁর চেম্বারে ঢোকা রাম ডাক্তার তো আঁ আঁ করে আঁতকে উঠেছেন তাঁকে দেখেই না!

'ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! চিনতে পারছেন না আমায়? আমি শ্রীহর্ষবর্ধন।' তাড়াতাড়ি তিনি বলেন—'আপনার ওষুধ খেয়ে আমি ঢের ভালো আছি এখন। বুকের সেই ব্যথাটাও নেই আর। সেই কথাটাই বলতে এলাম আপনাকে।'

'আমি তো কোনো ওষুধ দিয়ে আসিনি আপনাকে। শুধু একটা

কোরামিন ইনজেক্শন দিয়েছিলাম কেবল তবে কি, তারই রি-অ্যাক্শনেই আপনি পুনর্জীবন···'

'সে কি! আমাকে দেখে এই পেসক্রপশনটা দিয়ে আসেননি আপনি?' বাধা নিয়ে বললেন হর্ষবর্ধন: 'কাগজখানা সেই থেকে আমি বুকে করে রেখেছি যে। কখনো কাছ ছাড়া করিনে। আপনার এই প্রেসকৃপশনের ওষুধ খেয়েই ত আমি নবজীবন লাভ করলাম মশাই।'

কাগজখানা তিনি বাড়িয়ে দিলেন রাম ডাক্তারের দিকে।

'প্রেসকৃপশন? দেখি—আঁ—এটা তো আপনার ডেথ সার্টিফিকেট—আমিই দিয়েছিলাম বটে।'

'ডেথ সার্টিফিকেট?···আঁ?' এবার আঁতকাবার পালা হর্ষবর্ধনের। কাঁপতে কাঁপতে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লেন তিনি।

'আমার ডেথ সার্টিফিকেট? তাই-ই বটে!' খানিকটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন তারপর—'তাহলে ঠিকই হয়েছে। আমার সেই ভীষণ স্বপ্নটার মানে আমি বুঝতে পারছি এখন···এতক্ষণে বুঝলাম।'

'আপনি কি তাহলে মারা যাননি না কি?'

'তাহলে কি এখন ভূত হয়ে···' ভয় খেলেও তেমন ভয়াবহ কিছু নয় বিবেচনা করে ডাক্তার তত ঘাবড়ালেন না এবার—'দেখুন স্বর্গীয় হর্ষবর্ধন-বাবু! আমার কোনো দোষ নেই। আমি আপনাকে মারিনি! সে সুযোগ আমি পাইনি বলতে গেলে। আমি গিয়ে পেঁছিবার আগেই আপনি খতম হয়েছিলেন ··।'

'না না, আপনার কোনো দোষ দিচ্ছিনে। আমি মারা গেছলাম ঠিকই। আমার নিজগুণেই মরেছিলাম। আপনার ডেথ সার্টিফিকেটেও কোনো ভুল হয়নিকো। যমালয়েও নিয়ে গেছল আমায়। ঘটনাটা যা হয়েছিল বলি তাহলে আপনাকে। যমালয়ের ফেরতা বেঁচে ফিরে এলাম কি করে আবার—শুনলে আপনি অবাক হবেন।'

সন্দেহ একেবারে না গেলেও রাম ডাক্তার উৎকর্ণ হন।

'যমদূতেরা নিয়ে গিয়ে যমরাজার দরবারে তো হাজির করল আমায়।'—বলে যান অভূতপূর্ব হর্ষবর্ধন—'দেখলাম, বিরাট সেরেস্তার সামনে সিংহাসনে বসে আছেন যমরাজ। সামনে দপ্তর নিয়ে বসে তাঁর চিত্রগুপ্ত, কেউ না বলে দিলেও, তাঁর দিকে তাকালেই তা মালুম হয়। যমদূতেরা সব ইতস্তত খাড়া।

যমরাজ আমাকে দেখে গুপ্তমশাইকে ডেকে বললেন—'দেখত হে, এর পাপ-পুণ্যের হিসাবটা দ্যাখো তো একবার।'

খতিয়ান দেখে চিত্রগুপ্ত জানালেন—'প্রভু! এর পুণ্যকর্মই বেশি দেখছি। তবে পাপও করেছে কিছু-কিছু।'

'কী পাপ?'

'আজ্ঞে ভ্যাজালের কারবার। ভারতখণ্ডের বেশির ভাগ লোকই যা করছে আজকাল।'

'কিসে ভ্যাজাল দিত লোকটা ?'

'কাঠের ভ্যাজাল।'

'প্রভু! কাঠ কি কোনো খাবার জিনিস না ওষুধপত্তর, যে তাতে আমি ভ্যাজাল দিতে যাব ?' প্রতিবাদ না করে পারলাম না আমি—'কাঠ কি কেউ খায় কখনো ? না, কাঠে কেউ ভ্যাজাল দিতে যায় ? কাঠের আবার ভ্যাজাল হয় না কি ?'

'কিন্তু হয়েছে।' চিত্রগুপ্ত বললেন—'লোকটা দামী সেগুন কাঠ বলে বাজে বেগুনকাঠের ভ্যাজাল চালাত।'

'আপনি অবাক করলেন গুপ্তমশাই!' আমি বললাম তখন—'পাট গাছ থেকে যেমন ধান হয়ে থাকে, সেই রকম কথাটাই বলছেন না আপনি ? বেগুন গাছের থেকে কাঠ হয় নাকি আবার ? পাটগাছের থেকে তবু পাটকাঠি মেলে, কিন্তু বেগুন গাছের থেকে কাঠ দূরে থাক একটা কাঠিও যে পাওয়া যায় না মশাই!'

'বেগুন মানে গুণহীন, নির্গুণ, বাজে।' ব্যাখ্যা করে দিলেন চিত্রগুপ্ত। 'দামী বলে বিলকুল বাজে কাঠ ছেড়েছ তুমি বাজারে।'

কথাটা মেনে নিতে হয় আমায়।—'তা ছেড়েচি বটে প্রভু! কিন্তু দেখুন, শাস্ত্রেই বলেছে আমাদের মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা। সদা মহাজনদের পথে চলিবে। আমিও সদা সিধে তাই চলেছি। মহা মহা ব্যক্তিরা কে নয় ?—নানাভাবে ভ্যাজাল চালাচ্ছে এখন - বেপরোয়া চালিয়ে যাচ্ছে—তাই দেখে আমিও…'

যমরাজ বাধা দিলেন আমার কথায়—'চিত্রগুপ্ত, এর জন্য, কতদিন নরকবাসের দণ্ড দেয়া যায় লোকটাকে ?'

'ধর্মরাজ! বিশ বছর তো বটেই। পাপের বিষ ক্ষয় হতে ঐ বিশ বছরই যথেষ্ট—বিশে বিষক্ষয় হয়ে যাক…তবে এর স্বর্গবাসের সময়টাই ঢের বেশি আরো…।'

ধর্মরাজ তখন আমার দিকে তাকালেন—'তুমি আগে স্বর্গভোগ করতে চাও, না নরকভোগটাই করবে আগে ?'

'যা আপনি মঞ্জুর করবেন!' কৃতাঞ্জলিপুটে আমি বললাম। আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে যমরাজ নিজের হাতের নোখগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলাম, তাঁর হাতের নোখগুলো বেড়েছে বেজায়—দেখবার মতই হয়েছে সত্যি!

বললাম—'অবিলম্বে আপনার নোখ কাটার দরকার কর্তা! বড্ডো বড় হয়েছে যথার্থই! যদি অনুমতি করেন আর একটা নরুণ পাই, অভাবে ব্লেড, তাহলে আমিই কেটে দিতে পারি।'

'নোখ না, আমি নখদর্পণে তোমার কলকাতার পরিস্থিতিটা দেখছিলাম।'

'আজ্ঞে, কলকাতায় আমার কোনো পরিস্থিতি নেই। আমার পেত্নীস্থিতি। আমার বাড়িতে যিনি আছেন কোনো ক্রমেই তাঁকে পরি বলা যায় না। পেত্নী বললেই ঠিক হয়। এমন দজ্জাল ঘ্যানঘেনে আর খ্যানখেনে কুঁদুলে বৌ আর দুটি এমন দেখিনি। পেত্নী নিয়েই হয়েছে আমার ঘর করা··· ।'

'যদি তোমাকে বাঁচিয়ে আবার তোমার বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়?'

'দোহাই হুজুর, তাহলে আমি মারা পড়বো। মারা যাবো আবার আমি। অমন বৌয়ের কাছে আমি ফিরে যেতে চাইনে, তার চেয়ে নরকেও যাব আমি বরং।'

'দেখছিলাম তাই। তোমার ঘরের পরিস্থিতি এই, বাইরের পরিস্থিতি যা দেখছি কলকাতায় তা আরো ভয়াবহ···রাস্তায় খানাখন্দ, আর আঁস্তাকুড়ের গন্ধ, যত রাজ্যের জঞ্জাল। ট্রামে বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে মানুষ, রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা, আপিসে আপিসে ঘেরাও, চালে কাঁকর, তেলে ঘিয়ে ভেজাল, চিনিতে বালি, বালিতে গঙ্গামাটি, দুধে জল যে রকমটা দেখলাম আমার এই নখদর্পণে তাতে মনে হয় কলকাতাটাই এখন নরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কত বললে চিত্রগুপ্ত! বিশ বছরের নরকবাস না! তোমার আয়ু বিশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হলো আরো। যাও, গিয়ে তোমার কলকাতা গুলজার করো গে।'

আর, তারপরই আমি বেঁচে উঠলাম তৎক্ষণাৎ।' বলে হর্ষবর্ধন একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

'নাঃ, বিজ্ঞাপনে কাজ হয় সত্যিই !'

হর্ষবর্ধন এসে ধপ করে বসলেন আমার ডেকচেয়ারে। হাঁফ ছেড়ে বললেন কথাটা।

'হ্যাঁ, কথাটা আপনার যেমন বিজ্ঞাপনসম্মত তেমনি বিজ্ঞানসম্মতও বটে।' বিজ্ঞজনের মতই তাঁর কথায় আমার সায়।

'সেদিন আপনাকে দিয়ে আনন্দবাজারে বার করার জন্যে সেই বিজ্ঞানপনটা লিখিয়ে নিয়ে গেলুম না ?...... '

'হ্যাঁ, মনে আছে আমার !' আমি বললাম : 'রাতের পাহারা দেবার জন্যে লোক চাই—সেই ত ?'

'আমাদের কাঠের কারখানায় রোজের বিক্রির বহুত টাকা পড়ে থাকে ক্যাশ বাক্সে, বাড়ি নিয়ে আসা সম্ভব হয় না, পরদিন সে টাকা সোজা গিয়ে জমা পড়ে ব্যাঙ্কে—সেই কারণে, রাত্রে টাকাটা আগলাবার জন্যেই কারখানায় থাকবার একজন সুদক্ষ লোক চেয়েছিলাম আমরা।...'

'রাতের চার প্রহর পাহারা দেবার জন্য সুদক্ষ এক প্রহরী। বেশ মনে আছে আমার।' আমি বলি : 'আমিই ত লিখে দিলাম কপিটা। তা, কিছু ফল পেয়েছেন বিজ্ঞাপনটা দিয়ে ?'

'পেয়েছি বৈকি ফল। বলতে কি, সেই কথাটা জানাতেই ত আপনার কাছে ছুটে আসা।'

'ফল বলতে !' গোবরাও এসেছিল দাদার সঙ্গেঃ 'রীতিমতন প্রতিফল পাওয়া গেছে বলা যায়।'

'কটা সাড়া এলো ?' আমি শুধাই।

'আপাতত একটাই।' ওর দাদা বলেনঃ 'ক্রমশ আরও সাড়া পাবো আশা করছি। আপাতত এই একটাই।'

'ওই একটাতেই সাড়া পড়ে গেছে।' সাড়া পাওয়া যায় গোবরারও !—'সাড়া পড়ে গেছে সারা চেতলায়।' সে জানায়।

'দু ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের দরুন দুশো টাকা। তা নিক তাতে দুঃখ নেই। সে দু ইঞ্চিরই বা দাম দেয় কে ?'

'দুশো টাকার বিজ্ঞাপন দিলে অন্তত তার দুশো গুণ লাভ ত হয়ই কারবারে—তা নইলে লোকে দেয় কেন ?'

'এখানেও বেশ লাভ হয়েছে লোকটার। দুশো গুণেরও ঢের বেশি।'

'প্রায় ছয়শো গুণ—তাই না দাদা ?' হিসেব করে বলে ভাইটিঃ 'ষাট হাজার টাকার মতই ছিল না বাক্সটায় ?'

'প্রায় আশি হাজারের কাছাকাছি। বিলকুল ফাঁক !'

'আশি হাজার টাকা হলে কত হয় ?' গোবরা আঙুল দিয়ে আকাশের গায় পারসেণ্টেজের আঁক কষতে লাগে।

আমার সামান্য বুদ্ধির আঁকশি দিয়ে ওদের হিসেবের নাগাল পাই না—'বিলকুল ফাঁক ! তার মানে ?' শুধাই দাদাকে।

'মানে কাল সকলের কাগজে বিজ্ঞাপনটা বেরুল না আমাদের ? আর কাল রাত্তিরেই কারখানায় সিঁধ কেটে চোর ঢুকে সমস্ত টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। আজ কারখানা খুলতে গিয়ে দেখি ক্যাশবাক্স ভাঙা।'

'অ্যাঁ ?' আঁতকে উঠি আমিঃ 'তা, খবর দিয়েছেন পুলিসে ?'

'পুলিসে খবর দিয়ে কী হবে ? আমাদেরই পাকড়ে নিয়ে যাবে থানায়। এইসা টানা হ্যাঁচড়া লাগাবে যে বাপ বাপ ডাক ছাড়তে হবে। এখন নিজেদের কারবার দেখব না থানা-পুলিস করব ?' বলেন হর্ষবর্ধনঃ 'আর চোর বা ধরবে ওরা, তা আমার জানা আছে বিলক্ষণ !'

'আমি ধরতে পারি চোর।' বলল গোবরাঃ 'তা দাদা আমায় ধরতেই দিচ্ছে না।'

'হ্যাঁ বললেই হলো চোর ধরবো ! ওদের কাছে ছোরা-ছুরি থাকে না ? ধরতে গেলেই ছুরি বসিয়ে দেবে ঘ্যাচাং করে ! ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে এক কথায়। ওর মতন নাবালক একটা ছোঁড়াকে আমি ছুরির মুখে ঠেলে দেব—আপনি বলছেন ?'

'কি করে বলি !' বলতে হয় আমায়ঃ 'ওসব ছোরাছুরির ব্যাপারে আমাদের বয়স্কদের না থাকাই ভালো।'

'আমি কিন্তু অক্লেশে ধরে দিতাম। কোনো ছোরাছুরির মধ্যে না গিয়েও—স্রেফ গোয়েন্দাগিরি করেই।'

'কি করে ধরতিস ?'

'ঐ মাটি ধরেই।'

'ও! মাটিতে বুঝি পায়ের ছাপ পড়েছে চোরের ?' আমি কৌতূহলী হই : 'কারখানার মাটিতে পায়ের দাগ রেখে গেছে চোররা ? কবরখানা খুঁড়ে গেছে নিজের ?'

'দাগ না ছাই!' মুখ বিকৃত করেন হর্ষবর্ধন : 'সিগ্রেটের ছাইও ফেলে যায়নি একটুকু। কী নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবি শুনি ?'

'কারখানার মাটি নয়, সেই মাটি। বলে না যে—যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে ? সেই মাটি ধরেই আমি চোর ধরব।' ফাঁস করে গোবরা। 'বিজ্ঞাপনটা দিয়ে মাটি হয়েছে ত! ঐ মাটি দিয়েই আমার কাজ হাসিল করব আমি।' হাসিখুশি হয়ে সে জানায়।

ওর রহস্যের আমি থই পাই না। এমন কি ওর দাদাও থ হয়ে থাকেন। 'হ্যাঁ চোর ধরবে গোবরা!' বলে তিনি উসকে উঠলেন একটু পরেই : 'তাহলে ...তাহলে তখন ধরলো না কেন ? এর আগেও ত জিনিস চুরি গেছল আমাদের।'

'এর আগেও গেছে আবার ?'

'হ্যাঁ আমিই তো চুরি গেছলাম।' হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন।

'তোমার জিনিস নাকি ?' প্রতিবাদ করে গোবরা : 'বৌদির জিনিস না তুমি ? তুমি কি তোমার নিজের জিনিস—নিজস্ব ?'

'ওই হলো ?' বলে ফোঁস করলেন দাদা : 'কেন তুইও কি চুরি যাসনি আমার সঙ্গে ? তুই ত আমার জিনিস। আমি তোর অভিভাবক না ? তখন চোর ধরতে কী হয়েছিল তোর ?

'তারপর ? চোরের হাত থেকে উদ্ধার পেলেন কি করে ?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'যেমন করে পায় মানুষ।' তিনি জানান : 'চুরির ধন বাটপাড়িতে যায় শোনেননি ? তারপর চোরের হাত থেকে বাটপাড়ের হাতে গিয়ে পড়লাম আমরা।'

'বটে বটে ?' আমার সকৌতুক কৌতূহল : 'তা শেষমেষ উদ্ধার পেলেন ত ? পেতেই হবে উদ্ধার শেষ পর্যন্ত। গোয়েন্দাকাহিনীর দস্তুর। তা উদ্ধার করল কেটা ?'

'ডাকাত এসে পড়ল শেষটায়। ডাকাত আসতে দেখেই না বাটপাড় ব্যাটা ভোঁদৌড়!'

'ডাকাত এসে পড়ল আবার তার ওপর ?'

'হ্যাঁ, ওর বৌদি বাপের বাড়ি থেকে ফিরে যেই না দোরগোড়ায় এসে

হাঁকডাক শুরু করেছে তাই না শুনে নিচে উঁকি মেরে দেখেই না, সেই বাটপাড়টা সঙ্গে সঙ্গে উধাও! খিড়কির দোর দিয়ে সটাং!···বৌ না তো ডাকাত!'

'আমার ডাকসাইটে বৌদির নামে যাতা বলো না, বলে দিচ্ছি।' গোঁসা হয় গোবর্ধনের।

'ওই হলো! তোর কাছে যা ডাকসাইটে আমার কাছে তাই ডাকাত-সাইটে।'

'যেতে দিন।' পারিবারিক কলহের মাঝখানে পড়ে আমি মিটিয়ে দিই: 'আপনাদের চুরি যাওয়ার কাহিনীটা বলবেন ত আমায়। সেবারকার আপনাদের যুদ্ধে যাওয়ার গল্পটা বলেছিলেন, তাই লিখে দু পয়সা পিটেছিলাম, এবার এটার থেকেও···'

'বলব আপনাকে এক সময়। কারখানার জন্য এখন একটা লোহার সিন্দুক কিনতে যাচ্ছি। চোর বাবাজী আবার ঘুরে এলেও সেটা ভাঙা আর সহজ হবে না তার পক্ষে এবার।'

পরদিন সকালে শ্রীমান গোবর্ধন এসে হাজির। 'দেখুন এই বিজ্ঞাপনটা যাচ্ছে আজ আনন্দবাজারে, দেখুন ত ঠিক হয়েছে কিনা?'

গোবর্ধন তার কালজয়ী সাহিত্যকীর্তিটি আমার হাতে দেয়।

বিজ্ঞাপনের কপিটিতে ওদের চেতলার বাসার ঠিকানা দিয়ে লেখা আছে দেখলাম—'প্রাইভেট ডিটেকটিভ আবশ্যক। আমাদের বাড়ির একটি ঘরে বহুমূল্য তৈজসপত্র রক্ষিত আছে, সেই ঘরের গা-লাগাও একটা জলের পাইপ উঠে গেছে সোজা উপরে-সেই নল বেয়ে কেউ যাতে না উঠতে পারে সেই দিকে সারা রাত্রি নজর রাখার জন্য বিচক্ষণ এক গোয়েন্দার প্রয়োজন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক।'

'বুঝেছি। জলে যেমন জল বাধে' আমি ঘাড় নাড়লাম, 'তেমনি বিজ্ঞাপনটা দিয়ে ঐ রকম আরেকটা কাণ্ড বাধাবে তুমি দেখছি। চোরটা যেই পাইপ বেয়ে উঠবে আর তোমার ঐ ডিটেকটিভ গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াবে তাকে। এই তো?'

'সে আপনি বুঝবেন না। সেসব আপনার মাথায় খ্যালে না।' বলে চলে গেল গোবরা।

দিনকয়েক বাদে একটা লোক এসে ডাকছে আমায়—'আসুন আসুন। চটপট চলে আসুন আমার সঙ্গে।'

অপরিচিত আহ্বানে আমি থতমত খাই—'আপনি···আপনাকে তো আমি···।'

'চিনতে পারছেন না আমাকে? ছদ্মবেশে রয়েছি কিনা,' বলে লোকটা তার গোঁফদাড়ি খুলে ফ্যালে।

'ওমা! গোবরা ভায়া যে! এমন অদ্ভুত বেশ কেন হে?—এর মানে?'

'চোর ধরতে যাচ্ছি না? ডিটেকটিভকে ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করতে হয় না তো? আপনার জন্যেও একজোড়া দাড়িগোঁফ এনেছি, পরে নিন চট্ করে…'

'আমি, আমি, আমি আবার পরব কেন?'

'আপনাকেও ছদ্মবেশে ধারণ করতে হবে না? আপনি আমার শাগরেদ তো এ যাত্রায়। ব্লেকের যেমন স্মিথ, বিমলের যেমন কুমার। তেমনি আমার সহযোগী গোয়েন্দা যখন তখন আপনাকেও ত…'

'তুমি পরলেই হবে। আমাকে আর পরতে হবে না ছদ্মবেশ।' বললাম আমি ঃ 'দাড়িওয়ালা লোকের ছায়া আমি মাড়াই নে, জানে সবাই। তোমার সঙ্গে ঘুরলে কেউ আর আমায় আমি বলে সন্দেহ করবে না।'

'তাহলে চলে আসুন চটপট। এই ফাঁকে চেতলার বাজারটা ঘুরে আসি একবার।' বলল সে ঃ 'দাদাও আবার বাজার করতে বেরিয়েছেন কিনা এখন। পাছে আমায় চিনতে পারেন, আমার ছদ্মবেশধারণের সেও একটা কারণ বটে—বুঝলেন?'

'বুঝেছি।' বলে বেরুলাম ওর সঙ্গে। বাজারের মুদীখানাগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা লোককে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছে গোবরা—'ধরেছি-ধরেছি চোর। পাকড়েছি ব্যাটাকে। একটা পাহারোলা ডেকে আনুন তো এইবার।'

কোনই দোষ করেনি লোকটা। মুদীর সঙ্গে তেজপাতার দরকষাকষি করছিল কেবল, এমম সময় গোবরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে। এমন খারাপ লাগল আমার!

লোকটা বাবারে মারে বলে হাঁক পাড়তে লাগল। আর গোবরাও দাদাগো! বৌদিগো! বলে চেঁচাতে থাকে।

কাছেই কোথাও বুঝি বাজার করছিলেন দাদা। ভায়ের হাঁক-ডাকে এসে হাজির—'কী হয়েছে রে? এমন ষাঁড়ের মতন চিল্লাচ্ছিস কেন?'

'পাকড়েছি তোমার চোরকে—এই নাও। ধরো।'

লোকটা তখন হর্ষবর্ধনের পা জড়িয়ে ধরে—'দোহাই বাবু! আমাকে পুলিসে দেবেন না। দোহাই! সেদিন আমি দু বচ্ছর খেটে বেরিয়েছি এবার গেলে ছ-বচ্ছরের জন্য ঠেলে দেবে জেলে।'

'বেশ দেব না পুলিসে। বের করে দাও আমাদের মালপত্তর।' গোবরার তম্বি।

'সব বার করে দেব বাবু—চলুন!' সকৃতজ্ঞ লোকটা আমাদের সঙ্গে নিয়ে তার বস্তির কুঠুরীতে যায়। বের করে দেয় হর্ষবর্ধনের আশি হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল।

'আর আমার তৈজসপত্র ? সেসব গেল কোথায় ?'

গোবরার রোয়াব।

'ওই যে ওই কোণায় ধরা রয়েছে বাবু ! নিয়ে যান দয়া করে।'

ঘরের কোণে দুটো বস্তা পাশাপাশি খাড়া-করা দেখলাম। এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি···গিয়ে উঁকি মেরে দেখি······ দেখছি যে······'এই কি তোমার······'

'তৈজসপত্র।' জানায় গোবর্ধন। 'তেজপাতাকে সাধু ভাষায় কী বলে তাহলে ? তৈজসপত্র বলে না ? লেখক মানুষ হয়ে আপনি বাংলাও জানেন না ছাই ?'

অবাক করল গোবর্ধন ! কী বলে ও ? বাঙালি লেখক হতে হলে আবার বাংলা ভাষা জানতে হয় নাকি ? আশ্চর্য !

ধাপে ধাপে শিক্ষা লাভ

শিক্ষালাভের কোনো বয়েস নেই সে কথা সত্যি। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, পরমহংসদেবের সার কথা। আর যত শিখি ততই দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে, আর যত দেখি ততই শিখি—ততই আরো শিক্ষা হয়।

শিক্ষা পাওয়ার স্থান কাল পাত্রর ঠিক-ঠিকানা থাকে না সে কথাও ঠিক। তবে তার প্রণালীর ইতরবিশেষ নিয়ে প্রশ্ন থাকেই।

সেদিন হর্ষবর্ধনের উদ্দেশ্যে (অবশ্যই অর্থবর্ধনের দ্বারা) চেতলায় গিয়ে দেখলাম বাড়ির রোয়াকে গোবর্ধন গালে হাত দিয়ে বসে মুখ ভার করে!

'দাদা বাড়ি নেই নাকি?'

গোবরার কোনো জবাব নেই।

'বেরিয়েছেন কোথাও? কোথায় গেছেন?'

'হাসপাতালে।'

শুনেই চমকে যাই—'হাসপাতালে কেন হে? কার জন্যে যাওয়া?'

'নিজের জন্যেই। আবার কার? পড়ে গিয়ে পায়ে হাড় ভাঙলেন তাঁর। সেইজন্যেই।'

'সেইজন্যেই মনমরা হয়ে রয়েছো! ভেবে মরছো এমন! হয়েছে কী! হাত পা ভাঙা তেমন শক্ত কিছু, সাংঘাতিক কিছু নয়। পড়ে গিয়ে গায়ের হাড় ভাঙলেও পায়ের হাড় ভেঙে কেউ মারা পড়ে না। হাড় জোড়া লাগে আবার। অল্পদিনেই—সহজেই। আজকাল আকচার ভাঙছে জুড়ছে, বুঝলে?

ভাবনার কিছু নেই। যেমন পড়েছেন তেমনি উঠে পড়বেন দেখতে না দেখতেই। কিছু ভেব না।'

গোবর্ধন তথাপি ভাবনায় হাবুডুবু খায়। আমিও যে খানিক ভাবিত না হই তা নয়।

জানি যে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, পতনের পরই অভ্যুত্থান, কিন্তু উক্ত বন্ধুকৃত্য পরখ করতে সেই আভ্যুদায়িকের পথে পা বাড়াবার মতিগতি হবে কার? পড়লে অপদস্থ হতে হয়, কিম্বা অপদস্থ হলেই মানুষ পড়ে তা সত্যি, তবু না পড়লে ওঠা যায় না, পদস্থ হওয়াও যায় না সে কথাও মিছে নয়; তবু নিজের পায় নতুন করে দাঁড়াবার জন্য পদোন্নতির স্বার্থে কে আবার পা ভেঙে ব্যানডেজ প্লাসটারে পায়াভারী হতে চাইবে?

'কী করে ভাঙলেন পা'? আমি জানতে চাই।

'এই যে, সামনেই এই তিনটে ধাপ দেখছেন না? রোয়াকের এই তিনটে পৈঠে? দেখছেন, দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি বইকি।'

'আপনি তো পাচ্ছেন, কিন্তু দাদা দেখতে পাননি। এই ধাপগুলো দিয়ে নামবার সময় ভাবতে ভাবতে নামছিলেন বোধ হয়, কেমন করে পা ফসকে…।'

'ভাবের ঘোরে পড়ে গেছেন। বুঝেছি।'

ভাবুক লোকেদের পদে পদেই বিপদ ঘটে, কে না জানে?

'পড়ে গিয়ে আর খাড়া হতে পারেন না। আমি এখানেই ছিলাম, দৌড়ে গিয়ে তাঁকে তুলে ধরলাম। আর তারপরই অ্যাম্বুলেন্সে ডেকে -'

'তাঁর ওই পাতাল প্রবেশ? কোন হাসপাতালে গেছেন শুনি?'

'রামকৃষ্ণ মিশনে কী একটা নামকরা সেবাশ্রম আছে না?'

'সেই যেখানে উনি প্রায়ই দান-খয়রাত করে থাকেন? সেখানেই আবার প্রাণ খয়রাত করতে গেছেন?'

'এমন কথা কইছেন কেন? সাধারণ হাসপাতালে সেবা-যত্নের অভাবে চিকিৎসা বিহনে রুগী মারা পড়ে, তাই বলছেন? কিন্তু রামকৃষ্ণর নামে করা নামকরা এসব জায়গায় সেসব হবার উপায় নেই। সেবাশ্রম বলছে না? কী শুনলেন?'

'শুনব না কেন? দেখছিও তো। সেবা দেবাশ্রম সবই দেখা! তবে কোথায় সেটা? কখন যাওয়া যায়?'

'যখন তখন। হাত পা ভাঙলে, এক্ষুনি।'

'না না, সে যাওয়া নয় ভাই, তোমার দাদাকে আমি দেখতে চাই। কখন ভিজিটিং আওয়ারস? বেড নম্বর কত?'

'কেন মিছে কষ্ট করে যাবেন? এখানেই দেখতে পারেন। উনি সেরে

উঠেছেন দেখে এসেছি, আজকালের মধ্যেই ছেড়ে দেব জেনে এলাম। দেখতে দেখতে এসে পড়বেন…'

বলতে বলতে এসে গেলেন। গোবর্ধন কথাটা শেষ করার আগেই ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। হর্ষবর্ধন নামলেন তার থেকে—হাসতে হাসতেই।

'এই তো দাদা এসে গেছে!' উচ্ছ্বসিত গোবরা চিৎকার ছাড়ে—'বৌদি! দাদা এসেছে দাদা এসেছে!'

হন্তদন্ত ওর বৌদি ছুটে আসেন হাতা খুন্তি হাতে।

'আমি জানতাম তুমি আজ আসবে। তোমার জন্যেই সেই জিনিসটা রাঁধছিলাম এখন, যেটা তুমি খেতে খুব ভালোবাসো।'

'এতক্ষণ ওঁর সঙ্গে তোমার কথাই হচ্ছিল দাদা! বলতে বলতে তুমি এসে পড়েছ! দাদা, তুমি অনেকদিন বাঁচবে। অ-নে-ক দিন।'

গোবর্ধন গদগদ হয়ে বলে।

'দাঁড়াও, কড়াইটা নামিয়ে আসি, ধরে যাবে জিনিসটা…' বলেই বৌদি হাতা হাতে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ান—হাতে হাতে তাকে সামলাতে, কি সাঁতলাতেই!

'বাঃ বাঃ! আপনি সেরে এসেছেন বেশ। দেখতে পাচ্ছি।' উৎসাহিত হয়ে বলি।

'হ্যাঁ, পা-তো সেরেছে কিন্তু মন আমার ভেঙে গেছে মশাই!' তিনি দুঃখ করে বলেন।

'কেন! তারা ভালোই সারিয়েছে আপনাকে। কপাল জোরই বলতে হয় আপনার। ভাঙ্গা পা জুড়ে গেছে দিব্যি! একবার অধঃপতনের পর দেখিছি পরে আর কেউ ঠিকমত দাঁড়াতে পারে না। দুটো পা কেমন করে একটুখানি ছোটবড়ো হয়ে যায় যেন। লক্ষপতি লোককেও পদস্খলনের পর জীবনভোর একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা গেছে—কী দুঃখ বলুন তো! কিন্তু আপনার বেলায় উঁচু নিচু হয়নি কিছু! বেশ হাঁটছেন। দিব্যি জুড়ে গেছে পা।'

'পা তো জুড়েছে কিন্তু মন জুড়ায় কে!' তিনি নিশ্বাস ফেলেন, 'আমার এই ভাঙা মন কে জোড়া দেয়। আমি ভগ্ন মনে ফিরে এলাম সেবাশ্রম থেকে।'

'সে কী! পা সারিয়ে হৃদয় হারিয়ে ফিরলেন?' বিস্মিত হতে হয়ঃ 'কোনো নার্স টার্স নাকি? কিন্তু মনোভঙ্গ হবার বয়স কি আছে আর আমাদের?

তিনি মুহ্যমান হয়ে থাকেন, কোনো কথা নেই।

'ওসব নিয়ে মন খারাপ করবেন না। আপনার আমার বয়সে ভীমরতির মতন হয় জানি, ও কিছু নয়। ঠিক যুধিষ্ঠির-গতির আগেই ওটা হয়ে থাকে। তারপরেই তো মহাপ্রস্থান! ওর জন্যে কোনো বিশল্যকরণীর প্রয়োজন নেই,

প্রিয়জনটিকে অপত্যস্নেহের চোখে দেখুন, অকথ্য পথে যাবেন, বাৎসল্য বলে মনে করুন না !'

তবুও ওঁর কোনো বার্তাচিত নেই !

'কেন ওকথা ভাবছেন ! আপনার পা সেরে দিব্যি জুড়ে গেছে এখন ! সেই আনন্দে নৃত্যে করুন বরং ! আপনার পা দেখে আমারই যে নাচতে ইচ্ছে করছে মশাই।'

'ধুত্তোর পা। পা আমার গোল্লায় যাক, চুলোয় যাক। মাথায় থাক পা ! তার কথা আমি ভাবছিও না। আমি ভাবছি তাঁর শ্রীচরণের কথা। সেই ভাবনাই আমার—কী করে পাই ! তাঁর পায়ে কি ঠাঁই হবে আমার ?'

'কার পায় ?' আমি জানতে চাই।

'ঠাকুরের। তাঁর পায়ে কি আমি স্থান পাব কোনোদিন ?'

'পরমহংসদেবের ? কী করে পাবেন ! তিনি তো পা ফা সমস্ত নিয়ে অন্তর্ধান করেছেন কবে। তিনি সশরীরে স্বপদে বহাল আছেন এখনো ?'

'আহা, ইহলোকে না হোক, পরলোকে ? তা কি আমি পাব না ?'

'কী করে বলব ? পরলোকের খবর আমি রাখিনে। তবে তাঁর দুটি পা ছিল এই জানি। সে দুটি তো বিবেকানন্দ আর শ্রীশ্রীমা দখল করে বসে আছেন, যেমন এখানে তেমনি সেখানেও। তাঁর পার্ষদবর্গের আর কেউ পেয়েছেন মনে হয় না। তবে অচিন্ত্যনীয় উপায়ে কেউ যদি পায়ে ঠাঁই পেয়ে থাকে বলা যায় না।'

'আপনি কোনো ধর্মগুরুর সন্ধান দিতে পারেন আমায় ? যাঁর কাছে একটু ধর্মশিক্ষা পাওয়া যায় ?'

'আজ্ঞে না। ধর্মকে আমি গুরুত্ব দিইনি কোনোদিন, এ জীবনে কখনো ধার ধারিনি তার। কী করে তার খবর দেব আপনাকে ? বলুন !'

'সে কী ! মুক্তি চান না আপনি ?'

'একদম না। মারা গেলেও নয়। পাছে কোনো কারণে আমায় স্বর্গে যেতে হয় সেই ভয় আমার দারুণ। সাবধান থাকি, প্রাণ থাকতে ধর্মকর্ম কিছু করিনে। স্বর্গে নয়, পৃথিবীর এই রসাতলেই ফিরে আসতে চাই ফের — একবার নয়, আবার আবার বারম্বার।'

আমার কথায় তিনি কান দেন না, নিজের আবেগে বলে যান— 'জানেন, সেবাশ্রমে এক স্বামীজী আসতেন রোজ। সব রুগীর কাছেই আসতেন, ধর্মশিক্ষা দিতেন সবাইকে। তাঁর কাছে আমি অনেক জ্ঞান পেয়েছি, কিন্তু এই অল্প কদিনে যতটুকু হবার তাই হলো, ধর্মশিক্ষার পুরোটা হয়নি আমার। আধা-খ্যাচরা এই ধর্মশিক্ষা আমি সম্পূর্ণ করতে চাই। কোথায় করি।'

'খোদায় মালুম। খোদার ওপর খোদকারি-করার লোক কোথায়

থাকেন, কোন ঘুপচির মধ্যে, কোনো আশ্রমের গর্ভে কি হিমালয়ের গহ্বরে আমার জানা নেই। স্বামীজীরা স্ত্রীজীরা কোথায় আছেন যেন শুনেছি—পাপীতাপীদের উদ্ধার করার জন্যেই। আমার জানা নেই। জানবার উৎসাহও নেই। পাপী মানুষ কিন্তু পাপী নয়, পাপের ওপর ধর্মের সন্তাপ বাড়িয়ে উত্তপ্ত হবার বাসনা নেই আমার। বললাম তো আপনাকে।'

'শুনেছি শুনেছি, ঢের শুনেছি—বলতে হবে না আর। ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ করার কোনো পথ বাতলাতে পারেন যদি, জানেন যদি বলুন আমায়।'

'আমি জানি দাদা। বলব তোমাকে?' গোবরা উসকে ওঠে।

'তুই জানিস! তুই!' দাদার বিস্ময় থই পায় না।

'হ্যাঁ। তুমি ধর্মশিক্ষার বাকি অদ্ধেকটা পেতে চাও তো? তার উপায় হচ্ছে, তোমার অন্য পাটাও ভাঙা। তাহলেই হবে।'

'পাঁঠার মত বলিস কী! একটাকে এত কষ্ট করে সারিয়ে আনার পর আমার অন্য পাটাও ভাঙব আবার?' হর্ষবর্ধন হতবাক হন।

'তা না হলে কী করে হবে?'

'হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে,' ভেবে দ্যাখেন দাদা—'হ্যাঁ, তাহলে হয়। তাহলে আবার আমি সেই সেবাশ্রমে যেতে পারি, সেই স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাই, তাঁর কৃপায় বাকিটাও পেয়ে যাই। হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে। তিনিও তাই বলেছিলেন যে ধর্মশিক্ষা পেতে হলে অভীপ্সা চাই।'

'কী বললেন? কীপসা?' আমি চমকে যাই।

'অভীপ্সা। কী মানে ওর, জানিনে ঠিক। তবে তিনি বললেন যে তাই হলেই নাকি উত্থান ব্যুত্থান সব হয়ে যায়।'

'কীত্থান বললেন?' আবার আমি চমকাই, 'কেন একেকখান থান ইঁট ঝাড়ছেন! শুনে মাথা ঘুরছে আমার।'

'ঘুরবার কথা। আমারও ঘুরেছিল। তিনি বলেছিলেন যে প্রাণের আকুতি যাকে বলে না, সেই জিনিস নাকি।'

'তাই তো বলছি দাদা তোমায়। হাড়গোড় ভাঙলেই সেই আকুতি হয়—আপনার থেকেই হয়ে যায়। হতে থাকে কেমন।'

তাই হয় বটে, আমিও খতিয়ে দেখি। কোনো ক্ষতি না হলে কি কিছু লাভ হতে পারে! অধঃপতিত পদদলিতইরাই তাঁর কাছে যেতে পায়। Meek-দেরই রয়েছে স্বর্গের উত্তরাধিকার, বাইবেলে বলা, অহংকৃতের ঠাঁই নেই সেখানে, বরং উটরাও ছুঁচের ছ্যাঁদা দিয়ে গলবে, কিন্তু অহমিকরা (নাকি, আহম্মকরা?) কদাচ না।

'কিন্তু পাঁঠার মতন তোর কথাটা না? ধীরে সুস্থে কি করে ভাঙব আস্ত পা-টা?'

'কিছু শক্ত নয় দাদা, খুব সহজ, রোয়াকের এই তিনটে ধাপ দেখছো তো?

সেদিন যা তুমি দেখতে পাওনি বলেই পা ফসকে এই ধর্মশিক্ষা লাভের সুযোগটা পেলে না ? ওই ধাপ দিয়ে উটমুখো হয়ে উটকোর মতই আবার তুমি উঠানামা করো, তাহলেই হয়ে যাবে। সব শিক্ষাই ধাপে ধাপে পেতে হয় তাই না ? তোমার ওই ধর্মশিক্ষা মানে ধর্মশিক্ষার বাকি আধখানা পেতে হলেও তাই করতে হবে তোমাকে। এগুতে হবে এই ধাপে ধাপে।'

'ধাপে ধাপে ?'

'ধর্মকে ধাপ্পা বলে না দাদা ? এইজন্যেই তো ?'

বৈজ্ঞানিক ভ্যাবাচাকা

'এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম রে! আমাদের কাঠ সাপ্লায়ের শর্ত সব ওরা মেনে নিয়েছে।' হর্ষবর্ধন ডেকে বললেন ভাইকে ঃ 'নে, এবার তৈরি হয়ে নে। বেরুব এখুনি।'

'কোথায় যাব দাদা?' শুধায় গোবর্ধন।

'বোম্বাই।'

'বোম্বাই!' গোবরা যেন গাছ থেকে পড়ে—ঠিক বোম্বাই আমটির মতই! বলে সে ঃ 'বোম্বাই যাব কিসের জন্যে?'

'বাঃ! বোম্বায়ের সেই কোম্পানি আমাদের শর্তগুলো মেনে নিয়েছে না? চ, সেখানে গিয়ে কনট্রাক্টটা পাকা করে আসিগে। অনেক টাকার কনট্রাক্ট। পত্রপাঠ যেতে হবে, বলে দিয়েছে টেলিগ্রামে।'

উঠল বাই তো কটক যাই! গোবর্ধন তার দাদাকে চেনে, তবু একটু আমতা আমতা করে—'এক্ষুনি যাবে কি করে দাদা!'

'এক্ষুনি না তো কখন যাব! ট্রেন ছাড়তে কি বেশী দেরি আছে নাকি? বোম্বে মেল কি দাঁড়িয়ে থাকবে আমাদের জন্যে? এখনই রওনা হতে হবে।'

'নাইবে খাবে না?'

'ট্রেনের কামরাতেই চান করা যাবে। তোফা বাথরুম আছে। খাসা শাওয়ার বাথের ব্যবস্থা। খাবার কথা বলছিস? ডাইনিং-কারে এইসা খাওয়ায়!'

'বিছানাপত্তর নিতে হবে না সঙ্গে ?'

'বিছানা তো ফাসক্লাসের বেঞ্চে আঁটা থাকে রে। বিছানা আবার কে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যায় ? আর বোম্বায়ে গিয়ে তো উঠব বড় এক হোটেলে। সেসব হোটেলে খাট পালঙ্কের কোন অভাব আছে নাকি ?'

'একেবারেই কোনো লাগেজ নেবে না ?'

'ল্যাগেজ ? কেন, লাগেজ তো একটা রইলই। তুই তো সঙ্গে যাচ্ছিস। তুইই তো আস্ত একটা লাগেজ !'

কথাটা গোবর্ধনের প্রাণে লাগে। সম্মানেও লাগে বুঝি। কিন্তু বলবার মতন জুতসই কোন জবাব সে পায় না। শুধু ঘোঁতঘোঁত করে।

স্টেশনের পথে হর্ষবর্ধন মত পালটান।—'না রে, ফাসক্লাসে যাব না রে। আমাদের থাড়ক্লাসই ভালো।'

'কেন, আমরা কি বড়লোক নই ?' ফোঁস করে ওঠে গোবর্ধন: 'বড়লোকরাই তো যায় সবাই ফাসক্লাসে।'

'বড়লোক নয় তারা, বড় বালক। বয়েসই বেড়েছে, বুদ্ধিতে পাকেনি। ট্রেনের ফাসক্লাসে কত হাঙ্গামা হুজ্জত হয় পড়িস নি খবর কাগজে ? মাঝ রাস্তায় যত সব বদ লোক উঠে ডাকাতি রাহাজানি করে যায়। খুন-খারাপিও করে থাকে। বেঘোরে মারা যাওয়াটা কি ভালো ? না ভাই, আমি ফাসক্লাসে গিয়ে ভ্রাতৃহারা হতে পারব না।'

'ভ্রাতৃহারা কেন ?'

'কেউ আমাকে মারতে এলে তুই তো আমাকে বাঁচাতে যাবি। যাবিই, আমি জানি। মাঝের থেকে তুই মারা পড়বি, সেটা কি খুব ভালো হবে ?'

গোবর্ধন চুপ করে থাকে।

'তাছাড়া, ভ্রাতৃহারা হওয়া তবু বরং সওয়া যায়, কিন্তু আত্মহারা হলে আর রক্ষে নেই—নিজেকেই খুঁজে পাব না তখন !'

হাওড়া স্টেশনে পোঁছে হাঁপ ছাড়েন হর্ষবর্ধন: 'চ, টিকিটটা করে আনি গে।'

'থাড় কেলাসে কিন্তু বেজায় ভিড় হবে দাদা !'

'ভিড় কিসের ! গোটা কামরাটাই তো রিজার্ভ করে ফেলবু আমরা।'

কামরা রিজার্ভের পর টিকিটবাবুকে তিনি জিগ্যেস করেন: 'আগ্রা ইস্টিশনে কতক্ষণ আপনাদের গাড়ি দাঁড়াবে বলতে পারেন মশাই ?'

'আধ ঘণ্টা তো বটেই। ওখানে বোম্বে মেলের সঙ্গে কলকাতা মেল মীট করে কিনা…'

'কলকাতা মেল ! কলকাতা মেল বলে আছে নাকি কিছু আবার !' দুই ভাই অবাক।—'শুনিনি তো কখনো ?'

'বোম্বের থেকে যে মেল ছাড়ে সেটা তো কলকাতায় এসে পোঁছোয়।

সেটাই হলগে কলকাতা মেল। আমাদেরটা যেমন বোম্বে মেল।' বুঝিয়ে দিলেন টিকিটবাবুঃ 'তা আগ্রায় গাড়ি থামার খবর নিয়ে কী দরকার বলুন তো?'

'তাজমহলটা দেখতুম একটু। দেখা যাবে এই ফাঁকে?'

'তা ইস্টিশনে নেমেই যদি ট্যাকসি ধরে এক চক্করে ঘুরে দেখে আসতে পারেন আধঘণ্টার ভেতরে—তাহলে হয়তো হয়।'

'ট্যাকসিরা তো সব ইস্টিশনেই থাকে, থাকে না দাদা?' বলল গোবর্ধনঃ 'তাহলে হবে না কেন?'

কামরায় উঠেই হর্ষবর্ধন নেমে যানঃ 'বোস, আমি এক্ষুনি আসছি—দাঁড়া।'

খানিক বাদে তিনি ফিরলে গোবরা শুধায়ঃ 'কী আনলে দাদা? খাবার, না, খবর কাগজ?'

কোন জবাব না দিয়ে দাদা একখানা বই মেলে ধরেন ভাইয়ের চোখের ওপরে। না, খাবারও নয়, খবরেরও কিছু না, সবিস্ময়ে গোবরা দেখে—বইটার নাম 'বিজ্ঞানের বিস্ময়'।

'রেলের ইসটল থেকে কিনে আনলাম বইটা।'

'এ কী হবে দাদা? এ তো কোন গল্পের বই না!'

'বিজ্ঞানের বইরে।' জানান দাদাঃ 'এটা বিজ্ঞানের যুগ সে খবর রাখিস—জানিস কিছু তার?'

তারপরে গাড়িও ছাড়ে। হর্ষবর্ধনও তার দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে বইয়ের মধ্যে ডুবে যান।

ভেসে ওঠেন অনেক পরে।—'আপেল কেন গাছ থেকে মাটিতে পড়ে কারণ জানিস তার?'

'পেকে যায় বলে।'

'কে বলেছে? মাটিতে না পড়ে আকাশে উড়ে যেতেও তো পারত?'

'কি করে যাবে? আপেলের কি পাখা আছে নাকি?'

'তোর মাথা! মাধ্যাকর্ষণের জন্যই এমনটা হয়ে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে জানিস কিছু? নিউটনের আবিষ্কার।'

'কি রকম?'

'নিউটন কিরকম তা আমি বলতে পারব না। দেখি নি তো তাকে কোনোদিন কখনো। আমরা জন্মাবার ঢের আগেই মারা পড়েছে লোকটা। তবে মাধ্যাকর্ষণটা হচ্ছে এই রকম—নিউটন একদিন এক আপেল গাছের তলায় ওত্‌পেতে বসে ছিল...'

'হাঁ করে বুঝি?'

'কে জানে! হয়তো হবে। এমনই সময় একটা আপেল পড়ল...'

'তার মধুখের মধ্যে ?'

'তাও আমি বলতে পারব না। কিন্তু তার ফলেই মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার হয়ে গেল। করে ফেলল লোকটা। ভারী অদ্ভুত লোক! বুঝলি এখন ?'

'বুঝেছি···তবে কথাটা তোমার মাধ্য নয়, মধ্য হবে।'

'বইয়ে লিখেছে মাধ্য···'

'ছাপার ভুল। বইয়ে ওরকম বিস্তর থাকে। মাধ্য কথার কি কোন মানে হয় ? মধ্য মানে মাঝখানে। আমাদের মাঝখানে কী আছে ? পেট। আমার বেলায় পেট, তোমার বেলায় অবশ্যি ভুঁড়ি—কিন্তু তার একটা আকর্ষণ তো আছেই। খিদেটাই হচ্ছে সেই আকর্ষণ। তোমার ভুঁড়িতে খিদে পেলে কি কর তুমিই জানো, কিন্তু আমার পেটে···মানে, আমার খিদের আকর্ষণ হলে সেটা আমি টের পাই। অমনি সটান আমাদের বাগানে চলে যাই। আমবাগানে। সেখানে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। পাকা আম গাছ থেকে টুপ করে পড়লেই আমি টপ করে নিয়ে নিজের গালে পুরে দিই। আমিও এই মধ্যাকর্ষণটা অনুভব করেছি—আবিষ্কার করেছি অনেকদিন আগেই। তবে তোমার ওই নিউটনের মতন বই লিখে তা বাজারে জাহির করতে যাই নি কখনো।'

ভাইয়ের বিজ্ঞানবত্তা দাদাকে বিমূঢ় করে দেয়। তিনি দ্বিরুক্তি না করে ফের সেই বইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

খানিক বাদে আবার দাদার দ্বিতীয় উক্তি শোনা যায়—'ইসটোভে চাপালে চায়ের কেটলির ঢাকনা-টা নড়তে থাকে কেন বলতে পারিস ?'

'তোমার নিউটনই জানেন !'

'না, নিউটন নয়, অন্য লোক। নিউটনের এটা জানা ছিল না। কেটলির ঢাকনিটা নড়ে—একদিন আমাদের এই সব রেলগাড়ি চালাবে বলেই।'

'বটে ?' গোবর্ধনের চোখ এবার কেটলির ঢাকনার মতই হয়।

'ফুটন্ত জলের থেকে একটা ভাপ বেরয় না ? তারই নাম ইসটিম। সেই ইসটিমের চাপে পড়ে ঢাকনিটা নড়তে থাকে। ইঞ্জিনের ভেতরে সেই ইসটিমকে পুরে দিয়েই এত বড় রেলগাড়িটা চালানো হচ্ছে, বুঝেছিস ?'

গোবর্ধন বিস্ময়ে হতবাক।

'তুইও অনেকটা আমাদের কেটলির মতই। তুই যেমন ছটফটে, মনে হয় তোর মধ্যেও অনেকখানি ইসটিম আছে। তুই হয়তো একটা বড় কিছু চালাবি একদিন। দেশকেও চালাতে পারিস হয়তো। দেশের চালক যদি নাই বা হস, অন্তত ইঞ্জিনচালক তো হতেই পারিস।'

'ঠাট্টা করছ দাদা ! কোনো চালক আমি কোনদিন না হতে পারি কিন্তু তোমার চেয়ে চালাক আমি, এটা তুমি মানবে ?'

'আমার চেয়ে চালাক ? বলিস কিরে ? নে, এই মনিব্যাগটা রাখ।

এর মধ্যে একশখানা একশ টাকার নোট আছে- মোট দশ হাজার টাকা। এটা যদি এর ভেতরে না খুইয়ে বোম্বের ইস্টিশনে নেমে আমায় ফিরিয়ে দিতে পারিস তবেই মানব তুই চালাক। শুধু চালাক নয়, তোর লাকও আমি মেনে নেব— কেননা এর অর্ধেক টাকা আমি পুরস্কার দেব তোকে।'

'তুমি বলছ রাখতে পারব না আমি?'

'আর্ধেক টাকা বাজি রাখলাম তো। ততক্ষণ মনিব্যাগটা তোর পকেটে থাকলে হয়! চারদিকেই যা চোর জোচ্চোরের ভিড়—যত সব পকেটমার! দেখিসনি, কী লেখা ছিল টিকিট ঘরটার সামনেটায়। চোর জুয়াচোর পকেটমার তোমার নিকটেই আছে। সাবধান!'

'তাহলে তো তোমার থেকেই সাবধান হতে হয়, দাদা! তুমিই তো এখন আমার নিকটে আছ।'

'আরে, এখানে না, আগ্রায় ইস্টিশনে নেমে ট্যাক্সি ধরার ফাঁকেই তোর পকেট ফাঁক হয়ে যাবে—আমি বলে দিচ্ছি—তুই দেখে নিস—নির্ঘাত!'

'তাহলে এটাকে আমি পকেটে রাখবই না। পেটের তলায় গুঁজে রাখব। আমার মধ্যাকর্ষণের ভেতরে আটকে রাখব এটাকে।'

তারপর অনেক স্টেশন পার হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের বিচিত্র নানা বিস্ময়ের ভারে প্রপীড়িত হর্ষবর্ধন ক্লান্ত হয়ে কখন ঢুলতে শুরু করেছেন, গোবর্ধন গেছে বাথরুমে।

একটু পরেই চেঁচাতে চেঁচাতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে সে—'দাদা, দাদা! সর্বনাশ হয়েছে।'

হর্ষবর্ধন চোখ মেলে তাকান—'অ্যাঁ?'

'পেটের তলায় রেখেছিলাম তো ব্যাগটা? যেই না বাথরুমে উবু হয়ে বসতে গেছি, ওটা আমার মধ্যাকর্ষণ ফসকে তলাকার গর্তের ভেতর দিয়ে গলে পড়ে গেছে নীচেয়।'

'অ্যাঁ? তা, তুই চেন টানলি না কেন তক্ষুনি? তাহলে তো গাড়ি থেমে যেত কখন! এতক্ষণ গিয়ে কুড়িয়ে আনা যেত ব্যাগটা।'

'টেনেছিলাম তো চেন। কিন্তু যত বারই টানি, হুড় হুড় করে কেবল খালি জল বেরিয়ে আসে।'

'জলাঞ্জলি গেল টাকাটা!' দাদার কণ্ঠে কিন্তু ক্ষোভের লেশ নেই: 'বলেছিলাম না তোকে, রাখতে পারবি না তুই। দেখলি তো? বাজি জিতে গেলাম কেমন? যদিও লোকসানের বাজি—তা হোক!'

'টাকাটা খোয়া গেল তোমার! দশ দশ হাজার টাকা!' গোবর্ধন হায় হায় করে।

'আমি কি আর এক পকেট টাকা নিয়ে বেরিয়েছি নাকি রে।' দাদা ভাইকে সান্ত্বনা দেন: 'আমার চার পকেটে চারটে মনিব্যাগ। সব দশ

হাজারের। বুকপকেটেরটা কেবল দিয়েছি তোকে। এই দ্যাখ, ডান পকেটে একটা, বাঁ পকেটে এই দ্যাখ, আবার কোটের ভেতরের পকেটে আর একটা। আবার ফতুয়ার পকেটেও আছে কিছু। আমাকে ফতুর করে কার সাধ্যি? কটা মারবে পকেটমার?' তার পরেও আরো জানান তিনি—'তাছাড়া পকেট মারা গেলেও আমি মারা পড়ব না। আমার কাছাতেও বাঁধা আছে খানিক। আমায় মুক্তকচ্ছ করতে পারবে কেউ?'

নানান ব্যাংকে দাদার অ্যাকাউণ্টের খবরেও, গোবর্ধন তবুও ম্লান।

'দুঃখ করিসনে। টাকা জমানোর জন্য নয় রে! খরচ করবার জন্যই উপায় করা। আমি কি টাকা জমাই? দুহাতে উড়িয়ে দিই তো। টাকা বড়ই প্রিয় রে, আমি বরং নিজে যাব কিন্তু টাকাকে কখনো জমালয়ে যেতে দেব না।'

আগ্রায় গাড়ি দাঁড়ালে দু ভাই নেমে ট্যাকসি চেপে এক চক্করে তাজমহল দর্শন সেরে আগ্রার বাজারে পুরি মেঠাই মেরে সেখানকার বিখ্যাত নাগ্রা জুতো দু জোড়া কিনে যখন স্টেশনে ফিরলেন তখন ট্রেনের ঘণ্টা দিয়েছে, গাড়ি প্রায় ছাড় ছাড়।

দৌড়ে গিয়ে দুই ভাই সামনে যে কামরা পেলেন উঠে পড়লেন তাইতেই।

'ফাসক্লাস যে দাদা!' বলল গোবরা।—'চেকার ধরবে না আমাদের?'

'উঠি তো এখন। পরে নেমে নিজেদের কামরায় চলে গেলেই হবে। না হয় বাড়তি ভাড়াই দেব, তার হয়েছেটা কি!'

কামরা প্রায় ফাঁকা। কেবল ওপরের বার্থে এক ভদ্রলোক অর্ধশায়ী।

'আপনিও কি বোম্বায়ের যাত্রী নাকি?' আলাপ ফাঁদলেন হর্ষবর্ধন: 'বোম্বায়েই নামবেন বুঝি?'

'না মশাই, আমি যাচ্ছি কলকাতায়।' জানালেন ভদ্রলোক।

'কলকাতায়! আশ্চর্য!' গুমরে ওঠেন দাদা: 'দ্যাখরে গোবরা দ্যাখ। বিজ্ঞানের আরেক বিস্ময় চেয়ে দ্যাখ চোখে। তলাকার বার্থ চলেছে বোম্বাই আর ওপরের বার্থ যাচ্ছে আমাদের কলকাতায়।'

গোবর্ধন দ্যাখে। কলকাতাগামী ওপরের বার্থসহ বিস্ময়াবহ ভদ্রলোককে তাকিয়ে দ্যাখে।—'আছি কোথায় দাদা!'

'কোথায় আবার! একেবারে বৈজ্ঞানিক মুল্লুকে।' দাদার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, 'এরপর দেখবি কোনদিন আমরা দুভাই রকেটে চেপে চাঁদে পাড়ি দিয়েছি!'

'গদি-আঁটা বেঞ্চি দাদা। আরাম করে একটু গড়িয়ে নেয়া যাক—কী বলো?' গোবরার লোভ হয়।

'সেই ভালো, ঘুমোনো যাক না হয় এবার। তাজমহল তো দেখলাম, খাওয়া দাওয়াও সারা হয়েছে, নাগ্রা জুতোও কিনেছি, এবার আগ্রার তাজমহলের স্বপ্ন দেখা যাক শুয়ে শুয়ে।'

লম্বা ঘুমের পর দুই ভাই উঠে দ্যাখেন, কামরা ফাঁকা, গাড়ি শেষ স্টেশনে এসে খাড়া হয়ে আছে।

'নাম নাম গোবরা। দেখছিস কি, পেঁাছে গেছি আমরা। এসে গেছে বোম্বাই।' গোবরাকে টেনে নিয়ে নেমে পড়েন শ্রীহর্ষ। সহর্ষে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে দুই ভাই তো হতভম্ব! ভেবেছিলেন বোম্বাই ইস্টিশনে নেমে কোথায় গুজরাটি মারাঠী আর পাঞ্জাবীদের ভিড় দেখবেন, তা নয়, চারধারেই খালি বাঙালি আর বাঙালি।

'বাঙালিকে ঘরকুনো বলে সবাই। বলে যে আর সব প্রদেশের লোক বাঙলায় এসে ভিড় জমায়, রোজগার করে খায়—কিন্তু বাঙালি মরলেও কোথাও যেতে চায় না। কিন্তু এ যে তার উলটো দেখছি রে···'

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আরো সব উলটো দেখা যায়।

'ও বাবা! এখানেও যে সেই হাওড়ার মতই একটা ব্রিজ বানিয়ে রেখেছে দেখছি!'

'বিজ্ঞানের কী বাহাদুরি দ্যাখো দাদা!' গোবরাও কিছু কম তাজ্জব হয় না: 'কলকাতার গঙ্গাকে বোম্বায়ে এনে ফেলেছে দেখছি।'

'ভেবেছিলাম নতুন শহর দেখব। কিন্তু এ যে দেখছি কলকাতার মতনই হুবহু। বোম্বে মেলে চেপে অ্যাদ্দুর এসে এখন যদি সেই কলকাতাকেই দেখতে হয় আবার, তাহলে এত কষ্ট করে আর বোম্বাই আসা কেন?'

'দুর দুর!' বিস্ময়ে মুহ্যমান গোবর্ধনও বিরক্তি প্রকাশ না করে পারে না—'আমাদের কলকাতাই তো ঢের ভালো ছিল দাদা?'

'ছিলই তো!' সায় দেন দাদা: 'বোম্বাইকা খেল দেখো—দিল্লিকা লাড্ডু দেখো—বলে থাকে না? বাচ্চাদের সেই যে খেলনার বায়স্কোপ দেখাবার সময়? বোম্বাই মেল সেই খেলই দেখিয়ে দিল আমাদের! যেখানে ছিলাম সেই কলকাতাতেই এনে ফেলল আবার!'

সবার উপরে মানুষ সত্য— ঘোরতর সত্যি কথা। উপরওয়ালা যে প্রচণ্ডভাবে অমোঘ, তা কে না জানে? কিন্তু মানুষ আর কতক্ষণ উপরে থাকতে পায়? উপরের মানুষটির কতক্ষণ আর উপরি উপায়ের সুযোগ থাকে? আপন কর্ম-দোষে আপনার থেকেই কখন নীচে নেমে পড়ে।

আমরা তো হর্ষবর্ধনকে অদ্বিতীয় বলেই জানতাম, কিন্তু তিনি যে নিজগুণে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবেন, করতে পারেন, তা কখনো আমার ধারণার মধ্যে ছিল না।

ধারণাটা পালটালো ওঁর গিন্নির কথায়। যেতেই তিনি বেশ খাপ্পা হয়ে কথাটা জানালেন আমায়। বললেন যে, 'লোকটা তো অ্যাদ্দিন বেশ চৌকোসই ছিল, কিন্তু আপনার সঙ্গে মিশবার পর থেকেই দেখছি কেমনধারা ভোঁতা মেরে যাচ্ছে। বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছু আর নেই।'

'কিন্তু আমাকে তো আমি রীতিমত ধারালো বলেই জানতাম', মৃদু প্রতি-বাদের ছলে বলি: 'উনি যেমন ধার দিয়ে দিয়ে ধারালো' তেমনি ধার নেবার বেলায় আমারও তো আর জুড়ি হয় না।'

'ধারালো লোকের ধার ঘেঁষতে নেই কখনো।' পাশ থেকে ফোড়ন কাটে গোবরা: 'ধারে ধারে ঘষাঘষি হয়ে ধার ক্ষয়ে ভোঁতা হয়ে যায় শেষটায়। তাই হয়েছে গিয়ে দাদার।'

তারপর সমস্ত কথা জানতে পারলাম সবিশেষ। হর্ষবর্ধনের চোখের ওপর

ভোজবাজিটা ঘটে গেল কেমন করে! যেন কোন জাদুকরের মায়াদণ্ডেই হাওয়া হয়ে গেল অমন গাড়িটা!

হয়েছিল কি, হর্ষবর্ধন গত সকালে চুল ছাঁটতে গেছলেন পাড়ার কাছাকাছি এক সালুনে।

সালুনে কাল ভিড় ছিল বেজায়। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে খানিকক্ষণ।

অপেক্ষমান হর্ষবর্ধনের সামনে কতকগুলো বইপত্র এনে দিয়েছে সালুনওলা — 'চুপ করে বসে থাকবেন কেন বাবু! এই বইগুলো দেখুন ততক্ষণ। আপনার আগে তো আরো জনাতিনেক রয়েছেন, তাঁদের ছাঁটাই শেষ হলেই আপনাকে ধরব তারপর।'

বইগুলো নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করছেন এমন সময় অপরিচিত একজন এসে তাঁর পাশে বসল—

'নমস্কার হর্ষবর্ধনবাবু!' বসেই এক নমস্কার ঠুকল তাঁকে।

'নমস্—কার!' প্রতিধ্বনির সুরে বললেও লোকটা যে কে তা কিন্তু তাঁর আদৌ ঠাওর হল না।

'আপনি আমাকে চিনবেন না মশাই! আপনার প্রায় প্রতিবেশীই বলতে গেলে। দুটো গলির ওধারে আমি থাকি। তবে আপনাকে আমি বেশ চিনি। আপনি আমাদের পাড়ার শীর্ষস্থানীয়। আপনাকে না চেনে কে?'

'না না। কী যে বলেন, আমি নিতান্ত সামান্য লোক।' অপরের দ্বারা এভাবে স্তুত হয়ে হর্ষবর্ধন কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করেন।

'আপনি অসামান্য আপনি অসাধারণ! জানেন, পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলে ইতর ভদ্র সবাই আমরা আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করি?' বলে লোকটি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেঃ 'এই দেখুন না, আপনাকে এই সালুনে ঢুকতে দেখে আমিও এখানে দাড়ি কামাতে এলাম। নইলে নিজের বাড়িতেই তো কামাই রোজ। নিজের হাতেই কামিয়ে থাকি।'

'আমি চুল ছাঁটতে এসেছি।' হর্ষবর্ধন কথাটা উড়িয়ে দিতে চান। নিজের দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়াটা যেন তাঁর তেমন পছন্দ হয় না।

বলেই তিনি বইগুলো ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দেন—'পড়তে দিয়েছে এগুলো। দেরি হবে এখানে চুল ছাঁটবার, দাড়ি কামাবার। হাত খালি নেই কারো—দেখছেন তো। পড়ুন এগুলো ততক্ষণ।'

'এসব তো রহস্য রোমাঞ্চের বই।' দেখেশুনে নাক সিঁটকান ভদ্রলোকঃ 'ভুতুড়ে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প যতো। পড়লে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। কেন যে রাখে এগুলো সালুনে কে জানে!'

'ওই জন্যেই রাখে বোধহয়।' হর্ষবর্ধন বাতলানঃ 'মাথার চুল খাড়া হয়ে থাকলে ছাঁটবার পক্ষে ওদের সুবিধা হয় সম্ভবত।'

একটা গভীর রহস্যের রোমাঞ্চকর সমাধান করে ওঁকে যেন একটু উৎফুল্লই দেখা যায়।

'তা যা বলেছেন!' তাঁর কথায় সায় দেন ভদ্রলোক: 'এই এলাকায় এই একটাই তো ভাল সালুন। তবে এই বড় রাস্তার ওপরে, পাড়ার থেকে অনেকটা দূরে – রোজ রোজ আর কে এখানে দাড়ি কামাতে আসছে বলুন! এধার দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনাকে ঢুকতে দেখলাম বলেই না…তা, আপনার গাড়িটা কোথায় রাখলেন?'

'গাড়ি! গাড়ি কই আমার!' হর্ষবর্ধন নিজের দাড়িতে হাত বুলান— 'গাড়ি নেই বলেই তো এত ঝামেলা, দুবেলা গিন্নি বাড়ি মাথায় করছেন সেইজন্যে। গাড়ি আর পাচ্ছি কোথায়!'

'সে কি! আপনি পাচ্ছেন না গাড়ি?' ভদ্রলোক রীতিমতন হতভম্ব।

'কই আর পাচ্ছি মশাই! তিন বছর হলো দরখাস্ত দিয়ে বসে আছি…তবে এবার একটু আশার সঞ্চার হয়েছে বটে। এতদিনে আমার নাম লিস্টির মাথায় এসেছে। সবার ওপরে আমার নাম, দেখে এলাম সেদিন। এইবার পাব মনে হয়।'

'পেলেও পেতে পারেন।' ভরসা দেন ভদ্রলোক, 'মাথায় মাথায় হলে পাওয়া যায় কিনা!'

'হ্যাঁ, এজেন্টও সেই কথাই বলল। বলল যে আপনার গাড়ি পৌঁছে গেছে ডাকে দু'একদিনের মধ্যেই মাল খালাস হয়ে আসবে। দিন দুই বাদে এসে দাম চুকিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারবেন, বলল এজেন্টে।'

'আপনি ভাগ্যবান।' উল্লসিত হয় ভদ্রলোক, 'কী গাড়ি বলুন ত?'

'ফিয়াট তো বলল।' হর্ষবর্ধন জানান: 'ফিয়াট না কী যেন!'

'ফি—য়া—ট।' উপচে ওঠা উৎসাহ হঠাৎ যেন চুপসে গেল লোকটার— 'ফিয়াট!'

'কিরকম গাড়ি মশাই?' হর্ষবর্ধন জানতে উদগ্রীব।

'যাস্‌সেতাই! ফিয়াট না বলে আপনি ফীয়ারও বলতে পারেন।'

'তার মানে?'

'ফীয়ার মানে ভয়। ভয়ংকর গাড়ি মশাই'

'সে কি! তবে যে খুব ভালো গাড়ি বলল এজেন্ট?'

'ওরকম বলে ওরা। বেচতে পারলেই তো ওদের কমিশন। মোটামুটি লাভ যাকে বলে।'

'তাই নাকি?'

'বেশ বড়ো গাড়িই তো পেয়েছেন? বিগ ফিয়াট, নাকি বেবি ফিয়াট?' জানতে চান ভদ্রলোক।

'না. তেমনটা নাকি বড় হবে না বলল লোকটা। তবে নেহাত ছোটও নয় তাহলে। মাঝামাঝি সাইজের বলছে এজেন্ট।'

'কজন চাপবার লোক বাড়িতে আপনার ?'

'তিনজন আমরা। আমি, আমার গিন্নি আর আমার ভাই গোবরা—এই তো মোট! ড্রাইভারকে ধরে জনা চারেক স্বচ্ছন্দে যেতে পারে, সেইরকম জানা গেল।'

'কুলিয়ে যাবে তাহলে আপনাদের।'

'তা যাবে। গোবরা ড্রাইভারের পাশেই বসবে নাহয়, তার কী হয়েছে! আমরা কর্তা গিন্নি দুজনায় ভেতরে বসলাম। দুজনেই অবিশ্যি আমরা একটু মোটার দিকে, তাহলেও মোটামুটি আমাদের চলে যাবে মনে হয়।'

'মোটামুটিই হন আর পাতলাপাতলিই হন, আপনাদের চলে যাবে বুঝলাম।' বলার সময় ভদ্রলোকের মুখ বেশ ভার হয়—'তবে গাড়িটা যদি চলে—তবেই না!'

'কেন, গাড়ি কি চলবে না নাকি ?'

'কেন চলবে না। চালালেই চলবে। ঠেলেঠুলে চালাতে হবে। ঠেলেঠুলে চলালে কী না চলে বলুন ? বাড়িতে আপনারা ক'জন আছেন বললেন ? ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে অবশ্যি, সে তো ধর্তব্যের বাইরে, কেননা সে তো স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকবে কেবল। কজনা আছেন বললেন আপনারা ?'

'আমি, আমার বৌ, আমার ভাই—তাছাড়া একটা বাচ্চা চাকর—এই চারজন মোটামুটি।'

'চারজনায় মিলে ঠেললে গাড়ি চলবে না!' ভদ্রলোক মুক্তকণ্ঠঃ 'বলেন কি ; চারজনায় চার্জ করলে…বলে, ঠেলেঠুলে হাতিকেও চালিয়ে দেয়া যায়।'

'ঠেলেঠুলে নিয়ে যেতে হবে গাড়ি, তার মানে ঠেলাগাড়ি নাকি মশাই ?' অবাক হন হর্ষবর্ধন।

'না, না, তা কেন ? মোটরগাড়িই, আর দাম দিয়ে চালাবার মত না হলেও, একটু উদ্যম লাগবে বইকি!…তবে ওই যা—একটু ঠেলা আছে।' তিনি বিশদ করেন—

'ঐ গোড়াতেই যা একটু ঠেলতে হবে। তারপর একবার ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলে গড়গড় করে গড়িয়ে যাবে গাড়ি। এগুলোর অ্যাকসিলেটার তত ভালো নয় কিনা, তাই এরকমটা। আপনার থেকে স্টার্ট নেয় না তাই।'

'নতুন গাড়ির এমন দশা কেন মশাই ?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু।

'নতুন গাড়ি কি এদেশে পাঠায় নাকি ওরা ? সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সব।' জানান ভদ্রলোকঃ 'বলে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, আসলে কতো হাত ঘুরে এসেছে কে জানে! তাকেই আনকোরা বলে চালায় এখানকার বাজারে।'

'এই রকম! জানতাম না তো।' হর্ষবর্ধনকে একটু ম্রিয়মান দেখা যায়। 'ওদের শোরুমে ঐ ফিয়াট ছিল আরো দু-একখানা। এজেণ্ট ভদ্রলোক নমুনা দেখালেন আমায়—ঝকঝকে নতুন—খাসা চমৎকার দেখতে কিন্তু।'

'ঐ ওপর ওপর।' সমঝদারের হাসি হাসেন ভদ্রলোক। —'উপরে চাকন-চিকন ভিতরে খড়ের আঁটি! উপরটা ঝকঝকে, ভিতরটা ঝরঝরে।' একটু দম নিয়ে নবোদ্যমে তিনি লাগেন আবার—'তা ছাড়া, এই গাড়িগ্লোর আরেকটা দোষ এই, পেট্রল কনজাম্পসন বড্ড বেশি। পেট্রল খায় খ্ব।'

'তা খাক। খাইয়ে লোকদের আমরা পছন্দ করি। আমরাও খ্ব খাই।'

'শ্ধ্ই কি পেট্রল? তাছাড়া হোঁচোট— ?'

'হোঁচোট?' হর্ষবর্ধন ব্ঝতে পারেন না। চোট খান হঠাৎ।

'যেতে যেতে হোঁচট খায় যে গাড়ি। ভয়ঙ্কর স্কিড্ করে।'

'ছাগলছানা সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই ব্ঝি?' হর্ষবর্ধন শ্ধান ঃ 'চাপা দিয়ে চলে যায়—বলছেন তাই?'

'ছাগলছানা পাচ্ছেন কোথা থেকে?' ভদ্রলোক হতবাক।

'ঐ যে বললেন ইস্কিড? ইস্কিড নানে তো ছাগলছানা। বিড এ ম্যান গো টু দি ইস্কিড্। পড়িনি নাকি ফাস্টব্কে?'

ছাগলছানা অব্দি যে তাঁর বিদ্যের দৌড় সেকথা অম্লানবদনে প্রকাশ করতে তিনি কোনো কুণ্ঠাবোধ করেন না।

'না না। সে তো হোলো গিয়ে কিড। এটা স্কিড। তার মানে, যেতে যেতে হঠাৎ লাফিয়ে যায় গাড়িটা। টক করে বেটক্করে গিয়ে পড়ে। আর এই করে বেমক্কা মান্ষ খ্ন করেও বসে মাঝে মাঝে।'

'অ্যাঁ?' আঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন।

'মারাত্মক গাড়ি মশাই—তবে আর বলছি কি!'

'কী সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ বলতে! গাড়ির ব্রেকটাই আসলে খারাপ। হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে আপনাকে। রাস্তায় যত খ্ন জখম হবে আপনার গাড়ির তলায় —তার খেসারত গ্নতে গ্নতে দ্দিনেই আপনি ফতুর হয়ে যাবেন—লাখটাকার ক্ষতিপ্রেণ গ্নেও আপনি পার পাবেন না!'

'লাখ লাখ টাকা ফাঁক হয়ে যাবে ঐ গাড়ির জন্যেই। বলছেন আপনি?'

'ঐ ব্রেকের জন্য ব্রোক হতে হবে আপনাকে শেষতক।' ভদ্রলোকের শেষ কথা।

ব্রোক হবার আগেই যেন ব্রেক ডাউন হয় হর্ষবর্ধনের, ভেঙে পড়েন তিনি—শ্নেই না!

'আরি কলিশন হলেই ত হয়েছে। যদি আর কোনো গাড়ি কি ল্যাম্পোস্টের সঙ্গে একটুখানি ধাক্কা লাগে তাহলেই তক্ষ্নি ভেঙে চুরমার! যা ঠ্নকো গাড়ি মশাই!'

'তাহলে আমরাও তো খতম্ হয়ে যাবো সেই সঙ্গে?'

'খতম্ না হলেও জখম তো বটেই। তবে গাড়িটা কিনেই ইনসিওর করিয়ে

নেবেন, আপনারও লাইফ ইনসিওর করে রাখবেন নিজেদের—তাহলেই কোনো ভয় থাকবে না আর। দুদিকই রক্ষা পাবে তাহলে। কোম্পানির থেকে দুটোরই খেসারত পেয়ে যাবেন তখন।'

'মারা গিয়ে টাকা পাওয়ার কি কোনো মানে হয় ?' তাঁর কথায় হর্ষবর্ধন তেমন ভরসা পান না ঃ 'আর নাই যদি বা মরি, কেবল হাত পা-ই হারাই -কিন্তু তা হারিয়ে অর্থলাভ করাটা কি একটা লাভ হলো নাকি ?'

'সেটা দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য। যে যেমনটা দ্যাখে। কেউ টাকা উপায় করার জন্য সারা জীবন ব্যয় করে। কেউ বা জীবন রক্ষা করতে গিয়ে দু হাতে টাকা ওড়ায়। যার যেমন অভিরুচি।'

'ইস্। ফেঁসে গিয়েছিলাম ত আরেকটু হলেই। ফাঁসিয়ে দিয়েছিল গাড়িটা। কী ভাগ্যি আপনার সঙ্গে দেখা হলো আজ, আপনি বাঁচিয়ে দিলেন মশায়। আমাকেও আর—আমার টাকাকেও।'

'না, না, তাতে কী হয়েছে। আপনি ঘাবড়াবেন না। চাপবার জন্যে কি আর গাড়ি ? তার জন্যে তো ট্যাক্‌সিই রয়েছে। রাস্তায় পা দিয়েই যদি ট্যাক্‌সি মিলে যায় তাহলে তার চেয়ে ভালো আর হয় না। আর তা সস্তাও ঢের। এধারে দেখুন এসব গাড়ির পেছনে খর্চাটা কি কম ? ঠুনকো গাড়ি, পচা কলকব্জা, একটুতেই বিকল। অর্দ্ধেক দিন কারখানার গ্যারেজেই পড়ে থাকবে তারপরে মেরামত হয়ে এলেও, দুদিনেই আবার যে কে সেই।'

'এমন গাড়িতে আমার কাজ নেই। এ গাড়ি আমি নেব না।'

'না না, নেবেন না কেন ? বললাম না, চাপবার জন্য ত গাড়ি নয়, গাড়ি হচ্ছে বাড়ির শোভা, বাড়ির ইজ্জৎ বাড়াবার। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে পাড়া-পড়শীর কাছে মান বেড়ে যায় কতো।'

'আমার গিন্নিও সেই কথা বলেন বটে। বলেন যে, একটা গাড়ি নেই বলে পাড়া-পড়শীর কাছে মুখ দেখানো যাচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেন তিনি। বাড়ি গাড়ি এসব ত লোককে দেখানোর জন্যেই মশাই ! দেখে যাতে পাড়ার সবার চোখ টাটায়। তবে এ যা গাড়ি - চোখে আঙুল দিয়ে তো দেখানো যাবে না পড়শীদের।' বলেন ভদ্রলোক ঃ 'তেমন করে দেখাতে গেলে তো তাদের চাপা দিয়ে দেখাতে হবে। নিদেন চাপা না দিলেও গা ঘেঁষে গিয়ে কি গায়ে কাদা ছিটিয়ে গেলেও চলে কিন্তু তাতো আর এ গাড়িতে সম্ভব হবে না। গাড়ি চালু হলে তবেই না কাদা ছিটোবার কথা ! তবে হ্যাঁ, পড়শীদের কানে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন বটে।'

'কানে আঙুল দিয়ে ?' তিনি অবাক হন ঃ 'সে আবার কিরকম ধারা ?'

'কেন, ঐ ঘচাং ঘচ্ ! ঐটা করতে পারেন আপনারা। ঐ ঘচাং ঘচ্।'

'ঘচাং ঘচ্ ?'

'হ্যাঁ। আপনারা চারজন আছেন বললেন না ? কর্তা, গিন্নি, দেওর আর

বাড়ির চাকর, চারজন ত রয়েছেন। বাড়ির দেউড়িতে থাকবে তো গাড়ি, গাড়ির চার দরজায় আপনারা চারজন দাঁড়াবেন। তারপর ঐ ঘচাংঘচ।'

'ঘচাং ঘচ্ কী মশাই ?' বারবার শুনে বিরক্ত হন হর্ষবর্ধন।

'আপনারা চারজনায় মিলে গাড়ির চারটে দরজা খুলুন আর লাগান—ঘণ্টায় ঘণ্টায়—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেবল ঘচাং ঘচ—ঘচাং ঘচ…ঘচাং ঘচ… চলতে থাকুক পরম্পরায়। রীতিমতন কানে আঙুল দিয়ে টের পেতে হবে পড়শীদের…যে হ্যাঁ, গাড়ি একখানা আছে বটে পাড়ায়। চালান দিনভোর ঐ ঘচাংঘচ।'

'কিন্তু নাহক ঘচাংঘচ করাটা কি ভালো ?'

'তাহলে ঘচাং ঘচ-এর ফাঁকে ফাঁকে প্যাঁ পোঁ চালাবেন। তাও করতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

'প্যাঁ পোঁ ?' একটু যেন ভড়কেই যান তিনি।

'হ্যাঁ, প্যাঁ পোঁ। গাড়ির সবকিছু বাজে হলেও ওর হর্নটা কিন্তু নিখুঁত। সেটাও বেশ বাজে। মাঝে মাঝে তাই বাজান। চলুক ঐ প্যাঁ পোঁ আর ঘচাংঘচ !'

দূর মশাই ঘচাং ঘচ্ ! আমি এক্ষুণি চললাম অর্ডার ক্যানসেল করতে—অমন ঘচাংঘচে গাড়ি আমার চাই নে।'

চুল না ছেঁটেই তীর বেগে বেরিয়ে পড়লেন হর্ষবর্ধন। গাড়ি খারিজ করে দিয়ে বাড়ি ফিরলেন তারপর।

'না গিন্নি ! ঘচাংঘচ করা পোষাল না আমার পক্ষে।'

বলে বাড়ি ফিরে গিন্নির কাছে পাড়তে গেছেন গাড়ির কথাটা, তিনি তো বাড়ি তোলপাড় করে তুললেন। কর্তার বোকামির বহর মাপতে না পেরে কিছু আর তিনি বাকি রাখলেন না তাঁর।

বৌয়ের বকুনি খেয়ে আজ সকালেই আবার তিনি মুখ চুন করে গেছেন সেই এজেণ্টের কাছে—'গাড়িটা চাই মশাই। আমি মত পালটেছি আমার।'

'গাড়ি আর কোথায় ! আপনি অর্ডার ক্যানসেল করে যাবার পর যিনি দু নম্বরে ছিলেন— আপনার ঠিক পরেই ছিলেন যিনি—পেয়ে গেছেন গাড়িটা। ঐ যে তিনি ডেলিভারি নিয়ে বেরিয়ে আসছেন এখন।' তিনি দেখিয়ে দেন—'তবে যদি বলেন, আপনার নাম আমি দ্বিতীয় স্থানে রাখতে পারি অতঃপর। এর পরের পর যে গাড়ি আসবে সেইটা আপনি পাবেন। ফের আবার তিন বছরের ধাক্কা হয়ত।'

হর্ষবর্ধনের চোখের ওপর দিয়ে প্যাঁ পোঁ করতে করতে চলে গেলে গাড়িটা। তাঁর মুখ দিয়ে বেরুতে শোনা যায় শুধু—'সেই ভদ্রলোক দেখছি ! সালুনের আলাপি কালকের সেই ঘচাংঘচ্…… !'

অদ্বিতীয় সেই ভদ্রলোককে দেখে আপন মনেই তিনি খচ্‌খচ্ করেন।

গোবরধনের কেরামতি

আসাম সরকারের নোটিস এসেছে প্রত্যেক আসামীর কাছেই। হর্ষবর্ধনরাও বাদ যাননি, যদিও বহুকাল আগে দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে কাঠের ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছেন, তাহলেও আসাম সরকারের কঠোর দৃষ্টি এড়াতে পারেননি।

শুধু তাঁর ওপরেই না, তাঁর ভাই গোবর্ধনও পেয়েছে এক নোটিস সীমান্ত-যুদ্ধে যাবার নোটিস।

পররাজ্য লিপ্সায় চীন যখন নেফার সীমানা পার হয়ে তেজপুরের দরজায় এসে হানা দিল, তখন কেবল আসামবাসীদেরই নয়, প্রত্যেক তেজস্বী ভারতীয়েরই ডাক পড়েছিল চীনকে রুখবার আর তেজপুরকে রাখবার জন্যে।

কলকাতায় হর্ষবর্ধনের কাছেও এসে পোঁছোলো সেই ডাক। হর্ষবর্ধন কিন্তু বললেন—'না আমি যুদ্ধে যাবো না।'

'সে কী, দাদা!' বিস্ময়ে হতবাক গোবর্ধন, 'তুমি না বিলেতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলে। সেই যুদ্ধ যখন নিজের দেশেই এসেছে এই সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে?'

'বিলেত গেছিলাম আমি? সে তো ইসপেন!' বলেন হর্ষবর্ধন। 'ইসপেনেই তো লড়েছিলাম।'

'একই কথা। বিলেত যাবার পথেই ইসপেন। সেখানে হিটলারের ফ্যাসিস্ত বাহিনীকে তুমি ফাঁসিয়ে দিয়ে এসেছো। আমিও তো লড়েছিলাম তোমার পাশেই।

আমাদের লড়াইয়ের সেই কাহিনী 'যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন' বইতে ফাঁস করে দিয়েছে সেই হতভাগাটা।'

'কোন্ হতভাগা?'

'কে আবার—তোমার পেয়ারের সেই চকর্‌বর্‌তি। জানো না নাকি তাকে?'

'জানবো না কেন? পড়েছি তো বইটা। আমাকেও দিয়েছিল একটা। লোকটা ভারী বাড়িয়ে লেখে কিন্তু। গাঁজা খায় বোধ হয়।'

'হ্যাঁ বড্ডো গাঁজায়, ওর সব গুলই গাঁজানো।'

'গঞ্জনাও বলতে পারিস—সমস্‌কৃত করে। কিন্তু সে কথা নয়, কথা হচ্ছে এই, চিরকাল আমরাই যুদ্ধে যাবো নাকি? তখন যুবক ছিলাম লড়েছি, কিন্তু বুড়ো হয়ে যাইনি কি এখন, গায়ের জোর কি কমে যায়নি? বন্দুক তুলতে গেলেই তো উল্‌টে পড়বো মনে হয়। তাছাড়া প্যারেড! লম্বা লম্বা রুট-মার্চ করতে পারব এই বয়সে?'

'এই মার্চ মাসে তো নয়—এমন গরমে।' গোবর্ধন সায় দেয়।

'তবে? এখন যারা যুবক তারা গিয়ে যুদ্ধ করুক। আমরা তো লড়ায়ের কথা পড়ব খবরের কাগজে। কিংবা বলব সেই চকর্‌বর্‌তিকে তাদের যুদ্ধের গল্প লিখতে …বইয়ে পড়া যাবে।'

'তা বটে!'

'আর তারাই তো লড়ছে এখন। সেই জাওয়ানেরাই।'

'জাওয়ান! জাওয়ান আবার কি দাদা?'

'রাষ্ট্রভাষা! জাওয়ান মানে জোয়ান।'

'মানে তুমি।' জানায় গোবর্ধন।

'আমি জোয়ান! তার মানে?' হর্ষবর্ধন হক্‌চকান।

'বৌদি বলল যে সেদিন!' প্রকাশ করে গোবরা।

'তোর বৌদি বলল আমি জোয়ান? সে-ই দেখছি ফাঁসাবে আমায়। কোনো মিলিটারি অফিসারের কাছে বলেছে নাকি সে?'

'না না। সেই চকর্‌বর্‌তিটার কাছেই বলল তো।'

'শুনি তো ব্যাপারটা। সে যদি আবার গল্প লিখে কথাটা ছাপিয়ে দেয় তাহলেই তো গেছি! তারপর এই নোটিস এসেছে!'

'বৌদির ইতুপুজোর ব্রত ছিল না? পুজো-টুজো সেরে বলল আমায়, যাও তো ভাই, একটা বামুন ধরে নিয়ে এসো তো! বামুন ভোজন করাতে হবে। আমি বললাম, বৌদি, ইতুপুজো করবে যখন, তখন বামুন-ভোজন করাতে ইতুর দাদাকেই ধরে নিয়ে আসি না হয়! ইতুর দাদাকে! শুনে বৌদি তো অবাক! আমি খোদ ইতুকেই ধরে আনতে পারতাম। জ্যান্ত ইতুর পুজো করতে পারতে। তা যখন হলো না, তাহলে তার দাদাকেই ধরে আনা যাক এখন। তখন বৌদি বুঝতে পারলো কথাটা।'

'সর্বকিছুই একটু লেটে বোঝে সে।' হাসলেন হর্ষবর্ধন।

'গেলাম চকরবরতির কাছে। খাবার কথা শুনে তখনি সে পা বাড়িয়ে তৈরি! কিন্তু যখন শুনলো যে ব্রত উদযাপনের বামুন-ভোজন, তখন আবার পিছিয়ে গেল ঘাবড়ে। বলল, ভাই, আমি তো ঠিক বামুন নই। পৈতেই নেইকো আমার। আমি বললাম, ধোপার বাড়ি কাচতে দিয়েছেন বুঝি? সে বলল, তা নয়, ঠিক কখনো পৈতে হয়েছিল কিনা মনেই পড়ে না আমার। তা না হোক আপনার দাদার পৈতে ছিলো তো? আমি বলি। বামুন না হোক, বামুনের ছেলে হলেই হবে। তখন সে এলো খেতে।'

'সর্বনেশে কথাই বটে। লোকটার কথাই এই রকম। পেট ঠেসে খেয়ে ঢেকুর তুলে বলে কিনা সে—সবই তো করলেন বৌদি, বেশ ভালোই করেছেন। রেঁধেছেন খাসা। কেবল একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। অম্বলটা করেননি, একটু অম্বলও করতে পারতেন এই সঙ্গে! শুনে বৌদি বলল, চকরবরতি মশাই, এ বাজারে কি খাঁটি জিনিস মেলে? এখন কাঁকরমণি চালের ভাত, পচা মাছ, বাদাম তেলের রান্না, এই থেকেই যথেষ্ট অম্বল হবে, সেই ভেবেই আর অম্বলটা করিনি, শুনে তো আঁতকে উঠল লোকটা—অ্যাঁ। বলেন কি! তাহলে তো হজম করা মুশকিল হবে দেখছি? হজম করাবার কোন দাবাই আছে বাড়িতে? দিন তাহলে একটু। এর সঙ্গে খেয়ে নিই। কি রকম দাবাই? জানতে চাইলেন বৌদি—এই জোয়ান টোয়ান?'

'এ বাড়িতে জোয়ান বলতে তো···'জানালো বৌদি—'জোয়ান বলতে গোবরার দাদা। তা তিনি তো এখন ঘুমুচ্ছেন।'

'তোর বৌদির যেমন কথা। আমি যদি জোয়ান, তাহলে প্রৌ···প্রৌ···প্রৌ—কথাটা কিরে! গলায় আসছে মুখে আসছে না! মানে প্রৌড় কে তাহলে?'

'প্রৌঢ়!'

'প্রৌড়, নাকি প্রৌঢ়? ও সে একই কথা। তোর বৌদির সার্টিফিকেটে দেখছি আমায় তেজপুরে গিয়ে গড়াতে হবে। বিধবা হতে হবে আমায় এই বয়সে।'

'তুমি বিধবা হবে? বলো কি?' গোবরা হাঁ করে থাকে।

'আমি কেন—তোর বৌদিই হবে তো, সেই তো হবে বিধবা। ও সে একই কথা। তা মজাটা টের পাবে তখন। মাছ খেতে পাবে না, তার সাধের বেড়াল মাছ না পেয়ে পালিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। বোঝো ঠ্যালা।'

'বৌদির ঠ্যালা বৌদি বুঝবে। এখন নিজেদের ঠ্যালা তো সামলাই আমরা!' বলে গোবরা।

'সামলানোর কী আছে আর।' জবাব দেন দাদা, 'বললাম না এই ঠ্যালায় গড়াতে হবে গিয়ে তেজপুরে। মুণ্ডু একদিকে গড়াবে, ধড়টা আর একদিকে।'

'আমিও গড়াবো তোমার পাশেই দাদা।' গোবরার উৎসাহ আর ধরে না।

'হায় হায় ! বংশ লোপ হয়ে গেলো আমাদের।' কাতর স্বরে শুরু করেন শ্রীহর্ষ, 'একলক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি, একজনও না রহিল বংশে দিতে বাতি।' রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে গুলিয়ে রাবণের শোকে তিনি মুহ্যমান থাকেন।

'মিছে হায় হায় করছো দাদা। তোমার ছেলেও নেই, নাতিও নেই'—গোবর্ধন বাতলায়, 'তোমার বংশ লোপ হবে কি করে ?'

'নাতিবৃহৎ তুই তো আছিস ! তুই গেলেই আমাদের বংশ গেলো।' দাদার শোক উথলে ওঠে, 'এতোদিনে আমাদের রাবণ বংশ গোল্লায় গেলো। আর বর্ধিত হতে পেল না, গোলায় বল্ আর গোল্লায় বল,—একই কথা।'

'না, না ! তোমাকে কি ওরা ফ্র···ফ্র···ফ্র···ফ্র···'

'কী ফড়ফড় করছিস—'

'ফ্রন··· !' বলেই হতবাক গোবর্ধন !

'মানে ?' হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন।

'মানে, তোমাকে কি ওরা আর ফ্রণ্টে পাঠাবে ?' কথাটা খুঁজে পেয়েছে গোবরা, 'তুমি নাকি ইসপেনের যুদ্ধ জয় করে এসেছো ! পড়েছে নিশ্চয়ই তারা বইয়ে। তাইতো ডেকেছে তোমাকে। অবিশ্যি তোমাকে তারা সেনাপতিটাও করে দেবে। সামনে থেকে লড়তে হবে না তোমাকে। মরতে হবে না গোলায়। পেছন থেকে পালাবার পথ পরিষ্কার পাবে।'

'পেয়েছি ! পালাবার পথ নাই যম আছে পিছে। যুদ্ধ কাকে বলে জানিস নে তো !' বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন দাদা, 'সে বড়ো কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।'

'দাদা-ভাইয়ে দেখা হবে কিন্তু।' গোবর্ধন আশ্বাস দেয়, 'তোমার ধারে কাছেই থাকব আমি। পালাবো না।'

'জ্বালাসনে আর। এখন পড়তো কি লিখেছে নোটিসটায়।'

'গোখেল রোডের একটা ঠিকানা দিয়েছে।' নোটিস পড়ে গোবর্ধন জানায়, 'রিক্রুটিং অফিসের ঠিকানা। সেখানে আগামী পরশু সকাল দশটায় গিয়ে হাজির হতে হবে। নাম লেখাতে হবে। তারপরে মেডিক্যাল একজামিনেশনের পর ভর্তি করে নেবার কথা।'

'আর যদি না যাই ?'

'ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসে পাকড়ে নিয়ে যাবে পেয়াদায়।'

'আর যদি পালিয়ে যাই এখান থেকে ?'

'হুলিয়া বেরিয়ে যাবে। পুলিস লেলিয়ে দেবে বোধ হয়।'

'পুলিস ! ওরে বাবা !' আঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন, 'তাহলে আর না গিয়ে কাজ নেই। যাবো আমরা।'

যথা দিবসে যথাস্থানে গেলেন দু'ভাই। দাঁড়ালেন পাশাপাশি। প্রথমে পরীক্ষা হলো হর্ষবর্ধনের।

'নাম ?'

'শ্রীহর্ষবর্ধন।'

'বয়স ?'

'বিয়াল্লিশ।'

'পিতার নাম ?'

'পৌণ্ড্রবর্ধন। মা'র নাম বলব ?'

'না। দরকার নেই। ঠিকানা ?'

'চেতলা।'

'পেশা ?'

'কাঠের কারবার।'

'ভারতের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া একটা কাজের বস্তু, গৌরবের বস্তু বলে কি আপনি মনে করেন ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'বাহিনীর কোন বিভাগে ভর্তি হতে চান আপনি ?'

'আজ্ঞে ?' প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেন না হর্ষবর্ধন।

'নানান বিভাগ আছে তো ? পদাতিক বাহিনী, গোলান্দাজ বাহিনী, বিমান বাহিনী—'

'আমি একেবারে জেনারেল হতে চাই। মানে সেনাপতিটতি।' জানান হর্ষবর্ধন।

'পাগল হয়েছেন!' রিক্রুটিং অফিসার কথাটা না বলে পারেন না।

'সেটা একটা শর্ত নাকি ?' হর্ষবর্ধন জানতে চান, 'জেনারেল হতে হলে কি পাগল হতে হবে ?'

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে অফিসার গোবর্ধনকে নিয়ে পড়েন।—'নাম ?'

'গোবর্ধন।'

'বয়স ?'

'বত্রিশ। আর বাকি সব ঐ ঐ ঐ ঐ। মানে—ঠিকানা, পিতার নাম, পেশা সব—ঐ ঐ।' বিশদ করে দেয় গোবরা, 'অর্থাৎ ইংরেজি করে বললে—ডিটো ডিটো, আমরা দুই ভাই কিনা!'

'ও। তাহলে আপনারা এবার ঐ পাশের ঘরে চলে যান, সেখানে আপনাদের মেডিক্যাল চেক্-আপ হবে।' বললেন অফিসার, 'ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করতে পারলে তবে ভর্তি।'

'পাশের ঘরে যাবার পথে ফিস্-ফিস্ করে গোবরা, 'আর ভয় নেই, দাদা! আমার জীবনে কোনো পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি, আর ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করবো! ফেল্ যাবো নির্ঘাত! বেঁচে গেলাম এ যাত্রা!

'হ্যাঁ, ফেলেছে কিনা আমাদের।' আশ্বাস পান না দাদা, 'এই যুদ্ধের বাজারে কেউ ফেলবার নয়, কিছু ফ্যালনা না।'

হর্ষবর্ধনের বিপুল ভুঁড়ি দেখেই বাতিল করে দিলেন ডাক্তার—'না, এ চলবে না।' প্রতিবাদ করে বলতে গেছলেন বহুৎ বহুৎ জেনারেলের ভুরি ভুরি ভুঁড়ি তিনি দেখেছেন—যদিও ফটোতেই তাঁর দেখা। কিন্তু তাঁর ভুঁড়িতে গোটা দুই টোকা মেরে তুড়ি দিয়ে তাঁর কথা উড়িয়ে দিলেন ডাক্তার।

তারপর গোবর্ধনের পালা এলো। সব পরীক্ষায় পাস করার পর চক্ষু পরীক্ষা।

'চার্টের হরফগুলো পড়তে পারছেন তো? দেয়ালের গায়ে যে চার্ট ঝুলছে?'

'অ্যাঁ! ওখানে একটা দেয়াল আছে নাকি আবার।'

'আপনার চোখ তো দেখছি তেমন সুবিধের নয়।' বলে ডাক্তার একটা অ্যালুমিনিয়মের প্রকাণ্ড ট্রে ওর চোখের দু-ফুট দূরে ধরে রেখে শুধোলেন, 'এটা কী দেখছেন বলুন তো?'

'একটা আধুলি বোধ হয়, নাকি, সিকিই হবে!'

দৃষ্টিহীনতার দোষে গোবর্ধনও বাতিল হয়ে গেলো।

গোখেল-রোডের বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ল দু'ভাই: 'চল দাদা! আজ একটু ফুর্তি করা যাক। আড়াইটে বাজে প্রায়। রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে দুজনে মিলে তিনটের শোয়ে কোনো সিনেমা দেখিগে!'

নানান খানা খেতে খেতে তিনটে পেরিয়ে গেল, তিনটের পরে সিনেমার অন্ধকার ঘরে গিয়ে ঢুকল দু'ভাই। নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল পাশাপাশি।

ইন্ট্যারভ্যালের আলো জ্বলে উঠতেই চমকে উঠলেন হর্ষবর্ধন। পাশেই যে সেই ডাক্তারটা বসে! খারাপ চোখ নিয়ে সিনেমা দেখছে দিব্যি। এতো কাণ্ড করে শেষটায় বুঝি ধরা পড়ে গোবরা।

কনুয়ের গুঁতোয় পাশের ডাক্তারকে দেখিয়ে দিলেন দাদা।

গোবরা কিন্তু ঘাবড়ালো না, জিজ্ঞেস করল সেই ডাক্তারকেই, 'কিছু মনে করবেন না, দিদি! শুধোচ্ছি আপনাকে—এটা তেত্রিশ নম্বর বাস তো?'

'অ্যাঁ!' অতর্কিত প্রশ্নবাণে চমকে ওঠেন ডাক্তারবাবু।

'মানে, মাপ করবেন বড়দি! এটা চেতলার বাস তো? ভিড়ের মধ্যে ঢুকে তো পড়লাম—কিন্তু ঠিক বাসে উঠেছি কিনা বুঝতে পারছি না। চেতলা পৌঁছোবে কি না কে জানে।'

প্রথম পুরস্কার কখনও আমি পাইনি আমার জীবনে। কোনো বিষয়েই না।

দ্বিতীয় পুরস্কারটাও ফস্‌কাতে যাচ্ছিল প্রায়...

আমার বাল্যকালের সেই কাহিনীটাই বলবো আজ।

আমাদের স্কুল হোস্টেলটা ছিল প্রাচীন এক রাজ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। বাড়িটার দক্ষিণ আর পশ্চিম ধারটা পড়ে গেছলো, কেবল উত্তর-পূর্বদিকের খানকয়েক ঘর খাড়া ছিলো তখনো। একতলার তারই কয়েকটায় ছিলো ইস্কুলের ছেলেদের হোস্টেল। হোস্টেল আর বোর্ডিং একাধারে।

আমরা ছেলেরা থাকতাম পূর্বদিকের ঘরগুলোয় আর মাস্টারমশায়রা থাকতেন উত্তর দুয়ারী ক'খানা ঘরে।

বড় হলটাতে থাকতাম আমরা জনা দশেক এক সঙ্গে। পাশাপাশি দশখান সীট পড়েছিলো সেই ঘরটায়।

বাচ্চা ছেলেরা থাকতো সব আশপাশের ঘরগুলোয়। আর আমরা, যারা ওরই মধ্যে একটু বড়োসড়ো, এবং হয়তো বা একটু ডানপিটে, তারা সবাই একসঙ্গে ঐ বড়ো ঘরটায় জড়ো হয়েছিল।

অবিশ্যি, আমাকে ঠিক ডানপিটে বলতে পারি না এবং আমার বন্ধু বিষ্টু সুকুলকেও বলা যায় কিনা সন্দেহ। নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে পিঠের চেয়ে পেটের দিকটাতেই বেশি দাক্ষিণ্য ছিলো আমার।

তারাপদ, সাহেব, পিয়ারী, পুণ্য, শ্রীমোহন মিশ্র, শরৎ ঝা—আর কে কে আমরা থাকতুম যেন সেই ঘরে, সবার নাম এখন আমার মনে পড়ে না। তারা

কে কোথায় এখন, কী করছে, কিছুই তার জানি নে। কেউ কারও খবর রাখে না, খবরও দেয় না কাউকে।

সত্যি, প্রথম বয়সের বন্ধুরা সব কোথায় কি করে যে হারিয়ে যায়! জীবন-পথে চলতে গিয়ে কে যে চলে যায় কোন দিকে, তার কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না আর। তবে শেষ বয়সের বন্ধুরাও যে হারিয়ে যায় না তা নয়, তবে তারা মারা গিয়েই হারায়। আর ছোটবেলার বন্ধুরা বেঁচে থাকতেই কোথায় যেন হারিয়ে থাকে।

হাবুই ছিল আমাদের ভেতর সর্দার। খেলাধুলোয়, দুঃসাহসিকতায় সব বিষয়েই চৌকস সে। সবাই আমরা তাকে হাবুদা বলে ডাকতাম।

রোজ ভোরে উঠে হাবুদার নেতৃত্বে প্রথম কাজ ছিলো আমাদের মর্নিং ওয়াকে বেরুনো। দাঁতন আর প্রাতঃভ্রমণ একসঙ্গে চলতো আমাদের। হোস্টেল থেকে বেরিয়ে মহানন্দা নদীর পুল পেরিয়ে সিঙ্গিয়ায় আমবাগান ভেদ করে আধ মাইল দূরে আমাদের গাঁয়ের ইস্কুল বরাবর চলে যেতাম কোন কোন দিন। আবার কোন দিন বা আমরা নদীর ধার দিয়ে পাহাড়পুর সীমান্ত ধরে শ্মশানঘাটে গিয়ে পেঁছিতাম। যে-দিন যে-দিকে পা টানতো।

পায়ের টানে সেদিন আমরা শ্মশানে গিয়ে পেঁছেছি। ওমা, একি! দেখি যে আস্ত একটা মড়া না পুড়িয়ে কারা ফেলে রেখে গেছে নদীর চড়ায়।

গরীব মানুষরা মাঝে-মাঝে এ-রকমটা ক'রে থাকে বটে। পোড়াবার কাঠ-খড়ের পয়সা জোটাতে না পেরে এমনি ফেলে চলে যায়। বেওয়ারিশ লাশেরও প্রায় এই গতিই হয়ে থাকে। আপাদমস্তক কাপড় ঢাকা মড়াটার কেবল একটা হাত বেরিয়ে আছে।

হাবুদা মড়াটার চারপাশে ঘুরে মুখের ঢাকনা খুলে দেখলো। 'ফাস্ট্ ক্লাস মড়া দেখছি' বললো সে। 'কেউ যদি আজ রাত্তিরে একলা এখানে এসে এই মড়াটার বার করা এই ডান হাতের আঙুলে একটা লাল সুতো বেঁধে দিতে পারে তাকে আমি রসগোল্লা খাওয়াবো। গরম গরম রসগোল্লা—বাজি রাখলাম!'

রসগোল্লা! শুনেই আমি লাফিয়ে উঠেছি—একে রসগোল্লা, তায় আবার গরম গরম!

পরম উপাদেয় অমন জিনিস আর হয় না।

'এক সের রসগোল্লা! এক আধটা না।'

এক সের গোল্লা চেখে দেখা দূরে থাক, চোখেও দেখিনি আমি কোনো দিন। এক সেরে কতগুলো হতে পারে মনে-মনে টের পাবার চেষ্টা করি।

'বাণিজ্যার দোকানে রসগোল্লা—তার ওপর!' হাবুদা পুনশ্চ যোগ করে।

বাজারে আর পাঁচটা মিষ্টির দোকানের মধ্যে বাণিজ্যার দোকানই সবার সেরা। বাঁড়ুজ্যে ঠাকুরের নাম বাণিজ্যা কেন হলো কে জানে! সুদূর বাঁকুড়া থেকে

আমাদের পাড়ায় মিষ্টদ্রব্যের বাণিজ্য করতে এসেছিলো বলেই হয়ে থাকবে বোধহয়।

আমি বললাম—'আমি আসবো। ঠিক ঠিক বাজি তো?'

'আলবৎ। এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি দ্যাখ।' হাবুদা বলে।

'বাজি নয়, তুই ডিগবাজি খাবি।' বললো শ্রীমোহন। 'রসগোল্লা আর খেতে হবে না তোকে।'

'খাবি খেতে হবে নির্ঘাৎ।' শরৎ ঝা জানালো—'শিব্রামের যা ভূতের ভয়!'

কথাটা কিছু মিছে নয়। কিন্তু ভূতের ভয় থাকলেও রসগোল্লার লোভও কিছু কম ছিলো না আমার। রসগোল্লারাই ভয়টাকে জয় করে নিলো।

তাছাড়া ভেবে দেখলাম, আমার নামটাও নেহাত ফ্যালনা না তো।—নামের শিব-অংশ ভূতদের বাড়ালেও, দ্বিতীয়াংশটা ভূতদের তাড়ায়। আর, শিবের ওপরে ঠিক না হলেও, শিবের পরেই রাম রয়েছে। তার সামনে কি ভূত দাঁড়াতে পারে আর?

রাম রাম করতে করতে চলে আসবো সটান। আর, মড়ার হাতে একটা লাল সুতো বেঁধেই না পিটটান! কতক্ষণ লাগে তা বাঁধতে!

'আসব, কিন্তু এই অন্ধকার রাত্তির—আমাকে টর্চ দিতে হবে কিন্তু।' আমি বললাম।

'টর্চ আছে কারো কাছে?' হাবুদা শুধোয়।

'টর্চ কোথায় পাবো!' বলে সবাই।

'আমি একটা টর্চ দিতে পারি।' তারাপদ জানায়, 'তুই সেটা নিতে পারিস। কিন্তু সেটা জ্বলে না মোটেই—ব্যাটারি নেই কিনা। তাহলেও সঙ্গে রাখিস, দরকার হলে তাই দিয়ে ঠেঙাতে পারবি ভূতদের।'

'না, ভূতকে আমি টর্চার করতে চাইনে।' আমি বলি ঃ 'চাঁদের আলোয় চলে আসবো ঠিক আমি।'

'আজ চাঁদ উঠবে সেই ভোর রাতের দিকে।' হাবুদা ব্যক্ত করে।

'আমার যা ঘুম! তবে কেউ যদি সেই সময় তুলে দেয় আমায়—চলে আসবো ঠিক।' বলে দিই আমি।

'আমার টাইমপিসটায় রাত তিনটের অ্যালার্ম দিয়ে রেখে দেবো তোমার বিছানায়—ঠিক তোমার কানের গোড়াতেই। তাহলে তো হবে তোমার?' হাবুদা বলে ঃ 'আর একটা লাল সুতোও বাঁধা থাকবে ঘড়িটার মাথায়—সেইটা খুলে নিয়ে বেরিয়ে পোড়ো তুমি।'

অ্যালার্ম-এর আওয়াজ হতেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। কানের গোড়ায় একটানা ক্রিং-ক্রিং যেন শিঙের মতই গুঁতো লাগায়। উঠে বসলাম বিছানায়।

দেখলাম ঐ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে সকলেরই। বিছানায় উঠে বসলো

কেউ, কেউ, কিন্তু তার বেশি উঠলো না আর। বিষ্টুটা তো চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো ফের।

ঘড়ি থেকে লাল সুতোটা খুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। একবার আড়চোখে দেখে নিলাম, রসগোল্লাও এনে রাখা হয়েছে। হাঁড়িটা হাবুদার টেবিলের ওপর মজুদ। দেখে আমার বেশ উৎসাহ জাগতে লাগলো, বলবো কি!

হাবুদা বলল—'জয়োস্তু!'

বিষ্টু চাদরের ভেতর থেকেই জানাল—'গুড মর্নিং দাদা!'

শরৎদা বলল —'ভালোয় ভালোয় ফিরে আয় বাছা। এসে বাঁচা আমাদের।'

কারু কোনো কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ফিরে চাঁদের আলোয় আমি বেরিয়ে পড়লাম শ্মশানের দিকে।

দু'পা এগিয়েছি তিন পা পেৌছিয়েছি—আধ ঘণ্টা ধরে এমনি আগুপাছু করে আস্তে-আস্তে পেঁছিলাম গিয়ে অকুস্থলে।

দেখলাম চাদরমুড়ি মড়াটার একটা হাত বার করা—তখনো সেই ভাবে শায়িত।

শিব শিব! রাম রাম! নিজের নাম জপতে-জপতে এগিয়ে গেলাম আমি। বাণিজ্যার দোকানে রসগোল্লার ধ্যান করতে করতেই এগুলাম।

আমার আঙুলে বাঁধা লাল সুতোটা বার-করা তার সেই ডান হাতের আঙুলে জড়ালাম কোনো রকমে। এমন সময়ে মড়াটা···

মড়াটা করলো কি, তার বাঁ হাত খানা তুলে ধরে ফিস-ফিস করে বললো আমায়—আর এই হাতটা?

শুনেই (এবং দেখেও বইকি) আমার তো হয়ে গেছে!

যখন হুঁশ হলো, দেখি হাবুদারা সবাই ঘিরে রয়েছে আমাকে আর ভোর হয়ে এসেছে তখন।

'কী হয়েছিলো রে! কি হয়েছিলো রে!'

যা হয়েছিলো বললাম আনুপূর্বিক।

'কিন্তু মড়াটা গেলো কোথায় রে?' জিগ্যেস করলো হাবুদা।

তখন আমি তাকিয়ে দেখলাম—যেখানে সেটার পড়ে থাকার কথা সেখানটা বিলকুল ফাঁকা।

'আমি কী জানি তার! আমি তার হাতে সুতোটা বেঁধে দিয়েছি ঠিকই। তোমরা দেখে নিয়ো।'

দেখবো কি! কাকে দেখব? মড়াই নেই তো দেখবো কোথায়?

'যে মড়া হাত নাড়তে পারে সে নিশ্চয় পা নেড়ে চলে গেছে কোথাও।' আমি বললাম ঃ 'ও-রকম মড়ার অসাধ্য কিছু নেই! বিষ্টু কোথায়! সে এলো না যে তোমাদের সঙ্গে?'

'ঘুম ফেলে আসবে সে! সে যা ঘুমকাতুরে।' বললো শ্রীমোহন।— 'তোমার দাদা একটি!'

'আর সে-ই নাকি আমার প্রাণের বন্ধু!' বলে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম —'আমি এদিকে মড়ার সঙ্গে সহমরণে যেতে বসেছি আর সে ওধারে কিনা শুয়ে-শুয়ে নাক-ডাকাচ্ছে। এই কি বন্ধু? একেই কি বন্ধু বলে? যাক্, তবু ভালো যে তোমরা সবাই এসেছিলে। নইলে বেহুঁশ হয়ে এখানে পড়ে থেকে হয়তো এতক্ষণে আমি অক্কাই পেতাম।···তা, তোমরা এখানে এলে যে বড়ো?' শুধালাম হাবুদাকেই।

'শরৎ যা করতে লাগলো, না এসে উপায় কি? বললো সে শিব্রামটা যা ভীতু···এতক্ষণে হয়তো ভিরমি খেয়েছে আর ওকে আধমড়া দেখে শেয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গেছে মড়াটার সঙ্গে। মিনিট পনেরো ধরে ওর গজর-গজর শুনে আর তিষ্ঠোতে পারা গেল না। বাধ্য হয়েই—'

'শান্তিতে সকাল বেলাটায় একটু যে ঘুমুবো তার যো নেই।' তারাপদ গঞ্জনা দেয়।

'তা শরৎদা বলেছিলো ঠিকই। ভিরমি তো খেয়েইছিলাম। মড়াটা যেমন করে হাত বাড়ালো······'

'মড়া হাত বাড়ালে তক্ষুনি আমি তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করি।' জানায় হাবুদা।

তা বলতে পারে বটে সে। ভয়-ডর তার নেই মোটেই।

কথায়-কথায় আমরা হোস্টেলে ফিরে এলাম। সকাল হয়ে গিয়েছিলো তখন।

'একি, আমার সাইকেলটা এখানে বারান্দায় পড়ে কেন?' অবাক হয়ে শুধায় হাবুদা—'সাইকেলটা তো আমার মাথার কাছে থাকে, টেবিলের পাশটাতে —এখানে আনলো কে?'

'ভূতে! আবার কে?' তখন অব্দি সেই মড়ার ভূতটা আমার মাথায় ঘুরছিল।

আর ভূত বলতে না বলতেই ভূত! অদ্ভুত কাণ্ড!

হলে ঢুকেই চমকে গেছি আমি। আমার বিছানায় আমার গায়ের চাদরটা মুড়ি দিয়ে সেই ভূতটা শুয়ে—

'ওই দ্যাখো! সেই মড়াটা। শ্মশান থেকে পালিয়ে এসে আমার বিছানায় শুয়ে আছে মজা করে। ঐ দ্যাখো না, তার আঙুলে জড়ানো আমার সেই লাল সুতোটা ওই তো!'

আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া মড়াটার একখানা হাত বার করা, আর তাতে সেই লাল সুতোটা লাগানো।

ছেলেরা সব হৈ-হৈ করে ওঠে। হট্টগোলে টনক নড়ে বুঝি মড়াটার! আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে সে।

আর কে? আমাদের শ্রীমান বিষ্ণুপ্রসাদ সুকুল!

'বিষ্টু—তুই! তোর হাতে লাল সুতো বাঁধা কেন রে?' সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। 'তুই-ই বুঝি মড়া সেজে পড়েছিলিস্ সেখানে?' ভীষণ রাগ হয় আমার।

বিষ্টু মুচকি-মুচকি হাসে।

ওর হাসিতে পিত্তি জ্বলে যায় আরও। ইচ্ছে করে ওকে ধরে কসে ঘা' কতক দুম্-দাম্ লাগাই।

'কিন্তু একটা কথা তো বুঝতে পারছি না ভাই।' হাবুদার প্রশ্ন—'শিবু বেরুবার মিনিট পনেরো কুড়ি পরেই বেরিয়েছি আমরা, বিষ্টু তখন তো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলো। ও তাহলে আমাদের আগে, এমন কি, শিবুর আগেও সেখানে গিয়ে পৌঁছুলো কি ক'রে?'

'আর গেলই বা কেন মরতে?' সে-প্রশ্নটা শরৎদার।

'শিব্রামের বাহাদুরিটা দেখবার জন্যেই আর কিছুটা ওকে জব্দ করবার মতলবেও। তোমরা সবাই চলে যাবার পরেই নাক ডাকানো থামিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আমি। হাবুদার সাইকেলে চেপে পাকা সড়ক ধরে গিয়েছিলাম বলেই ঢের আগে পৌঁছেছি তোমাদের……'

'তারপর? তারপর?' ব্যগ্র প্রশ্ন সবাইকার।

'…গিয়ে দেখি মড়াটার চিহ্নও নেই—না-না, কেবল চিহ্নমাত্রই পড়ে আছে। হাড়গোড়গুলোই খালি। শেয়াল-কুকুরে খেয়ে শেষ করেছে সব। হাত-ফাত কিচ্ছু নেইকো…'

'না থাকগে, কিন্তু এটা কি তোমার বন্ধুর মতন কাজ হয়েছে?' আমি আর থাকতে পারি না, গর্জে উঠি।

'নিশ্চয়।' অম্লানমুখে বিষ্টু বাতলায়, 'আমি দেখলাম হাত না থাকলে শিবরামটা সুতো বাঁধবে কোথায়? আর, ওর অতো সাধের রসগোল্লাগুলো বেহাত হয়ে যাবে শেষটায়? সেই না ভেবে বাধ্য হয়েই আমাকে…বন্ধুর প্রতি কর্তব্যের খাতিরেই মড়া সেজে মট্‌কা মেরে পড়ে থাকতে হলো।…'

'তা না হয় হলো, কিন্তু মড়াটা, মানে, তার ভুক্তাবশেষগুলো গেল কোথায়?' হাবুদা জিজ্ঞেস করে।

'আমি ওটাকে, ওর কাপড়ে বেঁধে পুটুলি বানিয়ে মহানন্দার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।'

হাবুর মুখে রসগোল্লার উল্লেখে কথাটা আমার মনে পড়ে যায়—'এবার তাহলে হাঁড়িটা পাড়ি হাবুদা?' কথা আর হাঁড়ি একসঙ্গে পাড়া আমার।

'স্থিরোভব।' হাবুদা বলে ওঠে, 'রসগোল্লাটা বোধহয় তোমার ঠিক প্রাপ্য

নয়। তুমি মড়ার হাতে সুতো বাঁধলেও, বেশি সাহস দেখিয়েছে বিষ্টু—গোটা মড়াটাকেই হাতিয়ে—তোমার ঢের আগেই গিয়ে। তার ওপরে মড়া সেজে ঐ শ্মশানে অমনভাবে পড়ে থাকাটাও ওর কম সাহসের পরাকাষ্ঠা নয়। অতএব আমার বিশেষ বিবেচনায় পুরস্কারটা ওরই পাওনা।'

কথাটা শুনে আমার মুখখানাই যেন হাঁড়ি হয়ে উঠলো তখন।—'আর আমি? আমি যে অতো কষ্ট করে সুতো বাঁধলাম।···তোমার কথা ছিল কী?'

'তুমি পাবে দ্বিতীয় পুরস্কার—গোটা দুয়েক রসগোল্লা।'

'মোটে দুটো রসগোল্লা? না, দ্বিতীয় পুরস্কার আমি চাই না। নেবো না কিছুতেই···কিছুতেই না। মড়ার হাতে সুতো বাঁধবার কথা ছিল, মড়া সেজে পড়ে থাকবার কথা ছিল না মোটেই।'

'আচ্ছা তাহলে এটা হোক অদ্বিতীয় পুরস্কার।' হাবুদা ঘোষণা করে ঃ 'অদ্বিতীয় তো বলতে গেলে একরকম প্রথমই। মানে যে দ্বিতীয় নয়।'

বিষ্টু ততক্ষণে হাঁড়িটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে খেতে শুরু করে দিয়েছে, চিবুতে-চিবুতে বলে, 'মানে যে দ্বিতীয় না, মানে, তৃতীয়ও হতে পারে।'

'আর রসগোল্লা?'

'আদ্ধেক।'

বিষ্টু দুটো তিনটে চারটে করে গোল্লা পুরছিলো মুখে।

'দাও তাহলে আমার অর্ধেক ভাগ।'

হাত বাড়িয়ে আমি খালি হাঁড়িটাই হাতে পেলাম। হাঁড়ি খালি। বিষ্টু এর মধ্যেই সাবাড় করে দিয়েছে সব।

রসগোল্লা খতম্। শুধু তার রসটাই পড়ে রয়েছে তলায়।

'রসগোল্লা কই, হাঁড়ি তো ফাঁক।' আমি জানালাম।

'রসটাও কিছু ফ্যালনা নয় বৎস!' শরৎদা বলে—'তুই যদি না খাস তো দে আমায়।···'

শুনে আমি আর দেরি করি না। তলানি রসটাই গলায় ঢেলে দিই তৎক্ষণাৎ।

চেয়ারম্যান বলতে চারু। তার মতন চেয়ারম্যান হয় না আর।

চেয়ারম্যানগিরিতে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারতুম না কেউ আমরা।

কিন্তু তার চেয়ারম্যানিতে বাধা পড়লো একদিন।

আমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবু এসে হানা দিলেন আমাদের ইস্কুলে।

'আপনাদের ইস্কুল বিল্‌ডিং বাড়াচ্ছেন নাকি, মাস্টারমশাই?' জিজ্ঞেস করলেন হেডমাস্টারবাবুকে এসে।

'কই না ত। কে বললে একথা আপনাকে?' হেডমাস্টারমশাই একটু যেন বিস্মিতই।

'আপনার ইটের ভারী দরকার পড়েছে—দেখছি কিনা!'

'ইটের দরকার! আমার!' হেডমাস্টার ত হতবাক।

'আমার বাড়িটা পাকা করছি, লক্ষ্য করেছেন বোধ হয়?' ডাক্তারবাবু জানান, 'সেজন্য রাস্তার ধারে ইটের পাঁজা খাড়া করা রয়েছে—সেই ইটের পাঁজা থেকে আপনার ইস্কুলের ছেলেরা—তা, দু একখানা নয়—একশ দুশ ইট তুলে নিয়ে আসছে। এক আধদিন না, রোজ। ইস্কুলে আসার পথেই নাকি সারছে কাজটা।'

'বলেন কি! এমনটা হতেই পারে না।' বললেন হেডমাস্টারমশাই, 'আমার ইস্কুলের ছেলেরা তেমনধারা নয়। নিজের চোখে দেখেছেন আপনি?'

'কি করে দেখব?' সারাদিন তো কল সামলাতেই ব্যস্ত—দূর দূর

গাঁয়ের কল। তা ছাড়া এখানকার সরকারী ডিস্পেনসারিতে গিয়ে বসতে হয় একসময়। সময় কোথায় এসব দেখার বলুন! তবে শুনলাম আমার পাড়াপড়শীর মুখেই।'

'শোনা কথায় কদাপি বিশ্বাস করবেন না। আগে নিজের চোখে দেখবেন তারপর বলবেন।' সার কথা বলে দিলেন হেডসার।

'নিজের চোখে দেখলে কি আর রক্ষে থাকবে মশাই? বলতে আসব আপনার কাছে? এক একটাকে ধরব—আর ধরে ধরে টিটেনাস-এর ইনজেকশন দিয়ে দেব।…'

'টিটেনাস-এর ইনজেকশন! সে কি আবার!' সেকেন্ডমাস্টার কথা পাড়েন মাঝখানে।

'ইটে হাত-পা ছড়ে গেলে তাই দেয়া নিয়ম তো। ঐ টিটেনাসের ইনজেকশন! ইট নিয়ে খেলাধুলা করতে গেলে হাত-পা তো ছড়বেই। আপনারা গেম-ফি তো নেন ঠিকই—কিন্তু ওদের খেলাধুলার ব্যবস্থা করেন না তো! তাই বাধ্য হয়েই ওদের ইট-পাটকেল নিয়েই খেলতে হয়। ইট দিয়েই বল খেলে বোধ হয়। আর বাধ্য হয়েই আমাকে ঐ ইনজেকশন দিতে হবে তাদের।…'

'হাত-পা না ছড়লেও?' আমরা কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম —প্রশ্নটা তুললাম আমিই।

'হ্যাঁ, না ছড়লেও। প্রিভেন্শন ইজ বেটার দ্যান কিওর। বলে থাকে শোনোনি নাকি?' বলে তিনি হাঁফ ছাড়লেন—'কিংবা…'

'কিংবা?' চারু শুধোয় এবার।

'কিংবা এক একটাকে ধরে হাঁ করিয়ে খানিকটা কুইনিন পাউডার তুলে মুখে ভরে দিলেও হবে। ব্যায়রাম সারবে নির্ঘাৎ। কুইনিনে পালা জ্বরও সেরে যায়। ইট সরানোর পালাও সারবে।' বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। আরেকটা কল সামলাতেই সাইকেল চেপে বুঝি উধাও হলেন আর কোথাও।

আমি বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখলাম, কুইনিনের কথায় চারুর মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। ঠিক চারুতার প্রদর্শনী তাকে যেন বলা যায় না।

পরদিন ইস্কুলে আসার সময় ডাক্তারবাবুর রাস্তা ধরে আসছি—ইটের পাঁজার পাশ দিয়ে।

চারু বলল—'নে নে সবাই দুখান করে ইট তুলে নে।'

'কুইনিনের কথাটা ভুলে গেলি এর মধ্যেই?' মনে করিয়ে দিই আমি। —'পালা জ্বরও পালায়, জানিস?'

'আগে অঙ্কের স্যারকে তো সামলাই। কুইনিন তারপর,' বলল চারু, 'আজ আবার আমার হোমটাস্কই হয়নি। অঙ্ক কষবার সময়ই পেলাম না ভাই!'

এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও ডাক্তারের টিকি না দেখে পুঞ্জীভূত ইটের থেকে হাতসাফাই করলাম সবাই।

'এত এত ইট নিয়ে কী হয়?' ইট হস্তে আমি বলি, রোজ রোজ এত ইটের কী দরকার? ইটগুলো তো পড়েই আছে ইস্কুলের পেছনে। ঘাটের পাড়টায়। সেইগুলোই কি কাজে লাগানো যায় না?'

'ঘাটের পাড়ে ময়লা পাঁকের মধ্যে পড়ে আছে— সেই সব ইট?' প্রতিবাদ করে চারু ঃ 'হাইজীনে কী বলে? ওগুলো কি এর মধ্যেই বীজাণুঘটিত হয়ে যায়নি। তাছাড়া সারা রাত শেয়াল কুকুরে মুখ দিচ্ছে···'

'শেয়াল কুকুর কি ইট খায় নাকি রে?'

'না খাক্, ইটের ওপর প্রাতঃকৃত্য করতে পারে তো! ছিঃ ছিঃ!'

'বেয়ারাটা যে কেন ক্লাসের থেকে ইটগুলো নিয়ে যায় রোজ রোজ! ফেলে আসে ঘাটের পাড়টায়।' আমার অনুযোগ, কাকে যে, তা ঠিক বোঝা যায় না।

'বাঃ, তাকে ইস্কুলের জঞ্জাল সাফ করতে হবে না? ক্লাসরুম পরিষ্কার করতে হবে তো রোজই।' জানায় জগবন্ধু, 'তা ভালোই করছে একরকম। ঘাটের পাড়ে পড়ে পড়ে জমা হয়ে পাঁকালো ঘাটটা সান-বাঁধানো পাকা হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে।'

'আমি যদি বড়ো হই কোনো দিন—বড়ো তো হবই···'বলে চারু, 'তা হলে এখানকার মুন্সীপালীর চেয়ারম্যান হয়ে—সত্যিকারের চেয়ারম্যান—ঐ ঘাটের নাম রাখবো চারু সরোবর আর ডাক্তারের ইটের দৌলতে বানানো হয়েছে বলে ঘাটটার নাম হবে ডাক্তারঘাটা। ঐ ডাক্তারবাবু সেদিন এসে হাসতে হাসতে ঘাটের উদ্বোধন করবে বিরাট সভায়।'

'হ্যাঁ, এর মধ্যে মুখপোড়া ডাক্তারটা যদি হাতেনাতে আমাদের না পাকড়াতে পারে।' বলতে হয় আমাকে।

'আর পাকড়ে ধরে বেঁধে যদি একতাল কুইনিন না খাইয়ে দেয়—'

'কিংবা ইটেনাস ইনজেকশন'···বলে বিষ্টু সুকুল।

'ইটেনাস নয়, টিটেনাস।' আমি ওকে শুধরে দিই।

জগবন্ধু যোগ দেয়, 'আর ওই দুয়ের বদলে ভুলে জোলাপ দিয়ে দিলেই তো হয়েছে! তা হলে দিনভোর প্রাতঃকৃত্য করতে করতেই আমাদের টেঁসে যেতে হবে শেষটায়!'

অঙ্কের ঘণ্টার স্যার আসতেই আমরা যেন মিইয়ে পড়ি। কেমন যেন অসাড় বোধ করি সব্বাই!

কিন্তু জীবন অসার বলে বোধ হলেই ইস্কুল তো আর অসার হয় না। অন্তত অঙ্কের স্যার ছাড়া ইস্কুল ভাবাই যায় না কখনো।

অঙ্কে কেউই আমরা তেমন পাকা নই। আমি তো কাঁচকলার মতোই কাঁচা। অঙ্কের সারকে দেখলেই আমার বুক কাঁপতে থাকে।

অঙ্কের স্যার এসেই টেবিলের ওপর সপাৎ করে বেতটা নামিয়ে বললেন—'দেখি তোমাদের হোমটাস্‌ক।'

যারা যারা করে এনেছিল টেবিলের ওপর জমা রাখল খাতা। চার‍ু মোটেই নড়ল না, বেঞ্চে নিজের জায়গাটিতে জমাট হয়ে রইল।

'তোমার খাতা কই?' অঙ্কের স্যার শ‍ুধালেন।

'সময়ই পেলাম না স্যার আঁক কষবার।' বলল চার‍ু, 'তা হলে চেয়ার হবো? হই?'

'টাস্‌ক যখন করোনি তখন তো হতেই হবে চেয়ার।' অঙ্কের স্যার বললেন।

বলতে না বলতে চার‍ু তৈরি। চেয়ার হয়ে বসেছে।

না, চেয়ারে বসেনি ঠিক। তবে চেয়ারে বসলে যেমনটা হয় প্রায় সেই রকমই—কেবল, চার‍ুর তলায় কোনো চেয়ার নেই এই যা! নিজেই সে যেন একটা চেয়ার! একেবারে পারফেক্ট!

চেয়ারম্যান বলতে চার‍ু! আমরা অবাক হয়ে নিখ‍ুঁতভাবে উপবিষ্ট চার‍ুর সেই চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকি। আর মনে মনে তারিফ করি তার। এমন স‍ুচার‍ু আর হয় না।

চেয়ার হয়ে দ‍ু হাত পেতে বসে চার‍ু—কন‍ুই দ‍ুমড়ে হাত দ‍ুটো উঁচু করে। তার প্রসারিত দ‍ুই হাতের তেলোয় দ‍ুখানা ইট বসিয়ে দিই। হ্যাঁ, ম‍ুক্তহস্তে ইট নিতে চার‍ু ওস্তাদ! দ‍ু-হাতে দ‍ুখানা থান ইট ধরে কী করে যে সে ভারসাম্য বজায় রাখে সেই জানে!

আমরা তো এমনিতেই উল্টে পড়ি—ইট হাতে না নিয়েই। খানিকক্ষণ চেয়ার হয়ে থাকবার পরেই তো আমি কুপোকাত! তার ওপরে ইট চাপালে তো কথাই নেই।

কিন্তু কেউ উল্টে পড়লেই অমনি তার ওপরে সপাৎ! বেতের ঘা খেতেই না, চিতপাত দশা থেকে উঠে তক্ষ‍ুনি সে আবার চেয়ার হয়ে বসেছে!

আমাদের সবাইকেই চেয়ার হতে হয় একে একে। কেউ আঁক পারেনি, কেউ পারলেও ভুল পেরেছে, কেউ হোমটাস্‌কের খাতাই আনেনি একদম। বাধ্য হয়ে সবারই সেই এক দশা।

ক্লাস ঘরের সব জায়গা জ‍ুড়ে সারি সারি চেয়ার শোভমান।

'কি করে যে রোজ রোজ এত এত ভুল হয় তোমাদের!' আফশোস করেন অঙ্কের স্যার—সারবন্দী চেয়ারদের দিকে তাকিয়ে।—'কিছ‍ু তোমাদের মাথায় ঢোকে না দেখছি।'

'ইস্কুলে চেয়ার হবার ভাবনাতেই তো মাথার ঠিক থাকে না।' আমি তাঁকে বলি, 'তাই আঁকের ভুল হয়ে যায় স্যার।'

'ভুল তো হবেই জানি, তাই আমি আর আঁক কষতেই যাই না।' জানায় চার‍ু, 'তাছাড়া, প্র্যাকটিস করেই সময় পাই না একদম।'

'এতো প্র্যাকটিস করো তবু অংক ঢোকে না তোমার মগজে! আশ্চর্য!' বলে ঘণ্টা পড়তেই তিনি বেরিয়ে যান ক্লাস থেকে।

আমরাও একে একে উঠে পড়ি। চারু কিন্তু চেয়ার হয়েই বহাল থাকে। উঠবার নামটি নেই।

'স্যার চলে গেছেন রে! বসে আছিস যে তবু?' আমরা বলি। ও কিন্তু চেয়ারম্যানি ছাড়তে চায় না। পরের স্যার না আসার আগে অবধি অমনিভাবে বসে থাকে ঠায়।

'বেশ লাগছে আমার।' বলে চারু, 'বোধ হচ্ছে এটা কোন উচ্চাঙ্গের যৌগিক ব্যায়াম হবে—ভারী ফুর্তি লাগছে ভাই!'

'তা হলে আমারও একটু ফুর্তি লাগুক!' বলে আমি এগিয়ে যাই—'তোর চেয়ারে তা হলে বসি আমি একটুখানি আরাম করে।'

'বসতে পারিস স্বচ্ছন্দে। সাবধানে বসিস কিন্তু। চেয়ারের পেছনদিকের পায়া দুটো নেই মনে রাখবি। হেলান দিসনি যেন।'

কিন্তু অত কথা মনে রাখলে চেয়ারে আরাম করে বসা যায় না। চেয়ারে হেলা করে হেলান না দেয়ার কোন মানে হয় না। আর চেয়ারে বসে যদি আরাম না হলো তো হলো কি!

'কেন, তুই তো বেশ আরাম করেই বসেছিস - আকাশে হেলান দিয়ে।' আমি বললাম, 'আমিও অমনি আরাম করেই বসলাম না হয়।'

কিন্তু চেয়ারের পিঠে এলিয়ে বসতে গিয়ে দুজনেই চিতপটাত!

'চেয়ারম্যানের উপরে চেয়ারম্যান নিয়ে প্র্যাকটিস করিনি তো কখনো।' বলে একটু বোকার মতন হাসে অপ্রতিভ চারু। নিজে উঠে আমাকেও তোলে মাটির থেকে।

'এমনি হয় না রে, রিহার্সাল দিতে লাগে। অনেক কসরত করতে হয় আগে। নইলে স্টেজে গিয়ে কি কেউ কখনো পার্ট করতে পারে ভালো করে?'

'তোর পার্ট তুই জানিস! আমার তো হার্টফেল করছিল।' গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলি।

পরদিন সাত-সকালে চারুর বাড়ি গেছি—ওর খাতার থেকে আজকের টাস্কের আঁক টুকলিফাই করতে। গিয়ে দেখি···অবাক কাণ্ড! একী! অংকের স্যার নেই, কেউ নেই, ঘরের মধ্যে চেয়ার বনে বসে আছে চারু!

'এ কী রে! এ আবার কী রে!' আবাক হয়ে শুধাই।

'প্র্যাকটিস করছি ভাই! প্র্যাকটিস না করলে কি হয়! সব জিনিসেরই প্র্যাকটিশ লাগে—রীতিমত অভ্যাসের দরকার।'

'অঙ্ক টঙ্ক করিসনি? আমি যে তোর খাতার থেকে টুকে নিতে এলাম রে।'

'কি করে করব। আর করেই বা কি হবে! সেই তো কেলাসে গিয়ে চেয়ার হতে হবেই কিন্তু একটু খুঁত থেকে যাচ্ছে ভাই!' বলে সে খুঁতখুঁত করে।

'কিসের খুঁত ?'

'ইট এনে রেখেছি, কিন্তু হাতের ওপর বসিয়ে দেবার লোক পাচ্ছি নে কাউকে। ভারসাম্য থাকছে না তাই। নিখুঁতটি হচ্ছে না ঠিক।...তুই এসে ভালোই হলো, ইট দুটো আমার হাতে চাপিয়ে দে না ভাই !'

আমি ওর দুহাতে ইট দুখানা ধরিয়ে দিয়ে বলি—'ভালো শখ তো ! এমনি এমনি সাধ করে কেউ চেয়ার হতে যায় নাকি !'

'আগের থেকে রিহার্সাল না দিলে কেউ স্টেজে গিয়ে দাঁড়াতে পারে কখনো ? বাড়ি এসে প্রাকটিস না করলে আমিও তোদের মতন উলটে পড়তাম কেলাসে, —চাবুক খেতে হোতো আমাকেও ! চাবুকে আমার ভারী ভয় ভাই। তাই দু'বেলাই প্র্যাকটিস করতে হয়। পড়বো, অঙ্ক কষবো কখন ?'

'তোর খুরে খুরে দণ্ডবৎ !' বলে ওর চেয়ারের দুই খুরোয় হাত ছোঁয়াই খুড়তুতো পায়ার ধুলো মাথায় নিয়ে ফিরে আসি।

ঘুমুলে নাকি সাড় থাকে না…

শুধু কি সাড়! ষাঁড় বাঘ কিছুই থাকে না বুঝি।

সেই কারণেই পণ্ডিতেরা ঘুমকে অসার ব'লে থাকেন, কিন্তু আমার মতে, ঘুমই হচ্ছে এই জীবনের সবচেয়ে সারালো জিনিস।

কিন্তু মশাই বলুন তো, জীবনের সেই সারভাগে যদি কোন ষাঁড় এসে ভাগ বসায়…সেটা কি একটা জীবন-মরণ-সমস্যাই হয়ে দাঁড়ায় না?

জীবন আমাদের ঘুমুতে ওস্তাদ! বিছানায় গড়ালো কি মড়া ও। দেখতে না দেখতে ওর নাক ডাকছে—শুনতে শুনতে দ্যাখো!

রাতভোর জেগে জেগে শুনতে থাকো ঐ কাড়া-নাকাড়া!

জীবনকে আমরা সাধলাম—যাবি দেখতে? শহর থেকে বয়স্কাউটরা এসেছে—ছাউনি ফেলেছে সিঙ্গিয়ার মাঠে—ক্যাম্প্-ফায়ার—আরে কত কি নাকি হবে আজ রাত্তিরে—যাস্ তো আমাদের সঙ্গে চল।

ঘাড় নাড়লো জীবন—'আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!'

'কী তোমার কাজ শুনি? কাল তো রোববার।'

'খেয়েদেয়ে যা কাজ—ঘুম লাগাবো।'

হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছুটি দিয়েছিলেন আমাদের। রাত দশটার মধ্যে ফিরলেই চলবে। দশ মানেই এগারো—আর যেখানে এগারো সেখানে বারোটা বাজিয়ে ফিরলেও দেখবার কেউ নেই। সুপার কিছুতেই অত রাত অবধি জেগে থাকবে না—ঠিক সময়ে ফিরছি কিনা দেখবার জন্যে। এতগুলো সুযোগ সুবিধা জীবনে কবার আসে? আর, সবার সামনেই এগুলো সমভাবে উন্মুক্ত। জীবনের সামনেও উন্মুক্ত করা হলো। শুনে ও খুশি

হয়ে উঠলো—'তোরা কেউ থাকবি নে নাকি ? আঃ বাঁচা গেল বাবা ! তাহলে তো কোন ঝামেলাই নেই। তোফা একখানা ঘুম লাগানো যাবে।'

সিঙ্গিয়ার মাঠে যাবার পথে দেবীপুরের হাট। ভজুর মাসি বলেছিল সেখান থেকে এক ভাঁড় মধু যোগাড় করতে। সোনালী রঙের চাক-ভাঙা খাঁটি মধু। ভজু বললে যদি তার সাথে যাই তো সে একটু চাখতে দেবে আমায় তার থেকে।

এত মধুর কথা আমি ভজুর মুখে কোনদিন শুনিনি। শুনে মধুর লোভে হোস্টেলের ছেলেদের দঙ্গল ছেড়ে ভজুর সঙ্গ নিলুম। দেবীপুরের শনিবারি হাট তখন ভাঙো ভাঙো। সেই ভাঙা হাটে মধুওয়ালাদের খুঁজে বের করতে সন্ধে উৎরে গেল।

ভজুর মাসি থাকেন কলকাতায়, বোনের গাঁয়ে বেড়াতে এসেছেন—মধুর জন্যেই নাকি! কলকাতায় খাঁটি মধু বিরল। ঝোলা গুড়কে জল দিয়ে আর জ্বাল দিয়ে, ফেটিয়ে ফেটিয়ে আর ফুটিয়ে ফুটিয়ে আরো বেশি ঝুলিয়ে বোতলে ভরে মধু ব'লে চালানো হয়—দেখতে হুবহু মধুর মত হ'লেও তার সোয়াদ নাকি তেমন সুমধুর হয় না।

কে নাকি বলেছে ভজুর মাসিকে, বনগ্রামে মধু মেলে। আর তেমন মধু নাকি কোনখানে মেলে না। তাই বোনকে চোখে দেখার সাথে বন্য মধুর সোয়াদ চেখে দেখার লোভেই বোনের গ্রামে—এই বুনো গাঁয় তিনি এসেছেন।

এক ভাঁড় মধু কিনলো ভজু। আমি বললাম—'কই দে। চাখতে দিবি বলেছিলিস।'

'এখন কিরে ? এখন কী ? ফরমাসি মধু যে! মাসিমাকে আগে দিই! দিয়ে তার পরে তো ? তাঁর জার ভর্তি হবার পর ভাঁড়ের গায়ে যা লেগে থাকবে তার সবখানিই তো আমাদের। তোর আর আমার।'

জারের কথায় আমি ভারি ব্যাজার হলাম—'যা, রেখে দে তোর মধুর ভাঁড় তোর মাসির ভাঁড়ারে। চাইনে আমি চাখতে ফরমাসির মধু তোর for মেসো রেখে দেগে!'

তারপর ভাঁড় ঘাড়ে ক'রে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। হাট ভেঙে আমরা সিঙ্গিয়ার পথ ধরলাম।

ক'ষে হাঁটন লাগিয়েছি। কিন্তু কোশের পর কোশ পেরিয়ে গেল সিঙ্গিয়ার দেখা নেই। এদিকে কোশে কোশে ধুল-পরিমাণ! ধুলোর আর পরিমাণ হয় না। পাড়াগাঁর রাস্তা তো ?

এর মধ্যে সরু একফালি চাঁদ উঠেছিল। ভজু বললে—'চ, মেঠো পথ ধরা যাক। তাহ'লে আর এই ধুলো ঠেলতে হবে না। মাঠে মাঠে শর্টকাট ক'রে চলে যাওয়া যাবে বেশ।'

মেঠো পথে পা দিতেই চাঁদটাও যেন মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে

লাগলো। এই এক ছিরিক আলো, তার পরেই ঢালাও আঁধার। আলেয়া নেই বটে, তবে আলের গায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে নাজেহাল হলাম! একবার তো হোঁচোট খেয়ে নিজের ঘাড়েই গিয়ে পড়লাম। ঘাড়ে মধুর ভাঁড় ছিল, তার চোটে চল্‌কে উঠে জামায় পড়লো। এমন চটে গেলাম নিজের ওপর যে বলবার নয়। চটচটে হয়ে গেল জামাটা।

এমনিভাবে আরেকবার আলোর ওপর হুমড়ি খেতে গিয়ে কার যেন গায়ের ওপর পড়েছি।

পড়তেই আমি গাঁক ক'রে উঠলাম।

'ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছিস্ যে?' ভজহরি চেঁচায়।

'ও তুই! তোর গায়েই টাল খেয়েছি, তাই বল।' শুশ্রূষার ছলে আমি ওর গায়ে হাত বুলাই। 'যাই বল ভজু, খেয়ে না খেয়ে শরীরটা তুই বাগিয়েছিস বটে!'

আমার কথায় ভজু এবার গাঁক করে।

'ষাঁড়ের মত চেঁচায় না, ছিঃ!' আমি বলি—'জাঁক করবার মতন চেহারা পেয়েছিস—পেয়ে আবার গাঁক করছিস? আহা, তোর মতন এমন নধর দেহ যদি আমার হোতো রে ভাই'—বলতে বলতে (আর, বোলাতে বোলাতে) ওর লেজে আমার হাত পড়ে। বেশ লম্বা একখানা লেজ!

'আরে, এ কিরে! তোর আবার ল্যাজ হলো কবে? তুই ল্যাজ গজিয়েচিস —কই তোর লেজের কথা তো কোনোদিন আমায় বলিস নি? ঘুণাক্ষরেও না!'—ভজুর লেজম্বিতার পরিচয় পেয়ে হতবাক হতে হয়।

'ষাঁড়ের গোবর তোর মাথায়!' ভজু বলে—গাঁক গাঁক ক'রে।

(কিম্বা বলতে বলতে গাঁকায়।)—'যেমন ষাঁড়ের মতন বুদ্ধি, তেমনি হয়েছে ষাঁড়ের মতই গলা।'

ক্রমে ওর শিঙে হাত পড়তেই টের পেলাম যে ভজু নয়। ভজু ওরফে ষাঁড়। তখন আমি বলি—'আমি না ভাই, একটা ষাঁড়। ষাঁড়টাই আমার মতন ডাকছিলো।'

সেই সময়ে মেঘের ঘোমটা ফাঁক করে চাঁদামামা উঁকি মারেন, আর ষাঁড়চন্দ্র নিজমূর্তিতে দেখা দেন। আমি ভজুকে দেখাই—'এইটেই এতক্ষণ গাঁক গাঁক ক'রে আমাদের ভাষায় কথা কইছিলো। আর এইটেয় হাত দিয়ে—ষাঁড়টার এই সারাংশে—বুঝলি কিনা—আমি ভেবেছি যে, এটা বুঝি তোর ল্যাজ!'

ষাঁড়টা মাথা চালে। নিজের লেজে বারবার পরের হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করে না ব'লেই মনে হয়।

ওর মাথার চাল দেখে ভজু আমায় জিগ্যেস করে—'ওটা অমন করে মাথা খেলাচ্ছে কেন রে? মতলব কী ওর?'

'কী খেলছে ওর মাথায় ওই জানে !' আমি বলি—'তবে শুনেছি গুঁতোবার আগেই নাকি ওরা মাথাটাকে অমনি ক'রে খেলিয়ে দেয়—'

'অ্যাঁক্ ?' ষাঁড়ের মতই এক আওয়াজ, কিন্তু ষাঁড়ের নয়, ভজুর। আমার কথা শেষ হবার আগেই ভজু, কাছেই একটা যে গাছ ছিলো, তার ডালে লাফিয়ে উঠেছে। আমাকেও আর বলতে হয় না, আমিও ততক্ষণে আরেক ডালবাহাদুর হয়ে বসেছি দেখতে না দেখতে !

ষাঁড়টা তখন আমাদের কাছ ঘেঁষে আসে—গাছ ঘেষে দাঁড়ায়। গাছের গুঁড়িতে শিং ঘষতে থাকে। আর মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে তাকায় আমাদের দিকে। আর গাঁক গাঁক করে।

'মানে কি রে এর ?' ভজু জিগ্যেস করে।

'আমরা যেমন ধার বাড়াবার জন্যে ছুরিতে শান দিই নে ? ও তেমনি নিজের শিং শানিয়ে নিচ্ছে।

'গুঁ-গুঁতোবে নাকি রে ?' ভজু ভয়ে তোৎলা মেরে যায়।

'নি-নি-নির্ঘাৎ !'

'তাহ'লে সারা রাত দেখছি এই গাছের ডালে ব'সেই কাটাতে হবে আমাদের !' ভজু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। 'কোথায় সিঙ্গিয়ার মাঠ আর কোথায় এই-ই—য়া শিং ! কোথায় বয়স্কাউটের মেলা আর কোথায় এই ষাঁড়ের খেলা ! ভাবতে গেলে কান্না পায়।'

'তোর মধুর ভাঁড়টা দে তো আমায়।' আমি ভজুকে বলি 'ওকে একটু মধু খাইয়ে দেখি—যদি ওর রাগটা কিছু পড়ে। মধু খেয়ে মেজাজটা একটু মিষ্টি হয় যদি।'

তাক ক'রে খানিকটা মধু ওর মুখের ওপর ছাড়ি। ষাঁড়টা জিভ দিয়ে চেটে নেয় ; চেখেটেখে খুশি হয়েছে ব'লেই মনে হয়। ফের আবার হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে আমাদের পানে। আধ-চাঁদিনির আবছায়ায়—আবছা আলোয় স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না, তাহ'লেও সেটা ওর মধুর দৃষ্টিই যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাক করে ভাঁড়টা আমি হাঁকড়ে দিই ওর নাকের ওপর। ভজু হাঁ হাঁ করে ওঠে— 'এই এই ! করলি কি ? মাসিমার মধু যে, অ্যাঁ ?'

'মধুরেণ সমাপয়েৎ করলাম। বেঁচে থাকলে বহুৎ মধু পাওয়া যাবে ভাই, আর বিস্তর মাসি। কিন্তু বেঘোরে এখানে মারা পড়ে বাসি হয়ে গেলেও কেউ দেখবে না !'

ভাঁড়টা তাক ফসকে—তার নাক ফসকে—মাটিতে গিয়ে পড়ে। ভেঙে ছড়িয়ে যায় চারধারে। আর, ষাঁড়টা হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার ওপর। একহাত জিভ বার করে চাটতে থাকে।

ভজুকে বলি—'আর না ! আর দেরি নয়। এইবার যতোক্ষণ ও মধু নিয়ে মত্ত থাকবে সেই ফাঁকে আমরা সটকাই আয়।'

চট করে আমরা গাছ থেকে মেমে পড়ি। নেমেই ছুট!

কিন্তু ষাঁড়ের জিভ যে আমাদের চার ডবল তা কে জানতো? এক লহমায় সে ভাঁড়ের মধু খতম করে—মাঠের টুকুও চেটে নিয়ে আমাদের পিছু নেয়। গোরুদের সঙ্গে আমাদের গরমিল ঠিক এইখানেই। ওরা আলাদা জীব। কোথায় একটা ভালো জিনিস পেলে আমরা ধীরে সুস্থে তারিয়ে খাই, আর ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে তারপরে তারায়—যার নাম নাকি রোমন্থনে—চার পা তুলে আমাদের তেড়ে আসে।

'ষাঁড়টা বোধহয় গুঁতুতে আসছে, না রে—?' ছুটতে ছুটতেই ভজুকে বলি—'মনে হচ্ছে আরো মধু পাবার জন্যেই—'

'তোকে বলেছে!'

'এক ভাঁড়ে আর কী হবে ওর! এক জালা হলেও কিছুটা হোতো না হয়—'

পড়ি কি মরি ক'রে ছুটেছি। এটাকে, কবির ভাষায় বলতে গেলে, 'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে চন্দ্র ডোবে ডোবে। ষাঁড় ছুটেছে পিছু পিছু মধুর লোভে লোভে।' ছুটতে ছুটতে আমরা হোসটেলের এলাকায় এসে পড়লাম। তখনো কিন্তু পাষণ্ডটা পিছু ছাড়েনি।

'কী হ্যাংলা ভাই!' ভজু না বলে পারে না—'এমন আদেখলে ষাঁড় আমি জন্মে দেখিনি।'

আমি বলাম—'দাঁড়া, ষাঁড়টার সঙ্গে একটা চালাকি খেলা যাক' বলে, হোস্‌টেলের গা-লাগা যে চালাঘরে আমাদের কয়লা ঘুঁটে ইত্যাদি মজুত থাকতো, ভজুকে নিয়ে আমি তার ভেতরে গিয়ে সেঁধুই। বলা বাহুল্য, ষাঁড়টা সেখানেও আমাদের অনুসরণ করে। কিন্তু ঢুকেই না, আমরা ওদিকের জানালা দিয়ে গ'লে বেরিয়ে এসেছি বাছাধন সেটি আর টের পায়নি—বাছুরে বুদ্ধি তো! বেরিয়ে এসে আমরা এদিক থেকে বাইরের শেকল তুলে দিই—'থাকো বাবা, যাবজ্জীবন কারাবাসে—আজ রাত্তিরের মতন!'

ষাঁড়কে শৃঙ্খলিত করে আমরা শুতে যাই। কিন্তু শোয়া—ঐ নামমাত্রই! ঘুমের দেখা নেই। মুহুর্মুহু কানে যেন শূল বিঁধতে থাকে। বাপরে ষাঁড়টার সে কী ডাক! সিংহনাদ কখনো শুনিনি, কিন্তু ষাঁড়ের নাদ তার কোনো অংশে খাটো নয়, সেকথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

আটচালা ফুঁড়ে, হোস্‌টেলের পাকা দেওয়াল ফুটো করে আসতে থাকে সেই হাঁক। জীবন দুর্বিষহ করে তোলে (তখনও কিন্তু জীবন-দুর্বিষহের সবটা আমরা টের পাইনি!)।

ভোরে উঠেই প্রথম কাজ হলো ষাঁড়টাকে বার করার—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওঠবার আগেই। হোস্‌টেলের বাচ্চা চাকরটাকে ডাকলাম। তাকে আমরা মোষের পিঠে চড়ে বেড়াতে দেখেছি—অমন মোষের যে পৃষ্ঠপোষকতা করতে

পারে সে কি আর তুচ্ছ একটা ষাঁড়ের মোসাহেবী করতে পারবে না? মিষ্ট কথায় তাকে তুষ্ট করে, কি গায়ে হাত বুলিয়ে, কি যা করেই হোক সামান্য একটা ষাঁড়কে সায়েস্তা করা তার পক্ষে এমন কী?

'এই বংশী, চালাঘরের মধ্যে একটা ষাঁড় ঢুকে বসে আছে তাকে কায়দা করে বার করতে পারবি?'

'আট আনা হ'লে পারি।'

ভজু বললে, 'দু আনা।'

বংশী।—না, আট আনা।

আমি।—দশ পয়সা।

বংশী।—আট আনা।

ভজু।—চার আনা।

বংশী।—না বাবু, আট আনা চাই।

আমি বললাম—নারে, না, মোট-মাট সাড়ে চার আনা পাবি।

বংশী।—আট আনা। (বংশীর সেই এক কথা।)

ভজু। ছ'আনা—

আমি। সাড়ে ছ' আনা—(আস্তে আস্তে বাড়ানো আমার।)

ভজু যেন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলো—না না, আনাই। আট আনাই দেব, কিন্তু ষাঁড়টাকে বার করা চাই—

বংশী তখন লম্বা একটা বাঁশ নিয়ে এলো। তারপরে আটচালার পেছনে গিয়ে জানলা গলিয়ে সেই বাঁশ দিয়ে খোঁচাতে লাগলো ষাঁড়টাকে।

বংশী আর বংশ দু'জনে মিলে কি করলো তারাই জানে, একটু পরেই আমরা চালাটার এধার ফুঁড়ে একজোড়া শিং বেরুতে দেখলাম, তারপর সেই শিংয়ের পিছু পিছু গোটা ষাঁড়টাকেই বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। লেজ আর আওয়াজ একসঙ্গে তুলে—শিং নাড়তে নাড়তে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো পাষণ্ডটা। বেরিয়েই আর কোনো ধার না তাকিয়ে দুদ্দাড় এক ছুট লাগালো মাঠের দিকে।

আর আমাদের বংশী, সবংশে, ছুটলো তার পিছন পিছন—সে দৃশ্য দেখবার মতই।

কিন্তু এসবেরও বড়ো আরেক দ্রষ্টব্য ছিলো—সেটা দেখা দিল তারপরেই।

জীবন আমাদের বেরিয়ে এলো চোখ রগড়াতে রগড়াতে। ঘুঁটের ঘাঁটি সেই আটচালার আড়ত ভেদ করে। শিং দিয়ে ষাঁড়টা যে দরজা বানিয়েছিলো—সেই সিংদরজা দিয়ে এলো আমাদের জীবন। ষাঁড়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

'অ্যাঁ, তুই কি ছিলিস নাকি রে ওর ভেতর? ওই আটচালায়—সারারাত? অ্যাঁ?' অবাক হয়ে আমরা জীবনকে দেখি। আমাদের জীবনের অষ্টম আশ্চর্যকে।

'এই কি তোর ঘুম ভাঙলো নাকি রে ?' ভজু ওকে শুধোয়।

'ঘুমুতে পেলাম কোথায় ? আরামে যে একটু ঘুমুবো তার যো কি !' চোখ মুছতে মুছতে জীবন জানায় ঃ 'যা ঝড়বৃষ্টি গেছে কাল রাত্তিরে ! যত না বিষ্টি তার চেয়ে ঝড়—যতো না ঝড় তার ঢের বেশি মেঘের ডাক !'

'মেঘের ডাক —বলিস কিরে ?'

'বলছি কী তবে ? ভাবলুম যে, তোরা নেই, কোনো ঝামেলা হবে না। আরামে ঘুমুনো যাবে। কিন্তু হোসটেলে কি তোরা ঘুমুতে দিবি ? এগারোটার সময় ফিরে এসে হৈ-হল্লা লাগাবি সবাই—আমার সাধের ঘুমটাই মাটি করবি তখন। তাই ভাবলুম তার চেয়ে চলে যাই আটচালায়—কাঠকুটরো সরিয়ে - ঘুঁটেদের সরিয়ে হটিয়ে—মজাসে ঘুম লাগাই গে একখান।'……

'তা তা তোর বেশ ঘুম হয়েছিল তো ! ঘুমিয়েছিস তো ভালো করে ?'

'টের পাসনি কিচ্ছু ?' ভজুর কথা আমার কথার পিঠেই।

'ঘুম ? তা, ঘুম একরকম হয়েছে—কেন, কী টের পাবো, বলতো ?' সে একটু অবাক হয় !

'এই - এই একটু ইতর-বিশেষ ?' ভজু একটু ঘুরিয়ে বলে—'কারো হাঁক ডাক ?'

'বললাম কি তবে ? ঝড়বিষ্টি কি কম গেছে কালকে ? আর, কী বাজ-পড়া আওয়াজ রে ভাই ! আর ঝড়েরও কি তেমনিই দাপট ? হাওয়ার চোটে একগাদা ঘুঁটে এসে পড়েছে আমার ঘাড়ের ওপর—কখন যে, তার কিচ্ছু আমি টের পাইনি। সকালে উঠে দেখলাম সারা গায় ঘুঁটের লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। কিন্তু আওয়াজটা যা ! বাপ্‌স্‌ ! ঘুমের মধ্যেও হানা দিয়েছে আমায়। রাতভোর কী কড়াক্কড় ! এমন মেঘের ডাক জীবনে শুনিনি !'

জীবনের ঘুমকাহিনী (কিম্বা ঘুমের জীবনকাহিনী) হাঁ করে শুনি আমরা।

পরিত্যক্ত জলসা

"হরিনাথবাবু ক্ষেপেছেন আবার!" ফিসফিসিয়ে বললেন সেকেন পণ্ডিত।

হরিনাথবাবু আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার—এবং হেডমাস্টারের পক্ষে যতদূর ভালো হওয়া সম্ভব তিনি তার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ছেলেদের তিনি শাসন করতে জানেন না। অবিশ্যি, আর যারই হোক, এটা আমাদের—ছেলেদের দুঃখের বিষয় নয়। তবে ছাত্রদের তাড়না করবার প্রেরণা পান না বলে আর সব মাষ্টাররা আপসোস করেন। আপসোস করেন আর নিশপিশ করতে থাকেন, এমন কি, এ-স্কুলে মাস্টারি করে আর কী লাভ, এমন কথাও সময়ে-অসময়ে তাঁদের মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতে শোনা যায়।

এবার, কলকাতার শিক্ষক-সম্মেলনের ফেরতা হরিনাথবাবু নতুন এক আইডিয়া মাথায় করে এসেছেন। তাঁর মতে, আইডিয়া; অন্যান্য মাস্টারের মতে আরেক তাঁর খেয়াল। তাঁর ধারণায়, জীবনে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের সব উৎসাহ জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে। এইজন্যে মাঝে মাঝে এক আধটা জলসা হওয়া দরকার।

সেকেন পণ্ডিত বলেছেন—'এটাও তাঁর সেই ব্যাটবল খেলার মতই হবে।'

হ্যাঁ, এর আগের বারে তিনি ক্রিকেটের আইডিয়া নিয়ে ফিরেছিলেন। ঠিক মাথায় করে নয়, কিংবা মাথায় করে বললেই বোধহয় ঠিক হয়। এক রাজ্যের

উইকেট, বল, ব্যাট, পায়ে-পরা প্যাড ইত্যাদির বোঝা নিয়ে যখন তিনি ফিরলেন, তখন বলতে কি, আমাদের বেশ উৎসাহই হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল বলগুলো এক মণ করে ভারী, ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাত ব্যাথা হয়ে যায় আর তিন দিন ধরে সেই ব্যথা যথাস্থানে জমে থাকে, আর এধারে যতই কায়দা করে ছোড়াছুড়ি করো না কেন, উইকেটের এক মাইলের মধ্যে দিয়ে কিছুতেই তারা যাবার পাত্র নয়, তখন আমাদের সব উৎসাহ জল হয়ে গেল। তার ওপরে আবার ব্যাটের দুর্ব্যবহার রয়েছে, একজন ব্যাটকীপার—তা, ব্যাটকীপার ছাড়া আর কীই বা বলা যায়?—কখনো ব্যাট দিয়ে তো তাকে একখানা বলের প্রতিও বলপ্রয়োগ করতে দেখতে পাইনে—হ্যাঁ, একদিন একজন ব্যাটকীপার করল কি, আগন্তুক একটা বলকে হাঁকড়াতে না গিয়ে—বল তার দেড় মাইল দূরে দিয়ে যাচ্ছিল—নিজের মাথায় ব্যাট মেরে বসল। নিজের কপালে ব্যাটাঘাতেও তেমন কিছু যেত আসত না, কিন্তু করল কি, ঘুরতির মুখে, সেই ব্যাট দিয়েই উইকেটকীপারের এক পাশের এক গাদা দাঁত খসিয়ে দিলে। আমরা খুব চটে গেলাম। চটবই তো, আমাদের সন্দেহ হলো, হেডমাস্টার মশাই হাতে না মেরে এই ভাবে ব্যাটবলের সাহায্যে আমাদের দুরস্ত করছেন! দাঁতে মারছেন আমাদের! উইকেট আর ব্যাটকীপার দুজন সেই ধাক্কায় সেই যে শয্যা নিল আর তারা উঠল না। ক্রিসমাসের ছুটি পর্যন্ত তারা পাল্লা দিয়ে বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলে, তারপর তারা সেই ক্রিকেটের দৌলতেই ক্লাস প্রমোশন আদায় করে (আফটার অল ইট ওয়াজ নট ক্রিকেট!)—রুগ্ন শয্যা পরিহার করে লাফাতে লাফাতে বাড়ি চলে গেল। ফিরে এল ছুটি খতম করে নতুন বছরে—এসেই তারা ফের ক্রিকেট খেলার আগ্রহ দেখিয়েছিল, কিন্তু ক্রিকেট তখন কোথায়? আমরা যতো ব্যাট, বল, পায়ে বাঁধা প্যাডের বালিশ সবশুদ্ধু—(মাথায় যখন বলরা ব্যাটরা এসে লাগে তখন নাহক পায়ে বালিশ জড়িয়ে লাভ?—হতে হলে আপাদমস্তক বালিশবন্দী হতে হয়)—সর্বসমেত পদ্মার গর্ভে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেচি। বিস্তুতঃপক্ষে, ক্রিকেটকে, তারা দুজন ছাড়া আমরা কেউ যখন ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলুম না—ক্রিকেট নিজগুণে আপনা থেকেও আমাদের কারো কাজে লাগল না যখন—আর কোনো কারুকার্যই হলো না যেকালে ওকে দিয়ে—তখন আর অনর্থক গায়ের ব্যথা বাড়িয়ে ফয়দা?

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কি মনে হয় জানেন?' হেডমাস্টার মশাই অন্যান্য মাস্টারদের ডেকে জানালেন: 'এই রকম প্রায়শঃ জলসা প্রভৃতির দ্বারা কেবল যে ছেলেদের জীবনে উদ্দীপনা বাড়ানো হবে তাই নয়, এতে করে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রর সম্বন্ধ আরো মধুরতর আরো ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠবে। উভয়ের সদ্ভাবও বৃদ্ধি পাবে ক্রমশঃই।'

এই ছোট্ট বক্তৃতাটি দেবার পরই তিনি আমাদের ডাক করে একটা প্রশ্ন ছুঁড়লেন—'এখন তোমরা কে কি করতে পারো বলো দেখি?'

আমরা এতক্ষণ ধরে একজোট হয়ে তাঁর বক্তব্য থেকে জলসার ব্যাপারটা কিনারা করার তালে ছিলাম—জলসা হলেও জলের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, এমন কি, জলযোগের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই কোনো—না-যাত্রা না-থিয়েটার না-ভোজবাজি—অথচ সব কিছুর গরমিল এই বিষয়টা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে আসছিল তখন।

'আমি হয়ত গান গাইতে পারি।' সাহস করে আমি বললাম।

'আমরাও সেই ভয় করেছি' বললেন হরিনাথবাবু: 'বেশ, তুমিই তাহলে এই সব কাণ্ডের কর্মকর্তা হলে। তোমাকেই মনিটার করে দিলুম। তুমি যখন গান গাইতে পারো তখন তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। তুমি সব পারবে।'

তারপর তিনি আমাদের বাদবাকিদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে লাগলেন—'কী, তোমাদের কেউ হারমোনিয়ম বাজাতে জানো নাকি?'

'আমি সার, একটা টেনিসবল আমার দাড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি।' বলল ফটিক: 'হাত দিয়ে ধরা নেই, ছোঁয়া সেই, ভারী শক্ত।'

'আমি হারমোনিয়ম বাজাতে জানিনে বটে, তবে বাজাতে পারব।' বলল রহমান। -'যদি হারমোনিয়ম পাই আর সেটা যদি আমার হাতে বাজতে চায়।'

'কী বাজাবে?' হেডমাস্টার মশাই আগ্রহান্বিত হলেন: 'কোনো গৎ টৎ জানা আছে তোমার? কনসার্টের মত একটা কিছু না হলে জলসা জমবে কেন?'

'হ্যাঁ, গৎ জানি বইকি সার!' অম্লানবদনে জানালো রহমান: 'আকাশের চাঁদ ছিল রে! - এই গৎটাই আমি বাজাব।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলেন হরিনাথবাবু। 'ওইটেই কেন?'

'এই গৎটাই জানি যে।' বলল রহমান: 'এ ছাড়া আর কোনো গৎই আমার জানা নেই।'

'ওকে ওইটাই বাজাতে দিন সার। ও বেশ ভালোই বাজাবে।' ফটিক সায় দিয়ে বলল: 'ও কালো ঘরগুলোও বাজাতে পারে আমি দেখেছি। কালো ঘর বাজানো ভারী শক্ত। ঠিক দাড়ির ওপর বল রাখার মতই সার।'

ছোট্ট মুকুল, এক পাশ থেকে বলে উঠল হঠাৎ: 'আমি বেশ ভালো হাঁস ডাকতে পারি কিন্তু।'

'দেখাও আমাদের'—হুকুম করলেন হেডমাস্টার।—'ডেকে দেখাও।'

মুকুল একে ছোট্টো তার ওপরে একটু লাজুক, সহসা এই আক্রমণে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। কোনো শিল্পীকে যদি তড়িঘড়ি তার শিল্পসাধনার পরিচয় দিতে হয়—নিজ-নৈপুণ্য প্রকট করার যতই বাসনা তার থাক না এবং যত বড় শিল্পীই হোক না কেন, স্বভাবতঃই একটু না ঘাবড়ে গিয়ে পারবে না।

মুকুল হাঁস ডাকতে ইতস্তত করে।

'কই, তোমার হাঁসের ডাক শুনি।' হেডমাস্টার মশাইও ছাড়বার পাত্র নন—শোনার জন্য তিনি হাঁসফাঁস করতে থাকেন।

'প্যাঁক্—প্যাঁক্—প্যাঁক্'—ডাকল মুকুল। ডাকতেই লাগল। এবং একবার কোনো শিল্পী উসকে উঠলেই মুশকিল! তখন তার প্যাঁক প্যাঁকানি আর থামানো যায় না।

'থামাও তোমার হাঁসের বাদ্যি।' ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন হেডমাস্টার।

যাই হোক, কোনো রকমে একটা প্রোগ্রাম তো খাড়া করা গেল—

—সম্মিলিত জলসা—

হেডমাস্টার মহাশয়ের : বক্তৃতা

শ্রীমান মুকুল মৈত্র : হাঁসের ডাক

হেডমাস্টার মহাশয়ের : বক্তৃতা

রহমানের হারমোনিয়ম কনসার্ট :

('আকাশের চাঁদ ছিল রে!')

ফটিক চন্দ্রের : ম্যাজিক

(হাতে ধরা নেই, ছোঁয়া নেই, ভারী শক্ত!)

—ইনটারভ্যাল—

চকরবরতির গানের গুঁতো :

'সেথা আমি কী গাহিব গান!'

সেই সঙ্গে

রহমানের হারমোনিয়ম-সংগত

('আকাশের চাঁদ ছিল রে!')

ফটিক চন্দ্রের পুনশ্চ ম্যাজিক

শ্রীমান মুকুল মৈত্র : আরো হাঁসের ডাক

হেডমাস্টার মহাশয়ের আবার বক্তৃতা

অবশেষে

বন্দে মাতরম্

মনিটার হিসেবে জলসার উদ্যোগ-আয়োজনের সব ভার আমার ওপর। জলসার জন্য আমাদের ছোট্ট টাউনের একমাত্র সিনেমা হাউসটি আমি ভাড়া করে ফেললাম। কিন্তু মুকুল বললে : 'এই ছোট্ট হলে আমাদের সবাইকে ধরবে না সার।'

মুকুল অবিশ্যি খুব ছোট্ট আর আমি নিশ্চয়ই খুব বড়ো, ফাসট ক্লাসেই পড়ি যখন, তবু মুকুলের এই অপ্রত্যাশিত সম্বোধনের সারাংশে সদ্যলব্ধ মনিটারির আত্মপ্রসাদে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। কিন্তু ও-ছাড়াও, মুকুলের মন্তব্য অন্য দিক দিয়েও সারগর্ভ বইকি! ঠিক কথাই বলেছে ও, কিন্তু সারা টাউনে এইটি এক মাত্র পাবলিক হল—অথচ এর মধ্যে স্কুলের আদ্ধেক ছেলেকেও গুঁতোগুঁতি করে আঁটানো যায় কিনা সন্দেহ।

সমস্যাটা হেডমাস্টার মশায়ের কাছে এনে নিবেদন করা হলো!

তিনি বললেনঃ 'তাতে কি হয়েছে? জলসা তো তা বলে বন্ধ করা যায় না। আদ্ধেক ছেলেই দেখবে—কি করা যাবে? কারা দেখবে, তোমরা নিজেদের মধ্যে লটারি করে ঠিক করে নাও না হয়।'

এ ব্যবস্থা, বলতে কি, ছেলেদের বেশ মনঃপূতই হলো। ছেলেরা লটারি করতে যেমন ভালোবাসে তেমন আর কিছু না। এমন কি ফুটবল খেলার গোলটা ঠিক ঠিক হয়েছে কিনা, সে বিষয়েও তারা রেফারির চেয়ে লটারির ওপরেই বেশি নির্ভর করে।

অবশেষে সেই জলসা-রজনী এল। প্রত্যেকেই উৎসাহে আগ্রহে অধীর। ফটিকচন্দ্র তার বলক্রীড়া নিখুঁত করবার আয়োজনে চোখ খইয়ে ফেলেছে। সন্ধে থেকেই সবলে সে শেষ-চেষ্টায় লেগেছে। মুকুল স্টেজের পেছনে গিয়ে নেপথ্য থেকে হংসধ্বনির রিহার্সাল দিচ্ছিল। আর রহমান এদিকে হারমোনিয়ম নিয়ে (সাদা কালো সব ঘরেই সে হাত চালাতে সমান ওস্তাদ) ক্ষেপে উঠেছিল —'আকাশের চাঁদের' ভেতর থেকে সে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত সুর বার করে আনছিল যা কোনোদিন সে পারবে বলে আশা করতে পারেনি। চলতি সিনেমার যাবতীয় চালু সুরকে সে ওই একটামাত্র গতের মধ্যে একসঙ্গে আমদানি করতে পেরেছিল—বলতে কি!

আমার নিজের গানটাও এক আধ বার ভেঁজে নেবার দরকার ছিল কিন্তু রহমানের অত্যাচারে তার ফাঁক পাচ্ছিনে একটুও। রহমান রপ্ত করেই চলেছে, ওর সুরের আমদানি-রপ্তানির বহরে এধারে আমার প্রায় যায় যায় অবস্থা। ওর সংগতের সঙ্গে আমার সংগীত যে কি করে খাপ খাওয়াবো তাই ভেবে আমি কাহিল হচ্ছি। আমার গানের সাথে, রচনার ভাষাতেই, একটু সাফাই দেয়া আছে এইটুকুই যা আমার সান্তনা।···

সবাই কৌতূহলে উদ্দীপ্ত, হেডমাস্টার মশাইও কারো চেয়ে কিছু কম নন, কিন্তু সমবেত দর্শকদের মধ্যে কেমন যেন স্পৃহার অভাব! কি রকম যেন মনমরা ভাব! এমন একখানা জলসা—এখানে এই শতাব্দীতে এই প্রথম—তার সঙ্গে জলযোগের কোনো সম্পর্ক নাই বা থাকল, তা বলে ছেলেদের স্বভাবসুলভ উৎসাহ লোপ পাবে, এই বা কি কথা?

ছেলেরা ম্রিয়মাণ মুখে একে একে সিনেমা হলে ঢুকছিল। ঠিক যেমন করে পাঁঠারা খাঁড়ার তলায় এসে দাঁড়ায়। তাদের হই হুল্লোড় কিচ্ছু নেই, টিকিট করে সিনেমা দেখার সময়ে অন্তত যতটা দেখা যায় তার একশ ভাগের এক ভাগও এই বিনে-পয়সার জলসার বেলায় কেন দেখা যাচ্ছে না, এটা একটা বিস্ময়ের বিষয় বলেই বোধ হতে লাগল।

ব্যাপারটা কি, জানতে আমি উদগ্রীব হলাম।

হেডমাস্টার মশায়ের দৃষ্টি যে অতিশয় তীক্ষ্ন তা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর নজরেও এটা যেন কেমন খোঁচাচ্ছিল। তিনি মুখে কিছু বলছিলেন না বটে,

কিন্তু একটা প্রশ্নপত্র চোখে নিয়ে ঘুরছিলেন। অবশেষে সেকেন পণ্ডিতকে সামনে পেয়ে তিনি আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। খচ খচ করে উঠলেন।

'কী হয়েছে মশাই? ছেলেরা সব মুখ কালো কালো করে আসছে কেন এখানে? লটারিতে কি তাহলে কোন গোলমাল—?'

'কিছু না। গোলমাল কি হবে? লটারিতে গোলমালের কি আছে?'

'যাক, তবু ভালো।" দিলদরিয়া একখানা হাসিতে হরিনাথবাবুর সারা মুখ ভরে গেল: 'লটারিতে কোনো ত্রুটি হয়নি যে তবু ভালো। আপনার ওপর যখন লটারির ভার দিয়েছিলাম তখনই জানি সুষ্ঠুভাবে ওটা আপনি সুসম্পন্ন করবেন। যাক, কারা কারা লটারি জিতেছে দেখা যাক এবার।'

'আজ্ঞে, আপনি একটু ভুল করছেন মশাই।' হেডমাস্টারের কানে কানে ফিসফিস করলেন সেকেন পণ্ডিত, সে ফিসফিসানি আমার কান অবধি এসে গড়ালো।—'লটারি-জেতারা কেউ নেই এর ভেতর। তারা সবাই হোসটেলে বসে পিকনিক করছে এখন। এরা সব লটারি-হারার দল।'

আমি তখন বোর্ডিংএ থেকে ইস্কুলে পাড় ফাস কেলাসে।

একদিন শীতের সকালে বোর্ডিংয়ের উঠোনে কয়েকজনে মিলে আরাম করে বসে রোদ পোহাচ্ছি, এমন সময়ে বোর্ডিংয়ের সামনে রেলের এক পার্শেলভ্যান এসে হাজির! ভ্যান থেকে একটা লোক নেমে এসে খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করল—'সিটারাম চকরবর্তি বলে কেউ আছে এখানে?'

'না, সিটারাম কেউ নেই তবে শিবরাম বলে একজন আছে বটে।' আমি বললাম।

'না, সিটারামকে চাই।'

কেনরে বাবা, ধরে নিয়ে যাবে নাকি? সেই সময়ে গান্ধির আন্দোলনের হিড়িকে খুব ধরপাকড় চলছিল চারধারে। গান্ধিজীর দলের বলে সন্দেহ হলে ধরে নিয়ে পুরে দিচ্ছিল জেলে। ভ্যানে চাপিয়ে সটান আমায় জেলখানায় নিয়ে যাবে নাকি? জেলখানায় আর পাহারোলায় আমার ভারী ভয়। পাছে ধরে জেলে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দেয় সেই ভয়ে গান্ধিজীর ভলাণ্টীয়াররা যে পথে হাঁটে আমি সেদিকে পা বাড়াইনে। ভয়ে ভয়ে শুধালাম— 'কেন, কী দরকার সিটারামকে?'

'নেপাল থেকে রেলোয়ে পার্শেল এসেছে তার নামে হোম-ডেলিভারির।'

'কিসের পার্শেল?

'তা আমি বলতে পারব না। কোনো প্রেজেণ্ট হবে হয়ত।' লোকটা জানান দেয়।

প্রেজেণ্টের নাম শুনে আমার উৎসাহ জাগে। তখন ক্লাসের রেজেস্ট্রি খাতায় প্রেজেণ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন প্রেজেণ্ট আমাদের জীবনে নেই, কখনো আসেনি, তাই অপ্রত্যাশিত উপহার-প্রাপ্তির আশায় উল্লসিত হলাম।

'সিটারাম নেই তবে শিবরাম একজন আছে বটে এখানে।' আমি জানালাম 'আমিই সেই ভদ্রলোক। আমাকে দেবে তোমার প্রেজেণ্ট ?'

'শিবরাম ছিলিস বটে, কিন্তু এখন ত তুই সিটারাম।' বলল আমার এক বন্ধু 'আরাম করে বসে আছিস তো এখন। sit plus আরাম is equal to সিটারাম। 'তাছাড়া চক্রবর্তীতেও মিলে যাচ্ছে।' বলল আরেকজনা – 'ওরই নাম শিবরাম ওরফে সিটারাম চকরবর্তি, বুঝলে হে বাপু !'

'ওই হবে – ওতেই হবে।' বলে ভ্যানওয়ালা একটা রেলোয়ে রসিদের কাগজ আমার মুখের সামনে মেলে ধরল।—'আধঘণ্টা ধরে ঘুরে মরছি এই মহল্লায় তোমার খোঁজে। নাও, এখন দু টাকা দশ আনা বার করো, পার্শেলের রেলের মাসুলটা দিয়ে তোমার মালের ডেলিভারি নাও।'

বলে সে ভ্যান থেকে উত্তমরূপে প্যাক করা একটা পেল্লায় পার্শেল এনে খাড়া করল উঠোনের ওপর। বলল—'নাও, চটপট খালাস করো—মালটা গন্ধ ছাড়ছে বেজায়।'

'গন্ধ বেরিয়েছে মালের ? কিসের মাল গো ?' আমরা সবাই জানতে চাই।

'মাংস। মণ খানেক মাংস হবে। হরিণের মাংস বলে লেখা আছে পার্শেলে। পচে গেছে মাংসটা।' সে বলে।

'পচা মাংস নিয়ে আমরা কী করবো ?' আমার উৎসাহ নিভে আসে।

'হরিণ তো পচিয়েই খায় মশাই !' সংক্ষেপে সে জানায়।

'নিয়ে নে নিয়ে নে।' আমার বন্ধুরা উৎসাহ দিতে থাকে—'আজ শনিবার তো। কালকে ছুটি ! রাত্তিরে খাসা ফিসটি হবে এখন।'

'দিনের পর দিন ঘাস চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে পেটে তো চড়া পড়ে গেল। মুখ বদলানো যাবে আজকে।' বললে অন্যজন।—'নিয়ে নে মাংসটা। আড়াই টাকায় এক মণ, সস্তাই তো রে।'

'আড়াই টাকা নয়, দু টাকা দশ আনা।' মনে করিয়ে দেয় লোকটা।

'ওই হোলো। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।'

দু টাকা দশ আনা খসিয়ে মাল তো খালাস করা গেল। তারপর আমরা পার্শেলের পর্যবেক্ষণে লাগলাম। এই যৎসামান্য ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের কারো নামে এত বড় পার্শেল আসতে দেখিনি কখনো।

'নেপাল থেকে পাঠিয়েছে।' পার্শেলের গায়ের লেখা দেখে বলল একজন 'কী এক রানা নাকি। সেই পাঠিয়েছে।'

'রানা বলে আমার এক কাকা আছে, নেপালে চাকরি করে।' আমি জানাই : 'তার সঙ্গে ভারী ভাব ছিল আমার। অনেকদিন তাকে দেখিনি। আমার ছোট্ট কাকা।'

'তাহলে সেই হয়ত পাঠিয়েছে তোকে আদর করে।'

'এতো দেখছি রানা জং বাহাদুর।' খুঁটিয়ে দেখে আমি বললাম : 'আমার কাকা তো চকরবরতি হবে, সে বাহাদুর হতে যাবে কেন ?'

'নেপালে যে যায় সেই বাহাদুর হয়।' ছেলেটা ব্যাখ্যা করে দেয় : 'কিছুদিন থাকলেই নেপালী হয়ে যায় কিনা। যেমন আমাদের পশ্চিমা বন্ধুরা বাংলা দেশে থেকে বাঙালি বনে যায়, তেমনি। আর, নেপালী মাত্রই বাহাদুর। হতে হবে !'

'নেপালে যাওয়াটাই একটা মস্ত বাহাদুরি।' আরেকজনার মন্তব্য।

'আর জং ?' আমি জিগেস করি। এই প্রশ্নটাই সব চেয়ে জবর বলে আমার বোধ হয়।

'বেশিদিন বাহাদুরি করলেই জং ধরে যায় মানুষের।' তার জবাব। 'পুরনো লোহায় যেমন মরচে পড়ে।'

এর ওপর আর কথা নেই। জবর জং যা ছিল, সব জলের মতন পরিষ্কার।

তারপর আমরা জং ধরা সেই জেল্লাদার পার্শেলের প্যাকিং ছাড়াতে লাগি। লোহার পাতগুলো কেটে ছাড়িয়ে ফেলে চাড়া দিয়ে পেরেকগুলো তুলে শক্ত পাতলা কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে আস্ত একটা হরিণের শবদেহ বেরিয়ে আসে।

'ওরে বাবা ! এ যে অনেকখানিরে।' মাংসের চেহারা দেখে আঁতকে উঠতে হয় আমাদের।—'এত খাবে কে ?'

'কেন, আমাদের হোস্টেলে রাক্ষোস কি কম নাকিরে ?'

'তাহলে মনিটারকে ডাকি ? রান্নার ব্যবস্থা করা যাক।' রাক্ষসদের একজন উৎসাহ দেখায়, মনিটারকে ডাকতে যায়।

'আচ্ছা, মনিটারকে দিয়ে এটা হেস্টেলে গছিয়ে দিলে হয় না ?'···আমি বলি : 'মানে, বেচে দিলে কী হয় হোস্টেলে ? খাওয়াও হয়, আবার সেই সঙ্গে দুটো পয়সাও আসে। আমার কাকা যখন আমায় পাঠিয়েছে···'

'বারে, খাচ্ছিস তো পেট ভরে ! পয়সা চাচ্ছিস আবার ?'

'সে তো সবাই খাচ্ছে—যাদের কাকা পাঠায়নি তারাও। আমার কাকার পাঠানোটা কি তাহলে ফাঁকা হয়ে যাবে ?' আমি প্রকাশ করি।

'তাছাড়া, আমরা বামুনের ছেলে ভেবে দ্যাখ। খাওয়ার সঙ্গে আমাদের দক্ষিণে-টি চাই বাবা ! আমি বরং কিছু লাভ নিয়ে মনিটারকে বেচে দিই। মনিটার আবার তার ওপর আরো কিছু বসিয়ে হোস্টেলকে ধসাক।'

ছোটবেলার থেকেই ব্যবসা-বুদ্ধিটা আমার বেশ প্রখর।

মনিটার আমাদের সঙ্গেই পড়ে। ফাস কেলাসের ছেলে এবং ফাস্ কেলাস

ছেলে। পড়াশোনায় ভালো, ক্লাসে ফার্স্ট হয়। বোর্ডিং-এ ওর হাফ ফ্রি। হোস্টেলে আমাদের খবরদারী করা ওর কাজ। আমাদের খবরাখবর—মানে, কে পড়ছি না পড়ছি, কি করছি না করছি তার সব বার্তা হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কানে পেঁছে দেয় সে।

মনিটার আসতেই আমি বললাম—'দ্যাখ যোগেন, এই আস্ত হরিণটা নেপালের থেকে আমার কাকা আমাকে উপহার পাঠিয়েছে।'

যোগেন দেখল। চোখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে। তারপর বলল—'বিচ্ছিরি গন্ধ বেরিয়েছে কিন্তু!'

'হরিণ যে রে! হরিণ তো পচিয়েই খায়। জানিসনে?'

'শুনেছি বটে। তা আমি এই মৃতদেহ নিয়ে কী করব এখন?' যোগেন শুধায়ঃ 'পোড়াতে হবে নাকি? কি করে হরিণের সৎকার করে শুনি?'

'অতিথিসৎকার করে।' বলল উৎসাহী একজন।—'এটা হোস্টেলে দিয়ে রাঁধিয়ে ফিস্টি লাগা আজকে। আমাদের সবার সৎকার হয়ে যাক।'

'না না। এমনি দিয়ে নয়।' আমি বাধা দিয়ে বলিঃ 'কিনে নিতে হবে। মণ দেড়েক মাংস আছে। পনের টাকায় ছাড়তে পারি। তাহলেও হোস্টেলের লাভ, ভেবে দ্যাখ তুই। চার আনা করে সের পড়ল মোটে। চার আনায় কি মাংস পাওয়া যায়? তার ওপর হরিণের মাংস?'

হরিণ দিয়ে ওকে কতোটা আমার ঋণপাশে আবদ্ধ করেছি সেটা ভালো করে বোঝাবার জন্য আরো আমি প্রাঞ্জল হই—'হরিণ খেতে পাওয়া দূরে থাক, চোখে দেখতে পায় কটা লোকে? কি রকম লাল রঙের মাংসটা দেখেছিস? লাল মাংস দেখেছিস কখনো?'

বলতে গিয়ে লালসার উদাহরণস্বরূপে আমার মুখ দিয়ে লাল পড়ে যায়। সুরুৎ করে সেটাকে টেনে নিয়ে আমি বললাম—'তুই কিনে নে নাহয়। তারপর পনের টাকায় কিনে এর ওপর আরো কিছু লাভ চড়িয়ে পঁচিশ টাকায় বেচে দে নাহয় বোর্ডিংকে।'

ওকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা পাই।

'হোস্টেল এই লাশ কিনতে যাবে কেন? হোস্টেলের কি খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই!' সে বলে।

'তাহলে তুইই এটা কিনে নিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অমনি দিয়ে দে। প্রেজেণ্ট করে দে নাহয়।'

'আমার লাভ?'

'তোর পনের টাকা এখন যাবে বটে, কিন্তু তেমনি মাস মাস তিরিশ টাকা করে বেঁচে যাবে। হাফ ফ্রি তো তোর আছেই। তার ওপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খুশি হলে পুরো ফ্রি হয়ে যেতে কতক্ষণ? তাছাড়া আরো একটা সুবিধা তুই করতে পারিস—'

'কি সুবিধা ?'

'আরে, এই তো তোর মোকারে ! পুরনো হেডমাস্টার বদলি হয়ে নতুন হেডমাস্টার এসেছে ইস্কুলে কদিন হলো। এখন যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন করে হোস্টেলে এনে খুব কসে খাওয়ানো যায় আর তিনি যদি জানতে পারেন—মানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই নিশ্চয়ই তাঁকে বলবেন তোর বাড়ির থেকে মাংসটা পাঠিয়েছে আর তুই সবাইকে ঘটা করে খাওয়াচ্ছিস তাহলে চাই কি তাঁর দয়ায় ইস্কুল ফ্রিটাও হয়ে যাবে তোর। আমি বিস্তারিত করি 'ভাই যোগেন, ডবোল গেন করবার এমন জো তুই ছাড়িস নে ভাই !'

যোগেন একটু চিন্তা করে। তারপর ছুট মারে সটান—'আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাইকে ডেকে আনিগে।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাশাই এসে দেখেন—'এ যে আস্ত একটা হরিণ দেখছি। চমৎকার ! কোত্থেকে এল ?'

'যোগেনের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে সার।' ও জো পাবার আগেই আমি বলে দি। যোগেন, ছেলে হিসেবে যতই ভালো হোক, মনিটার হিসেবে আমাদের কাছে একটা ডেভিল। কিন্তু যখন পনের টাকা দিচ্ছে তখন তাকে তার due দিতে হবে বইকি।—'ও এটা আপনাকে উপহার দিতে চায়।'

ডেভিলকে তার ডিউ দিয়ে আমার ডিউটি করলাম।

শুনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখ লালসায় লাল হয়ে ওঠে—মাংসটার মতই টকটকে। মুখ থেকে লাল ঠিক না পড়লেও লালায়িত হয়ে তিনি বললেন—'তা বেশ বেশ। অনেকখানি মাংস আছে এটার।'

'মণ দুয়েক তো হবেই সার।' যোগেন বলল।

সুপারের ভ্রূকুঞ্চিত হলো, একটু যেন দোমনা দেখা গেল তাঁকে।—'না, দুমন নয়। তা, দুমন ঠিক না হলেও এক মণ ত বটেই।'

হরিণটাকে তিনি একমনে পর্যবেক্ষণ করলেন।

'এখনই এটাকে পুঁতে ফেলার দরকার।' জানালেন তিনি। 'গর্ত খোঁড়ো সবাই মিলে।'

'পুঁতে ফেলবেন ?' শুনে আমরা দমে গেলাম। 'পুঁতে ফেলবেন কেন সার ?'

গোর দেওয়া তো পোড়ানোরই নামান্তর—আমার মনে হলো। ওইভাবে হরিণটার শেষকৃত্য করবার প্রস্তাব আমাদের মনঃপূত হয় না।

'তা, মাসখানেক তো পুঁতে রাখা দরকার। ভালো করে না পচলে হরিণের মাংস তেমন উপাদেয় হয় না নাকি।'

'এমনিতেই বেশ পচেছে সার। কদিন ধরে আসছে নেপাল থেকে। যা পচা গন্ধ ছেড়েছে ! আবার কেন ওটাকে পুঁততে যাবেন ?' যোগেন বলে।

'যথেষ্ট পূতিগন্ধ বেরিয়েছে সার।' আমি যোগ করি। 'আর নয়!'

'তা বটে। গন্ধটা বেশ জবর রকমের বটে।' বলে তিনি নাকে রুমাল চাপা দিলেন—'তা যোগেন, তুমি এটা আমাকে উপহার দিতে যাচ্ছ কেন?'

'আপনাকে উপহার দেওয়া সার, তার মানে আমাদের নিজেদেরই দেওয়া।'

ওর হয়ে আমাকেই বলে দিতে হলো আবার—'দেবতাকে যেমন পুজো দিয়ে প্রসাদ পায় মানুষ। আর, আপনার সঙ্গে এই সুযোগে আর সব মাস্টারকেও আমাদের পুজো দেওয়া।'

বলে, তার পরে হেড করে বলটাকে গোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে যাই—'তা ছাড়া, আমাদের নতুন হেডমাস্টার মশাই এসেছেন। যোগেন চায় যে, মানে আমরা সবাই চাই, আপনি আমাদের হয়ে হোস্টেলের ফিসটে তাঁকে নেমন্তন্ন করুন।'

'তাহলে এই ভোজটা আমরা হেডমাস্টার মশাইয়ের সম্বর্ধনা-উৎসব বলেই ঘোষণা করি না কেন?' উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন।

'মানে তাঁর জন্যেই আমাদের এই প্রীতিভোজ।'

'সেই তো আমরা বলতে চাইছি সার। শুধু ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারছি না কেবল।' আমি বলি—'এই সুযোগে নতুন হেডসারের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হবে। সেটা মধুরেণ সমাপয়েৎ করেই শুরু করা উচিত নয় কি? আপনিই বলুন সার?'

'তাহলে বেশ। কাল রবিবার ছুটির দিন আছে। কাল দুপুরের মধ্যাহ্ন-ভোজে হেডমাস্টার মশাইকে হোস্টেলে নেমন্তন্ন করা যাক। সেই সঙ্গে আর সব টীচারকেও। কী বলো?'

'হাঁ সার। শিবহীন যজ্ঞ যেমন হয় না তেমনি শিবের সঙ্গে আর সব—'

বলতে গিয়ে আমি চেপে যাই। ভূতপ্রেত কথাটার উচ্চারণ করাটা ঠিক আমার অভিপ্রেত ছিল না।

'শিবের সঙ্গে আর সব দেবতাকেও আমাদের যজ্ঞস্থলে…'

যোগেন বলে। এতক্ষণে একটা যোগ্য কথাই বলে যোগেন।

'ডাকো ঠাকুরকে। হরিণের মাংস তো রোসট করে খেতে হয়। সে কি পারবে রোস্ট করতে? আস্ত রোসট করা দরকার।'

ঠাকুরকে ডেকে আনা হলো। দেখে শুনে সে বলল—'রোসট করতে পারি তো। কিন্তু গোটা হরিণ ধরবে এত বড় হাঁড়ি পাব কোথায়? তার চেয়ে বড় বড় টুকরো করে হাণ্ডিকাবাব বানিয়ে দিই না কেন? সেও খেতে খুব খাসা হবে বাবু।'

পরদিন দুপুরে সারি সারি পাতা পড়ল আমাদের খাবার ঘরে। টীচাররা বসলেন, আমরাও বসলাম। হেডমাস্টার মশাই বসলেন মধ্যমণি হয়ে।

পোলাও পড়ল পাতায় পাতায়। হাণ্ডিকাবাবের হাঁড়ি এসে নামল আমাদের সামনে। সৌরভে সারা ঘর মাত!

পাতে পাতে পড়তে লাগল বড় বড় টুকরো হরিণ-মাংসের। হেডমাস্টার মশাই এক গাল কামড়ে বললেন—'বাঃ! বেশ খাসা হয়েছে তো!'

'আরো খাসা হত যদি আরো কিছুদিন পচতে পেত।' বললেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

'তা তেমন না পচলেও সুপাচ্য হবে আমি আশা করি স্যর।' আমার নিজস্ব মত।

'আমিও একদিন খাওয়াব আপনাদের হরিণের মাংস।' হাসিমুখে বললেন হেড স্যর ঃ 'নেপালের এক রানার ছেলে আমার ছাত্র ছিল। সে একটা হরিণ আমায় রেল পার্শেল করে পাঠাবে বলে লিখেছে। দু চার হপ্তার মধ্যেই এসে পড়বে মাংসটা। খেয়ে দেখবেন তখন। নেপালের হরিণ খেতে আরো কত খাসা হয় দেখবেন তখন।'

শুনে আমার টনক নড়ল। হাত আর নড়ল না। পাতের মাংস পাতেই পড়ে রইল। অতি কষ্টে এক আধটু চাখলাম। আঁচানোর পরে যোগেনকে শুধালাম আড়ালে—'নতুন হেডসারের নাম কিরে? জানিস নাকি?'

'তোদের চক্রবর্তীই তো রে!' যোগেন জানায় ঃ 'শ্রীযুক্তবাবু সীতারাম চক্রবর্তী। এম-এ বি-এ—বি-টি। বাড়ি খানপুর।'

শুনে আমার চারধার খাঁ খাঁ করে, মুহূর্তের মধ্যে সব যেন খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে আমার সামনে।

পরদিন খুব ভোরে কাকচিল ডাকবার আগেই উঠে আমি হোস্টেল ছেড়ে পালালাম। ইস্কুলে ইস্তফা দিয়ে সটান গান্ধিজীর ভলাণ্টিয়ার দলে নাম লেখালাম গিয়ে।

এখন জেলে গেলেই আমার বাঁচান।

আমার নিখরচায় জলযোগের গল্প হয়ত তোমরা পড়ে থাকবে। কিন্তু জলযোগ করতে গিয়ে নিজেই খরচ হয়ে যাওয়ার মতন কাণ্ডও হয়। সেই প্রাণান্তকর জলযোগের এই গল্পটা।

আমরা ওঁকে 'একাদশী মুখুয্যে' বলেই জানতাম।

ওঁর এহেন নাম-ডাকের কারণ এই, কেবল দুটো দিন বাদ দিয়ে সারা মাসটাই উনি একাদশী করতেন। একাদশী—মানে একবেলা খেয়ে থাকতেন। এ বিষয়ে ওর রেকর্ড ছিল—পুরো আশি বছরের পাকা রেকর্ড। শুধু একাদশীর দুটো দিন বাদ যেত, সে দুদিন ছিল তাঁর অনাদশী—মানে একেবারে অনাহার।

উনি বলতেন ওতেই শরীর ভালো থাকে। একবেলা খেয়েও খাসা থাকা যায়। সুখে থাকা না হোক বেঁচে থাকার ওই যে প্রশস্ত উপায় তার প্রশস্তি ওঁর শতমুখে। সে কথার প্রতিবাদের সাহস কে করবে! কেন না তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ উনি নিজেই। যদিচ সেই অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আর ইহলোকে নাই। আমরা তাঁকে হারিয়েছি—এখন তিনি অতীতের গর্ভে। কিন্তু পঁচানব্বই বছর ত বেঁচে ছিলেনই, আকস্মিক দুর্ঘটনাটা না ঘটলে আরও পঁচানব্বই বছর যে কায়ক্লেশে টিঁকতেন না এমন কথা জোর করে বলা কঠিন।

শ্যামরতন বাবুর বাবা 'অকালে মারা গেছেন'। পাড়ার লোক শুধু খবরটাই পেয়েছিল, কিন্তু কি দুঃখে এবং দুর্ঘটনার ফলে যে তিনি অকস্মাৎ

দেহরক্ষা করলেন, যে মর্মন্তুদ কাণ্ড না ঘটলে তিনি কিছুতেই অমন কার্য করতে যেতেন না, তা কেবল আমিই জানি। আমি আর ঘন্টু। ঘন্টু ওঁদের পাশের বাড়ির—আমার সঙ্গে এক কেলাসে পড়ত—আলাদা ইস্কুলে। ওর কাছেই আমার শোনা!

যে জলের ছোঁয়া থেকে তিনি সাবধানে আত্মরক্ষা করে চলতেন, নিদারুণ সঙ্কটকালে সেই জলস্পর্শ করেই তিনি মারা গেলেন। জলের আস্বাদ জলের চেয়ে ভালো হওয়াই তাঁর অপমৃত্যুর কারণ।

জল যে তিনি একেবারেই পান করতেন না তা নয়, করতেন বইকি। কিন্তু সে সামান্যই—কিন্তু স্নান? একেবারেই না! স্নান করতে হলে জল ছাড়া আরও একটা জিনিস লাগে। তেল! তেল মাখতে হয়। জলে পয়সা খরচ নেই বটে, কিন্তু তেলে আছে। এ জন্যেই তিনি স্নান বর্জন করেছিলেন।

এইজন্যেই যে, সেটা আমাদের আন্দাজ। তাঁর ব্যাখ্যা অন্যরকম ছিল। সেটা জেনেছিলাম যেদিন রাস্তায় আমাকে ধরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপু, তুমি কি চানটান কর?'

আমি আর ঘন্টু দুজনে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে, রাস্তায় আমাদের মাঝে পড়ে তাঁর এই অদ্ভুত প্রশ্ন। আমি উত্তর দিই—'আজ্ঞে হ্যাঁ, করি বইকি।'

'প্রত্যেক মাসেই?'

'মাসে? হ্যাঁ, মাসে ত বটেই। সকালে নেয়ে খেয়ে ইস্কুলে যাই। আবার ইস্কুল থেকে ফিরেই ফের চান করি।'

তাঁর চোখ দুটো প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে—'ব-লো-কি?'

'বিকেলে ফুটবল খেলে ফের চান করি আবার।'

'য়্যা!' চোখ দুটো তাঁর ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসে।

'তবে রাত্রে আর করা যায় না, তখন ঘুমুই কিনা। কিন্তু সেই ভোরে উঠেই আবার যাই লেকে সাঁতার কাটতে। তাতেও অনেক সময় চান করা হয়ে যায়। কি করব?'

বহুক্ষণ তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হয় না। অবশেষে তিনি বলেন, 'কুপের দড়ি দেখেছ?'

আমরা ঘাড় নাড়ি।—'দেখেছি বই কি?'

'দুটো দড়ি কিনো; কিনে, একটা তুলে রাখ আর একটা দিয়ে অনবরত জল তোলো। দেখবে যেটা নির্জলা তোলা আছে সেটার অখণ্ড পরমায়ু; আর যেটা কেবল কুপে চোবানি খাচ্ছে, তার আর দেখতে হবে না—এই হয়ে এল বলে। আমি বাপু মোটেই চান করি না। দেখচ ত এই পঁচানব্বই বছরেও কেমন তাজা টনকো রয়েছি। আর তোমরা? পঁচানব্বইয়ের ঢের আগেই তোমরা পচে যাচ্ছ। কত বয়স তোমার? বারো? এই বারোতেই যা

বাড়াবাড়ি শুরু করেছ তাতে টিকলে হয়। বিরাশী পর্যন্তই পেঁছবে কিনা সন্দেহ! বিরাশী দূরে যাক, বাইশেই হয়ত টেঁসে যাবে।'

স্নানাহার বাঁচিয়ে এইভাবে তিনি বেঁচে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সেই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটল।

দুর্ঘটনাটা ঘটল ভোরের দিকেই।

রামরতন ও শ্যামরতন—পিতাপুত্রে শুয়েছিলেন একই শয্যায়—যেমন তাঁদের চিরদিনের অভ্যাস। এমন সময় রামরতনের পেটে কী যেন নড়ে উঠল।

নড়ে উঠল পেটের গর্ভে নয়, ভুঁড়ির পর্বতে। পর্বতের মূষিক প্রসবের মতই আর কি! বিস্মিত হয়ে রামরতন চোখ খুলে চেয়ে দেখেন—তাঁর পেটের ওপর এক ইঁদুরছানা। ইঁদুর দেখেই রামরতন তিড়িং করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ইঁদুরটাকে বাগিয়ে ধরলেন নিজের মুঠোয়। তারপর তার ল্যাজ ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে তাঁর আস্ফালন দেখে কে!

'য়্যাঁ? আমার ঘরে ইঁদুরছানা? ইঁদুর মানেই বেড়ালের আমন্ত্রণ। ইঁদুর থাকলেই বেড়াল আসবে, আর বেড়াল? বেড়াল মানেই মাছ আর দুধের বরাদ্দ। বেড়াল মানেই খরচান্ত! বটে? আমাকে ফাঁক করার মতলবে তোমার ঢোকা হয়েছে এখানে? বটে—?'

বিড়ম্বিত ইঁদুরটাকে ধরে সতেজে আর সলেজে তিনি ঘুরোতে থাকেন। ইঁদুরের সঙ্গে এই মুষ্টিযুদ্ধের অবকাশে, কি করে জানি না, অকস্মাৎ তিনি ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যান। তাঁর সেই প্রসিদ্ধ পদস্খলন! আকস্মিক পদস্খলন—কিন্তু অনিবার্যভাবেই ঘটে গেল; কিছুতেই তাঁকে থামাতে পারা গেল না। হয়তো ঘন্টুদের আশ্রমের থেকে কোনো মহাপ্রভু কলা খেয়ে খোসাটি দয়া করে একাদশীর বাড়ির দিকেই নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই খোসার থেকেই এই দশা!

মাথায় চোট লেগে একাদশী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ গেল, অনেক চেষ্টা হল, জ্ঞান আর হয় না। অগত্যা শ্যামরতন ভয়ে ভয়ে প্রস্তাবটা পাড়লেন—'ডাক্তার ডাকব নাকি?'

শ্যামরতনের মা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন—'সর্বনাশ! অমন কথা বলো না শ্যামু। তাহলে কি আর ওঁকে বাঁচানো যাবে বাছা? ডাক্তার এসেছে, ভিজিট দিতে হবে জানলে ওঁর আর জ্ঞান হতেই চাইবে না। তোমার বাবাকে কি তুমি চেন না বাবা?'

বাবাকে ভালো করেই চেনে শ্যামু। নিজেকে চেনে তারও বেশি। কাজেই পিতৃহত্যা পাতকের ভাগী হবার জন্য সে বেশি পীড়াপীড়ি করল না।

একাদশী গিন্নি বললেন, 'তার চেয়ে এক পয়সার চিনি কিনে আনো বরং। শরবত করে একটু খাওয়ালেই জ্ঞান ফিরবে। এক পয়সার বুঝেচ? বেশি নয় কিন্তু।'

পয়সার কথাটা কানে যাবার জন্যেই সম্ভবত একাদশীর জ্ঞান ফিরল। তিনি

হাঁ করলেন। সেই সুযোগে গিন্নি গেলাস নিয়ে এগুলেন—'এই টুকু ঢক করে গিলে ফ্যালো তো! গায়ে বল পাবে, সেরে উঠবে এক্ষুনি।'

একাদশী চমকে উঠলেন—'কি ও! দুধ নাকি?'

'রামচন্দ্র! দুধ দেব তোমায়? কী যে বলো তুমি।' গিন্নি হেসে উড়িয়ে দেন। 'দুধ আবার মানুষে খায়? দুধ দিতে যাব তোমাকে?'

'তবে কী? বেদানার শরবত?'

'ছি-ছি! অমন কথা মুখেও এনো না।' গিন্নি এবার মুখ ভার করেন।

'বার্লি নয় তো?'

'না গো না। ভয় পাচ্ছ কেন? বার্লি নয়, সাগু নয়, বেদনার রস নয়। তোমার পয়সা দেব জলে তেমন মেয়ে পেয়েছ আমায়? এখন ঢক্ করে এটুকু গিলে ফ্যালো দিকিন। জল। সামান্য একটু জল মাত্র।' গিন্নি ভরসা দেন।

'জল? ঠিক বলছ তো?' গিন্নির কাছে ভরসা পেয়ে একাদশী এক ঢোক খান—'কি রকম জল গা? মিষ্টি মিষ্টি লাগছে যেন। জল কি এমন মিষ্টি হয় নাকি? জল ত এ নয় গিন্নি!'

'ও কিছু না। শ্যামু একটু চিনি মিশিয়েছে জলে।' দুঃসংবাদটা তিনি আস্তে আস্তে ভাঙতে চান।

'য়্যা! কি বললে? কী বললে গিন্নি? জলে চিনি? এইবার তোমরা আমায় ডোবাবে। সত্যিই এবার পথে বসালে। এইবার আমি সর্বস্বান্ত হলুম। জলে চিনি? কী সর্বনাশ! য়্যাঁ? জলে চিনি? করলে কি গিন্নি? জলে চিনি? য়্যাঁ? জলে চি-চি-চি—'

বলতে বলতে একাদশী নিজেকে উদযাপন করলেন। সেই প্রথম শ্যামরতনবাবুর বাড়ি চিনি এল, কিন্তু চিনির সঙ্গে বাপকেও জলাঞ্জলি দিতে হবে, সামান্য জলযোগ যে এমন বিয়োগান্ত ব্যাপারে দাঁড়াবে একথা শ্যামরতনও ভাবতে পারেনি।

চিঁ চিঁ করতে করতেই মারা গেলেন শ্যামরতনবাবুর বাবা। আমাদের রামরতনবাবু। ডাকসাইটে একাদশী মুখুয্যে।

নরহরির স্যাঙাৎ

টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে উঠল পাশের ঘরে। সবে মাত্র ভোর তখন,—বিছানা ছেড়ে উঠতে তখনো আমার বেশ খানিক দেরি। তার ওপরে কাল রাত্রে এক নেমন্তন্নে বেজায় খাওয়াদাওয়া হয়েছিল, বেশিই একটু, তখনো তার রেশ কাটেনি। সেই অসভ্য সময়ে টেলিফোনের ডাকে লেপের মায়া কাটিয়ে উঠতে হলো।

'হ্যালো!' কণ্ঠস্বরটা একটু কড়াই হয়ে গেল বুঝি।

'হ্যা—লো!' নরহরির গলা কানে এলো। মিঠে হয়ে আর মোলায়েম হয়ে।

নরহরি উঠেছে এত সকালে! তাজ্জব! কাল রাত্রে নেমন্তন্ন-বাড়ি এত বেশি ও খেয়েছিল যে নড়াচড়ার শক্তি ছিল না ওর! নড়ানো চড়ানোও শক্ত ছিল ওকে। পাতার থেকে তোল্লাতুল্লি করে ওকে রিকশয় ওঠানো হয়েছিল—এবং রিকশ থেকে এক রকম ধরে বেঁধে, যেমন করে ক্রেন দিয়ে মাল তোলে জাহাজের, ঠিক তেমনি করে ওর বাড়িতে ওকে তুলতে হয়েছে।

'ওহে শোনো!' বললে নরহরিঃ 'এক বন্ধুকে আমি পাঠাচ্ছিলাম তোমার কাছে—তোমার সঙ্গে প্রাতরাশ করতে।'

'কার বন্ধু?' ঘুমের জড়তা ভালো করে তখনো আমার কাটে নি।

'আমার—আবার কার? হরেকৃষ্ণ পাতিতুণ্ডি, মোকাম জব্বলপুর। আজ সকালের গাড়িতে পশ্চিম থেকে তাঁর পেঁছবার কথা। এই এসে পড়লেন বলে। আমাকে তো ভাই বিশেষ জরুরি কাজে একটু বর্ধমানে যেতে হচ্ছে—এক্ষুনিই—কখন ফিরব—এমন কি কবে ফিরব তার স্থিরতা নেই। তোমার ওপরেই তাঁর দেখাশোনার ভার দিয়ে যেতে চাই। তোমার মত বন্ধু আমার আর কে আছে বলো?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও! আমাকেও যে—' আমারো যে গন্তব্যস্থল ছিল একটা, সুন্দরতরই ছিল হয়ত আরো, কিন্তু চট করে সেটা মনে আসতে চায় না। আর সেই ফাঁকে নরহরি বাধা দিয়ে বলে ওঠেঃ 'জিওমেট্রি পড়েচ ত? মনে আছে নিশ্চয়? এ ফ্রেণ্ড হু ইজ এ ফ্রেণ্ড টু আদার ফ্রেণ্ড আর অল ইকোয়াল টু ওয়ান অ্যানাদার। অ্যাংগল ট্যাংগল দিয়ে ওই রকম কী একটা বলে না যেন জিওমেট্রিতে? সে হিসেবে হরেকেষ্টকে তোমার আপন বন্ধু বলেও গণ্য করতে পারো। আমার আপত্তি নেই।'

কিন্তু আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু সে কথা ভাষায় প্রকাশ করার আগেই নরহরি চেঁচাতে থাকেঃ 'ভালো কথা, তোমাকে জানানো দরকার। আমার বন্ধুটি হচ্ছেন পাক্কা নিরামিষাশী—এক নম্বরের গোঁড়া যাকে বলে। তাঁর পাতের গোড়ায় আমিষ কোনো দ্রব্য দেয়া দূরে থাক—মাছ মাংসের কথাই তাঁর কাছে তুলো না। ভয়ংকর প্রাণে আঘাত পাবেন তাহলে। আর হ্যাঁ, দেখাশোনার ভারই কেবল নয়, দেখানোর শোনানোর ভারও থাকলো তোমার ওপর। কলকাতার যা কিছু দ্রষ্টব্য আর জ্ঞাতব্য আছে—যে ক'দিন তোমার ওখানে থাকেন, থাকতে চান স্বেচ্ছায়, সেই সব দেখিয়ে শুনিয়ে এখানে ওখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে বেড়াতে দ্বিধা কোরো না। আচ্ছা, আসি। ট্রেন ধরার সময় হয়ে এল আমার। তাঁর ট্রেন আর আমার ট্রেন এক সঙ্গেই ধরতে হবে কিনা! হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম থেকেই তাঁকে তোমার ঠিকানায় রিডিরেক্ট করে দিয়ে তবেই আমার বর্ধমানের গাড়ি ধরা। আচ্ছা আসি। কিছু মনে কোরো না ভাই।'

মনে কত কিছুই না করি, না করে পারি না। মনের কোনো দোষ নেই, বন্ধুর মন হলেও মানুষের মন তো! সামনে পেলে নরহরিকে চিবিয়ে খাবার ইচ্ছাও মনে হয়। আগের রাত্রের ওই ভূরিভোজনের পর কারো বন্ধুর সঙ্গে অত সকালে প্রাতরাশ করতে আদৌ আমার মেজাজ ছিল না, কিন্তু নরহরিকে পাল্টা টেলিফোন করতে গিয়ে আর তার পাত্তা নেই। ওর ঘর থেকে আমার

টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং ঝংকার কানে আসে কিন্তু ওর কোনো সাড়া পাই না। 'প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি Do কৃং করণে' শঙ্করাচার্যের সেই অমর বাক্য স্মরণ করে তখন অগত্যা, চটপট হাতমুখ ধুয়ে, প্রাতঃকৃত্য সেরে, কাপড় বদলে তৈরি হয়ে পড়তে হলো। হরেকেষ্টবাবু কখন এসে পড়বেন বলা যায় না ; কে জানে হয়তো বা সূর্যের আগেই তাঁর উদয় হবে পশ্চিমের থেকে।

এবং কেবল প্রাতরাশই নয়। সারাদিন ধরেই কলকাতার চারধারে তাঁর সঙ্গে রাসলীলা করে বেড়াতে হবে। আর ট্রামে বাসেও আজকাল যা রাশ তা কহতব্য নয়। পদব্রজে ব্রজলীলা করতে হলেই আমার হয়েছে!

বিষাক্ত মনে এই সব ভাবছি এমন সময় সদর দরজার কড়ার আওয়াজ কানে এল। দৌড়ে গিয়ে কপাট খুলতেই নরহরির বন্ধু ভজহরি—আই মীন—হরেকেষ্টকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখলাম। জাব্বাজোব্বা আঁটা, জব্বলপুরের আমদানি - দেখলেই বোঝা যায়।

'আপনি ?…ও আপনিই!' ভদ্রলোকের গদগদ কণ্ঠঃ 'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব জানি না। আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে যে কী বিপদ থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন কী বলব! নরুটা যে কী গরু! কিসের তাড়ায় কোথায় যেন চলে গেল—কবে ফিরবে কে জানে!'

'যাক গে, যেতে দিন। আপনি আমাকে আপনার নরুর তুল্য বিবেচনা করবেন। নরু আদৌ না ফিরলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। বরং আর সে নাই ফিরুক! আপদটা গেলেই বাঁচি!…তবে আপনাকে দেখে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, কী বলব! দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে ভেতরে আসুন, আপনার প্রাতরাশ প্রস্তুত। একটু জলযোগ করে নিন আগে। আপনি চা খান তো – চা, না কফি, না কোকো ? কী ?'

'স্রেফ দুধ।' বলতে গিয়ে ভদ্রলোককে যেন একটু দ্বিধান্বিত দেখা গেল: 'মানে, প্রাতরাশের কথাই বলছি। নইলে অন্য অন্য সময়ে অন্যান্য জিনিস খাই।' ঢোঁক গিলে তিনি বললেন।

'আজ্ঞে, আমিও তাই। দুধের দ্বারাই আমার প্রাতঃকালীন জলযোগ। দুধের মতন জিনিস আছে ? মানে, জলীয় জিনিস।'

চাকরকে ডেকে বলে দিলাম আড়ালে—পোচ নয়, ওমলেট নয়, মাছ ভাজা নয়,—শুদ্ধু দু গ্লাস দুধ—চা ফা কিছু না। টোসট ? টোসট কি আমিষ বস্তুর মধ্যে ধর্তব্য ? কে জানে, কাজ নেই! সন্দেহবশে টোসটও বাদ দেওয়া গেল! অকারণে কারো প্রাণে আঘাত দিতে আমার ভালো লাগে না।

'চা না খাওয়াই ভালো।' বললেন হরেকেষ্টবাবু—'ওটা শুনেছি বিষতুল্য।'

'জানি। তার চেয়ে চানা খাওয়া ঢের ভালো। ছানা খাওয়া আরো ভালো। কিন্তু তা আর এখন পাচ্ছি কোথায় ?' আমি বললাম ঃ 'চানাচুর অবশ্যি পাওয়া যায় রাস্তায়। বিকেলের দিকে খাওয়াবো আপনাকে।'

দুধের গ্লাস আসতেই মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ করে হরেকেষ্টবাবু বিচ্ছিরি এক ঢেঁকুর তুললেন। এক নিশ্বাসে যেভাবে কোঁতকোঁত করে সবটা গিলে ফেললেন দেখলে অবাক হতে হয়। কেবল নিরামিষাশী বললে এঁকে কম করে বলা হয়, কিছুই বলা হয় না,—আসলে ইনি ঘোর নিরামিষাসক্ত।

কিন্তু আমি তো আর অমন শক্ত নই, অতখানি শক্তি রাখিনে, কাজেই, পাঁচন যেমন করে গেলে মানুষ, তেমনি করে একটু একটু করে চোখ কান বুজে এক আধ ঢোঁক গিলছি, এত কায়ক্লেশে যে কী বলব !

'আপনি সত্যিই একজন নিরামিষের ভক্ত বটে, স্বচক্ষেই তো দেখতে পাচ্ছি। এযুগে এরকমটি দেখতে পাব, কোথাও যে এ জাতীয় কেউ এখনো টিকে আছে তা আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু না,—দেখলে আনন্দ হয়! যেমন করে রসিয়ে রসিয়ে অমৃতের মত এক এক চুমুক মারছেন—নাঃ, সত্যি, আপনি দুগ্ধরসিক বটে !' হরেকেষ্টবাবু বিগলিত হয়ে বললেন।

উচ্চ প্রশংসালাভ করে দুধের বিতৃষ্ণা আমার আরো যেন বেড়ে গেল। পেটের ভেতরে কালকের রাতের মাংসেরা 'ব্য ব্যা—অরব্ব্র্র্—কোককোর কোঁ !' নিজের নিজের জাতীয় ভাষায় আলাপ লাগিয়ে দিয়েছে বলে মনে হলো আমার। আমি গেলাস নামিয়ে রাখলাম।

'দুধ খায় বাছুরে' ! আরেকটা বিচ্ছিরি ঢেঁকুর তুলে মুখ বিকৃত করলেন হরেকেষ্টবাবু।

'য়্যা ?' আমার চমক লাগল হঠাৎ। দুধের মধ্যে আবার বাছুর আসে কোথথেকে ?

'না, না। আমি আপনাকে মীন করিনি। আপনার প্রতি কটাক্ষ করে কিছু বলছিনে।' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন তিনি ঃ 'আসলে গোরুর দুধ তার নিজের বাছুরের জন্যেই সৃষ্টি তো ? তাই নয় কি ? সেই কথাই আমি বলছিলাম।'

'তা যা বলেন ! আপনার আসার আগেই আমার আরেক গ্লাস হয়ে গেছে কিনা, পেটে আর জায়গা দেই।' এই বলে বাকি দুধের দিকে আর দৃকপাত করিনে, গেলাস ছুঁইনে আর।

'আহা, খেলেন না ! যতটুকু দুধ ততটুকুই রক্ত যে !' তাঁর আক্ষেপ হতে থাকে।

'রক্ত জলকরা। কলকাতার দুধ কেনা।' আমি বলি। রক্ত একেবারে জলবত না খেলেও তেমন ক্ষতি নেই।'

দুগ্ধগ্রাস থেকে মুক্তিলাভ করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কলকাতার রাস্তায় ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হয়ে বেড়াতে লাগলাম। পথে-বিপথে চার দিকেই কতো রেস্তরাঁ, কাফে আর কেবিন কিন্তু সবখানেই তো মৎস্য-মাংসঘটিত ব্যাপার—কোথাও পা দেবার যো নেই। তার ওপরে নিরামিষ আহারের উপকারিতার বিষয়ে হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে চলেছি।

অগত্যা তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে আমিষ-আহারের বিষময় ফল নিয়ে আমিও কিছু কিছু বললাম। আমিষ বস্তু হজম করতে যে পরিমাণ শক্তি যায় ঐ খাদ্য হতে সে পরিমাণ শক্তি আসে না, তার ফলেই আমিষাশীরা অল্প দিনে মারা পড়েন। এক কথায় আমিষ খাওয়া আর খাবি খাওয়া এক। (অবশ্যি, নিরামিষাশীরা বহুকাল বেঁচে থাকেন, কিন্তু মাছ মাংস ছেড়ে দিয়ে কিসের আশাতেই বা তাঁরা বাঁচেন কে জানে! কোন সুখেই বা, আমি তাই ভাবি!)

কিন্তু মুশকিল হলো খাওয়া নিয়ে। কী যে তাঁকে খাওয়াবো আর কোথায়ই বা খাওয়ানো যায়! সত্যি, কোথায় যে খাওয়া দাওয়া করি! মৎস্যমাংসবিবর্জিত একটাও পাকস্থলী তো (না কি, পাকস্থল?) কলকতায় নেই অন্তত জানাশোনার মধ্যে নেই আমার। কোথায় আমাদের নিয়ে যাই এখন!

অবশেষে, ভেবে দেখলাম ফলমূলই প্রশস্ত। মূল কোথায় মেলে জানি না, মূলোর বাজারেই হয়তো বা, কিন্তু ফল তো সর্বত্রই। প্রায় সব রাস্তার মোড়েই ফেরিওয়ালার হেপাজতে ছড়ানো রয়েছে ফল। ছড়ানো এবং ছাড়ানো : বাতাবি নেবু, কমলা, কলা আর পেঁপে। আনারসেরও অভাব নেই! পয়সা ফেললেই পাওয়া যায়। তাই খাওয়া যেতে লাগল। হরদম—যখন তখন—দুজনে মিলে। যত মেলে।

সারা দুপুরটা এইভাবে ফলবান হয়ে—লক্ষণ আর গাছপালার মতন বারংবার ফল ধরতে বাধ্য হয়ে বিকেলের দিকে হরেকেষ্টকে যেন একটু ব্যাজার দেখা গেল। 'ফল খায় বাঁদরে' এই ধরনের একটা বিরূপ মন্তব্যও যেন ফসকে এল তাঁর মুখ থেকে। অবশ্যি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুদ্ধিপত্রে প্রকাশ করে দিলেন — আমাদের নিজেদের প্রতি কোনো অবজ্ঞা তিনি দেখাচ্ছেন না। আসলে, ফল তো গাছেই ফলে, আর বাঁদরদেরও সেই গাছেই বসবাস—কাজেই প্রথম ফলাওয়ের মুখে তাদের বরাতেই ফললাভ ঘটে থাকে!

আমি বললুম : 'মা ফলেষু কদাচন। তাহলে আর ফলার করে কাজ নেই। খুব হয়েছে।' মনে মনেই বললুম যদিও।

এখন বৈকালিক জলযোগ কি করা যায়? এক পাঞ্জাবী দোকানে গিয়ে দু গ্লাস—বেশ বড় বড় গ্লাস—লস্যি নেওয়া গেল। সেই ঘোল না খেয়ে

হরেকেষ্টবাবু ঘাল হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে দম নিয়ে তিনি বললেন : 'ঘোল খায় যতো বোকায়।' বলে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

'কেন, খেতে কি তেমন ভালো না? আপনাদের পশ্চিম মুলুকের মতন নয় বোধ হয়? কিন্তু আমার তো বেশ খাসা লাগলো মশাই!'

'খাসা বইকি! খুবই খাসা! খেয়ে বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছি, তা, বলাই বাহুল্য। আমাদের আমি বোকা বলছি তা ঠাওরাবেন না। বোকারা ঘোল খায় বলে একটা কথা ছিল না? কথাটার মানে কী, তাই আমি ভাবছিলাম।'

দুধের যত প্রকার অপভ্রংশ হতে পারে তার মধ্যে ঘোলটাই যে একমাত্র নয় —তা ছাড়া ছাতার বাঁটও আছে—তবে ঘোলটাই সবচেয়ে অম্লমধুর আর বেশ সুস্বাদু—বৈজ্ঞানিকের ন্যায় আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি। দুধের ছানা অংশ থেকে ছাতার বাঁট তৈরি হয়ে থাকে একথায় হরেকেষ্টবাবু তো হাঁ হয়ে গেলেন। বললেন, 'ছাতার বাঁট কিন্তু তেমন সুস্বাদু নয়। শিশুকালে আমি ঢের খেয়েছি মশাই, আমার বাবা তাই দিয়ে পিটতেন আমায়, এখনো আমার মনে আছে।'

'অবশ্যি, ঘোল যেমন পেটে লাগে ছাতার বাঁট তেমন নয়; ওকে বরং পিঠে লাগানো যায়।' আমি অনুযোগ করি। এবং পরবর্তী সুযোগে নরহরি আর ছাতার বাঁটকে দ্বন্দ্বসমাসে নিয়ে আসা যায় কিনা মনে মনে ভাবি।

যাবতীয় দর্শন-প্রদর্শন সমাধা করতে সন্ধে হয়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আমি। হরেকেষ্ট বললেন, আর একটা জায়গা দেখলেই তাঁর হয়ে যায়। গুলুওস্তাগরের গলির যে বাড়ির একতলায় তিনি জন্মেছিলেন সেইখানটা।

তাঁর সেই সাধটাই বা না মেটে কেন? ঠিকানা বাৎলে সেই জন্মস্থানে তাঁকে নিয়ে গেলাম। খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। কিন্তু জায়গাটা দেখে হরেকেষ্টবাবু ভারী বিচলিত হয়ে পড়লেন। সেই একতলাটা এখন একটা চপ কাটলেটের দোকান হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখা গেল।

'ভেতরে গিয়ে দেখবার ইচ্ছা ছিল একবার; কিন্তু—কী দুঃখের বিষয়—', ভগ্নকণ্ঠে তিনি আওড়ালেন।

'আসুন না, যাওয়া যাক। দেখতে দোষ কি? না খেলেই তো হলো।'

ভেতরে গেলাম আমরা এবং একটা টেবিল নিয়ে বসলাম—ঠিক যেখানটিতে হরেকেষ্টবাবু স্বর্গচ্যুত হয়ে ইহলোকে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন সেইখানে। দুটো লেমোনেড নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করা গেল।

কেবল চপ কাটলেটই নয়, সব কিছুই ছিল হোটেলটায়। মাংসের কারি,

কোর্মা, রোস্ট, কাবাব, শিককাবাব, দোপিঁয়াজী, পোলাও পর্যন্ত। আর এমন খাসা গন্ধ ছেড়েছিল যে কী বলব!

সেই গন্ধে তো আমার জিভে জল এসে গেল। আর হরেকেষ্টবাবুর (সেই গন্ধেই কিনা বলতে পারি না) চোখ লাগল চকচক করতে।

'কেন যে মানুষ এই সব ছাইপাঁশ খায়—এই যতো চপ কাটলেট! খেয়ে কী সুখ পায় জানিনে!' বললেন হরেকেষ্ট: 'কি রকম খেতে কে জানে!'

'একটা নিয়ে চেখে দেখা যাক না কেন?' আমি বলি। বাস্তবিক, অভিজ্ঞতা অর্জনে দোষ কি? সব রকমের অভিজ্ঞতাই অর্জন করতে হয়—আসক্ত হয়ে না পড়লেই হলো। সেকথা বলি আমি।

'আচ্ছা বেশ, অভিজ্ঞতালাভের জন্য সামান্য কিছু খেয়ে দেখা যাক না হয়। একটা চপ আর একটা কাটলেট তাহলে—কি বলেন?' নিমরাজি হলেন হরেকেষ্ট।

'নিশ্চয় নিশ্চয়! আরও গোটা দুই বেশি করে নেয়া যকে আমিই বা কেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে বঞ্চিত হই?' সায় দিয়ে বললাম আমি।

চপ-কাটলেট এসে পড়ল। হরেকেষ্ট বললেন: 'ও জিনিস আর হাত দিয়ে ছুঁতে চাইনে। ছুরি-কাঁটা আছে?' ছুরি কাঁটাও এসে গেল। দুপ্রস্থই এল। দুজনেই আমরা অভিজ্ঞ হতে লাগলাম।

ওঁর ছুরি-কাঁটা-চালানোর কায়দা দেখে তো আমার তাক লেগে গেল। অবশেষে না বলে আমি পারলাম না: 'কিছু মনে করবেন না হরেকেষ্টবাবু, নরহরির কথায় কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে। ঘোরতর সন্দেহ। সে আমাকে বলল যে আপনি নাকি মাছমাংস স্পর্শও করেন না, কিন্তু ছুরি-কাঁটায় আপনাকে যেরকম ওস্তাদ দেখছি—'

'নরহরি বলল?' হরেকেষ্টবাবু বাধা দিয়ে বললেন সবিস্ময়ে 'নরহরি বলল এই কথা না নশাই, না। বরং মাছমাংস ছাড়া আর কিছুই আমি ছুঁইনে। আপনিই নাকি নিরামিষের ভীষণ ভক্ত নরহরি আমায় বলেছে। আর বলেছে যে মাছমাংসের কথা কানে তুলতেও প্রাণে আপনি ব্যথা পান। তা কি তবে সত্যি নয়—য়্যাঁ?'

আর য়্যাঁ! তারপরে দুজনে মিলে নরহরির যা একখানা শ্রাদ্ধ করা গেল! প্রাণ ভরেই করলাম। শ্রাদ্ধশান্তি সেরে তখন একধার থেকে চপ-কাটলেট, রোসট, কারি, কাবাব, কোর্মা, দোপিঁয়াজী, মাছের পোলাও, মাংসের পোলাও যা কিছু ছিল সেই হোটেলে, সব সেই টেবিলে জড়ো হলো। শ্রাদ্ধের পরে নিয়মভঙ্গে লাগা গেল প্রাণপণে।

এবং তারপরে ? খাওয়া দাওয়া শেষ হলে নরুর বন্ধু হরুকেও তোল্লাতুল্লি করে রিকশায় টেনে তুলতে হলো। ঠিক আগের রাতের নরহরির মতই অবিকল সেইরকম কাঁপকলের মত করেই।

আমাকেই টানাটানি করতে হলো—আমার অদৃষ্ট! গুরু ভোজনের পরে গুরুতর পরিশ্রম আমার পোষায় না—কিন্তু করব কি? পাতিতুণ্ডি মশাইকে তো গুলু ওস্তাগরের হোটেলে আসা যায় না অধঃপতিত অবস্থায়? নরহরি, যে আমার বন্ধু আর ইনি, যিনি নরহরির বন্ধু—ফলতঃ, উনি আর আমি এবং আমরা সবাই পরস্পর সমান এবং বন্ধুবৎ নই কি? জিওমেট্রিতে কী বলে থাকে? য়্যাঁ?

জুজু
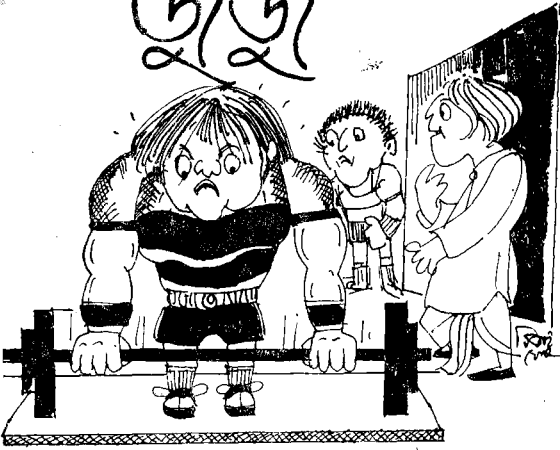
এক বাঘের মুল্লুক থেকে আরেক বাঘের মুল্লুকে! হাজারিবাঘ থেকে বাঘেরহাট।

হাজারিবাগে আমার সেজোমামার বাড়ি। তাঁর ইলেকট্রিক্যাল গুডস-এর কারবার। সেই সঙ্গে ছোটখাট একটা কারখানাও ছিল তাঁর। সেখানে বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি জিনিসপত্তর মেরামত হত। মোটরের যন্তরটন্তর, পাখা-টাখা, হীটার, মীটার—এসব সারাতে জানতেন সেজোমামা।

বিদ্যুতের যে কত রকমের কেরামতি, তা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। আমিও কিছু কিছু শিখছিলাম সেজোমামার কাছে। একদিন সেজোমামার মতই ওস্তাদ হব এইরকম আশা মনে মনে পোষণ করছি এমন সময়……

এমন সময়ে বাগেরহাট থেকে মেজোমামার তলব এলো—শিবুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো একবার। শুনছি ওর শরীরের নাকি তেমন উন্নতি হচ্ছে না। ভাবছি যে আমি একবার চেষ্টা করে দেখি নাহয়……

চিঠি পেয়ে সেজোমামা বললেন, 'যা তাহলে তোর ব্যায়ামবীর মেজোমামার কাছে। চেহারাটা বাগিয়ে তারপর আসিস আবার। কেমন?'

চেহারা বাগাতে চলে গেলাম বাগেরহাট।

আমাকে দেখে মেজোমামা বললেন, 'ওমা? সেইরকমটা লিকলিকেই

রয়েছিস যে! গায়পায় একটুও তো গত্তি লাগেনি। হাওয়ায় উড়ছিস যে রে! জামাটা খোল তো, দেখি একবার।'

জামা খুলতে আমার দারুন আপত্তি। চানের সময় যে খুলতে হয় তাতেই যেন আমার মাথা কাটা যায়। জামা পরে চান করতে পারলে বাঁচি যেন। কাউকে গা দেখাতে হলেই তক্ষুনি সেখান থেকে আমি গায়েব।

মামার কথাটা আমি গায়ে মাখি না, যেন কানেই যায়নি কথাটা—এমনি ভাবে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিই।

'হবে হবে, পরে হবে প্রণাম আগে জামাটা খোল।' বলে মেজোমামা নিজেই আমার কোটের বোতামগুলো খুলতে লাগলেন। খোলস খুলতেই আমার খোলতাই বেরিয়ে পড়ল। 'ওমা, এই চেহারা! গলার কণ্ঠা বেরুনো!' উৎকণ্ঠায় আঁতকে ওঠেন মেজোমামাঃ 'হাড় পাঁজরা যে গোনা যাচ্ছে রে সব! দেখি কখানা, এক দুই তিন চার ।'

আঙ্গুল ঠুকে ঠুকে মেজোমামা আমার পাঁজরার অগণ্য হাড় গণনা করেন···

'যাক, এতেই হবে। এই-তোকেই আমি বাগেশ্রী বানিয়ে দেব। একবার যখন বাগে পেয়েছি—দেখিস!

'মেজোমামা, আমার ওপর তোমার এত রাগ কিসের?' ভয়ে ভয়ে বললাম।

'কেন, রাগের কথাটা কি হল?'

'বললে যে আমায় বাগেশ্রী বানাবে। বাগেশ্রী তো একটা রাগ-রাগিণী।'

আমার গাইয়ে ছোটমামার কাছ থেকে খবরটা আমার জানা ছিল।

'আহা, সে বাগেশ্রী নয়। এ হচ্ছে আলাদা। বাগেশ্রী মানে বাগেরহাটের শ্রী। ওরফে বাগেশ্রী। বাগেরহাটে ফি বছর সুঠাম চেহারার প্রতিযোগিতায় যার দেহ সবচেয়ে সুগঠিত সুন্দর বলে গণ্য হয় সেই ঐ খেতাব পায়। আসছে বছরের বাগেশ্রী হচ্ছিস তুই।···চ, এবার আমার ব্যায়ামাগার দেখবি চ।'

বলে তিনি উৎসাহভরে আমার পিঠে এক চাপড় মারলেন। তাঁর স্নেহের সেই চাপড়ানিতেই আমি তিনহাত ছিটকে গেলাম। এগিয়ে গেলাম অনেকটা ব্যায়ামাগারের দিকেই!

সেখানে গিয়ে দেখি, ইলাহী ব্যাপার! ছেলেরা তাল ঠুকছে, কুস্তি লড়ছে, ডন বৈঠক ভাঁজছে। ধুলো মাটি মেখে সব কিম্ভূতকিমাকার।

মুগুর ডাম্বেল বারবেলের ছড়াছড়ি। তারই একধারে একটা বৈদ্যুতিক ওজন-যন্ত্রও রয়েছে। যন্তরটা আমার পরিচিত। সেজোমামাকে এমন যন্ত্র আমি সারাতে দেখেছি।

'আয়, তোর ওজনটা নিই তো একবার।' যন্ত্রটার দিকে মেজোমামা আমায় আহবান করলেন।

'আজ নয় মেজোমামা, তোমার এখানে খেয়েদেয়ে ব্যায়াম ট্যায়াম করে ওজনটা একটু বাড়ুক আগে, তারপর।' আমি বললাম।

'ছেলেদের শরীরগুলো দেখছিস।' আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন মেজোমামা : 'এখানে ব্যায়াম করে করে এমনি হয়েছে। আরও হবে! ভালো করে চেয়ে দ্যাখ না!'

না দেখে উপায় নেই। না চাইতেই দেখা দেয় এমনি সব চেহারা। তার-স্বরে নিজেদের ব্যায়ামবার্তা ঘোষণা করছে যেন। প্রত্যেকেরই দেহ বেশ সুগঠিত। তার মধ্যে একজনের, বয়সে আমার চাইতে তেমন বড় হবে না হয়তো, কিন্তু চেহারায় আমার তিনগুণ! পেল্লায় চেহারার, বলা যায়!

নামেও প্রায় তার কাছাকাছি। মামার এক ডাকেই জানা গেল।

'পেল্লাদ, এদিকে এসো।' মামা তাকে ডাক দিলেন।

পেল্লাদ এগিয়ে এলো।

'একে একটু দেখিয়ে দাও তো।' বললেন মেজোমামা।

শুনেই আমার পিলে চমকে যায়। কিন্তু না, আমাকে নয়, নিজেকেই সে দেখাতে লাগলো।

সারা দেহটাকে ভেঙে চুরে দুমড়ে বেঁকে এমন ভাবে সে দাঁড়ালো যে, হ্যাঁ, দেখবার মতই বটে। গায়ের পায়ের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফেঁপে উঠলো সব—ইয়া হলো তার বুকের ছাতি, গলার কাছটায় যেন দলা পাকানো, এইসা হাতের কবজি। বক দেখানোর মতন হাতটা দুমড়েছে আর তাইতেই তার বাহুর কাছটা তিন ডবোল হয়ে এমনটা হয়েছে যে ভাষায় তার বর্ণনা করা যায় না। বাহুল্যমাত্র বলে, মানে, বাহুর বাহুল্য, এই বলেই প্রকাশ করতে হয়।

'এই হচ্ছে আমাদের বাগেশ্রী। আগামী নয়, আসন্ন। এ বছরের পাল্লায় একেই আমরা নামাবো।' মেজোমামা জানালেন। 'আর আসছে বছরের, মানে, আমাদের আগামী বাগেশ্রী হচ্ছিস তুই…'

কথাটা কানে যেতেই পেল্লাদ এমন রোষকষায়িত নেত্রে আমার দিকে তাকালো যে তা আমি জীবনে ভুলবো না। পেল্লাদের চেহারায় যেন জল্লাদের রূপ দেখলাম। এ বছরে বাগেশ্রীর সারা দেহে তো ফুটেছিলই, এবার যেন তার চোখের থেকেও বাঘের শ্রী ফেটে পড়তে লাগল। বাঘের মতন হিংস্র দৃষ্টি দিয়ে সে দেখতে লাগল আমায়।

'পেল্লাদ, এবং তোমরা সকলেই শোনো', গলা খাঁকারি দিয়ে ঘোষণা করলেন মেজোমামা : 'আজ থেকে এ, মানে শিবু, আমার ভাগনে—এই হবে তোমাদের সর্দার। একে তোমরা শিবুদা বলে ডাকবে। ওরফে রামদাও বলতে পারো। যার যা খুশি। আর, একে তোমরা আমার মতই মেনে চলবে। এবং এ যা বলবে, মন দিয়ে পালন করবে সবাই—বুঝলে?'

এইভাবে বুঝিয়ে দিয়ে মেজোমামা তো ব্যায়ামাগার থেকে চলে গেলেন। আর মেজোমামা সরে যেতেই পেল্লাদ ফোঁস করে উঠল সকলের আগে—'হ্যাঁ, ঐ রামফড়িংকে আমরা রামদা বলবো। ও-তো এক ফুঁয়েই উড়ে যাবে আমার।'

'ফড়িংদা বলে যদি ডাকি পেল্লাদদা ?' জিগ্যেস করল একটা বাচ্চা ছেলে।

'তা ডাকতে পারিস ইচ্ছে করলে। আমি ডাকবো ফড়িং বলে। শুদ্ধ ফড়িং। দাদা ফাদা বলতে পারব না।' ফড়-ফড় করে পেল্লাদ ঃ 'আর ঐ ফড়িংটা যদি আমার কাছে সর্দারি ফলাতে আসে তাহলে এক গাঁট্টায়।··না, গাঁট্টা নয়, আমার এই আঙুলের এক টোকায় উড়িয়ে দেব তোমায়, বুঝেচো রামফড়িং ?'

বলে পেল্লাদ আকাশের গায় একটা টোকা মারল। আর পেল্লাদের কাণ্ড দেখে ছেলেরা সব হেসে উঠল হি হি করে। হাসলও পেল্লাদও। হিঁ হি হিঁ হি করেই হাসলো সে এক অট্টহাসি। পেল্লাদের আহ্লাদ দেখে আমি বাঁচিনে !

কিন্তু মরণ-বাঁচন সমস্যাটা দেখা দিল তার পরদিন। মামা সকালে উঠে বললেন—'কাল ছেলেদের আমি সব বলে রেখেছি আজ সকালে এসে ব্যায়ামাগারের মাঠের ঘাসগুলো ছাঁটাই করতে। যাও, গিয়ে দেখো তো, কদ্দুর এগুলো। তুমি যখন ওদের সর্দার তখন তোমাকেই তো এসব তদারক করতে হবে। কাজটা করিয়ে নাওগে ওদের দিয়ে।'

গিয়ে দেখি, পেল্লাদকে নিয়ে জটলা পাকিয়ে মাঠে বসে ছেলেরা আড্ডা মারছে সবাই।

আমি বললাম 'একি ! ঘাসের একটা ডগাও তো ছাঁটোনি দেখছি। গল্প করছো সবাই বসে—এদিকে এতটা বেলা গড়িয়ে গেল ! নাও, চটপট গা হাত লাগাও সব।'

'যদি না লাগাই তো তুমি কি করতে পারো শুনি ?' গর্জে উঠল পেল্লাদ।

'তাহলে আমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।' ভারী গলায় আমি ছাড়লাম।

'কী ব্যবস্থা করবে শুনি তো একবার ?'

'আমি···আমি···মানে···মানে···' বলে আমি একটা ঢোঁক গিললাম। তাতে আমার মানের যে খুব হানি হল বুঝতে পারলাম বেশ।—'আমি বলছিলাম কি', আমতা আমতা করে বললাম—'বৃথা আলস্যে কালাতিপাত না করে তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে লিপ্ত হও, ভ্রাতৃবৃন্দ ! এই কথাই বলছিলাম আমি।'

সাধু উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই আমার বলা, এইটে জানাবার জন্যই সাধু-ভাষার ব্যবহার করতে হলো।

'যদি না লিপ্ত হই ?' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল পেল্লাদ। মারমূর্তি ধরে আমার সামনে খাড়া হলো সে। 'তাহলে···তাহলে কি তুমি আমায় মারবে নাকি ?'

'না না। সে কথা কি আমি বলেচি ? তোমার মতন ছেলেকে কি আমি কখনো মারতে পারি ? হাত তুলতে পারি তোমার গায় ?' যথাসাধ্য আত্ম-মর্যাদা বজায় রেখে বলি ঃ 'তবে আমি বলছি কি, তোমরা যদি চটপট ঘাস ছাঁটতে না লাগো তাহলে ভীষণ প্যাঁচে পড়বে।'

'কিসের প্যাঁচ ?' প্যাঁচার মতন মুখ করে সে শুধায়।

'জুজুৎসুর এমন প্যাঁচ কষে দেব যে এক মিনিটের মধ্যে হাড়গোড় ভাঙা হয়ে যাবে তুমি।'

'জুজুৎসু ?' আমার কথায় যেন একটু থ হয়ে গেল পেল্লাদ—'সে আবার কি ?'

'কেন, জুজুৎসুর নাম কখনো শোনোনি নাকি ? একরকমের জাপানী কসরত। একশো গুণ গায়ের জোর বেশি এমন একটা পালোয়ানকে একরত্তি একটা জাপানী ছেলে দুটো আঙুলের কায়দায় একেবারে ঘায়েল করে দিতে পারে শোনোনি নাকি কখনো ?'

পেল্লাদের একটা শাগরেদ মাথা নেড়ে জানালো যে এমন কথা শুনেছে বটে।

'তুমি জানো জুজুৎসু ?' জিগ্যেস করল পেল্লাদ। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে।

'জানি কিনা টের পাবে এই দণ্ডেই। কিন্তু ভগবান না করুন—যেন আমায় তা না জানাতে হয়। এর আগে একটা গুণ্ডা ছুরি নিয়ে আমায় তাড়া করেছিল, তাকে আমি ঐ প্যাঁচে ফেলেছিলাম। বেচারাকে পাক্কা ছ মাস হাসপাতালে কাটাতে হলো ! মারা যেতে যেতে বেঁচে গেল কোনোরকমে !'

'তবে রে ব্যাটা রামফড়িং ! তুই আমাকে জুজুৎসুর প্যাঁচে ফেলবি ?' এই না বলে পেল্লাদ একলাফে এগিয়ে এসে আমার ঘাড় ধরলো। ঘাড়ের কাছটার কোটের কলার ধরে আমাকে উঁচু করে তুলল আকাশে।—'আমার প্যাঁচটা তবে দ্যাখ তুই এইবার। তোকে তুলে এইসা এক আছাড় মারবো যে···' বলে সে কৃত্তিবাসী রামায়ণের থেকে সুর করে আওড়ালো···'ভাঙিবে মাথার খুলি চূর্ণ হবে হাড়।'

ত্রিশঙ্কুর মতই আমার অবস্থা। ত্রিশূন্যে উঠে আমি হাতপা ছুঁড়তে লাগলাম—'ভালো—ভালো হচ্ছে না কিন্তু ! এমনি ভাবে আমাকে ঘাড় ধরে তোলা···আমি আঙুলের কায়দা দেখাতে পারছি না কিনা···যদি একবার তোমায় আমার আঙুলের নাগালে পাই তো দেখতে পাবে মজাটা !'

'তুই আমায় মজা দেখাবি ? বটে রে ব্যাটা রামফড়িং ?' বলে সে আমাকে নামিয়ে দিল মাটিতেঃ 'তার আগে এক ঘুষিতে তোর মাথাটা আমি চ্যাপটা করে দেব বসিয়ে দেব তোর গলার ভেতর···কোটের কলারের তলায়, ঘাড়টাড় সব সমেত। কন্ধ-কাটার মতই ঘুরে বেড়াবি তখন তুই।'

'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি পেল্লাদ', আমার গলা ঘড়ঘড় করেঃ 'ফের যদি তুমি এরকম বেকায়দায় ফ্যালো আমায়—এরূপ বেয়াদবি করো তো তোমাকে পরজন্মে গিয়ে পস্তাতে হবে। ভালো কথায় বলছি, খুব বেঁচে গেলে এ যাত্রা।'

পেল্লাদ, বলতে কি, এবার একটু ভ্যাবাচাকা খেয়েছে। আমি বেশ ভড়কে

যাব ও ভেবেছিল। কিন্তু এততেও আমার মুখসাপট দেখে ও একটু ঘাবড়ে গেল!

'দাঁড়া, এবার তোকে ঠ্যাং ধরে তুলবো আকাশে।' বলে এগিয়ে এসে খাড়া হলেও আমার শ্রীচরণ ধারণ করার তার কোনো তাড়া দেখা গেল না। অদূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো আমায়।

তারপরে একটু নরম হয়ে বলল—'না। আগে তুমি আমায় এক ঘা মারো। আমি আইন বাঁচিয়ে চলতে চাই। তারপরে আমি তোমায় ধরে তুলো ধুনে দিচ্ছি। বলতে পারব তখন যে আগে আমার গায় তুমি হাত তুলেছিলে। মারো আমায় আগে এক ঘা।'

এই বলে সে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো এসে আমার সামনে।

'না, আমি তোমার গায়ে হাত দেব না। ভদ্রলোকরা কি মারামারি করে? ভদ্রবালকেরও সেটা কর্তব্য নয়। কেন, মারামারি করা ছাড়া কি গায়ের জোরের পরীক্ষা হয় না? আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, আমি সর্দার হওয়াতে তোমার খুব রাগ হয়েছে আমার ওপর, তাই না?'

'ঠিক তাই।' মেনে নিল সে…'ইচ্ছে করছে, আস্ত তোমায় চিবিয়ে খাই।'

'আমি কি করব? আমি তো নিজের থেকে সর্দার হতে চাইনি, মামা করেছে। আমি কি করব? বেশ, আমাদের মধ্যে কার গায়ের জোর বেশি পরীক্ষা হয়ে যাক। যার বেশি জোর সেই সর্দার হবে, তাকে সর্দার বলে মানবে সবাই—কেমন তো? তার কথায় সবাইকে চলতে হবে তখন। কেমন, এতে তো তোমার আপত্তি নেই…রাজি?'

'হ্যাঁ, রাজি।' সায় দিলে পেল্লাদ। ছেলেরাও সবাই বেশ সোচ্চার উৎসাহ দেখাল।

'বেশ, ঐ যে বারবেলটা পড়ে আছে ওখানে—ওজনদাঁড়ির ওপর…' অদূরে দাঁড়-করা বৈদ্যুতিক ওজন-দাঁড়িটার পাটাতনে একটা সের পনেরর লোহার বারবেল পড়েছিল—সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম—'ঐ বারবেলটা যে মাথার ওপর তুলতে পারবে…'

'ঐ বারবেল তো দুবেলা আমি ভাঁজি।' কথার মাঝখানেই বাধা দিল সে—'মাথার ওপর ঘোরাই রোজ দুবেলা। বুঝেচ হে?'

'বেশ তো তুলেই দেখাও না একবার। পরীক্ষাটা হয়ে যাক সবার সামনে।' আমি বললাম।

'বেশ, তুমি আগে তোলো তো দেখি। তোমার জোরটাই দেখা যাক একবার। তোলো। দেখি তো।'

ছেলেরা বলতে লাগলো—'তোলো রাম দাদা, তোলো!'

এত তোলো তোলো শুনে তুলাদণ্ডের ওপর থেকে বারবেলটাকে তুললাম। এবং বলতে কি, তুলতে গিয়ে বেগ পেলাম বেশ। দুহাতে না ধরে অতিকষ্টে

হাঁটুর ওপর তুললাম, তারপর আস্তে আস্তে কাঁধ বরাবর। শেষে প্রাণান্ত এক পরিশ্রমে মাথার ওপর খাড়া করলাম ওটাকে।

'এইবার তোমার পালা।' বারবেলটাকে নামিয়ে রেখে আমি দেয়ালে গিয়ে ঠেসান দিয়ে হাঁফ ছাড়তে লাগলাম। বাপ!

পেল্লাদ এসে পাকড়ালো বারবেলটাকে।—'এক ঝটকায় তুলে ফেলছি দ্যাখো না! তোরা সবাই চেয়ে দ্যাখরে।'

বলে বারবেলটাকে ধরে এক ঝটকা মারতে গেল সে। মারতে গিয়ে, কী আশ্চর্য! পটকালো সে আপনাকেই। উলটে পড়লো মেঝের ওপর।

'হাত পিছলে গেল কিনা।' বলে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো পেল্লাদ। মাটিতে হাত ঘষে নিয়ে লাগতে গেল আবার; কিন্তু—তার ঐ লাগাই সার, একটুও বাগাতে পারল না ওটাকে। এক ইঞ্চিও নড়াতে পারল না বারবেল। আমি ঠায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মৃদুমধুর হাসতে লাগলাম ওর দিকে তাকিয়ে।

ওর বাহুর পেশী ডবোল হয়ে উঠলো – আবার দেখা গেল ওর বাহুর সেই বাহুল্য! বুক ফুলে উঠলো দেড়গুণ। হাপরের মতন নিশ্বাস পড়তে লাগল ওর। এত হাঁপিয়েও এক চুলও তুলতে পারল না বারবেলটাকে।

'যাও, কাজে মন দাও গে।' বললাম আমি তখনঃ 'সাফ করে ফ্যালো মাঠটা। মাঠ পরিষ্কার না হলে আমাদের বার্ষিক উৎসব হবে কি করে? এ বছরের সভা বসবে তো ঐখানেই, বাগেরহাটের লোকরা দেখতে আসবে সবাই। আর সেই সভায় তুমিই তো এবার বাগেশ্রী হবে, পেল্লাদ! আমরা সবাই হাততালি দেব তোমায়। তোমার গরজই তো সবার চেয়ে বেশি হওয়া উচিত ভাই!'

বলে আমি উৎসাহভরে ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম।

'হ্যাঁ রামদা' বলে সদলবলে নতমস্তকে সে চলে গেল। সর্দার বলে মনে মনে মেনে নিল আমায়।

তারপর পেল্লাদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল খুব। সে আমার বিশেষ ভক্ত হল একজন!

সেদিন সন্ধ্যাতেই সে এসে শুধালো আমায়—'এই তো আমি এইমাত্র সেই বারবেলটা ভেঁজে এলাম। সকালে আমি তুলতে পারলাম না কেন বল তো? বলো না রামদা, তুমি কি আমায় কোনো জুজুৎসু করে দিয়েছিলে নাকি?'

'বারে! আমি তোমায় ছুঁতে গেলাম কখন?' প্রতিবাদ করি আমিঃ না ছুঁয়ে কি কাউকে কখনো জুত করা যায়? জুজুৎসুও করা যায় না।'

'তাহলে বুঝি ঐ বারবেলটাকেই··· ? ওটা তো তুমি আগেই ছুঁয়েছিলে। বেশ জুত করেই তুলেছিলে আমার আগে।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো বটে।' বলে আমি ঘাড় নাড়ি—যে-ঘাড় ওটার উত্তোলনে তখন থেকেই টনটন করছিল আমার।

'তাই। তুমি জানতে যে, জুজুৎসুর প্যাঁচ কষে দিয়েছ ওটাকে। কিছুতেই আমি আর তুলতে পারব না। তাই তুমি দেয়ালে হেলান দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলে অমনি করে—আমি লক্ষ্য করেছিলাম।'

যে রহস্য বাল্যকালে পেল্লাদের কাছে আমি ব্যক্ত করতে পারিনি, আজ সেটা ফাঁস করবার আমার বাধা নেই।

হাজারিবাগের মামার কাছ থেকে আসবার সময় আমি একটা বিদ্যুৎ-চুম্বক বাগিয়ে আনি। আর, সেদিন সকালে বাগেরহাটের মাতুল-সাক্ষাতের আগে সেটাকে বৈদ্যুতিক ওজন-যন্ত্রটার পাটাতন তুলে তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে পেল্লাদ বারবেলটা তুলবার সময় যখন আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে মৃদু মধুর হাসছিলাম তখন আমার পিঠের ঠিক পেছনে যে ইলেকট্রিক সুইচ ছিল, চেপে ধরেছিলাম সেটাকে। ফলে ওজন-যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে উপজাত বৈদ্যুৎ চৌম্বক বারবেলটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। ওটাকে তুলতে হলে গোটা ওজনযন্ত্র সমেত তুলতে হত পেল্লাদকে।

আমার বৈদ্যুতিক মামার দৌলতে এটা জানা ছিল আমার।

বাসের মধ্যে আবাস

অবশেষে নতুন আবাসে এসে ওঠা গেল। বাস-অস্থানও বলা যায়, কিন্তু তাহলেও বাস্তুসমস্যার Bus-তব সমাধান হলো একটা...

বাড়ি একবার ছাড়লে কি এ-বাজারে মেলে আর? বিনি বলেছিল, 'মিলবে। আলবাৎ মিলবে।'

কিন্তু পরে দেখা গেল তা all বাৎ। নিছক কথার কথাই!

বাড়িওয়ালা নাকি তাকে কথা দিয়েছিল যে, আমাদের অবর্তমানে তিনি ভাড়া দেবেন না কাউকে। আমরা না আসা পর্যন্ত বাসা তাঁর ফাঁকাই থাকবে! বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, এবং ভদ্রলোকের হচ্ছে এক কথা......

বলে বিনি তার নিজের কথা বলল, 'বাড়ি যখন খালিই থাকবে, তখন খালি-খালি ভাড়া গোনা কেন?'

উচ্চগণিতের মধ্যে না পড়লেও বিনির কথাগুলি তুচ্ছ করার মত নয়। গণনা করবার মতনই বটে! ভাড়ার টাকার মতই দামী কথা, বলতে কি!

অতএব বিনির কথায় (উক্ত ভদ্রলোকের কথা তার মধ্যে উহ্য) বাড়ি ছেড়ে পা বাড়ালাম, কলকাতার থেকে ছাড়ান পেয়ে বেশ কিছুদিন টো-টো করে বেড়ানো গেল এখানে সেখানে।

নানা প্রদেশে নানান হস্তাবস্তা খেয়ে পরিশেষে নিজের দ্বারদেশে ফেরত এসে দেখলাম—ওমা। একি? বাড়ির একেবারে তালাক হয়ে গেছে যে! বাড়িটা —হ্যাঁ— ফাঁকাই রয়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে ঢোকার কোন ফাঁক নেই। তালাবন্ধ একদম!

এবং এ তালা সে তালা নয়। মানে, আমরা যে তালা মেরে গেছলাম কার দয়ায় সেটা মারা পড়েছে ইতিমধ্যে।

দেখা গেল, বিনির কথাগুলো নিতান্তই কথার কথা—(বাড়িওয়ালার কথা তার মধ্যে গুহ্য)। টাকার মতই দামী কথা যে, তার কোনো ভুল নেই,— তেমনি আবার টাকার মতই বাজে। মানে, রুপোর টাকার মতই বাজতে থাকে।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ; আর ভদ্রলোকের এক কথা। ভদ্রলোক স্পষ্টই জানালেন যে তিনি যা বলেছিলেন তাঁর সেই কথাই পাক্কা। বাড়ি তিনি খালিই রাখবেন, ভাড়া দেবেন না, কাউকেই নয়—তা আমাদের অবর্তমানেই কী ! আর, আমরা এসে বর্তমান হলেই বা কী ! এবং একবার যখন আমরা নিজগুণে উঠে গেছি, তখন সেই গুণফলের ওপর নতুন করে ফের যোগের আঁক কষতে তিনি বসবেন না। কোন অনুযোগ রাখবেন না কারো। তাঁর বাড়ির ভাগ্যে কাউকে ভাগ বসাতে দিতে তিনি রাজি নন। তাঁর সেই এক কথা—তখনো, এখনো।

বলেই তিনি তাঁর এক কথার সঙ্গে আরো অনেক কথা তুললেন। সব কথা খুললেন একে একে···

আমাদের তোলার জন্যে তিনি থানা পুলিস করেন নি, তা সত্যি। যান নি আদালতেও। সাদা পথে যে সুবিধে হবে না, কেমন করে যেন তিনি বুঝেছিলেন। বাঁকাচোরা পথে ঘুরেছেন প্রচুর। তলে-তলে চেষ্টার তাঁর কসুর ছিল না—আমাদের তোলবার। নিজেই তিনি বিশদভাবে বিবৃত করলেন। পাড়ার কাছাকাছি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটা জানা গেল তাঁরই বাঁধানো। একদল হিন্দু লুঙ্গি পরে আরেক দল ধুতিপরা হিন্দুকে ধরে ঠেঙিয়েছে এর জন্যে হতাহত কেউ না হলেও দুদলকেই বেশ টাকা খসাতে হয়েছে তাঁর। ভূতে ভয় দেখিয়ে ভাড়াটে ভাগানো সেকেলে কায়দার নতুন সংস্করণ এটা। তবুও আমরা নড়িনি, প্রাণ হাতে করে বাস করেছি ; কিন্তু প্রাণ থাকতে বাসা বেহাত করিনি। আমাদের বাড়িতে ইট ছুঁড়েছিলেন, সিঁধেল চোর ছেড়েছিলেন, তবুও আমরা অনড় থেকেছি। পাড়ার জমাদারকে ঘুষ দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে ডাস্টবিন খাড়া করা তাঁরই কীর্তি। আশা ছিল, যত বড় হনুমানই হোক, গন্ধমাদনের আমদানিতে লাফিয়ে না উঠে পারবে না। কিন্তু বৃথাই ! বাড়ির গা-লাগা নিজের দিকটায় রেডিয়ো বসিয়েছিলেন—লাউডস্পীকার সমেত, কিন্তু বেতারজগৎ হার মেনে গেল, বেতরিবৎ আমাদের কাছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর পাশের বস্তিতে, বলতে কি, লোহাওয়ালাদের এনে তিনি বসালেন। সারাদিন ধরে তাদের ঢং দেখে—না, দেখে নয়, শুনে—তাদের অবিশ্রাম ঢনৎকারে যদি আমাদের টনক নড়ে। চিত্তির যদি চিড় খায় লোহার ঘায়। কিন্তু কী আশ্চর্য, লোহা আর লক্কড় পাশপাশি বাস করতে লাগল।

কিছুতেই কিছু হয়নি। কলকাতার প্লেগ তাঁর আমদানি কি না জানা যায়নি যদিও, তবে কালীঘাটে মেনেছিলেন, 'হে মা কালী, আর কিছু না, মা,—

ভূমিকম্প ! তাছাড়া তো হতভাগাদের ভাগানো যাবে না দেখছি ! ভূমিকম্প দাও মা ! তাতে আমার বাড়িঘর চুলোয় যায় তো যাক, কিন্তু যাক ওরাও ! আমার বাড়ি ভেঙে পড়ুক ওদের ঘাড়ে—করিবরগা-সমেত রসাতলে যাক ভাড়াটেদের সাথেই ! রক্ষা করো মা, রক্ষাকালী ! দয়া করো মা তাই করো !'

এই বাড়ি আর ইহলোক যাতে আমরা একসঙ্গে ত্যাগ করি—এমনকি, আমাদের কলকাতা-লীলা সংবরণ করেও - সে-প্রার্থনা জানাতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। অবশেষে এত কাণ্ডের পর মা কালী যখন মুখ তুলে চাইলেন এবং এই মাকালরাও…তখন পাকাঘুঁটি—তাঁর পাকা বাড়ি হাতে পেয়ে সাধ করে আবার তিনি কাঁচাবেন, এত বড় আহাম্মক তিনি নন। তাঁর সাফ কথা।

তার পরের কথা, বিনির কথাই, সেও বেশ পরিষ্কার। সে বললে, 'অন্য বাড়ি দ্যাখ দাদা !'

আরেক দামী কথা, টাকার মত ট্যাঁকসই। ট্যাঁক-ট্যাঁক করে বলা যায় বেশ।

কিন্তু দ্যাখো বললেই কি দেখা মেলে ? বাড়ি হচ্ছে ভগবান আর বীজাণুর ন্যায়। সর্বত্রই ছড়িয়ে। কিন্তু যতই তার বাড়াবাড়ি থাক, দেখতে চাইলে কিছুতেই দর্শন দেন না ! দর্শনী দিলেও নয়।

আরো সব বাড়িওয়ালাদের বাজিয়ে দেখি। বাড়ি বাড়ি আগিয়ে দেখি বাগিয়ে আনা যায় কি না—চাঁদদের। কিন্তু সে ঠিক হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরবার মতই যেন ! যতই আমরা কাতর হই না কেন, হৃদয় তাদের পাথর। বইয়ে লেখে, কোনো পাথর ওলটাতে কসুর কোরো না। করিও নে আমরা ; কিন্তু অমন ভারিক্কি পাথরও যে কী করে সাবানের মতই পিছলে যায় ! আঁটাই যায় না কিছুতে, ওলটাবো কি ! আর পাথরও কি কম ? ভুঁড়ি-টুঁড়ি সব মিলিয়ে এক-একজন বিশ-বাইশ স্টোনের কম নন। কিন্তু হলে কী হবে, ধরতে গেলে আটার ভেতর সোপস্টোনের মত ধরাই যায় না একদম।

বিনিকে নিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদুনি গেয়েও, কিছু হলো না। কারু কাছেই না। বিনির মধুর হাসির বিনিময়েও নয়।

কোন বাড়ির পাথরই গলল না। গলতে দিল না আমাদের, কারো বাড়ির দরজা দিয়ে, সেই অকূল পাথারেই পড়ে রইলাম আমরা।

মরিয়া হয়ে খবর-কাগজে চড়াও হওয়া গেল - শেষটায় ! বাড়িখালির বিজ্ঞাপন খুঁজি আর খালি বাড়ির বিজ্ঞাপন ছাড়ি—বাড়ি চাই, ফ্ল্যাট চাই, ঘর চাই—কিন্তু এত ঢাকঢোল পিটেও কোনো ফল হলো না। নিদেন একটা মাট-কোঠা পেলেও হয়, তাও চাইলাম কাগজের মারফতে। যে-কোন পাড়ায় ! শ্রাবস্তি চাইনে, বস্তি হলেও খুশি। এল না কোন সাড়া। শেষে সেকালের পোড়ো বাড়ি কি একালের ঝোড়ো গুদাম খুঁজতে লাগলাম। কিংবা ছাড়া

গ্যারেজ যদি মিলে যায়—যাহোক ভাড়ায়। ঘোড়াদের আর ঘোড়েলদের পরিত্যক্ত প্রাক্তন আস্তাবলেরও খোঁজ করা গেল! এমনকি রেলওয়ে ওয়াগন, মালগাড়ির পরমাল-হওয়া কামরা পেলেও নিতে রাজি। গঙ্গাবক্ষে বজরাতেও পেছপা নই, কিন্তু হায়, বজরাঘাত দূরে থাক, একটা জেলে-ডিঙিও জুটল না বরাতে। বাকি রইল শুধু আইন ডিঙিয়ে জেলে যাওয়া। সেখানে যদি জায়গা মেলে।

আমরা যে-ধরনের উদ্বাস্তু, তার জন্যে শিয়ালদা ইস্টিশানেও স্থান ছিল না। পাকিস্তানের বিপাকে আসা নয়—কলিকাতা-ঘটি ত আমাদের জন্যে সব ভোঁ-ভোঁ। সরকারী তাঁবু বা বেসরকারী তাঁবে যাব যে, তারো জো নেই। তিলমাত্র ঠাঁই নেই কোনোখানেও—তামাম দুনিয়ায়! হিল্লী-দিল্লী—কোনখানে হিল্লে হবার নয়। কটক-ছাপরা-কানপুর-আগ্রা-আন্দামান—কোথাও নেই কোনো আমন্ত্রণ আমাদের জন্য! এমন কি, দণ্ডকারণ্যেও নয়,—একদা যথায় শ্রীরাম গেছলেন সেখানেও শিব্রামের প্রবেশ নিষেধ।

কোন কুলেই আশ্রয় নেই—মাতৃকুলে জামাতৃকুলে। বাসগৃহের সমস্যা এমনই জটিল, উদ্বাস্তু থেকে থেকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছি, সেই সময়ে একটা পুরনো বাস মিলে গেল দৈবাৎ। নতুন Bus-গৃহ জুটে গেল এই বরাতে। ভগবান রয়েছেন, বাস্তবিক!

ঠিক নতুন Bus-গৃহ নয়। আনকোরা নয় একেবারেই। অনেক কালের ঝরঝরে গাড়ি, তাহলেও ডবলডেকার। যাত্রী বহনের অযোগ্য হলেও—বাস-যোগ্যতা ছিল বইকি বাসখানার। তাছাড়া দোতলা তো বটেই!

সরকারী কি বেসরকারী বাস কে জানে, কবে হয়ত এই পথে অচল হয়েছিল আর তাকে কোনোক্রমেই ঠেলেঠুলে চালানো যায়নি—কারো কোনো ঠ্যালাতেই চলতে রাজি না হওয়ায়, কিছুতেই চালু করতে না পেরে শেষটায় তার কলকব্জা মোটর-ফোটর সব খুলে নিয়ে বাসটাকে এই ভাবে বিপথে ঠেলে দিয়ে ফেলে গেছে! যাই হোক, গাড়িখানাকে প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই ঢাকুরের রাস্তায়—এক আঁস্তাকুড়ের ধারে পাওয়া গেল।

সারা কলকাতা চুঁড়ে, শহরতলির উপকূলে Bus-উপযোগী বেওয়ারিশ জায়গা পাওয়া গেল ঐখানেই। আঁস্তাকুড়ের কিনারে আস্তানার কিনারা হল। আবর্জনার আওতায় হলেও নিতান্ত কুঁড়েঘর তো নয়! দস্তুরমতই দোতলা বাড়ি বলতে হয়। একেবারে একেলে বাসতবাটি!

সত্যি বলতে, কলকাতার ভাড়াটে-বাড়ির যা কিছু সুখ-সুবিধা সবই পেলাম এবার Bus-তবিক! কী নেই এই নতুন আ-Bus-এ? যা যা না থাকবার, তার সবই আছে ঠিক ঠিক! কল জল পায়খানা—কিছুই ছিল না। বাথরুম নেইকো। ইলেকট্রিক কনেকশনও নাস্তি। কিন্তু না থাক, মাথার উপরে ছাত আছে। আছে আরেক তলা। তারপর ঐ লঝ্ঝর বাস নিয়ে যিনি যা বানালো একখানা, সাবাস বলতে হয়। মিস্ত্রী মজুর লাগিয়ে দোতলার সীট-

গুলো খোলালো ; এক-তলার গদিগুলো তোলা হলো—দোতলায় খাসা দুটি চৌকি পড়ল পাশাপাশি। গদিপাতা নরম বিছানা গড়ালো—গদগদ হবার মতই। আর, বাতায়ন ছিল দুধারেই বাসটার—যেমন থাকে। অলিন্দ না থাকলেও দু-একটা অলি মাঝে মাঝে গুন গুন করে আসছিল, আর ভোঁ-ভোঁ হয়ে যাচ্ছিল আবার নিজগুণেই ! তাছাড়া, খড়খড়ি-ভাঙা আর আভাঙা—দুরকমেরই জানলা ছিল,—তার ওপরে পর্দা পড়ল বিনির। রঙ চড়ল বাসের গায়ে। ভদ্রলোকের বাসা হয়ে উঠল দেখতে না দেখতে।

একতলার আসনগুলি তোলা হলো না। সিঁড়িটাও রইল সেইরকম। ঘণ্টাটাও আমরা রাখলাম। কলিং বেলের কাজে লাগবে। যদি কেউ দেখা করতে আসে, রীতিমতন ঢং করে আসতে হবে তাকে। না থাক দারোয়ান, দ্বারদেশের এই ঢনৎকারের দ্বারাই আগন্তুকের আগমনবার্তা মালুম হবে।

দোতলা হলো আমাদের শোবার ঘর। একতলাটা বসবার ; সকলের অভ্যাগতি-অভ্যর্থনার জন্য। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আমন্ত্রিত, অনাহূতদের আড্ডাখানা জমবে সেখানে। যদি কেউ বাড়ি বয়ে জমাতে আসে।

আমাদের খাবার ঘর ঐ নীচেতেই। রান্নাবান্না অবশ্যি দোতলারই এক কোণে হবে। স্টোভে-কুকারে রান্না—হাঙ্গাম নেই কোনো। অদূরেই ছিল টিউবওয়েল। বাসকষ্ট, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট—সব মিটল একসঙ্গে। এতদিনের পর।

ঠিকানা চান ? রাস্তার নাম আমাদের জানা নেই মশাই ! তবে, বাড়ির নম্বর বাতলাতে পারি। নং 2A।

তারপর শুরু হলো আমাদের বসবাস। ২এ নম্বরে হপ্তা-দুয়েক কাটল বেশ। মুক্ত আরামে না হলেও, মুক্তির আরামে তো বটেই। এমন সময়ে ঘটল এক অঘটন।

অঘটনই বলা যায়। সরকারী বাসখানার দপ্তর থেকে এলেন একজনা একদিন। কি করে টের পেলেন কে জানে ! এসে বললেন—'ভাড়া দিন মশাই !'

'ভাড়া কিসের !' অবাক হলাম আমরা।

'বাড়ি ভাড়াটা দিন। বসবাস করছেন, ভাড়া দিতে হবে না বাসটার ?'

'আপনাদের ফেলে-দিয়ে যাওয়া বাস তো ! পোড়ো বাসের আবার ভাড়া লাগে না কি ফের ?'

'আমাদের পোড়ো বাস অমনি পড়ে থাকবে। কিন্তু থাকতে গেলেই ভাড়া দিতে হবে। কর্পোরেশনকেও ট্যাকসো দিতে হতে পারে হয়ত।'

শুনে বিনির চোখ তো ছানাবড়া।—'আবার মাস মাস ভাড়া গুনতে হবে দাদা !'

'ভাড়া দেবার দরকার কি !' বাতলালেন ভদ্রলোক, 'কিনে নিন না কেন আউটরাইট।'

'কিনে নিলে বাড়ির রাইট সর্বস্বত্ব আমাদেরই বর্তাবে তো ? কেউ তো আর উৎখাত করতে পারবে না আমাদের ?'

'কে আর এমন বাড়ির থেকে তুলতে আসবে আপনাদের—ঢাকুরের এই আঁস্তাকুড়ে ? কার এত গরজ মশাই ? কিনে নিন বরং, নামমাত্র দামে বেচে দেব আমরা।'

বিনির পরামর্শে কিনে ফেলাই গেল। সাতটা গল্প আর পাঁচটা কবিতার দাম বেরিয়ে গেল কিনতে গিয়ে—এক ধাক্কায়। সাত পাঁচ ভেবে মন খারাপ করে আর কী হবে ? কিন্তু তার পরেও দুর্ঘটনা ছিল বরাতে।

হঠাৎ একদিন মাঝরাতে বিনি আমার ঘুম ভাঙালো, চাপা গলায়—'দাদা, শুনেছ ?'

শুনে আমি চমকে উঠলাম। উঠে বসলাম বিছানায়। জ্বাললাম আমার টর্চ। জেলে দেখি, বিনি বসে বিবর্ণমুখে নিজের শয্যায়।

'কী শুনব ? অ্যাঁ ?' আমি শুধাই।

'শুনেছ না ? শুনতে পাচ্ছ না নীচে ?'

কান পাতলাম আমি। নীচতলায় কিসের যেন দুপ দাপ! কার যেন চলার শব্দ, ঠিকই তো! তলার থেকে ভাঙা-গলার আওয়াজ এল—'টিকিট! টিকিট হয়েছে দাদা ?'

কান খাড়া হলো আমাদের। সঙ্গে সঙ্গেই কর্ণবিদারী ধ্বনি শোনা গেল, 'খালি গাড়ি কালীঘাট—কালীঘাট-গড়িয়াহাট!'

অ্যাঁ ? এ-কি ? এ আবার কোন পাগলের কাণ্ড ? রাত দুপুরে বাস চালাবার এই প্যাগল্যামি চাপলো কার মাথায় ? কার এই বিশ্রী বদরসিকতা ?

সিঁড়ির মুখে গিয়ে উঁকি মারলাম নীচেয়—একতলা অন্ধকার। আরো তলায় একটু ঝুঁকি মারলাম তার পর। কই, কেউ তো কোথথাও নেই! টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল—কেউ না। নেমে গিয়ে বাসের চারপাশে ঘুরে এলাম—দেখলাম চারধার—টর্চের আলো দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে টর্চার করে—ভাল করে খুঁটিয়ে যদ্দুর দেখা যায়, না, ত্রিসীমানায় কেউ নেই—কোনোখানেই না।

ফিরে এলাম নিজের বিছানায় ফের। একটু যেতেই না আবার—আবার সেই কণ্ঠস্বর, ভাঙা-গলার খোনা আওয়াজ—

'টিকিট ? টিকিট বাকি আছে কারো ? টিকিট ?'

তার উপরে ঢং করা রয়েছে আবার! থেমে থেমে—ঢং আর ঢং ঢং—গাড়ি থামা, গাড়ি ছাড়ার ইশারা।

এ-ছাড়াও, 'আগে বাড়ুন—সিঁড়ির মুখে দাঁড়াবেন না। ওপরে যান—ওপর খালি।—সিঁড়ির কাছে ভিড় করবেন না কেউ।' ঘণ্টার ইশারার ওপর এসব সাড়া তো আছেই!

কিন্তু আমি আর চৌকিদারি করতে নামলাম না, কাঁপতে লাগলাম বসে বসে নিজের চৌকিতে।

আমার আবার হার্ট-ট্রাবল। হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে ভববন্ধন মোচন হলেই হলো। আর, হলেই বা যাব কোথায়? মরেও তো নিস্তার নেই! এই পোড়ো বাস আশ্রয় করে এখানেই পড়ে থাকতে হবে কামড়ে—আমার মাসতুতো বোনের বাসতুতো ভাই হয়ে! স্বর্গে—নরকে—কোথায় আর গতি হবে আমার? ভাবতেও বুক কাঁপে আরো।

'আমার ভারী ভয় করছে বাপু!' বিনি বলে।

'ভয় কিসের?' কম্পিত কণ্ঠে আমি ওকে সাহস দিই—'ভূত। বিলকুল ভুতুড়ে। ভূত ছাড়া আর কিছু নয়। ভৌতিক ব্যাপার, ভয়ের কিছু নেই।

'ভয়ের কিছু নেই?'

'ভয়ের কী? বিভূতিবাবুর 'দেবযান' পড়িসনি? ভূত তো চারধারেই আছে, ঘুরছে ফিরছে, হাওয়া খাচ্ছে। কেবল আমরা তাদের টের পাইনে। টের পাইনে বলেই ভয় খাইনে। ইনি শুধু দয়া করে টের পাওয়াচ্ছেন আমাদের, এই যা। তা—তা—তা ভূ-ভূতে ঘা-ঘা-ঘাবড়াবার কী-কী আছে?'

'ঘাবড়াবার নেই?'

'সজীব তো নয়, তবে ভয় কী? সলিড নয়, মারধোর করতে পারবে না তো। অবশ্যি, ঠিক ঠিক নির্জীবও না—তুষারবাবুর 'বিচিত্র কাহিনী' 'আরো বিচিত্র কাহিনী' পড়েছিস তো? সেই-সেই তাদের মতই জলজ্যান্ত একটা—তা, এই বাসটা মনে কর না, সেই বিচিত্র রকমের এক উপদেব-যান। ভূতরা তো কিলবিল করছে চারধারেই—জীবাণুদের মতই। ইনি—মানে, আমাদের এই ভদ্রলোক সেই পাঁচটারই একটা মাত্র।'

'পাঁচটার একটা—বল কী গো? আৎকে ওঠে ও: 'আরো পাঁচটা ভূত আছে নাকি এখানে?'

'পঞ্চভূতও বলা যায়। তবে, এটি ষষ্ঠ ভূত। যদ্দুর আমার মনে হয়।' আমার ধারণা ব্যক্ত করি, 'তাহলেও, একটাই তো। এতে ভয় কিসের? আমরা দু দু-জন আছি যেকালে একজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে!'

'একটাই যে কেবল, তা কে বলবে?' বিনি বলে: 'কে জানে, নীচের তলায় আরো সব ভূত ভিড় করেছে কি না! ও যাদের সঙ্গে কথা কইচে, টিকিট কাটছে যাদের, উঠছে নামছে যারা, তারা—তারাও সবাই হয়তো···'

ভয়ে ওর গলা বুজে আসে। সে ভেঙে পড়ে। ভুতুড়ে যাত্রীদের কথা ভেবে আমিও যে মচকাইনে তা নয়। তাহলেও মুখের সাহস দেখাতেই হয়—'হলেই বা। তারা তো কিছু বলছে না আমাদের। উচ্চবাচ্য করছে না তো। যে-ভূত জানান দেয় না, তার হাতে জান যাবার ভয় নেই—এমনকি, সে যদি কোনো জানানা ভূতও হয় তাহলেও।'

এইরকম ঘটতে লাগল—রাতের পর রাত।

'টিকিট, টিকিট বাকি আছে কারো? মেয়েছেলে নামছে—বাঁধকে—বাঁধকে—একদম বেঁধে···আসুন···চলে আসুন···খালি গাড়ি—কালীঘাট! লেক-গড়িয়াহাটা···'

আর, থেকে থেকে ক্রিং···ক্রিং ক্রিং···সেই ক্রিংকার! ওর তিড়িং-বিড়িং-এর ওপরে এই কিড়িং কিড়িং—এতেই আরো বেশি করে পিলে চমকায়! কিন্তু চলল এমনিধারা। ভাঙা-গলার একঘেয়েমি—চলতে লাগল ধারাবাহিক। ফাঁক নেই এক রাত্তিরও। পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হল আমাদের।

যাদের থেকে বাস কিনেছিলাম, গেলাম সেই বাস কোম্পানির দপ্তরে। তাঁরা যে কিছু বিহিত করতে পারবেন যদিও সে-ভরসা ছিল না, কিন্তু তবু তো কিছু একটা করতে হয়। সেইজন্যে যাওয়া।

'দেখুন মশাই, আপনারা ভাল বলে বেচেছেন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আপনারা একটা হানাবাড়ি গছিয়ে দিয়েছেন আমাদের! আপনাদের এই পোড়ো বাস ভূতের একটা আড্ডাখানা ছাড়া কিছু না···'

এই বলে সেই ভূতুড়ে বাসটায় যা যা ঘটেছে, যেমন যেমনটি শুনেছি—শুনিয়ে দিলাম অকপটে।

'আপনাদের জনৈক কনডাকটার—কনডাকট তার আদৌ ভাল নয় রোজ রাত দুপুরে এসে তিক্ত-বিরক্ত করছে আমাদের···'

শুনে প্রথমে তারা ভাবল, আমি ক্ষেপে গেছি হয়ত। তখন আর চেপে না রেখে ফলাও করে, যতটা সাধ্য সেই মৌলিক গলার অবিকল নকল করে, বিশদ করতে হলো—ওস্তাদি কসরত করে বোঝাতে হলো আমায়।

শুনে তাঁদের টনক নড়ল। তাঁদের ড্রাইভারদের একজন বললে, 'মনে হচ্ছে আমাদের জনার্দন। বুড়ো জনার্দনই এসেছে আমার মালুম। আচ্ছা, গলাটা কি একটু খোনা খোনা?'

'হ্যাঁ, যদ্দুর হতে হয়।' আমি জানাই, 'হ্যাঁ, খোনারে বচন তাকে বলা যায় বটে।'

'তাহলে বুড়ো জনার্দনই। আর কেউ নয়। গত দশবছর ধরে এই লাইনে সে বাস চালিয়েছিল। তারপর এক বাস অ্যাকসিডেণ্টে—ঐ বাসটার সঙ্গে আরেক বাসের ধাক্কা লাগার ফলেই···তা, বলুন তো আমরা এর আর কী করতে পারি?'

'বাঃ, আপনারা কী করতে পারেন! আপনাদের লোক আমাদের বাড়িতে হানা দিচ্ছে—উপদ্রব করছে—রোজ রোজ। ঘুমুতে দিচ্ছে না মোটেই আমাদের—আর আপনারা বলছেন, কী করতে পারেন!'

আমি অবাক হবার চেষ্টা করি।

'কিন্তু সে তো আর আমাদের চাকরিতে নেই মশাই! এখানকার লোক নয়কো সে আর। এখন সে পরলোকে।'

'তা বলে আপনি কি বলেন, এই বে-আইনী ট্রেসপাস বরদাস্ত করতে হবে আমাদের ?'

'পুলিসে খবর দিন তাহলে। আইনের মালিক তারাই। আইন মানানো তাদের কাজ।'

কথাটা আমার মনে লাগে। তাড়াবার মালিক যদি কেউ থাকে—তারাই। তাড়াতাড়ি হবার কাজ কি না জানিনে, তবে তাড়া দেওয়া তাদেরই কাজ বটে। সায়েস্তা খাঁ তারাই। তাঁরাই পারেন সবাইকে সায়েস্তা করতে।

এক পুলিস-অফিসারের সঙ্গে সামান্য একটু খাতির ছিল। ছুটলাম সেই আননবাবুর কাছে। সমস্ত শুনে-টুনে তিনি বললেন, 'থাকতে হবে আমায় এক রাত্তির আপনাদের বাসায়। স্বচক্ষে দেখতে হবে সব।'

এলেন তিনি যদিও দেখতে পেলেন না কিছুই তবে হ্যাঁ, শুনলেন বইকি সব। শোনার মতই শুনলেন। জনার্দন দেখা দিল না বটে, তবে সবকিছুই সে শুনিয়ে দিল একে-একে – তার পার্টের একটুও বাদ না দিয়ে—কাটছাঁট না করেই কাঠখোট্টা গলায় বাজিয়ে গেল অবিকল। তিলমাত্র বাতিল না করে - এমনকি, ওর সেই কিড়িং-কিড়িং পর্যন্ত।

ভূমিকার কিছু তো ছাড়লই না, তার ওপর তার ভূতুড়ে স্বরের সঙ্গে ছড়ালো অদ্ভূত ব্যঞ্জনা ! নিজের ঢংটিও বজায় রাখল রীতিমতন। বাক্যের ঝংকারের সঙ্গে বাজনার টংকার। সংলাপের সাথে তাল রেখে আবহসংগীত।

নিজের পালার আড়াগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে সে পালাল যথাসময়ে যথারীতি যেমন যায়।

'আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা করব এখন।'

এই বলে আননবাবু তো বিদায় নিলেন। তার পরদিনই বিকেলে আনলেন এক নোটিশ—এনে সেটা সেঁটে দিলেন বাসের একতলায়, সামনের দিকের দেওয়ালে। দিয়ে বললেন –'আপনাদের জন্যই ছাপানো এটা এসপেসিয়্যালি—এই একটি কপি মাত্র। দেখুন তো কী হয় এর পর, আজ রাত্রেই টের পাবেন – দেখতে পাবেন।'

দেখবার কিছুই ছিল না, তবুও রাত তো আমাদের নির্নিমেষেই কাটে। চোখ না বুজে কান খাড়া করেই কাটাতে হয়। এক পলের জন্যেও পলক ফেলতে দেয় না।

সেদিন রাত্রেও এল জনার্দন ! ভাঙা গলার সাবেকি ঢং নিয়ে। ভাড়ার জন্য তাড়া লাগালো আবার। আগের মতই বোল-চাল ঝাড়ল। বলতে বলতে, তার বাগাড়ম্বরের মাঝখানেই থেমে গেল সে হঠাৎ। চেঁচিয়ে উঠল সে তারপরেই 'কী ! এ কী ? এসব কী ! নাঃ, এমন জুলুম হলে কাজ করা চলে না আর ! এরকম চললে বাসের লাইনে থাকা পোষাবে না আমাদের ! না মশাই, না—আমার কম্মো নয় আর। এখানে আর এক দণ্ড নয়। এক মিনিট না…'

এই না বলে গট-গট করে সে নেমে গেল বাস থেকে—শুনতে পেলাম স্পষ্টই। সেই যে গেল, তারপরে চার মাস গেল, আর তার দেখা নেই। আর তার 'শোনা' পাইনে আমরা। সে আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেল, চিরদিনের মতই ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়ে গেল আমাদের।

কেন এমনটা হলো, জানার কৌতূহলে ডেকে আনা হলো আননবাবুকে। বিনি তাঁকে চায়ের নেমন্তন্ন করল একদিন।

পানাহার-শেষে তিনি প্রকাশ করলেন, 'যে নোটিশটা লাগিয়ে গেছলাম, সেটা কি পড়ে দেখেননি নাকি? চোখ বুলিয়ে দেখুন না একবার—টের পাবেন তাহলেই!'

নোটিশ-বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিটা আমরা পড়ি গিয়ে। সরকারী ঘোষণায় সেখানে লেখা রয়েছে দেখা গেল—

সরকারী নোটিশ

'এতদ্দ্বারা বাসের কণ্ডাকটারদিগকে জানানো যাইতেছে যে, অতঃপর হইতে বাসে যতগুলি সীটে যতজনা বসিয়া যাইতে পারে তাহার বেশি আর একটি বাড়তি লোকও লওয়া চলিবেক না। বাসের ভিতরে দাঁড়াইয়া যাওয়া রহিত হইল। ফুটবোর্ডে মাডগার্ডে কিংবা বামপারে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। যাত্রী ডাকিবার জন্য হাঁকাহাঁকি করা রহিত হইল। অপর বাসের সহিত আড়াআড়ি কিংবা রেসারেসি করা চলিবেক না। কখনো কখনো ঢিমে-তেতালায়, কখনো বা ঊর্ধ্বশ্বাসে—বাসের এরূপ গতিবিধি একেবারে নিষিদ্ধ করা হইল। কেহ ইহা অমান্য করিলে বা ইহার কোনরূপ অন্যথা হইলে আইনত দণ্ডনীয় হইবেক।'

'পড়লাম তো, কিন্তু এর সঙ্গে জনার্দনের কী সম্পর্ক?' মাথা চুলকাই আমি—'এর মানে তো ঠিক বুঝতে পারছিনে মশাই!'

'পারছেন না? এই নতুন নোটিশটা দেখেই সরেছে সে। এইসব নিয়ম মেনে চলতে সে নারাজ। সে কেন, এ ধরনের কানুন চালু হলে কোন কণ্ডাকটারই বাস চালাতে রাজি হবে না। যদ্দিন না এই হুকুম রদ করা হবে, পালটানো হবে এই নোটিশ—তদ্দিন চলবে তার এই ধর্মঘট।'

'তাহলে ও নোটিশ আর পালটানে হবে না'—বলল বিনি—'লটকানো থাকবে ঐখানেই। যদ্দিন না এ-বাসা—মানে, আমাদের এ-বাস ওলটায়।'

বলে আননবাবুর জন্যে আরেক পেয়ালা চা সে ঢালল—সহাস্য-আননেই।

ছত্রপতি শিবজী

বর্ষা ঋতুতে প্রায় সব কিছুতেই ছাতা পড়ে, এমনকি মানুষের মাথাতেও। এই কথাটাই বিনি পইপই করে বোঝাচ্ছিল আমায়।

বর্ষা এসে গেল, কিন্তু আমাদের মাথায় ছাতা পড়ার এত দেরি হচ্ছে কেন দাদা? এই ছিল তার প্রশ্ন।

কলকাতায় থাকতে ছাতার কথা মনে হয় নি কখনো। তার অভাব বোধ করি নি কোনোদিন। রোদ্দুরের দিনে তো নয়ই!

কলকাতার পথঘাট এমন ভাবে বানানো (কোনো বড়ো বাস্তুকারের জ্যামিতিক মারপ্যাঁচ কিছু হয়তো থাকতে পারে এর পেছনে), রাস্তার একধারে না একধারে সব সময় ছায়া পড়বেই।

আর বর্ষার দিনে?

বহুত বাড়িরই পথঢাকা বারান্দা আছে, বৃষ্টি নামলে তার তলায় গিয়ে দাঁড়াও। তারপর বৃষ্টি ছাড়লে পা বাড়াও আবার। ছাতা দিয়ে মাথা বাঁচাবার দরকার করবে না।

কিন্তু মাঝে মাঝে বাড়ির বারান্দা মানুষের মাথার ওপরে ভেঙে পড়ে বাড়াবাড়ি করেছে এমন খবর কাগজের পাতায় দেখা যায় না যে তা নয়। বলতে কি, অনেক বাড়ির বারান্দাই ছাতা-পড়া; সাতাত্তর বছর আগেকার বানানো সেকেলে বাড়ি সব।

কিন্তু সে কদাচ। নেহাত ভাঙা কপাল না হলে কপালে বারান্দা ভেঙে পড়ে না কারো।

কিন্তু কোন্নগরে আসতেই ছাতার দরকার দেখা দিল আমাদের।

সূর্যমুখীর পিত্রালয়, এমন কিছু অজ পাড়া-গাঁ নয়।

রাস্তার ওপরেই বাড়ি আর রাস্তার ওপারেই গঙ্গা। পরিষ্কার পরিদৃশ্যমান। গঙ্গার ঘাটে সেই সুবিখ্যাত দ্বাদশ শিবমন্দির।

খানচারেক ঘরওয়ালা ছোটখাট দোতলা বাড়িটা ভালোই বলতে হবে। বাড়িটার ডানধারে ছেলেদের খেলবার মাঠ। মাঠের লাগাও ইস্কুল আবার।

সামনের রাস্তায় কলকাতার বাস যায়। সেই বাসে চেপে আমাকেও যেতে হয় কলকাতায়—ট্রেন ধরেও যাই—প্রায় রোজই বলতে গেলে।

কলকাতাতেই আমার যত কাজ আর অকাজ। কলকাতা ছাড়া আমার চলে না।

বেশ ছিলাম বাপু কলকাতায়। কলকাতা ছাড়তে আমি চাই নি। আমার মত কলকাতাসক্ত লোকের পক্ষে কলকাতা ছাড়া শক্ত খুব, কিন্তু সেই যে প্রথম ভাগে লেখা আছে, মাসী যেন কার ফাঁসির কারণ হয়েছিল, তেমনি আমার এক মাসী অকস্মাৎ উদিত হয়ে ফাঁসিয়ে দিলেন আমাদের। কলকাতা-ছাড়া করে টেনে আনলেন তাঁর কোন্নগরে।

কাশী যাবার জন্যে হঠাৎ কোমর বাঁধলেন মা। বললেন, 'বুড়ো হয়েছি, এবার গিয়ে কাশীবাস করবো।'

খবর পেয়ে ছুটে এলেন মাসীমা, মাসতুতো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, 'কাশী যাবে কেন দিদি, আমাদের কোন্নগরে এসো না!'

'কোথায় কাশী আর কোথায় কোন্নগর!!' চোখ কপালে উঠল মাতৃদেবীর।

'কেন দিদি, শাস্তরেই তো বলেছে—গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। কোন্নগর তো গঙ্গার পশ্চিমেই বটে গো দিদি! তবে কাশী নয় কেন শুনি?'

'কাশীতে একটা শিব, কোন্নগরে এক ডজন।' দৃষ্টান্ত দেখায় মাসতুতো ভাই। 'বারাণসীর বারোগুণ ফল।' জানায় সে।

মাসীমারা চিরদিনই ফাঁসিয়ে দেন, আমি জানি। ফাঁসিকাঠের সামনে এসে প্রথম ভাগের ভুবন অন্ধকার দেখেছিল আমি কোন্নগরে এসে এখন ভুবন অন্ধকার দেখছি।

দুঃখ এই যে, কামড়াবার কোনো উপায় নেই; মাসীমার কান বিলকুল আমার নাগালের বাইরে। আমার খেদোক্তি তাঁর কর্ণকুহরে পেঁছচ্ছে না।

কলকাতা ছেড়ে এখানে আসা আমার পক্ষে যেন বনবাস।

আর বনবাস যে কী কষ্টের, বোনের সঙ্গে বাস করেই আমার হাড়ে হাড়ে মালুম। বিনির সঙ্গে কোনদিনই—কিছুতেই আমি পারিনে। পেরে উঠিনে

'রোজ রোজ চাকরির ধান্দায় কলকাতা যাচ্ছো দাদা! আর সামান্য একটা

ছাতা কেনার কথা তোমার মনে থাকে না—আচ্ছা তো!' ইনিয়ে বিনিয়ে সে বলে।

'আর চাকরির ধান্দা নয় দিদিমণি! চাকরি আমার কবজায়। পেয়ে গেছি চাকরি। সেলসম্যানের কাজ। এই দ্যাখ, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার আমার পকেটেই। আজই গিয়ে কাজে লাগব জানিস?'

'তবে আর কি! কাউণ্টার আলো করে বোসো গে। আর খদ্দের এলে ভুজুং ভাজাং দিয়ে গছিয়ে দাও যতো আজেবাজে জিনিস।'

'কাউণ্টার নয় দিদি, রীতিমতন এনকাউণ্টার। কাউণ্টার টু দি পাওয়ার এন। খদ্দেরের সঙ্গে লড়াই করে তাকে কাবু করে আনা। বললুম না, সেলসম্যানের কাজ।···সাদা বাংলায় বলে ফিরিওলা।' আমি জানাই।

'চাই অবাক জলপান ঘুগনিদানা··· ?'

'প্রায় তাই। দুপুরবেলায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্তা-গিন্নিদের কাছে জিনিস বেচে আসা···' আমি প্রকাশ করি: 'তবে সারাদিনে একটা বেচতে পারলেই এক গাদা টাকা। মোটা কমিশন আছে বুঝলি—বেতনের উপর—উপরি।'

'তবে তো ভালোই। সেইজন্যেই ছাতার কথাটা তোমার মনে থাকে না, বুঝছি এখন। কিন্তু বর্ষা তো এসে গেল। ছাতা না হলে কি এই শহরতলিতে চলবে একদিনও?' মনে করিয়ে দেয় সে।

'মনে থাকবে না কেন, মনে করে রাখতে তো চাই। কিন্তু ছাতারা যেমন হারায় তেমনি ছাতার কথাটাও হারিয়ে যায় যে কখন!'

'বলি, ইতিহাস তো পড়েচো? সামান্য ইতিহাসের কথাটাও মনে থাকে না তোমার?'

ছাতার আবার ইতিহাস? শুনেই আমার মাথা ঘোরে। ইতিহাস তো কবে পড়েছি, সেই ছোটবেলায়। সেই বইটা কোথায় এখন—কোন আলমারিতে কে জানে! হয়তো সেই ইতিহাসে এতদিনে ছাতা পড়ে থাকবে, কিন্তু ছাতার কথা ইতিহাসের কোথাও পড়েছি বলে তো মনে পড়ে না।

কথাটা ব্যক্ত করতেই সে ফোঁস করে ওঠে: 'কেন, ছত্রপতি শিবাজীর কথাটা মনে পড়ে না তোমার?'

'শিবাজী নয়, শিবজী।' ওর কথার প্রথম ছত্রের ভুলটাই শুধরে দিতে হয়: 'শিবা মানে হচ্ছে শেয়াল। কথাটা হবে ছত্রপতি শিবজী।'

'কথাটা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় দাদা!' সে বলে: 'শিবজী তো তুমি আছোই, এখন শুধু ছত্রপতি হলেই হয়।'

বিনির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারপর 'ছত্রপতি শিবজী' জপতে জপতে কোন্নগর স্টেশনে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরলাম।

ট্রেনের কামরায় উঠে দেখলাম বিনির কথাটা মিথ্যে নয়, সবার হাতেই একটা

করে ছাতা। আচমকা বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যেই—বলা বাহুল্য। বর্ষাকাল আসন্ন বটে।

হাওড়া স্টেশনে নেমে চার্কারস্থলের উদ্দেশ্যে ধাওয়া করছি, এমন সময় পেছন থেকে কার যেন হাঁক এল—'ও মশাই ! মশাই ! আমার ছাতাটা নিয়ে উধাও হচ্ছেন কেন—ও মশাই ?'

পেছন ফিরে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম, তাই তো, আমার হাতে আনকোরা একটা ছাতাই তো বটে ! তখন থেকে ছাতার কথাই মাথায় ঘুরছিল তো, তাই ভুল করে পাশের ভদ্রলোকের ছাতিটা নিয়েই নেমে এসেছি কখন !

'আপনার বুকের ছাতি তো কম নয় মশাই ! আমার চোখের ওপর নতুন ছাতিটা নিয়ে সরে পড়ছেন !' ছাতিটা হাতিয়ে টিপ্পনী কাটলেন ভদ্রলোক।

'কিছু মনে করবেন না।' কাঁচুমাচু হয়ে বলি—'সকাল থেকেই ছাতা কিনতে হবে কথাটা মাথায় ঘুরছে কিনা···ওটা অবচেতন মনের কাণ্ড, বুঝলেন কিনা !' সাফাই গাইতে যাই।

'নতুন ছাতাটা বেহাত করতে চাই না এভাবে। এটা আমি নিজে হারাবো বলেই কিনেছি কিনা।' বললেন ভদ্রলোক। 'আপনার হাতে হারাতে চাই, কিন্তু আপনার হাতে হারাতে রাজি নই আদৌ। বুঝেছেন ?'

বলে, তিনি আর দাঁড়ালেন না। তাঁরও আপিসের তাড়া।

আমিও হন্যে হয়ে বেরুলাম আমার আপিসের উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে আমার কাজ বুঝে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতা-হণ্টনে।

সটান চলে গেলাম কলকাতার দক্ষিণে। গড়িয়াহাট—গোলপার্ক—ঢাকুরে ছাড়িয়ে যোধপুর পার্কের কাছাকাছি। শুনেছিলাম বড়ো বড়ো চাকুরে আর হঠাৎ বড়লোকরা জমি নিয়ে বাড়িঘর জমিয়ে নতুন বসতি করছেন সেখানে।

এসব জিনিসের খদ্দের মিলবে সেইখানেই।

আর, এর একটা তাদের কারো কাছে বেচতে পারলেই একশ টাকার কমিশন লাভ। বেতনের ওপর বাড়তি—যার নাম দাঁও।

রওনা হবার আগে কোম্পানির ম্যানেজার সেলসম্যানের আর্ট সম্বন্ধে ভালো করে তালিম দিয়েছেন আমাকে। কী করে যে বেচতে হয়—মোটেই যে কিনতে চায় না, কী করে তার কাছেও গছানো যায় মাল, আর যে একটা কিনতে চায় তাকে দিয়ে চারটে কেনানো যায় তার যতো কায়দা কানুন—শিখিয়ে দিয়েছেন সব। এখন হাতে চাঁদ পেতে যা দেরি—যার নাম মুনাফা—moon-i-ফাও বলতে পারি !

কড়া নাড়তেই এক কিশোরী এসে দরজা খুলে দিল।

'কী চাই ? বাবা বাড়ি নেই।' দুটো কথা বলে ফেলল এক নিশ্বাসে।

'মা তো আছেন ? মা হলেই হবে।' বললাম আমি।

বলতে বলতেই মা এসে দাঁড়ালেন—'আসুন ভেতরে।'

'কী চাই বলুন তো?' শুধান মা।

'কিছু বলতে চাই।' বলেই আমি শুরু করি: 'দেখুন, আজকালকার দিনে কলকাতায় ঝি চাকর পাওয়া দারুণ দুর্ঘট হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটা বেতন দিয়েও পাবেন না আপনি। তারপরে পাওয়া গেল যদি বা, দেখা গেল তারা চুরি করে পালাচ্ছে, এরকম খবর তো আকছারই পড়ছেন কাগজে। ছুরি মেরেও পালাচ্ছে কোথাও কোথাও। এমন অবস্থায় কী করা?'...বলে ম্যানেজারের তালিম দেওয়া মতন আমার ছোট্ট বক্তৃতাটি একনাগাড়ে বলে গেলাম।

'ঠিক বলেছেন।' বললেন গিন্নিমা।

তাঁর সায় পেয়ে উৎসাহ পাই—'বাধ্য হয়ে বাড়ির গিন্নিকেই সব কাজ করতে হয় নিজের হাতে। কিন্তু তার ধকল তো নেহাৎ কম নয়। রান্না বান্না, ঝাঁট পাট, বাড়ির কাজ কি একটা? গিন্নিদের সেই কষ্ট লাঘবের জন্যে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার হচ্ছে প্রেসারকুকার, কাপড়কাচার কল, বাসন মাজার যন্তর, ঘর ঝাঁটানোর ভ্যাকুয়াম ক্লীনার...ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব রান্না হয়ে যায়, চার মিনিটে কাপড় কাচা, এক মিনিটে ঘর সাফ...পনের মিনিটে বাড়ির কাজ সেরে হাঁফ ছেড়ে গল্পের বই নিয়ে বসতে পারেন বাড়ির গিন্নি!'

বলে আমি হাঁফ ছাড়ি। কাঁধের থেকে ঝোলাটা নামিয়ে কাগজের ঠোঙাটা বার করি। তার ভেতরে ছিল যতো রাজ্যের ধুলো বালি, পাথরকুচি, ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ডিমের খোলা, চীনে বাদামের খোলস ইত্যাদি। রাস্তায় আসতে গোটাকতক কলা আর কমলা নেবু খেয়েছিলাম, তার খোসাগুলোও জমানো ছিল। জিনিসগুলো তাদের সেই ঝকঝকে তকতকে ড্রইং-রুমের সব জায়গায় ছড়িয়ে দিলাম তারপর।

'এ কি! এ কি! করছেন কি এ!' ককিয়ে উঠলেন গিন্নিমা: 'ঘর দোর সব এমন করে নোংরা করছেন কেন?'

'দেখুন না কী করি!' বলে তারপর আমার ঝোলার মধ্যের আসল জিনিসটা বার করলাম।

'এ জিনিসটি কী জানেন নিশ্চয়? এটা একটা ভ্যাকুয়াম ক্লীনার। এ যুগের বিজ্ঞানের বিরাট অবদান। মুহূর্তের মধ্যে এটি আপনার মেঝেকে পরিমার্জিত করে দেবে, ঘরের যত ধুলো বালি নোংরা ময়লা, খোলা খোসা কাগজের টুকরো পাথরের কুচি সব টেনে নেবে নিজের মধ্যে—চোখের সামনেই দেখতে পাবেন আপনারা।...'

'আর যদি না টানতে পারে তাহলে?' বাধা দিয়ে বলল মেয়েটি।

'আমি কথা দিচ্ছি আমি নিজেই টেনে নেব এসব। আর এ যদি ব্যর্থ হয় তো আমি এই মেঝের প্রত্যেকটি জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে খাব। ধুলো বালি

চেটে নেব, ছেঁড়া কাগজ চিবিয়ে খাব, গিলে ফেলব পাথরকুচিদের, আর কলার খোসা কমলা নেবুর খোসা……'

'ও সব তো সুখাদ্য।' আবার মেয়েটি বাধা দেয় আমার কথায়—'খেতেও খাসা। তার ওপর ফুল অব ভিটামিন।'

'চোখের সামনেই দেখবেন। যন্ত্রের এই তারটা এবার ঘরের ইলেকট্রিক প্লাগে লাগিয়ে দিই আগে…তারপর স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন এর কী মহিমা। প্লাগ-হোলটা কোথায়? ওই-যে—ওইখানেই তো।' আমি দেয়ালের দিকে এগোই।

'দাঁড়াও বাছা।' আমার দেয়ালায় বাধা দেন গিন্নিমা: 'আগে যদি বলতে, তোমাকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হত না। ঘর দোরও নোংরা হত না আমার। আমাদের এই বাড়িটা নতুন তৈরি। ইলেকট্রিক ফিটিংস হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও আমরা কোম্পানির থেকে কনেকশন পাই নি। দেখছ না, পাখা টাখা কিচ্ছু ঘুরছে না মাথার ওপর?'

শুনে আমার মাথায় যেন পাখা ভেঙে পড়ে। পাখাটা মাথায় না পড়ে যদি আমার ডানার জায়গায় গজাত তো তক্ষুনি আমি জানালা দিয়ে উড়ে পালাতাম সেখান থেকে।

'এবার বেশ ম্যাজিক দেখা যাবে না!' মেয়েটি হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে।

'ম্যাজিক আবার কিসের?' অবাক হয়ে মা শুধোন।

'কেন, ম্যাজিকের খেলায়, লম্বা লম্বা কাগজের চেন, ছুরি, কাঁচি, রুমাল সব গিলে ফ্যালে দ্যাখো নি তুমি? এমন কি তরোয়াল পর্যন্ত খেয়ে ফ্যালে?' মেয়েটি ওগরায়: 'এইবার তো উনি গিলবেন এই সব। বিনে পয়সায় ঘরে বসে মজা করে ম্যাজিক দেখা যাবে কেমন!' ওর উৎসাহ আর ধরে না।

ম্যাজিকই বটে। আমি এধারে মজেছি আর ওধারে মজা! মেয়েরা এই রকমই হয়। কিন্তু ভেবে আর কী লাভ? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন!

'এই সঙ্গে আমার ছুরি কাঁচি পেনসিল রুমাল চুলের কাঁটা এসব এনে ওর মধ্যে ফেলে দেব নাকি মা?'

'মাছ খেতেই বলে অস্থির! তার ওপর আবার মাছের কাঁটা! যদি বেচারার গলায় বিঁধে মারা যায় তখন?' মার আশঙ্কা জাগে। হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো!

মাছই বটে! মাছের কাঁটাই বটে! কিন্তু ভাবনা করে কী হবে? ঝাঁটার কাজে নিজেকে লাগাই—ঘর সাফ করতে লাগি।

মুখরোচক জিনিস দিয়েই শুরু করা যাক প্রথম। একটা কমলা নেবুর খোসা নিয়ে দাঁতে কাটি। না, নেহাত মন্দ না তো! বেশ খেতে—একথা আমি বলব না, তবে খাওয়া যায়। তার পর মেয়েটা যা বলছিল,—ভিটামিন ভরতি তো বটেই!

কমলার খোসা খতম করে কলার খোসায় হাত বাড়াই। চেখে দেখি একটু-খানি। না, আদৌ এদের উপাদেয় বলা যায় না। কমলার খোসার মতন খাসা নয় ততটা। কলা যেমন নৈপুণ্যের সঙ্গে খাওয়া যায় খোসা তেমন খোশ-মেজাজে খাবার নয়। তবু গলা দিয়ে গলাতে হলো আমার।

'চীনে বাদাম আর ডিমের খোসাগুলো খান তো এবার।' মেয়েটি আমায় উৎসাহ দিতে থাকে।

আমি কড়মড় করে চিবোতে লাগি।

'বেশ কুড়মুড় ভাজার মতই, তাই না? বাদাম আর ডিমের খোলায় বিস্তর ক্যালসিয়ম আবার—খেলে হাড়-গোড় সব শক্ত হয়। বাবা বলেন। কিন্তু আশ্চর্য, তবু কেউ খেতে চায় না।'

আমি কোনো উচ্চবাচ্য না করে পাথরকুচিগুলো নিয়ে পড়ি তারপর।

'ওগুলো খেয়ে কাজ নেইকো বাবা।' বললেন গিন্নিমা: 'হজম করা শক্ত হবে।'

'পাথর খেয়ে হজম করেছি কত!' আমি জানাই: 'রোজই তো ভাতের সঙ্গে একগাদা কাঁকড় খেতে হয়।'

'তাহলে আর কি! কাঁকড় মনে করে খেয়ে ফেলুন চোখ বুজে।' বলল মেয়েটা। 'মনে করুন না অবাক জলপান!'

অবাক জলপানই বটে! বিনির মুখেও শুনেছিলাম কথাটা সকালে। অবাক জলপান খেয়ে খেয়েই গেল আজকের দিনটা। অবাক জলপান বা ঘুগনিদানা যাই হোক না, কোঁতকোঁত করে গিলে ফেললাম পাথরকুচিদের।

'এইবার কাগজগুলো চিবিয়ে খাই! তাহলেই শেষ!' নিশ্বেস ফেলে বলি।

'শুকনো কাগজ খেতে কি ভালো লাগবে?' মেয়েটা বলে: 'নুন মরিচ এনে দিই বরং—কী বলেন? নাকি স্যালাড দিয়ে খাবেন বলছেন? আনবো স্যালাড?'

'আনো।'

নুন মরিচ স্যালাড সহযোগে কাগজের টুকরোগুলো কচমচ করে খেলাম।—'এইবার একটু জল।'

গিন্নিমা এক গেলাস জল এনে দিলেন।

কতকগুলো কাগজের টুকরো গলার কাছটায় গিয়ে আটকেছিল, টাকরায় লেপটে ছিল কিছু, জলাঞ্জলি দিয়ে নামাতে হলো আমায়। তারপরে ভোজনপর্ব সেরে পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বললাম—'বাড়িতে হজমি দাবাই কিছু আছে? দিন তো একটুখানি। খাওয়া তো হলো, এবার হজমের ব্যবস্থা করা যাক। যোয়ান টোয়ান আছে বাড়িতে?'

'জোয়ান? বাড়িতে জোয়ান বললে আমার বাবা।' মেয়েটি বলে: 'তা,

তিনি তো এখন আপিসে। বাড়িতে তিনিই একমাত্র জোয়ান। আর আমরা সবাই যুবতী।' বলে খিলখিল করে হাসে মেয়েটা।

সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা আমার আপিসে যাই। পাথরকুচি খেয়ে পেট ভার। কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে ভ্যাকুয়াম ক্লীনারটা জমা দিয়ে আমার কাজে ইস্তফা দিই। বলি—'মশাই, আমার হজম শক্তি তেমন সুবিধের নয়! এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। পোষাবে না আমার।'

একটা বদহজমের ঢেঁকুর উঠে আমার কথায় সায় দিল। কাগজগুলো সব গজগজ কচ্ছিল পেটে।

তারপরে চলে যাই সটান চাঁদনি চকে—ছাতা কিনতে।

প্রথমে মনে হলো ছাতাওয়ালা গলিতেই যাই—ছাতার জন্য। তারপর ভাবলাম, বৃথা আশা, সেখানে যাওয়া হয়তো নাহক হবে। আমাদের সেই মুক্তারামবাবু স্ট্রীটেই, যেমন আর মুক্ত আরাম নেই, চারধারেই গাইয়ের উপদ্রব, হাম্বা আর খাম্বাজ রাগিণী, এমন কি সেদিনের বাছুররাও SING গজিয়ে দেখতে দেখতে গাইয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তখন ছাতাওয়ালায় গিয়ে কি আর ছাতা মিলবে? সেখানে হয়তো হাতা কিংবা আতা বিক্রি হচ্ছে এখন।

চাঁদনি চকটা আমার আপিসের চক্করের মধ্যেই। চলে গেলাম চাঁদনিতে—চক্করবর্তির চক্কর শেষ হবে সেইখানেই।

বললাম গিয়ে দোকানীকে, 'মজবুত গোছের ভালো মতন বেছে একটা দিন তো আমায়।'

'আপনার জন্যে?'

'হ্যাঁ, আমার। আবার কার?'

'একটা ছাতায় কী হবে মশাই? এক ছাতায় কি কারো বর্ষা কাটে কখনো?'

'সে কি মশাই! ছাতা তো শুনেছি নিজের ছেলেকে উইল করে দিয়ে যায় লোকে। তিন পুরুষ ধরে চলে এক ছাতা। মজবুত ছাতা চাইছি তো সেই-জন্যেই।'

'ওই যা বললেন—তিন পুরুষে চলে একটা ছাতা! আপনি কিনলেন, আপনার বন্ধু সেটা ধার নিলেন, তারপর তাঁর কাছ থেকে নিলেন আরেকজন—তিন পুরুষ ধরে চলবে তো ছাতাটা? সেইজন্যেই একটা নয়, আপনার তিনটে ছাতার দরকার।'

'তিনটে ছাতা!' আমি যেন ছাত থেকেই পড়লাম।

'হ্যাঁ, অন্তত তিনটে। একটা আপনার নিজের জন্যে, একটা বন্ধুদের ধার দিতে, আর একটা—আরেকটা ফের আপনার জন্যেই।'

'আমার জন্যে আবার আরেকটা!' বিস্ময়ে আমি হতবাক।

'হ্যাঁ, আপনার নিজের হারাবার জন্যেই একটা চাই যে। এ ছাড়াও, একটা ইস্টকে রিজার্ভ রাখলে ভালো হয়।'

তিনটার ওপর আবার ওর ইস্টকবৃষ্টিতে আমি আহত হই 'রক্ষে করুন মশাই! অতো পয়সা আমার নেইকো।'

'তাহলেও তিনটে তো চাইই আপনার। আপনার বাড়িতে কজনা লোক?'

'আমি, আমার ভাই, আমার বোন আর মা।'

'মা কি বাইরে বেরোন টেরোন?'

'কক্ষনো না। ছাতার দরকার হয় না তাঁর। মাথার ওপর ছাত থাকলেই ঢের।'

'তাহলেও আপনাদের তিনজনের জন্যে চারটে করে—এক ডজন ছাতার প্রয়োজন।'

আমি আর্তনাদ করে উঠি—'না মশাই, বাড়তি ছাতার দরকার নেই আমার। বন্ধুবান্ধবদের ছাতা আমি ধার দেব না, দিই নে কক্ষনো। আমার কোনো বন্ধুই নেই বলতে কি!' মরিয়া হয়ে বলি—'আর যদি থাকেও, আজকেই তাদের সবাইকে ডাইভোর্স করে দিলাম।'

'তাহলে- হ্যাঁ, মাত্র নটা ছাতার দরকার আপনার।' বলে নটা ছাতা তিনি আমার মাথায় চাপিয়ে দিলেন।

ঠিক মাথায় নয়। দু হাতে দুই ছাতা, দুটো দু বগলে, দুখানা দু কাঁধে আটকানো, দুটো ঘাড়ের পেছনে জামার সঙ্গে আর একটা গলার দিকের কলারে লটকানো। হ্যাঁ, এবারে আমায় ছত্রপতি বললে মানায় বটে!

বিনির জন্যে কেনা রঙচঙে রঙিন ছাতা তিনটে সঙ্গীনের মতই আমার গলগ্রহ হয়ে রইলো।

ছাতা বেচতে জানে বটে লোকটা! সেলসম্যান বুঝি একেই বলা যায়! যে সেলসম্যানগিরির তালিম কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে পাচ্ছিলাম আজ—ইনিই তার মূর্তিমান নমুনা - জলজ্যান্ত উদাহরণ। একটা ছাতা কিনতে এসে নটা ছাতা কিনতে বাধ্য হওয়া- এতগুলো পয়সার নয়ছয় করা! ছাতায় ছাতায় ছয়লাপ হয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে এখন।

হাওড়া প্ল্যাটফর্মের গেটে ঢুকতেই টিকিট চেকার তো আমায় দেখে থ। টিকিট চাইবার কথা ভুলে গিয়ে তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

'ছাতার যে ভারী ঘন ঘটা! ছটাও কিছু কম নয় দেখছি।' না বলে পারলেন না তিনি।

'ছটা নয় মশাই, নটা।' বলে পাশ কাটিয়ে গেলাম। উঠলাম একটা একশ এগারো নম্বরী কামরায়।

কামরায় আবার সেই ভদ্রলোক—সকালের ট্রেনে দেখা হয়েছিল যাঁর সঙ্গে।

আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন তিনি—'দিনটা দেখছি আজ ভালোই কেটেছে আপনার !'

'ভালো যে কেটেছে সেকথা আর বলে কাজ নেই।' আমি বলি ঃ 'এখনো আমার পেট ভুটভাট করছে—জানেন ?'

'বেশ দাঁও মেরেছেন দেখছি আজ।' তাঁর বক্রোক্তি শুনতে হয় ঃ 'সকালে এসেছিলেন খালি হাতে শুধু শিবজী। এখন ফিরছেন ছত্রপতি হয়ে।···বেশ দাদা বেশ, এইতো চাই !'

আমি আর কোনো জবাব দিলাম না। শুধু একটা চোঁয়া ঢেঁকুর তুললাম মাত্র।

প্রাণকেষ্টর কাণ্ড

কথায় বলে—কীর্তির্যস্য স জীবতি। আমাদের প্রাণকেষ্টর বেলা কিন্তু তার অন্যথা দেখা যাচ্ছে। কীর্তি করে সে মারা যাবার দাখিল - মারা না গেলেও প্রায় আধমরা হয়ে রয়েছে!

ফাঁসি ঠিক না হলেও, নিজেকে ফাঁসিয়েছে সে, ঠিকই; কেন না যে পথ দিয়ে লোকে ফাঁসি যায় এবং তার চেয়ে কাছাকাছি আরো যেসব তীর্থক্ষেত্র—জেল হাজত ইত্যাদি বাস করে—সেই আদালতেই তাকে হাজির হতে হয়েছে।

কেন যে তার এই ধৈর্যচ্যুতি হলো বলা যায় না, বাসে যেতে যেতে, মোটা-সোটা এক মেমকে হঠাৎ সে এক চড় মেরে বসেচে। এবং তার ফলে,—আহত ব্যক্তিটি স্থূলে বলে নয়, মেম বলেই, হুলস্থূলে পড়ে গেছে বেজায়।

সবাই এসে বলচে, 'প্রাণকেষ্ট, এহেন কাজ তুমি কেন করলে? এ কাজ তোমার ঠিক উপযুক্ত হয়নি।'

প্রাণকেষ্টর কিন্তু কোনো জবাব নেই।

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছল না কি? নইলে হঠাৎ অমন ক্ষেপে ওঠবার কারণ?' জিগ্যেস করে একজন।

প্রাণকেষ্ট চুপ করে থাকে।

'নাকি—মেম তোমাকে মারতে এসেছিল বুঝি? তাই বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার খাতিরেই বোধ করি—?' আরেকজনের সংশয়-প্রকাশ: 'নাকি কামড়াতেই এসেছিল তোমায়? কিন্তু মেমরা তো সচরাচর কাউকে কিছু বলে না?'

প্রাণকেষ্ট রা কাড়ে না কোনো।

'মাতৃবৎ পরদারেষু' এ কথা কি তোমার জানা ছিল না প্রাণকেষ্ট? তবে? তবে হ্যাঁ, মেমকে তুমি মাতৃতুল্য মনে করতে যাবে কেন, তাও বটে। আমাদের কার বাবা আর কটা মেম বিয়ে করতে গেছে! কিন্তু - কিন্তু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, এটা—এটাতো তুমি জানতে? একথা তুমি অবশ্যই মানবে যে মেম কিছু তোমার নিজের দ্রব্য নয়—? নিজস্ব জিনিস না?' পণ্ডিতম্মন্য এক ব্যক্তি শাস্ত্রের দ্বারা প্রাণকেষ্টকে ঘায়েল করার চেষ্টা পান। চাণক্য-শ্লোক মেরে ওকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেন তিনি। 'পরের মেমের গায়ে হাত তোলা কি তোমার উচিত হয়েছে? তুমিই বলো প্রাণকেষ্ট!'

প্রাণকেষ্ট কিছুই বলে না—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কেবল। এবং ওই ঘোঁৎকারের বেশি আর কিছু তার কাছ থেকে বার করা যায় না।

কেউ দুঃখ করে, কেউ বা সহানুভূতি জানায়, কারো বা চেষ্টা হয় প্রাণকেষ্টকে অভিনন্দন দান করার। সম্বর্ধনা-দাতাদের প্রত্যাশা, প্রাণকেষ্টর এই তো সবে হাতেখড়ি, মেম থেকেই শুরু সবে। আস্তে আস্তে এবার ও সাহেবের দিকে এগুবে—এবং ক্রমশঃ ওর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাজার হাজার প্রাণকেষ্ট দেখা দিলে দেশোদ্ধারের আর দেরি কি?

বেশির ভাগ লোকই অবশ্যি ছি ছি করে। কিন্তু প্রাণকেষ্টর কোনো হুঁ হাঁ নেই। যে কিনা জবাই হতে যাচ্ছে তার কি কারো জবাব দিতে ভালো লাগে?

খবরের কাগজ থেকে ফোটো নিতে এসেছিল, একটি সদ্যোজাত সাপ্তাহিকের সম্পাদক বাণী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, ওই এলাকার হাতে-লেখা ত্রৈমাসিকের নাছোড়বান্দা ছেলেরা তার জীবনী ছাপতে চেয়েছিল - পাড়ার একমাত্র মুখপত্রে যার মুদ্রণ-সংখ্যা মাত্র ১ - কিন্তু প্রাণকেষ্ট তাদের সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছে। এমন কি, আমি নিজে গিয়েও গায়ে পড়ে বড় গলা করে বলেছিলাম, 'পানু, তুমি অন্ততঃ একটা বিবৃতি দাও।' প্রাণকেষ্ট তাতেও কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

সেই ঘটনার পর থেকে প্রাণকেষ্ট কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে!

অবশেষে প্রাণকেষ্টর বিচারের দিন এল। আদালত ভিড়ে ভিড়াক্কার! কাঠগড়ায় দাঁড়ালো প্রাণকেষ্ট। মুখে তার সকাতর হাসি। এক বাক্যে বীর এবং কাপুরুষ আখ্যা যুগপৎ লাভ করে যেমন হাসি মানুষের মুখে দেখা যায়।

প্রাণকেষ্ট এইবার মুখ খুলবে আশা করে সবাই।

কিন্তু প্রাণকেষ্ট মুখ খোলে না।

প্রাণকেষ্ট উকিল দেয়নি, নিজেও জেরা করছে না—সাক্ষীরা একে একে সাক্ষ্য দিয়ে যায় - সেদিনকার বাসের সহযাত্রীরা তার সেই বিখ্যাত অপচেষ্টার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত—সমস্তই প্রায় ঠিক ঠিক বলে যায়—প্রাণকেষ্ট কান পেতে শোনে। অধোবদনে মানমুখে শুনে যায় প্রাণকেষ্ট।

অবশেষে হাকিম নিজেই প্রাণকেষ্টর জবানবন্দী চান। কেন সে এমন হঠকারিতা করে বসল—তার কৈফিয়ত তলব করেন তিনি।

প্রাণকেষ্ট মুখ খুলল। অবশেষে মুখ খুলতে বাধ্য হলো সেঃ

'শুনুন ধর্মাবতার, তাহলে বলি—'ম্লান হেসে শুরু করল প্রাণকেষ্ট। 'কেন যে এমনটা ঘটে গেল বলি তাহলে। শ্বেতাঙ্গী মহিলাটি বাসে উঠলেন, উঠে বসলেন। তারপর উনি তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, তারপর ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ বরলেন, মানিব্যাগ খুললেন, খুলে একটা আনি বার করে মানিব্যাগ বন্ধ করলেন, ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন,—খুলে মানিব্যাগ রাখলেন, রেখে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন—তারপর উনি তাকিয়ে দেখলেন যে কণ্ডাকটার বাসের দোতলায় উঠচে। তখন তিনি তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, করে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন, মানিব্যাগ খুললেন, খুলে আনিটি রাখলেন তার ভেতর। রেখে মানিব্যাগ বন্ধ করলেন, করে ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ রাখলেন, রেখে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন—'

'মানিব্যাগ বন্ধ করলেন, তাই বলো।' হাকিম ঠিক অনুধাবন করতে পারেন না। প্রাণকেষ্টর কথার দৌড়ে পাল্লা দিতে কোথায় যেন তাঁর আটকে যায়। কেমন যেন তাঁর গোলমাল ঠেকে সব।

'মানিব্যাগ বন্ধ করলেন? না, হুজুর! মানিব্যাগ খুলে তার মধ্যে ভ্যানিটিব্যাগ রাখলেন? না, ভ্যানিটিব্যাগ খুলে মানিব্যাগ রাখলেন? না—কি মানিব্যাগ খুলে ভ্যানিটিব্যাগ বার করে তার ভেতর আনিটা রেখে তারপর ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করে—নাঃ, তাও তো নয়? তাই বা হয় কি করে? মানিব্যাগের ভেতর কি ভ্যানিটিব্যাগ রাখা যায় কখনো? আপনি সমস্ত গোলমাল করে দিলেন হুজুর। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন! দাঁড়ান হুজুর, আবার তাহলে সেই গোড়ার থেকে খেই ধরি।'

প্রাণকেষ্ট আবার গোড়ার থেকে গড়াতে লাগল। যেখানে আটকেছিল প্রায় সেখান অবধি গড়গড় করে গড়িয়ে এলো এক খেয়ায়।

' তখন উনি দেখলেন যে কণ্ডাকটার বাসের দোতলায় যাচ্ছে। দেখে ফের তিনি তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, বার করে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন, বন্ধ করে মানিব্যাগ খুললেন—'

'বন্ধ করে মানিব্যাগ খুললেন?' হাকিমের খটকা লাগেঃ 'সে আবার কেমনটা হলো?' দ্বিধায় পড়ে আবার তিনি বাধা দেনঃ 'বন্ধ করচেন, আবার খুলচেন দু রকমের দুটো কাজ একসঙ্গে হয় কি করে?'

'কি করে হয় বলতে পারব না হুজুর, তবে হচ্ছিল—হয়েছিল—এইটুকুই বলতে পারি। একটা খুলচেন আরেকটা বন্ধ করচেন—একটার পর একটা ঘটে যাচ্ছে।' প্রাণকেষ্ট প্রাণের কথাটি প্রাঞ্জল করার জন্য প্রাণপণ করে।

'ওঃ, বুঝেছি—' হাকিম মাথা নেড়ে বলেনঃ 'আচ্ছা, বলে যাও।'

প্রাণকেষ্টর করুণ সুরে শুরু হয় পুনরায়ঃ 'তখন উনি দেখলেন যে

কণ্ডাক্টার বাসের দোতলার দিকে হেলে দুলে রওনা দিচ্ছে। অতএব, আবার উনি ও'র ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, মানিব্যাগ বার করে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন—কোন্‌টার ভাগ্যে কি ঘটচে ভালো করে লক্ষ্য করুন হুজুর! তারপর ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করে মানিব্যাগ খুললেন, মানিব্যাগ খুলে তাঁর আনিটি যথাস্থানে রাখলেন। রেখে মানিব্যাগ বন্ধ করলেন, তারপর তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ রাখলেন ভেতরে—রেখে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন! ···তার পর তিনি কণ্ডাকটারকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলেন—দেখে ফের তাঁর ভ্যানিটিব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, বার করে ভ্যানিটিব্যাগ বন্ধ করলেন. তারপরে মানিব্যাগ খুললেন, খুলে একটা আনি বার করলেন, এবং মানিব্যাগ বন্ধ করলেন'—

হাকিমের আর সহ্য হয় না ঃ 'থামো—থামো! বিলকুল চুপ!' বিশ্রী রকম চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি ঃ 'তুমি আমায় পাগল করে দেবে দেখচি।'

'আজ্ঞে, আমারও ঠিক তাই হয়েছিল বোধ হয়।' ম্লান হাসির সঙ্গে করুণ স্বরের মিকচার করে প্রাণকেষ্ট বলল ঃ 'কিন্তু হুজুর বলেছেন সব কথা খুলে বলতে, কিচ্ছুটি না গোপন করে—সমস্ত খোলসা করে বলতে বলেছে, আমায়। তাই আমারো না বলে উপায় নেই। যেমন যেমনটি আমি দেখেছি তেমনটি হুজুরকেও আমি দেখাতে চাই···তারপর তিনি করলেন কি, মানিব্যাগ বন্ধ করে তাঁর ভ্যানিটিব্যাগটা খুললেন, খুলে—'

'বটে? দেখাতে চাও? আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই তুমি দেখাতে চাও? অ্যাদ্দুর আস্পর্ধা!' হাকিমের চোখমুখ যেন কিরকম হয়ে ওঠে, আর তাঁর হুকুম কি হুমকি, ঠিক বলা যায় না, আদালতের কড়ি বরগা কাঁপিয়ে তোলে।

'তবে এই দ্যাখো।' এই না বলে হাকিম আসন ছেড়ে উঠে, কাঠগড়ার কাছে গিয়ে, প্রাণকেষ্টর গালে কষিয়ে এক চড় বসিয়ে দেন। 'এই দ্যাখো তবে। হয়েছে এবার?'

'হুজুর, আমিও এর বেশি কিছু করিনি।' প্রাণকেষ্ট সকাতরে জানায়। 'এখন স্বচক্ষেই দেখলেন তো হুজুর। স্বহস্তেও দেখলেন বলা যায়।'

আমার পাশের চেয়ারের লোকটি যে ত্রিভঙ্গিম, টের পেলাম অনেক অনেক পরে। কি করে আন্দাজ করবো বলো? ত্রিভঙ্গিমের এ-ভঙ্গিমা কখনো দেখিনি, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কোনোদিন। ত্রিভঙ্গিম হেয়ার কাটিং সেলুনে বসে নিজের পয়সা খসিয়ে এত ঘটা করে চুল ছাঁটাবে—একথা ধারণা করতেই মাথা ঘুরে যায়।

কিন্তু সত্যিই তাই! এতক্ষণ ধরে আমারই পাশের চেয়ার দখল করে চুল ছাঁটানো, দাড়ি কামানো, নোখ চাঁছানো থেকে শুরু করে মাথায় দলাই-মলাই, শ্যাম্পু এবং হেয়ার ড্রেসিং—মায় মুখে পাউডার মাখানো পর্যন্ত একটার পর একটা একটানা অবাধে বিনা প্রতিবাদে যিনি করিয়ে নিচ্ছিলেন তিনিই আমাদের ত্রিভঙ্গিম। নিজের চুলক্ষয়ে—নিজের মাথার উপরে কাঁচির খচখচানি শুনে তন্ময় হয়েছিলাম তাই এতক্ষণ ওকে লক্ষ্য করিনি—এখন লক্ষ্য করে মাথা ঘুরে গেল।

দুজনে এক সঙ্গেই সেলুন থেকে বেরুলুম। বেরিয়েই, সামনে চায়ের দোকান দেখে, ত্রিভঙ্গিম বলল: 'একটু চা খাওয়া যাক—চলো!'

আমার চমক লাগল। য়্যাঁ? বলে কী ত্রিভঙ্গিম?

চা-খানায় বসতে না বসতেই ত্রিভঙ্গিম বলে: 'আর কী খাবে বলো? ওমলেট? পোচ? টোসট্? কিছু খাবে না? আমার পয়সা কিন্তু!'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় আমায় মুহ্যমান করে দেয়। এই সুবিন্যস্ত কেশ, মুক্তহস্ত, বন্ধুবৎসল ত্রিভঙ্গিম আমার একেবারে অজ্ঞাত। যে-ত্রিভঙ্গিমকে আমি চিনি, হাড়ে হাড়েই চিনি—ইনি তো তিনি নন! ওর শরীর সুস্থ আছে কি না, সুকৌশলে জানতে চেষ্টা করলাম। শরীরের কথাটা জেনে নিয়ে তারপরে ওর মাথার ঠিক আছে কি না জানতে চাইব।

'শরীর? শরীর আমার ভীষণ ভালো যাচ্ছে আজকাল। বিশেষ করে কবিরাজ হারান সেনের চার বোতল সেই দ্রাক্ষারিষ্ট খাবার পর থেকে—পার বোতল দেড় টাকা—এমন তোফা রয়েছি এখন—যে কী বলব!'

'জলের মতো টাকা ওড়াচ্ছ বলে বোধ হচ্ছে আমার!' আমি বললুম।

'টাকা নয়, বই।' বলল ত্রিভঙ্গিম। 'তোমারই বই ভাই! তোমার সেই গল্পের বইটা—ওই যে—কী—কথা বলার বিপদ—না—কি!'

'আমার সদ্যপ্রকাশিত বইটা? প্রকাশকের দেয়া তার কমপ্লিমেণ্টারি কপি-গুলো কি তোমার বাসাতেই ফেলে এসেছিলাম নাকি? য়্যাঁ? তাই নাকি হে?' আমি চিৎকার করে উঠিঃ 'কোথায় যে ফেললাম কপিগুলো ভেবে ভেবে আমি সারা হচ্ছি এদিকে!'

'পঁচিশখানা কপি তো মোটে! মোটমাট পঁচিশটিমাত্র—আমি বেশ করে গুণে দেখেছি।'

'কপিগুলো কি তুমি বেচে দিয়েছো নাকি?' আমার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস।

'হায়, সেই চেষ্টাই করেছিলাম প্রথমে।' দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললে ত্রিভঙ্গিমঃ 'ভেবেছিলাম অসংখ্য বন্ধু আমার। পঁচিশটা কপিই তো! এ-কটা পাচার করে দিতে আমার কতক্ষণ! আর, তুমি যখন ভুলে ফেলেই গেছ, তোমাকে ফের মনে করিয়ে দিয়ে অনর্থক কেন কষ্ট দেওয়া?—মনঃপীড়া দেওয়া বইতো না?—'

'বেচে দিয়েছো স—ব?' বাধা দিয়ে আমি জানতে চাই।

'বেচতে আর পারলাম কই! কেউ কিনলে তো! শুনেছিলাম তোমার বইয়ের নাকি ভারী কাটতি!···তোমার মুখেই শুনেছিলাম।···ভুলিয়ে ভালিয়ে ভুজুং দিয়ে আমাকে তোমার প্রকাশক বানাবার তালে ছিলে কিনা তুমিই জান! কিন্তু বলব কি, তোমার বই কাটাতে গিয়ে আমার অনেক বন্ধু কেটে গেল—বিস্তর—বিস্তর বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে গেল আমার।'

'বলো কি!' ওর বন্ধু-হানির খবর শুনে আমার বই লোকসানির কথাও ভুলে যাই।

'ডজন ডজন বন্ধু ছিল আমার, বন্ধু হে! কিন্তু তারা কী পরিমাণ বন্ধু, বই বেচতে গিয়েই টের পেয়েছি। পাঁচ সিকেও দাম নয় কারো বন্ধুত্বের! নগদ মূল্যে দুখানা কেবল বেচতে পেরেছি ভায়া—পাঁচ সিকে করে আড়াই টাকা পেয়েচি মবলগ। তারপর ভাবলাম বার্টার-সীসটেম করে দেখলে কেমন হয়—

মালের বদলে মাল। আমার প্রথম বন্ধু হচ্ছে এই চা-খানার মালিক—অদ্য যেখানে বসে চা পান করছি আমরা। কী, আরেক কাপ চা দেবে নাকি ?'

'না, থাক।' কষ্টে-সৃষ্টে আমি জানাই ঃ 'ধন্যবাদ !'

'লোকটা প্রথমে রাজি হতে চায়নি। বই নিতে রাজিই হয়নি গোড়ায়। বলেছিল, তার চা যে সুখাদ্য এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ, কিন্তু বইটা ততখানি উপাদেয় কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ আছে।...কী! আমার বন্ধুর বইকে অখাদ্য বলা! রাগ হয়ে গেল আমার। তক্ষুনি আমি স্পষ্টাস্পষ্টি তাকে জানিয়ে দিলাম, তাহলে আজ থেকে আমার—আমারও—এই দোকানে ইস্তফা! কাল থেকে ঐ সামনের চা-খানাতেই চা খাবো! এবং বন্ধুবান্ধবদের চাখাবো! এইভাবে হুমকি দেওয়ার ফলে চায়ের বদলি একখানা বই ও নিয়েছে—নিতে বাধ্য হয়েছে।'

এই পর্যন্ত বলে ত্রিভঙ্গিম দোকানের এক কোণে কোনঠাসা চায়ের মালিকের দিকে আড়চোখে তাকায়।

আমিও ওর প্রথম নিহতটির দিকে তাকিয়ে অ-ক্ষুন্ন থাকতে পারি না।

সেই দুর্বোধ্য লোকটি তার ছোট্ট টেবিলের উপরে দুর্বোধ্য বইটির দিকে ম্রিয়মান হয়ে তাকিয়ে আছে দেখতে পাই।

'চায়ের বদলে বই—বদলাবদলি সীসটেমে। বইয়ের বদলে চা। এ পর্যন্ত আমি এই ক'দিন ধরে তোমার বইটার পাঁচটা গল্প পর্যন্ত পান করতে পেরেছি,—তোমাকে আমাকে জড়িয়ে এখন অবধি বইটার এই সাড়ে সাত আনা উঠলো—' ত্রিভঙ্গিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ঃ 'আরো—এখনো সাড়ে বারো আনা বাকি !...দেবে আরেক কাপ ?'

'তোমার হেয়ার কাটিং সেলুনের অত সমারোহ যে কেন তাও আমার কাছে বেশ পরিস্ফুট হচ্ছে এখন।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, তাই-ই। ঠিকই ধরেচ। কিন্তু সেলুনের লোকটা এ-লোকটার চেয়েও বেশি আনাড়ী। কথা বলার বিপদ – নামটা দেখেই বললে, এ বই তার কোনো কাজে লাগবে না। চুল ছেঁটেই ওদের ফুসরত নেই, কথা কইবে কখন ? কথা বললে তো বিপদ! এ-বইয়ের মধ্যে ওর শেখবার কী আছে জানতে চাইল। কী করি ? বললাম যে, মেয়েদের ববছাঁট ছেলেদের ঘাড়ে চাপানোর কৌশল এতে বিশদরূপে বিবৃত করা রয়েছে। এই বলে—অনেক বলে কয়ে তো খান দুই ওকে গছিয়েছি। ও কিন্তু এই শর্তে রাজি হয়েছিল যে বইয়ের বদলি আড়াই টাকা দামের চুল-ছাঁটাই দাড়ি-কামাই শ্যাম্পু ইত্যাদি সব আমায় এক চোটে তুলে নিতে হবে। রোজ রোজ খুচখাচ চলবে না! কি করি বলো—একনাগাড়ে বসে তিন বার চুল ছাঁটলাম, পাঁচ বার হেয়ার ড্রেসিং করে দিলে, সাত বার দাড়ি কামাতে হয়েছে। নোখ কাটাই হলো বার দশেক। সেই সকাল থেকেই চলেছে! উঃ! যা জ্বলছে সারা মুখ। তেমনি আবার নোখের ডগাগুলোও!'

সান্ত্বনাচ্ছলে ওর গালে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছা করল—সাত বার কামানো হলে মসৃণতা কেমন হয়, জানবার কৌতূহলও যে একটু না জাগল তা নয়,—কিন্তু আমার যতো বিপদ উদ্ধার করেই যে ওর এই দাড়িহীনতার বিলাসিতা একথা ভাবতেই ওর গায় হস্তক্ষেপ করবার উৎসাহ আমার লোপ পায়।

হাতের সঙ্গে গালের প্রায় এক ইঞ্চির সমান্তরাল রেখে, ও নিজেই নিজের সারা মুখে হাত বুলোতে থাকে। আর সেই হাত বুলানোতেই তার সুকর্তিত নোখের ডগায় এমন আঘাত লাগে যে পুনঃ পুনঃ ফুঁ দিতে হয়। তারপর ক্ষুরের মতো ধারাল এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে সে জানায়ঃ 'উঃ! পরের বই কাটানো যে কী ঝকমারি ভাই! আর কেউ যেন কখনো এ কাজ না করে। এর চেয়ে বই দুটোর পেজ বাই পেজ দিনের পর দিন দেড় বছর ধরে বাড়ি বসে দাড়ি কামিয়ে কাটাতে পারলেও আমার কোনো ক্ষতি ছিল না।···উঃ!'

'এইভাবে আর কতোগুলি কপির হাত থেকে তুমি রেহাই পেয়েছ?' আমি জিজ্ঞেস করিঃ কতোগুলি বইকে মুক্তিদান করেছ আমার?'

'ওষুধের দোকান বোস কোম্পানিতে চেষ্টা করেছিলাম। খান চারেক বইয়ের বিনিময়ে পাঁচ টাকা দামের টুথপেসট, হেয়ার ক্রিম, ওভ্যালটিন আর লিলি-বিস্কুট এই সব পাওয়া যায় কি না - খোঁজ করেছিলাম। তাঁদের মুখে আশ্চর্য এক বিস্ময়ের চিহ্ন দেখলাম—এবং চিহ্নটি কেবল চিহ্নমাত্র না থেকে নৈর্ঋৎ কোণের মেঘের মত ক্রমশই এত বর্ধিত হতে লাগল যে জবাব জানবার জন্যে বেশিক্ষণ দাঁড়াবার আমার সাহস হলো না। নিশ্চিহ্ন হবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি তৎক্ষণাত!'

'ভালোই করেছ। বটকেষ্ট পালে একবার ঢুঁ মারলে না কেন? তাদের দোকান তো আরো বড়ো?'

'নাঃ, ঢুঁ মেরে ফল নেই। ফয়দা নেই দাদা—আমি বুঝতে পেরেছি। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধওলারা কোনো কাজের নয়। আমাদের কবিরাজরা ওদের চেয়ে ভালো। ঢের বিচক্ষণ! এই জন্যেই অনেকে কবিরাজির পক্ষপাতী। এমন কি, আমাকেও হতে হয়েছে। চারটে কপির বদলে কবিরাজ হারান সেন বড় বড় চার বোতল দ্রাক্ষারিষ্ট দিয়েছেন। চার চার বোতল! হাতে হাতে! তাও আবার হাফ্ প্রাইসে—মুক্তহস্তেই দিয়ে দিলেন। কথা পাড়বামাত্র যেন লুফে নিলেন বই ক'খানা! কবিরাজ অথচ সাহিত্যরসিক, এমনটি এর আগে আমি আর দেখিনি! বললেন, কাগজ যা আক্রা আজকাল, আর, এমন ভালো কাগজে ছেপেচে! আবার ছবিও দিয়েছে দেখচি! বাঃ! তারপর—' ত্রিভঙ্গিম থেমে যায়ঃ 'তারপর আর যা বললেন, বলব?'

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাই—আমার বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

'বললেন, ওষুধের পুরিয়া বাঁধবার খাসা মোড়ক হবে।' বলল ত্রিভঙ্গিমঃ 'লোকটা যথার্থই সাহিত্যরসিক। আমার শ্রদ্ধা হচ্চে।'

কবিরাজ হারাচন্দ্র সেন ভিষগ্‌রত্নের সাহিত্য-রসিকতা নিয়ে আমি মনে মনে একটু নাড়াচাড়া করি, তারপরে ভগ্নকণ্ঠে বলি ঃ 'মোটমাট কখানা কাটিয়েছ এই করে? নগদ মূল্যে তো দুখানা,—চায়ের বদলি এক,—চুল ছাঁটতে দুই,—আর কবিরাজখানায় চার—সবসুদ্ধ নখানা গেল? তাই না।'

'নখানা? নখানা মোটে? সব কখানাই গেছে। কিন্তু যাওয়াতে যা বেগ পেতে হয়েছে আমাকে—যা করে যাইয়েছি—তা কেবল এক খোদাই জানেন!' ত্রিভঙ্গিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'আর - আমিও জানি কিছু কিছু!'

'একখানাও বাকি নেই আর?' আমার ভগ্নতর কণ্ঠ থেকে বার হয়।

'আর একখানাই বাকি আছে কেবল।' এই বলে ত্রিভঙ্গিম পকেট থেকে—পঁচিশ খানার ধ্বংসাবশেষ - সেই একমাত্র কপিটিকে টেনে বার করল ঃ 'এইটাই কেবল কাটাতে বাকি!'

'এটা নিয়ে কোথাও চেষ্টা করো নি?' আমার গদগদ গলা থেকে বেরয়।

'করিনি আবার! কমলালয়ের রিডাকশন সেলে কপাল ঠুকে ঢুকেছিলাম—এর বদলে একখানা রুমালও পাওয়া যায় যদি। তাঁরা বললেন, রিডাকশন সেল বটে, মালপত্রের দামও খুব কমানো হয়েছে সেকথাও সত্যি—কিন্তু তা বলে অতোদূর কমানো হয়নি। খুব কঠোর ভাষাতেই তাঁরা এই কথা বললেন। আমি বললাম, খদ্দেরদের সঙ্গে তাঁদের যদি এই ধরনের ব্যাভার হয়, তাহলে তাঁদের দোকানে এই আমার শেষ পদার্পণ। তাঁরা জানালেন, আমার মতো বহুমূল্য মক্কেল হারানো খুবই দুঃখের সন্দেহ কি! কিন্তু কি করবেন, তাঁরা নাচার—এত বড় দুঃখও তাদের বুক পেতে সইতে হবে। উপায় নেই।' এই না শুনে আমি তৎক্ষণাত বইটা নিয়ে চলে এসেছি।'

'আমার মনে হয় মেছোবাজারে মেছুনীদের কাছে একবার চেষ্টা করে দেখলে পারতে।'

'তাকি আর করা হয়নি? বইয়ের কথা শুনতেই তারা রাজি নয়। আলু-পটল ওলাদেরও বাজিয়ে দেখেছি! কিন্তু সব বৃথা! মাংসওলাকেও বলা হয়েছিল - কাটারি নিয়ে আমার মারতে আসে আর কি। এখন শুধু শ্রীমানী মার্কেটের মসলাওলারা বাকি আছে কেবল। চলো না, একবার চেষ্টা করে দেখি গে।'

ও-ই ভেতরে যায় বই নিয়ে—আমি বাজারের গেটে—গেটের বাইরেই দাঁড়াই। হাতাহাতিতে যোগ দেয়া তো দূরে, মারামারির সাক্ষী হবারও আমার সামর্থ্য নেই। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় না, একটু পরেই ও ম্লান মুখে ফিরে আসে।

'উঁহু, হলো না। বইটার বদলে, পাঁচ সিকে তো পরের কথা—বারো আনা—ছ আনা—এমন কি দু আনা দামেরও লবঙ্গ এলাচ তেজপাতা ইত্যাদি

দিতে প্রস্তুত নয়। উলটে যা তেজ দেখাচ্ছে—বাপ! কেবল একজন লোক একটু আশা দিয়েছে। গেটের মুখে যে লোকটা মাখন বিক্রি করে—সে-ই! সে বলেছে মাস কয়েক পরে আসতে—ততদিনে মাখন পচলে, পচা মাখনের বদলে নিতে পারে হয়ত। য়্যাঁ, কি বলছ? কয়েক মাস পরে কেন? ও!— ইতিমধ্যে ওর পুত্ররত্ন লাভের সম্ভাবনা রয়েছে কি না! ছেলের দুধ গরমের জন্যেই নেবে তখন।'

'ছেলের দুধ গরমের জন্যে!' শুনে আমার সর্বাঙ্গ যেন ঠাণ্ডা মেরে আসে। কাটতি না থাক, আমার বইয়ের এই কাঠ-তির সম্ভাবনায় তেমন উৎসাহ পাই না।

'হ্যাঁঃ, তার জন্যে আমি তদ্দিন বসে থাকব কিনা! দেখ না আবদার! তার চেয়ে উইয়ের হাতেই কাটতির ভার দেব নাহয়। তাতেও আমার লোকসান নেই!'

ছোট ছেলেদের আমি ভালবাসি। হ্যাঁ, ভালোই লাগে আমার ওদের। যেন ভোরবেলায় এক ঝলক সোনালি রোদ, কিংবা গুমোট গরমের দিনে এক পশলা ফিনফিনে বৃষ্টি, কিংবা নীল-আকাশের গায়ে এক ঝাঁক বলাকা, কিংবা -। এমনি অনেক কিছু বানিয়ে কবিতার মত করে বলা যায় ওদের সম্বন্ধে! হ্যাঁ, ভালো কথা, বলাকা মানে কী? অনেকদিন থেকেই শুনতে পাচ্ছি কথাটা, ওই নামে একটা বইও আছে কে যেন বলছিল,—একদিন অভিধানটা খুলে দেখতে হবে, কিংবা সেই বইখানাই।

আসল কথা ছেলেদের আমার ভালো লাগে। তাদের মানুষের মত মানুষ করার একটা প্রবল বাসনা যেন আমার মধ্যে আছে। সব সময়ে সেটা টের পাই না, যেদিন বদ হজম হয় কেবল সেই দিনই জানা যায়। চোঁয়া ঢেঁকুরের সঙ্গে ইচ্ছাটা চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, যে-সব মানুষ চলাফেরা করছে তাদের দ্বারা কিছুই হবে না, না-তাদের নিজের না-এই পৃথিবীর; কেবল যে সব মানুষ এখন হাই জাম্প লং জাম্প দিচ্ছে, হাডুডু খেলছে, ময়দানে ফুটবল পিটছে, কিংবা তারাও নয়—যে-সব মানুষ এখন কলকাতার সরু গলির মধ্যে টেনিস খেলছে (মানে, বেওয়ারিশ বাতিল টেনিস বলের সঙ্গে ফুটলের মত দুর্ব্যবহার করেছে), হাফপ্যান্ট পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে এবং সুযোগ পেলেই আলু-কাবলি চাখছে, কিংবা তারাও নয়,—যে-সব মানুষ এখন নেহাৎ হামাগুড়ি দিচ্ছে কেবল তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের ভবিষ্যৎ।

মানুষের ভবিষ্যৎ এবং পৃথিবীর স্বর্গ-প্রাপ্তি! হ্যাঁ, তাদের মধ্যেই। (স্বর্গ-প্রাপ্তি মানে চন্দ্রবিন্দু-প্রাপ্তি নয়! পৃথিবীটাই একদিন স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে এই রকম একটা কানাঘুষা প্রায়ই শোনা যায়, আমি তারই ইঙ্গিত করছি এখানে।)

কে এক বিলিতি কবি বলে গেছেন, ফাদার ইজ্ দি চাইল্ড অব্ ম্যান? —নাঃ, ম্যান ইজ্ দি ফাদার অফ চাইল্ড? উঁহু ম্যান ইজ দি চাইল্ড অফ ফাদার? তাও বোধহয় না! কথাটা কি বলেছিলেন ভদ্রলোক, আমার ঠিক মনে পড়ছে না এখন। মোদ্দা কথা তার মানেটা হচ্ছে এই—

তার মানেটা কী তাও বলা ভারি শক্ত! বিলিতি কবিতা আর বিলিতি বেগুন দুই ই আমার কাছে এক জাতীয়! দুটোই সমান বিস্বাদ, গলাধঃ করণ করতে প্রাণ যায় কিন্তু উভয়ই ভয়ঙ্কর হজমি! একবার পেটে গেছে কি একেবারে হজম। তখন তাকে মুখে আনা বেজায় কঠিন। (দেখছ না, এই চাইল্ডের কবিতাটা কিছুতেই আসতে রাজি হচ্চে না!—অথচ, চাইল্ড, মানুষের খুড়ো কি জ্যাঠা জানবার কতখানি দরকার ছিল আমার!)

এইসব কারণে, ছেলে পেলেই মানুষ করার চেষ্টায় আমি হাত পাকাই। কিণ্ডারগার্টেনের মত একটা নতুন ধরনের শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি, যার ফলে ছেলেরা সটান পুরো মানুষে পরিণত হতে পারে, এই রকম একটা কিছু আবিষ্কার করে যাবার মতলব আছে আমার মনে মনে।

সেদিন বৌদির এক বন্ধু বেড়াতে এলেন আমাদের বাড়ি! বছর আষ্টেকের ছোট্ট একটি ছেলেকে সঙ্গে করে। দিব্যি ফুটফুটে ছেলেটি! দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে! হ্যাঁ, এরাই তো মানুষ হবে কালক্রমে! (যদি কোনক্রমে টিকে যায় অবশ্যি!)

তিনি বৌদির সঙ্গে গল্পে জমে গেলেন বাড়ির ভেতরে এবং ছেলেটা এসে জমল আমার পড়ার ঘরে। জমুক এসে, আমার আপত্তি নেই, ওদের জন্য আমার অভ্যর্থনা সব সময়েই—সব সময়েই কী? (সাহিত্য করে বলতে গেলে কি হবে? উদগ্রীব? উন্মুখ? উন্মুখর? উঁহু—!) ওদের জন্য আমার অভ্যর্থনা সব সময়েই ব্যতিব্যস্ত! (কিম্বা হেস্তনেস্ত, কিম্বা যদি আরো ভালো করে বলি—) আমার অভ্যর্থনা একেবারে চুরমার, ছত্রখান, জীবন-স্মৃতি—ছিন্নপত্র!

'তোমার নাম কি খোকা?'

'মা যে বলল তোমার কাছে আসতে।'

তা তো বলবেনই। তিনি জানেন কিনা, ছেলে মানুষ করার কাজে মার পরেই আমার স্থান। মনে মনে গর্বিত হয়ে উঠি! বলি,—'কিন্তু তোমার নাম কি তা তো বললে না?'

'বলব? কিন্তু বানান করতে হবে না তো?'

আমি অভয় দিই। খোকার নাম শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকেন্দ্র প্রসন্ন পুরোকায়স্থ। বাব্বাঃ! বানান করা যেমন শক্ত উচ্চারণ তার চেয়ে কিছু কম নয়। এমন ফুটফুটে ছেলের এ কি বিদঘুটে নাম! মনে মনে সহানুভূতি হয় ওর ওপর। জীবন ভোর এই নাম নিয়ে ওকে ধস্তাধস্তি করতে হবে! এই জগদ্দল বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মানুষ হতে হবে এবং ঐ বিলিতি কবি যা বলে গেছেন (কি বলে গেছেন জানি না!) তাই হতে হবে ওকে। বাপস্!

'তা বেশ বেশ। এমন আর মন্দ কি? অন্তত বদনামের চেয়ে ভালো। তা তুমি কি পড়-টড়?'

খোকা ঘাড় নাড়ে—'হ্যাঁ, ইংজি পড়ি।'

'ইংরিজি? তা ঐ ইংজিই একটু বলো।' (বুঝতে পারব কিনা মনে মনে ভয় হয়। ওই সাবজেক্টেই আমি একটু কাঁচা আবার!)

খোকা অমিতবিক্রমে গড়গড় করে বলতে থাকে—'এ বি সি ডি ই এফ জি এচ আই জে কে এ বি সি ডি ই এফ জি এচ আই জে কে এল এম এ বি সি ডি ই এফ জি এচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এ বি সি ডি ই এফ—'

ওর বুক ফুলে উঠে, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, আমি বলি—'থামো, খুব হয়েছে।' আশঙ্কা হয়, বিদ্যের সঙ্গে বক্সিং-এর প্যাঁচ না জাহির করে বসে!

কিন্তু সে কি থামবার? হিন্দি এবং ইংরেজি বক্তৃতার গুণই এই (কিম্বা দোষও বলতে পারো) যে, তাকে সহজে থামানো যায় না। আপনার বেগে আপনি চলতে থাকে, যেন কলের গাড়ি। অবশেষে খোকা তার লাস্ট সেন্টেন্স হাতড়ে পায়—

'এ বি সি ডি ডবলিউ এক্স ওয়াই জেড।' বলে খোকা নিরস্ত হয়। বেশ বোঝা যায় এই জেড খুঁজে পাচ্ছিল না বলেই তার জেদ থামছিল না। হ্যাঁ, এই ছেলেই তো মানুষ হবে (কিংবা ঐ ইংরেজ কবি যা বলেছেন তাই।) কিংবা মানুষের বাবাও হতে পারে, বিচিত্র নয়! কিছুই বলা যায় না এখন।

'গোলক, তোমাকে একটা ইতিহাসের গল্প বলি শোনো।'

'হাঁসের গল্প? বলুন।' গোলক কাছে ঘনিয়ে আসে। 'হাঁসে ডিম পাড়ে আপনি জানেন?'

তার আগ্রহ দেখে আমার আনন্দ হয়।—'হাঁসের গল্প নয়, ইতিহাসের গল্প! ইতিহাস কাকে বলে জানো না?'

খোকা ঈষৎ অবাক হয়।—'ইতিহাস আবার কি রকম হাঁস? পাতিহাঁস তো জানি! কিন্তু পাতিরাম আমাদের দারোয়ান, সে হাঁস নয়!' একটু ভেবে নিয়ে আবার প্রশ্ন করে—'ইতিহাস কি তবে ঘোড়া? ঘোড়াতেও ডিম পাড়ে কি না! কিন্তু তাকে বলে ঘোড়ার ডিম।'

'চুপ করে গল্প শোনো। আমাদের দেশে—'

'আমাদের কোন দেশ ?'

'আমাদের বাংলা দেশ। বাঙালিদের দেশ! তোমার দেশ, আমার দেশ, আমাদের বাবার-মার-ঠাকুরদ্দার সবার জন্মভূমি! বুঝলে ?'

খোকা ঘাড় নাড়ে।

'আমাদের বাংলা দেশে প্রতাপাদিত্য বলে এক রাজা ছিলেন।'

'কে সে ?' আবার প্রশ্ন।

ওর অনুসন্ধিৎসা আমাকে পুলকিত করে। 'আমাদের দেশের এক রাজা!'

'কোন দেশের ?'

'আমাদের এই বাংলা দেশের।'

'ও!'

'তিনি ভয়ানক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। খুব যুদ্ধ করতে পারতেন।'

'কে যুদ্ধ করতে পারতেন ?'

'কেন, এইমাত্র যে বললাম।'

'কি বললেন ?

ছেলেদের সঙ্গে বাক্যালাপের অদ্ভুত কৌশল আছে, সবাই সেটা জানে না। বালক গোলোকের এই পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটত, কারু কারু হয়ত পিত্ত জ্বলে গিয়ে চড় কসিয়ে দেবার প্রলোভন হত! কিন্তু আমি তো জানি ছেলেদের মনস্তত্ত্বই এই, সব বিষয়েই তাদের জানবার ইচ্ছা। ছোটবেলার এই কৌতূহল থেকে তো তারা বড় হয়ে উঠবে (মানুষ হয়ে উঠবে) এবং অন্য সকলের কৌতূহলের বিষয় হবে। সুতরাং এই ধাক্কায় আত্মসংযম করা আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হলো না।

অতএব আমি মিষ্টি করে একটুখানি হাসলাম। ঠিক যে রকম মিষ্টি করে আমাদের ফটোগ্রাফের মধ্যে আমরা হেসে থাকি। যৎসামান্য মৃদু হাস্য, নদীর ঢেউ সূর্যকিরণে ভেঙে পড়লে যেমন দেখায়, সেই সঙ্গে কেমন একটা কোমল বিষাদের ভাব মিশানো—সমস্ত জিনিসটা আকর্ণ-বিস্তারের আগেই সতর্কতায় সামলে-নেওয়া। গোলোকের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করে কিঞ্চিৎ ফটোগ্রাফিক হাসি আমি হেসে নিলাম।

'রাজা প্রতাপাদিত্য। খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। কেন, পদ্যের বইয়ে পড় নি ?—যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।'

গোলোক এতক্ষণে সায় দেয়—'হুম্। আমরা।'

আমি কিছু অবাক হই—'কি তোমরা ?'

'আমরা প্রতাপাদিত্য।'

আমি এবার ঘাবড়ে যাই—'তোমরা প্রতাপাদিত্য কি রকম ?'

'হুম, আমরাও। আমরা পুরোকায়স্থ।'

'ও, বুঝলাম এতক্ষণে। এখন মন দিয়ে শোনো, খুব মজার গল্প। প্রতাপ যখন খুব ছোট ছিলেন, এই তোমারাই মত ছেলেমানুষ সেই সময় একদিন তার বাবা—'

'কার বাবা ?'

'প্রতাপের বাবা।'

'কে প্রতাপ ?'

'কেন রাজা প্রতাপাদিত্য ! যার ছেলেবেলার গল্প তোমাকে বলছি।'

'ও !'

ওর গল্প শোনার আগ্রহ যে কতোধারালো তার পরিচয় ক্রমশই স্পষ্ট হচ্চে। হবেই, আমি জানতাম। গোড়ার দিকে গলার উপদ্রব শোনা গেলেও, গল্প খানিকটা গড়াবার পর, তখন ছেলেদের মধ্যে চোখ এবং কান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমরা তো ঠাকুরমার কোলে আহার নিদ্রা পর্যন্ত ভুলেছি। দুঃখের বিষয়, আর কোন ঠাকুমা ছিল না, যদি বা কখনো থেকে থাকে আমার কালে তাঁর চিহ্নমাত্র পাইনি। কিন্তু তাতে কি, ঠাকুরমার কাহিনীর কল্পনাতেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয় এখন পর্যন্ত।

'এখন, প্রতাপের বাবা প্রতাপকে একদিন একটা ছোট কুঠার দিলেন। দিয়ে—'

'প্রতাপের বাবা কে ?'

ছেলেদের জানবার ইচ্ছা অসীম। পৃথিবীর যত কিছু সমস্যা, যত কিছু প্রশ্ন, তা প্রথম প্রশ্নই কি আর শেষ প্রশ্নই কি, শিশুমন থেকেই সে সমস্তর সমুদ্ভব। শোনা গেছে, কোন এক শিশু মুশকিল আসান, সেলাই বুরুশ এবং ইস্টিশান খেতে চেয়েছিল, সে আর কিছু না, জিভের কষ্টিপাথরে সেই জিনিস-গুলি জানবার বাসনা। ছেলেদের বায়নায় যারা রাগ করে তারা মুর্খ। ছেলেদের আগ্রহ সর্বদা মেটাতে হয়।

'প্রতাপের বাবা ? তার নামটা এখন মনে আসছে না, তবে তার এক খুড়োর নাম ছিল বটে বসন্ত রায়। তাহলে ধর হেমন্ত রায়, গ্রীষ্ম রায় কি বর্ষা রায় বা শরৎ রায় এমন কিছু একটা হবে হয়ত।'

'কি হবে ?'

'প্রতাপের বাবার নাম।'

'ও !'

আমি আবার গল্পের সঙ্গে চলবার চেষ্টা করি—'প্রতাপকে ছোট কুঠার-খানি দিয়ে তিনি বললেন -'

'কে দিল কুঠার ?'

ছেলেটির বুদ্ধির পরিচয় আমাকে মুগ্ধ করল। যতদূর সম্ভব কণ্ঠকে কোমল করলাম এবং সেই দেবদুর্লভ হাসির সঙ্গে মিকশ্চার করে নিয়ে সামান্য একটু তাড়া দিলাম—'এতক্ষণ তবে কি বললাম তোমায় ?'

কিন্তু তাড়ায় পর্যবসিত হবার ছেলে সে নয়। 'কি বললেন ?'

বলা বাহুল্য অনেকেই এ প্রশ্নে ক্ষেপে যেতেন, কিন্তু ধৈর্য, আত্মসংযম, তিতিক্ষা এসব আমার আয়ত্তের মধ্যে, আমি সহজে ক্ষেপি না। আমি জানি, কি করে ছেলেদের সঙ্গে কথা কইতে হয়। হাসবার চেষ্টা করলাম কিন্তু হাসি এল না, অগত্যা না হেসেই বললাম—'প্রতাপের বাবা দিলেন।'

'কাকে দিলেন ?'

'প্রতাপকে।'

'ও !'

'দিয়ে বললেন—'

'কাকে বললেন ?'

'প্রতাপকে।'

'ও হ্যাঁ, প্রতাপকে !'

বুঝতে পারলাম, গল্পের শেষ জানবার জন্য খোকার আগ্রহের অন্ত নেই। ওর উৎসাহের সঙ্গে তাল রেখে, যতটা সম্ভব ধৈর্য ও মাধুর্যের অবতার হয়ে আবার গল্পের সূত্র ধরলাম।

'তিনি কুঠার দিয়ে বললেন –'

'প্রতাপ বলল বাবাকে ?'

'না প্রতাপের বাবা বলল প্রতাপকে '

'ও !'

'বললেন যে, সে যেন কুঠার নিয়ে অসাবধান না হয়—'

'কে অসাবধান হবে না ?'

'প্রতাপ হবে না।'

'ও !'

'হ্যাঁ, যেন অসাবধান না হয়, যেখানে সেখানে না ফেলে রাখে এবং নিজে না কাটা পড়ে। প্রতাপকে ছোটবেলার থেকেই অস্ত্রের ব্যবহার শেখাতে হবে তো, নইলে বড় হয়ে সে সাহসী হবে কেন ? রাজার ছেলের বীর হওয়া চাই তো, তাই তিনি প্রতাপকে সেই ছোট কুঠারখানি দিলেন এবং সাবধান হতে বললেন। কারণ সাবধান না হলে ছেলেমানুষ হাত পা কেটে ফেলতে কতক্ষণ ? আর হাত-পা কাটা গেলে হাতেও খোঁড়া হতে হবে পায়েও খোঁড়াবে, তখন বীর হওয়া ভারি শক্ত ব্যাপার ! অবশ্য বাক্যবীর হবার পথ তখনো পরিষ্কার থাকবে। কিন্তু—, তুমি বুঝতে পারছ তো— ?'

প্রশ্ন করলাম বটে, কিন্তু ওকে বুঝবার অবকাশ দেবার জন্য মুহূর্তমাত্র থামবার সাহস আমার হলো না। কারণ স্পষ্টই দেখছিলাম, ওর চোখ মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, ঠোঁট কাঁপছে, হাজার হাজার প্রশ্ন যেন ঝরে পড়ার প্রতীক্ষায় শ্রাবণের মেঘের মত ঘনীভূত হয়েছে। এ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে

বড় বড় সেনাপতিরা যে কায়দা করে থাকেন আমিও তাই অবলম্বন করলাম অর্থাৎ আক্রান্ত হবার আগেই আক্রমণ করা ! ওর প্রশ্নের ধাক্কায় হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে ওকেই গল্পের তোড়ে ভাসিয়ে দেওয়া আমি ভালো মনে করলাম। সুতরাং নিশ্বাস ফেলার বিলাসিতা পর্যন্ত আমাকে ছাড়তে হলো। আমি বলেই চললাম 'আর প্রতাপও তখন কুঠার হাতে বেরিয়ে পড়ল অস্ত্রবিদ্যায় হাত পাকানোর জন্য। প্রথমে কতগুলো কচুগাছ শেষ করল, তারপর কলা-বাগানে গেল, সেখানে কলগাছদের কচুকাটা করে অবশেষে গিয়ে আমবাগানে ঢুকল। বাগানের মধ্যে বাবার সব চেয়ে প্রিয় যে ফজলি আমের গাছটা ছিল, সব চেয়ে নিরীহ দেখে এবং একলা পেয়ে তাকেই ধরাশায়ী করল।'

'ধরাধরি করে নিয়ে গেল ? গাছটাকে ?' খোকার চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন।

আমি দম নেবার জন্য মুহূর্তখানেক থেমেছি কি থামি নি, সেই ফাঁকেই গোলোকচন্দ্র একটি প্রশ্নপত্র পরিত্যাগ করেছেন।

'উঁহু, ধরাশায়ী করল, মানে, কেটে ফেলল।'

'কে কেটে ফেলল ?'

'প্রতাপ।'

'ও !'

'প্রতাপের বাবা বিকেলে বাগানে বেড়াতে গিয়েই এই কাণ্ড দেখতে পেলেন—'

'কি দেখতে পেলেন ? কুঠারটাকে ?'

'না না ! সেই ফজলি গাছের দশা। তিনি সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আমার ফজলি গাছ কেটেছে ?

'কার ফজলি গাছ ?'

'প্রতাপের বাবার। এবং সবাই জবাব দিল যে তারা কেউ কিছুই জানে না এর সম্বন্ধে—'

'কার সম্বন্ধে ?'

'ফজলি আমগাছের সম্বন্ধে।'

'ও !'

'সেই সময়ে প্রতাপ সেখানে এসে উপস্থিত হলো এবং সমস্ত শুনল—'

'কি শুনল ?'

'তার বাবা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছেন শুনতে পেল।'

'কি জিজ্ঞাসা করছেন ?'

'সেই ফজলি আমগাছের বিষয় জিজ্ঞাসা করছেন।'

'কোন্ ফজলি আমগাছ ?'

'আহা, সেই ফজলি আমের গাছ যা প্রতাপ কেটে ফেলেছিল।'

'প্রতাপ কে ?'

,প্রতাপাদিত্য !'

'উঁহু, প্রতাপাদিত্য না। প্রতাপ কে ?'

'প্রতাপের বাবার প্রতাপ।'

'ও !'

'তখন প্রতাপ এগিয়ে এসে বলল—বাবা, মিথ্যা কথা বলতে আমি পারব না—'

'ওর বাবা পারবে না ?'

'তা কেন হবে ? প্রতাপ পারবে না মিথ্যা কথা বলতে।'

'ও ! প্রতাপ ! হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'প্রতাপ বলল—বাবা, তোমার ফজলি আমের গাছ আমি কেটেছি।'

'ওর বাবা কেটেছে ?'

'না, না, না, সে নিজে কেটেছে ফজলি গাছটা, প্রতাপ বলল।'

'প্রতাপের নিজের ফজলি আমগাছ ?'

উঁহুঃ, তার বাবার।'

'ও !'

'সে বলল —।'

'প্রতাপের বাবা বলল ?'

'না, না, না ! প্রতাপ বলল—বাবা, আমি মিথ্যা বলতে পারব না, আমার সেই ছোট কুঠারখানা দিয়েই আমি গাছটাকে কেটে ফেলেছি ! এবং তার বাবা বলল—তোমার সত্যবাদিতায় আমি মুগ্ধ হলেম। তুমি খাসা ছেলে ! তোমার একটা মিথ্যা কথা বলার চেয়ে আমার এক হাজার গাছ যাক, আমার তাতে দুঃখ নেই।'

'প্রতাপ বলল এই কথা ?'

'না, প্রতাপের বাবা বললেন।'

'বললেন যে বরং তাঁর এক হাজার গাছ হোক—?'

'না, না, না। বললেন যে তিনি এক হাজার গাছ খোয়াবেন সেও ভালো, তবু—'

'প্রতাপকে গাছ খোয়াতে দেবেন না ?'

'না ; তবু প্রতাপ মিথ্যা কথা বলুক, এটা তিনি কখনো চাইবেন না।'

'তিনি নিজে মিথ্যা কথা বলবেন !'

'তা কেন ?'

'ও ! প্রতাপ চাইবে যে তার বাবা মিথ্যা কথা বলুক ?'

নাঃ, আমার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়, নিজের গুণে নিজেই আমি চমৎকৃত ! শিশুদের শিক্ষাদান সহজ কাজ নয়, যাঁরা কিল চাপড় কানমলার সাহায্যেই সেটা সারেন তাঁরা আমার এই কঠোর প্রয়াসের অর্থ বুঝবেন না।

গল্পের ছলে ছেলেদের নীতিশিক্ষা দিতে হবে, তাদের চরিত্র গড়ে তোলার ঐ হচ্ছে একমাত্র পথ।

এই ছেলেটিকে আমার নিজের আবিষ্কৃত সেই আদি ও অকৃত্রিম উপায়েই এতক্ষণ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু বৌদির বন্ধু এই সময়ে বাহিরে এলেন এবং এ-যাত্রা বেঁচে গেল এ বেচারা। যাক, হাতে সময়ও বিস্তর আছে আমার এবং পাড়ায় ছেলেরও অভাব নেই— !

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গোলক তার মাকে বলছে আমার কানে এল—

'মা শুনেছ? ভারি মজার গল্প! ঐ লোকটা বলছিল! একটা ছেলে ছিল তার বাবার নাম হচ্ছে প্রতাপ, তা সেই ছেলেটা তার বাবাকে ডেকে বলল একটা ফজলি আমের গাছ কাটতে। তার বাবা কি বললো জানো মা? বলল যে আমি এক হাজার মিথ্যা কথা বলব সে ভালো তবু একটা ফজলি আমের গাছ কাটতে পারব না।...'

বলতে কি, ছেলেদের সত্যিই আমি ভালোবাসি। ভারি ভালো লাগে আমার ওদের। ওরা স্বর্গের ফুল। (আমার মত যিশুখৃষ্টও ছেলেদের ভালোবাসতেন, সর্বদা কাছে কাছে রাখতেন– বোধহয় পরে ক্রুশে যাবার যন্ত্রণাটা আগে থেকে গা-সইয়ে নেওয়া এই করেই তাঁর রপ্ত হয়েছিল।)

হ্যাঁ, বিলিতি কবির কথাটা মনে পড়েছে এবার—চাইল্ড ইজ দি এল্ডার ব্রাদার অফ হিজ ফাদার!

ওর বাংলা হচ্ছে, শিশুরা এক একটি জ্যাঠামশাই! আস্ত অকালপক্ক। পাক্কা।

আমার পিসেমশাই প্রায় এই পৃথিবীর মতই। হ্যাঁ, গোলাকার তো বটেই, কিন্তু তা বলছিনে, আমার বলবার কথা এই, পৃথিবীর যেমন উত্তর দক্ষিণে চাপা, ঠিক তেমনই একটি মানুষ আমার পিসেমশাই।

উত্তরের দিকেই একটু বেশি করে। একেই তো অল্পকথার লোক, তারপর দুয়েকটা কথা যাও বলেন, তা আবার হুকুমের সুরে। তার ওপরে যদি তুমি তাঁর বক্তব্য খোলসা করে জানতে চাও, এবং কিছু জিজ্ঞেস করতে যাও তো তিনি একেবারেই চুপ্! হুকুমের দিকে যেমন তাঁর চাপ, উত্তর দিতে তেমনি তিনি চাপা।

এক-এক সময় এমন গোল বাধে তাঁকে নিয়ে, মানে তার কথা নিয়ে, আর এত হাঙ্গামা আমায় পোয়াতে হয় যে—

এই তো সেদিন। ডেকে বললেন আমায়—'এই' বসে বসে কী করছিস? যা তো, আমাদের মইটা শান্তালয়ে দিয়ায়। ছবি টাঙাবার না ঘর সাজাবার—কে জানে কি জন্যে দরকার পড়েছে ওদের।'

'শান্তালয়? সে তো সেই লেকের কাছে। সাদার্ন অ্যাভিনিউ ছাড়িয়ে—সে কি এখানে পিসেমশাই?'

'এখেনে নয়?' পিসেমশাই যেন অবাক হন—'এই তো এখেনেই তো! এ কি আবার এমন একটা দূর হলো?,

পিসেমশায়ের জবাবের নমুনা এই।

তা, তোমার কাছে সাদার্ন অ্যাভিনিউ এই কাছেই হতে পারে, কিন্তু যাকে মই ঘাড়ে করে যেতে হবে—মনে মনেই আমি আওড়াই—তার কাছে পুরো দশ মাইলের ধাক্কা। মইয়ের ভারে প্রতি পদক্ষেপেই সেটা দুশো মাইল বলে মনে হবে তার।

'তা, কি করে নিয়ে যাবো? লরিতে চাপিয়ে? না কি ঘোড়াগাড়িতে? এতটা পথ তো বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না একটা মই।'

'এইটুকু পথ ঘোড়াগাড়িতে? যা যা, বাজে বকিস নে। যা বললুম করগে।'

'বাসে যে নেবে তাও তো মনে হয় না।' আপন মনেই আমি আওড়াই।

'বাস্!' মনে হলো আকাশ থেকে যেন তিনি আছাড় খেলেন।

বাস্—বলেই পিসেমশাই শেষ করলেন। বাস্! আর তাঁর খতম! একটিও কথা নেই তারপর। ঠোঁটের কুলুপ এঁটে দিয়েছেন, মুখের চেহারা দেখলেই মালুম হয়। কিন্তু বাসের কথা ভাবতেও আমার ভয় করে। একবার, খুব বেশি দূরে না, এই বৌবাজার থেকে এক বস্তা তুলো নিয়ে বাসে করে আসতেই যা দুরবস্থা হয়েছিল, এখনো আমার বেশ মনে আছে! তারপরে আবার যদি মই নিয়ে বাসে চাপি তো—

বাসওয়ালা আর রক্ষে রাখবে না! বিশেষ করে সেই তুলোর বস্তার কথা যদি তার মনে থাকে! সেই পিসতুতো তুলোর দায় ঘাড়ে নিয়ে আমি—আর তার ভাড়া আদায় নিয়ে সে—দুজনেই যা বেগ পেয়েছিলাম!···তাছাড়া আরো অশান্তির কথা ছিল।···

শান্তা মাসিমার কথাই! ভাবতেও ভয় খাই, যা কড়া মেজাজী আমার এই মাসিমাটি! যদি তাঁর ঘরদোর সাজানোর জন্যে মইয়ের দরকার থাকে আর যথাসময়ে সেই মই তিনি না পান তাহলে আমি তো কী ছার, অমন জাঁদরেল যে পিসেমশাই তাঁকেও তিনি একটা পিঁপড়ের মতই পিষে ফেলবেন। পিসেমশাই যদি 'মস্তান' হন তো মাসিমা একটি পিস্তল!

'আচ্ছা নিয়ে যাচ্ছি!' বলে মই ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ি।

মোড়ের বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে খাড়া হই। বাস-এর কণ্ডাকটার তো মই দেখেই হৈ-চৈ করে ওঠে—

'না না, ওসব মইটই এখানে চলবে না। বাসে জায়গা নেই বসবার।'

'মইতো বসবে না। দাঁড়িয়ে যাবে।' আমি জানাই।

'না একদম জায়গা নেই।'

'ভাড়া দি যদি?' বলে আমি দু টাকার একটা নোট দেখাই!

দু দুটো টাকা পেলে লোকে ঢেঁকি গেলে, কাজেই একটু ঢোঁক গিলে·সে মইটাকে সইতে রাজি হলো শেষটায়।

খুব কষ্টেসৃষ্টে তো মইয়ের খানিকটা ঢোকানো গেল বাসে। মইয়ের ঘাড়টা সামনের লেডিজ সীটের দুইটি মহিলার নাক ঘেঁষে গেল। তাঁদের

দুজনের গালের মাঝখান দিয়ে গলে ওদিককার জানালা ভেদ করে বেরুলো—ট্রামের পথ আটকে! দাঁড়িয়ে গেল ট্রাম। ট্রামের পর ট্রাম দাঁড়িয়ে গেল পরের পর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল দেখতে না দেখতে। ভিড়ের কেউ কেউ অবিশ্যি সাহায্য করতে এগিয়ে এল, তাদের সঙ্গে জিলিপি খেতে খেতে একটা ছোট্ট ছেলেও। জিলিপিখোর ছেলেটা বোধ হয় ভেবেছিল এটা একটা মজার খেলা। যাক, সবাই মিলে ধরাধরি করে বিস্তর চেষ্টায় মইটাকে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে কোণ ঘেঁষে কোনোরকমে তো বাগিয়ে নেয়া গেল বাসে। মইয়ের ধাক্কায় ছেলেটার আধখানা জিলিপি উড়ে গেল, বাসের একধারের খানিক রঙ গেল চটে, একটা দারোয়ানের প্যাগড়ি গেল পড়ে। সেও চটে গেল। অবশেষে অনেক কষ্টে মইটাকে বাসের মধ্যে লম্বালম্বি করে রাখা গেল—প্যাসেজের মাঝখানটায়। বাসের পেছনদিকের লেডিজ সীটের মহিলাটির পা ছুঁয়ে একেবারে সামনেকার সীটের মাড়োয়ারির ভুঁড়িতে গিয়ে ঠেকলো মই। একজন পাদরি উঠেছিলেন বাসে, তাঁর পায়ে পড়লো মইটা! পড়তেই তিনি 'ও মাই গড্!' বলে লাফিয়ে উঠলেন।

'তখনি বলেছিলাম।' বলল বাসের কণ্ডাকটর।—'এখন তোমার মই তুমি সামলাও!'

মই সামলাতে আমি মাড়োয়ারিটির পাশে গিয়ে বসলাম—তাঁর ভুঁড়ি আর মইয়ের মাঝে হাইফেন হয়ে। মইটা তখন বাসটির চলবার বেতালে (কিংবা চালাবার বেচালে), মাঝে মাঝে ওপাশের ভদ্রলোকের বগলে গিয়ে ঢুঁ মারতে লাগল!

'এই! এ কী হচ্ছে?' ধমকে উঠলেন তিনি!—'নিজের মইকে আগলে রাখতে হয়, তা জানো?'

তখন অগত্যা, বগলাবাবুর কথায় ওটাকে নিজের বগলে আনলাম। কিন্তু এমন কিছু হনুমান নই যে সূর্যের মত মইটাকে বগলদাবাই করতে পারবো। মইটা আমার বগলে থেকে আমাকেই দাবাতে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে, ওটা যাতে গলে কারো বগলে কি ভুঁড়িতে গিয়ে না লাগে, তার জন্যে ওকে শিরোধার্য করতে হলো আমায়—বসতে হলো—মইয়ের মধ্যে নিজের মাথা গলিয়ে। যার তলদেশে থাকবার কথা সে আমার গলদেশে এলো। মইয়ের দুধারের ডাণ্ডা আমার ঘাড়ের দুদিকে বারাণ্ডার ন্যায় বিরাজ করতে লাগল।

মই ঘাড়ে পড়লে বোধহয় মাথা খুলে যায়। তখন আমার মাথায় খেললো যে মইটাকে এমনি করে গলায় গেঁথে না রেখে আর নিজে তার মধ্যে ঢুকে না থেকে এটাকে প্যাসেজের মাঝখানে চিৎ করে রাখলেও তো হয়। কোনো মইয়ের পক্ষেই সেভাবে থাকাটা অনুচিত নয়। আর তাহ'লে এই মইয়ের মালা গলায় দিয়ে ত্রিভঙ্গমুরারি হতে হয় না আমায়।

মইয়ের গলগ্রহদশা থেকে মুক্তি পেলাম। ওটাকে বিছিয়ে রাখা হলো

মেঝেয় ! তার একধারে—মাথার দিকটায় আমি খাড়া রইলাম। আর মাঝে মাঝে সিঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়ালো মাঝখানের যাত্রীরা। খাঁজে খাঁজে ভাঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সবাই। যারা বসেছিলো তাদেরও আর অস্থির হতে হলো না।

এমন সময়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলো এক পাহারাওয়ালা। মইটা যে মেঝেয় পাতা রয়েছে সেটা তার নজরে ঠেকেনি (স্বভাবতই তাদের উঁচু নজর তো)। পায়ে লেগে হোঁচট খেয়ে সে সামনের আসনের মহিলাটির ঘাড়ে গিয়ে পড়লো। অমন পাহাড় ঘাড়ে পড়লে বেঘোরে মারা যাবার কথা, কিন্তু মেয়েটির হাড় শক্ত ছিল মনে হয়। একটু বিরক্ত হয়ে তিনি ঘুরে বসলেন কেবল। আর সেই পাহারাওয়ালা তখন তাল সামলে মাথার পাগড়ি ঠিকঠাক করে গর্জে উঠলো বাজের মতন—'এ চীজ হিঁয়াপ্‌পের ঘুসায়া কৌন বেতমিজ ?'

কথাটা যেন বেতের মতই পড়লো আমার পিঠে। আমি নিরাসক্তের ন্যায় অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম। রাস্তার শোভা দেখতে লাগলাম নিবিষ্ট মনে।

'ওই ! ওই যে ওইখানে দাঁড়িয়ে।' কণ্ডাকটার আমায় দেখিয়ে দিলো।

'লেকিন তুম কেঁউ ঘুসনে দিয়া ?' পাহারাওয়ালার তম্বি চলে তার ওপর —'উসকো ঘুসনে দিয়া কেঁউ ?'

এত কেঁউ কেঁউয়েও কন্ডাকটার চুপ করে থাকে গুডবয়ের মতন। যদিও গুড কণ্ডাকটের সার্টিফিকেট ওকে দেয়া যায় না। ভাবি যে বলি একবার—কাহে ঘুসনে দিয়া জানতে চাও ? দু টাকা ঘুস নিয়ে তবে দিয়েছে। তারপর খেয়াল হলো যে ঘুস দেয়াটাও তো নেয়ার মতই অন্যায়। পুলিসের সম্মুখে নিজের মুখে দোষ কবুল করে হাতে নাতে ধরা পড়াটা বুদ্ধির কাজ নয়।

বাস ছেড়ে দিলো। পাহারাওয়ালাটা সিঁড়ির সববের তলার ধাপে দাঁড়িয়ে নিজের মনে গজরাতে থাকলো।

বাসের ভেতর সিঁড়ি রাখাটা কতো সিরিয়াস—বাস ছাড়তেই তা টের পাওয়া গেল। আর, তারাই টের পেলো বেশি করে যারা মইয়ের খাঁজে খাঁজে পা ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছিল।

বাস চলতে শুরু করতেই তাঁরা টলতে লাগলেন। মইয়ের ছোট ছোট খুপরির চৌকোর মধ্যে দাঁড়িয়ে চলতি বাসে স্থির হয়ে থাকতে পারে এমন চৌকোস লোক অতি বিরল।

এক ভদ্রলোক তো থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন,—'ইস বেজায় লাগছে ! আর তো পারা যায় না—উঃ !'

'মই তো শোয়ানো রয়েছে মশাই ! লাগবার কথা তো নয়।' আমি বললাম।

'আমার পায়ে কড়া আছে যে ! তাতেই লাগছে।' তিনি জানালেন।

'তা কড়াটা পায়ের কাছে রেখেছেন কেন ? হাতে রাখলেই পারেন।' আমি হাত বাড়িয়ে বলি—'দিন, আমার হাতে দিন।'

'দিতে পারলে তো বাচতুম।' তাঁর কাতরানি শোনা গেল—'হায়, পায়ের কড়া যে কারো হাতে দেখা যায় না। আঃ গেলাম—বাবারে !'

বিরূপ দৃষ্টির সঙ্গে মিশিয়ে তাঁর বিষাক্ত আর্তনাদ বর্ষিত হতে লাগলো—আমার ওপর। অগত্যা বাধ্য হয়ে বলতে হলো আমায়—'কড়া নিয়ে তাহলে ওঠেন কেন বাসে ? বাসায় রেখে এলেই পারতেন। কড়া নিয়ে বাসে যে আসতেই হবে এমন কোনো কড়াকড়ি নেই।'

'মই নিয়েই বা আসে কেন লোকরা।' আমার কথার জবাব দিলেন সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোক—গোড়াতেই নিজের ভুঁড়িতে আমার মইয়ের চোট যিনি সয়েছিলেন।

কণ্ডাকটার বলল, 'আহাম্মোক !'

আমাকেই বলল মনে হয় !'

পাহারাওয়ালাটা চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে।

'আমি কি ইচ্ছে করে পায়ের কাছে এই কড়া রেখেছি ? পায়ের কড়া বাসায় রেখে আসবো, তুমি বলছো ?' ভদ্রলোক ভারী খাপপা হলেন—'বলছো তুমি ? বটে ? বেশ, তাহলে দ্যাখো আমার পায়ের কড়া। দ্যাখো একবার ভালো করে।' ভদ্রলোক তাঁর পা তুলে দেখাবার চেষ্টা করেন আমায়।

আমি দেখলাম—পায়ের কব্জির কাছে কালোপানা উঁচু হয়ে ঢিবির মতই কী যেন একটা। পায়ের মাংস উঁচু হয়ে, মাংসের বড়া বলেই আমার বোধ হলো। মোটেই হাঁড়ি কি কড়াইয়ের মত নয়। চাটুর মতও না। তাকে কড়া বলা নিতান্তই ওঁর চাটুকারিতা।

আমার মত অনেকেই কৌতূহলের বশে কড়াটাকে দেখছিলো। তিনিও, ঐ ভিড়ের মধ্যে যদ্দুর সাধ্য পা তুলে দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু বাসের আন্দোলনে এক পায় স্থির হয়ে থাকা কারো কম্মো না ! অচিরেই তিনি উলটে পাদরিটার ওপর গিয়ে পড়লেন ! একেবারে অপদস্থ হয়ে !

'ও মাই গড !' পাদরিটা চেঁচিয়ে উঠলো পুনশ্চ।

কড়াওয়ালা পাদরির কোল থেকে উঠে খাড়া হলো আবার—'দেখলেন তো সবাই আপনারা ! ছেলেটা চাইছে এই কড়া ওর হাতে দিতে। দেখুন একবার ! হাঃ হাঃ হাঃ ! ওরে বাবারে—গেলুম রে। ইস্।'

খুনি হ্যায়, ডাকু হ্যায়, চোটটা হ্যায়।' আরেক চোট এলো পাহারা-ওয়ালার কাছ থেকে—'উসকো হাতকড়া লাগানা ঠিক হ্যায়।'

এবার আমি একটু ভয় খেলাম। পায়ের কড়া আমাকে দেয়া না গেলেও এক্ষুণি আমায় পাকড়ানো যায়। পুলিসের পক্ষে কিছুই অসম্ভব না।

পাহারাওয়ালার ধার ঘেঁষে দুটি ইস্কুলের মেয়ে উঠলো বাসে—চৌরঙ্গি

টেরেসের কাছটায় এসে। এলগিন রোড আসতেই অনেক খালি হয়ে গেল বাস। মইটাকে সামনে দেখে একটা মেয়ে তো লাফিয়ে উঠলো—'বারে। কী চমৎকার একটা মই রয়েছে এখানে। দেখেছিস! দ্যাখ দ্যাখ্!'

'দেখিস। যেন পায়ে আটকে পড়ে না যাস।' ওর সঙ্গিনী ওকে সাবধান করে দেয়।

'আহা। মই বেয়ে যেন উঠিনি কখনো! আমাদের ছাতেই তো রয়েছে মই!' সইয়ের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে মইয়ের ধাপে ধাপে পা রেখে—পায়ে পায়ে সে এগিয়ে আসতে লাগলো সামনের দিকে।

'তুই ঐখেনে বোস। আমি সামনের লেডিজ সীটে বসি গিয়ে। আহা, এমন একটা চমৎকার মই। বিনে পয়সায় চড়ে নিই মজা করে।'

মইয়ের ওপর দিয়ে—তার দাঁড়ে দাঁড়ে—হীল-তোলা জুতা খট খটিয়ে হঠাৎ পা ফসকালো মেয়েটার। হোঁচট খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়লো সে—পড়লো সেই পায়ে-কড়াওয়ালার ঘাড়ে। আর সে লোকটা, তার কড়াঘাতের ওপর মেয়েটির পদাঘাত লাভ করে এমন একখানা চিৎকার ছাড়লো যে কণ্ডাকটারটা 'খালি গাড়ি—কালীঘাট!' বলে ঘন ঘন চেঁচাচ্ছিল—সে-চেঁচানিও তাকে থামিয়ে ফেলতে হলো তক্ষুণি। তার অমন সঘন যে আওয়াজ—তাও চাপা পড়ে গেল সেই করাল কণ্ঠের দাপটে।

আর মেয়েটার একপাটি জুতো তার পায়ের থেকে খুলে—ছিটকে বেরিয়ে গেল বাসের থেকে। নিজের আবেগেই।

বেরিয়ে গেল হাজরা রোডের মাথায়। হাজার লোকের মাঝখানে মনে হয় ভিড়ের মধ্যে চিরতরেই হারিয়ে গেলেন শ্রীজুত।

বাস থামলো কালীঘাটের স্টপে এসে।

মেয়েটা কণ্ডাকটারের দিকে তাকালো—'আমার জুতো?'

'আমি তার কী জানি। ওই লোকটার মই। ওকেই বলুন।'

মেয়েটি কিছু না বলে শুধু দুটি প্রশ্নবান নিক্ষেপ করলো আমার দিকে। নীরবে তার দুটি চোখ দিয়ে।

'আমার কী দোষ? মানে, আমার মইয়ের দোষ কি?'

তার চোখ দেখে আর রোখ দেখে, মইয়ের হয়ে সাফাই দিতে হলো আমায়—'তুমি যদি মইয়ের কাঠিতে পা দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে না আসতে—একটু চেষ্টা করলে অনায়াসেই ফাঁকে ফাঁকে পা রেখে আসা যেত—তাহলে আর এই দুর্ঘটনা ঘটতো না।'

'আমি কিন্তু ছাড়বো না। পাঁচ টাকা নেব তোমার কাছ থেকে।' মুখ খুললো মেয়েটি: 'আমার জুতোর দাম।'

ততক্ষণে তার সঙ্গিনী সন্তর্পণে—মইয়ের ফাঁকে ফাঁকে পা রেখে—এগিয়ে

তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—সে বলে উঠল—'ও তোর একপাটির দাম রে! অন্য পাটিটা কি আর তোর কোনো কাজে লাগবে? ওটাও তো গেছে!'

তখন মেয়েটি তার অপর পাটিটা খুলে আমার হাতে তুলে দিল—'এটা—এটাও তাহলে তুমি নাও। তোমাকে দুপাটির দামই দিতে হবে। দশ টাকাই নেব আমি তোমার কাছ থেকে।'

'এক পয়সাও নেই আমার কাছে।' জুতোটা হাতে নিয়ে আমি জানালাম। কেন না সত্যি বলতে, দুটাকার যে নোটখানা ছিলো সেটা নামার সময় কণ্ডাকটারকে দিয়ে আমার এই মই ছাড়াবার কথা। এই নোট আর মোট তখন একসঙ্গে খালাস হবে।

'তোমার না থাক তোমার দাদার আছে!' মেয়েটির বন্ধু সহাস্য মুখে বলল তখন—'না হয় তোমার বৌদির কাছ থেকে এনে দাও।'

'আমার দাদাই নেই তো বৌদি!' আমার আরেকটি অভাবের কথাও দুঃখের সঙ্গে ব্যক্ত করতে হলো আমাকে—'আমিই আমার দাদা।'

পাহারাওয়ালাটা বুঝি আর সইতে পারলো না! সে গর্জে উঠলো এবার—'নিকালো হিয়াসে।'

'আভি নিকালেগা।' বলতে বলতে আমি তৈরি হই।

বাসে আর এক দণ্ডও তিষ্ঠোতে ইচ্ছা ছিল না। সাদার্ন অ্যাভিনিউ এসে পড়েছিল।

'রোকো বাস। উতারো এ উজবুককো। হটাও উসকো ইয়ে চীজ।' গর্জাতে থাকে আইনের কর্তা, দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

ড্রাইভার হকচকিয়ে যায়। বাস থামাতে বাধ্য হয়। আমিও মই নিয়ে নামি। সবাই সাগ্রহে ধরাধরি করে নামিয়ে দেয় মইটা। কোনো কড়া ছিল না, তবু, পায়ে—কড়াওয়ালাও হাত বাড়িয়ে সাহায্য করে। আর এদিকে, পাহারাওয়ালার হুমকির সামনে হাত পাততে সাহস করে না কণ্ডাকটার। নিজের গুড কণ্ডাক্ট দেখায়। দু টাকা দূরে থাক, দুপয়সাও ভাড়া দিতে হয় না মইয়ের।

বাস চলে যায়। ফিরতেই দেখি—মাসিমার বাড়ি। শান্তালয়, নাকের সামনেই।

মই ঘাড়ে নিয়ে মাসিমার দ্বারে গিয়ে দাঁড়াই।

'মই কী হবে রে?' মাসিমা তো অবাক।

'পিসেমশাই আনতে বললেন যে—!' আমি আমতা আমতা করি—'ঘর সাজাবার জন্যেই দরকার নাকি তোমার।'

'মই দিয়ে ঘর সাজাবো? গলায় দড়ি! বলিহারি বুদ্ধি তোর পিসের। মই দিয়ে কেউ আবার ঘর সাজায় নাকি? যতো সব অলক্ষণ! নিয়ে যা তোর বিদঘুটে মই।'

'অ্যাঁ?' শুনেই আমার পিলে চমকায়। ফের এই মই ঘাড়ে নিয়ে যাবার

কথায় এতক্ষণের দৃশ্যগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি শিউরে উঠে বলি—'নিয়ে যাবো মই বলছো তুমি ?'

'এক্ষুণি। এই দণ্ডে!' চেঁচাতে থাকেন মাসিমা—'নিয়ে যা এই হতচ্ছাড়া মইটাকে আমার চোখের সামনে থেকে। দূরে কর। দূরে হ! যতো সব পাপ! সবাই তোরা অলক্ষণ!'

মই সমেত দূরীভূত হবার জন্যে ঘুরতেই একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়ালো পাশে। পিসেমশাই নামলেন তার থেকে—

'তখুনি জানি।' বলতে বলতে নামলেন তিনি—'জানি যে তুই একটা হতমুখ্য! নিশ্চয় একটা গোল পাকাবি। তোর ঘটে একটুও যদি বুদ্ধি থাকে! যদি একটা কাজেরো ভার তোকে আর দিই কখনো!'

'মাসিমা নিতে চাচ্ছে না যে মই, আমি কী করবো? বলছে যে দূরে হয়ে যা তোর অলক্ষুণে মই নিয়ে।'

'আমি তোকে বললাম শান্তি-আলয়ে নিয়ে যেতে। খানচারেক বাড়ির পরই শান্তি-আলয়। আর তুই কিনা—এই মই ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছিস এখেনে?'

'শান্তি-আলয়? শান্তি-আলয় বললে তুমি? কখন বললে তুমি?' এবার আমার রাগ হয় সত্যিই—'তুমি বললে না—শান্তালয়? শান্তা মাসিমার বাড়ি—বললে না?'

'শান্তালয়? শান্তালয় বলেছি আমি? বলেছি শান্ত্যালয়। শান্তালয় আর শান্ত্যালয় এক হলো? আ আর অ্যা এক? পাঁটারা আর প্যাঁটরা এক জিনিস?'

আমি কোন উত্তর দিতে পারিনে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলে তো দেব! আমার তখন আক্কেল গুড়ুম!

'প্যাঁট্ প্যাঁট্ করে তাকাচ্ছিস্ কী—পাঁটার মতন? পাঁটারা আর প্যাঁটরা কি এক হলো? পাঁটারা আমাদের পেটে যায় আর প্যাঁটরার পেটে আমাদের জিনিসপত্তর থাকে। পাঁটাদের চার পা আর প্যাঁটরার কোন পা-ই নেই, পাঁটারা ভ্যা ভ্যা করে—'

'হয়েছে হয়েছে। আর বলতে হবে না।' পিসেমশায়ের ভ্যাকার দিয়ে ব্যাখ্যানায় আমি অস্থির হয়ে পড়ি।

'তবেই বোঝ।' পিসেমশাই তাঁর বোঝা নামান: 'আকার আর অ্যাকারে আকাশ-পাতাল ফারাক। নাকার আর ন্যাকারে যতখানি তফাত! ইস্কুলে যাস যে, পড়িস কি? কী শেখায় সেখানে শুনি?'

'পাঁটাদের কথা সেখানে পড়ায় না। তোমার প্যাঁটরার কথাও নয়।'

কিন্তু সন্ধি তো পড়ায়? শান্তি + আলয়—সন্ধি করলে কী হয়?'

'সেটা তোমার অভিসন্ধি।' রাগ করে না বলে আমি পারি না: 'কিন্তু তা যদি তোমার পেটের মধ্যে থাকে—তোমার প্যাঁটরার ভেতরে পুরে রাখো—আর তার টের পাবো কি করে?'

ভোজন দক্ষিণা

আমাদের মাসতুতো ভাই এণ্ড কোম্পানি ডকে উঠে যাবার পর, কিছুদিন পরেই আবার আমাদের মাথায় ব্যবসার ফন্দি গজিয়ে উঠল।

এবারকার বুদ্ধিটা ভোলানাথের। কিন্তু এরকম বেয়াক্কেলে বুদ্ধি আর হয় না, বলতে আমি বাধ্য। সত্যি, সেই বাসের কারবারের চেয়েও ঢের বেশি অবাস্তব।

আমি বললাম, 'ব্যবসা তো করবি, কিন্তু তার মূলধন কই? টাকাকড়ি সব তো সেই বাসের ব্যবসাতেই হারাতে হয়েছে আমাদের।'

'আমাদের এক মাসতুতো ঠাকুর্দা…' বলছিল ভোলানাথ।

'কী বললি? কীরকমের ঠাকুর্দা?' জিজ্ঞেস করল শৈলেশ।

'আমার মাসির বাবা আর কী!' জানাল সে।

'সেতো তোর মারও বাবা রে। দাদামশাই বল তাহলে!'

'ওই হলো। তা, তিনি বার্মা মুলুকে টিকের ব্যবসাতে বিস্তর টাকা কামিয়ে দেশে ফিরেছেন সম্প্রতি। দেশে মানে এই কলকাতাতেই। আহিরীটোলায় তাঁর পৈতৃক বাড়ি আছে, সেখানেই উঠেছেন এসে।'

'টিকের ব্যবসায় বড়লোক?' অবাক হয় শৈলেশ।

'ঠিক বলছিস!' আমিও কম অবাক হইনে।

'সত্যি না তো কী! বার্মায় গিয়ে টিকের ব্যবসায় বহুৎ লোক ধন-কুবের হয়েছে—কে না জানে!'

'ব্যবসায় টিকে থাকাই বলে শক্ত!' আমি বললাম—'দেখলি না, টেকা দূরে থাক, দাঁড়াতেই পারলাম না আমরা।'

'এ বাস-এর ব্যবসা নয় রে ভাই, টিকের ব্যবসা। বলছিনে?' বলল ভোলানাথ।

'টিকে তামাকের ব্যবসায় বড়লোক?' আমার বিশ্বাস হতে চায় না, 'তবে হ্যাঁ, ব্যবসায় টিকে থাকতে পারলে হতে পারে। সব ব্যবসাতেই হওয়া যায় হয়তো—টিকে থাকতে পারলে শেষ পর্যন্ত।'

'আরে দূর।' বলল সে, 'তামাক টিকের ব্যবসা না রে! যে-টিকে দিয়ে হামবসন্ত আটকায় তাও না। আর পণ্ডিতমশাই শ্লোক ঝেড়ে 'টিকা লিখহ' বলে যে ব্যাখ্যা করতে দেন তার কথাও বলছি না আমি। এ হচ্ছে আসল টিকের ব্যবসা।'

'আসলটি-কে ব্যক্ত করহ, বৎস!' আমি বললাম, 'বিস্তৃত বিবরণ সহ।'

'টিক হচ্ছে একরকমের কাঠ—বার্মা মুলুকে মেলে কেবল।'

'কাঠ, তাই বল! তা, আকাঠের মতন অমন টিক টিক করছিস কেন তখন থেকে?' আমি বললাম।

'ঠিক ঠিকই বলছি।' বলল ভোলানাথ—'আর এটাও জানি যে তার থেকে দামী দামী আসবাবপত্র বানায়—টিক-উড-এর ফার্নিচারের দাম সবচেয়ে বেশি। টিক-এর জিনিস ঢের বেশি দিন টিকে থাকে বলেই ওই নাম টিক হয়েছে কিনা তা আমি বলতে পারব না।'

'তা তোর দাদুর টিকের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক তা তো সঠিক বুঝতে পারছি না দাদা।' বলল শৈলেশ

দাদুর নিজের ছেলেপুলে বলতে কেউ নেই, আছে কেবল অগাধ টাকা, লোকটা কী ধরনের জানিস? সেই যে মারা গেলে কাগজে ছবি ছেপে বেরোয় —আর লেখা থাকে—ওঁর ভারী দান-ধ্যান ছিল, যেমন পরোপকারী তেমনি দাতা, দেশহিতৈষী মহানপুরুষ, কত লোককে—কত পরিবারকে গোপনে তিনি নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'সে তো মারা যাবার পর জানা যায়, জ্যান্ত থাকতে টের পায় না কেউ।' আমি প্রকাশ করি।

'এখানে জ্যান্ত থাকতেই জানা যাচ্ছে। জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত আমার দাদু। তিনি চান বাঙালির ছেলেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজের পায়ে খাড়া হয়ে যাক —তিনি নিজে যেমনটি হয়েছেন। সেইজন্যে কেউ গিয়ে ব্যবসার জন্য তাঁর কাছে টাকা চাইলে তক্ষুনি তিনি মূলধন দিয়ে সাহায্য করেন—এমনিতেই।'

'বলিস কী রে!'

'তবে আর বলছি কী। আমার এক মামাতো ভাই ব্যবসা করবে বলে বেশ কিছু টাকা বাগিয়ে এনেছে তাঁর কাছ থেকে।'

'কাঠের ব্যবসা ?'

'না কাঠ নয়, কাটলেটের। বলছে যে বিক্রি না-হয় নিজেই খেয়ে কাটিয়ে দেবে। পয়সা দিয়ে তাকে আর কাটলেট কিনে খেতে হবে না। ব্যবসাটা মন্দ নয় তেমন।' বলল ভোলানাথ।

'সে বুঝি কাটলেট খায় খুব ?' জানতে চায় শৈলেশ।

'করেছে কাটলেটের ব্যবসা ?' সঙ্গে-সঙ্গেই আমার সোৎসাহ প্রশ্ন।—'কোথায় তার সেই দোকানটা রে ?'

'কাটলেট না কচু! সিনেমা দেখে ফুঁকে দিচ্ছে টাকাটা। কেবল রোজ চারটে করে দিলখোস কেবিনের কাটলেট কিনে নিজের দোকানের বলে পাঠিয়ে দেয় দাদুকে। দাদু ভারী খুশি। বলছে যে কলকাতার ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় ব্র্যাঞ্চ খুলতে, আরো আরো টাকা সাহায্য করবে তাকে।'

'ভারী কাটখোট্টা তো!' আমি বলি, 'না না, তোর দাদুকে বলছি না—তোর ঐ মাসতুতো ভাইটা।'

'মাসতুতো নয়, মামাতো ভাই। মাসতুতো বলে অপমান করছিস আমার ?' ভোলানাথের ভারী গোসা হয়।—'মাসতুতো ভাই তো চোরে চোরেই হয়ে থাকে।'

'ওই হলো। মাসীর গোঁফ বেরুলেই মামা।'—আমি এই বলে ওকে সান্ত্বনা দিই।

'তাহলে তুই যাচ্ছিস না কেন ?' শুধায় শৈলেশ : 'তুই গেলে তো অনেক বেশি টাকা পাবি। তোর নিজের দাদু বলছিস যখন।'

'না, আমি গেলে হবে না। আমি তার আপন খুড়তুতো মেয়ের আপন ছেলে যে, বলছি না যে লোকটা ভারী পরোপকারী ? পরের উপকার করে, নিজের লোকের জন্যে কিচ্ছু করে না।'

'নাতিরা বৃহৎ হোক চায় না বুঝি ?' আমি বলি, 'তাদের নাতি-বৃহৎ থাকাটাই পছন্দ করে বোধহয় ?'

'তাই হবে হয়ত। তাহলে তুই যা।' বাতলায় সে আমায়, 'তুই তো দাদুর কেউ নোস—যাকে বলে কাকস্য পরিবেদনা। তুই গেলে দেবে ঠিক।'

'কিন্তু কী ব্যবসার কথা বলব, বল তো ?'

'যা মাথায় খেলে, যা মনে আসে তখন। ব্যবসার নাম শুনলেই দাদু অজ্ঞান। সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়। টাকা তো দেয়ই, খাওয়ায় আবার। খুব খাওয়ায়, বলল আমার মামাতো ভাই। কেউ কিছু খেলে খুব খুশি হয় নাকি। খুশি হয়ে টাকা দেয় তখন।'

'বলিস কী রে ?' জিভের জল টানি, 'সে কথা বলতে হয় আগে।'

সেদিন বিকেলেই বেরিয়ে পড়লাম ভোলানাথের দাদুর দিশায়। ততটা

টাকার লোভে নয়, যতটা ভালমন্দ চাখার লালসায়। সত্যি বলতে চমচম, ছানার গজা, ল্যাংচা, পান্তুয়া, লেডিকেনি, দরবেশ, শোনপাপড়ি, সন্দেশ, রাজভোগ, মতিচুর—তারাই আমায় মক্তারামের মস্ত আরাম ছেড়ে অতিদূর আহিরিটোলায় টেনে নিয়ে গেল কান ধরে হিড়হিড় করে। নাম্বার খুঁজে বাড়ি বের করতেও দেরি হল না।

বিরাট বাড়ি। অবারিত দ্বার। সোজা ওপরে উঠে গেলাম। দোতালার সামনের ঘরেই সৌম্যদর্শন বয়স্ক এক ভদ্রলোককে সোফায় বসে থাকতে দেখলাম। আমাকে দেখে তিনি শুধালেন, 'কে তুমি?'

'আজ্ঞে, আমি ভোলানাথের মামাতো ভাই।' জবাব দিলাম, 'আপনার নাতি শ্রীমান ভোলানাথ।'

'ও!···তা, ভোলানাথ তো ঠিক আমার আপন নাতি নয়। মানে, আমি বলছিলাম যে ঠিক আমার পৈতৃক নাতি নয় সে।'

'পৈতৃক নাতি!' আমার বিস্মিত কণ্ঠ থেকে বেরোয়। 'পৈতৃক সম্পত্তি হয় আমি জানতাম। পৈতৃক নাতি হয় বলে আমার জানা ছিল না।'

'পৈতৃক নাতি, মানে, বাবা বিয়ে দিয়ে গেলে নিজের বৌয়ের মেয়ের পেটের ছেলে হলে যাকে বলা যায়। আমি তো বে থা না করেই রেঙ্গুনে পালিয়ে গিছলাম যৌবনে—ব্যবসা করতেই।—ভোলানাথ হচ্ছে আমার খুড়তুতো ভাইয়ের শালীর ছেলে।'

'তাহলে অবশ্যি তাকে সহোদর নাতি বলা যায় না সত্যি।' সায় দিতে হয় আমায়।

'তাই বলছিলাম তুমি ভোলানাথের কী রকমের মামাতো ভাই?'

'আমি ··আমি···আমি'—আমতা করি। আমার আমিত্ব আমায় ছাপিয়ে উঠে আত্মপ্রকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

'সেদিন ভোলানাথের এক মামাতো ভাই এসেছিল কি না, রাখহরি না কী যেন নাম। বলল যে সে-ই ভোলানাথের একমাত্র মামাতো ভাই, আবার তুমিও বলছ···'

'আজ্ঞে, একটু ভুল হয়েছে', শুধরে নিই আমি, 'আমি নই, ভোলানাথই হচ্ছে আমার মামাতো ভাই। গুলিয়ে ফেলেছিলাম আমি। আমি হচ্ছি ওর পিসতুতো ভাই।'

'তাই বলো!' শুনে তিনি ঠাণ্ডা হন—যেন মনের শান্তি খুঁজে পেলেন তিনি। 'তোমার নামটি কী?'

'আজ্ঞে, আমার নাম থাকহরি।'

মামাতো আর পিসতুতো দুই ভাইয়ের নামের দুটো পিস মিলিয়ে আমি বিশ্বাসযোগ্য করে দিই। আবহাওয়াটা যাতে **peaceful** দাঁড়ায়।

'আশ্চর্য! আমার খুড়তুতো ভাইয়ের বংশে দেখছি হরিনামের ছড়াছড়ি।

তার নামও ছিল আবার রামহরি।' বলে তিনি আরামের নিশ্বাস ফেললেন, 'তা তুমি কি খেয়ে বেরিয়েছ বিকেলে ?'

'আজ্ঞে ···' বলে আমি চুপ করে থাকি। এ-কথার আর কী জবাব দেব ? সত্যি বললে বলতে হয় যে এখানে এসে বেশ করে সাঁটবো বলে সেই সকাল থেকে দাঁতে কুটোটি দিয়ে পড়ে আছি ! কিন্তু ভোলানাথের কথাটা দেখছি মিথ্যে নয় নেহাৎ ! টাকার কথাটা না পাড়তেই তিনি খাবার কথাটা পেড়ে বসেছেন ।

আহিরিটোলার বিখ্যাত সন্দেশের আশায় উল্লসিত হয়ে উঠেছি, তিনি উঠে এসে আমার নাকের ডগা টিপে ধরলেন।

এ কী ! খাবার নাম করে হঠাৎ আমার এই নাকমলা কেন ? চমকে উঠতে হয় ! এরপর আবার কানমলা খেতে হবে নাকি ?

তারপর ঠোঁটে হাত ঠেকিয়ে বললেনঃ 'ঠাণ্ডা !···দেখি, তোমার হাত দেখি।' আমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'হাতও ঠাণ্ডা দেখছি। ভালো কথা নয়।'

তারপর তিনি আমার পায়ে হাত দিতে এগুচ্ছেন দেখে আমি তিন পা পিছিয়ে এলাম, 'এ কী ! আমার বাপের বয়সী হয়ে আপনি আমার পায়ে হাত দেবেন—আমার পায়ের ধুলো নেবেন সে কি কখনো হয় ? আমি একটা পুঁচকে ছেলে !'

'তোমার পায়ের ধুলো নিতে যাব কেন হে ! আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডা কিনা দেখছিলাম তাই।···দেখলাম যে একেবারে কিছু না খেয়ে রয়েছ ! অনেকক্ষণ থেকে তোমার পেটে কিছু পড়েনি। চার পাঁচ ঘণ্টা না খেয়ে থাকলে রক্তের চাপ কমে যায় কিনা ! দেহের প্রান্তসীমাগুলো ঠাণ্ডা মেরে আসে, হাত পার আঙুল, ঠোঁট, সব হীমশীতল হয়ে যায় ! কিছু খেলেই ফের রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে তক্ষুনি সব গরম হয়ে ওঠে আবার। দাঁড়াও, তোমাকে আগে কিছু খেতে দিই এখন।'

বলে তিনি থার্মোফ্লাস্ক থেকে একটা গেলাসে গরম জল ঢাললেন, তারপর একটা কৌটোর থেকে সাদা গুড়ো মতন কী একটা জিনিস ঢাউস চামচের বড় বড় তিন চামচ গুললেন সেই জলে। গেলাসটা এগিয়ে বললেন—'নাও খেয়ে ফ্যালো।'

সুবোধ বালকের মতন ঢক ঢক করে গিলে ফেললাম কোনরকমে।

'কী রকম খেতে ?'

'বিচ্ছিরি ! তেতো ! আমার তো কোন অসুখ করেনি, ওষুধ খেতে দিলেন কেন আমায় ?'

'ওষুধ নয়, এর নাম প্রোটিনেক্স্। প্রোটিন কাকে বলে জানো ? মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা এই সব হচ্ছে প্রোটিন। সেইসব প্রোটিনের সার ভাগ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্কাশিত করে বিচূর্ণিত অবস্থায় এই কৌটোয় রক্ষিত। নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে মানুষে যত মাছ, মাংস, ডিম, আর সন্দেশ সাঁটাতে পারে, পুরো তিন চামচে তুমি তার সারাংশটা সব খেলে এখন।'

'একটা পুরো ভোজ খেলাম! বলেন কি!' চোখের ওপর ভোজবাজি দেখে আমার তাক লেগে যায়।

'হুবহু। তবে জিনিসটা দুধে মিশিয়ে খাওয়াই নিয়ম। কিন্তু দুধ এখন পাচ্ছি কোথায়? হরলিকস দিয়ে খেলেও হত। কিন্তু গোয়ালিনী মার্কা জমাট দুধের কৌটোও খালি, হর্লিকস নেই! তাই গরম জলে বানিয়ে দিলাম। তবে একটু চিনি মিশিয়ে দিলে হত হয়তো। নাও, হাঁ করো।' বলে এক চামচ চিনি আমার মুখ-গহ্বরে ঢেলে দিলেন তিনি।

'চিনি খেলে এনার্জি হয়। গ্লুকোজ খেলে আরও বেশি হয় অবশ্যি। গ্লুকোজ হচ্ছে চিনির সাব্‌স্ট্যান্স। এইবার ভিটামিন বড়ি খাওয়ানো যাক গোটাকতক। খাবার পরেই খেতেই হয়। খালি পেটে খাওয়া নিয়ম নয় তো।'

এরপর তিনি ছোটো শিশির ভিতর থেকে লাল লাল দুটি কী যেন বের করলেন—'এ হচ্ছে অ্যাডকসলিন। ভিটামিন এ আর ডি। এ খেলে চোখ ভালো থাকে। হাড়ের শক্তি বাড়ে। কবজি মোটা হয়। দাঁত শক্ত হয়। নাও, খেয়ে ফ্যালো টুক করে।'

চিনি খাবার পর আমার এনার্জি হয়েছিল সত্যিই। আপত্তি করে বললাম, 'আমার চোখ এমনিতেই বেশ ভালো। বেশ পড়তে পারি। দাঁতও খুব শক্ত আমার।'

'এখন আছে—এর পর তো বয়েস হলে নড়বড় করবে। কিন্তু তুমি যদি চিরদিন ভিটামিন এ আর ডি খেয়ে যাও তো বয়েস হলেও তোমার দাঁত কক্ষনো নড়বে না। এই দ্যাখো না, অষ্টাশী বছর বয়স, আমার দাঁত দ্যাখো।' বলে তিনি দাঁতের দুপাটিই বিকশিত করলেন।

তাঁর দন্তবিকাশ দেখেও আমার তেমন উৎসাহ হলো না। বললাম, 'প্রোটিন তো খেলাম, আবার কেন? ওতেই হবে।'

'তা কি হয়? প্রোটিনে তো খালি মাংসপেশী গজায়। পেশীর তন্তুরা গড়ে ওঠে। হাড় কি তাতে হবার? হাড় হয় ক্যালসিয়ামে। যে-জিনিস ঐ ডি-ভিটামিন উৎপন্ন করে থাকে। আর এ-ভিটামিনে হয় চোখ তাজা। দুধে আছে ঐ দুই ভিটামিন। এক পিপে দুধ খেলে যতটা এ-ডি পাওয়া যায়, এর দুটি ক্যাপসুলে তুমি তাই পাবে। এই নাও, দেরি কোরো না, গিলে ফ্যালো চট করে।' খাবারের সঙ্গে সঙ্গে খাবার নিয়ম বলে বড়ি দুটো এরকম জোর করে তিনি আমার মুখেয় মধ্যে গুঁজে দিলেন।

'এবার হজম করার পালা। এইসব হজম করার জন্য বি-ভিটামিনের দরকার। বি-কম্‌প্লেকস খাওয়াই তোমায় এবার…।'

হজম করার পালা শুনেই আমার পিলে চমকে গিয়েছিল, পালার জায়গায় আমি যেন ঠ্যালা শুনলাম। খাবার ঠ্যালার পরে এখন হজম করার ঠ্যালা। তাড়াতাড়ি বললাম—'ওষুধের কোন দরকার নেই আমার। এমনিতেই আমার বেশ হজম হয়।'

'বললেই হলো—এমনিতে কিছুই হয় না! দাঁড়াও, তোমায় হজম করাই। হজম করা কি সহজ ব্যাপার হে! এই যে বি-কমপ্লেক্সের বড়ি দেখছ—কমপ্লেক্স্ মানে একটা গ্রুপ, বি-ভিটামিনের সম্প্রদায়। এর ভেতর আছে একাধিক বি-ভিটামিন। বিভিন্ন কাজ এদের। বি-ওয়ান হচ্ছে বেরিবেরির ওষুধ, বাতও সারায়।'

বাধা দিয়ে বলি, 'আমার বেরিবেরি হয়নি। বাত কক্ষনো হয় না!'

'হয় না কিন্তু হতে কতক্ষণ। বাত হলেই তোমায় চিৎ করে ফেলবে, বিছানা থেকে উঠতে দেবে না। তারপর আর কোন বাত-চিৎ নেই, কাজেই তার আগেই…প্রিভেন্‌টস ইজ বেটার দ্যান কিওর…বলে থাকে শোনোনি? তারপর, বি-টু-থ্রি-ফোর - এদেরও নানান গুনগুণ আছে তার বিশদ ব্যাখ্যানের দরকার নেই, তবে তোমাদের এখন ছাত্রজীবন—বি-সিক্স - মানে, পাইরোডক্সিন—এটা খাওয়া তোমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়! এতে মেমরি বাড়ায়। আর বি-টুয়েলভ হচ্ছে রক্তবর্ধক।'

রক্তের জন্যে আমার কোন লালসা ছিল না, তবে মেমরিতে আমি বড্ডোই কাঁচা—তাই একটু প্রলুব্ধ হয়ে হাত বাড়ালাম, 'দিন তাহলে, দুটো বড়ি দিন, খাই। মেমরিটা আমার চটপট বাড়াতে চাই।'

'বাঃ, এই তো বেশ! লক্ষ্মী ছেলের মতন কথা। দুটো কেন, চারটে খাও। এনতার আছে। পুরা এক শিশি দিয়ে দেব তোমাকে।'

বি-ভিটামিন খাইয়ে তিনি বললেন—'এবার সি-ভিটামিনটা খেলেই পুরো হয়ে যায়। এ-ডি আগেই খেয়েছ, বি-ও খেলে, এবার সি। ৫00 মিলিগ্রামের এক বড়ি রোজ একটা খেলেই যথেষ্ট।'

চার চারটে বড়ি খেয়ে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল—তারপর ৫00 মিলি-গ্রামির সি-য়ে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম আর তিনি বলে চললেন, 'আরো সব ভিটামিন রয়েছে, ই, কে, ইত্যাদি - সেসব খাবার তোমার দরকার নেই। প্রোটিন হলো, কার্বোহাইড্রেট হয়েছে। এবার কিছু ফ্যাট। তাহলেই হয়ে যায়। তোমার খাওয়াটা কমপ্লিট হয়।' ফ্যাট বলে না ফট্ করে দেরাজ থেকে তিনি একটা পেল্লায় বোতল বার করলেন—'এ হচ্ছে ফ্যাটের সেরা ফ্যাট খাঁটি কডলিভার তেল।'

কডলিভার শুনেই না আমি চমকে উঠেছি। ভোজের পারাবার পার না হলে টাকার কথাটা পাড়া যাবে না! তাই হাবুডুবু খেয়েও কোনরকমে সাঁতরেছি, এবার কডলিভারের কথায় কাতরে উঠলাম।

তিনি বলছিলেন, 'এই কর্ডলিভারের তিন চামচ, আর তার সঙ্গে গ্রেন দুই কুইনিন—মিশিয়ে খেলেই, কর্ডলিভার প্লাস কুইনিন—যেমন খাদ্য তেমনি একটা বলকর টনিক।'

টনিক-এর নাম শুনেই আমি টনকো হয়ে উঠলাম। গা বমি বমি করতে লাগল আমার। পাছে ভোলানাথের দাদুর গায়েই বমি করে বসি—তাই সেই বমবিং-এর আগেই তিন লাফে সিঁড়ি টপকে ফুটপাথে নেমেই আমার ওয়াক!

সেই ওয়াক-এর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় প্রোটিন ভিটামিন ইত্যাদি এমন কি যে কর্ডলিভার খাইনি তারও খানিকটা বেরিয়ে গেল।

তারপর সেখান থেকে আমার ওয়াকিং শুরু। উঠলাম এসে সোজা ভোলানাথের আস্তানায়।

'এই তোর দাদু! এমনি সে খাওয়ায়? খাইয়ে খুশি হয় আবার। খুশি হয়ে টাকা দেয়! তোর দাদুর নিকুচি করেছে।'

আমি তাকে মারতে বাকি রাখি কেবল।

আগাগোড়া সব সে কান দিয়ে শোনে, তারপর, মাথা নাড়েঃ 'রাখহরি কি মিছে বলেছে! মিথ্যে কথা বলার ছেলেই নয় সে। পাক্কা বিজনেস ম্যান। সব কটা খাবার যে মুখ বুজে খেয়েছিল, প্রত্যেকটা আইটেম চেয়ে চেয়ে নিয়েছে আবার! চেখে চেখে তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছে। কর্ডলিভার প্রায় দশ চামচ গিলেছিল—বিশ গ্রেন কুইনিন তারপর। চামচটা অব্দি চেটেপুটে খেয়েছে। তবে না খুশি হয়েছে আমার দাদু! তখন না দিয়েছে টাকা। বলেছে যে আবার এসে খাবে—যত খুশি—যত তোমার প্রাণ চায়। ফের ফের টাকা দেব তোমায়। আর তুই খেলিই না তো কী হবে! ভোজন করলে তারপরে তো দক্ষিণার কথা—তখন তো ভোজন-দক্ষিণা!' গজগজ করে ভোলানাথ গঞ্জনা দেয় আমাকে।
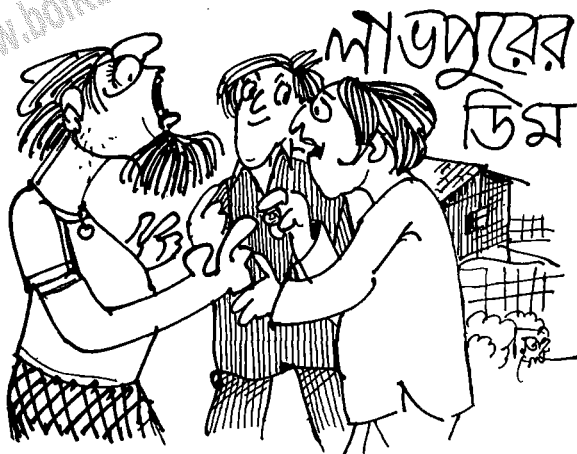
'বলেন কি মশাই! ডবল ডিমের মামলেটের দাম আট আনা?' অমল হাঁ করে রেস্তরাঁওলার তাকালো। ওর চোখ দুটো এমনিতেই বড়ো বড়ো। প্রায় ডিমের মতনই। এখন তা মামলেটের ন্যায় বিস্ফারিত হলো।

'মামলেট নয়, অমলেট।' আমি অমলের ভুলটা শুধরে দি।

'থাম তুই। একটা সিংগল্ মামলেটের দাম চার আনা? ডবল মামলেটের দাম আটানা? এক জোড়ার দাম এক টাকা? তিনজনের তিনটে ডবল মামলেট তাহলে— তিন তিরিক্ষে?' অমল তিরিক্ষে হয়ে ওঠে: 'না, তিন তিরিক্ষে তো নয়, তিন আটানায় মোটমাট দাঁড়ালো দেড় টাকা—অ্যাঁ, এরা বলে কী রে!'

'ডিমের চালান আসে পদ্মার পার থেকে জানেন? এখন চালানি কম, তাই দাম চড়া'—রেস্তরাঁর মালিক অমলের ওপরেও গলা চড়ায়—'আমরা তার কী করবো বলুন! গবর্মেণ্টকে বলতে পারেন।'

'গবর্মেণ্টকে বলে কি হবে, গবর্মেণ্ট তো আর ডিম পাড়ে না।' আমি বলি: 'কিংবা হয়তো ডিমই পাড়ে, কিন্তু সে-ডিমে অমলেট কি মামলেট কিছুই হয় না।'

হানিফ চুপ করে ছিলো এতক্ষণ, সে বললে, 'আমাদের দেশে চার পয়সায় পাঁচটা ডিম। মুর্গির ডিম আবার! কখনো কখনো ফাউ দেয় তার ওপর।'

আমাদের সঙ্গে এক কলেজে পড়ে হানিফ, কিন্তু নলেজে বুঝি আমাদের ডিঙোতে চায়। চায়ের টেবিলে তার দেশের ডিম এনে পাড়ে।

'চায়ের আড্ডা গুলজার করতে চাস তো কর,' না বলে আমি পারি না—'কিন্তু তাই বলে এত গুল ঝাড়চিস কেন ?

'গুল নয়, সত্যি ! যদি কখনো যাস আমাদের গাঁয়ে তো দেখবি। দেখতে পাবি তখন।' হানিফ তার গাঁর গর্বে মশগুল ঃ 'চার চার পয়সা - পাঁচ পাঁচ ডিম। যতো চার ফেলবি ততো পাঁচ পাবি। পাঁচ আঙুলের মত দেখবি, নিজের হাতেই।'

চার ফেললে মাছও নাকি এসে থাকে—হাতের পাঁচের মতই। কিন্তু তা ঐ কানেই শোনা যায়, চোখে দেখতে গেলে ছিপ হাতে নাচার হয়ে ফিরতে হয়। হানিফের ডিম তেমনি ঐ মুখেরই ডিণ্ডিম, সুমুখে পাওয়ার নয়, নিজের মুখে তো নয়ই।

আমার কথা শুনে হানিফ বাজি ধরে বসলো—'বেশ তো, এবারের ভ্যাকেশনে বেড়াতে যাস আমাদের দেশে। নেমন্তন্ন রইলো তোদের। যদি চার পয়সায় পাঁচটা ডিম না দিতে পারি তো বলিস তখন, তাহলে নিজের নামই আমি পালটে দেবো।'

এত বড়ো কথায় বদ্ধমূল অবিশ্বাসও নড়ে যায়। জিভের জল সরে যায়। মনে মনে হিসেব করে বলি—'চার পয়সায় পাঁচটা বলছিস ? তাহলে একটা ডিমের হাফবয়েল, একটা ডিম থ্রি-কোয়ার্টার, একটার সেদ্ধ, একখানার পোচ, একটা ডিমের অমলেট, আর একটা ডিমের কালিয়া খাওয়া যায়।'

'কালিয়া পাচ্ছিস কোথ থেকে ? অমল বাধা দেয়—'ছটা ডিম তো নয়, পাঁচটা যে ?

'তাহলে কালিয়া থাক। তোর গাঁ কোথায় বল এখন।'

'লাভপুর। লাভপুরের নাম শুনেছিস ? তার খুব কাছেই।'

'নাম শুনে মনে হচ্ছে—লাভের জায়গা হলেও হতে পারে। এখান থেকে কদ্দুর ?'

'বীরভূমে। কলকাতার থেকে বেশি দূর নয়। লাভপুরের গা-ঘেঁষা আমাদের গাঁ !' জানায় হানিফ।

কিন্ত জানালেই বা কি, চার টাকার রেল ভাড়া দিয়ে, চার পয়সায় পাঁচটা ডিম খেতে যাওয়া মোটেই লাভজনক না। তাই লাভপুরের love-এ পড়লেও, সেখানে যাওয়ার লোভ ডিমের কালিয়ার মতই আমায় দমন করতে হলো।

কিন্তু কপালে যদি ডিম থাকে, ঠেকায় কে ? একটা সুযোগ জুটে গেল হঠাৎ। গ্রীষ্মের ছুটিতে বড় মামার বিয়ে ঠিক হলো লাভপুরে, আর তার বরযাত্রী হয়ে যেতে হলো আমায়।

হানিফকে চিঠি দিয়ে খবর দিলাম, যে অমল না গেলেও আমি যাচ্ছি লাভপুরে। ডিমের কথাটা তার মনে আছে তো ? হানিফের জবাব এলো—'আলবাৎ।'

হানিফ এক কথার মানুষ !

ইস্টিশানেই হানিফ হাজির।—'চল তোকে ডিম খাওয়াইগে।' তখন-তখনি সে তৈরি।

'দাঁড়া। এখন কী? এখন তো বরযাত্রী। বিয়ের নেমন্তন্ন খাবো। সব বরযাত্রীর সঙ্গে এসেছি তাদের ছেড়ে কি যাওয়া যায়, বল? কাল সকালের গাড়িতে এরা সবাই ফিরে যাবে, তখন এদের সাথে না গিয়ে তোর সঙ্গে বেরুবো! তোদের গাঁয়ের ডিম খেয়ে তারপরে বিকেলের গাড়িতে ফিরবো আমি। পাঁচ পাঁচটা ডিম, বাবা, কক্ষনো একসঙ্গে খাইনি। না খেয়ে নড়ছিনে কিছুতেই। অনেক চারপয়সা নিয়ে বেরিয়েছি, তুই নিশ্চিন্ত থাক।'

আশা ছিলো যে ডিম যখন এতই সস্তা এখানে, তখন বিয়ের ভোজেও আজ রাত্রে কিছু তার খোঁজখবর মিলতে পারে। হয়ত বা কালিয়া-রূপেই নিজের পাতে দর্শন পাবো তার। কিন্তু হায়, লুচি পোলাও পড়লো, মাছও পড়লো এনতার, কিন্তু ডিমের কালিয়া দূরে থাক—একটা বড়ার পাত্তাও পাওয়া গেল না।

তখন মনে হলো, মুর্গির ডিম বলেই বুঝি। ও জিনিস, মুর্গির মতই, পঙ্‌ক্তি ভোজে অপাংক্তেয়। ব্রাহ্মণভোজনের আসরে অচল। রেস্তরাঁয় গিয়ে খুব কষে খেতে পারো, কিন্তু পুজো-বাড়ি কি বিয়ে-বাড়ির খাওয়ায়— নৈব নৈব চ।

'চ হানিফ, তোদের গাঁয় যাই।' সকালের খাওয়া শেষ করে, সকলের সঙ্গে স্টেশনের পথ না ধরে হানিফের সঙ্গ নিলাম।

হানিফ আমাকে নিয়ে গেল এক চাষীর বাড়িতে।

'বলি', ও চাচা, বাড়ি আছো? মুর্গির ডিম আছে বাড়িতে? আছে তো? দাম কতো করে বলো তো বাপু!'

'আপনি কি আর জানেন না দাদা? চার পয়সায় পাঁচটা।'

'শুনলি? শুনলি তো?—কী শুনলি?'

চাচা ঘাড় নাড়তেই, আর দেরি না করে চোঁচা চারটে পয়সা আমি তার হাতে গুঁজে দিয়েছি, আনিটা ট্যাঁকে নিয়ে চাচা বাড়ির ভেতরে গেল। অনেকক্ষণ পরে একটা ডিম হাতে করে বেরুলো।

'একি, এই একটা?—মোটে একটা ডিম?' আমি চেঁচাই, একবার চাচা, একবার হানিফের দিকে তাকাই।

'মুর্গিরা যা পেড়েছিলো বাবু, ছেলেগুলো মেরে দিয়েছে বেবাক। একটাই পড়ে আছে দেখছি। ছোঁড়াগুলো হয়েছে ডিম খাবার রাককোস।'

'কি করে খেল? ভেজে, বড়া করে, কড়া করে কালিয়া বানিয়ে?' আমি জানতে চাই। ঘ্রাণে যদি অর্ধভোজন হয়, শ্রবণেও তো যৎকিঞ্চিৎ!

'কাঁচাই সাবড়ে দেয় বাবু! রাঁধবার কি ওদের ফুরসৎ আছে, না, সবুর সয়?'

'কাঁচা ডিম খাওয়া তো ভালোই। বেশি পুষ্টিকর।' হানিফ জানায়ঃ 'ওতে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ থাকে।'

'থাকুক। কিন্তু ওর বড়া করে বড়িয়া করে বানালেই তখন তা প্রাণের খাদ্য হয়।' আমি বলি। 'কাঁচা খাওয়ার মত কাঁচা কাজে আমি নারাজ।'

'এটা আপনারা ধরুন। বাকি চারটা এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে যোগাড় করে দিচ্ছি আপনাদের।'

ডিম এবং চাচার পিছু পিছু চললাম। চার বাড়ি ঘুরে আরেকটা মিললো। আর এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতেই গোটা গাঁ-টা চষা হয়ে গেল আমাদের। গাঁয়ের মধ্যেই পায়ে পায়ে মাইল চারেক ঘোরা হলো, কিন্তু চারটে ডিম পাওয়া গেল না তখনো। দেড়ঘণ্টা এলো হাতে।

আমি বললাম—'এই ঢের। এই তিনটে খেয়েই ফেরা যাক এখন। বিকেল গড়িয়ে আসাছে, বেশি দেরি করলে—ডিম ধরতে গিয়ে ট্রেন ধরতে পারব না।'

হানিফ বাধা দিলো—'তা কি হয় রে? চাচা ছাড়বে কেন? চারটা পয়সা নিয়েছে, পাঁচটা ডিম না দিয়ে সে ছাড়বে না। নিতেই হবে। ভারী নাছোড়বান্দ এরা। নইলে এখন পয়সা ফেরত দেবে কি হিসেবে শুনি?'

'চারপয়সায় পাঁচটা ডিম হলে তিনটে ডিমের দাম কতো হয়?' বলে আমি খতিয়ে দেখি—'দু'পয়সায় আড়াইটে ডিম। এক পয়সায় সোয়া এক। কি মুশকিল—এ যে দেখছি, তিনটে ডিমের কোনো দামই হয় না।' আমি অমূল্য ডিম তিনটির দিকে তাকিয়ে থাকি।

'সোয়া কি আধখানা ডিম তুই নিবি কি করে শুনি?' হানিফ শুধোয়। 'ডিমের কি ভাগাভাগি হয় নাকি? মানে কাঁচা অবস্থায় হয় কি?'

সত্যিই! কাঁচা ডিমকে যেমন বসানো যায় না, তেমনি শোয়ানোও দায় সোয়া ভাগ কি আধা-আধিতে আনা সম্ভব। তাহলে কি হবে?

'নিতেই হবে তোকে। পাঁচটাই নিতে হবে। না নিলেও ছাড়বে না! এরা পাড়াগাঁর লোক, চাষাভূষা হতে পারে, কিন্তু ভারী অনেস্ট। ভীষণ একগুঁয়ে। এক কথার মানুষ এরা।'

চাচা অবশেষে আমাদের এক খামারের পাশে নিয়ে গেল। গিয়ে সেখানে একটা মুর্গি দেখলো—'এইখানে একটু বসুন বাবুরা! এক্ষুনি আপনাদের বাকি দুটো ডিম পেয়ে যাবেন। আমি ততক্ষণ জমিদারের কাছারিটা ঘুরে আসি। খাজনা দিবার তারিখ ছিলো কিনা আজ।'

'লোকটা তো মুর্গি দেখিয়ে চলে গেল।' আমি বললাম—'কিন্তু মুর্গির আবার দেখবার কী আছে? মুর্গি কি আমরা দেখিনি কখনো?'

'কেমন করে বসে আছে দ্যাখ না।'

'বেশ আয়েস করে।' সেটা আমি অনায়াসেই দেখতে পাই।

'না না; আয়েশ নয় রে, এমনি করে ওরা বসে থাকে কখন?'

'হাতে যখন কোনো কাজ থাকে না।'

'চোখে-মুখে অমন প্রত্যাশা নিয়ে ঐভাবে ওরা বসে থাকে কখন জানিস? ওদের ডিম পাড়বার সময়ে। এই পাড়লো বলে দ্যাখ না।'

আমরাও বসে থাকলাম—ওর মতই, চোখে মুখে ডিমের প্রত্যাশা নিয়ে। খানিকক্ষণ পরে মুর্গিটা ঘাড় উঁচু করে একটা হাঁক ছাড়লো কোকর কোঁ—ঠিক যেন দিগ্বিজয়ীর মতই। আমরা লাফিয়ে উঠলাম। মুর্গিটা একটু নড়েচড়ে বসলো। তারপর সরে ঘাড় বেঁকিয়ে গজেন্দ্রগমনে চলে গেল অন্যদিকে। আমরা ছুটে গিয়ে দেখি, তার বসার জায়গায় ডিম নয়, ছেঁড়া একটা পালক পড়ে আছে কেবল।

'ডিম কইরে হানিফ? এত কাণ্ড করে—এতক্ষণ পরে—চোখমুখে এত প্রত্যাশা নিয়ে এতক্ষণ ধরে বসে থেকে—?'

'আমাদের দেখে মুর্গিটা লজ্জা পেয়েছে মনে হচ্ছে। অন্য লোকের চোখের সামনে ডিম পাড়তে হতেই পারে লজ্জা।'

'তাহলে?'

'দাঁড়া, এক কাজ করা যাক। ডিম তিনটে দে তো। হয়তো ডিম পাড়ার কথা ও ভুলেই গেছে—এমনও হতে পারে। ওকে দেখানো যাক ডিমগুলো—তাহলে ওর মনে পড়ে যাবে।'

হানিফ ডিম তিনটি নিয়ে মুর্গির সামনে রেখে দিল—ওকে প্রেরণা দেবার জন্যই। ডিমগুলো দেখে মুর্গিটা এগিয়ে এসে তাদের ওপর চেপে বসলো।

'এইবার! এইবার পাড়বে, দাঁড়িয়ে দ্যাখ।' মুর্গিটার ব্যবহারে হানিফ ভারী খুশি হয়।

আমিও উৎসাহ বোধ করি। জলে যেমন জল বাধে, তেমনি এক ডিমের সহিত অন্য ডিমের—অন্যান্য ডিমের—অদৃশ্যসূত্রে কোনো বাধ্য-বাধকতা থাকতেও পারে।

কিন্তু মুর্গিটা তেমনি বসেই থাকে ঠায়। সেখান থেকে নড়তেই চায় না। ডিমগুলোও ছাড়ে না।

এদিকে ট্রেন আমার ছাড়ে ছাড়ে। হাতঘড়ি দেখেই বুঝতে পারি, আর বেশি দেরি নেই।

'হানিফ, মুর্গিটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সরিয়ে কোনোরকমে ওই তিনটেই তুই নিয়ে আয় তো। কাঁচাই মেরে দেখা যাক। যথালাভ!'

কিন্তু মুর্গিটাও দেখা গেল নাছোড়বান্দা—ঠিক আমাদের চাচার মতই! হানিফের হানাদারী সে গ্রাহ্যই করে না।

হানিফ ওকে যতই ওঠাবার চেষ্টা করে, ও ততই অটল হয়ে বসে থাকে। আমলই দেয় না হানিফের হামলাকে।

'মনে হচ্ছে তা দিতে লেগেছে।' হানিফ বলেঃ 'ডিমগুলো ওকে দেয়া

ভারী ভুল হয়েছে। ওর ধারণা হয়ে গেছে যে আজকের ডিম ও পেড়েছে। তাই নিজের ডিম মনে করে - লোকে যেমন নিজের গোঁফে তা দেয় -- তাই ভাই, এখন তো আর ওকে ওখান থেকে নড়ানো যাবে না।'

'ডিমের চেয়ে চিকেন ঢের ভালো তা জানি। আরো যে উপাদেয় তা আমার জানা আছে।' বলি আমি হানিফকে : 'কিন্তু আমি তো ভাই, ডিমের বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত সবুর করতে পারব না। আমাকে যে ফিরতেই হবে আজকের গাড়িতে '

'তাহলে তুই কি করতে চাস বল ? কি করতে বলিস আমায় ?'

যা বলি তা মনেই বলি। বলি যে হানিফ, লাভপুরের ডিম সস্তা যে বলেছিলে সে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে যে মস্ত বড়ো একটা IF আছে তাও যদি বলতে, তাহলে তোমার কোনো হানি হত কি ? কিন্তু আমার মুখে ফোটে অন্য কথা—হানিফকে বলি : 'এক কাজ কর। তুই ওর সামনে বসে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ কর। যেন তুই আরেকটা মুর্গি, ডিম পাড়ছিস কি ডিমে তা দিতে লেগেছিস। আর আমি এদিকে ওর পেছন থেকে গিয়ে আস্তে আস্তে ডিমগুলো সরিয়ে আনি। তলায় তলায় কাজ সারি। কেমন ?'

হানিফ ঠিক তাই করে। যাতে মুর্গিটার মনে কোনোরূপ অযথা সন্দেহ না জাগে তার জন্যে সে কয়েকবার 'কোকর কোঁ' ডাক-ছাড়তেও কসুর করে না।

আর আমি এদিকে যেই না মুর্গিটার পায়ের তলায় হাত বাড়িয়েছি—পায়ের ধুলো পাইনি তখনো তার ল্যাজে হাত ঠেকেছে-কি-ঠেকেনি, মুর্গিটা হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে—

ইস ! এমন এক খাবলা দিলো আমার হাতে ! এক খাবলাতেই ছটাক-মাংস তুলে নিলো আমার।

আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। আর, সেই এক লাফেই আহত হাত নিয়ে আর্তনাদ করতে করতে লাভপুরের স্টেশনে এসে হাজির।

উঠলাম কলকাতার গাড়িতে। লাভপুর থেকে আমার লাভ পুরো করেই।

এক দুর্যোগের রাতে
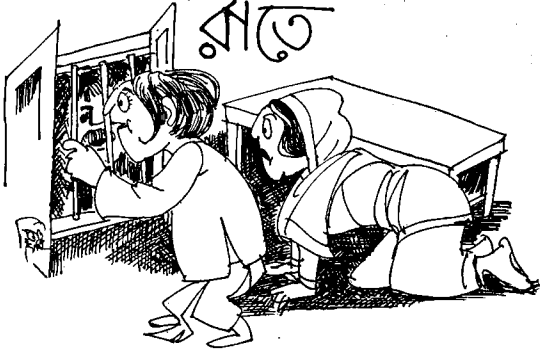
বিদ্যুৎ চমকানোতে ভারী ভয় পায়ে মেয়েরা। বিশেষ করে পিসীজাতীয় মেয়েরা। যদি পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতায়, কিংবা ইস্কুলের টেক্সট্ বুক পড়েও এ কথাটা আমার জানা থাকত তাহলে গরমের ছুটিতে মুকুন্দপুরে কখনই আমি মরতে যেতাম না। অজ পাড়া-গাঁ মুকুন্দপুর—সাধারণত পিসীদেরই সেখানে বসবাস।

বাবা বললেন—'যা, অনেক দিন ধরে লেখালেখি করছে তরু। তোকে কবে সেই ছোটবেলায় দেখেছে, দেখতে চায় একবার। তারই কোলে পিঠে তুই মানুষ তো! তাছাড়া, তারিণীও খুশি হবে খুব। গরমের ছুটিটা সেইখানেই কাটিয়ে আয় না কেন? গান্ধীজীও বলছেন—ব্যাক টু ভিলেজ, তার মানে কি? না, গ্রামাঞ্চলে ফিরে যাও আবার।'

বাবা দারুণ ভক্ত গান্ধীজীর। আমি প্রতিবাদ করতে চাই·· 'উহুঁ। তা কি করে হয় বাবা? ব্যাক টু ভিলেজ মানে হবে গ্রামের দিকে পিঠ ফেরাও। অর্থাৎ কিনা গ্রামের প্রতি বিমুখ হয়ে শহরেই তোমরা পড়ে থাক।'

'তাই নাকি?' বাবা মাথা চুলকোতে থাকেন—'তাহলে ও দুইই হয়! গ্রামেও থাক, শহরেও থাক।'

মা ঘাড় নাড়েন—'তা কি করে হয়? ব্যাক টু ভিলেজ মানে হল তোমার পিঠ দাও গ্রামকে অর্থাৎ কিনা গ্রামকেই তোমার পীঠস্থান কর! তার মানে, গ্রামেই পিঠ দিয়ে পড়ে থাক চিৎ হয়ে।'

মা-র বাক্যে বাবার উৎসাহ হয়—'তবে তো গান্ধীজীর ব্যাখ্যাই ঠিক তা

হলে ! হুম্ !' আমার বাবা নিদারুণ ভক্ত গান্ধীজীর ! 'গান্ধীর কথা তবে শুনতেই হবে তোকে। তা ছাড়া, এখন আমের সময়, পাড়াগাঁয় আম প্রচুর। কিনে খেতে হয় না, আমবাগানে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালেই টুপটাপ পড়বে। হাতেই এসে পড়বে তোর। মাথাতেও পড়তে পারে। সেই যে রবি ঠাকুরের কবিতায় আছে—'সেই মনে পড়ে জৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম'—'

হাত ঝেড়ে মাথা নেড়ে শুরু করেছিলেন বাবা। কিন্তু ধুমেই এসে ধুম করে তাঁকে থামতে হয়। তার পর আর মনে পড়ে না কিছুতেই। না বাবার, না আমার। আর মা ? কবিতার ধার দিবেই ঘেঁষেন না মা। ও-জিনিস তাঁর দু-কর্ণের বিষ।

যাক, অবশেষে রাজিই হলাম। গান্ধীজীর কথায় নয়, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসে।

আমের আশায় আমার মুকুন্দপুর আসা। এসেই দেখলাম পিসীরা খুব ভ্রাতুষ্পুত্র-বৎসল হয়, বিশেষ করে পিসতুতো ভাই-বোন যদি না গজিয়ে থাকে। আমার আদর-যত্নের আর অবধি থাকল না। মার কাছেও কখনো এত ভালো-বাসা পাই নি। মনে মনেই আমি এর একটা ব্যাকরণ-সংগত সূত্র রচনা করে নিই। মা ? মা হচ্ছেন শুধুই মা, সীমার মধ্যে তিনি। কিন্তু পিসীমা ? তাঁর পরিসীমা কোথায় ?

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। বিদ্যুতের সঙ্গে মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়ত আছে, কিংবা কিছু বৈদ্যুতিক অংশও তাঁদের মধ্যে থেকে পাওয়া অসম্ভব নয়—তা না হলে বিদ্যুৎচমক শুরু হলে মেয়েরাও কেন চমকাতে থাকে ? আমার মাকেও চমকাতে দেখেছি। বিনিকেও দেখেছি। কিন্তু পিসীমার মত কাউকে নয়। একটা নেংটি ইঁদুরের সামনেও তিনি অকুতোভয়ে অটল থাকবেন হয় তো,—কিন্তু বিদ্যুৎ চমকালে ? পিসীমা তক্ষুনি খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছেন। একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে—পিস বাই পিস।

সেই দুর্যোগের রাতের কথাটা চিরদিন আমার মনে থাকবে। ভাবলে এখনো হৃৎকম্প হয়। 'ক্যালামিটি' কখনো একা আসে না, খুব খাঁটিই এ কথা। সে রাত্রে তারিণীবাবুও বাড়ি নেই (সম্পর্কে তিনিই আমার পিসেমশাই), পাশের গ্রামে গেছেন ; জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন, তারই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রাত্রে ফিরবেন কিনা কে জানে !

বাড়িতে কেবল পিসীমা আর আমি। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা চুকোতে বেশি দেরি হলো না। রাত দশটার মধ্যেই সব খতম। দরজা, জানালা, ছিটকিনি সমস্ত ভালো করে বন্ধ করবার পিসীমার হুকুম হয়ে গেল। আপত্তির সুরে আমি বলি—'দরজায় তো খিল এঁটেছি, কিন্তু যা গরম পিসীমা ! জানালা-গুলো বন্ধ করলে তো মারা পড়তে হবে।'

'গরমে লোকে মারা যায় না', পিসীমা বলেন, 'চোরের হাতেই মারা যায়, ডাকাতের হাতেই মারা পড়ে। জানালা খোলা রাখলে চোর-ডাকাত লাফিয়ে আসতে পারে তা জানিস? তার ওপরে উনি আবার বাড়ি নেই—সামলাবে কে শুনি?'

যেন উনি বাড়ি থাকলেই সামলাতে পারতেন! পিসে হতে পারেন কিন্তু চোর-ডাকাতে ধরে পিষে ফেলবেন এতখানি ক্ষমতা ওঁর নেই! আমার মন্তব্য কিন্তু মনে মনেই আমি উচ্চারণ করি! ততক্ষণে পিসীমা কোনো জানালার একটা খড়খড়িরও ফাঁক রাখেন না।

অন্ধকার ঘরে দারুণ গুমোটের মধ্যে ছটফট করতে করতে কখন একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল, এমন সময়ে—

ক্বড়্—ক্বড়্—ক্বড়্—ক্বড়াৎ···

আচমকা জেগে উঠি হঠাৎ। তক্ষুণি ঘরের অন্য কোণ থেকে পিসীমার আর্তনাদ শোনা যায়। 'মণ্টু! ও মণ্টু!'

'পিসীমা! কি হলো পিসীমা?'

'চৌকির তলায় সেঁধিয়ে যা। চটপট···দেরি করিস নে।'

আমি উঠে বসি। চৌকির তলায় সেঁধুব কেন? চোর-টোর লাফিয়ে এল নাকি? কিন্তু দোরজানালা তো বন্ধ, ঘর তেমনি ঘুটঘুট্টি—আসবেই বা কি করে? খড়খড়ি ফাঁক করে তার ভেতর দিয়ে কি গলে আসতে পারে চোর? অন্ধকারের মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকি।

'ঢুকেছিস?'

'না তো।'

'ঢুকিস নি এখনো? সর্বনাশ করলি তুই। ঢুকে পড় চট করে।'

'কেন, কি হয়েছে পিসীমা?'

'শোনো কথা! এখনো বলে কী হয়েছে! আকাশে বিদ্যুৎ হানছে যে! বাজ পড়ল শুনলি না?—' পিসীমা ক্ষেপে ওঠেন—'এখন কি তর্ক করার সময়? বলছি না ঢুকে পড়তে—'

পিসীমার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। ক্বড়—ক্বড়- ক্বড়—ক্বড়াৎ—দুম—দুম! সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক জানালার ফাঁকে ফাঁকে ঝলসে ওঠে।

'মরল ছেলেটা! আমাকেও বেঘোরে মারল!' তরঙ্গিনী পিসী তরঙ্গিত হতে থাকেন। চাপা কান্নার শব্দ আসে কানে।

কি করি? হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধোতে হয় চৌকির তলায়। 'ঢুকেছি পিসীমা।' - করুণ স্বরে জানাই।

'ঢুকেছিস! আঃ! বাঁচালি! ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের সময় কি বিছানায় থাকতে আছে? শুয়ে পড়িস নি তো চৌকির তলায়?'

'নাঃ। হামাগুড়ি দিয়ে আছি।'

'হামাগুড়ি দিয়ে? কী সর্বনাশ! বিদ্যুৎ চমকানোর সময়ে কি কেউ হামাগুড়ি দেয়? হাত-পা গুটিয়ে আসন-পিঁড়ি করে সোজা হয়ে বোস।'

উদ্যমের সূত্রপাতেই কিন্তু সংঘর্ষ বাধে। 'কি করে বসব বলতো? চৌকি লাগছে যে মাথায়।'

'ভারী বিপদ করলে! এই সময়ে আবার চৌকি লাগছে মাথায়!' পিসীমা চেঁচাতে থাকেন, 'এই কি মাথায় চৌকি লাগবার সময়? চৌকি মাথায় করে সোজা হয়ে বস।'

'উহুঁ। মাথায় করা যায় না, বেজায় ভারী যে!' পিসীমাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি, 'পিসেমশাই আর আমি দু'জনে হলে হয়ত পারা যেত।'

সত্যি, আমার একার পক্ষে অত বড় চৌকি মাথায় করা অসম্ভব—দস্তুর মতই অসম্ভব। আর, কেবল মাথায় করা নয়, মাথায় করে বসে থাকা তার ওপর।

'কি করছিস, মণ্টু—?' পিসীমা হাঁক পাড়েন।

'চৌকির তলাতেই আছি! হাত-পা গুটিয়েই বসেছি। তবে সোজা হয়ে নয়, ঘাড় হেঁট করে।

'ঘাড় হেঁট করে? তবেই মারা গেলি! এ সময়ে মাথা সোজা করে রাখার নিয়ম যে! চৌকির তলাতেই থাকতে হবে, কিন্তু মাথা উঁচু করে থাকা চাই। তোকে নিয়ে কি করি বল তো? একে এই দুর্যোগ—চৌকি কাঁধে করার জন্যে এখন তোর পিসেমশাইকে আমি পাই কোথায়?—'

অকস্মাৎ বিদ্যুতের চমকে পিসীমার বাক্য বাধা পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ কড়াক্কড় আওয়াজ আর পিসীমার যারপরনাই আর্তনাদ।

'হায় মা কালী! হায় মা দুর্গা! কি বিপদই না ডেকে আনছে ছোঁড়াটা, কি করি এখন, হায় মা—'

আমিও মনে মনে বলি, 'হায় মা!' দাঁতে ঠোঁট কামড়াই। কি করি এখন? ওদিকে পিসীমার চিৎকার, এদিকে দশমণি চৌকি! ঐতিহাসিক ব্যক্তি নই যে অসাধ্য সাধন করতে পারব। গন্ধমাদন মাথায় করার মতন অসম্ভব কাজ কেবল ওরাই পারে। আমার কান্না আসে!

আবার বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রপাতের শব্দ।

'দেখলি, দেখলি তো? তোর ঘাড় হেঁট করে থাকায় কী সর্বনাশটা হচ্ছে! নিজেও মরবি—আমাকেও মারবি তুই—' পুনরায় পিসীমার ফোঁস-ফোঁসানি শুরু হয়ে যায়। আমি চুপ করে থাকি।

'উঠোনে ঘটিবাটি পড়ে নেই তো রে? তাহলেই অক্কা পেয়েছি। পেতল-কাঁসার বাসনে ভারী বিদ্যুৎ টানে—'

'গিয়ে দেখে আসব পিসীমা?'

এই তটস্থ দুরবস্থা থেকে যে-কোনও পথে পরিত্রাণের সুযোগ পেতে চাই!

পিসীমা কিন্তু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'বাইরে যাবি তুই? এই বিপদের মুখে?

কি আক্কেল তোর বল দেখি তো ? তোর চেয়ে ঘটিবাটির দামটাই বেশি হলো আমার ?' একটু থেমেই আবার তাঁর সেই প্রশ্নঘাত, 'ঘাড় সোজা করলি ? করেছিস ?'

চৌকির তলায় থাকা এবং মাথা উঁচু করে থাকা যখন একযোগে সম্ভব নয়, তখন অগত্যা ওর আওতা বর্জন করে বেরিয়ে আসি। এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, এবং মাথা উঁচু করি। উঃ, ঘাড়টা কি টনটনই না করছে ! দারুণ গরমে চৌকির তলায় প্রাণ একেবারে গলায় গলায় এসে গেছল।

'ঘাড় উঁচু করেই আছি এখন পিসীমা।'—অকপটেই বলি।

'আহা, বাঁচিয়েছিস।' পিসীমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে।—'লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, জাদু ছেলে। যা বলি শোন। আজকের ভয়ানক রাতটা কেটে যাক মা দুর্গা করুন, কাল সকালেই তোকে পিঠে করে খাওয়াব। এ কি, কি করছিস আবার ?—'

'দেশলাই জ্বালছি পিসীমা, লণ্ঠন ধরাব। যা অন্ধকার—'

'কি সর্বনাশ ! এই সময়ে কেউ আলো জ্বালে ?' পিসীমা শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন—'আলোয় যে রকম বিদ্যুৎ টেনে আনে এমন আর কিছুতে নয়। নিভিয়ে ফ্যাল এক্ষুণি। এই দণ্ডে। [কড়—কড়—কড়াৎ—বাম্ বাম্] দেখলি তো, কি করলি তুই !'

'আমি করলাম ? ও তো আপনি হচ্ছে। দেশলায়ে বিদ্যুৎ টেনে আনে কি না তা তুমিই জান, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারে না তো ?' আমি একটু বিরক্ত হয়েই বলি।

'এই কি বক্তৃতা করবার সময় ? তুই কি মরতে চাস ? আমাকেও মারতে চাস সেই সঙ্গে ?'

আমি চুপ করে থাকি। কি বলব ?

'সেই সপ্তবজ্র-নিবারণের মন্ত্রটা তোর মনে আছে ? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাক। বজ্রঘাত থেকে বাঁচতে হলে—ওঃ, কি বিচ্ছিরি রাত। কালকের সকাল দেখতে পাব কি না মা-কালীই জানেন ! কই, পড়ছিস না মন্তর '

জানিই না তো পড়ব কি ?'

'কি মুখ্যু ছেলেটা ! এও জানিস না ? ইস্কুলে কি ছাই শেখায় তোদের ? অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমন্ত বিভীষণ। কৃপাচার্য দ্রোণাচার্য সপ্তবজ্র নিবারণ ॥ ঘন ঘন আওড়া।'

আওড়াতে থাকি। কি আর করব ?

শ্লোকপাঠের মধ্যিখানে আর এক দুর্ঘটনা। পিসীমার পোষা বেড়ালটা কখন আমার পায়ের তলায় এসে হাজির হয়েছে। বেড়াল আমার ভারী আতঙ্ক। লাফিয়ে উঠি আমি। বেড়ালের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় বেড়ালের গায়েই পা চালিয়ে দিই।

'ম্যাও—' মণ্টু-চাপা পড়ে বেড়ালটাও ত্রাহি ত্রাহি করে। 'মিউ—মিয়াও!'

'ধুত্তোর!' অন্ধকারে যে ধারে পা বাড়াই সেখানেই বেড়াল। ও যেন একাই একশ। সর্বদা পায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। পদে এদে এ রকম বেড়ালের উৎপাতের চেয়ে বজ্রপাতও আমি সহনীয় জ্ঞান করি।

'মণ্টু!' পিসীমার শাসনের কণ্ঠ শোনা যায়, 'এই কি আমাদের সময়? আবার বেড়াল ডাকা হচ্ছে?'

'আমি ডাকি নি পিসীমা।'

'তবে কে ডাকতে গেল শুনি? তোমার পিসেমশাই? এমন মিথ্যেবাদী হয়েছ তুমি? ছি! লিখে দেব দাদাকে চিঠিতে যে, তোমার ছেলে যতই বড় হচ্ছে ততই—'

'সত্যি বলছি পিসীমা, আমি ডাকি নি। আমি কেন ডাকব? বেড়াল—'

আমার কথা শেষ হতে পায় না—'বল কে বেড়াল ডাকল তবে? কার এত শখ হয়েছে? ভূতে ডাকতে গেল নাকি?' পিসীমার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়।

'না। বেড়াল নিজেই।'

'অ্যাঁ?' আবার পিসীমার আর্তনাদ। তিনি যে বেশ বিচলিত হয়েছেন, অন্ধকারের মধ্যেই আমি তা টের পাই। 'বেড়াল! তবেই সেরেছে! আমাদের আর রক্ষে নেই আজ তাহলে! বেড়াল ভারী বিদ্যুৎবাহী! বেড়ালের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিদ্যুৎ—বইয়েতেই লিখে দিয়েছে। কি সর্বনাশ! হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে বাবা অশ্বত্থামা, হে বাবা বলি, ব্যাস—'

'বাবা নয়, বাবারা।'—আমি ওঁকে সংশোধন করে দিই—'বহুবচন বলছ যে পিসীমা!'

'এই সময়ে আবার ইয়ার্কি?' পিসীমা ধমক দেন, 'হে বাবা হনুমন্ত, হে বিভীষণ, হে বাবা জাম্বুবান! ছোঁড়াটাকে বাঁচাও। অবোধ ছেলের অপরাধ নিয়ো না বাবা! কড়- কড়—কড়াৎ—বমবম—বমাৎ! পিসীমা যান ক্ষেপে, 'এখনো বুঝি ধরে রয়েছিস বেড়ালটাকে? ছুঁড়ে ফেলে দে—ছুঁড়ে ফ্যাল—এই দণ্ডে।'

ছুঁড়ে ফেলা শক্তই হয়, কেননা বেড়ালটাকে ধারণ করি নি ত! কিন্তু পিসীমার আদেশ রাখতেই হবে—যে করেই হোক। অন্ধকারেই আন্দাজ করে বেড়ালের উদ্দেশে এক শুট ঝাড়ি। শুট লাগবি ত' লাগ লাগে গিয়ে এক এক তেপায়া টেবিলে; তাতে ছিল পিসেমশায়ের ঔষধপত্রের শিশি [যত রাজ্যের শৌখীন ব্যারাম সব পিসেমশায়ের একচেটে]—সেই এক ধাক্কাতেই টেবিল চিৎপাত আর শিশি-বোতল সব চুরমার!

পিসীমা গোঁ গোঁ করতে থাকেন; অজ্ঞান হয়ে গেলেন কিনা এই ঘুট-ঘুট্টির মধ্যে তো বোঝবার জো নেই! কিন্তু যখন জানেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হয়নি, নিতান্তই টেবিলপাত—তখন তাঁর গোঙানি থামে, সামলে ওঠেন আপনিই।

'যাক, ভগবান খুব বাঁচিয়েছেন এবার! ওটাকে ঝেড়ে ফেলেছিস তো? বেশ করেছিস! [অন্য সময় হলে তাঁর আদরের মেনির গায়ে কাউকে হাত ঠেকাতেও দেন না, কিন্তু এখন বিদ্যুতের সামনে, বেড়ালের ওপরেও পিসীমার আর চিত্তির নেই]। তুই এক কাজ কর মণ্টু, ঐ তেপায়াটার ওপর খাড়া হ। কাঠের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-চলাচল করে না তো। চেয়ার কিংবা টেবিলের ওপরে দাঁড়ানোই এখন সব চেয়ে নিরাপদ—বুঝলি? দাঁড়িয়েছিস?'

'উহুঁ -'

[ফ্যাশ ক্কড়-ক্কড়াৎ - ববম্ বম্—বম্ বম্ !]

'কী দস্যি ছেলে রে বাবা! দাঁড়াসনি এখনও? তুই কি আমাকে পাগল করে দিবি নাকি? হে মা দুর্গা—হে মা'—

'দাঁড়িয়েছি পিসীমা।'

[বিদ্যুতের ঝলক —দুমদাম দমাদ্দম · কড়—কড় কড়াৎ !]

'এমন দুর্যোগের রাত কাটলে হয়! দোহাই মা দুর্গা! তোর পিসেমশাই ফিরে এসে আমাদের জ্যান্ত দেখবে কিনা কে জানে! পরের ছেলেকে টেনে এনে কি-বিপদেই পড়লুম যে। দাদাকে আমি কৈফিয়ত দেব কি! '

আমি সন্তর্পণে আর সসংকোচে ক্ষীণকায়া তেপায়ার ওপর সসেমিরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি! নীরবে পিসীমার কাতরোক্তি শুনি।

'…মণ্টু, ভূমিকম্পের সময় কি করে রে? শাঁখ ঘণ্টা বাজায় না? ওতেই ভূমিকম্প থেমে যায়—নয় কি? ঝড়-বৃষ্টি কি ভূমিকম্পের চেয়ে কিছু কম মারাত্মক? আয়, আমরা শাঁখ ঘণ্টা বাজাই— তা' হলে ঝড়-বৃষ্টিও থামবে। বজ্রপাতও বন্ধ হবে। শাঁখ এই কুলুঙ্গিতেই আছে, আমি নিচ্ছি। ওধারের থেকে ঘণ্টাটা তুই পেড়ে আন। অন্ধকারে পারবি তো?'

অন্ধকারেই আমি ঘাড় নাড়ি।

'এনেছিস? বড্ড দেরী করিস তুই। বাঁচতে আর দিলি না আমাদের।'

তাকের এবং শাঁখের অন্বেষণে তিনটে চেয়ার ওল্টাই, গোটাকত গেলাস ফেলি, জলের কুঁজোকে নিপাত করি। তারপর মনে পড়ে শাঁখ আনার দায় আমার নয়, পিসীমার। আমার এক্তিয়ারে হচ্ছে ঘণ্টা। ঘণ্টাটাকে হাতিয়ে বলি, 'এনেছি পিসীমা।'

'বেশ, এবার ঐ তেপায়াটার ওপর দাঁড়া। খুব জোরে পেট—আকাশে যেন দেবতারা শুনতে পান। আমি শাঁখ বাজাচ্ছি।'

পিসীমা শাঁখ বাজান, আর আমি ঘন্টা পিটি। পিসীমা কষে বাজান, আমি প্রাণপণে পিটি। কানের সমস্ত পোকা বেরিয়ে আসে আমার।

হঠাৎ জানালাটা খুলে যায়, একটা ছায়ামূর্তি যেন ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। চোর নাকি? পিসীমা ভয়ে কাঠ হয়ে যান। আমিও ঘন্টাবাদ্য থামাই।

'ডাকাত পড়েছে নাকি ?'—ছায়ামূর্তি বলে, 'তোরা কি লাগিয়েছিস বলতো ? মণ্টে ? এ সব কি কাণ্ড রে তোদের ?'

'বিদ্যুৎ তাড়াচ্ছি পিসেমশাই ! কাতর কণ্ঠে জানাই ।

'বিদ্যুৎ ! আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, বিনা মেঘেই বিদ্যুৎ ? এমন খাসা চাঁদনী রাত—আর তোদের কাছে বজ্রপাত ? বাইরে চেয়ে দ্যাখ দেখি !'

তাই তো ! বাইরে তাকিয়ে দেখি পরিষ্কার ধবধবে জ্যোৎস্না । আমি ও পিসীমা দুজনেই দেখি । পিসীমা বলেন, 'তাহলে এতক্ষণ এই দুমদাম, বজ্রপাতের শব্দ বিদ্যুতের ঝলকানি—এসব কিছুই না ? '

'ও, ওই আওয়াজ ?' পিসেমশায়ের অট্টহাস্য আরম্ভ হয়—'জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন কিনা । যত রাজ্যের বাজির অর্ডার দিয়েছিলেন । কলকাতার থেকে রাত এগারোটার ট্রেনে পেঁছিল সেসব—বোমা, পটকা, তুবড়ি, উড়ন-তুবড়ি, হাউই—আরও কত কি । ভোজের পর এতক্ষণ তো বাজি পোড়ানোই হচ্ছিল —তারই ঝলক দেখেছ, তারই আওয়াজ শুনেছ তোমরা ।'

পিসেমশাইয়ের হাসি আর থামতে চায় না ।

আমি হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই না । ভোজও চেখে দেখলাম না, বাজিও চোখে দেখতে পেলাম না । মাঝখান থেকে ঘরের ভেতর যেন এক ভোজবাজি হয়ে গেল ।

কাঁধের ওপর একটা না থাকলে নেহাত খারাপ দেখায়, সেই কারণেই বিধাতার আমাকে ওটা দেওয়া! মাথা কেবল শোভার জন্যে, ব্যবহারের জন্যে নয়; যখনই কোনো ব্যাপারে ওকে খাটাতে গেছি, তখনই এর প্রমাণ আমি পেয়েছি। একবার মাথা খাটাতে গিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম, তার কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে আমার জীবনস্মৃতিতে লেখা থাববে।

ক্রমশঃ যতই দিন যাচ্ছে, আরো যত প্রমাণ পাচ্ছি, ততই আমার ওই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে। সেই কাণ্ডর পর থেকে আমার মাথাকে আমি অলংকারের মতই মনে করি। সর্বদা সঙ্গে রাখি (না রেখে উপায় কি!) কিন্তু কাজে আর ওকে লাগাই না।

গোবিন্দর জন্যেই যত কাণ্ড! গোবিন্দ আমার বন্ধু, তার উপকার করতে গিয়েই—! তারপর থেকে আমি বুঝতে পেরেছি কারো উপকার করতে যাওয়া কিছু না। একটা পোকারও উপরকার করবার মতো বুদ্ধি আমার ঘটে নেই।

গোবিন্দ কিছুকাল থেকে ক্রমেই আরো ম্রিয়মান হয়ে পড়ছিল। কারণ আন্দাজ করা কঠিন। রোজ বিকেলে বালিগঞ্জ লেকের ধারে বেড়াতে যায়, অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেখানে মশাদের সঙ্গে পায়চারী করে। রাত বারোটা বাজিয়ে বাড়ি ফিরে মশা কামড়ানো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বার্নল ঘষে। তারপর শুতে যায়।

এই রকমই প্রত্যহ। মশারাও যেন ওকে চিনতে পেরেছিল, আর সবাইকে ছেড়ে দিয়ে ওর জন্যেই যেন ওত পেতে থাকে। দাঁতের ধার শাণিত রাখার জন্যে

অনেক বনেদী বায়ুসেবীকে ওরা পরিত্যাগ করেছে, এমনই গোবিন্দর ওপর ওদের টান। গোবিন্দও দিন দিন আরো বেশী আহত হয়ে বাড়ি ফিরছে।

কিন্তু গোবিন্দর লেকে বেড়ানোর কামাই নেই। বিকেল হয়েছে কি, ওকে দড়ি দিয়েও বেঁধে রাখা যাবে না। হলো কি গোবিন্দর? কবি-টবি হয়ে গেল না কি হঠাৎ? কিংবা…?

একদিন আমিও ওর বেড়ানোর সঙ্গী হলাম। —'ব্যাপার কিহে গোবিন্দ?'

কিছুতেই কিছু বলে না; অনেক সাধাসাধির পরে, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিল। —'উনিই!'

'উনি তো বুঝলাম। কিন্তু কী হয়েছে ওঁর?' কৌতূহলী হয়ে আমি জিগেস করি।

অনেক কষ্টে গোবিন্দর কাছ থেকে যা আদায় করা যায় তার মর্ম হচ্ছে এই যে ভদ্রলোকের নাম জগদীশ চৌধুরী। কোন এক নামজাদা অফিসের বড়বাবু; একটা চাকরির জন্যে গোবিন্দ অনেক দিন ওঁর পেছনে ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি। অনেক মোটা মোটা চাকরি আছে নাকি ওঁর হাতে, ইচ্ছা করলেই উনি দিতে পারেন।

'ওঃ এই কথা! একটা চাকরি? তা আমাকে বলো নি কেন য়্যাদ্দিন? আমিই ব্যবস্থা করে দিতাম—ওঁর কাছ থেকেই।'

'বলো কি হে!' গোবিন্দ অবাক হয়ে তাকায়, 'ওঁর কাছ থেকেই আদায় করতে? ভারী কড়া লোক—তা জানে?'

'হোক না কড়া লোক! সব কিছু করারই কায়দা আছে! মাথা খাটাতে হয় হে, মাথা! বুঝেছ?'

গোবিন্দ মাথা নাড়ে, তেমন উৎসাহ পায় না।

'ওতো এক্ষুনি হয়ে যায়, এক কথায়! তেমন কি কঠিন! ভদ্রলোক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করো—' গোবিন্দকে প্ররোচিত করি. 'দেখেচ, একেবারে জলের ধারটায়। আমি করব কি, পেছন থেকে গিয়ে হঠাৎ যেন পা ফসকে ওঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়েছি এমন ভাবে এক ধাক্কা লাগাব, তাহলেই উনি লেকের মধ্যে কুপোকাৎ! তুমি তখন করবে কি, লেকের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে জল থেকে উদ্ধার করবে ওঁকে। তাহলেই তো চাকরির পথ একদম পরিষ্কার।'

'কি রকম?' গোবিন্দ তবুও বুঝতে পারে না, 'চাকরির পথ, না, জেলখানার পথ?'

'তুমি নেহাত আহাম্মক! এই জন্যেই তোমার কিছু হয় না। জীবনদাতাকে লোকে চাকরি দ্যায়, না, জেলে দ্যায়?'

'ওঃ, এইবার বুঝেছি। তা বেশ, কিন্তু খুব বেশি গভীর জলে ফেলো না যেন।'

'না না, ধারে আর এমন কি বেশী জল হবে!'

কিন্তু ধারে বেশ গভীর জলই ছিল। ভদ্রলোককে ফেলে দেবার পর তখনো দেখি গোবিন্দ ইতস্ততঃ করছে। এই রে, মাটি করলে! দামী দামী সব মুহূর্ত অমনি অমনি ফসকে যায় বুঝি! অগত্যা আবার মাথা খাটাতে হয়—গোবিন্দকেও ধাক্কা মেরে ফেলে দিই।

তারপর যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল তাতে তো আমার চক্ষুস্থির! দেখি, ভদ্রলোক দিব্যি সাঁতার কাটছেন আর গোবিন্দ খাচ্ছে হাবুডুবু। বন্ধুকে তো বাঁচানো দরকার, আমিও ঝাঁপ দিই। জলের মধ্যে তুমুল কাণ্ড! গোবিন্দ আমাকে জড়িয়ে ধরে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। আমি ওকে ছাড়তে চাই, পেরে উঠি না।

অবশেষে ভদ্রলোক এসে আমাদের দুজনকেই উদ্ধার করেন, সলিল-সমাধির থেকে।

আমি গোবিন্দর ওপর দারুণ চটে যাই। গোবিন্দও আমার দিকে রোষ-কষায়িত নেত্রে চেয়ে থাকে। এদিকে দুজনের অবস্থাই তখন ভিজে বেড়ালটি!

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর আমাদের আলোচনা শুরু হয়ঃ

'আমাকে ধাক্কা দিতে গেলে কেন? আমাকে জলে ফেলবার কথা ছিল না তো!' গোবিন্দ ভারী রেগে যায় আমার ওপর।

'বারে! জলে না পড়লে জগদীশবাবুকে উদ্ধার করতে কি করে তুমি?' আমিও তেতে উঠি।

'আমিই কি ওঁকে উদ্ধার করলাম? না, উনিই করলেন আমাদের?'

'তুমি ফাঁক করতে দিলে তার আমি কি করব?' আমি ওকে বোঝাতে চাই, 'এরকমটা হবে, আমার আইডিয়াই ছিল না।'

এতক্ষণে গোবিন্দ একটু নরম হয়—'আমি সাঁতার জানি না যে।'

'সে কথা আমায় বলেছে?'

এরপর বিরক্ত হয়ে আমি পুরী চলে এলাম। যা নাকানি-চোবানিটা লেকে হলো আমার! ওরকম জল-পরিবর্তনের পর বায়ু-পরিবর্তনের দরকার।

গোবিন্দও এল আমার সঙ্গে।

সমুদ্রের ধারে বালির ওপর বেড়াতে বেড়াতে একদিন অকস্মাৎ অঙ্গুলি নির্দেশ করে—'ঐ ঐ!' আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে।

'কি? তিনি মাছ নাকি হে?'

'উহুঁ, অত দূরে নয়। ঐ যে—সেই ভদ্রলোক, জগদীশবাবু।'

'তাই তো বটে। তিনিও তাহলে হাওয়া খেতে এসেছেন।'

'চাকরিটা ফসকালো! কেবল তোমার জন্যেই!' গোবিন্দ কেমন মনমরা হয়ে থাকে—'লেগে থাকলে হোতো একদিন। কিন্তু যা জলে চুবিয়েছ ভদ্রলোককে—।'

আমি চুপ করে থাকি। কী আর বলব?

পরদিন সকালে সমুদ্রের ধার দিয়ে পোস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছি। আবার দেখি সেই জগদীশবাবু! তাঁর সঙ্গে এবার এক বাচ্চা—মোটা-সোটা আর বিদঘুটে চেহারার। মাঝে মাঝে এমন কতিপয় শিশু দেখা যায় যাদের কোলে করতে বললে কোলা ব্যাঙের কথাই মনে পড়ে—এটি তাদের একজন।

বাচ্চাটা বালি দিয়ে বাঁধ তৈরির চেষ্টা করছিল এবং জগদীশবাবু ওকে খুব উৎসাহ দিচ্ছিলেন। শেষটা জগদীশবাবুকেও দেখা গেল ওর সঙ্গে লেগে যেতে। দুজনে মিলে বাঁধ রচনা যখন সমাপ্ত হলো তখন জগদীশবাবু ঘেমে নেয়ে উঠেছেন।

বাচ্চাটা কেন জানি না হঠাৎ যেন ক্ষেপে যায়। গোঁ গোঁ করে বাঁধের ওপরে পদাঘাত করতে থাকে। অল্পক্ষণেই বাঁধটাকেই ভূমিসাৎ করে ফেলে। জীবনের সাধনা সফল হবার পর অনেকেরই এমন দশা হয়, সেই ফল পণ্ড করতে সে উঠে পড়ে লেগে যায় তখন।

জগদীশবাবু পকেট থেকে বিস্কুট বার করে ওকে দেন। তারপরে সে ঠাণ্ডা হয়।

এই পর্যন্ত দেখে আমি পোস্ট অফিসে চলে গেছি। যখন ফিরলাম তখন বেলা আরো পড়ে এসেছে। ভগ্ন বাঁধের ধারে একাকী সেই ছেলেটি, কিন্তু জগদীশবাবুর চিহ্নমাত্র নেই কোনোখানেও।

তখনই আমার মাথায় বুদ্ধি খেলতে থাকে। এই তো হয়েছে, এইবার গোবিন্দর চাকরির ব্যবস্থা না হয়ে আর যায় না।

ভাবলাম, এই ফাঁকে দেড়মণি এই শিশুটিকে নিয়ে সরে পড়লে কেমন হয়? জগদীশবাবু, নিশ্চয়ই তাঁর ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে উঠবেন, ছেলের ওপরে তাঁর যেরকম টান দেখা গেল আজ বিকেলে। সেই সময়ে গোবিন্দ ওকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির হবে এবং একটা গল্প বানিয়ে বলে দেবে। ছেলেটা সমুদ্রেই জলাঞ্জলি যাচ্ছিল কিংবা পুরীর লোকারণ্যে হারিয়ে পথে পথে হায় হায় করে বেড়াচ্ছিল, এমন সময়ে গোবিন্দ ওকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। তাহলেও কি জগদীশবাবুর হৃদয় গলবে না? হারানো ছেলে ফিরে পেলে তো মানুষের আনন্দই হয় (তবে এ যা ছেলে এই একটা কথা!) তখন কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে, বালিগঞ্জের জলে পড়ার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে, গোবিন্দকে একটা চাকরি দিয়ে ফেলতে তাঁর কতক্ষণ?

ছেলেটিকে আত্মসাৎ করে যখন ফিরলাম তখন গোবিন্দ হোটেলের বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে চুপটি করে বসে আছে। মুহ্যমানের মতই। চাকরি আর জগদীশের কথাই ধ্যান করছে বোধ হয়।

আস্তে আস্তে আইডিয়াটা ওর কাছে ব্যক্ত করি। সমস্ত বুঝে উঠতে ওর দেরি লাগে! ও ঐ রকম। মাথা বলে যদি কিছু থাকে ওর!

প্রথম যখন ছেলেটাকে নিয়ে আমি ঢুকলাম, আমার আশা ছিল, আনন্দে ও,

মুখ খুললে বোতলের সোডা যেরকমটা হয়, সেই রকম উথলে উঠবে—কিন্তু ও হরি! একেবারেই সেরকম নয়। জগদীশবাবুর ছেলে শুনে আরো যেন সে দমে গেল। তবে কি ওর ধারণা, অন্য কারো ছেলেকে ফিরে পেলে জগদীশবাবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবেন? আর চাকরি দিয়ে ফেলবেন তৎক্ষণাত?

ইতিমধ্যে ছেলেটাও চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে।

গোবিন্দ কিছুক্ষণ কান পেতে তার কান্না শোনে। তারপর সেই তারস্বর তার অসহ্য হয়ে ওঠে। 'থামো থামো!' ছেলেটাকে সে তাড়না দেয়, 'তুমি কি ভেবেছ দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আর কারু কোনো দুঃখু নেই?……এ সব কি ব্যাপার হে, শিব্রাম!'

আমি আর কী বলব? ছেলেটিই এর জবাব দেয়—কান্নার ধমক দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে। লোকের উপকার করা সহজসাধ্য নয়, আমি জানি; করতে যাবার পথেই কত বাধা কত হাঙ্গাম! কিন্তু এ ছাড়া আর পথ কি? গোবিন্দর উপকার করবার আর কী উপায় ছিল আমার?

দোকান থেকে বিস্কুট এনে দিলে তবে ছেলেটা চুপ করে। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পর, গোবিন্দ আগাগোড়া সমস্ত প্ল্যানটা ভাবে। ক্রমশ ওর মাথা খুলতে থাকে। মুখে হাসি দেখা দেয়। আইডিয়াটা মাথায় ঢোকে ওর।

'বাস্তবিক শিবু, যতটা বোকা তোমায় দেখায়, তত বোকা তুমি নও। তোমার এবারের প্যাঁচটা যে ভালো হয়েছে একথা মানতে আমি বাধ্য।'

অনেক টাকার লটারী জিতলে যত না খুশি হতাম, গোবিন্দর সার্টিফিকেট আমাকে তার বেশি পুলকিত করে। যাক, এতদিনে তাহলে গোবিন্দ বেচারার সত্যিই একটা হিল্লে করতে পারা গেল।

ছেলেটিকে হস্তগত করে গোবিন্দ আর আমি এবারে বেরিয়ে পড়লাম জগদীশবাবুর খোঁজে।

ছেলেটা দুপা হাঁটে আর কাঁদতে শুরু করে। তৎক্ষণাত ওকে খাবার যোগাতে হয়। মুখের দুটি মাত্র ব্যবহার ওর জানা, খাওয়া আর কাঁদা, একটা স্থগিত হলেই আরেকটার আরম্ভ। বিস্কুট, লজেঞ্চুস, চকোলেট, টফি পালাক্রমে আমি যুগিয়ে চলি। এই ভাবেই চালাতে হবে জগদীশবাবু পর্যন্ত।

কিন্তু জগদীশবাবুকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সমুদ্রের ধার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা হয়, কিন্তু জগদীশবাবুর পাত্তা নেই। আচ্ছা ভদ্রলোক তো? ছেলে হারিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে আছেন তো বেশ!

গোবিন্দ বলে, 'থানায় খবর দিতে গেছেন বোধ হয়।'

আমি ভ্রূকুঞ্চিত করি।

ক্রমশ গম্ভীর হয়ে ওঠে ও। 'এবার দেখছি জেলেই যেতে হলো তোমার জন্যে। ছেলে চুরির দায়ে। ছেলে চুরি করলে ক'মাস জেল হয় জানা আছে তোমার?'

আমি চুপ করে থাকি।

'ক মাস কি ক বছর কে জানে!' গোবিন্দ এবার যেন ক্ষেপে যায়; 'তোমার যে রকম আক্কেল! আমি কিন্তু এ ব্যাপারে নেই বাপু! তুমি চুরি করেছ, জেল খাটতে হয় তুমিই খাটবে। ছ'বছরের কম নয় নিশ্চয়। আমি বেশ জানি!'

ছেলেটার হাত ছেড়ে দেয় গোবিন্দ, এবার সে আমাকেই দু হাতে জড়িয়ে ধরে। ওর কথায় আর ছেলেটার হস্তগত হয়ে আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করি। নাঃ, এতটাই কি হবে? একেবারে থানায় যাবেন ভদ্রলোক? আর গেলেই কি পুলিসের ঘটে একবিন্দু বুদ্ধি নেই? আমরা তো খুঁজে পেয়েই একে ফিরিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছি। চাকরি না দেয় নাই দেবে, কিন্তু তাই বলে জেলে? নাঃ, ছেলের উদ্ধারকর্তার ওপর কোন ভদ্রলোকই কখনো এতটা নিষ্ঠুর হতে পারেন না।

সমুদ্রের ধারে একজনের কাছে খবর পাই স্বর্গদ্বারের কোথায় যেন থাকেন কে-এক জগদীশবাবু। স্বর্গদ্বারেই ছুটতে হয়। আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি—কিন্তু গোবিন্দ অদ্ভুত! তার জন্যেই এত কাণ্ড আর সে নিতান্ত নিস্পৃহের মতই দূরে দূরে চলেছে—আমাদের চেনেই না যেন।

অতিকষ্টে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর অনেক রাত্রে জগদীশবাবুর আস্তানা মেলে। প্রবল কড়ানাড়ার পর উনি নেমে আসেন। লণ্ঠন হাতে নিজেই।

'এত রাত্রে তোমরা কে হ্যা?' ভদ্রলোকের বিরক্ত কণ্ঠ শুনি।

সবিনয়ে বলি, 'আজ্ঞে, সমস্ত পুরী খুঁজে তবে আপনার বাড়ি পেয়েছি, মশাই!'

'তা, আমাকে এত খোঁজাখুঁজি কিসের জন্যে?' ভদ্রলোক আলোটা তুলে আমাদের নিরীক্ষণ করেন, 'তোমরা সেই বালিগঞ্জের না?'

'আজ্ঞে, বালিগঞ্জেরই বটে! সেজন্যে কিছু মনে করবেন না। আপনি স্নেহপ্রবণ পিতা হয়েও এত অন্যমনস্ক প্রকৃতির হতে পারেন, আমরা তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারি নি। আপনার ছেলেকে যে সমুদ্রের ধারেই ফেলে এসেছেন, তা বোধহয় আপনার স্মরণেও নেই। আপনার ছেলে এতক্ষণ সমুদ্রের গর্ভে ভেসে যেত, সত্যি কথা বলতে কি, একটা প্রকাণ্ড ঢেউ ওকে তাড়াও করেছিল, আমার এই বন্ধু নিজের জীবন বিপন্ন করে ওকে বাঁচিয়েছেন। এতক্ষণ আপনার ছেলে—আপনার ছেলে আর আমার বন্ধু দুজনেই—এতক্ষণ হাঙ্গর কুমিরের পেটে গিয়ে বেবাক হজম হয়ে যেত, কিন্তু আমার বন্ধু চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু আর ভগবান সহায়—এই দুয়ের যোগাযোগে আজ আপনার ছেলের বহুমূল্য জীবন রক্ষা পেয়েছে—'

ভদ্রলোক এতক্ষণ অবাক হয়ে আমার ভাষণ শুনছিলেন, এবার বাধা দিয়ে বললেন—'আমার ছেলে কাকে বলছো? এর মধ্যে কোনটি আমার ছেলে?'

আমি আকাশ থেকে পড়ি—'কেন এই দেবদূতের মতন স্বর্গীয় শিশুটি, আপনার নয় এ ?'

'হ্যাঁ, একে দেখেছিলাম বটে আজ বিকেলে। সমুদ্রের ধারে। বিস্কুটও খেতে দিয়েছি কিন্তু একে তো বাপু আমি চিনি না !···যাও, আর বিরক্ত কোরো না—ঘুমোও গে।'

এই বলে সশব্দে আমাদের মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গোবিন্দ সেই ধুলো-বালির ওপরই বসে পড়ল—'শিব্রাম, বরাতে কি শেষটা এই ছিল ? ছেলে চুরির দায়ে কঠোর কারাদণ্ড ? যাবজ্জীবনের দ্বীপান্তর ? এই করলে তুমি মাথা খাটিয়ে শেষটায় ?'

ঢিল থেকে ঢোল

তিল থেকে যেমন তাল হয়, ঠিক সেই রকমই প্রায়। ঢিল থেকে ঢোল। সামান্য এক টুকরো ঢিলের থেকে ফেঁপে-ফুলে ঢোল।

আমের আশা নিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছি আমতায়। ফি-বছরই যাই।

ইস্টিশন থেকে মাইল সাতেক হাঁটতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। বারোটা বাজিয়ে পৌঁছলাম মামার বাড়ি।

বাড়ির ভেতরে পা দিয়েই আমি অবাক! উঠোনের উপরেই এক দৃশ্য! আমার মামাতো ভাইবোনেরা সার বেঁধে সবাই হাঁটু গেড়ে বসে। মামীমা এক ধারে দাঁড়িয়ে।

আন্দাজ করলাম মামীমা কোনো দোষের জন্য ওদের সাজা দিয়েছেন। এবার আমাকে পেয়ে আমাকে দিয়ে ওদের কান মলিয়ে দেবেন। ভেবে আমার খুব উৎসাহ হলো। হাতের এতখানি সুখ হাতের নাগালে এলে কার না ভালো লাগে। এহেন আরাম সেই পাঠশালাতেই যা পেয়েছি। পেয়েছি এবং দিয়েছি। কষে ওদের কান মলে দেবার জন্য আমার হাত নিসপিস করতে লাগল। নিলডাউন করা ভাইদের কান ডলতে আমি তৈরি হলাম।

আমাকে দেখেই মামাতো-বোন মিনিটা তারস্বরে আউড়েছে ঃ

ঠিক দুককুর ব্যা···লা···
ভূতে মারে ঢ্যা···লা···
ভূতের পায়ে রো···সি···
হাঁটু গেড়ে বো···সি···

'তার মানে ?' আমি রাগ করলাম ঃ 'দুপুরবেলা এসে পড়েছি বলে আমাকে ভূত বলে গাল পাড়া হচ্ছে ? আমি কী করব ! তোমাদের হাওড়া-আমতার ট্রেন যেমন ! আমাদের ধাপার লাইনকেও হার মানিয়ে দেয় ।'

জবাবে কোনো কথা না বলে মীনা দু'বাহু বিস্তার করে দেখালো ।

একটা হাত তার দেওয়াল-ঘড়ির দিকে—দেখলাম সেখানে বারোটা বেজে তিন মিনিট । আর একটা হাত উঠোনের উদ্দেশে—সেখানে একটা পাটকেল পড়েছিল···তার দিকে ।

'ভূতে ঢিল মারছে আমাদের বাড়ি, জানো রামদা ?' টুপসি জানায়, 'আজ কদিন থেকেই । যেই-না ঠিক বারোটা বাজে অমনি একটা দুটো করে ভূতের ঢিল এসে পড়ে—'

'আর অমনি না আমরা হাটু গেড়ে বসে মন্তর পড়ি ।' টুংকু ব্যাপারটা আরো বিশদ করে !—'ঠিক দুককুর ব্যালা ভূতে মারে— ।'

'ভূত না ঢেঁকি !' মন্ত্রপাঠে আমি বাধা দিই ঃ 'এ বাড়ির ত্রিসীমানায় বেল গাছ কি শ্যাওড়া গাছ রয়েছে ? তাই নেই ত ভূত আর পেত্নীরা আসবে কোত্থেকে শুনি ?' জিগ্যেস করি আমি, 'তবে হ্যাঁ, তোরা নিজেরাই যদি এই কাণ্ড করে থাকিস ত বলতে পারি না ।'

বলে আমি উঠোনের পাটকেলটার দিকে তাকালাম । তার গতিবিধি লক্ষ্য করে একটু গোয়েন্দাগিরি ফলালাম আমার । শ্যাওলাপড়া উঠোনের মেঝে ঘসে একটা তির্যকরেখা টেনে চলে গেছল পাটকেলটা ।

সেই পাটকেলটা দিয়েই মেঝের ওপর একটা সরলরেখা টানলাম । তারপর তার ওপর পারপেণ্ডিকুলার খাড়া করে অ্যাংগল কষে একটা ডিগ্রীর আন্দাজ বার করলাম । মনে হল আমাদের ঈশান কোণের দিক থেকে এসেছে ওই টুকরোটা—পাড়ার ওদিকে বঙ্কুদের বাড়ি । এটা ছোঁড়া তা হলে সেই ছোঁড়ারই কাজ । সে ছাড়া আর কেউ নয় ।

'বঙ্কিমের কাজ ।' মুখ ব্যাঁকা করে আমি বললাম, তারপর বঙ্কিম-নেত্রে তাকালাম মিনির দিকে—'তোদের সঙ্গে কি তার কোনো ঝগড়াবিবাদ হয়েছিল ইতিমধ্যে ?'

'বাবা তাকে বকে দিয়েছে । আমাদের আমবাগানে গাছে উঠে আম খাচ্ছিল বসে বসে, তাই ।'

'বকবেই ত !' সায় দিলাম আমি ঃ 'কেন, ঢিল না ছুঁড়ে কি আম ছুঁড়তে

পারে না ? গোছা গোছা আম ? তা হলে ত আমাদের কষ্ট করে আর গাছ থেকে পেড়ে খেতে হয় না। থাক-না যত খুশি—কিন্তু সেইসঙ্গে ছড়াক এন্তার। বলি, হনুমান কী করেছিল ? আমাদের এত আম এলো কোত্থেকে শুনি ? লঙ্কার থেকে···সব সেই হনুমানের আমদানি ! লঙ্কায় বসে খেয়েছে আর আঁঠিগুলো ছুঁড়েছে অযোধ্যার দিকে। ল্যাংড়া আমের আঁঠি যত।'

'বঙ্কুদাও ত তাই ছুঁড়েছিল।' ব্যক্ত করল টঙ্কু ঃ 'ল্যাংড়া আমের আঁঠি···'

'তোর মেজমামার টাক লক্ষ্য করে।' মামীমার প্রকাশ।

'তাতেই ত কাণ্ডটা বাধল।'

'বাবা খুব কষে বকে দিলেন। গাছের ডালে বসে ছিল ত। হাতের নাগালে পেলেন না। পেলে কী হত কে জানে।'

'কাণ্ড গড়াত আরো।' মিনি জানায়।

'ধরে কানডলা দিতেন বোধ হয়। আচ্ছা,—আমি সেটা দিয়ে আসছি বঙ্কাকে।' বলে আমি বেরুলাম।

'বঙ্কিম, এটা তোমার কি রকম কর্ম ?' গিয়ে সাধু ভাষায় আমি শুরু করলাম—'আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা ?'

আমার কথায় বঙ্কিম ত' চট্টোপাধ্যায় ! চটে উঠে বলল, 'লোষ্ট্র নিক্ষেপ ! বলে, লোষ্ট্রের আমি বানান জানিনে, আর তাই নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করব ?'

'বঙ্কে, অঙ্কে আমি যতই কাঁচা হই, জ্যামিতিটা আমি ভালোই জানতাম, এটা তুমি মানবে। এই গাঁয়ের ইস্কুলে একদা তোমার সঙ্গে পড়েও ছিলাম কিছুদিন—তোমার মনে আছে নিশ্চয় ?'

'ইস্কুলের পড়ার সঙ্গে ঢিল পড়ার কী সম্পর্ক শুনি ? ঢিল কি কোনো পাঠ্যপুস্তক ? পড়বার জিনিস। না পড়লেই নয় ?'

'চালাকি রাখো। আমি অ্যাংগল কষে বার করেছি ঢিলটা আমাদের বাড়ির ঈশান কোণ থেকে···'

'ঈশানকাকার বাড়ির কোণ থেকে বলছ ? ঈশানকাকা আমাদের পাড়ার কোনো ব্যাপারে থাকে না।'

'ঈশানকাকার বাড়ি ত আমাদের বাড়ির নৈঋত কোণে। আমাদের ঈশান কোণে তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই। অর্থাৎ কিনা···'

'ঈশানকাকাকে বলো গিয়ে ঈশান কোণের খবর তিনিই ভালো রাখেন। আমরা সে-সব জানিনে।' বলে সে আমার মুখের ওপর দড়াম করে বাড়ির দরোজা বন্ধ করে দেয়।

অগত্যা, গেলাম ঈশানকাকার কাছে। ঈশানকাকা সব শুনেটুনে বললেন—'এসব ভূতের কম্মো। বঙ্কা ত এখনো ভূত হয়নি। জ্যান্তই রয়েছে। ভূতে ঢিল মারছে—বুঝেছ ? এখন ভূতের ওপর কি আমাদের কারো হাত আছে ?'

'বঙ্কার আছে। বঙ্কার বাড়ির দিক থেকেই আসছে ঢিলগুলো—।'

'কী বললে? ভূতের ওপর বঙ্কার হাত? বঙ্কার ওপর ভূতের হাত? ভূতের হাতে বঙ্কা? বঙ্কার হাতে ভূত? তুমি ভূত মানো না? ভগবানে তোমার বিশ্বাস নেই?' ঈশানকাকা ব্যাজার হলেন ভারী। 'আজকালকার ছেলেরা বেজায় নাস্তিক দেখছি।'

সেখান থেকে গেলাম পাশাপাশি আর ক'জনার বাড়ি। সনাতন-মেসো, পদ্মলোচন-পিসে, জনার্দন খাস্তগীর—এঁদেরকেও গিয়ে জানালাম কথাটা। কথাটা কেউ কানেই তুলতে চাইলেন না।

আসল কথা, বঙ্কা ভারী দজ্জাল ছেলে। তাকে ঘাঁটাবার সাহস নেই কারো।

পরের দিন দুপুরে আবার পড়লো ঢিল। এবার পর পর অনেকগুলো। তার একটা ঠিক আমার নাক ঘেঁষে গেল। তাক আছে বটে বঙ্কার।

তক্ষুণি আমি চলে গেলাম রেল লাইনের ধারে। কোঁচড় ভরে কতকগুলো নুড়ি-নোড়া কুড়িয়ে আনলাম। সোজা উঠে গেলাম বাড়ির ছাদে।

আমাদের বাড়ির ঈশান কোণ, মানে বঙ্কার বাড়িটা বাদ দিয়ে, পাশাপাশি সব বাড়ির দিকে তাক করে ছুঁড়লাম নুড়িদের। আর নোড়াটা ছুঁড়লাম ঈশান-কাকার বাড়ির কোণে—তাঁর দোরগোড়ায়।

দরজার উপর দড়াম করে আওয়াজ হতেই ঈশানকাকা, দেখলাম, খড়ম পায়ে বেরিয়ে এলেন—কে—কে—কে? দরজায় ধাক্কা মারে কে?

বাইরে এসে দেখেন, কেউ না।

ভূত। বললাম আমি মনে মনেই।—ভূতকে কি দেখা যায়? ভগবানকে? ঈশানকাকা, তুমি ভগবান মানো না, ছ্যা!

আশেপাশের সব বাড়ি থেকেই বেরুলো লোকেরা। পদ্ম-পিসে, সনাতন-মেসো, খাস্তগীর-খুড়ো সবাই বেরুলো।

বেরুলাম আমিও। কদ্দুর গড়ায় দেখতে।

ঈশানকাকা সোজা আমাদের বাড়ির ঈশান কোণের দিকে ছুটলেন খড়ম খটখট করে। বঙ্কার দরজায় গিয়ে খড়ম খুলে লাগালেন এক ঘা।

বঙ্কাকে নয়, দরজাকে। কিন্তু তাতেই কাজ হলো। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বঙ্কু।

'আমাদের বাড়ি ঢিল ফেলেছিস কেন রে হতভাগা?' খড়ম আস্ফালন করে তিনি বললেন।

'আমি ঢিল ফেলেছি!' বঙ্কু আকাশ থেকে পড়ে। ঢিলের মতই পড়ে ঠিক।

'তুই ছাড়া আবার কেটা?' বলেন পদ্ম-পিসে, 'টঙ্কাদের বাড়ি তুই ফেলে-ছিলি ঢিল। আজ আমাদের বাড়ি ফেলেছিস।

'তোকে আজ আর আস্ত রাখব না।' বললেন খাস্তগীর। বলেই চটপট চটাচট ঘা কতক চড়-চাপড় বসিয়ে দিলেন এলোপাথাড়ি। তারপর তার চুলের মুঠো ধরলেন কসকসিয়ে। চড়চাড়ির পর মনে হল, মুড়োঘণ্ট রাঁধবার ইচ্ছে তাঁর।

'সত্যি বলছি ঈশানকাকা, আমি ঢিল ফেলিনি···'

তার জবাবে ঈশানকাকা খড়মের এক ঘা বসালেন ওর মাথায়। দেখতে না দেখতে ঢিলটা ওর মাথার ওপরেই দেখা দিল। ফুলে উঠল মাথাটা।

'আমি কেবল টঙ্কুদের বাড়ি ফেলেছিলাম···' কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল বঙ্কু: 'তোমাদের বাড়ি আমি ফেলিনি বলছি।'

'টঙ্কুদের বাড়িই বা ঢিল ফেলবি কেন রে বদমাস?' ঈশানকাকার আরেক ঘা খড়মের খটাস।

'আমি বলতে পারি কে ফেলেছে ঢিল। ঐ শিবেটা—'

বঙ্কু আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে: 'আমার উপর রাগ আছে ওর···'

'তোর বাড়িতে পড়েছে ঢিল?' জিগ্যেস করেন পদ্ম-পিসে।

'না···না তো!' স্বীকার করতে হয় বঙ্কুকে।

'তবে? তোর উপর যদি রাগ ওর, তবে তোর বাড়ি না ফেলে ফেলতে যাবে আমাদের বাড়ি?' খাস্তগীরের আরেকটা আস্ত কিল।

'তোমার ছাড়া আর কারো কাজ নয় বাপু! পরের বাড়ি ঢিল ফেলাই তোমার অভ্যেস। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি। পরশু তার বাড়ি··· বড়ডো বাড় বেড়েছো তুমি। আমাদের বাড়ি ঢিল ফেল, তোমার অ্যাদ্দুর আস্পর্ধা।'

'পাড়ায় বাস করে পড়শীদের বাড়ি ঢিল···'

'না, এত বাড়াবাড়ি ত ভালো নয়। আজই এর হেস্তনেস্ত করব,' বলে খাস্তগীর বঙ্কুদের বাড়ির লাগাও বাঁশঝাড়ের দিকে এগুলেন। যুতমত মজবুতমত আস্ত একটা বাঁশ. ঝাড়ের থেকে ভাঙতে লাগলেন।

এই সুযোগে এগিয়ে আমি কষে বঙ্কার কান মলে দিলাম। কান ধরে বললাম—'ওরে বঙ্কা, দেখছিস কি! ঝাড়ে-বংশে শেষ করবে তোদের। পালা এক্ষুণি, দেখছিসনে তোদের বংশলোপ করছে—এর পর তোর বাবার বংশলোপ করবে।' এই কথাটা ফিসফিস করে বললাম ওকে।

বলতেই বঙ্কু টান মেরে কান ছাড়িয়ে তীরের মত ছুট মারল। সাত মাইল দূরে ইস্টিশনে গিয়ে বিনা টিকিটে গাড়ি চেপে সটান চলে গেল মামার বাড়ি হাওড়ায়। মারের হাত থেকে বাঁচতে হাওয়া!

পড়শীর মায়া

আমার বন্ধু নৈনিতাল যাবার আগে তার একটি তাল যে আমার উপর ঠুকে যাচ্ছে তখন তা বুঝতে পারিনি, টের পেলাম পরে।

'পড়শীর মায়া কাটিয়ে যেতে হচ্ছে!' বলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললো সে।

পড়শীর প্রেমে তাকে বিগলিত দেখে আমি বিচলিত হলাম—'প্রতিবেশীর প্রতি বেশি ভালোবাসা দেখছি যে! এর মানে?'

'মানে, আমার যে তাদের ওপর মায়া খুব, তা নয়। আমার অভাবে তারা মনে কষ্ট পাবে সেই ভেবেই আমার দুঃখ।' বলে তার আবার আরেক ফোঁস: 'আমি চলে গেছি একথা যদি তাদের জানানো যেত—আহা!'

'বাহা!' আমি বলি: 'তুমি চলে যাবে আর তারা সে খবর পাবে না তা কি করে হয়?'

'হয়। যদি তুমি ভাই আমার হয়ে, মানে তুমি যদি আমার এই অভাব মোচন করো।'

'না ভাই, আমি তোমায় ধার দিতে পারবো না। আমার টাকা নেই।'

'টাকার কথা হচ্ছে না, আমি বলছিলাম কি, আজন্ম তো বাসা আর মেসে কাটালে, দিন কতক বাড়িতে কাটাও না? আমি নৈনিতালে বদলি হয়ে যাচ্ছি, কদিনের জন্য কে জানে, আমার অমন বাড়ি তো খালিই পড়ে থাকবে। ওয়েল ফার্নিশড হাউস—খাট বিছানা দেরাজ আলমারি সোফাসেট সবই এখানে

থাকবে, কিছুই নিয়ে যাব না। তার উপর ফ্রীজ আছে, ফোন আছে—আর কি চাও? বাসার ভাড়া না গুণে যদ্দিন না আমি আসি আমার বাড়িতে গিয়ে বাস করো না কেন?'

'তোমার অত বড় বাড়ির ভাড়া দেব কোত্থেকে?'

'ভাড়া কে চাইছে তোমার কাছে। কেয়ারটেকার হয়ে থাকবে তো। আমার চাকরকে রেখে যাব। সেকেন্ড ক্লাস সার্ভেন্ট ওরফে ফার্স্ট ক্লাস কুক। সব রকম রান্না জানে। তার বেতনটা কেবল তোমায় দিতে হবে।'

'তা না হয় দিলুম। কিন্তু তোমার অভাব মোচনের কথা বলছ যে! আমার দ্বারা কি করে হবে সেটা? তোমার পড়শীরা যখন তোমায় দেখতে পাবে না…'

'মাথাও ঘামাবে না। ঘরে আলো জ্বললে তারা ধরে নেবে আমি আছি, কোথাও হয়ত কাজে বেরিয়েছি, ফিরবো এখুনি—এমনি কিছু একটা তারা আঁচ করে নেবে। আমার চাকরকে দেখতে পেলেই তারা বুঝবে আমি আছি—বুঝলে কিনা।'

'তুমি চলে যাবে আর তারা সেটা দেখতে পাবে না?'

'আমি নিশুত রাতে কাটবো, আজ রাত্রেই, খালি একটা সুটকেস হাতে নিয়ে। তুমি কাল সকালে সুবিধেমত গিয়ে সেখানে উঠো, কেমন? চাকরকে আমি বলে যাবো সব।'

সকালে যখন বন্ধুর বাড়িতে পা বাড়ালুম, দেখি ড্রইংরুম ভর্তি লোক। একখানি খবরের কাগজ নিয়ে পড়েছেন সবাই।

সেরা কুশন-চেয়ারটিতে একটি যুবক ত্রিভঙ্গ হয়ে বসে। অপরিচিত হলেও আমাকে তিনি অভ্যর্থনা করলেন, 'আসুন! এই প্রথম আসছেন বুঝি এখানে?' বলে তাঁর পাশের আসনটিতে বসতে বললেন।

'তা হ্যাঁ, বলতে পারেন বটে'। বলে আমি বসলুম।

'এ পাড়ায় সবে এসেছেন মনে হচ্ছে?' তিনি শুধালেন আবার।

'সে কথা সত্যি।' সায় দিতে হলো আমায়।

'ভদ্রলোক আজ নেই,' তিনি জানালেন: 'থাকলে এতক্ষণ চা হত আমাদের। চাকরটা আছে কিন্তু সে কোনো কথা শুনবে না। সে যেন কি রকম!'

'আচ্ছা, আমি বলছি।' বলে ভেতরে গিয়ে চাকরকে ডেকে জিগ্যেস করলাম – 'এরা সব কারা রে?'

'পাড়ার লোক। রোজ খবরের কাগজ পড়তে আসে সকালে। অফিসের টাইম হলেই চলে যাবে।'

'তা একটু চা-টা করে দাওনা ভদ্রলোকদের। দু-চার খানা করে বিস্কুটও দিয়ো, থাকে যদি।' মুখ বেঁকিয়ে সে চলে যায়—চা বানাতে।

দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখি

কাগজটা টুকরো করে রেখে গেছে। সাতজনে মিলে পড়বার সুবিধে করতে কাগজখানা নয়-ছয় করে ফেলেছে, এখন তার ল্যাজা মুড়ো মিলিয়ে পড়া দুষ্কর। তবু জোড়াতাড়া দিয়ে পড়ার চেষ্টায় আছি এমন সময়···এক পাল ছেলে এসে হানা দিল।

এসেই তারা আমার খাটের তলা থেকে তিনটে ক্যারামবোর্ড টেনে বার করল—সেখানে যে ওগুলো লুক্কায়িতভাবে ছিল তা আমি জানতাম না—বার করে আমাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করেই খটাং করে ক্যারম পিটতে শুরু করে দিল সবাই।

ঘণ্টাখানেক পেটবার পর ওদের একজন বলল—ভারি খিদে পেয়েছে ভাই, বিস্কুটের টিনটা বার করতো।

বলতে না বলতেই ওদের একজন লাফিয়ে গিয়ে দেরাজের মাথা থেকে টিনটা পেড়ে আনল। সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নিতেই টিনটা ফাঁকা।

'চকোলেটের বাক্সটা কোথায় আজ লুকিয়ে রেখেছে কে জানে।' বলে একটা ছেলে : 'লোকটা ভারি চালাক কিন্তু।'

খুঁজতে খুঁজতে বাক্সটা আমারই মাথার তলা থেকে বেরুলো। বালিশের নীচের থেকে। অথচ আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না।

এতগুলো উপাদেয় চকোলেট আমারই সম্মুখ থেকে—আমার মুখের থেকে চলে যেতে দেখে দুঃখ হয়। মুখ ভার করে আমি তাকিয়ে থাকি।

একটি ছেলে আমার মনের কথাটি টের পেয়ে এক টুকরো আমার হাতে তুলে দেয়—'খান না, আপনিও খান। খান একখানা।'

'তোমরা ইস্কুল যাও না?' আমি তাকে শুধাই! 'যাওনি কেন আজ?'

'বাঃ, ভ্যাকেশন যে? সামার ভ্যাকেশন তো। এখনো দেড় মাস ছুটি।'

'ও বাবা!' আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

চকোলেট-পর্ব সাঙ্গ হবার পর ক্যারাম পেটা শেষ করে ফুটবল পিটতে তারা যায়।

সন্ধ্যাবেলায় ড্রইংরুমে বসে আছি চুপচাপ, এমন সময় সকালবেলার ভদ্রলোকদের একজনের পুনরাবির্ভাব। তাঁর পিছু-পিছু আরেকজন।

'কতক্ষণ এসেছেন?' একজন শুধোলেন : 'রেডিয়োটা খোলেননি এখনো? ভদ্রলোক বাড়ি নেই বুঝি?'

'রেডিয়ো আমার দু কানের বিষ।' আমি জানাই।

'সেকি কথা। আজ একটা ভলো নাটক ছিল যে।' বলে তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে রেডিয়োটা চালু করে দিলেন।

একে একে সবাই এলেন। আমাদের রেডিও শুনতে।

'চাকরটা গেল কোথায়? তেষ্টা পেয়েছে বেজায়। এক গ্লাস জল পেলে হত।'

'বাজারে গেছে বোধ হয়।' বলে আমি নিজেই জল আনবার জন্য উঠতে যাচ্ছি, কিন্তু আর এক ব্যক্তি বলে উঠল— 'যাও না হে! ফ্রিজটা খুলে নাও না গিয়ে নিজে। বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল ভর্তি রয়েছে। কতো খাবে?'

বলতেই পিপাসার্ত ভদ্রলোক উঠে গেলেন। সঙ্গে করে তিনি নিয়ে এলেন তিন বোতল জল, গোটা দশেক গেলাস এবং আরো কয়েক বোতল—তিনি প্রকাশ করলেন নিজেই—'এগুলোও ফ্রিজের ভেতর পেলাম। পাইন আপেল, অরেঞ্জ আর ম্যাংগো সিরাপ। এসো, শরবত করে খাওয়া যাক। খাসা হবে। কতকগুলো বরফের টুকরোও এনেছি এই যে।'

গেলাস গেলাস বরফি—শরবত ঘুরতে লাগলো হাতে হাতে।

আমি ওদের একজনকে আড়ালে পেয়ে বললাম—'এতই যদি আপনার রেডিয়োর শখ, কিনতে পারেন ত একটা। ট্রানজিস্টার সেট, দাম আর কত! এমন বেশি নয়। তাহলে বাড়িতে বসেই শুনতে পারেন আরাম করে।'

রেডিয়ো কিনে বাড়িতে বসে শুনব? বলেন কি আপনি?' তিনি বললেন। 'পাগল হয়েছেন? এখানে পাখার তলায় কুশানে বসে আরামে···রেডিয়ো কিনি আর যত পাড়ার লোকেরা বাড়িতে এসে ভিড় জমাক! বাড়িতে রেডিয়ো রাখার ভারি ঝামেলা মশাই।'

ভদ্রমহোদয়রা বিদায় নিলে এক মাসের মাইনে আগাম দিয়ে চাকরকে আমি বিদায় দিলাম। তারপর নিশুত রাতে সদরে তালা দিয়ে বন্ধুর বাড়িকে তালাকই দিয়ে উঠলাম এসে মেসে—নিজের বাসায়। পড়শীদের মায়া কাটিয়ে।

ভাগনে যদি ভাগ্যে থাকে

তাহলে আর রক্ষে নেই !

কথায় বলে কাজের সময় কাজী, কিন্তু আমার কাজিনরাও কিছু কম কাজের নন ।

আমার সাত মাসি মিলে সাঁইত্রিশটি কাজিনরত্ন দিয়েছিলেন আমায় । হী-কাজিনদের বাদ দিয়ে কেবল শী-কাজিনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাতাত্তরটা ভাগনে আর ভাগনিরত্ন আমি পেয়েছি।

বোন চিরকালই কিছু বোন থাকে না, ক্রমেই গভীর হয়, গভীরতর হয়ে হয়ে অরণ্যে দাঁড়ায় । আর অরণ্য মাত্রই শ্বাপদ সংকুল । সেই অরণ্যের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে হিংস্র জীব জন্তুরা বেরুতে থাকে । ভাগনে ভাগনিরা দেখা দেয় ।

'বন থেকে বেরুলো টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।'—শোনা ছিল উপকথায় । কিন্তু বোনের সেই টিয়েদের যে কখনো চোখে দেখতে পাবো কোনো দিন কল্পনা করিনি, চোখা হয়ে একে একে তারা দেখা দিতে লাগল ।

অবশ্যি, ভাগনিদের আমি হিংস্র প্রকৃতির বলতে চাইনি । আমার ভাগনিদের মতন মিষ্টি আর হয় না । কিন্তু ভগ্নীর থেকে কেবল ভাগনি পাবে এমন ভাগ্য নিয়ে কজন আসে ! ভাগনির সঙ্গে ভাগনের ভ্যাজাল এসে জোটেই । ভ্যাজাল ছাড়া কি কিছু আছে আজকাল ?

আমার বোনেরা উপবনের মতন সুরভিত। আর ভাগনিরা ত আবার খাবোর মতই উপাদেয়। আর ভাগনেরা? আহা, তারা যদি ভাগলপুরের মত সুদূরেপরাহত হত!

অবশ্যি, সাতচল্লিশটা ভাগনের সবাই সমান দুর্ধর্ষ নয়। আর সবাই কিছু একসঙ্গে হানা দেয় না। একসঙ্গে কি কারো পেট কামড়ায় আর মাথা ধরে? পায়ে গোদ আর চোখে ছানি পড়ে? পেটের অসুখ, হাম আর ধনুষ্টঙ্কার হয়ে থাকে? কলেরা আর পক্ষাঘাত, বাতের ব্যথা আর দাঁতের ব্যথা? জলাতঙ্ক আর অম্বলের ব্যায়রাম? তাহালে আর বাঁচতে হত না মানুষকে। আমার ভাগনেরা একসঙ্গে হামলা করলে আমি আর মর্তলোকে বর্তমান থাকতুম না।

তারা মৃদুমন্দ সমীরণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে প্রবাহিত হয়, আর প্রথম শরতের বর্ষণের ন্যায় পশলায় পশলায় আসে। কেউ কেউ বা ঝড় ঝাপটার মতই এসে পড়ে। দাপটের সঙ্গে।

মুহুর্মুহু ঠিক না এলেও প্রায় ক্ষেপে ক্ষেপেই তারা আসে।

সেদিন যেমন তিনজন এলো। অশোক, সত্যেন আর রথীন। কোন ষড়-যন্ত্র করে কিনা জানিনা, কলকাতার তিন মুলুকের তিনজনা দেখা দিল একসঙ্গে।

পুজোর মুখেই এল তারা। তাদের ধরন-ধারণ দেখে ঠাওর হলো বিজয়ার ঢের আগেই তারা দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছে।

এসেই পুজোর পার্বনীর কথা তুলল। মাসিদের কাছ থেকে কে কত পেয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে লাগল আমায়। এরপর মামাদের কাছ থেকে কার কত আদায় হয়েছে তার কথা পাড়বে বোধ হয়। আর তার পরেই পেড়ে ফেলবে আমাকেও। আগের থেকেই সতর্ক হওয়া ভালো। আমার চোটটাই দিয়ে রাখি আগে। আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় আগের থেকেই আক্রমণ করা।

'আর এই দেখো, আমার টেরিলিনের স্যুট – বাবা দিয়েছে পুজোয়।' বলল রথীন। টেরি তার আগেই দেখেছিলাম, এখন টেরিলিন দেখে চোখ ট্যারা হয়ে গেল।

'এত এত পেয়েছিস বলছিস যখন – তখন কিছু আমায় তোরা দিয়ে যা না-হয়।' আমি বললামঃ 'আমার অবস্থা ভারী কাহিল যাচ্ছে রে। অবশ্যি ধার দিতেই বলছিলাম আমি তোদের।'

'সেধারে আমরা নেই মামা।' বলল অশোকঃ 'তার চেয়ে দেলখোস কেবিনে চলো বরং।'

ভেবে দেখলে সে ধারটাও খুব খারাপ নয়। নগদ দক্ষিণা না মিললেও আজকালকার বাজারে বিনি-পয়সায় ভোজটাই বা কে দিচ্ছে অমনি! তক্ষুনি শার্টে মাথা গলিয়ে এক পায়ে খাড়া।

না, ভাগনেরা খালি যে ভাগ বসায় তাই নয়, তিনজনের যোগে গ্রহস্পর্শ ঘটলে তাদের গুণও দেখা যায় বইকি !

দেলখোসে এমনিতেই বেজায় ভিড়—সর্বদাই ভোজনবিলাসীতে ভর্তি। ভিড়ের ঠেলায় ঢোকাই দায়, ঢুকতে পারলেও বসবার জায়গা পাওয়া যায় না। কিন্তু সেদিন দেখলাম, বোধহয় রবিবার ছিল বলেই—রবিবারে আশপাশের বইয়ের বাজার বন্ধ থাকে তো—কেবিন বেশ ফাঁকা ফাঁকা।

চারজনে বসা গেল একধার ঘেঁসে।

অশোক বলেল—'মোগলাই পরোটা মামা।'

রথীন বললে—'মুর্গির মাংস।'

আমি বললাম—'মাটনচপ—আর কিছু নয়। মাটনচপ গ্রেভি—বেশ চর্বিওলা।' আমি চর্বিত চর্বনের পক্ষপাতী।

সত্যেন বলল—'সেই যে ইয়া বড়ো মুর্গির কাটলেট ডিম দিয়ে ভেজে দেয়—খাইয়েছিলে তুমি একদিন—প্লেট জুড়ে যায় একেবারে। পেট ভরে যায় একটাতেই। খেতেও খাসা। তার নাম কি জানিনা, আমি তাই খাবো একখানা।'

'তার নাম কবরেজি কাটলেট।' আমি জানালাম।

'বেশ। তাহলে সবার জন্যেই সব আসুক।' সবাই মিলে বললুম তখন। —'সবাই খাক সবরকম।'

এসে গেল—চারখানা মোগলাই পরোটা। চারটে কবরেজি কাটলেট। চারখানা মাটনচপ গ্রেভি বেশ চর্বিওয়ালা। চার প্লেট চিকেনকারি।

বিল হলো আঠারো টাকা আশি পয়সার।

অশোক ওদের বড়ো, তাকেই সম্বোধন করলাম—'অশোক, বৎস, দিয়ে দাও টাকাটা এবার।'

'আমি তো টাকা আনিনি মামা।' বলল সে: 'আমার কাছে নগদ আঠেরো পয়সা আছে কেবল। বাড়ি ফেরার ভাড়াটাই। এখান থেকে বরানগর বাসে যেতে আঠেরো পয়সাই লাতে তো।'

রথীন বললে—'আমার আট পয়সা সম্বল। এখান থেকে সোজা বাগবাজারে গিয়ে নামব—সেকেন ক্লাসের ট্রামে। সেখান থেকে মদনমোহনতলা হেঁটে মেরে দেব।'

সত্যেন কিছুই বলল না। সে সবচেয়ে ছোট, এসব অর্থনৈতিক ব্যাপারে তার কোন দায়িত্ব আছে বলে মনেই করল না সে।

'তোমার কাছে টাকা নেই মামা?' শুধালো অশোক।

'কোথায় টাকা।' আমি দু পকেট উলটে দেখিয়ে দিলাম—'একটা নয়া পয়সাও নেই কোথাও।'

'সে কি! টাকা পয়সা না নিয়ে তুমি রাস্তায় বেরোও?' রথীন তো অবাক: 'কলকাতার রাস্তায় পকেটে কিছু না নিয়ে কক্ষনো বেরুবি না;

আমাদের পই পই করে বলো যে তুমি ? কখন কী হয়, কোথায় কোন বিপদে পড়িস—অন্তত একটা টাকাও সঙ্গে রাখবি ! বলো না আমাদের ?'

'বলি তো বলেছি তো। কিন্তু বেরুবার সময় মনেই হয়নি যে সঙ্গে বেরিয়ে বিপদে পড়ব। তাছাড়া, তোরা বললি যে পুজোয় তোরা মামাদের কাছ থেকে মামীদের কাছ থেকে, দিদিমাদের কাছ থেকে কত কী পেয়েছিস। খাওয়াবি বলে তো ধরে আনলি এখানে আমায়।'

'আমরা তোমায় খাওয়াবো ! তুমি বলো কি মামা ?' বলল অশোক।—'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি !'

'মামা ভাগনেকে খাওয়ায়, না, –ভাগনে মামাকে খাওয়ায় ?' প্রশ্ন তুলল রথীন !

সত্যেন কিছুই বলল না, সে শুধু হাঁ করে রইল। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে বোধ হয়।

আমি বললাম 'কেন, ভাগনে হয়ে মামাকে খাওয়ালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় ?' তার কোনো জবাব না দিয়ে অশোক বলল –'আমরা এখানে বসে রইলাম ততক্ষণ। তুমি বাড়ি গিয়ে টাকাটা নিয়ে এসোগে চটপট।'

'বাড়িতেও ফাঁকা। এই পকেটের মত গড়ের মাঠ সেখানেও—' ক্ষুণ্ণকণ্ঠে জানালাম।

'পুজোয় এত এত লিখলে, টাকাগুলো কী করলে মামা ?'

'এত এত করে কী লিখলাম ! দু পাঁচটা তো লিখেছি মাত্র। ছাপাতে দিয়েছি কাগজে। ছাপে যদি—ছাপাবার পর দু'পাঁচটা টাকা দেয় যদি দয়া করে।' বলতে হলো আমায়।

ভাগনেরা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। বলে যে 'তোমার যদি টাকা নেই তো এমন সিল্কের জামা তুমি ওড়াও কি করে শুনি ?'

আমি বলি, 'এই একটাই তো জামা, আমার একমাত্র লাক্সারি।'

'কেবল একটা জামায় চলে যায় তোমার ?'

'হপ্তায় একবার করে কেচে নিই যে বাড়িতে—লাক্স দিয়ে। বললাম না, আমার একমাত্র লাক্সারি।'

'ও মা !' বিস্ময়ে বলে উঠল সত্যেন। লাকসারির নতুন ব্যাখ্যা শুনেই বোধ করি।

'ওমা কীরে ! বল্ ও মামা।' অশোক বলেঃ 'মামা যে মার ডবোল তা জানিসনে মুখ্যু ? মামাকে আধখানা করছিস, মাথা খাচ্ছিস মামার অপমান হচ্ছে না ?'

'অতো ঝামেলা কিসের ?' বলল রথীনঃ 'থানায় জমা করে দিতে বলো আমাদের। তোমায় সমেত।'

'থানায় !' শুনে আমি আঁতকে উঠলাম।—'বলতে হবে না, এমনিতেই না দিতে পারলে পাহারোলা ডেকে ধরিয়ে দেবে এখন।'

না, থানার ত্রিসীমানায় যেতে আমার সাতপুরুষের মানা। পুলিশকে আমাদের ভারী ভয়। শুনেছি থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে খালি ওঠবোস করায়। একজন বেতো রোগীর বাত সেরে গেছল নাকি হাজারবার খালি ওঠবোস করেই। আমার তো বাত নেই সারবে কি! পক্ষাঘাত হয়ে যাবে নির্ঘাত!

সত্যি বলতে, আমার যা বাত তা শুধু মুখের। ওই ডন বৈঠকের পরে আমার মুখ থেকে কোনো বাত সরবে না আর নিশ্চয়।

'বলছিলাম কেন,' বাতলালো রথীন, 'আমার বাবা তো পুলিস অফিসার। থানার থেকে ফোন করে দেব আমি বাবাকে। বাবা এসে বিনে পয়সায় ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।'

ও সব কথায় কান না দিয়ে সোজা আমি কাউণ্টারে চলে গেলাম। অসুবিধার কথাটা বললাম ভদ্রলোককে।

'তাতে কী হয়েছে!' বললেন তিনি: 'আমরা তো চিনি আপনাকে। লিখে রেখে দিচ্ছি পরে আপনার সুবিধে মতন দিয়ে যাবেন এক সময়।'

আমি ললাম 'বেশ বেশ' বেশ খুশি খুশি হয়েই বললাম। লেখাপড়ার ব্যাপারে আমার উৎসাহ সব সময়েই।

'চকটা নিয়ে আয় তো রে।' হাঁক পাড়লেন তিনি।—'চকরবরতির ধারটা লিখে রাখি।' বলেই তিনি লিখতে উঠলেন—

'শিবরাম, না শিব্রাম—কী বানান লেখেন আপনি?'

'ওকি। দেওয়ালের গায়ে লিখছেন যে? খাতায় লিখে রাখবেন তো!'

'খাতায় কোথায় লিখবো! সেখানে তো সব পেড্ হিসেব, ক্যাশমেমোর ব্যাপার! ধারবাকির কথা দেওয়ালেই লেখা হয় কিনা!'

'কিন্তু দেয়ালে এভাবে লিখলে তো নজরে পড়বে সবার। এখানে যারা আসে সকলেই দেখবে।' আপত্তি করলাম আমি: 'এখানে বইপটিতে অনেকেই আমায় চেনে যে।'

'তা তো জানি। সেই জন্যেই তো পেরেকের তলায় লিখছি। দেখছেন না?'

'তা তো দেখছি।' দেখে আমি অবাক হলাম—লোকটার বুদ্ধি দেখে। পেরেকের তলায় লিখলে দেখা যায় না বুঝি? একটা সামান্য পেরেকে আর কতখানি আড়াল করে? পেরেকটা দেয়াল থেকে তুলে ওর মাথায় ঠুকে দিলে হয়ত ওর বুদ্ধির কিছুটা খোলতাই হতে পারত।

'কিন্তু পেরেকের তলায় লিখলে কি কেউ দেখতে পাবে না—আপনি বলছেন?'

'কি করে পাবে? পেরেকে আপনার সিল্কের শার্টটা লটকানো থাকবে

না? আপনার জামা দিয়েই তো ঢাকা থাকবে লেখাটা।' তিনি জানালেন।

'য়্যাঁ? গায়ের জামাটাও কেড়ে নেবেন নাকি?'

'না, কাড়তে যাবো কেন! নেবই বা কিসের জন্যে? ওটা জমা থাকবে এখানে। আপনি টাকাটা চুকিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবেন আবার।'

ভাগনেরা ভাগ নেয়, সব কিছুতেই ভাগ বসায় জানি। কিন্তু তিন তিনটে ভাগনে এক সঙ্গে যোগ দিলে তার ত্র্যহস্পর্শে কী হয়, জানলাম এতদিনে।

তারপর?...

তারপর আর কি! গায়ের জামা খালাস করে খালি নিজের লাশটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হলো।

জামাই সেজে ঢুকেছিলাম, খালাসী হয়ে বেরুলাম।

ভাগনে যদি ভাগ্যে থাকে।...

গ্যাস মিত্রের গ্যাস দেওয়া

খুব ভোরে ওঠার একটা উপকারিতা আছে, হাইজীনের বইয়ে পড়েছিলাম। সেই থেকে আমার ভোরে ওঠার বদভ্যাস।

তখন বাড়ির সবাই ঘুমন্ত। কাক চিল পর্যন্ত নিঃসাড়। একবার বাথরুমে যাই, একবার বারান্দায় দাঁড়াই। শুকতারার সঙ্গে মুখোমুখি হয়। বাড়ির কেউ আমার আগে ভোরে আর উঠতে পারে না।

হ্যাঁ, খুব ভোরে আমি উঠি। উঠেই একটু ঘুমিয়ে নিই আবার।

তারপর, প্রাতর্নিদ্রাটা সেরে উঠতে আটটা বেজে যায়। বাজবেই তো, না ওঠা খুব সহজসাধ্য নয়। প্রথমে তো ময়লা ফেলা গাড়িগুলোর ঘড়রঘড়র, তারপর রামবতার সিং-এর রামভজন, তারপরেই বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ, পাড়ার যত উজবুক ছোঁড়াদের চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রিডিং পড়া—এই সব শুরু হয়ে যায়, এর মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে আরামে একটু গড়াগড়ি দেব তার জো কি!

সটান চলে এলুম মেজমামার বাড়ি। সেই জন্যেই।

কিন্তু এখানে এসে আরেক উৎপাত! না, ভোরে ওঠার অভ্যাস ঠিকই বজায় আছে আমার, কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করেনি। তবে—

মামার বাড়ি কয়লা—উনুনের কারবার। আর, খুব ভোরেই উনুনে আঁচ দেওয়া তাদের এক ব্যায়রাম। রান্নাঘর আবার একতলায়। কাজেই আগুন দেয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই, একতলা, দোতলা, তেতলা ভেদ করে বাড়ির চিলেকোঠা পর্যন্ত ধোঁয়ায় ছাপিয়ে ওঠে। চারধার ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার হয়ে যায়।

কোনো ঘর বাকি থাকে না। দরজা ভালো করে ভেজিয়ে, হুড়কো লাগিয়ে, কিছুতেই নিস্তার নেই। ধোঁয়া কোনো ফাঁকে ঢুকবেই। আর সে কী ধোঁয়া রে! চোখে কানে দেখতে দেয় না, দম বন্ধ হবার যোগাড়। বাপ্‌স্‌!

সকাল সন্ধ্যায় রোজ এই উপদ্রব! সন্ধ্যায় ধোঁয়া খাওয়ার চেয়ে হাওয়া খাওয়াটাই আমি বেশি পছন্দ করতাম, কাজেই বাইরে বেরিয়ে পড়তে কোনদিন দ্বিধা করিনি। কিন্তু সকাল বেলার দিকটায়—!

বিছানা আঁকড়ে কদিন তো থাকলাম খুব। কিন্তু নাঃ, আর পারা যায় না পরাজয় স্বীকার করতেই হলো। তারপর থেকে, ভোরে ওঠার পরই ধূম্রলোচনের প্রাদুর্ভাব হতে না হতেই, তীরবেগে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। পাশবালিশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই!

দিনকত মুখ বুজে প্রাতর্ভ্রমণই করলাম। কিন্তু কাঁহাতক আর পারা যায়? হলোই বা ভোরের হাওয়া! একদিন মেজমামাকে মুখ ফুটে বলেই ফেলি—'জানেন কয়লার উনুন ভারী অস্বাস্থ্যকর। সেদিন এক বইয়ে পড়ছিলাম—'

'কেন? হজম হয় না বুঝি?'

'না, হজম নয়, ভারী ধোঁয়া হয় কিনা।'

'আমি তো জানতাম হাওয়া হয় কারু কারু পেটে! পেট থেকে আবার ধোঁয়া বেরয় শুনিনি তো!' মেজমামা অবাক হয়ে যান—'কোন বইয়ে লিখেছে একথা?'

'কোন বই?' আমি আমতা আমতা করি—'বইটা হচ্ছে হাইজীন! আমাদের ইস্কুলের বই।'

'বইয়ে লিখেছে এমন কথা! আশ্চর্য!'

'পেটে ধোঁয়ার কথা লেখেনি কিছু। পেটে কখনো আগুন জ্বললেও ধোঁয়া বেরোয় না বলেই আমার ধারণা। কয়লার উনুনের ধোঁয়ার কথাই হচ্ছিল।'

'আমি তো জানতাম কাঠের উনুনের ধোঁয়া হয়ে থাকে।' মামা বললেন।

'কাঠের উনুনে হয় হরদম ধোঁয়া আর কয়লার উনুনে বেদম ধোঁয়া। অবশ্যি প্রথম দিকটাতেই কেবল। কিন্তু তাতেই যা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তা আর পূরণ হবার নয়। বইয়ের দরকার কি, চোখেই দেখতে পাওয়া যায়।'

এতগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলে যাই! মেজমামা একটু কাবু হন যেন।

'কেন, দেখতে পান না?' আমি বলেই চলি। 'কড়িকাঠগুলোর পর্যন্ত কি অবস্থা হয়েছে। দেয়ালের চেহারার দিকে তো আর তাকানো যায় না। কালিঝুলিতে একাক্কার! বাড়িগুলোর তো হাড় কালি হয়ে গেল। দেরাজ টেবিল আয়না আলমারির হাল দেখলে কান্না পায়। আর কাপড়-চোপড়গুলো তো দুদিন না যেতে যেতেই কালি মেরে যাচ্ছে। কোনো দিকেই চোখ ফেরানোর উপায় নেই—এসব কেন, কি জন্য?'

'ওই কয়লার উনুন!' মেজমামাই ঘাড় নেড়ে কথাটাকে সমাপ্ত করেন।

'এসব তো বাইরের দশা—কিন্তু ভেতরের? ভেতরের কথাটা কি ভেবেচেন একবার?'

'না, ভাবিনি তো।' মামার জিজ্ঞাসা: 'কিসের ভেতরের?'

'আমাদের ভেতরের। আমাদের নিজেদের ভেতরের। বাইরের দেয়ালে যেমন ঝুলকালি দেখচেন, তেমনি আমাদের হার্টের লাংসের ভেতরেও অমনি কালিঝুলি পড়ে যাচ্ছে। ধোঁয়ার অত্যাচারে। এই কথাই হাইজীন লিখেছে।'

এইবার মেজমামা সত্যিসত্যিই ভারী কাহিল হয়ে পড়েন—'অ্যাঁ? বলিস কি? এই সব কথা লিখেছে হাইজীনে? তা লিখবেই বা না কেন? এ তো কিছু আশ্চর্য কথা নয়। বাইরেও যেমন ভেতরেও তেমনি—কালিঝুল পড়তে বাধ্য।'

ঘাড় হেঁট করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন। 'যাক, একটা উপায় হয়েছে। এর প্রতিকার বের করা গেছে।'

আমি মাতুলের দিকে তাকাই।

'কাল সকালেই মিস্ত্রী ডাকিয়ে বাড়িঘরে চুনকামের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তাহলেই আর কালিঝুলি থাকবে না। সব পরিষ্কার।'

'সে তো বাইরের করলেন, কিন্তু ভেতরের?'

'ভেতরের? মেজমামা আবার ভাবিত হয়ে পড়েন, 'ভেতরের কি করা যাবে বল তো? ভেতরে তো চুনকাম করা যায় না। তাহলে? তুই কি বলিস তবে চুনের জল খেতে? না, সেই লাইমজুস যেটা তোর মামী চুলে দ্যায়?'

'আমি কি তাই বলেছি?'

'আহা, তুই কেন বলবি? তোর হাইজীন কী বলে?' মেজমামা উৎসুক ভাবে আমার উপদেশের প্রতীক্ষা করেন।

'লাইমজুস খাবার, অত কাণ্ড করবার কি দরকার মামা, তার চেয়ে এক কাজ করলেই তো হয়। আমাদের বাড়ির মতো গ্যাসের ব্যবস্থা করলেই তো পারেন?'

'গ্যাস?' মেজমামার চোখ জ্বলে ওঠে: 'ঠিক বলেছিস! আঃ, এতদিন মাথাতেই আসেনি এই কথাটা! তাইতো! তাই করলেই তো সব হাঙ্গামা চুকে যায়! ঠিক বলেছিস। মানে, তুই না, তুই আর কি বলবি—তোর হাইজীনের কথাই ঠিক!'

মেজমামা তৎক্ষণাত গ্যাস কোম্পানিকে টেলিফোন করে দেন, বাড়িতে গ্যাসের কানেকশন দেবার জন্যে। আমিও পরদিন সকালের সুখস্বপ্ন দেখতে শুরু করি।

গ্যাসের আমদানির পর দিনকতক খুব সুখেই কাটল। গ্যাসের উনুনেই

সব রান্নাবান্না হয়—ধুমধাড়াক্কা একেবারে বন্ধ। তাছাড়া আরো কত রকমের সুবিধা। স্নানের ঘরে গরম জল পাওয়া যেতে লাগল। শীতও এসে পড়েছিল—ফুলকফির ডালনার সঙ্গে গরম জলের চান—এমন সুখকর স্নানাহারের যোগাযোগ কপালে খুব কমই লেখে।

কেরোসিনের হ্যারিকেন তুলে দিয়ে গ্যাসের বাতির বন্দোবস্ত হলো। প্রচুর ঠাণ্ডা আলোয় চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। আমরা সকলেই গ্যাসের দারুণ ভক্ত হয়ে পড়লাম। আমি তো বলেই ফেললাম—'হ্যারিকেনের আলোয় এতদিন কেবল কানা হতেই বাকি ছিল। কী খাসা আলো দেখছেন মামা? ইলেকট্রিক কোথায় লাগে?'

মেজমামা ঘাড় নাড়েন—'হুঁ। গ্যাস মানুষ নয় রে, দেবতা, আসল দেবতা। দ্বাপরে ছিলেন ব্যাসদেব আর কলিতে এই গ্যাসদেব।'

গ্যাসের মীটারটি মামার ভারি প্রিয়। দিনরাত তার দিকে মামার নজর। একটা স্পেশাল চাকরই বহাল করে দিয়েছেন, সে সদাসর্বদা ওটার তোয়াজ করছে। মীটারের একটু অযত্ন, ঝাড় পোঁছে ঈষৎ অবহেলা হয়েছে কি অমনি বেচারার জরিমানা হয়ে যাচ্ছে।

মামা বলেন, 'বুঝলি, ঐ মীটারটাই হচ্ছে গ্যাসের মালিক। ঐটিই আসল। ঐখান থেকেই গ্যাস তৈরি হচ্ছে কিনা—'

'উঁহু'—আমি প্রতিবাদ করতে যাই।

'আহা, তৈরি না-হোক, তৈরি যেখানে খুশি হোক না, এই মীটারই সেই গ্যাস আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে আসছে আমাদের বাড়ি। আর কি রকম ওর মাথা! কত কত গ্যাস খরচ হচ্ছে তার ঠিক ঠিক হিসাব রাখছে সেই সঙ্গে! কম কথা নয়!'

মাসকাবারে বিল এল। এমন কিছু নয়, কয়লা ও কেরোসিনে যা খরচ হোতো, তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশিই হয়তো। কিন্তু তেমনি আরামের দিকটাও তো বিবেচনা করবার। মামার ভয় ছিল কত টাকাই না জানি দিতে হবে, কিন্তু সামান্য কয়েকটা টাকা দেখে তিনি কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন প্রকাণ্ড একটা বোঝা তাঁর কাঁধ থেকে নেমে গেল। পিয়নের বিল চুকিয়ে, তাকে বকশিশ দিয়ে ফেললেন আনন্দের আতিশয্যে।

আমাকে একটা টাকা দিয়ে বললেন—'যা, বায়স্কোপ দেখগে যা। ভাগনেরা প্রায়ই হাঁদা হয়, তুই সে রকম না। তোর বুদ্ধিতেই—না, তোর আর বুদ্ধি কি! তোর হাইজীনের বুদ্ধিই বলতে হবে। তা সে যাই হোক, যারই বুদ্ধি হোক, গ্যাসের নিয়ে আসাটা মন্দ হয়নি।'

বায়স্কোপ থেকে ফিরে দেখি, মীটারের গলায় গোড়ের মালা ঝুলছে। জানা গেল ওটা ওর জয়মাল্য! জাগ্রত এই সাক্ষাৎ গ্যাসদেবের পুজো আর্চায় স্বয়ং মামারই এই কীর্তি!

মালাটা হস্তগত করব কি না ভাবছি, এমন সময়ে মামা নেমে এলেন ! যেন আমার আসার আগমনের অপেক্ষা করছিলেন।

'কি রকম মানিয়েছে দ্যাখ দিকি ! মালা পরে যেন হাসছে। ওর আমি আজ নতুন নামকরণ করেছি ! মীটার মানে তো মিত্র ? আর তোর প্রেমেন মিত্র হচ্ছে প্রেমেন মীটার, তাই আজ থেকে ওর নাম দিলাম গ্যাস মিত্র। তুই কি বলিস ?'

আমি কী বলব ? মামার কথায় সায় দিতেই হয় আমায়।

'হ্যাঁ, তাহলে ঠিকই হয়েছে ? কী বলিস ? বলতেই হবে। না বলে উপায় কি ?' মেজমামা আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করেন, 'এই ফুলের মালায় হাত দিসনে যেন। তোর জন্যে একটা ফুল আলাদা করে আমি রেখে এসেছি তোর টেবিলে।'

কদিন থেকে শীতটা একটু জোর পড়েছিল। মেজমামা আপিস থেকে ফিরে হঠাৎ গ্যাস মিত্রের গায় হাত দিয়ে দেখেন দারুণ ঠাণ্ডায় তিনি কনকন করছেন ! তৎক্ষণাত মিত্রবরের খাস খানসামার তলব হলো।

মামা তো বাড়ি মাথায় তুললেন—'হ্যাঁ, ও কিনা গ্যাস চালিয়ে আমাদের সকলকে গরমে রাখছে, আর ওরই এই দুর্দশা ? এই প্রচণ্ড শীতে বেচারা একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। হ্যাঁ ?'

খুব করে মাসাজ করা হলো। খানসামা, আমি এবং মামা তিনজনে মিলেই হাত চালালাম। কিন্তু শৈত্য কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না ! মামা মীটারের গায়ে কান পেতে শোনেন—'কোন আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না। চলছে কিনা কে জানে ! হায় হায়, এমন মিত্র আমাদের মারা পড়ল শেষটায়। কেবল তোদের অমনোযোগে।'

তারপর মামা মাথা ঘামাতে লাগলেন।

মামা মাথা ঘামালেই কিনারা হয়। কেমন করে যেন হয়ে যায়, আমি বরাবর দেখে আসছি। তিনি হুকুম করলেন – 'গরম জল কর। করে ঢাল ওর মাথায়।'

বালতি বালতি গরম জল মীটারের মাথায় পড়তে লাগল। অল্পক্ষণেই মিত্র মহাশয়ের দেহ তেতে উঠল। মামা তখন একটা পোকার নিয়ে, এক জায়গায় গর্তের মত ছিল, তারই ফুটো দিয়ে ভালো করে ভেতরটা খুঁচিয়ে দিলেন। তারপর আরেকটা ছ্যাঁদার উপলক্ষ্য নিয়ে একটা সিক চালালেন—চালিয়ে মীটারের ভেতরটা খুব কষে ঘুরিয়ে দিলেন, গায়ে যত বল ছিল সব দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যেই মিস্টার মিটারের পরিবর্তন দেখা গেল। আগেও তিনি চলতেন, কিন্তু তাঁর চালচলন ছিল কেমন নিঃশব্দ। এখন তার ভেতরের কলকব্জা বেশ সজোরে আর সশব্দে চলতে শুরু করেছে। আগে এমনটা ছিল না। মিত্র-দেহে নব জীবনের সঞ্চার দেখে মেজমামা খুব প্রীত হলেন। পুলকিত হয়ে ওপরে গেলেন।

মীটারের উৎসাহের লক্ষণ আমরা সকলেই লক্ষ্য করছি কদিন থেকে। তার ভেতরের যন্ত্রপাতি প্রবল উদ্যমে চলছে। বাড়ির সব জায়গা থেকেই মীটারের আওয়াজ শোনা যায়। মেজমামা ভারী খুশি। মিত্র মহাশয়ের ব্যায়রাম তিনিই চিকিৎসা করে আরাম করেছেন!

মাসকাবারে যথারীতি গ্যাসের বিল এল! গ্যাসের বিল দেখে তো মামার চক্ষুস্থির! আমাদেরও চোখ ছানাবড়া হয়ে এল। মেজমামা নাকি এই মাসে পনর লক্ষ ফিট গ্যাস পুড়িয়েছেন, এবং সেজন্য তাঁর কাছে গ্যাস কোম্পানির পাওনা হয়েছে দেড়লক্ষ টাকা। বিলের টাকাটা অবিলম্বে দিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে।

মেজমামার মাথার চুল সব খাড়া হয়ে উঠল। এবং তাঁর মাথার চুল নামার আগেই মেজমামী ফিট হয়ে পড়লেন। পনের লক্ষ ফিটের পর আরেক ফিট বাড়ল। মানসাঙ্ক কষে আমি হিসাব করলাম।

'হ্যাঁ? দেড়লক্ষ টাকা!' বলতে বলতে মেজমামা বেরিয়ে পড়লেন। সোজা গ্যাস কোম্পানির আপিসের উদ্দেশ্যে। এই প্রথম তিনি বেরুবার মুখে, মিত্রবরের প্রতি দৃকপাত করতে ভুলে গেলেন। গ্যাসদেবকে তিনি নমস্কার করে বেরুতেন রোজ।

গিয়ে কেরানীদের এক দলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মাসে কত গ্যাস তোমরা তৈরি করেচ?'

'ঠিক বলতে পারব না, তবে দশলক্ষ ফিট এই রকম আন্দাজ।'

'কিন্তু আমার বিলে দেখছি যা তৈরি করেছ, তার চেয়েও পাঁচলক্ষ ফিট বেশি চার্জ করেছ তোমরা। ভুলটা শোধরানো দরকার।'

'কই, বিল দেখি। হুম মৃ-মৃ। ও ঠিকই আছে। মীটার দেখেই ওই বিল করা হয়েছে কিনা। মানে, ও হচ্ছে আপনারই মীটারের হিসাব।'

'তা বলে তো যা গ্যাস তৈরি হয়েছে তার বেশি আমি কখনও খরচ করতে পারি না?'

'তার আমরা কি করব? মীটারের হিসাব কখনও ভুল হতে পারে কি?' কেরানীটি সবিনয়ে জবাব দেয়। 'বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর তো আমরা কলম চালাতে পারি না মশাই। আমরা মীটারের ওপরই নির্ভর করি। মীটার যদি বলে আপনি ষাট লক্ষ ফিট গ্যাস পুড়িয়েছেন তবে আপনি তাই পুড়িয়েছেন নিশ্চয়! এমন কি যদি সে মাসে আমাদের এক ফিট গ্যাসও না তৈরি হয় তবুও।'

মেজমামা বলেন—'বেশ আমিও সোজা পাত্র নই। আমারও নাম অবিনাশ মীটার। যা ন্যায্য পাওনা তোমাদের আমি দেব, তার বেশি কানা কড়িও না। হ্যাঁ, বাড়তির জন্যে আমি এক পয়সাও দেব না। তবে দশ লক্ষ ফিট, যা আমার পক্ষে খরচা করা সম্ভব, তার জন্যে একলক্ষ টাকা দিতে আমি প্রস্তুত

আছি। আমার বাড়ি ঘর বেচে ফতুর হয়েও আমি তা দেব—কিন্তু ঐ বাড়তি পঞ্চাশ হাজারের জন্যে এক পয়সাও না।'

কেরানী বললে—'পুরো বিলই আপনাকে চোকাতে হবে, তা না-হলে আমরা গ্যাস বন্ধ করে দেব।

'বেশ, তাই দাও তাহলে'। বলে মেজমামা রেগে বাড়ি চলে এলেন!

ইতিমধ্যে মিত্র মহাশয়, মেজমামা এসেই লক্ষ্য করে দেখেন, বিল হওয়ার পর থেকে আরো দশলক্ষ ফিটের হিসেব তৈরি করে রেখেছেন এবং প্রতিমুহূর্তেই ফিটের পর ফিট বেড়েই চলেছে। যে রকম মিনিটে মিনিটে হাজার হাজার টাকার অঙ্ক বাড়ছে তাতে আর কিছুদিন চললে গ্যাস কোম্পানির কাছে তাঁর দেনা গত মহাযুদ্ধের সম্মিলিত শক্তিরা সবাই মিলে আমেরিকার কাছে যা ঋণ করেছিল তার সীমা ছাড়িয়ে যাবে বলে তাঁর আশঙ্কা হতে লাগল।

মেজমামার মেজাজ গেল ক্ষেপে। তিনি এক লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এসে, বলা নেই কওয়া নেই, দুদ্দাড় করে মীটারটাকে পিটতে শুরু করে দিলেন। যতক্ষণ ঐ পদার্থ নিতান্ত অপদার্থে পরিণত না হলো ততক্ষণ ওকে রেহাই দিলেন না। তারপরে ঐ জড়পিণ্ড, ভূতপূর্ব গ্যাস মিত্রের খাস খানসামাকে দিয়েই বাড়ির থেকে বিদেয় করে বহুদূরে, রাস্তার চৌমাথার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। তারপরে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

পরের দিন থেকে আবার সেই ধূম্রলোচনের প্রাদুর্ভাব!

ডিটেকটিভ শ্রীভর্তৃহরি
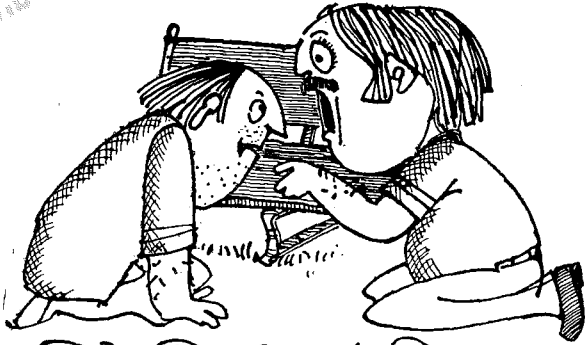
ডিটেকটিভ শ্রীভর্তৃহরি সেদিন বিকেলে সবেমাত্র কলেজ স্কোয়ারের একটি বেঞ্চে এসে বসেছেন···

জীবন ? জীবন যা ভাবা যায় তা নয়, তার চেয়ে ঢের কঠিন, জটিল, রহস্যময়। কিন্তু এহেন অনুভূতি ভর্তৃহরির জীবনে এই প্রথম···এই সদ্যোজাত রহস্য অতিশয় সম্প্রতি তাঁর অভিজ্ঞতায় এসে আলোড়ন তুলেছে।

ডিটেকটিভ ভর্তৃহরিবাবু এই মাত্র তাঁর মোটর গাড়িটি, মোড়ের পাহারাওলার নজরবন্দী রেখে গোলদিঘিতে এসে বসেছেন। সান্ধ্যবায়ু সেবনের সদভিপ্রায়ে।

এই সময়টায় এইখানে এসে বসতে তাঁর বেশ লাগে। কাজকর্মের ফাঁকে ফোকরে অবকাশ পেলেই প্রায়ই তিনি এখানে এসে বসেন। দিঘির পশ্চিম দিকে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে ট্রাম বাস অমনিবাস ট্যাক্সি মোটর অবিশ্রাম ছুটোছুটি করে—কত রকমের বিচিত্র যান অবিরাম চলেছে—আর কি জনস্রোত ! আর এধারে, দিঘির এক কোণে, একটা বেঞ্চে অম্লানবদনে বসে শ্রীযুক্ত ভর্তৃহরি। ছুটবার কিছুমাত্র প্রয়োজন, বিশ্বের কোনো দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে নেই এখন। আপাতত—অন্তত, এই মুহূর্তে তো নেই। ···কথাটা ভাবতেই কী আরাম !

এই সময়টায় ভর্তৃহরিবাবুর ছুটি !

সেই বেঞ্চে, তাঁর পাশে, আধময়লা জামা-কাপড়ে একজন ভদ্রলোক, একটু বয়স্কই, কোনো দিকে কিছু মনোযোগ না দিয়ে কী যেন ভাবছিল।

আপন মনে কী ভাবছে লোকটা ? কোন মতলব ভাঁজছে ? কোনো চুরি

ডাকাতি কিম্বা—কারুকে খুন করার মারপ্যাঁচ? কিম্বা তার চেয়ে ছোটখাট কিছু—কারো পকেট কাটার দুরভিসন্ধি?

ভর্তৃহরি তাঁর স্বভাবসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে দেন—পার্শ্ববর্তী লোকটির অন্তস্থল ভেদ করে চালাতে চান—কিন্তু পারেন না।

হয়ত বা পারতেন, তাঁর মর্মভেদী কটাক্ষে লোকটার মর্মভেদ করতে পারতেন হয়ত, অসম্ভব নয়, কিন্তু বয়স্ক লোকটি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে। ভাবতে ভাবতেই উঠে পড়ে হঠাৎ, এবং তেমনি ভাবিত ভাবে এক দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে জন-সমুদ্রে গিয়ে মিলিয়ে যায়!

ভর্তৃহরির ওকে নিয়ে যাও বা ভাবনা হয়েছিল, ওর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাও তিরোহিত হলো, আবার কেন তিনি ভাবতে যাবেন? অপরের বিষয়ে মাথা ঘামায় চোর আর ডিটেকটিভ, একথা মিথ্যে নয়, কিন্তু সেই পর যদি নিকটস্থ না হয়, যার-পর-নাই পর হয়ে চলে যায়, তাহলে তার সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক?

ভর্তৃহরি আরামের নিশ্বাস ফেলেন—উঃ! কোথাও যদি একটু স্বস্তি রয়েছে! ডিটেকটিভদের জন্যে যদি শান্তি থাকে কোথাও! সব জায়গাতেই বদলোকের ভিড়—প্রায় সব ব্যাপারেই চক্রান্ত—সমস্ত কিছুর সঙ্গেই গোলমাল বিজড়িত। একদণ্ড যে নিশ্চিন্তে কোথাও বসে একটু বিশ্রাম উপভোগ করবেন তার যো কি! ওই যে এই লোকটা, আধময়লা কাপড়চোপড়ে, বদখৎ, বিশ্রী ওই ব্যক্তিটি, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে গেল তার উনি আর কী করছেন? যেরকম ওর ধরণধারণ আর আকারপ্রকার, নিশ্চয়ই ও কারু বাড়ি সিঁধ কাটতে কিম্বা খুব কমে সমে, অপর কারু পকেট ছাঁটবার উদ্দেশ্যেই উঠে গেছে—পথে ঘাটে বেওয়ারিশ কারুকে পেলে ধরে খুন করতেই বা বাধা কোথায়? উনি তার কী করছেন? ওর উচিত ছিল ওর পেছনে পেছনে ফলো করা—তাহলেই হয়তো ফলোদয় হোতো, ফলেন পরিচীয়তে হয়ে সমস্তই পরিষ্কার হয়ে যেত! কিন্তু তিনি আর কী করবেন, কত করতে পারেন একলা? বিশ্বশুদ্ধ সবাই বদমাইস, আর তিনি একটি মাত্র সৎ ডিটেকটিভ—না, ঠিক একমাত্র না হলেও, অদ্বিতীয় তো বটেন! যথার্থ ভেবে দেখলে, তাঁর মতো ডিটেকটিভ আর কজনাই বা আছে? এই ধরাধামে আসামী ধরার ধান্দায়?

যাকগে, যেতে দাও। এই দুনিয়ার যাবতীয় অপকর্ম আটকানো তাঁর সাধ্য না। তিনি থাকতেও, পৃথিবীতে তাঁর অস্তিত্ব সত্ত্বেও, গোটাকতক খুন-খারাপি, তাঁর হাত ফসকে, এমন কি, তাঁর নজর এড়িয়েই ঘটে যাবে! চোখের ওপরেও ঘটতে পারে! ঘটতে দাও! ঘটুক! নইলে, দারোগারা ক'রে খাবে কি করে? দু পয়সা পাবে কি করে। না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে যাবে যে!

আধাবয়সী লোকটি উঠে যেতে না যেতেই, ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকুনি দিয়ে বেঞ্চি কাঁপিয়ে একজন তরুণবয়স্ক এসে সেই স্থান অধিকার করল—তার শূন্য স্থান

পূর্ণ করল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল ঃ 'ধুত্তোর !' ঝাঁকুনির তোড়ের মুখেই কথাটা বেরিয়ে এল তার।

ভর্তৃহরি সতর্ক হয়ে বসলেন। ওই বিরক্তিদ্যোতক আর্তধ্বনির মধ্যে পৃথিবীর সম্বন্ধে একটা অপ্রশংসাপত্র উদ্যত নেই কি? কেমন একটা সমালোচনার ভাব প্রচ্ছন্ন নেই কি ওর ভেতর? জগৎ সংসার যেন ওর সাথে সঠিক সদ্ব্যবহার করছে না—এই গোছের একটা কিছু বিজ্ঞাপন? পৃথিবীর আপামরের প্রতি এই বীতরাগ—বৈরাগ্যবান এই ধরনের লোকেরা তেমন সুবিধের হয় না, প্রায়শই দেখা যায়। ভর্তৃহরি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। তার অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ম দৃষ্টি যুবকটির অন্তঃস্থল—ওর এই আকস্মিক ভাবের অভিব্যক্তির মর্মভেদ করতে লাগল !

এ-ও কি, এই তরুণটিও কি তাহলে, এর অগ্রগামীর ন্যায়, এক নম্বরের—পাক্কা একটি—তাই না কি এ ?

কিম্বা এ বেচারী নিতান্তই গোবেচারী—অপরের, অন্য সব দুষ্ট লোকের চক্রান্তজালে বিজড়িত বিপর্যস্ত নাস্তানাবুদ এক হতভাগ্যই ? অসহায় অবস্থায়, একান্ত সৌভাগ্যবশে, তাঁরই সাহায্যের উপকূলে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এমনটাও তো হতে পারে। এমন হয় না কি ?

বলতে কি, পৃথিবীতে এই দুদলই তো রয়েছে। এক দল নিরুপায়। আরেক দলের অসদুপায়। আর এরা ছাড়াও, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় অন্য এক দল আছেন, যাঁরা এদের পায় পায় বাধা দিচ্ছেন। এদের মিলনের পথে যাঁরা মূর্তিমান অন্তরায় ! এদের উভয়ের মধ্যে ভালো করে সংমিশ্রণ হতে—খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ স্থাপিত হতে দিচ্ছেন না যাঁরা এঁরাই শ্রীভর্তৃহরি। এঁরা ডিটেকটিভ !

ভর্তৃহরির মনে হলো এমনও তো হতে পারে, এর আগের অবাঞ্ছনীয় লোকটি চক্রান্ত জাল বিস্তার করে—ছত্রাকারে ছড়িয়ে চলে গেছে, আর এই যুবকটি সেই-জালেই জড়িয়ে জড়ীভূত হয়ে বিপদের অথৈ থেকে ঘাই মেরে ঠেলে উঠলো এইমাত্তর ? অসম্ভব নয় !

এই পৃথিবীতে এবং এই গোলদিঘীতে কিছুই অসম্ভব নয়। কেবল দিঘির জলেই নয়, ঐ সলিলসীমার বাইরেও, মানুষের মধ্যে মৎস্য অবতারের—মাছের মতই বোকা জীবের কিছুমাত্র অভাব নেই।

তিনি একটু কৌতূহলী হলেন।

'তুমি কি কোনো অসুবিধায় পড়েচ বাপু ?' তিনি জিগ্যেস করলেন ঃ 'তোমার মেজাজ তেমন ভালো দেখছিনে যেন !'

'মেজাজের অপরাধ কী !' যুবকটি তাঁর দিকে ফিরে তাকালো ঃ 'আমি যা মুশকিলে পড়েছি মশাই, এমন অবস্থায় পড়লে আপনারও মেজাজ ঠিক থাকতো না। অনেক অগেই বিগড়ে যেত ! এমন বোকামি

করেছি—উঃ! বোকামি করে মানুষ এমন বিপদেও পড়ে!'—বলতে বলতে যুবকটি হঠাৎ চেপে গেল।

'বটে?' ভর্তৃহরি ওকে উৎসাহ দিয়ে উস্কে দিতে চাইলেন: 'বল দেখি কী হয়েছে? কিরকম মুশকিলটা শুনি?'

'বলবো কি মশাই, আজ বিকালে—এই একটু আগে এসে নেমেছি কলকাতায়। চেনা এক বন্ধুর বাড়িতে উঠব এই স্থির। বছর দুই আগে আরেকবার যখন এসেছিলাম তাদের বাড়িতেই ছিলাম। এখন সেখানে গিয়ে দেখি, কোথায় সেই বাড়ি, কোথায় কি! বন্ধুর পাত্তা নেই!'

'বলো কিহে? খুনটুন করে ফেরার নাকি তোমার সেই বন্ধুটি?' ভর্তৃহরির বিস্ময় আরো বাড়ে: 'কিন্তু বাড়িও নেই? বাড়ি পর্যন্ত লোপাটি?' বাড়ির পলায়ন ভর্তৃহরির কাছে ভালো লাগলো না। একটু বাড়াবাড়ি বলেই বোধ হল যেন। বাড়ির পালাবার কী প্রয়োজন ছিল?

'না, না, বাড়ি ঠিকই আছে বাড়ি কোথাও যায়নি? যেতে পারে না।' যুবকটির মতো অতদূর নাস্তিক তিনি নন: 'তুমি ভালো করে খুঁজে দেখেছ?'

'খুঁজতে কি আর বাকি রেখেছি মশাই? যদ্দূর খুঁজবার তার কসুর করিনি।' যুবকটি জানায়: 'কিন্তু খুঁজে আর কী হবে? সেখানে সিনেমা হাউস খাড়া হচ্ছে, নিজের চোখেই দেখে এলাম।...আপনি কি এর পরেও খুঁজতে বলেন?' যুবকটি জানতে চায়।

'হ্যাঁ, এরকম প্রায় হয়ে থাকে বটে।' ভর্তৃহরি এতক্ষনে আন্দাজ পান: 'আজ যেখানে ডাইংক্লিনিং ছিল, কাল দেখবে সেখানে চায়ের দোকান। বেমালুম রেস্তরাঁ বনে' গেছে। তার কদিন পরে যাও, দেখতে পাবে, রাতারাতি রেস্তরাঁ বদলে হেয়ারকাটিং সেলুন! নাপিত খচ খচ করে কাঁচি চালাচ্ছে। চুল ছাঁটবার নামে রগ ঘেঁষে তোর পকেটের ওপরেই! আর কিছু না, এসব জোচ্চুরি ব্যাপার। অসাধু লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে বেজায়! আসল ব্যাংক মনে করে আজ যেখানে তোমার টাকা রাখলে, কাল দেখবে সেটা রিভার ব্যাংক! তোমার যথাসর্বস্বই জলে—তাঁরা দয়া করে লালবাতি জেবলে বসে আছেন! যে যা পাচ্ছে, যেখানে পারছে, যাকে পাচ্ছে, অপরের মেরে ধরে নিয়ে সটকে পড়ছে! লোক-ঠকানো ব্যবসা আর কি!'

'কিন্তু আমার বন্ধু বাড়িসমেত উধাও হয়ে আমাকে যা ঠকিয়েছে মশাই, তার কাছে এসব লাগে না। ট্যাকসি ড্রাইভার বলল তার জানা কোথায় একটা হোটেল আছে নাকি। তার জানা সেই হোটেলে আমাকে তুলে দিয়ে ভাড়া নিয়ে সে চলে গেছে। আর আমি করেছি কি, সেই হোটেলের একটা কামরায় আমার ব্যাগ বেডিং সুটকেস ইত্যাদি সব রেখে একটা টুথপেসট্ কেনবার জন্য বেরিয়েছি—তারপর, তারপর আর কী বলব? সেই হোটেল আর খুঁজে পাচ্ছিনে এখন!'

'হোটেলের নাম কি?' ভর্তৃহরি জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর গলার স্বরে কিঞ্চিত ক্ষুণ্ণতা। ট্যাক্সি ড্রাইভার নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে গেছে—জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট মারেনি জেনে তিনি অনেকটা হতাশ হয়েছেন! এখন হোটেল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এই! হোটেলহারা একটি যুবক মাত্র! তিনি বেশ একটু মর্মাহতই হলেন।

'তাই তো মনে পড়চে না মশাই, নাম মনে থাকলে তো হোতোই। তবে আর মুশকিল কোথায়?'

'এ আর মুশকিল কি? হোটেলটা এখান থেকে কদ্দুর? খুব কাছাকাছিই কি? এই গোলদিঘির আশেপাশে, হ্যারিসন রোড' মীর্জাপুর আর আমহার্স্ট স্ট্রীট-এর সবই হোটেলে ভর্তি! এইখানেই যত রাজ্যের হোটেল আর বোর্ডিং হাউস! আর, একটা তো হোটেল নয়! যাক, একটু ঘুরতে হবে, এই আর কি! বাড়িটা দেখলে চিনতে পারবে তো?'

'সেইখানেই তো গোল মশাই! কি রঙের কি ঢঙের কি রকমের ক'তলা বাড়ি— কিছুই ভালো করে দেখিনি! তাছাড়া, কাছ থেকে একটা টুথপেস্ট কিনে এক্ষুনি ফিরে আসব— ভালো করে চিনে রাখবার দরকারও মনে করিনি—'

'এখন দেখচ সব চিনেম্যান—কাউকেই চেনা যাচ্ছে না?' ভর্তৃহরি যুবকটির ভগ্নহৃদয় রসিকতার রস দিয়ে ভর্তি করতে চান: ' তারপর?'

'তারপর এ-দোকান সে-দোকান করতে করতে কখন রাস্তা গুলিয়ে ফেলেচি!'

'তাহলে তো সত্যিই গোল পাকিয়েছো হে! দস্তুরমত গোল!' অনুসন্ধানের সূত্র পেয়ে, এমন কি, দীর্ঘতর একখানা সূত্র পেয়েও, ভর্তৃহরির অনুসন্ধিৎসা জাগে না।

গোরু খোঁজা আর বাড়ি খোঁজায় কার আর উৎসাহ হয়? তার ওপরে, গোরুর জন্যে বাড়ি খুঁজতে হলেই তো হয়েছে!

'ভারী মুশকিল হয়েছে! বাড়িটা তো চিনে রাখিই নি, কোন রাস্তায় যে তাও জানিনে! অথচ আমার জিনিসপত্র সব—সেই হোটেলেই থেকে গেল। টাকা কড়ি যা কিছু!' যুবকটি হতাশা-মাখানো চোখে তাকায়: 'এখন কি যে করি?'

'কী আর করবে? এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে স্বস্থানে প্রস্থান করা—যেখান থেকে এসেছে সেইখানেই পত্রপাঠ ফিরে যাওয়া। নিজের বাড়ি পিটটান দেয়া ছাড়া আর উপায় কি? এছাড়া তো আর পথ দেখচিনে। অবিশ্যি, কাছাকাছি থানায় একটা খবর দিয়ে যেতে পারো। তারা যদি তোমার হোটেল আর জিনিসপত্রের পাত্তা পায় তো তখন তোমার দেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।' বলতে বলতে ভর্তৃহরির মুখ বক্র সন্দেহবাদে ভর্তি হয়ে ওঠে। পুলিসের কার্যকারিতার প্রতি তাঁদের—ডিটেকটিভদের আস্থা যে কত কম, কীদৃশ অগভীর, সেই কথাটাই যেন তাঁর বদনমণ্ডলের চক্ষরধার থেকে ভিড় করে বিকশিত হতে থাকে।

'তা না হয় গেলাম। পুলিসে খবর দিয়েই গেলাম নাহয়। চলে গেলাম রাত্রের ট্রেনে। কিন্তু—কিন্তু—' কী যেন একটা কথা, বার হবার আগে দাঁতের চৌকাঠে এসে হঠাৎ হোঁচট খায়ঃ 'কিন্তু বেয়ারিং পোসটে ফেরৎ যাওয়া যাবে নাতো ?'

'তা তো যাবেই না। তা আর কি করে যাবে ?' ভর্তৃহরি কথাটা গায়ে মাখেন না।

'না গেলেও যে হয় না তাও নয়। আপাতত অন্য কোনো একটা হোটেলে উঠে দুঃসংবাদ জানিয়ে বাড়িতে তার করে দিলেও হয়। বাড়ি থেকে টি এম ও-তে টাকা আনিয়ে নেয়া যায়। বাবা তো দেশের একজন জমিদার, টাকার তাঁর অভাব নেই, খবর পেলেই টাকা পাঠিয়ে দেবেন এক্ষুণি। কিন্তু—কিন্তু—' ছেলেটি আবার দ্বিধান্বিত হয়।

'কিন্তু আবার কি ? এক্ষুনি তাহলে খবর পাঠিয়ে দাও—' ভর্তৃহরির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাঃ 'তার করে পাঠাতেই বা বাধা কিসের ?'

'কিন্তু তার আগে একটা ঠিকানায় তো ওঠা চাই ? টাকা পেঁছবে কোথায় ? দেখে শুনে একটা হোটেলে ওঠা দরকার বোধহয়—আমার ঠিক ঠিকানা দিতে হবে না ?'

'হোটেলের আবার অভাব কি ?' প্রশ্নপত্র পাওয়ার সাথেই ভর্তৃহরির উত্তর পেশ।

'কিন্তু—কিন্তু হোটেলে উঠতে—টেলিগ্রাম করতে—' ছেলেটির কোথায় যেন আটকে যায়।

'পোষ্টাপিসটা কোন ধারে জানতে চাও ?' ভর্তৃহরির জিজ্ঞাস্য হয়।

'উঁহু—হোটেলে উঠতে···টেলিগ্রান করতে···টাকা লাগবে না কি ? এসবের জন্য টাকা লাগে বোধহয় ?' যুবকটি এবার কোনরকমে বাধা উৎরে সাদা কথায় আসেঃ 'আর—টাকা আমার কই ? আমার কাছে কিচ্ছু নেই।'

ভর্তৃহরি এই তথ্য বহুক্ষণ আগেই জেনেছেন। তাঁর কাছে এ সংবাদে কোমো নূতনত্ব ছিল না।

'আপনাকে—আপনি—আমাকে—' যুবকটি এত আপনা-আপনির মধ্যে থেকেও বলতে ইতস্তত করেঃ 'আপনাকে সদাশয় ভদ্রলোক বলেই আমার বোধ হচ্ছে। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন—যদি আমাকে সরল বিশ্বাস গোটা কয়েক টাকা আপনি—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমাকে আমি দিতাম যদি তোমার এই কাহিনীতে আমি আস্থা স্থাপন করতে পারতাম।' ভর্তৃহরি পরিষ্কার পলায় বলেনঃ 'মুশকিল হয়েছে কোথায় জানো ? হোটেল হারানোয় নয়—' রূঢ় অপ্রিয় সত্যটা বলবেন কি না ভর্তৃহরি মুহূর্তমাত্র ভাবেন। 'টুথপেসট কিমতে বেরুনোতেও না—'

'তাহলে ?'

'মুশকিল হয়েচে এই যে, সবই ঠিক, কিন্তু যে টুথপেস্টটা কিনেচ, সেইটাই কেবল দেখাতে পারছ না।'

ভর্তৃহরির বিচক্ষণের মত মৃদু মধুর হাস্য ঃ 'কাহিনীটি ফেঁদেছিলে মন্দ না -- প্রায় অপরাজেয় কথাশিল্পীদের মতই বানাতে পেরেছিলে। কিন্তু তোমার গল্পের ঐখানটাতেই গলদ থেকে গেছে! আসল জায়গাটাই কাঁচা রেখে দিয়েছো। আর সেই কারণেই ধরা পড়ে গিয়েছ! বুঝতে পারছি -'

সপ্রশংস আত্মাভিমানে ডিটেকটিভের সারা মুখ রঙিন বইয়ের মলাটের মত মুখর হয়ে ওঠে ঃ 'বুঝতে পারছি, এখনো ততটা পোক্ত হয়ে উঠতে পারোনি বালক।'

—দুই—

ভর্তৃহরির অভিযোগের সাথেই সাথেই ছেলেটি চমকে যায়, চট করে জামার পকেটে হাত পুরে দেয়...আর তার পরেই সে এক লাফে খাড়া হয়ে ওঠে!

'কোথায় হারালাম তাহলে?' যুবকটির সবিস্ময় কণ্ঠ!

'এক বিকেলের মধ্যে একটা হোটেল আর এক প্যাকেট টুথপেসট একসঙ্গে হারানো, পর পর হারিয়ে ফেলা—অনেকখানি অমনোযোগিতার কারসাজি বলে তোমার মনে হয় না কি?'

ভর্তৃহরি আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ছেলেটি শোনবার জন্য সবুর করে না। আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে, তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, ছটফট করতে করতে চলে যায়। ঘাড় উঁচু করেই চলে যায় সে। সন্দেহবাদী, বিরুদ্ধ-সমালোচক, পক্ষপাতদুষ্ট ভ্রান্ত জনমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করেই যেন চলে যায়!

'বেচারী'! ভর্তৃহরিবাবু ঈষৎ সানুকম্প হন! 'দেশ থেকে সদ্য ট্রেনে আসা টুথপেসট কিনতে বেরুনো, হোটেল হারিয়ে ফেলা সবই ঠিকঠাক করেছিল - গল্পটা বানিয়েওছে মন্দ না! বলতেও পেরেছে—গড়গড়িয়ে করে—মাঝে মাঝে থেমে—দরদভরা গলায় সবই প্রায় নিখুঁত - কেবল সামান্য ঐ একটুখানি ত্রুটির জন্যেই সমস্তটা ভেস্তে গেল! আগাগোড়া আলগা হয়ে বেফাঁস হয়ে গেল বিলকুল! আরো একটু বুদ্ধি খরচ করে আগে থেকে যদি, চকচকে মোড়কে মোড়া টুথপেসটের একটা প্যাকেট দোকানের ক্যাশমেমো সমেত নিজের পকেটে মজুদ রাখতে পারত—তাহলে, বলতে কি, ওকে আমি একটি উদীয়মান প্রতিভা বলেই আখ্যা দিতে পারতাম। ওর জন্যে আর ভাবনা ছিল না তাহলে! নিজের লাইনেই ও করে খেতে পারত!'

আস্তে আস্তে তিনি বেঞ্চি ছেড়ে ওঠেন—এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নজর পড়ে...বেঞ্চির তলায়, মোড়কে মোড়া—দীর্ঘাকৃতি—কী ওটা? একটা টুথপেসটই

তো বটে! দোকানের ক্যাশমেমোয় জড়ানো, সদ্যকেনা যে, তাতে কোনো ভুল নেই। বোঝা গেল, ছেলেটি যে সময়ে গা-ঝাঁকি দিয়ে ঝুপ করে বেঞ্চে এসে বসেছিল, ঠিক সেই সময়েই ওঠা ওর পাঞ্জাবির পকেট থেকে টপকে ধরাশায়ী হয়েছে।

ভর্তৃহরি অর্দ্ধস্ফুট একটু আর্তনাদ করেন। ওঁর আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়। মানুষকে ল-সা-গু-র আঁকের মতো যতোটা সোজা মনে করেছিলেন তত সোজা নয়-মানুষের জীবনও গোলকধাঁধার মত বেশ একটু জটিল বলেই তার বোধ হয়।

'নাঃ, ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে হলো। এই অজানা শহরে, অপরিচিত নির্বান্ধব জায়গায় নিরাশ্রয় হয়ে, অসহায় অবস্থায় কোথায় না জানি ঘুরে মরছে এখন!'

এধারে-ওধারে চারিধারে খুঁজতে খুঁজতে যখন প্রায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে তিনি উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে দেখতে পেলেন সেই ছেলেটিই জন-সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে টাল খেতে খেতে, ওধারের মোড় ঘুরে রাস্তা পেরিয়ে এধার-পানেই আসবার চেষ্টায় রয়েছে।

'ওহে, শোনো শোনো!'—সাইরেনের আওয়াজের মতো ভর্তৃহরির একখানা ডাক।

যুবকটি উদ্ধতভাবে ফিরে তাকালো।

'তোমার গল্পের প্রধান সাক্ষী এসে পৌঁছেচে!' এই বলে তিনি প্যাকেটে-আটক টুথপেসটটা হাত বাড়িয়ে দিলেন: 'এই নাও তোমার টুথপেসট! বেঞ্চির তলাতেই পড়েছিল। যখন তুমি ওখানে বসেছিলে তারই এক ফাঁকে ওটা হয়তো তোমার পকেট থেকে পড়ে গেছল। তোমার অজান্তেই—তুমি চলে আসবার পর, উঠতে গিয়েই নজরে পড়ল আমার। যাক, যাকগে যেতে দাও।··· তোমাকে অযথা সন্দেহ করেছি বলে কিছু মনে কোরোনা। এই নাও, এখন এই গোটা দশেক টাকা হলে যদি তোমার চলে—'

এই বলে, ভর্তৃহরি তাঁর পকেট হাতড়ে, নোটে টাকায় রেজকিতে এবং খুচরো খাচরায় মিলিয়ে যা ছিল সব ঝেড়েঝুড়ে ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন—,

'—যদি এখনকার মতো তোমার চলে যায়—আপাতত একটা হোটেল দেখে ওঠা আর বাড়িতে তার করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করো—এবং—এবং আমার ন্যায় অবিশ্বাসপ্রবণ ব্যক্তির কাছ থেকে টাকাটা নিতে—অবশ্যি ঋণ হিসাবেই নিতে—তোমার তেমন আপত্তি না থাকে—'

ছেলেটি তৎক্ষণাত হাত বাড়িয়ে টাকাটা পকেটস্থ করে তাঁর সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করে দেয়।

'—আর এই আমার কার্ড। এতে আমার ঠিকানা আছে।' ভর্তৃহরি বলে চলেন: 'এই সপ্তাহের মধ্যে, বা পরে যখন বাড়ি থেকে তোমার টাকা এসে

পেঁছবে, তার পরে সুবিধা মতো যে কোনো দিন এই টাকাটা ফিরিয়ে দিলেই চলবে। আমার ঠিকানায় এম-ও করে দিতেও পারো। আর এই নাও তোমার টুথপেসট। ভালো করে রাখো! আবার যেন কোথাও হারিও না! এই প্যাকেটটা তোমার বিশ্বস্ত বন্ধুর মতই কাজ করেছে। খাঁটী বন্ধুরা যেমন ছেড়ে চলে গেলেও -- দুঃসময়ে ঠিক ফিরে আসে। আসলে এরই কাছে—এর সদ্ব্যবহারের কাছেই তুমি ঋণী।'

'ভাগ্যিস, টুথপেসটটা আপনি পেয়েছিলেন!' এই বলে ছেলেটি তো তো করে কী দু-একটা কথা যেমন বলতে গেল - খুব সম্ভব, ধন্যবাদের ভাষাই হবে। এবং তার পরেই সে, যে ধার থেকে এসেছিল, রাস্তা উৎরে, ফের সেই দিকেই চোঁ চাঁ করে দৌড় মারলো।

'বেচারী!' ভতৃর্হরির মুখ থেকে বার হলো আবার—তরুণ যুবকটির উদ্দেশেই। 'ওপর ওপর দেখে আর কক্ষনো আমি কোনো মানুষের বিচার করব না। প্রায়ই ভারী ভুল হয় তাতে। উঃ, কী বিপদটাই না হোতো আজকে! আমার ঠিক না হলেও ছেলেটির তো বটেই! কী অসুবিধাতেই না পড়ত বেচারা! নাঃ, মহামতি শেকসপীয়ার যথার্থই বলেছিলেন—হোরশিয়াকে না কাকে লক্ষ্য করে যেন বলেছিলেন, কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিলেন। জীবন যে কী বিশ্রী রকমের জটিল, মানুষ যে কতদূর রহস্যময়!'

ভাবতে ভাবতে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। পায়চারি করতে করতে আবার তিনি পার্কের মধ্যে ফিরে আসেন। গোলদিঘিতে আরো দু-একটা চক্কর মেরে, গাড়ি ধরে এবার বাড়ি ফিরবেন। ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরপাক খাবার মুখে, সেই আগের বেঞ্চির কাছাকাছি আসতেই একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য তিনি দেখতে পান। এক ব্যক্তি অত্যন্ত আগ্রহভরে বেঞ্চির নীচে, আশে-পাশে, চারিধারে ভারী উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

দেখবামাত্রই লোকটিকে তিনি চিনতে পারেন। ছেলেটির বেঞ্চি অধিকারের আগে, এই লোকটিই, তাঁর পাশের স্থান দখল করে বসেছিল।

'আপনার কি কিছু হারিয়েছে নাকি?' ভতৃর্হরি জিজ্ঞেস করলেন। 'কী খুঁজচেন অমন করে?'

'হ্যাঁ, মশাই, এইমাত্র কেনা —' লোকটি আর্তকণ্ঠে জানায়ঃ 'একটা টুথপেসটের প্যাকেট!'

বলা বাহুল্য, সামলাতে ভতৃর্হরির বেশ একটু সময় লাগে।

মানুষ সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিও আস্থা আর ততটা সুদৃঢ় নেই, এমন কি, নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন থেকেই নতুন এক জীবন-দর্শন রচনায়,—কেবল রচনা কেন, মনের মধ্যে তার মুদ্রণে, পুনর্মুদ্রণে আর পুনঃ পুনঃ প্রুফ-সংশোধনে যে সময়ে তিনি মশগুল হয়ে আছেন, সেইকালে সে-সমস্ত সবকিছুর ভিত্তিমূল টলিয়ে দিতে এ আবার কি এক নতুন নিদর্শন?

আধাবয়সী লোকটি তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে দেয়ঃ 'টুথপেসটের জন্যে তত না, ওটা হারালে তেমন কিছু ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ওর মধ্যে—ওই প্যাকেটের ভেতরে, আমার মাইনের'—বলবে কিনা, বলে কী লাভ হবে ইত্যাদি ভেবে লোকটা নীরব হয়ে যায়।

'কখানা নোট ছিল ?' ভর্তৃহরি জিগ্যেস করেন।

'আটখানা দশ টাকার নোট, এ মাসের মাইনের প্রায় সবটাই। টুথপেসটা কিনে ভাবলুম যা পকেট মারা যায় আজকাল! নোটগুলো ওর প্যাকেটের মধ্যে পুরে রাখলে নিরাপদ হবে। এই মনে করে রেখে দিয়েছিলুম।'

'আপনার বুঝি পঁচাশী টাকা মাইনে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় ঠিক ধরেছেন। নিরানব্বই টাকার সামান্য কেরানী আমি। আঠারো টাকা ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম জমা দিয়ে একাশী টাকা মোট ছিল।' ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেনঃ 'কিন্তু আর একটি আধলাও আমার কাছে নেই। বাড়তি টাকাটা দিয়ে ছেলের জন্য টুথপেসট কিনেছিলাম।'

'হুঁ—।' ভর্তৃহরি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'দেখুন, আপনার টাকাটা খোয়া যাবার জন্যে আমিই দায়ী!' গলাটা ঝেড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করলেন ভর্তৃহরিঃ 'আচ্ছা, আপনি আমার বাড়ি চলুন। আমি ক্ষতিপূরণ করবো। আমি অবশ্যি একটু দূরেই থাকি, কলকাতার কাছাকাছিও বটে আবার বাইরেও বলা যায়—এই ডায়মণ্ডহারবার রোডে। তা, আমার মোটর রয়েছে, যাবার সময়ে আপনার অসুবিধা নেই। আর ফেরবার ট্যাক্সি ভাড়াটা আপনাকে আমি দিয়ে দেব।'

মজ্জমান লোকটি দেব দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে—দেবতা না হলেও একজন মহাপুরুষ তো বটেই এবং 'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন' সেই একমাত্র গন্তব্য পথ অনুসরণ করে বিনা বাক্যব্যয়ে তার মোটরে গিয়ে ওঠে।

ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে ভর্তৃহরির মোটর হু হু করে ছুটছে। শহর ছাড়িয়ে—শহরতলী পার হয়ে—একটানা পীচ ঢালা পথের বুকের ওপর দিয়ে। দুধারেই ফাঁকা—নির্জন রাস্তা এবং মাঝে মাঝে এক আধখানা বাড়ি। বাগান বাড়িই বেশির ভাগ।

ভর্তৃহরি বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর পাশে বসে—মুখ বুজে চুপটি করে—সেই আত্মহারা সর্বস্বান্ত ভদ্রলোক!

হঠাৎ ভর্তৃহরির কেমন একটা খটকা লাগে, কেমন যেন সংশয় জাগে, তিনি পার্শ্ববর্তীর দিকে একবার ভ্রূক্ষেপ করেন। তার পরেই কুটিল একটা কটাক্ষ বাঁ চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে আসে। লোকটাকে যেন কুটি কুটি করে কাটে সেই চাউনিটা।

এই টুথপেসট-হারা লোকটি সেই গৃহহারা যুবকটির মাসতুতো ভাই নয় তো ?

সন্দেহ হতেই তিনি নিজের বাঁ পকেটে হাত পুরে দেন—হুম! ঠিক! ঠিকই তো! অবিকল—যা ভেবেছেন!

তাঁর সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়!

অমনি ডান পকেট থেকে তাঁর রিভলভার বার হয়ে আসে।

(গোয়েন্দার পকেটে আর কিছু থাক বা না থাক, পিস্তল আর হাতকড়া প্রায় সব সময়েই মজুদ থাকে।)

লোকটিও অমনি একটিও কথা না বলে নিজের পকেট থেকে ঘড়ি চেন সব বার করে দেয় বিনাবাক্যব্যয়ে।

ভর্তৃহরি ঘড়ি চেন পকেটস্থ করতে করতে ভাবেন: 'হুঁ, যা ভেবেচি! পৃথিবী কি আর পালটায়? রাতারাতিই পালটায় নাকি? এতদিনের পৃথিবী একদিনে পালটাবার নয়। সব মানুষই প্রায় সেই রকমই রয়ে গেছে। আগের মতই দাগী। ···দেখি, হাত দেখি।···'

ডান পকেট থেকে হাতকড়ি মুক্ত করে পার্শ্ববর্তীর যুক্ত করে পরিয়ে দিতে তাঁর দেরি হয় না। তারপর, মোটর থামিয়ে, লোকটিকে পথের মাঝখানেই তিনি নামিয়ে দেন। পত্রপাঠ তৎক্ষণাত! দয়া করে পুলিশে আর দেন না, হাতকড়ি হাতে মরুকগে ব্যাটা ঘুরে ঘুরে! ঐভাবে করজোড়ে, অতখানি পথ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরাটাই কি ওর কম শাস্তি হবে?

তাছাড়া, তিনি ভেবে দেখেন, ঐ রকম একটা আসামীকে নিজের ল্যাজে বেঁধে সরকারী ঘাঁটিতে পাকড়ে নিয়ে যাওয়াটাই কি কম দুর্ভোগ হতো এখন? এবং তাছাড়া তাঁর মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার ট্যাঁক থেকেই চেন ঘড়ি খোয়া যায়, নিজের এত বড় বাহাদুরির পরিচয় থানা পুলিসে জানাবার তাঁর গরজ?

ভণ্ড কেরানীটিকে, নিজের সঙ্গে হাতাহাতি করবার সুযোগ সহ, বিপথে বিসর্জন দিয়ে, চিন্তাকুল চিত্তে তিনি গাড়ি হাঁকাতে থাকেন: অ্যাঁ, পৃথিবীর হলো কী? মানুষরা সবাই যদি দাগী হয় যায়, প্রায় সকলেই যদি চোর ছ্যাঁচোর বনে গিয়ে থাকে তাহলে তিনি একলা ভালো মানুষ হয়ে, একাকী সৎলোক কতো দিক আর সামলাবেন?

ভাবতে ভাবতে তিনি ঘাবড়ে যান।

অবশেষে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি ভাবেন, ভেবে দেখেন, যাক, তাঁর জানা-শোনার ভেতরে একজনও যে সাধুব্যক্তি তবু আছে, অসাধু-সংকুল ঘড়িচোরদের ধরিত্রীতে এখনো যে টিকে রয়ে গেছে,—তিনি নিজেই রয়েছেন!—এইটাই কি বড় কম কথা? কম বড় কথা কি? একথা ভাবতেও কতোখানি আরাম!

পৃথিবীর অষ্টম পরামাশ্চর্য, সেই একমাত্র অভিব্যক্তির সম্বন্ধে সগর্ব ধারণা নিয়ে, (আয়নার অভাবে তার দর্শনলাভের কোনো উপায় তখন ছিল না), গৌরবের জয়পতাকা বহন করে ভারাক্রান্ত মনে তিনি বাড়ি ফেরেন।

চৌকাঠের ওধারে পা না বাড়াতেই তার ছোট ছেলে সত্যহরি ছুটে এসেছে।

'বাবা, বাবা। তোমার চেনঘড়িটা আজ তুমি নিয়ে যাওনি যে? তুমি তো বলো তোমার কোনো কাজে কক্ষনো ভুল হয় না? তোমার নাকি দিব্য দৃষ্টি! ভগবানের মতই সব কিছু তুমি টের পাও? তবে আজ কেন এমন ভুলে গেলে? টেবিলের ওপরেই পড়ে রয়েছে, দ্যাখো গে! তখন থেকেই পড়ে আছে, না, না, তুমি ভয় খেয়ো না বাবা, আমার অনেকবার ইচ্ছা হয়েছিল বটে কিন্তু ওটাকে আমি মেরামত করিনি। ভালো ঘড়ি মেরামত করে কি হবে? ভালো ঘড়িকে তার কল কবজা খুলে অবিশ্যি আরো ভালো করে সারানো যায় কিন্তু ভালো ঘড়ি সারাতে গেলে তুমি রাগ করো যে! তুমি যে বলো ভালো ঘড়ি কখনো সারানো যায় না। শুধু একেবারে হারানো যায়। তাই ওর ঢাকনি টাকনি কোনো কিছু আমি খুলিনি, একটুও কিছু করিনি, তুমি বাজিয়ে দেখতে পারো।'

ভূতে বিশ্বাস করো ? কেউ যদি একথা আমায় জিগ্যেস করে, আমি বলবো —না, একদম না। সত্যিই, ওদের ওপরে একটুও আমার আস্থা নেই। একবার একটা ভূতের কথায় বিশ্বাস করে যা নাকাল হয়েছি আর যেরকম বিপদে পড়েছিলাম ! ইস, ভূতটা কী ঠকানটাই না ঠকিয়েছিলো আমায়।

সেদিন সিনেমায় সন্ধের টিকিট না পেয়ে বাড়ি ফিরে এলাম—ভারী মন নিয়ে। নিজের ডেক চেয়ারটিতে বসে বসে ভাবছি···নিজের ভূত-ভবিষ্যতের ভাবনা না– ভবিষ্যতে নিজের ভূত হবার কথাও নয়– ভাবছি ন'টার শোয়ে, নিজেকে শোয়ানোটা মুলতুবি রেখে সিনেমা দেখা কি উচিত হবে ? ভাবতে ভাবতে প্রায় সোয়া ছ'টা তখন– হঠাৎ খুট করে এক আওয়াজ !

চমকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, টেবিলের ওপরে আমার টুলের ওপর বসে একটি পাত্র। বেঁটে খাটো এক মানুষ !

আরে, এ কে ? এ আবার কে রে ? একে তো কখনো দেখিনি। এলোই বা কখন ? কি করে এলো ? খিল তো ভেতর থেকে লাগানো, ঘরে ঢুকলোই বা কেমন করে ?

আমার মনের কথা টের পেয়ে লোকটি নিজের থেকেই জবাব দিলো—'আমার নাম অনিমেষ। আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি তেমাথার মোড়ে আমাদের লাল বাড়িটার সামনে দিয়ে অনেকবার আপনাকে যেতে আমি দেখেছি—'

'তা হবে। কিন্তু মশাই, আপনি এখানে ঢুকলেন কখন—দেখতে পাইনি তো।'

'কেন, আপনার পিছু পিছুই এলাম যে।'

তাই হবে। ছোট্টোখাট্টো বলে নজরে পড়েনি। তাছাড়া, সিনেমার চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম, অন্য সিনের দিকে মন ছিল না। ঝাড়া দেড় ঘণ্টা লাইনে খাড়া থেকে টিকিট না পেলে যা হয়। চোখ কান বলে কিছু থাকে না – খুব চোখা লোকেরো। চোখে-কানে ঢোকে না কিছু।

'বসুন বসুন।' আমি বলি – যদিও বলাটা তখন বাহুল্যমাত্রই। আমার অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে ভদ্রলোক বেশ জুত করেই বসে ছিলেন! –'কি দরকার বলুন তো আমার কাছে?'

'আপনাকেই আমার দরকার—বিশেষ দরকার। ভয়ঙ্কর দরকার।' অনিমেষ বলে।

'অবাক করলেন!' আমি অনিমেষকে দেখি—'আপনাকে আমি কখনো দেখিনি—অথচ……' অনিমেষ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোককে।

'আপনি যদি একটা কাজ করেন, আমার বড়ডো উপকার হয়। তার বিনময়ে যদি প্রাণ দেওয়া সম্ভব হতো আমি দিতাম, কিন্তু তা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' বলে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। 'তবে প্রাণের চেয়ে দামী জিনিস আপনাকে আমি দিতে পারি। যাতে প্রাণ থাকে—যা না থাকলে প্রাণ থাকে না —যার অভাবে মানুষের প্রাণ যায়, সেই অমূল্য বস্তু দিতে পারি আপনাকে। টাকা। প্রচুর টাকা। যদি আপনি আমায় একটু সাহায্য করেন—'

আমি ডেক-চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম। আবার দেখলাম লোকটাকে – চুলের থেকে পায়ের গোড়ালি অব্দি ট্যাক্ ট্যাক্ করে। ওর ট্যাঁক অব্দি দেখতে চেষ্টা করলাম। (প্রচুর টাকার ট্যাঁক্‌শাল জীবনে কটা দেখা যায়?) তারপর বললাম—'তাহলে অবশ্যি আলাদা কথা। টাকার জন্য কী না করে লোকে? ডাকাতিও করে থাকে। এখন বলুন তো, আপনার কাজটা কী?'

'এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।' অনিমেষ আমাকে জানায় 'তেমাথার মোড়ের সেই লালবাড়িটা তো দেখেছেন? সেখানে আপনি যাবেন। তার তেতলায় আমার শোবার ঘর। সেই ঘরে ঢুকে, আলমারির মধ্যে একটা বইয়ের ভেতরে আমার উইল দেখতে পাবেন। সেই উইলখানা আপনাকে নষ্ট করতে হবে।'

'নষ্ট করতে হবে? আপনার উইল?…কিন্তু সে কাজ তো আপনি নিজেই করতে পারেন মশাই!'

'আমার হাতে আর তা নেই। মানে, কথাটা হচ্ছে, এ-ব্যাপারে আমার আর কোনো হাত নেই। সত্যি বলতে, হাতই নেই আমার।'

'হাত নেই! কেন, ঐ তো বেশ দুটো হাত রয়েছে—দিব্যি!'

'থেকেও না থাকার মধ্যে।' বলার সঙ্গে ওর গলা ভারী হয়, মুখ কেমন

ম্লান দেখায়—'আসল কথা হচ্ছে, আমি আর বেঁচে নেই। আদপেই আমি নেই কিনা! গত বেস্পতিবারে আমি মারা গেছি।'

শুনে তো আমার প্রায় মূর্ছা যাবার যোগাড়। কিন্তু ব্যাপারটায় টাকার গন্ধ ছিল বলে স্মেলিং সলটের কাজ করলো। কোনোরকমে নিজেকে সামলালাম। 'ও, মারা গেছেন বুঝি ?'

'আজ্ঞে, জলজ্যান্ত!' বলতেই জলের মত সব বোঝা গেল। উইলখানা কেন যে ওর হাতছাড়া, তাও বুঝলাম।

'মারা গেছি কি না তার প্রমাণ চান ? দেখতে চান আপনি ?' বলে অনিমেষ আমাকে দেখায়। বাতাসে ভর দিয়ে সড়াৎ করে সে উঠে যায় ওপরে। টুলের থেকে উড়ে কড়িকাঠেই গিয়ে ওঠে। জমিদার থেকে বর্গাদার হয়ে দাঁড়ায়!

আমার চোখও কড়িকাঠে ওঠে —'নামুন! করছেন কি! ভদ্রভাবে বসুন — ভালো হয়ে লক্ষ্মীটির মতন।' বলতে না বলতে ও ছাদের ভেতর দিয়ে গলে যায়। মাথাটা ওর গলিয়ে দেয় ওপারে—কাঁধের ওধারটা আর আমার চোখে পড়ে না। দৃষ্টির বাইরেই চলে গেছে বেবাক। খালি ধড়ের আধখানা এধারে ঝুলে থাকে। সে এক বিশ্রী দৃশ্য! যারপরনাই খারাপ। দেখে আবার আমার মূর্ছা যাবার মত হয়। আমি অস্ফুট আর্তনাদ করি। আমার আর্তস্বরে তারপরে সে এ-ধারে আসে। মাথা বার করে কড়িকাঠ ধরে ঝুলতে থাকে— ত্রিশঙ্কুর মতই ত্রিশূন্যে দাঁড়িয়ে থাকে - আমার শঙ্কা তিনগুণ বাড়িয়ে।

'নেমে আসুন - নেমে আসুন চট করে। অমন নহুঁসের প্রেতাত্মার মতন করবেন না। আমি বেহুঁস হয়ে পড়বো তাহলে।'

এমনিতেই ভূতে আমার বড্ডো ভয়। অবশ্যি, সত্যি বললে, শুধু ভূত হয়তো ততটা ভয়ের নয়, কিন্তু ওদের ভূতুড়ে কাণ্ডেই মানুষ ভয় খায়। এমনি তো কতোই না ভূত, জীবাণুর ন্যায়, আমাদের আশেপাশে ঘুরছে—কিন্তু কিলবিল করলেও তা জানা যায় না। কিন্তু তাদের কিল খেলে—কি অন্য কোনো ভাবে তাঁরা জানান দিলেই জান্ যায়। বড় বড় বীররাও ভিরমি খান তখন। ভূত হচ্ছে পুলিশের মতই। পাশ দিয়ে চলে গেলেও ভয় নেই, কোনোই পরোয়া করিনে, কিন্তু ওদের কার্যকলাপেই ডরাই।

কিন্তু ভূতেরা ঐ রকমই! সুযোগ পেলেই নিজের কেদানি দেখাবে। ছোটবেলায় একটা বইয়ে নহুঁসের প্রেতাত্মার কাহিনী পড়েছিলাম। সেই থেকেই আমার জানা যে প্রেতাত্মাদের কোন হুঁস থাকে না।

অনেক বলায় অনিমেষ ওর টুলে এসে বসে। বায়ুভূত নিরালম্ব দশা থেকে নেমে মাধ্যাকর্ষণে বশীভূত হয়। আমি হাঁপ ছাড়ি। আমার ঘাম ছাড়ে। কিন্তু আমার সন্দেহ ছাড়ে না। ভূতে আমার বিশ্বাস আছে, মানে, ওদের ভৌতিক অস্তিত্বেরই ; কিন্তু ওদের কথায় কি বিশ্বাস ? যে-হাতে ও উইল বাগাতে পারে না, সেই হাত দিয়ে ওর টাকা গলবে কি করে ?

আমার সংশয় ব্যক্ত করতে হয়।

'আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন।' কাতর হয়ে সে বলে—'যখন আমি কথা দিয়েছি তখন তার নড়চড় হবে না। ঐ আলমারির আরেক কোণে আমার একটা নোট বই আছে। আমার সেই নোটখাতার মধ্যে খানদশেক একশ টাকার নোট পাবেন খাতাখানা আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব। সেই হাজার টাকা আপনার।'

হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে। হাজারে কে ব্যাজারে? দুঃখ দৈন্যে একশা হয়ে আছি, দশখানা একশ টাকার নোট পেলে একটা মোটা লাভ। এই দশাটা এখনকার মত ফেরানো যায় এখুনি।

'চলুন তাহলে। কিন্তু মশাই, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে উইলখানা আপনি নষ্ট করতে চাইছেন কেন বলবেন আমায়?'

'তাহলে বলি শুনুন—' ওর বিবৃতি শুনিঃ 'বাপের একমাত্র ছেলে, অগাধ সম্পত্তির মালিক আমি। বে-থা করিনি। অতো বড়ো বাড়িতে একলাই থাকতাম। আমার টাকাকড়ি বিষয়-আশয় যা-কিছু সব যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে দিয়ে যাবো, এই ছিলো আমার মনের বাসনা। সে-রকম একটা উইলও আমি বানিয়েছিলাম। সেটা আমায় এটর্নির কাছে আছে। কিন্তু তার পরে আরেকটা উইল করে—মানে, এই নতুন উইলটা—যেটা নষ্ট করতে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে - এইটে করায় আগের উইলটা আমার আইনতই বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু এ-উইলটা যদি ওড়ানো যায়, তাহলে আমার আগেরটাই আবার বলবৎ হবে।

'বুঝলাম। কিন্তু নতুন উইলটা বাতিল করতে চাচ্ছেন কেন? বাৎলান তো?' আমি শুধাই।

'তাই তো বলছি। ভুতোর জন্যই মশাই। না না, ভূত নয়—কোনো ভূতের জন্যে না—ভূতের জন্যে কি কোনো ভূতের মাথাব্যথা হয়? এ হচ্ছে ভুতোর জন্যে। আমার মাসতুতো ভাই ভুতো। ছেলেটাকে ভালো বলেই জানতাম অ্যাদ্দিন। একটা বাড়িতে একলা পড়ে থাকি, দেখবার শুনবার কেউ নেই— ভুতো মাঝে মাঝে আমার খবর নিতো। তদারক করতো। এসে দরদ দেখাতো খুব। এবার অসুখে পড়তে ভাবলাম যে হাসপাতালেই যাই, সেখানে কেবিন ভাড়া নিয়ে থাকবো। বেশ হবে। কিন্তু ভুতো বাধা দিলো। অযাচিত এসে নিজের থেকে আমার সেবার ভার নিলে। আর এমন সেবা-যত্ন করতে লাগলো যে আমি প্রায় সেরে উঠলুম। আমার বেশ মায়া পড়ে গেল ওর ওপরে। সেই অবস্থায়— সেটা মনের কী অবস্থা আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না —'

'মায়ালু অবস্থা বলতে পারেন।' আমি বলি।

'সেই মায়ালু অবস্থায় দেখলাম চেহারাটা ওর গুণ্ডার মত চোয়াড়ে হলেও ভেতরটা ওর মাখনের মতই মোলায়েম। তখন, ওর প্রতি আন্তরিক মমতায়, ওর

স্নেহের প্রতিদান দিতেই—যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার সব কিছুই ও-ই পাবে এই রকম একটা উইল আমি বানালাম ভুতোকে। জানলামও ভুতোকে আর এইটা করার পর থেকেই অসুখটা আমার বেঁকে দাঁড়ালো কেমন! ভুতো এক বড় ডাক্তার ডেকে আনলো। তিনি দেখে-শুনে বললেন 'ভয়ের কিছু নেই, ওষুধে আর সেবাতেই সেরে উঠবে। কিন্তু খবরদার, ঠাণ্ডা যেন না লাগে। ঠাণ্ডা লাগলেই এ-রুগীকে আর বাঁচানো যাবে না।' শুনেই, ভুতোর চোখে যে-ঝিলিক খেলতে দেখলাম তাতেই আমি ঠাণ্ডা মেরে গেছি। হাড় হিম হয়ে গেছে আমার। বুঝলাম যে পুরোপুরি ঠাণ্ডা হবার আমার আর দেরি নেই। টের পেলাম সেই রাত্তিরেই। মাঘের এই হাড় কাঁপানো কনকনে শীতে চারধারের জানালা সে খুলে দিলো—গায়ের লেপ তুলে নিলো আমার। তারপরে যা হবার তাই হয়েছে। ডবল নিউমোনিয়া হয়ে আমি মারা গেছি; পটল তুলতে হয়েছে আমায়।'

'এ তো মৃত্যু নয় মশাই, এ যেন খুন। ডাহা খুনই যে!' আমি আঁতকে উঠি।

'আমি নিজেই এজন্যে দায়ী। আমি কিংবা আমার ঐ উইলটাই। কিন্তু আমার আরেকখানা উইলও যে করা আছে একথা হতভাগাটা জানে না।'...

আর কিছু জানবার ছিল না। অনিমেষের পিছু পিছু আমি বেরুলাম। রাস্তায় নেমে ওর আর দেখা নেই। লাল বাড়িটার কাছে গিয়ে সাড়া পেলাম তার। সদর দরজায় প্রকাণ্ড এক তালা ঝুলছে। খড়খড়ি-জানালা সব ভেতর থেকে আঁটা—কোথাও কোনো ফাঁক নেই সেঁধুবার। 'ঢুকি কি করে?' আপন মনেই বলছি—পাশের গ্যাসের বাতিটা ফিসফিসিয়ে উঠলো—'পেছন দিকের একটা খড়খড়ির পাল্লা ভাঙা, তার ভেতর দিয়ে আঙুল গলিয়ে ছিটকিনি খোলা যায়। জানালা গলে সামনের সিঁড়ি পাবেন—সোজা চলে যাবেন ওপরে—তেতলায়।' গেলাম তাই। যেতেই আলমারিটা আমায় ডাকলো। 'এই যে! এই খেনে! এর মধ্যেই উইলটা পাবেন।' বলে উঠলো আলমারি। তার খোপে খোপে বইয়ের গাদা—তার ভেতর থেকে খুঁজে বার করলাম উইলখানা। কিন্তু এখন? এখন কী করি? টেবিলের ওপরে দেশলাইটা পড়ে ছিল—দেখলাম সেও বেশ বলতে কইতে শিখেছে। আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে দেশলাইটা বললে—'এই যে—আমি এখানে আছি! আমাকে ধরো—আমায় দিয়ে ধরাও।'

ওর শিখায়, ওরই শিখানো মত উইলটা ধরি—ধরতে না ধরতে সেখানা ছাই হয়ে যায়। তখন আমি অনিমেষের দিকে ফিরি। এতক্ষণ সে দেশলাইয়ের ছদ্মবেশে আমাকে উৎসাহ দিচ্ছিলো। কিন্তু সে আর ধরা দিলো না। কিছুতেই আর নিজমূর্তি ধরলো না। আসল কথাটা তখন বাধ্য হয়ে জনান্তিকেই পাড়তে হলো—দেশলাইয়ের উদ্দেশেই ছাড়লাম—'কিন্তু মশাই পুরস্কার কই? সেই হাজার টাকার হদিশ?'

'এই যে। আমার তলার খুপরির কোণের দিকে—ডায়ারি-বইটার ভেতর।' আলমারিটা জবাব দিল আমার।

এমন সময়ে সদরে একটা মোটর এসে দাঁড়ানোর আওয়াজ পেলাম। আলমারিটা চেঁচাতে লাগলো—'পালাও পালাও, আর দেরি করোনা। প্রাণে যদি বাঁচতে চাও। খুনে গুণ্ডাটা এসে পড়েছে। ভয়ংকর ওর গায়ের জোর—তার ওপর আবার বারবেল ভাঁজে রীতিমতন। দেখতে পেলে—আর তোমার এই কাণ্ড দেখলে—তোমাকে আর আস্ত রাখবে না। মেরে ভূত বানাবে, তা কিন্তু বলে রাখছি। ভুতো এলো বলে!'

জুতোর শব্দ শোনা যায় নীচের তলায়। ডায়ারি বইটা বাগিয়ে নিয়ে আমি দুদ্দাড় করে নামি। সিঁড়ি ভেঙে টপ করে পিছনের ভাঙা জানালার দিকে যাই। তার ফাঁক দিয়ে টপকে যাই। তারপর এক রামছুট লাগাই। হাঁপ ছাড়ি বাড়ি ফিরে।

বাবাঃ, যা ফাঁড়াটা গেল! আরেকটু হলেই গেছলাম—ভুতোর হাতে মার খেয়ে ভূত হতাম এতক্ষণ? আরেকটা ভূত! অনিমেষের স্যাঙাৎ হতে হতো। আর ভুতোর হতো দু'নম্বর—আরেকখানা খুন! আজ আবার ছিলো আরেক বেস্পতিবার—এবং বারবেলাই এখন। এর ওপর সেই বারবেল-ভাঁজা ওস্তাদ এসে পড়লে দেখতে হতো না মোটেই।

যাক, অমন তাড়ার মধ্যেও নোটের তাড়াটা হাতাতে ছাড়িনি, হাতছাড়া করিনি নোটবই। দৌড়ঝাঁপ যতই হোক না। ডায়ারি-বইটা বুকের মধ্যে করে এনেছি—ফেলে আসিনি—আর, সমস্ত টাকা তার মধ্যেই ইনট্যাকট! আমার ট্যাকেই—বলতে গেলে।

নোট খাতাটা খুলি! ওমা, এর ভেতরের আদ্দেক পাতা যে উই-খাওয়া। মলাট দুটোকে ঠিক রেখে ভেতরে ভেতরে কাজ সেরেছে। নিখুঁত উই-শিল্পই বলতে হয়। খুলতেই খাতার আর্ধেক ঝুরঝুর করে খসে পড়ে।

এক ঝুড়ি নোটও সেই সাথে। এগুলোকেও বাকি রাখেনি, কুরে কুরে খেয়েছে। সেই কারিকুরির থেকে নোটের কুচিগুলি জোড়াতাড়া দিয়ে হয়তো বা একখানা বানানো যায়—

আর তাই বা কম কি? সর্বনাশে সমুৎপন্নে পণ্ডিতরা অর্ধেক ছাড়েন; এখন পরিশ্রমের সবটাই যখন পণ্ড, তখন নব্বইভাগই না হয় আমি বাদ দিলাম। তা বরবাদ দিয়েও একশো থাকে, সেই বা মন্দ কি? এই বাজারে একশো টাকাই এমন কি কম?

কিন্তু 'উই'য়ের কেরামতির সঙ্গে কি 'আই' পারে? পারি কি আমি? '**WE**'-এর কাছে '**I**' তো ছেলেমানুষ! নিতান্তই একবচন। একেবারে নাম-মাত্রই! যাহোক জোড়া-তাড়া দিয়ে তাহলেও খাড়া করে তুলি একখানা—

একশোই বটে! আঠারোখানা টুকরো আঠা-র সাহায্যে একটা কাগজের

পিঠের আঁটার পর সে যা এক Show হলো। দেখবার মতই! দেখে তারিফ করার মতই, হ্যাঁ! চেহারার দিক দিয়ে একশো টাকার নোটের চেয়ে একটু বেশি লম্বা চওড়াই যদিও, কিন্তু তা হলেও তার জন্য আমার বেশি দাবী নেই—একশো টাকা পেলেই আমি খুশি হবো। এমন কি, টেন পারসেণ্ট ডিসকাউণ্ট দিয়ে নব্বই নিতেও নারাজ নই—টাকায় যদি নাই মেলে আনায় এলেও ক্ষতি নেই। নব্বই আনা পেলেও লুফে নেব। নব্বই পয়সা কেউ দিলেও বর্তে যাই।

কিন্তু জাল নোট ঠিক এটা না হলেও এই ভ্যাজাল নোট, কোনো দামেই কেউ কি নিতে চাইবে?

বলো ভাই, তোমরাই বলো, এর পরেও কি কেউ ভূতে কখনো আর বিশ্বাস করে? করতে পারে?

লক্ষ্মী এবং দুর্লক্ষ্মী

'গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি— !'

এই গৌড় যে শুধু মাইকেলের কবিতাতেই জায়গা পেয়েছে তাই নয়, গৌড় বলে একটা জায়গাও আছে আবার।

মালদহ জেলায় জায়গাটা। কিন্তু সেখানকার জনমনিষ্যি মাইকেলি সুধায় কিরূপ মশগুল তা আমি বলতে পারব না, তবে সেখানে—মানে, সেই গৌড়ের কাছাকাছি রামকেলির মেলা বসে।

বসে বছরে একবার করে। কাকার সঙ্গে ছোটবেলায় সেই মেলায় গেছলাম একবার।

কাকা বললেন, 'চ, যখন মেলাতেই এলাম তখন এই ফাঁকে গৌড়টাও দেখে যাওয়া যাক।

গৌড় বাংলার গৌরব। বাঙালির অতীত ইতিহাসের একপৃষ্ঠা—তার সংস্কৃতির গোড়াকার, যদিও সেই অতীত হাসির কিছুই আর এখন নেই। তার সমস্তই ইতি। এখন ধ্বংসাবশেষ।

দৌড়লাম কাকার সঙ্গে গৌড় দেখতে। ধ্বংসাবশেষ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। দিনকয়েক আগে কাকার দামী সোনার ঘড়িটার—'মেকেবের'

ঘড়ি না কি—তার ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। দুঃখের বিষয় ঘড়িটা নিজের থেকেই ধ্বংসাবশেষ হয়ে ছিলো না—আমাকেই করে দেখতে হলো।

আর কাকাও ধ্বংসাবশেষের বেশ ভক্ত। ঘড়ির হাল দেখে তিনি আমাকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন; কাকীমা বাধা না দিলে তখন তখনি একটা কিছু হয়ে যেত। কেননা ধ্বংস হলে তারপরে আর দেখবার মত কিছুই নাকি আমার অবশেষ থাকতো না, তাই কাকীমা বাধা দিলেন।

গুড়ের মতই আর কি! ধ্বংস করলে আর কিছুই তার অবশেষ থাকে না। যা একখানা লগুড় নিয়ে তেড়ে এসেছিলেন কাকা!

কিন্তু গুড়ের না থাকলেও গৌড়ের ছিলো, আমরা তাই দেখতে গেলাম।

মেলার থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সেখানেও মেলা—না মনিষ্যির। মেলাই জঙ্গল! বাঘ ভালুকও হয়তো মিলতে পারে মনে হলো—দয়া করে এসে মেলেন যদি! সেও এক রকমের মেলাই তো বলতে হবে?

কাকার কথা বলতে পারিনে, তবে ও ধরনের মেলামেশা মোটেই আমার পছন্দ নয়। ভালুক জানে বাসতে ভালো, আর তারা এসে কানে কানে কথা কয়, সেকথাও জানা আছে, কানাকানি করে অনেক সদুপদেশও দিয়ে থাকে—কথামালায় পড়া আমার, কিন্তু তাহলেও—তাদের ভালোবাসার আমি ধার ধারিনে।

আর বাঘ? বাঘকে আমি তত ভয় করিনে। বাঘ এলে আর বাগে পেলে—আমায় ফেলে কাকাকেই খাতির করবে। ভালোই জানি সেটা। কাকাবাবুর গায়ে যা চর্বি, বাঘটা যদি নেহাৎ গরু না হয়, চর্বিতচর্বনের অমন সুযোগ সে ছাড়বে না নিশ্চয়।

যাক, ধ্বংসাবশেষের কাছে গিয়ে পোঁছুতেই সন্ধে হয়ে গেল। ফাঁকা আকাশে বাঁকা চাঁদ দেখা দিলেন। কাকা বললেন, এতটা এসে না দেখেই ফিরে যাব? তুই কি বলিস?

আমি কিছু বলি না। গাছপালার মগ-ডালে লম্বা পা ঝুলিয়ে কেউ বসে আছেন কিনা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি।

'নিশ্চয় এখানে কোনো লোক আছে যে এ সবের দেখাশোনা করে। কেউ দেখতে এলে দেখায় টেখায়।' কাকা বললেন: 'আয়, তাকে খুঁজে বার করি আগে।'

বিপুল ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে আমরা এগুলাম। সে-যুগের পাথুরে বাড়ি—বাড়ি কিম্বা কেল্লাই হবে—কালের অত্যাচারে ভেঙেচুরে এখানে সেখানে স্তূপাকার। পেল্লায় চেহারার একেকটা থাম।

'কাকা, থাম।' আমি কাকাকে বললাম।

'থাম? বল থামুন। স্কুলে লেখাপড়া শিখে এই বিদ্যে হচ্ছে? এই সভ্যতা শিখেচো? কাকাকে বলা হচ্ছে থাম? বটে?…গদাম।'

শেষের কথাটা কাকা বলেন না, বলে ওঁর হাত। আমার পিঠের ওপর। আমি কুঁকড়ে গিয়ে বলি—'না,' আর কিছু বলি না—থামদের দেখাই।

'স্তম্ভ। ওর নাম স্তম্ভ।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখি। এক একটার গুঁড়ি এমনি চওড়া যে শিবপুর বোটানিক্যালের বুড়ো বট কোথায় লাগে! কাকা বললেন, 'যখন আস্ত ছিলো, খাড়া ছিলো ওগুলো, তখন ওদের আগাপাশতলা সমান ছিলো— এইসা হৃষ্ট-পুষ্ট ছিলো যে কোথাও সরুমোটা ছিলো না। গুঁড়ি - ভুঁড়ি— মুড়ি সব একাকার।'

আমার এ কাকার মতোই ছিল নাকি। বুঝতে পারি বেশ। ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা চত্বরের ধারে এসে পড়লাম। তার এক দিকে কয়েকটা পাথরের ধাপ—হয়তো একদা তা সোপানশ্রেণী ছিল, কাকা জানালেন, এখন ধ্বংসাবশেষ হয়ে তার ধাপ্পা দিচ্ছে।

তারই একটা ধাপে পা দিয়ে কাকা বললেন—'নাঃ, কেল্লাটার জেল্লা ছিলো এককালে।

ধাপগুলো একটা ঘরের দিকে গেছলো। আমরাও ধাপে ধাপে সেই দিকে এগুলাম। ঘরটার ভেতরে গিয়ে পড়লাম। কি রকম একটা ভ্যাপসা গন্ধ চারধারে। কেমন যেন গা ছমছম করে। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘরের মাথায় ছাদ ছিল না।

'আমরা গড়খাই পেরিয়ে এলাম, বুঝলি? মনে হচ্ছে এটা দুর্গের ঘণ্টাঘর।'

'গড়খাই কী কাকা কোনো কিছু খাবার জিনিস?'

কাকা সেকথা কানে তোলেন না—'খালি খাই খাই! খালি তোর খাই খাই। কোথায় এসেছিস দ্যাখ।'

ঘণ্টাঘরে এসেছি মনে পড়ে। কিন্তু খাবার নামে ঘণ্টা!

সেই ঘরটা পেরিয়ে আরেকটা, ওর চেয়ে লম্বা চওড়া ঘরে গিয়ে পড়লাম। তারও মাথায় আকাশ। ঘরটার একধারে একটা পাথরের সিংহাসন - তার তিন ভাগ গরহাজির। কাকা বললেন সিংহাসন, কিন্তু আমার মনে হলো পাথরের ঢিপি—সিংহ কি আসন তার কিচ্ছু ছিল না। তবে তার পিঠের দিকটা বেশ উঁচু আর নক্সা করা। সাধারণ চেয়ারের পীঠস্থান ঠিক এমনটা হয় না। সিংহাসনই হবে মনে হয়।

ভাঙা সিংহাসনের সামনে, পাথরের টেবিলের মতো একটা জিনিস - তারও একটা পায়া ভাঙা। সেই পাথরের তেপায়ায় মাথা রেখে বিশ্রাম করছিলো একটা লোক।

টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোতে দেখেছি লোককে, কিন্তু ঠিক এমনটা দেখিনি। আমি তখন খুবই ছোট্ট, পৃথিবীর বিশেষ কিছু দেখিনি বলতে গেলে—দেখিও

নি শুনিও নি—কিন্তু তাহলেও টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোতে দেখেছিলাম লোককে। তারা মাথাটাকে পাশে রেখে, এভাবে আলাদা করে রেখে ঘুমোয় না।

মনে হলো কাকাও দৃশ্যটাকে বিসদৃশ বোধ করছেন। কেননা তাঁর মুখ থেকে এমন একটা আওয়াজ বেরুতে শোনা গেল যা সাত জন্মে আমার কানে আসেনি।

কাকা বললেন—'ই—য়া—ল্লা !'

সাড়া পেয়ে লোকটা উঠে বসলো। মাথাটা ঠিকঠাক করে নিলো, বসালো ঘাড়ের যথাস্থানে—অতি সযত্নে। তারপর অভ্যর্থনা করলো আমাদের—স্বাগত। সুস্বাগত।

কাকাও ততক্ষণে খানিকটা সামলেচেন। তিনিও বিড় বিড় করলেন—স্বাগত, সুস্বাগত।

গুডমর্ণিং-এর বদলে গুডমর্ণিং, হ্যালোর বদলে হ্যালো বলবার মতই আর কি! গৌড়ীয় রীতি পালন করলেন কাকা।

'আপনারা গৌড় দেখতে এসেছেন? আসুন, আপনাদের দেখাই—'

'হ্যাঁ, দয়া করে দেখান যদি। ধন্যবাদ।'

উঠে দাঁড়ালো লোকটা। কী অদ্ভুত পোশাক তার পরণে। সেরকমের পোশাক কেউ পরে না আজকাল। কোমর থেকে তরোয়ালের খাপের মতন কী একটা ঝুলছিল। কাকা আমার কানে ফিস ফিস করে করলেন—'কোষবদ্ধ অসি। বুঝেচিস? ঐ লোকটা এখানকার দারোয়ান। তা, দারোয়ান হলেও লোকটাকে খাতির করতে হবে। কোষবদ্ধ অসি—দেখচিস না?'

দেখেছি—ভালো করেই। এই বিদেশ-বিভূঁয়ে চটে গিয়ে লোকটা যদি কোষবদ্ধ অসি নিয়ে তাড়া করে তাহলে ক কোশ যে আমাদের ছুটতে হবে তারও আমি ধারণা করতে পারি।

'আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম না তো?' খাতির করে বলতে গেলেন কাকা—'আপনি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন—'

'ও—হ্যাঁ! একটু শ্রান্তি অপনোদন করছিলাম বটে। তা হোক, আপনারা এতদূর থেকে এত কষ্ট করে এসেছেন—' বলে লোকটা এগুলো—'আসুন আমার সঙ্গে।'

আমরা তার পিছু পিছু এগুলাম। খানিকটা গিয়ে একটা জায়গায় এলাম আমরা। সেখানেও কতকগুলি ধাপ—কিন্তু নীচের দিকে চলে গেছে। সেই ধাপ বেয়ে আমরা নামলাম নীচেয়।

'এইটা হলো গর্ভগৃহ। এই গৃহের ঐ দিক দিয়ে আর এক প্রস্থ সোপানশ্রেণী আরো নীচে নেমে গেছে। সেটা কারাকক্ষ। রাষ্ট্র-বিরোধী কর্মে যারা লিপ্ত সেই অপরাধীদের ওখানে বন্দী রেখে সাজা দেওয়া হতো। দেখবার বাসনা হয়?'

কাকা ইতস্তত করেন—আমারো বাধ বাধ ঠেকে! রাষ্ট্রবিরোধী কর্মে আমরা লিপ্ত কিনা জানা নেই, তার ওপরে আবার এক গর্ভ-যন্ত্রণার মধ্যে যাবার আমার উৎসাহ হয় না।

কাকা বললেন—'না, রাত হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আমাদের।'

'তবে থাক।' না দেখাতে পেরে লোকটা যেন একটু ক্ষুণ্ণই হলো মনে হয়।

'আসুন, ফিরে যাই।' বলেই লোকটা হাওয়া। হাওয়ার মতই গৃহের গর্ভে মিলিয়ে গেল যেন হঠাৎ।

হাতড়ে হাতড়ে আর পাতড়ে পাতড়ে কোনো রকমে উঠে এলাম উপরে। ফিরে এলাম সেই সিংহাসনের ঘরেই আবার। দেখলাম, দারোয়ানটা তেপায়ায় বসে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। ছোট্ট মেয়েটি! দারোয়ানেরই মেয়ে-টেয়ে হবে মনে হয়।

কী বিষণ্ণ মুখ মেয়েটার! আর কী বিষাদমাখা মিষ্টি হাসি! দারোয়ান আমাদের দেখে মেয়েটিকে বলল, 'সুলক্ষণা, যাও। অতিথিদের জন্যে কিছু আহার্য নিয়ে এসো।'

মেয়েটি আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম দরজার মুখটায়। সরে দাঁড়াতে যাবো, কিন্তু তার দরকার হলো না—সে আমাদের দেহ ভেদ করে চলে গেল। যেমন করে কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো গলে যায়, অনেকটা সেইরকম। কেমন যেন রোমাঞ্চ হলো আমার। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। মেয়েটা নেমে গেল সেই গর্ভগৃহের গহ্বরে।

'ঐ মেয়েটিও বুঝি এখানে থাকে?' কাকা শুধোলেন।

'ও? ও সুলক্ষণা। আমার পালিত কন্যা। আমার এই রাজধানীর নাম লক্ষণাবতী—ওর নামেই কিনা!'

'তবে যে শুনলাম এটা গৌড়?' আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

'সমগ্র দেশটাই তো গৌড়।' লোকটা ভ্রূক্ষেপ করলো আমার দিকে: 'গৌড় বঙ্গ। আর তার রাজধানী—আমার এই লক্ষণাবতী। শোনো, বলি তোমায় এর ইতিহাস—' বলে তিনি এক লম্বা ফিরিস্তি শুরু করলেন—যার কিছুটা আমার পাঠ্য বইয়ে পড়া, কিছুটা—মনে হলো—সিলেবাসের বাইরে।

'...এর পর এলো সেই বক্তিয়ার খিলজি।...' বলে বক্তৃতার মাঝখানে তিনি থামলেন। থেমে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।—'তারপর যে কী হলো—সব যেন গুলিয়ে গেল কিরকম। সমস্তই ইতোনষ্ট হয়ে গেল। আর—আর তারপর থেকেই আমার মাথার ঠিক নেই।'

বলে মাথাটাকে তিনি ঠিক করে ঘাড়ের ওপর বসালেন—'এই মাথা নিয়েই আমার মুশকিল। একটুতেই সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। মাথা ঠিক রাখতে পারি না।'

'ডাক্তার দেখান না কেন?' আমি বললাম।

'ডাক্তার? সে আবার কী পদার্থ?' অবাক হলো লোকটা।

'তারা অ-পদার্থ। কিন্তু তারা আপনার ওষুধ দিতে পারে মাথার।' জবাব দিলেন কাকা।

'যারা ভিষক? বৈদ্যশাস্ত্রী? না, তাদের কর্ম নয়। ডাক্তার নয় ভাস্কর। ভাস্করের দরকার, উত্তম এক ভাস্কর। সেই পারে আমার মাথা সারাতে। এই দুর্গে ঢুকতেই, তোরণের মুখে তোমরা দেখোনি? দেখোনি আমার প্রস্তরমূর্তি?'

'না তো।' কাকা জানালেন—'ফেরবার সময় লক্ষ্য করবো।'

'লক্ষণাবতীর শ্রেষ্ঠ ভাস্করের খোদিত—যাও, দেখো গে। দুঃখের বিষয় লোকটা এখন বেঁচে নেই। সে এখানে থাকলে কথাই ছিল না। যাক তা ভেবে আর কী হবে!' আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো তার।

ফেরার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছিলাম– সুলক্ষণার খাবার আনার কোনো লক্ষণ না দেখে। এমন সময়ে হাত বাড়ালো দারোয়ানটা—'দাও, টাকা দাও?'

কাকা পিছিয়ে গেলেন পাঁচ হাত—'কেন, টাকা কিসের?'

'রাজকর। রাজকর না দিয়েই চলে যাবে? সে কি হয়?'

যা ছিলো কাকার পকেটে ঝেড়েমুছে দিতে হলো বাধ্য হয়ে। কাকা একটু গড়িমসি করছিলেন দিতে—আমি কোষবদ্ধ অসিটা কাকাকে দেখালাম। আমাকেই দেখাতে হলো এবার।

কাকার উল্লিখিত 'গড়খাই' পেরিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে হাঁফ ছাড়লাম শেষটায়।

সামনেই এবার দেখতে পেলাম মূর্তিটা। আসার সময় নজর করি নি। ঐ দারোয়ানটার মতই চেহারা—কোষবদ্ধ অসি—তেমন পোশাক-আশাক – খালি মাথাটা নেই ঘাড়ের ওপর। সেটা রয়েছে পায়ের কাছে। আর তার পাদপীঠে লেখা দেবনাগরীতে—মহারাজ শ্রীশ্রীলক্ষ্মণসেন।

কাকা থমকে থাকলেন খানিক, তারপর বললেন—'রাম। রাম!! লক্ষণ নয়, দুর্লক্ষণ এসব। চলে আয় হতভাগা—দাঁড়াস নে আর।' হন হন করে তিনি পা চালালেন।

একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাস লিখতে হয়। আমার জীবনে এই ধরনের একটা 'য়্যামবিশন্‌' অনেক দিন ধরেই ছিল। কিন্তু কি করে যে ওই সব লেখে, গল্পচ্ছলেই যদিও, যাতে করে অদ্ভুত আর বিচ্ছিরি যত কাণ্ড—যার মাথা নেই মুণ্ডু নেই—একটার পর একটা ঘটে যায়···পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ঘটতে থাকে—কৌতূহল আর অনিদ্রা সমান তালে জাগিয়ে রেখে ধারাবাহিকভাবে গড়াতে থাকে, কিছুতেই আমি ভেবে উঠতে পারি নে। সত্যি, ভাবতে গেলে, আশ্চর্য নয় কি ? প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে এসেই নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ো, এর পরে, এরও পরে আরো কী দুর্ঘটনা ঘটবে, ঘটতে পারে, ধারণা করতেই তোমার মাথা ঘুরবে—এবং পরের পরিচ্ছেদের গোড়াতেই যখন ব্যাপারটা আরো একটু খোলসা হবে, তখন আবার আপন মনেই বলবে হয়তো ঃ দূর দূর ! এই জন্যেই য়্যাতো !

কিন্তু সে যাই হোক, অ্যাডভেঞ্চারের একটা বই লেখার দুরাকাঙ্ক্ষা, অতি দুরূহ আকাঙ্ক্ষা, আমারও ছিল ! কিন্তু কি করে যে মাথা খাটিয়ে ওই রকমের একটা গল্প ফাঁদা যায়, কিছুতেই ঠাওর করে উঠতে পারছিলাম না।

সেই-আমারই জীবনে যে এমন এক রোমাঞ্চকর অ্যাভেঞ্চার ঘটবে কে জানে ! একেবারে সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার, গল্পের বইয়ে ঠিক যেমন-যেমনটি ঘটে, মাথামুণ্ডুহীন নিখুঁত রকমের হুবহু ! কেন যে হলো, কিজন্যে যে হলো, এমনকি

কী যে হলো, তাও কিছুই আমি খুঁটিয়ে বলতে পারব না। কোথায় যে হলো তাও আমার কাছে ধোঁয়াটে।

সেই অ্যাডভেঞ্চারের কেবল একটি পরিচ্ছেদই আমি জানি, সেইটিই আমি এখানে বিবৃত করব। তার আগে কী ঘটেছে, এবং পরেই বা কী ঘটিতব্য—আমার জানা নেই। জানার বাসনাও নেই। এই একটিমাত্র পরিচ্ছেদই আমার জীবনে ঘটেছিল, অথবা, সেই ক্রমশ-প্রকাশ্য অ্যাডভেঞ্চারের এই পরিচ্ছেদটি যখন ঘটছিল, সেই অশুভ মুহূর্তে আমার জীবন নিয়ে আমি হঠাৎ তার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম—এবং, সুখের কথা যে জীবন নিয়েই ফিরতে পেরেছি।

বেশি দিন আগের কথা নয়, বিশেষ এক জরুরি কাজে ডায়মণ্ডহারবারে যেতে হয়েছিল। ইচ্ছে করেই লাস্ট বাস-এ চেপেছিলাম, যতই ঢিমে-তেতালায় চলুক, রাত দুটো তিনটে নাগাদ গিয়ে পেঁছিতে পারব। মনে মনে একটু অ্যাডভেঞ্চারের লালসাও যে না ছিল তা নয়! কলকাতার বাইরে কখনো তো পা বাড়াইনে। রাত দুপুরের পর ডায়মণ্ডহারবারের মত এক অচেনা জায়গায় উৎরে, বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করে, চৌকিদার-পুলিস-ইত্যাদির সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে, কড়া নাড়ানাড়ি করে, কিংবা দরজা ভেঙেই, বন্ধুকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তোলা—বেশ একটুখানি অ্যাডভেঞ্চারই বই কি!

বাস-এ আমি একাই যাত্রী।

হুস হুস করে বাস চলেছে। কলকাতা পেরিয়ে অনেক দূর এসেছি বেশ বোঝা যায়! অন্ধকার রাতের ভেতর দিয়ে উত্তাল হাওয়ায় পাড়াগেঁয়ে মেঠো গন্ধ ভেসে আসছে; দুধারে কোথাও আমবাগান, কোথাও বা বাঁশঝাড়, কোথাও চষা ক্ষেত, কোথাও বা খোড়ো ঘরের বস্তি—আবছায়ার মত চোখে এসে লাগে। এরই মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে ভীষণ এক ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা থেমে গেল হঠাৎ।

কল বিগড়েছে, গাড়ি আর চলবে না, জানা গেল। আজকের মত এইখানেই নিশ্চিন্দি।

নিশ্চিন্দি? বলতে কি, বেশ একটু ভয়-ভয়ই করতে লাগল আমার। অজানা জায়গায়, নির্জন নিশুতিতে কেবলমাত্র ঐ ড্রাইভার আর এই কণ্ডাকটার—ওদের কণ্ডাক্ট, অথবা ড্রাইভ অকস্মাৎ কী দাঁড়াবে কে বলবে?—ওধারে ষণ্ডা-গুণ্ডা ওই দুজন, আর এধারে নামমাত্র আমি—আমার রীতিমত হৃৎকম্প শুরু হলো।

অবিশ্যি, নিজেকে আশ্বাস দিতেও কসুর করলাম না। তেমন ভয়ের কিছু না, সত্যিই হয়তো কল বিগড়েছে। বেগড়াতেও তো পারে! বেগড়ায় না কি? পথে-ঘাটে আকচারই তো মোটরের কল বেগড়ায়—না বলে কয়েই বিগড়ে যায়। কেবল স্থান-কাল পাত্র তেমন সুবিধের নয়, আমার মনের মত নয় বলেই কি আর মোটরের কল বেগড়াবে না? বেশ তো আমার আব্দার!

তাছাড়া, এমনও তো হতে পারে যে ড্রাইভারের বেজায় ঘুম পাচ্ছে, গাড়ি টানতে আর রাজি নয়—এবং ঘুম পায় না কি মানুষের? মোটর চালাতে পেলেও ঘুম পেতে পারে।

কিংবা, সবচেয়ে যেটা বেশি সম্ভব, এতটা পেট্রল-খরচায় একজন মাত্র আরোহীকে ঘাড়ে করে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেলে মজুরি পোষাবে না, তাই ভেবে বুঝে-সুঝেই মোটরের কল বিগড়েছে হয়তো—

'গাড়ি ফের চলবে কখন?' জিগ্যেস করতেই আমার শেষের আশঙ্কটাই যে সত্য, সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম।

জবাব এল : 'সেই কাল সাতটা-আটটায়। সকাল না হলে কোনখানকার কল বিগড়েছে জানব কি করে?'

'এই রাত্রে—এত রাত্রে তা হলে তো ভারী মুশকিল!'

'কাছেই একটা বে-সরকারী বাংলো আছে। সেইখানে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিনগে—গেলেই শুতে দেবে। আর রাতও তেমন অন্ধকার নয়। চাঁদ উঠে গেছে এতক্ষণে।' কণ্ডাকটারটা জানাল।

চাঁদ উঠেছে বটে। সরু একফালি চাঁদ—চাঁদের অপভ্রংশই বলা যায়। অন্ধকারও অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে দেখলাম।

'কোন ধারে বাংলোটা? যাবো কোন দিক দিয়ে?'

'রাস্তা থেকে নেমে, চষা ক্ষেতের ওপর দিয়ে চলে যান। আল ধরে ধরে যান চলে। একটু গিয়ে, সামনের ঐ বাগানের আড়ালেই বাংলোটা। বাবুর্চিকে ডাকবেন! লোকটা ভালো—বকশিস পেলে এত রাত্রেও উঠে রেঁধে দেবে। বাংলোর মালিকও খুব ভদ্রলোক - তাঁর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।'

কেবল শোবার জায়গাই নয়, খাবারও ব্যবস্থা রয়েছে। বাসের কল বিগড়ে ভালোই হয়েছে বলতে হবে।

একেই বলে বরাত! না চাইতেই বর পাওয়া।

যাক বাস থেকে নেমে রওনা তো দিলাম। চষা জমির ওপর দিয়ে, খানাখন্দে না পড়ে, হাত পা না ভেঙে, আল এবং টাল সামলে, কোনো গতিকে কেবলমাত্র আকাশের চাঁদের সাহায্যে সেই বাগান-ঘেঁষা বাংলোয় গিয়ে তো উত্তীর্ণ হলাম।

ভেবে কাহিল হচ্ছিলাম, অনেক ডাকাডাকি করতে হবে, বন্ধুর জন্যে যে প্ল্যান আঁটা ছিল, বাবুর্চির ওপরেই প্রয়োগ করতে হবে হয়তো, কিন্তু না, কাছাকাছি হতেই বাংলোর একটা ঘরে আলো জ্বলছে এবং দরজাটাও খোলা, দিব্যি চোখে পড়ল!

আস্তে আস্তে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—গলা খাঁকারি দেব কি না ভাবছি—এমন সময়ে—ও—মা!—

ভয়ানক এক দৃশ্য আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হলো!

ঘরের মাঝখানে, খাটে বসে, সেই বাংলোর মালিকই হয়তো—অতিকায় একজন মানুষ, যেমন হৃষ্ট তেমনি পুষ্ট তবে হৃষ্ট খুব বোধ হয় বলা যায় না—তবে যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—পাক্কা তিন মণের কম নয় কিছুতেই। শুধু একটি চুল বাদে সারা মাথায় টাক—সেই চুলটিই কেবল খাড়া হয়ে রয়েছে। তার ডান চোখের ওপরে কালো একটা ছোপ এবং ডান হাতে পিঠে উলকি দিয়ে হরতনের টেক্কা আঁকা। এবং তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর একটা মুশকো লোক, তার হাতে রিভলভার। দোর-গোড়াতেই দাঁড়িয়ে।

আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম দরজার আড়ালেই। চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লাম বলাই ঠিক। মাটিতে হঠাৎ এঁটে গেলাম যেন।

সেই তিনমণী লোকটা বলছিল: 'দেখো, আমাকে মারাটা তোমার ভালো হচ্ছে কি? আমায় মেরো না। এখনো আমার বয়েস আছে, দাঁতও রয়েছে; খুব বুড়ো হয়ে পড়ি নি এখনো, এখনো আমায় বাতে ধরে নি। চোখে ছানি না পড়তেই মারা পড়ব, সেটা কি খুব ভালো দেখায়? বলো, তুমিই বলো! তুমি তামাসা করছ, ঠাট্টা করছ, নয় কি? সত্যি সত্যি মারছ না আমায়? য়্যাঁ?'

পিস্তল হাতে লোকটি খক খক করে একটু হাসল—হাসল কি কাসল বলা শক্ত—'হ্যাঁ, মারব না! তাই বই কি! এত কাণ্ড করে, এত কষ্ট করে শেষটায় তোমাকে না মেরেই চলে যাই আর কি! 'অমাবস্যার আর্তনাদ' বইটা তুমি পড়ো নি তাই এই কথা বলছ! 'ধরো আর মারো'—সেই বইটাও তোমার না পড়া রয়ে গেছে মনে হচ্ছে! কিন্তু কি করব, এ-জীবনে তুমি আর পড়বার ফুরসৎ পাবে না—আমি নাচার!—নাও, প্রস্তুত হও।'

এই বলে তিনমণী সেই লোকটাকে প্রস্তুত হবার, কিংবা দ্বিতীয় কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই—'গুড়ুম্! গড়ুম্! গুম্!'

সেই মুশকো লোকটার হাতের পিস্তলটা বাক্যব্যয় করতে শুরু করে দিল।

তিনমণী লোকটার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এবং আমিও ধুপ করে বসে পড়লাম সেইখানেই।

পিস্তলহস্তে লোকটার নজর আমার দিকে পড়ল এবার।

'কে হে? তুমি আবার কে এসে জুটলে হে এখানে? গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নও তো!'

'আজ্ঞে না।' ভয়ে ভয়ে বলি—বেশ সবিনয়েই: 'এমনি এসে পড়েছি। একেবারেই দৈবাৎ! এমনি এসে পড়ে না কি মানুষ? গল্পের বইয়েও তো এসে পড়ে—বহুৎ পড়া গেছে—আপনার ঐ বই দুটোতেও কতবার এসেছে দেখতে পাবেন। তবে যদি বলেন, অনুমতি করেন যদি, তা হলে এখান থেকে চলে যেতেও পারি। এক্ষুনি যেতে পারি। সে বিষয়ে আমার খুব অনিচ্ছা

নেই—হ্যাঁ, চলে যেতে বললেও নিতান্ত অপমানিত বোধ করব না—' বলতে বলতে আমি উঠে পড়ি।

'উহুঃ সেটি হচ্ছে না। যখন এসেই পড়েছ তখন—'

তার অঙ্গুলি-হেলনে—পিস্তল-হেলনে বললেই যথার্থ হবে—আবার বসে পড়তে হয়।

'তা হলে যদি আপনার অভিরুচি হয় নেহাৎ আপত্তি না থাকে,—' আবার আর্জি শুরু হয় আমার: 'আপনি আমাকে মারলে মারতেও পারেন। ঐ পিস্তল দিয়েই মারতে পারেন। আমার তেমন খুব অরুচি নেই। যদিও আমার দাঁত পড়ে নি তবে বাত ধরেছে কি না বলতে পারব না। তবু যে-কারণেই হোক, বাঁচতে আমার আর উৎসাহ নেই। বেঁচে কি হবে? বেঁচে লাভ? আপনার উল্লিখিত ঐ-বই দুটো আমি পড়েছি। এই সেদিনই তো পড়লাম। তবে পড়বার পর থেকেই আমার বাঁচবার স্পৃহা লোপ পেয়েছে। সেই বই থেকে জানা যায়, এরকম স্থান-কালে মারাই উচিত, এবং মরাটাই বাঞ্ছনীয়—এরকম সুযোগ হাতছাড়া হতে দেয়া ঠিক নয়! আপনারও না, আমারও না। একবার ফসকালে আর আসবে কি না কে জানে! এরকম সুযোগ কটা আসে জীবনে? এরকম অবস্থায় মরতে, মরলে পারলে কেউ না কেউ আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চার লিখে ফেলবেই, আর, মরে অমর হতে কে না চায়? তার ওপর, মেরে হতে পারলে তো আর কথাই নাই।'

'উঁহু, মরা অত সহজ নয় হে, ফাজিল ছোকরা। অমর হওয়া অত শস্তা নয়। ইয়ার্কি পেয়েছ না কি? যেখানে আছ সেখানে চুপটি করে বসে থাকো। আমাকে ভাবতে দাও আগে। একরাত্রে একটা খুনই যথেষ্ট কি না, ভেবে দেখি। যদি মনে হয় আরো একটা হোলে নেহাৎ মন্দ হয় না, তখন না হয় তোমাকে দেখা যাবে। 'হত্যা-হাহাকার' বইটা তুমি পড়েছ না কি? ওটাতে এক রাত্রে ক'টা খুন ছিল? ও-বইটা আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু বাজারে পাই নি, কার লেখা তাও জানি নে। কার লেখা জানো?'

'আজ্ঞে, আমি লিখি নি। অ্যাডভেঞ্চার আমার বড় আসে না।'

'ফের বাজে কথা? অমন করলে, কথার ওপর কথা বললে—এ রকম বাজে বকলে, খুন না করেই—হ্যাঁ বলে দিচ্ছি—খুন না করেই গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব তোমায়, সোজা তাড়িয়ে দেব, মনে থাকে যেন! অমর হওয়ার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ করে দেব,—হুঁ।'

ভয় পেয়ে আমি চুপ মেরে গেলাম!

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

মুশকো লোকটা আপন মনেই বলতে থাকে হঠাৎ: 'আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? এর মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে সেই কাটা মাথাটা ম্যাজিসেট্রটকে গিয়ে প্রেজেন্ট করলে কেমন হয়? স্ট্রেট একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটকে? কোনোও

অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে এ রকমটা ঘটেছে কি ? ওহে—ও ! পড়েছ না কি হে কোনো বইয়ে ?'

আমাকে উদ্দেশ্য করেই হাঁক-ডাক তা বেশ বুঝতে পারি। অগত্যা বলতে হয় ঃ 'ঘটা আর বিচিত্র কি ! এরকম তো ঘটেই থাকে। না পড়লেও, বলে দিতে পারি।'

'আঃ, বড্ড তুমি বাজে বকো। বলছি না যে আমায় বকিয়ো না। ভাবতে দাও আমায়।'

এর পর সেই হত্যাকারী ভদ্রলোক একেবারেই ভাবনা-সাগরে নিমগ্ন হলেন।

ভেসে উঠলেন সেই ভোরবেলার দিকে। বাবুর্চি এসে পড়তেই ভেসে উঠতে হলো। বাবুর্চির হাতে ব্রেকফাসটের ট্রে, তাতে টোস্ট রুটি, মাখন, চা, ডিম—স্বর্গীয় মোটা লোকটির জন্যই আনা হয়েছিল বেশ বোঝ যায়।—দরজার বাইরে ঐ ভাবে-বসানো আমাকে এবং দরজার ভেতরে সেই মুশকো লোকটিকে দেখেই বাবুর্চির মুশকিল ঠেকেছিল, তার ওপরে অস্ত্রশস্ত্র, খুনখারাপি ইত্যাদির আমদানি দর্শন করে চায়ের ট্রে ফেলে দিয়ে পিঠটান দেয়াই যথোচিত হবে কি না চিন্তা করছিল বেচারা, এমন সময়ে সেই হত্যাকারী হঠাৎ হাহাকার করে ওঠে ঃ 'হয়েছে হয়েছে, ইউরেকা ! নিয়ে এস।'

পিস্তলচালিত হয়ে বাবুর্চি মন্ত্রমুগ্ধের মত ব্রেকফাসটের ট্রে সেই মুশকো লোকটির সম্মুখে এনে ধরে দেয়, এবং নিজে এগিয়ে ধরাশায়ী সেই তিনমণীর পাশে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

'এই কথাই ভাবছিলাম। এই টোস্ট-রুটির কথাই। খুন তো করলাম, কিন্তু তারপরে আর কি করা যায়, এতক্ষণ ধরে সেই কথাই ভাবছিলাম। এই তো চমৎকার একটা হাতের কাজ রয়ে গেছে ! বাঃ ! বাঃ ! বেশ বানিয়েছে তো টোস্টগুলো। ডিমসেদ্ধও নেহাৎ মন্দ করো নি তো !—'

বাম হস্তে পিস্তল ধারণ করে সেই মারখুনে মানুষটা ডান হাতের সদ্ব্যবহার শুরু করে দেয়।

আমিও সেই তালে একটু ফাঁক পেতেই সরে পড়ি সেখান থেকে।

ছুট ! ছুট !! ছুট !!! একেবারে সেই বড় রাস্তায়—ডায়মণ্ডহারবার রোডে। কিন্তু কোথায় বা সেই বাস ! কাকস্য পরিবেদনা ! সদ্য-উত্থিত একজন প্রাতঃ-কৃত্যকারীর কাছ থেকে থানাটা কোন দিকে জেনে নিয়ে আবার দৌড় লাগাই।

মাইল দেড়েক দৌড়ে পেঁছলাম গিয়ে থানায়। এক ছুটেই উঠলাম গিয়ে থানার উঠোনে।

বাংলোর মালিককে বাংলোর মধ্যেই খুন করে রেখেছে, এক্ষুনিই তদন্ত

করবার জন্যে, দারোগাকে খবরটা জানানো দরকার। হন্তদন্ত হয়ে এক্ষুনি গেলে — এখনো গেলে, হাতে-নাতে খুনেটাকে পাকড়ানো যায় হয়তো।

পাহারোলার ইঙ্গিতে বুঝলাম, দারোগাবাবু অফিস-ঘরেই।

একলাফে ধাপ ক'টা টপকে দরজা ঠেলে অফিস-ঘরে ঢুকলাম।

ঢুকে কী দেখলাম ? দেখলাম কী ?

দেখলাম দারোগাবাবুটি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—বেশ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক—পাক্কা তিন মণের কম যান না, ঐ পেল্লায় চেহারা নিয়ে তাঁর চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর ডান চোখের কাছটায় কালো ছোপ, এবং ডান হাতের পেছনে সবুজ উলকিতে একটা টেক্কা মারা !

হরতনের টেক্কা !

কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, ভদ্রলোকের দেহে প্রাণ নেই—পিস্তল দিয়েই কে যেন তাঁকে নিঃশেষ করে গেছে স্পষ্টই বোঝা যায়। সোজা তাঁর বুকের ভেতর দিয়েই গুলি চালিয়ে দিয়েছে। কী অন্যায়।

আর হ্যাঁ, তাঁরও সারা মাথায় ঝাড়া টাক, শুধু একটিমাত্র চুল খাড়া দাঁড়িয়ে ??—

এক ভূতুড়ে কান্ড
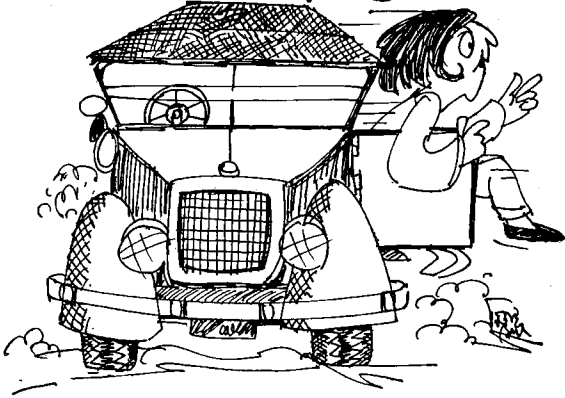
ভূত বলে কিছু আছে? যদি থাকে তো তিনি আমাকে কখনো দেখা দেননি। তাঁর দয়া, এবং আমার ধন্যবাদ। কৃপা করে দর্শন দিলে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে পারতাম কিনা সন্দেহ। ভূতদের রূপগুণে আমার কোনো মোহ নেই। তা ছাড়া আমার হার্ট খুব উইক। আর শুনেছি যে ওরা ভারী উইকেড—

তবে ভূত কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু অদ্ভুত একটা কিছু একবার আমি দেখেছিলাম। দেখেছিলাম রাঁচিতে। না, পাগলাগারদে নয়, তার বাইরে—সরকারী রাস্তায়। রাঁচির রাজপথ না হলেও সেটা বেশ দরাজ পথ।

কি করে দেখলাম বলি।

একটা পরস্মৈপদী সাইকেল হাতে পেয়ে হুনড্রুর দিকে পাড়ি জমিয়েছিলাম, কিন্তু মাইল সাতেক না যেতেই তার একটা টায়ার ফেঁসে গেল।

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়—একটা কথা আছে না? আর যেখানে সন্ধে হয় সেইখানেই সাইকেলের টায়ার ফাঁসে।

জনমানবহীন পথ। জায়গাটাও জংলী। আরো মাইল পাঁচেক যেতে পারলে গাঁয়ের মত একটা পাওয়া যেত—কিন্তু সাইকেল ঘাড়ে করে যেতে হলেই হয়েছে! এমন কি, সাইকেল ফেলে, শুধু পায়ে হেঁটে যেতেও পারব কিনা আমার সন্দেহ ছিল। হাঁটতে হবে আগে জানলে হাতে পেয়েও সাইকেলে আমি পা দিতাম না নিশ্চয়।

তখনো সন্ধে হয়নি। এই হব-হব। সামনে গেলে পাঁচ মাইল, ফিরতে হলে সাত—দুদিকেই সমান পাল্লা। কোন দিকে হাঁটন দেব হাঁ করে ভাবচি।

শেষ পর্যন্ত কী হাঁটতেই হবে? এই একই প্রশ্ন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পুনঃ পুনঃ আমার মানসপটে উদিত হয়েছে। আর এর একমাত্র উত্তর আমি দিয়েছি —না বাবা, প্রাণ থাকতে নয়!

অবিশ্যি, এরকম স্থানে আর এহেন অবস্থায় প্রাণ বেশিক্ষণ থাকবে কিনা সেটাও প্রশ্নের বিষয় ছিল। সন্ধে উৎরে গিয়ে বাঁকা চাঁদের ফিকে আলো দেখা দিয়েছে। সেদিন পর্যন্ত এধারে বাঘের উপদ্রব শোনা গেছল। কখন হালুম শুনব কে জানে!

তবু, চিরদিনই আমি আশাবাদী। সমস্যার সমাধান কিছু না কিছু একটা ঘটবেই। অচিরেই ঘটল বলে। দু এক মিনিটের অপেক্ষা কেবল এবং সেই অভাবনীয়ের সুযোগ নিয়ে সহজেই আমি উদ্ধার লাভ করবো।

এ রকমটা ঘটেই থাকে, এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কতো গল্পের বইয়েই এরূপ ঘটতে দেখা গেছে, আমার নিজেরই কতো গল্পে এরকম দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। আর স্বয়ং লেখক হয়ে আমি নিজে আজ বিপদের মুখে পড়েছি বলে সেই সব অঘটনগুলো ঘটবে না? কোনো গল্পের নায়ক কি কখনো বাঘের পেটে গেছে? তবে একজন গল্পলেখকই বা কোন দুঃখে যাবে শুনি?

সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তের অপেক্ষায় আরো আধ ঘণ্টা কাটালাম। অবশেষে একটা ঘটনার মত দেখা দিল বটে। একখানা লরী। খুব জোরেও নয়, আস্তেও নয়, আসতে দেখা গেল সেই পথে। রাঁচির দিকে যাচ্ছিল লরীটা।

আমার টর্চ বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলাম। শীতের রাত, ফিকে চাঁদের আলো, তার ওপর কুয়াসার পর্দা পড়েছে—এই ঘোরালো আবহাওয়ার মধ্যে আমার আলোর ঘূর্ণীপাক লরীর ড্রাইভার দেখতে পেলে হয়।

লরীটা এসে পেঁছিল—এলো একেবারে সামনাসামনি, মুহূর্তের জন্যই এল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও থামলো না। যেমন এল তেমনি চলে গেল নিজের আবেগে। রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

অনর্থক কেবল টর্চটাকে আর নিজেকে টর্চার করা। আলোর আন্দোলন করতে গিয়ে হাত ব্যথা হয়ে গেছল।

ছ্যা ছ্যা! লরীওয়ালারা কি কানা হয়ে লরী চালায় নাকি? (যেরকম তারা মানুষ চাপা দেয়, তাতে বিচিত্র নয়!)

শেষটা কি হাঁটাই আছে কপালে? এই ঝাপসা আলো আর কুয়াসার মধ্যে সাইকেল টেনে পাক্কা সাত মাইলের ধাক্কা।—ভাবতেই আমার বুক দুর দুর

করতে থাকে। তার চেয়ে বাঘের পেটের মধ্যে দিয়ে স্বর্গে যাওয়া ঢের শর্টকাট।

না—না! কোথাও যেতে হবে না—বাঘের পেটেও নয়। কিছু না কিছু একটা হতে বাধ্য—অনতিবিলম্বেই হচ্ছে! আর এক মিনিটের অপেক্ষা কেবল!

এর মধ্যে কুয়াসা আরো জমেছে, চাঁদের আলো ফিকে হয়ে এসেছে আরো। আমি নিজেকে প্রাণপণে প্রবোধ দিচ্ছি, এমন সময়ে দুটো হলদে রঙের চোখ কুয়াসা ভেদ করে আসতে দেখা গেল।

বাঘ নাকি?···না, বাঘ নয়—দুই চোখের অতোখানি ফারাক থেকেই বোঝা যায়। বাঘের দৃষ্টিভঙ্গী ওরকম উদার হতে পারে না।

আবার আমি বাহুবলে টর্চ ঘোরাতে লাগলাম।

ছোট্ট একটা বেবি অস্টিন—তারই কটাক্ষ! আস্তে আস্তে আসছিল গাড়িটা—এত আস্তে যে মানুষ পা চালালে বোধ হয় ওর চেয়ে জোর চলতে পারে।

আসতে আসতে গাড়িটা আমার সামনে এসে পড়ল।

আমি হাঁকলাম—এই।

কিন্তু গাড়িটার থামবার কোনো লক্ষণ নেই! তেমনি মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলতে লাগল গাড়িটা।

আমার পাশ কাটিয়ে যাবার দুর্লক্ষণ দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

না, আর দেরি করা চলে না, এক্ষুনি একটা কিছু করে ফেলা চাই। এসপার ওসপার যা হোক! গাড়ি মালিকের না হয় ভদ্রতা রক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাকে তো আত্মরক্ষা করতে হবে!

অগত্যা, আগায়মান গাড়ির গায় গিয়ে পড়লাম। দরজার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চলন্ত গাড়িতে ওঠা সহজ নয়, নিরাপদও না, কিন্তু কী করব, এক মিনিটও সময় নষ্ট করার ছিল না। কায়দা করে উঠতে হলো কোনোগতিকে। কে জানে, এ-ই হয়তো সশরীরে বাঁচি ফেরার শেষ সুযোগ!

সাইকেলটা রাস্তার ধারে ধরাশায়ী হয়ে থাকল। থাকগে, কী করা যাবে? নিতান্তই যদি রাত্রে বাঘের পেটে না যায়,—(বাঘরা কি সাইকেল খেতে ভালোবাসে?—) কাল সকালে উদ্ধার করা যাবে। সাইকেলের মালিককে আগামীকাল এক সময়ে জানালেই হবে—বেশি বলতে হবে না—খবর দেবামাত্র আমার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে তিনি নিজেই এসে নিয়ে যাবেন।

ছোট্ট গাড়ির মধ্যে যতটা আরাম করে বসা যায় বসেছি! বসে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলতে গেছি—

'আমায় লালপুরার মোড়টায় নামিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে। ডাঃ যদুগোপালের বাড়ির—'

বলতে বলতে আমার গলার স্বর উপে গেল, বক্তব্যের বাকিটা উচ্চারিত হলো না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম—আমার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইলো।

আমার শার্টের কলারটা মনে হলো যেন আমার গলার চারধারে চেপে বসেছে। হাত তুলে যে গলার কাছটা আলগা করব সে ক্ষমতা নেই। আঙুলগুলো অব্দি অবশ। সেই শীতের রাত্রেও সারা গায়ে আমার ঘাম দিয়েছে।

যেখানটায় ড্রাইভার থাকবার কথা সেখানে কেউ নেই।···একদম ফাঁকা, আমি তাকিয়ে দেখলাম।

জিভ আমার টাকরায় আটকেছিল। কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলে বাকশক্তি ফিরে পেলাম। 'ভূত! ভূত ছাড়া কিছু না!' আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার কথায় ভূত যে কর্ণপাত করলো তা মনে হলো না। বে-ড্রাইভার গাড়ি যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো।

প্রথমে আমার মনে হলো, নেমে পড়ি গাড়ির থেকে। কিন্তু তারপর সমস্ত পথটা হেঁটে মরতে হবে এই কথা ভাবতেই, ভূতের মারও তার চেয়ে ঢের শ্রেয় বলে আমার জ্ঞান হলো। আমার নামের প্রথমার্ধ ভূতভাবন, আর বাকি অর্ধেক তুতধাবন ; কাজেই ভূতের ভয় আমার থাকলেও, ভাবনা তেমন ছিল না। ভূতের হাতে মরলেও শিবলোক কিম্বা রামরাজ্য একটা কিছু আমি পাবই। সেটা একেবারে নিশ্চিত।

কিন্তু তাহলেও এমন অভূতপূর্ব অবস্থায় আমায় পড়তে হবে কখনো ভাবিনি।

ড্রাইভার নেই, এবং গাড়ির ইঞ্জিনও চলছিল না। তবু গাড়ি চলছিল এবং ঠিক পথ ধরেই চলছিল। এইকথা ভেবে, এবং হেঁটে যাওয়ার চেয়ে বসে যাওয়ার আরাম বেশি বিবেচনা করে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সেই ভুতুড়ে গাড়িকেই আশ্রয় করে রইলাম। আলস্যের সঙ্গে আমি কোনদিনই পারি না ; চেষ্টা করলে হয়ত বা কায়ক্লেশে পারা যায় ; কিন্তু পেরে লাভ ? লাভ তো ডিমের! চিরকালের মত এবারও আমার আলস্যই জয়ী হলো শেষটায়।

ঘণ্টা দুয়েক পরে গাড়িটা একটা লেভেল-ক্রসিংয়ের মুখে এসে পেঁছেচে। ক্রসিং-এর গেট পেরিয়ে যখন প্রায় লাইনের সম্মুখে এসে পড়েছি তখন হুঁস হলো আমার। হুস হুস করে তেড়ে আসছিল একটা আওয়াজ! রেলগাড়ির আগমনী কানে আসতেই আমি চমকে উঠলাম।

আপ কিম্বা ডাউন—একটা গাড়ি এসে পড়ল বলে—অদূরে তার ইঞ্জিনের আলো দেখা দিয়েছে—কিন্তু আমার গাড়ির থামবার কোনো উৎসাহ নেই!···

বিনে ভাড়ায় গাড়ি চেপে চলেছি বলে কি অদৃশ্য ভূত আমায় টেনে নিজের দল ভারী করতে চায় নাকি ?

নিঃশব্দ রাত্রির শান্তিভঙ্গ করে গম গম করতে করতে ছুটে আসছিল ট্রেনটা। তার জ্বলন্ত চোখে মৃত্যুদূতের হাতছানি !

আমার গাড়ির হাতলটা কোথায় ?—এক্ষুনি এই যমালয়ের রথ থেকে নেমে পড়া দরকার—আরেক মুহূর্ত দেরি হলেই হয়েছে।

কোনোরকমে দরজা খুলে তো বেরিয়েছি। আমিও নেমেছি আর আমার গাড়িও থেমেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিয়ে রেলগাড়িটাও গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার সম্বিত ছিল না। হুস হুস করে ট্রেনটা চলে যাবার পর আমার হুঁস হলো।

নাঃ মারা যায়নি—হুঁসিয়ার হয়ে দেখলাম। জলজ্যান্ত রয়েছি এখনো এবং মোটরগাড়িটাও চুরমার হয়নি। আমার পাশেই ছবির মতন দাঁড়িয়ে—

আমার এবং মোটরটার টিকে থাকা একটা চূড়ান্ত রহস্য মনে হচ্ছে—

এমন সময় চোখে চশমা-লাগানো একটা লোক বেরিয়ে এল মোটরের পেছন থেকে।

'আমাকে একটু সাহায্য করবেন ?' এগিয়ে এসে বললেন ভদ্রলোক—'দয়া করে যদি আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দ্যান মশাই। আট মাইল দূরে গাড়িটার কল বিগড়েছে, সেখান থেকে একলাই এটাকে ঠেলতে ঠেলতে আসছি! সারা পথে একজনকেও পেলাম না যে আমার সঙ্গে হাত লাগায়। যদি একটু আমার সঙ্গে হাত লাগান। লাইনটাই পেরিয়ে আমার বাড়ি, একটু গেলেই। ঐ যে, দেখা যাচ্ছে—আর এক মিনিটের ওয়াস্তা।'

ধূম্রলোচনের আবির্ভাব

দৈত্যদানোদের যে একালেও দেখা যায় তা হয়তো তোমরা জানো না। এযুগের ছেলেমেয়েরা তা মানোও না বোধ হয়? সেই আলাদীনের আমলের প্রায় আশ্চর্য প্রদীপের ন্যায় একজনা একবার আমার বোন জবার কাছেই এসে হাজির হয়েছিল একদিন। হঠাৎ এসে হাজির! জবার কাছেই গল্পটা শোনা আমার।

জবাকে তোমরা চিনতে পারবে আশা করি। তার মেয়ে টুমপা, আমার ভাগনি, তার ভাই টিকলুকে পিঠে চড়িয়ে সচিত্র হয়ে কিছুদিন আগে এই পূজাবার্ষিকীর পৃষ্ঠাতেই 'টুমপা-র গল্পে' প্রকাশিত হয়েছিল—এত তাড়াতাড়ি তোমাদের তা ভুলে যাবার কথা নয়। সেই টুমপা-র জননী জবা। (নিখরচায় জলযোগ বইয়ে এই জবার কাহিনী তোমরা পড়ে থাকবে হয়ত বা।)

সত্যি, আমার বোনরা সব অদ্ভুত! ভূতপ্রেত দৈত্যদানোরা কোথায় নাকি মানুষদের এসে পাকড়ায় বলে শুনে থাকি, উলটে বলব কি, তারাই কেউ ভুল করে আমার বোনদের কারো কাছাকাছি এলে ধরা পড়ে নাজেহাল হয়ে যায় শেষটায়! যেমন, আলাদীনমার্কা এই দৈত্যটাও জবার পাল্লায় পড়ে এইসা জব্দ হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত প্রায় জবাই হবার যোগাড় আর কি!

'কি হয়েছিল শোনো দাদা' (জবা-ই গল্পটা বলছিল আমায়)। সেদিন ছিল টিকলুর জন্মদিন। বছর কয়েক আগে এক পুরনো আসবাবের দোকান থেকে সখ করে সেকেলে একটা চীনে প্যান আমি কিনেছিলাম, কলাই-করা বেশ

দেখতে পাত্রটা, মেজে-ঘষে ঝেড়ে-মুছে রাখতাম মাঝে মাঝে, কিন্তু কখনো সেটাকে কাজে লাগাইনি। ভাবলুম, আজ এই পাত্রেই টিকলুর জন্যে পায়েসটা রাঁধি না কেন? রেশনের চিনিতে চা খেতেই কুলোয় না আমাদের, কিন্তু এই পাত্রটা ত চীনি, কাজেই চিনির মাত্রা একটু কম হলেও মিষ্টি হবে হয়ত। এই না ভেবে নতুন করে ফের ওটাকে মাজতে বসেছি, একটুখানি ঘষেছি যেই না, দেখি কি, পেল্লায় চেহারার বিকটাকার এক দৈত্য এসে সটান আমার সামনে খাড়া।···'

'সত্যি বলছিস?' শুনেই না আমি চমকে গেছি—দেখলে কী হত কে জানে! চেয়ার সমেত উলটে পড়ি আর কি! সামলে নিয়ে বললাম—'দূর! এখনকার কালে কি আর দৈত্যদানোরা দেখা দেন নাকি? এখন ওঁদের আসতে মানা, তাছাড়া ওনারা কি টিকে আছেন এখনো যে টিকি দেখাবেন আবার।'

'এক বর্ণ মিথ্যে নয় দাদা! এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি ···· ধোঁয়াটে রঙ বিচ্ছিরি চেহারা···' বর্ণনা করে জবা: 'সত্যি বলতে, গোড়ায় আমি একটু চমকে গেলেও দাত্যি দেখে ভড়কাবার মেয়ে আমি নই। তাছাড়া, আলাদীনের গল্পটা তো পড়াই ছিল আমার। প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোকের পরিচয় টের পেয়ে গেছি। সহজ সুরেই বলেছি—'দ্যাখো বাপু! আচমকা এইভাবে এসে এমন করে আমায় চমকে দেবার মানে? ভেবেছ কি তুমি? আরেকটু হলেই এই প্যানটা আমার হাত ফসকে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যেত যে।' ···

সে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে বলল—'হুকুম করুন, কী করতে হবে এখন আমায়।'

'বলি, অ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়?' আমি রাগ করে বললাম—'এই প্যানটা তো কিনেছি বাপু, আজ না। প্রায় বছর দশেক হবে। ঘষে ঘষে হাত ক্ষয়ে গেল আমার। কই, অ্যাদ্দিন ত দেখা দাওনি লাটসাহেব? আগে হলে কাজ দিত। অনেক কিছু করবার ছিল তখন। এখন আর কী করবে!'

আগে আপনি ওটা তোয়ালে দিয়ে ঘষতেন কিনা! আসি আসি করেও আসতে পারিনি তাই। আজ আপনি হাত দিয়ে ঘষেছেন তো এনামেলের গায়। আপনার নখের আঁচড় লেগে দাগ পড়ল কিনা, টনক নড়লো আমার, তাই আমার মুল্লুক ছেড়ে চলে আসাত হলো আমায়। এখন হুকুম করুন কী করব আমি? কিছুই কি করবার নেই আর?'

তার কথায় তখন আমি ভাবতে বসলাম, কী করতে বলা যায় লোকটাকে। ··

'সে কিরে! এত ভাববার কী ছিল তোর?' জবার ভাবনার আমি জবাব দিই: 'দৈত্যদানোদের দিয়ে যতো সোনা-দানা আনিয়ে নিতে হয় তাও জানিসনে! চুনি পান্না হীরে জহরৎ মনি মুক্তো এই সব আনাবি তো . তা না··'

'আহা! সে সব দিন আর আছে নাকি? সে সুখের দিন আর নেই দাদা! গোলড কন্ট্রোল হয়ে যায়নি এখন? চোর-ডাকাতের ভয় নেইকো? একালে

.. এই কলকাতাতেও এখন ? আমাদের এই যাদবপুরেও চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাপি, বোমবাজি দিনরাত লেগেই রয়েছে। তাছাড়া তোমার ওই ইনকমট্যাকসো-ওয়ালারা ধরবে না ? কর্তা আবার সরকারী চাকরি করেন··· পুলিস এসে পাকড়াবে না তাঁকে ? কৈফিয়ৎ চাইবে না, এত সোনা-দানা হলো কোত্থেকে তোমার শুনি ? ঘুষ খাচ্ছো নিশ্চয় ! ব্যস, তার চাকরি খতম ! নইলে গা-ভরা গয়না পরার সখ ছিল না কি আমার ? দু'এক সেট জড়োয়া অলঙ্কারই কি ঐ দানোটাকে দিয়েই না আনাতাম ?'জবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

'তোর ঐ আঁচড়ে মানে, তোর ঐ আঁচড়ণের জন্যে সে খুব বিরক্তি প্রকাশ করল বোধ হয় ?' জিগ্যেস করি আমি।

'মোটেই না। বলল যে, তুমি কবে আঁচড়াও সেই অপেক্ষাতেই বসেছিলাম আমি অ্যাদ্দিন। এখন বল কী করতে হবে ?'

'কী করবে ! তুমি ত রাঁধতে জানো না যে রেঁধে-বেড়ে সাহায্য করবে আমায়। আজ আমার ছেলের জন্মদিন ছিল। ভেবেছিলাম ভালোমন্দ এক-আধটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করব···।'

'তা, রাঁধবার কী দরকার ?' বলল সেঃ 'কোথাকার খানা চাই তোমর বলোনা তাই। কাবুল, কান্দাহার, ইস্তাম্বুল, ইরাণ, তুরাণ, তুর্ক, মোগলাই, পাটনাই, চাইনীজ, প্যারী, মাদ্রাজী,, ঢাকাই, লন্ডন, সুজারল্যান্ড, রোম থেকে রমনা কোথাকার খাবার চাই তোমার হুকুম করো— হাজার রকমের ডিশ এনে হাজির করছি এই দণ্ডে।'

'আহা এতই যদি আনিয়েছিলিস তো আমায় খবর দিসনি কেন রে ? সুরুৎ করে জিভের জল টেনে নিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে আমি শুরু করি।

'কে আনাচ্ছে দাদা ? খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আইন নেই নাকি ? অতো সব খাবার দেখলে পাড়ার লোকদের চোখ ট্যারা হয়ে যেত না ? অথিতিদের তিন পদের বেশি খাদ্য দিতে গেলেই ত বিপদ। পুলিস এসে পাকড়াতো না আমাদের ? পাগল হয়েছো নাকি তুমি !'

'যা বলেছিস ! পুলিসের পরোয়ানার পরোয়া না করেটা কে !' আবার আমার সায় তার কথায়।

'তাহলে আমায় কি করতে হবে বলুন।' জানতে চাইল দৈত্যটা।

'তাইত ভাবচি।' ভাবিত হয়ে আমি বললাম, 'আলাদীনের কাল আর নেই ভাই ! এ বাজারে হঠাৎ এখন বড়লোক হওয়া যায় না। পাড়াপড়শীর চোখ টাটাবে। পুলিসে টের পেলেই জেল। হাতে দড়ি পড়ে যাবে সবাইকার। ভেবে দেখি আমি।···ভালো কথা, কী বলে ডাকবো আমি তোমায় ? তোমার নামটা কি ?'

'নাম ত আমার জানা নেই, তবে আমার মুলুক কোথায় বলতে পারি। জাহান্নাম।'

'না, ওরকম কটমট নামে তোমাকে আমি ডাকতে পারব না বাপু! একটা ভদ্রগোছের নাম রাখব তোমার। ধূমড়োলোচন নামটা কেমন? এটা তোমার পছন্দ?'

'ধূমড়োলোচন?' সে ভাবতে থাকে।

'নামের ভেতর এত ধূম-ধাম দেখে সে ভড়কে যায় বুঝি?' আমি শুধাই।

'কে জানে?' জবা বলে: 'তখন আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে জানাই—'তবে হ্যাঁ, আরেকটা ভালো নামও ছিল বটে। ওর বদলে কুম্ভকর্ণও রাখা যেতে পারত। কিন্তু তাহলে আমার দাদা ভারী রাগ করবে—জানতে পারে যদি। আর জানতে ত পারবেই, তার সামনে ঐ নাম ধরে ডাকবো যখন তোমায়। না, কুম্ভকর্ণ রাখা চলবে না।'

'আমার ঘুমের ওপর নজর দিচ্ছিস? অ্যা?' তক্ষুণি তক্ষুণি আমি রাগ করি।

'তাইত বললাম লোকটাকে, যে ও-নাম রাখা চলবে না। তাতে আমার দাদার ওপর কটাক্ষপাত হবে। আর, বোন হয়ে দাদার প্রতি কটাক্ষপাত করাটা কি ভালো?'

'বোধ হয় ভালো নয়।' একটু দোনামোনায় বলল দানোটা। এবং তারপরই সে জানতে চাইল, 'তাতে খারাপটা কী হতে পারে। আর কটাক্ষপাত বস্তুটা-ই বা কী?

'এই, এখন তোমার দিকে আমি যেমন চেয়ে রয়েছি গো!' বলে তির্যক-দৃষ্টির দ্বারা ওকে বোঝাতে চাইলাম চোখে আঙুল দিয়ে।

চেয়ে চেয়ে ও দেখল খানিক, তারপর বলল, 'এর ভেতর তো খারাপ কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না মোটেই'।

আমি বললাম, 'এর মানে আছে। কিন্তু তুমি তো মানুষ নও তাই এর মর্ম বুঝতে পারবে না। একে বলে মর্মভেদী কটাক্ষ।'

'যা বলেছিস! ওর মর্মভেদ করা কোনো দানোর কম্মো নয়।' জবাকে আমি বললাম। 'ওর মর্মভেদ করতে গিয়ে বলে আমাদেরই মর্ম ভেদ হয়ে যায়!'

'বেশ, তাহলে কুম্ভকর্ণ নয়। ঐ ধূমড়োলোচনই নাম রইল তবে তোমার। আমি ধূমড়ো বলে ডাকলেই তুমি সাড়া দেবে, কেমন? আচ্ছা, এইবার চেহারাটা তোমার পালটাতে হবে বাপু। ঐ চেহারা নিয়ে ভদ্রসমাজে বেরুনো চলবে না। তাছাড়া, আমার ছেলেমেয়েরা দেখলে ভিরমি খেতে পারে। মানে ধূমড়ো হলেও, তোমার ঐ ধূমড়ো চেহারা অচল। একটা সভ্যভব্য চেহারা নিতে হবে তোমায়।'

'হুকুম করুন। কী চেহারা নেব বলুন আমায় আপনি?'

ওকে একটা চিরকুটে তোমার ঠনঠনের ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বললুম, 'এই

ঠিকানায় যাও, গিয়ে দেখে এসো গে আমার দাদাকে। ঐ ধারার চেহারা বানিয়ে আসবে আমার এখানে, তাহলে আর পাড়ার কেউ সন্দেহ করবে না। কোন গোল হবে না তোমাকে নিয়ে আর।'

'আমার রূপ ধারণ করতে বললি ওকে?' শুনে রাগব কি খুশি হব আমি ঠিক ঠাওর করতে পারি না—'আমার চেহারাটা তাহলে তুই বেশ ভদ্রগোছের বলছিস?'

'তা মন্দ কি এমন? চাকর-বাকর হওয়ার পক্ষে অন্তত আমি ত বেশ চলনসই চেহারা বলেই মনে করি।'

'আমার রূপ ধরে লোকটা তারপরে তোদের কাজে এসে লাগল বুঝি এখানে?' আমি জানতে চাই।

'আমায় চাকর রাখো চাকর রাখো চাকর রাখো গো!' বলে যদিও আমি গান গেয়ে সাধিনি কোনোদিন জবাকে, তাহলেও আমার ওরফে হয়ে শ্রীমান ধূম্রলোচন (কিংবা ধূম্রড়োলোচনের বিকল্পরূপে এই আমি) ওদের চাকরিতে বহাল হয়ে কেমনধারা কাজ বাজালাম জানবার আমার কৌতূহল হয়।

'খানিক বাদে দেখি কি, আমাদের ইস্ট রোড ধরে কুঁজো হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে বেচারা। তোমারই চেহারা বানিয়ে এসেছে বটে। কিন্তু ছেঁড়া চটি পায় লুঙ্গি পরণে কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ ও কী চেহারা তোমার!'

ওর কথায় সেই ছড়াটা আমার মনে পড়ে···নুব্জ পৃষ্ঠ কুব্জ দেহ সারি সারি উট। চালকের ইঙ্গিত মাত্রই দেয় ছুট। কিন্তু যতই বিচ্ছির হোক না, অমন উটকো চেহার কখনই নয় আমার 'হতেই পারে না কক্ষনো।' আমি ঘোরতর প্রতিবাদ করি।

'আমিও সেই কথাই ভেবেছি! তোমার ঐ মূর্তি তো দেখিনি কখনো আমরা।··· দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল! তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ করল নাকি? নাকি, পড়ে গিয়ে হাত পা মচকে বসেছো। কুঁজো হয়ে অমন করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছো সেইজন্যে। আর ধূমড়ো গিয়ে তোমার সেই চেহারা দেখেই না···'

কথাটায় আমারও যেন কেমন খটকা লাগে। —'কোন মাস ছিল তখন রে? তারিখটা তুই বল ত আমায়!'

'পয়লা আষাঢ় ছিল দিনটা। আকাশ মেঘে মেঘে ভার। বেশ মনে আছে আমার। সেই আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ঐ শ্রীমূর্তি ধরে আমাদের এই ইস্ট রোড দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তুমি আসছিলে।'

'হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে আমার।' আমি বলে উঠি, 'প্রথম বাদলার ঠাণ্ডায় আমার ফেরারী বাতটা ফিরে এসে চাগড়া দিয়ে উঠেছিল সেদিন ফের। রাত্তিরের লুঙ্গিটা আর ছাড়া হয়নি সকলে। তাই লুঙ্গি পরে ছেঁড়া স্লিপারটা পায়

গলিয়ে কুঁজো হয়ে খঁাড়িয়ে খঁাড়িয়ে এঘর ওঘর করছিলাম বটে। তোমার শ্রীমান তখন গিয়ে সেই কাহিল অবস্থায় দেখে থাকবে হয়ত আমায়।'

'বাত? তোমার বাত?' জবা গালে হাত দেয়—'ফক্কুরি পেয়েছো নাকি? সাত জন্মে তোমার বাত হতে দেখিনি। তোমার বাত তো আমরা জানি—কেবল তোমার ওই মুখেই! এইতো জানি আমারা। বাত ফক্কুরির আর জায়গা পাওনি নাকি? আমার কাছে চালাকি?'

আরে, সে তো হলো গে বাতচিৎ—আমাদের মুল্লুকী ভাষায়; কিন্তু আমাদের সেই বিহারী বাতের কথা আমি বলছিনে। তোদের বাংলা ভাষায় যাকে বাত বলে রে যে আগে এসে পায়ে পড়ে, তারপর হাঁটু ধরে, ক্রমে কোমর জড়ায়, তারপরে আগাপাশতলা পাকড়ে চিৎ করে ফ্যালে শেষটায়। নট নড়ন চড়ন—নট কিচ্ছু সেই বাতচিতের কথাই বলছি আমি। আমাদের হিন্দিতে যাকে ··'

'তোমাদের হিন্দিতে যাকে মহাব্বাত বলে তাই তোমায় ধরেছিল বুঝি?' বাধা দিয়ে জানতে চায় জবা।

'মহাব্বাতের কথা রাখ। উ বাত হামকো মৎ বাতাও। আমি বোনের মুখে মহাব্বাতের কথা শুনতে চাইনে।' ওর কথায় আমি বাধা দিই—'সে বাত তো আমার সেরে গেছে দুদিনেই। দুদিন ফক্কুরি করার পর যেমন ঝঞ্ঝাবাতের মতন সে এসেছিল তেমনি কেটে পড়েছে তরপর।'

'আমি জানব কি করে? আমি তো কোনোদিন ঐ চেহারা তোমার দেখিনি ···কুঁজোর থেকে জল গড়িয়ে খাবার সময়েই যা তোমাকে আমি কুঁজো হতে দেখেছি। সঙ্গদোষেই বলা যায় হয়ত তাকে। কিন্তু তোমার সেই মন্থরামার্কা চেহারা আর ওই মৃদু-মন্থর গতি বিলকুল আমার ধারণার বাইরে।'

'ঠিক প্রদীপের মতন না হলেও চিরকাল আমি নিবাত নিষ্কম্প।' আমি বলি—'অমন বাতাহত কদলী কান্ডবৎ পড়ে থাকতে হবে, অমন কান্ড আমি করব আমিই কি কোনোদিন তা কল্পনা করতে পেরেছিলাম? সে কথা যাক, তার পর কি হলো তাই বল। আমার বিকল্পকে তোদের রাস্তা দিয়ে ঐ কুঁজো হয়ে খঁাড়িয়ে খঁাড়িয়ে আসতে দেখে কী করলি তুই তারপর?'

'আহা! তোমাকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতে দেখে আমি আগ বাড়িয়ে গিয়ে হাতে ধরে তোমায় নিয়ে এলাম বাড়িতে। পাছে তুমি পাড়ার কারো নজরে পড়ে যাও। দাদার এই দুরবস্থা আর বোন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাই দেখছে—এটা দেখলে লোকে বলবে কি? ভাববে-ই বা কি আমায়!'

বোনের হাতে বিকল্প আমার সমাদরটা কেমন হলো, মনে মনে আমি কল্পনা করি।—'তা বটে তা বটে! তারপর?'

'এলাম ত! এখন কী করতে হবে আমায় বলুন তাই। বললে তখন তুমি। তুমি মানে তোমার সেই ওরফে।'

ওর কথায় আমি ভাবতে বসলাম—'তাই ত, তোমাকে দিয়ে কী করানো যায় ভেবে দেখি। আলাদীনের কাল ত আর নেই এখন। তুমি যে রাতারাতি সাত মহলা বাড়ি বানিয়ে দেবে সেটি হচ্ছে না। তোমাকে দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি মোহর আনাব, কাঁড়ি কাঁড়ি হীরে জহরৎ, তাও হবে না। তোমাকে দিয়ে দেশ-বিদেশের ভালোমন্দ খাবার আনিয়ে খাবো যে, তাও হবার নয়। সেকালে আইন-টাইনের কোনো বালাই ছিল না, পুলিস ফুলিসও ছিল না বোধ হয়। এখনকার আইন-কানুন ভারী কড়া। একটুখানি ইদিক উদিক হবার যো নেই। তাহলে এসেছো যখন, থেকে যাও। কোনো-না-কোনো কাজে লাগবেই। বাড়ির কাজকর্ম করার লোক মেলে না আজকাল। বাসন-কোসন মাজা, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ, বাজার হাট করা—এইসব কাজ তুমি করবে। তোমাকে আমি লুচি ভাজতে অমলেট বানাতে শিখিয়ে দেব এক সময়। এইসব টুকি-টাকি কাজ করতে পারলেও নেহাৎ কম হবে না। তাই বা করে কে? তাই করবার লোক বা পাচ্ছি কোথায়? পঞ্চাশ টাকা মাইনে হাঁকলেও কাজের লোক পাওয়া যায় না আজকাল। এইসব কাজ করবে তুমি।'

আমার কথায় মাথা নেড়ে বলল সে—'যা হুকুম।'

কিন্তু জবার কথায় অবাক হতে হয় আমায়—'বলিস কি রে? আলাদীনের সেই অদ্ভুত-কর্মাকে হাতে পেয়েও তুই তাকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে পারলিনে? ফাই-ফরমাস খাটবার ফালতু কাজে লাগালি কেবল? আশ্চর্য!'

'ভেবে দেখলে এইটেই কি কম নাকি দাদা? খুব বরাত জোর থাকলেই এমন একটা লোক পাওয়া যায় আজকাল—তা জানো? ভেবে দেখো, সব কাজ করবে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, অথচ এক পয়সা তাকে মাইনে দিতে হবে না, কোনো খোরাকিও নেই আবার! এটা কি একটা কম লাভ হল নাকি?'

'যথা লাভ!' কথাটা মানতে হয় আমাকে।

'বরাতজোর না থাকলে এমন একটা লোক, তাও মাগনা, মেলে কি এখন আজকাল? তুমিই বলো না দাদা!'

'তা, বরাত বটে তোর!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমি বললাম: 'পরশপাথর হাতে পেয়েও লাখ লাখ টাকার সোনা বানিয়ে নিতে পারলি না? মিনি মাইনে বিনা খোরাকির চাকর নিয়েই খুশি হয়ে রইলি!'

'কী করব দাদা। লাখ লাখ টাকার সোনা নিয়ে কী হবে যদি তার জন্য জেলে গিয়ে সারাজীবন কাটাতে হয়? তা যাই বলো, এ বাজারে অমন একটা চাকর পাওয়াও কম ভাগ্যির কথা নয়। ঘর সংসার তো করলে না। তুমি এর মর্ম কী বুঝবে? যাই হোক, ধুমড়ো কাজকর্ম করছিল বেশ…।'

'খুব ধুম ধাম করে?'

'না। নিঃশব্দে। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে কর্তা আপিস চলে গেলে পর সে

আসত। যা কিছু করবার সব করে দিয়ে দোকান বাজার সেরে চারটে বাজার আগেই চলে যেত, কারো নজরে পড়ার কোনো জো ছিল না। সবার চোখের আড়ালে তাকে রেখেছিলাম। কাপড় কাচতে, কুটনো কুটতে, বাটনা বাটতে শিখে গেছল, অমলেট-টমলেট ভাজতেও শিখিয়ে দিয়েছিলাম। এমন সময় হলো কি, একদিন কে নাকি মাতব্বর মারা যাওয়ায় তাদের ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল হঠাৎ, তারা অসময়ে বাড়ি ফিরে আসতেই ধূমড়ো তাদের চোখে পড়ে গেল··· টুম্পা তো তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে, ও মা! মামা যে! আর টিকলু তাকে ভালো করে লক্ষ্য করে বলেছে, মামা এমন কুঁজো হয়ে গেছে কেন রে দিদি?'

'আমার ব্যারাম সেরে গেল আর তারটা সারলো না তখনো?' আমার বিস্ময় লাগে।

জবা বলল—'ও কী করে টের পাবে বলো! ও তো তার পরে তোমাকে আর দেখেনি। টুম্পা আমাকে জিগ্যেস করলো, মামা এমন খোঁড়াচ্ছে কেন মা? আমি বললাম তোমার মামাই জানে! টিকলুও তখন ধূমড়োকে শুধায় — মামা, তুমি লুঙ্গি পরে আছ কেন গো? তোমাকে লুঙ্গি পরতে দেখিনি কখনও তো আমরা।'

ধূমড়ো ওদের দেখে অবাক হয়ে গেছল, আমাকে জিজ্ঞেস করল—'ওরা কারা?'

আমাকে তখন বলতে হলো যে, 'তোমার মামা নয় এ, নূতন লোক, ঠিকেয় কাজ করে, তোমার মামার মতন দেখতে তাই, তোমাদের ভুল হচ্ছে। এক চেহারার দুজন লোক কি দেখা যায় না? এর নাম হলো গে ধূমড়ো, শুদ্ধ ভাষায় বলতে গেলে ধূম্রলোচন।'

'তাহলে তো ভারী গোল বাধবে মা', বলল টুম্পা—'মামা যখন আমাদের বাড়ি আসবে, তখন দুজনের মধ্যে কে যে মামা ঠাউরে উঠতে পারব না আমরা।'

'দাঁড়া, আমি শুধরে দিচ্ছি এখুনি। তোর মামা তো গল্প লেখে, একে আমি কবি বানিয়ে দিচ্ছি এখন। ধূমড়ো, তুমি চট করে দাড়ি বানিয়ে ফেলো তো? দাঁড়িয়ে দেখছ কি, দাড়ি বানাও।'

'জানিস', জবাবে আমি বলি 'আমাদের দেহাতী ভাষায় দাড়ি বানানোর মানে দাড়ি কামানো। ও তো নাপিত নয় যে দাড়ি বানাতে পারবে। তাছাড়া, টুম্পা টিকলুর কি দাড়ি হয়েছে যে বানাবে, দাড়ি কামিয়ে দেবে তাদের।' ভাষা সমস্যার পরেও আরো প্রশ্ন থেকে যায় আবার—'তাছাড়া, দাড়ি হলেই কি কবি হয় নাকি রে? কবিতা লিখতে হবে না?'

'কবিতা কে দেখছে দাদা? আর দেখলেই কি কবিতা বোঝা যায়, কবিতা পড়ে কি কবিতা বুঝতে পারে কেউ? কবিতা নয়, দাড়িতেই কবির পরিচয়,

হনুমানের যেমন ল্যাজে···যাকগে, বলতেই, ধুমড়ো চাপ চাপ দাড়ি বানিয়ে বসল। আমার ছেলেমেয়েরা তো অবাক। টিকলু ওর কাছে গিয়ে দাড়িটা টেনে টেনে দেখল—'না, নকল নয় ত, একেবারে আসল দাড়ি রে দিদি! টানলে খুলছে না।' ধুমড়োও বলল—'অমন করে টেনো না দাদা! লাগছে আমার।' কাণ্ড দেখে সবাই ওরা অবাক।

'হবার কথাই।' আমি বললাম -'কমা নয়, সেমিকোলন নয়, একেবারে দাড়ি।'

তারপর টুম্পা বলল, 'খেতে দাও মা, খিদে পেয়েছে ভারী।' 'জলখাবার তো করা হয়নি', বললাম আমি, 'তোরা তোরা যে এমন হুট করে আসবি আমি জানব কি করে?' তখন ধুমড়ো বলে উঠল, 'কী খাবে বলো না দিদি, আমি এনে দিচ্ছি এক্ষুণি।' 'পারবে আনতে?' টুম্পা বলে, 'বেশ, তাহলে নিয়ে এসো, কেক, চকোলেট, প্যাটিজ পটাটো চীপ; স্যানডউইচ, কলিটির আইসক্রীম।' টিকলু বলল 'আমার চাই, মোগলাই পরোটা, কবরেজি কাটলেট, ভীমনাগের সন্দেশ!' চক্ষের নিমেষে সব আনিয়ে দিল ধুমড়ো, হাত বাড়িয়ে আকাশ থেকে যেন পেড়ে আনল ডিস ডিস খাবার। খেয়ে-দেয়ে তৃপ্ত হয়ে ভাইবোন বলল তখন, 'তুমি নিশ্চয় ম্যাজিক জানো ধুমড়ো। টাকা ওড়াতে পারো নিশ্চয়?' ধুমড়ো বলল, 'নিশ্চয়। দাও টাকা, উড়িয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।' টিকলু বলল - 'টাকা পাচ্ছি কোথায়? আমার কি টাকা আছে? আচ্ছা, তুমি আমার এই ফাউণ্টেন পেনটা উড়িয়ে দাও।' হাতেও নিতে হলো না, টিকলুর পকেট থেকেই কলমটা উধাও হয়ে গেল। 'বারে! আমি এখন লিখব কী দিয়ে? আমাকে একটা খুব ভালো আর দামী কলম এনে দাও তাহলে। নইলে আজকে আমি আমার হোমটাসক করব কি করে?' অমনি তার জামার যথাস্থানে চমৎকার একটা কলম লটকানো দেখলাম। 'যখন ওড়াতে পারো, তখন তুমি টাকা আনতেও পারো নিশ্চয়।' বলল তাকে টিকলু 'দাও তো আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা। সিনেমা দেখে আসি আজ ম্যাটিনি শো-য়ে।' টুমপাও ছাড়বার পাত্রী নয় আমার একশ টাকা চাই কিন্তু, পছন্দসই একটা শাড়ি কিনব আমি। ফ্রক পরতে আর ভালো লাগে না আমার। তারপর একশ পাঁচ টাকা হাতে পেয়ে ভাইবোনে দুটিতে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আমি তখন ধুমড়োকে বললাম—কর্তার আসার সময় হয়ে এল। তুমি তার জলখাবারটা বানাও দেখি এবার? একটুখানি সুজি করো আজ, কেমন?

তারপর ধুমড়ো দোতালার রান্নাঘরে চলে যেতেই আমি আমার উল নিয়ে বুনতে বসেছি, এমন সময়ে দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। কর্তার আগমন আন্দাজ করে আমি দরজা খুলে দিতে গেলাম। গিয়ে দেখি···যা দেখলাম তাতে তো আমার চক্ষু স্থির! আক্কেল গুড়ুম। পুলিশের লোক দরজায়। আস্ত একজন ইনসপেক্টর দাঁড়িয়ে!

'বলিস কিরে !' পুলিশের কথায় আঁতকে উঠেছি আমিও।

'তখনই বুঝলাম যে ফ্যাসাদ বাধিয়েছে ধুমড়োলোচন। একশ টাকার যে নোটখানা বানিয়ে দিয়েছে ওদের, সেটা ঠিক ঠিক আমাদের কারেনসির নোট হয়নি···তাই এই পুলিস ইন্সপেক্টারের আমদানি।'

'আমি জানি দিদি।' আমি তখন বলি –'ঘরে বসে কি টাকা করা যায় না ? যায়। চেষ্টা করলে আমিও হয়ত করতে পারি। কিন্তু সেই টাকা বাজারে চালাতে গেলেই মুশকিল। কি করলো তখন ইন্সপেক্টর ? ধরে নিয়ে গেল তোদের সবাইকে ? ধুমড়োকে শুদ্ধু ?'

'না। সে বললে, আপনারা একজন নুতন লোক রেখেছেন আমরা খবর পেলাম। তার নাম-ধাম গোত্র ঠিকানা জানতে চাই আমরা। চাকরবাকর দিয়ে বাড়ি বাড়ি চুরি চামারি হচ্ছে আজকাল, তাই আমাদের তরফ থেকে এই সতর্কতার ব্যবস্থা। ওর টিপ সইটাও চাই, আর ফটোও তুলে নেব একখানা ! তাছাড়া, ওর রেশনকার্ডটাও পরীক্ষা করা দরকার। ডাকুন একবার লোকটাকে।' তখন আমি হাঁফ ছেড়ে বললাম, 'আপনি এই সোফাটায় বসুন। ডাকছি।' বলে হাঁক পাড়লাম আমি—'ধুমড়ো, নেমে এস ! সব কাজ ফেলে সোজা – চটপট এক্ষুণি।' বলতেই সে ছাত গলে চক্ষের পলকে নেমে এল। তার ঐ আবির্ভাবে কেমন হকচকিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। চোখ মুছে নিয়ে ভদ্রলোক ধুমড়োকে শুধোলেন। 'তোমার নাম কি হে ?' 'ধুমড়ো, ধুমড়োলোচন।' অদ্ভুত নাম ত ! দেশ কোথায় ?' 'জাহান্নাম।' 'বাব্বা ! জায়গাটা তো আরো জব্বর। তোমার রেশনকার্ডটা দেখাও দেখি।' 'এখানে আমার কিছু নেই। সব আমার মুল্লুকে আছে। আপনাকে জাহান্নামে গিয়ে দেখতে হবে। ইন্সপেক্টর বললেন 'সেখানে গিয়ে দেখবার আমার দরকার নেই। এখানে চটপট একটা রেশনকার্ড করিয়ে নিয়ো, বুঝলে ? ওবেলা থানার থেকে ফোটোগ্রাফার এসে তোমার ফোটো তুলবে। চেহারাটা তোমার কেমন চেনাচেনা ঠেকছে আমার, কেন জানি না।' বলে বিদায় নিলেন ইন্সপেক্টর।

তিনি চলে যাবার পর আমি ধুমড়োর দিকে তাকালাম, ওমা ! একি ! দেখতে দেখতে লোকটা যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কেমন ! ওদিক থেকে পোড়া ঘিয়ের গন্ধ এসে নাকে লাগে ! ধরা সুজির সুরভি।

'ধুমড়ো ! প্যানে সুজি চাপিয়ে এসেছিলে বুঝি ? সুজিটা ধরে গেছে। ওমা ! তুমি এমন করে চোখের উপর উপে যাচ্ছ কেন গো ! কী হলো তোমার ?'

'উপচীয়মান ধুমড়োর উদ্দেশে বললি তুই ?' আমি বলি। 'উপচে উঠে গেল কোথায় সে ?'

'আর কী হবে। যা হবার হলো।' বলতে বলতে ধুমড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলঃ 'তুমিই করলে তো। হীটারে প্যান বসিয়ে সুজি

চাপিয়েছিলাম, তুমি সোজা নেমে আসতে বললে সটাং। আমি সোজাসুজি নেমে এলাম। প্যানটা গিয়ে ওর কলাইকরাটা ঝলসে গেছে সব। এখানকার মেয়াদ আমার ফুরলো এখন আমি চললাম।'

'ধূম করে চলে গেল—ঐ ধূম হয়ে?' আমি বলি—'এত ধূমধাম করার পর।'

'হ্যাঁ দাদা।' জানায় জবা—'গেল ধূমসোটা, যাবার সময় বলে গেল…'

'কী বলল?'

'বলল যে,– বলে ধূম্র সত্যিই ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেস ঘর থেকে। 'আমি চললাম আমার জাহান্নামে! এ জীবনে আর দেখা হবে না আমাদের।' অন্তরীক্ষ থেকে আওয়াজ পেলাম তার।'

ধূম্রলোচন ততক্ষণে অন্তর্হিত!

খুব ছোটবেলায় বড় হবার স্বপ্ন সবাই দেখে। বড় হবার আর বড়লোক হবার। আহা, হঠাৎ যদি একদিন বড় হয়ে ওঠা যেত!

একদা সুপ্রভাতে উঠে দেখলাম আমি বাবার মতন হয়ে গেছি। কেবল লম্বায় চওড়ায় নয়, টাকাপয়সাতেও। আঃ, সে কী মজা!

'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে,'—পড়েছি পদ্যপাঠে। ছোট তো হয়েইছি। এখন তাহলে বড় হবার বাধা কী আর?

অকস্মাৎ বেড়ে-ওঠার একটা স্বাভাবিক অসুবিধা আছে—যেটা সে-বয়সে বুঝতেও বেগ পেতে হয় না। কিন্তু মাথায় বাড়তে না পারলেও টাকার দিক থেকে বাড়বাড়ন্ত হবার বাধা কোথায়?

শৈলেশ, ভোলানাথ আর আমি—আমরা তিন বন্ধু মিলে বড়লোক হবার ধান্দায় ছিলাম—সেই কিশোর বয়সেই।

'এবার আর যা তা করলে চলবে না।' বলল ভোলানাথ: 'একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুতে হবে আমাদের।'

'বাস্তব?' জিগ্যেস করলো শৈলেশ: 'বাস্তবের মানে জানো?'

ভোলানাথের কথায় তাকে অবাক হতে দেখা গেল। 'ঠিক বাস্তবিক জানি না, তবে মনে হচ্ছে সেটা বাসের ব্যবসা হবে। বাস চালাবার ব্যবসা।' আমি বললাম।

'বাস ?' আকাশ থেকে পড়লো ভোলানাথ।

'সাবাস।' বলল শৈলেশ—আমার কল্পনার দৌড় দেখেই বোধকরি।

মফস্বলের ছেলে হলেও কলকাতা আমরা অনেকবার ঘুরে গেছি। বাসে ট্রামে চাপারও কসুর করিনি। কাজেই বাস আমাদের কাছে পূর্ণমাত্রায় বাস্তব।

'বাস চালাবে কোথায় শুনি ?'

'কেন আমাদের এই গাঁয়ে। গাঁয়ের লোকেরাই চাপবে বাসে। ট্রেন ধরতে হাটবারে সাত মাইল দূরে তুলসীহাটার হাটে যেতে বাসের যাত্রীর অভাব হবে না। তাছাড়া -তাছাড়া আমাদের ইস্কুলের ছেলেরাও চাপতে পারবে বাসে।' আমি জানালাম।

'ইস্কুলের ছেলেরা ? পয়সা দিয়ে বাসে চাপবে তারা ?' ভোলানাথের জিজ্ঞাসা ঃ 'মানে, বাস তার চাপবে ঠিকই, কিন্তু পয়সা দেবে কি ভাই ?'

'কেন দেবে না ? তাদের জন্যে আমরা হাফটিকিট করে দেব না হয় ?…'

বলতে গেলে, বিশখানা গাঁয়ের ছেলেদের জন্যে একটা ইস্কুল। সেই একমাত্র ইস্কুলটা আমাদের গাঁয়ে। আমাদের গ্রামটা স্টেশনের কাছাকাছি বলে স্বভাবতই একটু সমৃদ্ধ ; শুধু ইস্কুলই নয়। ডাক্তারখানা, পোস্টাপিস, থানা সবকিছুই আমাদের গ্রামে। বিশখানা গাঁয়ের ছেলে দু' মাইল পাঁচ মাইল হেঁটে পড়তে আসে আমাদের গ্রাম্য হাইস্কুলে। আমরা যদি তাদের হণ্টনকষ্ট লাঘব করি, মানে, আমাদের বাস যদি ইস্কুল-টাইমে বিশখানা গাঁয়ের ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে আসে, আবার ছুটির সময় তাদের বাড়ি পেঁৗছে দিই, আর টিকিটের দাম করি দু'পয়সা চার পয়সা, তাহলে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ত্রিশ দিনে বেশ দু'চার পয়সা আমাদের পকেটে এসে যায়। প্রাঞ্জল করে বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলাম।

'কিন্তু বাস জোগাড় হবে কোথা থেকে ? বাসের দাম যে অনেক রে দাদা !'

'মহকুমায় আমার এক স্যাকরা মামার বাসের ব্যবসা আছে বলেছি না তোমাদের ? পুরনো বাসটা বাতিল করে মামা নতুন বাস কিনেছে একখানা। পুরনো বাসটা পড়ে আছে অমনি। সেদিনও দেখেছি মামার বাড়ির পাশে কাঁঠালগাছের তলায় দাঁড়-করানো আছে বাসখানা।'

'বাস তো আছে বুঝলাম, কিন্তু আস্ত আছে কি ?'

'বিলকুল আস্ত। টায়ার-টিউব-ইঞ্জিন-ফিঞ্জিন সবসমেত। মামার কোনো কাজেই লাগছে না। মামাকে ভজিয়ে-টজিয়ে একেবারে জলের দামেই পাওয়া যাবে বাসটা।'

'জলের দাম ! জলের দাম বললে কী বুঝব ! দামের একটা আঁচ দেবে তো।' ভোলানাথের দাবি।

'একেবারে ওজনদরে আর কি !' আমি জানাই।

'বাস কি ওজন করে খরিদ বিক্রি হয় নাকি!' ভোলানাথ হতবাক। 'পাল্লায় চাপানো যায় বাসকে? অত বড় পাল্লা পাওয়া যায় কোথায়?'

'না।' আমি ঘাড় নাড়িঃ 'বাস কারো পাল্লায় যাবার পাত্র নয়। বাসের পাল্লাতেই পড়ে থাকে মানুষ।'

'তাহলে?'

'বাসের বডিটা কাঠের দরে, ইঞ্জিন-টিঞ্জিন লোহার দামে। মামাকে বোঝাতে হবে এই মহকুমায় তোমার বাস কিনবে কে? ওকে তো চেলাকাঠ বানিয়ে বিক্রি করতে হবে তোমাকে। সেই দামে তুমি আমাদের দিয়ে দাও মামা, চেলাকাঠ না বানিয়ে।'

'তাই বলো!' হাঁফ ছাড়ে শৈলেশঃ 'নইলে একবার চেলাকাঠ বানিয়ে ফেললে তারপর আবার তাকে জোড়াতাড়া দিয়ে বাস বানানো ভারি হাঙ্গামা হবে কিনা কে জানে!'

'তা তো হলো। এখন বাস চালাবে কে শুনি?' ভোলানাথ নতুন সমস্যা আসেঃ 'আমরা তো কেউ মোটর চালাতে জানি নে।'

'পাঁচু জানে। আমাদের পাঁচু। সেই চালাবে বাস।'

'আমাদের দু-কেলাশ নিচে পড়ে যে পাঁচু? দাড়ি-গোঁফ বেরিয়ে গেছে যার?'

'হ্যাঁ, সে-ই।' আমি সায় দিই। —'গাড়ি চালাতে ওস্তাদ। ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি থেকে কলকাতায় পালিয়ে এক মোটর-গ্যারেজে কাজ নিয়েছিল সেইখানেই মোটরের সব কাজকর্ম মায় মেকানিজম পর্যন্ত সবকিছু সে শিখে এসেছে। এমনকি, ড্রাইভিং লাইসেন্সও রয়েছে নাকি তার!'

'তাহলে তো চমৎকার!' উছলে ওঠে শৈলেশঃ 'তাহলে তাকে আমাদের কোম্পানির একজন অংশীদার করে নেয়া হোক, এই আমার প্রস্তাব।'

আমি বললাম, 'তথাস্তু।'

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে গেল প্রস্তাব।

'আচ্ছা, ড্রাইভার তো হলো, এখন কণ্ডাক্টার। বাসের কণ্ডাক্টার কে হবে?' ভোলানাথ যতো নতুন-নতুন ফ্যাকড়া নিয়ে আসে।

'কণ্ডাক্টার হবো আমি।' আমি প্রকাশ করি।

'কেন, তুমি হবে কেন?' শৈলেশ আপত্তি করেঃ 'আমরা কি কেউ কণ্ডাক্টার হতে পারি নে? টিকিট কাটতে জানিনে আমরা?'

'বেশ, কেটো না-টিকিট। বাধা দিচ্ছে কে? বাসের মালিক হিসেবে তোমরা যদি অমনি না গিয়ে টিকিট কেটে যাও সে তো ভালোই আরো। বাসের দু' পয়সা আয় বাড়লে তার ভাগ তো আমরা সবাই পাবো। চারজনাই।'

'সে টিকিট কাটা নয় হে! খচ খচ করে কাটবো টিকিট।'

'অতো খচখচিতে আমি নেই। আমি হব কণ্ডাক্টার—আমি আগে বলেছি। তারপর আমি যদি কণ্ডাক্টারগিরি করতে না পারি, তখন তোমরা হয়ো।'

অগত্যা আমার কথায় সায় দিতে তারা বাধ্য হয়।

বাসের কণ্ডাক্টার হওয়াটা, ভেবে দেখছি আমি একটা ফাণ্ডামেণ্টাল ব্যাপার। ও নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না ; ওঠা উচিত নয়। টিকিট বেচার যাবতীয় ফাণ্ড কণ্ডাক্টারের জিম্মায় থাকে - তার সদগতি করার সমূহ দায় হচ্ছে তার। আর এই ফাণ্ড হাতাবার মেণ্টালিটি আমার চিরকালের ·· সেই ছোটবেলাকার থেকেই।

'এইবার আয়ব্যয়ের কথায় আসা যাক,' ভোলানাথের নয়া প্রশ্নের আমদানি।

'ব্যয় হচ্ছে, খালি পেট্রলের। তাছাড়া সমস্তটাই আয়!' আমি জানাই।

'কী রকম আয় হতে পারে, হিসেব করা যাক তো'। শৈলেশ ব্যক্ত করে, 'তার ওপরেই তো অংশীদারদের লভ্যাংশ নির্ভর করছে।'

বসা গেল হিসেবে। পাঁচশো ছেলের ইস্কুল আমাদের। তার মধ্যে, বাসার কাছে ইস্কুল বলে, আমাদের গাঁয়ের ছেলেরা যদি বাসে নাও চাপে, যাদের দূরে-দূরে বাড়ি তেমন ছেলের সংখ্যাও নেহাত কম হবে না। তার ভেতরে যদি গড়পড়তা পঞ্চাশটা করে রোজ স্কুল কামাই করে তাহালেও শ চারেক পড়ুয়া প্যাসেঞ্জার বাঁধা আমাদের।

'এক আনা করে টিকিট হলে ', শৈলেশ পাড়ে।

'এক আনার রিটার্ন টিকিট, ইস্কুলে যাওয়ার আর আসার।' আমি বলি। —'ছাত্রদের কনসেসন দিতে হবে না।'

'বেশ তাই হলো। তা হলেও চারশো আনা। চারশো আনায় কত টাকা কত আনা?'

'হিসেব পরে করলেই হবে। বাস তো হোক আগে।' আমি বলি।

আসলে, অঙ্কে আমি কাঁচা। আর, টাকা আনা পাইয়ের আঁক ভারি কড়া। তাছাড়া, ফাণ্ডামেণ্টাল জিনিসটা যখন 'আমার হস্তগত হয়েছে, তখন যতটা বেহিসাবের মধ্যে থাকা যায় ততই ভালো। হিসেবের মধ্যে আমি সহজে মাথা গলাতে যাই না।

'ছেলেদের খালি কনসেসন তো, বাকি যাত্রীদের তো আর নয়। ধরো, যারা স্টেশনে যাবে ··'

'আমাদের গাঁয়ের কেউ বাসে চেপে ইস্টিশনে যাবে না।' ভোলানাথ বলেঃ 'বাড়ির কাছে ইস্টিশন। হেঁটেই মেরে দেবে সবাই।'

'দূরে-দূরে গাঁয়ের থেকে যাবে যারা? গোরুর গাড়ির ভাড়া কত পড়ে জানো কি? দেড় টাকা দু-টাকার কম নয়। সেখানে আমরা আট আনায় নিয়ে যাবো। আট আনা করে টিকিট হবে ইস্টিশনের -- মালের ভাড়া সমেত। মালপত্তর থাকবে ড্রাইভারের পাশে তার হেফাজতে।'

'চলো ড্রাইভারের কাছে যাই তো।' আমি বললাম, 'পাঁচুর সঙ্গে কথাটা পাকা হয়ে যাক আগে।'

পাঁচকড়ি সবকথা মন দিয়ে শোনে আমাদের। তারপর জিগ্যেস করে ঃ 'বাসটার ডাইমেনসন ?'

'ডাইমেনসন মানে'। শুনেই তো আমরা চমকাই।—'সে আবার কী গো ?'

'প্রত্যেক জিনিসেরই তিনটে ক'রে ডাইমেনসন থাকে।' ব্যাখ্যা করে পাঁচু ঃ 'লম্ব, প্রস্থ আর উচ্চতা। বাসের সেটা কত জানা দরকার আগে।'

'কেন বলো তো ?'

'ইস্কুলে যাবার পথে, স্টেশনের রাস্তায় রেলের কালভার্ট পড়ে না ? তার তলা দিয়ে বাস গলানো যাবে কিনা জানা চাই না আগে ? সেটা ক্রস করে যেতে হবে তো ?'

'তা বটে !' ঘাড় নাড়ি আমরা।

'তাহলে চলো কালভার্টের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আর উচ্চতাটা মাপি গিয়ে আগে। গজ ফিতে নিয়ে যাই আমরা।' পাঁচু বলে ঃ 'তারপর তোমাদের সঙ্গে মহকুমায় গিয়ে বাসটার আগাপাশতলা মাপা যাবে। দুটো মাপ মিলিয়ে দেখা যাবে তখন।'

কালভার্ট যাবার পথে আলোচনা হয় আমাদের।—'বাসটার ইঞ্জিন কেমন ?' জিগ্যেস করে পাঁচু।

'চালু ইঞ্জিন। সেদিন পর্যন্ত চলেছে তো বাসটা।

'চলে তো ঠিকই।' বলে পাঁচু ঃ 'কিন্তু সে কথা নয়। চলার চেয়েও বড় কথা বাসটা থামে তো ?'

'তার মানে ?' তার কথার ধরনে আমি বিস্মিত হই।

'বাসের ব্রেক কেমন ? প্রয়োজন মতো থামানো যাবে তো বাসটা ?' সে শুধোয়।

'সে তো তোমার দেখবার। তুমি তো দেখে নেবে ব্রেক ট্রেক-সব।' শৈলেশ বলে।

'মামাকে সে-কথা শুধিয়েছিলাম আমি। মামা বলেছিল চালাবার সময় মাঝে-মাঝে একটু বেগ পেতে হলেও থামাবার বেলায় কেনো অসুবিধে নেই···'

চৌহদ্দি মাপার পর সেই কালভার্টের কোলেই আমরা বসে পড়লাম ঃ আমাদের কোম্পানির প্রথম বৈঠক বসল।

স্থির হলো মোট একশ টাকা মূলধন নিয়ে আমাদের কোম্পানি চালু হবে। আমাদের চারজনের শেয়ার থাকবে তাতে মোট পঁচিশ টাকা করে নেট।

শৈলেশ তার পৈতেয় যা পেয়েছিল সেই পাওনার থেকে পঁচিশ টাকা জমিয়ে রেখেছিল, বের করে দিলে। ভোলানাথও বের করল পঁচিশ টাকা। 'তারপর তোমার মূলধন কই ?' জিগ্যেস করল আমায়।

সেই এক কথাতেই জবাব দিলাম—'আমার মূলধন কই ! টাকাই তো নেই আমার।'

তখন পাঁচকড়ি একাই বাকি পঞ্চাশ টাকা দিলে। মোটর গ্যারেজে কাজ করে সে অনেক টাকা কামিয়েছে, এ-টাকা তার কাছে কিছুই নয়। তারপর বলল—'আদ্ধেক টাকা আমার। অতএব আমার দুটো শেয়ার হলো—কেমন তো?'

'তা কেন হবে!' আমি আপত্তি করলাম: 'সেটা নেহাত ক্যাপিটালিজমকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না?'

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আমার বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। —'তার চেয়ে বরং পাঁচু, তুমি আমায় পাঁচিশটা টাকা ধার দাও, সেই টাকায় আমারও শেয়ার হোক! বাস চালু হবার প্রথম মাসেই শুধে দেবো তোমার টাকাটা।'

'তোমার লভ্যাংশ থেকে শুধবে তো? কিন্তু ধরো প্রথম মাসে যদি কোনো লাভ না হয়?'

'সে আমি বুঝব!'

কণ্ডাক্টার হিসেবে বাসের তহবিল আমার তাঁবে, কোকড়ির বোঝা আমার ঘাড়েই—কাজেই আমার বোঝার কোনো অসুবিধা ছিল না।

কোম্পানি সংঠনের পর আমরা মহকুমায় গেলাম। দেখলাম সেই কাঁঠাল-গাছতলাতেই সেইরকমই খাড়া রয়েছে একতলা বাসটা।

'অল গন রং!' দেখে আমি বললাম—'অল রঙ গন-ও বলা যায়। ফাঁকা জায়গায় রোদ বৃষ্টি ঝড় লেগে বাসের গায়ের রঙ-টঙ চটে গেছে সব।'

দেখে শৈলেশও চটে গেল বুঝি। বলল—'মরি মরি! এই তোমার বাসের চেহারা!'

'তাতে কী হয়েছে!' আমি বললাম: 'একবার রঙ ফিরিয়ে নিলে তখন এর বাবাও একে চিনতে পারবে না।'

অথরিটির সায় পাওয়া গেল আমার কথায়! ঘাড় নাড়লো পাঁচকড়ি।

তারপর সে গজ ফিতে নিয়ে বাসের চতুর্দিক মাপতে লাগলো—আপাদমস্তক। মাপাজোকার পর বলল সে—'দুধারে দেড় ফুট করে ছাড় থাকবে। আমার মতন ওস্তাদ ড্রাইভার তার ভেতর দিয়ে অনায়সে বের করে নিয়ে যেতে পারবে বাসটা।'

'আর উচ্চতা?' সেটাও যে তুচ্ছতার নয়', মনে করিয়ে দেয় শৈলেশ।

'কালভার্টের উচ্চতা হচ্ছে মোট দশ ফুট।' জানালো পাঁচকড়ি।

'আর বাসটার?'

'তার চেয়ে তিন ইঞ্চি কম।'

'তিন ইঞ্চি মাত্র? এ তো নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ।' আমি বললাম।

'বাস গলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।' পাঁচকড়ি জানায়।

তারপর, অনেক দরাদরি করে চৌষট্টি টাকায় রফা হলো স্যাকরা-মামার সঙ্গে।

মামা বলল, 'পঁয়ষট্টি দাও।'

'এক্ষুনি দেব পঁয়ষট্টি – কিচ্ছু ভেবো না মামা।' আমি বললাম: 'তোমার ঐ বাসটা নিয়েই পঁয়ষট্টি দিচ্ছি আমরা।'

বাসের টায়ারগুলো সব ফ্ল্যাট হয়ে পড়েছিল, পাম্প করে ফাঁপিয়ে নেওয়া হলো সেগুলো।

'ভারি দাঁওয়ে পাওয়া গেছে বুঝলে?' বলল পাঁচকড়ি: 'ইঞ্জিন-টিঞ্জিন সব ভালোই রয়েছে বাসটার।'

হাতে-হাতে প্রমাণ পাওয়া গেল তার। ঠেলতে ঠুলতে হলো না, বারকয়েক হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই চালু হয়ে গেল বাস।

'দাঁড়াও, পেট্রল ভরে নিতে হবে!' বলল পাঁচকড়ি: 'একশ টাকার থেকে চৌষট্টি গেল, হাতে রইলো মোট ছত্রিশ। ত্রিশ টাকার পেট্রল কেনা যাক।'

'আর বাকি ছ টাকায় টিকিট ছাপিয়ে ফেলি আমি।' আমার কর্তব্যের বিষয়েও আমি সচেতন: 'এই মহকুমাশহরে এক ঘণ্টায় ছেপে দেয়, এমন ছাপাখানা আছে। সেবার সরস্বতী পুজোর নেমন্তন্নপত্র ঘণ্টাখানেকের ভেতর ছাপিয়ে দিয়েছিল।'

মাঝখান থেকে শৈলেশ হঠাৎ বোমার মতন ফাটে: 'আমি কিন্তু কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। আমি আগে বলেছি।'

'হও গে।' অম্লানবদনে আমি সায় দিয়ে দিই।

যে খুশি কর্তা হোক না, আমার কী ক্ষতি? খতিয়ে দেখলে, আসল জিনিস তো আমার হাতে—সোল ট্রেজারার তো আমি। আমি ছাড়া আর কেউ বাসের Cash-আকর্ষণ করতে পারছে না।

টিকিট ছাপাবার পর পেট্রল ভরে নিয়ে স্টার্ট দিল আমাদের গাড়ি। চালিয়ে নিয়ে চলল পাঁচকড়ি – অবলীলায়।

নিজেদের বাসে নিজেরা মালিক—গর্বে আমাদের বুক দশ হাত।

'আমরা স্টেশনের যাত্রীদের কত করে ভাড়া ধরেছি? আট আনা না? বাসে কতজন যাত্রী ধরবে, মনে হয়?' শৈলেশের জিজ্ঞাস্য।

'ঐ তো লেখাই আছে বাসের মাথায়—দেখছ না।' আমি দেখিয়ে দিই—'মোট বাইশজন বসিবেক। লেখাই রয়েছে।'

'বসিবেক বাইশ, দাঁড়াইবেক আরো এগারো! এবং ঝুলিবেক গোটা পাঁচেক।' ভোলানাথ যোগ করে।

'না, একজনকেও ঝুলতে দেওয়া হবে না।' আমি ঝুলনযাত্রার বিরোধী—'পাঁচজনের একজনাও যদি হাত-পা ফসকে পড়ে জখম হয়, তাহলে গাঁয়ের লোক আর আমাদের আস্ত রাখবে না। বাসও পুড়িয়ে দেবে। যাত্রী, বাস বা আমাদের—কারোরই পঞ্চত্ব পাবার আমি পক্ষপাতী নই।'

'বেশ, বাইশ প্লাস এগারো এই তেত্রিশজনই সই। তাহলে তেত্রিশ আট

আনা হলো গে সাড়ে ষোলো টাকা। পাঁচবার আপ আর পাঁচবার ডাউন গাড়ি ধরতে হবে স্টেশনে—দশ ট্রিপ যাতায়াতে, মানে মোট কুড়িবারের যাত্রী ধরলে'··· যেতে-যেতে মুখে মুখে হিসেব করে শৈলেশ ঃ 'সাড়েটা বাদ দিলাম হিসেবের সুবিধের জন্যে। ষোলো টাকা ইনটু টেন ইনটু টু ইকোয়াল টু—রোজ আমাদের ইনকাম হবে তিনশো কুড়ি টাকা।'

'সাতদিনের আয় হচ্ছে তিনশো কুড়ি ইনটু সাত—প্রায় দেড় হাজার টাকার ধাক্কা।' ভোলানাথ বাৎলায়।

'চার দেড়ে ছয়—মাসে পাবো আমরা ছ হাজার।' আমি বলি। ততক্ষণে আমরা সেই কালভার্টের পথে এসে পড়েছি।—'সেই কালভার্ট পার হতে দেরি নেই আর! পাঁচু, খুব সাবধান কিন্তু।' মনে করিয়ে দিই পাঁচকড়িকে।

'সে আর তোমায় বলতে হবে না।' বলে পাঁচুও আমাদের আলোচনা যোগ দেয় ঃ 'বছরে দাঁড়াবে তো ছ বারং বাহাত্তর হাজার।'

'আর দশ বছরে হবে গিয়ে সাত লাখ কুড়ি হাজার টাকা! বুঝেচ? আমাদের প্রত্যেকের ভাগে পড়বে···ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং।'

শেষের কথাগুলো কে যেন বললে আকাশ ফাটিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে।

সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ যেন ভেঙে পড়ল আমাদের মাথায়। ঝুরঝুর করে খসে পড়তে লাগল।

আকাশ নয়, বাসের ছাদ।

সবেগে সেই কালভার্টের ভেতর সেঁধিয়ে আটকে গেছে বাস—নট নড়নচড়ন! কালভার্টের ছাদ আর বাসে কলিশন বেধে পরস্পরের কুক্ষিগত হয়েছে।

কোনোরকমে হামাগুড়ি দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম বাস থেকে। বাসকে বার করা গেল না কিছুতেই। কোনোদিন যে বেরুবে সে আশাও সুদূরপরাহত।

'এ-রকমটা হলো কেন পাঁচু?' শুধালাম আমরা, 'কালভার্টের মাথার থেকে বাসটার মাপ তিন ইঞ্চি কম তুমি বললে যে।'

'বলেছিলুম তো! ছিলও তাই। কিন্তু বাসটার টায়ারগুলো যে ফ্ল্যাট হয়ে আছে লক্ষ্য করিনি তখন তো। তারপর পাম্প করার পর উচ্চতায় পাঁচ ইঞ্চি বেড়ে গেছে যে বাসটা। আমার কী দোষ?'

দোষ কার কে জানে, কিন্তু লাখ টাকার স্বপ্ন আমার চুরমার!

গদাইয়ের গাড়ি

'আইডিয়াটা পেলাম এক মোটর গাড়ির এগজিবিশন দেখতে গিয়ে।' বললেন গদাইয়ের বাবা: 'আমার ছেলেকে আমি এঞ্জিনিয়ার করতে চাই কিনা।'

'কিসের আইডিয়া?' আমি জিগেস করলাম

'মোটরের।' জবাব দিলেন তিনি: 'সেখানে আরেক ভদ্রলোকও গেছলেন সপরিবারে এগজিবিশন দেখতে। আমার মতই খুঁটিয়ে দেখছিলেন সব। এমন সময়ে তাঁর ছোট ছেলেটা···সেটা একটা বাচ্চা···'

এই অব্দি বলে তিনি যেন ভাবসমুদ্রে তলিয়ে গেলেন।

'আচ্ছা?' আমি বললাম—তাঁকে আবার উসকে দেবার জন্যেই।

'সেটা একটা অদ্ভুত ছেলে মশাই! আশ্চর্য আশ্চর্য প্রশ্ন করছিল সে। কৌতূহলের তার অন্ত নেই। প্রশ্নও তার অফুরন্ত। জিগেস করল, 'মোটর গাড়ির মা আছে মা?'

'আছে বইকি, নইলে মোটর এলো কোত্থেকে?' বললেন ওর মা।

'দুধ খায়?'

'খায় বইকি বাবা। লক্ষ্মী ছেলের মতই সোনামুখ করে খায়।' এবার জ্ঞান দিলেন ওর বাবা: 'সেই দুধের নাম পেট্রল।'

'পেট কামড়ায় মোটর গাড়ির?'

এবার সবাইকে চুপ মেরে যেতে দেখে আমাকেই গায়ে পড়ে বলতে হলো —বললেন গদাইয়ের বাবা: 'পেট কামড়ালে ডাক্তার আসে, তার নাম মেকানিক।'

খোকা বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকাল।—'আচ্ছা, মোটর গাড়ি ইস্কুলে যায় ?'

'যায় বইকি ভাই !' আমি বললাম ঃ'তবে বই বগলে নয়, তোমাদের মতন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বগলে করে নিয়ে যায়। ইস্কুলে গিয়েই আবার ফিরে চলে আসে।'

'গিয়েই চলে আসে ! ইস্কুলে পড়তে হয় না ? বাঃ বাঃ, বেশ মজা তো !' ফুর্তিতে খোকা হাততালি দিয়ে ওঠে।

'মোটর গাড়ি আপিস যায় মা ?' জানতে চাইল খোকা তারপর। 'মোটর গাড়ির আপিস কোথায় মা ?'

'রাস্তায়।' এতক্ষণে জুত পেয়ে একটা জুতসই জবাব দিল খোকার দিদি ঃ 'রাস্তায় রাস্তায় ওদের আপিস—বুঝলি টুটু ?'

'আচ্ছা, বলুন না, মোটর গাড়ি কি মারা যায় না কখনো ?' দিদিকে আমল না দিয়ে খোকা আমার কাছে জানতে চায়।

'কখনো কখনো।' বলি আমি ঃ 'বাসের সঙ্গে কি ট্রামের সঙ্গে মারামারি করতে গেলেই মোটর গাড়ি মারা পড়ে। মোটর গাড়ির থেকে তুমি সব সময় দূরে থাকবে খোকা ! তুমি যেন তার সঙ্গে আবার মারামারি করতে যেয়ো না !'

'বাহবা ! দৃষ্টান্তর সঙ্গে সঙ্গে তো বেশ সদুপদেশ দিতে পারেন আপনি।' গদাইয়ের বাবাকে আমি বাহবা দিলাম।

'সেইখানেই শেষ নয় মশাই !' বললেন গদাইয়ের বাবা ঃ 'আমার কথা শুনে খোকা বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। আর তার মার আঁচল ধরে টানল, 'আচ্ছা মা, মোটর গাড়ি যখন বুড়ো হয়ে যায়, যখন সে আর চলতে পারে না তখন তার কী হয় মা' ?

এই কথাতে, কেন জানি না, ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তার মা ! তেতো গলায় বললেন, 'তখন তারা সেটাকে তোমার বাবার কাছে বেচে দেয়। বুঝেচ ?'

'আর এই থেকেই পেলাম আমার আইডিয়াটা', বলে গদাইয়ের বাবা তাঁর কাহিনীর উপসংহারে এলেন ঃ 'আমার গদাইকে আমি এঞ্জিনিয়ার করতে চাই কিনা !'

এই উপসংহার-পর্বের আগেকার কাহিনীতে আসা যাক এবার। সেটা হচ্ছে আমার সংহার-পর্ব - আমার মোটরযাত্রার পালা।

পাড়ার রাস্তায় পা বাড়াতেই দেখি গদাই। স্টীয়ারিং হুইল হাতে। সেডান বডির একটা মোটরে বসে।

'কার গাড়ি হে গদাই ?' আমি শুধাই।

'আমার।' সগর্বে সে বলে ঃ 'বাবা আমায় কিনে দিয়েছে জানেন ?'

'বটে বটে ! তোমার বাবা তো তোমাকে খুব ভালোবাসেন দেখছি। তুমি কি গাড়ি চালাতে জানো নাকি ?'

'এইটুকুন বয়েস থেকে।' গদাই বেশ গর্বের সঙ্গে জানায়ঃ 'মামার বাড়ি থাকতে মামার গাড়িতে হাত পাকিয়েছি। মামা পাশে বসিয়ে গাড়ি চালাতে শিখিয়েছে আমায়।'

'বটে বটে? তুমি তো খুব বাহাদুর ছেলে! তোমার বয়সে আমি কেবল ট্রাইসাইকেল চালাতে পারতাম। ট্রাইসাইকেলের মজাটা কী জানো? যতই ট্রাই করো, সাইকেল তোমার কিছুতেই ওলটাবে না। পড়ে যাবার ভয় নেই মোটেই। তোমার ওই বাইসাইকেলের চেয়ে ঢের ভালো। অনেক নিরাপদ। তা, এটা তোমাদের কী গাড়ি হে?'

'অস্টিন। খুব নামজাদা গাড়ি, জানেন? তবে পুরনো মডেলের, এই যা।' গদাই যোগ করেঃ 'এসব গাড়ি আজকাল পাওয়া যায় না। যা সার্ভিস দেয় এসব গাড়ি! যাচ্ছেন কোথায় আপনি?'

'এই একটু ভবানীপুরের দিকে। আমার এক প্রকাশকরে কাছে—টাকার জন্য।'

'আসুন না আমার গাড়িতে।' গদাই আমায় আমন্ত্রণ জানায়ঃ 'আমিও ওইদিকেই যাব তো। আমাদের দোকানের হালখাতার নেমন্তন্ন করতে।'

'না ভাই! আমার পক্ষে ট্রাম বাসই ভালো।'

'উঠতে পারবেন ট্রামে বাসে? যা ভিড়!' সে বলে ওঠেঃ 'উঠলেও বসতে জায়গা পাবেন না নিশ্চয়।'

'চিরদিন ট্যাংট্যাং করে ঘুরি। পায়ে হেঁটে যাই সব জায়গায়। পরের গাড়ি চেপে কোথাও গেলে আমার যেন মাথা কাটা যায়।'

'ওই জন্যেই কেউ আপনাকে টাকা দেয় না। ট্যাংট্যাং করে প্রকাশকের কাছে গেলে কি আর টং টং শুনতে পাবেন? তাতে কি আর টাকা পাওয়া যায়? আপনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলেই দেখবেন তারা টাকা নিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে। গাড়িতে কত প্রেস্টিজ—জানেন!'

কথাটা আমি ভেবে দেখি। ওই প্রেস্টিজের কথাটা। আমাকে দোনামোনা দেখে গদাই বলল—'তাছাড়া আরো কী জানেন? মোটর গাড়িতে একলা বেড়িয়ে কোনো আমোদ নেই। আমি তো চাই পাড়ার লোকদের সবাইকে নিয়ে বেরোই—কিন্তু পাড়ার লোকরা · অশোক! ও অশোক! কোথায় যাচ্ছিসরে?' গদাইয়ের বয়সী একটা ছেলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। হাঁক শুনে থমকে দাঁড়াল। —গোলদিঘিতে সাঁতার কাটতে।'

'বেশ তো, আয় না আমার গাড়িতে। আমরা ওই পথেই যাচ্ছি তো। তোকে গোলদিঘির কাছে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'না ভাই, আমার দেরি হয়ে যাবে।' বলে সে হনহন করে চলে গেল।

'বাজারে যাচ্ছেন নাকি দিলীপদা?' গদাই চেঁচিয়ে ওঠে আবারঃ 'হেঁটে যাবেন কেন? আমার গাড়িতে আসুন না।'

'আমার তাড়া আছে ভাই।' দিলীপ যেন লাফ মেরে চলে যায়। দিলীপের সেই **LEAP** দেখবার মতই।

'দেখলেন তো? আমি তো চাই পাড়ার সবাইকে আমার গাড়ির সুযোগ দিতে। কিন্তু ওরা যেন কেমন! কিরকমের যেন! আসুন, উঠে পড়ুন, ভাবছেন কি!'

ভাবনার অকূল পাথার সাঁতারে গদাইয়ের মোটরে গিয়ে উঠি।

'বসুন ভালোলো হয়ে আমার পাশে। পেছনের সিটগুলো সব ফাঁকা পড়ে রইল! গাড়ি ভর্তি লোক হলে কেমন ভালো দেখায় না?' গদাই বলেঃ 'কিন্তু আমি তো সাধছি, কেউ না উঠলে আমি কী করব?'

'তাই তো, তুমি আর কী করবে!' আমি ওকে সান্তনা দিই। 'যাক, আমি তো উঠলাম। আমি একাই অনেকখানি জায়গা জুড়তে পারব। দেখচ তো আমাকে!' আমার হৃষ্টপুষ্টতার দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পুষ্ট আমি বরাবরই, তবে মোটরে চাপতে পেয়ে এখন আমায় একটু হৃষ্ট দেখায় বোধহয়।

দেখতে দেখতে পাড়ার কাচ্চাবাচ্চারা এগিয়ে এল সবাই। ঘিরে দাঁড়ালো আমাদের গাড়ি। আমাকে দেখতেই তারা এগিয়ে এসেছে আমি বুঝতে পারি। এ পাড়ার কেউ মোটর গাড়িতে চড়তে আমায় দেখেনি তো কখনো!

'গদাইদা, চালাব তোমার গাড়ি?' হাঁকতে লাগল তারা।

'ওরা চালাবে নাকি গাড়ি?' আমার বুক কেঁপে ওঠেঃ 'সর্বনাশ!'

'না না, ওরা কী চালাবে! ওরা কি গাড়ি চালাতে জানে? আমিই চালাব তো। আমি কেবল ওদের একটু চান্স দিচ্ছি—'

'চান্স তো দিচ্ছ! কিন্তু বাইচান্স যদি কিছু একটা ঘটে যায় তাহলে…'

'না না। ওরা তো বাইরে থেকে চালাবে। অ্যাকসিডেণ্ট হবে কি করে? স্টীয়ারিং তো আমার হাতে। পাড়ার ছেলে সব, আমি হচ্ছি ওদের লীডার, ওদের যদি আমি একটু গাড়ি চালাতে না দিই তো মনে ভারী কষ্ট পাবে ওরা। চালা·· চালা…চালা এবার গাড়ি··· জোরসে চালা।'

গদাইয়ের চালাও হুকুমে সবাই মিলে ওরা হাত লাগালো। চার ধার থেকে ঠেলতে থাকলো গাড়িটা।

'আমি যদি স্টার্টার দিয়ে স্টার্ট নিয়ে ওদের মুখের ওপর দিয়ে হুস করে গাড়ি চালিয়ে চলে যাই সেটা ভারী খারাপ দেখায়। দেখায় না? তাই গোড়ায় আমি ওদের একটু ওই চালাতে দিই। চালাক না একটু।'

একশ হাত না এগুতেই গাড়িটা ভর ভর ভররররভর করে গর্জে উঠল।

'দেখছেন! কেমন একটুতেই স্টার্ট নেয় গাড়িটা!' বলে গদাই হুস করে চালিয়ে দিল গাড়িঃ 'ওরাও কেমন খুশি হলো—আমারও কোন ক্ষতি হলো না।'

খাসা গাড়ি চালায় গদাই। কলকাতার রাস্তায় কাউকে না চাপা দিয়ে,

সাইকেল টাইকেল বাঁচিয়ে, ট্রাম বাসের সঙ্গে মারামারি না করে গাড়ি চালানো চাট্টিখানি কথা নয়। রীতিমতন বাহাদুরি। বাচ্চাদের সামলে রিকশার রিসকের মধ্যে না গিয়ে ঠেলা মেরে গাড়িদের না ঠেলা বেশ চালালো গাড়ি।

হ্যাঁ, বেশ চালায়, কিন্তু দোষের মধ্যে এই, হর্ন দেয় ভারী! ওইটেই ওর বড্ড বাড়াবাড়ি।

'তোমার গাড়ির সামনে তো কেউ পড়েনি, অনর্থক অত হর্ন দিচ্ছ কেন?' না বলে আমি পারি না : 'কানে তালা লেগে গেল যে হে!'

'আমাদের ইস্কুলের ছেলে যাচ্ছে যে!' সে বলে।

'কোথায় যাচ্ছে? তোমার গাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে নাকি?' আমি ভালো করে নিরীক্ষণের প্রয়াস পাই।

'না না, ওই পাশের ফুটপাথ দিয়েই তো। ওই যে!'

'ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে তো তোমার কি? চাপা পড়ছে না তো সে?'

'বারে! আমি গাড়ি চালাচ্ছি চেয়ে দেখবে না?' গদাই বলে : 'তাহলে মোটর চালাবার মজাটা কি মশাই? ক্রিং ক্রিং করার জন্যই তো সাইকেল্ চাপা, আর ভঁকভঁক করার জন্যই মোটর! কেউ যদি না দেখল ত কী হলো? নাহক মোটরে কেউ চাপে নাকি আবার?'

এই সেরেছে!! ওইটুকুন বাচ্চা ছেলে গাড়ি চালাচ্ছে আর আমি ঠুঁটো জগন্নাথের ন্যায় তার পাশে বসে, আমার বন্ধুদের কারো চোখে যদি এই দৃশ্য পড়ে তো আমি আর বাজারে মুখ দেখাতে পারব না।

কিন্তু আমার কথা শুনছে কে! যা ওর উৎসাহ!

গাঁকগাঁক করতে করতে গাড়ি তো ওয়েলেসলির মোড়ে এসে পড়ল।

গদাই বলল—'গাড়িটা থামাবো এবার। সামনের বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি।'

'আমাকে কি করতে হবে শুনি?'

কিচ্ছু না। আপনি চুপচাপ বসে থাকুন গাড়িতে।'

বসে আছি তো বসেই আছি। চুপচাপ অনেকক্ষণ। আধ ঘণ্টা বাদ হাসতে হাসতে এল গদাই, 'খাওয়াচ্ছিল কিনা। সন্দেশ পেলে কি ফেলে আসা যায়—আপনিই বলুন?'

শুনে আমি খুব ক্ষুণ্ণ হলাম। সন্দেশ হচ্ছে এমন জিনিস যা চোখের আড়াল দিয়ে গেলে ভারী খারাপ লাগে। মুখে এলে তো বটেই, এমন কি মুখে না এসেও যদি কেবল সম্মুখে আসে তাতেও আনন্দ! চেখে দেখলে তো কথাই নেই, সেই সুধা শুধু চোখে দেখলেও আরাম।

'এই নিন।' গদাই পকেট থেকে দুটো সন্দেশ বার করে দেয় : 'নিন, আপনার জন্যে এনেছি। এক ফাঁকে পকেটে পুরে ফেলেছিলাম, ওরা কেউ দেখতে পায়নি।'

সন্দেশ খেয়ে আমি খুশি হয়ে উঠলাম। এতক্ষণে গদাইয়ের সঙ্গে আসার মজুরি পোষালো। ওর সঙ্গে ভাব রাখার একটা মানে হলো, এই মৌখিক প্রমাণে।

'আপনি আমার জায়গায় বসুন এবার স্টীয়ারিং ধরে। আমি একটু গাড়িটা ঠেলে দিই, দাঁড়ান।' গদাই বলল ঃ 'না না, দাঁড়াতে হবে না, বসেই থাকুন। একটু ঠেললেই স্টার্ট হয়ে যাবে গাড়িটা।'

'তবে যে বললে স্টার্টার আছে?'

'আছে তবে স্টার্ট নেয় না। একটুখানি ঠেলতে হয়।' বলে গদাই গাড়ির পেছনে গিয়ে হাত লাগায়!

খানিক ঠেলাঠেলি করে গদাই বলে ওঠে 'এ কি, নড়ছে না কেন বলুন তো? আমি তো রোজ দুবেলা এটাকে ঠেলে নিয়ে যাই, আজ এখন পারছি না কেন?' বলে সে সন্দিগ্ধ নেত্রে আমার দিকে তাকায়।

আমিও তাকাই আমার দিকে নিঃসন্দেহেই।

'বুঝেছি। আপনার জন্যেই এরকমটা হচ্ছে। আপনার ওজন আমার গাড়ির ওজনের ডবোল। তাই নড়ছে না গাড়িটা। নামুন তো আপনিই।'

'দুজনে মিলে ঠেললেই চালু হয়ে যাবে গাড়ি' নেমে আমি বললাম।

'না—না। আপনি ঠেলুন। একজনকে স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে থাকতে হবে যে…!'

অগত্যা। একাই লাগলাম ঠেলতে। ফার্লংখানেক ঠেলে যাবার পর আওয়াজ ছাড়ল গাড়ি! তারপর কপালের ঘাম মুছে গলদঘর্ম হয়ে গদাইয়ের পাশে গিয়ে বসলাম।

গদাইয়ের গাড়ি ঠেলতে গিয়ে আমার জিব বেরিয়ে গেছল। অবশ্যি, একটু আগেও আমার জিব বার হয়েছিল —কিন্তু সেটা সন্দেশ খাবার জন্যে। দুটো দুরকমের জিবলীলা! একটা হচ্ছে জিবে দয়া, আরেকটা জীবন যাওয়া!

'চলতে শুরু করলে পঞ্চাশ মাইল চলে যাবে গাড়িটা, কোথাও থামবে না,' জানায় গদাই ঃ 'কিন্তু থেমেছে কি হয়ে গেছে! তখন আবার ওকে চালু করতে ঠেলাঠেলি করো!'

'বুঝতে পেরেছি।'

বুঝতে পেরেছি এতক্ষণে সত্যিই! কেন যে গদাইয়ের গাড়িতে কেউ চাপতে চায় না, কাছেই ভিড়তে চায় না গাড়িটার; স-গদাই গাড়িকে দেখলে সাত হাত পিছিয়ে যায় তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সরে পড়ে কেন যে গাড়ির সঙ্গে আড়ি করে তিন লাফে পালিয়ে যায় মানুষ, এতক্ষণে মালুম আমার।

'গাড়ি ঠেলা সহজ কাজ নয়।' আমি হাঁফ ছাড়ি।

'খুব ভালো ব্যায়াম তা জানেন? বাবা বলেন, ব্যায়াম করলে সব ব্যারাম সেরে যায়।'

'ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায় কিন্তু, আমার ধারণা। আমার আবার··'

'বাবার গেঁটে বাত ছিল জানেন? কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন রাতদিন। সেই বাত সেরে গেছে বাবার এই গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে। জানেন তা?'

'বলো কিহে? ঠেলাগাড়ি মানে, গাড়ি ঠেলা যে এত বড় দাবাই তা আমার জানা ছিল যা তো।'

'আপনার বাত নেই?' গদাই শুধায়।

'আছে। তবে কেবল মুখে।'

'মুখে তো বাত হয় না। গেঁটে বাত, পায়ে বাত, পিঠে বাত, মাজায় বাত, কোমরে বাত—এই সব হয়। বাত মানুষকে একেবারে চিৎ করে ফেলে···'

'আমার যা বাতচিৎ, তা শুধু ওই মুখেই। এ কি, আবার থামলো কেন গাড়িটা? কী হল গাড়ির? থেমে গেল যে হঠাৎ?'

'ব্রেক কষলাম যে।' গদাই বলল : 'ব্রেক কষে থামালাম তো গাড়িটা!'

'থামাতে গেলে কেন? কেউ চাপা পড়েছে নাকি?'

'সামনের বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে হবে আমায়'

'কী সর্বনাশ! আবার তো তাহলে ঠেলতে হবে তোমার গাড়ি?···'

কিন্তু সর্বনাশ যা হবার হয়েই গেছে, ভেবে আর কোন চারা নেই, তাই নিজেকে সামলে নিলাম 'যাক গে, সন্দেশ টন্দেশ নিয়ে এসো মনে করে।'

নেমন্তন্ন সেরে একটু পরেই গদাই ফিরে এল। ফিরে এল শুধু হাতে। বলল, 'শুধু চা খাইয়ে ছেড়ে দিল! চা তো আর পকেটে করে আনা যায় না!'

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে নীচে নেমে গাড়ি ঠেলতে লাগলাম।

এবার তিন ফার্লং ঠেলবার পর চালু হলো গাড়ি। আধমরার মত উঠলাম গিয়ে গাড়িতে।

'আরেকটু গেলে সামনেই তো আপনার প্রকাশকের দোকান।' গদাই আঙুল বাড়িয়ে দেখায় : 'থামব তো ওইখানে?'

'রক্ষে করো।' আমি আঁতকে উঠি : 'গাড়ি থেকে নামতে দেখলে যদিবা কিছু টাকা দেয়, তারপরে আমাকে আবার গাড়ি ঠেলতে দেখলে তক্ষুনি এসে কেড়ে নেবে টাকাটা। কখনো আর আমার বই নেবে না। ভাববে আমি কলম ঠেলা ছেড়ে দিয়ে গাড়ি ঠেলাই ধরেছি আজকাল।'

'তাহলে সোজা চালিয়ে যাই? আপনিই বলছিলেন আপনার খুব টাকার দরকার। প্রকাশকের কাছ থেকে আদায় করার জন্যেই তাই···'

'টাকা আমার মাথায় থাক। তুমি চালিয়ে যাও ভাই! কোথাও আর থামিয়ো না লক্ষ্মীটি! সোজা বাড়ি চলো এবার।'

'বাড়ি যাব কি মশাই? এখনই? এখনও যে আমার দশ বারো জায়গায় নেমন্তন্ন করার বাকি আছে!'

'অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ।' প্লুতস্বরে নিজের আর্তনাদ শুনতে হয়।

'হ্যাঁ। আমাকে এখন যেতে হবে অনেক জায়গায়! বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বেহালা, নিউ আলিপুর, চেতলা, গড়িয়া, যাদবপুর, ঢাকুরে, যোধপুর পার্ক, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, ল্যান্সডাউন রোড, কুপার স্ট্রীট···'

'কিন্তু আমি তো আর ঠেলতে পারব না তোমার গাড়ি! তুমি বলছিলে গাড়ি ঠেললে বাত সারে, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার উলটো হল। বাত ধরে গেল বুঝি ঠেলতে গিয়ে। আমার পেট কামড়াচ্ছে, গা হাত পা সব কামড়াচ্ছে!' আমি সকাতরে বলি: 'তুমি আর গাড়ি থামিয়ো না ভাই, দোহাই তোমার! সটাং বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমার বিছানায় আমায় শুইয়ে দাও। তারপর মারা গেলাম কিনা বিকেলে একবার খোঁজ নিয়ো এসো।'

গদাইয়ের বাবাকে বলছিলাম—'আর গাড়ি পেলেন না মশাই! একটা লঝ্ঝরে গাড়ি কিনে দিলেন আপনার গদাইকে! আপনারা এত বড়লোক···'

'আমার ছেলেকে এঞ্জিনিয়ার করতে চাই যে।' জবাব পেলাম ওঁর।

'ও, বুঝেছি, মোটর মেকানিক করতে চান বুঝি? মোটর গাড়ির এঞ্জিনিয়ার?'

'না না। আসল এঞ্জিনিয়ার। যাদবপুর শিবপুর খড়গপুরের পাস করা এঞ্জিনিয়ার যাকে বলে! কিন্তু এঞ্জিনিয়ার হতে হলে গায়ের জোর লাগে তো?'

'তা তো লাগেই।' আমি সায় দিই: 'বলে একটা গাড়ি ঠেলতেই প্রাণ যায়! আর সে হচ্ছে বড় বড় কারখানা ঠেলা! সহজ ব্যাপার নাকি?'

'তবেই বুঝুন। তবে আর বলছি কি! কিন্তু ছেলে আমার ব্যায়াম করতেই চায় না। ব্যায়াম করলে তবে তো গায়ের জোর হবে!'

'কোনো একসারসাইজ ক্লাবে ভরতি করে দিন না।'

'দিয়েছিলাম। ডন বৈঠক করতে ওর মন ওঠে না। সাঁতার কাটতে যায় না, ফুটবল খেলতে চায় না, তাই বাধ্য হয়ে কি করি, ওই গাড়ি কিনে দিলুম ওকে। এখন দুবেলা ঠেলাঠেলি করে গাড়ি চালাও। মশাই, গাড়ি নিয়ে ওর কি উৎসাহ! ওই গাড়ি ঠেলাতেই কদিনে ওর চেহারা ফিরে গেছে···'

'বলেন কি!'

'ইয়া ইয়া মাশুল বেরিয়েছে হাতের পায়ের···দেখেছেন?'

'মাশুল!' শুনে আমি চমৎকৃত হই।

'এই যে!' বলে তিনি আমার বাইসেপস ট্রাইসেপস টিপে টিপে দেখালেন,··· 'একেই তো মাশুল বলে। ওই মাশুলই বলুন আর মাশলই বলুন, এক কথা! এই যে, আপনারও দেখছি ত! একদিনের ঠেলাতেই আপনারও তো মাশুল হয়েছে মশাই।'

'তা হয়েছে।' মনে মনেই বললাম: 'আমার ঝকমারির মাশুল!'

হাতী-মার্কা বরাত

বাজার মন্দা মানেই বরাত মন্দ। কালীকেষ্টর পড়তা খারাপ পড়েছে। ট্যাঁক খালি—কয়েক হপ্তার থেকে টাকার আমদানি নেই। আধুলিটা সিকিটাও আসছে না। খদ্দেরের দেখা নেইকো, টাকাওয়ালা দূরে থাক, একটা টাবওয়ালা পর্যন্ত টিকি দেখায় না।

এমনি অচল অবস্থা। কালীকেষ্ট ভাবে, খালি ভাবে; ভেবে ভেবে কুল পায় না। অর্ডারি সাপ্লায়ের কারবার তার। সব কিছু বেচাকেনার লাভ কুড়িয়ে তার মুনাফা। নানা রকমের মালের তার যোগানদারি। দোকানদারিও— পাইকারি আর খুচরোয়। যোট চাই, আর যেটি চাইনে, আর যে-জিনিস হাজার চাইলেও কোথাও পাইনে—সব তার আড়তে মজুদ।

কিন্তু মজুদ মালে মজা কোথায়? মূলধন আটকে তা তো উলটো মালিককেই আরো বেশি মজায়। মাল কাটাতে পারলে তবেই না তা টাকাতে ঘুরে আসে। ঘুরে টাকা হয়ে আসে। কাটা মানেই টাকা। না কাটলে সবই

সবই তো পয়মাল। মহাজনের দেনা মেটাতেই মাথার চুল বিকিয়ে যাবার যোগাড়!

কিন্তু তাও বুঝি আর বিকোবে না। টেনে টেনে মাথার চুল ছিড়ছিলো কালীকেষ্ট। ভাবনায় চিন্তায় সে পাগলের মত হয়েছে। অবশেষে ভাবলে, না, এ জীবন রেখে কোনো লাভ নেই, গঙ্গার জলে বিসর্জন দেয়াই ভালো।

সেই মতলবে সে গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজের জলাঞ্জলি দিতে যাচ্ছে এমন সময় দেখলো গাছতলার থেকে এক সন্ন্যাসী হাত তুলে তাকে ডাকছে।

সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই তিনি বললেন—'কেন বাপু, অকারণে মরতে যাচ্ছো? তোমার বরাত তো খারাপ নয়। তোমার দরজায় হাতি বাঁধা থাকবে আমি দেখছি। কপাল দেখে আমি বলতে পারি।'

'হাতি! প্রভু, বললেন ভালো! সাতদিন থেকে হাতে একটা পাই নেই। কিচ্ছু পাইনি, বিক্রিপাট বন্ধ! খাব কি তার সঙ্গতি নেই, আর আপনি বলছেন হাতি! বলছেন বেশ।'

সন্ন্যাসী ধুনির থেকে একটু ছাই তুলে ওর হাতে দিলেন—বললেন –'এই ন্যাও বৎস! এই ছাইটুকু নস্যির সঙ্গে মিশিয়ে নাকে দাওগে। বরাত কাকে বলে তখন দেখবে। এই নস্যি নাকে দিয়ে তুমি যে-কোনো জিনিস যাকে খুশি যে-কোনো দামে বেচতে পারবে। যদ্দিন এ জিনিস তোমার নাকের কাছে থাকবে, কিছুতেই তোমার মার নেই। ব্যবসায় লক্ষ্মী মা গন্ধেশ্বরীর কৃপা, আর এই নস্যি, একসঙ্গে তুমি টানবে।'

কালী তো লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরলো। তার নিজের আড়তেই নস্যি ছিলো, খানিকটা নিয়ে তার সঙ্গে সেই ছাই মিশিয়ে ডিবেয় ভরে রাখলে নিজের ট্যাঁকে। এক টিপ না নাকে দিয়ে ভাবতে লাগলো কী করা যায়। কী বেচা যায়—কাকে বেচা যায়।

ভাবতে ভাবতে তার চোখ খুললো। চোখের কাছেই পড়েছিলো চকের ঢেরি—চকচক করে উঠলো সামনে। এই চকখড়ির সাত গাড়ি সে কিনেছিলো এক নিলামে বেশ দাঁওয়ের মাথায়—জলের মতন সস্তায়—কিন্তু তারপর থেকেই পস্তাচ্ছে। এই চীজের একটুরোও সে তারপরে গছাতে পারেনি কাউকে।

ইস্কুল পাঠশালায় তো খড়ি লাগে, তাই ভেবে সে পাচার করতে গেছলো সেখানে। তাঁরা বলেছিলেন, নিতে পারি এক আধ সের—এত খড়ি নিয়ে কী করবো? যদি এ শহরের সবাই সাতপুরুষ ধরে এ ইস্কুলে পড়ে তাহলেও লিখে লিখে সাতাত্তর বছরেও ফুরোতে পারবে না। ব্ল্যাকবোর্ড ক্ষয়ে যাবে তবু সব খড়ি খরচ হবে না। সারা বাংলা দেশের তামাম ছেলের যদি একসাথে হাতেখড়ি হয়, তাহলেও নয়।

আচ্ছা, দেখা যাক না নস্যির গুণটা! ভাবলো সে। সেই ইস্কুলেই খড়ি

বেচতে পারি কিনা, দেখি না গে! যদি এই অচলকে চালাতে পারি তবেই বুঝবো এই নস্যির দৌলতে বাকি জিনিস চালু করতে বেগ পেতে হবে না।

খড়িবোঝাই এক গাড়ি নিয়ে সে পাড়ি দিল ইস্কুলের দিকে। যেতে যেতে পথে পড়ল এক রাজজ্যোতিষীর বাড়ি। ভাবলো সে—গণৎকারদের তো গুণতে লাগে। এখানেও খানিক বেচা যাক না? গোড়াতেই কিছু বউনি হওয়া তো ভাল। মাল বেচে যাওয়া মানে যদিও খানিকটা তার কমে যাওয়া—মালের ঘাটতিই, তাহলেও মালের কাটতি মানেই মালিকের বেঁচে যাওয়া। আর মাল বেঁচে যাওয়া মানেই মালিকের মরণ। টাকার জন্যেই টেকা আর টেকার জন্যেই টাকা। মাল না বাঁচলেই মালিক বাঁচলো। এই ভেবে সে গণকালয়ের দরজায় গিয়ে 'নক্' করলো।

বেরিয়ে এলেন গণক—'কী? কী? কী চাই?'

'আজ্ঞে, খড়ি বেচতে এসেচি। গুণতে তো আপনার খড়ি লাগে। তাই—এই এক গাড়ি এনেছি—কয়েক মণ মোটে।'

'গুণতে? হ্যাঁ, লাগে। কিন্তু তাই বলে অ্যাতো খড়ি? একটু হলেই তো হয়। একবারে গাড়িখানেক এনে ফেলেচো যখন, তোমাকে ফেরাতে চাইনে, দাও তাহলে একটুখানি। এই এক কাচ্চার। এইটুকুর দাম কতো?'

'একটুতে কী হবে?' বলে কালীকেষ্ট এক টিপ নস্যি নেয় 'অন্তত মণখানেক তো নিন? একমন না হলে গুণবেন কি করে? আদ্ধেক মন দিয়ে গোণা যায় মশায়? গোণাগাথা একমনে করার জিনিস,—নয় কি কর্তা? আপনিই বলুন না। এক মন না হলে কি কেউ কখনো গুণতে পারে?'

'তা বটে! একমনেই গুণতে হয় সে কথা ঠিক!' মানতে হয় গণক ঠাকুরকে। 'তাহলে দাও এক মণই দাও—বলচো এত করে।'

মণখানেক সেখানে দিয়ে মনের ভার একটু লাঘব করে—দোমনা গণককে দু মণ গছানো যেত কি-না ভাবতে ভাবতে সেই ইস্কুলের দিকে এগুলো।

গাড়ি আর খড়ি নিয়ে হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে খাড়া হতেই তাঁর চোখ পড়লো সেই খড়ির ওপর, আর উঠলো—সোজা কড়িকাঠেই। 'এ কি! আবার তুমি সেই খড়ি নিয়ে এসেছো? অ্যাঁ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলে এক টিপ নস্যি দিল নাকে - 'দিন কয়েক আগে আপনার এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে আমার নজরে পড়ল আপনার ইস্কুলের অনেক জানলার খড়খড়ি ভাঙা। অনেক দিনের ইস্কুল তো—ভাঙবে আর বিচিত্র কি! একেই ছেলেরা ডানপিটে। তার পরে পড়া না পারলেই মাস্টাররা তাদের ধরে পিটেন আবার। তাঁদের কাছে যা পিটুনি খায় তার ঝালটাই তো ঝাড়ে ঐ জানালার ওপরে!—'

'কিন্তু খড়ির সঙ্গে তোমার খড়খড়ির কী?' হেডমাস্টার অবাক হন।—'খড়ি তার কী কাজে লাগবে?'

'খড়খড়ি সারাতেই মশাই! ঐ খড়খড়ির অভাব মোচনের জন্যেই। খড়ি তো মজুদ, এখন কিছু খড় হলেই হয়ে যায়।' বলে আরেক টিপ নস্যি সে লাগায়—'খড় আর খড়ি জুড়ে—সন্ধি করে কিম্বা সমান করে লাগিয়ে দিন—হয়ে গেল! যদি বলেন তো খড়ও আমরা যোগান দিতে পারি।'

কথাটা হেডমাস্টারের মনে ধরে, মাথা চুলকে তিনি বলেন—'কথাটা বলেচো মন্দ না। আইডিয়াটা আমার মাথায় লাগচে। এইভাবে খড়-খড়ির সমস্যা মিটলে খর্চাও খুব বেশি পড়ার কথা নয়। খড়ি তো পেলাম—আচ্ছা যাও, খড়টা চটপট পাঠিয়ে দাও গে।'

খড়ি-খড় সরবরাহ করার পর সারাদিনের কারবার তার মন্দ হল না। এক বিজলি বাতির কারখানার শ' পাঁচেক লণ্ঠন সে পাচার করেছে! জুতার দোকানে মজুত করেছে খড়ম। গোরুর খাটালওয়ালাকে গছিয়ে এসেছে ঘোড়ার লাগাম—এক আধটা নয়—কয়েক ডজন। টেকো লোকের কাতে বেচেছে মাথার চিরুণী, চুলের বুরুশ।

তার আড়তে বেদবাক্যের মত অকাট্য যা ছিল তার প্রায় সবই সে কাটিয়েছে সারাদিনে। হেসে খেলে। কিন্তু পঁচিশ মণ খড়ি তখনো গড়াগড়ি যাচ্ছিল এক ধারে। সেগুলো গাড়ি বোঝাই করে সে রওনা দিল শহরতলীতে! সেখানে নতুন এক সার্কাসের দল এসে তাঁবু গেড়েছিল। লরী বোঝাই খড়ি নিয়ে কালীকেষ্ট হাজির।

সার্কাসের ম্যানেজার ঘাড় নেড়েছেন—'না, মশাই না। চকের আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই। চক নিয়ে আমরা কী করবো?'

'তাঁবুতে লাগান', কালী তাদের বাৎলেছে—তাঁবুর চেহারা ফিরবে। চক লাগিয়ে তাঁবু চকচকে করুন। চটের গায়েও খড়ি মাখালে তার চটক বাড়ে, জানেন তা? চকচকে তাঁবু হলে তবে না চোখ টানবে সবার? আর লোকের নজরেই যদি না পড়ে তবে নজরানা পড়বে কেন? চাকচিক্য না দেখলে গাঁটের কড়ি খরচ করে দেখতে আসবে কেন মানুষ?'

খড়ি বেচতে তারপর আর দেরি হয়নি। বেগ পেতে হয়নি বিশেষ।

কিন্তু বেগ পেতে হলো বেশ—তারপরেই এক গোঁসাইবাড়ি মাংস থুড়বার যন্ত্র যোগাতে গিয়ে। যন্ত্রটা দেখেই না তিনি এমনভাবে না না করে উঠলেন যেন ভয়ঙ্কর এক যন্ত্রণা পেয়েছেন। নাক সিটকে বললেন—'আমরা বৈষ্ণব মানুষ, মাছ-মাংস তো ছুঁইনে? মাংস থোড়ার যন্তর নিয়ে কী করবো?'

'মাংস না খান, থোড় তো খান? এঁচোড় চলে? গাছ পাঁঠাতে তো অরুচি নেই? থোড়কেও যদি এতদ্বারা থোড়েন—থুড়ে নেন—কী চমৎকার যে হয় বলবার নয়! পাঁঠার মত গাচপাঁঠাকেও এই যন্ত্রে ফেলে পাট করা যায়। তারপর সেই উত্তমরূপে থুড়িত সেই থোড়া এঁচোড় দিয়ে—তারপরে তার সঙ্গে থোড়া গাওয়া ঘি মিশিয়ে—আহা!' কালীকেষ্ট সড়াৎ করে জিভের ঝোল টেনে টেনে নেয়।

'থুড়লাম না হয়, কিন্তু তারপর ?' জিগ্যেস করেন গোঁসাই ঠাকুর—'ততঃ কিম ?'

'তারপরেই কিমা। কাঁঠালের কিমা। সেই কিমার পুর দিয়ে ব্যাসনে ভেজে চপ কাটলেট যা খুশি বানান - যা আপনার প্রাণ চায়। বিলাস-ব্যসন একাধারে। যা ইচ্ছে বানিয়ে খান—খাদ্যের যে-কোনো বিলাসিতা! এঁচোড়ের দোপেঁয়াজী কি থোড়ের সামীকাবাব।'

সামীকাবাবের নামে গোস্বামী একটু কাতর হয়েছেন কিতু কাত হননি, বিলাস-ব্যসনের কথাটায় টলেছেন, কিন্তু কাবার হননি। থোড়াই-মেসিন থোরাই তিনি নিয়েছেন, একখানাই মোটে। ডজন খানেক কিছুতেই তাঁকে গছানো যায়নি। তিনি বলেছেন—'একটাই তো যথেষ্ট। দুটি মাত্র হাত আমার, দু ডজন তো নয়। বারোটা যন্তর নিয়ে কি করবো বাপু, ক হাতে চালাবো ?'

'আজ এটায়, কাল ওটায়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালান না। বারোটাকেই কাজে লাগান এইভাবে। যন্তরকেও মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিতে হয়, তাতে ভালো কাজ দেয় আরো।'

'বুঝলাম, কিন্তু দুটি তো মোটে বাহু। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এতগুলি নেয়া একটু বাহুল্যই নয় কি ?'

'আপনি নিজে কি আর থুড়তে যাবেন, থুড়বে তো বাড়ির মেয়েরা। গিন্নিবান্নীরাই। আর তাঁরা যে দশ হাতে কাজ করেন তা কি আপনার শোনা সেই ? তাঁরা যদি কিমা বানাতে বসেন, কী না করতে পারেন ? সামান্য এ-কটা যন্ত্র কি পেরে উঠতে পারবে তাঁদের সঙ্গে ?'

'ভালো কথা মনে করিয়া দিলে। কিমার কথাতেই মনে পড়লো। কিমা করবে কে ? কাকিমাই নেই যে! তীর্থ করতে বেরিয়েছেন প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা—চারধাম ঘুরে তারপর ফিরবেন। তিনি মথুরা থেকে ফিরলে তারপরে তো এই থুড়াথুড়ি। না বাপু, ও যন্তরের এখন কোনো কাজ নেই। একটাও আমার চাইনে।'

কালীকেষ্ট ধাক্কা খেল। এমন ধাক্কা সে সকাল থেকে খায়নি। চালের দোকান-দারকে কাঁকরের বদলে কাঁকুড় গছাতে সে বাধা পায়নি, দর্জির কাছে দরজা বেচে এসেছে, ঘড়িওয়ালার কাছে ঘড়া, ডাক্তারের কাছে থার্মোমিটারের বদলে হাতুড়ি, হাতুড়ের কাছে ইনজেকসনের দাবাই, রেশনের দোকানে অপারেশনের যন্ত্রপাতি চালাতেও কোন অসুবিধা হয়নি, কিন্তু টক্কর খেল এই প্রথম।

খেতেই সে টক করে নাকে হাত দিল—না, এক টিপ নস্যি নেওয়ার দরকার। কিন্তু ট্যাঁকে হাত দিয়েই তার চক্ষু স্থির! এ কি, ডিবেটা তো নেইকো! গেল কোথায় ?

কোথায় ফেলল ডিবেটা ? কখন হারালো সে ? ভাবতে ভাবতে তার খেয়াল হলো, সার্কাসের ম্যানেজারের টেবিলে ফেলে আসেনি তো ভুল করে ?

ছুটলো সে তাঁবুর দিকে—মুহূর্ত আর দেরি না করে। ডিবেটা নিজের তাঁবে না আসা অব্দি তার স্বস্তি ছিল না।

সার্কাসে ফিরে গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। ম্যানেজার হাঁচতে হাঁচতে তাকে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু বিস্ময় সেজন্যে নয়। সে হাঁ হয়ে গেল এই দেখে যে তার খড়ি তাঁবুতে না লাগিয়ে গুঁড়িয়ে গুলে কাই বানিয়ে হাতির গায়ে মাখাচ্ছে, তাই।

'ইস কী কড়া নস্যি মশাই আপনার। একটু না নাকে দিয়েই যা নাকাল হয়েছি '

সেকথা না কানে তুলে কালী শুধালো—'এ কী মশাই ? খড়ি দিয়ে এ কী হচ্ছে ?'

'হাতিটার হাতেখড়ি হচ্ছে আর কি !' বলল ম্যানেজার। হাতির সামনের গোদা পা-দুটেরে খড়িগোলা লাগাতে লাগাতেই বলল।

'তাতো দেখছিই, কিন্তু এমন করে খড়ি মাখিয়ে হচ্ছে কী ?'

'হাতিটা বেজায় বুড়ো হয়ে গেছে কিনা, কোন কাজেই লাগে না আর। কদিন বাঁচবে কে জানে ! তাই ভাবচি এটাকে এবারে বেচে দেব।'

'বুড়ো হাতি কিনবে কে ?' কালী ঠোঁট উলটায় —'তার ওপর আবার ফোকলা ? দাঁত নেইকো একদম।'

'তা বটে ! কিন্তু হাতিদের দাঁত বাঁধাবার ডাক্তার মেলে কোথায় ? হাতিদের কি ডেনটিস্ট আছে ? হস্তীসমাজে আছে কিনা জানিনে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে তো নেই। তাই ভাবছিলাম কী করি। আপনার নস্যির ডিবে ফেলে গেছিলেন, তার এক টিপ নাকে দিতেই মাথা খুলে গেল।—দেখলাম, তাই তো ! আপনার খড়ি দিয়েই তো হয়ে যায়। বেশ হয়।'

'কি হয় ?'

'মানে. এটাকে শ্বেতহস্তী বলে চালানো যায়। সাদা হাতির বেজায় দাম, জানেন নিশ্চয় ? অতি দুর্লভ জিনিস কিনা !'

'বটে, বটে ? কেমন দাম এক একটা হাতির ?'

'লাখখানেকের কম তো নয়। শ্যাম দেশে শ্বেতহস্তীর পুজো হয়ে থাকে। যাকে বলে রাজপুজা—রাজরাণীরা পুজো করেন। ঐরাবতের বংশধর কিনা ওরা, দেবতাবিশেষ বুঝলেন ?'

'তা, কতো দামে বেচবেন এটাকে ?'

'লাখখানেক আর কে দেবে এখানে ? এ তো শ্যাম দেশ নয়। হাজার বিশেক হলেই ছেড়ে দেব। ভারী পয়মন্ত মশাই, এই শ্বেতহস্তী। যার দরজায় এই হাতি বাঁধা থাকে, বুঝলেন কিনা, মা লক্ষ্মী তার বাড়ি অচলা। তবে কিনা, বরাত করে আসা চাই। যার তার দরজায় কি হাতি বাঁধা থাকে ?'

শুনেই কালীকেষ্টর টনক নড়ে। মনে মনে সে খতায়। সারাদিনের রোজগারে হাজার বিশেক টাকা তার হয়েছিল – হিসেব করে দেখে। তারপর বিশেষ বিবেচনা করে বলে—'কিন্তু সত্যিকারের শ্বেতহস্তী তো নয় মশাই ?' সে বলে—'আমারই খড়িগোলা মাখানো জাল হাতিই তো, বলতে গেলে ? কিম্বা হাতির ভ্যাজাল – তাও বলতে পারেন !'

'টের পাচ্ছে কে ? সবে তো এর হাতেখড়ি হয়েছে, পায়েখড়ি হোক, সারা গায়ে খড়ি লাগাই—তখন দেখবেন ! মুনিরও মন টলে যাবে সে-চেহারা দেখলে। হুঁ।'

বলে সার্কাসের মালিক আরেক টিপ নস্যি লাগায় নাকে। লাগিয়ে আরেক প্রস্থ হাঁচির মহড়া দেয়।

তারপর আর বলতে হয় না। হাঁচতে হাঁচতেই হাসিল হয় কাজ—হাসতে হাসতেই।

খানিক বাদে কালীকেষ্ট সার্কাস থেকে বেরয়—খালি হাতে নয়, হাতি হাতিয়ে। হাতির লেজ ধরে নিজের ট্যাঁক হালকা করে।

তাঁবুর গেটে যে তাঁবেদার ছিলো সে তাকে শুধালো—'কি মশাই ! পেলেন আপনার হারানো জিনিস—যা খুঁজতে এসেছিলেন ?'

'না, পাইনি। তবে এইটা পেয়েছি।

'এই হাতিটা ?'

'হ্যাঁ, ভারী দুর্লভ জিনিস মশাই ! এই সাদা হাতিটাকে বেশ দাঁওয়ে পাওয়া গেছে।'

'দাঁওয়ে ?' লোকটা হাঁ হয়ে থাকে।

'দাঁও বইকি ! লাখ টাকা একটা সাদা হাতির দাম। সোজা কথা নয়। এদিকে সারাদিনের আমার আমদানি মাত্তর বিশ হাজার। কিন্তু তাতেই হয়ে গেল। বিশে বিষক্ষয় করে এই হাতিটাকে নিয়ে চললাম—বেঁধে রাখবো আমার দরজায় !··· বেশ হবে !'

ট্রেনের ওপর কেরামতি

ভগবান যা করেন তা ভালোর জন্যেই করে থাকেন। এমন কি ট্রেন দুর্ঘটনাও।

হ্যাঁ, ট্রেন দুর্ঘটনাও। তার ফলে অনেক লোক নিহত হয় জানি, কিন্তু তার মধ্যেই আবার তাঁর মঙ্গলহস্ত নিহিত থাকে।

অনেকে যেমন হতাহত হয়, অনেকে আবার হতে হতে বেঁচেও যায় সেই-রকম। আমিই যেমন বেঁচে গিয়েছিলাম সেযাত্রা।

শিলিগুড়ির সে বছরের সেই ট্রেন দুর্ঘটনার খবরটা কাগজে তোমরা পড়েছিলে নিশ্চয়। সেই দুর্ঘটনাটা না ঘটলে আমি এক সুদূর ঘটনায় গিয়ে পড়তুম।

দীর্ঘকাল ধরে না খেয়ে খেয়ে মরতে হত আমায়।

তিলে তিলে সেই নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে এক তালে দুর্ঘটনাটাই আমায় বাঁচিয়ে দিলে। সেই মারাত্মক ট্রেনের যাত্রী ছিলাম আমি!···

ভগবান আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। এক ক্লাসেই পড়তাম আমরা। ভটচাযদের ছেলে ছিলো সে।

বাবা বামুন পণ্ডিত মানুষ। চেয়েছিলেন যে ছেলেও কিনা তাঁর মতই হোক। কিন্তু ছেলে তাঁর মিস্তিরি হয়ে গেল। বলল একদিন আমাদের: 'এসব

ভূগোল ব্যাকরণ না পড়ে আমি বরং পলিটেকনিকে পড়িগে। ছুতোর হতে পারলে পয়সা আছে, রোজ চার টাকা করে রোজগার—জানিস ? পুরুত হয়ে ঘণ্টা নেড়ে কী হবে বল তো ? তাতে কটা পয়সা আসে ভাই ?'

আমি বললাম ঃ 'তার জন্যেও আবার ছুতোর অপেক্ষা করতে হয়। কবে কে মরবে, কখন কার ছেরাদ্দ হবে, কে বিয়ে করবে, কার পইতে হবে '

'আমি কি ছুতোর হতে যাচ্ছি নাকি !' বললে সে ঃ 'ছুতোরগিরি শিখতে যাব কেবল। তারপর আরো শিখে আরো শিখে আরো শিখে আরো শিখে আরো শিখে আসল এঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরুব। বুঝেছ হে ?'

'ইস্কুলের পড়াশুনা শিকেয় তুলে রেখে আরো শিখে—মানে ? ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবি, তাই বলছিস তো ?' আমি বলি।

'ছুঁচো বললি আমায় ? বটে ? ভালো হবে না তাহলে। তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।' সে মারতে আসে আমাকে।

'না না, ছুঁচো বলব কেন ? ছুঁচ মানে তো সূচ, সাধুভাষায় ! – তার থেকেই যাকে বলে গিয়ে · সূত্রপাত।'

'কোনো গালাগাল নয় তো ?' সন্দিগ্ধ সুরে সে শুধোয়।

'গাল হবে কেন ? তুমি তো মিস্টার হবে বলেই মিস্তিরি হতে যাচ্ছো, এঞ্জিনিয়ার হবার জন্যই তোমার এই ছুতোর পিছনে ছোটা। তাই না।'

'নিশ্চয়। বামুন পণ্ডিত হয়ে কী হয় ? মোটের ওপর বামুনরা আসলে কী, বলতে পারো ?'

'মোটের ওপর ?' আমি বলি ঃ 'মোটের হচ্ছে বাঁধাছাঁদা, আর বামুনের হচ্ছে ছাঁদা বাঁধা।'

'ওসব ছাঁদা বাঁধায় আমি নেই। নেমন্তন্ন আর ভোজ খেয়ে বেড়ানো আমার কম্মো নয়, আমার অন্য কাজ আছে। ছাঁদা বাঁধা কি একটা কাজ নাকি ?'

'ম্যাজিকের কাজ।' আমি বলি ঃ 'আসলে সেটাই হচ্ছে ভোজবাজি। পাতে পড়তে থাকল, ছাঁদায় উঠতে থাকল, কিছু পড়ল পেটে কিছু পড়ল পাশের ছাঁদায়। ভোজের শেষে দেখা গেল পেটটা মোটা হয়ে ভুঁড়ি ; আর ছাঁদাতেও ভূরি ভূরি।'

'ওসব ছাঁদা বাঁধার কাজে আমি নেই। আমি বড়ো বড়ো ব্রিজ বাঁধবো, কারখানা ফাঁদবো, শহর পাতবো। আমার হচ্ছে এঞ্জিনিয়ারের কাজ।'

এই বলে ইস্কুল ছেড়ে পলিটেকনিকে গিয়ে ভিড়লো ভগবান। আমাদের ভগবান ভটচায।

তারপর অনেক কাল দেখা নেই। অবশেষে তার দেখা পেলাম শিলিগুড়ির ট্রেনে সেদিন। সেই সাংঘাতিক ট্রেনটায়।

খালি কামরায় একা একা যাচ্ছিলাম, ভগবান এসে সঙ্গী হল।

ভগবানের দর্শন পাওয়া দুর্লভ জানি, কিন্তু এভাবে এখানে তার দেখা মিলবে আশা করিনি আমি।

এঞ্জিনিয়াররূপে নয় মিস্তিরির বেশেই দেখা দিলে সে। কিন্তু মিস্টার না হলেও তার এই মিস্তিরি-রূপও কিছু কম মিস্টিরিয়াস নয়।

তার বগলে ঝুলির মতন কী একটা ঝুলছিল, তার ভেতর থেকে ছোট্ট একটা করাত উঁকি দিচ্ছিল যেন। সেই দিকে আঙুল দিয়ে বললাম ঃ 'কী হে, আজকাল চোরাই কারবার চলছে নাকি তোমার ?'

'চোরাই কারবার, তার মানে ?' বলেই সে ঝোলাটা আমার সামনে উজাড় করে ফেলল ! তার ভেতরে ছুতোরের নানান যন্তরপাতি ছিল, ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।

'এটা হচ্ছে করাত। এদিয়ে কাঠ চেরে। এটা তোমার গিয়ে সিঁধকাঠি নয়।'

'আমি চেরাই কারবার বলতে চেয়েছিলাম।' আমার ত্রুটি সংশোধন করি ঃ 'কিন্তু বলতে গিয়ে কে যে এ-কারের স্থলে ও-কার আদেশ করল বলতে পারব না।'

'এখনো সেই ইস্কুলের বিদ্যে ফলানো হচ্ছে ? এখানেও ? ফলিয়ে কোনো লাভ হল কিছু ?'

'প্রতিফল পাচ্ছি।' আমি জানাই ঃ 'লিখে খাচ্ছি, কিন্তু খেতে পাচ্ছি না ভাই।'

'পাবে কি করে ? খাচ্ছি তো আমরা। দিনে দশ বারো টাকা কামাই। সাত ঘণ্টায় রোজ, সাড়ে পাঁচ রোজে হপ্তা, হপ্তায় আশি টাকা। তার ওপর আবার ওভারটাইম আছে। যার নাম উপরি রোজগার। আছো কোথায় ?'

নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজের সংশয় আর ব্যক্ত করতে চাই না, ওর যন্তর-পাতির দিকে তাকাই ঃ 'ওগুলো কি ?'

'এটার নাম প্লাস। এটা হোলো গে ইস্ক্রুপ ডাইভার—'

'প্লাস ? দুটো করে দাঁড়া দেখছি। ওই দাঁড়াগুলোর নাম মাইনাস নিশ্চয় ?'

'কেন বলতো ?' ভগবান একটু অবাক হয় 'মাইনাস হবে কেন ?'

'টু মাইনাস মেক ওয়ান প্লাস !' আমি মনে করিয়ে দি।

'তোমার ঐ ইস্কুলের আঁক আর এখানে খাটে না হে। আমার পলিটেক-নিকের আলাদা আঁক। সে আঁক তুমি কি ছার, তোমাদের সেই থাড় মাস্টারও করতে পারবে না। দেব নাকি একটা আঁক ?'

'রক্ষে করো ! তুমি কি চাও যে আমি এই চলতি গাড়ির থেকে লাফ মেরে পালাই ?'

আঁকের আঁকশি দিয়ে আমাকে পাড়বার চেষ্টা না করে এবার সে কামরার চারধারে তাকাল। আমাকে না কামড়ে, কামরাটার ওপর তার কামড় বসালো চোখ দিয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ঘুরে ফিরে।

'ইস্টিলের বানানো এটা।' বলল ভগবান ঃ 'আজকাল যত কামরা, এমনকি গোটা রেলগাড়িটাই ইস্পাতে তৈরি হচ্ছে। কলকব্জার ব্যাপার সব।'

'কলকব্জার তো বটেই।' সমঝদারের মত সায় দিই।

'এই কামরাগুলো তোমাদের কাছে খুব রহস্য বলে ঠ্যাকে? তাই না?'

ভগবান মিস্ত্রি যখন, তখন সে যে mystery-র কথা তুলবে সেটা খুবেই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু কামরাটার মধ্যে রহস্যময় কিছু খুঁজে পাই না। তবে সাক্ষাৎ ভগবানকে একটা দারুণ রহস্য বলে বোধ হতে থাকে বটে।

'নাটবোলটুর ব্যাপার সব।' সে বলেঃ 'ইস্পাতের পাতের ওপর পাত বসিয়ে নাটবোলটু দিয়ে এঁটে বানানো। প্রত্যেকটা কামরা। সময় পেলে গোটা গাড়িখানা খুলে আবার আমি তেমনি করে এঁটে লাগিয়ে দিতে পারি। এ তো কলকব্জার ব্যাপার আর কিছু না।'

'বল কি?' বিস্ময়ে আমি হতবাকঃ 'গোটা গাড়িটাই তোমার কলকব্জার মধ্যে আনতে পারো নাকি? বল কি হে?'

'না তো কি? এর প্রত্যেকটি কব্জা। দেখবে তুমি?'

বলে সে বাথরুমে ঢুকে আয়নাটার ওপর তার ইসক্রু ডাইভার বসিয়ে দিল। তারপর তার প্লাস ঘুরিয়ে কয়েক প্যাঁচে চকিতের মধ্যে আয়নাটাকে মাইনাস করে আমার সামনে এনে রাখলঃ 'এই দ্যাখো।'

দেখলাম। আয়না আর নিজের চেহারা—দুইই।

'বাড়ি নিয়ে যেতে পারো ইচ্ছে করলে।' সে বললে।

'তাহলে আর দেখতে হবে না। নিজের চেহারা তো নয়ই।' আমি বললামঃ 'সোজা হাজতে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দেবে। পাক্কা ছ বছর! আমাকে তো দেবেই, তোমাকেও ছাড়বে না! তুমিও যে জেলার ছেলে আমিও সেই জেলার কিন্তু তাই বলে মানে, আমি বলছি কি, তাইতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এক জেলার আছি এই বেশ। এক জেলার থেকে এক জেলের, হতে চাওয়াটা কি আমাদের পক্ষে খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

'লাগিয়ে দেব আবার। যেখানকার আয়না সেইখানেই শোভা পাবে।' বলে আয়নাটাকে সে মেঝেয় শুইয়ে দিলঃ 'এই গাড়ির আগাপাশতলা খুলে আবার আমি জুড়ে দিতে পারি দেখতে চাও?'

'না না। আদৌ না। মোটেই চাই না।'

আয়না দেখেই আমার চোখ কপালে উঠেছিল, আয়নাতেই দেখলাম, তার বেশি দেখার আমার বায়না নেই।

'সেই নাটবোলটু, আর ইসক্রুপের কারবার। ছোট বড় মাঝারি—নানা সাইজের নাটবোলটু, তা ছাড়া কিছু না।' সে জানায়ঃ 'এ গাড়ির সব চাকা আমি খুলে ফেলতে পারি, এই কামরার যাবতীয় ফিটিং। আমার কাছে এ কাজ একেবারে কিছু না। হাজার হাজার মাইল যে রেললাইন পাতা, তাও তুলে ফেলা যায়। মোটেই শক্ত নয়। ফিশপ্লেট দিয়ে জোড়া তো সব। খুলতে কতক্ষণ?'

বিস্ময়ে আমি থই পাই না। এমন অমানুষিক বিশ্বকর্মার শক্তি পেয়েছে আমাদের ভগবান—আমার পাঠশালার সহপড়ুয়া শ্রীমান ভগবানচন্দ্র ভট্টাচার্য? বিস্ময় আমার থইথই করে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমায়।

আমার মুখ খুলবার আগেই ও প্লাস চালিয়ে একধারের লাগেজ রাখার বাঙ্ক খুলে ফেলেচে। বাঙ্কটা আটকানো চেনের সাহায্যে লটকে থাকে।

'দেখচ?'

'দেখচি বটে কিন্তু এ দৃশ্য আমি দেখতে চাই না। দেখতে মোটেই ভালো নয়।'

'লাগিয়ে দেব আবার।' বলে সে সেধারের সীটগুলোকেও কব্জা করে ফ্যালে। দেখতে না দেখতে নামিয়ে আনে সব। বাঙ্কের সমান্তরালে তারাও ঝুলতে থাকে সেধারে।

'এইবার মাঝখানের সীটগুলো।'

বলে ঘ্যাচাংঘ্যাচাং করে সেগুলোকেও সে শুইয়ে দেয় অচিরে।

এর মধ্যে একটা ইস্টিশন এসে পড়ে। ভগবান ব্যস্ত হয়ে ওঠেঃ 'যাও যাও। দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়াও গে। লোক উঠে পড়বে যে। আটকাও ওদের। টি-টি-আই কি আর কেউ উঠে যদি এসব দেখতে পায় তাহলে—'

এর বেশি সে বলে না। বলতেও হয় না। তাহলে কী হবে আমার জানা। হাতকড়া পড়ে যাবে দুজনার, যে হাতকড়া কোনো প্লাস মাইনাসেই খোলা যাবে না আর আমি লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই দুজনা যাত্রী দরজা ঠেলে উঠে পড়েছে। উঠে তো তারা তাজ্জব! এ কী কাণ্ড!

অপ্রস্তুত হয়ে নেমে গেল তারা। একজন তাদের বলতে বলতে গেল শুনতে পেলামঃ 'চলতি গাড়িতেই মেরামতি চলছে। আমাদের রেল কোম্পানি তো খুব চালু দেখছি। কে বলে আমাদের সরকার বাহাদুর কোন কাজের নয়?'

লোকগুলো নেমে যেতেই ভগবান বললঃ 'দাঁড়াও তো দরজাগুলো ইসক্রুপ দিয়ে এঁটে দিই আগে। তাহলে ঠেলাঠেলি করেও কেউ উঠতে পারবে না আর।'

দুদিকের দরজা, দরজার জানালা সব সে ইসক্রুপ দিয়ে এঁটে দিল তারপর।

আমি বললামঃ 'উঠতে পারবে না কেউ, তা না হয় বুঝলুম; কিন্তু নামতেও তো কেউ পারবে না। আমরা নামব কি করে?'

'তখন খুলে দেব ইসক্রুপ।' বলে সে এবার আমার দিকে এগুলো। আমার মাথার স্ক্রুগুলোও খুলবে নাকি গো? ভয় খেতে হল আমায়।

'ওঠো। দাঁড়াও তো।' সে বললেঃ 'এধারের বাঙ্কটাও নামিয়ে দিই এবার। তার পর এদিকের সীটগুলোও খুলে ফেলব।'

'বসব কোথায় তাহলে?'

'কতক্ষণের জন্য আর? এখুনই তো ফের লাগিয়ে দেব সব।'

তার কেরামতি দেখাতে কামরার অপরদিকেও খোলতাই দেখা গেল। দেখতে দেখতে গোটা কামরায় খালি চারধারের দেওয়াল ছাড়া আর কিছু খাড়া রইল না। বাঙ্কগুলো ঝুলছে, বেঞ্চিগুলো মাটিতে শোয়ানো, আর স্ক্রু নাট বোলটু সব স্থানে স্তূপাকার। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে।

'দেখলে তো ?'

এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা দুঃসহ। আমি বললাম : 'দাঁড়াও, একটু বাথরুম থেকে আসি।'

বলে যেই না পা বাড়াবে একটা চাকতির মত বড় সাইজের বোলটুর উপর পা দিয়ে বসলাম। আর যায় কোথায় ? চক্রবর্তীরা চক্রবর্তীদের এগুতে সাহায্য করে। অবশ্যই করা উচিত। কেননা, চক্রবর্তীদের চক্রবর্তীরা না দেখিলে কে দেখিবে ? আমি কিন্তু সেই চাকতিটাকে দেখিনি। সেই চক্রাকার বোলটুটি আমাকে তীরবেগে এগিয়ে নিয়ে চলল। সেই বোলটু চেপে আমি এখানকার বোলটুর সমাবেশের ভেতর দিয়ে ওখানকার নাটদের জমায়েৎ ভেদ করে চারপাক ঘুরে তিনপাক পিছিয়ে শেষে কামরার মাঝখানে এসে হাত পা ছড়িয়ে চিৎপাত হয়ে পড়লাম।

'দিলে ? দিলে তো সব গুলিয়ে ? সব নাট বোলটু ইসক্রুপ দিলে তো সব একাকার করে ? গেল তো সব ছড়িয়ে ধারধারে ?'

'আমি দিলাম ?—না, তোমার পাকচক্রে পড়েই আমার এই'

'তুমি না তো কে ? গাড়ি চেপে যাবে, গাড়ির মধ্যে বোলটু চাপে আবার কেটা ? গাড়ির ভেতর নাচতে নাচতে ঘুরপাক খেতে খেতে যায় নাকি কেউ ? রেলগাড়িতে কি করে যেতে হয় তাও জানো না ?'

'ইসক্রুপ না খুলে।' রেগেমেগে আমি বলি : 'রেলগাড়ির ইসক্রুপ-টিসক্রুপ না খুলে।'

'কোথাকার ইসক্রুপ কোথায় গেল এখন ? কোথাকার নাট বোলটু কোথায় হারালো ! আমি সব একেক জায়গায় ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম। এখন কি করে খুঁজে পাই, কোন্‌টা যে কার, মেলাই কি করে ? এসব জুড়বই বা কি করে আমি ?'

মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়ে। বসে পড়ে আবার একটা ইসক্রুপের ওপরেই। 'বাপ রে' বলে বসতে না বসতেই সে উঠে দাঁড়ায় তক্ষুনি।

'দ্যাখো তো, কী—কী কাণ্ড করেছো !' আমার দিকে রোষকষাতি নেত্রে সে তাকায় : 'কোথাকার ইসক্রুপ কোথায় এসেছে।

কামরায় চিৎপাত হয়ে নাট বোলটুর ঘায় আমার গায়ের চামড়া ছড়ে গিয়েছিল। জবালা করছিল সর্বাঙ্গ। তবুও ওরই মধ্যে একটুখানি আরাম পেলাম এতক্ষণে। ইসক্রুপটা ওর মাথায় লাগা উচিত ছিল—যেখানটার ইসক্রুপ ওর খোয়া গেছে।

'এখন আমি কি করে কি করব ? একটু বসতেও পাচ্ছি না !' বলে আবার সে হাত মাথায় দিয়ে বসে পড়ে। বসবার আগে ত্রিসীমানার বোলটু ইসক্রুপ সব পা দিয়ে সরিয়ে দেয়। বসে টসে বলে ঃ 'ভয়ংকর লাগছে।'

'আহা, লাগছে তো আমারও।' সান্তনার ছলে বলি ঃ 'আমারই কি কিছু কম লেগেছে নাকি ?'

'আরে ইসক্রুপ নয়, খিদে।' সে জানায়, 'ভয়ংকর খিদে লাগছে ! ভেবে দ্যাখো, এতক্ষণ ধরে খাটুনি তো কিছু কম হয়নি। আধ রোজের কাজ।'

পেটের বাইরে তো লাগছিলই আমার, ওর কথায় মনে পেটের ভেতরেও লাগছে তো কম নয়। ইসক্রুপের মতই খোঁচাচ্ছে ! খিদে।

'দাঁড়াও। কিছু খাবার কিনে আনিগে।' বলে সে উঠে দাঁড়ায়।

'ইসক্রুপ ডাইভার আছে, খুলতে কতক্ষণ ? খাবারটা নিয়ে আসি আগে। যা খিদে পেয়েছে। দুজনে আগে খেয়ে নিই। এই তো গাড়ি এসে ভিড়লো স্টেশনে ! তুমি এটারের বাঙ্কটা তুলে ধরো, আমি জানালার ভেতর দিয়ে নেমে যাই। আসার সময় আমার কোনো অসুবিধা হবে না, বাঙ্ক ঠেলে উঠে আসতে পারব।'

আমি সেই বাঙ্কটা অতি কষ্টে দু হাতে টেনে ধরলাম আর সে তার ফাঁক দিয়ে গলে সুরুত করে চলে গেল। তার যন্তরপাতির ব্যাগ বগলে করে।

সেও 'ব্যাগ্র' হয়ে নামল আর ট্রেনও ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

আমি চার দেয়ালের মধ্যে অকূল পাথারে আটকা পড়ে রইলাম। দশ মিনিট পনের মিনিট অন্তর গাড়ি থামতে লাগলো, স্টেশন এল আর গেল, যাত্রীরা উঠতে নামতে লাগল—অন্য অন্য কামরায়। এ কামরায় কেউ উঁকিও মারল না। দরজা তো ভেতর থেকে কব্জা আঁটা—উঠবে কি করে ? আমি এখন কি করি ? ইসক্রুপ ডাইভারটাও যদি সে রেখে যেত, না হয় দরজাটার ইসক্রুপগুলো আলগা করে বেরুবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু ভগবান যে এভাবে আমায় ছলনা করবে তা কি আমি জানি ?

এক হচ্ছে, এই পাশের বাঙ্ক তুলে ধরে গলে যাওয়া। কিন্তু ওর বেলায় তো আমি তুলেছি, ও গলেছে ; আমার বেলায় তুলছেটা কে ?

তাহলে কি এইভাবে এখানেই কাটাতে হবে আমায় ? কেবল আজ নয়, কাল নয়, পরশু নয়, দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস ! এই কামরায় আমিই থাকবো একক যাত্রী···অনাহারে জীর্ণ···জীর্ণ শীর্ণ কংকালসার ···অবশেষে নিষ্প্রাণ কঙ্কালমাত্র—বছরের পর বছর ধরে এই কামরার ভেতর লটকে থেকে শেয়ালদা আর শিলিগুড়ি করতে থাকব দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ?

ভাবতেই মূর্ছিত হয়ে পড়লাম।

মূর্ছাভঙ্গে উঠে মনে হলো, দেখি তো, নোখ দিয়ে দরজার ইসক্রুপগুলো

ঘোরানো যায় কিনা। কিন্তু বসতেই চায় না নোখ - সবে মাত্র নোখ কেটে-ছিলাম। অবশ্যি, এই নোখ বাড়বে, এখানে থাকতে থাকতেই বাড়বে, দশ জোড়া নোখ পাব…উহুঁহুঃ দু হাতে দশ খানা নোখ তো হাতের পাঁচ…পাঁচ ইনটু টু…নাঃ, আর ভাবতে পারি না! নোখ তো বাড়বে. কিন্তু ঘুরিয়ে ইসক্রুপ খোলার মতন গায়ের জোর কি ততদিনে থাকবে আমায় ?

নাঃ, আর ভাবতে পারি না। অবার মূর্ছিত হবার চেষ্টায় আছি, এমন সময়ে ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ— ঘ্যাচাং! ঘ্যাচাং ঘ্যাং— ঘ্যাঁচ-চাঙ…! মাথা ঘুরে গেল আমার—আমার কামরাটা যেন চোখের ওপর ঘুরপাক খেতে লাগল।

দ্বিতীয়বার মূর্ছার পর উঠে দেখি আমার কামরাটা ফাঁক হয়ে দু আধখানা হয়ে ঘেছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! ঘাড়ে হাত বুলতে বুলতে আমি কামরা থেকে নামলাম।

পরের দিন খবরের কাগজে দেখা গেল—কে বা কাহারা লাইনের থেকে ফিশপ্লেট খুলে নেবার জন্যই শিলিগুড়ির এই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনাটা হয়েছিল!

ঐ, আর কারুর নয়, সেই ভগবানের হাত। আমি হলপ করে বলতে পারি। তারই কাজ আমি জানি। সে কি করে ট্রেনের আগে এসে এই কাণ্ড বাধাল তা আমি বলতে পারব না। তবে কারিগররা সব পারে, টেকনলজিতে সব হয়, কারিগরির-কেরামতিতে না হতে পারে এমন কাজ নেই। এ হচ্ছে তার-ই কারিকুরি, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। আমার কামরা থেকে নেমে হয়তো সে অন্য কামরায় উঠেছিল, তার সেইসব মারাত্মক যন্ত্রপাতি বগলে করে। তারপর চলতি গাড়িতেই,—সে খুব চালু ছেলে, চলতি গাড়িতেই কাজ চালাতে ওস্তাদ! গাড়ির ওপরে বসে বসেই গাড়ির নীচের লাইনের ফিশপ্লেট সরিয়েছে। লাইন খুলেছে, লাইন তুলেছে, ভগবানের অসাধ্য কিছু নেই।

তারপর থেকেই আমি তার খোঁজে রয়েছি। দেখতে পেলেই তাকে ধরে অ্যায়সা ঠাঙাবো!
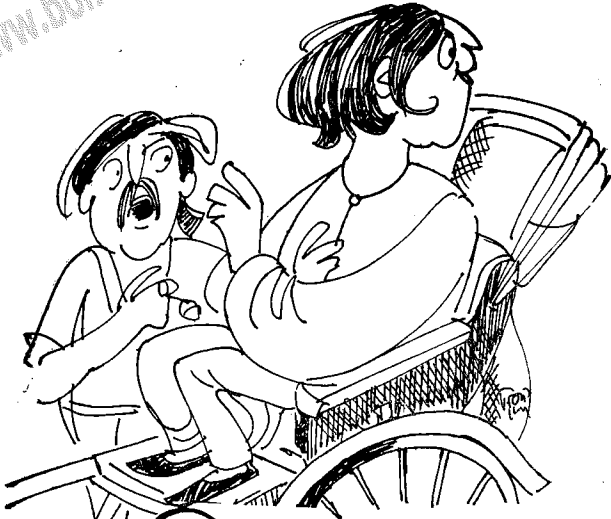
রিকসায় কোন কোন রিস্ক নেই

পাড়ায় গদাইয়ের গাড়ি চেপে একবার ভারী বিপাকে পড়েছিলাম, এবার ভোঁদাইয়ের মোটরে চড়ে এতদিন পরে আগেকার সেই গদাঘাতের দুঃখও ভুলতে হলো !

বাস্তবিক, আমার বিবেচনায় রিক্সাই ভালো সবচেয়ে। এমনকি পা-গাড়িও তেমন নিরাপদ নয়। চালিয়ে গেলে কী হয় জানিনে, চালাইনি কখনো, কিন্তু আর কেউ যদি সাইকেল চালিয়ে আসছে দেখি তক্ষুণি আমি সাত হাত পালিয়ে যাই। রাস্তার ধার ঘেঁষে গেলেই মোটর-চাপা পড়বার ভয় নেই, কিন্তু সাইকেলের বেলায় যে ধারেই তুমি যাও না, তোমার ঘাড়ে এসে চাপবেই। ফুটপাথে উঠেও নিস্তার নেই।

তাই বলছিলাম, রিক্সাই আমাদের ভালো। কোনো রিস্‌ক নেই একেবারেই। না সওয়ারির, না পথচারির।

কী কাজে শহরতলিতে যেতে হয়েছিল। ট্রামে বাসে ওঠা বেজায় দায়, পাদানিতেও পা দেয়া যায় না। হাঁটতে হাঁটতে যদি কিছুটা এগিয়ে কোন ট্রাম বাস একটু খালি পাওয়া যায় সেই ভরসায় এগুচ্ছি। আশায় আশায় যদ্দুর এগিয়ে আসা যায়।

হঠাৎ দেখি, ভোঁদা তার মোটর নিয়ে ভোঁ ভোঁ করে আসছে। আমাকে দেখে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—'এসো আমার গাড়িতে। পেঁছে দিচ্ছি তোমায়।' বলল সে।

'ঠেলতে হবে না ত ফের?' উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম।

'কী বললে?'

'গাড়ি চড়ার ভারী ঠেলা ভাই!' গদাইজনিত আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলাম। সে গাড়ি একবার থামলে আর চলবার নামটি করে না। থেমে গেলেই নেমে গিয়ে ঠেলতে হয় আবার। গদাই আর আমি দুজনে মিলে সেই গাড়ি চালিয়ে—গদাই সামনের স্টীয়ারীং হুইলে আর আমি গাড়ির পেছন থেকে—সাত দিন আমায় কাত হয়ে থাকতে হয়েছিল বিছানায়। কাতর কন্ঠে জানালাম।

'তোমার গাড়িও সেইরকম - নেমে নেমে - মাঝে মাঝে ঠেলতে হবে না ত?'

'কী যে বলো তুমি! একি গদাইয়ের লঝ্ঝর গাড়ি পেয়েছ? আনকোরা নতুন মডেলের গাড়ি—দেখচ না?'

কিন্তু গাড়ি ঠেলার চেয়েও যে ভারী ঠ্যালা আছে আরো—সেই অভিজ্ঞতা হল আমার সেদিন! কেমন করে যেন আঁচ পাচ্ছিলাম সেই অবশ্যম্ভাবী অভিজ্ঞতার, আমার অবচেতন বিজ্ঞতার মধ্যেই হয়ত বা। তার আভাসেই বলতে গেলাম কিনা কে জানে 'কিন্তু তার দরকার কি এমন? আর একটুখানি গেলেই তো শহরতলির স্টেশনটা। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে শেয়ালদা, শেয়ালদার টার্মিনাসে ট্রাম ধরে কলেজ স্ট্রীট মার্কেট আমার ডাগনে ভাগনির বইয়ের দোকান হয়ে সেখান থেকে চোরবাগান আর কতটুকু? বলতে গেলাম আমি।

'তা হলেও বেশ দেরি হবে তোমার ' বাধা দিয়ে বলল ভোঁদা—'এধারের ট্রেন সব আধঘন্টা পর পর আসে। ভিড়ও হয় নেহাত কম না। ধরতে পারলেও, চড়তে পারবে কি না সেই সমস্যা, আর তা পারলেও, বাড়ি পেঁছতে অন্তত তিরিশ মিনিট লেট তোমার হবেই—আমি তোমাকে তিন মিনিটে পেঁছে দিতাম।'

সেই তিরিশ মিনিটের লেট বাঁচাতে তিরিশ বছর আগেই বৈতরণীর তীরে পেঁছাচ্ছিলাম গিয়ে!

'গাড়িটার স্পীড একটু কমাও ভাই!' যেতে যেতেই আমি বলি—'বড্ডো জোরে চালাচ্ছো মনে হচ্ছে।'

'মোটেই না। ভালো গাড়ি এমনি স্পীডেই চলে। এই রকমই স্পীড নেয়।' স্টীয়ারিং হুইলে এক হাত রেখে, আর এক্সিলেটারে তার পা রেখে, আরেক হাতে নিজেয় গোঁফে চাড়া দিতে দিতে নির্ভাবনায় সে জানায়।

আমি কিন্তু দুর্ভাবনায় মরি। একটা পথ-দুর্ঘটনা না বাধিয়ে বসে আচমকা!

'ভারী ভয় করছে কিন্তু আমার। যদি একটা কিছু...'

এক ইঞ্চির চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি ব্যবধানে একটা সাইকেলের পাশ কাটিয়ে সে যায় - 'জানো গাড়িকে সব সময় টিপটপ কন্ডিশনে রাখতে হয় তা হলেই আর টপ করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। গাড়ির মেকানিজম যদি গাড়ির মালিকের জানা থাকে আর সর্বদাই যদি সে নিজের গাড়ির খবর রাখে আর নিজেই চালায়...'

'তা বটে...।' উল্কার মত একটা লরির পাশ দিয়ে যাবার কালে সভয়ে আমি চোখ বুঁজে, আমার কথা আর নিশ্বাস দুই-ই বন্ধ হয়ে আসে।

'এই লরিগুলোই তো অ্যাক্সিডেন্ট বাধায়। বুঝেচ? কি করে চালাতে হয় জানে না একদম...' ভোঁদা ভারি ব্যাজার হয়ে ওঠে লরিটার ওপর।

'হ্যাঁ, কী বলছিলাম। এর কলকব্জা সব আমার নখদর্পণে। এর কোণার বোল্টুটাও আমার অজানা নয়। আমার গাড়ি আমি নিজেই সারি। কোনো কারখানায় সারাতে পাঠাই না। গাড়ির সব পার্টস নষ্ট করে দেয় তারাই।...'

পর পর দুটো পেট্রোল ট্যাঙ্কের রগ ঘেঁষে চলে যায় গাড়িটা। না ভোঁদার আমন্ত্রন না নিলেই বুঝি ভালো করতাম আজ!

'গাড়ির আসল জিনিস হচ্ছে তার ব্রেক। ব্রেক যদি তোমার ঠিক থাকে, দুনিয়ার কিছুকে তোমার তোয়াক্কা নেই। বুঝলে?'

'ব্রেক তোমার ঠিক আছে তো?' কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাই। আর ওর স্পীডো-মীটারে পঁয়ষট্টি মাইলের স্পীড উঠেছে দেখতে পাই।

পঁয়ষট্টি! পঁয়ষট্টি! পঁয়ষট্টি!! আমার মনে অনুরণিত হতে থাকে।

'ব্রেক আমার পারফেক্ট বলেই এত জোরে আমি চালাতে পারি।' ওর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

'তোমার ব্রেক ভালো জেনে তবু একটু আশ্বাস পেলাম এখন।' আমি বললাম।

'ভালো বলে ভালো! আমি নিজে হপ্তায় দুবার করে অ্যাডজাস্ট করি ব্রেকটা। ব্রেকের কোনো গলদ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। ব্রেকই তো গাড়ির প্রাণ হে!'

'আর সোয়ারীদেরও বই কি!' আমি সায় দিই ওর কথায়—'তা হলেও একটু আস্তে চালালে কি ভালো হত না? ক্ষতি কি ছিল?'

'তাহলে তো গোরুর গাড়ি কি রিক্সাতেই যেতে পারতে।...এই দ্যাখো সত্তরে তুলেছি স্পীড। চেসে দ্যাখো।' সে দেখায়—'ঐ ব্রেকের ভরসাতেই।'

আমি সভয়ে চোখ তুলে তাকাই। দেখি সত্তর- শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সত্যিই!

'তোমার ব্রেক ঠিক আছে তো? জানো তো ঠিক?' আমি জিগ্যেস করি আবার 'গাড়ি বার করার আগে পরীক্ষা করেছিলে আজ?'

'ঘাবড়াচ্ছো কেন হে? আমার ব্রেকের সম্পর্কে তোমার কোনো সন্দেহ আছে নাকি? দাঁড়াও তাহলে, এক্ষুণি তোমার সন্দেহ মোচন করি। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে যাক...এই দারুণ স্পীডের মাথাতেই আমি ব্রেক কষবো, ঠিক এখান থেকে একশ' গজ দূরে— দরজার পাল্লাটা ধরে শক্ত হয়ে বসো...রেডি!...'

আর ঠিক একশ গজ দূরেই সেই কাণ্ডটা ঘটল! বরাত জোর যে তিনজনেই আমরা রক্ষা পেলাম। একআধটু আঁচড়ের ওপর দিয়েই বাঁচন হলো সে যাত্রায়।

তিনজন? মানে, আমি ভোঁদা আর পেছতের খালি ট্যাক্সির ড্রাইভারটা।

দুখানা গাড়ির ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে যখন কোন রকমে খাড়া হয়ে উঠেছি তখন ওদের দুজনের মধ্যে দারুণ তর্ক বেধেছে। ভোঁদা সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে তার গাড়ির ব্রেকটাও যদি ওর নিজের ব্রেকের মতই টিপটপ অবস্থায় থাকত তাহলে অমন টপ করে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। লোকটা কিন্তু মানতে চাইছে না কিছুতেই। দারুণ ঝগড়া বেধে গেছে দুজনের।

মোড়ের পুলিস সার্জেণ্ট এদিকেই এগিয়ে আসছে দেখতে পেলাম। আর এমনি সময়েই · এই দুর্বিপাকে...

ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন! কানের মধ্যে যেন মধুবর্ষণ হলো অকস্মাৎ।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, থামিয়ে চেপে বসেছি তৎক্ষণাত! ওদের দুজনকে সেই সতর্ক অবস্থায় ফেলে রেখেই...

না, রিক্সায় কোনো রিসক নেই।

আর, পাহারোলার পাললায় পড়ার মতন রিসক আর হয় না! অতএব অকুস্থল থেকে যঃ পলায়তি...!

খবরদারি সহজ নয়

খবর দেয়া সহজ কথা কি ? কথায় বলে, খবরদারি ! খবরদার কথাটার দুটো মানে, এক হচ্ছে যে খবর দেয়, আরেক হচ্ছে, সাবধান ! তার মানে খবর দেবে খুব সাবধান হয়ে।

মানে কিনা খবরাখবর। খবরের সঙ্গে অখবর—সংবাদের সঙ্গে দুঃসংবাদ জড়ানো থাকে। সেইজন্যেই তা কায়দা করে ফাঁস করতে হয়। আসল কথাটা আস্তে আস্তে ভাঙাটাই দস্তুর।

সিধুর মাসির কাছে কি করে খবরটা দেবে সারা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছে মানতু। মাসি ন্যাকি ভারি কড়া মেয়ে, আর খবরটাও তেমন মিটে নয়কো। এই মিঠেকড়া সংবাদটা কি করে যে মিটানো যায় ! ভালো দায় নিয়েছে সে নিজের ঘাড়ে।

দরজায় কড়া নাড়তেই মাসি এসে হাজির !

'আপনি কি ক্ষ্যান্ত মাসি ?' জিগ্যেস করেছে মামতু !– 'আপনিই কি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' খ্যান খ্যান করে উঠেছেন মাসিমা।

'সিধু—আমাদের সিদ্ধেশ্বরের মাসি তো আপনি? সিধু আজ বাড়ি ফিরতে পারবে না।'

'কেন কী হয়েছে?'

'বাড়ি ফেরার তার শক্তি নেই। শনিবার আজ—শনিবার দুটোর সময় অফিসের ছুটি হয় জানেন তো? তার ওপর আজ আবার মাসকাবার মাইনা পেয়ে যেই না সে ফুর্তি'র চোটে লাফাদিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে—পড়্তি তো পড় একেবারে এক চলন্ত মোটরের সামনে—'

'চাপা পড়েছে নাকি? অ্যাঁ!' আঁৎকে ওঠেন মাসি।

'না পড়েনি। মোটরটা তখন ব্যাক করছিল—তাই রক্ষে! মোড় ঘোরাচ্ছি গাড়িটার। কিন্তু ঘুরিয়ে নিয়ে আসতেই দেখা গেল গাড়ির মধ্যে দুটো মুশকো মুশকো লোক। দুটি মিচকে শয়তান। সিধুকে দেখতে পেয়ে তারা এলো গাড়ির থেকে—'

'সেই শয়তানের মতো লোক দুটো?'

'হ্যাঁ, যমদূতের চেহারা। সিধে চলে এল সিধুর কাছে···'

'মেরে ধরে সব কেড়েকুড়ে নিয়েছে তো?'

'কাছে আসতেই সিধু চিনতে পারলো তাদের। পিণ্টু আর পটলা। তাদের তাসের আড্ডায় পিণ্টু আর পটল।'

'পিণ্টু আর পটল তো আমার কি?' ক্ষ্যান্ত মাসি জানতে চান।

'লোকে পটল তোলে, কিন্তু পটলই তুলল সিধুকে। তুলে নিলো নিজের গাড়িতে। বললো চীনোবাজারে জুতো কিনতে যাচ্ছি, চ আমাদের সঙ্গে। বলে তাকে গাড়িতে তুলে যেই না বোঁ করে রাস্তার মোড় ঘুরেছে—'

'অমনি বুঝি একটা লরি?'

'ঘুরতেই বেণ্টিংক স্ট্রীট। চীনে মুচিদের সারি সারি জুতোর দোকান। দোকানে ঢুকে জুতোর দর করতে গিয়ে দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া হল সিধুর। সিধু বললে, তোমার জুতো বিলকুল পিজবোর্ড! বলতেই ক্ষেপে গেল চীনেটা। একটুতেই ওরা ক্ষেপে যায়—চীনেরা ভারী মাথখুনে জাত—কথায় কথায় ছোরা ছুরি বার করে—'

'দিয়েছে তো বসিয়ে?'

'বসিয়ে? না, উঠিয়ে দিলো দোকান থেকে! জুতো জোড়া ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললো, জুতো কিনে তোমার কাজ নেই বাবু! জুতো না কিনে রসগোল্লা খাওগে। জুতো না কিনে রসগোল্লা খেতে বললো, নাকি, জুতো না খেয়ে রসগোল্লা কিনতে বললো—মানে কী যে বললো—রসগোল্লা না কিনে জুতো খাও। নাকি, জুতো না খেয়ে রসগোল্লা কেন, জুতোও খাও, রসগোল্লাও খাও—কী যে বলল—তা আমি ঠিক বলতে পারব না। মোটের ওপর দোকান থেকে ভাগিয়ে দিল ওদের—'

'জ্বতো মেরে ?'

'জ্বতো না মেরে। দোকান থেকে বেরিয়ে পিণ্টু বলল, ঠিক কথাই বলেছে চীনেটা। চল কোথাও গিয়ে ভালো মন্দ কিছ্ব খাওয়া যাক। কাছেই ছিল একটা অফিস ক্যানটিন—সেখানে তারা খেতে গেল। অপিসটার চারতলার ওপরেই ক্যানটিনটা—কিন্তু তার সিঁড়িটা এমন নড়বড়ে যে '

'ভেঙে পড়লো ব্বঝি হ্বড়ম্বড় করে? মাসিমার আশঙ্কার সীমা থাকে না।

'সিঁড়ি ভেঙে তারা ওপরে উঠলো। সেই চারতলার মাথায়। ছাদের উপরে। ছাদের এক ধারটায় সিঁড়ির লাগাও একখানা ঘর আছে—সেইটেই ক্যানটিন! বাকীটা খোলা ছাদ। সেধারে কোনো বারান্দার মতো নেই। সর্বদাই পড়ে যাবার ভয়। সেধারে দাঁড়ালে গা ছমছম করে একবার যদি পা হড়কালো তো চারতলার নীচে—পীচের রাস্তায় ছাদ থেকে পড়ে একেবারে ছাতু……'

'পড়েনি তো কেউ ছাত থেকে পিছলে সেই পীচের রাস্তায়?'

'তাও বলি মাসি, ছাতেও কিছ্ব কম পীচ নেই। পানের পীচে ভর্তি ছাত। ছাতেও তোমার বেশ পিচকারী। তা, পিণ্টুটা কলা খাচ্ছিল আর খোসাগ্বলো ছড়িয়ে ফেলছিল চারধারে। সিধ্ব আপত্তি করলো—খোসাগ্বলো অমন করে যেখানে সেখানে ফেলো না—ওগ্বলো হেলাফেলার জিনিস নয়। বলল যে, কলাকার্ব বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু কলার খোসা কার্ব না। তার ওপর কার্ব পা পড়লে আর রক্ষে নেই। এমন কি, তোমার ঐ খোসার জন্যেই হয়তো ছাত থেকে হয়তো বা পৃথিবী থেকেই খসতে হতে পারে কাউকে। শ্বনে পিণ্টু বলল—যা যা, তোকে আর কলার খোসামো করতে হবে না।'

'কলার খোসামোদ?' ক্ষ্যান্তমাসি হাঁ করে থাকে, ব্বঝতে পারেন না। 'কলার খোসাম্বদি কেউ করে নাকি? কলা কি রাজা উজীর?'

'কলার খোসা নিয়ে আমোদ করা আর কি! ফেলিসনে খোসাগ্বলো অমন করে বলতে না বলতে পটল তুললো।'

'অ্যাঁ, হার্টফেল করলে নাকি গো? বলচো কি তুমি বাছা?' ক্ষ্যান্তমাসি ককিয়ে ওঠেন, 'পটল তুললো আমার সিধ্ব?'

'পটল সেই খোসাগ্বলো তুললো। পটল ওরফে পটলা! তুলে ছাতের একধারে রেখে দিল। আর পিণ্টু বলল সিধ্বকে, কলাড়্বলো খাসা কিন্তু। আরো কলা খাওয়া। মাইনে পেয়েছিস তো আজ? সিধ্ব বললো—যত খেতে পারিস খা! কাঁদি কাঁদি কলা খাইয়ে দেব তোকে। তারপরে তারা ক্যানটিনে বসে চপ কাটলেট সাঁটবার পর ছড়া কলা গিলতে লাগলো তিনজনায়। ছাতময় খোসার ছড়াছড়ি।'

'পটল আবার তুললো খোসাগ্বলো?'—মাসি জানতে উৎস্বক হন।

'তার দায় পড়েছে। তারপরে তারা দ্বজনে মিলে সিধ্বকে ধরে টেনে নিয়ে

গেছে তাসের আড্ডায়। সেখানে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে চারধার বেশ বন্ধ করে—'

'গুম করে রেখেছে নাকি সিধুকে?'

'খেলায় বসেছে তারা। ব্রিজ খেলায়'

এই অবধি বলে মানতু নিজেই গুম হয়ে থাকে। এর পরের শোচনীয় বার্তাটা কি করে ব্যক্ত করবে তার ভাষার খোঁজ করে। দুঃসংবাদ দেওয়ার নিয়ম এই যে তা আস্তে আস্তে ভাঙ্গতে হয়। দুর্ঘটনা যেমন একলা আসে না, একে একে, একটার পর একটা এসে—সইয়ে সইয়ে অসহ্য অবস্থায় নিয়ে যায় অসহনীয় খবরের বেলাও এই একাদিক্রম। দুঃসংবাদ দানেরও দফাদারি আছে। দফায় দফায় রফা করে, শেষ দফায় দফারফা করা।

'ব্রিজ খেলায় বসেছে সিধুরা। ব্রিজ খেলা কি রকম জান মাসি? তোমাদের সেই সেকেলে বিন্তি খেলা নয়। গোলাম চোরও না। এ হচ্ছে বাজী ধরে খেলা। বারোটা বাজিয়েও খতম হবে না।—রাত ভোর চলবে খেলা! এখন অব্দি সিধুর হার হচ্ছে খেলায়, বেজায় রকম হারছে সিধু—হেরে হেরে ঢোল হচ্ছে। মাসকাবারের মাইনে প্রায় কাবার। সিধু যেন কি রকম হয়ে গেছে। খেলার নেশায় প্রায় পাগলের মতো। সে বলছে, যে মাটিতে পরে লোক, ওঠে তাই ধরে। যে খেলায় টাকাগুলো মাটি হলো তার থেকেই টাকাগুলো তুলতে হবে। টাকা মাটি—মাটি টাকা! মুক্ত পুরুষের মতোই বলছে সে। বলছে যে হয় বাজি জিতে বেবাক টাকা তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরব, নয়তো সে—' তারপর আর মানতু বলতে পারে না।

'নয়তো কি আত্মহত্যা করবে নাকি?' শিউরে ওঠেন ক্ষ্যান্ত মাসি।

'নয়তো ওর জামা জুতো সব বাঁধা থাকবে। অবিশ্যি, পুরানো পচা জামা কেউ নিতে চাইবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু জামার সঙ্গে সোনার বোতাম আছে, হাত ঘড়িটাও রয়েছে তার। ফাউণ্টেন পেনটাও ছিল যেন—আমার আসার সময় অব্দি ছিল। দেখে এসেছি আমি। কিন্তু ফিরে গিয়ে ফের দেখতে পাবো কিনা জানি না—'

'সিধুকে ফিরে গিয়ে দেখতে পাবে তো?'

'সিধুকে দেখতে পাবো বইকি। কে আর তাকে সিন্ধুকে তুলে রাখবে!'

'তবে তার ঘড়ি চেন ফাউণ্টেন পেন দেখতে পাবো কিনা সন্দেহ। দেখব হয়ত খবরের কাগজ পরে বসে রয়েছে! যেমন মরীয়া হয়ে খেলতে লেগেছে সিধুটা আর পাগলের মতো ডাক দিচ্ছে—আর সেইসব ডাক ফিরে এসে—বেরারিং ডাকের মতই ফেরত এসে ডবোল খেসারত দিতে হচ্ছে তাকে।'

'কী সব্বোনেশে খেলা বাবা!'

'তাই—তাই, সিধু আমায় বলল—মানতু, তুই যা, ক্ষ্যান্তমাসিকে বলগে যা যে আজ রাত্তিরে আমি বাড়ি ফিরতে পারবো না—মাসি যেন আমার জন্যে না

ভাবে। মাসি যেন মনে করে যে আমি মোটর চাপা পড়েছি, কি ছাদ থেকে কলার খোসায় পিছলে পড়ে গেছি নীচের রাস্তায়—কি চীনেম্যান আমায় ছুরি মেরেছে—কিছু অমনি ভালোমন্দ একটা আমার হয়ে গেছে যাহোক কিছু ভেবে নেয়—আমার জন্যে ভাবতে মানা করিস মাসিকে।'

'আহা, কে যেন সেই মুখপোড়ার জন্যে ভাবতে গেছে। ভাবনার যেন দায় পড়েছে কার! ভেবে মরছে যে কেটা!'

খ্যান খ্যান করে ওঠেন ক্ষ্যান্তমাসি। মানতুর আখ্যান শুনে!

কলকাতার হালচাল

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনবাবু দুই ভাই, কাঠের কারবারে বড় মানুষ। কর্মসূত্রে আসামের জঙ্গলেই চিরটা কাল কাটিয়ে এসেছেন ; এবার ওঁদের শখ হলো কলকাতা শহরটা দেখবার। টাকা তো কামানো কম হয়নি, এবার কিছু কমানো দরকার। তা ছাড়া, তাঁরা কিছু ফেরারি আসামী নন যে সারা জন্মটা আসামেই কাটাতে হবে।

কলকাতা শহরটা চোখে না দেখলেও কানে যে শোনেননি তা নয়। অনেক কিছুই শুনেছেন—অনেক দিন থেকে এবং অনেক দিক থেকে। মোটরগাড়ির কথা শুনেছেন, বড় বড় বাড়ির কথা শুনেছেন, বায়োস্কোপের কথা শুনেছেন, এমন কি ছবিতে আজকাল কথা কইছে এমন কথাও ওঁদের কানে এসেছে।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে কলকাতার লোকেরা নাকি তেমনি মিশুক নয়—পাশের বাড়ির খবর রাখে না, পাড়ার লোককে চিনতে পারে না।

রাস্তায় বেরুলে খালি মানুষ আর মানুষ—কিন্তু আশ্চর্য এই, কেউ কারু সঙ্গে কথা কয় না, উপরন্তু গায়ে পড়ে ভাব জমাতে গেলে বিরক্ত হয়। এমনকি অচেনা কেউ যদি তোমার গায়ে এসে পড়ে, পরমুহূর্তেই দেখবে তোমার পকেট বেশ হালকা হয়ে গেছে। আলাপ না করলেও বিলাপ—কোনদিকেই রক্ষা নেই।

বাস্তবিক, তাঁদের কলকাতা ব্র্যাঞ্চের কর্মচারী দীর্ঘছন্দে চিঠি লিখে শহরের যা হালচাল জানিয়েছে তাতে ভয়ের কথাই বইকি। সবচেয়ে ভাবনার কথা ভাব না করার কথায়—তাঁরা দুই ভাই-ই ভাব করতে ওস্তাদ—চেনা, অচেনা, অর্ধ-চেনার সঙ্গে আড্ডা জমাতে তাঁদের জোড়া নেই—সকালে, বিকেলে, দুপুরে এবং অনেক সময়ে গভীর রাত্রে অনর্গল কথা না বললে তাঁদের ভাত হজম হয় না। গল্প করতে তাঁদের এমন ভাল লাগে—সেজন্যে কাজ পণ্ড করতেও তাঁদের দ্বিধা নেই। কথা বলবার জন্যে আহার-নিদ্রা ভুলতে প্রস্তুত, অপরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে প্রস্তুত, এমন কি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পর্যন্ত পরোয়া নেইকো। কিন্তু কলকাতার লোকেরা মিশুকে নয় এ খবরে খবরে তাঁরা ভারী দমে গেছেন।

কিন্তু দুই ভাই মরীয়া হয়ে উঠেছেন—শহরটা একবার ঘুরে আসবেনই, যা থাকে কপালে!

বড় ভাই বলেছেন—'যদি কলকাতাই না দেখলাম, তবে ভবে এসে করলাম কী? কেবল কাঠ—কাঠ—আর কাঠ, কাঠ কি সঙ্গে যাবে?'

কাঠের প্রতি নেহাত অবিচার হচ্ছে দেখে ছোট ভাই মৃদু আপত্তি তুলেছিল—'না দাদা, কাঠ সঙ্গে ঠিক না গেলেও অন্তিমে কাজে লাগে।'

বড় ভাই প্রবলভাবে ঘাড় নেড়েছেন—'আমি না হয় কবরেই যাব, তবু কলকাতাকে একবার দেখে নেব—না দেখে ছাড়ছি না।'

এর পর আর কথা চলে না, কিংবা কথা চললেও কথা বাড়ানোর চেয়ে কলকাতা বেড়ানোর ইচ্ছা ছোট ভাইয়ের মনে তীব্রতর ছিল বলে এক্ষেত্রে সে চেপে যায়! অতএব একদা অতি প্রত্যুষে গৌহাটির বিখ্যাত বর্ধন অ্যাণ্ড বর্ধন কোম্পানির দুই বড় কর্তাকে শিয়ালদা স্টেশনে এসে অবতীর্ণ হতে দেখা গেল।

গোটা প্ল্যাটফর্মটা এধার থেকে ওধার দু'-দুবার টহল দিলেন, কিন্তু নাঃ, কর্মচারীটার দেখা নেই। কাল দু-দুটো জরুরি তার করে জানানো হয়েছে তাঁরা যাচ্ছেন তবু হতভাগা—

গোবর্ধন বলল—'এমন তো হতে পারে সারা রাত জেগে বেচারাকে হিসেব মেল্যাতে হয়েছে, ভোরবেলার দিকটায় তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা যে নিতান্তই এসে পড়ব এজন্যে হয়ত সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না—'

হর্ষবর্ধন বললেন—'উঁহু।'

গোবর্ধন ভ্রূ কুঁচকে, যেন গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছে এইভাবে সবচেয়ে শোকাবহ দুর্ঘটনার ইঙ্গিত করল—'কিংবা এমনও হতে পারে যে ব্যাটা

কিছুতেই তহবিল না মেলাতে পেরে অবশেষে বাকি যা ছিল মেরে নিয়ে আমরা যখন শিয়ালদায় নামছি তখন সে হাওড়া দিয়ে সট্‌কে পড়েছে ?'

হর্ষবর্ধন তথাপি নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন 'উঁহুহু।'

বড় বড় গবেষণা এইভাবে পুনঃ-পুনঃ ব্যর্থ হওয়ায় মনে মনে চটে গিয়ে গোবর্ধন বললে, 'তবে তুমি কী ভাবছ শুনি ?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করেন—'কিছু না, কলকাতার হালচালই এই। লোকটা নেহাৎ মিথ্যা কথা লেখেনি।'

গোবর্ধন বলে—'স্বীকার করি লোকটা কলকাতার, কিন্তু তাই বলে নিজের মনিবের সঙ্গে মিশবে না—এমন কখনও হতে পারে ?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের বোকামি দেখে অবাক হন—'কেন, স্পষ্টই তো লোকটাকে না মিশতে দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখাই যাচ্ছে না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লোকটার কথা সত্যি। এ তো হাতেনাতেই প্রমাণ। চল, বেরিয়ে একটা মোটর ভাড়া করিগে।'

দাদার 'লজিকে'র বহর দেখে ভাইও কম অবাক হয় না, কিন্তু নির্বাক হবার কথা তার না হলেও, কথা-কাটাকাটিতে না কাটিয়ে সময়টা মোটরে কাটালেই কাজ দেবে ভেবে আপাতত সে নিজেকে দমন করে ফেলে।

হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন, 'চিঠিখানা তোর কাছে আছে তো ? বাড়ির ঠিকানা ছিল তাতে।'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায় -'চিঠি নেই, তবে মনে হচ্ছে ১৩।১২ রসা রোড, ভবানীপুর।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত ভাবিত হন—'কেমন বাড়ি ভাড়া করেছে কে জানে! লোকটা নিজে তো মিশুক নয়ই, হয়ত এমন পাড়ায় বাড়ি দেখেছে যেখানে কথা কইতে গেলে লোকে বিগড়ে যায়। কিছু জিগেস করলে তেড়ে মারতে আসে।'

গোবর্ধন সায় দেয়—'কিংবা মেশবার ভয়ে তাও আসে না।'

'সেইটাই তো আরো ভাবনার কথা—' কিন্তু হর্ষবর্ধনের ভাবনায় বাধা পড়ে, একজন ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে—'ট্যাক্সি চাই বাবু ট্যাক্সি ?'

'যদি মোটরেই চাপি তাহলে তোমার ওই পুঁচকে গাড়িতে যাব কেন হে ? গোবরা, ওই যে ভারী গাড়িখানা বেজায় ধুমধাড়াক্কা করে আসছে ওটাকে দাঁড় করা।' হর্ষবর্ধন এক বৃহদাকার ডবল ডেকারের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন, 'বড় গাড়িতে বেশি ভাড়া লাগবে, এই তো ? কলকাতায় ফুর্তি করতে আসা, টাকার মায়া করলে চলবে কেন ?

শীতের প্রত্যুষে জনবিরল পথে যাত্রীহীন বাসখানা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটছিল, গোবর্ধনের সঙ্কেতমাত্র খাড়া হলো! হর্ষবর্ধন উঠেই হুকুম দিলেন—'চালাও তোমার তেরোর বারো রসা রোড। কোথায় জানা আছে তো ?'

কণ্ডাক্টর জবাব দেয়—'আমাদের তিন নম্বর বাস ওইদিকেই তো যায়।

মনিব্যাগ থেকে একখানা একশ টাকার নোট বার করে হর্ষবর্ধন তার হাতে দেন। কণ্ডাকটর জানায়—'কিন্তু এর চেঞ্জ তো নেই!'

হর্ষবর্ধন বলেন - 'দরকার নেই চেঞ্জ দেবার; পুরোটাই ওর ভাড়া ধরে নাও। চিরকাল মোটর-গাড়ির গল্প শুনে আসছি, আজ সুযোগ হয়েছে, শখ মিটিয়ে চাপব। যত টাকাই লাগুক, কেয়ার করি না আমরা।'

এতক্ষণে গোবর্ধন কথা বলবার ফুরসৎ পায়—'দিব্যি গাড়ি দাদা, দেখছ কতগুলো সীট তার ওপরে গদিমোড়া। আবার হাওয়া খেলবার জন্যে এতগুলো জানালা! একটা বড় আয়নাও রয়েছে সামনে! এমনি একটা মোটর দেশে নিয়ে যাব, কী বল দাদা? মোটরগাড়ি আর মোটর-বাড়ি একসঙ্গে!'

'আলবৎ! দেশে নিয়ে যেতে হবে বইকি! যদি চেনা লোকের চোখেই না পড়লাম তবে মোটরে চেপে লাভ কী হলো?'

'এখন যে-কদিন কলকাতায় আছি গাড়িখানায় চাপা যাবে, কী বল দাদা?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—সে কথা বলতে? সাত দিনের জন্যে এটাকে ভাড়া করে ফেলছি এক্ষুনি।'

হঠাৎ বাস দাঁড়াল এবং একটি তরুণী ভদ্রমহিলা উঠলেন। হর্ষবর্ধন একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ফিসফিস করে গোবর্ধনকে বললেন—'উঠেছে উঠুক, কিছু বলিস নে। মেয়েটা যদি খানিকটা মোটরের হাওয়া খেতে চায় ঘরে—খাক না, ক্ষতি কি, জায়গা যথেষ্টই আছে।'

তরুণীটি একটি সিকি বের করে কণ্ডাকটরের হাতে দিতে গেল। হর্ষবর্ধন বাধা দিলেন—'পয়সা কিসের?'

'খিদিরপুরের ভাড়া।'

'আপনার সিকি আপনি নিজের কাছে রেখে দিন, ওটি আমরা হ'তে দিচ্ছি না! আপনি আমাদের গাড়িতে উঠেছেন, আমাদের সৌভাগ্য, সেজন্যে কোন পয়সা নিতে আমার অক্ষম।' বলে হর্ষবর্ধন গম্ভীরভাবে গোঁফে একবার চাড়ন দিয়ে নিলেন।

মেয়েটির বিস্ময় কমতে না কমতেই আবার বাস দাঁড়াল এবং একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি উঠলেন। যেমনি না তিনি মনিব্যাগের মুখ খুলেছেন অমনি গোবর্ধন গিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল—'মাপ করবেন, পয়সা নিতে পারব না। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন, আরাম করে হাওয়া খান—কিন্তু তারজন্যে ভাড়া দিতে দেব না আপনাকে। মনে করুন এটা আপনার নিজের গাড়ি।'

গোবর্ধনের নিজের গোঁফ ছিল না, চাড়া দেবার জন্যে দাদার গোঁফ ধার নেবে কি না ভাবল একবার।

দু' মিনিটের মধ্যে আরো গোটা তিন ভদ্রলোক, দুটি অত্যন্ত মোটাসোটা মেয়েছেলে এবং আধ ডজন ফচকে চ্যাংড়া গাড়িতে প্রবেশ করল। এবার হর্ষবর্ধনের কপালে রেখা দেখা দিল এবং গোবর্ধনের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো; বড়

ভাইকে চাপা গলায় প্রশ্ন করলো—'কে বলছিল গো কলকাতার লোকরা মিশুকে নয় ?'

কিছুক্ষণেই বাস বোঝাই হয়ে গেল, হর্ষবর্ধন প্রত্যেক অভ্যাগতকেই সাদরে অভ্যর্থনা করছিলেন এবং তাদের ভাড়া দিতে নিরস্ত করতেও তাঁর কম বেগ পেতে হচ্ছিল না। লোকগুলোর অপব্যয়-প্রবৃত্তি দেখে গোবর্ধন আর বিস্ময় দমন করতে না পেরে দাদাকে নিজের অভিমত জানাল—'কলকাতার লোকগুলো ভারী খরচে কিন্তু দাদা !'

'চলে আসুন। জায়গা যথেষ্টই রয়েছে। আরামে হাওয়া খান। একটি পয়সাও দিতে হবে না। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের গাড়িতে আসছেন।' হর্ষবর্ধন থামবার ফুরসত পান না।

আরও প্যাসেঞ্জার উঠতে লাগল, বাসের দুধারের সীট ভরতি হয়ে গেল, এমনকি মাঝামাঝি দুথাক লোক গাদাগাদি দাঁড়িয়ে গেল, – দরজা, ফুটবোর্ড পর্যন্ত ভরতি হবার দাখিল। অবশেষে একজন চীনাম্যান ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়তেই গোবর্ধন সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছে—'দাদা, দাদা, দেখ দেখ, এক চীনাম্যান !'

দাদা অদৃষ্টপূর্ব এবং ইতিহাস-বিশ্রুত হুয়েন সাং ফা হিয়েনের বংশধরটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে গুরুগম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন— 'হুঁ, ওদের দাড়ি হয় না বটে !'

গোবর্ধন যোগ করে—'হ্যাঁ দাদা ! কামাবার হাঙ্গামা নেই—ওরাই এ জগতে সুখী !'

এমন সময়ে কণ্ডাকটর জানাল যে রসা রোড এসে পড়েছে। দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে ঠেলে-ঠুলে কোন রকমে নেমে পড়লেন, নামবার আগে ঘোষণা করলেন— 'ওহে, যতক্ষণ এঁরা চাপতে চান চাপুন, যেখানে এঁরা যেতে চান নিয়ে যাও এঁদের। আরও যা টাকা লাগে আমাদের ঠিকানায় এসে নিয়ে যেয়ো—তেরোর বারো রসা রোড, বুঝলে ? আর আপনারা, বন্ধুগণ, বিদায় ! আরামে ঘুরুন সারা দিন, যত খুশি, যতক্ষণ খুশি ! কারুর একটি পাই-পয়সা লাগবে না।'

বাস থেকে নেমেই গোবর্ধন প্রশ্ন করল—'কলকাতার হালচাল কী রকম বুঝলে দাদা ?'

'হ্যাঁ ! কে বলে কলকাতার লোকেরা মিশুক নয় ? একেবারে মিথ্যা কথা, বাজে কথা, ভুয়ো কথা ! মেশামেশির ধাক্কায় আমার দম আটকে যাবার যোগাড় হয়েছিল ! শেষকালে একটা চীন্যম্যান পর্যন্ত — ! আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সাহেব-সুবোরাও এসে উঠত ! এমনকি মেমরাও। বাপ রে বাপ ! এ রকম গায়ে পড়া মিশুক লোক আমি দুনিয়ায় দেখিনি ! কিন্তু একটা সর্বনাশ হয়েছে—'

গোবর্ধন ব্যস্ত হয়ে ওঠে—'কী ? কী ? পকেট মেরেছে নাকি ?'

'উঁহু ! আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে ফেলেছি ওদের। ভারী মুশকিল করেছি ! খপ করে বাড়ি ঢুকেই খিল এঁটে দিতে হবে, আর যদি সম্ভব হয় বাড়ির

চারধারে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে দেওয়া ভাল। তাতে অনেকটা নিরাপদ। কলকাতার লোক যে-রকম মিশুক দেখছি, বাড়ি চড়াও হয়ে আমাদের সঙ্গে খেতে-শুতে না চেয়ে বসে, কী জানি!'

দ্বিতীয় ধাক্কা॥ গোবর্ধনের গৃহারোহণ

চওড়া ফুটপাথে উঠেই হর্ষর্ধন প্রশ্ন করেন—'কাকে জিজ্ঞাসা করি?'

এইমাত্র তিনি গোবর্ধনকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন, তার চেয়েও গুরুতর ভাবনা তাঁর কাঁধে ভর করে—কলকাতার মত শহরে এত ঘর-বাড়ির মধ্যে নিজের 'থাকতব্য' জায়গার খোঁজ করা কী কষ্টসাধ্য--কী ভীষণ ঝকমারি! এই সমস্ত নিদারুণ মিশুক লোকদের মাঝখানে শেষে কি ফুটপাথেই দিনরাত কাটাতে হবে?

গোবর্ধন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়!

'বাড়ির ঠিকানা বাগাবার কী হবে রে?' হর্ষবর্ধনের প্রশ্ন হয়।

গোবর্ধন জবাব দেয়—'কেন, বাড়ির ঠিকানা তো পাওয়াই গেছে, এখন ঠিকানার বাড়ি বল!'

'ওই একই কথা, একই কথা হলো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাকে?'

গোবর্ধন যোগ দেয়—'নিরাপদও তো নয় জিজ্ঞাসা করা! যদি এখন খুড়ো, জ্যাঠা, মাসি, পিসি, মামা, মাস-শাশুড়ি সব নিয়ে এসে হাজির হয় আমাদের বাড়ি? যে রকম সব মিশুক দাদা!'

'হুঁ!' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন—'বাড়িতে ভারী গোলমাল হবে তাহলে।'

গোবর্ধন আরো বেশি মাথা নাড়ে—'নিজেরা সমস্ত ভাড়াটা গুণে শেষে চৌকির তলাতেও শোবার ঠাঁই পাব কি না সন্দেহ!'

'তবে?' হর্ষবর্ধন মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন দাদার দিকে তাকায়—'ফুটপাথে লাট্টু ঘোরাচ্ছে, ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করব?'

'নিরাপদ তো?'

'না-হয় যত-রাজ্যের ছেলে—ওর বন্ধুদের সব জুটিয়ে আনবে, এই তো? তা আনুক গে। ছেলেরা বাড়ির মধ্যে থাকতে খুব কমই ভালবাসে। একবার বাইরে ছাড়া পেলে হয় - তারপর গড়ের মাঠ বলে কি একটা দেদার ফাঁকা জায়গা আছে না কলকাতায়? তুমিই তো বলছিলে গো?'

'সনাতনখুড়োর কাছে শুনেছিলাম বটে। কিন্তু কোনদিকে জানি নে তো।'

'সেটা জেনে নিয়ে একটা কোন খেলার ছুতো করে ছেলেদের সব ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে গড়ের মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এলেই হবে।'

হর্ষবর্ধন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আদেশ দেন—'তবে ওকেই বল তাহলে।'

দুজনে লাট্টু-নিরত খোকার দিকে অগ্রসর হন—গোবর্ধনই সাহস সঞ্চয় করে—'ওহে খোকা, শোন তো এদিকে!'

খোকার দিক থেকে তীক্ষ্ণ জবাব আসে—'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না!' না তাকিয়েই সে জবাব দেয়।

গোবর্ধন ভড়কে যায়, কিন্তু দাদা পাশে থাকতে ভয়ের কি আছে এই ভেবে মরীয়া হয়ে ওঠে, তার কম্পিত কণ্ঠ শোনা যায় – 'তবে কী বললে তুমি সাড়া দাও শুনি ?'

'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না। দেব কেন? আমি কি খোকা? খোকা তো যারা দুধ খায়।' ছেলেটির স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ পায়।

ব্যাপার সহজ নয় বিবেচনা করে এবার হর্ষবর্ধন নিজেই আগুয়ান হন – 'ওহে বালক! খোকা বলা তোমাকে খারাপ হয়েছে আমরা মেনে নিচ্ছি, এখন বল তো এখানে এত সব বাড়ির ভেতর তেরোর বারো কোনটি ?'

হর্ষবর্ধনের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে বালকের 'লাট্টুশীলতা' তৎক্ষণাত থেমে যায় – 'কী বললেন, তেরোর বারো ?'

'হ্যাঁ, তেরোর বারো কিংবা ত্রয়োদশের দ্বাদশ যেটা তোমার বুঝবার পক্ষে সুবিধে।'

ছেলেটি আর বিস্ময় দমন করতে পারে না—'কী করে জানলেন? আমিই তো! আমারই বয়েস তেরো, ইস্কুলে বারো লিখিয়েছে!'

এমন সময়ে পাশ দিয়ে একটা পরিচিত সাইকেল যেতে দেখে ছেলেটি হর্ষবর্ধনের প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই মুহূর্তে মধ্যে তার পেছনের ক্যারিয়ারে চেপে বসে এবং পরমুহূর্তেই বালক ও সাইকেলচালক দুজনেরই টিকি এত দূরে দেখা যায় যে উচ্চৈঃস্বরে জবাব দেবার কোন সঙ্গত কারণ হর্ষবর্ধন খুঁজে পান না।

'গোবরা, বুঝলি কিছু?'

'উঁহু!'

'তোর ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই দেখছি!'

গোবর্ধন এবার চটে – 'বুঝব না কেন? অনেক আগেই বুঝেছি, বুঝবার এতে এমন কী আছে? কলকাতার সাইকেলের পেছনগুলো সব ছেলেদের জন্যে রিজার্ভ করা, এই তো? যে-কোন ছেলে যখন খুশি চাপলেই হলো।'

হর্ষবর্ধন বলেন—'তা হতে পারে। কিন্তু ছেলেটারও নম্বর তেরোর বারো — তা কিছু বুঝেছিস? যেমন ঘর-বাড়ির, তেমনি কলকাতার প্রত্যেক ছেলেরই একটা করে নম্বর আছে মার্কামারা ছেলে সব!'

বলে হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন। অনন্যোপায় গোবর্ধন দাদার সঙ্গে সমান পাল্লা দেবার প্রয়াসে একবার দাড়ি চুলকে নেয়—'থাকবেই তো নম্বর। কেন, কলকাতার ছেলের কি কিছু কমতি? এই যত লোক দেখছ তাদের প্রত্যেকের গড় পড়তা চারটে-পাঁচটা করে ছেলে—আবার কারু-কারু চোদ্দ পনেরটাও আছে। এত লাখ-লাখ ছেলের মধ্যে পাছে হারিয়ে যায় কি গুলিয়ে যায়—

বাপ মা-রা না খুঁজে পায় সেইজন্যেই এই নম্বর দেওয়া! এ আর আমি বুঝিনি? তোমার ঢের আগেই বুঝেছি।'

'আমার আগেই বুঝেছিস?' হর্ষবর্ধনের গোঁফ হস্তচ্যুত হয়—'বটে? তাহলে তুই আমার আগেই জন্মেছিস, তাই বল? আরে মুখ্যু, আগে না জন্মালে কখনো আগে বোঝা যায়? তাহলে আমার এই ইয়া গোঁফ—তোর কোনো গোঁফ নেই কেন?'

এমন জাজ্বল্যমান উদাহরণের বিপক্ষে গোবর্ধনের বাকবিতণ্ডা অগ্রসর হবার পথ পায় না। কিন্তু হর্ষবর্ধন কি থামবার! 'বড় শক্ত জায়গায় এসে পড়েছিস গোবরা, বুদ্ধি একদম না খেলাতে পারলে কোনদিন তুই মারা পড়বি এখানে। চাই কি, তোকেও নম্বর দেগে দিতে পারে—এখনো তুই ছেলেমানুষ তো! কিন্তু আমার আর সে ভয় নেই।'

হর্ষবর্ধন পুনরায় গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন। গোবর্ধন প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করে –'ম্যানেজারের চিঠিটার মানে বুঝেছ? বালক লিখতে ভুলে লোক লিখে ফেলেছে। কলকাতার বালকরাই মিশুক নয়। দেখলেই তো—সাইকেলে চেপে সটান চোখের ওপর সটকান দিল!'

হর্ষবর্ধন বললে—'তোরও যেমন বুদ্ধি তারও তেমনি! আমরা কি এত পয়রা খরচ করে বালকদের সঙ্গে মিশবার জন্যেই কলকাতায় এসেছি নাকি? এ রকম ভয় দেখাবার মানে? ব্যাটাকে দেখতে পেলেই ডিসমিস করব! আমরা প্রবীণ, প্রাজ্ঞ, প্রাপ্তবয়স্ক লোক – বালকদের সঙ্গে মিশতে যাবই বা কেন? দূর দূর!'

হঠাৎ গোবর্ধন দাদার পিলে চমকে দেয়—'ঐ যে দাদা! আমাদের পাশেই যে তেরোর বারো!'

হর্ষবর্ধন পাশ ফিরে দেখেন, সত্যিই তো, তেরোই বারোই তো বটে! বাঁ-হাতি সম্মুখ বাড়িটার গায়ে পরিষ্কার করে নম্বর দাগা—১৩।১২, বারোটাকে স্পষ্ট করবার জন্যেই মাঝে দাঁড়ি দিয়ে দুভাগ করে দিয়েছে তাতে হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থাকে না। হঠাৎ তাঁর মনে এত পুলকের সঞ্চার হয় যে তিনি ভাইয়ের সমস্ত বোকামি মার্জনা করে দেন। বুদ্ধিহীনতা যতই থাক, দৃষ্টিক্ষীণতা নেই গোবরার।

'ও বাবা! এ যে প্রকাণ্ড বাড়ি! দুজনে এতগুলো ঘরে শোবই বা কী করে?'

'আজ এ-ঘরে, কাল ও-ঘরে এই করলেই হবে।' গোবরা যেন সমস্যার সমাধান করে- সব ঘরগুলোই চাখতে হবে তো একে-একে। তুমি একটায় শুয়ো, আমি একটায় শোব।'

'উঁহু!' হর্ষবর্ধন প্রবল প্রতিবাদ করে—'সেটি হচ্ছে না, আমার ভূতের ভয় করবে তাহলে। তোকে আমার কাছে-কাছে থাকতে হবে। এত বড় বাড়িতে রাত্রে একলা থাকা আমার কম্ম না!'

দুঃসাহসী গোবর্ধন দাদার দুর্বলতার সুযোগে একটু মৃদু হাস্য করে নেয়।

'বেশ, তোমার কাছেই থাকব আমি। কিন্তু তুমি আমায় যখন-তখন বোকা বলতে পারবে না—তা বলে দিচ্ছি।'

'দূর, তুই বোকা হতে যাবি কেন? আমার ভাই কখনো বোকা হয়!' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দেন—'ছেলেটা যেমন খোকা নয়, তুইও তেমনই বোকা নয়।'

দাদার বিরাট পৃষ্ঠপোষকতায় পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয় গোবর্ধন—'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। ফের আমাকে বলেছ কি আমি অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছি। কি ছাতেই শুয়ে থাকব গিয়ে, দেখো!'

হর্ষবর্ধনের কণ্ঠ করুণ হয়—'বিদেশ বিভূঁয়ে এসে অমন করিসনে গোবরা। ভূতের তাড়ায় কোনদিন হয়ত জানলা টপকে রাস্তাতেই লাফিয়ে পড়তে হবে আমায়। বিদেশে এসে বেঘোরে প্রাণটা যাবে তাহলে! আচ্ছা, এই কথা রইল, তুই যদি একগুণ বোকা হোস আমি একশো গুণ বোকা। তাহলে হবে তো?'

'না, তুমি তাহলে হাজারগুণ।' গোবরা গম্ভীরভাবে বলে।

'বেশ, তাই।' হর্ষবর্ধনের মুখ ম্লান হয়ে আসে।

দাদার ম্রিয়মানতায় গোবর্ধনের দুঃখ পায় 'আমি হলে তবে তো তুমি হবে। আমি একগুণও না, তুমি হাজার গুণও না।'

মিনিটের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায় দুই ভাইয়ের।

অতঃপর দুই ভাই দরজার সম্মুখে সমাগত হন। দরজায় প্রকাণ্ড ভারী তালা লাগানো। এত কষ্ট করে কলকাতায় এসে গৃহদ্বারে যে এভাবে অভ্যর্থনা লাভ করবেন হর্ষবর্ধন এ রকম আশংকা কোনদিন করেননি। ঘরে না ঢুকতে দোর গোড়াতেই এই তালাক—এ কী! তিনি ভারী মুষড়ে পড়েন।

গোবরা বলে—'ভেঙে ফেলব? কী বল দাদা? যখন ভাড়া দেব তখন তো আমাদেরই বাড়ি এখন!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'ভেঙে ফেলবি, চৌকিদার কিছু বলবে না তো?'

গোবরা জবাব দেয় 'কলকাতায় আবার চৌকিদার আছে নাকি?' তবু একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়; 'তিনতলা বাড়ির যদি ভাড়া গুনতে পারি তাহলে সামান্য একতালা ভাঙার দাম দিতে পারি না নাকি?'

'তবে ভেঙেই ফ্যাল!' হর্ষবর্ধন হুকুম দিয়ে দেন।

গোবর্ধন প্রবল পরাক্রমে তালার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে, কিন্তু অলপক্ষণেই তার বোধগম্য হয়, অসামান্য তালাকে সামান্য জ্ঞান করা তার অন্যায় হয়েছে। মোটা তালাটা যে-দুটি কড়াকে করায়ত্ত করে রয়েছে সে-দুটি অতি ক্ষীণকায়, অগত্যা গোবর্ধন তালাকে তালাক দিয়ে কড়া ধরেই কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয়। কিন্তু কেউ ছাড়বার পাত্র নয়। গোবর্ধন ঘেমে, নেয়ে, হাঁপিয়ে বসে পড়ে।

হর্ষবর্ধন এবার দরজার ওপর নিজেই পদাঘাত আরম্ভ করেন। দরজা প্রবল প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু এক ইঞ্চি পিছু হটে না—হটবার কোন মতলবই দেখায় না। কাঠের কী কঠোর দুর্ব্যবহার!

তাঁর বিরক্ত কণ্ঠ থেকে বহির্গত হয়—'দূর ছাই! এ কি ভাঙবার দরজা! কলকাতার ভালো কাঠ রপ্তানি করার ফল দ্যাখ্ গোবরা, আমাদের কাঠ আমাদের সঙ্গেই শত্রুতা করছে! ছ্যা ছ্যা!'

গোবরা গুম হয়ে থাকে।

হর্ষবর্ধন বলতে থাকেন—'এবার থেকে কাঠ পচিয়ে ঘুন ধরিয়ে পাঠাব তেমনি। আমাদের ম্যানেজার কি আর সাধে বার বার করে লিখে পাঠায় যে কলকাতায় ভালো কাঠ পাঠাবেন না, পাঠাবেন না, এখানে ভালো কাঠ চালিয়ে তেমন লাভ নেই; খেলো কাঠ পাঠালে ভালো হয়! এখন তার মানে বুঝছি! হুঁ, হাড়ে-হাড়ে বুঝছি!' দরজার পরাকাষ্ঠার সামনে তিনি পাদচারণা শুরু করেন।—'প্রতি পদক্ষেপে টের পেয়েছি।'

গোবর্ধনের প্রাণে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়—'আচ্ছা দাদা, বাড়ির গা দিয়ে একটা লোহার পাইপ দেখলাম না—সটান গিয়ে ছাদে উঠেছে?'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো।'

'আমি ওই ধরে ছাদে উঠি গিয়ে, তারপর নেমে এসে ভেতর থেকে একটা জানলা খুলে দেব, তুমি তখন ঢুকো, কেমন?'

'পারবি উঠতে?'

'তালগাছে ওঠা আমার অভ্যাস, নারকেল গাছেও উঠেছি। খেজুর গাছেই কেবল উঠিনি কখনো।' সে কয়ঃ 'খেজুর কাউকে গায় পড়তে দেয় না তো! গায়ে যা কাঁটা!'

তখন দুই ভাই বাড়ির পাশে এসে দাঁড়ান। হর্ষবর্ধন পাইপের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেন—'হ্যাঁ ছাদ পর্যন্তই গেছে বটে। কিন্তু পাইপ বেয়ে ওঠা কি সোজা রে? পারবি তো?'

গোবর্ধন বলে—'ওঠার চেয়ে নামাই সুবিধে বোধহয়। সর-সরিয়ে নেমে পড়লেই হলো।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'তা বটে। কিন্তু না উঠলে নামবি কী করে?'

'তাই করি, কী বল দাদা? বারকতক উঠি আর নামি, কেমন? বেশ মজা হবে।'

'হুঁ, খুব ভালো একসাইজ। ওতে তোর সাইজও বাড়বে। ডবোল হয়ে যাবি। দুসাইজ হয়ে যাবে তোর। কাল থেকে ওটা করিস, আজ একবার উঠেই চট করে জানলাটা খুলে দে বরং। কেবল রেলে চেপে চেপে তখন থেকে গা ঝিম্ঝিম্ করছে। ভেতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক ততক্ষণ। কিন্তু দেখিস সাবধান, পা ফসকে পড়ে যাস না যেন।'

গোবর্ধন পাইপস্থ হয়। যুগপৎ তার হস্তক্ষেপ আর পদক্ষেপ চলতে থাকে। হর্ষবর্ধন হাঁ করে তাকিয়ে দেখেন।

ছোঁড়াটা আবার গড়িয়ে পড়ে গড়বড়িয়ে না যায়!

তৃতীয় ধাক্কা ॥ গৃহপ্রবেশ ও শেষরক্ষা

পাইপ-পথে গোবর্ধন উর্ধলোকে অদৃশ্য হয়, হর্ষবর্ধন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন কখন জানলা-যোগে গৃহপ্রবেশের আমন্ত্রণ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যায়, তবু গোবর্ধনের দেখা নেই। হর্ষবর্ধনের ভয় হয়, অত বড় বাড়িতে হারিয়ে গেল না তো ছোকরা! ভাবতে থাকেন, কী সর্বনাশ দেখ! ঐ প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা কি সোজা কথা! আর তাছাড়া খুঁজবেই বা কে! এত বড় ভুঁড়ি নিয়ে ঐ খাড়া পাইপ বেয়ে ওঠা হর্ষবর্ধনের কম্ম নয়। শেষটা কি ভাই খুইয়ে আসামীর মত তাঁকে আসামে ফিরে যেতে হবে নাকি! তাঁর চোখ-মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে আসে।

কিন্তু না—একটু পরে একতলার একটা জানলার ছিটকিনি খুলে যায়। গোবর্ধন বত্রিশ পাটি বহিষ্কৃত করে দাদাকে অভ্যর্থনা জানায়। হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে. কিন্তু গোবর্ধনের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়—'তোমার পেছনে ও কী দাদা?'

হর্ষবর্ধন পেছনে তাকিয়ে দেখেন বিরাট জনতা। তারা যে গোবর্ধনের পাইপ-লীলা দেখবার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল একথা তাঁর মনে হয় না,—মুহূর্তের মস্তিষ্ক-চালনায় যে বিপজ্জনক আশঙ্কার আভাস তাঁর চিত্তলোকে চমকে যায় তারই আতঙ্কের ধাক্কায় তিনি পড়ি-কি-মরি হয়ে জানলার দিকে হন্যে হন। ছুটে গিয়ে জানলার অভিমুখে দুই হাত বাড়িয়ে দেন, আঁকড়ে উঠবার চেষ্টা করেন—কিন্তু কেবল হাতা-হাতি করাই সার, জানলা তাঁকে আদপেই আমল দিতে চায় না। জানোয়ার বলে এতদিন যাদের ঘৃণা করে এসেছেন, মনুষ্য-পদ-বাচ্য হর্ষবর্ধন এখন তাদের প্রতিই ঈর্ষান্বিত হন হাতকে পায়ের মত ব্যবহার করার দুর্লভ কায়দা কেবল তারাই করতলগত করেছে।

গোবর্ধন দাদার সাহায্যে অগ্রসর হয়—দাদার করমর্দন করে। গোবর্ধনের চেষ্টা থাকে দাদাকে টেনে তুলতে, দাদারও চেষ্টা থাকে ঠেলে উঠতে কিন্তু পৃথিবীর দুশ্চেষ্টা থাকে হর্ষবর্ধনকে ধরাশায়ী করবার। গোবর্ধন এবং মাধ্যাকর্ষণের ভেতর তুমুল পাল্লা চলে—হর্ষবর্ধন বেচারার প্রাণান্ত হয়। তিনি বাঁচলেও তাঁর ভুঁড়ি বোধহয় বাঁচে না এ-যাত্রা আর। এ রকম অবস্থায় মরিয়া হয়ে উঠতে মানুষের কতক্ষণ? জলে পড়লে হর্ষবর্ধন যেমন কুটোকে অবলম্বন করতে দ্বিধা করতেন না, স্থলে পড়ায় এখন তেমনি গোবর্ধনকে কুটো জ্ঞান করে ঝুলে পড়লেন। গোবর্ধন দাদার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হয়।

হর্ষবর্ধন বলেন, –'পড়লি তো? এই ভয়ই করছিলাম আমি! গায়ে যদি হতভাগার একটুখানিও জোর থাকে!'

গোবর্ধন সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

'আবার তো সেই পাইপ বেয়েই উঠতে হবে? সে কি চারটিখানি কথা?'

গোবর্ধন বলে, 'আচ্ছা, আমি না হয় পাইপ বেয়েই উঠব, তুমি কিন্তু এক কাজ কর। আমি কুঁজো হচ্ছি, তুমি আমার পিঠে চড়ে পড় না!'

'পারবি তো?' হর্ষবর্ধন দ্বিধা বোধ করেন, 'দেখিস, পৃষ্ঠ-ভঙ্গ না হয়ে যায়। বাড়ি গেলে বাড়ি পাব, দাড়ি গেলে দাড়িও পাওয়া যায় কিন্তু তুই গেলে আর তোকে পাব না।' হর্ষবর্ধনের মুখের ভাব ভারী হয়ে আসে।

'তুমি ওঠ না দাদা!' গোবর্ধন দাদাকে উৎসাহিত করে, 'এ কুঁজো সে কুঁজো নয়। একি সহজে ভাঙবার? এ তোমার সেই মাটির কুঁজো না!'

'তাহলে উঠছি কিন্তু! উঠি?' হর্ষবর্ধন বারংবার পুনরুক্তি করেন— গোবরা বারংবার অনুমতি দেয়। অবশেষে আর কোন উপায় না দেখে পিঠের উপর একটা পা রাখেন, তখনই ফের নামিয়ে নেন; আবার পদক্ষেপ করেন, কেমন মায়া হয়, আবার নামিয়ে নেন।

মাটির কুঁজো নয় কিন্তু ধপাস হলেই সব মাটি!

'তাড়াতাড়ি কর দাদা।' গোবর্ধন ফিস্‌ফিস্‌ করে—'দেখছ না, কত লোক দাঁড়িয়ে গেছে!'

'ওদের মতলব বুঝেছি।' হর্ষবর্ধন জবাব দেন।

'বিনে পয়সায় সার্কাস দেখে নিচ্ছে!'

'উঁহু, তা নয়। বাড়ির ভেতরে যাই, বলছি তারপর।'

'দাদা, ভারী দেরি করছ তুমি! লোকগুলো তেড়ে না আসে শেষটায়!' গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে ভয় দেখায়।

লোকগুলো তাড়া করতে পারে এ রকম দুঃসম্ভাবনা হর্ষবর্ধনেরও মনে হয়েছে। সুতরাং তিনি কাল বিলম্ব করেন না, গোবর্ধনের পিঠের উপর চেপে বসে পড়েন, তারপর আর দাঁড়াতে বড় দেরি হয় না—জানলাও সহজে তাঁর নাগাল পায়। হর্ষবর্ধন-ভারে গোবর্ধন যেন আরো ঝুঁকে পড়ে—হয়ত না-মাটির কুঁজোও ভাঙবার মত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রুখে ওঠবার তরফে তার চেষ্টা থাকায় কোন রকমে ভারসাম্য হয়ে যায়।

জানলার অন্তরালে দাদার মহাপ্রস্থানের পথে গোবর্ধন একটা ঝোঝুল্যমান ঠ্যাং ধরে ফেলে। হর্ষবর্ধন ঠ্যাং নিয়েই ওঠেন, মানে, অগত্যা তাঁকে উঠতে হয়, তখন আর অন্য উপায় কী! গোবরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায়—অবলীলাক্রমে।

'দেখলে, কেমন দুজনরাই ওঠা হলো!' গোবরা বলে। 'পা দিয়েই পাইপের কাজ সারলাম।'

হর্ষবর্ধন সে কথার কোনো জবাব দেন না, অনাহত ভুঁড়ি এবং আহত পায়ের শুশ্রূষা করতে থাকেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে হয়— 'কী সর্বনাশ! এখনও খুলে রেখেছিস? বন্ধ করে দে জানলা!'

গোবর্ধন ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে জানলা বন্ধ করে। 'কেন? লাফিয়ে আসবার ভয় করছ ওদের?'

'করছিই তো ! ওরা কারা, এখনো বুঝতে পারিসনি বুঝি ?'

'না তো !' গোবর্ধন মূঢ়ের মত তাকায়।

'সেই বাসের যত লোক !'

'অ্যাঁ ?' গোবর্ধন তাড়াতাড়ি একটা খড়খড়ি ফাঁক করে দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেয়—'সত্যিই তো ! সেই চীনেম্যানটা পর্যন্ত রয়েছে দাদা ! দলে বেশ ভারী হয়ে এসেছে এখন !'

'এখানে থাকবার মতলবে !' হর্ষবর্ধন রহস্যটা ফাঁস করে দেন। 'বুঝেছিস ? বিলকুল বিনে ভাড়ায় !'

গোবর্ধন অসন্তোষ উন্মুক্ত করে—'গাড়ি চড়লি—অমনি অমনি হাওয়া খেলি হলো। তার ওপর আবার বাড়ি চড়াও ? আবদার তো কম না এদের !'

হর্ষবর্ধন জানলার খিল এঁটে দেন—'আর ভয় নেই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'থাক দাঁড়িয়ে সব। কতক্ষণ আর থাকবে ?'

'পাইপ বেয়ে উঠবে না তো ?' হর্ষবর্ধনের আশঙ্কা হয়।' কী মনে করিস তুই ?'

'উঠুক গে।' গোবরা দাদাকে ভরসা দেয়, 'চল আগে থেকে ছাদের দরজটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। থাকতে চায় থাকুক গে ছাদে। বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছি না তো—হ্যাঁ !'

দুই ভাই তড়িৎগতিতে সিঁড়ি অতিক্রম করতে থাকেন। সর্বোচ্চ দরজাটি অর্গলিত করে তবে দুজনের দুশ্চিন্তা দূর হয়।

গোবরা বলে চলে—'এখন পাইপ বেয়ে ওঠ আর পাইপ বেয়ে নাম। বাড়িতে ঢোকার ফাঁক রাখিনি বাপু! চীনেম্যান নিয়ে এসে ভয় দেখানো হচ্ছে আমাদের ! বটে ? এবার চীনেম্যানগিরি বেরিয়ে যাবে সব।'

হর্ষবর্ধন কিছু বলেন না, নীরবে হাঁপান।

অনন্তর দুই ভাই বিভিন্ন ঘর পরিদর্শনে বহির্গত হন। প্রত্যেক কামরাতেই খাট, পালঙ্ক, দেরাজ, ডেস্ক, আয়না ও আলমারি, নানা প্যাটার্নের টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নানান ফার্নিচারের ছড়াছড়ি।

'আমাদের দামী দামী কাঠ কিনে এনে ভেঙে-চুরে ট্যারা-বাঁকা করে কী সব করেছে দেখেছিস ?' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের অভিমত জানতে চান।

গোবর্ধন ঠোঁট বাঁকায়—'কাঠের শ্রাদ্ধ কেবল !'

'সোজাসুজি চৌকি করলি, টুল করলি, চারকোণা টেবিল করলি, ফুরিয়ে গেল—কাঠ নিয়ে এত মারপ্যাঁচ কেন রে বাপু !'

'দরকার তো শোবার, বসবার, আর কখনও কদাচ দু-এক কলম লেখবার। কাজ চলে গেলেই হলো।'

'হ্যাঁ, কাজ চলা নিয়ে কথা। কিন্তু এসব কী !' অকস্মাৎ যেন তাঁর পিলে চমকে যায় ! 'কাঠগুলোর কী সর্বনাশ করেছে রে গোবরা ! ঐ দ্যাখ একটা গেল টেবিল—মোটে তিনখানা পা !'

গোবরা বিরক্তি প্রকাশ করে - 'তিন পায়া তো পদে আছে, ঐ কোণেরটা দেখেছ দাদা ?'

হর্ষবর্ধন সবিস্ময়ে দেখেন, একটা টেবিলের মোটে একখানা পা – তাও ঠিক মাঝখানে—তারই সাহায্যে বেচারা কোন রকমে কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবর্ধন বলে, 'ও টেবিল কোন্ কাজে লাগবে ? ওতে কি বসা যাবে ?

হর্ষবর্ধনও সহানুভূতি জানান 'হুঁ, বসেছ কি কাত, আর চিৎপাত !'

হঠাৎ হর্ষবর্ধনের আকস্মিক উল্লাস হয়—'দেখলি, দেখলি কেমন পদ্য হয়ে গেল ! বসেছ কি কাত, আর চিৎপাৎ !'

হর্ষবর্ধন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে পদ্যটাকে আবৃত্তি করেন।

গোবর্ধনও করে। তারপর দুই ভায়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

গোবর্ধন বলে, 'আবার মিলেও গেছে কেমন ! কোনো খবর কাগজে ছাপতে দিয়ে দাও দাদা। বেশ পদ্য !'

দুই ভাইয়ের মনে বাল্মীকি-সুলভ আনন্দের সূচনা হয় – বাল্মীকির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হবার পরই যে রকম আনন্দ হয়েছিল বলে শোনা গেছে।

তারপর দু'ভাই একটা বড় ঘরে আসে। হর্ষবর্ধন বলেন, 'একটু বসা যাক।'

দুটো চার-পায়া টেবিল যাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই—পাশাপাশি এখন টানা হয়। একটা হর্ষবর্ধন অধিকার করেন, আর একটায় গোবরা বসে।

'চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসা কি আমাদের পোষায় বাপু ? ছড়িয়ে না বসলে বসার আরাম !'

'নিশ্চয়ই তো ! এমন আসনে বসতে হবে যে যখন খুশি ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়াও যায়। আসনের সঙ্গে বিলাস-ব্যসন।'

'খাবার দরকারের মত ঘুমোনোর দরকারও তো মানুষের প্রতি মুহূর্তে' গোবরা, ঐ গদি-আঁটা কিম্ভূতকিমাকার চেয়ারদুটো নিয়ে আয় তো ! পা রাখার অসুবিধা হচ্ছে।'

পা রাখার সুবিধার জন্যে চেয়ার আসে। দুই ভাই গ্যাঁট হয়ে থাকেন। সামনের প্রকাণ্ড আয়নায় হর্ষবর্ধনের প্রতিচ্ছায়া পড়ে—আয়নার ভেতরের আর বাহিরের হর্ষবর্ধনের পরস্পরের প্রতি তাকায় আর নিজের নিজের গোঁফে চাড়া দেয়। গোবর্ধন দাদাদের কাণ্ড দেখে।

অদূরদেশ থেকে জুতোর আওয়াজ আসে। হর্ষবর্ধন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেন—'তারাই ! বুঝতে পেরেছিস ?'

'তালা ভেঙে ঢুকেছে তাহলে ! কী হবে এখন ?'

হর্ষবর্ধন হাল ছেড়ে দেন—'কী আর হবে! থাকতে দিতে হবে। তোদের কলকাতার যেমন হালচাল তাই তো হবে!'

গোবর্ধন প্রতিবাদ করে—'আমাদের কলকাতা! এমন কথাও বোলো না! আসামের খাসা জঙ্গল থাকতে এমন জায়গায় আবার আসে মানুষ! ছ্যা ছ্যা!' গোবর্ধন যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত হয়।

গোবরা দরজার ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে দেখে, আগন্তুক মোটে একটি লোক এবং একমাত্র। তার সাহস হয়, হাঁক ছাড়ে —'কে?'

লোকটা চমকে যায়, পালাবে কি দাঁড়াবে ইতস্তত করে—বিড়-বিড় করে কি যে বলে কিছুই বোঝা যায় না।

হর্ষবর্ধন সম্মুখীন হন—'অমন হাঁ করে আমাদের দেখবার কী আছে? ভয় পাবারই বা কী আছে! কলকাতার লোক ভারি অসভ্য বাপু তোমরা!'

ভূত নয় অদ্ভুত-কিছু এইরকম একটা আঁচ করে এতক্ষণে লোকটার ভয় ভাঙে। তার কম্পিত অভ্যন্তর থেকে অস্পষ্ট ধ্বনি বিনির্গত হয়—'কে আপনারা?'

'পরিচয়টা দিয়ে দাও না দাদা!'

'বর্ধন কোম্পানীর বড় কর্তা আর ছোট কর্তা। আমি শ্রীহর্ষবর্ধন আর ও গোবরা—।'

'উঁহু, শ্রীযুক্ত গোবর্ধন। এখন বল তো বাপু তুমি কে? কড়িকাঠ থেকে নেমেছ বলেই মনে হচ্ছে যেন! ভূত-পেরেত নও তো?'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে—'না, আমি কর্মচারী।' আমতা করে বটে, কিন্তু হাওড়া হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখায় না।

'অ্যাঁ? কর্মচারী!' হর্ষবর্ধন লাফিয়ে ওঠেন; 'বলি বাপু, এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল তোমার? শিয়ালদয়ে সকালে যাওয়া হয়নি কেন? মনিব আমি, আর আমার সঙ্গেই মিশতে চাও না, এতদূর তোমার আস্পর্ধা—তারপরে তুমি নাকি তবিল মেরে সটকেছ।'

'হুঁ, আমরা যখন শিয়ালদয়ে নামছি তখন হাওড়া দিয়ে সটকানো হয়েছে।' গোবর্ধনেরও রোখ চেপে যায়। —'হাওয়া হয়ে গেছ হাওড়া দিয়ে!'

'যাও, তোমাকে ডিসমিস করলুম!' হর্ষবর্ধন হুকুম পাস করেন,—'তবিল যা মেরেছ তা মেরেছ, তা আর ফেরত চাই না। টাকা ওড়াবার জন্যেই আমাদের কলকাতায় আসা - ওটা এখানকার বাজে খরচের মধ্যেই ধরে রাখলুম।'

'হ্যা, মেরে থাকো ভালোই করেছ, কিন্তু জবাব হয়ে গেল তোমার। ব্যস, খতম।' গোবর্ধনও রায় দিয়ে দেয়।

এতক্ষণে লোকটা কথা বলবার ফাঁক পায়—'আজ্ঞে আপনারা ভুল করছেন, আমি আপনাদের লোক নই। এই বাড়ির মালিকের কর্মচারী আমি।'

হর্ষবর্ধন হতভম্ব হয়ে যান, উনি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো লোক কর্মচারী রাখে—এও কি সম্ভব? কিন্তু ক্রমশ এ কথাটাও তাঁর বিশ্বাস হতে থাকে। তিনি নিজেকে সামলে নেন, কিন্তু গোঁ ছাড়েন না—'তাহলেও বলি বাপু, তোমার এ কী রকম আক্কেল! আমরা হলুম ভাড়াটে—আর আমাদের তালা বন্ধ করে পালিয়েছ?'

'এটা কি উচিত?' গোবরারও কৈফিয়ত তলব।

লোকটা নমস্কার করে—'ও! আপনিই বুঝি মিস্টার নন্দী?'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'উহুঁ, নন্দী নই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'ভৃঙ্গীও নই, আমরা হচ্ছি বর্ধন। আসামী, কিন্তু ফৌজদারির আসামী নই। আসামের লোক বলেই আসামী।'

'আসলে বাঙালি।' দাদার অনুযোগ।

লোকটা বলে—'জমিদার গোঁয়ারগোবিন্দ সিং এ-বাড়ি ভাড়া করেছেন—আপনি তাঁরই ম্যানেজার মিস্টার নন্দী তো?' একটু থেমে,—'কিংবা আপনিই বাবু গোঁয়ারগোবিন্দ সিং কি না কে জানে!'

'অত শিং নাড়ছ কেন বল তো হে! আসামের হাতির দাঁত ধরে ঝুলি, শিং দেখে ভয় খাবার ছেলে নই আমরা।' গোবরা দাদার সঙ্গে যোগ দেয় 'তেরোর বারো নম্বরের এই বাড়ি আমাদের ম্যানেজার ভাড়া করে গেছে।'

লোকটা গোবরার মন্তব্যের প্রতিবাদ করে—'তাহলে আপনারা ভুল বাড়িতে এসেছেন মশাই! এ তো ও নম্বর নয়!'

'আলবত ওই নম্বর! নিজের চোখে দেখা, বললেই হবে?' হর্ষবর্ধন কন।

'তুমি তো ভারী মিথ্যেবাদী হে!' গোবরা বলে—'তোমার আর দোষ দেব কি, তোমাদের দেশেরই এই স্বভাব। একজন তো চিঠি লিখেছেন যে কলকাতার লোকেরা মিশুক নয়। কী রকম যে মিশুক নয় তা হাড়ে হাড়ে জেনেছি!'

'তুমি বলছ ভাড়া করিনি, বেশ ভাড়া করছি। তার কী হয়েছে! এখনই করে ফেলছি, এই দণ্ডেই। গোবরা, নোটের তাড়াটা বের কর তো! কত ভাড়া তোমার?'

'কী করে আপনাকে এ-বাড়ি দেব মশাই? মি. সিং যে বায়না করে গেছেন।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'সিং-এর বয়স কত?'

'মি. সিং দাঁড়াশের জমিদার, শুনেছি খুব বুড়ো মানুষ।'

'ছেলেরাই তো বায়না করে থাকে শুনে আসছি চিরদিন—কলকাতার বুড়ো মানুষেরাও আবার,—অ্যাঁ, এ বলে কীরে গোবরা?'

গোবরাও বিস্মিত হয়—'বুড়ো মানুষের বায়না! আজব শহরে এসে পড়া গেছে দাদা!'

'সে বায়না নয় মশাই, এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন। দুশো বত্রিশ টাকা।'

'বেশ, আমরাও না হয় দাদন দিচ্ছি। ডবল দাদন। দিয়ে দে তো গোবরা চারশো বাহাত্তর টাকা!'

গোবরা গুণে গুণে নোট দেয়—'গেল এ মাসের দাদন! আবার আসছে মাসে দেব—আবার দাদন···অবশ্য যদি থাকা হয়। মাসকাবারি এসে নিয়ে যেয়ো তোমার দাদন!'

নোটের গাদা দেখে লোকটার মুখ সাদা হয়ে যায়, সহজে কথা বেরোয় না। অনেক কষ্টে বহুক্ষণ পরে বলে 'বেশ, মি· সিং-এর জন্যে অন্য বাড়ি দেখতে হবে তাহলে। তিনি আজই দাঁড়াশ থেকে রওনা হবেন কিনা! কাল এখানে এসে পেঁছিনোর কথা।'

হর্ষবর্ধন কি যেন চিন্তা করেন—'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বাপু? কিছু মনে কোরো না। তোমাদের এই শহরে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা কি রকম? একটা ব্যবস্থা আছেই, নইলে শহরে অ্যাতো লোক! না খেয়ে কেউ বাঁচে না নিশ্চয়ই?'

গোবর্ধন বলে, 'না খেয়ে আবার বাঁচা যায় নাকি! তুমি কী যে বল দাদা! খেতে না পেলে লোকে বাঁচতে চাইবেই বা কেন? খাবার জন্যেই তো বেঁচে থাকা।'

লোকটি জবাব দেয়—'হ্যাঁ, আছে বই কি! ভালো ভালো পাইস হোটেল আছে। সেখানে এক পয়সার ভাত, এক পয়সার ডাল, ঝাল, ঝোল, অম্বল, তরকারি, চচ্চড়ি, শুক্তো, পলতা, মাছের ঘণ্ট, কপির তরকারি—সব পয়সা পয়সা! যা চাই সব এক-এক পয়সায় পাবেন।'

'কলকাতার লোকরা সব সেখানেই গিয়ে খায় বুঝি? বাঃ বেশ তো?'

গোবরা ঘাড় নাড়ে—'অনেক পয়সা খরচ হয় কিন্তু!'

'যার যেমন খুশি', লোকটা ভরসা দিতে চায়—'কেউ ইচ্ছে করলে তিন পয়সার খেয়েও চলে আসতে পারে, কেবল ভাত আর ডাল।'

'কতদূরে সেই হোটেল?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন।

'একটু দূরে আছে, সেই জগুবাবুর বাজারের কাছটায়।'

'দেখ, আমরা আজ অনেক খেটে-খুটে আসছি দেশ থেকে—গোবরাকে তার ওপরে আবার বাড়িতে চড়তেও হয়েছে। এত চড়াই উৎরাইয়ের পর আমাদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। উৎসাহও নেইকো। তুমি যদি বাপু দয়া করে এখানে আমাদের কিনে এনে দিয়ে যাও তাহলে বড়ই বাধিত হই। তোমাকে টাকা দিচ্ছি অবশ্য।'

গোবরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'যত রকম খাবার সব এক-এক পয়সার এনো —দুশো পাঁচশো যতরকম আছে। সকাল থেকে ভারি খিদেও পেয়েছে দাদা !'

'গোটা পাঁচেক টাকা দিলে কুলোবে ? দে তো গোবরা টাকাটা !'

'খুচরো তো নেই দাদা ! খুচরো নেই বলেই তো ওকে চারশো বাহাত্তরের জায়গায় চারশো আশি দিতে হয়েছে।'

'তবে তো ঐখানেই আটটা আছে।' হর্ষবর্ধন উল্লসিত হন, 'সত্যি গোবরা, তুই নিজের খেয়ালে কাজ করিস বটে কিন্তু এক-এক সময়ে এমন বাঁচিয়ে দিস যে তোকে কোলাকুলি করতে ইচ্ছে হয়ে যায় !'

কোলাকুলির প্রস্তাবে গোবর্ধন ভীত হয় ; এত হাঙ্গামার পর যদি ঐ বিরাট ভুঁড়ির ধাক্কা সামলাতে হয় তাহলেই ও কাবার ! তার উপর আবার এই খিদে পেটে !

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে সে—'তাহলে বাপু, একটু চট করেই আনো গে টাকা পাঁচেকের সব পাইস খাবার, আর যে তিন টাকা বাঁচল তুমি নিয়ো। নিজে খেয়ো কিছু। কেমন ?'

এ রকম কষ্ট স্বীকারে লোকটার বিশেষ আপত্তি দেখা যায় না। 'বেশ, আপনারা ততক্ষণ নেয়ে-টেয়ে নিন, আমি এসে পড়লুম বলে।' সে চলে যায় —তার পুলকিত পদধ্বনি হর্ষবর্ধনকে বিস্মিত করে।

'এখানকার লোকগুলো অদ্ভুত, একটুতেই খুশি। যা করতে বলবি তাতেই রাজি হয়ে রয়েছে, পা বাড়িয়ে তৈরি। শুধু একটু হাঁ করার অপেক্ষা !'

'তার উপর ইংরিজি বিদ্যে একফোঁটাও নেই পেটে। নাইস হোটেলকে বলছে পাইস হোটেল ! নাইস মানে ফাসকেলাস,—জান তো দাদা ?'

'তোর জন্মাবার আগের থেকে জানি !' বলতে বলতে হর্ষবর্ধন টেবিলের উপর লম্বা হন। তাঁর হাই উঠতে থাকে।

চতুর্থ ধাক্কা ॥ বাইশকোপ—মানে, বাইশজনের কোপে শ্রীহর্ষবর্ধন !

সেদিন বিকালের কাহিনী। দুই ভাই গভীর পরামর্শে বসেছেন। আলোচ্য বিষয়, এবার কী করা যায় ? নিশ্চয়ই এখনও কলকাতায় আরো অনেক কিছু দেখবার, শোনবার, যাবার এবং চাপবার বস্তু রয়েছে, কিন্তু সে সবের সদ্ব্যবহার করবেন কী করে ? জীবনে এই প্রথম তাঁদের কলকাতায় আসা এবং এই হচ্ছে প্রথম দিন। এরই মধ্যে কলকাতার হালচাল যা তাঁরা টের পেয়েছেন সেই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই দুই ভাইয়ের আলোচনা চলছিল।

বাস্তবিক, তাঁরা তো নিতান্ত কেউকেটা লোক নন ! আসামের বিখ্যাত বর্ধন অ্যান্ড বর্ধন কোম্পানির বড় দুই অংশীদার। কলকাতায় এসেছেন ফুর্তি করতে —টাকা ওড়াতে। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত জীবনে অনেক টাকা তাঁরা কামিয়েছেন,

এবার কিছু কমিয়ে যাবেন, এই ওঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এজন্যে কলকাতার যত কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, গন্তব্য এবং চাপতব্য বিষয় আছে সব তাঁরা দেখবেন, শুনবেন, যাবেন এবং চাপবেন সেজন্যে যত টাকা লাগে দুঃখ নেই। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ওঁদের স্থির সংকল্প।

কিন্তু টাকা ওড়াবার জো কী! টাকা এমন চিজই নয় যে উড়িয়ে দিলেই উড়ে যাবে। গোবর্ধন একবার দুশ্চেষ্টা করেছিল দেখতে, টাকা আকাশে ছুঁড়ে দিলে উড়ে যায় কি না কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখা গেল তা হাতেই এসে পড়ে, কিংবা হাতের নিতান্ত কাছাকাছি। তা ছাড়া কলকাতার মত জায়গায় টাকা ওড়ানো ভারী কঠিন, হর্ষবর্ধন তাঁর ভাইকে এই কথাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। 'দেখলি না সকালে, আমরা একশ টাকা দিয়ে মোটর ভাড়া করে অমনি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি কিন্তু লোকগুলো গায়ে পড়ে সেধে পয়সা দিতে আসে?'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায় - 'হুঁ, টাকা জিনিসটা উপায় করা সহজ, কিন্তু ওড়ানোই দেখছি কঠিন!'

'বিশেষত কলকাতার মত জায়গায়। এখানকার বোকাদের ঠকিয়ে বেশ দু পয়সা করা যায়। লোকে যে বলে কলকাতার পথে-ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে - নেহাত মিথ্যে নয়!'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু আমাদের পয়সারই যে অভাব নেই, এই হচ্ছে দুঃখের বিষয়।'

'হুঁ, হঠাৎ কোন গতিকে গরিব হয়ে যেতে পারলে আবার ব্যবসা ফেঁদে এখানে বেশ বড়লোক হওয়া যেত। কিন্তু যা টাকা জমেছে, আর কি গরিব হওয়া সম্ভব?' হর্ষবর্ধন উৎসুকচিত্তে গোবর্ধনকে প্রশ্ন করেন।

ছোট ভাই দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করেছে—'এ জন্মে তো নয়!'

হতাশ হয়ে বড় ভাই চুপ করে থাকেন, খানিক বাদে উত্তেজিত হয়ে উঠেন —'তা' বলে কি এমনি করেই হাত-পা গুটিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকতে হবে? চেষ্টা করতে হবে না? চেষ্টার অসাধ্য কী আছে? দ্যাখ আজ কলকাতায় এসেছি - সারা দিনে আর কতই বা খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত! এত কম খরচ হলে চলবে কেন? এইজন্যেই কলকাতায় আসা? নতুন নতুন উপায় করতে হবে না টাকা ওড়াবার? মানিব্যাগটায় দু-পাঁচ শো যা ধরে নিয়ে নে, চল বেরিয়ে পড়ি। দিনটা কি এমনি এমনি নষ্ট হবে?'

হর্ষবর্ধনবাবু ভ্রাতা এবং মানিব্যাগ সমভিব্যাহারে বেরিয়ে পড়লেন, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে। বাস্তবিক, অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়া গেছে, টাকা খরচ করবার একটা পন্থা নেই গো! টাকা ওড়াবার নিত্য নতুন ফন্দি বাতলাতে পারে এমন একজন লোক ভয়ানক বেশি মাইনে দিয়ে রাখতেও তিনি প্রস্তুত,—হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই! এক হাজার – দু হাজার - যা বেতন চায় নিক না!

রাস্তায় বেরিয়েই দেখলেন, একজন লোক মইয়ে উঠে তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে

প্রকাণ্ড বড় একটা ছবি সাঁটছে। ছবিটা হনুমানের—না, হনুমানের নয়, দুই ভাই ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন—ছবিটা একটা অতিকায় জাম্বুবানের। বড় বড় অক্ষরে ছবির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে– ছবির মাথায়, নিচে জাম্বুবানের বগলের মধ্যে—'কিঙ-কঙ – অত্যন্ত চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর চিত্র, রাওনক-মহলে।'

'হুঁ', যা বলেছে! এটি যে চমকদার জাম্বুবান সে বিষয়ে ভুল নেই।'

গোবর্ধন সায় দেয়—'খুব রোমাঞ্চকরও আবার। কী বল দাদা ?'

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'ওহে ব্যক্তি, শোন শোন।' মই আর ময়দার বালতি হাতে লোকটি এগিয়ে আসে। 'বেশ, বেশ ছবিটি তোমার। ভারী খুশি হলাম। একটা আমাদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে লাগিয়ে দাও গে।'

লোকটি জানায় এসব বায়স্কোপের পোস্টার, বাড়ির ভেতরে লাগিয়ে বরবাদ করা তার এক্তিয়ারে নেই।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে ফিস-ফিস করে বলেন—'না লাগায় নাই লাগাবে। রাত্রে এসে তখন চুপি-চুপি খুলে নিয়ে গেলেই হলো—কী বলিস ? বেশ ছবিখানা! কত বড় হাঁ করেছে দ্যাখ! একটা বড় কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে যাব আমরা।'

গোবর্ধন কানে কানে জবাব দেয়—'হ্যাঁ দাদা। আর যদি এখানে বাঁধাতে বেশি খরচ পড়ে, ছবিটার আন্দাজের একটা বড় কাঁচ কিনে নিয়ে গেলেই হবে। দেশে তো আর কাঠের দুঃখ নেই! কারিগরকে দিয়ে ফ্রেম বানাতে কতক্ষণ!'

হর্ষবর্ধন দিলদরিয়া হয়ে ওঠেন—'না, না, এখানেই বাঁধাব। লাগুক না, কত টাকা লাগবে! কোথায় বৈঠকখানা রোড জানি না, কিন্তু খুঁজে নেব; সেখানে আমাদেরই কাঠের দোকান রয়েছে তো, কত চড়া দামে তারা আমাদের কাঠ আমাদেরকেই বিক্রি করে দেখাই যাক! ম্যানেজারটার কাজের বহর জানা যাবে।' তারপর গোঁফ মুচড়ে নেন 'আরে হাঁদা, আসল কথাটা কী জানিস ? তোর বৌদি আসবার সময়ে বলেছিল আমার একটা ফটো তুলিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় ফটো তোলে জানি না তো, এই বিরাট শহরে কোথায় ফটোর কারখানা কে খুঁজে পাবে ? তার বদলে যদি এই ছবিখানি বাঁধিয়ে নিয়ে যাই খুশি হবে না কি ?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে বিচার করে, একবার দাদার দিকে একবার কিঙ কঙের দিকে তাকায়, তুলনা করে দেখে বৌদির চোখে কে অধিকতর পছন্দনীয় হবে, তারপর ঘাড় নেড়ে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানায়।

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'আর একখানা যদি না দিতে পার নাই দেবে। আমরা বাঁধাতাম কিনা! তার দরকারও নেই বড় গোবরা হতভাগা তো বিয়েই করেনি। কিন্তু কী জান, আমরা বড়লোক কিনা' চিত্রকলার সমঝদার আর পৃষ্ঠপোষক হতে হয় আমাদের। বড়লোক হওয়ার অনেক হ্যাপা, বুঝলে হে ? যাক, আমরা দুঃখিত নই সেজন্যে। তা ছবিখানা

আমাদের বাড়ি লাগিয়েছ তার জন্যে কত দিতে হবে তোমাকে? যা চাও বল লজ্জা কোরো না। কোনো দাম দিতেই কুণ্ঠিত নই আমরা।' চাপা গলায় গোবর্ধনের মত নেন—'একশো টাকার একখানা নোট ওকে দিই, কেমন? খুব কম হবে না তো, দ্যাখ। কলকাতা শহরে এসে মান-মর্যাদা খোয়ানো চলবে না ভাই!'

গোবর্ধন 'সেফসাইডে' থাকে, বলে, 'তাহলে দু-খানাই দাও।'

পোস্টারওয়ালা বোধ হয় ঘাবড়ে গিয়েছিল, সে জবাব দেয়—'টাকা নিতে পারব না বাবু, এই হলো আমাদের কাজ।'

দুই ভাই যে মর্মাহত হয়েছেন তা মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। লোকটা সান্তনা দিয়ে জানায়—'আচ্ছা, আসছে হপ্তায় আর একখানা ছবি লাগিয়ে যাব, সেটা এর চেয়ে বাচ্চা-গোছের—সান অব কঙ।'

হর্ষবর্ধনের মুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠে—'বেশ বেশ! সেই ভালো। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা ব্রাদার অব কঙ-ও আনতে পার না? এখনও আমার ছেলেপুলে হয়নি তো, তবে শ্রীমান...' গোবর্ধনের দিকে তাকিয়ে কথাটা তিনি সেরে নিতে চান।

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের দুঃখ সহ্য করতে অপারগ। তিনি কিঙ কঙ নিয়ে অম্লানবদনে বাড়ি ফিরবেন রাজার মতই, আর ভাই খালি হাতে বিষণ্ণ বদনে যাবে—এক যাত্রায় পৃথক ফল—এ চিন্তাও তাঁর অসহ্য।

লোকটা বলে—'আচ্ছা, পুছব কর্তাদের। বোধহয় ব্রাদার অব কঙ ও বেরিয়ে থাকবে অ্যাদ্দিনে।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বে মানিব্যাগের মুখ বন্ধ করেন—'সেদিন তোমায় টাকা নিতে হবে কিন্তু!'

গোবর্ধনও মনে করিয়ে দেয়—'হ্যাঁ, সেদিন আর 'না' বললে শুনছি না!'

দেয়াল-শিল্পী চলে গেলে পরে হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন—'ছবিটার মধ্যে ছোট ছোট অক্ষরে কী সব লিখেছে পড়ে দ্যাখ তো—ব্যাপারটা কী বলে।'

গোবর্ধন সমস্তটা পড়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে—'ধর্মতলায় রাওনাকমহলে একটা বাইশকোপ হচ্ছে,—সেখানে যেতে ডাকছে সবাইকে।'

'চল, যাই সেখানে। অমনি নাকি?'

'উঁহু! ঐ যে লিখেছে—'বিলম্বে আসিলে টিকিট পাইবে না!' টিকিট লাগবে।'

'লাগুক না! টাকা খরচ হবে তো! বলছে যখন তখন আর বিলম্ব করে কাজ নেই, চল।'

'হনুমানের ভাই জাম্বুমান—রামায়ণে পড়নি দাদা? তারই সব কীর্তি-কলাপ, বুঝেছ?'

'অনেকক্ষণ। সমসকৃত ছবি—নাম দেখে বুঝতে পারছিস না? ঐসব অং বং। কিং কং, ততঃ কিং—এসবই হচ্ছে সমসকৃত।'

গোবর্ধন উৎসাহিত হয়ে ওঠে 'রামায়ণ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে দাদা। সেই যে তিন বছর আগে দেখেছিলাম মনে নেই তোমার? কিন্তু এ তো রামযাত্রা নয়, এ হল গিয়ে রামবাইশকোপ! তার চেয়ে ঢের ভালো নিশ্চয়।'

'মনে আছে বইকি। সে ছিল হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড, এ বোধহয় জাম্বুবানের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-টাণ্ড হবে। ধর্মতলাটা কোন দিকে রে, জিজ্ঞাসা কর না কাউকে।'

'জিজ্ঞাসা করে কী হবে, ভাববে পাড়াগেঁয়ে, তার চেয়ে একেবারে মোটরে চেপে বসা যাক।' গোবর্ধনের মোটর চাপবার শখ কম নয়। 'সকালে তো একটা একতালা মোটরে চেপেছিলাম, এবেলা কত দোতালা মোটর ছুটোছুটি করছে দেখ না দাদা! ডাকব একটাকে?'

'উঁহু, মোটরে হুস করে নিয়ে যায়, শহর দেখা হয় না। যদি কলকাতাই না দেখলাম তো কলকাতায় এসে করলাম কী? এবেলা দোতালা মোটর বেরিয়েছে, কাল সকালে দেখবি তিনতালা, কাল বিকেলে চারতালা—কত কি দেখবি, দু-দিন থাক না, আস্তে আস্তে বেরুবে সব। ভাড়াও হবে তেমনি ডবল তিনগুণ, চারগুণ, তা চল্লিশ কেন, একশো টাকা হোক না, আমরা বাপু কিছুতেই পিছ-পা নই।'

সগর্বে পদক্ষেপ করতে করতে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হলেন, অগত্যা ব্রাদার অব হর্ষবর্ধনকেও মোটর না চাপতে পারার দুঃখ হজম করে দাদার অনুসরণ করতে হলো।

চলতে চলতে হর্ষবর্ধনের দৈবাৎ কিসে যেন পা পড়ল, তিনি সহসা পিছলে দুশো হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছলে সাধারণত লোকে পড়েই যায়, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে দাঁড়িয়ে গেলেন। অকস্মাৎ তীরবেগে অগ্রসর হবার সময় ধারণা হয়েছিল হয়ত কোন অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু অবশেষে যখন দণ্ডায়মান অবস্থাতেই রইলেন তখন তাঁর মনে হলো, এ তো বেশ মজাই!

নিঃশব্দ-চলমান দাদার সমকক্ষতা বজায় রাখতে গোবর্ধনকে সশব্দে দৌড়তে হলো। হর্ষবর্ধন পায়ের তলায় তাকিয়ে দেখেন, এই দুর্নিবার গতিবেগের মূলে সামান্য একটা কলার খোসা। এরই পিঠে চেপে তিনি এক মুহূর্তে এতখানি পথ অনায়াসে উতরে এসেছেন। কলকাতায় কলার খোসাও একটা চলতি ব্যাপার তাহলে! যানবাহনের একজন। রীতিমতন চাপতব্যই।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে গতিরহস্যটা বুঝিয়ে দেন—'ওঃ, এতক্ষণ লক্ষ করিনি, চারিদিকেই কলার খোসা ছড়ানো রয়েছে যে! এগুলো কেন ছড়িয়েছে জানিস? চলবার সুবিধের জন্যে। দেখলি না—না-হেঁটে না-দৌড়ে না-লাফিয়ে দুশো হাত এগিয়ে এলাম! এক লহমায় দুশো হাত আনাগোনা কম কথা নয় নেহাত!'

গোবর্ধন মাথা নাড়ে—'যা বলেছ! যারা মোটরে যেতে পারে না তাদের জন্যেই রেখেছে বোধহয়। মোটরের মতনই বেগে যায় অথচ ভাড়া নেই এক পয়সাও! কলকাতার হালচালই অদ্ভুত!'

'আমার ভারী চমৎকার লেগেছে। এখন থেকে আমি কলার খোসায় চেপেই বেড়াব, কী বলিস! কেন অনর্থক হেঁটে মরি! দেরিও হয় তাতে!'

'না না, পড়ে যেতে পার দৈবাৎ!' গোবর্ধন আপত্তি জানায়।

'পাগল, আমি পড়ি কখনও! কখনও পড়তে দেখেছিস আমায়? কোনও জন্মে?'

'আমি তা'বলে অত দৌড়তে পারব না তোমার সঙ্গে!'

'সেই কথা বল!' হর্ষবর্ধন হাসতে থাকেন।

এসপ্লানেডের মোড়ে এসে হর্ষবর্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন—'এবার কোন দিকে যাব? চারদিকেই তো রাস্তা!'

গোবর্ধন সংশোধন করে দেয়—'উঁহু, পাঁচদিকে।'

সামনেই একটা কমলালেবুর খোসা পড়ে ছিল, হর্ষবর্ধন সেদিকে ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—'এবার একটু রকমফের করা যাক। ঐটায় চেপে যাই খানিক!' বলে যেমন না 'খোসারোহণ' করতে যাবেন, অমনি তিনি চিৎপটাং। তৎক্ষণাত উঠে পড়ে হর্ষবর্ধন অপ্রতিভ হয়ে চারদিকে তাকিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে থাকেন, যেন পড়েন নি এমনিভাবে পাশের একজনকে প্রশ্ন করেন—'জায়গায়টার নাম কী মশাই?'

লোকটা খোট্টা, এক কথায় জবাব দেয়—'ধরমতল্লা— জানতা নেহি?'

'ধড়ামতলা—তাই বল! না পড়ে কি উপায় আছে? ঠিকই হয়েছে তবে।'

গোবর্ধনের কৌতূহল হয়, দাদার সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

'সবাই এখানে ধড়াম করে পড়ে যায়। তাই জায়গাটার নাম ধড়ামতলা হয়েছে, বুঝছিস না? পড়তেই হবে যে এখানে!'

'আর কদ্দুর বাপু, তোমার জাম্বুবানের বাইশকোপ। হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল!' গোবর্ধন বিরক্তি প্রকাশ করে।

হর্ষবর্ধন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়েন—'আবার এদিকে খোসায় চাপাও নিরাপদ নয়কো।'

'এখানে এত ভিড় কিসের দাদা?'

'আরে, এই যে রওনক-মহল! দেখছিস না লেখাই রয়েছে—ঐ যে সেই ছবিখানা রে! এখানে দেখছি একটা বড় সাইজের রঙচঙে সেঁটেছে!'

গোবর্ধন এবার সাহসী হয়ে একজনকে প্রশ্ন করে বসে—'ওই ঘুলঘুলিটার কাছে এত ভিড় কেন মশাই?'

'এখুনি টিকিট কাটা শুরু হবে কিনা!' —উত্তর দেয় লোকটা।

'ক' টাকার টিকিট কাটবে দাদা ?' গোবর্ধন দাদাকে প্রশ্ন করে।

'একেবারে সবচেয়ে সামনের সীট, তা যত টাকাই লাগুক।'

হর্ষবর্ধন বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী করেন—'সেবার সনাতনখুড়ো কলকাতা থেকে দেশে ফিরল, তার কাছ থেকে সব আমার জানা। খুড়ো বলে কিনা ঠ্যাটরের সব-আগের সীটের দাম সবচেয়ে বেশি—পাঁচ টাকা করে। 'ঠ্যাটর' কী বুঝেছিস ?'

'না তো !'

'ঠ্যাটর হচ্ছে থিয়েটার—বুঝলি ! খুড়ো কী মুখ্যু দ্যাখ ! তবে, খুড়োরই বা দোষ দেব কী ? ইংরিজি উচ্চারণ করা কি সোজা রে দাদা !'

গোবর্ধন আবার সেই লোকটিকে প্রশ্ন করে—'মশাই, সব-সামনের টিকিট কোথায় দিচ্ছে ?'

লোকটি এবার বিরক্ত হয়—'দেখছেন না ?' ভিড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে—'ঐ তো ফোর্থ ক্লাসের টিকিট ঘর।'

হর্ষবর্ধন দুখানা দশ টাকার নোট বের করে নিয়ে ভাইয়ের হাতে মানিব্যাগ দেয়—'ধর এটা, টিকিট কেটে আনি গে। থিয়েটারের পাঁচ টাকা হলে বাইশ কোপের না-হয় দশ টাকাই হোক ! এর বেশি আর কী হবে ? ভিড়ের মধ্যে সেঁধুব যে, উপায় কী ? সবথেকে দামী সীটের জন্যে সবচেয়ে বেশি ভিড় হবে জানা কথা।'

গোবর্ধন বলে—'হুঁ। কলকাতার লোকের টাকার অভাব নেইতো !'

নোট দুখানা দাঁতে চেপে দুহাতে ভিড় ঠেলে হর্ষবর্ধন ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মুহূর্তপরেই টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলি খুলে গেল—খোলামাত্রই তুমুল কাণ্ড ! কথা নেই বার্তা নেই, জমাট জনতা সহসা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে উঠল—চারিদিকে যেন প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেল ! হঠাৎ হর্ষবর্ধন দেখেন তাঁদের মাথার উপরে জন-দুই লোক সাঁতার কাটছে এবং তাদেরই একজন, ডুবন্ত লোক যেমন করে কুটোকে আশ্রয় করে তেমনি করে তাঁর চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে। গতিক সুবিধের নয় দেখে হর্ষবর্ধন নোট দুখানা মুখের মধ্যে পুরলেন—কি জানি চুল ছেড়ে যদি, নোট চেপে ধরে ! সেই দারুণ ধস্তাধস্তির মধ্যে হর্ষবর্ধন একবার ডুব-সাঁতার দিতে চেষ্টা করলেন, দুবার শূন্যে উঠলেন, তিনবার কাৎ হলেন, অবশেষে চারবার ঘুরপাক খেয়ে, নিজের বিনা চেষ্টায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন ; তখন তাঁর খেয়াল হলো, নোট দু-খানা গোলমালে গিলে ফেলেছেন কখন।

'দেখেছিস গোবরা, জামার দশা ! ফর্দাফাঁই ! আরো দু'খানা নোট দে তো—সে দুখানা হজম হয়ে গেছে।'

গোবরা পকেটে হাত দিয়ে অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়ে, সেখানে ব্যাগের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না। এই দুর্যোগে বা সুযোগে কে পকেট

মেরে সরে পড়েছে। কিন্তু তার বিস্ময় তার বিক্ষোভকে ছাপিয়ে ওঠে—'একি, তোমার কাপড় কী হলো দাদা ?'

তাই তো। এ কার কাপড় পরে আছেন হর্ষবর্ধন ? তাঁর ছিল লাল-পেড়ে ধোপ-দুরস্ত ধুতি—এ কার আধ-ময়লা ফুল-পাড় কাপড়! কখন বদলে গেছে কে জানে!

'আজ আর টিকিট কেটে কাজ নেই দাদা! কাপড় বদলেছে এই যথেষ্ট, এবার যদি চেহারা বদলে যায় ?'

ভাবনার কথা বটে! হর্ষবর্ধন বলেন—'তবে চল বাড়ি ফিরি। কী আর করব, বেশি খরচ করা গেল না আজ! সারা দিনে আর কটা টাকাই বা ওড়াতে পেরেছি হজমের এই কুড়ি ধরে ?' তাঁর কণ্ঠে দুঃখের সুর বাজে।

গোবর্ধন যেতে যেতে হঠাৎ দেখে, রাস্তার কোণে আর-একটা কার মানিব্যাগ পড়ে আছে, দাদার-অলক্ষে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পোরে। ব্যাগটা বেশ ভারি, নোটে-টাকায় নিশ্চয়ই অনেক কিছু। যাক, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে দাদার বকুনি ছিল। মনে মনে সে হিসেব করে, পাঁচশো যদি গিয়েই থাকে তবে সাতশো নির্ঘাত ফিরে এসেছে। টাকাকড়ি কলকাতার পথে ঘাটে ছড়ানো থাকে, বলে যে তা মিথ্যে নয়। সত্যিই এসব কথা। গোবর্ধন কলকাতার প্রতি কৃতজ্ঞ-চিত্ত হয়।

বাড়ি ফিরে হর্ষবর্ধন চায় 'দে তো ব্যাগটা!'

প্রসন্ন মুখে গোবর্ধন জবাব দেয়—'সেটা খোয়া গেছে দাদা, তবে আর একটা কুড়িয়ে পেরেছি, অনেক টাকা আছে তাতে!···দেখছ কেমন পেট মোটা ব্যাগ! ···একি! ব্যাগের আবার হাত পা কেন? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! হাত-পা-ওয়ালা মানিব্যাগ! কিন্তু এর মুখ খোলে না কেন! ওমা, এ যে দেখছি মোটর-চাপা-পড়া চ্যাপ্টা একটা কোলা ব্যাঙ!'

হর্ষবর্ধন অট্টহাস্য করতে থাকেন—'যাক, বেশ হয়েছে! পাঁচশো টাকা তবু খরচ করা গেল—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনো যাবে আজ!'

পঞ্চম ধাক্কা ॥ ইঁদুর-চরিতামৃত

সেদিন সকাল আটটা বেজে গেল তবু দু'ভাইয়ের ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছিল। অর্ধতন্দ্রায় হর্ষবর্ধন নানাবিধ সুখস্বপ্ন দেখছিলেন, যেমন—কেবলমাত্র কলার খোসায় চেপে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা যায় কি না, কিংবা যদি এমন হত রেল লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন না চলে যদি প্ল্যাটফর্মটাই চলতে শুরু করত তা হলে কী মজাই না হত যে! কেমন প্ল্যাটফর্মটায় চেপে, খোলা জায়গায় হাওয়া খেতে খেতে, পায়চারি করতে করতে দিব্যি হিল্লী-দিল্লী বেড়ানো যেতো! ঠিক এমনি সুখের সময়ে (মানুষের সুখ বিধাতার সয় না!) সহসা

হর্ষবর্ধনের মনে হলো, তার ভুঁড়ির ভার যেন অকস্মাৎ অনেকখানি বেড়ে গেছে। চোখ খুললে পাছে স্বপ্নের আমেজ টুটে যায় সেই ভয়ে হর্ষবর্ধন চোখ বুজেই ডাকলেন—'গোবর, এই গোবরা !'

'উঁ !'

'দ্যাখ্‌তো আমার পেটে কী ?'

চোখ না খুলেই গোবর্ধন জবাব দিল—'কী আবার ?'

ইতিমধ্যে ভুঁড়ির বোঝাটিকে সচল এবং সক্রিয় বলে হর্ষবর্ধনের বোধ হতে লাগল। ব্যাপার কি ? নিতান্তই কি নিদ্রার মায়া ত্যাগ করে অকালে চোখ খুলতে হবে ? কিংবা খবরের কাগজের বড় বড় হরফে যাকে বলে 'ভীষণ আকস্মিক দুর্ঘটনা ! তেমনি ভয়াবহ কিছু তাঁরই উদরের উপরে এই মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে ? তাঁর ভয় হচ্ছিল চোখ খুলতে।

'দ্যাখ্‌ না, নড়ছে যে রে - আমার পেটে !'

'পেটে নড়ছে ? পিলে-টিলে হয়ত !' গোবর্ধনও চোখ খোলার কষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। হর্ষবর্ধন ভাবলেন গোবরা ভুল বলেনি। পিলেই হবে, নইলে পেটে আবার নড়বেটা কী ? আসামের পিলে ডাকসাইটে পিলে, কলকাতায় এসে হাওয়া-বদল করে শহরের হালচাল দেখে আন্দোলন শুরু করেছে—এমন আশ্চর্য কিছু নয় ! আকস্মিক ভুঁড়িকম্পের কারণ অবগত হয়ে হর্ষবর্ধন নিশ্চিন্ত হলেন, আবার তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল। ভুঁড়িকম্পে চাপা পড়ার ভয় নেই যখন, সে ভয় বরং পাশের লোকের কিছু পরিমাণে থাকলেও ভুঁড়ির যিনি মালিক তিনি একেবারে অকুতোভয়। সুতরাং হর্ষবর্ধন ভুঁড়িতুত বিপর্যয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করলেন। তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

বর্ধনেরা নিশ্চিন্ত হলেও পিলে নিশ্চিন্ত ছিল না ; হঠাৎ গোবর্ধন অনুভব করল কি যেন একটা লাফিয়ে পড়ল তার পেটের উপর। ভয়ে তার সারা শরীর কুঁকড়ে গেল, কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হলো না। দাদার পিলে তার পেটে লাফিয়ে আসবে, শারীরতত্ত্বের নিয়মে এটা কি সম্ভব ? সে ভয়ানকভাবে ভাবতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে একটা ক্ষীণ আর্তধ্বনি শোনা গেল—মিঁয়াও !

পিলের ডাক ! আওয়াজ শুনে গোবর্ধনের নিজের পিলে চমকে গেল ; সে ধড়মড় করে উঠল—'এ যে বেড়াল, ও দাদা !' তার কণ্ঠে ও চোখে বিভীষিকা, বেড়ালকে তার ভারী ভয় হয়। হর্ষবর্ধন উঠে বেড়ালটাকে বিপর্যস্ত গোবর্ধনের উদর থেকে সজোরে বেদখল করে ঘরের কোণে নিক্ষেপ করলেন। 'বেড়াল ? বেড়াল এল কোত্থেকে ! কী বি - পদ !

বেড়ালটা তৎক্ষণাত ফের লাফিয়ে বিছানায় এসে উঠল—তার সেই লাফটাকে একসঙ্গে হাই এবং লং-জাম্পের রেকর্ড বলা যেতে পারে। মার্জার মহাপ্রভুর ভীত দৃষ্টি অনুসরণ করে দুই ভাই দেখলেন, ঘরের কোণে তিনটে কেঁদো

কেঁদো ইঁদুর—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে তাঁদের রাত্রের ভুক্তাবশেষের সদ্ব্যবহারে নিরত। বিছানায় বসে তিন জনে সভয়ে সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ভয়ের কথাই বটে। কাবুলে ইঁদুর হয় কি না জানা যায়নি, কিন্তু কাবুলি ইঁদুর বলে যদি কিছু থাকে এগুলি হচ্ছে তাই। তারই ভায়রাভাই নিঃসন্দেহই। কাবুলি বেড়ালের সঙ্গে এরা কেমন ব্যবহার করে কে জানে, কিন্তু গো-বেচারা বাঙালি বেড়ালকে যে এরা আদপেই আমল দেয় না তা তো স্পষ্টই! মানুষদের এরা কদ্দুর খাতির করবে তাও জানা নেই, হর্ষবর্ধন নিতান্ত ভাবিত হন।

গোবরা সাহস দেয়—'ভয় কী দাদা, ওরাও তিনজন, আমরাও তো তিনজন।'

হর্ষবর্ধন হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন—'উঁহু! সম্মুখ-সমরে এই বেড়ালটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় দেখলি না। কী রকম পালাতে ওস্তাদ! কী রকম লাফখানা দিল—বাপ্! আস্ত একটা কাপুরুষ!'

অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়ে কথাটা গোবর্ধনের মনে আসে—'হুঁ, যাকে ইংরিজিতে বলে 'কাউহার্ড'; আস্ত গোরু! গোরুর পাল। যা বলেছ!'

হর্ষবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন—'যদি এক-একজন করে আসে আমি ওদের ভয় খাই না। কিন্তু তা তো আসবে না, একসঙ্গে সব তাড়া করবে।'

তাহলে কী বিপজ্জনক ব্যাপারটাই না ঘটবে, ভেবে গোবর্ধন শিউরে ওঠে। একসঙ্গে তিন-তিনটে কাবুলি ইঁদুরের আক্রমণ ঠেকানো কি সহজ কথা? এ যা ইঁদুর, বেড়াল দূরে থাক, এ রকম বাহন দেখলে বাবা গণেশকেও পালাতে হত। কার প্রাণের বাপু মায়া নেই? গোবরা বলে—'বুঝেছ দাদা, এ চিজ দেখলে গণেশ বাবাজীও পালাতেন, এমন কি, তোমার ঐ ঐরাবতও! আমরা তো ছার!'

'হুঁ', হর্ষবর্ধন গম্ভীর হয়ে ওঠেন 'আমি ভাবছি যদি তাড়া করে তাহলে কী করব। কড়িকাঠ ধরে ঝুলতে হবে দেখছি। পালাব কোথায়?'

'হ্যাঁ, দরজা তো ওরাই আগলে রয়েছে!' দুই ভাই কড়িকাঠ ধরে ঝুলছেন, বেড়ালটা দাদার কাছা আশ্রয় করে দোদুল্যমান, আর নিচে থেকে ইঁদুরদের লম্ফ-ঝম্ফ—এই দৃশ্য কল্পনা করে গোবরার হাসি পেল। 'তাই তো, তাহলে তো ভারী মুশকিল হলো দাদা! তুমি কি ওই ভারী দেহ নিয়ে ঝুলতে পারবে?'

বেড়ালটাও কটাক্ষে হর্ষবর্ধনের বিপুল কলেবর লক্ষ করল, তার মুখভাব দেখে মনে হলো গোবর্ধনের মতন সেও এবিষয়ে সন্দেহবাদী। বেড়ালের সহানুভূতি হর্ষবর্ধনের হৃদয় স্পর্শ করল।

'যদি করেই তাড়া আমি ভয় করি নাকি?' হর্ষবর্ধন তাল ঠুকে বেড়ালটার লেজ মুঠিয়ে ধরেন—'তাহলে এই বেড়ালটাকেই বাগিয়ে ধরব! বেড়ালে ইঁদুর মারে বলে শুনেছি—এই বেড়াল-পেটা করেই ইঁদুর ব্যাটাদের মেরে খতম্ করব।'

বেড়ালটা হস্তগত লেজের বিরুদ্ধে কুণ্ঠিতভাবে আপত্তি জানায়—'মিউ'।

অনাহূত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এই চতুষ্পদ ব্যক্তিটিকে গোবরারও ক্রমশ ভাল লাগছিল। ভাল লাগবারই কথা, আসন্ন বিপদের মুখে শত্রুর সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়। ভীষণ বন্যাবর্তে মানুষ আর বাঘ একই ঘরের চাল আশ্রয় করে পাশাপাশি ভেসে চলেছে, অনেক সময়ে এমন দেখা গেছে (দেখার চেয়ে শোনা যাওয়াই সম্ভব, কেননা সেই দারুণ স্রোতের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখার লোক তখন কোথায়)। যাই হোক, আসল কথা এই, বিপদে পড়লে বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, সুতরাং একটা বেড়ালের সঙ্গে ভাব করে ফেলবে এ আর বেশি কথা কী?

সুতরাং সে দাদার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে—'তাহলে বেড়ালটাও যে সাবাড় হবে!'

'হয়, হোক গে। কথায় বলে, যাক শত্রু পরে পরে। ইঁদুরও যাক, বেড়ালও যাক—ওদের কাউকেই চাইনে।'

'আচ্ছা, ইঁদুরগুলো যদি এখন বিছানায় লাফিয়ে আসে দাদা?'

'কেন, তা আসবে কেন? বিছানা কি ওদের খাদ্য নাকি?

'হ্যাঁ, গদি কাটে বলে শুনেছি। নিশ্চয় তুলো খায়। কিন্তু তা নয়, যদি বেড়ালটাকে তাড়া করে আসে?'

'অ্যাঁ; বলিস কী?' হর্ষবর্ধন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, 'তা পারে তাড়া করতে, যে-রকম মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বেড়ালটার দিকে! কী হবে তাহলে?' হর্ষবর্ধনের হৃৎকম্প হয়।

'তাই তো ভাবছি!'

'দে, ওকে ইঁদুরদের দিয়ে দে—পিকনিক করে ফেলুক। ওর জন্যে কি আমরাও প্রাণে মরব?'

কিন্তু বেড়ালটা বোধ করি ওদের মতলব টের পেয়েছিল, এমন ভাবে গদিতে নখ এঁটে বসল যে টেনে তোলে কার সাধ্য! বেড়ালের সঙ্গে টাগ্-অব্-ওয়ারের প্রাণান্ত পরিশ্রমে দুই ভাই যখন ঘর্মাক্তকলেবর, ইঁদুর তিনটে তখন প্রাতরাশ সমাপ্ত করে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছে। বাহুযুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিনজনের কেউই এদিকে দৃক্‌পাত করেননি। প্রথমে বেড়ালের নজরে পড়তেই সে ঘাড় ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এতক্ষণ পরে পরিষ্কার গলায় উঁচু খাদের ডাক ছাড়ল—'ম্যাঁও!'

পরমুহূর্তেই সে বর্ধনদের বাহুপাশ থেকে বিমুক্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল, দরজা পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ইঁদুরদের উচ্ছিষ্টে মনোনিবেশ করল।

বেড়ালের স্বরের তারতম্য থেকেই হর্ষবর্ধন ঘরের পরিবর্তন আবিষ্কার করতে পারলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—'বাঁচা গেল, বাপ্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার! ইঁদুরে বেড়াল তাড়ায়—কলকাতার হালচালই অদ্ভুত!'

'শহুরে ইঁদুর দাদা! যে রকম ভাবভঙ্গী দেখলাম, মানুষেরই তোয়াক্কা করে না, তো বেড়াল! আমার তো বুক কাঁপছিল এতক্ষণ!'

'কিন্তু' - খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে।

'হুঁ।' গোবর্ধন কি যেন ভাবতে থাকে!

'তুই কী ভাবছিলি?'

'ভাবছিলাম বেড়ালটা যে শহুরে ইঁদুর দেখে ঘাবড়েছিল তা হয়ত নয়।'

'তা নয় তো আবার কী! আমাদের কর্মচারী কী লিখেছিল? কলকাতার হালচালই এই। মেশামেশির তত বেশি পক্ষপাতী নয় এরা। এমনকি এই বেড়ালেরাও।'

'উঁহুঁ, তা নয়; পিলেগের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি, কী তাতে?'

'শহর-জায়গায় ভারী হয়।' গোবর্ধনের চালটা মুরুব্বিয়ানা হয়ে ওঠে—'ব্যায়রামটার নাম পিলেগ কেন জান? পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠে—তাই পিলেগ। লেগ কাকে বলে জান তো?'

হর্ষবর্ধন দাবড়ি দেন—'যা-যাঃ, তোকে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না! তোর মাথা।'

'উহু, লেগ মানে মাথা নয়, ঠিক তার উলটো। যাকে বলে গিয়ে পা।'

'জানা, জানি, তোকে আর বলতে হবে না! ফীট মানেও পা হয়—আবার ফীট দিয়ে আমরা কাঠ মাপি. সে হল গিয়ে আর-এক ফীট।'

'আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেও ফীট হয়, সে আবার আরেকটা ফীট। কিন্তু তাতে গিয়ে তোমার লেগ হয় না—লেগে আর ফীটে এই এইখানেই তফাত।'

হর্ষবর্ধন চটে যান—'বুঝেছি। এখন পিলেগের কথা 'ক'।'

'শহরের ইঁদুর, বুঝেছ, কামড়ালেই পিলেগ। বেড়ালটা কেন ঘাবড়াচ্ছিল, বুঝলে এখন? ইঁদুরের ভয়ে নয়, পিলেগের ভয়ে।'

'অ্যাঁ, বলিস কীরে?' হর্ষবর্ধন এবারে চমকে ওঠেন সত্যিই।

'শহুরে বেড়াল, কত ডাক্তারের বাড়ি ওর যাতায়াত—কত ডাক্তারি কথাবার্তা শোনে, রোগ-ব্যায়রামের ব্যাপার সব ওর জানা, তাই ও সাবধান, বুঝেছ দাদা, সাবধানের বিনাশ নেই বলে কি না!'

'তুই ঠিক বলেছিস।' হর্ষবর্ধন সোজা হয়ে বসেন। 'আজ কিংবা কালই এ বাড়ি আমাদের ছাড়তে হবে। যা ইঁদুরের উপদ্রব এখানে—কখন যে কামড়ে দেয় কে জানে! কামড়ে দিলেই হলো!'

'ব্যস, তাহলেই পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত—'

'—আগাগোড়া পিলেগ!' হর্ষবর্ধন বাক্যটা সম্পূর্ণ করে মুখখানা পঁ্যাচার মত বানিয়ে তোলেন। গোবর্ধনও দাদার মুখের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে বসে।

ষষ্ঠ ধাক্কা ॥ অথ শ্রীভিক্ষুক দর্শন

বসে থাকতে থাকতে দুই ভাই অকস্মাৎ উৎকর্ণ হন, তাঁদেরই বাড়ির সদর দুয়ারে খঞ্জনী বাজিয়ে কে সংকীর্তন শুরু করেছে।

হর্ষবর্ধন অভিভূত হয়ে বললেন, 'আহা, কে এমন হরিগুণ গান করে! গোবরা, ডেকে আন উপরে, কোন মহাপুরুষ-টহাপুরুষ হবে! দর্শন করা যাক।'

নিচে থেকে গোবরার গলা শোনা যায় --'কোন মহাপুরুষ নয় দাদা, একেবারেই টহাপুরুষ।'

'তুই ডেকে নিয়ে আয়।'

খঞ্জনীধারীকে নিয়ে গোবর্ধন ঘরে ঢোকে। একজন খোঁড়া ভিখারী – সিঁড়ি ভেঙে উপরে আসতে অনেক কষ্ট, অনেক কসরত করতে হয়েছে তাকে। খোঁড়া দেখে হর্ষবর্ধনের দয়া হয়, তিনি সান্তনা দেবার প্রয়াস পান – 'ভগবান তোমাকে খোঁড়া করেছেন সে জন্যে দুঃখ করো না ভাই, এ তাঁর দয়া। এ জন্মে আমাদের মত পাপী-তাপীকে হরিনাম শুনিয়ে পুণ্য অর্জন করছ, পরজন্মে তাঁর দয়ায়—'

গোবরা কথাটা পূরণ করে 'তুমি একজন সেরা ফুটবল-প্লেয়ার হবে।'

ভিখারীর মুখ বিকৃত হয় 'আর যা বলেন বাবু, তেনার দয়ার কথা বলবেননি, দয়ার জন্যেই মরে আছি! ভয় হয়, এ জন্মের ক্ষেতি সারতে পর-জন্মে না চার-পেয়ে করে পাঠান আমায়!'

লোকটার বিধাতার কৃপায় অরুচি দেখে হর্ষবর্ধন ক্ষুব্ধ হন—'তুমি বোধহয় পদ্যপাঠ পড়নি, সেই পদ্যটা—'একদা ছিল না জুতা চরণ-যুগলে, একদা ছিল না জুতা তার পরে কী ছিলরে গোবরা?'

গোবরার ধারণা হয়, দাদা ওকে ধাঁধা পূরণ করতে বলছেন; তাই অনেক ভেবে সে লাইনটা মিলিয়ে নেয় – 'মোজা পরে চলিয়া গেলাম কর্মস্থলে।'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন 'উঁহুঁহুঁ! মনে আসছে না পদ্যটা সেই কবে বাল্যকালে পড়েছি। যাই হোক, তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই, একজন লোকের একদিন পায়ে জুতো ছিল না বলে সে সেই রাগে ভগবানকে গাল পাড়ছিল, হঠাৎ দেখল আর-একজনের পা-ই নেই; তার তো কেবল জুতোই নেইকো আর একজনের জুতো থাকার প্রয়োজনই নেই! তাই দেখে তখন তার দুঃখ দূর হলো।'

গোবরা যোগ করে 'আর যে লোকটার পা ছিল না সে-ও অন্য লোকটার জুতো নেই দেখে অনেকটা আরাম পেল। দুজনেই ভগবানের অপার মহিমা স্মরণ করে মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।'

ভিখারীটা এই উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা কতটা হৃদয়ঙ্গম করলে সে-ই জানে, কিন্তু সে-ও জোরের সঙ্গে সায় দিল—'দেবেই তো!'

তাঁর শিক্ষার ফল ধরছে দেখে হর্ষবর্ধন পুলকিত হন—'দ্যাখো! তবেই

বোঝ। খোঁড়া হওয়া খুবই দুঃখের তাতে ভুল নেই, কিন্তু কানা হলে আরও কত কষ্ট! ভগবান যে তোমাকে—'

ভিখারী বাধা দেয়, 'যা বলেছেন বাবু, আগে যখন কানা ছিলাম তখন লোকে কেবল আমাকে অচল পয়সা চালাত। সিসের সিকি দুয়ানি যতো! বাধ্য হয়ে আমায় খোঁড়া হতে হলো—কী করি? লোকে ভারী ঠকায়।'

হর্ষবর্ধন দারুণ বিস্মিত হন—'বল কী? তুমি কি আগে অন্ধ ছিলে নাকি?'

'তা, চোখ পেলে কী করে?' গোবরাও বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করে।

ভিখারী আমতা আমতা করতে থাকে—'ভগবানের কেরপা! তা ছাড়া আর কী বলব মশাই!'

'তাই বল!' গোবরা আশ্বস্ত হয়। হর্ষবর্ধন বলেন—'সেই কথাই তো বলছিলাম হে! ভগবানের দয়ায় কী না হয়?'

ভিখারী তাগাদা লাগায়—'পয়সা দিন বাবু, যাই এবার। অনেক বাড়ি ঘুরতে হবে আমাকে, বেলা হলো।'

'আমাদের কাছে তো পয়সা নেই বাপু, নোট আছে কেবল। গোবরা—' বলা-মাত্র গোবর্ধন একখানা দশ টাকার নোট বের করে আনে।

ভিখারী তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয়—'ওঃ দশ টাকার নোট! তা আপনারা দুজনের দুটো পয়সা দেবেন তো বাবু? আমি ন টাকা সাড়ে পনের আনা ফেরত দিচ্ছি—' বলে ঝুলি ঝেড়ে রাশিকৃত পয়সা বের করে গুণতে শুরু করে সে।

'উঁহুঁহুঁ—' হর্ষবর্ধন বাধা দেন—'তুমি গোটা নোটখানাই নাও। ওর বদল দিতে হবে না; আমরা খরচ করতেই শহরে এসেছি।'

ভিখারীর চোখদুটো ডাগর হয়ে ওঠে, সে অবাক হয়ে যায়; কিছুক্ষণ পরে সন্দেহের দৃষ্টিতে নোটখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে, আসল কি নকল আবিষ্কারের চেষ্টা করে। জাল নোটের ভ্যাজাল নয়তো? দেখে-টেখে শেষে তার সাহস হয়—'বাবু, আপনি কি পুলিসের টিকটিকি?'

হর্ষবর্ধন স্তম্ভিত হন—'গোবরা, এ বলে কীরে? আমি টিকটিকি। কলকাতায় এসে কি টিকটিকির মত চেহারা হলো নাকি আমার? আয়নাখানা আনতো দেখি একবার!'

গোবরা আয়না আনতে পাশের ঘরে দৌড়োয়। বাবুর ভাবান্তর দেখে, পাছে নোটখানা কেড়ে নেয় সেই ভয়ে ভিখারীও সেই অবসরে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

হর্ষবর্ধন আপন মনে বলতে থাকেন—'বৌ বলছিলে বটে, যেয়ো না বাপু কলকাতায়, চামচিকের মতন চেহারা হবে। কিন্তু চামচিকে না হয়ে হয়ে গেলাম টিকটিকি! আশ্চর্য!'

আয়না দেখে হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে—'নাঃ, এখনও অন্দুরে গড়াইনি।' গোবর্ধন দাদাকে ভরসা দেয়, দাদার মুখে আবার হাসি খেলে—'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভিখিরিটা! লোকটা কানা ছিল কি, এখনও সেই কানাই রয়েছে!'

গোবর্ধনও সে বিষয়ে দ্বিমত নয়—'হ্যাঁ, এখনও চোখ সারেনি সম্পূর্ণ। তা নইলে তোমার মতন ইয়া লম্বা-চওড়া ভুঁড়িদার লোকটাকে বলে কিনা টিকটিকি? ছ্যাঃ!' ভিখারীর উপর সমস্ত শ্রদ্ধা তার লোপ পায়।

'কিন্তু দেখেছিস, ভিখিরি হলে কী হবে, লোকটার অগাধ পয়সা! সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার চেঞ্জ বার করে দিচ্ছিল! কলকাতার ভিখিরিরাও কী বড়মানুষ! আসামের অনেক ধনীকেই হয়ত কিনতে পারে।'

'যা বলেছ দাদা, হাতে-হাতে ন টাকা সাড়ে পনের আনা নগদ — চাই-কি নিরেনব্বই টাকা সাড়ে পনের আনাও বের করতে পারত হয়ত!'

'তাহলে একখানা একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে নিলিনে কেন? খুচরো টাকাকড়ির কখন কি দরকার পড়ে বলা যায় না তো!'

'আর কী দেখলাম জান দাদা? আরো অদ্ভুত ব্যাপার!'

'কী কী?' হর্ষবর্ধন উৎসুক হন।

'লোকটা আসবার সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, কতো কষ্টেসৃষ্টে এল যে! কিন্তু যাবার সময় সিঁড়ি টপকে তর-তর করে নেমে গেল। ভারী আশ্চর্য কিন্তু!'

হর্ষবর্ধন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না—'আশ্চর্য আর কি, এ কি আমাদের আসাম? এ হলো গিয়ে শহর কলকাতা। এখানকার হালচালই আলাদা।'

তিনি আয়নার মধ্যে আপনাকে পুঙখানুপুঙখ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

সপ্তম ধাক্কা॥ বে-দন্তবাগীশের বিবরে

সাজ-সজ্জা করে দুই ভাই নগর-ভ্রমণের জন্যে বার হন। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গোবর্ধন হতাশ হয়ে ওঠে 'কই দাদা, তুমি যে বলেছিলে আজ সকালে তিনতালা মোটর বেরুবে? কই এখনও বেরুলো না তো!'

'বেরুবে বই কি, সবুর কর! না বেরিয়ে যাবে কোথায়? বেরুতেই হবে! তিনতালাও বেরুবে, চারতালাও বেরুবে—তবে, পাঁচতালার কথা ঠিক বলতে পারি না।'

"পাঁচতালা মোটর বোধ হয় নেই।'

"কলকাতায় কী আছে আর কী নেই কিছুই বলা যায় না। সনাতনখুড়ো এই কথা বলে, বুঝলি?

'ধুত্তোর তোমার সনাতনখুড়ো!'

'আরে, এত অধীর হচ্ছিস কেন? যদি তিনতালা মোটর এ বেলা না-ই বেরোয়, দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে যাব না-হয়—সেও তো তিনতালাই হবে।'

'পড়ে যাই যদি?'

'ধুর, পড়বো কেন? আমি কখনও পড়ি? তবে ধড়ামতলার কাছটায় একটু সাবধান হতে হবে, জায়গাটা বড় খারাপ। আর পড়বই বা কেন? মাথার ওপর দিয়ে বরাবর তার চলে গেছে দেখছিস না?'

'দেখছি তো!'

'কেন বল দেখি? ধরবার জন্যে। পড়বার মুখেই তার ধরে ফেলবি, ব্যাস।'

সত্যিই তো, যতদূর দৃষ্টি যায়—গোবর্ধন চোখ চালিয়ে দেখে – রাস্তার মাঝখান দিয়ে বরাবর তারের লাইন চলে গেছে আর তারই তলা দিয়ে অতিকায় মোটরগুলো হুলুস্থুল হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে। সে মনে মনে দাদার বুদ্ধির তারিফ করতে থাকে, যথার্থই তার মত দাদা দুনিয়ায় দুর্লভ। 'তবে চল দাদা, চটপট একটা মোটরের ছাদে উঠে পড়া যাক। ছাদে যাবার সিঁড়িও আছে যেন দেখা যাচ্ছে। থামাব একটাকে?'

'একটু দাঁড়া।' পাশের দোকানের দিকে হর্ষবর্ধনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়—'দোকানটা এ-রকম দাঁত বের করে রয়েছে কেন দেখা যাক তো।'

উভয়ে দাঁত-বের-করা দোকানের দিকে অগ্রসর হন। 'বাবা, দাঁতের কী বাহার! দেখলে পিলে চমকায়! এটা কিসের দোকান হ্যা?'

একজন সাহেবি পোশাক-পরা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হর্ষবর্ধনের কথার জবাব দেন—'আমরা দাঁত তুলি, দাঁত বাঁধাই। আমি ডেণ্টিস্ট।'

'গোবরা তোর পোকা-খাওয়া দাঁতটা তোলাবি?'

'তা তোলালে হয়, পোকারা খেয়ে শেষ করতে কদ্দিন লাগাবে কে জানে? ওদের ওপর তো বরাত দিয়ে বসে থাকা যায় না।'

'হ্যাঁ তুলেই ফ্যাল। পরের ওপর নির্ভর করা ভাল নয়। তা, কতক্ষণ লাগবে একটা দাঁত তুলতে?'

ডেণ্টিস্ট বলেন—'কতক্ষণ আর? এক মিনিট; আপনি টেরটিও পাবেন না।'

'কত মজুরি?'

'মজুরি কী মশাই, ফিস বলুন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এক কথাই—চেঁচিয়েই বলি আর ফিস-ফিস করেই বলি। দিতে হবে কত?'

'দশ টাকা আমাদের চার্জ।'

'বলেন কী মশাই! এক মিনিটের কাজের জন্যে দ - শ টাকা! আপনি কি ডাকাত? চলে আয় গোবরা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে পেয়ে ভদ্রলোক ঠকাচ্ছেন, চলে আয়, তোর দাঁত তুলিয়ে কাজ নেই।'

গোবরাও অবাক হয়—'সত্যিই তো! মিনিটে মিনিটে দশ-দশ টাকা

রোজকার, তাও আবার পরের দাঁত তুলে ! শহুরে ঠক দাদা, পালাই চল এখান থেকে ? আধ ঘণ্টা কাঠ চিরলে একখানা তক্তা হয়, তার দাম আট আনাও নয়, আর এদিকে এক মিনিটে দশ টাকা তাও আবার গোটা দাঁত না, আধখানা।'

হর্ষবর্ধন আরো রুষ্ট হন—'আমরা বেড়াতে এসেছি, খরচ করতেই এসেছি তাতে ভুল নেই, কিন্তু ঠকতে রাজি নই আমরা। হ্যাঁ, যদি ন্যায্য হয় দুশো টাকা নাও, দিচ্ছি, কিন্তু ঠকিয়ে কেউ একটি পয়সাও নিতে পারবে না আমাদের, হুঁ!'

মেজাজ আর ধরন-ধারণেই দাঁতের ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন যে খদ্দের কেবল দাঁতালোই নয়, শাঁসালোও বটে। এমন মক্কেল হাতছাড়া করা ঠিক না ; তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যদি একটা দাঁতের জন্যে দশ টাকা খরচ করতে নারাজ হয়, না-হয় দশটা দাঁতই তুলিয়ে নিক। তাঁর আপত্তি নেই, কেননা তাঁর পক্ষে তো দশ মিনেটের মামলা ! তাহলেই তো আর ওদের ঠকা হবে না।

নিতান্তই চলে যায় দেখে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন—'দশ টাকায় একটা দাঁত তোলানো যদি লোকসান জ্ঞান করেন, না-হয় দু জনের দুটো দাঁত তুলে দিচ্ছি ঐ এক চার্জে।'

হর্ষবর্ধন দলের পাণ্ডা বিবেচনা করে ডেণ্টিস্ট তাঁকেই হাত করার তাল করলেন—'দেখুন, বাজার মন্দা, কমপিটিশন খুব কীন, সবই জানি, কিন্তু আমাদের রেট তো কমাতে পারিনে ! বরং আপনার একটা দাঁত না-হয় অমনি তুলে দিতে রাজি আছি। এর চেয়ে আর কী কনসেশন আশা করেন বলুন ?'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'একেবারে অমনি ?'

'একেবারে।'

'পোকায় না খেলেও ?'

'ক্ষতি কী ?'

হর্ষবর্ধন কিন্তু আপ্যায়িত হন না। 'মশাই, আমরা কলকাতায় এসেছি, টাকা খরচ করব এ কথাও সত্যি ; কিন্তু তাই বলে যে অনর্থক দাঁত খরচ করে যাব এ দুরাশা আপনি মনেও স্থান দেবেন না। অমনি হলেও না।'

গোবরা বলে—'হ্যাঁ, টাকা আমাদের অঢেল হতে পারে, কিন্তু দাঁত আমাদের মুষ্টিমেয়। বাজে খরচ করবার মত দাঁত নেই আমাদের।'

হর্ষবর্ধন উষ্ণ হয়ে ওঠেন—'আমাদের পাড়াগেঁয়ে দেখে আপনি হয়ত ভেবেছেন যে একটা দাঁও। কিন্তু ভুল ধারণা মশাই আপনার, যত বোকা আমাদের দেখায় তত বোকা আমরা নই ! আমরাও ব্যবসা করি—কিন্তু দাঁতের নয়, কাঠের।'

গোবরা সানাইয়ের পোঁ ধরে—'হ্যাঁ, ব্যবসা করেই খাই আমরা, কাঠের ওপর করাত চালাই, তা ঠিক, কিন্তু গলায় কারো ছুরি বসাই না।'

এতক্ষণে ডেণ্টিস্ট কথা বলার ফুরসত পান—'আমিও না। ছুরি নয়—

সাঁড়াশি বসানোই আমার কাজ, তাও গলায় নয়, দাঁতে।' তিনি গোবর্ধনকে সংশোধন করে দেন।

হর্ষবর্ধন চটে যান —'তা, সাঁড়াশিই বসান আর খুন্তিই বসান কিংবা হাতাই বসান, এক মিনিটের কাজের মজুরি যে দশ টাকা দিয়ে ফেলব, এত ছেলেমানুষ পাননি আমাদের।'

গোবরা দাদার কথায় সায় দেয়—'আর হাতুড়িই বসান চাই কি!'

ডেন্টিস্ট যেন এতক্ষণে আলো দেখতে পান—'ও, এই কথা! এক মিনিটের কাজে দশ টাকা দিতে আপনাদের আপত্তি? তা, না-হয় এক ঘণ্টা ধরে আস্তে আস্তে দাঁতটা তুলে দিচ্ছি—তাহলে তো হবে?' তাঁর প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

এবার হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন; 'হ্যাঁ, তাহলে আপত্তি নেই। উচিত খাটুনির উচিৎ দাম নেবেন, এতে নারাজ হবে কে? কী বলিস তুই গোবরা?'

গোবরাও উৎসাহিত হয় —'দু-ঘণ্টা ধরে তুলুন—কুড়ি টাকা নিন—উচিত মজুরি দিতে আমরা পেছোব না। কিন্তু এক মিনিটে—জানতেও পেলাম না, বুঝতেও পেলাম না—সে কী কথা!'

ডেন্টিস্ট গোবরাকে নির্দেশ করেন —'নিন, বসে পড়ুন তো ঐ চেয়ারটায়! আপনাদের অভিরুচিটা স্পষ্ট করে বললেই পারতেন গোড়ায়, এত বকাবকি হত না! দেখে নেবেন আপনি, এমনভাবে এত আস্তে একটু একটু করে তুলব যে আপনি তো টের পাবেনই, পাড়াসুদ্ধ সবাই টের পাবে যে হ্যাঁ, একটা দাঁত তুলছে বটে।'

গোবধনের ভারী আনন্দ হয়,—'হুঁ, পোকারাও যেন টের পায়! ভারী বজ্জাত ব্যাটারা; এমন যন্ত্রণা দেয় মাঝে মাঝে!' তাকে জিঘাংসা-পরায়ণ দেখা যায়।

হর্ষবর্ধনের হাসি ধরে না—'এই তো চাই! দাঁত তোলা হবে, কাক-চিল জানতে পাবে না সে কী কথা! পাড়াসুদ্ধ জানুক যে হ্যাঁ, একটা মানুষের দাঁতের মত দাঁত তোলা হচ্ছে! নইলে দাঁত তুলে লাভ কী? কথায় বলে, হাতিকা বাত, মরদকা দাঁত।'

ডেন্টিস্ট বাধা দেন—'উঁহু' ভুল হলো কথাটা। মরদকা বাত হাতিকা—'

হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—'দুইই হয়। হাতিকা বাত তো শোনেননি! কী করে শুনবেন, থাকেন কলকাতায়! আমরা আসামের জঙ্গলে থাকি, আমরা জানি। দিনরাত শুনতে পাই।'

ডেন্টিস্টের চোখ কপালে ওঠে—'কেন, সেখানে কি হাতির দাঁত হয় না?'

'হয় না তা কি বলেছি?' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন, 'কথাটার মানে হলো এই যে হাতির আওয়াজ যেমন জোরালো তেমনি জোর হবে পুরুষের দাঁতের। যাকে কামড়াবে তার আর রক্ষা নেই। সেই যে শক্ত ব্যামো—জল দেখলে

ঘাবড়ায়—তাতেই খতম হবে নির্ঘাৎ! কী ব্যামো রে গোবরা?'

গোবরা মাথা চুলকোতে থাকে—'কি হাইডো না ফাইডো—'

'হ্যাঁ, হাইড্রো-হোবিয়া। ইংরিজি কথা মনে রাখা কি সোজা রে দাদা!' হর্ষবর্ধন আরো বিশদ করে দেন, 'বুঝলেন মশাই, দাঁতই হলোগে মানুষের প্রধান অস্ত্র। প্রথমে দাঁত, তার পরেই হাত।'

গোবরা নিজের গবেষণা যোগ করে—'ও দুটো কাজে না লাগলে তারপরেই পা—পালাবার জন্যে।'

বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার জন্যে হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উপর উত্তপ্ত হন—'কিন্তু তাই বলে পা কিছু অস্ত্র নয় তোমার। বরং বাহন বলতে পার, পায়ে চেপেই তো আমাদের যাতায়াত।'

পাছে দু ভাই দোকানের মধ্যেই নিজেদের অস্ত্রবলের পরিচয় দিতে শুরু করে দেয় কিম্বা বাহন বলে বেগে বেরিয়ে যায় সেই ভয়ে ডেন্টিস্ট তাঁর মক্কেলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন—'বসে পড়ুন চেয়ারটায়। আবার তো অনেকক্ষণ লাগবে দাঁতটা তুলতে!'

গোবরা বলে—'এখন কী করে হবে? এখন তো একঘন্টা ছেড়ে এক এক মিনিট সময় নেই আমাদের। শহর দেখতে বেরুচ্ছি এখন, সন্ধ্যার পরে আসব। কী বল দাদা!'

'সেই ভাল। এর মধ্যে তুই বরং কাবুলি ইঁদুরের গর্তটা খুঁজে রাখিস। দাঁতটা সেই গর্তে দিলে কাবুলি দাঁত পাবি।'

'কী হবে দিয়ে? আর কি দাঁত উঠবে আমার? এ তো দুধে-দাঁত নয়!' গোবরা সন্দেহ প্রকাশ করে।

'এ জন্মে না ওঠে পরজন্মে তো উঠবে? আরে, কর্মফল তোর যাবে কোথায়!'

'তাহলে তো কাবুলি হয়ে জন্মাতে হয় দাদা!'

'যদি হয় তো হবে। তোর বুলি শুনিয়ে লোককে কাবু করে দিবি—মন্দ কী!'

ভবিষ্যতের কল্পনায় গোবর্ধন মুহ্যমান হয় কি না হয় ঠিক বোঝা যায় না।

ভাইকে করতলগত করে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হন। 'আচ্ছা, আসি তাহলে ডেন্টিস্ট মশায়। কী দাঁত-ভাঙা নাম মশায় আপনার! কোনো সাহেবে রেখেছিল বুঝি? যেন ইংরিজি ইংরিজি মনে হচ্ছে!'

'হুঁ, যা বলেছ দাদা! ডেনাটিশ মেনাটিশ কখনও বাঙালির নাম হয়? পারবেন মশাই, পারবেন—আপনিই পারবেন দাঁত তুলতে। আপনাকে উচ্চারণ করতেই দাঁত উঠে আসে—সাঁড়াশির দরকার হয় না! ডেনাটিশ—বাব্বাঃ! কী নাম!'

অতিথিরা অন্তর্হিত হলে ডেন্টিস্ট দু-বার কাঁধের ঝাঁকি দেন—'কোথাকার

আমদানি কে জানে! বাহনের সাহায্যে যখন নিয়েছে, আর ফিরবে বলে বোধ হয় না। না ফিরুক, যা চমৎকার আইডিয়া একখানা দিয়ে গেছে তারই দাম দশ টাকা।'

এক ঘণ্টা পরে তাঁর দরজার ওপরে নতুন একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা যায়ঃ

'দাঁতই হল মানুষের প্রধান অস্ত্র।
নিরস্ত্র লোককে সশস্ত্র করাই আমাদের কাজ
আমরা দাঁত বাঁধাই।'

ততক্ষণে দুভাই তিনতলা মোটরের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে উঠেছেন। অবশেষে হর্ষবর্ধন হতাশ হয়ে পড়েন—'নাঃ, কোনো আশা নেই! বেশিতলার মোটর সব ভাড়া হয়ে গেছে আজ। তার চেয়ে এক কাজ করি, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা যাক। সেটাও তো একটা চাপবার জিনিস!'

গোবরাষ মোটরে চাপা শখ, সে তেমন উৎসাহ পায় না—'দূর! ঘোড়ার গাড়িতে আবার মানুষ চাপে?'

হর্ষবর্ধন উত্তেজিত হন 'কেন চাপবে না? ঘোড়ায় চাপে, তো ঘোড়ার গাড়ি। তোর যে কেন এত মোটরের ঝোঁক আমি বুঝি না! আমার তো নিত্যি নতুন জিনিস চাপতে ইচ্ছে করে। ঘোড়ার গাড়ি কি গাড়ি নয়? আমি ডাকছি ঐ গাড়িটাকে এই কচুয়ান, কচুয়ান!'

কোচম্যান গাড়ি এনে খাড়া করে। 'কোথায় যেতে হবে বাবু?'

গোবর্ধন অসন্তোষ প্রকাশ করে—'গাড়ি তো নয়, চার চাকার পিঁজরে!'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে কোচম্যানের কেশবিন্যাস দেখে আত্মহারা—'বাঃ, তোমার খাসা চুল তো হে! কোন নাপিতের কাছে ছেঁটেছ?'

'নাপিত নয় বাবু, সেলুনের ছাঁট।'

'চালই তো কলে ছাঁটে জানি, আজকাল চুলও কলে ছাঁটায়? কালে কালে হলো কী! তা, কোথায় কিনতে মেলে এই সব সেলুনকল? একটা দেশে নিয়ে যাব তাহলে।'

'কোন কল না বাবু, সেলুন হচ্ছে চুল ছাঁটার দোকান।'

'দোকানে চুল ছেঁটে দেয়? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! তা বাপু, তুমি সেই দোকানে নিয়ে চল না আমাদের। আমরা তোমার মত করে চুল ছাঁটব। ভাড়া বল, বকশিস বল, দশ টাকা দেব তোমাকে। দে তো গোবরা, একখানা নোট ওকে! নাও, আগাম নাও।' গাড়িতে চেপে হর্ষবর্ধনের স্ফূর্তি হয়, 'ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিলাম বলেই তো চুল ছাঁটার দোকান জানলাম! কখন কিসে কার থেকে কী উপকার হয় কেউ কইতে পারে? কলকাতার মত চুল ছাঁটলে পাড়াগেঁয়ে বলে কারু সন্দেহও হবে না, কেউ আমাদের ঠকাতেও সাহস করবে না।'

গোবর্ধন গুম হয়ে থাকে।

'তা ছাড়া কলকাতায় এলাম, তার একটা চিহ্ন তো নিয়ে যেতে হবে, আমাদের মাথা দেখে তবু এখানকার হালচালের কিছু পরিচয় পাবে দেশের লোক। তারা কত অবাক হবে ভাব তো!'

তবুও গোবর্ধন সাড়া দেয় না।

'তাই মাথায় করে নিয়ে যাব কলকাতাকে। সারা কলকাতা তো মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি না, তাই মাথাটা কলকাতার মত করে নিয়ে যাই।'

গোবর্ধন এবার জবাব দেয় 'কে যেন গোটা গন্ধমাদনই মাথায় করে নিয়ে গেছল না?'

হর্ষবর্ধন কি-একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু বাধা পড়ে; কোচম্যান গাড়ির দরজা খুলে ডাকে—'নামুন বাবু, এসে পড়েছি।'

হর্ষবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে—'সে কি! এক মিনিটও তোমার গাড়ি চাপলাম না এর মধ্যেই এসে পড়লাম!'

গোবর্ধন বলে, 'কড়কড়ে দশটা টাকা গুণে দিয়েছি নগদ!'

কোচম্যান জবাব দেয়—'যেখানে যেতে বললেন নিয়ে এলাম। বিশ্বাস না হয়, ঐ দেখুন দোকানের সাইনবোর্ট।'

দুই ভাই গাড়ির দুই জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান—সত্যিই, অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, 'সাইনবোর্টে' স্পষ্ট করে বড় বড় হরফে লেখা—

'এখানে উত্তমরূপে চুল ছাঁটা আর দাড়ি কামানো হয়।'

হর্ষবর্ধন তবু ইতস্তত করেন 'এত শিগগির এলে? তোমার গাড়ি যে বাপু মোটরের চেয়েও জোর চলে দেখছি! গাড়ি চাপলাম, তা টেরই পেলাম না!'

গোবরাও নামতে রাজি হয় না—'তোমার কি বাপু পক্ষীরাজ ঘোড়া? একেবারে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল!'

কোচম্যান বলে—'তা যখন দশ টাকা পেয়েছি হুকুম করেন তো আপনাদের আলিপুর ঘুরিয়ে আবার এখানেই নিয়ে আসছি। কিন্তু আলিপুর গেলে একটু মুশকিল আছে।'

'কী? কী মুশকিল? কিসের মুশকিল?' দুই ভাইয়ের যুগপৎ জিজ্ঞাসা।

'সেখান থেকে আপনাদের ফিরতে দিলে হয়!' কোচম্যান একটু মুচকি হাসে।

গোবরা বলে—'কেন? কেন ফিরতে দেবে না? কে ফিরতে দেবে না? আটকাবে কেটা? কার অ্যাদ্দুর ক্ষমতা? আমরা পালিয়ে আসতে জানি।'

হর্ষবর্ধন অধিকতর সমীচীন হন—'উঁহু, দরকার নেই গিয়ে। জায়গাটা

বোধ হয় খারাপ, প্রাণের ভয়-টয় আছে। নইলে বারণ করবে কেন? নেবে পড় গোবরা!' তিনি ভুঁড়িকে অগ্রবর্তী করেন, গোবরা পশ্চাদ্বর্তী হয়।

গাড়ি চলে গেলে গোবরা আকাশ থেকে পড়ে—'আরে, এ যে আমাদের সামনের বাড়ি গো! কাল থেকে দুশো বার এ সেলুনটা আমার চোখে পড়েছে। কেবল ভাবছি, নীল কাচের দরজা দেওয়া ঘরটা কী হতে পারে! তখন তো জানি নি এই-ই সেলুন!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন, 'বলিস কী!' তিনি ঘুরে দাঁড়ান। 'তাই তো! ঐ যে ও ফুটপাথে আমাদের বাড়ি! আর তার পাশেই সেই ডেণ্টিস্টের দোকান!'

এমন সময়ে একটি বছর পনেরর ফুটফুটে ছেলে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে। গোবর্ধন তাকে চিনতে পারে—'তোমাকে যেন দেখেছি হে! তুমি আমাদের পাশের বাড়ির না?'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে—'কোন বাড়িটা আপনাদের?'

'ঐ যে আমার ছবি সাঁটা রয়েছে—দেয়ালে—' ভুল ধরতে পেরে হর্ষবর্ধন তৎক্ষণাৎ শুধরে নেন—'উঁহু, আমার নয়, কিং কঙের ছবি সাঁটা রয়েছে ঐ আমাদের দেয়ালে—'

'দেখেছি। আর ঐ বাড়িটা আমাদের।' ছেলেটা দাঁত বের-করা দোকানটা নির্দেশ করে, 'ডেণ্টিস্ট আমার বাবা।'

'অ্যাঁ, বল কী গো? দেখি, হাঁ কর তো! একি, তোমার সবগুলো দাঁতই যে ঠিকঠাক রয়েছে! একটাও তোলেননি তো!' হর্ষবর্ধন চমৎকৃত হন।

গোবর্ধন বলে—'তোমার বাবা বোধ হয় তোমাকে তেমন ভালবাসেন না?'

'তোমার দাঁতগুলো সব বাঁধানো বোধ হয়?' হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ হন।

ছেলেটা ঘোরতর প্রতিবাদ করে—'বাঃ, তা কেন হবে? কখনই নয়।'

গোবরার কৌতূহল হয়—'টেনে দেখতে দেবে?'

'এই যে আমি নিজেই টানছি, দেখুন না!' ছেলেটি প্রাণপণ বলে দুহাতে দুপাটি আকর্ষণ করে।

তথাপি হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থেকে যায় 'উঁহু, তুমি জান না যে তোমার দাঁত বাঁধানো। দুপাটিই তোলা হয়েছে, তোমার মনে নেই। তুমি ডেণ্টিস্টের ছেলে তোমার কখনও আসল দাঁত হয় নাকি?'

গোবরা বলে—'সেলুনে বুঝি চুল ছাঁটতে গেছলে?'

'না, দাড়ি কামাতে গেছলাম।'

'এইটুকুন ছেলে, তোমার দাড়ি কই হে!' বিস্ময়ে হর্ষবর্ধন বিরাট হাঁ করেন।

দাড়িহীনতার লজ্জায় ছেলেটি ম্রিয়মান হয়ে যায়—'দাড়ি আর টাকা কি

অমনি আসে মশাই ? কামাতে হয়। আমার কথা নয়, মাস্টারমশাই বলেন। আমার ইস্কুলের টাইম হলো।'

ছেলেটি চলে যায়, দুই ভাই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকেন। অবশেষে গোবর্ধন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে—'কী রকম বুঝছো দাদা এই কলকাতার হালচাল ?'

হর্ষবর্ধন মাথা চুলকোতে থাকেন—'তাই তো দেখছি !'

'এ বাড়ির লোকের দাড়ি না-গজাতেই সামনের বাড়ির লোক সেলুন খুলে বসে গেছে। আজব শহর দাদা, কী বল !'

হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন—'চল, সেলুনে ঢুকি !'

অষ্টম ধাক্কা ॥ কেশ-কর্ষণের করুণ কাহিনী

কাল থেকে গোবর্ধন নীল কাচের দরজায় নজর রেখেছে এবং ওর অন্তরালে কী ব্যাপার হতে পারে তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—সেই নীল কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যে কোন দিন তার জীবনে হবে, এ প্রত্যাশা তার ছিল না। নানা চেহারার, নানা বয়সের, নানা সাইজের হরেক রকম লোককে ওই দরজা ঠেলে যেতে-আসতে সে দেখেছে আর ভেবেছে, বিশ্বসুদ্ধ লোকই কি বাড়ির বাসিন্দা নাকি ! কিন্তু এখন কেবল আর এক মুহূর্তের ব্যবধান—একটু পরেই ঐ রহস্যলোকের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ পাতায় এসে কিশোর পাঠকের বুক যেমন কাঁপতে থাকে, গোবর্ধনের এখন সেই দশা।

যবনিকা অপসৃত হলে দেখা যায়, ছোট্ট একটি ঘর মাত্র। তার ভেতরেই কায়দা করে খান-ছয়েক চেয়ার সাজানো—ছ-টা বিরাট আয়নার মুখোমুখি ; সবকটা চেয়ারেই তখন ক্ষুর আর কাঁচির বেজায় জোর খচ-খচ। হর্ষবর্ধন ভাবেন কী আশ্চর্য, এইটুকুন ঘরে বিশ্বভারতের আমন্ত্রণ ! যাদের মাথা আছে আর মাথায় চুল আছে তাদের কারুরই অব্যাহতি নেই এখানে না এসে সারা দুনিয়ার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এরা ! কামিয়ে দিয়ে বেশ কামিয়ে নিচ্ছে। বাহাদুর বটে ! গোবর্ধন কী ভাবে বলা যায় না, কী ভাবা উচিত, বোধকরি সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

যাওয়া-মাত্রই কর্তা-নাপিত এসে দুই ভাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে, দুজনকে দুটো কুশন-চেয়ারে বসতে দেয়, একজোড়ামাথা ও গালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবিনয়ে জানায় সে ওই দুটির 'চুলহীন ও নির্দাড়ি' হতে যা দেরি ! আর, তার পরেই তাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

কলকাতায় আসার পর এই প্রথম অভিনন্দন লাভে হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন। গোবর্ধনও রীতিমত বিস্মিত হয়। নীল কাচের নেপথ্যলোকের যিনি

একচ্ছত্র মালিক তার পর্যন্ত কী অমায়িক ব্যবহার! হ্যাঁ, শহরের হলেও এবং হাতে ধারালো ক্ষুর থাকলেও এমনি লোকের কাছেই গাল ও গলা (দাড়ি সমেত) নির্ভয়ে বাড়ানো যায়—এমন কি এর কাঁচির তলায় মস্তক দান করাও তেমন শক্ত ব্যাপার নয়।

গোবর্ধন অবাক হয়ে লক্ষ করে। সত্যিই, রহস্যলোকই বটে! ওধারের আয়নার ছায়া এধারের আয়নায় পড়েছে, আর কিছুই না, কিন্তু কী আশ্চর্য! একই আয়নার মধ্যে গোবর্ধন দেখছে একশোটা ঘর, একশোটা আয়না! ঘরগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে হয়ে যেন দিগন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড! গোবর্ধন ভাবছে, এখান থেকে বেরিয়েই দাদাকে প্রস্তাব করবে, এমনি এক কুড়ি বড় বড় আয়না বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। প্রত্যেক ঘরে দুটো করে মুখোমুখি সাজিয়ে দেওয়া হবে—তাতে ঘরের সংখ্যা বাড়বে, আত্মপ্রসাদও বাড়বে সেইসঙ্গে, অথচ পয়সা খরচ করে ঘর বাড়াতে হবে না। বাড়িতে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন এখন কেবল আর-একটি গোবর্ধনকে মাত্র দেখতে পায়, কিন্তু এইরকম পলিসি করলে তখন একশোটা গোবর্ধনকে এক-সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে—গোবর্ধনের সামনের চেহারা আর পেছনের চেহারা দুই নিয়ে যুগপৎ! কী মজাই না হবে তাহলে!

যাদের চুল-দাড়ির গতি হচ্ছিল, হর্ষবর্ধন বসে বসে তাদের ভাব গতিক দেখছিলেন। অবশেষে তিনি ফিস-ফিস করতে বাধ্য হন—'গোবরা দেখেছিস, লোকগুলোর মুখের ভাব খুব হাসি-হাসি নয় কিন্তু!'

'চুল-ছাঁটা কি হাসির ব্যাপার দাদা?'

'জানি গুরুতর ব্যাপার; কিন্তু তাই বলে এতখানি গোমড়া মুখ করতে হবে এ-ই বা কী কথা?'

তবে তিনি এটাও ভাবেন, এক চুল ইদিক-উদিক হলে কত মানুষের মন মেজাজ বিগড়ে যায়, এখানে এখন কতো চুল এদিক-ওদিক হয়ে যাচ্ছে—সেদিকটাও তো ভেবে দেখবার।

আর, তা ভাবতে গেলে হাসি পাবার কথা কি?

গোবরা অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে—'হুঁ, লোকগুলো যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে মনে হয়!'

হর্ষবর্ধন সায় দেন—'যা বলেছিস! হাল আর মাথা দুই-ই হলো এক জিনিস, দুটোরই কর্ণ আছে কিনা! মাঝিকে বলে কর্ণধার—শুদ্ধ ভাষায়, জানিস নে?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—'নাপিতকেও বলা যায় ও-কথা। কর্ণধার তো বটেই, তা ছাড়া নাপিতের ক্ষুরেও বেশ ধার।'

একটা আয়নার চেয়ার খালি হয়, হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ আসে। গোবরা ত্যাগীর ভূমিকা নেয়—'দাদা, তুমিই ছাঁটো আগে, আমার পরে হবে।'

হর্ষবর্ধনের ভাই-অন্ত প্রাণ, ভাইকে ছেড়ে কোন কাজে তাঁর মন সরে না। একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছেন, ট্রেন থেকে নেমেছেন, মোটরে চেপেছেন, কলকাতার সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁরা একসঙ্গে আস্বাদ করছেন, অথচ চুল-ছাঁটার আনন্দ একা তাঁকেই উপভোগ করতে হবে! ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কাঁচুমাচু হয়ঃ 'বেশ, তুই না-হয় আগে দাঁত তোলাস।' তারপর কি ভাবেন খানিকক্ষণ — 'আমি না-হয় দাঁত তোলাবই না।' হ্যাঁ, গোবরার দাদ্ভক্তির বিনিময় তিনি অবশ্যই দেবেন, দাঁত তোলার আনন্দ থেকে তিনি কঠোরভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন। ভাইয়ের জন্যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর প্রাণ চওড়া হয়ে ওঠে। গোবরা দাদ্ভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃভক্তির তুলনাই কি পৃথিবীতে আছে?

চেয়ারে বসে চুল-ছাঁটানো হর্ষবর্ধনের জীবনে এই প্রথম। চুল ছাঁটার কথা শুনলেই চিরকাল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে এসেছে, আর দাড়ি কামানোর সময়ে মনে হয়েছে চীনেম্যানরাই পৃথিবীতে সুখী। চীনে দাড়ির প্রাদুর্ভাব কম, হর্ষবর্ধনের ধারণা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের এই হচ্ছে একমাত্র কারণ।

হ্যাঁ, দাড়ি কামানোর সময়ে হর্ষবর্ধনের মনে হয়েছে, এর চেয়ে চীন দেশে জন্মানো ভাল ছিল। আসামের গাছপালা রেহাই পেত, তিনিও রেহাই পেতেন। দেশি নাপিতকে যদি বলেছেন —'দাড়িটা আর একটু ভিজিয়ে নাও হে—বড্ডো লাগছে', অমনি তার জবাব পেয়েছেন, 'দরকার হবে না বাবু, আপনার নয়নজলেই সেরে নিতে পারব।' বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের দাড়ির উপর অশ্রুবর্ষণ করতে হয়েছে। যদি বলেছেন, 'তোমার ক্ষুরটা ভারি ভোঁতা বাপু!' অমনি বাপুর উত্তর—'ডবল খাটুনি হলো তার দ্বিগুণ মজুরি দিন তাহলে।' সুতরাং আর-এক দফা অশ্রুবর্ষণ। আর চুল ছাঁটার কথা না তোলাই ভাল। উবু হয়ে বসে খবরের কাগজের মাঝখানে ফুটো করে মাথা গলিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা সে কী কর্মভোগ! চুলের সঙ্গে কাঁচির সে কী ঘোরতর সংগ্রাম – আবার অনেক সময়ে ঠিক চুলের সঙ্গেই না, মাথার খুলি, কানের ডগা, খোদ হর্ষবর্ধনের সঙ্গেও। কাঁচির খোঁচা খেয়ে হর্ষবর্ধন ক্ষেপে ওঠেন; ইচ্ছা হয় নাপিতকে মনের সাধে দু'ঘা দেন কসিয়ে কিন্তু দারুণ বাসনা তিনি দমন করে নেন। নাপিতকে মারা আর আত্মহত্যা করা এক কথা, কেননা এমন সুযোগ প্রায়ই আসে যখন নাপিতের ক্ষুর আর গলার দূরত্ব খুব বেশি থাকে না। অনেক ভেবে হর্ষবর্ধন নাপিতকে মার্জনা করে ফেলেন। বিবেচক হর্ষবর্ধন।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে পরিত্রাণ পেলেও চুল নিয়ে কি পরিত্রাণ আছে সেসব নাপিতের কাছে? অনেক ধস্তাধস্তি করে মাথায় মাথায় হয়ত রক্ষা পান, কিন্তু চুলের অবস্থা দেখে হর্ষবর্ধনের কান্না পায় আয়নায় যেটুকু স্বচক্ষে দেখা যায় সে তো শোকাবহ বটেই, আর যে অংশ 'পরস্ব' চোখে জানতে হয় তার রিপোর্টও কম মর্মভেদী হয় না। এধারে খপচানো, ওধারে খপচানো, কাকে-ঠোকরানো,

বকে-ঠোকরানো—যত দিন না চুল বেড়ে আবার কাটবার মতন হয়েছে তত দিন সে মাথা মানুষের কাছে দেখালে মাথা কাট যায়। এইহেতু কাঁচি-হাতে নাপিতের আবির্ভাব দেখলেই হর্ষবর্ধনের জ্বর আসে, মাথা ধরে, ঘাম হয়, পেট কামড়াতে থাকে—এমন কি বমি করে বসেন। ঠিক যে-সব উপসর্গ ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাবার আগে অনিবার্যরূপে দেখা দিত।

কিন্তু সে চুল-ছাঁটার সঙ্গে এ চুল-ছাঁটার তুলনাই হয় না। এ কেমন চেয়ারে বসে সাদা চাদর জড়িয়ে (যাতে একটিমাত্র পলাতক চুলও তোমার কাপড়-জামার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে না পারে) দস্তুরমত আরাম! ঘণ্টাখানেক চোখ বুজে ঘুমিয়েও নিতে পার, জেগে দেখবে তোফা চুল ছেঁটে দিয়েছে—ঠিক কচুয়ানদের মতই। তুমি কচুয়ান নও বলে যে তোমাকে কম খাতির করবে তা নয়, কোনরকম উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই এ সব শহুরে নাপিতের কাছে। যে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় না তাকেও এরা মানুষ বলেই গণ্য করে। কেন, হর্ষবর্ধনকে কি এরা কম খাতির করেছে? ঢোকবামাত্রই কত সাদর সম্ভাষণ—ডেকে চেয়ারে বসানো—সম্বর্ধনা কি কিছু কম করেছে এরা? তবু তো হর্ষবর্ধন কচুয়ান নন। হর্ষবর্ধন গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েন চেয়ারে, আরামে গা এলিয়ে দেন। মাথার উপরে হু-হু করে পাখা ঘুরছে—সম্মুখে নিজের চেহারা দেখবার সুবর্ণ সুযোগ—হর্ষবর্ধন স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। মুখখানা হাসি হাসি করে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করেন তিনি। নাপিত একটা নতুন ধরনের কাঁচি হাতে হাতে নেয়, কাঁচির কলেবর দেখে হর্ষবর্ধন অবাক হন। কাঁচি না বলে তাকে চিরুনিও বলা যায়, তার মুখের দিকে চিরুনির মত দাঁত আর হাতলের দিকটা অবিকল কাঁচি। হর্ষবর্ধন বস্তুটির মনে মনে নামকরণ করেন—'কাঁচিরুনি'। নাপিতকে প্রশ্ন করেন—'অন্তুতে কাঁচি তো!'

'কাঁচি নয়, ক্লিপ!' নাপিত উত্তর দেয়। 'পেছনটা ক্লিপছাঁটা হবে তো?

'যেমন কলকাতার দস্তুর তাই কর।'

ঘাড়ের পেছনে ক্লিপ চালাতে থাকে, হর্ষবর্ধন শিউরে শিউরে ওঠেন। যন্ত্রটা তেমন আরামপ্রদ নয়। যেন ঘাড়ের চামড়া একেবারে চেঁছেপুঁছে নেয়, চুল-যেন গোড়া থেকে সমূলে উপড়ে তোলে। কখনও ঘাড় কোঁচকান, কখনও টান করেন, কখনও কাত করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সুবিধা করতে পারেন না। অবশেষে মরীয়া হয়ে তিনি লাফিয়ে ওঠেন,—'থামাও তোমার কিলিপ! ঘাড় গেল আমার! এ যে দেখছি আসামী কাঁচির বাবা!'

নাপিত ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়, কোন উচ্চবাচ্য না করেই। তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। পাড়াগেঁয়ে যারা প্রথম চুল ছাঁটায় তারা সবাই এইরকমই করে কিন্তু পরে আবার তারাই চেহারার খোলতাই দেখে খুশি হয়ে আশাতীত বখশিস দিয়ে ফেলে। ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন একবার কাতর নেত্রে গোবর্ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কী করবেন, ভাগ্যের কবল থেকে কারু

কি নিষ্কৃতি আছে ! তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। গোবরা তাকিয়ে দেখে, দাদার হাসি-হাসি মুখভাব বেশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসেছে এখন। নাপিতের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নীল দরজা ভেদ করে সবেগে প্রস্থান করবে কি না সে ভাবতে থাকে। আপন মনে গজরায়,—'আসলে হল খুরপি, নাম দিয়েছেন কিলিপ ! তা, খুরপি চালাবে তো বাগানে চালাও গে না ! পরের ছেলের মাথার কেন বাপু ?'

পেছন শেষ করে সামনে ছাঁটাই শুরু হয়, কিলিপের স্থান অধিকার করে কাঁচি। সামনের চুল যেমন তেমনই থাকে, কেবল ডগাগুলো সামান্য ছেঁটে সমান করে দেওয়া। কাজ সমাধা হয়েছে জানিয়ে, পছন্দ হয়েছে কি না নাপিত প্রশ্ন করে। হর্ষবর্ধন সেই প্রশ্ন গোবর্ধনের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

গোবর্ধন প্রাণপণে পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু চুল ছাঁটাটা কোন জায়গায় হলো খুঁজে পায় না। সামনের চুল তো ছোঁয়াই হয়নি, আর পেছনটা দিয়েছে খুরপি দিয়ে একদম ন্যাড়া করে। সমান করে আঁচড়ালে সামনে দাড়ি পর্যন্ত ঢাকা পড়বে—নাক-মুখই দেখতে পাওয়া যাবে না, আর পেছনে তো মাথার খুলিই বেরিয়ে পড়েছে, খোলাখুলি সেই সাদা চামড়া ঢাকতে পরচুলোই পরতে হয় কি না কে জানে ! গোবরা স্বাধীন অভিমত দেয়,—'সামনে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ।'

'হুঁ, সামনেটা একটু কমানো দরকার।' হর্ষবর্ধন মন্তব্য করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর আশঙ্কা হয়, কমাতে বললে হয়ত কাঁচি ছেড়ে কিলিপ দিয়ে কামাতে শুরু করে দেবে। ভয়াবহ যন্ত্রটার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ করে তিনি বলেন,—'না, থাক।'

'তাহলে হেয়ার ড্রেস করি ?' নাপিত হর্ষবর্ধনের অনুমতির অপেক্ষা রাখে। হর্ষবর্ধন মনে মনে আলোচনা করেন, হেয়ার মানে তো চুল, অবশ্য খরগোশও হয় কিন্তু এখানে চুলই হবে, কিন্তু ড্রেস করবে-সে আবার কী চুলে কাপড় পরাবে নাকি ? তিনি ভয়ে ভয়ে জিগেস করেন,—'কিলিপের ব্যাপার-স্যাপার নয় তো ?'

'না না, মাথায় গোলাপ জল দিয়ে—'

'তা দাও, তা দাও।' ঘাড়ের পেছনটা তখন থেকে ভারী জ্বলছিল, জল পড়লে, হয়ত ঠাণ্ডা হতে পারে ভেবে হর্ষবর্ধন উৎসাহিত হন, বলেন, 'আচ্ছা, চুল না ছাঁটলে বুঝি তোমরা গোলাপ-জল খরচ কর না—না ?' নাপিত ঘাড় নাড়ে। 'কর ? বটে ? আহা তা জানলে আমি ড্রেস হেয়ারই করাতাম, তাহলে চুল ছাঁটতে আগাতো কোন হতভাগা !'

নাপিত গোলাপ-জল দিয়ে চুলগুলো ভিজিয়ে দেয়, দিয়ে চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙুল চালায়। হর্ষবর্ধনের আরাম লাগে, ঘুম পায় ! কিন্তু ক্রমশই নাপিতের 'ড্রেস হেয়ারের' জোর বাড়তে থাকে, তার আঙুলগুলো হয়ে

যেন লৌহঘটিত—সে তার সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে হর্ষবর্ধনের খুলির ওপর। হর্ষবর্ধন লাফাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না, লাফাবেন কী করে? পায়ের জোরে মানুষ লাফায় বটে, কিন্তু লাফাতে হলে পা ও মাথা একসঙ্গে তুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর শ্রীচরণ স্বাধীন থাকলে কী হবে, মাথা যে নিতান্তই বে-হাত। মাথা বাদ দিয়ে লাফানো যায় না। হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করেন,—'এ কী হচ্ছে? এ কী হচ্ছে? এ কী রকম তোমাদের ড্রেস হেয়ার? এ তো ভাল নয়!'

খোট্টারা যেমন প্রবল পরাক্রমে বর্তন মলে, গোবর্ধন দেখে, সেই তালে দাদার ড্রেস হেয়ার চলছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করে,—'এ কি বেওয়ারিশ মাথা পেয়েছ যে চটকে-মটকে দিচ্ছ?'

নাপিত এ সব কথায় কান দেয় না, তার কাজ করে যায়। সে কখনও রগ টিপে ধরে, কখনও মাথায় থাবড়া মারে, কখনও সমস্ত চুল মুঠিয়ে ধরে গোড়া ধরে টানে, কখনও দুধার থেকে টিপে মাথাটাকে চ্যাপটা করার চেষ্টা পায়, কখনও ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দেয়—তার দেহের সমস্ত শক্তি এখন করতলগত। হর্ষবর্ধনের বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে, তিনি নির্জীব হয়ে পড়েন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়,—'গোবরা, তোর বৌদিকে বলিস আমি সজ্ঞানে কলকাতা-লাভ করেছি!' এর বেশি আর তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু গোবরা বুঝতে পারে দাদার অবস্থা সংকটাপন্ন, দাদাকে সজ্ঞানে আসাম-লাভ করাতে হলে এই মুহূর্তেই এখান থেকে সটকান দিতে হবে। সে যেন ক্ষেপে যায়—'ছেড়ে দাও বলছি আমার দাদাকে; নইলে ভাল হবে না!'

নাপিত হতভম্ব হয়ে হস্তচালনা থামায়।

'এমনিভাবে মাথাটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ, এর মানে কী?'

'চুলের গোড়া শক্ত হয় এতে।'

'চুলই রইল না তো চুলের গোড়া! টেনে টেনে তো আর্ধেক চুল ওপড়ালে মাথায় চুল কোথায় আর?'

'এ রকম করলে মাথা ছেড়ে যায়।'

'মাথা ছেড়ে যায়?' গোবরা যেমন অবাক হয়, তেমনি চটে। 'ছেড়ে যায়? ছেড়ে গেলে তুমি জোড়া দিতে পারবে?'

নাপিত কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। গোবরা কণ্ঠে আরো জোর খাটায়,—'যে মাথা তুমি দিতে পার না সে মাথা নেবার তোমার কী অধিকার?'

হর্ষবর্ধন ঘেরাটোপের ভিতর দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে ক্লিপটা হাতাবার চেষ্টা করেন,—'গোবরা, সহজে না ছাড়ে যদি তাহলে দে এই যন্তরটা ওর ঘাড়ে বসিয়ে! মজাটা টের পাক।···মাথা ছাড়িয়ে দেবেন—ভারি আবদার আমার!'

গোবরা বলে,—'না, দরকার নেই ঝগড়াঝাটির। এই নাও তোমার মজুরি দশ টাকা। দেশে চুল ছাঁটতে দশ পয়সা—কলকাতায় না-হয় দশ টাকাই হবে,

এর বেশি তো না? দাদা, আর দেরি করো না, উঠে এস! চল পালাই! পালিয়ে যাই এখেন থেকে এক দৌড়ে।'

দুই ভাই নাপিতকে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দেয় না, চক্ষের পলকে সেলুন পরিত্যাগ করে।

বাইরে এসে হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। হতাশভাবে মাথায় হাত বুলোন,—'সত্যিই তো, টাক ফেলে দিয়েছে দেখছি! যাক, খুব রক্ষা পাওয়া গেছে! একেবারে মাথায় মাথায়! আরেকটু হলে মাথাটাই ফেলে আসতে হত!'

গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে,—'এরা পেছনের চুল দেয় দাড়ি কামানো করে আর সামনের চুলগুলো দেয় উপড়ে—একেই কি বলে চুলছাঁটা? আজব শহরের অদ্ভুত হালচাল!…অ্যাঁ, এত লোক জমছে কেন চারদিকে?'

দুই ভাইকে কেন্দ্র করে ক্রমশই জনতা ভারী হতে থাকে। হর্ষবর্ধ ফিস-ফিস করে বলেন,—'দু জনের দু রকম চুল দেখে অবাক হচ্ছে বোধহয়?'

'উঁহু' গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে জানায়, তোমার রোরখাটা খুলে ফেলনি এতক্ষণেও?'

পালাবার মুখে ঘেরাটোপ ফেলে আসার অবকাশ সামান্যই ছিল, সেটাকে তখন পর্যন্ত গায়ে জড়িয়েই রেখেছেন হর্ষবর্ধন। এতক্ষণে খেয়াল হলো। সত্যিই, লোকে যা বলে মিথ্যা নয়, অদ্ভুত কলকাতার হালচাল! ঘেরাটোপ খুলে ফেলতেই জনতা আপনা থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কোন উচ্চবাচ্য করল না।

চাদরটা গুটিয়ে বগলে চেপে হর্ষবর্ধন বলেন, 'এই দ্যাখ!' তাঁর হাতে সেই ভয়াবহ ক্লিপটা। 'আমি ইচ্ছে করে আনিনি, পালাবার সময় আমার হাতে ছিল। কী করব? ফেরত দিয়ে আসি?'

'আর যায় ওখানে?' গোবরা ভয় দেখায়—'আবার যদি শুরু কয়ে দেয়?'

'তবে থাক এটা। দেশে গিয়ে দীনু নাপিতকে দেখাব। এবার যে ব্যাটা আমার চুল ছাঁটতে আসবে দেব এটা তার ঘাড়ে বসিয়ে—তা কলকাতার নাপিতই কি আর আসামের নাপিতই কি!'

'বেশ করেছ এটা নিয়ে এসে। কলকাতার বহুৎ লোক তোমাকে চার পা তুলে আশির্বাদ করবে। অনেকের ঘাড় বাঁচিয়ে দিলে!'

হর্ষবর্ধন মাথা নাড়েন,—'যা বলেছিস তুই!' একখানা মানুষমারা কল!' ক্লিপটা দিয়ে একবার পিঠ চুলকে নেন তিনি। 'যাক, ঘামাচি মারা যাবে এটা দিয়ে।'

'বৌদি কাক তাড়াবে এই দেখিয়ে। কাকের উৎপাত থেকে বাঁচা যাবে তাহলে। মানুষ এ দেখলে ভয় খায় আর কাক খাবে না? কী বল দাদা?'

'তখন থেকে ঘাড়টা কী জ্বলছে যে! মাথাটাও টাটিয়ে উঠেছে! চুল নিয়ে কি কম টানাটানি করেছে লোকটা? ইসকুলের সেই যে কি ইসপোর্ট হয় জানিস না…সেই যেরে…ঐ কাছি ধরে টানাটানি। প্রায় তার কাছাকাছি।'

'হুঁ। ওয়ার অব টাগ।'

হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে বিশদ করেন,—'ওয়ার মানে যুদ্ধ,—বালিশের ওয়াড়ও হয় আবার,—সে আলাদা ওয়াড়—'

গোবর্ধন বাধা দেয়,—'কেন, আলাদা হবে কেন? আমরা ছোটবেলায় বালিশ নিয়ে যুদ্ধ করিনি? কত বালিশের তুলো বের করে দিলাম!'

'দূর মুখ্যু, বালিশের ওয়াড় বুঝি ওকে বলে? বালিশের জামাকে..বলে বালিশের ওয়াড়, তাও জানিস না? ওয়ার অব টাগ—অব মানে হলো 'র' আর টাগ? টাগ মানে কী?'

'কী জানি! টাক-ফাক হবে।'

'তাই হবে বোধ হয়। ওয়ারের চোটে প্রায় টাক পড়ে গেছে আমার! হ্যাঁ, কথাটা হবে ওয়ার অব টাক, বুঝলি? লোকের মুখে মুখে 'টাক' 'টাগ' হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

গোবরা মুখখানা গম্ভীর করে,—'উঃ, কাল থেকে কী টেকো লোকই না দেখছি রাস্তায়! কলকাতার লোকের এত টাক কেন বোঝা গেল এখন।'

'কেন?'

'এইসব দোকানে চুল ছাঁটিয়ে—এই ছাঁটার জন্যেই। দু-বার ছাঁটালেই টাক—চাঁদি চকচকে। বিলকুল সব পরিষ্কার! চুল ছাঁটালেই চুল ধরে টানতে দিতে হবে—এই হল গিয়ে কলকাতার নিয়ম।'

'বলিস কী! ভাগ্যিস গোঁফ ছাঁটিনি! তাহলে কী সর্বনাশই না হত!' হর্ষবর্ধন সভয়ে গোঁফ চুমরান। গোঁফ তাঁর ভারী আদরের এবং এই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি যার ভাগ ইচ্ছা থাকলেও তাঁর ভাইকে দেবার তাঁর উপায় ছিল না।

নবম ধাক্কা ॥ আনন্দবাজারের আনন্দ-সংবাদ

যতদূর সম্ভব এবং নাপিতের সাধ্য নিশ্চুল তো হয়েছেন, অতঃপর কী করা যায় এই কথাই হর্ষবর্ধন ভাবছিলেন। দ্রষ্টব্য দেখতেই তিনি বাড়ি থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন, অবশেষে এখানে এসে চাপ্তব্য জিনিসেরও সাক্ষাৎ পেলেন মোটর গাড়ি থেকে মায় কলার খোসা পর্যন্ত চাপতে আর বাকি রইল না – এমনকি যা তাঁর দুঃস্বপ্নেরও দূর-গোচর ছিল এমন ভয়াবহ সেই ছাঁটতব্য কাজটাও তিনি এইমাত্র সমাধা করে এসেছেন। অতঃপর আর কী করা যায়?

গোবর্ধনের কাছে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন কিন্তু তার চিন্তাধারা যে অন্য পথে খেলছিস তা প্রকাশ পেতেও দেরি হল না। সে বলল,—'কেন? চাপ্তব্য তো কতই এখনও বাকি রয়ে গেল! টেরাম আর গরুর গাড়ি তো চাপিইনি এখনো। রিক্‌শো না কি বলে—ওই যে মানুষ-টানা দু'চাকার—ওর

রসও তো এখনও টের পেলুম না। তেতালা মোটরের কথা ছেড়েই দাও। ইস্টিশনে সেই যে টাক্সি না টাশ্‌কি কি বলছিল তাও চাপা হয়নি। দাদা, এস, ঐ রকম পাঁচকে মোটর ভাড়া করে ঘোরা যাক ততক্ষণ।'

'থাম থাম! তোর কেবল মোটর আর মোটর!' হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, 'কেন, কলার খোসায় যে চাপা গেল সেটা কি চাপা নয়? কটা লোক চাপতে পারে?'

'সে তো তুমিই কেবল চেপেছ। আমি তো চাপিনি!'

'কে বারণ করছে চাপতে? একঝুড়ি কলা কিনে ফেললেই হলো! কলার খোসা মোটরের চেয়ে জোরে যায়—হ্যাঁ! চোখে-কানে দেখতে দেয় না! হুঁ!'

'তা বেশ, কেনো না কেন? ওই তো ওখানে ঝুরিতে বসে বিক্রি করছে। আমি টাশ্‌কি চেপে কলা খেয়ে খেয়ে খোসা ফেলতে ফেলতে যাই আর তুমি পেছনে পেছনে খোসায় চেপে চেপে আসতে থাকো। আমি বরাবর জুগিয়ে যেতে পারব, খোসার অভাব হবে না তোমার, তা বলে রাখছি।'

গোবর্ধনের প্ল্যানটা হর্ষবর্ধনের ঠিক মনঃপূত হয় না। তিনি ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বলেন,—'উঁহু!' খানিক পরে পুনরায় নিজের কথায় সায় দেন—'তা হয় না।'

কোনটা হয় না, টাশ্‌কি চাপা কি কলা খাওয়া, গোবর্ধন দাদার মন্তব্য থেকে সেই দুরূহ তত্ত্ব উদ্ধারের প্রয়াস পাচ্ছে, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক এসে উভয়কে অভিবাদন করল। 'খবর-কাগজ দেব বাবু?' লোকটা কাগজওয়ালা।

'কাগজে কী হবে আর?' হর্ষবর্ধন চিন্তা করে বলেন, 'চুলছাঁটা তো হয়েই গেছে।'

গোবর্ধন বলে —'শালুনে চুল ছাঁটতে গেলে তো কাগজের দরকার হয় না, ওরা কাপড় মুড়ে দেয়।'

'খবর-কাগজ থাকলে কে যেত ঐ হতভাগার শালুনে? ওর চেয়ে কাগজে মাথা গলিয়ে উবু হয়ে বসে ঘরোয়া নাপিতের কাছে ছাঁটানো ঢের ভাল! হ্যাঁ, ঢের ভাল!' এই বলে হর্ষবর্ধন হকারের দিকে ঝোঁক দেন,—'তা বাপু, একটু যদি আগে আসতে—নেওয়া যেত তোমার একখানা কাগজ। গোবরা ছাঁটবি নাকি, নেব কাগজ?'

'এসেছে যখন আশা করে—কেন একখান।'

কাগজওয়ালা সেদিনকার একখানা বাঙলা কাগজ হর্ষবর্ধনের হাতে দেয়। মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়।

'এ কী কাগজ? এত ছোট কেন? এ তো আমাদের পুরোনো হিতবাদী নয়! না বাপু, আমাকে প্রকাণ্ড বড় একখানা দাও—হিতবাদীই দাও কিংবা হিতবাদীর মতন। আজকের হোক, পুরোনো হোক তাতে ক্ষতি নেই! টুকরো-

টাকরা এতগুলি আমার কী কাজে লাগবে? মাথা গললেও গা ঢাকা তো পড়বে না এতে?'

'পেতে বসা যাবে অন্তত!' গোবরা আর-একটা সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের দিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—'যদি টেবিলগুলোয় ছারপোকা থাকে দাদা?'

'হ্যাঁ, তবে দাও তোমার কাগজ।' হর্ষবর্ধন ঠন করে একটা টাকা ফেলে দেন।

'কোন কোন কাগজ দেব বাবু?' হকার সপ্রশ্ন হয়।

'যা যা' আছে দাও না কেন তোমার। এক টাকার মধ্যে কিন্তু—ওর বেশি কিনতে পারব না এখন।' লোকটার বিস্ময়বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠবার আগেই আবার তাকে কাবু করে দেন—'কি কাগজ দিচ্ছিলে তুমি- তাই না-হয় দাও এক টাকার। ঘর তো একখান নয়, টেবিল চেয়ারও অনেক।'

গোবর্ধন যোগ করে,—'আর যদি থেকে থাকে তাহলে ছারপোকাও অঢেল হবে।'

হকার তার বগলের সমস্ত কাগজ গুণতে থাকে, হর্ষবর্ধন তার থেকে একখানা টেনে নিয়ে ভাইয়ের হাতে দেন, 'কী কাগজ পড়ে দ্যাখ্‌ তো গোবরা! হিতবাদী যে নয় তা আমি না-পড়েই বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, হিতবাদীর বাচ্চা হতে পারে।'

'হ্যাঁ, বাচ্চা হাতি – বাচ্ছা হিতবাদীর মতই দেখতে দাদা!' গোবর্ধন নামটা পড়বার চেষ্টা করে, 'বলছে, আনন্দবাজার পত্রিকা।'

'ঠিক হয়েছে। কলকাতার হাট-বাজারের সব খবর রয়েছে এতে। সবাই তো কলকাতায় আমাদের মত বেড়াতে আর টাকা ওড়াতে আসে না, হাট-বাজার কেনা-কাটা করতেই অনেকের আসা হয়। তাদের সুবিধের জন্যেই এই কাগজ, বুঝতে পেরেছিস গোবরা?'

'যাতে লোকে, মানে যারা পাড়াগেঁয়ে, অনর্থক না ঠকে যায় - বেশ আনন্দের সঙ্গে বাজার করতে পারে। অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি আমি।'

'হ্যাঁ, তা বুঝবিই তো! বলে দিলুম কিনা!' হর্ষবর্ধন গোবরার ওপর-চালে ঠিক আপ্যায়িত হতে পারেন না,—'এইজন্যেই তোকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না!'

এই বলে তিনি ভাইয়ের প্রতি আর দৃকপাত না করে হকারের বিষয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন,—'হ্যাঁ হে বাপু, তোমার কাছে 'জগুবাবুর বাজার' বলে কোন কাগজ আছে? নেই? কাছে না থাক একটু পরে এনে দিতে পারবে তো? পুরোনো হলেও চলবে, পুরোনো খবরও পড়া যায়,—খবর থাকলেই হলো, খবর পড়া নিয়ে কথা। আজকের খবর আজকেই পড়তে হবে তার কোন মানে নেই। ঐ আমাদের বাড়ি, ওখানে গিয়ে দিয়ে এলেই হবে; অ্যাঁ? কি বলছ? ও নামে কোন কাগজই নেই? একদম নেই? উঁহু—

গোবর্ধন দাদার বাক্য সমাপ্ত করে দেয়,—'দাড়ি গজায় জলবায়ুর গুণে। চীন দেশে যে একেবারেই হয় না, তার কী করছি বল ? এ তো মিথ্যে কথা নয়, নিজের চোখে দেখলাম কাল সকালে।'

'আচ্ছা, আমি যদি আসামে গিয়ে দাড়িতে জলপটি লাগিয়ে রাখি আর দিনরাত পাখার বাতাস করি তাহলেও কি এক মাসে আমার দাড়ি গজাবে না ?' সে গোবর্ধনকে জিজ্ঞাসা করে এবার।—'হবে না দাড়ি ?'

'হবে না ? আলবত হবে ! হতেই হবে দাড়িকে—জল-হাওয়ার গুণ তবে কী ?' গোবর্ধন সজোরে জবাব দেয়।

'তবে তাই যাই, বাবাকে বলে কয়ে দেখি গে। আসামে যেতে হলে বাবার পারমিশন নিতে হবে। আপনাদের সঙ্গে যদি যেতে দেয় তো হয়।' ছেলেটি চলে যায়।

'ইটালি কোথায় দাদা ?' গোবর্ধন ভয়ে-ভয়ে দাদাকে জিগ্যেস করে।

'কোথায় আবার ! বিলেতে।' হর্ষবর্ধনের বিরক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

'বিলেত আর ইটালি কি এক জায়গা নাকি ?'

'নিশ্চয় ! খাপরার ইংরিজি যেমন টালি, বিলেতের ইংরিজি তেমনি ইটালি।'

'এইবার বুঝেছি।' গোবর্ধন মাথা নাড়ে,—'নেপালের ইংরিজি যেমন ভুটানি।'

হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ প্রীত হয়,—'কিন্তু সে কথা তো নয়, আমি ভাবছি কি—'

গোবর্ধন দুর্ভাবিত দাদার দুশ্চিন্তার অংশ নেবার ব্যগ্রতা ব্যক্ত করে,—'বল না দাদা, কী ভাবছ তুমি ?'

'ভাবছি যে আমাদের বয়স কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে—তার বুদ্ধির সমস্ত দরজা-জানলা যেন একযোগে অকস্মাৎ খুলে যায়,—'হ্যাঁ ! ভারী চমৎকার হয় দাদা ! এই জন্যেই তো তোমাকে দাদা বলি ! তোমায় গড় করি এইজন্যেই।' তারপর একটু দম নেয়,—'তাহলে উড়োজাহাজেও চড়া হয়—জাহাজেই চাপিনি তো উড়োজাহাজ !'

'তুই আছিস কেবল চাপবার তালে ! আমাকে কত দিক ভাবতে হয় ! ছেলে-মানুষ সঙ্গে নিয়ে বিদেশে এসেছি, তার উপরে বিদেশ থেকে আরো বিদেশে—আটাশ হলে কি হয়, তুই ওই ছোঁড়াটার চেয়েও অপোগণ্ড ! উড়োজাহাজ উল্টে গিয়ে যদি আকাশ থেকে ঝপাৎ করে পড়ে যাস তখন কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে তোকে ? হাওয়ার চোটে কোন মুলুকে কোথায় যে উড়ে যাবি কে জানে ! অত উঁচু আকাশে হাওয়ার জোর কি কম !'

'পড়ব কেন ? আমি তোমাকে ধরে থাকব দেখো।'

'হ্যাঁ, তাহলে হয়। আমি বেশ ভারী আছি, সহজে আমাকে ওল্টাতে পারবে না।'

'তবে আর ইটালি যেতে বাধা কী আমাদের ? বয়েস তো আছেই, তাছাড়া দাড়িও রয়েছে—উড়োজাহাজে চাপতে হলে যা যা চাই।'

'আমি তাই ভাবছিলুম। এ-দুদিন কলকাতা তো বহুৎ দেখলাম, এখন বিলেতটা একটু দেখে আসা যাক বরং।' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন,—'বিলেতের হালচাল আবার কী রকম কে জানে।'

'হ্যাঁ, উড়োজাহাজে চাপতে পারলে মোটরে না চাপলেও চলে যায়, তত দুঃখ থাকে না আর। তবে চল দাদা, বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটা কারু কাছে বাতলে নিয়ে এক্ষুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি। নইলে অন্য সকলে আমাদের আগে গিয়ে ভিড় জমিয়ে ফেলবে। দেশে দাড়িওলার তো আর অভাব নেই।'

'আচ্ছা আমরা যে ইটালি যাব, সেই কথাই যে আমি ভাবছিলাম তা কি তুই জানতে পেরেছিলি ?' হর্ষবর্ধন মুরুব্বির মত একখানা চাল দেন।

'একদম না।' সরল গোবর্ধন সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

'আমি কিন্তু জানতে পেরেছিলাম। খবর-কাগজ পড়ে নয়, যেদিন বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছি তখনই জেনেছিলাম যে আমাদের ইটালি যেতে হবে। জানিস ?'

গোবর্ধনের সংশয় হয়, প্রায় প্রতিবাদ করে বসে আর কি, কিন্তু উড়োজাহাজে চাপবার লোভে চেপে যায় সে ! গোঁফে চাড়া দেন হর্ষবর্ধন.— 'তোর চেয়ে কত বেশি জানি আমি, দ্যাখ !'

গোবর্ধন মৌন সম্মতি জানায়, তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার প্রবল ভাবের সূত্রপাত হয়।

দশম ধাক্কা ॥ হর্ষবর্ধনের সমুদ্র-লঙ্ঘন

বিখ্যাত বিমানবীর পৃথ্বীশ রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়। তাঁর খেয়াল হয়েছে, নিজের মনো-প্লেনে ইটালি যাবেন একেবারে ননস্টপ ফ্লাইট, কলকাতা থেকে ইটালি এবং ইটালি থেকে ফের কলকাতা।

বাঙালিদের মুখোজ্জ্বল করতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল না সকাল থেকে। দু'জন সহযাত্রী চেয়ে খবরের কাগজে তিনি ইশ্তাহার দিয়েছিলেন, তার পনের ষোল হাজার জবাব এসেছে কিন্তু প্রায় সবই পনের ষোল বছরের ছেলেদের কাছ থেকে।

তিনি চেয়েছিলেন দু'জন সাবালক সহযাত্রী, আটাশ থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স, স্পষ্ট করে সে কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ বয়সের কোন লোক যে সম্প্রতি বাংলা দেশে আছে, হাজার হাজার আবেদনের ভেতরে তার কোন প্রমাণ তিনি পাচ্ছেন না।

না, সেরূপ কোনো অবদানের আবেদন নেই।

তিনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই, আর যদিই বা এরোপ্লেন বিকল হয় তখন প্যারাস্যুট রয়েছে। কিন্তু বয়স্ক বাঙালিরা প্রাণরক্ষার প্রলোভনে সহজে পড়তে রাজি নয় স্পষ্টই তা বোঝা যাচ্ছে। অনেক ইস্কুলের মেয়েও যেতে চেয়েছে, আট বছরের ছেলেদের কাছ থেকেও অনুরোধ এসেছে কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে একজন না।

পৃথ্বীশ রায় খামের পর খাম খুলছেন আর ঘাড় নাড়ছেন—'হ্যাঁ, এইসব ছেলেমেয়েরা যেদিন বড় হবে সেদিন আমাদের দেশও বড় হবে, কিন্তু ততদিন — ! নাঃ, আটাশ বছর কি আটাশি বছর আর অপেক্ষা করবার মতো সময় আমার হাতে নেই। সহযাত্রী বা না-সহযাত্রী, আজই আমাকে যাত্রা করতে হবে।'

একটি ছেলে লিখেছে,—'দেখুন, আমি আপনার সাথী হতে রাজি আছি, কিন্তু একটা শর্তে! আপনাকে এক সময়ে এরোপ্লেন বিকল করতে হবে যেমন বায়োস্কোপে দেখা যায় তেমন হলেও চলবে; এরোপ্লেনে আগুন লাগিয়েও দিতে পারেন, তাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই। কেবল আমাকে প্যারাস্যুটে নামবার সুযোগটা দিতে হবে। অজানা দেশে অচেনা লোকেদের মধ্যে হঠাৎ আকাশ থেকে নামতে ভারী মজা হয় কিন্তু— !'

আর একটা চিঠির বক্তব্য,—'আমাকে কি আপনি সঙ্গে নেবেন? আমার একটা মুশকিল আছে। আমার বয়স আটাশ বছর কিন্তু দেখতে ভারী ছোট দেখায়। দেখলে আপনার মনে হবে বারো কি চোদ্দ—এই হয়েছে গণ্ডগোল। এইজন্যে আমাকে ইস্কুলেও খুব নিচু কেলাসে ভর্তি করে দিয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি বলছি আমার আটাশ বছর বয়স সবে আটাশ পেরোলাম সেদিন। আপনি না হয় আমাদের পাড়ার টুনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

এই দুটি আবেদন সম্পর্কে গুরুতর বিবেচনা করছেন, এমন সময়ে দুটি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পৃথ্বীশ রায় মুখ তুলে চাইলেন,— 'কে আপনারা?'

এক নম্বর ভদ্রলোক দু-নম্বরকে দেখিয়ে বললেন,—'উনি হচ্ছেন হর্ষবর্ধন। আমার দাদা।'

দু-নম্বর বললেন,— 'আর ওর নাম গোবরা।'

এক নম্বর সংশোধন করে দিলো,—'উঁহু। শ্রীমান গোবর্ধন।'

পৃথ্বীশ রায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন,—'তা, কী চাই আপনাদের?'

হর্ষবর্ধন বলেন, —'আমরা আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে চাই।'

গোবর্ধন আবার সংশোধন করে,—'উঁহু! উড়ে আসতে।'

'ওঃ, উড়োজাহাজে ইটালি যাবেন? বেশ তো, বেশ তো! তা আপনাদের বয়েস?'

হর্ষবর্ধন ভাল করে গোঁফ চুমরে নেন,—'আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধনও প্রয়োজন-মত গম্ভীর গলায় সায় দেয়,—'হুঁ, তার থেকে এক দিনও কম নয়।'

এর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না ; পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'তবে কাল সকালে দশটার সময় হাজির থাকবেন দমদমে। দমদম এরোড্রাম, বুঝলেন ?

হর্ষবর্ধন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন,—'তা, ভাড়া কত পড়বে ? খুব বেশি নয় তো ?'

গোবর্ধন বলে,—'দশ হাজার পর্যন্ত আমরা উঠতে পারি। বেশি টাকা তো সঙ্গে আনা হয়নি !'

'হ্যাঁ, আসাম থেকে কলকাতায় এসেছি বেড়াতে। বিলেতে যাওয়ার মতলব ছিল না তো আগে ! তা, আপনি যখন খবরের কাগজে ছাপিয়েছেন যে তিন দিনে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন—'

গোবর্ধন মাঝখানে বাধা দেয়,—'উড়িয়ে আনবেন।'

'হ্যাঁ, বিলেত উড়িয়ে আনবেন, তখন আমরা ভাবলাম, মন্দ কী ? এই ফাঁকে বিলেত ঘুরে—ওর নাম কি—বিলেত উড়ে আসা যাক না !'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'আপনাদের সহযাত্রী পাচ্ছি এই আমার সৌভাগ্য ! এক পয়সাও লাগবে না আপনাদের।'

গোবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে,—'অ্যাঁ, বলে কী দাদা ! বিনে পয়সায় বিলেত !'

হর্ষবর্ধনও কম অবাক হন না,—'অমনি-অমনি নিয়ে যাবেন ?'

'নিয়ে যাব আবার নিয়ে আসব - একদম মুফত্ ! বরং আপনারা দাবি করলে কিছু ধরে দিতে রাজি আছি এর ওপরে।'

হর্ষবর্ধনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না,—'না, আমরা কিছুই চাই না। আমরা তো রোজগার করতে কলকাতায় আসিনি, টাকা ওড়াতেই এসেছি।'

'কিন্তু দেখছ তো দাদা, টাকা ওড়ানো কত শক্ত এখানে !' গোবর্ধন যোগ করে,—'আমি তখনই বলেছিলাম তোমায় !'

হর্ষবর্ধন পিছপা হবার পাত্র নন, 'তা বেশ, বিনে পয়সায়ই সই, অমনিই যাব বিলেত। তার কী হয়েছে ?'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'একটু ভুল করেছেন। বিলেত নয়, ইটালি।'

'ওই যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। বিলেত আর ইটালি একই কথা। সমুদ্দুর পেরুলেই বিলেত, তা ইটালিই কি আর আন্দামানই কি ?'

গোবর্ধন অমায়িকভাবে বসাতে থাকে, - 'ও আর আমাদের বোঝাতে হবে না।'

পৃথ্বীশ রায় বলতে শুরু করলে,—'দেখুন, যদিও উড়োজাহাজে প্রাণহানির কোন ভয় নেই, তবু—'

হর্ষবর্ধন বাধা দেন,—'আমরা জানি। আকাশে আবার ভয় কিসের ? এ তো রেলগাড়ি নয় যে কলিশন হবে ! আর আকাশে এনতার ফাঁকা, কোথায় কার সাথে বা ধাক্কা লাগবে বলুন ! তুই কী বলিস রে গোবরা ?'

গোবরা জবাব দেয়,—'তুমিই বল না, কোন পাখিকে কি কখনো মরতে দেখা

গেছে? মানে খাঁচার পাখি নয়, আকাশের পাখিকে? আকাশে যারা ওড়ে তাদের মরণ নেই দাদা! আর উড়োজাহাজ তো বলতে গেলে পাখির সগোত্রই। এখখুনি পথে আসতে আসতে দেখলে না—ইয়া বড়-বড় দুই পাখা!'

পৃথিবীশ রায় তথাপি বোঝাতে চেষ্টা করেন,—'তা বটে, পাখা থাকলেই পাখি হয় বটে, কিন্তু আরশোলা আর এরোপ্লেন বাদ। কিন্তু আমার কথা তো তা নয়! প্রাণহানির ভয় নেই সে কথা সত্যি, তবু আমি বলছিলাম কি, আপনাদের কি লাইফ ইন্‌শিওর করা আছে? নেই! তা, একটা করে ফেলুন না কেন যাত্রার আগে, বলা যায় না তো! যদিই একটা বিপদ-আপদ ঘটে যায়, একটা প্রিমিয়াম দেয়া থাকলে আত্মীয়-পরিবার তখন টাকাটা পাবে।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন,—'হ্যাঁ, লাইফ ইনশিওর জানি বই-কি! আসামের জঙ্গলেও ওরা গেছে। তা আপনি যখন বলছেন, পঞ্চাশ হাজার কি লাখ খানেকের একটা করে ফেলা যাক। তবে আমার নামেই করুন ওর নামে করে কাজ নেই—ও কখনো মরবে না। আমি ম'লে টাকাটা যেন গোবরাই পায়। হ্যাঁ, যা বলেছেন. যদিই দৈবাৎ উড়ো কল বেগড়ায়, বলা যায় না তো! পড়লেই তো সব চুরমার—হাড়গোড় একদম ছাতু! তখন কি আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে!'

পৃথিবীশ রায় জিজ্ঞাসা করেন—'ওঃ, উনি আপনার সঙ্গে যাবেন না তাহলে?'

'নিশ্চয়ই যাবে! যাবে না কে বললে? ওকে ছেড়ে আমি যমের বাড়ি যেতেও রাজি নই', হর্ষবর্ধন জোরালো গলায় জবাব দেন,—'বিলেত তো বিলেত!'

পৃথিবীশ রায়ের উড়োজাহাজ ইটালির এরোড্রামে পৌঁছতেই সেখানকার প্রবাসী বাঙালিরা ভিড় করে এল। অভিবাদন ও অভিনন্দনের পালা সাঙ্গ হলে হর্ষবর্ধন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন,—'দেখছিস গোবরা, বাংলা ভাষাটা কী রকম ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল!

'হুঁ দাদা, নইলে বিলিতি সাহেবদের মুখে বাংলা বুলি!'

পৃথিবীশ রায় বুঝিয়ে দেন যে সমাগত ভদ্রলোকদের সাহেবি পোশাক হলেও আসলে তাঁরা বাঙালি; ব্যবসাবাণিজ্য কিংবা পড়াশুনোর ব্যাপারেই এঁদের এই বিদেশে বাস; বাঙালি বলেই বাঙালিকে সম্বর্ধনা করতেই সবাই এসেছেন। তখন দুই ভাই দস্তুরমত অবাক হয়ে যায়। 'বটে? বুঝেছি তাহলে, কাঠের কারবার নিয়েই এদের এখানে থাকা!' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়তে থাকেন।

'তা আর বলতে!' গোবর্ধন যোগদান করে,—'কাঠের জন্যে আসামের জঙ্গলে গিয়ে মানুষ বাস করে, তা বিলেতে আসবে যে আর বেশি কী!'

পৃথ্বীশ রায় জানান যে সন্ধ্যার মুখেই ও'রা দেশমুখো হবেন ; এঞ্জিনের অবস্থা ভালো নয়, এইজন্যে সারাটা দিন ও'র কল মেরামত করতেই যাবে। হর্ষবর্ধন বলেন,—'তাহলে এই ফাঁকে এই বিলিতি শহরটা দেখে নেওয়া যাক না কেন ?'

গোবর্ধন সায় দেয়,—'হুঁ, পুরো একটা দিন পাওয়া যাবে যখন !'

মুকুল বলে একটি বছর পনের ষোলর ছেলে এগিয়ে আসে,—'আসুন, এখানে যা যা দেখবার আছে আপনাদের সব দেখাব আমি।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন,—'অ্যাঁ, এইটুকুন ছেলে তুমিও কাঠের কারবারে লেগেছ ? এই বয়সেই ?'

মুকুল বলে, 'না, আমার বাবা ডাক্তার।'

গোবর্ধন ব্যাখা করে,—'তার মানে, তিনি তোমাকে ব্যবসাতে সাহায্য করেন। মরলেই তো কাঠের খরচ !'

হর্ষবর্ধন পুলকিত হয়ে ওঠেন, 'বাপ ডাক্তার, ছেলের কাঠের কারবার ; এর চেয়ে লাভের কী আছে ? ব্যবসার দুটো দিকই একচেটে—ডবল লাভ ! আমার ছেলেকে আমি ডাক্তারি পড়াব। আর নাতিকে দেব আমাদের কারবারে, বুঝলি গোবরা ?'

পৃথ্বীশ রায় মনে করিয়ে দেন,—'আপনারা সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন কিন্তু।'

'সে আর ব'লে দিতে হবে না। আপনি আমাদের ফেলে চলে গেলেই তো হয়েছে ! সব অন্ধকার ! এখান থেকে হে'টে বাড়ি ফেরা আমাদের কম্ম নয় !'

গোবর্ধন মিনতি জানায়,—'দোহাই, তা যেন যাবেন না ! দেখছেন তো, দাদা যা মোটা একটু হাঁটলেই ও'র হাঁপ ধরে। আমি হাঁটতে পারলেও দাদা পারবে না।'

হর্ষবর্ধনের আত্মসম্মানে ঘা লাগে,—'হুঁ ! দাদা পারবে না ! নিশ্চয় পারবে, আলবত পারবে, দাদার ঘাড় পারবে ! হে'টে দেখিয়ে দেব ?' গোঁফে তা' দিতে দিতে সদর্পে তিনি অগ্রসর হন।

'আসুন আপনারা আমার মোটরে।' হর্ষবর্ধনের অভিযানে মুকুল বাধা দেয়,—'ঐ যে আমার বেবি কার ঐখানে, আমি নিজেই ড্রাইভ করি।'

কিন্তু হর্ষবর্ধন থামেন না, তাঁর অগ্রগতি ততক্ষণে শুরু হয়েছে। গোবর্ধন সভয়ে দাদার বিরাট পদক্ষেপ দেখতে থাকে, তার আশঙ্কা হয়, হয়ত একেবারে আসাম না গিয়ে দাদা শান্ত হবেন না। কিন্তু সন্দেহ অমূলক হর্ষবর্ধন সটান গিয়ে মোটরে পে'ছিেই গ্যাট হয়ে বসেন।

তখন আশ্বস্ত হৃদয়ে গোবর্ধনও দাদার অনুসরণ করে। কিন্তু হর্ষবর্ধন ভায়ের দিকে দৃকপাত করেন না, তিনি ভয়ানক চ'টে গেছেন, তিনি নাকি ভয়ানক মোটা, হাঁটতে গেলে তাঁর হাঁপ ধরে যায়—দেশে হলেও ক্ষতি ছিল না

কিন্তু বিলেতে এসে তাঁকে এমনধারা অপমান, যতো বাঙালি সাহেবদের সামনে, ছি! ছি! তিনি জোরে জোরে গোঁফে তা' দিতে থাকেন।

মুকুল ওঁদের মিউজিয়ামে নিয়ে যায়, সেখান থেকে চিত্রশালায়। 'এই যে সব চমৎকার চমৎকার ছবি দেখছেন, এসব হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর। পৃথিবীর একজন নামজাদা বড় আর্টিস্ট।'

'অ্যাঁ, বল কী? আমাদের মাইকেল? বিলেতে এসে ছবি আঁকত সে? বটে?' হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না।

'মাইকেল এঞ্জেলোকে আপনারা জানলেন কী করে?'

'মাইকেল জানি না! তুমি অবাক করলে! তুমি তাঁর মেঘনাদবধ পড়নি?'

মুকুল ঘাড় নাড়ে,—'না তো! আমি জন্ম থেকেই এখানে কিনা, দেশে তো যাইনি কখনো!'

'বল না গোবরা, বল না সেইটে মুখস্থ—সম্মুখ সমরে পড়ি চূড়বীরামণি, বহু বীর—বহু বীর—হুঁ, মনে পড়েছে, বীর বহু চলি যবে গেলা যমপুরে—তার পরে—তার পরে?'

গোবর্ধনও সহজে দমবার নয়,—'হুর্‌রে হুর্‌রে হুর্‌রে করি গাজল ইংরাজ, নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ—'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হয়ে বাধা দেন,—'উঁহু, উঁহু! ও যে মিলে গেল! মাইকেলের মেলে না। তোর কিচ্ছু মনে থাকে না, তুই একটা অপদার্থ! একেবারে রাবিশ! আবার আমাকে বলিস হাঁটতে পারে না!"

এতক্ষণে প্রতিশোধ নিতে পেরে হর্ষবর্ধন একটু খুশি হন, মুকুলকে সম্বোধন করেন,—'তুমি মাইকেল পড়নি তো? পড়ে দেখো, অনেক বই আছে মাইকেলের।'

গোবর্ধন বলে,—'পড়লে বোঝা যায় বটে, কিন্তু পড়া চাট্টিখানি নয়। দস্তুরমতন শক্ত! দাঁতভাঙা ব্যাপার!'

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন,—'পড়লে বোঝা যায়? তুই তো সব জানিস মাইকেলের! বল দেখি "হস্তী নিনাদিল"—এর মানে কী?'

বার-বার অপমানে গোবর্ধনও গরম হয়,—'তুমি বল দেখি?'

'আমি? আমি জানি না? আমি না জেনেই তোকে জিজ্ঞেস করছি বুঝি?' হর্ষবধন গোঁফ পাকানো ছেড়ে আমতা আমতা করেন,—'এমন কী শক্ত মানেটা শুনি? "হস্তী নিনাদিল"? এ তো জলের মত সোজা! "নিনাদিল"'র "নি" বাদ দিলেই টের পাবি। কিংবা "হস্তিনী নাদিল" তাও করা যায়।' গোবর্ধন তাঁর পাণ্ডিত্যে কাবু হয়ে পড়েছে দেখে পুনরায় তিনি গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন,—'হুঁঃ, এই তোর বিদ্যে! তবু "হ্রেষাধ্বনি" এখনো তোকে জিজ্ঞাসাই করিনি!'

গোবর্ধন এবার ভীত হয়, "হ্রেষাধ্বনি" চাপা দেবার জন্যে বলে, 'মাইকেলের ছবিগুলো কিন্তু বেশ, না দাদা?'

'বেশ না ছাই, এর চেয়ে ওর পদ্য ঢের ভাল !'

মুকুল ওদের আরও অনেক কিছু দেখায়, মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য, মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্কো, এবং আরও কত কি কারুকার্য। মাইকেল এই বিদেশে এসে এত কাণ্ড করে গেছে ভেবে দু-ভাই কম অবাক হয় না। বলতে গেলে গোটা ইটালিটাই গড়ে পিটে গেছে সেই মাইকেল।

হর্ষবর্ধন মাইকেল-গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠেন,—'মাইকেলের বাড়ি কোথায় ছিল জানিস গোবরা ?'

'যশোরে কি খুলনায় যেন।'

'উঁহুঁ আসামে। আমাদের আসামে। আসামী ছাড়া কেউ অত খাটতে পারে নাকি ? কী রকম প্রাণ দিয়ে খেটেছে দ্যাখ !'

'হ্যাঁ, ঠিক যেন ফাঁসির আসামী !' গোবর্ধন আর দাদার প্রতিবাদ করে না। 'ফাঁসির আসামীর মত প্রাণ দিয়ে খাটতে পারে কেউ ?'

মুকুল ওদের বিখ্যাত রোমান ফোরাম দেখায় ; হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন,—'এও আমাদের মাইকেলের তো ?'

'না, তাঁর জন্মাবার হাজার বছরেরও আগের তৈরি।'

'ওঃ !' হর্ষবর্ধন কিঞ্চিত হতাশ হন।

অতি প্রাচীনকালের একটা প্রস্তর-স্তম্ভের কাছে এসে হর্ষবর্ধন আবার প্রশ্ন করেন,—'মাইকেলের ?'

'এ তাঁর জন্মাবার দু হাজার বছর আগেকার।'

হর্ষবর্ধন দমে যান, মুকুল তাঁকে একটা বিরাট প্রস্তর-মূর্তি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—'ওটা কার মূর্তি জানেন ?'

হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ চোখে তাকান,—'মাইকেলের বোধহয় ?'

'উঁহু। ভাস্কো-ডা-গামা ; নাম শোনেননি ?'

'গামা, গামা নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে যেন। খুব কুস্তি করে বেড়াত লোকটা না ?'

'ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল এ কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কিন্তু কুস্তি-টুস্তির কথা তো পড়িনি কখনো !'

'ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন ! তুমি অবাক করলে বাপু ! এইমাত্র আমরা তো ভারতবর্ষ থেকেই আসছি, কিন্তু কই এ-রকম কথা তো শুনিনি ! অত বড় দেশটা আবিষ্কার করল আর আমরা তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলাম না !'

গোবর্ধন বলে,—'তুমি ভুল পড়েছ। ভারতবর্ষ নয়, কুস্তি আবিষ্কার করেছিল গামা। আমি ভালরকম জানি।'

'কি গামা বললে ? ভাস্কো ডা গামা ? বেশ নামটা। তা লোকটা কি মারা গেছে ?'

'অনেক দিন ! চারশো বচ্ছরেরও আগে !'

'চারশো বচ্ছর ! বল কী হে ! তা কিসে মারা গেল সে ?'

'তা কী জানি !' মুকুল মাথা নাড়ে।

'বসন্ত বোধহয় ?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন।

'বইয়ে তো পড়িনি, জানি না।' মুকুল আরো জোরে মাথা নাড়তে থাকে।

গোবর্ধন বলে—'হামও হতে পারে !'

'হতে পারে—তাও হতে পারে—বেঁচে নেই যখন, কোন কিছুতে মারা গেছে নিশ্চয়।' মাথা নাড়তে নাড়তে মুকুলের ঘাড়ে ব্যথা হয়।

'বাপ মা আছে ?'

'অসম—ভব !' প্রশ্ন শুনে মুকুল আকাশ থেকে পড়ে। 'ছেলেপুলেই বেঁচে নেই তো বাপ মা !'

অবশেষে ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুর সম্মুখীন হয়—মিশরের কোন এক রাজার মামি। মুকুল উৎসাহে লাফাতে থাকে, 'দেখছেন ? মামি ! মামি।'

হর্ষবর্ধন কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে লক্ষ করেন,—'কী বললে ? কী নাম ভদ্রলোকের ?'

'নাম ? ওর কোন নাম নেই—জিপ্‌সিয়ান মামি !'

'মাইকেলের মত কোন নামজাদা লোক বোধ হয় ? তা এই বিলেতেই কি এর জন্ম ?'

'না—জিপসিয়ান মামি !'

'আমাদের বাংলা দেশের—মানে, আমাদের আসামের তবে ?'

'না না, বলছি তো, জিপসিয়ান !' মুকুল এবার ক্ষেপে যায়।

'ও, তাই বল ! এতক্ষণে বুঝেছি। ইংরেজ !'

'না, ইংরেজ নয়, ফরাসী নয়, জার্মান নয়, ইটালির লোকও নয়, এমনকি বাঙালিও না—ইজিপ্টায় এর জন্ম।'

'ইজিপ্টায় জন্ম ! ইজিপ্টা বলে কোন দেশের নাম তো কখনো শুনি নি !' হর্ষবর্ধন সন্দেহভরে মাথা নাড়েন।

'ইজিপ্টায়, না, ইজিচেয়ারে ? তুমি ঠিক জান ?' গোবর্ধন প্রশ্ন করে।

'ইজিপ্টা কোনো বিদেশ-টিদেশ হবে। গোবরা, তলায় কী লেখা রয়েছে পড়ে দ্যাখ তো।'

'এফ্‌-আর্‌-ও-এম্‌—ফ্রম্‌ ; ই-জি-ওয়াই-পি-টি। ফ্রম—ফ্রম মানে হইতে আর ই-জি-ওয়াই-পি-টি ?'

'এগ্‌ ওয়াইপ্ট্‌। এগ্‌ ওয়াইপ্ট্‌ হইতে। এগ্‌ মানে ডিম ! অর্থাৎ যেখান থেকে আমাদের দেশে ডিম চালান যায় সেখানকার এই লোকটা। বোধহয় কোন ডিমের আড়তদার-টাড়তদার।'

'মামি—মামি!' গোবর্ধন প্রশ্ন করে,—'তা এর মামা কোথায় গো?'

মুকুলের ঘাড় টন্‌-টন্‌ করছিল, সে হাত নেড়ে জানায় যে ওর জানা নেই।

'দেখছিস গোবরা, কি রকম মজা করে শুয়ে আছে লোকটা—কেমন শান্তশিষ্ট মুখের ভাব!'

গোবর্ধন মুকুলের মুখে তাকায়,—'একি—অ্যাঁ—এ কি মারা গেছে নাকি?'

'নিশ্চয়! তিন হাজার বছর!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—'অ্যাঁ, বল কি? তিন হাজার বছর ধরে এমনি মরে পড়ে রয়েছে?'

গোবর্ধনের বিশ্বাস হয় না,—'তিন হাজার বছর! হতেই পারে না! তিন দিনে মানুষ পচে ওঠে, আর এ কিনা তিন হাজার—'

হর্ষবর্ধনের মুখ এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়,—'শোন ছোকরা, তুমি কী বলতে চাও কও দেখি? বাংলা দেশ থেকে এসেছি বলে কি আমাদের বাঙাল পেয়েছ? যা খুশি তাই বুঝিয়ে দিচ্ছ? ছেলেমানুষ বলে এতক্ষণ তোমাকে কিছু বলিনি; তা বিলেতের ছেলে বলে কি তোমাকে ভয় করে চলতে হবে? অত ভীতু নই আমরা! তোমার চেয়ে আমাদের বাংলা দেশের ছেলেরা ঢের ঢের ভাল!'

গোবর্ধন দাদার সঙ্গে যোগ দেয়,—হ্যাঁ, 'স্পষ্ট কথা! আমরা ভয় খাই না! নিশ্চয় ভাল, হাজার হাজার গুণ ভাল! অত বোকা পাওনি আমাদের, যে যা খুশি তাই বুঝিয়ে দেবে! তিন হাজার বছরের বাসি মড়া চালাতে চাও আমাদের কাছে! টাটকা মড়া থাকে তো নিয়ে এস টাটকা চমৎকার খাসা একখানা লাশ! গোঁফ দাড়ি সমেত তোফা! আমাদের আপত্তি নেই।'

তিনজনকে বাক্যহীন গুরুগম্ভীর মুখে ফিরতে দেখে পৃথ্বীশ রায় বিস্মিত হন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের আগেই হর্ষবর্ধনের বিচলিত কণ্ঠ শোনা যায়, 'মশাই, চলুন! আর নয়, এ দেশে আর এক মুহূর্ত না! এই আপনার বিলেত? দূর দূর! সারা শহরটায় দেখবার মত কিছু নেই! এর চেয়ে আমাদের কলকাতা ভালো! ঢের ঢের ভাল! হ্যাঁ, ঢের ঢের ভাল!'